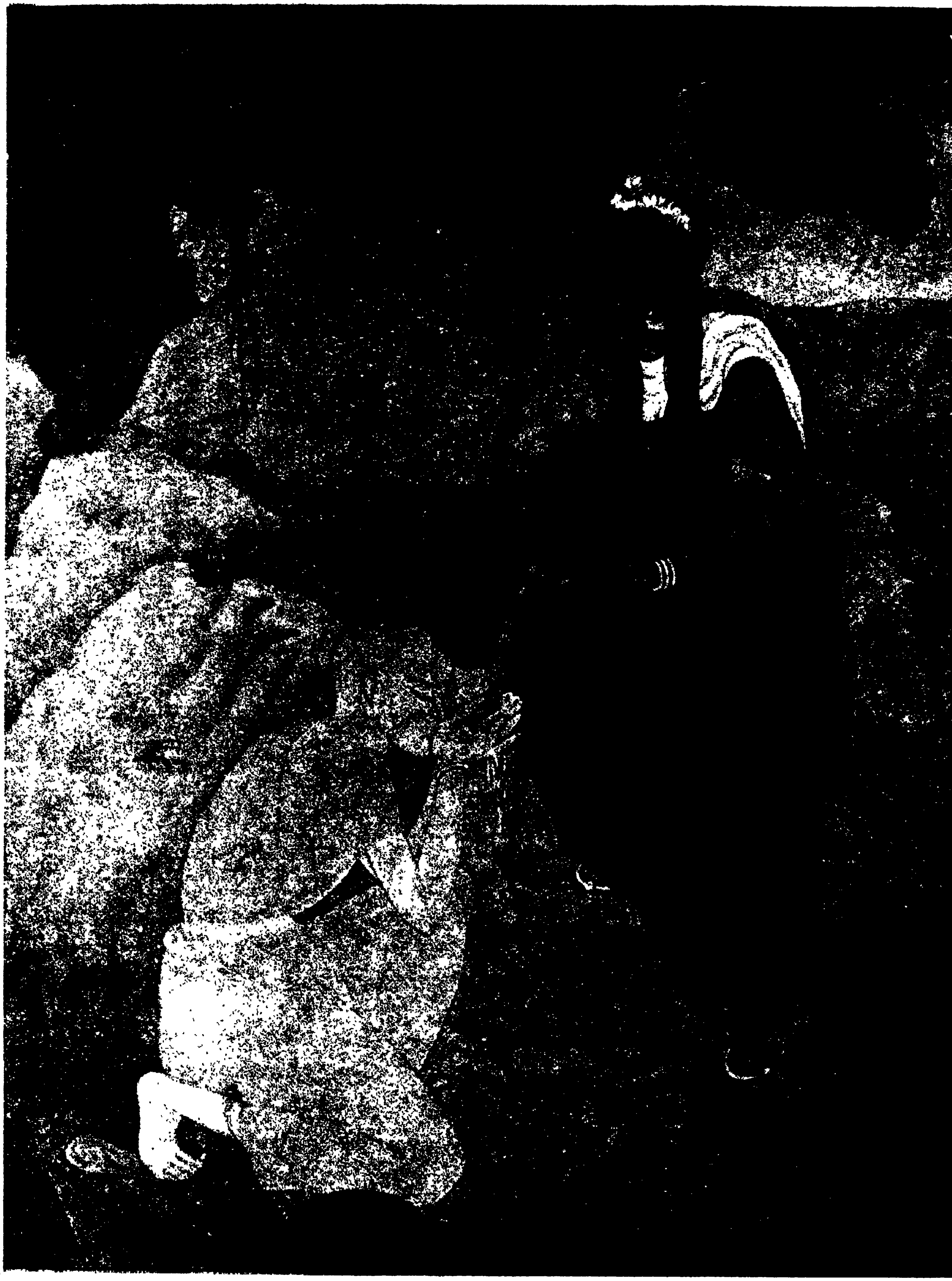


মাতৃকা

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫০ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রাণবান্ ধর্ম্ম

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রাণবান্ ধর্ম্মের যে বাণী শুনাইয়াছেন আজিকার এই মহাসঙ্কটের দিনে তাহা মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিবে। আচার্য্য সতীশচন্দ্র বলিয়াছেন :

"প্রাণবান্, গতিশীল, সতেজ ধর্ম্ম নানা ভাবে আপনার প্রাণবত্তার পরিচয় দেয়। তন্মধ্যে একটি পরিচয় এই যে, এরূপ ধর্ম্মের আশ্রিত মানুষদের কাছে অতীতের চেয়ে বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের মূল্য অধিক। বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য কি, ভবিষ্যতের আহ্বান কোন্ দিকে, এ সকল তাদের কাছে অতীতের স্মৃতির চেয়ে গুরুতর বিষয়। অতীতের স্মৃতিতে অনেক কল্যাণ-প্রেরণা, অনেক অনুপ্রাণনের উপাদান থাকতে পারে। কিন্তু প্রাণবান্ ধর্ম্মের বাণী এই যে, সেই অতীত যদি মানুষের জীবনে বর্ত্তমানের কর্ত্তব্যগুলি সমুচিতরূপে বহন করবার জন্য বল সঞ্চার করে, ভবিষ্যতের আহ্বানের সম্মুখীন হবার জন্য সাহস ও উদ্যোগ সঞ্চার করে, তবেই তা সার্থক, নতুবা নয়। তা না করলে অতীতের গৌরব স্মরণের ফলে আত্মতৃপ্তি ও উদ্যমহীনতা এসে আত্মার বলক্ষয় করে।

"এই জন্য প্রাণবান্ ধর্ম্মের প্রধান দৃষ্টি থাকে বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের দিকে। অতীতের দিকে প্রধান দৃষ্টি চ'লে যাওয়া প্রাণবত্তার ক্ষয়ের প্রথম লক্ষণ।

"অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোভাবের দুইটি দৃষ্টান্ত আমাকে গ্রহণ করতে হবে। তন্মধ্যে অবাঞ্ছনীয় মনোভাবের দৃষ্টান্তটি মহাকবি কালিদাসের উক্তি হ'তে গৃহীত, এজন্য আমার মনে বড় খেদ হচ্ছে। কালিদাসের কবিতার মাধুর্য চিরদিনের। তাহা কত যুগ ধ'রে মানুষ আস্বাদন করেছে, আজও করছে, ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু তাঁর যুগের মানুষের মনের ছাপ তাঁর কবিতায় কখনও কখনও প্রসঙ্গতঃ এসে পড়েছে। রঘুবংশে তাঁর আদর্শ রাজা দিলীপ সম্বন্ধে তিনি বলছেন—

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরম্
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ,

অর্থাৎ দিলীপ এমন ভাল রাজা ছিলেন যে, মনুর সময় থেকে আরম্ভ ক'রে গাড়ী চ'লে চ'লে চাকার দাগে দাগে যে-পথ তৈরি হ'য়ে গিয়েছিল, তাঁর শাসনে তাঁর প্রজারা সে-পথ থেকে রেখা-মাত্রও এদিকে-ওদিকে যেত না। আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, দিলীপের যুগে কি তবে মানুষদের মনগুলি হ'য়ে গিয়েছিল জীবনহীন, অগ্রগতির প্রেরণায় বঞ্চিত? তাই কি মহাকবির বর্ণিত আদর্শ প্রজাদের লক্ষণ এই যে তারা 'নেমিবৃত্তি' অর্থাৎ তারা চাকার দাগে-দাগেই চলে? কারণ যা-ই হোক, এই শ্লোকটি প'ড়ে মনে বড় ক্লেশ হয়। মানুষগুলির মধ্যে যেন অগ্রগতি নাই, স্বীয় যুগের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নাই। এক কাল্পনিক অতীতের উপরেই যেন তাদের আস্থা।

"কোন জাতি বা কোন মানবমণ্ডলী যখন অবনতির পথে চলে, তখন তার মধ্যে সে-অবনতির কতকগুলি চিহ্ন প্রকাশ পেতে থাকে। একটি চিহ্ন এই যে তার মধ্যে অবসাদ আসে, তার অগ্রসর হবার প্রবৃত্তি হ্রাস হ'তে থাকে। আর একটি চিহ্ন এই যে, নিজের সেই উদ্যোগ-হীনতাকে আবরণ করবার জন্য সে স্বীয় যুগকে ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থাসকলকে নিন্দা করতে আরম্ভ করে। কলি-যুগের নিন্দা ও কাল্পনিক এক সত্যযুগের প্রশংসা জাতীয় জীবনের অবসাদেরই পরিচায়ক।"

—

তাজা ধর্মের লক্ষণ

"এখন ভারতপ্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদাসের উক্তির সঙ্গে তুলনা করুন, বাংলার প্রাদেশিক লেখক নরোত্তম দাসকে। তিনি অতি নম্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন চৈতন্যদেবের তাজা ভক্তি-আন্দোলনের যুগে। সেই তাজা ধর্মের প্রেরণা লাভ ক'রে তিনি সাহসের সঙ্গে লিখলেন—

"প্রণমিহ কলিযুগ সর্বযুগসার,
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার।"

তাঁর সময় পর্যন্ত ভারতে যা ছিল চিরনিন্দিত, সেই কলিযুগকে, অর্থাৎ স্বীয় যুগকে, নরোত্তম দাস করলেন প্রণাম। তাজা ধর্মের এই লক্ষণ। তাজা ধর্ম স্বীয় যুগকে শ্রদ্ধা করে; স্বীয় যুগে সে কিছু কর্তব্য সম্মুখে দেখতে পায়। তাজা ধর্ম আশাশীল, সে আশাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকায়। তাজা ধর্মে আদর্শ থাকে; তাজা ধর্মের মানুষগুলি অনুভব করে, তাদের কিছু করবার আদর্শ আছে, কিছু হবার আদর্শ আছে।"

আচার্য্য সতীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, তাজা ও প্রাণবান্ ধর্মের লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম জীবনগত। এই ধর্ম মানুষের সমগ্র জীবনকে, অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান, হৃদয়, বাসনা-কামনা, রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি সম্বলিত সমুদয় মানুষটিকে উন্নত ও বিকশিত করে। এই ধর্মের দৃষ্টি মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির দিকে, বাহ্য অনুষ্ঠানের দকে নয়। তাজা ধর্ম মনুষ্যত্বের ধর্ম। এই ধর্মের আশ্রয়ভূমি মানুষের অন্তরে বটে; কিন্তু মানব-অন্তরের সকল অংশ, সকল ভাব এ ধর্মকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত করিতে পারে না; যেখানে মনুষ্যত্বের উদ্রেক ও উদ্দীপনা হয়, সে সকল অংশ ভালই পারে। তাজা ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে কেবল ঈশ্বরের মনন ও পূজাকেই যেন তাঁর উপাসনা ব'লে মনে করা না হয়। ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন করাও তাঁর উপাসনা-ই। সমাজের কল্যাণের জন্য মানব-প্রাণে আত্মোৎসর্গের ভাব জাগরিত করাই ধর্মের প্রধান মূল্য। জীবের জীবনে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরন্তর নানা চ্যালেঞ্জ আসে। যুদ্ধবিগ্রহে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে 'মঙ্গল কোথায়?' ব'লে দার্শনিক প্রশ্ন প্রাণবান্ ধর্ম তোলে না, 'হায় কি হ'ল' ব'লে বিমূঢ়-বিহ্বলও সে হয় না। এরই মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে ঈশ্বরের চ্যালেঞ্জ আসে, "ওঠ, জাগ, এ অবস্থায় কি কর্তব্য তা ভাব, এবং তা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।" অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্ব অবস্থায় ঈশ্বরের এই আহ্বান স্বীকার করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

ভারত-সরকারের নূতন সেন্সাস্

ভারত-সরকারের গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের গেজেটে প্রকাশ, গবর্ন্মেণ্ট এবার এক নূতন সেন্সাসে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতরক্ষা-আইনের ২৪ক ধারার বলে ভারত-সরকার ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র কোথায় কত জন 'এশিয়াটিক ব্রিটিশ প্রজা' ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার গণনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই গণনা-কার্য্যের জন্য যে প্রশ্নোত্তরমালা রচনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য:

১। ব্রহ্ম-মালয় প্রভৃতি স্থানে উপার্জ্জনের পন্থা কি ছিল?

২। বর্ত্তমানে আয়ের পথ কি?

৩। জীবিকা উপার্জনের বর্তমান উপায় কি স্থায়ী না অস্থায়ী?

৪। ব্রহ্ম মালয় প্রভৃতি হইতে আগত কত জন পোষ্য আছে?

৫। পড়াশুনা কত দূর হইয়াছে?

এই নূতন আদেশের [The Asiatic British Evacuees (Census) Order 1943] দুইটি তাৎপর্য্য আছে। প্রথমতঃ, এংলো-বর্ম্মান, এংলো-মালয়ান প্রভৃতিকেও এংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ানদের ন্যায় বিশেষ সুবিধা দানের জন্য সকলকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া একটি এংলো-এশিয়াটিক শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইউরোপীয়ানদের পুত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি বংশধরেরা ভিন্ন (not being of European descent in the male line) অপর সকলেই, অর্থাৎ খাটি ইউরোপীয়দের দৌহিত্র প্রভৃতি কন্যার দিকের বংশধরেরাও এই নূতন আদেশের সুযোগ লাভ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষে অথবা ভারতের পূর্বদিকে এশিয়ার যে-কোন দেশে ইউরোপীয় সংমিশ্রণে যাহারাই জন্মগ্রহণ করিবে অথবা স্থায়ী ভাবে বাস করিবে, তাহারাই হইবে এশিয়াটিক ব্রিটিশ প্রজা। মধ্য-এশিয়া বা আফ্রিকায় ব্রিটিশ-সংমিশ্রণে জাত যে-কোন ব্যক্তি অতঃপর এদেশে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলে সেও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের সমান সুবিধা ভোগ করিতে পাইবে।

সুবিধাটাও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। ১৯৪২-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র

নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আনে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম হইতেই ব্রহ্ম-মালয়-আগত এংলো-ইণ্ডিয়ান, এংলো-বর্ম্মান ও ইউরোপীয়ানদের প্রতি ভারত-সরকারের অনুগ্রহ বুঝা যাইবে :

ব্রহ্ম মালয় প্রভৃতি হইতে আগত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ভারত সরকারের নিজস্ব এবং অধীনস্থ বিভাগ-সমূহে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে :

ভারতীয়	৪৮০
এংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ডোমিসাইল ইউরোপীয়	২৫৮
এংলো-বর্ম্মান	১০৩
ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা	১২৪
অন্যান্য	৯৩
মোট	১০৫৮

ইহা ভিন্ন প্রাদেশিক সরকারেরা কে কত জন 'এশিয়াটিক ব্রিটিশ প্রজা' ও ভারতীয়কে আশ্রয় দিয়াছেন তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। খাঁটি ভারতবাসী যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের তুলনায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুবই কম, অথচ অর্দ্ধেকেরও অধিক উচ্চপদ ইহারা দখল করিতে পারিয়াছে।

—

আমরা কি সভ্য দেশে বাস করিতেছি ?

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ষ্টেট্সম্যান পত্রিকায় সম্প্রতি কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির লেখক জানাইতেছেন যে তিনি বালীগঞ্জ ষ্টেশনে একটি মৃতদেহ পচিবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া উহা সরানো হয় নাই কেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। হিন্দু সৎকার-সমিতিকে টেলিফোন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে পুলিসের ছাড়পত্র ভিন্ন শব সরাইবার উপায় নাই। অতঃপর বালীগঞ্জ থানায় ফোন করিলে তাঁহাকে ফাঁড়িতে টেলিফোন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। এইরূপে টেলিফোনে প্রাপ্ত উপদেশ অনুসারে ফাঁড়ি এবং আরও কোন কোন স্থানে ফোন করিয়া হতাশ হইয়া তিনি ষ্টেট্সম্যান-সম্পাদককে পত্র লিখিয়া সমস্ত ঘটনা জানাইয়াছেন এবং প্রশ্ন করিয়াছেন, "আমরা কি সভ্য দেশে বাস করিতেছি ?"

আমরা সভ্য দেশে বাস করিতেছি কি না এ বিতর্ক না তুলিলেও এটা নিঃসন্দেহ যে, বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলা দেশের শাসনকর্তা সর্ জন হার্বার্ট এবং তাঁহার প্রিয় প্রধান মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীনের শাসনগুণে সুবে বাংলায় মুড়ির দর মিছরির সমান নয়, দ্বিগুণ—এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলে ষ্টেট্সম্যানের পত্রপ্রেরক সভ্য দেশে বাস করিতেছেন কি না এ প্রশ্ন তুলিতেও হয়ত লজ্জা পাইতেন।

—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাব

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারত-সরকারের প্রতিনিধি সর্ সফাৎ আমেদ খাঁ ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার বাণিজ্যের উন্নতিকামনায় একজন ট্রেড কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। স্মাট্স-গবর্ন্মেণ্টের ভারতীয় বিতাড়ন বিলের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া ভারত-সরকারও একটু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সরকারী প্রতিবাদে আন্তরিকতার অভাব তখনই বেশ অনুভূত হইয়াছিল। প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি এত বড় অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই করেন নাই, ভারতীয়-বিতাড়ন-আইন প্রত্যাহারে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে বাধ্য করিবার কোন চেষ্টাই তাঁহাদের দ্বারা হয় নাই। এই অন্যায় আইন পাকা হইবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক দৃঢ়তর করিবার প্রস্তাব করিয়া লর্ড লিনলিথগোর গবর্ন্মেণ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রবাসী ভারতবাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের মতেও বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাই স্মাট্স-গবর্ন্মেণ্টকে যুক্তিসঙ্গত কথা শুনাইবার একমাত্র উপায়। ভারত-সরকারও ইহা না জানেন এমন নহে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইলে ভারতবর্ষের ক্ষতি হইবারও কথা নয়, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোন রূপ বাধাও ইহাতে হইবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেসের ভারতস্থ প্রতিনিধি মিঃ এম. এ. জাদোয়াৎ এবং স্বামী ভবানীদয়ালের বিবৃতি হইতেও ইহাই বুঝা যায় :

"দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে, এই সংবাদ বিশেষ উদ্বেগজনক। উহা ডাঃ খারে কর্তৃক আহূত নেতৃসম্মিলনে স্থিরীকৃত হয় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় উভয় পরিষদে অনুমোদিত হয়। ভারতীয়-বিতাড়ন-বিল ভারতবর্ষে বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়াছে। ভারতবাসীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ ইউনিয়ন গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা দাবি করিয়াছে। এখন এই কথা বলা হইতেছে যে, ভারতবর্ষ যদি ওয়াটেল গাছের ছাল আমদানী না করে, তবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিশেষ ক্ষতি হইবে। এ কথা সত্য নহে। উত্তর-ভারতের ট্যানারীগুলিতে এই ছাল

ব্যবহৃত হয় না। দক্ষিণ-ভারতে ইহার ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু এখানে তাহার পরিবর্তে 'বাবুলে'র ছাল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা সমানই উপযোগী। ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাই ইউনিয়ন গবর্ন্মেণ্টকে যুক্তি বুঝাইবার একমাত্র উপায়।"

সরকারী আশ্রয়-কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব

মফস্বল হইতে কলিকাতায় খাদ্যান্বেষণে আগত সহস্র সহস্র নরনারী শিশু বৃদ্ধকে আশ্রয়দানের জন্য বাংলা-সরকার কলিকাতার বাহিরে কয়েকটি আশ্রয়-কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যথারীতি একটি পরিকল্পনাও রচিত হইয়াছিল এবং সাড়ম্বরে সরকারী দপ্তরখানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে উহা ব্যাখ্যা করা বাদ যায় নাই। বৈঠকে রাজস্ব-সচিবকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলির উত্তরদান-প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় ব্যক্তিগত এবং সরকারের তরফ হইতে এই আশ্বাস দেন যে গ্রামে তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য বিনামূল্যে অন্নসত্র খুলিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয়-কেন্দ্র হইতে অপসারিত করা হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, দুঃস্থগণকে অপসারিত করার পূর্বে তাহাদের শারীরিক সুস্থতার বিষয়ও দেখা হইবে।

যাহাতে দুঃস্থদিগকে এমন কোন অঞ্চলে সরাইয়া লওয়া না হয় যেখানে তাহাদের পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধন ক্ষুণ্ণ হয়, শ্রীযুক্ত জে. কে. বিশ্বাস সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলেন যে, এই কারণেই যে-সকল অঞ্চল হইতে তাহারা আসিয়াছে সরকার তাহাদিগকে সেই সকল অঞ্চলেই প্রেরণ করিবার জন্য উৎসুক।

তাড়াতাড়িতে এক জেলার লোককে অন্য কোন জেলার আশ্রয়-কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হইবে কি না সে বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, দুঃস্থগণকে কলিকাতার আশ্রয়স্থলে আনার পর তাহাদিগকে স্ব-স্ব গ্রামের নিকটবর্তী কেন্দ্রে পাঠান হইবে। তিনি আরও বলেন, আশ্রয়-কেন্দ্রে এই সকল দুঃস্থকে খাওয়ান এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়াও যাহাতে তাহাদিগের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা হয় সেজন্য সরকার স্থানীয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

উল্লিখিত পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বে-সরকারী ভদ্র মহোদয়গণ বিভিন্ন সাহায্য-সমিতি ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সভায় প্রকাশ করা হয় যে, কলিকাতা কেন্দ্রে দুঃস্থগণকে আনার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং শুক্রবার অপরাহ্নের পূর্বেই প্রায় ৫৭০ জন দুঃস্থকে আশ্রয়দান করা হইয়াছে।

এই অতি সামান্য পরিকল্পনাটিও আজ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এক দিন ৫৭০ জনকে সরাইয়া লইবার পর আর এ বিষয়ে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রকার কয়টি আশ্রয়-শিবির খোলা হইয়াছে, মোট কত লোক সেখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে ইত্যাদি কোন বিশদ সংবাদই সরকার-পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপিত হয় নাই। শহরের রাজপথে রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাহারা মরিতেছে তাহাদের জন্য এরূপ অস্থায়ী আশ্রয়-শিবির আরও আগেই করা উচিত ছিল। পরিকল্পনা যদি বা হইল, উহার কতখানি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বাংলা-সরকার এ সংবাদ দিতে পারিতেছেন না কেন? বাংলার বিপর্য্যস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিয়া দেশের স্থায়ী উন্নতি করিবেন, বর্ত্তমান গবর্ন্মেণ্টের নিকট এ আশা কেহ করে না, কিন্তু বিপদের দিনে অস্থায়ী সাহায্যদানেও তাঁহাদের এ কুণ্ঠা ও অক্ষমতা কেন?

কেন্দ্রীয় রিলিফ ফণ্ড

বাংলার প্রধান মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীন ভারতের সর্বত্র দেশবাসীর নিকট এক আবেদনে বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী যে "সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড" খুলিয়াছেন তাহাতে সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়াছেন। অর্থ-সাহায্য কলিকাতার পোলক ষ্ট্রীটস্থ পোলক-হাউসে সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডের সেক্রেটরী মিঃ এ এশাহ্ আই-সি-এস-এর নিকট পাঠাইতে হইবে কিংবা সর্ নাজিমুদ্দীনের নিকট "সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড" চিহ্নিত করিয়া পাঠাইতে হইবে। খাদ্য বা অন্যান্য সাহায্য অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট ৭ নং চার্চ লেন, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। তিনি প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত জিনিস আনাইবার অনুমোদন সংগ্রহ করিবেন।

একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ ফণ্ডের অভাব অনুভব করিয়াই নাকি সর্ নাজিমুদ্দীন এই বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য সরকারী আওতায় স্বতন্ত্র ফণ্ড খোলার কোন প্রয়োজন ছিল কি? বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ডটিকে কেন্দ্রীয় ফণ্ডে পরিণত করিয়া উহার কর্মকর্তাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করিলে কি ক্ষতি ছিল? সর নাজিমুদ্দীনের গবর্ন্মেণ্ট বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে সাহায্য-দান-ব্যবস্থায় যে দীর্ঘসূত্রিতা, অদূরদর্শিতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার পর

তাহাদের হাতে সরকারী অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের নিকট হইতে টাকা আসিলেও তাহা যথাযথ সাহায্যে পরিণত হইতে কত দিন লাগিবে তাহা সঠিক বলা অসম্ভব।

—

সর্ সুলতান আহমদের বক্তৃতা

ভারত-সরকারের প্রচার-সচিব সর্ সুলতান আহমদ যুদ্ধের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছেন :

"নাৎসীরা মনে করে যে জার্মান ব্যতীত কাহারও পেট ভরিয়া খাওয়ার অধিকার নাই। সেজন্য ইউরোপে লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নরনারী ক্লেশভোগ করিতেছে। জাপানও ভারতের অনুরূপ দুর্দশা করিয়াছে এবং সম্ভব হইলে আরও ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি করিবে। বাংলার পর্য্যাপ্ত খাদ্যের অভাব ও তৎসংশ্লিষ্ট দুঃখকষ্টই আমাদের দেশে বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা জরুরি আভ্যন্তরীণ সমস্যা। সেজন্য জাপানী চাউল-লুণ্ঠনকারীরাই দায়ী। অতএব যে বৈদেশিক আক্রমণকারী ব্রহ্মদেশকে ভারতের পক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বহু লোকের আশা-ভরসা-স্থল ব্রহ্মের চাউল ফসল কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার নিকট হইতে আমরা কোনরূপ সহানুভূতি প্রত্যাশা করিব না। আমরা মাত্র জাপানীদের আত্মসমর্পণ চাহি এবং আমরা তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিব।"

জার্মেনী বা জাপান ভারতবর্ষ অধিকার করিলে ভারত-বাসীর ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিবে বলিয়া সর্ সুলতানের ন্যায় উৎসাহী প্রচারবিদেরা এত দিন বলিয়া আসিয়াছেন, ইংরেজ রাজত্ব বর্তমান থাকিতেই বাংলায় প্রতি দিন চক্ষের উপর সকলে সেই সব ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতেছে। দেশের বর্তমান দুরবস্থার জন্য একমাত্র জাপানই দায়ী, জাপানকে আত্মসমর্পণ করাইতে পারিলেই এই সমস্যা চিরতরে দূর হইয়া যাইবে, এতটা ভরসা কয়জনে করিতে পারিবেন জানি না।

—

দুর্ভিক্ষে কাঁথির অবস্থা

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি হইতে শ্রীযুক্ত অবন্তীকুমার পাত্র ৩রা সেপ্টেম্বরের 'যুগান্তরে' লিখিয়াছেন,

"গত প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের পর হইতে মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার অধিবাসীদিগকে রিলিফ দিয়া সরকার এ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া আসিতেছিলেন, গত ২০শে আগষ্ট হইতে গবর্মেণ্ট উক্ত মহকুমার সর্বত্র রিলিফ বন্ধের আদেশ দিয়াছেন। শুধু শহরেই প্রতি দিন গড়ে ১৫।১৬ জন করিয়া মরিতেছে। গত ২১শে আগষ্ট রবিবার শহরের উপরেই ২৫ জন মারা যায়। মফস্বলের ত কথাই নাই। এখন আর পোড়াইতে না পারিয়া মৃতদেহ ভাসাইয়া দেওয়া হইতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা যথেষ্ট থাকিলেও, এত দিন ধরিয়া মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য ছিল ভিক্ষুকশ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু রিলিফ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ভিক্ষুকশ্রেণীর অন্তর্গত হইল।

৮ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর রিলিফ কমিটির সেক্রেটরী ডাঃ জি সি ভৌমিক ইউনাইটেড প্রেসের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

"তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম হইতে বহু লোকের মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। অনাহার বা ম্যালেরিয়াতে ইহারা মারা যাইতেছে। পূর্ব-নন্দীগ্রামেই বেশী লোক মরিতেছে। মরা পোড়াইবার লোক না পাওয়াতে মৃত-দেহগুলি খালে ও রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। চাউলের অভাবে অন্নসত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহু লোক শয্যাগত হইয়া রহিয়াছে। অবিলম্বে সাহায্য দরকার। সুতাহাটায় অনাহারে দৈনিক ৩০ জন করিয়া মারা যাইতেছে। মহিষাদলে অনাহারে দৈনিক প্রায় ১৫ জন মারা যাইতেছে। তমলুক শহরে দৈনিক ৪।৫ জন এবং তমলুক মহকুমায় প্রায় ৫০ জন মারা যাইতেছে।"

৯ই সেপ্টেম্বরের আর একটি সংবাদে প্রকাশ,

"কাঁথি মহকুমার অবস্থা দিনের পর দিন অতি সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিতেছে, মায়েরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না, প্রত্যহ শহরের রাস্তায় ৪।৫ বছরের অস্থিকঙ্কালসার শিশুরা একা একা খাদ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে যে, তাহাদের মাতাপিতার মৃত্যু হইয়াছে, অথবা শিশুদিগকে শহরে ফেলিয়া দিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই সকল শিশুর রক্ষক কেহ নাই, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাস্তায় পড়িয়া মরিতেছে। শহরের রাস্তায় অনাহারে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে এই শহরের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ১২৭ জন লোক অনাহারে রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের মৃত্যুসংখ্যাও ভয়াবহ।"—যুগান্তর

বাংলা-সরকারের বাজেটে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করিবার পরও কাঁথির এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য টাকা জুটিল না, ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। অত ঝঞ্ঝার পর হইতেই মেদিনীপুরের প্রতি বাংলা-সরকারের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। যতখানি সাহায্য মেদিনীপুরকে করা উচিত

ছিল তাহা করা হয় নাই। এই জেলায় দুর্ভিক্ষ যখন করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে সেই সময় হঠাৎ সেখানে সরকারী রিলিফ বন্ধ করা হইল কেন? কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র রিলিফ ফণ্ডে মেদিনীপুরের নামে যে ৮০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা অবিলম্বে একমাত্র মেদিনীপুরের জন্যই ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

—

বর্তমান দুর্ভিক্ষে নারী রক্ষার প্রয়োজন

বাংলাই দুর্ভিক্ষে বহু জটিল সমস্যার মধ্যে একটি গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন বহু নারী, যুবতী ও কিশোরী আহারান্বেষণে পথে পথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় কুলোকের প্ররোচনায় পড়িয়া ইহারা অবাঞ্ছনীয় জীবনযাত্রায় বাধ্য হইবে ইহা আদৌ অস্বাভাবিক নহে। অনাথ বালকদিগকে আশ্রয় দানের একটু সামান্য চেষ্টা হইলেও নারীদের আশ্রয়-দানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এই গুরুতর সমস্যাটি আর উপেক্ষা করা উচিত নহে। নিখিল-ভারত মহিলা-সম্মেলনের কর্মিবৃন্দ এদিকে মনোযোগ দিতে পারেন। মহিলা-প্রতিষ্ঠানগুলিই এই কার্য্যে অগ্রণী হইলে ভাল হয়।

—

বরিশাল হিতৈষীর নিকট জামানত দাবি

বরিশাল হিতৈষীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য এই পত্রিকাটির নিকট পাঁচ শত টাকা জামানত দাবি করা হইয়াছে। দশ দিনের মধ্যে এই টাকা দাখিল করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বরিশাল হিতৈষী দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার মতবাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং এজন্য সরকারের নিকট হইতে লাঞ্ছনাও ভোগ করিয়াছে। এ আদেশ তাহার নিকট নূতন নয়। সরকারী কোপ বরিশাল হিতৈষীর ন্যায় পত্রিকাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, দেশবাসীর এই বিশ্বাসই তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

—

বাংলা-সরকারের চাউল ক্রয়

১১ই সেপ্টেম্বরের যুগান্তর পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়:

"এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ প্রচার করা হইয়াছে যে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে গবর্ন্মেণ্ট কলিকাতাতে ২৪৲ টাকা মণ দরে ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদ করিয়াছেন। চাউলের দর যখন কলিকাতায় ২০৲ টাকা মণ ছিল, তখন তাহা সাত-আট টাকায় নামাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া যাঁহারা আস্ফালন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আজ ২৪৲ টাকা দরে চাউল কিনিয়া লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, চাউলের দর কমিতেছে। কিন্তু এই ২৪৲ টাকা মণ দরে হঠাৎ এক দিন ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠ করিয়া স্বতঃই কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়, যথা—(১) এই চাউল কাহার নিকট হইতে খরিদ করা হইয়াছে, (২) চাউলটা আউস না আমন, (৩) কবে এই চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে, (৪) বিক্রেতা কত দরে খরিদ করিয়াছিল, (৫) কত দিন এই চাউল বিক্রেতার হাতে ছিল, (৬) এই চাউলের জন্য তাহার লাইসেন্স ছিল কি, (৭) লাইসেন্স থাকিলে তাহার নিকট যে এই চাউল আছে তাহা সে জানাইয়াছিল কি, (৮) জানাইয়া থাকিলে কবে জানাইয়াছিল, (৯) না জানাইয়া থাকিলে গবর্ন্মেণ্ট এই চাউলের সন্ধান কি করিয়া পাইলেন, (১০) বিক্রেতা স্বেচ্ছায় এই দরে গবর্ন্মেণ্টকে চাউল দিয়াছে, না গবর্ন্মেণ্ট এই দরে বিক্রয় করিতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছেন, (১১) এই চাউল অসামরিক না সামরিক বিভাগের জন্য খরিদ করা হইয়াছে? আশা করি, গবর্ন্মেণ্ট অবিলম্বে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া অকস্মাৎ এভাবে ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদ করার সংবাদ প্রচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। অন্যথায় এই প্রচারকার্য্য নানা সন্দেহ উদ্রেক করিবে।"

ইহার চার দিন পর ১৫ই সেপ্টেম্বর যুগান্তর আবার লেখেন,

"কয়েক দিন আগে প্রচারিত হইয়াছিল যে, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলা-সরকার ২৪৲ টাকা মণ দরে ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদ করিয়াছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে যে চাউলের উচ্চতম মূল্য ২৪৲ টাকা হইবে ইহা পূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় এক দিন আগেই ঐ দরে চাউলপ্রাপ্তির সংবাদ যে একটা সুসংবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সংবাদটি প্রচার করার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। প্রশ্ন কয়টির উত্তর পাওয়া যায় নাই। ইত্যবসরে জনৈক পত্রপ্রেরক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, উক্ত ৯ই তারিখেই নাকি সরকারের তরফে মল্লিক ষ্ট্রীটের এক গদিতে বসিয়া ২৯৲-৩০৲ টাকা মণ দরে বহু চাউল এবং ঐ তারিখেই টালিগঞ্জের কোনও এক রাইস মিল হইতে ২৮৷৷০ মণ দরে ছয় শত মণ চাউল খরিদ করা হইয়াছে। কথাটা সত্য হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, একই দিনে সরকার বাহাদুর ২৪৲ টাকা মণ দরে চাউল খরিদ করিতে পারিলেন অথচ সরকারের তরফে ক্রেতারা বেশী দাম দিয়া কিনিলেন

কেন ? অধিকন্তু পর-দিনই যে চাউল ২৪৲ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইবে, এক দিন অপেক্ষা না করিয়া সেই চাউল বেশী দরে খরিদ করা হইল কেন ? যদি সত্য সত্যই ঐরূপ খরিদ করা হইয়া থাকে, তবে লোকসানটা কে দিবে, সরকার বাহাদুর, না এজেন্টগণ ?"

বাংলা-সরকার ইহারও কোন জবাব দেন নাই। ১৯শে সেপ্টেম্বর দৈনিক বসুমতী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,

"উড়িষ্যা হইতে যে লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী করা হইয়াছিল, তাহা আসাম সরকার কিনিয়াছিলেন কি না ? যদি কিনিয়া থাকেন, তবে কেন ? উহা কি "Carrying coal to Newcastle" নহে ? সেই চাউল আবার বাংলায় আসে নাই ত ?"

পঞ্জাব হইতে বাংলা-সরকারের বিরুদ্ধে গম লইয়া অতিলাভের অভিযোগ উঠিয়াছে। উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতে আশঙ্কা হয় চাউল ক্রয় ব্যাপারেও বাংলা-সরকার কলুষমুক্ত নহেন। অন্ততঃ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। বাংলার দুইটি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রের প্রকাশ্য অভিযোগ নীরবে এড়াইবার চেষ্টা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। চাউল ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বাংলা-সরকারের কার্য্যকলাপের বিশদ বিবরণ প্রকাশের দাবি আরও তীব্র হওয়া দরকার।

—

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ডাঃ দেশমুখের বিবৃতি

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ডাঃ দেশমুখ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন :

"বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উহার প্রতীকার-প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে। কিছু কাল ধরিয়া শোচনীয় অবস্থা চলিতেছে। উক্ত প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের একজন অসামরিক সরবরাহ সচিব আছেন। তিনি শুধু বিবৃতি দেওয়া ছাড়া এ পর্য্যন্ত স্বয়ং অথবা তাঁহার গবর্ন্মেণ্টের মারফৎ কিছুই করেন নাই। তিনি ফসলের কোনও আনুমানিক হিসাব দেন নাই এবং কোনও বরাদ্দ ব্যবস্থা করেন নাই। মজুত করার বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে স্থায়ী জমিদারগণ যাহাতে তাঁহাদের মজুরগণকে নগদ টাকা না দিয়া অন্য প্রকারে পারিশ্রমিক দেন, তিনি তাঁহাদের সম্পর্কে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। শিল্পপতিগণ যাহাতে কেবল তাঁহাদের শ্রমিকগণকে খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে মজুত করিয়া লাভ না করিতে পারেন তিনি সেরূপ কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। উক্ত প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট সম্পূর্ণরূপে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।"

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বাংলা-সরকার একটিও স্পষ্ট কথা বলিতে চাহিতেছেন না। খাদ্যাভিযানের ফলে কি পরিমাণ ঘাট্‌তি ধরা পড়িয়াছে, ঘাট্‌তি পূরণের জন্য তাঁহারা কোন্ জেলায় এ যাবৎ কত শস্য পাঠাইয়াছেন, কোন্ জেলা হইতে কত ধান ও চাউল ক্রয় করা হইয়াছে এবং কোথায় কত বিক্রয় করা হইয়াছে, কোন্ প্রদেশ হইতে কত ফসল এ যাবৎ আসিয়াছে এই সব অত্যাবশ্যক তথ্য গবর্ন্মেণ্ট কিছুতেই প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন না। গোড়া হইতেই এই ভাবে ঢাক-ঢাক নীতি অবলম্বন করিবার ফলে বাংলা-সরকার আজ শুধু বাঙালীর নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও আস্থা হারাইতেছেন। ডাঃ দেশমুখের বিবৃতি তাহারই পরিচয়।

—

মিঃ সুরাবর্দির বিবৃতি

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মিঃ সুরাবর্দি বাংলার অন্নসমস্যা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে কাজের কথা একটিও নাই। তবে এত দিন পরে দুর্ভিক্ষের কথাটা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দি অন্নসমস্যার ১১টি কারণ দেখাইয়াছেন : (১) ১৯৪২ সালে আউস ধানের অভাব, (২) ১৯৪২-৪৩ সালে আমন ধানের অভাব, (৩) মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় বাত্যা, (৪) মড়কের জন্য ধান নষ্ট হওয়া, (৫) নৌকা-নিয়ন্ত্রণ-নীতি, (৬) সমুদ্রোপকূল হইতে লোকাপসরণ, (৭) বর্মা হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীর দল, (৮) কারখানা-অঞ্চলে মজুরসংখ্যা বৃদ্ধি, (৯) বর্ম্মা হইতে চাউল আমদানী বন্ধ, (১০) অতিরিক্ত মিলিটারী আমদানী এবং (১১) অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহুল পরিমাণে আমদানী হ্রাস।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় বৎসরাধিক কাল পূর্ব্ব হইতেই আসন্ন বিপদ অনুভব করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট কারণ পাওয়া গিয়াছিল। অন্যত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর যে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের কি কি ব্যবস্থা ফেমিন কোডে আছে তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলা-সরকার দুর্ভিক্ষের লক্ষণগুলির প্রতি একেবারেই মনোযোগ দেন নাই। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া

যাওয়ার পর তাঁহাদের চৈতন্ত হইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দি দুর্ভিক্ষের যে ১১টি কারণ দেখাইয়াছেন, সময় থাকিতে সেগুলি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এ দুর্ভিক্ষ আজ দেখা দিত না।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যবৃন্দের কর্তব্য পালনে ঔদাসীন্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নিয়োগী যত সতর্কতার সহিত প্রাদেশিক ফেমিন কোড অধ্যয়ন করিয়া বাংলা-সরকারের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন সদস্য সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইঁহাদের বক্তৃতার অধিকাংশই ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাসে পূর্ণ; নিজ নিজ জেলায় কি ঘটিতেছে তাহার সঠিক তথ্যপূর্ণ বিবরণ পর্যন্ত উহার ভিতর পাওয়া যায় না। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণের প্রধান দায়িত্ব নিজ নিজ নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রয়োজনের কথা যাচাই করা, তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা এবং সরকারের কোন কাজে অন্যায় অবিচার অথবা অক্ষমতার সংবাদ পাওয়া গেলে উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর পরিষদে প্রশ্নোত্তরের আকারে তাহা প্রকাশ করিয়া গবর্মেণ্টকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অতি সামান্য দুই-এক জন ভিন্ন আর কেহই এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। বেতন ও ভাতায় মাসিক ইঁহারা প্রায় তিন শত টাকা করদাতাদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। সেদিক দিয়াও ইঁহাদের কর্তব্য পালিত হয় নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে খাদ্য-সমস্যা লইয়া যেভাবে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, মিঃ সুরাবর্দির বিবৃতির যেরূপ সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন ছিল, সদস্যবৃন্দের অক্ষমতার জন্য তাহা হয় নাই।

ইস্পাহানী কোম্পানীকে সাড়ে চারি কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে কি না?

বাংলার নব-নিযুক্ত লাট সর্ টমাস রাদারফোর্ড কার্যভার গ্রহণ করিবার পর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে একখানি খোলা চিঠি লেখেন এবং কলিকাতার সংবাদপত্র-গুলিতে ৮ই সেপ্টেম্বর উহা প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কথার মধ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ঐ পত্রে নিম্নলিখিত গুরুতর অভি-যোগটি করেন:

"অবাধ বাণিজ্যের আমলে বাংলা-সরকার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি হইতে যে উপায়ে খাদ্যশস্য কিনিতেছিলেন তাহা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। মুস্লিম লীগ দলভুক্ত বলিয়া একটি পেয়ারের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে কোন টেণ্ডার আহ্বান না করিয়াই এই ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং **আজ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে।** অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি, কেননা, আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এই সকল কেনা বেচার কালে বাংলার জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই। যদি স্বাধীনভাবে তদন্ত গৃহীত হয় তবে আমরা প্রমাণ করিতে পারিব যে, মন্ত্রিমণ্ডল বাংলার প্রতি কিরূপ অবিচার করিয়াছেন। তাঁহারা জনকল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বার্থবোধ দ্বারাই অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন।"

এই খোলা চিঠি প্রকাশের সময় মিঃ সুরাবর্দ্দি লাহোরে ছিলেন। বোম্বাই ক্রনিকেলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, একথা সত্য কি না যে গবর্মেণ্টের দলভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানকে সরকারের সোল এজেণ্ট-রূপে চাউল ক্রয়ের জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে চার কোটি টাকারও বেশী আগাম দেওয়া হইয়াছে এবং ইহারা বাংলার বাহিরে যে-দরে চাউল ক্রয় করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক চড়া দরে বাংলা-সরকারকে উহা বিক্রয় করিয়াছে। বাংলা সরকার নিজেই বা কেন অপর প্রদেশ হইতে সরাসরি চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন না? মিঃ সুরাবর্দ্দি এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন, "বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সব প্রশ্ন তুলিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার যথোচিত জবাব দেওয়া হইয়াছে। তিনি পরিষদ-গৃহের বাহিরে এই সব কথা বলিলে আমি তাঁহাকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করিব। আমি জানি সে সাহস তাঁহার নাই।" মিঃ সুরাবর্দির লাহোর হইতে প্রদত্ত এই বিবৃতির পর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট বলেন, "মিঃ সুরাবর্দির এই ধৃষ্টতা ও ভীতিপ্রদর্শনের পরও আমি আমার অভিযোগের পুনরুক্তি করিতেছি। কটূক্তির দ্বারা তথ্য উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে-সব তথ্য এবং মন্ত্রীদের যে-সব অপকীর্ত্তি ও মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পাইয়াছে, মন্ত্রিত্বের ইতিহাসে সে কেলেঙ্কারীর তুলনা নাই। বিষয়টি আরও বেশী গুরুতর এই জন্য যে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর জীবন যখন বিপন্ন, সেই সময়ে এই সব কেলেঙ্কারী চলিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দি এবং তাঁহার বন্ধুদের যদি সাহস থাকে, তাঁহারা প্রকাশ্য এবং নিরপেক্ষ তদন্ত-কমীটির সম্মুখে দাঁড়াইতে সম্মত হউন। নিজের কথা আমি বলিতে পারি যে এরূপ প্রস্তাব মানিয়া লইতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" এই বিবৃতি প্রদত্ত হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর।

১৮ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা-পরিষদ-গৃহে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ পূর্ব্বের অভিযোগের পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন:

"মিঃ সুরাবর্দির যদি সাহস থাকে তবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব যেন পরিষদে পেশ করেন :—

(১) ইস্পাহানি কোম্পানীকে মোট কত টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ তারিখে দেওয়া হইয়াছে।

(২) গবর্নমেণ্ট ও ইস্পাহানি কোম্পানীর চুক্তিপত্র।

(৩) বাংলার বাহির হইতে কোন্ কোন্ তারিখে কোন্ কোন্ স্থান হইতে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি অথবা এজেণ্টের নিকট হইতে কত কত দরে ইস্পাহানি কোম্পানী চাল খরিদ করিয়াছেন।

সাড়ে চার কোটি টাকারও বেশী ইস্পাহানি কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার হিসাব জানার অধিকার বাংলাবাসীর আছে, বিশেষতঃ যখন বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলীর সহিত ইস্পাহানি কোম্পানীর রাজনৈতিক আঁতাত রহিয়াছে। যদি মন্ত্রিমণ্ডলীর কোন একটুও আত্মমর্য্যাদা বোধ থাকে (আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে) তাহা হইলে তাঁহারা এই সমস্ত খবর বাংলা দেশকে জানাইবেন।"

ইহার পর প্রায় সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, মিঃ সুরাবর্দি পরিষদ-গৃহে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের স্পষ্ট অভি-যোগের পরিষ্কার জবাব দেন নাই।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

বোম্বাই ক্রনিকেলের সংবাদদাতা লাহোরে মিঃ সুরা-বর্দিকে আরও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেটি এই : "বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কোন সদস্য সরকারের টাকায় খাদ্যদ্রব্যের দোকান খুলিয়াছেন এবং ফলে চাউল ও আটা দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদের হাতে না পড়িয়া চোরা-বাজারে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া যে-সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা সত্য কি না?" মিঃ সুরাবর্দি অবশ্য এই অভিযোগও অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথার মূল্যে যেভাবে সন্দেহ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এই অস্বীকৃতিতে আস্থা স্থাপন করা কঠিন। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ কথাটা যখন বাংলার বাহিরে উঠিয়াছে। পরিষদের কর্ত্তব্যপরায়ণ সদস্য যাঁহারা আছেন, বাঙালীর স্বার্থের খাতিরে তাঁহাদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

—

দৈনিক ২৭ হাজার মণ গম যায় কোথায়?

পঞ্জাব হইতে দৈনিক হাজার টন অর্থাৎ ২৭½ হাজার মণ গম মাসাধিক কাল যাবৎ বাংলায় আসিতেছে, তথাপি বাংলায় আটা সরকারী দরের আড়াই গুণ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আটার সরকারী দর ছয় আনা, কিন্তু অস্থায়ী লাট সর্ টমাস রাদারফোর্ড নিজেই উহা চৌদ্দ আনায় বিক্রয় হইতে দেখিয়াছেন। কলিকাতা ও শহরতলীতে মাসিক প্রায় ৪৬ হাজার টন আটা প্রয়োজন, তন্মধ্যে প্রায় ৩০-৪০ হাজার টন হিসাবে আসিতেছে, তৎসত্ত্বেও আটা দুর্মূল্য হইবার কারণ কি তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন ছিল। সম্প্রতি লাহোরের সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ সুরাবর্দির বিবৃতি হইতে এ সম্বন্ধে একটুখানি আলোর সন্ধান যেন মিলিতেছে।

মিঃ সুরাবর্দি বলিয়াছেন, "গত আগষ্ট মাসে আমা-দিগকে ৪০ হাজার টন গম পাঠানো হইয়াছে। গম পাওয়া মাত্র আমরা উহা পিষিবার জন্য মিলে পাঠাইয়া দিই। প্রাপ্ত আটার একটা অংশ যায় কলিকাতার মিল-গুলিতে তাহাদের শ্রমিকদের জন্য, তার পর কতক যায় নিয়ন্ত্রিত দোকানে, কতক রুটির কারখানায় এবং মফস্বলের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে।" এই উক্তি হইতে সন্দেহ হয় যে প্রাপ্ত আটার মোটা অংশটাগিয়া মজুত হয় মিল-মালিকদের গুদামে। ইহাদের মধ্যে প্রধান যাহারা তাহাদের অধি-কাংশই শ্বেতাঙ্গ এবং মিল-চালনা ছাড়া কেনা-বেচা ব্যবসায়ও অনেকের আছে। কলিকাতার গত খাদ্যান্বেষণ অভিযানে ইহাদের কাহার গুদামে কত খাদ্য মজুত ছিল, ইহাদের সাপ্তাহিক প্রয়োজন কত তাহার কোন হিসাব আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রমিকদের নামে ক্রীত আটার কতটা অংশ প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকেরা পাইতেছে এবং কতখানি চোরাবাজারে প্রবেশলাভ করিতেছে এই তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার। যে-অঞ্চলের প্রয়োজন ৪৬ হাজার টন সেখানে ৪০ হাজার টন হিসাবে আমদানীর পর বাজার-দর কোন রকমেই ছয় আনার স্থলে চৌদ্দ আনা থাকিতে পারে না।

—

বাংলা-সরকার ও মজুতদার

গোপন মজুতদারদের প্রতি বাংলা-সরকার মাঝে মাঝে ইস্তাহার জারি করিয়া হুমকি দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহাদের কার্য্যে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করেন না। ইস্পাহানি কোম্পানীর চাউল ক্রয়ের অবাধ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আটা মজুতের ব্যাপারটি বাংলা-সরকার চাপিয়া যাইতে

বাধ্য হইতেছেন কি না এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। সন্দেহের প্রধান কারণ,মিল-মালিকদের গুদামে মজুত আটা ও তাহাদের মাসিক বা সাপ্তাহিক ক্রয়ের পরিমাণ প্রকাশে বাংলা-সরকারের অনিচ্ছা। এই তথ্য প্রকাশ করিলে ভারতরক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিবার কোন কারণই নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সর্ টমাসের প্রতি খোলা চিঠিতে এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য: "গবর্মেণ্ট এই প্রদেশের অভ্যন্তরেও যে-প্রণালীতে শস্যাদি হস্তগত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। গত জুন মাসের বাংলার বহু ঢক্কানিনাদিত খাদ্যাভিযান সম্পর্কে সাধারণে কি বলে, তাহাও আপনাকে জানিতে হইবে। খাদ্য-অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে কোন হিসাব এখনও প্রকাশ করা হয় নাই, আমরা অবিলম্বে উহা প্রকাশ করিবার দাবী জানাইতেছি। সরকারী হিসাব অনুসারে বাংলার কোন্ এলাকায় খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত আছে, কোথায় বা আছে ঘাট্‌তি, তাহা জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই। বড় বড় ব্যবসায়ী ও মজুতদারদিগকে এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া যাহা খুশী মূল্যে চাউল কিনিতে দেওয়ার ফলেই বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাংলার পল্লী-অঞ্চল হইতে প্রকৃতপক্ষে সকল মজুত খাদ্যশস্যই সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে এইরূপ বেপরোয়া ভাবে ক্রয় করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। সম্প্রতি গবর্মেণ্ট সরবরাহের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই মূল্য-নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশ কার্য্যকরী হইবার পূর্বে বড় বড় ব্যবসায়ী ও মজুতদারগণ এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া চাউল ও ধান ক্রয় করিবার জন্য এক সপ্তাহেরও বেশী সময় পাইয়াছিলেন। ইহার অনিবার্য্য ফলরূপে চোরাবাজার ও ফাটকাবাজী দেখা দিয়াছে। যেখানেই গবর্মেণ্ট চাউল ক্রয় করিয়াছেন, সেখানেই বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশা দেখা দিয়াছে। ডিসেম্বর মাসে আমন ধান উঠিবে। তাহার পূর্বে গবর্মেণ্ট কর্তৃক চাউল ক্রয়ের পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন না হইলে আমাদের উদ্ধারের কোন পথই থাকিবে না।

"যে উপায়ে শস্যাদি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছে আমাদের মতে তাহাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। আমরা এ বিষয়েও আপনাকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলি। যদি বণ্টন-ব্যবস্থাতে গবর্মেণ্ট সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করেন, তবে তাহার ফল মারাত্মক হইবে। বণ্টন ব্যবস্থায় অনেক দুর্নীতির অভিযোগও উঠিয়াছে। এই প্রদেশে সেনাদলের জন্য এবং রেলওয়ে ও বড় বড় মালিকদের হাতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত আছে? এই সকল খাদ্যদ্রব্যের একটা অংশ কি অসামরিক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যায় না?"

আহার্যের সরকারী পরিমাণ

বাংলা-সরকার জনপ্রতি দৈনিক আহার্যের যে বরাদ্দ ঠিক করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহা বাড়াইয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন:

"প্রাপ্তবয়স্ক এবং আসন্নপ্রসবা ও প্রসূতিদের জন্য মাথাপিছু ৮ ছটাক, অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কাদের জন্য মাথাপিছু ৬ ছটাক এবং শিশুদের জন্য মাথাপিছু ৪ ছটাক করিয়া দুই বারের আহার হিসাবে বিলি করা হইবে। এই ব্যবস্থা দুই দফায় কার্যকরী করা হইবে। আপাততঃ কার্যরত প্রাপ্তবয়স্ক এবং আসন্নপ্রসবা ও প্রসূতিদের জন্য মাথাপিছু ৬ ছটাক, অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ৪ ছটাক ও শিশুদের জন্য মাথাপিছু ২ ছটাক নির্দ্ধারিত থাকিবে। দ্বিতীয় দফায় সংশোধিত বরাদ্দের সর্বোচ্চ পরিমাণ দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইবে। এই ব্যবস্থা যত দূর সম্ভব শীঘ্র কার্যকরী হইবে।"

মানুষের জীবনধারণের পক্ষে এই পরিমাণ আহার্যও যথেষ্ট নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাংলা দেশে বড় বড় চিকিৎসকের অভাব নাই, মেডিকেল এসোসিয়েশন প্রভৃতিও আছে। ইঁহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কি এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না? আহার্যের যে পরিমাণ পূর্বে বরাদ্দ করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সর্ জগদীশপ্রসাদ বলিয়াছিলেন যে ইহাতে মানুষ বাঁচে না, মরিতে একটু সময় লাগিবে মাত্র। বর্তমান হার প্রচলিত হইলেও, যদি কখনও হয়, অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহা ত মনে হয় না।

অন্য মন্ত্রীরা কোথায়?

বাংলার মন্ত্রীদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র মিঃ সহীদ সুরাবর্দি ভিন্ন অপর কাহারও অস্তিত্বের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। বাংলার বিভিন্ন স্থানে যেভাবে কলেরা প্রভৃতি মহামারী দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্য জনস্বাস্থ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কি করিতেছেন তাহা জানা যায় না। বে-সামরিক জনরক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও বোধ হয় একজন আছেন। বাংলা দেশকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বাভিযান আরম্ভ হইলে কলিকাতা এবং অন্যান্য

স্থানে বোমাবর্ষণের আশঙ্কা ক্রমেই নিকটতর হইতেছে। জনরক্ষা-মন্ত্রী এ বিষয়ে কি সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন? অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিদের চরকা, তাঁত প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিবার কোন কথা শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছে কি? কৃষি-মন্ত্রীর কার্য্যকলাপের কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় না কেন? সুন্দরবন অঞ্চলের এবং পূর্ববঙ্গের বহু স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া বহু লোককে বেকার করা হইয়াছে এবং সুন্দরবন হইতে জ্বালানি কাঠ আনিয়া কলিকাতার জ্বালানি সমস্যা সমাধানের পথও বন্ধ হইয়াছে। এখন ত জাপানী অভিযানের ভয় নাই, বরং ব্রহ্ম-বিজয়ের অভিযানই সুরু হইবে। এখনও কি নৌকার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দিবার এবং অর্থ সাহায্য করিয়া পুনরায় নৌকা তৈরীর ব্যবস্থা করিবার সময় হয় নাই? যানবাহন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কি এটা করিতে পারেন না?

—

বাংলার বাহিরে অনাথ বালক প্রেরণ

বাংলার বাহিরে শতাধিক অনাথ বালককে পাঠান হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই গিয়াছে পঞ্জাবে। পঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশ বাংলার এই মহাদুর্দিনে মহানুভবতা দেখাইয়াছে, বাঙালী চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই সামান্য কয়টি অনাথ বালকের স্থান কি বাংলাতেই হইতে পারিত না? এমন শতাধিক বাঙালী নিশ্চয়ই আছেন যাঁহারা এই অবস্থার মধ্যেও এক একটি অনাথ বালক বা বালিকার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। বাংলাতেই অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানেই এই সব বালকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাধারণ ও কারুশিল্প শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত করিলেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল কাজ হইত। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় শুধু বালকেরাই সাহায্য পাইল, কিন্তু বালিকারা একেবারেই বাদ পড়িয়াছে। অথচ ইহাদিগের জন্য একটা ব্যবস্থা করাও কম প্রয়োজনীয় নহে।

—

চীনে শিক্ষার প্রসার

ছয় বৎসর ব্যাপী জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়াও চীন শিক্ষাবিস্তারে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, 'চীনাবার্ত্তা'য় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদে তাহা জানা যায়:

'১৯৪২ সালে ১৩২টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। উহাদের মধ্যে ৫৩টি জাতীয়, ২৮টি প্রাদেশিক, এবং ৫১টি বেসরকারী। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে ৪১টি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৩২টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪১টি কলেজ, ৪৭টি যন্ত্রশিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১২টি কলেজ এবং ২৩টি যন্ত্রশিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩১,১৮৬ জন, ১৯৪২ সালে উহা বাড়িয়া ৬৩,৬০৫ জন হইয়াছে।

আর আমাদের দেশে? শিক্ষার প্রসার দূরে থাকুক, শিক্ষা-সঙ্কোচের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাবিল আনয়ন করিতেও এ দেশের গবর্ন্মেণ্টের বাধে নাই। অন্নসমস্যার চাপে ব্যাপারটা আপাততঃ চাপা পড়িয়াছে মাত্র। জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বাংলা দেশের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। বে-সরকারী বহু স্কুল উঠিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। শিক্ষকবৃন্দের দুর্দশার পরিসীমা নাই এবং গবর্ন্মেণ্ট এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি একেবারে উদাসীন। স্বাধীন দেশ মহাযুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াও যাহা করিতে পারে, পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থাতেও তাহা সাধন করা দুরূহ।

—

উৎকোচ বন্ধের অর্ডিনান্স

সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের যে অভিযোগ এত দিন ধরিয়া করা হইতেছিল শেষ পর্য্যন্ত ভারত-সরকার তাহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাদের উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করিবার জন্য এক অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। অর্ডিনান্স জারির কারণ বর্ণনা করিয়া ভারত-সরকার যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে জনসাধারণের বহু অভিযোগ সত্য বলিয়া গবর্ন্মেণ্ট ইহাতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইস্তাহারটি এই:

"গবর্ন্মেণ্ট কন্‌ট্রাক্ট, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রয় ব্যাপার এবং রেলের ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজে ব্যাপক জুয়াচুরি, ঘুষ এবং দুর্নীতি দেখা দিবার ফলে, ভারত-সরকার এই সব দমনের উদ্দেশ্যে কিছু দিন যাবৎ এক বিশেষ আইন-প্রণয়নের কথা বিবেচনা করিতেছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে স্বভাবতঃই এই সব ব্যাপার কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং কতকগুলি ব্যাপার না ঘটিয়া পারে না। যুদ্ধের ফলে গবর্ন্মেণ্ট কন্‌ট্রাক্টের বিপুল বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ফলে সরকারকে ঠকাইবারও বহুবিধ ফাঁক জুটিয়াছে। যে ঘুষ ও দুর্নীতি দেখা দিয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, লোকে এই সকল ফাঁকের যথাযোগ্য সুযোগ লইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে,এ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ

করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ ইহার ফলে গবর্ন্মেন্টকেই শুধু বিরাট্ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে না, যুদ্ধ-প্রচেষ্টাতেও বিশেষ বাধা সৃষ্টি হইতেছে। সরবরাহ ও রেল-বিভাগের দুর্নীতি ও ঘুষের সন্ধান করিয়া মামলা দায়েরের জন্য কিছু দিন হইল একটি বিশেষ তদন্ত বিভাগ খোলা হইয়াছে। ফলে কিছু কিছু সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, প্রথমতঃ অনেক সাধারণ আইন এই ধরণের অপরাধের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে যদিও পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে যে, গবর্ন্মেন্টকে ঠকান হইয়াছে এবং বুঝা গিয়াছে যে, ইহার পশ্চাতে কোন সরকারী কর্মচারীর হাত রহিয়াছে, তবুও ঠিক ঠিক ভাবে ঘুষের মামলা দায়ের করা যায় না। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটি অর্ডিনান্স জারি করা হইল। অর্ডিনান্সের ফলে প্রতারণা এবং ঘুষ প্রভৃতির অভিযোগ একই সঙ্গে বিচারের জন্য দুইটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। ট্রাইবুনালে তিন জন সদস্য থাকিবেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন থাকিবেন সৈন্য-বিভাগের অফিসার। তাঁহার প্রয়োজনীয় আইন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিতে হইবে। অপর দুইজনের মধ্যে একজনের হাইকোর্টের বিচারপতির অনুরূপ যোগ্যতা এবং বাকী জনের দায়রা জজের যোগ্যতা থাকিতে হইবে। ঘুষের মামলার বিচারের সময় তাঁহারা আসামীর যদি এমন কোন বিষয়-সম্পত্তি বা নগদ টাকা থাকা যাহার বিষয়ে সে কোন সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে না, তাহা এবং তাহার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারিবেন। কোন সরকারী কর্মচারী ঘুষ লইয়াছেন প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হউক কি না হউক তিনি যত টাকা ঘুষ লইয়াছেন, অন্ততঃ তত টাকার অর্থদণ্ডে তাঁহাকে দণ্ডিত করা হইবে। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না। তবে দণ্ডাদেশ সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য নিজ নিজ এলাকার হাইকোর্টে দরখাস্ত করা চলিবে।"

গত যুদ্ধের মিউনিশন বোর্ডের অভিজ্ঞতার ফলে এই অর্ডিনান্স এবার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জারি হওয়া উচিত ছিল। চারি বৎসর পরে ভারত-সরকারের চৈতন্যোদয় কৃতিত্বের লক্ষণ নহে। শুধু রেলওয়ে বা সরবরাহ বিভাগ নহে, বাংলার সিভিল সাপ্লাই বিভাগ, "আরও ফসল ফলাও" আন্দোলন যেখান হইতে করা হইতেছে সেই বিভাগ, এবং দুর্ভিক্ষে অর্থসাহায্য যাহাদের হাত দিয়া হইতেছে সেই সব বিভাগের কর্মচারীদের কার্য্যকলাপের প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। অর্ডিনান্স জারির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় কৃষি-বিভাগের জনৈক এসিসটাণ্ট সেক্রেটারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইহার পূর্বে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মামলা-সোপর্দ্দ হইয়াছেন। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ এবং সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নামে প্রকাশ্যে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উঠিয়াছিল। সেগুলিরও এখন তদন্ত হওয়া দরকার।

—

কুমুদিনী বসু

স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী বসু গত ৫ই সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। সারাজীবন তিনি দেশের কল্যাণকর নানা কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি বিশেষভাবে নারী-রক্ষায় ও নারীকল্যাণমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এ দেশে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের তিনিই পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহারই চেষ্টা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহায়তায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় নারীর ভোটাধিকারসূচক একটি আইন পাস হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনি প্রথম নির্বাচিতা নারী কাউন্সিলার। সাংবাদিকতার প্রতিও তাঁহার অনুরাগ কম ছিল না। ১৯০৭ সাল হইতে বহু দিন তিনি সুপ্রভাত নামে একটি মাসিক পত্র সম্পাদন করেন। স্বামী শচীন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর পর তিনি কৃতিত্বের সহিত 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯১২ সালে ভিয়েনায় নারী জাতির ভোটাধিকার আন্দোলনকারীদের যে বিশ্বসম্মেলন আহূত হয়, তিনি তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নির্বাচিতা হন, কিন্তু নানা বাধা-বিঘ্নের জন্য সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই।

—

বাংলার বাজেট

বাংলার বাজেট নূতন করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হইয়াছে। বাজেটে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হইয়াছে। পূর্ব-বৎসরের তুলনায় বর্তমান মহা দুর্ভিক্ষের বৎসরেও ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। আয়-ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব এই :

(হাজার টাকার সমষ্টিতে)

আয়	১৯৪২-৪৩ সনে আয়	১৯৪৩-৪৪ সনে বরাদ্দ
শুল্ক	১,১৯,০৯	১,২৫,০০
কর্পোরেশন ট্যাক্স ব্যতীত অন্যান্য আয়কর	২,১৮,০০	২,৩০,০০
ভূমিরাজস্ব	২,৬১,২৯	৩,৬২,৯০
আবগারী	২,৫৩,৬৫	৩,১৯,০২
ষ্ট্যাম্প	২,৪৯,৭৫	৩,০০,০০
বন-বিভাগ	৩৬,৫৭	৩২,৯৪
রেজিষ্ট্রেশন	৩৩,৩৮	২৯,৫০
মোটর যান ট্যাক্স	১৫,৯৭	১২,৯৫
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১,৬০,২৮	২,৩৪,৮৩
মোট আয়	১৬,৪৯,৯৭	১৮,৪৩,৮৯
ব্যয়		
সাধারণ শাসন-বিভাগ	১,৫০,৭০	১,৬৬,৩০
বিচার-বিভাগ	৯৭,৩৭	১,০২,২৮
জেল ও কয়েদী উপনিবেশ	৫৩,৩৪	৫৭,১৮
পুলিস	২,৬২,৫৮	২,৮৯,৪৪
শিক্ষা-বিভাগ	১,৭৬,৩৬	১,৮৬,৭৯
চিকিৎসা	৫৪,১৩	৫৪,৮৫
জনস্বাস্থ্য	৪১,৭২	৪০,১৬
কৃষি-বিভাগ	৬৮,১৬	১,৩৩,৯৯
সমবায়-বিভাগ	১৫,৬৩	১৬,৭৪
শিল্প-বিভাগ	২৭,৬০	৩০,৫৬
দুর্ভিক্ষ-সাহায্য	৫১,৯২	৩,৫২,০২
অসাধারণ ব্যয়*	১,৮৫,৭৩	৫,৪৮,৯৩
মোট ব্যয়	১৬,৭৩,১৬	২৫,৮০,৫৭

[* শস্যবিক্রয়ের লোকসান এই হিসাবে ধরা হইয়াছে।]

আয়ব্যয় ব্যাখ্যা করিয়া অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বলিয়াছেন,

"রাজস্ব খাতে আয় গত বৎসর অপেক্ষা ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ১৮ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আবকারী খাতে ৬৫ লক্ষ টাকা, ষ্ট্যাম্প খাতে ৫০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক খাতে ৭৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে। মদ্যের বিক্রয়-শুল্ক এবং মদ্য, গাঁজা ও অহিফেনের উপর কর বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় বাড়িবে। স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি অধিকতর পরিমাণে হস্তান্তরের ফলে "আদালত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত" ষ্ট্যাম্প বাবদ কর বেশী আদায় হইবে। কোর্ট ফি খাতে আয়ও কয়েক বৎসর ক্রমাগত হ্রাসের পরে বাড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কর ও শুল্ক খাতে মোট ৭৫ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধির মধ্যে ১৯৪৩ সনের বঙ্গীয়-অর্থ আইন অনুসারে প্রমোদ-কর, বাজীর উপর কর ও বিজলী-কর বৃদ্ধি দ্বারা ৪০ লক্ষ টাকা এবং বিক্রয়-কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু অবশিষ্ট টাকার অধিকাংশ পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান বৎসরে রাজস্ব খাতে ২৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে; গত বৎসর ১৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ ৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে। খাদ্যশস্য বিক্রয়ের লোকসানের দরুণ ৩॥০ কোটি টাকা, দুর্ভিক্ষ-সাহায্য বাবদ ৩ কোটি টাকা, কৃষি খাতে ৬৬ লক্ষ টাকা, পূর্ত্ত খাতে ৫৫ লক্ষ টাকা, পুলিস বাবদ ২৭ লক্ষ টাকা, সেচ খাতে ১১ লক্ষ টাকা, সুদ খাতে ১৫ লক্ষ টাকা, অসামরিক সরবরাহ বিভাগে ৩১ লক্ষ টাকা ও কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রদত্ত সাহায্য বাবদ ১০½ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে।

দুর্ভিক্ষের সাহায্য খাতে সাধারণতঃ বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত ও গত বৎসর ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এবার ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। খয়রাতি দান বাবদ ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ও সাহায্যদান-মূলক কার্য্য সম্পর্কে অবশিষ্ট টাকা ব্যয় হইবে। কৃষি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ৬৬ লক্ষ টাকার অধিকাংশই "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনে ব্যয় হইবে। গত বৎসর ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, এবার ঐ বাবদ প্রায় ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। এ বৎসর ৩ লক্ষ মণ আমন ধানের বীজ, ৫০ হাজার মণ গমের বীজ এবং ৪২ হাজার মণ ছোলা মসুর ও সরিষার বীজ ধারে বিতরণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ক্ষেত্রে জলসেচের পরিকল্পনায় ১½ লক্ষ টাকা, পশুখাদ্য চাষের পরিকল্পনায় ১½ লক্ষ টাকা ও সব্জীচাষ বাড়াইবার পরিকল্পনায় ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বীজ সরবরাহে ব্যয়ের অর্দ্ধেক টাকা ভারত-সরকার ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন, চাষীদের নিকট হইতে আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা পরিশোধ করা হইবে। পুলিস খাতে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির অর্দ্ধেক অপেক্ষাও বেশী টাকা অতিরিক্ত মাগ্‌গি ভাতা বাবদ এবং অবশিষ্ট টাকা সিভিক গার্ড, জরুরি অবস্থাধীন এলাকায় বোনাস এবং বস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধি বাবদ ব্যয় হইবে। পূর্ত্ত-বিভাগে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির অধিকাংশই বন্যায় ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে বাঁধ প্রভৃতি মেরামত করিতে ব্যয় হইবে।"

বাংলার বাজেটে ঘাট্‌তি পূরণ

বাজেটের এই বিরাট্ ঘাট্‌তি পূরণের জন্য অর্থসচিব কৃষি আয়কর বসাইবার এবং ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এই বিপুল ঘাট্‌তি কমাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা সর্বাগ্রে উচিত ছিল, গবর্ন্মেণ্ট তাহার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেন নাই। গোঁজামিল দিয়া সেদিকটা এড়াইয়া গিয়াছেন। অর্থসচিবের বাজেট-বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশে এই গোঁজামিল ধরা পড়িয়াছে :

"খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলাদা হিসাব রাখা হইতেছে। ক্রীত খাদ্য-শস্যের মূল্য উহাতে খরচ লেখা হইবে এবং শস্য-বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত মূল্য জমা করিয়া যে লোকসান পড়িবে তাহা রাজস্ব হইতে পূরণ করা হইবে। চাউল ও অন্য কোন কোন খাদ্যশস্যের মূল্য সাধারণের সাধ্যাতীত বলিয়া পড়তা-দর অপেক্ষা কমে উহা বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় ও মফস্বলে কতকগুলি কণ্ট্রোলের দোকান খোলা হইয়াছে। মাসিক তিন শত টাকার অল্প বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সস্তায় খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য কতকগুলি বিভাগীয় দোকান খুলিবার ব্যবস্থাও সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। সাধারণকে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য ২½ কোটি টাকা এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে শস্য সরবরাহের জন্য এক কোটি টাকা লোকসান পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সরকারের পক্ষ হইতে ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব এককালীন আয়-ব্যয়ের মধ্যে তোলা হইতেছে। খাদ্যশস্য ও ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ ক্রয়-বিক্রয়ের এবং লবণ মজুত রাখার ব্যয় ইহাতে ধরা হইয়াছে। শস্য ক্রয়ের জন্য দশ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ও উহা অল্প মূল্যে বিক্রয়ের ফলে সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। লোকসানের টাকাটা সাধারণ রাজস্ব হইতে পূরণ করা হইবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ক্রয়ের জন্য সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় হইবে, উহা সম্পূর্ণই আদায় করা যাইবে বলিয়া আশা আছে। লবণ ক্রয় খাতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে, ভবিষ্যতে জরুরি অবস্থার জন্য উহা মজুত রাখা হইবে বলিয়া এই টাকাটা পড়িয়া থাকিবে এবং এককালীন ব্যয় খাতে উহা খরচ লেখা হইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, এই হিসাব তৈয়ারীর পরে ৬৫ লক্ষ মণ আউশ ধানের চাউল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে আনুমানিক ষোল কোটি টাকা ব্যয় হইবে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি হইয়াছে।"

অর্থাৎ গবর্ন্মেণ্ট খাদ্যশস্য ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে আলাদা হিসাব রাখিতেছেন, সাড়ে সাত কোটি টাকার ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকার লবণ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। চাউল, আটা, কাপড় ও লবণ ক্রয়-বিক্রয়ের এই বিপুল বন্দোবস্ত আর একটু সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত করিয়া তুলিলে গবর্ন্মেণ্ট অনায়াসেই মফস্বল অথবা অন্য প্রদেশ হইতে স্বয়ং চাউল ক্রয় করিতে পারিতেন, ইহার জন্য ইস্পাহানী প্রভৃতি কোম্পানীকে অজস্র পরিমাণ টাকা দালালী দিতে হইত না। এই দালালীর টাকাটা বাঁচিলে ঘাটতি এত বেশী ত হইতই না, সময় থাকিতে একটু বুঝিয়া চলিতে পারিলে আদৌ হইত কি না সন্দেহ। ইস্পাহানী প্রভৃতি এজেণ্টরা কি দরে চাউল ক্রয় করিয়া কি দরে উহা গবর্ন্মেণ্টকে বিক্রয় করিয়াছে তাহার সঠিক তথ্য জানা গেলে কতখানি ঘাটতি কম হইতে পারিত তাহা হিসাব করা সম্ভব হইবে।

ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বে চাউলের দর এক আনা

ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বে চাউলের দর ছিল মণ-করা এক আনা। কৌটিল্যের যুগ হইতে সুরু করিয়া খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দর প্রচলিত ছিল। প্রশ্ন উঠিবে তখনকার এবং এখনকার টাকার ক্রয়শক্তি ত এক নয়, সুতরাং এই তুলনার মূল্য কোথায়? মূল্য অবশ্যই আছে। টাকার ক্রয়শক্তি কোন দেশের অর্থনৈতিক দৃঢ়তার পরিচয় নয়, মানুষের ক্রয়শক্তি,—আয়ের সহিত ব্যয়ের সমতা—দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদের দৃঢ়তার পরিচয়। সারাদিনের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে ভারতবর্ষের দরিদ্রতম লোকটি পর্য্যন্ত সচ্ছল জীবনযাপন করিতে পারিত, হিন্দু এবং মুসলমান রাজত্বে ভারতীয় অর্থনীতির এই বনিয়াদে ফাটল ধরে নাই। সর্বপ্রথম ইংরেজ আমলেই ভারতবাসীর আয়-ব্যয়ের সমতা নষ্ট হইয়াছে এবং ফলে ভারতীয় অর্থনৈতিক মূলসূত্রটি ছিন্ন হইয়া ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

কৌটিল্যের আমলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর ছিল :

চাউল	মণকরা ৫	তাম্রপণ	অথবা	এক আনা
তৈল	" ৪১	"	"	৮ "
ঘৃত	" ৬০	"	"	১২ "
ডাইল	" ৬	"	" (প্রায়)	১ "
লবণ	" ২	"	" (প্রায়)	½ "
চিনি	" ৪৮	"	"	১০ "
কাপড় (সাধারণ)	" ১	"		৫টি কাপড় এক আনা।

ইহার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চাউলের দর সমানই ছিল, কিন্তু ডাল, তৈল, ঘৃত, লবণ ও চিনির দর অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছিল।

মজুরির নিম্নলিখিত তালিকা হইতে হিন্দুরাজত্বে গরীব লোকের আয়ের হার বুঝা যাইবে।

সংবাদবাহক	বেতন	মাসিক	৪৯	তাম্রপণ	অথবা	১০ আনা
ভৃত্য	"	"	৩৪	"	"	৭ "
দ্বারবান	"	"	২০	"	"	৪ "
ঝাড়ুদার	"	"	২০	"	"	৪ "
রাখাল	"	"	৩৪	"	"	৭ "

হিসাব করিলেই দেখা যাইবে ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী ছিল।

— শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বে চাউলের দর দুই আনা হইতে এক টাকা

মুসলমান রাজত্বে চাউলের এবং নিত্যব্যবহার্য্য অন্যান্য দ্রব্যের দর ধীরে ধীরে বাড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ও বাড়িয়াছে। অর্থনৈতিক জীবনের মূলসূত্র এক হাত মাটিতে অপর হাত তাঁতে—তখনও সমানভাবেই বজায় ছিল। দেশের সম্পদ দেশেই থাকিত, বাহিরে যাইত না। মুসলমান শাসকেরা সিংহাসন অধিকার করিলেও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

মহম্মদ তোগলকের শাসনকালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইবন বটুটা নামে জনৈক মুসলমান পরিব্রাজক বাংলায় আসিয়াছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে-বিবরণ তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর এখনকার টাকার হিসাবে নিম্নলিখিতরূপ ছিল :

চাউল	মণ-করা	সাত পয়সা
তিল তৈল	„	॥৶১০ আনা
ঘৃত	„	১।৶০ „
চিনি	„	১।৶০ „
বড় মুরগী	একটি	৫ পয়সা
বড় ভেড়া	„	।০ আনা
উৎকৃষ্ট বস্ত্র ১৫ গজ		২৲ টাকা

আকবরের আমলে অর্থাৎ, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দর ছিল :

চাউল (ভাল)	মণকরা	৩০ দাম	অথবা		৸৶০ আনা
চাউল (মোটা)	„	২০	„	„	॥৵০ „
ডাল	„	২৭	„	„	৸/১০ „
ঘৃত	„	১৫৮	„	„	৫৲ টাকা
লবণ	„	২৪	„	„	৸০ আনা
চিনি	„	১৮২	„	„	৫॥৶০ „

আলিবর্দ্দীর আমলে, অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কালে, ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের বাজার ছিল :

বাঁশফুল চাউল (উৎকৃষ্ট)	টাকায়	১ মণ ১০ সের
মোটা চাউল	„	৭ „ ২০ „
তৈল	„	২৪ „
ঘৃত	„	১০॥০ „

১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় চাউলের দর ছিল টাকায় ২ মণ ২০ সের হইতে

ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকেও আয়ের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যাইবে এই আয়ের দ্বারা উল্লিখিত মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া যে-কোন লোক সচ্ছল জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত। আলিবর্দ্দীর আমলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ইংরেজ প্রবেশ করিয়াছে মাত্র, তখনও শিল্পজীবন বিধ্বস্ত হয় নাই। বাংলার সূতী ও রেশম বস্ত্রশিল্প তখনও বাঙালীর আয়ের দ্বিতীয় প্রধান পথ। কৃষির উপর সর্বস্ব নির্ভর তখনও আরম্ভ হয় নাই।

— শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বে চাউলের দর এক টাকা হইতে সত্তর টাকা

ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে চাউলের দর এক টাকা মণ ছিল, দুই শত বৎসরের সুশাসনে উহা মণকরা ৭০৲ টাকা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বাংলার খাদ্য-সচিব ত বলিয়াই দিয়াছেন চাউলের দর যে এক শত টাকা মণ হয় নাই এইটাই বাঙালীর ভাগ্য!

১৮১০ সালের কাছাকাছি দরিদ্র বাঙালীর আয় ছিল :

সাধারণ শ্রমিক	দৈনিক	৵০ আনা
বুদ্ধিমান্ শ্রমিক	„	৶০ „
ছুতার মিস্ত্রী	মাসিক	৬৲ টাকা
পিতল-কাঁসার কর্ম্মকার	„	৪৸৵০ আনা
তাঁতী	„	৩৲ টাকা

নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য ছিল :

উত্তম চাউল	মণকরা	১।০ আনা
মোটা চাউল	„	১৲ টাকা
অড়হর ও মুগ ডাল	„	১॥০ „
তৈল	সের-করা	৵০ আনা
ঘৃত	„	।৶০ „
মোটা ধুতি	একখানি	।৵০ „

এই সময়ে রংপুর জেলার হিসাবে দেখা গিয়াছে সেখানে বেকারের অনুপাত ছিল মাত্র শতকরা ১১ জন। ১৮৩০ সালের কাছাকাছি এদেশে সস্তা বিলাতী কাপড় অধিক পরিমাণে প্রবেশলাভ করিতে আরম্ভ করে, ফলে বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হইয়া বাঙালী কৃষির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে অন্যান্য শিল্পগুলিও নষ্ট হইয়া অতিরিক্ত আয়ের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বিনা-সারে ভূমি কর্ষণ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি-আইনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার জন্য মামলা-মোকদ্দমা বৃদ্ধি, কর-বৃদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে আয়হ্রাস এবং উহার সহিত দেশের সম্পদ প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে বিদেশে রপ্তানী, এই সব

বিবিধ কারণের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে যে দুর্দশা দেশের হইয়াছে তাহার পূর্বে দুই হাজার বৎসরের রাজত্ব, রাজ পরিবর্তন, বিপ্লব ও লুণ্ঠতরাজেও তাহা হয় নাই।
—শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

—

মোহিনীমোহন মজুমদার

বাংলায় মূক-বধিক শিক্ষার অন্যতম পথপ্রদর্শক মোহিনীমোহন মজুমদার পরলোক গমন করিয়াছেন। কলিকাতা মূক-বধির শিক্ষালয়ের তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। বাংলায় প্রথম মূক-বধির শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সিটি কলেজ ভবনে, অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের সহায়তায়। শ্রীনাথ সিংহ উহা প্রথম আরম্ভ করেন, মোহিনীমোহন অল্প দিনের মধ্যেই আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন। এই ক্ষুদ্র স্কুলটিই পরে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মোহিনীমোহন এই বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষার পথ-প্রদর্শক। স্কুল-বোর্ডিং স্থাপনও তাঁহারই কীর্তি। ১৯০৩ সালে তিনি "মূকশিক্ষা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

—

বাংলা-সরকারের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের অভিযোগ

পঞ্জাবে বাংলা-সরকার যে-দরে গম ক্রয় করিতেছেন বাংলায় উহা অনেক বেশী দরে বিক্রয় করিয়া বাংলা-সরকার অতি লাভ করিতেছেন, পঞ্জাবের মন্ত্রী সর্দ্দার বলদেব সিংহ এই অভিযোগ তুলিলে মিঃ সুরাবর্দি উহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ইহার অল্প দিনের মধ্যেই বাংলায় আটার সরকারী দর আট আনা হইতে ছয় আনায় নামিয়া যায়। ভারত-সরকারের খাদ্যসচিব সর্ জোয়ালাপ্রসাদও এই ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কথা বলিয়াছেন এবং সর্ মরিস্ গয়ারকে এরূপ একটি তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু আটার ব্যাপারে নয়, বাংলা-সরকারের খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে সমস্ত ব্যয়ের একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।

বর্দ্ধমানের বন্যায় কলিকাতার বিপদ

কলিকাতায় পূর্ণিমা-সম্মিলনীর এক সভায় ডাঃ মেঘনাদ সাহা দামোদরের বন্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং দামোদরের বন্যায় যে কলিকাতা শহর একেবারে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দামোদরের গতি ক্রমেই পূর্বদিকে মোড় ফিরিতেছে এবং ইহাতে কলিকাতার উত্তর দিকে গঙ্গায় প্রচুর পরিমাণে বন্যার জল আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কলিকাতার জমি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমি অপেক্ষা নীচু। গঙ্গার জল বহনের শক্তিও পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। [illegible] যে বন্যা হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ জলস্রোত যে-কোন বৎসর উহাতে প্রবাহিত হইলেই কলিকাতা ডুবিয়া যাইবে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ডাঃ সাহা ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলেন যে, সহর ধ্বংসের এই প্রকার সম্ভাবনা প্রাচীন বা আধুনিক কোন ইতিহাসেই বিরল নয়। চালডিয়ানদের রাজধানী ইউফ্রেটিস-তীরবর্তী উর, ভারতবর্ষের সিন্ধু-তীরবর্তী মহেঞ্জোদাড়ো এবং গণ্ডক ও শোন-তীরবর্তী পাটলিপুত্রের যে-ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মাটি পরীক্ষা করিয়া বুঝা যায় কোন প্রবল বন্যায় এই সব শহর ধ্বংস হইয়াছে। আধুনিক কালে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার মিয়ামী নদীর বন্যায় ডেটন ও হ্যামিল্টন নামক দুইটি বৃহৎ শহর একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। ১৯২০ সালে এডামস্-উইলিয়ামস্ তাঁহার রিপোর্টে এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া গবর্মেণ্টকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এডামস্-উইলিয়ামস্ এবং গ্লাস দামোদরের বন্যা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার যে উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন, শ্বেতাঙ্গ কয়লাওয়ালাদের বিরোধিতায় তাহা ধামাচাপা পড়িয়া রহিয়াছে।

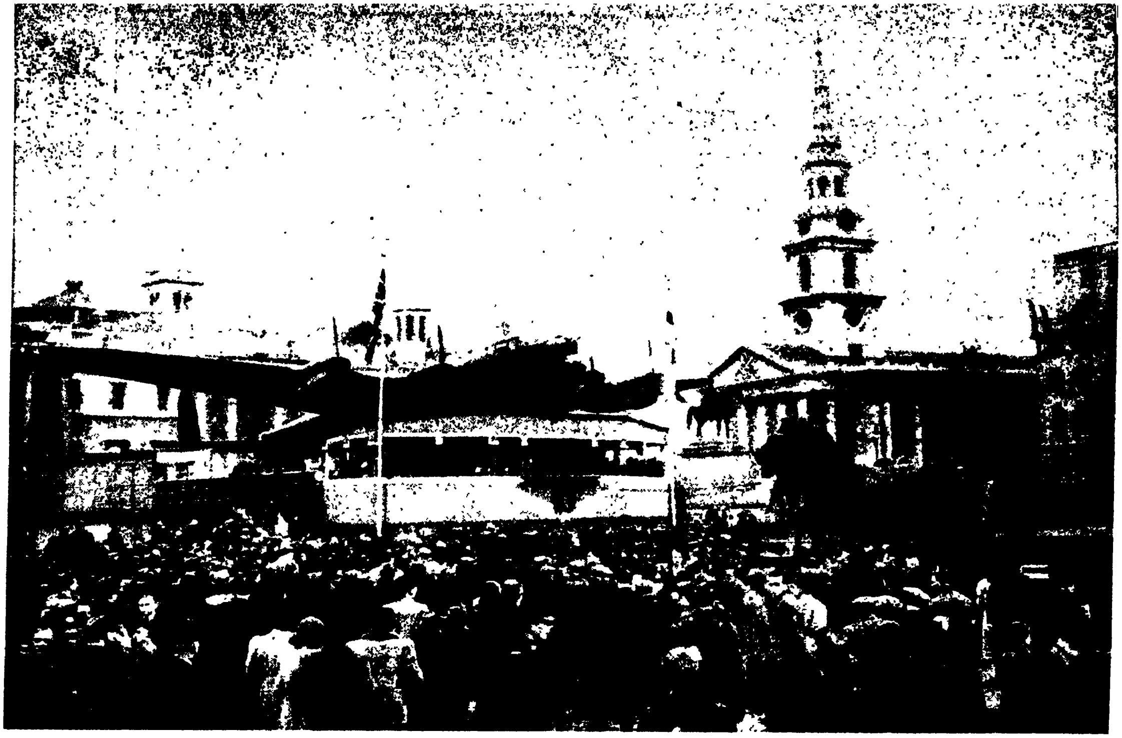
অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন। বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যায় গবেষণারত ছাত্র শ্রীকমলেশ রায় এ সম্বন্ধে সায়েন্স এণ্ড কালচার পত্রে যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, অধ্যাপক সাহা তাহা সভাস্থলে পড়িয়া শোনান। এই গুরুতর বিপদ সম্বন্ধে গবর্মেণ্টকে সচেতন করিবার দায়িত্ব জনসাধারণের। এই ধরণের আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও তাই যথেষ্ট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বাগীশ্বরী অধ্যাপক

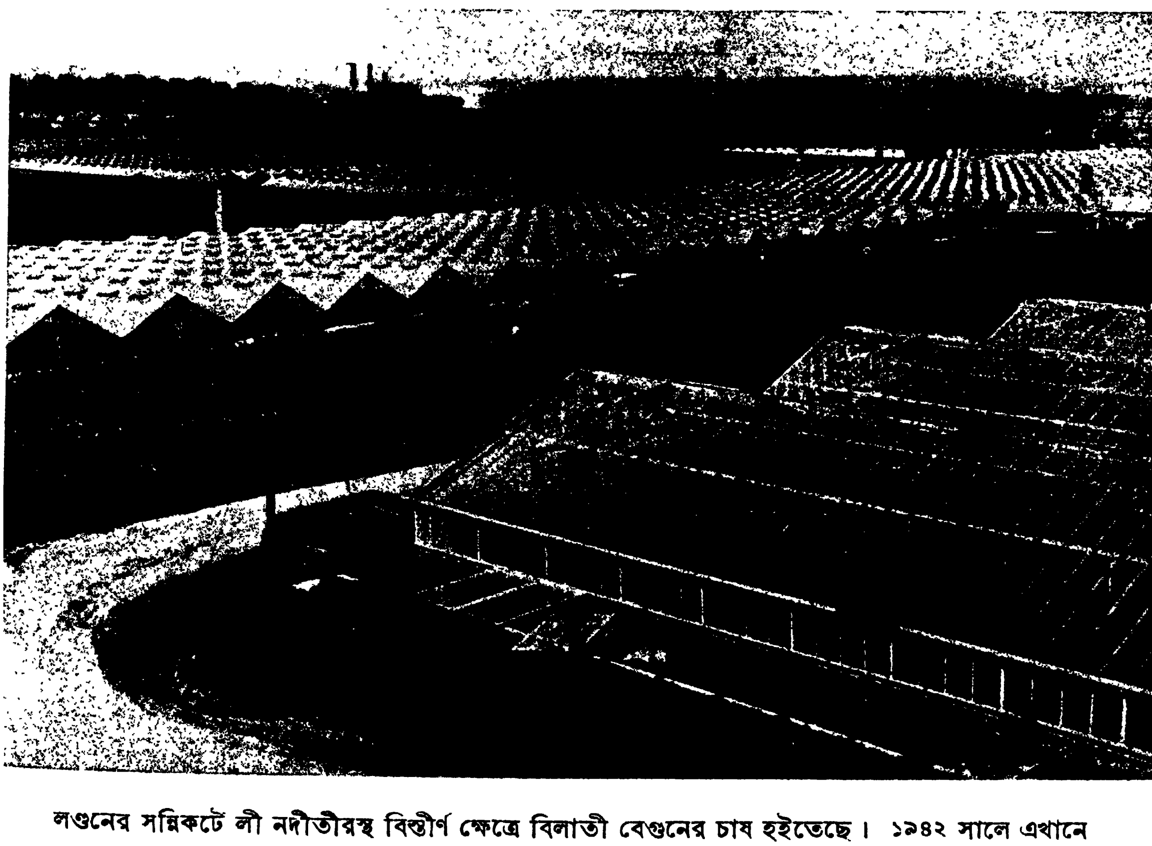
শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে প্রথম নিযুক্ত হন। তাঁহার পর এত দিন মিঃ সহীদ সুরাবর্দি উক্ত আসনে ছিলেন। বর্তমানে খ্যাতনামা শিল্পী—সমালোচক শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় এই পদে নিযুক্ত হইলেন। ভারতীয় চিত্রকলাকে যাঁহারা পুনর্জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। যোগ্য ব্যক্তির উপরেই বাগীশ্বরী অধ্যাপকের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

পূজার ছুটি

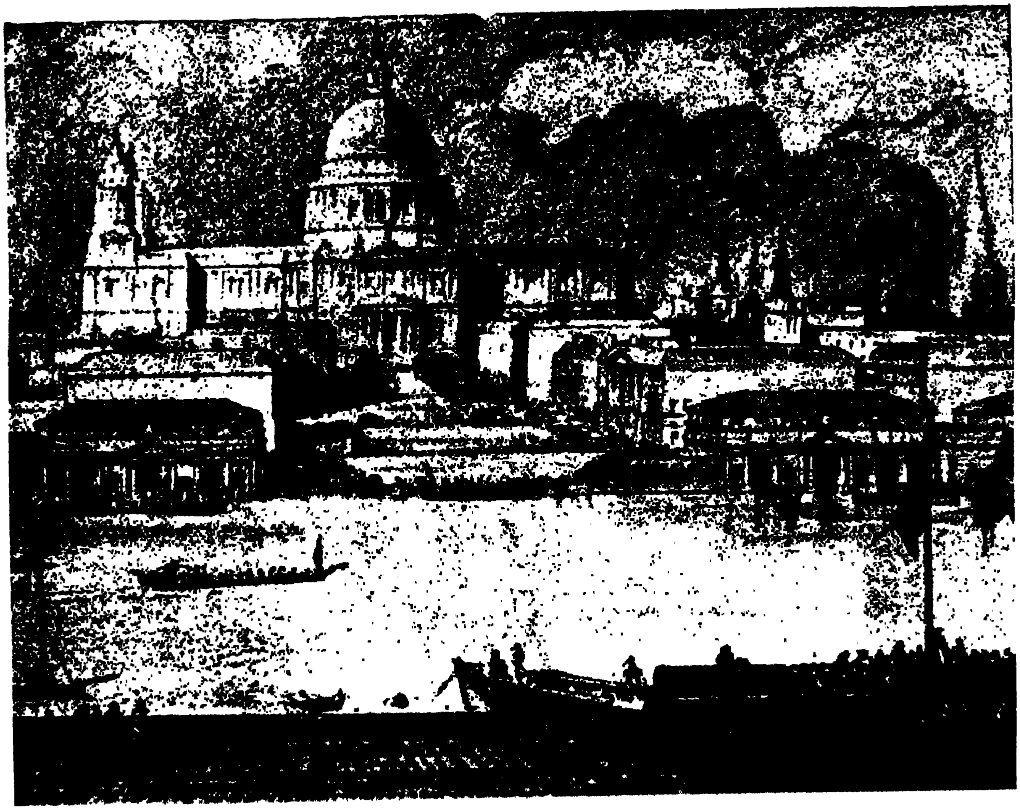
শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ১৮ই আশ্বিন (৫ই অক্টোবর) হইতে ১লা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।



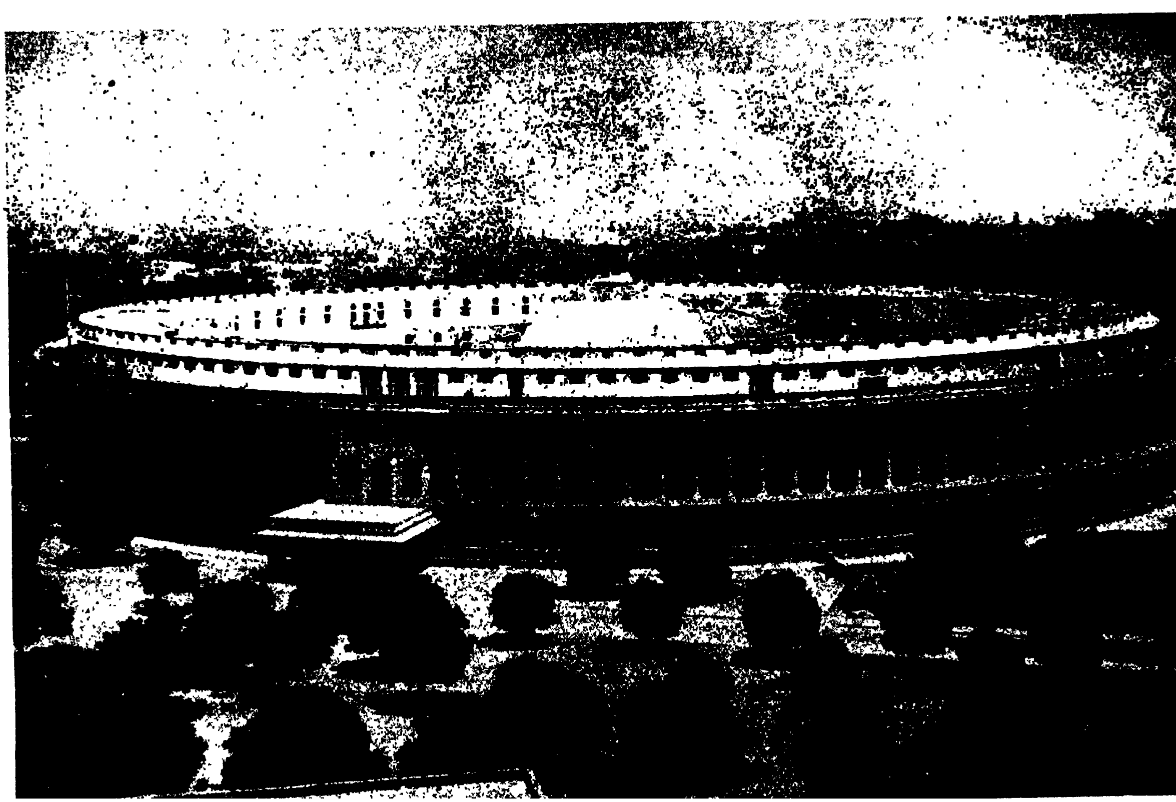
ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে বার্লিনে বোমাক্ষেপণকারী বিরাট্‌ ল্যাঙ্কাষ্টার এরোপ্লেন-প্রদর্শনী এবং সমরঋণ সংগ্রহের দৃশ্য



লণ্ডনের সন্নিকটে লী নদীতীরস্থ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিলাতী বেগুনের চাষ হইতেছে। ১৯৪২ সালে এখানে



লুটিয়েন্স্-কৃত বৃহত্তর লণ্ডনের পরিকল্পনা। টেম্স্ নদী এবং সেণ্ট পল্স্ ক্যাথিড্রালের পরিকল্পিত:নক্সা





মার্শাল চিয়াং কাই-শেক স্বাধীন চীনের নূতন সেনা পরিদর্শন করিতেছেন





রাজপুত

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

মারাঠাদের দীর্ঘকালব্যাপী লুণ্ঠনে এবং পিণ্ডারীদের অবাধ অত্যাচারে রাজপুতানা যখন শ্মশানে পরিণত হইতেছিল, রাজপুত জাতির সেই চরম দুর্দ্দিনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক বিভাগের কর্ম্মচারী কর্ণেল টড শৌর্য্য ও আত্মত্যাগের ঐ ধ্বংসস্তূপে উপস্থিত হন। পরাধীন জাতিকেও তিনি শ্রদ্ধা করিতে জানিতেন, ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে ধূলিধূসরিত মহীরুহকে পদাঘাত করিবার মত কাপুরুষতা তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত করে নাই। তাই তিনি বহু পরিশ্রমে রাজপুত জাতির প্রাচীন ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। ভারতবাসী এজন্য তাঁহার নিকট কতখানি কৃতজ্ঞ তাহা বলা যায় না। তিনি এই শ্রমসাধ্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিলে ইতিহাসের বহু মূল্যবান্ উপাদান চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যাইত। আধুনিক গবেষণার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে টডের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে টডের গ্রন্থ ব্যবহার না করিয়া কেহই রাজপুত জাতির ইতিহাস রচনা করিতে পারিবেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর রাজপুতেরা টডের গ্রন্থকে কতখানি মর্য্যাদা দিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগেই ইহা বাঙালী জাতির সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে' আমরা রাজপুতানার মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,—

> "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায় ?
> দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে কে পরিবে পায় ?"

দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই ব্যাকুলতা ক্রমশঃ শিক্ষিত বাঙালীর মনে সংক্রামিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতের সহিত তাহার অন্তরের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজপুতের বীরত্ব-কাহিনী বাঙালীর প্রাণ নবরসে সঞ্জীবিত করিল, পদ্মিনী ও প্রতাপসিংহ বাঙালীর মানসলোকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সমরের সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। 'শিবাজী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

> "সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে
> পায় নি সংবাদ…"

প্রকৃতপক্ষে মারাঠা জাতি সম্বন্ধে বাঙালীর মনে অত্যন্ত তিক্ত স্মৃতিই জাগ্রত ছিল। বাঙালীর কাছে মারাঠা অর্থ বর্গী, অর্থাৎ লুণ্ঠনকারী দস্যু। শিবাজীর আদর্শবাদ এবং পেশবা প্রথম বাজীরাওর হিন্দু পাদশাহী শিক্ষিত বাঙালীরও অজ্ঞাত ছিল। বাঙালীর শিক্ষাদাতা ইংরেজ পণ্ডিতেরা শিবাজীকে দস্যুদলপতি এবং মারাঠা জাতিকে ঠগ বা পিণ্ডারীর ন্যায় দস্যুদলরূপে চিত্রিত করিয়া বাঙালীর মন বিরূপ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় সুশিক্ষিত ও স্বদেশপ্রাণ নাট্যকারও বীরত্ব ও দেশভক্তির আলেখ্য অঙ্কন করিতে গিয়া রাজপুতানায় আশ্রয় লইয়াছেন, বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া মহারাষ্ট্র-ভ্রমণে বহির্গত হন নাই।

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে রাজপুতের কৃতিত্ব যাচাই করিবার সময় আসিয়াছে। রাজপুত ভারতবর্ষের কতখানি উপকার করিয়াছে? এত বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ থাকা সত্ত্বেও রাজপুত সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিল না কেন? রাজপুতের গৌরব বর্ণনায় আমরা কি ভাবাতিশয্যবশতঃ সত্যের সুদৃঢ় সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছি?

একথা মনে রাখিতে হইবে যে রাজপুতের ইতিহাস অতি দীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের আদিপর্ব্ব তমসাচ্ছন্ন। রাজপুতেরা বলেন যে তাঁহারা পৌরাণিক সূর্য্য-বংশ ও চন্দ্রবংশ হইতে উদ্ভূত, অর্থাৎ প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের বংশধর। ইদানীং মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয়ের ন্যায় সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক[১] এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমানকালোপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাজপুতের ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন যে রাজপুতদের মধ্যে অনেকেই বিদেশাগত শক, হূণ, গুর্জ্জর প্রভৃতি জাতির বংশধর। এই জটিল সমস্যার সর্ব্ববাদিসম্মত সমাধান কখন হইবে বলা যায় না।

মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের পূর্ব্বে যে-সকল রাজপুত-বংশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কনৌজের গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের রাজগণ এক সময়ে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মগধের পাল-রাজগণ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট

১। ইনি হিন্দী ভাষায় রাজপুতানার সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

রাজগণ গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের প্রবল শত্রু ছিলেন। সিন্ধু দেশ তখন আরবজাতীয় মুসলমানগণের করতলগত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজগণের প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়াই মুসলমানেরা পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে রাজ্যবিস্তার করিতে প্রয়াসী হয় নাই। গুর্জ্জর-প্রতিহাররাজ ভোজ একটি শিলালিপিতে 'আদি বরাহ' রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বরাহ-অবতারে বিষ্ণু যেমন জলপ্লাবিতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ভোজও তেমনি ম্লেচ্ছ-আক্রমণরূপ বন্যায় নিমগ্না ভারতভূমিকে রক্ষা করিয়াছিলেন —ইহাই বরাহের সহিত রাজার তুলনার তাৎপর্য্য। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে বিখ্যাত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের একটি শ্লোকে গ্রীক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষের পরিত্রাতা মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধেও অনুরূপ তুলনা প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজগণের কীর্ত্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে, কারণ তাঁহারা খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত উত্তর-ভারতকে রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন এবং মুসলমান আক্রমণের বিভীষিকা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের পতন আরম্ভ হয় এবং এই সুযোগে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় বহু রাজপুত-বংশ মস্তকোত্তোলন করে। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসেও এইরূপ কয়েকটি বংশের নাম দেখা যায়, যথা—শাকম্ভরীর (পরবর্ত্তী কালের আজমীড় ও দিল্লীর) চাহমান বা চৌহান বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্লবংশ, বারাণসীর ও কনৌজের গাহড়বাল বংশ, ত্রিপুরীর কলচুরি বংশ, মালবের পরমার বংশ, গুজরাটের চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশ, মেবারের গুহিলোট বংশ, গোয়ালিয়রের কচ্ছপঘাত বংশ, ইত্যাদি। এই সকল রাজবংশের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সম্প্রতি শিলালিপি ও সমসাময়িক গ্রন্থাবলীর সাহায্যে সঙ্কলিত হইতেছে।[২] এই সকল শিলালিপির সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে সেকালের রাজগণ কোন বৃহৎ লক্ষ্য বা বলিষ্ঠ কল্পনা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন না। বীরত্বের অভাব ছিল না। প্রত্যেক রাজাই বারংবার নিজের হিন্দু প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী অন্তর্যুদ্ধের ফলেও উত্তর-ভারতে বা দক্ষিণ-ভারতে একটি সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। এ ত দিগ্বিজয়কামী সমুদ্রগুপ্তের অভিযান নয়, এ যেন সাহসী দস্যুদলপতির লুণ্ঠনযাত্রা! লুণ্ঠনান্তে রাজা মহাসমারোহে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, অর্থলুব্ধ সভাকবি নির্লজ্জ চাটুকারিতায় তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। সেই চাটুবাক্যের সংক্ষিপ্তসার বৃহৎ সমাসবদ্ধ আড়ষ্ট ভাষায় শিলালিপিতে গ্রথিত হইত। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বোধ হয় এমন কোন রাজপুত রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই যাঁহার কল্পনা আকাশচারী মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করিত, এমন কোন সভাকবিও বোধ হয় ছিলেন না যিনি নিজের অন্নদাতাকে সত্য সত্যই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ভরসা করিতেন। অকস্মাৎ যেন ভারতবাসীর মানসিক জগৎ নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহৎ দুঃখ বরণের সাহস কাহারও ছিল না।

ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন পূর্ব্বে উত্থাপন করিয়াছি তাহার সহিত ইহার গভীর সম্বন্ধ আছে। আমি রাজপুতদিগকে শক-হূণ-গুর্জ্জর প্রভৃতির বংশধর বলিয়াই মনে করি। এই সকল বৈদেশিক জাতি ধীরে ধীরে ধর্ম্মে, ভাষায় ও আচার-ব্যবহারে হিন্দুত্ব লাভ করিলেও রক্তের ডাক ভুলিতে পারে নাই। আমি অন্যত্র বলিয়াছি, "মধ্য-এশিয়ার যাযাবর রক্ত পৌরাণিক মন্ত্রে শুদ্ধীকৃত হইলেও সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্ব লাভ করিতে পারে নাই।"[৩] এই সকল যাযাবর জাতি সাধারণতঃ বিভিন্ন কুল বা গোষ্ঠীতে (tribe) বিভক্ত থাকিত। হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও তাহারা এই কুলবৈষম্য ভুলিতে পারে নাই। অদ্যাপি রাজপুতদের মধ্যে কুলবৈষম্য প্রবলভাবে প্রচলিত। মধ্যযুগে দেখিতে পাই, বিভিন্ন রাজপুত কুল এক রাজার পতাকাতলে সমবেত হয় না। গুহিলোত কখনও রাঠোরের শাসন সহ্য করে না, রাঠোর গুহিলোতের নেতৃত্বে মুসলমানের সঙ্গেও যুদ্ধ করে না। সর্ যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐতিহাসিক দলিলপত্রের সন্ধানে তিনি জয়পুরে গিয়াছিলেন। তখন জয়পুরের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আপনি তো বিশেষভাবে ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়াছেন। বলুন তো রাঠোর কুল (যোধপুরের রাজবংশ) হইতে কাছোয়া কুল (জয়পুরের রাজবংশ) শ্রেষ্ঠ কিনা?"[৪] কুলগৌরব সম্বন্ধে যে জাতি এত সচেতন তাহার পক্ষে কুল অতিক্রম করিয়া জাতিকে

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হেমচন্দ্র রায় প্রণীত *Dynastic History of India* দ্রষ্টব্য।

৩। প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৯, ৮৪ পৃষ্ঠা

৪। *Fall of the Mughal Empire*, Vol. III

বরণ করা কঠিন হয়, পৈতৃক জমির সীমা অতিক্রম করিয়া মাতৃভূমির বৃহত্তর ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না।

বোধ হয় এই জন্যই রাজপুত জাতির দেশপ্রেম এত তীব্র ও এত সঙ্কীর্ণ। যে রাজপুত নিজ কুলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিত, সে ভারতবর্ষের বিশাল ভৌগোলিক মূর্ত্তি কখনও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই, বিশাল ভারতীয় জাতির ভাবমূর্ত্তি তাহার প্রাণে নব উন্মাদনার সৃষ্টি করে নাই। যে বীরত্ব সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে প্রবল, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহার বিকাশ হয় নাই। চন্দেল্ল কলচুরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, সোলাঙ্কি পরমার-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাঠোর ও কাছোয়া আত্মঘাতী কলহে মত্ত হইয়াছে, কিন্তু গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের পতনের পর কোন রাজপুত রাজা সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অথবা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করেন নাই। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় ঋষিরা আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের একত্ব অনুভব করিয়াছিলেন এবং বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়েরা রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভের জন্য মহাসংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে মৌর্য্য ও গুপ্ত সম্রাট্‌গণ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজগণের শিলালিপিতে হর্ষবর্দ্ধনকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু রাজপুত রাজত্বকালে ভারতীয় ঐক্যের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানেরা যদি সমগ্রভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী না হইত তবে বোধ হয় ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক কুলরাজ্যে (tribal state) বিভক্ত থাকিত।

রাজপুত-রাষ্ট্র যে কেবল আকৃতিতে ক্ষুদ্র এবং ভারতীয় ঐক্যের আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা নহে, শাসনকার্য্যে সামন্ততন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজপুত রাজগণ কেন্দ্রীয় শক্তিকে দুর্ব্বল এবং শাসন-পদ্ধতিকে প্রগতি-বিরোধী করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজপুত রাজ্যে সামন্তগণ অর্থাৎ সর্দ্দারেরা অত্যধিক ক্ষমতা ভোগ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ছিলেন প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। রাজাকেও নানা বিষয়ে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে সর্দ্দারেরা যথাসময়ে সসৈন্যে উপস্থিত না হইলে রাজা প্রমাদ গণিতেন। কুলমর্য্যাদা সম্বন্ধে রাজাদের ন্যায় সর্দ্দারেরাও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন, এবং মর্য্যাদাসংক্রান্ত প্রশ্ন অনেক সময় সর্দ্দারদের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী কলহ উৎপাদন করিত। কর্ণেল টড রাজপুত সর্দ্দারদের সহিত ইউরোপের মধ্যযুগের সামন্তদের (feudal barons) তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য না হইলেও একেবারে বর্জ্জনীয় নহে। প্রধানতঃ সামন্তদের স্বার্থরক্ষার জন্যই রাজপুত রাষ্ট্রে শাসন-পদ্ধতির সংস্কার হয় নাই। এই পরিবর্ত্তনবিরোধিতা প্রজার অকল্যাণ এবং দেশের শক্তিহ্রাস করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

রাজপুতের বীরত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু রাজপুত বীরেরা মুসলমান-আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না কেন তাহা বিচারের বিষয়। একতার অভাবই হিন্দুর পতনের কারণ, ইহা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। কঠিন ব্যাধির সহজ কারণ নির্দ্ধারণ করা কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কারণটি প্রকৃতই সহজ কি না তাহা সাবধানে পরীক্ষা করা আবশ্যক। আকৃতি ও লোকসংখ্যা হিসাবে সুলতান মামুদের রাজ্য প্রধান প্রধান ভারতীয় রাজ্যগুলির তুলনায় তেমন বেশী শক্তিশালী ছিল কি না সন্দেহ। বিদেশী আক্রমণকারীর পক্ষে ভারতবর্ষের পথঘাট অপরিচিত ছিল, স্থানীয় জনসাধারণ প্রতিকূল ছিল, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের অসুবিধা ছিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মনোভাবেও পার্থক্য ছিল—এক দল অর্থলোভে বিদেশে আসিয়াছিল, অপর দল দেশের স্বাধীনতা ও দেবমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল। এত সুবিধা সত্ত্বেও পঞ্জাবের শাহিরাজ অথবা গুজরাটের চৌলুক্যরাজ সুলতান মামুদকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেন না কেন? দেশের সেই মহা দুর্দ্দিনেও উত্তর-ভারতের হিন্দু রাজগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই, ইহা লজ্জা ও ক্ষোভের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য ভূমির অধিপতিকে পরাজিত করিবার জন্য হিন্দুরাজগণের সমবেত শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হইলে সামরিক হিসাবে তাহা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইত। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণে দেখা যায়, হিন্দু সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিত, কিন্তু নায়কের মৃত্যু হইয়াছে শুনিলেই তাহারা পলায়ন করিত। প্রাণভয় তুচ্ছ করাই যোদ্ধার একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, যুদ্ধক্ষেত্রে আকস্মিক বিপদে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার দায়িত্বও তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। রাজপুত রাজগণের সৈন্যেরা এবং সেনানায়কেরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিত না। দেশের মাটির প্রতি তাহাদের মমত্ববোধ তীব্র ছিল না, কুলপতি রাজার স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিত। সুতরাং কুলপতির মৃত্যুসংবাদ পাইলেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। যে সৈন্যদল কোন বৃহৎ আদর্শের পরিবর্ত্তে ব্যক্তি-বিশেষের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হয়, ইহাই তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আদর্শের মৃত্যু হয় না, কিন্তু

ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যু হয় এবং সেই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষের সেবক সৈন্যদলের বীরত্বও কর্পূরের মত শূন্যে মিলাইয়া যায়। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর রাজপুতেরা যদি সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিত তবে বোধ হয় সিন্ধু নদের পূর্ব্ব তীরে যবনাধিপত্য[৫] প্রতিষ্ঠিত হইত না।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, হিন্দুরা বীরত্বে মুসলমানদের সমকক্ষ ছিল, মুসলমানদের মতই তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিত, তথাপি সমরবিদ্যায় তাহারা আক্রমণকারীদের সমকক্ষ না হওয়ায় ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল।[৬] যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ব্যক্তিগত বীরত্বের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও দলগত সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন তদপেক্ষা বেশী। হিন্দু বাহিনীতে দলগত সঙ্ঘবদ্ধতার যথেষ্ট অভাব ছিল—নায়কের মৃত্যুতে সৈন্যদের পলায়ন তাহার একটি দৃষ্টান্ত। আবার সৈন্যদলে সাহস ও সঙ্ঘবদ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেই যুদ্ধে সাফল্যলাভ হয় না, সেনাপতি প্রকৃত রণকৌশলী হওয়া চাই। সুলতান মামুদ ও মুহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যে-সকল হিন্দু রাজা ও সেনাপতি যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই উচ্চশ্রেণীর রণকৌশলের পরিচয় দিতে পারেন নাই। মুসলমানের রীতি ছিল 'মারি অরি পারি যে কৌশলে', কিন্তু হিন্দুরা কোনক্রমে তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইত। যে রণনীতি কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক (defensive) তাহা দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পক্ষে যথেষ্ট নহে, আক্রমণকারীর উৎপাত হইতে স্থায়ীভাবে আত্মরক্ষার জন্য আঘাত করাও (offensive) প্রয়োজন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুসলমানদের সঙ্গে দীর্ঘ দুই শতাব্দী কাল সংঘর্ষের ফলেও হিন্দুরাজগণ এই সহজ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ দেড় শত বৎসর পঞ্জাবে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুর্ব্বল ছিলেন; আবার অনেক সময়েই তাঁহারা আভ্যন্তরীণ গোলযোগে এবং মধ্য-এশিয়াবাসী শত্রুদের আক্রমণে ব্যস্ত থাকিতেন। অথচ হিন্দুরাজগণ এই সুযোগে তাঁহাদিগকে পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন নাই। সমসাময়িক হিন্দুরা যে রণবিমুখ ছিলেন তাহা নহে। গুজরাটের যে চৌলুক্য রাজা সোমনাথ মন্দির রক্ষার কোন বন্দোবস্ত না করিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তিনিই সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর মালব আক্রমণ করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্জাব হইতে মামুদের বংশ উন্মূলিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগ্রত হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী আর এক চৌলুক্য রাজা মালবের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ রাজ্যের উত্তর সীমান্ত হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। রাজপুতদের সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টি এতটা সঙ্কীর্ণ না হইলে ভারতের ইতিহাস নব রূপ গ্রহণ করিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে রাজপুতেরা হিন্দুজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া যথাযথরূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে নাই। বারংবার পরাজয়ের ফলে হিন্দুর মানসিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হইল, আত্মবিশ্বাস হারাইয়া হিন্দুরাজগণ কাপুরুষে পরিণত হইলেন। আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে পাই, "পৃথিবীতে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) দেবতুল্য বহু রাজা আছেন, কিন্তু তুরস্করাজের নাম শুনিলেই তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।"[৭] বক্তিয়ার-পুত্রের আগমনে দিগ্বিজয়ী লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি।

দিল্লীর সুল্‌তানী আমলের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে রাজপুতেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই হিন্দুর নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। কেবলমাত্র রাজপুতানায় রাজপুতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল, উত্তর-ভারতের অন্যান্য রাজপুত রাজ্যসমূহ মুসলমানের পদানত হইল। কোন রাজপুত রাজা হিন্দুর ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। চিতোর, রন্তম্ভোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি দুর্গের রাজপুত অধিপতিগণ বার বার যুদ্ধ করিয়া মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল পৈতৃক ভূমি রক্ষা, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার বৃহৎ আদর্শ তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করে নাই। বাঙালীর রঙীন কল্পনায় পদ্মিনীর উপাখ্যান হিন্দুর স্বাধীনতা-সমরের ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সেকালের ইতিহাসে আলাউদ্দীনের চিতোর-অবরোধ একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র, ভারতবর্ষের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, চিতোরের প্রসিদ্ধ রাণা সংগ্রামসিংহ উত্তর-ভারতে হিন্দু আধিপত্য পুনরুদ্ধারের

৫ আমি 'যবন' শব্দ বিদেশী অর্থে ব্যবহার করিলাম।

৬। *Oxford History of India*, p. 220.

৭। *Epigraphia Indica*, I, 26.

কল্পনা করিয়াছিলেন। খানুয়ার রণক্ষেত্রে পরাজয়ের ফলে তাঁহার স্বপ্ন সফল হইল না, ভারতে পাঠানের পরিবর্ত্তে মুঘলের অধিকার স্থাপিত হইল। সংগ্রামসিংহের জীবন-কাহিনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মালব এবং গুজরাটের মুসলমান স্থলতানগণের সহিত সংগ্রামসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল, মালবের স্থলতান এক বার রাণার হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রামসিংহ এই মুসলমান রাজ্য দুইটি স্বরাজ্যভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই। মালব ও গুজরাট মুসলমান-শাসনাধীন থাকিতে উত্তর-ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপিত হইত কিরূপে? সত্য বটে, ইব্রাহিম লোদীর সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য সংগ্রামসিংহ বাবুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং বাবুর তৈমুরলঙ্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না দেখিয়া তাঁহার ধ্বংস সাধনের জন্য খানুয়া প্রান্তরে বিশাল রাজপুতবাহিনী সমবেত হইয়াছিল; কিন্তু দিল্লীর বাদশাহী তক্ত অধিকার করিবার বলিষ্ঠ কল্পনা সংগ্রাম-সিংহের মানসলোক নব বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। তর্কস্থলে হয়ত ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে তিনি দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে রাজ্যবিস্তারের প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু সে রাজ্য নিশ্চয়ই সৈয়দ ও লোদী স্থলতানদের রাজ্যের মত উত্তর-ভারতের অন্যতম খণ্ডরাজ্য-রূপে গণ্য হইত, তাহাতে হিন্দুর জাতীয় গৌরব নবজীবন লাভ করিতে পারিত না।

সংগ্রামসিংহের পৌত্র প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আকবরের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। টডের কল্পনা রাণা প্রতাপের যে বীরমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই ইতিহাসে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং বাঙালী সাহিত্যিকগণ নব নব বর্ণসম্পাতে তাহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজস্থানী ভাষায় ইতিহাসের যে-সকল উপকরণ এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে প্রতাপের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের রঙীন কল্পনা হয়ত খানিকটা ম্লান হইবে, কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসাধারণ সাহস, ধৈর্য্য এবং দুঃখ-সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু মেবারের স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সমগ্র ভারত-ভূমির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার কল্পনা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। বোধ হয় এই জন্যই সমসাময়িক ভারতের প্রান্তে প্রান্তে তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী ধ্বনিত হয় নাই, তাঁহার আদর্শ আরা-বল্লীর উপত্যকা হইতে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে নাই। যে আদর্শবাদ শিবাজীর সাফল্যকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল, মারাঠা জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল, পঞ্জাবের নির্যাতিত কৃষক-শক্তিকে মৃত্যুঞ্জয়ী খালসায় নব রূপ দান করিয়াছিল, প্রতাপসিংহের চরিত্রে তাহার একান্তই অভাব ছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত রাজপুতের সম্বন্ধ কতখানি গ্লানিকর তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। তুর্কীর সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রাজপুত হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে কলঙ্কভাজন হইয়াছিল, হিন্দু সমাজের নেতৃত্বের দাবী একেবারে হারাইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের বিবাহে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং এই সহজ সত্যটি জয়পুর ও যোধ-পুরের রাজগণের অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি তাঁহারা প্রায় দুই শতাব্দীকাল মুঘল-পরিবারে কন্যাদান করিয়াছিলেন। বাদশাহের বশ্যতাস্বীকারের সহিত কন্যাদানের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ ছিল না; মেবারের রাণা বাদশাহের অধীন হইয়া-ছিলেন, কিন্তু কন্যাদানে স্বীকৃত হন নাই। হিন্দু-মুসল-মানের বিবাহ যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে মুঘল-রাজপুতের বিবাহ সেকালের হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে একান্তই দোষাবহ ছিল এবং মুঘলের সংস্পর্শদুষ্ট রাজপুতের পক্ষে হিন্দু সমাজের সঙ্গে আংশিক বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

রাজপুতের বশ্যতা ও সহায়তার বিনিময়ে মুঘল সম্রাটেরা উচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জয়পুর ও যোধ-পুরের রাজগণ বাদশাহী দরবারে বিশেষ মর্য্যাদা পাইতেন, বাদশাহী অভিযানে সেনাপতিত্ব করিতেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার মসনদে বসিতেন। কণ্টকের দ্বারা কণ্টকো-দ্ধারের নীতি মুঘল বাদশাহদের অজ্ঞাত ছিল না। মহারাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বনাশ করিয়া বাংলার স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলেন। ঔরংজীবের মুসলমান সেনাপতিগণ যখন শিবাজীকে দমন করিতে পারিলেন না তখন জয়পুররাজ জয়সিংহ মহারাষ্ট্রে পদার্পণ করিলেন—পুরন্দরের সন্ধি দ্বারা মারাঠা বীরের ক্ষমতা ও গৌরব খর্ব্ব করা হইল। আসাম-বিজয়ের ভার পাইলেন কুমার রামসিংহ। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সওয়াই জয়সিংহ মারাঠা দমনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

প্রথম বাজীরাও হইতে আরম্ভ করিয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়া পর্য্যন্ত মারাঠা নায়কগণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজপুতদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন। মেবার-রাজকুমারী কৃষ্ণার

শোচনীয় মৃত্যু মাইকেলের তুলিকাস্পর্শে বাঙালীর অশ্রু-প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়াছে ; এই শোচনীয় ঘটনার জন্য মারাঠাদের অত্যাচার অনেকাংশে দায়ী। তথাপি মারাঠাদের কৃত কার্য্যের গুরুত্ব বিচারের সময় মানসিংহ, জয়সিংহ, রামসিংহ প্রভৃতি রাজপুত বীরের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ রাখা প্রয়োজন। টডের উচ্ছ্বসিত অত্যুক্তি আমাদের ঐতিহাসিক চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, রাজপুতকে স্বাধীনতার প্রতীক এবং হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইয়াছি। মুঘলের মিত্ররূপে রাজপুত যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হিন্দুর শত্রুতাসাধন করিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠাগণ হয়ত তাহা ভুলিতে পারে নাই। মুঘলের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া রাজপুত স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছে, স্বজাতিদ্রোহিতা করিয়াছে—মারাঠা বাহিনীর নির্ম্মম অত্যাচার হয়ত তাহারই অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত।

মেঘের প্রতি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কবে কোন্ দিনে পথ চিনে চিনে
গিয়েছিলে তুমি অলকায়,
হে বীর, তোমার জ্যোতির্ম্মালা
কণ্ঠে বিজলী ঝলকায়!
অনাদি কালের রসনির্ঝর
ঝরায়ে ভরালে এই চরাচর,
রামগিরিপুরে দূর পরবাসী
বেঁধেছিল বুক ভরসায়,
আজিও হে মেঘ! অনাদি যক্ষ
কাঁদে অনন্ত বেদনায়।

গগনে গগনে সেই ঘন-ঘটা
দ্রিংকি দ্রিমিকি মাদলের
সেই গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
আর্দ্র নয়ন বাদলের—
অনতিকথিত ব্যথিত বিদায়
অধরে পরাণ সমাগতপ্রায়,
সিক্ত সমিধ দগ্ধ ধুঁয়ায়
যজ্ঞতিলক বিরহের
অলকাপুরীর সে বিরহিণীর
নয়ন গলিত কাজলের,

ছায়ায় ঘিরিল অম্বরতল
ব্যথায় ভরিল ধরাতল,
বিশ্ববিরহী নয়নধারায়
পাথার করিল ধারাজল,
জীমূতমন্দ্রে গভীর আরাব,
ছুটে নির্ঝরে গৈরিক স্রাব,
আঁখির তড়িতে কৌতুকে নাচে
পেখম তুলিয়া শিখীদল,
শুভ্র উদার রূপ-সম্ভার
হাসিতে ফুটায় শতদল।

অজগর সম গরজে তটিনী
তীরবেগে বহে বারিধার,
পাটল পরাগ নব অনুরাগ
ছল ছল আঁখি কলিকার,
বিষাদ বাষ্প বিহ্বল বেদনা
উতল বাতাস কহিল, কেঁদ না—
তোলো মুখ তোলো, লাজময়ী ওলো,
মেঘদূত এল বরষার,
জলভারাতুর জলদ মেদুর
বক্ষে মালিকা বলাকার।

গিরি শৈবাল শষ্প উষীর
বন্য ভেষজ পরিমল
ধন্য হইল তৃণ শাদ্বল
শ্যামল হইল সমতল,
সুদূরোত্থিত উর্ম্মির মত
অস্ফুট বাণী কহিছ সতত
বনলক্ষ্মীর নয়ন যুগল
পুলকোজ্জ্বল ঢল ঢল,
হে মেঘ, তোমার বিজলী মাল্য
কণ্ঠে রহুক অচপল।



প্রশান্তিকা

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া সৃষ্টিকর্তা দুঃখিত হইলেন। সারা য়ুরোপ, আফ্রিকার অর্ধেক, এশিয়ার একাংশ হইতে একটা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরে উঠিতেছিল, তাহা দেখিয়া সৃষ্টিকর্তা ছোট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পৃথিবীটা হইল কি? স্বামী-স্ত্রীতে প্রেম নাই, পিতাপুত্রে সম্প্রীতি নাই, ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব নাই; সমাজ হইতে সত্য, শান্তি, সৌন্দর্য এই তিনটা লোপ পাইতে বসিয়াছে। তার পরে এই যুদ্ধ ব্যাপারটা, এ যেন একটা সংক্রামক মাথার রোগ—কয়েক কোটি লোক হঠাৎ একসঙ্গে ক্ষেপিয়া গিয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। কোথায় সেই আগেকার আমলের গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গ্রাম—সুখ, শান্তি, প্রেম; এখন আসিয়াছে শহরের যুগ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ত আছেই, তা ছাড়া আছে চতুর্থ ডাইমেন্‌শন্ সময়—রাত্রি দিনে আর প্রভেদ নাই।

পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া সৃষ্টিকর্তা অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তার পরে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে সযত্নে সৃষ্টি করিলেন এক শ্যামল দ্বীপ—সেই দ্বীপে বসাইলেন এক ঘর চাষী, এক ঘর কুমোর, এক ঘর কামার, এক ঘর ছুতোর আর এক ঘর তাঁতী; জীবনের খেলা সুরু হইল সেই দ্বীপে। দ্বীপের নাম হইল প্রশান্তিকা।

চাষী চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করে, ঘরে ঘরে বাঁটিয়া দেয়, কুমোর হাঁড়ি-কলসী গড়ে—যাহার যেটা প্রয়োজন সে সেটা লইয়া যায়, কামার কাস্তে গড়ে, দা গড়ে, ছুতোর পাঁচ গৃহস্থের জন্ত পাঁচখানি ঘর গড়ে, আর তাঁতী বোনে পাঁচ বউয়ের জন্তে পাঁচ-জোড়া শাড়ী আর পাঁচ মরদের জন্তে পাঁচ জোড়া ধুতি।

ইহাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিন কাজে, হাসিতে, গল্পে, গানে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সকালে পাঁচ মরদে নিজের নিজের কাজে লাগিয়া যায়, সন্ধ্যায় কাজের শেষে পাঁচ বন্ধু একত্র বসিয়া গল্প করে—অভাব-অভিযোগের কথা নয়, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি নয়, মার্কস্‌বাদ, ফ্রয়েডবাদ নয়—ফলের কথা, ফুলের কথা, গ্রীষ্মের কথা, বর্ষার কথা এবং আপন আপন প্রেয়সীর প্রেমের কথা। ততক্ষণ পাঁচ বৌ কলসী কাঁখে লইয়া জল আনিতে যায়, পথে গা ঠেলাঠেলি করিয়া মনের কথা বলে। দেখিয়া শুনিয়া সৃষ্টিকর্তা খুশী হন।

এই ভাবে দিন আসে যায়।

ইতিমধ্যে গ্রহান্তরে জরুরি কাজ পড়ায় সৃষ্টিকর্তা এদিককার কথা এক রকম ভুলিয়া যান।

দিন যায় আসে।

বৎসরান্তে পাঁচ গৃহস্থের ঘরে পাঁচটি শিশুর আবির্ভাব হইল। চাষীর ছেলে, তাঁতীর মেয়ে, কামারের ছেলে, কুমোরের মেয়ে এবং ছুতোরের একটি ছেলে হইল। কামার-বৌয়ের মনের বাসনা ছিল তাহার একটি মেয়ে হয়, তাই যখন সে জানিতে পারিল মেয়ে না হইয়া ছেলে হইয়াছে তখন মুহূর্তের জন্ত মনটা তাহার কেমন করিয়া উঠিল। তাঁতী-বৌয়ের বড় সাধ ছিল যে তাহার একটি ছেলে হয়, মেয়ে হইল বলিয়া তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখ ভার হইল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়িল।

এই সামান্য একটু অসন্তোষ ও একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশান্তিকার পরিষ্কার বাতাসে বেমালুম মিশিয়া গেল।

আজকাল প্রশান্তিকার শব্দসম্পদ কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। পাঁচটি মানবশিশুর হর্ষবিষাদ ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের নিরন্তর চেষ্টা চলিতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে শিশুরা কৈশোরে পা দেয়। প্রশান্তিকার পথে-ঘাটে ছোট ছোঁট পদচিহ্ন পড়িতে থাকে।

কুমোরের মেয়েটি হইয়াছে বড় সুন্দর—ফুটফুটে রং, টানা টানা ভুরুর নীচে চোখদুটি হাসিভরা, কোঁকড়া চুলের গোছা দুলাইয়া মায়ের আশেপাশে ছুটিয়া বেড়ায়। কুমোর-বৌ কুমোরকে এক দিন কহিল, 'ওগো, তোমার বন্ধু তাঁতীকে বলো না আমার খুকীর জন্যে একখানা টুকটুকে লাল শাড়ী বুনে দেবে।' কুমোর তাঁতী-বন্ধুর কাছে কথাটা পাড়িল। তাঁতী-বন্ধু আশ্বাস দিয়া কহিল, একখান লাল শাড়ির জন্য তাগিদ তাহার কাছে আগেই আসিয়াছে, অতএব অবিলম্বে দুইখানি লাল শাড়ী সে বুনিয়া ফেলিবে।

দুইখানি লাল শাড়ী বোনা হইল, একখানি পরিল তাঁতী-কন্যা আর একখানি পরিল কুমোর-কন্যা—তার পরে দুই কন্যা হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। কুমোর আহ্লাদে আট-খানা হইয়া বৌকে ডাকিয়া কহিল, 'দেখ দেখ, আমাদের খুকীকে কেমন দেখাচ্ছে!' কুমোর-বৌ হাতের কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, দেখিয়া মুখ ভার করিল, তার পরে প্রশ্ন করিল, 'হ্যাঁ গো, আমার খুকীর শাড়ী তাঁতী-মেয়ের শাড়ীর মত অত লাল কেন হ'ল না?' নিজের মেয়ের শাড়ী বুনিতে গেলে কেন যে পরের মেয়ের শাড়ীর চেয়ে রঙের ছোঁয়া একটু বেশী লাগিয়া যায় কুমোর সেদিন এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না।

ছুতোরের অবসর বেশী, তাই সে তার ঘরের দাওয়ায় পাঠশালা খুলিয়া বসে; চাষীর ছেলে, কামারের ছেলে আর ছুতোরের ছেলে সকাল-বিকাল লেখাপড়া করে। চাষীর ছেলেটার শরীরের শক্তি যে অনুপাতে বাড়িতে থাকে, বিদ্যা সে অনুপাতে বাড়ে না; কামারের ছেলের আহারে যে-পরিমাণ রুচি, পাঠে সেই পরিমাণ অরুচি; ছুতোরের ছেলের দেহ ছোট, ক্ষুধাও কম অথচ বুদ্ধি যেন অনাবশ্যক বেশী। এক এক দিন চাষী, কামার, ছুতোর ছেলেদের ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা করিতে বসে; ছুতোর বলে, 'চাষী-ভাইয়ের ছেলেটা ধারাপাত দেখিলে ভয় পায় বটে, কিন্তু বাঘ দেখিলে ভয় পায় না—কালে একটা বীর হইবে; কামার-ভাইয়ের ছেলের রসবোধ আছে—নীরস ব্যাকরণের চেয়ে রসাল কাঁচা তেঁতুলের পক্ষপাতী, আমার ছেলেটার লেখাপড়ায় মন আছে কিন্তু স্বাস্থ্য নাই, শরীর বাদ দিয়া ত কেবল মাথাটি টিকিতে পারে না!' শুনিয়া চাষী আর কামার হাসে, কিন্তু সে হাসি যেন আগেকার মত প্রাণখোলাও নয়—সরলও নয়!

প্রশান্তিকার তিন ছেলে দুই কন্যা যৌবনে পদার্পণ করে।

চাষীর ছেলেটা যেমন হইল লম্বা-চওড়া তেমনি হইল বলবান্। শরীরটা তাহার সাবালক হইল বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা নাবালকই রহিয়া গেল। কামারের ছেলের রসবোধ আরও বাড়িয়াছে, আহার এবং বিহার দুটিতেই তাহার অসামান্য রুচির পরিচয় পাওয়া যায়—যথা, মাথায় রঙীন পাগড়ি, অধরে তাম্বুলের রাগ। ছুতোরের ছেলের ব্যাপার হইল বিপরীত, তাহার যৌবন বাহিরে ফুটিল না, ফুটিল অন্তরে। সে ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, নির্জন নদীতীরে বসিয়া গান গায়।

এক দিন বিকালবেলা ছুতোরের ছেলে নদীর ধারে বসিয়া আছে এমন সময় তাঁতীর মেয়ে আর কুমোরের মেয়ে সেই ঘাটে



তাঁতীর মেয়ে আর কুমোরের মেয়ে জল নিতে আসিল

জল নিতে আসিল। দুই মেয়ের সর্বাঙ্গ ভরিয়া যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে, বাধা মানে না, উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে ছলকিয়া পড়ে। কুমোরের মেয়ের খোঁপায় আবার এক গোছা মালতী ফুল। জল লইয়া দুই কন্যা চলিয়া গেল, সন্ধ্যা ক্রমে ঘনাইয়া আসিল, বনে পাখীর গান থামিয়া গেল, ছুতোরের ছেলে কিন্তু ঘাটে অচল বসিয়া রহিল। ব্যাপার কি? ব্যাপার সাধারণ অথচ অসাধারণ—ছুতোরের ছেলে কুমোরের মেয়েকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে!

পরদিন প্রশান্তিকায় শোনা গেল প্রথম প্রেমের গান। ছুতোরের ছেলে প্রেমের কবিতা লেখে, বনের পথে চলিতে চলিতে প্রেমের গান গায়।

প্রেমের এ আনন্দ-সঙ্গীত কিন্তু প্রশান্তিকায় বেশী দিন স্থায়ী হইল না, কেন-না এক দিন ছুতোরের ছেলে দেখিল কামারের নন্দন কুমোর-কন্যার খোঁপায় চাঁপা ফুল গুঁজিয়া দিতেছে। পর-দিন বনের পথে শোনা গেল ব্যর্থপ্রেমের বুক-ভাঙা করুণ রাগিণী।

বছর না ঘুরিতে কামারের ছেলে কুমোরের মেয়ের এবং চাষীর ছেলে তাঁতীর মেয়ের পাণিগ্রহণ করিল; ছুতোরের ছেলে গোপন মর্ম্মব্যথা লইয়া একা রহিয়া গেল।

কিছু দিন যায় একদা প্রশান্তিকায় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। বেলা তখন দুপুর, হঠাৎ শোনা গেল একটা চীৎকার চেঁচামেচি, গোলমাল ও গালাগালি—পশুপক্ষীরা পর্য্যন্ত থ মারিয়া গেল। ঘটনা হইল এই যে, কামারের ছেলে এক খণ্ড জমিতে ফুলবাগিচা করিবার মানসে বেড়া দিতে থাকে, এমন সময় চাষীর ছেলে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাধা দেয় ও বলে যে ঠিক ঐ জায়গাটিতেই সে কুমড়ার বীজ বপন করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। কামারের ছেলে সৌন্দর্য্যবোধের দোহাই দেয়, চাষীর ছেলে ক্ষুধাবোধের দোহাই দেয়—বিচার বচসায় পরিণত হয় এবং শেষের দিকে বাক্‌যুদ্ধ বাহুযুদ্ধে গড়ায়। বলা বাহুল্য যে, কামারের ছেলের সৌন্দর্য্যবোধ ফুল হইয়া ফুটিবার সুযোগ পাইল না—চাষীর ছেলের ক্ষুধাবোধ কুষ্মাণ্ড হইয়া ফলিল।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়।

প্রশান্তিকার লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়িতে থাকে। কুমোর কামার ছুতোর চাষী ও তাঁতীর পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রে ঘর ভরিয়া যায়।

যেখানে জন্ম আছে সেখানে মৃত্যুও আছে, বৃদ্ধ কুমোর কামার ছুতোর চাষী ও তাঁতী একে একে পরলোক গমন করে।

আরও বৎসর যায়, প্রশান্তিকার লোকসংখ্যা আরও বাড়ে—যেখানে ছিল মাত্র পাঁচখানি, সেখানে দেখা দিল পঞ্চাশখানি ঘর। ক্রমে একখানি গ্রাম, তার পরে আর একখানি গ্রাম, তার পরে বহু গ্রাম গড়ে ওঠে। গ্রামের সঙ্গে গড়ে ওঠে গ্রাম্যসমাজ—বেচাকেনা সুরু হয়, হাটবাজার বসে।

ঘাড়ের উপর যতক্ষণ না মাহুতকে স্বীকার করিয়া নেয় ততক্ষণ তাহাকে যেমন সভ্য ও উন্নত হাতী বলা চলে না, মানুষের সমাজও তেমন তাহার ঘাড়ে যতক্ষণ না একটা সিংহাসন বা শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া নেয় ততক্ষণ তাহাকে যথেষ্ট সভ্য ও উন্নত সমাজ বলা যায় না। সেই হিসাবে প্রশান্তিকার জনসমাজ একদা একটা শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া উন্নতির সোপানের প্রথম ধাপে উঠিল। দ্বিতীয় ধাপে উঠিলে প্রশান্তিকায় শহর দেখা দিল, তৃতীয় ধাপে কলকারখানা দেখা দিল, চতুর্থ ধাপে এক দল লোকের ঐশ্বর্য্য আর একদল লোকের দারিদ্র্য দেখা দিল, পঞ্চম ধাপে প্রশান্তিকার লোকেরা প্রায় সভ্য হইয়া উঠিল—মিথ্যাকথা বলিতে, প্রতারণা করিতে, জিনিসে ভেজাল দিতে, ঘুষ নিতে, খোশামোদ করিতে শিখিল।

কালস্রোত বহিয়া চলে।

এক সময়ে দেখা গেল প্রশান্তিকার পূর্ব-অংশবাসী ও পশ্চিম-অংশবাসীদের ভিতরে একটা প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে এই প্রভেদটা ভাবে, ভাষায়, আচার-ব্যবহারে আরও পরিস্ফুট হইল। কিছু কাল পরে পূর্ব-প্রশান্তিকা ও পশ্চিম-প্রশান্তিকা দুই পৃথক্ রাজ্যে পরিণত হইল। অবশেষে দুই জনসমাজ যে কোন দিন এক ছিল সে-কথা ভুলিয়া গিয়া দুই পক্ষই খুশী হইল।

ইহার পরে দুই রাজ্য পাল্লা দিয়া উন্নতির সোপানে ধাপে ধাপে উঠিতে থাকে। দুই রাজ্যে সম্প্রীতিও হয় খুব, এ উহাকে ভদ্রভাষায় অভদ্র বলে। দুই রাজ্যে সহযোগিতাও চলে খুব, এ উহার বাজার একচেটিয়া করিতে চায়।

ইতিমধ্যে এক দিন পূর্ব-প্রশান্তিকার কোন বাসিন্দা কুয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটির নীচে একখানা জীর্ণ লাঙ্গলের ফাল পাইয়া সেটাকে টান মারিয়া উপরে ফেলিয়া দিল। মূর্খ চিনিল না ইহাই প্রশান্তিকার আদি চাষীর আদিম লাঙ্গলের ফাল! কিন্তু সৃষ্টিকর্তার বিশেষ সৃষ্টি এই লাঙ্গলের ফাল বৃথা হইবার নহে, হাতে হাতে ঘুরিয়া ইহা অবশেষে প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে গিয়া পড়িল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সুরু করিলেন, ফলে যাহা জানা গেল তাহা অতীব বিস্ময়কর। জানা গেল, এই যে বিশ হাজার অথবা দুই-শ বিশ হাজার বৎসর আগে এই অসামান্য লোহার ফাল তৈরি হইয়াছিল—এই ফালে যখন পূর্ব-প্রশান্তিকার জমি চাষ হইত তখন পশ্চিম-প্রশান্তিকার ত' কথাই নাই, পৃথিবীর কুত্রাপি কোন জাতি কৃষিকার্য করিবার মত সভ্যতা লাভ করে নাই।

এ হেন ব্যাপারে পশ্চিম-প্রশান্তিকার আঁতে ঘা লাগিবারই কথা। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বড়কর্তা ধমক খাইলেন, রাজ্যের যত পুরনো ঢিপি খোঁড়া হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে সামান্য একটা ঢিপির নীচে পাওয়া গেল অসামান্য একটা জিনিস—মরিচাধরা আধখানা ভাঙা বাটালি। রাজ্যময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল, বাটালি মানে শিল্প, সম্পদ, বাণিজ্য, সাম্রাজ্য। সকলেই বুঝিল পূর্ব-প্রশান্তিকার অসভ্যেরা যখন কেবল চাষ করিতে শিখিতেছিল, পশ্চিম-প্রশান্তিকার আর্য্যগণ তখন একটা অতি প্রবীণ সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। প্রশান্তিকার আদিসূত্রধরের বাটালি আধখানা হইলেও ব্যর্থ হইল না।

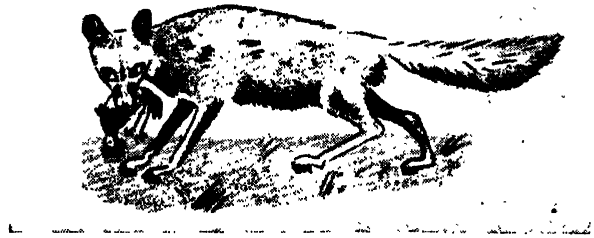
এত বড় অপমানে পূর্ব-প্রশান্তিকা প্রথমটা দমিয়া গেল বটে, কিন্তু তার পরে ইহার পাল্টা জবাব দিবার জন্য মরিয়া হইয়া লাগিল। গোলাবারুদের কারখানায় অকাট্য যুক্তি সব তৈরি হইতে লাগিল।

এই ভাবে দিন যায়—দুই রাজ্যের মানসিক উত্তাপ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসে। কিন্তু সে স্বল্পকালের জন্য, কেননা পূর্ব-প্রশান্তিকায় আবিষ্কার হয় একটা কয়লার খনি আর পশ্চিম-প্রশান্তিকায় আবিষ্কার হয় একটা লোহার খনি। গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়—পূর্বের কয়লা বেশী লোহা কম, পশ্চিমের লোহা বেশী কয়লা কম! আধাআধি ভাগ করিয়া লইলে সমস্যার মীমাংসা সহজেই

হইয়া যায়, কিন্তু অত সহজে অতবড় সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে যে সম্মান থাকে না তাই পূর্ব চায় গোটা লোহার খনিটা দখল করিতে, আর পশ্চিম চায় গোটা কয়লার খনিটা হাতে আনিতে।

এই যে এ উহার খনিটা হস্তগত করিতে চায় ইহা যে উভয় রাজ্যের পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত তাহা দুই পক্ষের কাগজ পড়িলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব-প্রশান্তিকার কাগজ বলে, "কেননা খনিটা লোহার এবং আমাদের কয়লা আছে, অতএব লোহার খনিটা আমাদেরই হওয়া উচিত।" পশ্চিম-প্রশান্তিকার কাগজ লেখে, "লোহা না থাকিলে কয়লার কোন আবশ্যকতা নাই," অতএব পূর্ব-প্রশান্তিকার অনাবশ্যক লোহার খনিটা আমরা চাই। এ হেন যুক্তিতে খুঁত ধরিবার কিছুই নাই।

ইহারই কিছু কাল পরে এক দিন দুই রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে এমন একটা ঘটনা ঘটে যা সামান্য হইলেও অচিরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। ঘটনা এই যে, পশ্চিম-প্রশান্তিকার সীমান্তপ্রদেশের ঘেঁটুবনের এক শৃগাল পূর্ব-প্রশান্তিকার সীমান্তপ্রদেশের এক মুচী-গৃহস্থের একমাত্র মুরগীকে হত্যা করে! বার ঘণ্টার মধ্যে দুই রাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়।



এমন একটা ঘটনা ঘটে যা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়

সৃষ্টিকর্তার গ্রহান্তরের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ এক দিন তাঁহার প্রশান্তিকার কথা মনে পড়িল। কত কাল হইল একান্ত প্রিয় সেই শান্তসুন্দর দ্বীপটিকে তিনি দেখেন নাই! তাই প্রসন্ন নয়নে তিনি আজ প্রশান্তিকার পানে তাকাইলেন কিন্তু মুহূর্তে সে প্রসন্ন ভাবটা অন্তর্হিত হইল, সৃষ্টিকর্তা দেখিলেন প্রশান্তিকার শ্যামল বন-প্রান্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরে উঠিতেছে!

সৃষ্টিকর্তা ভ্রুকুটি করিলেন।

সম্রাট কবি সমুদ্রগুপ্ত

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

হরিষেণ তাঁর সমুদ্রগুপ্ত-প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে রাজকবি বলে অভিহিত করেছেন।[১] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সমুদ্রগুপ্তের কোন রচনাই এত দিন সুধীবর্গের জানা ছিল না। সম্প্রতি সমুদ্রগুপ্ত-রচিত কৃষ্ণচরিত নামক একখানা হস্তলিখিত পুঁথির মাত্র আড়াইটি কীটদষ্ট পৃষ্ঠা আবিষ্কৃত হয়েছে—যা থেকে সমুদ্রগুপ্তের কবিত্বশক্তির কিছু পরিচয় এবং সমুদ্রগুপ্ত-প্রশংসিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদের বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য জানা যায়। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতের ইতিহাসের দিক থেকে এ লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণচরিতের যথাপ্রাপ্ত সাক্ষ্যও অমূল্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এ গ্রন্থ যে সমুদ্রগুপ্ত-বিরচিত, তা গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক এবং প্রাপ্ত দুই পরিচ্ছেদের অন্তস্থিত পরিচয়-বিবরণী[২] বা কলোফোন থেকে প্রমাণিত হয়।

কৃষ্ণচরিত গ্রন্থের পুঁথি যতটুকু অংশ পাওয়া গেছে, তার অন্তে লিখিত আছে, "অথ জীবিকা-কবয়ঃ।" এ অধ্যায়ে সমুদ্রগুপ্ত যে জীবিকাকবির প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুঁথির প্রাপ্ত অংশে সম্রাট্‌ কবি 'মুনিকবি' ও 'রাজকবিদে'র বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং সমুদ্রগুপ্ত কবিদের যে মুনিকবি, রাজ-কবি, জীবিকাকবি প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে বহু কবির বিবরণ এ গ্রন্থে দিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ।

যে সামান্য কয়টি কবিতা আমরা বর্তমানে পেয়েছি, তা থেকে সমুদ্রগুপ্তের কবিত্ব শক্তির স্ফুট পরিচয় অবশ্য আমরা আশা করতে পারি না; পুস্তকের ভূমিকায় কবিত্ব শক্তি প্রকাশের চেষ্টা হয়ত তিনি ইচ্ছা করেই করেন

১। **Allahabad Posthumous Stone Pillar Inscription of Samudragupta; Fleet, Stone Inscriptions, No. 32,** "প্রতিষ্ঠিত-কবিরাজ-শব্দস্য"। আরও দেখুন, ***Indian Antiquary*, XLII, 172, 188, 230, 843; *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1897, 20.**

২। ইতি শ্রীবিক্রমাঙ্ক-মহারাজাধিরাজ-পরমভাগবত-শ্রীসমুদ্রগুপ্ত-কৃতৌ কৃষ্ণচরিতে কথা-প্রস্তাবনায়াং মুনিকবি-কীর্তনম্‌। ইতি…রাজ-কবি-কীর্তনম্‌।

নি। এ অংশ কেবল বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। তা' হ'লেও সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত যে কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়।

এ গ্রন্থে স্পষ্ট বলা আছে যে, কালিদাস কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হয়েই সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত এ কৃষ্ণচরিত কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।[৩] সমুদ্রগুপ্ত স্বকীয় গ্রন্থেই নিজকে "পরম ভাগবত" বলে ঘোষণা করেছেন; সুতরাং তিনি কেন যে কৃষ্ণচরিত লিখতে ব্রতী হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

মুনি কবিদের প্রসঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত পাণিনি, শাঙ্খায়ন, বররুচি, ব্যাড়ি, দেবল, পতঞ্জলি, ভাস, বর্ধমান, চীনদেব ও মিহিরদেব—এ দশ জনের নামোল্লেখ করেছেন।

১। পাণিনি। কৃষ্ণচরিতের পুঁথিতে পাণিনির নাম প্রথম মুনিকবি হিসাবে বলা নাই। তবে সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বররুচি, ব্যাড়ি ও পতঞ্জলির নাম একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, মনে হয়, প্রসিদ্ধতম বৈয়াকরণ পাণিনিই প্রথম মুনিকবি হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের প্রণতিভাজন হয়েছিলেন। বাল্মীকির নামও এ প্রসঙ্গে থাকতে পারত; তবে রচনার প্রকার ও প্রসঙ্গের ক্রম দেখে মনে হয়, পাণিনির নামই সমুদ্রগুপ্ত ক'রে গেছেন। রাজশেখর সূক্তিমুক্তাবলীতে বলেছেন—পাণিনি জাম্ববতী নামক কাব্য রচনা করেছিলেন; রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের ব্যাখ্যায় [৪] নমি সাধু পাণিনির পাতালবিজয় নামক কাব্যেরও উল্লেখ করেছেন। পুরুষোত্তম তাঁর ভাষাবৃত্তি এবং শরণদেব স্বকৃত দুর্ঘটবৃত্তিতে পাণিনিকৃত জাম্ববতীজয় নামক কাব্যের উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভবতঃ, পাতালবিজয় ও জাম্ববতীজয় একই গ্রন্থ।[৫] রায়মুকুট অমরকোষ-ব্যাখ্যায় পাণিনিকৃত একটা পদ্যাংশ উদ্ধৃত করে তা'তে অশুদ্ধি প্রদর্শন করেছেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে পাণিনিকৃত আটটি এবং শার্ঙ্গধরের দুটি কবিতা উদ্ধৃত আছে। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর সুবৃত্ততিলকে পাণিনির উপজাতি ছন্দে বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। ভোজকৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণের কৃষ্ণলীলাশুক-কৃত টীকায় পাণিনির অনেক কবিতা উদ্ধৃত আছে। এ সব প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, পাণিনি কেবল বৈয়াকরণ ছিলেন না, কবিও ছিলেন। এবং তাঁর কবিতাও সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিল।

২। শাঙ্খায়ন। শাঙ্খায়ন নামক কবি এবং তৎকৃত "কণ্ঠাভরণ" গ্রন্থের নাম বর্ত্তমান পুঁথি থেকেই সর্ব্বপ্রথম জানা যায়।[৬]

৩। কাত্যায়ন বররুচি[৭]। সমুদ্রগুপ্ত বিরচিত কবিতাদ্বয় থেকে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, বার্তিককার বররুচি ও কবি বররুচি উভয়ে একই ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি 'স্বর্গারোহণ' নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। সূক্তি-মুক্তাবলীধৃত রাজশেখরের উক্তি থেকে কবির গ্রন্থের নাম 'কণ্ঠাভরণ' বলেই ভ্রম হয়। কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকের আবিষ্কারের পর ইহাই সাব্যস্ত করিতে হয় যে, 'কণ্ঠাভরণ' পদটি বিশেষণ মাত্র; সদারোহণ-প্রিয় পদের 'আরোহণে'র সঙ্গেই মূল-গ্রন্থের বাস্তব সম্পর্ক। পাতঞ্জল মহাভাষ্যের ৪।৩।১০১ সূত্রে "বাররুচং কাব্যম্"এর বিষয়ে উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গধর, সুভাষিতাবলী, সদুক্তি-কর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও বররুচি-কৃত পদ্য উদ্ধৃত আছে এবং মহাবৈয়াকরণ বার্তিককারই "স্বর্গারোহণ" কাব্যও রচনা করেছিলেন, সমুদ্রগুপ্ত-কৃত কৃষ্ণচরিত থেকে এ অভিনব বিষয় জেনে হৃদয় স্বতঃই আনন্দবিপ্লুত হয়। পুনরায় এও জানা যায় যে, বররুচি ব্যাকরণের জ্ঞান বিবৃদ্ধির জন্যই এ গ্রন্থ তৈরি করেছিলেন। ফলতঃ, বররুচিই ভট্টিকাব্যের রচয়িতার পথপ্রদর্শক, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সাহিত্যরসিকদের কাছে এ সংবাদও অভিনব।[৮]

৪। ব্যাড়ি। ব্যাড়ি পতঞ্জলি মহাভাষ্যকে আশ্রয় ক'রে তদ্ব্যাখ্যামূলক লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ তৈরি করেছিলেন। এ ব্যাড়িই যে 'বলচরিত' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার একমাত্র প্রমাণ বর্ত্তমান গ্রন্থ।[৯] ব্যাড়িকে সমুদ্রগুপ্ত 'রসাচার্য্য' বলেছিলেন। রসাচার্য্য হিসাবে ব্যাড়ির নাম বাগ্‌ভটও রসরত্ন-সমুচ্চয়ে উল্লেখ করেছেন। বলচরিতে, খুব সম্ভবতঃ, বলদেবের চরিত্র বর্ণিত হয়েছিল। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের উক্তি থেকে এও প্রমাণিত হয় যে,

---

৩। প্রাভাবয়চ্চ মাং কর্তুং কৃষ্ণস্য চরিতং শুভম্। ৪। ২.৮

৫। পাতালে গিয়ে স্যমন্তক লাভের পর কৃষ্ণ জাম্ববতীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

৬। শাঙ্খায়নায় কবয়ে নমোঽস্তু কণ্ঠাভরণ-কর্ত্রে
কাব্যং যস্য রসাঢ্যং কণ্ঠাভরণং সদা বিদুষাম্।

৭। যঃ স্বর্গারোহণং কৃত্বা স্বর্গমানীতবান্ ভুবি। কাব্যেন রুচিরেণৈব খ্যাতো বররুচিঃ কবিঃ।

৮। ন কেবলং ব্যাকরণং পুপোষ
দাক্ষীসুতস্যেরিত-বার্তিকৈর্যঃ।
কাব্যেঽপি ভূয়োঽনুচকার তং বৈ
কাত্যায়নোঽসৌ কবিকর্মদক্ষঃ।

৯। রসাচার্যঃ কবির্ব্যাড়িঃ শব্দ-ব্রহ্মৈক-বাঙ্‌মুনিঃ।
দাক্ষীপুত্র-বচোব্যাখ্যা-পটুর্মীমাংসকাগ্রণীঃ। ৩। ১,৩।

ব্যাড়িকৃত বলচরিতই অধুনা-প্রচলিত মহাকাব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।

৫। দেবল। দেবল নামক কবি ও তৎকৃত 'ইন্দ্র-বিজয়' নামক কাব্যের বিষয় সর্বপ্রথম মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের গ্রন্থ থেকেই জানতে পারি।[১০]

৬। পতঞ্জলি। সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত ভাষ্যকার পতঞ্জলি, চরক সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা পতঞ্জলি এবং যোগদর্শনের ব্যাখ্যানমূলক 'যোগদর্শন' নামক কাব্যের রচয়িতা পতঞ্জলিকে এক বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—এ 'যোগদর্শন' নামক কাব্য গ্রন্থ পৃথিবী থেকে চির-তরে লুপ্ত হয়ে গেছে। পতঞ্জলি বিষয়ক গবেষণায় বিভিন্ন পতঞ্জলির এক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়; তার নিরাকরণার্থে সমুদ্রগুপ্তের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান্। এবং এ সাক্ষ্য "যোগেন চিত্তস্য" প্রভৃতি কবিতাধৃত পতঞ্জলির এক ব্যক্তিত্ব [১১] সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

৭। ভাস। মহাকবি ভাস-সম্বন্ধেও এ গ্রন্থে অনেক অজ্ঞাত মহামূল্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এ পর্য্যন্ত ভাসের ত্রয়োদশ নাটক ত্রিবেণ্ড্রাম, এবং সম্প্রতি যজ্ঞফল নামক গ্রন্থ পশ্চিম-ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং আমরা ভাসকৃত এ চতুর্দশ গ্রন্থ সম্বন্ধেই জানবার সুযোগ লাভ করেছি। তা ছাড়া ভাসকৃত কতিপয় কবিতা কোষকাব্য-সমূহে দৃষ্ট হয়, যা এ চতুর্দশ গ্রন্থে নাই কিন্তু ভাসের প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্রাট্ কবি বল্‌ছেন যে ভাস মহাকাব্য, বিশটি নাটক ও অনেক অঙ্ক রচনা করেছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে ভাসকৃত কোনও মহাকাব্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সংস্কৃত-সাহিত্য-বিদ্‌দের কিছুই জানা নাই। সুতরাং সমুদ্রগুপ্ত লিখিত এ তথ্য অমূল্য। গণপতি শাস্ত্রি-প্রকাশিত ভাস-কৃতির মধ্যে কয়েকটি অঙ্ক আছে বটে; কিন্তু সেগুলিকে 'অঙ্ক' হিসাবে বিবেচনা করলে ভাসকৃত বিংশতি নাটকের মধ্যে বেশীর ভাগই আমাদের অপরিজ্ঞাত থেকে যায়। অন্যান্য সব সাহিত্য-মহারথীদের মত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত বাসবদত্তার অত্যুচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং ফলতঃ, ভাসকে তিনি অতুলনীয় কবি বলে ঘোষণা করেছেন। এবং রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন করেই ভাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন —এও তিনি বল্লেছেন। তবে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা ব্যতিরিক্ত বিষয়ান্তর অবলম্বনে রচিত যে-সব গ্রন্থ[১২] ভাসের নামে চল্‌ছে, সে-সব সত্যি ভাসকৃত কিনা, সে বিষয়ে এতে প্রশ্ন উঠে। এঁর নাটক নির্ম্মাণ-পদ্ধতিই যে অন্যান্য কবিরা মেনে নিয়েছেন সে-কথা সম্রাট্ স্পষ্টই বল্‌ছেন। সুতরাং ১৬০০ বছর আগেও 'ভাস'কেই আদি নাট্যকার হিসাবে মেনে নেওয়া হ'ত, এ স্বীকৃতব্য। এবং কবি ভাস যে পাণিনিকে মেনে চল্‌তেন না, সম্রাট্ তাও বলেছেন।[১৩] সম্রাট-কবি ভাস সম্পর্কে পুনরায় বলেছেন যে তিনি স্বকীয় বাক্যের রসের দ্বারা এমন কি অগ্নিকেও শান্ত করেছিলেন। এ কথা রাজশেখরাদি কবিও উল্লেখ করেছেন। বাক্‌পতিরাজও ভাসকে জলনমিত্র বলে অভিহিত করেছেন।[১৪]

৮। বর্ধমান। এ পর্য্যন্ত আমাদের বর্ধমান নামক কোনও কবির বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু সমুদ্র-গুপ্তের মুনি-কবি-বর্ণন থেকে জানা যায় যে বর্ধমান নামক কবি 'ভীমজয়' নামক গ্রন্থ রচনা ক'রে সুধীজনের প্রগাঢ় আনন্দবর্ধনে সহায়তা করেন।

৯। চীনদেব। কবি সমুদ্রগুপ্ত কৃষ্ণচরিতে বলেছেন এ কবি আর্য্যাবর্তসম্ভূত নন; এবং ইঁহার নাম থেকে বোঝা যায়—ইনি চীনদেশীয়। ফাহিয়েনাদির মত ইনিও বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন নিশ্চয়। স্বকীয় অনুরক্তি হেতু ইনি বুদ্ধচরিত যে কেবল মাগধী ভাষায় রচনা করেছিলেন, তা নয়, ইনি সংস্কৃত ভাষাতেও বুদ্ধচরিত রচনা করেছিলেন। এ মহামতি অত্যন্ত যশোভাজন হয়েছিলেন—সমুদ্রগুপ্ত বলে গেছেন।[১৫] একই চীনদেশীয় ব্যক্তি ভারতীয় দুইটি ভাষায় এত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে তিনি তাতে গ্রন্থ পর্যন্ত রচনা ক'রে গেছেন—এ থেকে প্রাচীন ভারতের প্রতি চীনদেশীয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সম্যক প্রকটিত হয়। সমুদ্রগুপ্ত নিজেই রাজকবি প্রসঙ্গে অশ্বঘোষ ও তৎকৃত বুদ্ধ-চরিতের

১০। সুযশা অভবদ্‌ভূমৌ বৃহস্পতিসমঃ কবিঃ। যৎকাব্যমিন্দ্র-বিজয়ং ভাসতে দেবলোঽস্ত্যজঃ।

১১। যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।

১২। অবিমারক, চারুদত্ত, প্রতিজ্ঞ-যৌগন্ধরায়ণ, বৃহৎকথা এবং বাল-চরিত পুরাণ অবলম্বনে রচিত। বাসবত্তা ও বৃহৎ-কথা অবলম্বনে রচিত; তবে ইহা যে ভাসকৃত, তা সমুদ্রগুপ্ত বলেছেন।

১৩। রূপক-ক্রমমস্তৈব কবয়োঽন্বযযুর্বুধাঃ। অয়ং চ নান্বয়াৎ পূর্বং দাক্ষীপুত্র-পদক্রমম্।

১৪। ভাসম্মি জলণমিত্তে কন্তোদেবে অ জস্ম রহুআরে। সো বন্ধবে অ বন্ধম্মি হারীঅন্দে অ আণন্দো। (গউড়বহো)।

১৫। বাহোঽপাহো ইহাগত্য কবিসম্মানমাপ্তবান্। অকরোদ্ বুদ্ধ-
চরিতং মাগধ্যামৃষিবাচ্যাপি।
পীযূষলিপ্তবচনশ্চীনদেবো ব্রতী কবিঃ। যশঃ শরীরেণ সদা
জীবত্যেব মহামতিঃ।

নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং অশ্বঘোষের সঙ্গে চীনদেবের কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে—এ সম্ভবপর নয়।

এ চীনদেব শিখরিণী ছন্দে এক শত শ্লোকে সূর্যস্তবও তৈরি করেছিলেন। তিনি মগধে অবস্থানকালে সূর্যো-পাসক ছিলেন এবং অশেষ যশ অর্জন করেন।

বলা বাহুল্য, এ কবি সম্বন্ধেও আমরা কোনও গ্রন্থ থেকে কিছুই জান্তে পারি না।

১০। মিহিরদেব। মিহিরদেব জাতিতে পার্সী ছিলেন; তা হ'লেও তিনি সংস্কৃত ভাষায় চিত্তবিনোদন 'আনন্দ-মন্দির' রচনা করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, এ কবি বা তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আজ আমাদের কিছুই জানা নেই।

উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে সমুদ্রগুপ্তরচিত কৃষ্ণচরিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে কত মূল্যবান্ গ্রন্থ, তা সহজে বোঝা যায়। এ সামান্য আড়াইটি পৃষ্ঠা থেকে কত অজ্ঞাতনামা কবি ও তাঁদের গ্রন্থের নাম এবং খ্যাতনামা কবিদেরও কত অজ্ঞাত গ্রন্থের নাম ও বিবরণ আমরা জানতে পাই। কৃষ্ণরচিত ও কৃষ্ণচরিতোক্ত গ্রন্থাবলীর মত কত শত শত অমূল্য গ্রন্থ যে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে—তার ইয়ত্তা নাই। কোথায় চীনদেশীয়, কোথায় পারস্যদেশীয় ও অন্যান্য দেশোদ্ভূত কত মহাজন এ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার কত পরিপুষ্টিই না সাধন করেছেন! সমগ্র বিশ্ববাসীর পুঞ্জীভূত সাধনার ধন এ সংস্কৃত সাহিত্য—অবর্ণনীয় ইহার মাহাত্ম্য, অননুমেয় ইহার দিগন্তব্যাপী প্রসার, অপরিসীম ইহার হ্লাদিনী শক্তি—সমুদ্রগুপ্তের স্বল্পসংখ্যক লুপ্তাবশিষ্ট কবিতা থেকে বারংবার এ কথাই মনে হয়।

আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থান হয়েছে কেবল চিত্রকলায়। ভাস্কর্য্য-শিল্প এখনও ঠিক যেন বাড়তে পায় নি। অবশ্য তার নানান্ কারণও আছে। বড় বাড়ী তৈরি করতে গেলে যেমন তার ভিৎ খুঁড়তে হয় এবং শক্ত ক'রে ইট-পাথর দিয়ে গাঁথুনি সুরু করতে হয়, তেমনি ভারতীয় চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বেশ শক্ত ক'রেই ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভিত্তিপত্তন করেছেন এবং তা বেশ ভাল ভাবেই বেড়ে উঠে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মূর্ত্তি-জগৎ ঠিক সে যত্ন পায় নি।

ভাস্কর্য্য-শিল্পে কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, মূর্ত্তিতে সাধারণতঃ রং থাকে না, আকার ও আয়তনের ব্যাপার লোকে সহজে বোঝে না। দ্বিতীয়তঃ, মূর্ত্তি গড়তে শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকা দরকার প্রচুর পরিমাণে। দুটো তুলির আঁচড়ে ছবি আঁকা হয়; মূর্ত্তি গড়তে গেলে চাই অসম্ভব ধৈর্য্য—দুটো আঁচড়ে কিছুই হয় না; মূর্ত্তি গড়তে সময়ও চাই প্রচুর! তৃতীয়তঃ, মাটি কিংবা চূণ সিমেণ্টে মূর্ত্তি গড়তেও পরিশ্রম করতে হয় যদিও পাথর কিংবা কাঠের মূর্ত্তি কোঁদার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। মোটের ওপর মূর্ত্তি গড়তে গেলে শিল্পীকে একাধারে হতে হবে শিল্পপ্রাণ ও শক্তিমান্।

ভারতবর্ষে আজকাল যাঁরা মূর্ত্তি গড়ে নাম করেছেন তাঁরা বেশীর ভাগই রাজারাজড়ার মূর্ত্তি, বড়লোকের চেহারার প্রতিকৃতি হুবহু মিলিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। তা ছাড়া উপায়ও নেই। অর্থ উপার্জ্জনের দিকটা দেখতে গেলে ঐ পথটাই খোলা আছে মূর্ত্তি-জগতে। 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান' ক'টা লোকে পারে? মন থেকে ভারতীয় পদ্ধতিতে গড়া মূর্ত্তির ক্রমবিকাশ ঠিক এখনও হ'তে পারে নি এই কারণেই—চাহিদা নাই, এবং শিল্পীদের শক্তি থাকলেও সামর্থ্য নেই বলা বাহুল্য!

১৯২৫ কি ১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে মূর্ত্তি গড়ার কাজ আরম্ভ হয়। তারও পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দেবল মূর্ত্তি গড়তেন শান্তিনিকেতনে সে কথা শুনেছিলুম। কলকাতায় ওরি-য়েণ্টাল সোসাইটিতে গিরিধারী মহাপাত্র (উড়িষ্যার ভাস্কর) পাথরে কাজ করতেন দেখেছিলুম। কিন্তু শান্তিনিকেতনে মূর্ত্তির কাজ কাদামাটি দিয়েই সাধারণতঃ সুরু হয়। ১৯২৬ সালে তিন-চার জন ছাত্র মূর্ত্তি গড়তে থাকেন। তার মধ্যে শিল্পী রামকিঙ্কর এক জন। কবি-শিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী সত্যেন বিশী, মান্দ্রাজবাসী রাজু নামে একজন শিল্পীও কাজ করতেন মাঝে মাঝে। এই সময় এই প্রবন্ধের লেখকও মূর্ত্তি গড়ার কাজে হাত দেন। শ্রীরুদ্র হাঞ্জীও দু-তিন বছর পরে মূর্ত্তি গড়তে সুরু করেন। এই সময় কলকাতা থেকে প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ

রায়চৌধুরী এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। মাষ্টার-মশায়ের (শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুর) বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। শুনেছিলুম তিনি শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাছে মূর্ত্তি গড়ার গোড়াপত্তন করেন। ওস্তাদ নামে একজন অতি বৃদ্ধ ছিল সেই সময়—তাকে প্রায়ই কলাভবনের ছাত্রেরা 'মডেল' করত, তাকে ধ'রে আনা হ'ল—এক তাল মাটি তৈরি ক'রে রাখা হয়েছিল। দেবীপ্রসাদবাবু চেহারা মিলিয়ে মূর্ত্তি গড়বার কসরৎ দেখিয়েছিলেন মনে আছে। আমরা অনেকেই ছিলুম সেখানে। এই সময় দু-তিন জন বিদেশী ভাস্কর শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁদের মধ্যে



"নটীর পূজা"



"নটীর পূজা" (পশ্চাৎ)

—শ্রীনন্দলাল বসু

Miss von Pott ও Mrs. Millward উল্লেখযোগ্য। মিস পট্ ছোটখাট মূর্ত্তি মন থেকে গড়তেন—পুড়িয়েও নিতেন সুবিধে মত। মিস মিলওয়ার্ড চেহারা মিলিয়ে লোকেদের মূর্ত্তি গড়তেন। উনি গুরুদেবেরও মূর্ত্তি গড়েছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সেই সময় আসেন কিছু দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে এবং দিনু বাবুর (৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) মূর্ত্তি গড়েন। মাষ্টারমশায় মূর্ত্তির কাজে ছাত্রদের খুব উৎসাহ দিতেন ও নিজেও সময়-মত মূর্ত্তি গড়তেন। ঠান্‌দি (শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনের পত্নী) সেই সময় ছোটখাট পুতুল গড়ে প্রায়ই কলাভবনে মাষ্টারমশায়ের কাছে নিয়ে আসতেন। মাষ্টারমশায় সেই সব পুতুলের ওপর কাজ ক'রে দেখাতেন। এই সময় বেশ একটা মাটির কাজের ওপর ঝোঁক পড়েছিল এবং সবচেয়ে বেশী ঝোঁকটা ছিল শিল্পী রামকিঙ্করের।



মৎস্য-দম্পতি: শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাস্কর্য্য-শিল্পের যুক্তিযুক্ত পুনরুত্থানের সূচনা শান্তিনিকেতনে দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই। শান্তিনিকেতনের কলাভবন একটি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পকেন্দ্র। ভাস্কর্য্য-

শিল্পের পুনরুত্থানে রামকিঙ্করের পরিশ্রম সার্থক হবে সন্দেহ নেই।

আমি যখন ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতন থেকে বার হয়ে মাদ্রাজে যাই, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তখন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে সেখানে ছিলেন। ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্ত্তিটা তিনি সেই সময় গড়ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে ইনি মূর্ত্তি গড়ে যথেষ্ট নাম করেছেন।

সিংহল ও মাদ্রাজ অঞ্চলে পুরাতন পদ্ধতিতে এখনও কেউ কেউ গড়েন। অষ্টধাতুতে ছাঁচে ক'রে ঢালাইও করেন কেউ কেউ, কিন্তু সে-সব কাজ আগেকার মত অত উঁচুদরের নয়। তিরুপতিতে কাঠের মূর্ত্তির চল খুব আছে। দেব-



মূর্ত্তি-গঠন-রত লেখক

দেবীর মূর্ত্তি কাঠে কুঁদে কারিগররা তীর্থযাত্রীদের কাছে বিক্রী ক'রে পয়সা উপার্জ্জন করে। অল্প দামে অত নিখুঁৎ কাজ অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা জানি না।

শিল্পীবন্ধু রামকিঙ্কর ও প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি এক ছুটিতে রাজপুতানা ভ্রমণে বার হই। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরী তখন জয়পুরের আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। আর্ট স্কুলে গোলাপচাঁদ বলে একজন



মূর্ত্তিনির্ম্মাণরত শ্রীরুদ্র হাঞ্জী, নাসিক

মার্ব্বল পাথর-কোঁদার কাজে ছিলেন। জীবজন্তুর মূর্ত্তি তাঁর হাতে ভালই হয়। কিন্তু সে-সব কাজকে খুব উঁচুদরের ভাস্কর্য্য বলে গণ্য করা যায় না। জয়পুরে মালীরাম বলে



মা: শ্রীপ্রভাস সেন



কুন্তীর আখড়ায় : শ্রীপ্রভাস সেন

প্রদেশে ভাস্কর্য্যে অনেক দিন থেকেই অনেকেই না করেছেন। ফড়কে, মাহ্ত্রে, কর্ম্মকার প্রভৃতির নাম ভাস্ক হিসাবে সবাই শুনেছেন। তাঁদের কাজের ছবিও ব কাগজে বার হয়েছে। বোম্বাই প্রদেশে বেড়াবার সময় সেই সব কাজের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়। চেহারা হুবহু নকল করাটাই যদি মূর্ত্তিকারদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয় তবে এঁরা সফল ভাস্করই বলতে হবে। তবে বার বার একই কথা মনে জাগে যে এঁরা সব যে-পথে চলেছেন তাকে ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্য-শিল্পের পুনরুত্থান বলা চলে না। মনে হয় এসব ভাস্কর নঙ্গর-ছেঁড়া বড় বড় নৌকা—লক্ষ্য হারিয়ে বেপরোয়া হয়ে হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলেছে।

বিলাতে ভারতীয় ভাস্কর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র বসু ষ্টুডিও ক'রে কাজ চালিয়েছিলেন। খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। কি ক'রে যে তাঁর চলত তাও অনেকেই জানেন। বহু কষ্টে অর্ডার পেতেন। কেউ বড়লোক মারা গেলে সাড়া পড়ে যেত। কবরের ওপর decorative design বা অর্ডারি মূর্ত্তি ইত্যাদি করেই তাঁর দিন কাটত! ফণীবাবু দেশেও এসেছিলেন একবার। 'প্রবাসী'তে তাঁর

একজন বিখ্যাত মূর্ত্তিকারের কারখানা আছে। তিনি মূর্ত্তির কাজ ক'রে যথেষ্ট নাম করেছেন। কলকাতায়ও তিনি মূর্ত্তিগড়ার কাজ করতে গিয়েছিলেন। 'মডার্ন রিভিয়ু'তে বহুকাল আগে তাঁর কাজের সুখ্যাতি ও নমুনার ছবি বার হয়েছে। জয়পুরে হিরণ্ময় বাবু তাঁর ষ্টুডিও ঠিকমত তৈরি করে কাজ আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে চলে আসেন। এখন শুনতে পাই লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে মূর্ত্তি গড়ার ও কোঁদার কাজ ভালই হয়। শ্রীধর মহাপাত্র সেখানে পাথরে মূর্ত্তি কোঁদার কাজ ক'রে থাকেন। লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার হালদারও মাঝে মাঝে মূর্ত্তি গড়ে থাকেন। ছোট ছোট পুতুল মাটিতে নিখুঁত ভাবে তৈরিও লক্ষ্ণৌয়ে হয়। শিল্প-জগতে তারও একটা স্থান আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, খুব উঁচুদরের শিল্পী একাজে হাত না দিলে ভাল ফল পাওয়া মুশকিল।

১৯৩৩ সালে আমি বোম্বাই শহরে মাহ্ত্রে সাহেবের ষ্টুডিওতে কিছু কাল পাথর কাটার কাজ করি। তাঁর মার্ব্বল পাথর কোঁদার ষ্টুডিওতে কেবল যাবার অনুমতি ছিল। অন্য আর এক জায়গায় ব্রোঞ্জে ঢালাই কাজ হ'ত কিন্তু সেখানে যাবার তাঁর অনুমতি ছিল না। বোম্বাই



গাঙ্গুলী মশায় : শ্রীরামকিঙ্কর

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর কাজের ছবিও কিছু বার হয়েছে। বরোদার মহারাজা তাঁর কিছু কাজ কেনেন। 'সাপুড়ে', 'মন্দিরের পথে', 'সাধু' ইত্যাদি মূর্ত্তিগুলো বরোদা মিউজিয়মে বা প্যালেসে রাখা আছে। মূর্ত্তিগুলো ভালই তবে ঐ একই কথা মনে হয়, এও যেন সব নঙ্গর-ছেঁড়া নৌকার মত। ভারতীয় পুরাতন ভাস্কর্য্য-শিল্পের সঙ্গে এগুলির এতটুকুও যোগ নেই। ফণীবাবু অল্প বয়সেই বিলাত যান ও সেখানেই তাঁর শিল্প শিক্ষা হয়। যা-কিছু গড়েছেন তা বিলাতী পদ্ধতিতেই! প্রৌঢ়ত্বে পা দেবার আগেই তিনি মারা যান। ভারতীয় শিল্পীদের শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়ার একটা নেশা আছে। চাকুরী পাবার সুবিধাই হয়ত তার প্রধান কারণ। ভারতীয় শিল্পীদের গোড়া-পত্তন এবং শিল্পশিক্ষা যদি ভারতবর্ষেই না হয় তবে তাদের ভারতীয় শিল্পের আদর্শ হারানো কিছু আশ্চর্য্যের নয়।

• ভারতবর্ষে নানা জায়গায় মূর্ত্তিকারেরা মূর্ত্তি গড়ছেন কেউ পেটের তাড়নায়, কেউ বা খেয়ালের তাড়নায়। তাঁদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়। যত বড় ক্ষমতাশালী শিল্পীই হোন না কেন, ভাস্কর্য্য-শিল্পের প্রকৃত পুনরুত্থান পেটের তাড়নায় বা খেয়ালের তাড়নায় কখনও সম্ভব হবে না। ব্যক্তিত্বের বিশেষত্বপূর্ণ মূর্ত্তি গড়া হয়ত সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু তাকেও ভারতীয় ভাস্কর্য্য বলা চলবে না। শান্তিনিকেতনে শিল্পকলা যে-রকম ভাবে সমগ্র আশ্রমের লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ও করছে এ রকমটি ভারতবর্ষের আর কোনো জায়গাতেই দেখা যায় না। দেওয়ালের গায়—শিশুবিভাগ থেকে আরম্ভ করে বড় বড় পণ্ডিতদের পড়বার ঘরের দেওয়ালের ছবি—পান্থনিবাস, হাসপাতাল, স্কুলের কৃষি-বিভাগও বঞ্চিত হয় নি। রামকিঙ্কর-বাবুর গড়া বড় বড় সিমেন্টের মূর্ত্তিগুলো এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর ও ছাত্রদের গড়া আরও বহু মূর্ত্তিতে শান্তিনিকেতন ভরে উঠবে তাতেও সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক ভারতীয় কৃষ্টির হাওয়া শান্তি-



গ্রামের পথে : লেখক

নিকেতনে বর্ত্তমান, ভারতীয় ভাস্কর্য্যের পুনরুত্থান এই স্বাভাবিক ভারতীয় কৃষ্টির আবহাওয়ার মধ্যেই সম্ভব। কোন সরকারী আর্ট স্কুল বা অন্য কোথাও হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

সম্প্রতি কলাভবন থেকে যাঁরা বার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমান্ প্রভাস সেন ও শ্রীশম্ভও ভাস্কর্য্যে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। ভবিষ্যতে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা ভাস্কর্য্য-শিল্পে আরও বেশী মন দেবেন আশা করা যেতে পারে।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২

অষ্টবন্ধনে মেয়ে-জামাই আসিলে যোগমায়া নূতন করিয়া মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিলেন। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ কয়টি বৎসরে যোগমায়া পুরা গৃহিণীতে পরিণত হইয়াছেন। পুত্রকন্যার সম্মুখেই মাথায় কাপড়টা মাত্র দিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলেন, বাদানুবাদও চলে। আজ নূতন একটি প্রাণীকে লইয়া—পুরাতন হইয়াও যোগমায়া পুনরায় নূতন হইলেন। শুধুই ঘোমটা টানিলেন না, গলার স্বরটিও কোমল করিলেন, মন্থর হইল পায়ের গতি।

রামচন্দ্র অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া বার কয়েক হাসিয়া এক অবসর সময়ে চাপা গলায় বলিলেন, বেশ লাগছে মায়া তোমার এই নতুন হওয়া। কি করব বল, অনেকগুলো চুল আমার হঠাৎই পেকে গেল—নইলে—

—মেয়ে-জামাই রয়েছে না ওঘরে? চাপা ভর্ৎসনায় যোগমায়া স্বামীকে শাসন করিলেন।

রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হায় রে সেকাল!

যোগমায়া হাসিয়া ফেলিলেন, সেকালের অপরাধ?

—অপরাধ অনেক। দিনের বেলায় তোমার দর্শন পাওয়া ছিল অনেকটা কঠোর তপস্যার শেষে বরলাভের মত। আর একালেও মেয়ে-জামাইয়ের ভয়ে দিনের বেলায় দুটো সুখ-দুঃখের কথাও কইতে পারি নে। কপালটাই আমার মন্দ!

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তাই বলে ওদের সামনে—

—না না, আমাদের লজ্জাটাই চিরকাল বাঁচিয়ে এসেছি—চিরকালই বাঁচাতে হবে। ওরা তো লজ্জার ধার ঘেঁষেও গেল না।

যোগমায়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, তা যাই বল বাপু, একালের মেয়েছেলেরা সব বেহায়া। দেখলে না, গৌরী শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় যখন প্রণাম করতে এল—গাঁটছড়া বাঁধা জামাইটিকে পর্য্যন্ত হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল। আমার সামনে কত কথাই বললে।

রামচন্দ্র বলিলেন, তোমার কি মনে হ'ল?

—ভারি লজ্জা করতে লাগল। এক রাত্তিরে বিয়ে হয়ে যেন কতকালের জানাশোনা ওদের।

—জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন—এ কি যে সে কথা!

—যাও—রাগিয়ো না। অমন বেহায়াপনা—

রামচন্দ্র বলিলেন, কালের যা গতি—কেউ হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারে? বিমলের যখন বউ আসবে—

—হাঁ, ভাল ক'রে না দেখে শুনে যে-সে ঘর থেকে বউ আনছি কিনা!

—ছেলে যদি লভে পড়ে বিয়ে করে? যোগমায়াকে অ[বাক] হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া রামচন্দ্র হাসিলেন, লভে ম[ানে] ওদের ভালবাসা হয়ে যদি বিয়ে হয়?

যোগমায়া বলিলেন, বিয়ে হ'লেই ত ভালবাসা হবে।

—না না, সে হ'ত আমাদের কালে। এখন বিয়ের অ[াগে] ভালবাসা।

—পোড়া কপাল। মুখ ফিরাইলেন যোগমায়া। মুখে কয়েক রেখা ফুটিল, বলিলেন, তাহলে ঘোর কলিকাল বল।

—কলিকালই ত। আমারও মাঝে মাঝে লোভ হয় ম[ায়া] এই কলিকালের মানুষ হতে।

—তা হ'লেই ত পার।

—কৈ আর পারি। যে সত্যযুগের বাঁধনে বেঁধে রেখেছ।

—কেন, খুলে দিচ্ছি বাঁধন—ভালবাসা করে বিয়ে করগে।

—গালের চামড়া থল থল করছে—মাথার চুল সাদা হ[য়ে] আসছে।

—তা হোক। আশী বছুরে বুড়ো যদি বিয়ে করতে পারে—

—তুমি রাগ করলে মায়া? দু'হাত দিয়া যোগমায়ার ঘ[াড়] ঘুরাইয়া রামচন্দ্র হাসিলেন।

—করলামই ত রাগ। আমার ত মনে হয়, আমাদের কা[ল] ছিল ভাল। ছিল কি না?

সজোরে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া রামচন্দ্র বলিলেন, নিশ্চয়-নিশ্চয়।

যোগমায়া বলিলেন, ঠাট্টা রাখ। আজ সকাল সক[াল] বাজারে গিয়ে ভাল মাছটাছ নিয়ে এস। আর দেখ—শান্তিপু[রে] ভাল জরিপাড় ধুতি এক জোড়া আনবে।

—প্রণামীর অনেক টাকা পেয়েছ বুঝি?

—সে টাকা বুঝি খেয়ে বসে থাকব? টাকা বাড়িয়ে দি[তে] হবে না?

—বটে! দেনা-পাওনার জের এখনও চলবে?

—যাও দেখি বাজারে।—রামচন্দ্র চলিয়া গেলে যোগমায়া রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে গৌরী আসিয়া সেখা[নে] দাঁড়াইল।

—কিরে গৌরী, কিছু বলবি?

গৌরী মুখখানি একটু নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, আজ রান্না করছ, মা?

—কি আর! গ্রীষ্মকালে কি ভাল তরিতরকারি পাওয়া যায়। খালি পটোল। ওঁকে বললাম—ভাল দেখে মাছ আনতে—

গৌরী বলিল, ওদের বাড়ি খাবার যা হাঙ্গামা দেখে এলাম—তাই জিজ্ঞাসা করছি।

কি হাঙ্গামা রে? যোগমায়া সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন। যদি জামাইয়ের কিছু অসুবিধে হয় ত—না হয় বল।

অসুবিধে কি জান? বলিয়া গৌরী একখানি পিঁড়ি টানিয়া মায়ের কাছ ঘেঁষিয়া বসিল ও কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, ওঁদের কাণ্ডই হ'ল আলাদা; মাংস, পেঁয়াজ সব এলাহি কাণ্ড। শ্বশুরের রোজ মাংস না হ'লে খাওয়াই হয় না। তাই কি যা-তা রান্না! সত্যিকারের এই এত পেঁয়াজ দিয়ে রান্না।—দুই করতল একত্র করিয়া পিঁয়াজের পরিমাণ দেখাইয়া গৌরী মাকে বিস্মিত করিয়া দিল।

যোগমায়া বলিলেন, আমাদের ত পেঁয়াজের হাঁড়ি নেই মা। বাসায় যা হয়েছে—হয়েছে। শাশুড়ী থাকতে এ বাড়িতে পেঁয়াজের পাট ত ছিলই না, আমি মন্তর নেবার পর থেকেও—

গৌরী বলিল, তা তুমি যদি বল—উঠোনে ইঁটের উনুন পেতে আলাদা হাঁড়িতে আমি না হয় রেঁধে দিতে পারি।

তুই রাঁধবি? নারে, আমিই না হয়—এ দিকের রান্না সেরে—কাপড় ছেড়ে করে দেব'খন। একটু ভাবিয়া বলিলেন, কিন্তু অনেক দিন রাঁধি নি, হয়ত—

আমি দেখিয়ে দেব'খন। আর দেখ মা খানকতক আলু ভাজা কর। ওরা তরকারি বড় একটা খায় না—ঐ ভাজাভুজি দিয়েই—

আচ্ছা—আচ্ছা। অপার বিস্ময়কে দমন করিয়া যোগমায়া ডালের কড়াইয়ে কাঁটা চালাইতে লাগিলেন। কাঁটা দেওয়া শেষ হইলে কহিলেন, হাঁরে গৌরী, তোরও তা হলে এ ক'দিন ভাল খাওয়া হয় নি বল?

গৌরী হাসিয়া কহিল, তা কেন! একদিন কেমন গন্ধ লাগল। তারপর দিন সব ঠিক হয়ে গেছে। পেঁয়াজ খেতে ত বেশ মিষ্টিই মা।

তা ঠিক। অত্যন্ত সন্তর্পণে যোগমায়া নিশ্বাস ফেলিয়া ডালে সম্বরা দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৌরী বলিতে লাগিল, ওদের বাড়ির সব ধরণ-ধারণই আলাদা, মা। শ্বশুর আবার টেবিলে বসে কাঁটা চামচে দিয়ে খান। উনিও বলেন, হাতে কত ময়লা লেগে থাকে—কাঁটা চামচেয় খেলে অসুখ করে না।

—বলিস কি? সাহেব বল।

—সায়েব না হাতি। সায়েবরা সন্দেশ খায়? সায়েবরা মুড়ি ফুটকড়াই ভাজা খায়? না আমের অম্বল ভালবাসে?

—কি জানি মা। একটু থামিয়া সশঙ্কিত স্বরে বলেন, তোর সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন ত?

গৌরী হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল।

আমি নাকি মেম—তাই ইংরেজীতে কথা বলব? তবে জুতো পরে বেড়ালে শ্বশুর খুশী হন।

হুঁ। গম্ভীর মুখে যোগমায়া পটোল ভাজিতে লাগিলেন।

গৌরী অনর্গল গল্প করিতে লাগিল, যোগমায়া 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ কালের এমন উদ্ভট চালচলনে মানুষ কি করিয়া সুখী হইতে পারে? ঘরময় এঁটো করিয়া মানুষ কেমন করিয়া ঘুমায়? হাত দিয়া না খাইলে কি তৃপ্তি লাগে! না আসন-পিঁড়ি হইয়া না বসিয়া ভাতের গ্রাস মুখে তোলা যায়? কলিকালই বটে! মাত্র কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি গিয়া মেয়ে সেখানকার খুঁটিনাটি তথ্য এমন নিখুঁত সংগ্রহ করিয়াছে—যাহা তাঁহাদের কালে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কতকাল পরে তবে যোগমায়া রন্ধনের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে স্বামীসেবা বা স্বামীসঙ্গ লাভ শাশুড়ী মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। মাথার দীর্ঘ ঘোমটা খাটো হইয়া সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়া স্কন্ধাশ্রয় করে নাই। আর এমন মুখরার মত আলাপ! নিজের মেয়ের চালচলন নিজের মন্দ লাগে না—তবু পীড়া জন্মায় মনে। সেকালের গৃহিণীরা চিরকালই এ কালের মেয়েদের আচরণে এমনই পীড়া বোধ করেন হয়ত।

মাঝে মাঝে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, যে কালের যা পছন্দ। মেয়ের সুখ-সৌভাগ্য যাহাতে লাভ হয়—তেমন ভাবে মেয়ে যদি নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে—তাহার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? মেয়ে যে ঘর করিবে—সেই ঘরকেই যেন সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া আপন করিয়া লইতে পারে।

কনকাঞ্জলির কথা মনে পড়িল। এক কাঠা চালে পিতৃঋণ পরিশোধের সময় রামচন্দ্রের চোখের ধারা যেমন অবিরল বহিয়াছিল তেমনই গৌরী কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিল। ঋণশোধের মর্ম্মটুকু রামচন্দ্রের মত গৌরীও হয়ত বুঝিয়াছিল, তাই এক সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ মুখে কান্না তাহার অমনই প্রবল হইয়াছিল।

যোগমায়ার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে না ভাল। পিতা চক্ষু মুছিতেছিলেন, যোগমায়া—ন বছরের বালিকা যোগমায়া—সেই সব বিচিত্র অনুষ্ঠানে শুধু কৌতুক বোধ করিয়াছিল। কনকাঞ্জলির মর্ম্মবিদারী সত্যটুকু—পর হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি হয়ত ভাল করিয়া বুঝিতেই পারেন নাই। সুখ বা বেদনার মর্ম্ম বুঝিতে যোগমায়ার বহু বৎসরই লাগিয়াছিল!

জামাইটি লাজুক। কেমন মিষ্ট ধীর কথাবার্ত্তা। যে জিনিসটি ভাল না লাগে—স্পষ্ট সে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। শুধু মাথা নাড়িয়া বলে, আর যে খেতে পারছি না, মা।

এই 'মা' ডাক ভারি মিষ্ট লাগে যোগমায়ার। বিমলের 'মা' ডাকের চেয়েও মিষ্ট।

একে একে গাঙ্গুলী-বাড়ি, বাঁড়ুয্যে-বাড়ি ও মুখুয্যে-বাড়ি জামাইয়ের নিমন্ত্রণ হইল। যোগমায়া মেয়েকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। নূতন জামাই পাইলে মেয়েদের রহস্যের নদী যেন সমুদ্র হইয়া উঠে; মেয়ে যেন জামাই-ঠকানো প্রক্রিয়াগুলি উহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সতর্ক করে।

গৌরী হাসিল, বল কি মা, তোমাদের কালে পিঁড়ির নীচের সুপুরি দিত? পড়ে গিয়ে যদি কেউ হাত-পা ভাঙ্গে!

—তা কি আর ভাঙত না।

—ছি-ছি! কি অসভ্য ঠাট্টা বাপু! নাক সিটকাইয়া গৌরী মুখে অবজ্ঞাব্যঞ্জক শব্দ করে। খানিক পরে বলে, এখন ওসব চাষাড়ে ঠাট্টা কেউ করে না। খাবার জিনিস নিয়ে ঠাট্টা!

যোগমায়া ক্ষীণ হাসিয়া বলেন, চাষাড়েই হোক—আর যাই হোক—সেকালে ওই চলন ছিল। আমোদও হ'ত খুব।

গৌরীর হাসি শব্দমুখর হইয়া উঠিল। আমোদ আবার নয়? হাত-পা ভেঙে একেবারে হাসপাতালে। খুব আমোদ!

যোগমায়া ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, ঠাট্টা না করলেই ভাল।

গৌরী বলিল, হাঁ মা, একটা কথা বলব?

—কি কথা রে?

—আমরা চলে গেলে নাকি প্রণামীর কাপড় নিয়ে খুব গোলমাল হয়েছিল?

—গোলমাল? কৈ না ত।

—না কি? নিস্তার-কাকীমা কাল বলছিলেন যে, প্রণামীর কাপড় ও-বাড়ীর কাকীমা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন?

—না রে—তা নয়। নিস্তারকে একখানা কাপড় দিয়েছিলাম কি না, তাই পাড়ার গিন্নিদের কারও রাগ হয়েছে। আমরা বামুন হয়ে পেলাম না, তার তেলি বৌয়ের ভাগ্যে···তা ওকে ত প্রণামী হিসেবে দিই নি—ভালবাসি বলে দিয়েছি।

—তাই বল। দুর্গা-পিসিমা এমন ভাবে কথাটা বললেন—যেন কত কাণ্ডই হয়ে গেছে!

—ওদের স্বভাবই ওই। তা রাত্তিরে শশাঙ্ক কি খায় রে?

মেয়ে লজ্জা পাইয়া বলিল, আমি জানি নে।

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, নতুন জামাইকে ত ভাত দিতে পারব না—তাই জিজ্ঞেস করছি!

—কেন জিজ্ঞেস করলে?

—সেদিন গাঙ্গুলী-বাড়ীর নতুন বরকে লুচি ভেজে দেয়া হয়েছিল, সে খায় নি। বলেছিল, গরম কালে লুচি নাকি খাওয়া যায়! তাই।

মেয়ে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। যোগমায়া সকৌতুকে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, কিছু বলবি নাকি গৌরী?

গৌরী কোন কথা না বলিয়া অঞ্চল-গ্রন্থি হইতে ছোট্ট একটি সোনার আংটি খুলিয়া মায়ের হাতে দিল, কোন কথা বলিল না।

যোগমায়ার বিস্ময় বাড়িল। বলিলেন, এ আংটি নিয়ে আমি কি করব রে? এ যে জামাইয়ের আংটি।

—হাঁ, তুমি রাখ। বাবাকে বলে এটা হাল-ফ্যাশানের মত গড়িয়ে দিও।

তথাপি যোগমায়াকে বিস্ময়াভিভূত দেখিয়া সে মুখ নামাইয়া বলিল, সেকেলে আংটির রেওয়াজ ত একালে নেই।

যোগমায়া এতক্ষণে গৌরীর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মুখ তাঁহার প্রসন্ন হইল না। গম্ভীর স্বরে বলিলেন, জামাই বলেছে বুঝি?

—না ত! গৌরী তাড়াতাড়ি বলিল, ওর বন্ধুরা কি ঠাট্টা করেছিল বলে—খুলে আমায় রাখতে দিয়েছিল।

—ওঃ। যোগমায়ার গাম্ভীর্য্য কাটিল না। তা কি রকমের আংটি হবে?

—আজকালকার পাথর দেয়া—কি সাপ-আংটি।

—বেশ বলব ওঁকে। যোগমায়া পিছন ফিরিতেই গৌরী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মা, শুনছ? আমি যে আংটি তোমায় দিয়েছি খবরদার ও যেন না জানতে পারে। ওকে ত বলি নি।

যোগমায়া মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন। মেয়ের এই অহেতুক উদ্বেগে জামাইয়ের সরল হাসিমাখা মুখখানি তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। কত ভাল জামাই তাঁহার, আংটির জন্য সে অনুযোগ করে নাই। হাল্কা সুরে বলিলেন, না রে, এ কথা বলব কেন? সত্যিই ত—সেকালের বুড়োটে পছন্দ—একালের ছেলেদের কাছে চলে না।

হাসিলেন বটে, সমস্ত গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেন না। গৌরী আজ পর হইয়া গিয়াছে। মায়ের কাছে পাইবার দাবী লইয়া আজ সে অন্য সংসারের মেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। মাকে ভালবাসিবার দিন সেকালে যেমন ছিল—এ কালেও কি তেমনই আছে? না থাকুক, মেয়েদের যা কাম্য—ঘর চিনিবার এই যে সর্ব্বপ্রকারের শিক্ষা ও যত্ন—ইহার মধ্যে স্বার্থ কখনও কখনও বা অশোভন তীব্রতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া মাতৃ-স্নেহকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। কিন্তু এই ত সত্য, এবং ইহাতেই ত নারীর সার্থকতা। গ্লানিটুকু হয়ত দূর হইয়া গেল। গৌরীর হাত ধরিয়া যোগমায়া সস্নেহে ডাকিলেন আয়, খাবি আয়।

সেই দিন রাত্রিতেই রামচন্দ্র বলিলেন, আমার ছুটি ত ফুরিয়ে এল, এবার বর্দ্ধমান বা কৃষ্ণনগরে নয়—ঢাকায় যেতে হবে। গুছিয়ে নাও সব।

যোগমায়া বলিলেন, ঢাকায়?

—হাঁ, আর পাঁচটা বছর কাটলে বাঁচি। টানা-পোড়েন পোষায় না শরীরে।

খানিকক্ষণ ভাবিয়া যোগমায়া বলিলেন, আমি ত বাসায় যেতে পারব না।

—পারবে না? মানে? ছেলে ত তোমার কলকাতায় পড়ছে, মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল—

যোগমায়া মৃদু হাসির দ্বারা রামচন্দ্রকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, সেই জন্যেই ত আমার যাওয়া হবে না। বিয়ে হ'লেই ত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারি নে। জামাই আসবেন মাঝে মাঝে, আমার যাওয়া কি ভাল দেখায়?

—কেন, মেয়ে আমাদের সঙ্গে ঢাকায় যাবে? জামাইও সেখানে ইচ্ছে হ'লে—

—দূর! ওরে এখন পরের বউ। হুট বলতে ওকে যেখানে-

সেখানে নিয়ে ঘুরতে পারি? ওর শ্বশুরবাড়ীর মান-মর্য্যাদা বাঁচিয়ে আমাদের চলতে হবে না?

—তা হ'লে উপায়? আমি যে বাসা ঠিক করবার জন্য আজই পোষ্টমাষ্টারকে চিঠি লিখে দিলাম।

—লিখেছ ত কি হয়েছে। চাকর-বামুন রেখে বাসায় থেক? একটু থামিয়া বলিলেন, আর সুবিধা হ'লে আমিও না-হয় গিয়ে দিনকতক থেকে আসব।

রামচন্দ্র বুঝিলেন, কোথায় যোগমায়ার টান। বলিতে গেলে এই সংসারের তিনি কতটুকু? সেই জীর্ণ কোঠা ঘুচিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকার উদ্ভব—মলিন জরাজীর্ণ বাসগৃহের এই চোখজুড়ান মনোরম মূর্ত্তি—এ রচনা যোগমায়ারই। রামচন্দ্রকে ভালবাসা, এবং বিমল ও গৌরীকে ভালবাসার বিভিন্ন রূপের মত এই বাড়িও ভালবাসার দাবীতে যোগমায়ার হৃদয়ের আর একটি অংশ দখল করিয়াছে।

—কিন্তু তোমাদের একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে। একলা থাকতে ত পারবে না।

—দিন রাতের এক জন বিশ্বাসী ঝি আমি রেখে দেব। চার দিকে লোকজন রয়েছে—বিমল ছুটি পেলেই বাড়ি আসছে।

রামচন্দ্র যোগমায়ার স্কন্ধে হাত রাখিয়া হাসিবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, কিন্তু গেলেই বেশ হ'ত, মায়া।

যোগমায়া প্রত্যুত্তর না দিয়া শুধু হাসিলেন।

৩

আগে আগে ছুটি হইলেই বিমল বাড়ি আসিত, আজকাল তাহারও বাড়ি আসা কমিয়া গিয়াছে। অনুযোগ করিলে বলে, এই বছরে শেষ পরীক্ষা দেব কিনা—তাই। না পড়লে পাস করব কি করে।

যোগমায়া অত-শত বোঝেন না। যদি বিমল শনিবারে বাড়ি আসে—বৃহস্পতিবার হইতে তাহার প্রিয় খাদ্যতালিকা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া উঠেন। সোনা মুগ ভাজিয়া ভাঙিয়া রাখা, মোচা কিনিয়া আনা, রাঙা নটে বা পালং শাক জোগাড় করা, সজিনার ফুল বা ডাঁটা পাড়াইবার ব্যবস্থা করা, সময়ের ফল—আম, জাম, পেঁপে, লিচু অথবা বেল সংগ্রহ করা—সংগ্রহের নেশায় ক'টি দিন যোগমায়ার বেশ কাটিয়া যায়। কোন বার বিমল আসে—কোন বার আসে না। আসিলে বলে, সকাল থেকে যা দিয়ে যাচ্ছ—তা আমাদের হোষ্টেল শুদ্ধ ছেলের খাবার। এত খেতে পারে মানুষ?

যোগমায়া বলেন, না খেয়ে-খেয়েই ত তোদের এই দশা!

শক্ত বাইসেপ্‌স ফুলাইয়া বিমল বলে, রোজ এক্‌সারসাইজ করি —জান ত।

—ছাই কর, তা হ'লে হাড়-সার চেহারা হ'ত না।

বিমল মাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারে না—মেদভারগ্রস্ত দেহের চেয়ে ওই দেহই শক্তির আধার। বাঙালীর ভুঁড়ি বাহির-করা নাদুস-নুদুস নন্দদুলালের মত চেহারা বিদ্রূপেরই বস্তু।

যোগমায়া বিমলের কথা শুনিয়া হাসেন। ঘাড় নাড়িয়া বলেন, যারা খেতে দেয় না তারাই বলে ও কথা। তেলে-জলে-দুধে-ঘিয়েই না মানুষের শরীর।

বিমল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলে যোগমায়া রাগ করিয়া উঠিয়া যান। কতক্ষণের জন্যই বা সে রাগ? বিমল পিছু পিছু গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে, ছাড়াও দিকি—কেমন তোমার শক্তি বুঝি?

যোগমায়া বলেন, ছাড়—ছাড়, খুব বীরপুরুষ হয়েছিস। আঃ, সকাল বেলায় এড়া কাপড়ে আমায় ছুঁলি ত?

—ছুঁলাম তাই কি হ'ল। তুমিই না বল আড়াই পা বাড়ালে বামুন শুদ্ধ।

—হাঁ—বলিই ত। তাই বলে যত নোংরা মাড়িয়ে এসে—

স্নেহের বাদানুবাদ, স্থায়ী মনোমালিন্যের ভিত্তি সেখানে কোন কালেই পত্তন করিতে পারে না। মা হাসেন, ছেলেও হাসে, এবং কখন এক সময়ে তাঁহাদের বিবাদ মিটিয়া যায়।

ভাদ্র মাস। সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন। বিমল চিঠি লিখিয়াছে, সে বাড়ি আসিবে। তাহার দুই-এক জন বন্ধুও আসিতে পারে। বাড়ি আসিয়া এমন একটা আশ্চর্য্য জিনিস মাকে দেখাইবে যাহাতে তিনি অবাক হইয়া যাইবেন। পাগল ছেলে।

অরন্ধনের পর্ব্ব পালন করা এই বাড়ির চিরন্তন প্রথা। ইহা—ভাদ্র-সংক্রান্তির অবশ্য পালনীয় অরন্ধন। কাল ত বাড়িতে উনান জ্বালিতে নাই। পাছে কেহ উনান জ্বালেন সেই জন্য উনানের পাড় নিকাইয়া আলিপনা দিয়া —মনসা গাছের ডাল উনানের মধ্যে রাখিয়া পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত পুষ্প-অর্ঘ্যাদি দিয়া পূজা করিতে হয়। একবার অরন্ধনের সময় রামচন্দ্র বাড়ী ছিলেন। মাছ না হইলে তাঁহার খাওয়া হয় না বলিয়া মায়ের সঙ্গে তর্ক করিয়া তিনি ইট দিয়া উঠানে অস্থায়ী উনুন পাতিয়া মাছ রাঁধিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু উদ্যোগই সার, সঙ্গে সঙ্গে একটা হেলে-জাতীয় সাপ কুয়াতলায় দেখা যায়। শাশুড়ী ছেলেকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া সেই মাছ টান মারিয়া বাগানে ফেলিয়া দেন ও মা-মনসার উদ্দেশে মোটা রকমের পূজা মানত করিয়া তবে স্বস্তি বোধ করেন। হেলে সাপ নাকি বিষহীন এই তর্ক রামচন্দ্র একবার করিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু শাশুড়ীর অনর্গল বাক্যপ্রবাহে সে তর্ক জমিতে পারে নাই। সেই হইতে অরন্ধন-পর্ব্ব এই বাড়িতে প্রবলপ্রতাপে চলিয়া আসিতেছে। এমন কি দুধ গরম করিবার প্রয়োজন হইলে—যাঁহাদের অরন্ধন নাই—তাঁহাদের বাড়ি হইতে কাজটা সারিয়া লইতে হয়।

কয়েকজন বন্ধু আসিবে শুনিয়া যোগমায়া একটু চিন্তিত হইয়াই পড়িয়াছেন। বিমল জানে এ বাড়িতে কোন পর্ব্বই বাদ যায় না, তবু কতকগুলি ছেলেকে আনিয়া কষ্ট দিবার কি প্রয়োজন তাহার? বাসি রান্না অতিথিকে দেওয়া যায় কখনও? আর কি সে রান্না! কচুর শাক, মটরের ডাল, ওই ডালেরই বড়া, পাঁচ

রকম ভাজা, চালতার অম্বল। নিরামিষ হেঁসেল বলিয়া মাছের চলন শাশুড়ী কখনও করেন নাই, কাজেই মাছ না-রাঁধাই প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। একটু দুধ—তাও খোসামোদ করিয়া অপরের বাড়ি হইতে জ্বাল দিয়া আনিতে হইবে।

আপনমনেই যোগমায়া কুটনা কুটিতেছিলেন—এমন সময় নিস্তারিণী বেড়াইতে আসিলেন।

—কি হচ্ছে গো দিদি? কচুর শাক কুটছ? একটু বেশি করে কুটো, তোমার অনেক খদ্দের।

—নিস্তার এসেছিস বোন। দেখ দেখি ভাই বিমলের আক্কেল! চিঠি দিলে—কাল আসবে। ঘরের ছেলে ঘরে আসুক —শাক-পান্তা যা হোক দিয়ে খেতে পারে, কিন্তু সঙ্গে ক'রে আবার বন্ধু জুটিয়ে আনা কেন ভাই।

নিস্তারিণী অবাক হইবার ভঙ্গিতে বলিলেন, ওমা—তাই ত। গেরো দেখ একবার।

এতটা সহানুভূতি অবশ্য যোগমায়া আশা করেন নাই। ঈষৎ বিরক্তিভরা কণ্ঠে কহিলেন, গেরোর কথা নয়—ছেলের হুঁসের কথা ভাবছি। শুধু কচুর শাক দিয়ে মানুষকে পান্তা ভাত দেওয়া যায়?

নিস্তারিণী বলিলেন, তাই ত।

—তা ভাই তুমি এই কচু কটা কুটে দাও ত—আমি ততক্ষণে চালগুলো ছাড়াই। সবই ত ল্যাঠার কুটনো!

নিস্তারিণী বঁটির উপর উবু হইয়া বসিয়া বলিলেন, একলা মানুষ ক-দিকই বা সামলাবে। মটর ডাল বাটা না হ'য়ে থাকে ত আমাকে দাও বেটে দিই।

কুটনা কুটিতে কুটিতে দুই জনে গল্প করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে—বৌমা বাড়ি আছগো, বলিতে বলিতে এক বৃদ্ধা লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করিতে করিতে বাড়ি ঢুকিলেন।

—কে—পিসিমা? আসুন।

—না, বউমা—বসব না আর। আরন্ধর কুটনো কোটা হচ্ছে বুঝি? ও কে—তেলি বউ? তা কুটনো কোট, মা। একটা ভারি বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলাম মা। একবার ইদিকে আসবে?

বঁটি ছাড়িয়া যোগমায়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, কি বিপদ পিসিমা?

—আর মা,—চাপা আক্ষেপের স্বরে তিনি বলিলেন, রাশুর ছেলে এই মাত্তর মারা গেল। রাশু এক হাতে চোখের জল মুছে লোক ডাকতে গেছে—আমি এলাম টাকার জোগাড়ে।

—আহা! কি হয়েছিল—পিসিমা?

—ভুগছিলই ত। ম্যালোয়ারি নাকি? দুবেলা পেট ভরে দুটি খেতেই কি পেত? তা তোমার কাছে গোটাদশেক টাকা হবে—মা? না দিলে আতান্তরে পড়ব মা? এই রূপোর গোট ছড়া রেখে—

যোগমায়া ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, গোট ওইখানে রাখুন—গঙ্গাজল দিয়ে তবে সিন্দুকে তুলব। টাকা দিচ্ছি।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে নিস্তারিণী বলিলেন, ভরসন্ধ্যে বেলা টাকা যে দিতে নেই—দিদি। তার ওপর পুত্তিমে লেগেছে, মরা-মিত্যু!

যোগমায়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মরা-মৃত্যু বলেই ত দিলাম ভাই। মানুষের দায়-অদায় যদি না দেখব ত সিন্দুকে টাকা রেখে লাভ!

—সবাই বলে, অকল্যাণ হয়।

যোগমায়া ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না রে, টাকা ধার দিয়ে সুদ নেব—তার আবার অকল্যাণ। সন্ধ্যে হ'য়ে এল—হাতটা একটু চালিয়ে ভাই। হাঁরে নারকোল পাওয়া যায় দোকানে? আমি ত ছিষ্টি খুঁজেও নারকোল জোগাড় করতে পারি নি ভাই।

—কোথায় নারকোল—দিদি! শান্তিপুরের বড়বাজারে নাকি মেলে। তা সে নারকোল আনাতে গেলে তোমার কচুর শাক আর রেঁধেছ!

—যা বলেছিস! বেশি ক'রে মটর ডালের বড়া দেব—কি বলিস?

বিমল বাড়ী আসিল—আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে। সঙ্গে মাত্র একজন ছেলে আসিয়াছে। তবু রক্ষা যে কোন প্রকারে মান রক্ষা করা যাইবে। কিন্তু এ কি চেহারা ছেলের? পরনে মোটা আধ-ময়লা ধুতি, মাথার চুল রুক্ষ, গায়ের জামাটারও কি কোন মানান নাই। মাকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, এই মা, প্রণাম কর শরৎ।

শরৎ যোগমায়ার পায়ের ধুলা লইল। যোগমায়া ইতিপূর্বেই মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়াছিলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে বলিলেন, এস বাবা, চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক।

পাতলা ছিপ্‌ছিপে ছেলেটি। রং ময়লা, চুলগুলি বড় বড়, মুখখানি ছোট—চোখ দুটি আর কপালটি ওরই মধ্যে যা একটু বিস্তৃত। শ্যামল মুখে হাসি তাহার লাগিয়াই আছে। মমতা বোধ হয় সে হাসি দেখিলে। ও ছেলের মা কি বাঁচিয়া নাই? থাকিলে এমন ক্ষীণকায় হইবে কেন? কাপড়-জামারই বা এমন শ্রী কেন?

বিমল বলিল, হঠাৎ অরন্ধনের দিন কেন এলাম না জান মা? শরৎ বললে—অনেক দিন পান্তা ভাত আর কচুর শাক খাই নি। আমি তো আর ওসব ভালবাসি নে।

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, নাঃ—তা বাসবে কেন? তা পরের ছেলেকে কষ্ট দিতে যে আনিস নি—ভালই করেছিস।

—শরতের পানে ফিরিয়া বিমল বলিল, কষ্ট দিতে তোকে আনছিলাম শরৎ?

শরৎ হাসিমুখে বলিল, আনছিলেই তো।

—শয়তান! বলিয়া বিমল তাহার পিঠে একটি সশব্দ চাপড় বসাইয়া দিল।

যোগমায়া সশঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ষাট্! ষাট্! ও কি আদিখ্যেতা বিমল?

শরৎ হাসিমুখেই বলিল, দিনরাত আমাকে মারে—মা। আপনার ছেলেটি একটি আস্ত গুণ্ডা।

এবার 'ষাট' ধ্বনি মনে মনে উচ্চারণ করিলেন যোগমায়া। ভরা পূর্ণিমার দিন ছেলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে—যোগমায়া সহ্য করিতে পারেন না। মুখে শুধু বলিলেন, দুটিই তোমরা বীর পুরুষ। এস, হাত পা ধুয়ে জিরিয়ে একটু জল-টল খাও।

—জল তো খাবই—কিন্তু তার আগে, বলিয়া পকেট হইতে হলদে সূতা বাহির করিয়া বিমল মায়ের হাত টানিতে টানিতে কহিল, দেখি মা তোমার হাত?

শরৎও তাড়াতাড়ি পকেট হইতে সূতা বাহির করিয়া যোগমায়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমি আগে বাঁধব।

দুইজনের টানাটানিতে বিব্রত হইয়া যোগমায়া বলিলেন, কি বাঁধবি রে?

—রাখী। আজ রাখী-পূর্ণিমা কিনা—এর জন্যই তো আমরা এলাম, মা। তোমার হাতে আগে রাখী বেঁধে—পাড়ায় বেরুব সব রাখী বাঁধতে।

বলিতে বলিতে দুইজনেই যোগমায়ার করপ্রকোষ্ঠে রাখী বাঁধিয়া দিল। দুইজনেই সমস্বরে বলিল, বন্দে মাতরম্।

বিমল বলিল, বল না মা—বন্দে মাতরম্।

যোগমায়া হাসিয়া স্নেহ-সকোপ কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তেতেপুড়ে আসছিস—জিরোনো চুলোয় গেল—আমার হাতে সুতো বেঁধে ছেলেমানুষি তোদের। আয়, খাবি আয়।

—না মা, তুমি বন্দে মাতরম্ না বললে আমরা খাব না।

কি আর করেন! যোগমায়া দ্রুতকণ্ঠে বলিলেন, ওসব বেরয় না বাপু আমার মুখ থেকে। বন্দে—কি মা—

—হাঁ—হাঁ—মা। বলিয়া দুইজনেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্। তার পর বিস্মিত যোগমায়াকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া মিষ্ট কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল:

বাংলার মাটি—বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক—পুণ্য হউক—পুণ্য হউক
হে ভগবান।

যোগমায়া আহারের অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই দুই জনে গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল।

এমন সময় নিস্তারিণী আসিয়া বলিলেন, কি গো দিদি, চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে! ও মা, হাতে আবার হলদে সুতো বাঁধা যে।

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, পাগল ছেলেদের কাণ্ড। হাতে সুতো বেঁধে দিয়ে বললে—বন্দে না কি মা।

—হাঁ—হাঁ—একপাল ছেলে জুটে হৈ হৈ করছে বটে। বেশ মিষ্টি গান গাইছে দিদি।

—তা জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়ে বেরুল দেখ দেখি। নিজে না খেয়ে থাকতে পারিস থাক্, পরের ছেলেটিকে কষ্ট দেয়া কেন? তোর হাতে ফেরো কিসের রে নিস্তার?

—ওদের জন্যে একটু দুধ নিয়ে এলাম, দিদি।

—নিয়ে তো এলি, খাবে কে বল দিকি। এসে বলে কি জানিস? বলে—আজ রাঁধতে নেই। এমন ছেলেও দেখি নি বোন। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কোথায় দেখলি ওদের?

—গড়ের বাজারের দিকে যাচ্ছে। বললে, কাপড় পোড়ানো হবে।

—কাপড় পোড়ানো? সে আবার কি!

—কি জানি দিদি, বিলিতি কাপড় সব নাকি পুড়িয়ে দেবে। স্বদেশী করবে।

যোগমায়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে রহস্যের অর্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যেন। বলিলেন, তাই বল—স্বদেশী। কালে কালে কত ঢেউ যে উঠবে!

নিস্তারিণী শিকার উপর দুধ তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন, যদি পার তো এক বার আমাদের বাড়ি যেয়ো, উঠোনের উনুন গোবর দিয়ে নিকিয়ে রেখেছি। কাট, ঘি, ময়দা, সব আনিয়ে রেখেছি, খানকতক লুচি ভেজে—

—ওমা, তুই অত হাঙ্গামা করতে গেলি কেন?

—হাঙ্গামা আবার কি। ব্রাহ্মণের সেবা হবে—এ তো আমাদের পরম ভাগ্যি। যেয়ো দিদি, ভুলো না।

যোগমায়া বলিল, তুই কিন্তু ওবেলা এখানে প্রসাদ পাবি।

—সে তুমি বললেও খাব—না বললেও খাব। শাশুড়ী বুড়ো মানুষ—তার জন্যে পেসাদ তো আমায় নিতেই হবে।

স্নান সারিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া যোগমায়া বহুক্ষণ হইল জপপূজা সারিয়া বসিয়া আছেন। রেকাবিতে শসা ও বাতাবি লেবু কাটিয়া নুন মাখিয়া রাখিয়াছেন, মর্ত্তমান কলা ও অসময়ের আনারস ছাড়াইয়া রাখিয়াছেন; গাছের গোটা-চারেক ভাল আতা চা'লের হাঁড়ি হইতে বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। ময়রা-বাড়ি হইতে ভাল কাঁচাগোল্লাও আনাইয়াছেন। কিন্তু ছেলেরা এখনও ফিরে নাই। এই আসে—এই আসে করিয়া জপটুকু পর্য্যন্ত যোগমায়া ভাল করিয়া সারিতে পারেন নাই। ভাত ঠাণ্ডা হইবার ভয় নাই, কিন্তু দুরন্ত ছেলেদের ক্ষুধাও কি লাগে না? ছোট নহে যে শাসন করিবেন! বকিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। যোগমায়া মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন—আর মনের মাঝে উদ্বেগ বর্দ্ধিত করিয়া বড় জোর কম কথা কহিয়া ছেলের সম্মুখে অভিমান প্রকাশ করিতে পারেন,

কিন্তু তাঁহার সে অভিমান নিজের মনেই একাকী বহন করিতে হয়, নিজের দুঃখের আগুনের আঁচে নিজের দেহেই জ্বালা ধরে।

দুপুরবেলায় বিমল ফিরিলে যোগমায়া সত্য সত্যই তাহাকে ধমকাইলেন। বিমল সে ধমক গ্রাহ্যও করিল না। হাতে একখানি কাপড় লইয়া বলিল, আগে এখানা পরে তোমার কাপড়-খানা ছেড়ে দাও—দেখি।

কাপড়খানা রোয়াকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যোগমায়া পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।

বিমল পিছু পিছু গেল। অনেক সাধ্যসাধনা করিল তাঁহাকে, কিন্তু সে সাধ্যসাধনায় যোগমায়ার মন গলিল না। স্নেহপ্রকাশের দুয়ার বিমল এমন ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে যে, শত অনুরোধেও সে দুয়ারের অর্গল খোলা যাইবে না বুঝি?

অবশেষে বিমল ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িল, শরৎ চ ভাই কলকাতা ফিরে যাই। যার মা কথা কয় না তার বাড়িতে থেকে লাভ!

যোগমায়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, আমারই যত দোষ! এই যে দুপুরবেলা পর্য্যন্ত জলটুকু মুখে না দিয়ে টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ালি —পিত্তি পড়ে জ্বর-জারি হলে কে ঠেকাবে বল দেখি?

—কৈ জলখাবার? ওই তো। শরৎ, এদিকে আয়। পাড়ায় পেটপুরে তো খুব খেলি—এদিকে ঘরের জলখাবার না খেলে মার রাগ যে ভাঙ্গে না রে! পারবি খেতে?

রোগা শরৎ সোৎসাহে বলিল, ওই তো ফল। এই দেখ না, বলিয়া দুইজনে পরম উৎসাহে যোগমায়ার সযত্নরক্ষিত জল-খাবারে মনোনিবেশ করিল।

যোগমায়ার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। খুশীতরা কণ্ঠে কহিলেন, পাড়ায় আবার কে খাওয়ালে রে?

—কত লোক। তুমি তো আর একলা মা নও—কত মা গাঁয়ে আছে।

—থাকলেই ভাল।

—উঠলে হবে না—মা, এই কাপড়খানা পর। অশুদ্ধ নয়—এই গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিচ্ছি।

—আঃ—কি করিস! কাপড়খানি হাতে লইয়া যোগমায়া হাসিমুখে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পাশের ঘরে গেলেন।

ফিরিয়া আসিতেই বিমল বলিল, দাঁড়াও, তোমার পায়ের ধুলো নিই। শরৎ—

শরৎ টুপ করিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, কিন্তু ভাই—মার কাপড়খানার সদ্গতি করতে হবে। ওখানা আহুতি দিয়ে—আমরা এ গাঁয়ের যজ্ঞ শেষ করি।

—ঠিক বলেছিস। বলিয়া এক লম্ফে পাশের ঘরে গিয়া বিমল শুধু সেই কাপড়খানাই নহে—আলনায় যে কয়খানি কাপড় ছিল টানিয়া উঠানে আনিয়া জড়ো করিল এবং যোগমায়ার বিস্ময় কাটিবার পূর্ব্বেই সেই বস্ত্রস্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্।

শরৎও সেই চীৎকারে যোগদান করিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অগ্ন্যুৎসবে কাপড় ক'খানি পুড়িয়া গেল। আম-কাঁঠালের পাতাসমেত গুটিকয়েক ছোট ছোট ডাল সে আগুনে ঝলসাইয়া গেল—আর দালানে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ যোগ-মায়া নির্ব্বাক্ হইয়া ছেলেদের এই বহ্ন্যুৎসব দেখিলেন।

ক্রমশঃ

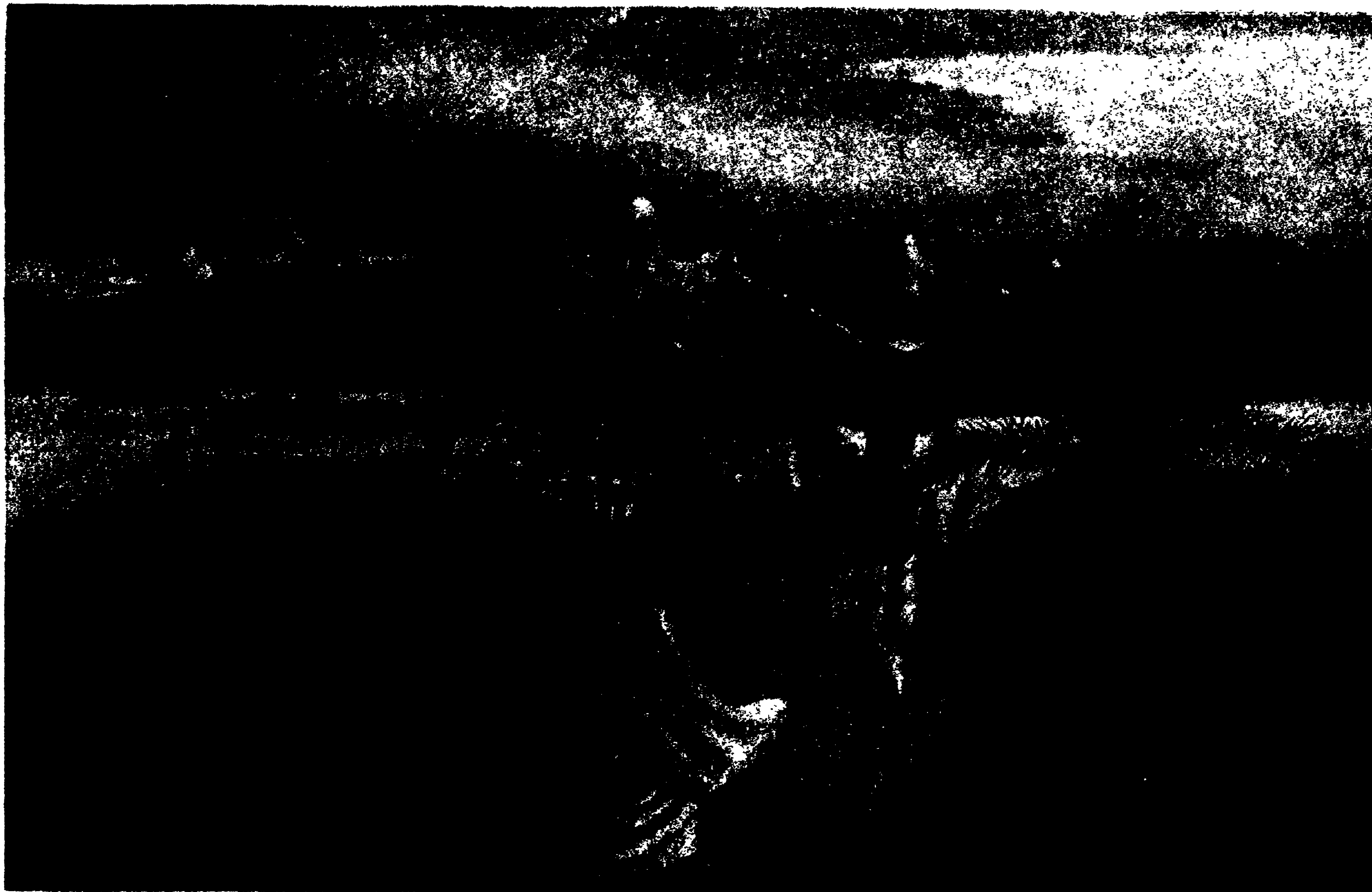
কবিতা-কণা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অস্ত রবির আলো-শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
শ্রান্তিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪

[সুনীতি দেবীর অটোগ্রাফ পুস্তকে লিখিত]



ফেরার পথে
শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী   কলিকাতা

হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অশান্ত,

ভাদ্র মাসের "প্রবাসী"তে আমার লেখার প্রতিবাদ কার্তিক মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় করেছেন—তা আমি দেখেছি। কিন্তু ওতে আমার মনে কোন হর্ষ উদয় হয় নি। কেননা ঐ প্রতিবাদ প'ড়ে আমার কোন নতুন জ্ঞান লাভ হয় নি। আর তার কারণ হচ্ছে এই যে ভাদ্রের "প্রবাসী"তে আমি যে চ্যাটার্জি সাহেবের প্রতিবাদ করেছি আর কার্তিকের "প্রবাসী"তে যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রতিবাদ করেছেন এ দু-জন একই মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। এই মনোভাবের শেষ বিশ্লেষণে দুটি লক্ষণ পাওয়া যায়। এর প্রথমটি হচ্ছে এই যে, পাঁচ শত মুসলমান যদি হিন্দুর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে চায় তবে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে নয় কিন্তু পনর জন মুসলমান যদি হিন্দুবিরোধী হয়ে সেই হিন্দুরই আপন স্বদেশে তার সহজ স্বাভাবিক ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে উঠে-প'ড়ে লেগে যান তবে তাঁরাই হচ্ছে মুসলিম সমাজের আসল নেতা, এইটে মেনে নেওয়া। আর দ্বিতীয় লক্ষণটি হচ্ছে এই যে, এঁরা মনে করেন যে এই পনর জন ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গের আজকের দাবীগুলি আজ মেনে নিলেই কাল পরশু তরশুর সর্ববিধ মুশকিলের আসান হয়ে যাবে। এ দুটো মনোভাবই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তি দুটিকেই ভিত্তি ক'রে চ্যাটার্জি সাহেবের যত ব্যবস্থা এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত বক্তৃতা। এই ভ্রান্তিকেই পরম স্নেহের সঙ্গে আঁকড়ে ধ'রে তাঁরা ভারত-সমস্যার সমাধান ও বাঙালী জাতিকে বড় ক'রে তুলবার স্বপ্ন দেখছেন। তাঁদের এ স্বপ্ন দিবা-স্বপ্ন মাত্রই থেকে যাবে।

জনাব জিন্না এবং সর্ নাজিমুদ্দিনের মত ব্যক্তিদের ভারতের মুসলিম সমাজের নেতা ব'লে চার্চিল সাহেব মেনে নেন তার একটা অর্থ বুঝি, কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেব ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও যে কেন তা ধ'রে নেন সেটা একটা পরম রহস্য। যে দুই প্রদেশে মুসলমানের হার লোকসংখ্যায় সবার চাইতে বেশি সেই সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশেও মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব পায় নি, অর্থাৎ সেখানেও মুসলিম লীগের আইডিয়লজি প্রধান হ'তে পারে নি অথচ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত হিন্দুরা উপর-পড়া হয়ে মুসলিম লীগেরই অনর্থকর কাম্যকেই সত্য ক'রে তুলবার সাহায্য করছেন এবং তা ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে দিচ্ছেন। কী দুর্দৈব! ভারতবর্ষের ইতিহাসের কী নিদারুণ পরিহাস! এ পরিহাস মহম্মদ ঘোরীর আমল থেকে চলে আসছে।

ছেলেবেলার স্কুলপাঠ্য পুস্তকে বিদ্যা সম্বন্ধে পড়েছি এই কথা যে—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" আজ ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর মুসলমানের দাবী সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথা খাটে—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" এবং এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, এই দাবী এক-পা এক-পা ক'রে আজ পাকিস্থানে এসে ঠেকেছে। জনাব জিন্না, না, কার মুখ থেকে যেন, এ রকম কথাও শোনা গিয়েছে যে ইংরেজরা যদি ভারতবর্ষটা ছেড়েই দেন তবে তা মুসলিমদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত, কেননা মুসলিমদের হাত থেকেই তাঁরা তা নিয়েছিলেন। যুক্তিটা অবশ্য ঘোর ঐতিহাসিক অসত্য। সে যা হোক এখন আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাকিস্থানে রাজি আছেন, না, ও নিয়ে তিনি বলদের লড়াই সুরু ক'রে দেবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাকিস্থানেও যদি রাজি থাকেন তবে বুঝতে হবে যে হয় তিনি ঐ পাকিস্থানের আসল অর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, আর না হয়, জীবনে যে-কোন মূল্যে শান্তি তাঁর কাম্য। বলা বাহুল্য, মানুষের জীবনে এই উপায়ে আহৃত শান্তি অমৃত নয়, তা হচ্ছে স্রেফ্ মৃত্যু। মানুষের মেরুদণ্ডটার একটা জৈবিক তাৎপর্য একটা biological significance আছে। যে-কেউ যা-কিছু যখন কিছু গলাধঃকরণ করিয়ে দিতে চাহেন আর অমনি সেটা সুবোধ বালকের মত গলা দিয়ে নামিয়ে দিলাম এটা কোন মানুষের স্বধর্ম নয়, বিশ্বমানবের পক্ষেও সদ্ধর্ম নয়।

হিন্দু-মুসলমানে মিলন দেশে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য স্থাপনা ইত্যাদির জন্য উৎকণ্ঠা মহাত্মা গান্ধীর মত আর কারও নয়। কিন্তু তিনিও অবশেষে তিক্তবিরক্ত হয়ে তাঁর মত বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। পূর্বে তাঁর রাজনৈতিক ফরমূলা ছিল—হিন্দু-মুসলমানে মিলন না হ'লে দেশ স্বাধীন হবে না। আজ তাঁর ফরমূলা হয়েছে—দেশ স্বাধীন না হ'লে হিন্দু-মুসলমানে মিলন কিছুতেই হবে না। এই দ্বিতীয় ফরমূলাটির মধ্যেই সত্য আছে বেশি। প্রথম ফরমূলাটি কতকটা বুনো হাঁসের পিছনে ছোটার সামিল। এর পরেও যদি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হয়ে থাকে তবে তাঁর জ্ঞানলাভের আর কোন আশা নেই।

আমার প্রতিবাদকারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সব কথার যে মানে বুঝতে পেরেছি তা বলতে পারি নে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন— "…বোঝাগুলো এমন ক'রেই বাঙালীর ঘাড়ে চেপে ধরেছে (বসেছে ?) যে সেই বোঝার ভারে আর আমরা এক পাও এগুতে পারছি না—কেবল খোঁটায়-বাঁধা এক জোড়া বলদের মত হিন্দু-বাঙালী আর মুসলমান-বাঙালী সেই দুর্ব্বিষহ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এক জন আর এক জনকে গুঁতিয়ে নিজেদের অক্ষমতা জাহির করছি। বি. সি. চাটুজ্যে সেই বলদ দুটোকে সমান উৎসাহের সঙ্গে তাদের "বলদত্ব" প্রকাশের স্থবিধা দেবার প্রস্তাব ক'রে যে খুব অন্যায় করেছেন তা মনে হয় না।" আমার ধারণা ছিল যে চ্যাটার্জি সাহেবের যত কিছু ব্যবস্থা সব দেশের বুকে শান্তি স্থাপন, যাতে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রেমের বন্যায় ভেসে যায় তারই জন্যে। কিন্তু এখন আমার প্রতিবাদকারীর মুখে শুনছি ও-সব দু-পক্ষের "বলদত্ব" প্রকাশের সমান স্থবিধার জন্য। যে-ব্যবস্থায় "বলদত্ব" প্রকাশেরই আরও স্থবিধা হয় তেমন ব্যবস্থার জন্য মহাসমারোহে মাথা ঘামানোর এমন কি প্রয়োজন তা বুঝতে পারা, economy of energyর দিক থেকেই হোক বা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকেই হোক, সহজ নয়। উপরন্তু যদি চ্যাটার্জি সাহেবের ব্যবস্থাগুলি দু-পক্ষই প্রসন্ন মনে মেনে নেয় তবে তাতে শান্তি স্থাপিত না হয়ে বলদযুগলের সংগ্রামশীলতাই আরও বেড়ে যাবে কেন তারও অর্থ খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল।

সে যা হোক্ প্রতিবাদকারী কিছু বাজে কথাও বলেছেন। সেইটেই বিশেষ ক'রে ধরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন আজকের দিনে। মানব-সভ্যতার যেমন প্রস্তর-যুগ, তাম্র-যুগ ইত্যাদি গিয়েছে তেমনি আজকের দিনকে বলা যায় স্লোগানের যুগ। দু-একটি স্লোগান দু-চার বার উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হ'তে শুনলেই তার সত্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। মহা মিথ্যাকেও বার বার উচ্চারিত ক'রে মহা সত্যে পরিণত করবার একটা রাজনৈতিক চাতুরীও আছে আর সেটা সম্ভব হয় এই কারণে যে জনসাধারণের শ্রবণ-শক্তি যেমন সদা প্রস্তুত সদা তৎপর হ'য়ে থাকে, মননশক্তি তেমন নয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই চাতুরীর কবলে পড়েছেন ব'লে মনে হয়।

এখন শোনো। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখছেন—"সুতরাং হিন্দুর দিকে ন্যায়টা যখন আছেই তখন এক কথায় আমরা মুসলমানদের মসজিদ্‌গুলোর সামনে দিয়ে আমাদের শোভাযাত্রাগুলো নিয়ে যাবার সময় extra উৎসাহের সঙ্গে জগঝম্প বাজিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে দশ দিক কম্পিত ক'রে আমাদের ন্যায় ও তৎসহ জিদটা বজায় রাখতে পারলেই যে পরমার্থ লাভ হবে তাতে আর সন্দেহ কি ?" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চতুর উকীল নন। তা যদি হ'তেন তবে তিনি ঐ কথাগুলি লিখতে পারতেন না। কেননা প্রশ্নটা extra উৎসাহে বা নিরুৎসাহে শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার নয়, আসল প্রশ্নটা হচ্ছে মাত্র বাদ্যসহ শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার ; আবার প্রশ্নটা মসজিদের সুমুখ দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার নয়, আসল প্রশ্নটা হচ্ছে সরকারী সদর রাস্তার উপর দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার—যে সদর রাস্তা অনুরূপ ব্যবহারের জন্যই তৈরি হ'য়ে এসেছে—সম্ভবতঃ মান্ধাতার আমল থেকে—কারও প্রার্থনার সৌকর্যার্থে তৈরি হয় নি কোনোদিনই। আশা করি ঐ দু-জোড়া প্রশ্নের মধ্যে যে মর্মগত সূক্ষ্ম অথচ অর্থপূর্ণ পার্থক্য আছে তা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধরতে পারবেন। হ্যারিসন রোড আর স্ট্র্যাণ্ড রোডের সংযোগস্থলে যদি কোনো হিন্দু বাড়ী তৈরি ক'রে কর্পোরেশনের কাছে এই ব'লে দরখাস্ত করেন—"মহাশয়গণ, এই স্থানটায় সারা দিন অত্যন্ত গণ্ডগোল—আমার ভাগবত-পাঠে ব্যাঘাত হচ্ছে—আপনারা কি এই গণ্ডগোল থামিয়ে দিতে পারেন না ?" তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি সেই হিন্দুর সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা মনে করেন তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরই সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবে। আর ঐ স্থান দিয়ে যদি কেউ বাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে চায়, তবে সেইটেকেই যদি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "জিদ" নামে অভিহিত করেন তা হ'লে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরই যে সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা নয় এইটেই মনে হ'তে থাকবে।

তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে ঢাকের বাদ্যটা ঠিক বীণাধ্বনিবৎ নয়। কিন্তু মুসলিমরা মহরমের সময় তাসা নামক যে বাদ্যযন্ত্রটি বাজান তার আওয়াজও মুরলীর স্বর-লহরীর মত নয়। সুতরাং ঢাকের বাদ্যে মুসলিমদের কর্ণ-পটহের পেলবত্ব পীড়িত হবে এ-অনুযোগও করা চলে না।

তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে extra উৎসাহের কথা বলেছেন সেটা যদি সত্যি হয় তবে সেটা সম্প্রতি ঘটেছে। নিশ্চিত জানি যে এর পূর্বে শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার সময় হিন্দুর মনে মুসলিম বা মসজিদ সম্পর্কীয় কোন কথাই স্মরণে আসত না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি অনুসন্ধান ক'রে দেখেন তবে তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন যে হিন্দুদের মনে এই extra উৎসাহ জাগতে আরম্ভ

করেছে তখন থেকে যখন থেকে তাঁদের শোভাযাত্রাকে অশোভায় পরিণত করবার সৎ উদ্দেশ্যে তার উপর ইট পাটকেল পড়তে সুরু করেছে। Mild হিন্দু—বিশেষ ক'রে বাঙালী হিন্দুর এই একটা অপবাদ ছিল যে অনুরূপ অবস্থায় পূর্বে তাঁরা গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বাড়ী গিয়ে তাঁদের অন্তঃপুরের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করতেন। কিন্তু আজ যে সেই mild হিন্দু অকুস্থলেই wild হ'য়ে উঠছেন এবং extra উৎসাহ অনুভব করছেন এটা হিন্দুর পক্ষে অতীব সুলক্ষণ বলেই মনে করি। এবং যেহেতু ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে ত্রিশ কোটিই হিন্দু সেই হেতু শেষাশেষি এই সুলক্ষণটা ভারত-বর্ষের পক্ষেই বর্তিবে। এজন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিরর্থক উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখায় একটা ব্যাপার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, দেশের বুকে আজ যে সাম্প্রদায়িকতার বিকট ও বীভৎস রূপ জেগে উঠেছে—তার জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমানভাবে দায়ী। সত্যের প্রতি যাদের কিছুমাত্র নিষ্ঠা আছে তাদের কাছ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে যে-ব্যাধি দূর করতে চাই সে-ব্যাধির মূল কোথায়, তার লক্ষণ কি, এ-সব যদি সঠিক ধরতে না পারি তবে ভুল স্থানে ঔষধের প্রলেপই খালি প্রাণপণে ঘষতে থাকব কিন্তু ব্যাধির উপশম তাতে কিছুতেই হবে না। জিন্না ও সাভারকারের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা, স্যর্ নাজিমুদ্দিন ও শ্যামাপ্রসাদকে একই দরের মানুষ বলে বিবেচনা করা, কারো কারো কাছে আজ ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে এঁদের ফ্যাশানের মোহ যতটা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ততটা নয়। কিংবা হয়ত ওতে তোষণ-নীতিরই প্রভাব বর্ত্তমান। হয়ত এঁদের অবচেতন মনে এমনি একটা ভাব কাজ করছে যে ওতে তাঁরা হিন্দু-বিরোধী মুসলিমদের কতকটা খুশী করতে পারবেন এবং তাঁদের কাছ থেকে নিরপেক্ষতার জন্য পিঠ-চাপড়ানি পাবেন। কিন্তু গোড়াতেই ভুল করলে ঠিকেও ভুল নামতে বাধ্য। আসল কথাটা সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানদের খুশী করা নয়—দেশের বুকে যে বিষ-বৃক্ষ আজ গজিয়ে উঠেছে তারই সমূলে নির্মূল করা। তার জন্যে শান্তির বাণীর প্রয়োজন থাকতে পারে, কৌশলের স্থান থাকতে পারে, কিন্তু অসত্যকে সত্য ব'লে প্রচার করবার কোনো স্থান নেই। প্রস্থান-ভূমিটাকেই যদি অসত্য ক'রে দেখি, তবে লক্ষ্য স্থানটাকেও স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাব না।

সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অনুরূপ মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সর্বপ্রথমে এই সত্যটা জানা দরকার যে, আজ দেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্য যা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দায়ী সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কূটনীতি। এবং ঐ ব্যাপারে দ্বিতীয়তঃ যাঁরা দায়ী, তাঁরা হচ্ছেন সেই মুসলমানরা যাঁরা ঐ কূটনীতির সঙ্গে যুক্তসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নৃত্যশীল হয়েছেন। এ-বিষয়ে হিন্দুরা যদি দায়ী থাকেন তবে তাঁরা এ দুয়ের অনেক নীচে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছেন—যাকে ইংরেজীতে বলে a very bad third। এই অতি স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্যটিকে মনে না রেখে, যে হিন্দুরা তাঁদের নাগরিক অধিকারকে—civic rightsকে রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন তাঁদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিমদের সঙ্গে সমান দোষে দোষী করলে সত্যের অপলাপমাত্র করা হবে—আসল সমস্যার কোনো সমাধানের সম্ভাবনাই জন্মলাভ করবে না। চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় হিন্দু বলেই হিন্দুর প্রতি অবিচার করবার তাঁর অধিকার জন্মে না। যেমন পিতা বলেই শিশুপুত্রকে অযথা তাড়না করবার তাঁর অধিকার জন্মে না। ব্রিটিশ নেশ্যন রাতারাতি দেবতা বনে যায় নি। সুতরাং ব্রিটিশ ক্যাবিনেট যে নানা কৌশলে ভারতবর্ষকে আরও যত দিন সম্ভব নিজেদের তাঁবে রাখতে চাইবেন এটা স্বাভাবিক—এর মধ্যে অদ্ভুতত্ব কিছু নেই। বরং অন্য রকম হলেই বিস্ময়ের কারণ ঘটত। কিন্তু মোগল নয়, পাঠান নয়, ইরাকী বা আরবী নয়, এই ভারতমাতারই সন্তান—হাঁ ভারত-মাতারই সন্তান—যে মুসলিমরা ব্রিটিশের ঐ কৌশলকে সফল ক'রে তুলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁদের কি নামে অভিহিত করতে হয়! অথচ রাজনীতি-বিশারদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়রা বসে বসে এই মুসলিমদেরই দর বাড়িয়ে দিচ্ছেন আর মনে মনে ভাবছেন দেশের কল্যাণের পথটা তাঁরাই শুধু আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সহজ ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানটাও কি আজ দেশে দুর্লভ হয়ে উঠল!

উপরিউক্ত মুসলিমদের মনোভাব যে আজ তাঁদের কোথায় এনে ফেলেছে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

বাংলা দেশে বহুকাল থেকে পাঠশালায় স্কুল-কলেজে বহু হিন্দু-মুসলমান ছাত্র একসঙ্গে বিদ্যালাভ করে। ঘটনা-ক্রমে হিন্দুদের দেব-দেবীর মধ্যে একটি জ্ঞানের দেবতাও আছেন। স্কুল-কলেজ-পাঠশালায় হিন্দু ছাত্ররা বহুকাল থেকে বৎসরের একটা দিন তাদের ঐ জ্ঞানের দেবতা দেবী সরস্বতীর অর্চনা ক'রে আসছে। মনে রেখো—মনসাপূজা বা ইতুপূজা বা সুবচনীর ব্রত নয়—জ্ঞানার্জ্জনের প্রতিষ্ঠানে

জ্ঞানের দেবতারই অর্চনা। এত দিন ধরে কোনোদিকেই এতে কোন বিপর্যয় ঘটে নি। কিন্তু বহুকাল পরে আজ শোনা যাচ্ছে যে প্রতিমা-পূজা মুসলিমদের ধর্মভাবে আঘাত করছে। কথাটা অবশ্য সত্য নয়। ও কথা সত্য হ'লে এ-দেশে মোগল পাঠানরা বহু শতাব্দী ধরে হয় রাজত্ব করতে পারত না, নয় এ-দেশে আজ একটিও হিন্দু বর্তমান থাকত না। কোরাণেও ওই রকমের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। উপরন্তু কথাটা যুক্তিসঙ্গতও নয়। আমার যদি বিশ্বাস থাকে যে আমার একটা উঁচুদরের ধর্ম আছে তবে আমার প্রতিবেশী আমার ধারণায় যদি কোন নীচুদরের ধর্মের অনুষ্ঠান করে তবে তাতে আমার ধর্মভাবে আঘাত লাগবে কেন বা আমার ধর্মের অনিষ্ট হবে কেন তা বোঝা যায় না। ওতে আমার প্রতিবেশীর প্রতি করুণা হ'তে পারে, কিন্তু ক্রোধ হবে কেন? আমার মনে প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি জাগতে পারে, কিন্তু বিদ্বেষ জাগবে কেন? অপর পক্ষে প্রতিবেশীর ধর্মকেই যদি শ্রেষ্ঠতর ব'লে মনে হয় তবে ত সে ধর্মকে আঘাত করাই হবে আমার পক্ষে বর্বরতার পরিচায়ক। সে যা হোক্ যুক্তি থাক বা না-থাক সত্য হোক্ বা না-হোক রব উঠল যে হিন্দু ছাত্রদের ঐ পূজা বন্ধ করতে হবে। আর যদি তা না হয় তবে মুসলিম ছাত্রদের অনুমতি দিতে হবে—কিসের? তাদের ত অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান নেই—তা নাই-ই থাক, কিন্তু তাদের গো-কোরবানি ত আছে—এই গো-কোরবানিরই অনুমতি তাদের দিতে হবে। এর উপরে টীকা-টিপ্পনী বাহুল্য ব'লে মনে করি। হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতীপূজার পাল্টা জবাব হিসাবে স্কুল-কলেজ বা হোস্টেলে গো-কোরবানির দাবী—এর প্রতিবাদ অন্ততঃ একজন মুসলিমের লেখায় দেখেছি। এইখানে এই কথাটা স্মরণ রাখা দরকার যে, গো-জাতির প্রতি হিন্দুর যে মনোভাব সেটা মুসলিমদের সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে আজ তাঁরা গড়ে তোলেন নি। এই মনোভাব মুসলিমরা এদেশে আসবার পূর্ব থেকেই—এমন কি আরব দেশে ইসলাম ধর্ম আবির্ভূত হবারও পূর্ব থেকে হিন্দুদের মধ্যে বর্তমান ছিল।

এখন, এই যে এক শ্রেণীর মুসলিমের হিন্দুদের প্রতি মনোভাব, যে মনোভাবকে কোনোক্রমেই সুমধুর ভ্রাতৃভাব নামে অভিহিত করা চলে না, এই মনোভাবকে যাঁরা আজ কাজে ও কথায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে উৎসাহিত করছেন তাঁরাই দেশের ভবিষ্যৎ অকল্যাণের পথটাকেই প্রশস্ত হ'তে প্রশস্ততর ক'রে তুলছেন। এই সহজ কথাটা যদি আজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বুঝে উঠতে না পারেন তবে তার এক-মাত্র কারণ হচ্ছে এই যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের কথা শুনে শুনে তিনি আজ মোহগ্রস্ত হয়েছেন।

হিন্দু সমাজে বহু দোষ বহু ত্রুটি আছে—সে-সব হিন্দু সমাজের আপন অন্তরেরই দুঃখকর ব্যাধি। কিন্তু এই ব্যাধিকে হিন্দু মহাসভাও কোনো দিন রাজনৈতিক চাল হিসেবে—political stunt রূপে ব্যবহার করেন নি। আজ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাঁরা মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখতে পান না, তাঁদের চোখের উপযোগী চশমা কোনো বাজারেই পাওয়া যাবে না, নিউ-ইয়র্কের চশমার দোকানেও নয়। ইতি। হসন্ত*

* এই প্রবন্ধটি প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে।—সম্পাদক

কবি ও জাতিগঠন

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

সাহিত্য গড়ে ওঠে মানব-জীবনকে নিয়ে। সাহিত্য ও মানব-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মানব-জীবন ও সমাজ-গোষ্ঠী সৃজনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সাহিত্য ও সমাজের উন্নতিও সম্মিলিত। নবতম সৃষ্টির প্রেরণা সাহিত্যই সমাজে এনে দেয়।

সাহিত্যরূপী লতা জীবনরূপী মহীরুহকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে উঠে, পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়ে থাকে।

জীবনে যা সত্য, যা সুন্দর, সাহিত্য সেই সৌন্দর্য্যকেই প্রকাশ করে।

সাহিত্যের এই শ্রী, একমাত্র কবিই ফুটিয়ে তুলতে পারেন—তাই কবির স্থান মানব-জাতির কল্যাণকামীদের সকলের শীর্ষে।

পুরাতন বাণী পদ্যময় ছিল। গদ্যের প্রচলন বহু পরে হয়েছিল।

শেক্‌সপীয়রের অভ্যুদয় না হ'লে ইংরেজী সাহিত্য ও জাতির এত ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী উন্নতির বনিয়াদ্ গড়ে উঠত না। কালসাগরে একটি সামান্য বুদ্‌বুদের ন্যায় হয়ত

ভেসে উঠত একটা ক্ষণস্থায়ী জাতীয় উন্নয়ন ও আবার তলিয়ে যেত, বহুদেশ ও লোকের অগোচরে।

মিল্টন, স্পেন্সার, হোমার, ভর্জ্জিল, টলস্টয় ও গ্যেটের সাহিত্যিক-প্রতিভা মানব-জাতির উন্নয়নে অপরিমেয় সাহায্য করেছে ও তারই ফলে ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে। গ্যেটের বাণী 'light more light' স্বদেশে মানবতা প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের যোগ স্থাপন করেছে।

আজ প্রত্যেক ভারতবাসী কবি-সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথের অভাব প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারছে। তিনি বেঁচে থাকলে ভারতে জাতিগঠন কার্য্যে প্রত্যেক প্রদেশের কাব্যে, সাহিত্যে, সুরে, সঙ্গীতে, মহিমান্বিত চিন্তায় এ দেশবাসীর মনোজগতে যে পরিবর্ত্তন তিনি ঘটাতে পারতেন তা আর কে পারবে?

চৈতন্য ও জেলালুউদ্দীন রুমী প্রথমে কবি ও মানব-প্রেমিক, পরে ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনব্রতের ফল ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন মধুনিষ্যন্দী, সুছন্দিত কবিতায়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের অভ্যুদয়, বিকাশ, পরিণতি ও ভাবধারার আলোচনা করলেই দেখা যাবে তদ্দেশীয় জাতিগঠনে কোন্ কবি কি পরিমাণে সহায়তা করেছেন।

গুজরাতী সাহিত্যে দেখতে পাই কবি নরসী মেহ্‌তার অপূর্ব্ব প্রভাব। শুধু তাঁর অবদান গুজরাতী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে নি, তাঁর গান, তাঁর কবিতা জনগণের চিত্তে স্বদেশ-সেবার ও জাতিগঠনের প্রেরণা এনে দিয়েছে। আজ তাঁর গান পুরনো হয় নি, তার প্রমাণ মহাত্মা গান্ধীকে নরসী মেহ্‌তার রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত 'বৈষ্ণব জন কো তেনে কহিয়ো যো পীর পরাই জানে রে' প্রত্যহ এক বার ক'রে তাঁর আশ্রমে গেয়ে শোনানো হয়। নরসী মেহ্‌তার আবির্ভাবের পূর্ব্বে গুজরাতী ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ছিল না। তিনি গুজরাতী-সাহিত্য নির্ম্মাণে ব্রতী ছিলেন।

গুজরাতের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব। ব্রজ-ভাষায় রচিত কবিতা সেখানে খুব সমাদৃত। বল্লভ-সম্প্রদায়ের মতাবলম্বীর সংখ্যা গুজরাতে অনেক। তাঁরা সংখ্যায় যেমন গরিষ্ঠ, তাঁদের প্রভাবও তেমনি দৃঢ় ও ব্যাপক। বল্লভাচার্য্যের মতবাদ সব চেয়ে বেশী প্রচারিত হয়েছিল গুজরাতে এবং তার প্রমাণ এখনও রয়েছে। বল্লভ-সম্প্রদায়ের ভক্তি-রসাত্মক ভজনাবলী গুজরাতীদের প্রায় সবাইকে বৈষ্ণব করে তুলেছে।

নরসী মেহ্‌তার রচিত কবিতাকে বলা হয় 'প্রভাতী'। প্রভাতের অরুণোদয়ের ন্যায় নরসী মেহ্‌তার এই 'প্রভাতী'-গুলি জনসাধারণের চিত্তলোকে জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বেলে দিয়েছিল। গুজরাতবাসীদের উন্নয়নে তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনা নিয়োজিত হয়েছিল।

গুজরাতী কবি শামলের 'ছপ্পয়', দয়ারামের 'গরূমিয়া' আর বর্ত্তমানে নর্ম্মদাশঙ্করের 'রোলাঁ' ছন্দে রচিত কবিতাবলী গুজরাতে সর্ব্বজনসমাদৃত। এঁদের রচিত কবিতা ও গান জাতিগঠনে ও ঐক্যস্থাপনে গুজরাত প্রদেশে কত দূর সাহায্য করেছে তা গুজরাতী-সাহিত্য আলোচনা করলেই চোখে পড়ে।

বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব আইন ও গৃহরক্ষা-সচিব শ্রী কে. এম. মুন্সীও এক জন দেশহিতব্রতী গুজরাতী কবি।

উড়িয়া ভাষায় উপেন্দ্র ভঞ্জের কবিতায় স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা খুব বেশী। কিন্তু তা হ'লেও এ সবের পশ্চাতে জাতির জাগরণ উন্নয়ন ও নির্দ্দোষ করার একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সহজেই চোখে পড়ে।

মানব-সাহিত্যে দান হিসাবে হয়ত উপেন্দ্র ভঞ্জের কাব্য তত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, কিন্তু তাঁর দেশবাসীর জন্য দরদভরা মন যে জাতিকে উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ করতে সর্ব্বদা সতৃষ্ণ ছিল একথা একবাক্যে মেনে নিতে হবে। কারণ, তিনি মানব-জীবনকে লেশমাত্র অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস করেন নি। বর্ত্তমানে উড়িয়া কবি পাণীগ্রাহীর কবিতাও প্রধানতঃ দেশপ্রীতিমূলক।

একটা কথা বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষগণ তাঁদের উপদেশাবলী ব্যক্ত করেছেন কবিতায়। সে-সব বাণী যে নিছক ধর্ম্মভাবপূর্ণ তা নয়, তার কাব্য-মাধুর্য্যও অনুপম হয়ে আছে। অনেক সময় এ মনে না হয়েই যায় না যে তাঁরা প্রথমে অতুল প্রতিভাশালী কবি, পরে ধর্ম্মোপদেষ্টা।

হিন্দী কবি সুরদাস, তুলসীদাস, নন্দদাস, ভূষণ, দাদু, হিতহরিবংশ হরিনাথ ইত্যাদি সবাই বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন, কিন্তু এ কথা মেনে নিতে হবে যে তাঁদের সাধন-ব্রত উদ্‌যাপনের উপায় তাঁরা কবিতারচনার মধ্যেই পেয়েছিলেন। কবিতারচনার মধ্যেই তাঁদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল যা মানব-সমাজকে সুন্দর ও মর্ত্ত্য-সংস্কার মলিনতামুক্ত করতে নিয়োজিত হয়েছিল।

শিখদের আদিগুরু নানক একজন মহাকবি ছিলেন এবং

তাঁর উপদেশাবলী প্রচারিত করেন স্বরচিত কবিতায়। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদেব, তাঁর আগে যে চারজন শিখ-গুরু হয়েছিলেন তাঁদের উপদেশাবলী সংগ্রহ ক'রে 'গুরুগ্রন্থ সাহেব' প্রকাশ করেন। ইহাই হ'ল শিখদের আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থ অদ্যাপি পঞ্জাবে করতারপুরে সযত্নে রক্ষিত আছে। এ গ্রন্থের রচনা শুধু যে ধর্ম্মোপদেশে ওতপ্রোত তাই নয়, কাব্য-মাধুর্য্যেও পরিপূর্ণ।

শিখগুরুদের আর একজন প্রধান গুরু তেগবাহাদুর, সংসারের নশ্বরতা সম্বন্ধে বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার রচনাও অতি উঁচুদরের কবি ও সাহিত্যিক ছাড়া সম্ভবপর হ'ত না।

শিখগুরুদের মধ্যমণি হচ্ছেন গুরু গোবিন্দসিংহ। তাঁর বিশাল জীবন-কথা আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি একজন মহাকবি ছিলেন। তাঁর সমস্ত উপদেশাবলী কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি সাধক কবি ছিলেন। তাঁর সাধনা কাব্য-রচনাকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে উঠেছিল ও জনগণের চিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। ধর্ম্মসাধনার ও কাব্যচর্চ্চার এমন মধুর সমাবেশ দুর্লভ বটে। গুরু গোবিন্দের প্রধান কীর্ত্তি হ'ল এক বীর জাতির সৃষ্টি করা আর এতে দেখা যাবে যে তার উৎস রয়েছে তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থরাজি প্রেমসুমার্গ, সুনীতিপ্রকাশ, জ্ঞানপ্রবোধ, বুদ্ধিসাগর, বিচিত্র নাটক ইত্যাদিতে। গুরু গোবিন্দ 'গ্রন্থসাহেবে'র কিয়দংশ রচনা করেছিলেন।

গুরু নানকই প্রথমে এক নূতন জাতিগঠনের ভিত্তি স্থাপনা করেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মাগণের অন্যতম তিনি একজন ছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর সহধর্ম্মিণী সুলক্ষণী, পুত্রদ্বয় শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীচন্দ্রের পবিত্র জীবন-যাত্রা-প্রণালী পারিপার্শ্বিক ধার্ম্মিক বাতাবরণ, ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যমণ্ডলী সহ নিখিল-ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, মক্কা, জেদ্দা প্রভৃতি দেশে-বিদেশে তীর্থ পরিক্রমার সঙ্গে আনুষঙ্গিক মধুর কবিত্বময়ী বাণীপ্রচার,—জাতির উন্নয়নে ও মানবতাবিকাশে নিয়োজিত হয়েছিল এবং তারই ফলে আমরা বীর শিখজাতিকে পাই। কবীর ও নানকের রচনা খুব সমাদৃত। তার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক।

জৈন কবিদের মধ্যে দেখতে পাই ঠাকুরসী, বাণারসদাস ও ভূধরদাসের আজীবন সাহিত্যসাধনা দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

কচ্ছদেশের কবিদের বিশদ পরিচয় এখনও পাই নি, কিন্তু যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে বুঝতে পারা যায় যে তাঁরা চারণ-কবি। দেশ, জাতি ও সমাজকে সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর ও উন্নত করার চেষ্টাই তাঁদের রচিত কবিতায় ও গাথায় প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

কল্পভ কবি বল্লাতোল জাতীয় জাগরণ সম্বন্ধে বহু কবিতা লিখেছেন।

অন্যান্য প্রদেশের কবিদের পরিচয় বারান্তরে করা যাবে। আমাদের দেশে একটা জাতিগঠনের প্রচেষ্টা খুব প্রবলভাবেই সক্রিয়, কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা যত দিন না হয়ে উঠবে তত দিন এ প্রচেষ্টা ফলবতী হবে না, হ'তে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক চিন্তাজগতে তাঁর অমূল্য অবদান দিয়ে হয়ত নিখিল-ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশসমূহের ভাবের আদান-প্রদানের একটা সুব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অভাবে এ প্রচেষ্টার গতি মাঝপথেই থেমে যাবে কারণ তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করবার মত লোক নেই।

বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ ক'রে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন,—

অর্দ্ধশত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্দ্ধশত মিলিলে হেন তবে সে পুরে চিত্ত,
সোনার তরী দিয়েছ ভরি,
তবুও আশা অনেক করি;
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী-সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত।

কত দীর্ঘ দিন এই অপূর্ণ আশা আমাদের বুকে জগদ্দল পাথরের মত বিরাজ করবে তা কে জানে?

আমাদের দেশের কৃষি ও স্বাধীন ডেনমার্কের কৃষি-শিল্প

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

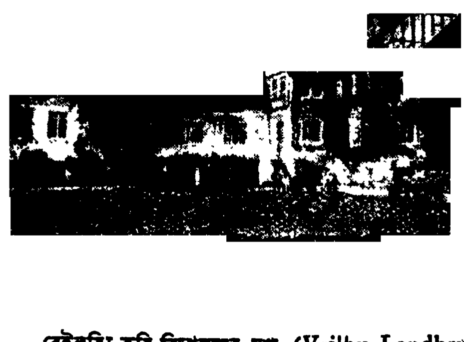
গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"র ৩২৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিমাতার সংসার" প্রসঙ্গে বাংলার খাদ্যাভাবের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"সকলের সঙ্কটত্রাণে বাংলা অগ্রসর কিন্তু বাংলার বিপদে কেহ আসে না—এই অবস্থাকে একমাত্র বিমাতার সংসারের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।" বাংলার লোকের দারুণ অন্নকষ্ট দেখিয়াই এরূপ আক্ষেপোক্তি তিনি করিয়াছেন সন্দেহ নাই।



একটি কৃষক-পরিবারের দৃশ্য ; মধ্যে কৃষক সস্ত্রীক, বামে দুই পুত্র, দক্ষিণে লেখক ও কৃষক-কন্যা ; সম্মুখে কৃষকের কনিষ্ঠ পুত্র

আমাদের খাদ্যবস্তুর অধিকাংশ কৃষিজাত দ্রব্য। সুতরাং খাদ্যবস্তুর আলোচনা করিতে গেলে প্রধানতঃ আমাদের চাষী ও চাষবাসের, এক কথায় কৃষি-শিল্পের অবস্থাই বিবেচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা কৃষকদের মধ্যে বাস করেন বা করিয়াছেন তাঁহারাই চাষীদের প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন। দেশের চাষী ও চাষের ক্রম-বর্দ্ধমান অধোগতি বহুকাল যাবতই স্বপ্রকাশমান। এ অবস্থার পরিবর্ত্তনকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রয়েল কমিশন বসিয়াছে, কমিশনের বড় রিপোর্ট বাহির হইয়াছে কিন্তু ইহাতে দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইহার কারণ বহু, যেমন—(১) গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কৃষি-শিল্পের দুরবস্থার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু চাষী ও চাষবাসের উন্নতির প্রকৃত প্রচেষ্টা অতি অল্পই হইয়াছে ; (২) কৃষি-বিভাগের মারফতে কৃষি-শিল্পের উন্নতির প্রচেষ্টা কৃষককুলকে নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তনে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই ; (৩) দেশের কৃষি-শিল্প সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজ কমবেশী বহুকাল যাবৎই উদাসীন ; (৪) আমাদের শিক্ষা-বিভাগ কৃষি, কৃষক ও কৃষি-শিল্পকে সার্ব্বজনীন শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন নাই যার ফলে চাষীর ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া পৈত্রিক উপজীবিকার পথকে হেয় মনে না করিলেও সাধারণতঃ চাকুরী বা শ্রম-শিল্পকে জীবিকার অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করে। দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী, কৃষি-জাত দ্রব্যাদি আমাদের খাইয়া বাঁচিবার প্রধান উৎস। অথচ এ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা আমাদের গণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে অল্পই স্থান পাইয়াছে, যাহার ফলে 'চাষী' শব্দ ইহার যথার্থ সম্মান শিক্ষিত মনে পায় না। (৫) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে, ইহাতে শিক্ষিত চাষী গড়ে না। যাঁহারা কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে যান তাঁহাদের জীবিকার ক্ষেত্র চাকুরী। আসল কথা, চাষীর ছেলেমেয়েকে কৃষি-শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা দেশে এ যাবৎ হয়ই নাই।

উপরোক্ত কারণ ও প্রক্রিয়াগুলি দেশে বহুকাল যাবৎ চলিয়াছে। ফলে, কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপন্নের হার ক্রমাগতই কমতির দিকে। গো-কুলের অবনতি, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু আর্থিক হীন অবস্থার ফলে কৃষি-যন্ত্রাদির অবনতি, উপযুক্ত সার ব্যবহারে অসমর্থতা, যথোপযুক্ত কর্ষণের অভাব, উপযুক্ত বীজ সম্বন্ধে অসতর্কতা, অতিরিক্ত লাভের আশায় ধান্য ও শস্যাদির জমিতে পাটের চাষ ইত্যাদি বহুবিধ কারণ কৃষক-কুলের সত্তাকে বহুকাল যাবৎই শাসাইয়া আসিতেছে, তদুপরি বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে বিদেশাগত খাদ্যশস্যাদির আমদানী বন্ধ ও নিজেদের খাদ্যদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী ইত্যাদি কারণ আমাদের খাইয়া বাঁচিবার পথকেই আজ সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে। আমাদের কৃষককুল অভাব-অনটনে, রোগে, শোকে স্বভাবতই জর্জ্জরিত থাকে। তদুপরি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় খাইয়া বাঁচিবার জন্য বহু কৃষকও আজ ভিটাবাড়ী প্রায় ত্যাগ করিতে উদ্যত। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষক আজ অধিক শস্য ফলাইয়া দেশের সকলের খাদ্যাভাব মিটাইবে এরূপ আশা করা শুধু নিরর্থক বলিয়াই মনে হয় না, বাতুলতাও বটে। দেশের এই দুর্দ্দিনে খাদ্যাভাবের নৈরাশ্যজনক অবস্থা যদি আজ দেশের শিক্ষিত মনকে সত্যই আলোড়িত করিয়া থাকে, কৃষক ও কৃষির অবনতির কারণ



বেইলবিা কৃষি-বিদ্যালয়ের দৃশ্য (Vejlby Landbrukskole)



শস্যক্ষেত্র পরিদর্শনে ডেনিস কৃষক-বন্ধু সঙ্গে লেখক

সম্বন্ধে দেশের সমগ্র মনে চেতনা আনে, তবেই হয়ত কৃষি-শিল্পের যথার্থ ও স্থায়ী উন্নতির পথ এক দিন প্রশস্ত হইতে পারে। "বিমাতার সংসারে" লেখক বলিয়াছেন "ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলি কৃষির উপর নির্ভর করা অসম্ভব বুঝিয়া শ্রম-শিল্পকে প্রধান উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করিয়াছে। বাঙালী কি করিবে?" বাঙালীর বাঁচিবার উপায়-স্বরূপ দুইটি পথের উল্লেখ করিয়াছেন—"প্রথম, শিল্পোন্নতি, দ্বিতীয়, বিদেশ যাত্রা।" বলা বাহুল্য, লেখক যে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যত সুচিন্তিত আলোচনা হয়, আমাদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে যত চেতনা বাড়ে, ততই দেশের মঙ্গল। যান্ত্রিক যুগে—যান্ত্রিক সভ্যতার মাঝখানে স্বাধীন ডেনমার্কে কৃষি-শিল্পের ভিত্তিতে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছিল, অতুলনীয় কৃষি-শিল্পের যে উন্নতি ডেনমার্কবাসী সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করা যাইতেছে।

বর্ত্তমানে ডেনমার্কের স্বাধীন সত্তা নাই। হিটলারের কোপে পড়িয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় যে-সকল দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছে, ডেনমার্ক ইহাদের একটি। কাজেই ডেনমার্কের কৃষি-শিল্প সম্বন্ধে বলিতে গেলে ঐতিহাসিক স্বাধীন ডেনমার্কের কথাই বুঝিতে হইবে।

অল্পাধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে ডেনমার্ক একটি অনুর্ব্বর দেশ ছিল। দেশময় বালুভূমির প্রাবল্যহেতু দেশটি কৃষির পক্ষে অনুকূল ব'লয়া বিবেচিত হইত না; সেজন্য কৃষি ও কৃষকের অবস্থাও অনুন্নত ছিল, তখন দেশের সমৃদ্ধির উৎস ছিল ডেনিস সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি। তার পর নানা ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধাদির ফলে ডেনিস সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে চরম দুর্দ্দশা আত্মপ্রকাশ করে। সেই চরম দুর্দ্দিনে আশা ও আনন্দের বাণী লইয়া ডেনমার্কবাসীদের মধ্যে আবির্ভূত হন এক মহাপুরুষ। ইহার নাম ছিল গ্রোন্ট্‌বিগ (N. F. S. Grundtvig)। ইনি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক গ্রোন্ট্‌বিগ দেশের চরম দুর্দ্দিনে স্বদেশবাসীকে জীবনীশক্তি লাভের উপায়স্বরূপ দেশমাতার বক্ষ হইতে ক্ষীর আহরণের সন্ধান দিয়াছিলেন, নিঃস্ব জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দেশের কৃষি ও কৃষ্টির উন্নতি সাধনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দেশবাসী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। ফলে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ডেনমার্কবাসী শতবর্ষ মধ্যে নিজেদের অনুর্ব্বর দেশটিকে একটি আদর্শ কৃষি-শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করে।

১৯৩২ সালের গণনানুযায়ী ডেনমার্কের লোকসংখ্যা ছিল ৩,৫৫০,৬৫৬। সেই বৎসরে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ছিল ১,৭৬৫,০০০ এবং মোট গরুর সংখ্যা ৩,২৮৫,০০০।

বৎসরিক মাখন উৎপন্নের হার ১৯৫,৫০০,০০০ কিলোগ্রাম (১ কিলোগ্রাম = ১$\frac{১}{১৪}$ সের = ২$\frac{১}{৫}$ পাউণ্ড), বাৎসরিক পনীর উৎপন্নের হার ২৫,৪০০,০০০ কিলোঃ। দুগ্ধজাত সমগ্র খাদ্যবস্তুর মোট পরিমাণ (বাৎসরিক) ৫,৫৬৫,০০০,০০০ কিলোঃ।

নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া একমাত্র ইংলণ্ডেই যে পরিমাণ মাখন চালান দেওয়া হইত, ইহার পরিমাণ গড়ে প্রতি বৎসর ১৭২,০০০,০০০ কিলোঃ। ইহা হইতে বুঝা যায় গো-



একটি ক্ষুদ্র কৃষকবাড়ী



মহাত্মা গ্রোন্ডবিগের চিত্রলিপি
[চিত্রশিল্পী যেনসেন কৃত, ১৮৩১]

পালনকে সেই দেশে কি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছিল।

গো-পালন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা ছাড়া শূকর পালন আর একটি ব্যবসা ছিল। ১৯৩১ সালে ডেনমার্কে শূকরের সংখ্যা ছিল ৬,১০০,৮০০; তন্মধ্যে ৫০ লক্ষ শূকরের মাংস একমাত্র ইংলণ্ডেই চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালে ডেনমার্ক হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে ডিম চালান দেওয়া হইয়াছিল, ইহার হিসাব এই :— ইংলণ্ডে—৩৭·৬ মিলিয়ন × ২০; জার্মানীতে —১২·৬ মিলিয়ন × ২০; সুইজারল্যাণ্ড—৩·৬ মিলিয়ন × ২০; স্পেনে—১·৯ মিলিয়ন × ২০। একই বৎসরে মোট মুরগীর সংখ্যা ২৬·৬ মিলিয়ন অর্থাৎ মাথা পিছু ৭·৪ করিয়া মুরগী ছিল এবং ৫৬·৩ মিলিয়ন ডিম বিদেশে চালান দিয়া ডিম ব্যবসায়ীরা ৮১ মিলিয়ন ক্রাউন লাভ করিয়াছিল।

দেশের এই অভাবনীয় কৃষিশিল্পের উন্নতির মূলে ছিল দেশের শিক্ষিত চাষী। চাষী, তাহাদের খামারের সংখ্যা ও আয়তন এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য।

খামারের আয়তন		সংখ্যা
০·৫৫ হেক্টার	৩·৫ হেক্টার	৩৮,৫২৫
৩·৫ „	১০ „	৭১,৮২৬
১০ „	১৫ „	২৬,৪০৯
১৫ „	৩০ „	৪৩,৫৬৬
৩০ „	৬০ „	২০,৪১৭
৬০ „	১২০ „	৩,৪২৩
১২০ „	২৪০ „	৭৬৫
২৪০ „	ইহার উর্দ্ধ আয়তনের খামার	৩০৬
মোট খামারের সংখ্যা		২০৫,২৩৭
তদ্ভিন্ন অনির্দ্দিষ্ট খামারের সংখ্যা		৪০০

একই সালে চাষাবাস ও গোপালনের কার্য্যে নিয়োজিত লোকসংখ্যা ছিল ৯৯০,৫০৫ অর্থাৎ দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী। তন্মধ্যে চাষী ভূম্যধিকারীর সংখ্যা ৬২০,৬৮১; চাষবাসের কাজে আত্মীয়স্বজন ও সাহায্য-কারীর সংখ্যা ৩৬৮,২৭০ জন ছিল।

গ্রীষ্মকালে ডেনমার্কে প্রতি বৎসর প্রতি প্রদেশে বিরাট কৃষি-প্রদর্শনী হইয়া থাকে। কৃষক মাত্রই কৃষি-প্রদর্শনীতে ভীড় করে এবং গো, অন্যান্য গৃহপালিত পশুপক্ষী, কৃষিজাত দ্রব্যাদি এবং কৃষিযন্ত্রের উন্নতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে। আমি বিভিন্ন প্রদেশে মোট চারিটি প্রদর্শনী দেখিয়াছিলাম। ইহাতে ঐ দেশের কৃষি ও কৃষিশিল্পের জাজ্বল্যমান উন্নতি দেখিয়া যেমন আনন্দ বোধ করিয়াছি, তেমনি স্বদেশের কৃষি ও কৃষককুলের অবস্থা ভাবিয়া ব্যথা অনুভব করিয়াছি। মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ তাঁহার দীর্ঘজীবনের অধিকাংশ সময় কৃষি ও গাভীর



ডেনমার্কের একটি কৃষি-প্রদর্শনীতে লেখক, পার্শ্ববর্ত্তী ঘোড়াটি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইয়াছিল



ষ্টিদ্‌হলট্‌ তরুণীদের গণবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সঙ্গে লেখক

উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটিয়াছেন। তরুণ বয়সে আমি তাঁহার সাহায্যকারী ছিলাম, তাঁহার রচিত কৃষি-প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপির নকল করিতাম; কাজেই কৃষি-বিষয়ে আমার যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, ইহারই ফলে অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ডেনমার্কে বহু কৃষক পরিবার পরিদর্শন করি। ডেনিস কৃষকদের অবস্থা বুঝাইবার জন্য এখানে কয়েকটি কৃষক-পরিবারের চিত্র দেওয়া যাইতেছে।

পরিদর্শন দিবস ১৭-৭-৩৫। কৃষকের নাম: শ্রীযুক্ত রীশ, স্থান: কাটরুপ, প্রদেশ: জুটল্যাণ্ড। কৃষকের খামার ভূমির পরিমাণ ২১ হেক্টর। দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ৩৫টি। বাছুর (স্ত্রী) ২৫টি, পুং ২টি।

বাৎসরিক গড়পড়তা দুগ্ধের পরিমাণ ৮০০০ কিঃ গ্রাঃ। দুধের গড়পড়তা মাখনের পরিমাণ শতকরা ৫.৫, বিশেষ বিশেষ গাভীর দুগ্ধে মাখনের পরিমাণ শতকরা ৬.৬, কৃষক উৎপাদিত দুগ্ধ বিক্রয় করেন নিকটবর্ত্তী শহর অরহুসে (Aarhus)। তিনি উপরোক্ত সংখ্যক গাভী পালন ভিন্ন ৩০টি শূকরী পালন করেন। ইহারা বৎসরে দুইবার বাচ্চা প্রসব করে। তিনি বাচ্চাগুলিকে খাদ্যোপযোগী না করিয়া শৈশবাবস্থায়ই বিক্রয় করেন। ইহাতে তাঁহার বাৎসরিক আয় কমপক্ষে ৬০০০ হাজার ক্রাউন। সুবৎসরে আয় আরও অধিক হয়। উক্ত কৃষকের ৫টি ঘোটকী আছে। গরুর জন্য ঘাস ও খাদ্যাদি ও নিজেদের প্রয়োজনীয় শস্যাদি আপন খামারেই হইয়া থাকে। কৃষকের বাৎসরিক নগদ আয় ২৫।২৬ হাজার ক্রাউন। সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়া বাৎসরিক লাভ অল্পাধিক ৪ হাজার ক্রাউন। তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির মূল্য এক লক্ষ ক্রাউন। সম্বৎসরে তিনজন পূর্ণ সাহায্যকারী ও একজন সময়বিশেষে তাঁহার কাজে সাহায্য করে। উক্ত কৃষক-পরিবারে রহিয়াছেন সস্ত্রীক কৃষক ও একটি শিশু।

আর একটি বৃহত্তর কৃষক-পরিবারের চিত্র:—পরিদর্শন দিবস ১-৭-৩৫ ইং, কৃষকের নাম: শ্রীযুত মাদসেন, স্থান: বাল্লেব্যর্গ (Vallebjerg), প্রদেশ: সিল্যাণ্ড। কথিত খামারের আয়তন ৩৬ হেক্টার, অনাবাদী বনভূমি ৩ হেক্টার। দুগ্ধবতী গাভী ২২টি, বাছুর ১২টি, বলদ ১টি, ঘোড়া (ব্যবহারোপযোগী) ৫টি, বাচ্চা ঘোড়া ২টি, শূকরী ৬টি, শূকর ১টি, মুরগী বৎসরে ২০০ শত। বাৎসরিক উৎপাদিত দুগ্ধের পরিমাণ ৭৫০০ কিঃ গ্রা।

আয়ব্যয়ের হিসাব:—

ব্যয়		আয়	
গাভী	৩,০০০ ক্রাউন	গাভী হইতে	৪,৫০০ ক্রাউন
শূকর	১৩,০০০ ,,	শূকর ,,	২০,৫০০ ,,
ঘোড়া ও মুরগী	৪০০ ,,	ঘোড়া ও মুরগী	১,৪০০ ,,
সাহায্যকারী	৩,৬০০ ,,	কৃষিজাত দ্রব্যাদি	৭৫১৪ ,,
বিভিন্ন খরচ	৩,৮১০ ,,		
কর	৩,৪০০ ,,	মোট আয়	৩৩,৯১৪ ক্রাউন
মোট	২৭,২১০ ক্রাউন		

আমি শ্রীযুত মাদসেনের বাড়ীতে কিছু দিন অতিথি ছিলাম। তিনি তাহার আয়-ব্যয়ের খাতা আমাকে দেখিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, সেজন্য উপরে সূক্ষ্ম আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া সম্ভব হইল। তাঁহার সংসারে তিনি সস্ত্রীক, তিনটি কন্যা ও দুটি পুত্র। একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র

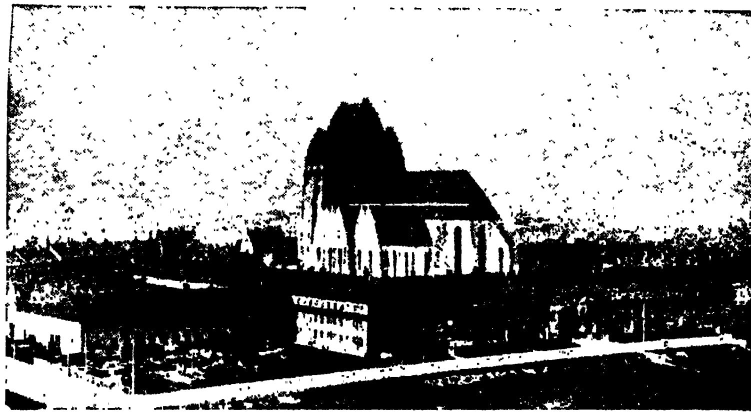


একটি গ্রাম্য গোশালা

পিতামাতার আশ্রয়ে বাস করে। অন্যরা স্বাবলম্বী। অবিবাহিতা কন্যা দুটি পিতার সংসারেই সাহায্যকারিণী হিসাবে—বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালীন ক্ষেতখামারের কাজে সহায়তা করেন।

উপরোক্ত মধ্যবিত্ত খামারের মালিক ও স্বল্পভূমি অর্থাৎ ৩ হেক্টার ভূমির স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে আয়ের প্রভেদ অতি নগণ্য, তাহা নিম্নের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে।

পরিদর্শন দিবস ২০-৭-৩৫, স্থানের নাম: টম্মারব্যি। কর্ষিত ভূমি: তিন হেক্টার, গাভী ১০টি, শূকর ৪০টি, মুরগী ৩০টি, পরিদর্শন-দিবসে মুরগী শাবকের সংখ্যা ৫০টি, মেষ ১৬টি ও মেষশাবক ৫০টি।



মহাত্মা গ্রোগুবিগের স্মৃতিরক্ষার্থ জনগণের অর্থে প্রধান শহর কোপেন-হাগেনের উপকণ্ঠে "গ্রোগুবিগ চার্চ্চের" দৃশ্য

শূকর পালন সম্বন্ধে এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃষক শূকরী না রাখিয়া শূকর-শাবক কিনিয়া খাদ্যোপযোগী করিয়া বাজারে বিক্রী করেন।

এই পরিবারের বাৎসরিক আয় ৬০০০ ক্রাউনের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে।

বাৎসরিক ব্যয়	৪৫০০ ক্রাউন
বাৎসরিক লাভ	১৫০০ „

পরিবারের লোকসংখ্যা ৪ জন, যথা সস্ত্রীক কৃষক, তরুণ বয়সের একটি পুত্র ও বৃদ্ধা শাশুড়ী।

সাধারণতঃ কৃষকমাত্রই নিজেদের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট খাদ্যশস্য, তরিতরকারী ও প্রচুর ফলমূল উৎপন্ন করিয়া থাকে। ডিম ও মুরগী নিজেদের জন্য অকাতরে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ইহাও খরচের মধ্যে পড়ে।

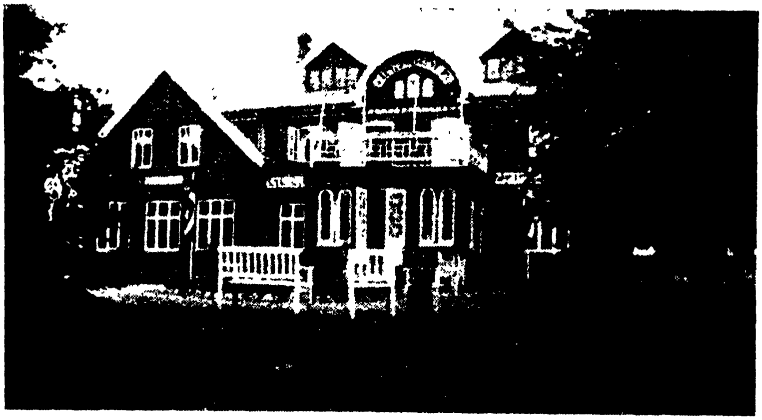
স্বাধীন ডেনমার্কের অধিবাসীরা প্রচুর খাইত এরূপ সুনাম বা বদনাম তাহাদের ছিল। আমি নিজে সে দেশের খাওয়া-দাওয়া ও ডেনমার্কবাসীদের আতিথ্যের প্রাচুর্য্যের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মাথাপিছু সারা বৎসরে একজন ডেনমার্ক-বাসীর খাদ্যের পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:—

মাখন ৬ কিলোগ্রাম, মারগারিণ ২২ কিলোগ্রাম, পনীর ৫ কিলোগ্রাম, লার্ড ২২ কিলোগ্রাম, মাংস ২১ কিলোগ্রাম, চর্ব্বি : কিলোগ্রাম, বিভিন্ন শস্যজাত ময়দা ও আটা ৯৭ কিলোগ্রাম, অন্যান্য খাদ্যের ব্যসন ৭ কিলোগ্রাম, কফি ৭ কিলোগ্রাম, সিগার ৮০টা, সিগারেট ৫৫টা, সিগার-সিগারেট ২৯০টা। এই তালিকা হইতে খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্য্য ও দেশবাসীর খাওয়ার পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়। অবশ্য এই খাদ্যতালিকা মোটেই সম্পূর্ণ নহে। ইহাতে মাছ, তরিতরকারী ও দুগ্ধের হিসাব সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে এবং এই সকল তাহারা প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে।



গোচারণ ক্ষেত্রে বাঁধা গাভী। ডেনমার্কে গোচারণভূমি আবাদী খামারের অন্তর্গত। এই প্রথা দেশের কৃষির একটি বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীন ডেনমার্কে কৃষি-শিল্পের এই অভাবনীয় উন্নতির মূল কারণ এই যে, দেশের কৃষককুলকে সমগ্র ভাবে শিক্ষিত, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চাষী করিবার উপায়স্বরূপ গ্রোণ্ডবিগ-প্রদর্শিত কৃষি ও সংস্কৃতির আদর্শে চাষীর ছেলেমেয়েদের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল বহু গণ-বিদ্যালয়। এই গণ-বিদ্যালয়গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) উচ্চ গণ-কৃষি বিদ্যালয়, (২) উচ্চ গণ-বিদ্যালয়,



হাডষ্টেন গণ ও শিল্প উচ্চবিদ্যালয়

(৩) স্বল্প আয়তনের খামারের অধিকারী কৃষকদের জন্য কৃষি-বিদ্যালয়।

শেষোক্ত বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য স্বল্পভূমির স্বত্বাধিকারী কৃষকগণকে বিশেষ জ্ঞান দেওয়া—যাহাতে ছোটবড় ভূম্যধিকারীদের আয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা একুশটি। ডেনমার্কের মত একটি ক্ষুদ্র দেশে একুশটি কৃষি-বিদ্যালয় আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইত, যদি শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকুরীর সন্ধানে যাইত। আসল কথা এই, প্রতি কৃষক পরিবার তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভবিষ্যৎ জীবিকা যথা—কৃষি ও গো-পালন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও কার্য্যকরী শিক্ষা হাতে কলমে লইবার জন্য কৃষি-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন। সমগ্র কৃষক শ্রেণীর শতকরা ৪০ জন, তরুণ কৃষক ছেলেমেয়ে শতকরা ৯০ জন এই জাতীয় বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্টের খরচে শিক্ষা পাইয়া থাকে। আমি যত কৃষক যুবক-যুবতীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ডেনমার্কের কোন কৃষকের পক্ষে উপযুক্ত বয়সে এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা লইতে অক্ষমতা ব্যক্তি ও দেশের পক্ষে ক্ষতি ও পরিতাপের বিষয় হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চ গণ-বিদ্যালয় সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য জাতিগত সংস্কৃতির ও শিক্ষার সবল উৎসকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার ফলে দেশের কৃষি, গোধন ও শিক্ষাদীক্ষার এরূপ সার্ব্বজনীন উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। কৃষি-বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা কি প্রকার তাহাও অনুধাবনযোগ্য।

দালুম একটি মিশ্রিত উচ্চ গণ ও কৃষি বিদ্যালয়। পরিদর্শন দিবস ১২-৭-৩৫। ইহাতে তিনটি বিভাগ আছে। একটি দুগ্ধ বিষয়ক, ইহাতে পূর্ণশিক্ষা লইতে ৮ মাস লাগে। ইহার পরীক্ষা আছে। পরীক্ষা পাস করিতে পারিলে দুগ্ধ-ব্যবসা ও পনীর তৈরির কেন্দ্রে কাজ দেওয়া হয়। ইহা অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এই ধরণের দুগ্ধবিষয়ক শিক্ষা আর একটি মাত্র বিদ্যালয়ে দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার নাম লাডেলুম। অপর দুইটি বিভাগ যুবকদের জন্য উন্মুক্ত। ইহার একটিতে শিক্ষা লইতে ছয় মাস, অপরটিতে নয় মাস লাগে।

প্রথম বিভাগে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় (১) Bactriology (২) Milk Industry (৩) Chemistry (৪) Mechanics of the Milk Industry.

অপর দুটি বিভাগের পাঠ্যক্রম যথা : Civics, Botany, Agriculture, Physics, Chemistry, ডেনমার্কের কৃষির ইতিহাস, কৃষিবিষয়ক ভূগোল, গৃহপালিত পশুপক্ষী সম্বন্ধে জ্ঞান, যন্ত্র-শিল্প, ডেনিস ভাষা, ড্রইং, অঙ্ক।

দুগ্ধব্যবসা-শিক্ষার্থীদের প্রবেশ-বয়স ২৪ উর্দ্ধে
অন্য কোর্সে কৃষকদের „ „ ২২ উর্দ্ধে

উক্ত বিদ্যালয়ের দুগ্ধাগার অতি আধুনিক। দিনে শিশুদের জন্য গড়পরতা ৩০০০ হাজার লিটার বিশেষ দুগ্ধ এই দুগ্ধাগার হইতে নিকটবর্ত্তী ওডেনসে শহরে বিক্রয় করা হয়। শিশুর উপযোগী এই জাতীয় দুগ্ধের এক লিটারের মূল্য ৭৫/১০০ ক্রাউন।

এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক বজেট ১ লক্ষ ক্রাউন। বিদ্যালয়ের সম্পত্তির মূল্য ১২৫ মিলিয়ন ক্রাউন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছয় হইতে সাত হাজার ক্রাউন বার্ষিক বেতন পাইয়া থাকেন। প্রতি বিদ্যার্থীকে প্রতি মাসে থাকা খাওয়া, বেতন সবসুদ্ধ ৭৫ ক্রাউন দিতে হয়। অনেকে গবর্ণমেন্টের বৃত্তি পাইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী : গ্রীষ্মকালে :—প্রাতঃ ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত। স্নানাহার ও বিশ্রামের জন্য মোট ২ ঘণ্টা ছুটি। শীতকালে : প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত। ছুটির সময় পূর্ব্ববৎ মোট ২ ঘণ্টা হইলেও দুগ্ধদোহন শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত এক ঘণ্টা কাজ করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বাধীন ডেনমার্কে ২১টি উচ্চ কৃষি বিদ্যালয় আছে। তাছাড়া উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬০টি। এ ছাড়া গৃহ-শিল্পাদির জন্য অন্য অনেক বিদ্যালয় আছে।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। শস্যশ্যামলা বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। জলবায়ুর গুণে সাধারণ যত্নে বা অযত্নেও শস্যাদি জন্মে বলিয়াই এখনও কৃষক নামে মাত্র বাঁচিয়া আছে। আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের ও কৃষির শোচনীয় অবস্থার উন্নতিসাধন যাঁহাদের ধ্যানের বিষয়, তাঁহাদের অবগতির জন্য স্বাধীন ডেনমার্কের কৃষি, কৃষক, কৃষিশিল্প ও ইহাদের ক্রমোন্নতির উৎস গণকৃষি বিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে যৎসামান্য লেখা হইল।

এরফান বাওয়ালির কবর

শ্রীমনোজ বসু

গভীর রাতে ধানবনের কিনারে দেখতে পাবে অসংখ্য টিমটিমে আলো। দুলছে, চলছে, মাঝে মাঝে ধানগাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আলোর মাছ-মারার মরশুম এটা। এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে ধারালো দা—নিঃশব্দে সব ঘোরাফেরা করে। আলোয় মোহগ্রস্ত হয়ে জলের মাছ মাথা ভাসান দেয়। দাও কোপ ঝেড়ে, ফেল খালুইতে। দেখতে দেখতে খালুই বোঝাই হয়ে যাচ্ছে।

ফতিমা মুখ ভার করে বলল, আমি এত ক'রে বললাম, আমায় একটু নিয়ে যেও—

এরফান বলে, বলেছিলি? মিথ্যে কথা।

তুমি কানে নাও নাকি? গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাক।

আকাশ থেকে পড়ে এরফান গালি। গাঁজা?

হুঁ। ছিদাম কুমোরের বাড়ী। এক দমে নাকি কলকে ফাটিয়ে দিচ্ছ আজকাল?

এরফান রাগ করে বলে, সাপের মন্তোরের গুরু ধরেছি ছিদামকে। পাঁচ শালা অমনি যা-তা রটাতে লেগেছে।

কলকের মতো তোমার মাথাটাও একদিন ফট করে ফেটে যাবে কিন্তু।

এসব বাজে কথার কত জবাব দেবে? হন-হন করে এরফান বাড়ীমুখো রওনা হয়। ফতিমা নাছোড়বান্দা; ছুটে সামনে চলে আসে।

শোন—শুনছ? আজকে ডেকে নিয়ে যেও। না ডাক ত দেখো কি করি।

যাঃ—সে কি হয়?

ফতিমা তর্ক করে, কেন হবে না? ও-বছর ত হয়েছিল।

কিন্তু ও-বছরের ফতিমা আর এ বছরের ফতিমা এক নয়। মাথায় সে বড্ড টেনে উঠেছে। অবশ্য মেয়েটার ক্ষমতা খুব। যা লগি ঠেলত সেই সময়, আস্ত একটা মরদ হিমসিম খেয়ে যায়। অথচ ভাল ঘরের মেয়ে ওরা, কোন পুরুষে কেউ এসব করে নি। ঐ রকম কাউকে সাথী পেলে সত্যিই জুৎ হত। সেবারে ডিঙি নিয়ে তারা মাঝবিলে নিকারির বাঁধাল অবধি গিয়েছিল। মাছ কি সেখানে! বড় বড় সোল, বোয়াল, মাগুর—অগুন্তি। ডাঙার দিকে মানুষের ভিড় বেশি—গোলমাল করে, আর হাঁটার সময় জল ছিটিয়ে মাছ তাড়িয়ে দেয়। দূরের দিকে এসব হাঙ্গামা নেই। কিন্তু ফতিমাকে নিয়ে ত কোন ক্রমেই যাওয়া চলে না, ও বছর যা হয়েছিল এ বছর তা হবে কি করে?···

রাত দুপুরে হুড়কো-বাঁশের ঠেলা খেয়ে এরফান ঘুমের মধ্যে উঠে বসে। ফতিমা। হাত দিয়ে নয়, বাঁশের আগা দিয়ে নাড়া দিচ্ছে। বলে, চল যাই—যাবে না? আমায় ত ডাকলে না, আমি তাই ডেকে নিয়ে যেতে এলাম।

একটু আগে চাঁদ উঠেছে। থম-থম করছে রাত্রি। ডাকাত মেয়ে চলে এসেছে একলা এই এতখানি পথ। যখন এসে পড়েছে আপত্তি করা বৃথা; মিছামিছি বাঁশের গুঁতো খেয়ে মরা কেন? বাঁশ কাঁধে বীরদাপে চলল ফতিমা। লণ্ঠন জ্বেলে এরফান পিছনে চলেছে।

নৌকোর কি হবে? কাউকে ত বলে-কয়ে রাখি নি।

তাচ্ছিল্যের স্বরে ফতিমা বলে, বলব আবার কিসের? নিলে হ'ল একটা। কে দেখছে?

ঘাটে ডিঙি ছিল আট-দশখানা। একটার দড়ি খুলে ভাসিয়ে দিল। লগি হ'ল সেই হুড়কোর বাঁশ।

আরে আরে, মুখ ঘুরে গেল যে!

ফতিমা কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে। বলে, চুপ করো, বক-বক করো না।

ও দিকে যে গ্রাম। হদ, পাথরঘাটা, মাগুরখালি। কড়কড়ে আউশ ধান। মাছ কোথা ও-সব জায়গায়?

ধানবনের মাঝ দিয়ে প্রাণপণে লগি ঠেলতে ঠেলতে ফতিমা বলে, গ্রামেই ত যাচ্ছি—

কেন?

শ্বশুরবাড়ি দেখতে।

শ্বশুরবাড়ি? সে আশা ছেড়ে দে। এ ক্ষেপে আর হবে না, মাণিক। মদ্দা মেয়েকে কে যাচ্ছে বিয়ে করতে?

হয় কিনা দেখো এই মাসটা পরে। পাথরঘাটার তমিজ মোড়ল—তার মেজো বেটা। চেনো ওদের বাড়ি?

তমিজ বড় গৃহস্থ, তালুকদার। বিলের ধারেই বাড়ি, পাকা দালান-কোঠা। অত বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে, এরফান বিশ্বাস করে না। ফতিমা কিরে করে, তার গা ছুঁয়ে বলে। বলে, আমার চেহারা দেখে খুব তারিফ করে গেছে শ্বশুর।

আবার অভিমানের সুরে বলে, চেহারা ত সবাই ভাল বলে, তুমি কেবল কোন দিন কিছু বললে না—

ভাল লাগে না, তা ভাল বলব কি করে?

আজকেই তমিজেরা এক দল এসে ফতিমাকে দেখে পান-তামাক খেয়ে গেছে। তাদের খুব পছন্দ; এখন ফতিমা পছন্দ করবে কিনা—সেইটে হচ্ছে কথা। আলোর মাছ-মারা না হাতী, এ সব মিছে কথা। সে যাচ্ছে তমিজের বাড়ি-ঘর দেখতে।

এরফান তার হাত থেকে কেড়ে নিল লগিটা। বলে, বস্—ঠাণ্ডা হয়ে বস্ দিকি। অত দূর লগি ঠেঙাতে পারিস কি তুই?

মেঘভাঙা জ্যোৎস্না তার গায়ে এসে পড়েছে। অনেক উঁচু দিয়ে সোঁ-সোঁ করে এক ঝাঁক রাত্রিচর পাখী উড়ে গেল। এরফান লগি চালায় আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ফতিমার দিকে। সবাই চেহারা ভাল বলে,—এত ভাল যে তমিজ মোড়লের মতো তালুকদার এক নজর দেখে লুফে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে দেখে এরফান ঘাড় নাড়ে, সত্যি—মেয়েটা নিতান্ত মন্দ নয়; হুঁ, ভালই! এই বছর দুই-তিন তারা তফাৎ তফাৎ থাকে, তার মধ্যে ফতিমা ভয়ানক ভাল হয়ে উঠেছে।

এরফান বলে, সাহস বলি তোর। এই যে যাচ্ছিস—শ্বশুর বেটা যদি দেখে ফেলে!

হুঁ, দেখবে! এখন বলে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকছে—

দৈবাতের কথা বলা যায়? ঘাট ত তাদের উঠোনের উপর বললে হয়। ধরো, বুড়ো কোন কাজে উঠে এসেছে। দুজনকে এই রকম দেখলে কি ভাববে বল ত—

দেখতে দেব কি না! এই একতাল কাদা ছুড়ে মারব তার চোখে। হি-হি-হি—

হাসিতে হাসিতে নির্জ্জন বিল তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। এরফান তাড়া দেয়, চুপ চুপ—ওরে পাগলী, চুপ কর্—

তমিজ মোড়লের বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখা হ'ল। ফিরতি মুখে দু-পাঁচটা মাছও কেটে নেওয়া হ'ল ডিঙির খোলে। শেষকালে বিপদ, ডিঙি এগুতে চায় না।

ফতিমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, গা দুলিয়ে চললে হবে? ঐ দেখ পোহাতি-তারা—

এরফান বড্ড বিরক্ত হয়েছে। বিশেষ ক'রে ফতিমার ভাবী শ্বশুরবাড়ী দেখবার পর থেকে। বলে, ভাঁটা সরে বিলের জল নেমে গেছে, দেখছিস না? কি করব? কাঁধ বাধিয়ে ঠেলব নাকি?

তাই—বলেই ফতিমা দিল এক ধাক্কা। আচমকা ঠেলা খেয়ে এরফান পড়ে গেল ধানবনের মধ্যে। নবাবনন্দিনী নৌকোর বসে হুকুম চালাচ্ছে। কি করবে, সাহসে কুলোয় না যে! নইলে এরফানের ইচ্ছে করে, তারও হাত টেনে নামিয়ে আনে।

ফতিমা হাততালি দিয়ে ওঠে। বলে, কাদায় চেহারা খুলেছে ভাল। চিতে বাঘ—ডোরা-কাটা চিতে।

চেহারার তারিফ করে গেছে কিনা তমিজ মিঞা, সেই গরবে মেয়ে আজ আর সকলকে যাচ্ছে-তাই দেখছে। বলুক—বসে বসে যা খুশি বলুক গে। এরফান বিস্তর ঠেলাঠেলি করে অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে গলুয়ে উঠে বসল। না, নড়ে না নৌকা। জোয়ারের জল এসে বিলে না ঢোকা পর্য্যন্ত নৌকা নাড়াতে পারে—তেমন সাধ্য মানুষের কেন, দত্যিদানোরও নেই।

ফতিমার হুঁশ হ'ল। এতক্ষণ পরে, অবস্থা বোধগম্য হয়েছে। করুণ কণ্ঠে বলে, কি হবে তা হলে? তোমার কি—ত্রিসংসারে কেউ নেই। বাপজান জানতে পারলে আমায় যে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

অনেক দুঃখে তারা ঘাটে ফিরে এল, তখন রোদ উঠে গেছে। তা হ'লেও লোকজন কেউ নেই—ভালোয় ভালোয় কাটল বুঝি ফাঁড়াটা! এরফান খেজুর-বাগানে উঠেছে। ফতিমা উত্তরমুখো যাচ্ছে রাস্তা ধরে। এমনি সময়ে দু-দিক দিয়ে দু-জন এসে জাপটে ধরল এরফানকে। এই লোক দু'টোকে চেনে এরফান, ফতিমার বাপের খুব অনুগত লোক।

বলে, এই শুয়োর, আমাদের ডিঙি নিয়ে নিয়েছিলি কার কথা মতো?

গোলমাল শুনে ফতিমা ফিরে দাঁড়াল।

সর্ব্বনাশ! বাপজান যে?

সমস্ত দিন কেটে গেল। পাড়া চুপচাপ। আর কেউ যে কিছু জেনেছে, তার পরিচয় নেই। সেই রাত্রে ফতিমা আবার এসে এরফানের গা ঠেলে। ঘাড় নেড়ে এরফান উষ্ণ কণ্ঠে বলে, না না না—আর আমি যাব না, কোথাও যেতে পারব না।—

ফতিমা বলে, না যদি যাও—একাই চলে যাব আমি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি আর ফিরব না বলে।

দৃঢ়কণ্ঠ। চোখ দুটো ঝকঝক করছে। শুয়ে থাকতে পারে না এরফান; নির্নিমেষ চোখে মেয়েটার দিকে তাকায়। না, তমিজ মোড়ল প্রশংসা করেছিল অকারণ নয়। খাসা চেহারা ফতিমার। বলে, কোথায় যাবি? কদ্দূর?

কদ্দূর, কি বৃত্তান্ত হিসেব ক'রে এসেছি নাকি? যেখানে তুমি নিয়ে যাবে সেইখানে।

এবার ধরলে খুন করে ফেলবে।

দূরে যাব। অনেক—অনেক দূরে। ধরতে না পারে।

কিন্তু বিয়ের ঠিক হচ্ছে যে—

ফতিমা বলে, তাই পালাচ্ছি। বাপ্ রে বাপ্। ঐ উঁচু পাঁচিলের মধ্যে নিয়ে পুরবে। হাঁপিয়ে মরে যাব। আমি মরে যাব এরফান ভাই, একটা দিনও বাঁচব না। ওরা খানদানি ঘর;

শুনেছি বউ নিয়ে দালানে তোলে, বের করে মরে গেলে কবর দেবার সময়।

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে ফতিমা আবার কথা বলে। যেন আর এক মানুষ, গলায় স্বর বদলে গেছে। বলে, তোমার সঙ্গেই বিয়ে হবে আমার। আর কোথাও নয়।

এরফানের কি—বিশ্বসংসারে কেউ নেই, কোন রকম পিছ্টান নেই। যথাসর্ব্বস্ব—অর্থাৎ ঘরের খুঁটিতে ছেঁদা ক'রে রাখা কয়েকটা টাকা এবং কাপড়-গামছা-পিরানের পুঁটুলি নিয়ে সে উঠানে নেমে এল।

বিল। ক্রোশ পাঁচেক উত্তরে পাকা রাস্তা আছে। তালের ডোঙায় এটুকু যাওয়া যাবে। আর ত ফিরবে না তারা, ডোঙা ডুবিয়ে দিয়ে যাবে, কারও কাছে জবাবদিহি করতে যাবে না।

জ্যোৎস্নার আলোয় এরফান তাকিয়ে চমকে উঠল, ও কি রে?

ফতিমা জবাব দেয় না।

এই—এই—এই। হাতে মুখে পিঠে লালচে লালচে দাগ কিসের?

মশার কামড়।

মশা এই রকম কামড়ায়? মারধোর করেছিল নাকি? বল্, সত্যি বল্—

ফতিমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, যাচ্ছ, তাই চলো না—

পাকা রাস্তায় উঠতে রাত পোহাল। হাঁটো—তাড়াতাড়ি পা ফেল—উড়ে চল বাতাসের আগে।

নিমতে-কৈবল্যপুরের হাটখোলায় পৌঁছতে বিকাল হয়ে আসে। পথের ধারে অশ্বত্থ তলায় ফতিমা একদম শুয়ে পড়ল। পারবে না, আর সে এক পা-ও চলতে পারবে না। পায়ের গোছা টনটন করছে, পায়ের তলার এক পর্দ্দা ক্ষয়ে গেছে।

বেশি পথ নেই, সামনে ঐ যে তালগাছ ক'টা ঐখানে খাল—খাল ছাড়িয়ে একটুখানি মোটে···(সে যে কতখানি এরফান তার কিছুই জানে না, এদিকে তার গতায়াত নেই, মুন্সিবাবুদের অতিথিশালার শুধু নামটাই শোনা আছে) একবার গিয়ে উঠতে পারলে হয়, তোফা আরামে রাত কাটানো যাবে।

শেষে খালের ধারে এসে পড়ল। ফতিমা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, দু-চোখে জল গড়াচ্ছে। ছপ-ছপ করে বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক নৌকা।

ও মাঝি, মাঝি-ভাই, একটু তুলে নেবে আমাদের?

রায়-কর্ত্তার নৌকো। ভাড়া খাটে না।

ওপারে যাব। দাও দাদা, এট্টু পার ক'রে দাও—

ধর্ম্মখেয়া রয়েছে। এগিয়ে যাও—

হাঁটতে আর পারছে না।

পারবেই না তো। ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়, ঐ তো মানুষের রীত—

নৌকোর মাঝি রাইচরণ। ঝপঝপ দাঁড় বেয়ে খানিকটা এগুল। একবার পিছন ফিরে দেখে। করে কি ওরা? পাগল নাকি? জলে নামে কেন এই অবেলায়?

বলি, গা-ধোবার শখ হ'ল নাকি?

সাঁতরে পার হব আমরা।

সবুর কর বাপু, একখানা কাণ্ড ক'রে ব'সো না।

গজর-গজর করতে করতে রাইচরণ নৌকা ফিরোয়। বলে, এক ক্রোশ এগিয়ে খেয়ায় উঠবার মুরোদ নেই, সে-সব মানুষ পথে বেরোয় কোন্ লজ্জায়?···কাদা মাখিয়ে দিলে পাটার উপর। কোথাকার আহম্মক হে?

ফতিমা ভয়ানক চটে ওঠে। পা দুটো কি তাহ'লে মাথায় তুলে রাখব? এত খিচ-খিচ করবে ত তুললে কেন নৌকোয়?

রাইচরণ তার দিকে চেয়ে নরম হয়ে বলে, পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। কাদা-কাদা হয়ে গেলে তোমাদেরই অসুবিধা হবে, দিদি।

মুখ বেজার কর তো এক্ষুণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। এটুকু খাল পার হ'তে কি লাগে?

পারে আর পৌঁছতে হবে না। কুমীর হাঁ করে আছে।

তা হ'লে জানব, তোমাদের চেয়ে কুমীরের দয়া বেশি।

মনে মনে রাইচরণ ঘাবড়ে যায়। যা বদরাগী—ঝপাস ক'রে লাফিয়ে পড়া কিছু বিচিত্র নয় এর পক্ষে। এই বয়সের মেয়েগুলোকে সে ভয় করে, খাতিরও করে, এদের সম্বন্ধে প্রায় সে কিছুই জানে না। তবে, জানবে। নিশ্চয় জানবে···বেশি দেরি নেই তার। কিছু টাকার জোগাড় করতে পারলে সে একটা বিয়ে করে ফেলবে। জাতবোষ্টমের ছেলে—ওদের ঘরে মেয়ের বড় দর। এই ধরো, খোলা-হাঁড়ির তলার মত রং, নিতান্ত একটা দুধ-ভাঙা পাত্রীর জন্য পণ হেঁকে বসবে তিন-শ চার-শ। রাইচরণ—তা এরফানের দেড়া বয়স হয়ে গেল বইকি!—বিয়ে সে নিশ্চিত করবে, নইলে শরীর অপটু হ'লে দেখাশোনা করবে কে? সম্প্রতি রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের পানসিতে কাজ পেয়েছে। আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা হচ্ছে। তাহ'লে তাকে পায় কে?

বাঁক দুই গিয়ে রাইচরণ জিজ্ঞাসা করে, ঐ হ'ল ধর্ম্মখেয়া। এইখানটার কথা বলছিলাম। নৌকো ধরব নাকি ওপারে?

ফতিমা বলে, কি এমন ভার-বোঝা আমরা? চল না যেখানে যাচ্ছ—

একটু চুপ করে থেকে সন্তর্পণে রাইচরণ বলে, তা কোথায় যাবে, ঠিকঠাক আছে কি কিছু?

না, কিছু না—

তবে? সন্ধ্যা হয়ে এল। কোথায় উঠবে? তোমাদের কুটুম্ব-আত্মীয় কেউ—

তোমার বাড়ী উঠছি না, মাঝি। অত কথান্তর কিসের জন্য শুনি?

কিন্তু উঠতে হ'ল তো ঐ রাইচরণেরই বাড়ী। বাড়ী মানে চারপোতার মধ্যে একখানা ঘর। ঘরও ঠিক নয়, বিঘতখানেক

উঁচু ভিটার উপর তালপাতায় ছাওয়া দো-চালা। আরও একটু চাল আড়াআড়ি ওর সঙ্গে জুড়ে গোয়াল বানানো হয়েছে। গরুটা এই ক'মাস মরে গিয়েছে, গোয়াল খাড়া আছে।

নৌকো কূলে লাগিয়ে রাইচরণ জিজ্ঞাসা করে, কি জাত তোমরা ?

মোছলমান—

এই হয়েছে !

ফতিমা বলে, হবে আবার কি ? তোমার ঘরে তো যাচ্ছি না।

না, ঘরে যাবে কেন ? বাইরে থেকে কাণ্ড ঘটিয়ে ব'সো। সোমত্ত মেয়েমানুষ—কত রকম ভয়-ভীত। ডাঙার মানুষের ভয় জলের কুমীরের চেয়ে বেশি।

রাগ ক'রে সে কাঁথা-মাদুর গোয়ালে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। জলের কলসী বের করে নিয়ে আসে।

পরদিন রাইচরণ বলে, গোয়ালে পড়ে মিছে মশার কামড় খেয়ে কি হবে ? বাদায় যাবি খাটতে ?

ইতিমধ্যে এরফান সমস্ত বলেছে রাইচরণকে। বলে, ফতিমার বাপ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। খোঁজ পেলে আস্ত রাখবে না।

বাপের চোদ্দ পুরুষে খোঁজ পাবে না, সে এমনি জায়গা। মানুষ নেই—বাঘ সাপ আর হরিণ। আমরা বাদায় গিয়ে বন কাটব, গোলা বাঁধব। ঘর-গেরস্থালি জায়গা-জমি হবে আমাদের।

নগর-গ্রাম নদী-মাঠ যত কিছু জানা জায়গা, সমস্ত মানুষে বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছে। আজও সেখানে মাপের ফিতে পড়ে নি, সেখানে এরা দু'জন চলল পরম আশ্বাসে—একজনে জীবনান্তের আগে একটা বউ যোগাড় করবার ভরসায়, আর একজন আপনি-এসে-পড়া বউটা পাছে বা হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই আতঙ্কে।

রাজচন্দ্র রায় বাদার বন্দোবস্ত নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন, সত্যি-মিথ্যে কতজনকে কত রকম প্রলোভন দেখাচ্ছেন কিন্তু কোন চাষী এগুতে চায় না। এই সময়ে এদের দু'জনকে পেয়ে লুফে নিলেন। বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই বাপধনেরা। কাছারি করেছি এপারে চরের উপর মিত্তিরবাবুদের এলাকার মধ্যে। মিত্তিরবাবুরা আমাদের কুটুম্ব, তাদের বলে কয়ে নিয়েছি, বাদা হাসিল না হওয়া পর্য্যন্ত থাকতে দিয়েছে। সকালবেলা উঠে দিব্যি ভরপেট পান্তা খেয়ে পার হয়ে যেও। আমি বরঞ্চ এরফানের বউটার জন্য কাছারির পাশে একটা ঘর বেঁধে দেব। তোফা থাকবে। বাঘ কেন একটা পাতিশিয়াল অবধি দেখতে পাবে না এ পারে।

ভাল দিন দেখে প্রথম এরা কুড়াল মারল বাদার গাছে।

দেখাদেখি এবং করকরে নগদ টাকার লোভে দু-এক করে আরও অনেক লোক খাল পার হয়ে জন খাটতে যায়। সেই যে একদা এরফান সাপের মন্ত্র শিখত, গরজে পড়ে ইতিমধ্যে বিদ্যেটা সে আয়ত্ত করে ফেলেছে কাছাকাছি এক নামজাদা গুণিনের কাছ থেকে। বাঘবন্ধনও শিখে ফেলেছে। জঙ্গলের সীমানায় নৌকা বেঁধে যে যার গরানের লাঠি নোনা-কাদায় পোঁতে, (শক্ত করে পুঁততে হবে, কারও লাঠি দৈবাৎ উপড়ে পড়লে বাঘের হাতে তার মৃত্যু নির্ঘাৎ) এরফান বাওয়ালি উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়তে থাকে···রাইচরণ গাদা-বন্দুক হাতে তদারক করে বেড়ায়, ঠকাঠক পঞ্চাশ মরদের কুড়াল পড়ে, সবুজ সতেজ গাছ থর-থর ক'রে কেঁপে ভূমিশয্যা নেয়। ফিরতি মুখে পোঁতা লাঠিগুলো তুলে নৌকো বেয়ে সকলে পার হয়ে আসে। এক দিককার জঙ্গল সাফ হয়ে এল। নিঃশব্দ ছায়াভূমি গাছেরা সন্তর্পণে সূর্য্যের আলো থেকে আড়াল করে রেখেছিল, জোয়ারের জল উঠে খেলা করত,—অনন্ত কাল পরে সেখানে দেখা দিল ফাঁকা মাঠ, নোনা-কাদায় কে যেন যত্ন করে নিকিয়ে রেখেছে। আজকাল যেটাকে বলে হাজারির চক অর্থাৎ যার মধ্যে কম-বেশি হাজার বিঘা জমি—এটে হাসিল করতেই এদের লেগেছিল দু-বছরের বেশি।

তারপরে বাঁধবন্দির পালা। জায়গায় জায়গায় মাটি একেবারে অমিল, নৌকো বোঝাই ক'রে ওপার থেকে শুকনো মাটি এনে ঢালতে হ'ল। দুর্ব্বার জলস্রোত চকে ঢুকবার আর পথ পায় না। বাক্স বসান হ'ল খালের মুখে। শেষাশেষি তার পাশে স্লুইস-গেট হ'ল। মাটির উপরে জমানো নুন বর্ষার জলধারায় ধুয়ে শোধিত হয়ে যায়। কাটা গাছের গোড়া থেকে যে-সব ছোট ছোট ডাল বেরিয়েছিল আবার তা কেটে দেওয়া হ'ল। গাছের গোড়ার মধ্যে লাঙল চালানোর জো নেই ; ক' বছর তাই প্রথম জ্যৈষ্ঠে খালি ধান ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত। পতিত-ভূমিতে দেখা দিল সবুজ চারা। বর্ষার জলে ধানের গোছা ফেঁপে ফুলে ওঠে ; জঙ্গলের কিনারে হাজারির চক ফসলের গৌরবে ঝলমল করে।

রাজচন্দ্র চৌধুরী গোড়ায় মাসে একবার দু'বার আসতেন। নূতন ফসল দেখা দিলে তিনি যেন পাগল হয়ে উঠলেন, কাছারি ছেড়ে নড়তে চান না। আর পাগল হ'ল রাইচরণ ও এরফান। চকের মাঝামাঝি নাবাল মতো একটু জায়গা, সেখানে ধান হয় নি, জল জমে আছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ঐ মিঠে জল খেতে রাত্রি বেলা জঙ্গল থেকে কোন কোন প্রাণী বেরিয়ে আসে। এমন কি এক রাতে জলের অধিকার নিয়েই সম্ভবত কিছু হাঙ্গামা হয়েছিল। সকালে দেখা গেল, খানিকটা জায়গায় তেজি চারা পিষ্ট হয়ে মাটির নিচে গেছে।

এরফান আর রাইচরণ সারাটা দিন ধরে গাছের উপর মাচা বাঁধল। সন্ধ্যায় তারা বাড়ী ফিরল না, মাচার উপর বসে টিন পিটিয়ে পিটিয়ে সমস্ত রাত জানোয়ার তাড়ায়। একজন যখন ঘুমোয়, পালা করে আর একজন সেই সময় জেগে থাকে।

পরদিন ফতিমা ভাল ক'রে কথাই বলে না এরফানের সঙ্গে। এরফান নানা কৌশলে বউকে হাসাবার চেষ্টা করে। অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে ফতিমা বলে, কোন্ আক্কেলে তুমি বনের মধ্যে রাত কাটালে বলো। চোখের পাতা এক করতে পারি নি, কেবল ঘর-বার করেছি—

হাত ধরে বউকে টানতে টানতে এরফান খাল ধারে নিয়ে

াসে। ওপারের দিগ্‌ব্যাপ্ত ক্ষেতের দিকে দেখিয়ে বলে, দেখ্‌ াগলী, চেয়ে দেখ্‌ বন কি আর আছে? বনের মধ্যে সোনার ত্তন করেছি। ধানের চারা দলে মলে নৈরেকার করল, আমরা ্ চোখ চেয়ে তা দেখতে পারি?

কিন্তু ফতিমা বোঝে না। কাঁদে। সেই দুঃসাহসী মেয়ে কেবারে কি হয়ে গেছে—দিনমানটা কোনক্রমে কাটায়, রাত্রি লই অজানা আশঙ্কায় তার বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে। রফান উঠানে এসে দাঁড়ালে তবে সে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

তখন অতি সঙ্কোচে এরফান রাইচরণকে গিয়ে বলে, আজকে তটা আমায় ছেড়ে দিতে হবে, দাদা।

রাইচরণ হেসে অস্থির।

তোকে একেবারেই ছেড়ে দিলাম, এরফান-ভাই। সত্যিই —দিন-রাত জোত করবি, জরু তা শুনবে কেন? আমার কি— ামি একা মানুষ, সচ্ছন্দে একা থাকতে পারব। ফতিমা-দিদিকে ড়ে কোনদিন আর যাবি তো, ঘুম পড়লে মাচান থেকে ধাক্কা রে তোকে ফেলে দেব, এই বলে দিলাম।

আরও মাস চারেক পরের কথা। কাছারির সামনে দুটো ালা বাঁধা হয়েছে। মাঠের ধান গোলায় উঠছে। রাজচন্দ্র য় বনের বাকি অংশ হাসিলের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

ওদিকটায় সুন্দরীগাছ বেশি। দামি কাঠ—রায় মশায় এখান কে চলে যাবার আগে গাছ গুন্‌তি করে একটা হিসাব নিতে ন। ভাল মন্দ নানা রকম মানুষ ত আছে, বন কাটার মুখে কাঠের াপারির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে কেউ গাছ সরিয়ে দিতে না পারে! ুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাজচন্দ্র নিজে বেরুলেন ওদের সঙ্গে, সব কাজ কর্ত্তার নিজের চোখের উপর না হ'লে তৃপ্তি হয় না। ঝি-মাল্লা নৌকায় রইল, শুধু তিনজন নামল চরের উপর— বু, এরফান বাওয়ালি আর রাইচরণ যথারীতি মন্ত্র পড়ে এরফান গাবার সঙ্কেত করে। চারিদিক দেখে সাবধানে তারা পা লছে। বাবুর হাতে বন্দুক, বাওয়ালির মতে ওর কোনই য়োজন নেই—তবু বাবু শোনেন নি।

শুলোর আঘাতে বাবুর পা রক্তাক্ত হ'ল। এদের পায়ে চামড়া । নয়, যেন ইস্পাত-আঁটা···শুলোই ভেঙে যাবে, পায়ের কিছু ব না। সুন্দরীগাছে এক এক কোপ মারা হচ্ছে, বাবু কাগজে ক নিচ্ছেন। শেষে তিনি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

গতিক দেখে এরফান প্রস্তাব করে, আপনি তা হলে সিধে গয়ে যান কর্ত্তা। রশিটাক গিয়ে সামনে চকের বাঁধ। কোটা ঘুরিয়ে ওদিকে নিয়ে যাক—আপনি বাঁধে গিয়ে দাঁড়ান। মি আর রাইচরণ জঙ্গল ঘুরে যাচ্ছি। সুঁদুর গাছ পেলে ালের ঘা দেবো, আওয়াজ শুনলে আপনি লিখে নেবেন।

প্রস্তাব বাবু পছন্দ করলেন; তবে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে াকী তিনি যাবেন না, রাইচরণকে সঙ্গে নিতে চান। বললেন, তুমি হলে গুণীন মানুষ, বনবিবির মরজিতে কিছুতে ছুঁতে পারবে না তোমায়। রাইচরণকে নিয়ে কি করবে?

বেশ ত। আপনার সঙ্গেই থাক। হাসি মুখে এরফান ডানহাতি জঙ্গলে ঢ়ুকল। ওকে একা যেতে দিতে রাইচরণের মন সরছিল না, কিন্তু কি করা যায়—সামনাসামনি আপত্তি করা চলে না তো কুড়ালের অনেক আওয়াজ আসছে। প্রসন্ন হাসিতে বাবুর মুখ ভরে গেল। এত গাছ ঐটুকু জঙ্গলে? এই ঘেরটুকু তা হলে খুবই লাভজনক হয়েছে, বন-কাটার খরচ এক পয়সাও ঘর থেকে দিতে হবে না, সুন্দরীগাছ বেচে উঠে যাবে।—হঠাৎ একটা শব্দ, এক মুহূর্ত্ত অনতিস্ফুট আর্ত্তনাদ। সর্ব্বনাশ! বাদার মানুষ সবাই এর অর্থ জানে।

রাইচরণ ছুটল। বাবুও ছুটলেন পিছু-পিছু। বাঘ উজ্জ্বল ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল রাইচরণের দিকে। থাবার নিচে এরফান বাওয়ালি—অচেতন। বাঘ-বন্ধনের এত মন্ত্রতন্ত্র—তাকে ঠেকাতে পারে নি।

বাঘের নজর থেকে নজর সরালে সর্ব্বনাশ। তবু রাইচরণ একটু আড়চোখে বাবুকে দেখল। বাবু হতভম্ব; বন্দুক ঠিকই বাগানো আছে, কিন্তু ছাড়বে কে? যেন একটি নিস্পন্দ পুতুল।

হিড়হিড় করে রাইচরণ তাঁকে খানিকটা পিছিয়ে আনল। টানাটানিতে রাজচন্দ্র যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। গুলি করলেন। হাতের টিপ অব্যর্থ—ঠিক লেগেছে। বাঘ তখন এরফানকে ছেড়ে ওদের দিকে লাফ দিল। অত দূর পৌছতে পারল না, ঝুপসি-মতো এক গেঁয়ো-ঝাড়ের উপর গিয়ে পড়ল। রায়ের সর্ব্বদেহ থর-থর করে কাঁপছে। আবার গুলি করলেন। বাঘ আর উঠল না।

নৌকা নিয়ে রাজচন্দ্র কাছারি চলে গেলেন। খবর পেয়ে লোক-জন পেয়াদা পাইক অনেকে এসে জুটল। প্রকাণ্ড বাঘ—এত বড় বাঘ মারার দরুণ সবাই বাবুকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। এরফানের মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বসে আছে জাতবোষ্টমের ছেলে রাইচরণ। ওরা স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছিল আর কোন দেশে, রাইচরণই জপিয়ে জাপিয়ে তাদের এখানে এনেছে, এই অবস্থার জন্য সে-ই দায়ী। এরফান ইদানীং যে গুণীনের সাকরেদি করছিল, তাকে আনতে লোক চলে গেছে। ইতিমধ্যে রোগীকে সুন্দরীগাছের আঠা খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, সুন্দরীর পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে ঘায়ে লাগানো হচ্ছে। বাঘে কামড়ানোর এই বড় অষুধ।

সন্ধ্যার পরে গুণীন এসে পৌছল। রোগীকে নাড়ানাড়ি করা নিষেধ, রক্তস্রোত অনেক কষ্টে এই সবে বন্ধ হয়েছে। কেওড়াগাছের বড় বড় শিকড় বেয়ে রক্ত গড়িয়েছে, জায়গাটা রাঙা হয়ে আছে। আরও রাত্রি হলে দুই-এক করে সকলেই সরে পড়ল। আবার কোন উৎপাত না হয়, সেইজন্য চারিদিকে শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে, জঙ্গল আলো হয়ে গেছে। পূর্ণিমা রাত্রি, জ্যোৎস্না ফুট-ফুট করছে, চারিদিক নিঃশব্দ নির্জ্জন। দূর থেকে এক একবার

হরিণের ডাক আসে। মুমূর্ষুকে নিয়ে জেগে রয়েছে রাইচরণ আর ঐ গুণীন।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। খালের ওপারে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে ফতিমা। ডাকছে, ও ভাইজান, আমি যাবো, আমায় একটু নিয়ে যাও—

অনেকক্ষণ গোপন ছিল, এখন হতভাগী শুনতে পেয়েছে কেমন করে। সে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। বাপ-ভাই ছেড়ে সমস্ত পৃথিবীকে অবহেলা করে এরফানের সঙ্গে এসেছিল, সে গেলে সংসারে আর তার কি থাকবে বল। বলে, ও ভাই, একটাবার, আমি দেখবো; আমায় ফেলে যেতে ওকে আমি দেবো না।

সকালবেলা রক্তাক্ত মড়া এপারে আনা হ'ল। ফতিমা এলোচুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুড়ো রাইচরণ সে ছবি আজও স্পষ্ট মনে করতে পারে। পাগল হয়ে ফতিমা মাথা খুঁড়ছে আর বলছে, ভাইজান গো, কি হবে আমার? আমি কোথায় যাব?

মিত্তিরবাবুদের নায়েব রাজচন্দ্র রায়কে বললেন, ঝঞ্চাট আবার এপারে নিয়ে এলেন কেন? না মশায়, কাছারি করতে দেওয়া হয়েছে বলে যে গোরস্থানও করবেন, সে হতে পাবে না। দখলি-স্বত্ব জন্মে যাবে, পরে কত রকম কথা উঠবে—

অতএব পুনশ্চ মড়া পার করে জঙ্গলের ধারে নেওয়া হ'ল। কেওড়া গাছটা নিশানা, কবরের চারি পাশ কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘিরে দিল, জন্তু-জানোয়ারে যাতে খোঁড়াখুড়ি করতে না পারে।

এখন ও-অঞ্চলে জল-জঙ্গল আর নেই। জমি সোনার দামে বিকোচ্ছে। খালের ঘাটে মস্ত বড় সাইনবোর্ড 'রাজনগর'—উদ্যোগী পুরুষসিংহ রাজচন্দ্র রায় মশায়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করছে। বিগত ৮ই আশ্বিন রাজচন্দ্র হস্পিট্যালের ভিত্তিস্থাপনা উপলক্ষে আমি গিয়েছিলাম ঐ রাজনগরে। রাজচন্দ্রের নাতি সনৎকুমার উৎসাহী হৃদয়বান্ যুবা; ইতিপূর্ব্বে সে ওখানে মাইনর ইস্কুল বসিয়েছে, এবার হাসপাতাল তৈরি করল। আপনারা খবরের কাগজে এসব বিস্তারিত ভাবে পাঠ করেছেন। আমাকে যে টেনে হিঁচড়ে অত দূর ধরে নিয়ে গেল, নিঃসন্দেহ আমি খবরের কাগজে চাকরি করি বলে। আমাদের তোয়াজ করলে খবর বেশ ফলাও হয়ে বেরোয়, বড়লোকেরা তা বোঝে। তাই এত খাতির।

ভিড়ের মধ্যে সুরকি দিয়ে প্রথম ইটখানা বসাবে সনৎকুমার নিজে। সভা হবে, বক্তৃতা হবে, সেজন্য ও-দিকে পাল খাটান হয়েছে। দুপুর থেকে অনুষ্ঠান শুরু, সকালবেলা নক্সা-মাফিক ভিতটা কেটে রাখা হচ্ছে। আমিন খোঁটা পুঁতে দিয়েছে, কোদালিরা দাগ ধরে কেটে যাচ্ছে। আমি আর সনৎকুমার এক পাশে চৌকির উপর বসে। প্রজাদেরও একটা ছোটখাটো ভিড় জমেছে, সসম্ভ্রমে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে।

বুড়ো রাইচরণ তাদের মধ্যে ছিল। সে চেঁচিয়ে উঠল, না হুজুর, না—না। ও মাটি কাটতে মানা করুন, এরফান বাওয়ালির কবর ওখানটায়।

কবর? মুসলমান প্রজারা নূতন পল্লী বসিয়েছে, তার মাঝখানে ছায়াময় তলতাবাঁশের ঝাড়ের নিচে তাদের কবরখানা। সেখান থেকে এত দূরে অনাবৃত নদীতটে কেওড়াতলায় এই পড়ো জমিটুকু—ইটের গাঁথনি নেই, কোন রকম পরিচয়-চিহ্ন নেই—কে বিশ্বাস করবে বুড়োর মুখের কথা? সনৎ বলে, মৌলবি সাহেব, গেল-বছর যখন এসে মাপজোপ করে গেলাম—আপনি তো কই, এ সব কিছু বললেন না—

মৌলবি হেদায়েৎউল্লা এ অঞ্চলের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। দাড়ির ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, একদম বাজে কথা, হুজুর। পঞ্চাশ ঘর মুসলমান আছি আমরা রাজনগরে। কেউ বলছি না, ও বুড়োর জাত নয়, জ্ঞাত নয়—ওর অত কড়ফড়ানি কেন বলুন তো?

রাইচরণ বলে, জাত নাই সেকথা সত্যি। কিন্তু আমার চেয়ে এরফানের আপনার লোক কে? একজন ছিল—ফতিমা পাগলী—সে তো আর মানুষের মধ্যে পড়ে না।

শেষে রাইচরণ শুয়ে পড়ল সেই কেওড়াগাছতলায়। বলে, ইচ্ছে হয় বুকে কোদাল মারো। তিনকালের ভুষণ্ডী কাক বেঁচে রয়েছি। আমার হাড় কখানা চিতেয় যাক, তার পরে খুঁড়ে ফেলে দিও আমার সাঙাৎ-সাকরেদ যে যেখানে আছে।

বৈরাগীকে অনেক বোঝানো হ'ল। সে জবাব দেয় না, চোখ বুঁজে থাকে। মহৎ কাজে এই রকম বাধা—সনৎ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আমি একপাশে নিয়ে বোঝাতে লাগলাম, দেখ, চটাচটি ক'রো না; ওতে নাম খারাপ হবে। বিকেলে সভা, তার ত দেরি আছে। আচ্ছা, আমি দেখছি চেষ্টা করে—

কোদালিদের বিদায় দিয়ে রাইচরণের পাশে গিয়ে বসলাম।

চেয়েই দেখ না ভাই। কেউ নেই এখানে, একলা আমি—

হাত ধরে তাকে নিয়ে এলাম কাছারির পূবের ঘরটায় যেখানে আমি আছি। একটা সিগারেট দিলাম। তিন-চার টানে সেটা প্রায় কাবার করে রাইচরণ বলে, উঁহু, জুৎ হয় না, বাবু। বড্ড ফ্যাকসা—গলায় সেঁকও লাগে না।

ক্রমশ ভাব জমে ওঠে। এরফান ও ফতিমার গল্প শুনলাম—এই এতক্ষণ যা সমস্ত বললাম তোমাদের। জঙ্গল কাটবার সময়-কার আরও কত কথা যে বলল। একলা কি ঐ এরফান বাওয়ালি—কত চাষা সাপ-বাঘ-কুমীরের কবলে মারা গেছে, জ্বরে ওলাওঠায় ভুগে ভুগে মরেছে, বানের জলে ভেসে উৎখাত হয়ে গেছে, অত সমস্ত কে মনে করে রেখেছে বলো।

পরদিন দৈবাৎ ফতিমাকেও দেখে ফেলেছিলাম।

চাঁদ আজও ওঠে, মাসে মাসে পূর্ণিমা লাগে, খালের জল বাঁধের মাথা অবধি উঁচু হয়ে ছলমল করে। ফতিমার কালো চুলের রাশি সাদা হতে হতে শনের নুড়ি হয়ে গেছে, চামড়া লোল, গতি শ্লথ, খালের ধারে ধারে এখন আর এরফানের খোঁজ করে

না, গৃহস্থদের বাড়ি গরু-বাছুর ফিরবার পর গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়। খোনা খোনা সুরে কথা বলে ফতিমা বুড়ি; দরদ দেখিয়ে ভাল কথা বলতে গেলে মনে করে ক্ষেপাচ্ছে, 'ঝাঁটা মার্, ঝাঁটা মার্' করে ওঠে; যখন একজায়গায় চুপটি করে বসে, আপনা-আপনি ঘাড় কাঁপে। তা হলেও সে বেঁচে আছে। বেঁচে আছে ছাড়া আর কি বলা চলে?

সনৎকুমার লেখাপড়া শিখেছে। ভাল ছেলে, হৃদয়বান্। এরফান বাওয়ালির কথা শুনে সে নিজে থেকেই প্রস্তাব করে, হাসপাতাল আরও দক্ষিণে সরিয়ে করা হবে। রাজনগরের হাজার হাজার বিঘা ক্ষেতে দোলায়িত সবুজ শস্যশীষ—ঐ সরকারী সাতটা গোলায় পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের জন্য মনে মনে বোধ করি যে এরফানের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল। প্রস্তাব করে, যেখানে এরফানকে বাঘে ধরেছিল সেই কেওড়াগাছের নিচে সে একটা পাথর খোদাই করে বসাবে।...

কিন্তু ক'টা পাথর বসাবে, ভাই? নোনা-মাটির পরতে পরতে মানুষের পঞ্জরাস্থি; স্মৃতিস্তম্ভ বসাতে গেলে তোমাদের গোটা আবাদ, এই শস্যশ্যামা নিখিল ধরিত্রী, পাথরের অরণ্য হয়ে যাবে, লাঙল ঘোরাবার জায়গা হবে না। ও হাঙ্গামে কাজ নেই। তার চেয়ে সাইনবোর্ডখানায় রাজনগর নামটা এবার সোনার অক্ষরে লিখিয়ে দাও—নৌকায় ও মোটরলঞ্চে বড় গাঙ দিয়ে হাজার হাজার যাত্রী গতায়াত করে, কারো নজর যাতে এড়াতে না পারে।

নিবর্ত্তন এবং গোচর্ম্মের ভূমি-পরিমাণ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা হইতে জানা যায়, সে-যুগে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রচলিত ভূমি-পরিমাপের নাম ছিল নিবর্ত্তন। ইহা দক্ষিণাপথের প্রায় সর্ব্বত্র এবং উত্তর-ভারতের বহু জনপদে প্রচলিত ছিল। অবশ্য বাংলা দেশে নিবর্ত্তনের মাপ পরিচিত ছিল কিনা, তাহা জানা যায় নাই। প্রাচীন ভারতের অপর একটি সুপরিচিত ভূমি-পরিমাপের নাম গোচর্ম্ম। ইহা ঠিক কোন্ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাহা বলা কঠিন। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রে ভূমিদান প্রসঙ্গে গোচর্ম্মের উল্লেখ আছে; তাম্রশাসনাদিতে এই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। বাংলা দেশের প্রাচীন লিপিতেও গোচর্ম্মের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২।৩৮) দেখা যায়, "অষ্টাঙ্গুলা ধনুর্মুষ্টিঃ। দ্বাদশাঙ্গুলো বিতস্তিঃ ছায়াপৌরুষং চ। দ্বিবিতস্তিররত্নিঃ প্রাজাপত্যো হস্তঃ। সধনুর্মুষ্টিঃ কিষ্কুঃ কংসো বা। ষট্‌কংসো দণ্ডো ব্রহ্মদেয়াতিথ্যমানম্। দশ দণ্ডো রজ্জুঃ। ত্রিরজ্জুকং নিবর্ত্তনম্।" অর্থাৎ, ৮ অঙ্গুলি = ১ ধনুর্মুষ্টি। ১২ অঙ্গুলি = ১ বিতস্তি বা ছায়াপৌরুষ। ২ বিতস্তি (২৪ অঙ্গুলি) = ১ অরত্নি বা প্রাজাপত্য হস্ত। ২ বিতস্তি + ১ ধনুর্মুষ্টি (মোট ১ হাত ৮ অঙ্গুলি) = ১ কিষ্কু বা কংস। ৬ কংস (৮ হাত) = ১ দণ্ড (ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তরাদির জন্য ভূমি মাপিবার কার্য্যে ব্যবহৃত)। ১০ দণ্ড (৮০ হাত) = ১ রজ্জু। ৩ × ৩ বর্গ রজ্জু (২৪০ × ২৪০ বর্গ হাত) = ১ নিবর্ত্তন।

কৌটিল্য স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও টীকাকার বলিয়াছেন, নিবর্ত্তন ক্ষেত্রফল পরিমাপের সংজ্ঞা। লেখমালা হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং অর্থশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, এক নিবর্ত্তন ভূমির পরিমাণ ২৪০ × ২৪০ = ৫৭৬০০ বর্গ হাত, অর্থাৎ ইংরেজী মাপের ২·৯৭৫ একর এবং আমাদের মাপের ৯ বিঘা জমি। কিন্তু কৌটিল্য একটি বিশেষ মাপের উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার মতে ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তরাদির জন্য ভূমি মাপিবার কার্য্যে ৮ হাত দীর্ঘ দণ্ড বা নল ব্যবহৃত হইত। অন্য উদ্দেশ্যে ভূমি মাপিবার কার্য্যে কত হাত দীর্ঘ নলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় না। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের জনৈক টীকাকার বলিয়াছেন যে, নিবর্ত্তনের মাপে ৪ হাত দীর্ঘ দণ্ড বা নল ব্যবহৃত হইত। সুতরাং এই টীকাকারের মতে ১২০ × ১২০ বর্গ হাত = ১৪৪০০ বর্গ হাত, অর্থাৎ ইংরেজী মাপে ·৭৪৩ একর এবং আমাদের হিসাবে ২¼ বিঘা জমিতে এক নিবর্ত্তন হইত। সম্ভবতঃ এ স্থলে বিশেষ মাপে ৮ হাতী নল এবং সাধারণ মাপে ৪ হাতী নলের ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। আমি অন্যত্র কুল্যবাপ এবং দ্রোণবাপের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, হাত ও নলের দৈর্ঘ্যের তারতম্যবশতঃ মৌলিক ভূমি পরিমাপ-সমূহ স্থানকালভেদে বিভিন্ন আয়তন লাভ করিত। সুতরাং কৌটিল্য এবং তাঁহার টীকাকার এক যুগে বা এক অঞ্চলে প্রচলিত নিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন কি না, তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না।

আবার কৌটিল্য ও তাঁহার টীকাকারের উল্লিখিত নিবর্ত্তন ছাড়াও ভিন্ন আয়তনের নিবর্ত্তন কোন-সময়ে ভারতের অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। বিজ্ঞানেশ্বর-

রচিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার (আচারাধ্যায়, ২১০ শ্লোক) মিতাক্ষরা টীকায় স্মৃতিনিবন্ধকার বৃহস্পতির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, "সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্" অর্থাৎ ৭ হাত = ১ দণ্ড এবং ৩০ × ৩০ বর্গ দণ্ড বা ২১০ × ২১০ বর্গ হাত (= ৪৪১০০ বর্গ হাত) = ১ নিবর্ত্তন। সুতরাং বৃহস্পতির মতে এক নিবর্ত্তন ভূমি ইংরেজী মাপে ২⅓ একর এবং আমাদের হিসাবে প্রায় ৭ বিঘা। উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল, প্রাচীন ভারতবর্ষে অন্ততঃপক্ষে তিন প্রকার বিভিন্ন আয়তনবিশিষ্ট নিবর্ত্তন প্রচলিত ছিল—কৌটিল্যের নিবর্ত্তন ৯ বিঘা; অর্থশাস্ত্রের টীকাকারের নিবর্ত্তন ২⅓ বিঘা এবং বৃহস্পতির নিবর্ত্তন প্রায় ৭ বিঘা।

গোচর্ম্ম সম্পর্কেও পূর্ব্বোল্লিখিতবৎ মতদ্বৈধ দেখিতে পাই। আমি পূর্ব্বে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, স্মৃতিনিবন্ধকার বশিষ্ঠের মতে—

"দশহস্তেন দণ্ডেন দশদণ্ডান্ সমন্ততঃ।
পঞ্চ চাভ্যধিকান্দদ্যাদেতদ্গোচর্ম্ম চোচ্যতে।"

অর্থাৎ ১০ হাত = ১ দণ্ড এবং ১৫ × ১৫ বর্গ দণ্ড (১৫০ × ১৫০ বর্গ হাত = ২২৫০০ বর্গ হাত) = ১ গোচর্ম্ম। এই হিসাব অনুসারে এক গোচর্ম্ম ভূমি ১⅛ একর অর্থাৎ আমাদের ৩½ বিঘার সমান।

আশ্চর্য্যের বিষয়, পরাশরসংহিতার দ্বাদশাধ্যায়ে ৪৩তম শ্লোকে যে গোচর্ম্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার আয়তন বহুগুণে অধিক। এ স্থলে গোচর্ম্মের প্রকৃত ভূমি-পরিমাণ উল্লেখ না করিয়া শুধু বলা হইয়াছে—

"গবাং শতং সৈকবৃষং যত্র তিষ্ঠত্যযন্ত্রিতম্।
তৎ ক্ষেত্রং দশগুণিতং গোচর্ম্ম পরিকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ যে আয়তনের ক্ষেত্রে একটি বৃষ সহ এক শত ধেনু মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিতে পারে, তাহার দশগুণ ক্ষেত্রকে গোচর্ম্ম বলে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পরাশর-নির্দ্দিষ্ট গোচর্ম্ম বশিষ্ঠ-কথিত সাড়ে তিন বিঘাত্মক গোচর্ম্ম অপেক্ষা বহুগুণে বৃহদায়তন।

পূর্ব্বে বিজ্ঞানেশ্বর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বৃহস্পতির একটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছি। উহাতে নিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে গোচর্ম্মেরও আয়তন লিখিত আছে। বৃহস্পতির মতে—

"সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব গোচর্ম্ম দত্বা স্বর্গে মহীয়তে।"

অর্থাৎ ১০ নিবর্ত্তন = ১ গোচর্ম্ম। আমরা দেখিয়াছি, বৃহস্পতির হিসাবে এক নিবর্ত্তন আমাদের প্রায় সাত বিঘার সমান। সুতরাং তাঁহার মতে প্রায় ২২½ একর বা ৬৯ বিঘা জমিতে এক গোচর্ম্ম হইত। সম্ভবতঃ পরাশর-সংহিতার নিবন্ধকার এইরূপ বিশাল আয়তনবিশিষ্ট গোচর্ম্মেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। যাহা হউক, দেখা গেল, বশিষ্ঠের মতে গোচর্ম্ম ৩½ বিঘা; কিন্তু বৃহস্পতির হিসাবে উহা প্রায় ৬৯ বিঘা।

নিবর্ত্তন এবং গোচর্ম্ম সম্পর্কে অপর কোন নিবন্ধকারের মত আমার জানা নাই। "প্রবাসী"র সুপণ্ডিত পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও এ বিষয়ে কিছু জানা থাকিতে পারে। তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য জানান, তবে অত্যন্ত উপকৃত হইব।



শ্রীমতী আরতি বসু

মহিলা-সংবাদ

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আরতি বসু এ বৎসর আশুতোষ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় ভূগোলে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

চাষবাসের কথা

রায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

৩

কৃষিযন্ত্রাদি

ভূমিকর্ষণের ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকমের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়; উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির কার্য্যকারিতা ও বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

(১) লাঙ্গল—জমিচাষের জন্য লাঙ্গলই আমাদের প্রধান কৃষিযন্ত্র। লাঙ্গল এমন হওয়া দরকার, যাহা দ্বারা মাটি একেবারে উল্টাইয়া যায়, অর্থাৎ উপরের মাটি নীচে চলিয়া যায় ও নীচের মাটি উপরে আসে। কেননা মাটি এইরূপ ভাবে ওলট-পালট হইলেই তবে উহা হাল্কা হইয়া যায় এবং তখনই উহার মধ্যে বায়ু, জল ও উত্তাপ অনায়াসে চলাচল করিতে পারে। ইহার ফলে, মাটির মধ্যে ফসলের খাদ্যের যে-সকল উপাদান থাকে, সেগুলি তরল হইয়া যায় এবং তখন শস্যাদি শিকড়ের সাহায্যে উহা অতি সহজে সংগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং মাটির ফলন-শক্তি বাড়িয়া যায়।

কিন্তু দেশী লাঙ্গলের দ্বারা চাষের সময় মাটি উল্টাইয়া যায় না, কেবল মাত্র কাটিয়া যায় ও কর্ষিত মাটি হালের দুই ধারে চলিয়া পড়ে এবং দুইটি V আকারের ন্যায় নালী হইয়া যায় ও দুইটি নালীর মধ্যের জমি অকর্ষিত অবস্থায় থাকে। ফলে, দেশী লাঙ্গলের দ্বারা জমি একবার কর্ষণ করিলে জমির সকল অংশ কর্ষিত হয় না। এই জন্য বার বার লম্বালম্বি ও এড়োএড়ি ভাবে লাঙ্গল দিয়া এইরূপ অকর্ষিত অংশগুলি ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। দেশী লাঙ্গলের দ্বারা মাটি উল্টাইয়া যায় না বলিয়া মাটিতে ভালরূপে জল, বায়ু ও রৌদ্র চলাচল করিতে পারে না এবং ঘাসজঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি সহজে নষ্ট হয় না। চাষও গভীর হয় না। সুতরাং দেশী লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ করিলে ভাল ফসল পাওয়ার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে।

বাংলা দেশের কৃষিবিভাগ কয়েক প্রকার উন্নত ধরণের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রধানতঃ এই সকল লাঙ্গলের ফালের একধারে পাখার মতন একটি জিনিস আছে। ইংরেজীতে ইহাকে "মোল্ড বোর্ড" বলে; এইরূপ পাখা থাকার জন্য উহা দ্বারা মাটি চাষ করিবার সময় কর্ষিত মাটি একেবারে উল্টাইয়া যায় অর্থাৎ উপরের মাটি নীচে চলিয়া যায় ও নীচের মাটি উপরে আসে। এই লাঙ্গলের দ্বারা চাষের পর জমির কোন অংশই মোটেই অকর্ষিত থাকে না এবং মাটি উল্টাইয়া যাইবার ফলে মাটিতে জল, বায়ু এবং রৌদ্র অনায়াসে চলাচল করিতে পারে এবং তাহার ফলে মাটির মধ্যে ফসলের খাদ্যের যে সকল উপাদান জমা থাকে, তাহা তরল হইয়া যায় এবং শস্যাদি উহা সহজে গ্রহণ করিয়া বাড়িতে পারে। মাটি উল্টাইয়া যাইবার ফলে জমির ঘাস, জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি মাটির নীচে পড়িয়া যায় ও উহাদের শিকড় মাটির উপরে আসিয়া পড়ে—সুতরাং উহারা মরিয়া যায় ও ক্রমশঃ পচিয়া সারে পরিণত হয়। সুতরাং ইহাতেও জমির ফলন-শক্তি বাড়ে।

একখানি দেশী লাঙ্গলের দাম মোটামুটি ৩৷৹ টাকা;* কিন্তু ইহার দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা হইলেও ইহাতে লৌহ ও ইস্পাতের অংশ কম থাকে বলিয়া উহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া মাটি ভালভাবে কর্ষণ করিতে হইলে দেশী লাঙ্গলের দ্বারা চার-পাঁচ এমন কি ছয় বারও জমি চাষ করিতে হয়, তাহাতে কৃষকের ও বলদের অনর্থক পরিশ্রম হয় এবং সময়ও যথেষ্ট নষ্ট হয়।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ যে-সকল উন্নত ধরণের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকের দাম ৬৷৹ টাকা হইতে ৭৷৹ টাকা। ইহাদের প্রত্যেকটির চারিটি অংশ আছে, কিন্তু ইহা নির্ম্মাণ করিতে একটিও বল্টু বা স্ক্রু দরকার হয় না। ইহার বিভিন্ন অংশগুলি লাগাইবার প্রণালীও খুব সহজ। যে-কেহ কোন যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া এই-গুলি ঠিক করিতে পারেন। এই সকল লাঙ্গলের কেবল ফালখানি ক্ষয় হয়; কিন্তু তাহাও শক্ত ইস্পাতের দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া উহা অন্ততঃ পাঁচ-সাত বৎসর অনায়াসে চলে। এমন কি, ফালখানি ক্ষয় হইলেও গ্রামের সকল কামারই উহা তৈয়ার করিতে পারে। এই সকল উন্নত ধরণের লাঙ্গলের দ্বারা জমি দুই বার চাষ করিলেই দেশী লাঙ্গলের চার-পাঁচ বার চাষের মত ফল পাওয়া যায়। এই সকল লাঙ্গলের ওজন দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা খুব বেশী নহে; কাজেই এইরূপ হাল্কা ধরণের লাঙ্গল কৃষকেরা অনায়াসে কাঁধে লইয়া মাঠে যাইতে পারে। এই জাতীয় বড়

---

* এই প্রবন্ধে লাঙ্গলের যে দাম লেখা হইয়াছে তাহা যুদ্ধের পূর্ব্বের দাম।

লাঙ্গল কাঁধে লইতে কষ্ট হইলে উহাকে জোয়ালের সহিত ঝুলাইয়া বলদের কাঁধে দিয়া মাঠে লইয়া যাওয়া যায়।

বাংলার বিভিন্ন প্রকার মাটি, ফসল ও বলদের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের উন্নত ধরণের লাঙ্গলের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) ২ নম্বর সবকাম লাঙ্গল, ওজন ২০ সের, মূল্য ৭৲ টাকা।

এই লাঙ্গল আমন ও আউস ধানের এবং রবি শস্যাদির জমি, এক কথায় যে সমস্ত শস্য বঙ্গদেশে জন্মায়, সেই সকল শস্যের উপযোগী জমি চাষ করিবার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। ইহা ব্যতীত নূতন জমি এবং যে সমস্ত জমিতে বহু দিন আবাদ হং নাই, এইরূপ শক্ত জমিও এই লাঙ্গলের দ্বারা অনায়াসে চাষ করা যাইতে পারে। এই লাঙ্গলের দ্বারা মাটি ৫″ ইঞ্চি হইতে ৯″ ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর করিয়া চাষ করা যায়। এই লাঙ্গল বাংলার সর্ব্বত্রই সাধারণ বলদের সাহায্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে

(খ) সবকাম 'ক' লাঙ্গল, ১৩ সের ওজন, মূল্য ৬৷৷০ টাকা।

এই লাঙ্গল সাধারণ কৃষিকার্য্যের উপযোগী। ইহা খুব হাল্কা, ছোট ছোট বলদ ইহা অনায়াসে টানিতে পারে।

(গ) ২ নং বাংলা লাঙ্গল, ২৪ সের ওজন, মূল্য ৭৲ টাকা।

এই লাঙ্গলও সাধারণ কৃষিকার্য্যের উপযোগী। এই লাঙ্গলে মাটি উল্টাইয়া দিবার জন্য কোন পাখা নাই ; সুতরাং ইহা দ্বারা মাটি উল্টান যায় না। কাজের হিসাবে এই লাঙ্গল মোটামুটি দেশী লাঙ্গলেরই সমান। ইহা দ্বারা মাটি ৫″ ইঞ্চি গভীর করিয়া চাষ করা যাইতে পারে। আমন ধানের চারা রোয়ার পূর্ব্বে জমি কাদা করিবার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী।

(ঘ) আমীর লাঙ্গল, ২৩ সের ওজন, মূল্য ৭৲ টাকা।

এই লাঙ্গলে মাটি উল্টাইয়া দিবার জন্য দুই পাশে দুইটি পাখা আছে। ইহা দ্বারা জমিতে নালী করা যায। যে-সকল ফসল নালীর মধ্যে বা আলের উপর রোপণ করা হয়, সেই সকল ফসলের জমি প্রস্তুত করিবার পক্ষে এই লাঙ্গল বিশেষ উপযোগী।

(ঙ) ২ নং বেঙ্গল লাঙ্গল, ওজন ১১ সের, মূল্য ঢালাই ফালসহ ৭৷০ টাকা। ইস্পাত ফালসহ—৮৲ টাকা।

ইহাতে ঢালাই ফ্রেম, ঢালাই লৌহের এবং ইস্পাতের মাটি উল্টাইবার পাখা এবং ফাল আছে। বেঙ্গল লাঙ্গলে কোন প্রকার চাপ দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা দ্বারা জমি সমভাবে চাষ হইয়া থাকে। কোথাও লাঙ্গল উঠিয়া যাইয়া জমি চষা বাদ পড়ে না এবং জলমগ্ন জমিও ইহা দ্বারা চাষ হইতে পারে ; কিন্তু দেশী লাঙ্গল দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না।

(চ) ৩ নং বীম লাঙ্গল, ওজন ৩০ সের, মূল্য ৩০৲ টাকা।

এই লাঙ্গল অতি উৎকৃষ্ট। ইহার ওজন এইরূপ বিলাতী বীম লাঙ্গল হইতে কম, অথচ ইহা দ্বারা বিলাতী লাঙ্গলের মতই চাষ করা যায় ; এবং বিলাতী লাঙ্গল অপেক্ষা ইহার দামও কম। এই লাঙ্গল খুব মজবুত এবং সহজে খারাপ হয় না। পূর্ব্বে যে-সকল লাঙ্গলের কথা বলা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা এই লাঙ্গল এবং বেঙ্গল লাঙ্গলের দ্বারা চাষের কাজ ভাল হইয়া থাকে।

যাঁহারা ৩০৲ টাকা খরচ করিয়া লাঙ্গল ক্রয় করিতে সক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে এই লাঙ্গল ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

২ নং সবকাম, ২ নং বাংলা এবং আমীর লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিবার সময় বলদের কোন কষ্ট হয় না এবং চাষীকেও লাঙ্গল চাপিয়া ধরিতে হয় না। ইহাদের দ্বারা সকল রকম জমি সমভাবে চাষ হইয়া থাকে।

২ নং সবকাম লাঙ্গল দ্বারা ২৪ ঘণ্টায় অনায়াসে তিন বিঘা জমি দুইবার চাষ করা যায় ; কিন্তু দেশী লাঙ্গলের দ্বারা ঐ পরিমাণ জমি চাষ করিতে ৯০ ঘণ্টা সময় লাগে। তথাপি এই লাঙ্গলের দ্বারা জমি যেরূপ সমান ভাবে চাষ হয়, দেশী লাঙ্গলের দ্বারা সেইরূপ সমানভাবে চাষ হয় না।

কিনিবার সময় দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা এই সকল উন্নত লাঙ্গলের দাম বেশী পড়ে বটে, কিন্তু দেশী লাঙ্গলের সহিত ইহাদের কার্য্যকারিতার ও ইহাদের দ্বারা চাষের ফলাফলের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, শেষ পর্য্যন্ত দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা এই সকল উন্নত লাঙ্গল অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক মূল্যে ক্রয় করাই বেশী লাভজনক। প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, দেশী লাঙ্গলের পরিবর্ত্তে এই সকল উন্নত লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ করিলে, যে-কোন শস্যের ফলন প্রতি একরে (৩ বিঘা) এক মণ হইতে তিন মণ বাড়াইতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ছয়-সাত টাকা মূল্যের এক খানা উন্নত লাঙ্গলের দ্বারা অন্ততঃ ছয়-সাত বৎসর ধরিয়া সুচারু রূপে জমি চাষ করা যায়, এবং ইহার কোন অংশ নষ্ট হয় না ও কোন রকম মেরামতেরও দরকার হয় না। কিন্তু দেশী লাঙ্গলের দ্বারা ছয়-সাত বৎসর জমি চাষ করিতে হইলে উহা অনেকবার মেরামত করিবার প্রয়োজন হয়, এবং উহার মূল্য ও মেরামতের খরচ ধরিলে দেখা যাইবে যে, দেশী লাঙ্গলের জন্য শেষ পর্য্যন্ত মোট খরচ একখানা উন্নত লাঙ্গলের মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ হয়।

সুতরাং মাটি ভাল ভাবে চাষ করিয়া ফসলের ফলন বাড়াইবার জন্য প্রথমে কিছু বেশী মূল্য দিয়া উন্নত লাঙ্গল কেনাই যুক্তিযুক্ত।

(১) লাঙ্গল ঠিক করিবার নিয়ম—দেশী লাঙ্গলের মত উন্নত লাঙ্গলের দ্বারাও জমি চাষ করিবার সময় বলদের আকৃতি অনুসারে লোহার শিকলটি নিকটে কিম্বা দূরে লাগাইয়া লাঙ্গলটি ঠিক করিয়া লইতে হয়। ফালযুক্ত লাঙ্গলের ফালটির অগ্রভাগ সকল সময় লাঙ্গল হইতে চার ইঞ্চি হইতে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে থাকা উচিত। যে পীনটির দ্বারা ফালটি আটকাইয়া থাকে, সেই পীনটি একটি ছিদ্র হইতে আর একটি ছিদ্রে পরাইয়া দিলেই প্রয়োজন মত ফালটিকে চার ইঞ্চি হইতে সাড়ে পাচ ইঞ্চির মধ্যে রাখা যাইবে।

• বীম এবং বেঙ্গল লাঙ্গলের ফাল উঁচুনীচু করা যায় না; যখন ইহার ফালটি ক্ষয় হইয়া যায় এবং ইহা দ্বারা আর কাজ চলে না, তখন পুরাতন ফালটি বদলাইয়া আর একটি নূতন ফাল পরাইয়া লইতে হয়।

এই সকল উন্নত লাঙ্গল একটু যত্নের সহিত রাখা উচিত; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে জমির চাষ শেষ হইলে লাঙ্গলটি এবং লাঙ্গলের ফালটি ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া তৈল মাখাইয়া তুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

এই সকল উন্নত লাঙ্গল ও উহাদের অংশ, মেসার্স রেনউইক্ কোং লিমিটেড, কুষ্টিয়া, জেলা নদীয়া—এই ঠিকানায় পাওয়া যায়। জেলার কৃষি-কর্ম্মচারীকে জানাইলে তিনিও এই লাঙ্গল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(২) মই ও চৌকী—লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণের পর ঢেলা ভাঙ্গিবার জন্য ও জমি চৌরস বা সমান করিবার জন্য মই ব্যবহৃত হয়; ঢেলা খুব বড় হইলে একটি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করিতে হয়; এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম চৌকী। মই বা চৌকীর উপর বলদের চালক দাঁড়াইয়া থাকে।

(৩) মুগুর—ইহা দ্বারাও জমির বড় বড় ঢেলা ভাঙ্গা যায়; হাতের দ্বারা পিটাইয়া ঢেলা ভাঙ্গিতে হয়।

(৪) বিদে—ইহা চালাইয়া মাটি আলোড়িত ও চূর্ণ করা যায় এবং ইহার দাঁতগুলিতে মাটির ভিতরকার গাছের শিকড় আটকাইয়া যায়। লাঙ্গলের মতই জোয়ালে বাঁধিয়া উহা চালাইতে হয়।

(৫) বাখার—যে-সকল জমি ঘন ঘাসে আবৃত, উহার উপর লাঙ্গল চালাইতে অসুবিধা হয়। এই সকল জমির উপর বাখার নামক যন্ত্র চালাইলে জমির ঘাসও কাটিয়া যায় এবং মাটিও ভাসা ভাসা ভাবে আলগা হয়। লাঙ্গল ও মই দেওয়ার পর ইহার সাহায্যে জমির ঢেলাও উত্তম রূপে ভাঙ্গা চলে। বাংলা দেশে ইহার চলন নাই।

(৬) ডলনা—ইহা একটি কাষ্ঠ খণ্ড; আয়তনে সাধারণতঃ ৫ হাত লম্বা, আধহাত চওড়া ও আট-দশ আঙ্গুল পুরু হয়। ইহার সাহায্যে আলগা জমি শক্ত করা যায় এবং জমির ঢেলা ভাঙিয়া সমতল করাও যায়। ডলনার দুই প্রান্তে দুইটি দড়ি দিয়া বলদ বাঁধিয়া দিতে হয়; চালক ডলনার উপর দাঁড়াইয়া বলদ চালায়।

(৭) আঁচড়া—ইহা বিদের মত, ওজনে অপেক্ষাকৃত হালকা ও ইহার দাঁতগুলি ঘন ঘন। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর চারা গাছগুলি একটু বড় হইলে জমির মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয় এবং বৃষ্টির পর মাটি শক্ত হইয়া গেলেও ঐ শক্ত মাটি আল্‌গা করিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। এই দুই কার্য্যে আঁচড়া ব্যবহৃত হয়। উহা চালাইবার সময় উহার দাঁতের সঙ্গে কতক কতক চারাও উপড়াইয়া যায়। ইহাতে শস্য পাতলা করিয়া দিবার কার্য্যও সাধিত হয়।

(৮) খুরপী, নিড়ানী, কাস্তে, কোদাল প্রভৃতি—এই এই কৃষি যন্ত্রগুলি আকারে খুব ছোট এবং হস্তচালিত। জমি আল্‌গা করা, আগাছা নিড়ান, শস্য কাটা, জল নিকাশের নালা করা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে এইগুলি ব্যবহৃত হয়।

(৯) প্লানেট জুনিয়র হ্যাণ্ড হো—শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উৎপন্ন শস্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান উস্‌কাইবার ও নিড়াইবার এবং গাছের গোড়ায় মাটি দিবার জন্য এই যন্ত্র খুবই কার্য্যকরী। ইহা একটি বালকও সহজে চালাইতে পারে।

উপরোক্ত যন্ত্রগুলি ছাড়া বিলাতী অনেক প্রকারের যন্ত্র আছে যেমন—সাব্-সয়েল প্লাউ, স্ক্রেপার, ডিস্ক হ্যারো, গ্রাবার, সিড ড্রিল ইত্যাদি।

সাব সয়েল প্লাউ—একই গভীরতায় মাটি বার বার চাষ করিবার ফলে উহার নিম্নস্তর কঠিন হইয়া যায়; শস্যের শিকড় এই কঠিন স্তরে আসিয়া উপযুক্ত ভাবে উহার শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া দিতে পারে না কিংবা উহা ভেদ করিয়া মাটির আরও নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না; কাজেকাজেই শস্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এই কারণে এই কঠিন স্তর ভাঙিয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেশী লাঙ্গলের দ্বারাই এই কঠিন স্তর ভাঙিয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু বিলাতী সাব-

সয়েল প্লাউ-এর দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে করা যায়। এই লাঙ্গলের ফালে পাখা নাই ; ইহা দেশী লাঙলের মতই মাটি কাটিয়া দুই ধারে ফেলিয়া দেয়।

স্ক্রেপার—মই, চৌকী ইত্যাদি দ্বারা জমি সমতল করা যায় বটে, কিন্তু এই সকল যন্ত্র বেশী দূর হইতে মাটি টানিয়া আনিয়া জমির নিম্নস্থান ভরাট করিবার পক্ষে তত উপযোগী নয় ; স্ক্রেপারের সাহায্যে এই কাজ উত্তমরূপে করা যায় ; এই যন্ত্র এক জনে এক জোড়া বলদের দ্বারা চালাইতে পারেন।

ডিস্ক হ্যারো—এই যন্ত্র মই, চৌকী, ডল্‌না অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী।

গ্রাবার—এই যন্ত্রের সাহায্যে জমি উত্তমরূপে ভাঙা যায় এবং ইহার দ্বারা জমি গভীরভাবে চাষ করা যায়।

সিড্‌ ড্রিল—এই যন্ত্রের সাহায্যে বীজগুলি সমান্তরাল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটি হইতে আর একটি সমান দূরে এবং সমান গভীরতায় পতিত হয়।

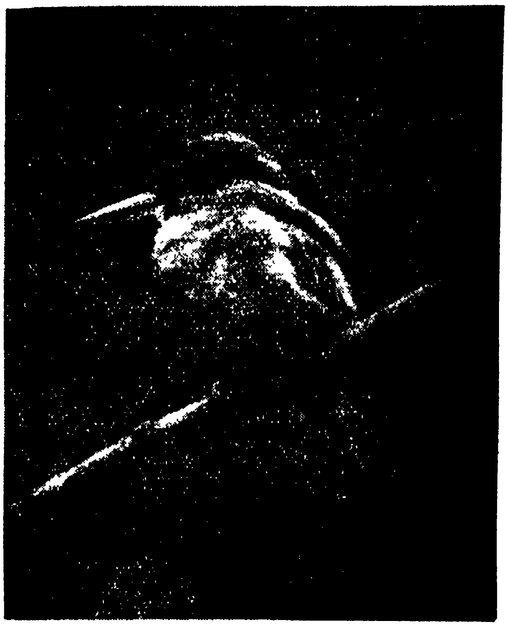
পবিত্র জীবজন্তু

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র—সভ্য এবং অসভ্য সমাজে পশুপক্ষী এবং মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীদিগকে দেবতা অথবা তাঁহাদের প্রতীক-স্বরূপ পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিবার রীতি অল্পাধিক প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের তো কথাই নাই,—হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রধানতঃ গো-জাতিকে পবিত্র জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবার রীতি প্রচলিত থাকিলেও, পশুর মধ্যে কুকুর, শূকর এবং পাখীর মধ্যে শকুন, মুরগী বাদে বাঘ, সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া ইঁদুর, বিড়াল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই কোন-না-কোন উপলক্ষে পূজা পাইয়া থাকে। কিন্তু অস্পৃশ্য কুকুর, মুরগীও বোধ হয় একেবারে বাদ যায় না। কারণ, পূজা-পার্ব্বণের মধ্যে 'কুক্কুটী-ব্রত'ও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং কুকুরও নাকি কাশীর কাল-ভৈরবের বাহন। শাস্ত্রানুসারে দেবতার সহিত তাহার বাহনটিও পূজা পাইবার অধিকারী। প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী কেবল পশুপক্ষীই নহে—গাছপালা, প্রস্তরখণ্ড, মায় ইস্তক ঢেঁকিটা পর্য্যন্ত এই গৌরব লাভে বঞ্চিত হয় না। যাহা হউক, প্রস্তরখণ্ড বা গাছপালার কথা উল্লেখ না করিয়া প্রাচীন এবং বর্ত্তমান বিভিন্ন সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র বলিয়া বিবেচিত কয়েকটি পশু, পক্ষী ও সরীসৃপের বিষয় আলোচনা করিব।

অনেক অসভ্য সমাজেই 'টোটেমিজম্' (Totemism) নামে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন এক জাতীয় পশু, পক্ষী বা অন্য কোন প্রাণীর সহিত ইহাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা পরিবার অলৌকিক উপায়ে অচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া মনে করে এবং সম্পর্কিত প্রাণীর নামানুসারেই তাহারা তাহাদের জাতি বা গোষ্ঠীর পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা ভল্লুকের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করে তাহারা ভল্লুক-গোষ্ঠীর মানুষ নামে নিজেদের পরিচয় দেয়। এইরূপ, কেহ কুকুর-গোষ্ঠী, কেহ বাঘ-গোষ্ঠী, কেহ শৃগাল-গোষ্ঠী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। গোষ্ঠীপতি জীবজন্তুকে তাহারা যে কেবল মানুষের সমপর্য্যায়ভুক্তই মনে করে তাহা নহে, অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন দেবতার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া তাহাদের তুষ্টিবিধান করিবার কোনই ত্রুটি করে না। তাহাদের বিশ্বাস পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণ-সম্পন্ন এই জীবজন্তুগুলি তাহাদের বংশেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিল। এই জন্যই শৃগাল-গোষ্ঠীর লোকেরা মনে করে—জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে চাতুর্য্যে তাহারা অতুলনীয় ; বিভার-গোষ্ঠীর লোকের ধারণা—কারুকার্য্যে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ; ব্যাঘ্র-গোষ্ঠীর লোকের বিশ্বাস—তাহারাই প্রকৃত শৌর্য্য-বীর্য্যের অধিকারী। প্রত্যেকের পক্ষেই, তাহাদের 'টোটেম' রূপে পরিগণিত প্রাণীহত্যা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। ইহাকেই 'ট্যাবু' (Taboo) বলা হয়। 'ট্যাবু' অমান্য করা গুরুতর অপরাধ। অবশ্য বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এই 'ট্যাবু' ভঙ্গ করার রীতি আছে। তাহাদের ধারণা পর্ব্ব-দিনে 'টোটেম' রূপে পরিগণিত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলে তাহার জাতীয়-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক গুণাবলী ভক্ষণকারীর শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সভ্য সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবজন্তুকে পবিত্র বলিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবার ব্যাপারটার মধ্যে 'টোটেমিজমে'র ক্ষীণ আভাস দেখিতে পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণেই তাহাদের মধ্যে পশুপক্ষীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। 'টোটেম' সম্পর্কিত বিশ্বাস পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত রূপ গ্রহণ করে। তখন পশুপক্ষীর মস্তকবিশিষ্ট মনুষ্য-দেহধারী দেবতার মূর্ত্তি কল্পিত হইতে থাকে। প্রাচীন মিশরেই এই ধরণের অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। ইহারা সকলেই যে 'টোটেম' হইতে উদ্ভূত তাহা নহে ; কৃতজ্ঞতা, ভয় এবং সৌন্দর্য্য বোধ হইতেও অনেক পশুপক্ষীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মানুষের জীবনযাত্রা

নির্ব্বাহের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য বোধেই যে আমাদের দেশে এক সময়ে গো-পূজার প্রচলন হয় একথা সহজেই বুঝিতে পারা

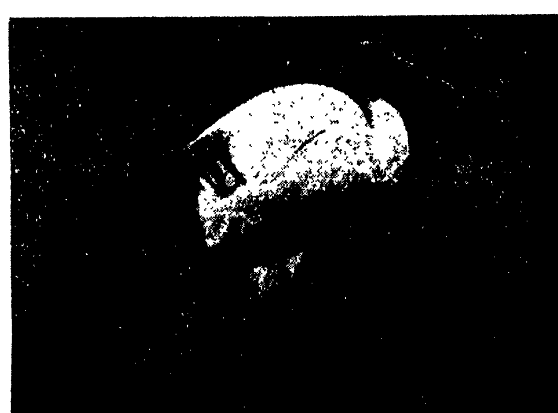


মাউরিদের পবিত্র মাছরাঙা-পাখী

যায়। ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, সর্প প্রভৃতি প্রাণীগুলি, হিংস্র প্রকৃতির জন্যই ভয়প্রযুক্ত মনুষ্যকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। ভীতিপ্রদ অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনেক স্থলে বিভিন্ন জাতীয় পশু-পক্ষী ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্ররূপে বিবেচিত হয়। নিউজিল্যাণ্ডে এক জাতীয় সুদৃশ্য মাছরাঙা পাখী দেখা যায়; তাহারা মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। শ্মশান-ভূমি বা গোর-স্থানেই ইহারা সর্ব্বদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সে স্থানের অধিবাসী মাউরিদের বিশ্বাস, এই পাখীদের সহিত মৃত ব্যক্তির আত্মার বিশেষ যোগাযোগ রহিয়াছে। শ্মশানে বিচরণ করে বলিয়াই তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। এই কারণেই মাউরিরা এই পাখীগুলিকে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকে।

দেবতা ওসিরিসের প্রতীক অথবা প্রতিনিধিরূপে প্রাচীন মিশরে বৃষকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা হইত। এই বৃষ-পূজা 'টোটেম' সম্পর্কিত ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। বীর্য্যবান্ সন্তান-প্রজনন ক্ষমতার প্রতীকরূপেই বোধ হয় ষাঁড়ের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চতুরতা ও তৎপরতার প্রতীকরূপেই ইঁদুরও বোধ হয় আমাদের দেশীয় গণেশ দেবতার বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছে। গ্রীকদের প্যালাস য়্যাথেনা বা মিনার্ভা দেবীর সহিত পেচক সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া অনেকে ইহাকে 'টোটেম' ঘটিত ব্যাপার মনে করেন; কিন্তু খুব সম্ভব আমাদের দেশীয় লক্ষ্মী দেবীর সহিত সংশ্লিষ্ট পেচকের ন্যায় জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুদ্ধ-নিপুণতার প্রতীক স্বরূপই মিনার্ভার সহিত পেচকের সংস্রব কল্পনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন মিশরের ধর্ম্ম-ষাঁড় বা 'এপিস-বুল' সম্বন্ধে অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মিলাইয়া, দেশের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজাখুঁজি করিবার পর বাচ্চা অবস্থায় ধর্ম্ম-ষাঁড়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। কারণ ধর্ম্ম-ষাঁড়ের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষণগুলি পরিস্ফুট থাকিবেই। ধর্ম্ম-ষাঁড়ের কপালে পবিত্রতা-দ্যোতক শ্বেতবর্ণের চতুষ্কোণ চিহ্ন এবং পৃষ্ঠদেশে ঈগলের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিবে। তাহার সর্ব্বশরীর হইবে কৃষ্ণবর্ণ এবং লেজের গুচ্ছ থাকিবে—সাধারণ ষাঁড়ের গুচ্ছ অপেক্ষা দ্বিগুণ বড়। জিহ্বাটিও তাহার পবিত্র গুবরে পোকার আকৃতির অনুরূপ রেখাঙ্কিত হওয়া চাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ ভাবেই লক্ষণ মিলাইয়া তিব্বতের নূতন দালাই লামার সন্ধান করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, অনেক চেষ্টার ফলে অনুরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত গো-বৎসের সন্ধান মিলিবার পর তাহাকে একটি প্রকাণ্ড বজরায় স্বর্ণমণ্ডিত কক্ষে আরোহণ করাইয়া জলপথে মেম্ফিসে আনয়ন করা হয়। তথায় একটি জমকালো বিরাট্ মন্দির তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিশ্রামের জন্য তাহার রাজোচিত শয্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পবিত্র কূপোদক পান করিতে দেওয়া হইত। পুরোহিতেরা সাধারণতঃ তাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে পরম যত্নে রক্ষা করিতেন। কেবল বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে তাহাকে লোকের সম্মুখে বাহির করা হইত। এইরূপ দর্শন দানের সময় পুরোহিতেরা তাহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া পবিত্র প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। প্রতিবৎসরই সাতদিন ধরিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত তাহার জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইত। দৈব প্রেরিত বলিয়া এই জানোয়ারটি মিশরীয়দের নিকট সর্ব্বোচ্চ সম্মান এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র ছিল। দেশী, বিদেশী, সম্ভ্রান্ত বা সাধারণ প্রত্যেক লোকের পক্ষেই ইহার মন্দির দর্শন যেন অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইত। ধর্ম্ম-ষাঁড়ের দৈব



মিশরীয়েরা এই জাতীয় আইবিস পাখীকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিত



মিশরীয়েরা বিড়ালকে অতি পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিত

বাণীর ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। বিজয়ী বীর জার্মেনিকাসের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে; মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্মের ষাঁড় কিছুতেই তাহার হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। ষাঁড়ের খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতিকেই লোকে তাহার আকস্মিক দুর্ঘটনার ইঙ্গিত বা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিত। অগাষ্টাস নীল-নদের পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ অধিকার করিবার পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম-ষাঁড় নাকি উচ্চরবে ডাকিয়া এই দুর্ঘটনার পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছিল। মৃত্যুর পর ধর্ম্ম-ষাঁড়কে রাজোচিত সম্মানের সহিত সুগন্ধি অনুলেপন করিয়া সেরাপিয়াসে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পর সে নাকি ওসিরিসের সহিত মিলিত হইয়া ওসিরিস-এপিস্ অথবা সেরাপিসের রূপ পরিগ্রহ করে। এই দেবতার পূজা গ্রীকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে ইহা রোমে এবং সর্ব্বশেষে ব্রিটেনেও প্রচলিত হয়; হেলিওপোলিসে নেভিস্ (Mnevis) নামে আর একটি বৃষও অনুরূপ আড়ম্বরের সহিত পূজিত হইত। মেণ্ডিস্, হার্ম্মোপালিস, লাইকোপোলস্ প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ভেড়াকে, রা এবং ওসিরিসের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া পবিত্র জ্ঞানে পূজা করা হইত। অবশ্য উক্ত দেবতাদের প্রতীকচিহ্ন-সমন্বিত ভেড়াগুলিই এই পূজা পাইবার অধিকারী ছিল।

মিশরীয়েরা কুমীরকে সিবেক দেবতার অবতাররূপে পূজা করিত। কুমীরদের তুষ্টিবিধান করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আবাদী জমির উপর অবাধে বিচরণ করিতে দেওয়া হইত। সেখানে তাহারা মানুষ, গরু, যাহাকে পাইত খাইয়া উজার করিত। ইহাতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা হইত না। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, জীবিতকালে মানুষ যে সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে, মৃত্যুর পর কুমীরেরা তাহাদের জন্য সেরূপ সুখ ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। মোয়ারিস হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের কুমীর-ভক্তি অতিশয় প্রবল ছিল। তাহারা হ্রদের পোষা কুমীরগুলিকে মূল্যবান মণিমাণিক্যে ভূষিত করিয়া উপহারস্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিত। পুরোহিতেরা এই সরীসৃপগুলিকে দেবতার প্রতিনিধিরূপে উপাসনা করিয়া উৎকৃষ্ট মধু, সুরা ও পিষ্টক দানে পরিতৃপ্ত করিত। মৃত্যুর পর গোলকধাঁধার আকৃতিবিশিষ্ট ভূগর্ভস্থ কক্ষে মহা আড়ম্বরে ইহাদিগকে সমাহিত করা হইত। দেবতার নিকট মানত করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে বলিস্বরূপ কুমীরের মুখে অর্পণ করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল।

নীল-নদের মোহানায় অবস্থিত দেশসমূহের অধিবাসীরা সিংহের পূজা করিত। মিশরীয়দের মতে—দেবতা আকের উভয় দ্বার রক্ষা করিয়া থাকে। সেফ্ এবং ডুয়া নামক তাহার পবিত্র সিংহ দুইটিও নাকি অতীত এবং বর্ত্তমানের দ্বার-রক্ষক; অধিকন্তু তাহারা জীবজন্তুরও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই মিশরের অধিবাসীরা সিংহের তৃপ্তিসাধন করিতে যত্নবান হইত। যাহাতে উত্তম ভোজে তৃপ্ত হইতে পারে এবং জীবন্ত পশু হত্যা করিয়া হিংসাবৃত্তিও চরিতার্থ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে হৃষ্টপুষ্ট গরু-বাছুরকে জোর করিয়া তাহাদের গুহায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত।

প্রাচীন মিশরে বিশেষ পবিত্র প্রাণীরূপে বিড়ালই সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত এবং সম্মানিত হইত। বিড়ালকে তাহারা বাষ্ট দেবীর অবতার বলিয়া জানিত। এই কারণে বিড়ালের উপর লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তির অন্ত ছিল না। এমন কি, কেহ অসতর্কতা-বশতঃও কোন বিড়ালের মৃত্যু ঘটাইলে মৃত্যুদণ্ডই তাহার একমাত্র শাস্তি ছিল। পরবর্ত্তী কালেও একজন বিদেশী রোমান অনবধানে একটি বিড়ালের মৃত্যু ঘটাইয়াছিল বলিয়া উত্তেজিত জনতা তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে পোড়াইয়া মারে। মৃত্যুর পর বিড়ালকে রাজকীয় শবের ন্যায় মমি করিয়া বিউবাষ্টিস্ নামক তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নগরে মহাসমারোহে সমাহিত করা হইত।



বলি এবং অন্যান্য পূজোপহার গ্রহণের নিমিত্ত কুম্ভীরগুলি দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে

দেবী টা-উরৃত্‌ মনুষ্যদের উপকার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিলেও ধ্বংসকারী উগ্র স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মিশরীয়েরা হিপোপোটেমাসকে এই দেবীর প্রতিনিধিরূপে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিত। চন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে সাইনোসেফালাস্‌ নামক এক জাতীয় কুকুরমুখো বানরের পূজাও মিশরে প্রচলিত ছিল। থিবিসে খেনসু নামক চন্দ্রদেবতার প্রত্যেকটি মন্দিরে এই জাতীয় বানরেরা পরম যত্নে প্রতিপালিত হইত। পাতাল প্রদেশে মৃত ব্যক্তির আত্মার পথপ্রদর্শক য্যান্যুবিসের অনুচর হিসাবে শৃগালও তাহাদের নিকট পূজার্হ ছিল। প্রজনন-ক্ষমতার প্রতীকরূপে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মিশরের অধিবাসীরা ব্যাং পূজা করিত। পরবর্ত্তী কালে ব্যাঙের মস্তকবিশিষ্ট হেক্ট দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। সর্প ও বৃশ্চিকের পূজারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কিন্তু তাহা যে শ্রদ্ধার পূজা নয়, ভয়ের পূজা একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

প্রাচীন মিশরে আইবিস্‌ নামে সারস জাতীয় এক প্রকার পাখী অতি পবিত্র বিবেচিত হইত। এমন কি, এই পাখীকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষ একটি পূজাপদ্ধতিও গড়িয়া উঠিয়াছিল। মিশরের অধিবাসীরা এই পাখীকে দেবতা ঠঠ্‌ বা থথ্‌ এবং চন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিত। হার্মোপোলিস্‌ই ছিল আইবিস্‌ পূজার প্রধান কেন্দ্রস্থল। সর্পকুলের শত্রু বলিয়াই লোকে প্রধানতঃ এই পাখীগুলিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, এক সময়ে আরব দেশ হইতে পক্ষবিশিষ্ট বিরাট্‌ আকৃতির অজগরেরা গিরিসঙ্কটের পথে অগ্রসর হইয়া মিশর দেশ আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। আইবিস পাখীরা তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেশকে বিপন্মুক্ত করে। এই কিম্বদন্তী হইতেই বোধ হয় আইবিস পূজার উৎপত্তি হইয়াছিল। সারসের মত বেন্নু্‌ নামক একজাতীয় পাখীও অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। পৌরাণিক কাহিনীর অমর-পক্ষী বা ফিনিক্স



শ্বেত-গোখুরা। কদাচিৎ ইহার সাক্ষাৎ মিলিলে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়

পাঁচশত বৎসর পর পর নিজেই নিজেকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে এবং অধিকতর তেজ-বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া সেই ভস্মস্তূপ হইতেই পুনরুদ্গত হয় এবং পুনরায় পাঁচশত বৎসর যথেচ্ছা বিচরণ করে। বেন্নু্‌ পাখীরা নাকি এই ফিনিক্স হইতে অভিন্ন। সূর্য্যদেবের প্রতীকরূপে বেন্নু্‌ পাখীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল; কারণ সূর্য্যও অনেকটা ফিনিক্সের মতই গোধূলির রক্তিম আকাশে বিলীন হইয়া যেন অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত উষার আকাশ হইতে পুনরায় নবীন তেজে, নবীনরূপে আবির্ভূত হয়। রা এবং ওসিরিসের অনুগৃহীত বলিয়া প্রাচীন মিশরে শ্যেন-পাখীরাও সূর্য্য এবং পুনর্জ্জন্ম-লব্ধ মনুষ্যাত্মার প্রতীকরূপে পূজিত হইত।

পশুপক্ষীর পূজা যে কেবল প্রাচীন মিশরেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; পরবর্ত্তী যুগে ইহা অন্যান্য জাতির মধ্যেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষীণ আভাস ছাড়া আর কিছু দেখিতে না পাওয়া গেলেও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা যে এক সময়ে বিভিন্ন পশু-পক্ষীর উপাসক ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জুলিয়াস সিজার নিজের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পবিত্র মনে করিয়া ব্রিটেনের অধিবাসীরা তৎকালে হাঁস, মুরগী এবং খরগোসের মাংস ভক্ষণ করিত না। ইহা যে এককালে প্রচলিত 'টোটেমিজম' সম্পর্কিত 'ট্যাবু'র প্রচ্ছন্ন আভাস মাত্র তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাহারাও ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত ছিল এবং বিভিন্ন পশু-পক্ষীকে তাহাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-ব্রিটেনের বিব্রোকিরা খুব সম্ভব বীভার নামক প্রাণীর উপাসক ছিল। স্কটলণ্ডের ক্ল্যানচ্যাটান নামক জাতিরা বিড়ালকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিত। কেলটিকদের এপোনা দেবীও বোধ হয় অশ্ব-জাতীয় জন্তু হইতেই কল্পিত



পেনাঙের মন্দিরে এই জীবন্ত সর্পগুলি শ্রদ্ধা-সহকারে পূজিত হইয়া থাকে

হইয়াছিল। গ্রীকদের ডাইওনিসাস অথবা ব্যাকাসের ন্যায় আইরিশদের যুদ্ধ-দেবতা কুচুলিনও বৃষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। রোমানরা ভেনাস দেবীর ঘুঘুকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিত।



কাশীর মন্দিরে বানরেরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিতেছে

কেহ ঘুঘু বধ করিলে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ রূপেই গণ্য হইত। এইরূপ য়্যাপোলোর মূষিক, ব্যাকাসের চিতাবাঘ, জোভের ঈগল এবং ওডিনের দাঁড়কাক প্রভৃতি পশুপক্ষীরা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্রিটেনে এক সময়ে কাক হত্যা করা গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য হইত। কারণ তাহাদের ধারণা ছিল যে, রাজা আর্থার মৃত্যুর পরে কাকরূপ ধারণ করেন এবং সেই কাক হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় কাকের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। বিশেষ বিশেষ জীবজন্তু সম্পর্কে তাহাদের এই অদ্ভুত মনোবৃত্তিকে অনেকে 'টোটেমিজমে'র ক্ষীণ আভাস বলিয়াই মনে করেন।

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে বিবিধ প্রকারের পশুপক্ষী পূজা এবং পবিত্র বোধে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিবার রীতি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অনেক স্থলে আজও কোন কোন প্রথা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমেরিকার ক্রীক-ইণ্ডিয়ানরা এক সময়ে কুমীরকে পরম শ্রদ্ধাভরে পূজা করিত এবং প্রাণান্তেও কুমীর বধ করিত না। বলিভিয়ার মোক্সিস্ জাতীয় লোকেরা জাগুয়ারের উপাসনা করিত। যে-ব্যক্তি জাগুয়ারের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহাকেই তাহারা পুরোহিতরূপে নির্ব্বাচন করিত। মধ্য-আমেরিকার মায়া এবং কুইচে জাতিরাও জাগুয়ারের উপাসক ছিল। তাহারা এই হিংস্র প্রাণীগুলিকে এমনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত যে, বনের মধ্যে কাহারও সহিত কোন জাগুয়ারের সাক্ষাৎ হইলেই সে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন করিত; কোন ক্রমেই তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা পলায়নের চেষ্টা করিত না। মেক্সিকো এবং মধ্য-আমেরিকার স্থানে স্থানে আজও 'নাগুয়ালিজম' নামে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিরোধী এক প্রকার অদ্ভুত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বিশ্বাস—কোন-না-কোন জন্তু-জানোয়ার প্রত্যেকটি মানুষকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। মায়া ও মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসীরা পাতালপুরীর দেবতা হিসাবে ক্যামাজোট্স্ বা বাদুড়েরও উপাসনা করিত। বাদুড়ের মস্তকবিশিষ্ট মনুষ্যদেহের অনুরূপ বাদুড়-দেবতা নির্ম্মিত হইত। বাদুড়-অধ্যুষিত অন্ধকার গুহা বা নির্জ্জন স্থানগুলিও তাহাদের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। হুয়াঙ্কা প্রদেশের অধিবাসীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে কুকুর পূজা করিত। ইঙ্কা-পেরুভিয়ানরা এই দেশ জয় করিবার পর কুকুর-দেবতার বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। হুয়াঙ্কার অধিবাসীরা প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রদানে কুকুরগুলিকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিবার পর তাহাদিগকে কুকুর-দেবতার সম্মুখে বলি দিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিত। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশের অসভ্য জাতীয় লোকেরা মহাসমারোহে কয়োট নামে এক জাতীয় নেকড়ে বাঘের পূজা করিত। কয়োটের বল, বীর্য্য, অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কত যে প্রবাদ, রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকার অসভ্য জাতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকালও 'টোটেম' সম্পর্কিত পশুপক্ষী পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, হরিণ, পাখী, মাছ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীরাই তাহাদের স্বজাতীয় কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিরাট্ প্রাণীকর্ত্তৃক শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহারাই তাহাদের প্রজাদিগকে মনুষ্যের আহারার্থ প্রেরণ করে। কাজেই কোন প্রাণীকে বধ বা শিকার করিতে হইলে দেবতারূপী তজ্জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রাণীর তুষ্টি বিধান করা প্রয়োজন। এই কারণে, নিউ-মেক্সিকোর জুনি ও অন্যান্য জাতীয় লোকেরা হরিণ বা অন্য কোন প্রাণী শিকার করিয়াই তাহার রক্তে তজ্জাতীয় দেবতার জিহ্বা রঞ্জিত করিয়া দেয়। ইহা ছাড়াও অসভ্য জাতীয় লোকেরা ব্যাং, পেচা, সাপ, ইঁদুর, কচ্ছপ প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণীকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। উপকূলবাসী সভ্য পেরুভিয়ানরা পর্য্যন্ত জ্ঞান ও শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রতীকরূপে অতি শ্রদ্ধার সহিত হাঙ্গরের পূজা করিত।

আমাদের দেশে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বর্ত্তমান কালেও


গালাটা-পাসের একটি মন্দিরে বানরগুলির জন্য বরাদ্দ দৈনিক পূজোপহার প্রদান করা হইতেছে

বহুবিধ পশু, পক্ষী ও সরীসৃপ পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল জীবজন্তু পূজা যে 'টোটেম' সম্পর্কিত নহে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। গাভী, বৃষ, মর্কট, কুম্ভীর প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী স্থানবিশেষে সশরীরে পূজিত হইলেও হিন্দুরা বাস্তব জীব জন্তুকে পূজা করে না, তাহাদের প্রতীকরূপে প্রতিমূর্ত্তির পূজা করে মাত্র। বিশেষতঃ এই সকল পূজা-অর্চ্চনার রীতি প্রচলিত হইয়াছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ হইতে। তাছাড়া অসভ্য সমাজে যে-সকল পশুপক্ষী 'টোটেম' রূপে পরিচিত ছিল সেই জাতীয় প্রত্যেকটি প্রাণীই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহাদের সম্পর্কে কঠোর 'ট্যাবু' প্রচলিত ছিল। প্রত্যক্ষভাবেই হউক কি পরোক্ষ ভাবেই হউক, প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই সাধারণতঃ আমাদের দেশে কতকগুলি জীবজন্তুর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভয়, কুসংস্কার, সৌন্দর্য্য-প্রীতি, অবতারবাদ প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপারও যে বিভিন্ন জাতীয় পশুপক্ষী পূজার মূলে রহিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হিন্দু মাত্রেই গো-জাতিকে অতি পবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গো-জাতির সহিত অনেক পৌরাণিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট থাকিলেও খুব সম্ভব প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই ইহাদের পূজার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গো-জাতি সম্বন্ধে 'ট্যাবু'র মত কঠোরতম বিধি-নিষেধ প্রচলিত থাকিলেও তাহা 'টোটেমিজম্' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পৌরাণিক ঘটনার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া হিন্দুরা মর্কট জাতীয় প্রাণীদিগকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহাদের অত্যাচারে বিব্রত হইবার ফলে অনেকেই ইহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলেও হত্যাব্যাপারে নিষেধ-বিধি সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলে। অত্যাচার-উপদ্রব করা সত্ত্বেও বহু তীর্থক্ষেত্রে ইহাদিগকে নিয়মিতভাবে খাদ্যাদি প্রদানে পরিতুষ্ট করা হইয়া থাকে। খুব বিরল হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট দুই-একটি কুম্ভীরকে নিয়মিত ভাবে অর্চ্চনা করিয়া খাদ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া সাধারণ ভাবে গঙ্গাদেবীর বাহন হিসাবে মকর অথবা কুম্ভীর প্রতীকরূপেও পূজিত হইয়া থাকে। দক্ষিণারায়ের বাহন হিসাবে ব্যাঘ্রও কোন কোন অঞ্চলে পূজিত হয়। আমাদের দেশে সর্প পূজার যথেষ্ট প্রচলন আছে ; কিন্তু জীবন্ত সর্পকে পূজা করিবার রেওয়াজ নাই। সর্পের প্রতিমূর্ত্তি অথবা প্রতীককেই পূজা করা হয়। শ্বেত-গোখরা অতি পবিত্র বিবেচিত হইয়া থাকে এবং দৈবাৎপরিদৃষ্ট হইলে শ্রদ্ধার সহিত উপহারাদি প্রদানে তাহার তুষ্টি বিধানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। পেনাঙে জর্জ্জটাউনের সন্নিহিত এক গ্রামে সর্প-পূজার একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের সম্মুখে টবে রোপিত কতকগুলি বৃক্ষশাখার মধ্যে অনেকগুলি সর্প প্রতিপালিত হয়। ভক্তেরা উপহারাদির সাহায্যে শ্রদ্ধাভরে এই সর্পগুলিকে পূজা করিয়া থাকে। সর্পগুলিও ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও যায় না। গাছের ডালে পাক খাইয়া, পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া অথবা বৃক্ষ-ডাল হইতে ঝুলিয়া দিনরাত ঐ স্থানেই অবস্থান করে। রোজ ইহাদিগকে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম খাইতে দেওয়া হয়। পুরোহিতেরা, ভক্ত কর্ত্তৃক আনীত উপহারাদি প্রদান করিয়া থাকে। ইহারা পুরোহিত বা তাহাদের অনুচরদের কোনই অনিষ্ট করে না।


একজন হিন্দু বৃদ্ধা রাস্তার উপর গরুর প্রতি ভক্তি নিবেদন করিতেছে

বৌদ্ধেরা ভগবান্ তথাগতের প্রতীকরূপে শ্বেত-হস্তীকে

অতি পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। শ্বেত-হস্তী অতি বিরল, সেই জন্য ইহা কেবল রাজ-তত্ত্বাবধানেই অতি যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়। হিন্দুরা প্রায় সকল প্রকারের পশু-



ব্রহ্মদেশীয় শ্বেতহস্তী
বৌদ্ধেরা শ্বেত-হস্তীকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন

পক্ষীকেই তাহাদের কোন-না-কোন দেবতার বাহন, অনুচর বা অবতার রূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। এই কারণেই তাহাদের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, গর্দ্দভ, মূষিক, বিড়াল, কচ্ছপ, পেঁচা, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতি বিবিধ প্রাণীকে বিবিধ উপলক্ষ্যে অর্চ্চনা করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। 'টোটেম' সম্পর্কিত ব্যাপারে এক এক জাতীয় প্রত্যেকটি প্রাণীই যেমন পবিত্র বোধে পূজিত হইয়া থাকে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যেরূপ 'ট্যাবু' প্রচলিত আছে এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন বিধান নাই। এতদ্ব্যতীত প্রচলিত দেশাচার অনুযায়ী কতকগুলি প্রাণীকে পবিত্র এবং কতকগুলিকে অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয়। পায়রা, রাজ-ঘুঘু, শ্বেত-ঘুঘু, লক্ষ্মী-পেঁচা প্রভৃতি পাখীগুলিকে অনেকেই পবিত্র বোধে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; কিন্তু শূকর, কুকুর, কাল-পেঁচা, কাক, শকুনি, মোরগ প্রভৃতি প্রাণীগুলি তাহাদের নিকট অপবিত্র, সুতরাং অস্পৃশ্য। সাধারণতঃ যে চক্ষেই দেখা হউক—বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান বা পর্ব্বোপলক্ষ্যে কয়েক জাতীয় মাছও পবিত্র বোধে অপরিহার্য্য বিবেচিত হয়। কোন কোন অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমীতে ইলিস মাছকে ধান্য, দূর্ব্বা, সিন্দুর প্রভৃতি দ্বারা বরণ করিয়া যথা-যোগ্য সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাহার আঁশগুলিকে পরম যত্নে গৃহের ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত করা হয়। ধর্ম্মমতে, বিজয়ার পর হইতে শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইলিস মাছ ভক্ষণও নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা যে প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বিজয়া দশমীতে পুঁটি মাছ সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। বিবাহে স্ত্রী-আচার সম্পর্কিত বিশেষ অনুষ্ঠানে স্থানবিশেষে ক্ষাদস্ মাছও অপরিহার্য্য বিবেচিত হয়।

শেষ যাত্রা

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

আমরা মরেছি বেঁচে আছে তবু
 আজও আমাদের ছেলের দল,
তারাই মানুষ তারাই মৃতের
 শেষযাত্রার শেষ সম্বল।
গঙ্গার তীরে জাহ্নবী-নীরে
 হবে যবে শেষ সমাধি-স্নান
কৃত্য সারিয়া ছেলেরা ফিরিবে
 নূতন বস্ত্র করি পরিধান।
শেষ কৃত্যটি শেষ করি সেথা
 জীর্ণ যা-কিছু ভস্ম করি
নূতন জগতে আমাদেরই ছেলে
 বাঁচিবে নূতন মূর্ত্তি ধরি।

অন্তিম দশা দেখি আমাদের
 খেদ যেন তারা না করে কভু
মরণ কখনো ব্যর্থ হবে না
 ধ্রুব অক্ষরে লেখেন প্রভু।
মরণে হরণ করে না ত কিছু
 সে যে শুধু শেষ শরণ লওয়া,
দ্বন্দ্বের শেষ দুঃখের শেষ
 মৃত্যুর শেষ—শান্ত হওয়া।
নবাগত যারা আগুনের পারা
 তারাই জগতে বাঁচিয়া থাক—
পৃথিবীর যত বালাই কুড়ায়ে
 মোরা শুনে চলি শেষের ডাক।

খাদ্য-বিভ্রাটের কয়েকটি দিক্

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী

১। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তব্যচ্যুতি

ভারতবর্ষ বহুকাল যাবৎ খাদ্যশস্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী নহে, প্রতি বৎসরই ঘাটতি পূরণের জন্য বাহির হইতে—বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। ১৯২০ সালে হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছিল যে, ভারতের জন্য ন্যূনপক্ষে পাঁচ কোটি টন খাদ্য এবং দেড় কোটি টন পশুখাদ্য ও বীজের প্রয়োজন। ১৯১৭-১৮ সালে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ ছিল ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ টন। ১৯১৮-১৯১৯ সালে ইহা কমিয়া চার কোটি পঁচিশ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। গত ২০ বৎসরে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে সর্ব্বশেষ সরকারী বিবৃতিতে দুইটা বিভিন্ন হিসাব অনুসারে ধার্য্য হইয়াছে যে, ভারতের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ৫ কোটি ৫ লক্ষ টন হইতে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টনের মধ্যে এবং প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ ধার্য্য হইয়াছে ৪৫ লক্ষ টন। উক্ত হিসাবে ভারতে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ প্রতি বৎসর পাঁচ কোটি টন বা ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন, সুতরাং দুইটা হিসাব ধরিয়া ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টনের মধ্যে। ১৯১০ সাল হইতে হিসাব লইলে দেখা যাইবে, চাউল ও গমের উৎপাদন বিশেষ বাড়ে নাই, অথচ লোকসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াছে। ফলে অবস্থাও ক্রমাগত মন্দের দিকে চলিয়াছে।

ভারতীয় খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউল প্রধান (চাষের জমির ৩৬ ./· অংশ) হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের প্রয়োজন মিটাইতে দীর্ঘকাল যাবৎ বহুপরিমাণে চাউল আমদানী করিতে হইতেছে, আমদানীর বার্ষিক পরিমাণ গড়ে ১৫ লক্ষ টন ধরা যাইতে পারে। রাইস মার্কেটিং কমিটির হিসাবে প্রতি বৎসর চাউল আমদানী হয় ১৪ কোটি টাকার এবং রপ্তানী হয় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার। সর্ব্বশেষ সরকারী বিবৃতি অনুসারে ব্রহ্মদেশ হইতে মাত্র বাংলার জন্য চাউল আমদানীর বার্ষিক পরিমাণ ২ লক্ষ টন।

চাউল উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায়। এই কয়টি প্রদেশে পাটের চাষেও অনেক জমি লাগানো হইয়া থাকে। ১৯৪০-৪১ সালে পাটচাষ যাহা ছিল, ১৯৪১-৪২ সালে কমিয়া তাহার ৫৫ ./· অংশে নামিয়াছে এবং পাটের পরিবর্ত্তে অন্ততঃ কিছু ধান চাষ হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা-গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনভাবে চলিতে পান নাই। ১৯৪২ সালের ১০ই মার্চ তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ এসেমব্লীতে প্রশ্নোত্তরে জানান যে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে বাংলা-গবর্ণমেণ্ট পাটচাষ আরও কমাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে পূর্ব্ববৎসরের পাটচাষের জমির দশ আনা অংশ পাটের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ রেঙ্গুনের পতনের পক্ষকালের পর পাটচাষ দশ আনা হইতে কমাইয়া আট আনা করিবার আদেশ হয় বটে, কিন্তু তখন আর কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাংলা দেশে চাউল সরবরা হয় এই বিঘ্ন সম্মুখে দেখিয়াও পাটচাষের নিম্নতম পরিমাণ অন্যূন আট আনা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ভারত-গবর্ণমেণ্টের এক বিভাগ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন করিতেছিলেন এবং অপর এক বিভাগ বাংলা-গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া পাটচাষ করাইতেছিলেন। মার্কিন কর্ত্তৃক পাট কিনিবার যে আশায় অধিক জমিতে পাটচাষের আয়োজন হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই।

ভারতবর্ষ যে সময় যুদ্ধে জড়িত হইতেছিল, তৎকালে খাদ্য-সংস্থানের এই অবস্থা! দেশে যে স্বভাবতঃ খাদ্যের ঘাটতি আছে তাহা বিবেচিত হয় নাই এবং যুদ্ধঘটিত অবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে খাদ্য আনাইবারও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। দেশে বহুসংখ্যক দেশী ও বিদেশী সৈন্য পোষণ করিতে যে অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োজন হইবে এবং এই ব্যাপারে যে বহু খাদ্যের অপচয় হইবে, সে কথাও বিবেচিত হয় নাই। বিদেশী সৈন্যদের জন্য কিরূপ অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহা সকলেরই বিদিত। ইহার উপর রহিয়াছে ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেশ হইতে আগত আশ্রয়-প্রার্থিগণ। এই সমস্ত কারণ মিলিয়া ভারতবর্ষের খাদ্যসঙ্কট বাড়িয়াছে। বিদেশে যে-সকল ভারতীয় সৈন্য আছে তাহাদের খাদ্য যোগাইবার দায় ভারতের, কিন্তু ভারতবর্ষে যে-সকল বিদেশী সৈন্য রহিয়াছে তাহাদের নিজ নিজ দেশ তাহাদের খাদ্য সরবরাহ করে না। সৈন্যদের ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া বহু খাদ্য যে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, বিশ্বস্ত-সূত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। মিত্রশক্তি-বাহিনী আরাকান ছাড়িয়া আসিবার সময় কত খাদ্য

যে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহা হয়ত কখনই জানা যাইবে না।

সৈনিকদের খাওয়াইবার জন্য যুদ্ধের প্রথম হইতে প্রতি বৎসর কত খাদ্য যে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। ১৯৪৩ সালে ২৩শে আগষ্ট একটি সরকারী বিবৃতিতে জানান হয় যে, ভারতবর্ষে সৈনিকদের জন্য বৎসরে ৫ লক্ষ টন গম ও এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টন চাউল দরকার হয়। ইহার পূর্ব্বে ৯ই আগষ্ট ভারত-গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন খাদ্য-সদস্য স্যর আজিজুল হক জানান যে উক্ত বৎসর জানুয়ারি হইতে জুলাই পর্য্যন্ত সৈন্যদলের জন্য ক্রীত চাউল ও গমের মোট পরিমাণ ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টন। আমি যত দূর জানি, সরকারী বিবৃতিতে ও স্যর আজিজুল হকের উক্তিতে অবস্থা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। প্রভূত পরিমাণে খাদ্য ক্রীত ও সঞ্চিত হইয়াছিল এবং যথেষ্ট মজুত আছে বলিয়াই খাদ্য ক্রয় সম্প্রতি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

খাদ্য রপ্তানী বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন, সেরূপ অবিবেচনার কার্য্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুর্লভ। ইহার সম্পূর্ণ সরকারী সংবাদ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ১৯৪৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় এসেমব্লীতে সরকার-পক্ষ সংবাদ জানাইতে অস্বীকার করেন। মধ্যে মধ্যে যে-সকল সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহা পরস্পরবিরোধী এবং তাহাতে সকল কথা বলা হয় না। এই জন্য সরকারী বিবৃতি ও তথ্যের উপর লোকের আস্থা নাই। বাংলা দেশ হইতে কত চাউল রপ্তানী হইয়াছে এবং বাংলা দেশে ঘাট্‌তির পরিমাণ কত, সে বিষয়ে প্রকাশিত সরকারী তথ্য ও হিসাব পরস্পর-বিরোধী। বাংলা দেশে মন্ত্রীরা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, ভারত-গবর্ণমেণ্টের উক্তি তাহার সহিত মেলে না। মোটের উপর এই কথা ঠিক যে, খাদ্যশস্য-রপ্তানীর নীতি নির্দ্ধারণ করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেন নাই, এমন কি খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবার পরও বাংলা ও অন্যান্য ঘাট্‌তি অঞ্চল হইতে চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত খাদ্যশস্য,—বিশেষ করিয়া চাউলের আমদানী ও রপ্তানী তুলনা করিলে দেখা যায়, এই কয় বৎসর রপ্তানী অপেক্ষা গড়ে প্রায় ১১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য অধিক আমদানী হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যে বাহিরের খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ১৯৪২ সালে আমদানী ও রপ্তানীর অবস্থা উল্টাইয়া গিয়াছে, খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে প্রায় ২ লক্ষ টন কিন্তু রপ্তানী হইয়াছে কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন লক্ষ টন (ইহার মধ্যে আমদানী চাউলের পরিমাণ ১৬৩৮০৩ টন, রপ্তানী চাউলের পরিমাণ ২৩০৩৫৮ টন); তবুও ইহাতে গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব রপ্তানী ধরা হয় নাই।

এই দুঃসময়েও ভারতবর্ষ হইতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশ হইতে প্রভূত খাদ্যশস্য রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, গত ২২শে আগষ্ট তারিখে এক বিবৃতিতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহা খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ঘাট্‌তি প্রদেশ ও রাজ্য-সমূহের প্রয়োজনীয় খাদ্যের একটা "কোটা" বা নিম্নতম পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহার জন্য ঘাটতি স্থান-সমূহ উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্য আনাইতে পারে। কোন্ স্থানের জন্য কি পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। বাংলার "কোটা" নির্দ্দেশ করিতে বাংলায় ২০ লক্ষ টনের অধিক ঘাট্‌তির কথা বিবেচনা করা হইয়াছে কি না ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট জবাব দেন যে, সরবরাহের সম্ভাবনা ও প্রাদেশিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়া "কোটা" স্থির করা হইয়াছে; স্পষ্টই বুঝা যায় প্রাদেশিক প্রয়োজন অপেক্ষা সরবরাহের সম্ভাবনার কথাটাই বিবেচনা করা হইয়াছে বেশী।

২। বাংলা-সরকারের দায়িত্বের অপলাপ

বাংলা দেশের এই দারুণ দুর্দ্দশার জন্য কে দায়ী তাহার আলোচনায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর দোষ ও দায়িত্ব চাপাইতে চাহিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধঘোষণার পর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর যে-সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাতে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা প্রদেশে প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

এইরূপ অবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যাহা করিতে হইবে তাহা "ফেমিন কোডে" নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বহু দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া এই "ফেমিন কোড" রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ১৯০১ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন "ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন"

গঠন করেন। উক্ত কমিশন যে মূল্যবান্ রিপোর্ট দেন তাহা অবলম্বন করিয়া "ভারতীয় ফেমিন কোড" আদ্যোপান্ত সংশোধন করা হয়। রিপোর্টের নির্দ্ধারিত সাধারণ নীতিসমূহ প্রাদেশিক বিশেষ অবস্থায় যে ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে তদনুসারে বিভিন্ন প্রাদেশিক "ফেমিন কোড" রচিত হইয়াছে। এই নীতিসমূহ অভিজ্ঞতার দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত ও সুফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ফেমিন কোডে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার যে-সকল কারণ অনুমান করা হইয়াছে তাহা শস্যহানিঘটিত। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিই শস্যহানির প্রধান কারণ; নদীর প্লাবন, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলেও যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে তাহাও ধরা হইয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দুর্ভিক্ষ আশঙ্কিত হইলে বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাহার প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্য ফেমিন কোডে যে-সকল মূল নীতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সকল দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে, যে-কারণেই উহা সংঘটিত হউক। বাংলা দেশে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের অবস্থা নানা বিচিত্র কারণে ঘটিয়াছে। কিন্তু ফেমিন কোডের নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ এক্ষেত্রেও সমান ভাবেই প্রযোজ্য মনে হয়।

ফেমিন কোডের নির্দ্দেশিত প্রতিকার-ব্যবস্থাসমূহ মোট চারি ভাগে বিভক্ত:—(১) দুর্ভিক্ষের বা অন্নসঙ্কটের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা, (২) উহার সম্ভাবনা আশঙ্কিত হইলে প্রাথমিক সন্ধান ও প্রতিকারের উদ্যোগ, (৩) প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষার জন্য টেষ্ট রিলিফ প্রবর্ত্তন, (৪) ইহার দ্বারা দুর্ভিক্ষ সিদ্ধান্ত হইলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা এবং তাহার প্রতিকারের জন্য বিশেষ প্রকারের রিলিফ-ব্যবস্থা। বৃষ্টিপাতের হিসাব, আবহাওয়ার পরিচয়, চাষের হিসাব, ফসলের হিসাব, জনস্বাস্থ্য, গো-মহিষাদির স্বাস্থ্য, দ্রব্য-মূল্যের হিসাব ইত্যাদি যে-সকল বিবরণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরকারী ভাবে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য দুর্ভিক্ষ-সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সম্ভাবনা অনুমিত হইলে, সময় থাকিতে তাহার প্রতিকার করা। এই সকল বিবরণের মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য—বাংলার কোথায় মোটা চাউল খুচরা কি দরে বিক্রয় হইতেছে তাহার বিবরণ এবং লোকের সাধারণ অবস্থা কি, কোথাও অন্নকষ্ট আছে কি না তাহার বিবরণ।

দুর্ভিক্ষ-সম্ভাবনায় সরকারের দায়িত্ব আরম্ভ হয় খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। স্বাভাবিক দরের উপর শতকরা ২০ ভাগ বাড়িলেই জেলা-কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ তৎপর হইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িলেই সে সংবাদ বিভাগীয় কমিশনার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার কথা। এই হিসাবে বর্ত্তমান অবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্ব্বে।

সাময়িক মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইলেও মূল্য দ্বিগুণ হইবার পরেও গবর্ণ-মেণ্টের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। প্রকৃত পক্ষে ফেমিন কোডের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তখন হইতেই গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব আরম্ভ হইয়াছে। তৎকালে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার ছিলেন, তাঁহারা ফেমিন কোডের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কি না তাহা প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য প্রদেশের খাদ্যশস্যের মূল্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সমসাময়িক কালে সর্ব্বত্রই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার তুলনায় বাংলা দেশের মূল্যবৃদ্ধি অত্যধিক। বস্তুতঃ বাংলা দেশে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে অন্যান্য প্রদেশে তাহা হয় নাই। বাংলা দেশে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও বর্ত্তমান অবস্থার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ও স্বতন্ত্র কারণ আছে।

অন্নকষ্টের আশঙ্কা দেখা দিলেই জেলা-কর্ত্তৃপক্ষ সন্ধান লইতে থাকিবেন শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রিলিফের কি ব্যবস্থা হইতে পারে। এই জন্য যে যে ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য:—

অপরাধের সংখ্যা বাড়িতেছে কি না,

অভাবগ্রস্ত, অনশনক্লিষ্ট লোকেরা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কি না,

অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে লোক-যাতায়াত কিরূপ,

মৃত্যু-সংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইতেছে কিনা,

অনশনের অথবা দারুণ অভাবের সংবাদ পাওয়া যায় কি না,

উল্লিখিত লক্ষণগুলি কমিতেছে কি না।

এই লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি অবস্থা উদ্বেগ-জনক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে টেষ্ট রিলিফের অর্থাৎ পরীক্ষামূলক রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। টেষ্ট রিলিফ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার কার্য্য, যখন পর্য্যন্ত লোকের খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা আছে, দীর্ঘকাল অন্নাভাবে লোকে একেবারে জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই। বাংলা-গবর্ণমেণ্ট গত ২০শে আগষ্ট তারিখে যে রিলিফের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এখন তাঁহারা টেষ্ট রিলিফের কথা তুলিয়াছেন। ফেমিন কোডের মূল নীতিটাই তাঁহাদের ভুল হইয়াছে। এখন লোকে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা টেষ্ট রিলিফের অবস্থা

নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূরাপূরি খয়রাতি রিলিফের অবস্থা।

ইহার পর দুর্ভিক্ষ ঘোষণা। টেষ্ট রিলিফের কার্য্যে বহু লোক আসিতে থাকিলে অথবা ব্যাপকভাবে খয়রাতি সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হইলে জেলা-কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ টেলিগ্রামের দ্বারা দুর্ভিক্ষ ঘোষণার জন্য অনুরোধ করিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী লোকগণনা অনুসারে কোন থানা বা তদপেক্ষা বৃহত্তর অঞ্চলের লোক-সংখ্যার প্রতি দুই শতে ১ জন যদি ক্রমান্বয়ে দুই মাস খয়রাতি রিলিফে জীবনধারণ করিতেছে ইহা সাব্যস্ত হয় তবেই দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হইবে। অন্নসঙ্কট অনুমানের যেমন লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তেমনি দুর্ভিক্ষ অনুমানের জন্য জেলা-কর্ত্তৃপক্ষকে কতকগুলি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তন্মধ্যে কয়েকটি হইল—

লোকের দান প্রবৃত্তির হ্রাস, ফলে ভিক্ষুকগণের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ,
ধার না পাওয়া,
শস্য-ব্যবসায়ে অস্বাভাবিক চঞ্চলতা,
লোকের অস্বাভাবিকভাবে গতায়াত ইত্যাদি।

বস্তুতঃ টেষ্ট রিলিফ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই এই সকল লক্ষ্য করিবার কথা। এইগুলির মধ্য দিয়া যে অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষাই টেষ্ট রিলিফের উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় অনশনক্লিষ্ট, ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ জনতার ক্লেশ লাঘবের জন্য পথের স্থানে স্থানে সরাই ও অন্নসত্র খুলিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই সকল স্থানে লোককে পৌছাইয়া দিবার জন্য বিশেষ পুলিসের ব্যবস্থা করিতেও বলা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ ঘোষণার পর যে রিলিফের ব্যবস্থা তাহা দুই প্রকারের—টেষ্ট রিলিফের সময় যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার বিস্তারসাধন এবং যাহারা অক্ষম তাহাদের জন্য খয়রাতি রিলিফের ব্যবস্থা। সমগ্র ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য "ফেমিন কমিশনার" নিয়োগ এ বিষয়ে প্রথম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে অতিরিক্ত খাদ্য বস্তু আমদানী করিতে রেলওয়ের উপর যে চাপ পড়িবে তাহা সামলাইবার জন্য শাসনকর্ত্তৃপক্ষ, রেল-কর্ত্তৃপক্ষের এবং প্রয়োজনীয় স্থলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগের একত্র পরামর্শক্রমে উপায় নির্দ্ধারণ। এই প্রসঙ্গে ফেমিন কোডের একটি নির্দ্দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে ব্যবসায়ের অবাধ সুযোগ দিতে হইবে" এবং "সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।"

দুর্ভিক্ষ রিলিফের ব্যবস্থায় যাহারা মজুরি করিবে সেই সকল লোকের জীবন ধারণের জন্য আহার্য্যের যে পরিমাণ "ফেমিন কোড" নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। যাহারা জীবিকার জন্য পুরাদস্তুর কায়িক শ্রম করিবে এরূপ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের জন্য খাদ্যশস্য দৈনিক ষোল ছটাক, অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে বার ছটাক, খাটিতে অপারগ মজুরের পরিবারস্থ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বার ছটাক, স্ত্রীলোক দশ ছটাক, শ্রমরত বালকবালিকা দশ ছটাক; যে-সকল বালকবালিকাকে খাটিতে হয় না, তাহারা দশ বৎসর বয়স হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দৈনিক আট ছটাক, সাত হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত ছয় ছটাক এবং সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক অথচ একেবারে শিশু নহে এরূপ বালকবালিকা চার ছটাক। যাহাদিগকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইবে তাহাদের জন্যও এই হিসাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। রাঁধিয়া খাওয়ানো হইলে তাহাতে অতিরিক্ত যাহা দেওয়া হইবে (ডাল, লবণ, ঘি বা তৈল, টক শাক-সব্জী) তাহা ধরিয়া উক্ত খাদ্যশস্যের বরাদ্দ হইতে যাহারা খাটে তাহাদের দুই ছটাক এবং যাহারা খাটে না তাহাদের এক ছটাক করিয়া কম দেওয়া হইবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেখানে সরকারী অন্নসত্র খুলিয়া খাওয়ানো হইবে তথায়ও এই বরাদ্দই প্রযোজ্য।

দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে দান সংগৃহীত হইলে তাহা নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ব্যবহৃত হইবে। আহার্য্যের ব্যয় ও চিকিৎসার ব্যয় বহন করিবার দায় সম্পূর্ণভাবেই গবর্ণ-মেণ্টের। সাধারণের প্রদত্ত অর্থ চারি প্রকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে—

(১) কাপড়, কম্বল প্রভৃতি দিতে, (২) অনাথ শিশুদের সাহায্যে, (৩) সরকারের নিকট সাহায্য লইতে যাহারা অনিচ্ছুক তাহাদের সাহায্যে এবং (৪) কৃষক ও কারুজীবী-দিগকে ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে।

বাংলা-গবর্ণমেণ্টের গত ২০শে আগষ্ট তারিখের যে রিলিফের পরিকল্পনা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ফেমিন কোডে উল্লিখিত ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলেই তাহার ফাঁকি ধরা পড়ে। ফেমিন কোডের মূল কথা হইল এই যে, দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে রক্ষা করিবার দায় সম্পূর্ণ গবর্ণ-মেণ্টের। বাংলা-গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনায় এই দায়িত্ব কৌশলে এড়াইয়া উহা পরিশেষে সাধারণের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে যেটুকু দায়িত্ব লইয়াছেন তাহা যে কত বড় ফাঁকি, দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দের প্রতি

লক্ষ্য করিলেই তাহা প্রকট হইয়া উঠে। ফেমিন কোডের বরাদ্দ উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলা-সরকারের নূতন বরাদ্দে দেখিতেছি যাহারা পুরাদস্তুর খাটিবে তাহাদের জন্য খাদ্য-শস্য দৈনিক ৪ ছটাক (ফেমিন কোডে ১৬ ছটাক), অন্যান্য বয়স্কের জন্য ৩ ছটাক (ফেমিন কোডে ১২ ছটাক), ২ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ২ ছটাক (ফেমিন কোডে ৪ ছটাক, ৬ ছটাক ও ৮ ছটাক)। দেখা যাইতেছে, বাংলা-গবর্ণমেণ্ট ফেমিন কোডের বরাদ্দ প্রত্যেক স্থলে প্রায় সিকি ভাগ করিয়াছেন। ফেমিন কোডে ৭ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর জন্য যে নিম্নতম বরাদ্দ ধরা হইয়াছে (৪ ছটাক), বাংলা-গবর্ণমেণ্ট পুরাদস্তুর কায়িক পরিশ্রমরত বয়স্কের পক্ষে সেই বরাদ্দ ধরিয়াছেন। বরাদ্দ যখনই গ্রুয়েল অর্থাৎ মণ্ডের আকারে বিতরিত হইবে তখনকার খাদ্যশস্য আরও কম, জন-প্রতি ২ ছটাক মাত্র। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সর্ জগদীশপ্রসাদ বলিয়াছেন, বাংলা-গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় মানুষ বাঁচিবে না, মরিতে একটু সময় লাগিবে মাত্র।

১৪ই সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশ যে বাংলা-সরকার এই খাদ্যের বরাদ্দ পরিবর্ত্তিত করিয়া কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হার প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই নূতন পরিকল্পনা অনুসারে দৈনিক দু-বেলায় কর্ম্মক্ষম বয়স্ক লোক, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও প্রসূতিদের জন্য জন-প্রতি ৮ ছটাক, অন্যান্য বয়স্কের জন্য ৬ ছটাক ও বালক-বালিকাদের জন্য ৪ ছটাক বরাদ্দ হইয়াছে, তবে উপরোক্ত হার এখনই প্রবর্ত্তিত হইবে না। বর্ত্তমানে কর্ম্মক্ষম বয়স্ক লোক এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও প্রসূতির জন্য জন-প্রতি ৬ ছটাক, অন্যান্য বয়স্কদের জন্য ৪ ছটাক এবং বালক-বালিকাদের জন্য ২ ছটাক করিয়া বরাদ্দ হইয়াছে।

১৮৭৬-৭৮ সালে বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সে সময়ে জন-প্রতি খাদ্য-বরাদ্দ কমাইয়া ৮ ছটাক করা হয়। এই খাদ্যের হার যে জীবনধারণের পক্ষে কত কম তাহা প্রতিপন্ন করিয়া উইলিয়ম ডিগবী তাঁহার পুস্তকে জনৈক প্রখ্যাতনামা চিকিৎসকের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে প্রায় প্রত্যেক দুর্ভিক্ষ কর্ম্মচারী যাঁহারা বর্ত্তমান কম হারের খাদ্য-দ্রব্যের (অর্থাৎ ৮ ছটাক) ফল লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাফলে বিশ্বাস করেন এবং প্রকাশ্যভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানের বরাদ্দ জীবন-ধারণের পক্ষে বিপজ্জনকভাবে কমান হইয়াছে (perilously low)।

দেশে যে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই তাহা অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, খাদ্য-সঙ্কটের দায় মজুতকারীদের উপর চাপান হইয়াছে। পরে অবশ্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও বাংলা-গবর্ণমেণ্ট উভয়েই ঘাটতি স্বীকার করিয়াছেন। বাংলা-গবর্ণমেণ্ট যে খাদ্য সন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র শোচনীয় খাদ্যা-ভাব ধরা পড়িয়াছে। গত ২১শে আগষ্ট তারিখে এক ঘোষণার দ্বারা বাংলা-গবর্ণমেণ্ট ধান ও চাউলের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে যাহাতে ক্রমে ক্রমে দাম কমিয়া যায় সেইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই দাম চড়িয়া গিয়াছে, এমন কি কণ্ট্রোলের দোকানে চাউলের দাম ২৩শে আগষ্ট হইতে ছয় আনা সেরের পরিবর্ত্তে আট আনা সের হইয়াছে। পরে চাউল একেবারেই দুষ্পাপ্য হইয়াছে। যে-সকল প্রদেশ ও রাজ্য হইতে বাংলায় খাদ্যশস্য আনীত হইতেছে তথায় যে-দরে খাদ্য কেনা হইতেছে বাংলায় আসিয়া তাহার দর দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া যাইতেছে। ইহাতে স্বভাবতঃই লোকের মনে সন্দেহ জাগিতেছে। সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে ধান ও চাউলের মূল্যের যে অনুপাত ধরা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে, বস্তুত চাউলের মূল্য ধানের মূল্যের দ্বিগুণ হয় না। সরকারী কণ্ট্রোলের ব্যবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াছে, স্বাভাবিক ব্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, সম্প্রদায়গত, জাতিগত ও অন্যান্য কারণে অনুগৃহীতগণ এজেণ্ট ও দালাল নিযুক্ত হইয়াছে, কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং ইহা ছাড়া আরও গুরুতর অভিযোগ লোকে করিতেছে। এই নিন্দনীয় ব্যাপারে সমগ্রভাবে তদন্ত করিবার জন্য লোকের আস্থাভাজন একটি কমিটি নিযুক্ত করা দরকার। ইহাতে অন্ততঃ দুই জন হাইকোর্টের জজ ও একজন একাউনটেণ্ট-জেনারেল থাকা আবশ্যক।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বিলাত হইতে এদেশ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ-মহলের প্রায় সকলেই কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের কথাই চিন্তা করিতেছেন। কলিকাতায় বড় বড় আফিসের মালিকেরা, বিশেষতঃ ব্রিটিশ মালিকেরা, কি প্রভূত পরিমাণে খাদ্য মজুত করিয়াছেন তাহা হয়ত কোন দিন জানা যাইবে না। ১৯৪৩ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ইহাদিগকে লাইসেন্স লইতে বা হিসাব দিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরও ছিল না। পরবর্ত্তী জুলাই মাসে মজুত সন্ধানের যে চেষ্টা হয় তাহা হইতে কলিকাতা ও হাবড়াকে ইচ্ছা করিয়াই বাদ দেওয়া হইয়াছিল, ফলে মফস্বল হইতে বহু খাদ্যশস্য এই দুই অঞ্চলে চলিয়া আসে এবং পাকে-প্রকারে বড় বড় আফিস ও মিলের মালিকদের হস্তগত হয়। এমন কি

এখনও বাংলার মফস্বলের শোচনীয় অবস্থার কথা ভারত-গবর্ণমেণ্টের যানবাহন-বিভাগের সদস্য সর্ এডওয়ার্ড বেন্থল অবগত নহেন বলিয়াই মনে হয়। তিনিও কলিকাতা, হাবড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলের কথাই ভাবিতেছেন। মজুত সন্ধানের প্রয়াসে মফস্বলে যে শোচনীয় ঘাটতি ধরা পড়িয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে যথেষ্ট মনোযোগী হন নাই এবং এই দুঃসময়ে মফস্বলে যে কি ঘটিতেছে তাহা হয়ত কখনও জানা যাইবে না।

বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী ছাড়া এই গুরুতর খাদ্যাভাবের প্রতিকার সম্ভব নহে। ইউরোপের শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য মিত্রশক্তিপক্ষ যে বিরাট্ খাদ্যসম্ভার রাখিয়াছেন তাহার একাংশ ভারতে প্রেরিত হউক এবং সদ্য সদ্য লোকের দুর্গতি মোচনার্থে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ, রেল কর্ত্তৃপক্ষ, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এবং কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট বাংলার মধ্যে তাঁহাদের মজুত খাদ্যশস্য হইতে কিয়দংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে ঋণস্বরূপ দান করুন। অচিরে বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের সমাধান না হইলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষাও ভয়াবহ ও মর্ম্মান্তিক অবস্থার উদ্ভব হইবে।

উত্তর-কাশীতে প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি

মহাপণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন-কথিত

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল কর্তৃক অনুলিখিত

[অনুলেখকের নিবেদন :—বৌদ্ধশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতবর রাহুল সাংকৃত্যায়নের নাম সর্বত্র সুবিদিত। ভারতে লুপ্ত বহু বৌদ্ধগ্রন্থের সংস্কৃত মূল তিব্বত হইতে উদ্ধার করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ইতিহাস সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি লিখিয়া এই কীর্তিমান পুরুষ জগতের পণ্ডিতসমাজে বিপুল যশের অধিকারী হইয়াছেন। ইদানীং বিহারের অগ্নিগর্ভ কিসান-আন্দোলনে নেতৃত্বের কল্যাণে অপণ্ডিত মহলেও আর অপরিচিত নহেন। গ্রন্থোদ্ধারব্যপদেশে ইনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বার বার তিব্বতে গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম তিব্বত-প্রবাসের রোমাঞ্চকর কাহিনীর বঙ্গানুবাদ কয়েক বৎসর পূর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। ঘটনাবৈচিত্র্যে রাহুলজীর জীবন উপন্যাসকেও হার মানায়।

রাহুলজী প্রতিবার মধ্য-তিব্বতেই গিয়াছেন। পশ্চিম-তিব্বত অর্থাৎ তিব্বতের যে অংশ টিহ্‌রী গাড়োয়ালের প্রান্তবর্তী তাহা দেখিবার সুযোগ পান নাই। এই অঞ্চলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ থোলিং মঠ বিদ্যমান। উত্তর-কাশী হইতে জলুখাগা গিরিপথে থোলিং মাত্র ১৪২ মাইল। সম্প্রতি রাহুলজী এই পথে থোলিং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার সঙ্গী সুপণ্ডিত নাগার্জুনজী গিয়াছেন। তিনি সফলকাম হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে তিব্বত ও ভারতের পরস্পর সম্বন্ধের ইতিহাসে হয়ত নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে।

উত্তর-কাশী হইতে ফিরিবার পথে রাহুলজী কয়েক দিন দেরাদুনে অবস্থান করেন। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তখন তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হই। ইহা এক রকমের শ্রুতিলিখনই বলা চলে। তাই রাহুলজীর জবানীতেই রাখিয়া দিয়াছি। তিনি হিন্দীতে বলিয়া যাইতেছিলেন, আমি বাংলা করিয়া লিখিয়া লইতেছিলাম। বক্তার সম্মতিক্রমেই, পুনর্লেখনকালে বক্তব্য-বিন্যাসে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছি। এই কথা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, আমার সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজন হিন্দীতেও লিখিয়া লইয়াছিলেন। যদি তাহা পরে প্রকাশিত হয়, তবে দুই প্রবন্ধ অক্ষরে অক্ষরে না মিলিবারই কথা। অবশ্য মূল বক্তব্য উভয়ত্র অভিন্ন পাওয়া যাইবে। প্রকাশের জন্য প্রেরণের পূর্বে রাহুলজীকে ইহা একবার আদ্যোপান্ত শুনাইয়াছি। ইতি ৩০।৬।৪৩]

হৃষীকেশ হইতে নরেন্দ্রনগর দিয়া উত্তর-কাশী ৯৪ মাইল। গাড়োয়ালের বাহিরে সমগ্র ভারতে যদিও উত্তর-কাশী নামই প্রচলিত, স্থানীয় পাহাড়ীরা এখনও ইহাকে বাড়-হাট বলে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন এককালে এখানে বার-হাট ছিল। গঙ্গা এই অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিতা। নদী ও পাহাড়ের মধ্যে সুবিস্তৃত প্রায়-সমতল ভূমি। প্রাকৃতিক অবস্থান দৃষ্টে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে কোনকালে এই অঞ্চল বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ ছিল। ইহার পূর্ব প্রসিদ্ধির সমর্থনকল্পে এক ধাতুনির্মিত ত্রিশূলের উল্লেখ করা যায়। ত্রিশূলটির উপর ষষ্ঠ শতাব্দীর লিপিতে উৎকীর্ণ তিন ছত্র সংস্কৃত ধাতুলেখ রহিয়াছে। এই ধাতুলিপি প্রথম হইতেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মনে পড়িতেছে, দশ বৎসর পূর্বে অধুনালুপ্ত, মৎ-সম্পাদিত গঙ্গা পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় (পুরাতত্ত্ব-সংখ্যায়) এই ত্রিশূল ও লেখ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বাহির হয়। সেই প্রবন্ধে ধাতুলিপির ব্লকও ছাপা হইয়াছিল। পূর্বালোচিত বলিয়া আমি এই ত্রিশূল-

লেখ সম্বন্ধে এস্থলে বিস্তারিত বিবরণ দিবার আবশ্যক দেখি না। আজ আমি অন্য একটি প্রাচীন বস্তুর কথা বলিব। সেটি এক বৃহদাকার বুদ্ধমূর্তি। মাত্র দুই-একজন লোক তাহার অস্তিত্বের কথা অবগত আছেন। মূর্তি অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধমূর্তি বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।



ত্রিশূলের ছবি

সম্প্রতি উত্তর-কাশীতে মাসখানেক ছিলাম। ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় উত্তর-কাশীবাসী আনন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন আমি দত্তাত্রেয় মন্দিরে ঠাকুর দেখিতে গিয়াছি কিনা। উহার এমন কি বিশিষ্টতা আছে জানিতে চাহিলে স্বামিজী বলিলেন যে দত্তাত্রেয় বলিয়া পূজিত হইলেও আসলে উহা বুদ্ধমূর্তি। কিছুকাল পূর্বে ইউ. পি. গবর্ণরের অ্যাডভাইসর ডাঃ পান্নালাল মন্দির ও মূর্তি দেখিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পিত্তলনির্মিত এই মূর্তির পাদপীঠে অবোধ্য লিপিতে এক লেখ উৎকীর্ণ আছে যাহা কেহ পড়িতে পারে না।

বলা বাহুল্য অবিলম্বে দেখিতে গেলাম। বাহির হইতে মন্দিরটিকে সাধারণ ঘরের মতই মনে হয়। মন্দির বলিয়া চিনিবার যো নাই। পাথরের ছাদ, সামনে পিছনে দুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা, বাইরে স্বল্পপরিসর বারান্দা। বর্তমান মন্দির মাত্র বিশ বৎসর আগে তৈরি। পূর্বে জীর্ণাবস্থ গোলাকৃতি মন্দির (?) ছিল—যাহা আকৃতিতে এই অঞ্চলের পার্বতীয় মন্দিরের মতই। আর ছিল, মন্দিরের চারি দিকে দেবদারু স্তম্ভের উপর বিন্যস্ত এক পরিক্রমা। মন্দির প্রদক্ষিণকারীদিগকে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য মন্দিরকে ঘিরিয়া যে "শেড" তৈরি হয়, পরিক্রমা তাহারই নাম।

আজকাল এক পাহাড়ী গোঁসাই-পরিবারের উপর পূজার ভার। চার-পাঁচ পুরুষ হইতে ইঁহারাই পূজক। টিহরী-রাজ্য হইতে মন্দিরের জন্য বার্ষিক পনর-বিশ টাকা আয়ের দেবোত্তর আছে । তা ছাড়া নগদ এক শত টাকার ব্যবস্থা।

বারান্দা ও বাহিরের কামরা অতিক্রম করিয়া গর্ভগৃহে প্রবিষ্ট হইলাম। ভিতরে অল্প অল্প অন্ধকার ছিল। তবে মূর্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। প্রসন্ন সুস্মিত আনন, দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা, বামে সংঘাটি চীবরের (ভিক্ষু-বসনের) কোঁচকান কোণ। উহার ত্রিভঙ্গ ঠামে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে একাদশ শতাব্দীর শিল্পকলার নিদর্শন সুস্পষ্ট। বহুকাল হইতে বালুকাদ্বারা ঘর্ষণে ভ্রূ চোখ ও নাক ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। তবু চোখের রৌপ্যরেখা অম্লান আছে। ওষ্ঠের লালিমা-সঞ্চারী তাম্র-রঞ্জন পরিষ্কার দেখা যায়। মূর্তির উপরের সারাদেহ ও শিরোভাগের দুই প্রভামণ্ডল কোনকালে অখণ্ডিত ছিল। পিত্তলকে স্বর্ণভ্রমে কেহ প্রভামণ্ডলের উপরের অংশ ছেনী দিয়া কাটিয়া লইয়া থাকিবে। ভাগ্যের কথা, বাকী অংশের উপর আর হাত চালায় নাই। হয়ত কর্তিত অংশ পরীক্ষায় নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই যে এক-কালে প্রভামণ্ডল সম্পূর্ণ ছিল, পরে কেহ কোন কারণে কাঁধের উপরের অংশ অপসারণ করিয়াছে। এখন এই বুদ্ধমূর্তি দত্তাত্রেয় নামে পূজিত হইতেছে। বিষ্ণুর অবতার দত্তাত্রেয় ত ত্রিমুখ। কিন্তু এই মূর্তির একটি মাত্র মাথা। পূজক কাঁধের উপর সঙ্কীর্ণ-পরিসর কর্তনচিহ্ন দেখাইয়া বলেন দুই দিকে আর দুইটি মস্তক ছিল, কেহ কাটিয়া দিয়াছে। এমনও শুনিলাম দেববিদ্বেষী বৌদ্ধরাই এই শিরশ্ছেদের জন্য দায়ী।

মূর্তি ত্রিশ ইঞ্চি উঁচু। পাদপীঠ-সমেত আটত্রিশ ইঞ্চি। একাদশ শতাব্দীর এমন সুন্দর ও বৃহদাকার বুদ্ধ-প্রতিমা বেশী পাওয়া যায় নাই।

পীঠাসনের উপর সামনের দিকে ক্ষোদিত যে ধাতুলেখ আছে, তাহা পড়িতে পারিলাম। তিব্বতী লিপি। লেখটি এবম্প্রকার

ল্হ· বচন· প· ন· গ· র· জ্ঞং· থুবস· প·

আজকালকার তিব্বতী উচ্চারণে ইহা এই রকম পড়িতে হইবে:

ল্‌হ চন্‌পো নগরজ.ই থুপ্পা

লেখের অর্থ—"দেবভট্টারক নাগরাজের মুনি"। মুনির অর্থ যে শাক্যমুনি অর্থাৎ বুদ্ধপ্রতিমা, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। ল্‌হ চনপো বা দেবভট্টারক সেই সময়ে রাজাকে বলা হইত। ইহাতে প্রতীত হয় নাগরাজ তিব্বতের এক রাজকুমার। কে এই নাগরাজ? কোন সময়ের লোক ইনি? তাঁহার সময় নির্ণয়কল্পে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যে সন্ধান পাই, তাহাই এক্ষণে নিবেদন করিব।

তিব্বতের ইতিহাসে দেখিতেছি, নাগরাজের পিতা খোরদে পশ্চিম-তিব্বতের গুগে অথবা শুঙ্‌ শুঙ্‌ প্রদেশের রাজা ছিলেন। ইনিই পশ্চিম-তিব্বতের অদ্যাপি-বিদ্যমান থোলিং মঠের প্রতিষ্ঠাতা। দুই পুত্র সহ ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভিক্ষু-নাম য়েশেয়ো বা জ্ঞান-প্রভ। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার মানসে এই মহা-পুরুষ দূত পাঠাইয়া বিক্রমশিলার বিশ্রুতকীর্তি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে সানুনয় আমন্ত্রণ করেন।* এই মহান্‌ সঙ্কল্প পূর্তির জন্য যখন জ্ঞানপ্রভ ধনসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সীমান্তের কোন নরপতি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। জ্ঞানপ্রভের পরিত্যক্ত শুঙ্‌ শুঙের সিংহাসনে, তখন তাঁহার পৌত্র দেবগুরু বোধিপ্রভ (ল্‌হ লামা চাং ছুপ্‌ ও) আসীন। (ইনি জ্ঞানপ্রভের সাক্ষাৎ পৌত্র নহেন, তাঁহার অনুজের পৌত্র। ইনিও পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। চাং ছুপ্‌ ও বা বোধিপ্রভ তাঁহার ভিক্ষু-নাম।) বোধিপ্রভ মুক্তি পণ দিয়া জ্যেষ্ঠ পিতামহের কারামোচনে উদ্যত হইলে তিনি নিষেধ করিয়া পাঠান। শত্রু-কারাগারেই এই রাজর্ষির দেহান্ত হয়। দূতপ্রমুখাৎ এই মর্মন্তুদ সংবাদ অবগত হইয়া দীপঙ্কর তিব্বত যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন ও ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-তিব্বতে পৌঁছেন। এই সব ঘটনা হইতে বোধিপ্রভের পিতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র নাগরাজের মোটামুটি কাল নির্ণয় করিতে পারা যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি বর্তমান ছিলেন, ইহা ধরিয়া লইতে পারি। সুতরাং তৎস্থাপিত উত্তর-কাশীর বৌদ্ধমূর্তিতে যে একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা অযৌক্তিক নহে।

এমন সুন্দর ও বিশাল মূর্তি কোন ক্ষুদ্র বিহারের জন্য নির্মিত হইতে পারে না। বোধ করি নাগরাজ এই স্থানে কোন বৃহৎ বিহার প্রতিষ্ঠা ও তাহার মন্দিরে এই মূর্তি স্থাপন করেন। কোন বৃহৎ বিহার অবৌদ্ধ দেশে স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে উত্তর-কাশী অঞ্চল সেই কালে বৌদ্ধ-অধ্যুষিত ও পশ্চিম-তিব্বতের বৌদ্ধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহাও হইতে পারে যে নাগরাজ পিতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রব্রজ্যা না লইয়া কিছু কাল পরে লইয়াছিলেন। যে সময় তিনি



দত্তাত্রেয় নামে পূজিত বুদ্ধমূর্তি

সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, সেই কালের মধ্যেই নিজ রাজ্যভুক্ত উত্তর-কাশীতে বিহার স্থাপন ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য ইতিহাসে বলে যে নাগরাজ ও তাঁহার পিতা যুগপৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রমণ হইবার পূর্বে তিনি যে কিছু কাল রাজপদ অলঙ্কৃত করেন, এই অনুমানও ভিত্তিহীন নহে। মূর্তির পাদপীঠে যে লিপি আছে, তাহাতে নাগরাজের উপাধি ল্‌হ-লামা নহে, যাহা সিংহাসনত্যাগী রাজ-ভিক্ষুর জন্য ব্যবহৃত হইত। উহাতে আছে, ল্‌হ চনপো অর্থাৎ দেবভট্টারক, যাহার অর্থ রাজা। ইহাতে অনুমান করি, পিতার সংসার ত্যাগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু দিনের জন্য সিংহাসনে বসেন এবং তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বসময়ে উক্ত বিহার নির্মিত হয়। একাদশ শতকের পূর্বার্ধে উত্তর-কাশী অঞ্চল যে তিব্বত-শাসিত ছিল, এই অনুমানের সপক্ষে অনেক যুক্তি দিতে পারা যায়।

স্রংচন গম্‌ পো তিব্বতের সম্রাট্‌। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়া ইনি খণ্ড-ছিন্ন তিব্বতকে একচ্ছত্র করেন। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতীদের পশ্চিমাভিমুখী অগ্রসরণ হইতে থাকে। ক্রমে সমগ্র হিমালয় অঞ্চল—নেপাল হইতে

* মৎপ্রণীত "তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম" দ্রষ্টব্য।

কাশ্মীর পর্যন্ত, তিব্বতের অধীন হয়। এই সব কথা তিব্বত-ইতিহাসের অবিসম্বাদিত সত্য। যখন হৃষীকেশ হইতে কালসী (দেরাদুন) পর্যন্ত তিব্বতরাজ্যভুক্ত ছিল, তখন উত্তর-কাশীর আর কথাই কি। এই অবস্থা স্রং-বংশের শেষ সম্রাটের সময় (৯০২-৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহার পরবর্তী এক শত বৎসরের কথা এইরূপ। ৯৬৫ অব্দের পর তিব্বত খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ইহা সত্য। কিন্তু সম্রাট্‌বংশীয় এক রাজকুমার (কি-দে-নী-মা-গোণ Kyi-de-ni-ma-gon) পশ্চিম-তিব্বত অধিকার করেন এবং মৃত্যুকালে তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিয়া যান। যে ভাগে গুঙ্‌ গুঙ্‌ বা গুগে প্রদেশ পড়িল, সেই ভাগ পাইলেন রাজকুমার দে-চু-গোণ (De-chu-gon)। এই দেচুগোণের পুত্রই নাগরাজের পিতা খোরদে যাঁহার ভিক্ষুনাম জ্ঞানপ্রভ। এখন প্রশ্ন এই, রাজ্যবিপর্যয়ের পরেও খণ্ডিত সাম্রাজ্যের অংশ, উত্তর-কাশী সমেত এই হিমালয় অঞ্চল আগের মত তিব্বত-শাসনেই ছিল কিনা। ছিল, তার প্রমাণ এই মূর্তি। উত্তর-কাশী এমন কি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া অন্য কোন প্রদেশের শাসক আসিয়া এখানে বৌদ্ধবিহার ও বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করিবেন? আমি এখানে একাদশ শতকের কথাই বলিতেছি। ষষ্ঠ শতাব্দীর লিপিতে উৎকীর্ণ ধাতুলেখ-সমন্বিত ত্রিশূল অবশ্য আর এক সমস্যা। ত্রিশূল স্থাপনের সমকালে এই স্থান বৌদ্ধ-প্রভাবিত ছিল অথবা ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। যদি বৌদ্ধপ্রভাব প্রমাণিত হয়, তবে তাহা ভারতের দিক হইতেই বিস্তৃত হইয়াছিল; কারণ ৬৪২-এর পূর্বে তিব্বতীদের পশ্চিমগতি আরম্ভ না হওয়ায়, তখন তিব্বত-শাসনের কথাই উঠে না।

এই অঞ্চলে তিব্বত-প্রভাবের প্রতিপাদক কিছু আনুষঙ্গিক যুক্তি দিতেছি। বহু গ্রামের নামে—যেমন, ধরাসু, জ্ঞানসু ইত্যাদি—তিব্বতী-প্রভাব সুস্পষ্ট। জলুখাগা হইতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল নীচে তিব্বতী-ভাষাভাষীদের গ্রাম আছে—যাহা এখন টিহরী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহারও নীচে, উত্তর-কাশী হইতে মাত্র ছত্রিশ মাইল অন্তরে, সুখী নামক এক গ্রাম আছে। গ্রামের লোকেরা বলেন, এক কালে সুখী তিব্বতীয় এক সামন্তের অধিকারভুক্ত ছিল। সুখী ও উত্তর-কাশীর মধ্যে এমন কোন প্রাকৃতিক বাধা নাই, যাহা কোন বিদেশীর বিজয়-অভিযান রোধ করিতে পারে। বস্তুতঃ, উত্তর-কাশীরও নীচে, টিহরীর পাঁচ মাইল উপরে ভল্ডেয়ানার পাহাড়ী চড়াইকে তিব্বতের রাজ্যসীমা ধরিতে পারি। সেই যুদ্ধপ্রিয় সামন্তদের যুগে ভল্ডেয়ানার দুর্লঙ্ঘ্য প্রকৃতি-নির্মিত প্রাকার দুই রাজ্যের মধ্যে সীমা-নির্দেশের পক্ষে নিঃসংশয় আদর্শস্থান বলিয়া গণ্য হইত। থোলিং মঠের রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে এই জটিল সমস্যার উপর হয়ত অপ্রত্যাশিত আলোকপাত



মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ ধাতুলেখ

হইবে। বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন থোলিং যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার ফিরিবার বেশী দেরি নাই। এই যাত্রা অবশ্য চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিতের যাত্রা। না হইলে, এমনি ত, এই অঞ্চল হইতে বহু লোক সর্বদাই থোলিং গিয়া থাকে। থোলিং হইতে জলুখাগা গিরিপথে ভারতে আসিবার রাস্তা বহু পুরাতন ও আজও ব্যবহৃত। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা লবণ ও পশম কিনিতে এবং আদি বদরী অর্থাৎ থোলিং দর্শন করিতে তিব্বতে যায়। পাহাড়ী হিন্দুদের বিশ্বাস যে আসল বদরীনাথ থোলিং মঠেই থাকিতেন। তিব্বতী লামাদের আহারে অনাচার হেতু থোলিং হইতে বর্তমান বদরীনাথে পলাইয়া আসিয়াছেন।

আর একটি কথা বলিয়াই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। উত্তরাখণ্ডে আমরা যে কাশী ও প্রয়াগের ছড়াছড়ি দেখিতে পাই, তাহা মুসলমান রাজত্বকালেই হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। এই অঞ্চলের বহু হিন্দু তীর্থই খুব প্রাচীন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, গঙ্গোত্রী তীর্থ। গঙ্গার মূল স্রোত, জাহ্নবী বা জাড়-গঙ্গা গঙ্গোত্রীর গোমুখনিঃসৃত নহে। মূল ধারার উৎপত্তি-স্থান জলুখাগা গিরিবর্ত্ম—যেখান হইতে নাগরাজের পিতা জ্ঞানপ্রভের স্মৃতিবিজড়িত থোলিং মঠ মাত্র দুই দিনের পথ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে

গঙ্গোত্রী অঞ্চল গুর্খারাজ্যের কবলিত হইলে বর্ত্তমান তীর্থ স্থাপিত হইয়াছিল। গুর্খা-অধিকারের সমকালে গঙ্গোত্রীর বর্ত্তমান পাণ্ডার পূর্ব্বপুরুষ কেদার দত্ত ও কিদু দুই ভাই মুখোয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কেদার দত্ত হইতে বর্ত্তমান পাণ্ডা তুলসীরাম (বয়স ৬০ বৎসর) মাত্র ছয় পুরুষ। এই ত প্রাচীন বলিয়া খ্যাত গঙ্গোত্রীর ইতিহাস। অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক তীর্থের অর্বাচীনতা প্রমাণিত হইবে।

রেবতীবাবু

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উকিল-লাইব্রেরিতে ঘর ছয়খানা।

প্রথমে ঢুকিয়াই একখানা বড় কামরা—সিনিয়র এবং অবসর-গ্রহণেচ্ছু উকিলদিগের জন্যে নির্দ্দিষ্ট। তার পরে তথাকথিত জুনিয়রদিগের ঘর। বাকী একখানা লাইব্রেরি, অন্যান্য দুইখানা মক্কেলদিগের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য। এবং ক্ষুদ্রতম কক্ষে চাকর রামা পান তামাক হুকা প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

নরেনবাবু এখন ওকালতি করেন না কিন্তু লাইব্রেরিতে আসেন, রেবতীবাবু মাঝে মাঝে আসেন। এঁদের বয়স সত্তর-পঁচাত্তর, সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। মক্কেল আসিলে জুনিয়র কাহাকেও দেখাইয়া দেন।

নরেনবাবু বেলা গোটা-দুইয়ের সময় আসিয়া জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া কহিলেন, ওরে রামা আমার খবরের কাগজ কোথায় গেল?

খবরের কাগজ অবশ্য পড়িবার জন্য নয়। ঠেস-বেঞ্চিতে কিছু ছারপোকায় উপদ্রব আছে, তাহা নিবারণের জন্যেই খবরের কাগজ পাতা হয়। ভৃত্য রামচন্দ্র আসিয়া কহিল, থিলা, ত মু-ত দিখিছিলু—

—থিলা ত হলা কি? নিয়ে আয় ব্যাটা, বিক্রি করে খেয়েছ।

রামা আর একখানা খবরের কাগজ পাতিয়া দিল। নরেনবাবু বসিয়া একটু হেলান দিয়া আদেশ করিলেন—তামাক দে রামা। ওহে মধু খবরের কাগজটা দাও, কালকেরটা।

নরেনবাবু সর্ব্বদাই গত দিনের কাগজ পড়েন, কারণ নূতন কাগজ লইয়া থাকিলে 'বাবাজীরা' অর্থাৎ জুনিয়র উকিলগণ বিরক্ত হন। মধু কাগজ ও রামা তামাক দিল। আগুনটা অল্পক্ষণেই নিবিয়া গেল, তিনি তারস্বরে হাঁকিলেন—রামচন্দ্র, বাবাজী, একটু তামুক দিও, একেবারে গুলে আগুন দিও না।

—মু-ত তামাকু দিছি বাবু—

—তোর পিণ্ডি দিয়েছিস, নিবে যায় কেন?

—বাবু টানিতে পারে না, তা বল না।

—নাঃ তামাক খাওয়া শিখোচ্ছে। ব্যাটা, আগুন দে—

রেবতীবাবু একখানা বই পড়িতেছিলেন। যে-কোন এক-খানা বই পাইলেই তিনি নিবিষ্ট মনে পড়িয়া যান, কি পুস্তক সে বিষয়ে কোন সংস্কার তাঁহার নাই। এবং পাশে কেহ বই পড়িলে সেটা দেখা চাইই। এবং সকলেরই কুশল প্রশ্ন করা তাঁহার একটা স্বভাব। তিনি জুনিয়র একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নরেশ, ওই বইটা কি দাও ত!

—ওইটাই পড়ুন না।

—আহা দাও না একটু, দাও না।

নরেশবাবু বইটা দিয়া একটু বিরক্তির সঙ্গে উঠিয়া গেলেন। শান্তিবাবু গাউন পরিয়া কোর্ট হইতে ফিরিতেছিলেন রেবতীবাবু প্রশ্ন করিলেন, কেমন শান্তি ভাল? তোমার মায়ের অসুখ সেরেছে?

—আজ্ঞে আমার মা ত বহুকাল মারা গেছেন?

—ও হো তোমার স্ত্রী তা হ'লে—

—আজ্ঞে তার শরীরে ত আজ বারো বছরেও কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখি নি।

—তবে?

—আজ্ঞে ভবেশের স্ত্রীর অসুখ হয়েছিল।

ভবেশ যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া রেবতীবাবু কহিলেন, তোমার স্ত্রী আরাম হয়েছেন?

ভবেশ মাথা চুলকাইয়া বলিল, আজ্ঞে, আপনি ভুল বলেছেন, আমি ত বিয়ে করি নি?

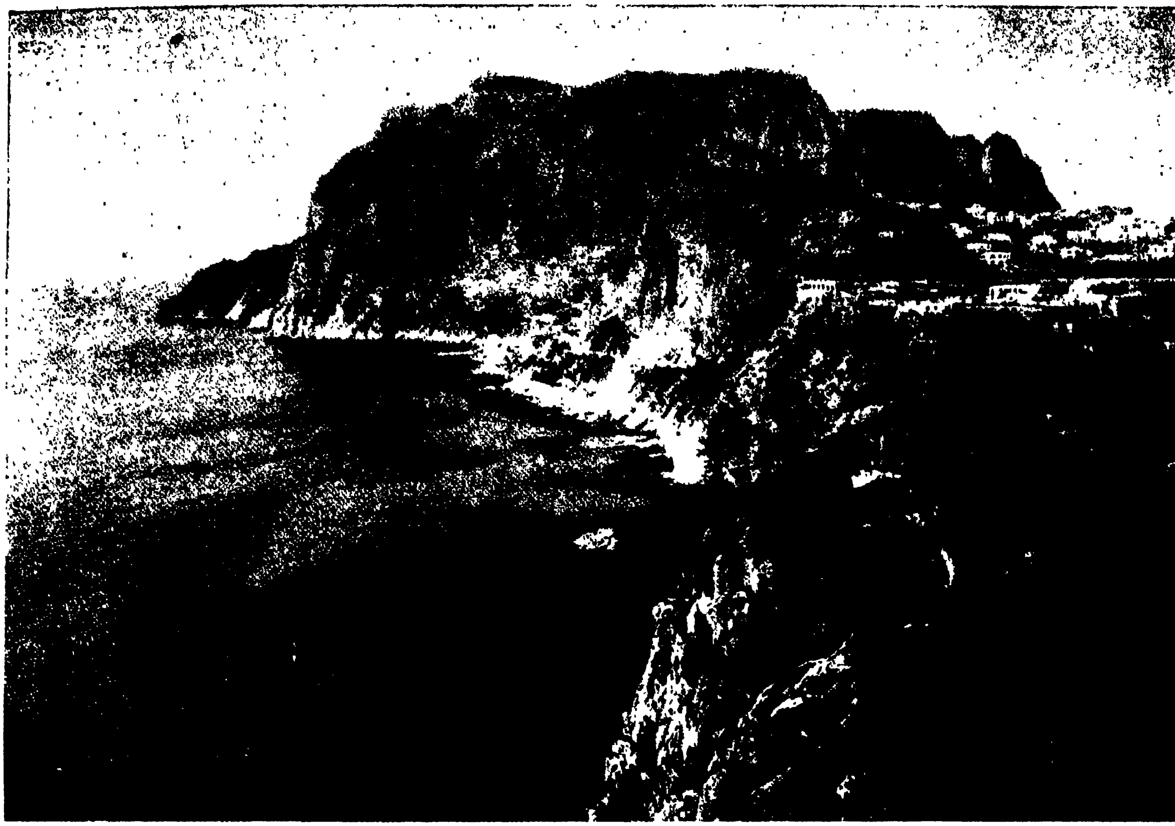
রেবতীবাবু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন, তার মানে?

অন্তরীক্ষে অনেকে হাসিয়া উঠিল। রেবতীবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, বয়সের সম্মান করার মধ্যে অসম্মান নেই ভবেশ। ঠাট্টা করছ? তোমার বিয়েতে যে সেদিন নেমতন্ন খেলাম, তাই না নরেন?

ভবেশ প্রতিবাদ করিল, আজ্ঞে আমার সজ্ঞানে ত বিয়ে হয় নি? .

—বল কি? নেমতন্ন খেলাম, তোমার স্ত্রীর গালে একটা তিল আছে—

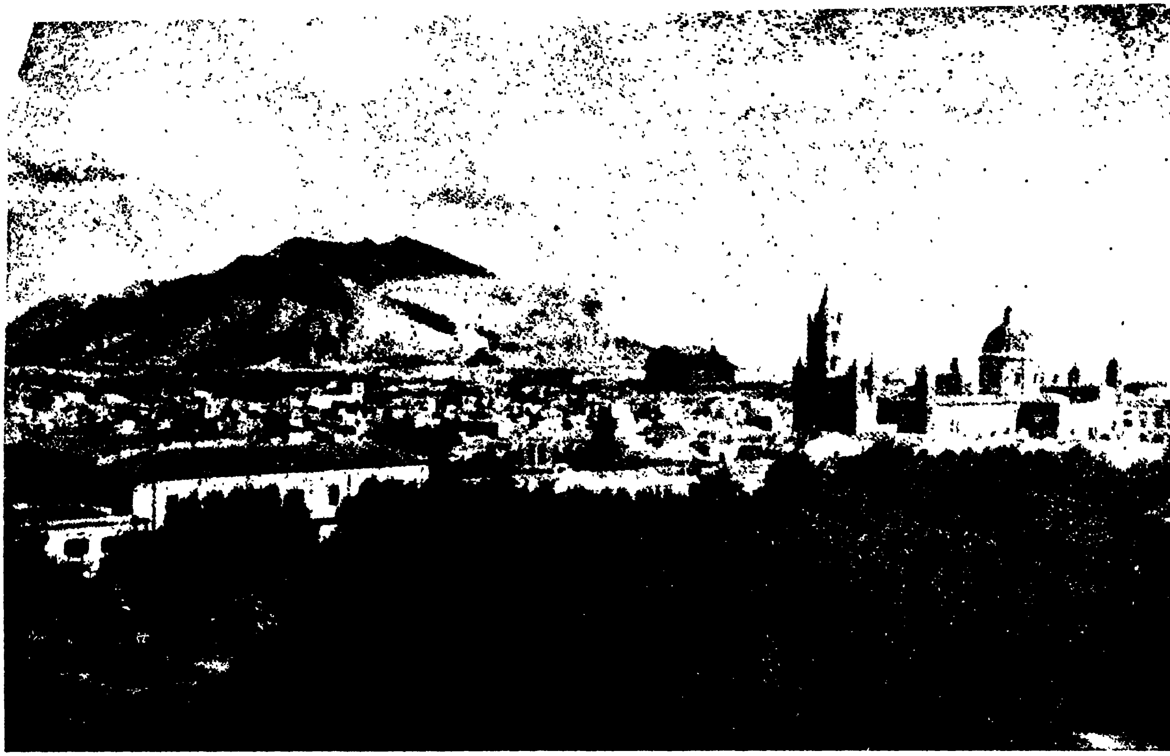
নরেনবাবু ধমক দিয়া কহিলেন, থামো রেবতী, তোমার বড্ড



ইটালী। নেপল্‌সের নিকটস্থ প্রসিদ্ধ কাপ্রি দ্বীপ



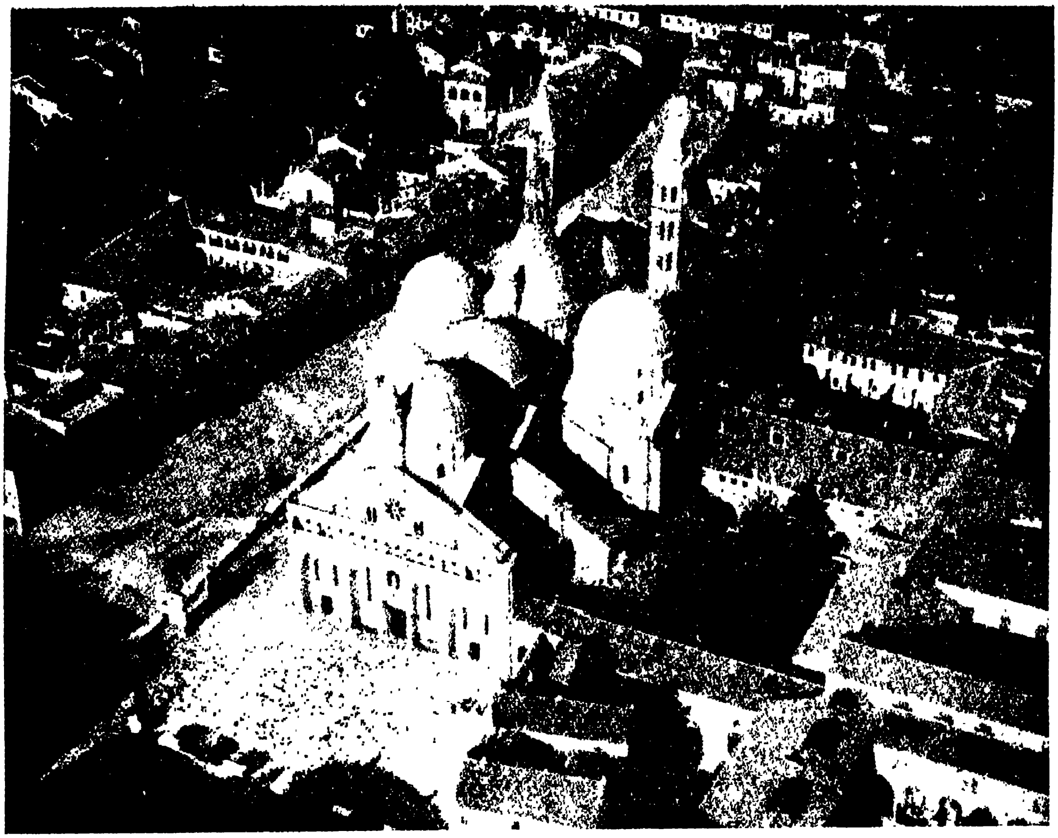
ইটালীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কূলস্থ বারি নগরের সমুদ্রতীরের দৃশ্য



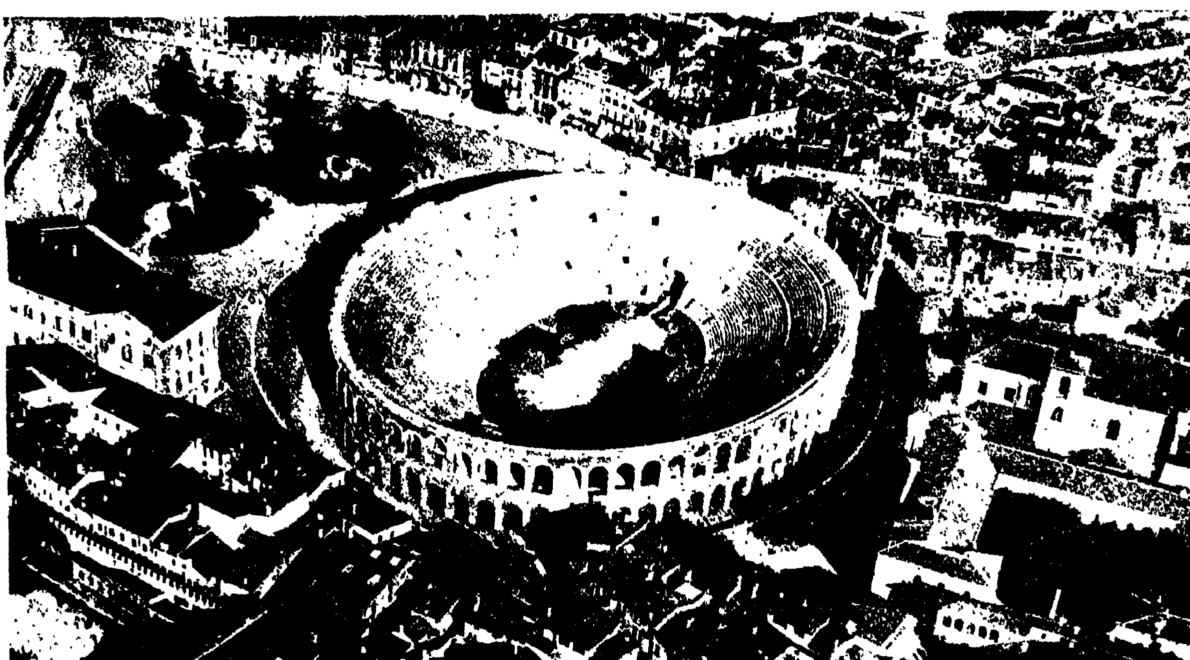
সিসিলির পালের্মো নগর



সিসিলির অধিবাসিগণের জাতীয় পরিচ্ছদ



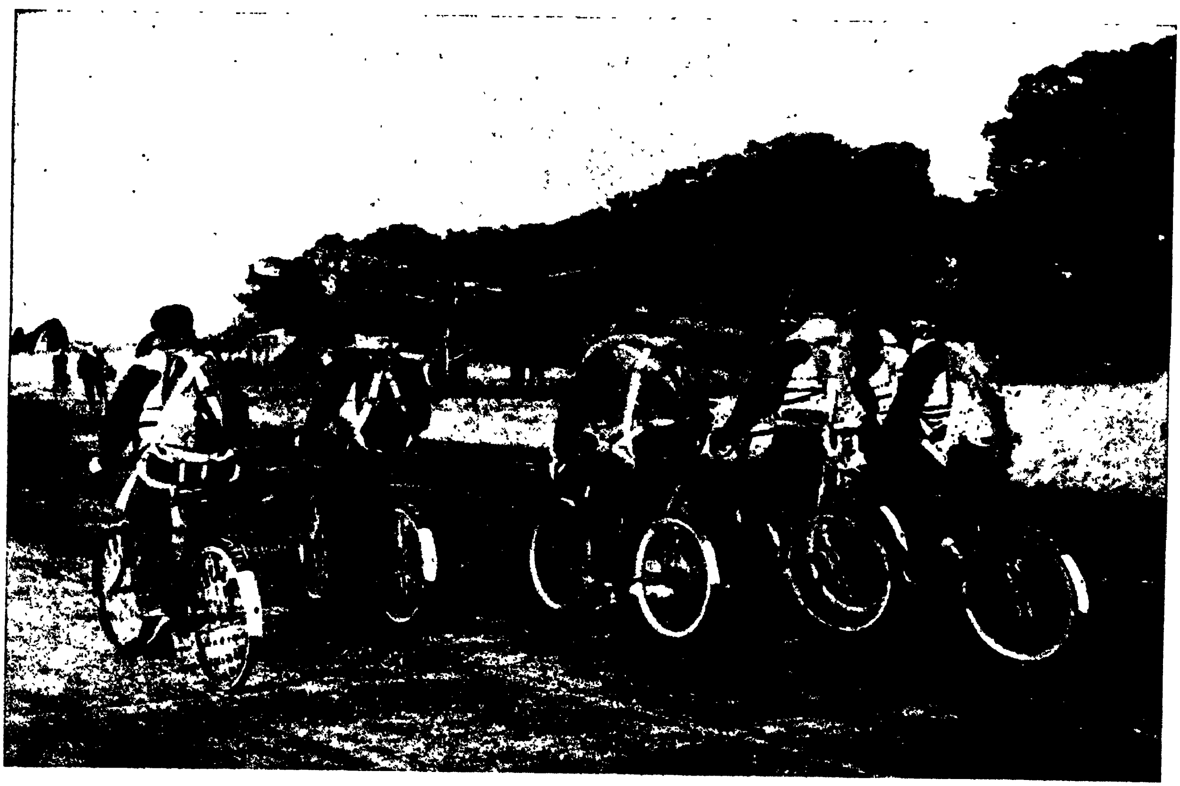
ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ পাডুয়া নগরের সেণ্ট-এণ্টনীর গীর্জ্জা



ইটালীর প্রসিদ্ধ ভেরোনা নগর। প্রাচীন ক্রীড়াগারের দৃশ্য



রোড্‌স্‌ নগরের দৃশ্য



'ল্যাঙ্কাষ্টার' ব্রিটেনের সর্ব্বাপেক্ষা ভারী বোমাবর্ষী বিমানের মধ্যে অন্যতম। বিমান-চালকগণ তৈল বাঁচাইবার জন্য সাইকেলে এই বিমান অভিমুখে যাইতেছে

ভুলো মন। ওর বিয়েই হয় নি তার নেমতন্ন খেলে—সে হচ্ছে নরেশের বিয়ে।

—ও হো হো, তাই হবে। তাই হবে—

ভবেশ সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে সেটা বিয়ে নয়, তার মার শ্রাদ্ধ।

জুনিয়র কক্ষ হইতে আর একটা হাসির হল্লা শোনা গেল। রেবতীবাবু ও নরেনবাবু আরও কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে পড়িয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন শরৎবাবু বাহিরে যাইতেছেন। রেবতীবাবু ডাকিলেন—শরৎ, ওহে শরৎ, শোনো। বিয়ে করলে তা নেমতন্ন করলে না কেন?

—বিয়ে করলাম? কবে?

—এই ত বোশেখে, বাবা এসব খবর কি চাপা থাকে! রেবতীবাবু হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নরেনবাবুও। তাঁহাদের বাঁধানো দাঁতগুলি চিকমিক করিয়া উঠিল।

—না, না না, আমার ছেলে ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ে ভন্টু, তাকে চেনেন ত!

—ও তাই ত। তবে কার বিয়ে?

শরৎবাবু উভয়ের স্বভাব জানিতেন তাই, অনাবশ্যক আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

রেবতীবাবু নরেনবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, কাগজের কি খবর?

—টিউনিসিয়াতে খুব লড়াই হচ্ছে। জার্ম্মানী হটে যাচ্ছে—

—কেন?

—আরে মলো কেন? যাচ্ছে, তার কেন? লড়াই ক'রে পারছে না—

—টিমোশেঙ্কোর মত জেনারেল হেরে যাচ্ছে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। ও বাজে খবর—

নরেনবাবু কহিলেন—টিমোশেঙ্কো টিউনিসে গেছে তোমার পিণ্ডি দিতে। ছাই পড়ো তুমি কাগজ—

রেবতীবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—টিউনিসটা ত সলমন দ্বীপপুঞ্জে?

—হ্যাঁ, ক'লকাতা লণ্ডনে গেছে। তুমি থামো—

—আহা, তাই জিজ্ঞেস্ করছি। যাক্‌গে যেখানেই হোক্, হারছে কে ব'ললে?

—জার্ম্মান।

—ওটা ঠিক হয় নি। ও দাবিটা কিসের?

—চার্চ্চিলের।

—না, দাবিটা ত ঠিক হয় নি।

—তোমার কুটুম্ব নাকি চার্চ্চিল যে তুমি তার চেহারা দেখেছ!

রেবতীবাবু কহিলেন—আহা হা, চটো কেন! একটা অনুমান ত করা যায়।

দুই জনের বচসাটা আপাততঃ থামিল। জনৈক পুরাতন মক্কেল সেলাম করিয়া কহিল—বাবু, ভাল আছেন?

রেবতীবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, তোমার বাড়ীর সব ভাল?

—হ্যাঁ, এই মামলাটায় যদি একটু দাঁড়াতেন?

—না না, সব ভুল হ'য়ে গেছে। মালিমোকদ্দমা আমি ছেড়ে দিলাম আর তুমি ছাড়তে পারলে না? ওটা ছাড়—

—তবুও যদি একবারটি দাঁড়ান।

—যাও, ওসব ব'লো না।

রেবতীবাবু ও নরেনবাবু প্রসিদ্ধ উকিল,—একদা সরকারী উকিল ছিলেন। সহকর্ম্মীরা সকলেই গিয়াছেন, তাঁহারা দুই জনেই রহিয়া গিয়াছেন। বার-লাইব্রেরিতে আসাটা একটা পুরাতন ব্যাধির মত দুরারোগ্য হইয়া রহিয়া গিয়াছে। যা-হয় কিছু পড়া এবং ভুলিয়া যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে তামাকু সেবন ও জুনিয়রগণের কুশল প্রশ্ন করা তাঁহাদের নিত্য কর্ম্ম। নরেনবাবুর আরশোলা-নিবারণী সংবাদপত্র ও তামাকু ঠিক থাকিলে আর কোন বালাই নাই।

প্রশান্তবাবু জুনিয়র উকিল। রবিবারে দুপুরে ঘুম হইতে উঠিয়া একটা মোকদ্দমার নথিপত্র দেখিতেছিলেন। তাঁহার বাসার অদূরেই বার-লাইব্রেরি—জানালা দিয়া দেখা যায়। অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে; কাজে মনোনিবেশ করা যায় না এমনি একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে রহিয়াছে। কে একজন বার-লাইব্রেরির সামনে দাঁড়াইয়া যেন দরজা খুলিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রশান্তবাবু দেখিলেন—রেবতীবাবু।

ছাতা মাথায় দিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রেবতীবাবু তাঁহারই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন—প্রশান্ত, রামা ব্যাটা আজ ঘর খুলে রাখে নি কেন?

—আজ যে রবিবার।

—ও তাই! দেখেছ বাবাজী, পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস, রবিবারে না আসার কথা কি মনে থাকে। ওটা কি পড়ছ দেখি—

নথিটাকে হাতে করিয়া কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেওয়ালে টাঙানো একখানা ছবির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, ওটা কার ছবি?

—আমার মায়ের।

—না, ঠিক হয় নি। মুখখানা ত অমনি নয়।

—আমার মাকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, তোমার মা আমার স্ত্রীর কাছে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন, তাঁর ভ্রূটা ছিল সুন্দর। এ হয় নি—

—ওটা ত বুড়ো কালের ফটো, আপনি যখন দেখেছেন তখন—

—তোমার বয়স বছর দুই হবে—তা হোক ওটা ঠিক হয় নি।

প্রশান্ত কৃতজ্ঞতার প্রভাবে প্রত্যুত্তর করিল না। এক দিন এই ভুলো মানুষটির সামান্য করুণায়ই সে উকিল হিসাবে পরিচিত হয়, এবং স্বল্প সাহায্যেই উন্নতি করে। অমন প্রতাপশালী এই

উকিলের একটু কৃপা অনেকেই সাগ্রহে প্রার্থনা করিতেন। রেবতী-বাবু কহিলেন—ওহে প্রশান্ত, এই কণ্ট্রোল চিনি কথাটার মানে কি হে?

প্রশান্ত বুঝাইয়া দিল। রেবতীবাবু সেদিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—ওই যে বইটা, ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এ্যাক্ট নাকি হে? দাও ত—

বইখানা নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন—এ আইনটা ঠিক হয় নি। হ্যাঁ, প্রশান্ত তোমার ছেলেপুলে কি?

—দুই ছেলে, এক মেয়ে। প্রশান্ত হাসিয়া উঠিল।

—রেবতীবাবু কহিলেন—হাসলে যে।

—এমনি, রোজই জিজ্ঞাসা করেন কি না?

—ও হো বাবাজী, ওটা যদি মনেই রাখতে পারবো তাহলে কি রবিবারে কাছারিতে আসি? বুড়ো হওয়ার যে-কটা দোষ তার মধ্যে ওটা একটা।

প্রশান্ত আইন-সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন করিলে রেবতীবাবু ক্ষণিক চিন্তা করিয়া একখানি পুস্তকের নাম করিলেন—ওটায় তুমি রুলিং পাবে, কাল দেখো—

প্রশান্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—যতই ভুল হোক আইনের কথাটা এখনও মনে আছে।

সেদিন ছিল শনিবার, কোর্টে বিশেষ কোন কাজ ছিল না। একটু একটু বৃষ্টি হইতেছে, জুনিয়র উকিলগণ তাহাদের ঘরে বসিয়া নানারূপ আলাপে ব্যস্ত। রেবতীবাবুকে লইয়া একটু রহস্য করিবার লোভ যেন সকলকে আজ পাইয়া বসিয়াছে। কে একজন চীৎকার করিয়া নরেনবাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল—ওরে রামা, নরেনবাবু তামাক চাইলেন শুনতে পাস্ না?

নরেনবাবু সহাস্যে রেবতীবাবুকে কহিলেন—ছাখো ছাখো, ওরা কি ব্যস্ত আমাদের জন্যে। আর তুমি কেবল বল, আজ-কালকার ছেলেরা—

ভবেশ ইচ্ছা করিয়াই রেবতীবাবুর সামনে দিয়া একটু ধীরে ধীরে যাইতেছিল। রেবতীবাবু কহিলেন—ওহে ভবেশ, বাড়ীর সব ভাল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে—

—তোমার স্ত্রীর অসুখ? একটু ভাল চিকিৎসক ছাখাও—

—কিন্তু ভাল চিকিৎসক পাই কোথা বলুন—শহরে ত কেউ নেই—

—যা বলেছ ভবেশ। আমার বাতটাই কেউ কমাতে পারলে না—

নরেনবাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন—ভবেশ? ও তুমি ত বিয়েই কর নি—

—বলেন কি? কালও ত সে আপনার বাড়ীতে বেড়াতে গেছে। আপনার পুত্রবধূ যে তার বিশেষ বন্ধু—

নরেনবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—সেদিন বললে যে বিয়ে কর নি।

—আজ্ঞে সে আমি নয়। নরেশের বিয়ে হয় নি, ওই হোঁৎকাটার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় না—

রেবতীবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন—আরে পুরুষ-ছেলের আবার রূপ কি? নরেশের চেহারা ত মন্দ নয়—

—মন্দ নয়, বলেন কি?

নরেনবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—তোমার একটা আইডিয়াই নেই রেবতী। নরেশের চেহারা ভাল?

রেবতীবাবু ভীতভাবে কহিলেন, কি মুশকিল! ভাল বলেছি নাকি? বললুম মন্দ নয়—

—মন্দ নয় মানে ত ভালই—

দুই বৃদ্ধে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। অকস্মাৎ তাঁহারা চাহিয়া দেখেন ভবেশ অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। জুনিয়রদিগের ঘর হইতে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি আসিল।

রেবতীবাবু আশেপাশে চাহিয়া কহিলেন—নরেন, ওরা ঠাট্টা করে না ত?

—না না, ওদের বাপের বয়সী, তা কি হয়?

শান্তি যাইতেছিল। রেবতীবাবু কহিলেন— কিহে শান্তি, ইনজাংশনের সে মামলায় জিতেছ তা হ'লে?

—আজ্ঞে সে ত আমার নয়, সে মামলায় জিতেছে ত অমল। আমি সে মামলায় দাঁড়াই নি—

—ও—

অমল আসিয়া দাঁড়াইল প্রশ্নের অপেক্ষায়। রেবতীবাবু বলিলেন—বেশ অমল, বেশ মামলাটা খুব জিতেছ—

অমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—তার মানে, আপনারা বাপের বয়সী, আপনাদের কি ঠাট্টা করা উচিত?

—ঠাট্টা, জিতেছ তাও বলব না।

—কেন? মামলায় আপনি হারেন নি কোন দিন? তার জন্যে এত ঠাট্টা কেন? মামলায় হারজিৎ আছেই—

—আহা-হা, চটো কেন? হেরেছ তা হ'লে তাই বল না—

—আমার মামলা, আমি হারি জিতি আপনার তার আলোচনায় দরকার কি?

রেবতীবাবু বিমূঢ়ের মত একটু তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন—কি বল নরেন? আমার দরকার নেই—

—নেই ত। হারজিৎ মামলায় ত আছেই—

রেবতীবাবু পড়িতে মনোনিবেশ করিলেন। একটু পরে কহিলেন—নরেন, ওরা হাসছে যে! রহস্য করছে না ত?

নরেনবাবু বলিলেন—তোমার কোন বুদ্ধিই নেই। ছেলেমানুষ হাসবে না—

—ঠাট্টা করে নি তা হ'লে।

—আরে বাপু ওদের ত কাজকর্ম্ম আছে? তোমাকে ঠাট্টা করবে কেন?

রেবতীবাবু খুশী হইয়া কহিলেন—তাই হবে। অমলের বাবা যে আমারই জুনিয়র ছিল অনেক দিন।

ছারপোকা-নিবারণী সংবাদপত্রে বসিয়া সেদিনও নরেনবাবু কাগজ পড়িতেছিলেন। রেবতীবাবু সামনে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছেন। অন্য টেবিলে বসিয়া শান্তিবাবু কয়েকখানা বই লইয়া ব্যস্তভাবে কি যেন খুঁজিতেছেন। রেবতীবাবু হাতের বইখানা নামাইয়া রাখিয়া শান্তিকে কটাক্ষে এক বার দেখিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন—ওহে শান্তি, দেখি ওটা কি বই।

শান্তিবাবু একখানা বই দিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন এমনি সময়ে রেবতীবাবু আবার বলিলেন, ওটা কি বই দেখি।

—ওইখানাই আপাততঃ পড়ুন।

রেবতীবাবু অবুঝ শিশুর মত আবার কহিলেন—দাও না, দাও একটু দেখি—

শান্তিবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—আপনার জন্যে কি কিছু পড়ার যো নেই। যা পড়ব তাই আপনার দরকার—কি জ্বালা!

রেবতীবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন—বিরক্ত হ'লে?

—হ্যাঁ, বিরক্ত করলে বিরক্ত হব না?

—আমরা এলে বিরক্ত হও?

শান্তিবাবুর ধৈর্য্য শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছিল, তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ, কেন আসেন? কাজকর্ম্ম যখন নেই তখন বাড়ী ব'সে হরিনাম করলেও ত পারেন! পরকালের কাজ হয়—

—কেন আসি?

—হ্যাঁ কেন আসেন?

রেবতীবাবু কেমন যেন একটু থতমত খাইয়া অত্যন্ত করুণ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, তা কি তোমরা বোঝ? জীবনের পঞ্চাশটি বছর এই ঘরে কেটেছে, নিত্য আসা-যাওয়া—আজ কি না এসে থাক্‌তে পারি? তাই আসি। না এসে যে পারি না নরেন—না?

নরেনবাবু কোন জবাব দিলেন না। জবাব দিলেন শান্তিবাবু, আসেন ভাল কথা, কিন্তু বিরক্ত করেন কেন? আমাদের কাজ-কর্ম্ম ত আছে—যে বই হাতে করব সেইটেই আপনার দরকার।

—তোমরা বিরক্ত হ'লে আর আসব না। কি বল নরেন?

—অনুগ্রহ ক'রে যদি ওই কাজটা করেন তবে অনেকেই বিশেষ উপকৃত হবে। এ উপকারটুকু আমরা আশা করতে পারি।

রেবতীবাবু ক্ষণিক নির্ব্বাক ভাবে শান্তির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শুষ্ক কোটরগত চোখ দুইটি নিষ্প্রভ হইয়া ভিজিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে জুতা পায়ে দিয়া ছাতাটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আর্দ্রকণ্ঠে অনুযোগের সুরে কহিলেন—আমরা আর আসব না, কিন্তু না এসে যে পারি না তাই। মনে রেখো শান্তি, এক দিন আমাদের কাছে তোমাদের কত জন এসেছিল উমেদারী ক'রতে—

—সে দিন ত নেই, তার জন্যে আর অনুশোচনা ক'রে লাভ নেই।

জুনিয়র দুই-এক জন কহিলেন—থামো ভাই। কেন খামকা উত্তেজিত হচ্ছ?

রেবতীবাবু কহিলেন—কিন্তু শান্তি, তুমি ছেলের বয়সী, একটু সম্মান করাই তোমাদের মহত্ব।

—নিজের ছেলেই আজকাল সম্মান করে না, তা পরের ছেলের কাছে তা প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনামাত্র!

রেবতীবাবু একটু উষ্মার সহিত কহিলেন—থাম, উপদেশ আর দিও না।

শান্তিবাবু অধিকতর উত্তেজিত হইয়া রেবতীবাবুর দুর্ব্বলতম স্থানে আঘাত করিলেন,—কেন থাম্‌ব? আমরা ত আর উমেদার নই—আপনার ছেলে ত ডেপুটি হয়েছে, আপনাকে সম্মান করে? টাকা পাঠায়—

—পাঠায় বইকি?

—তা হ'লে আর কণ্ট্রোলের চাল কিনবার জন্যে লাইনে গিয়ে দাঁড়াতেন না! যার ছেলে সম্মান করে না, তাকে আমরা যদি না করি, তবে কি খুব বড় অসম্মান করা হয়?

একটা তপ্ত লৌহশলাকা যেন অকস্মাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের মাঝে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পোড়াইয়া দিতেছে এমনি দুর্ব্বার বেদনায় বজ্রাহতের মত রেবতীবাবু ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পরে দুই চক্ষু হইতে উৎসারিত অশ্রুকে প্রবাহিত করিয়া দিয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে কহিলেন—সে করে না বলে কি তোমরাও ক'রবে না বাবা? এই কি তোমাদের শিক্ষা—

তিনি আর কহিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে রাস্তায় নামিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। নরেন-বাবু হাঁকিয়া উঠিলেন—রেবতী দাঁড়াও, দাঁড়াও আমিও যাব—

নরেনবাবু দ্রুত রেবতীবাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—চল রেবতী যাই—

জুনিয়র সকলেই শান্তিবাবুকে একবাক্যে ছি ছি করিতে লাগিল। শান্তিবাবু কহিলেন—সহ্যের একটা সীমা আছে। কতক্ষণ পাগলামি সহ্য করা যায়!

—তুমি ত ঐ ঘরে বসতে পারতে, জানই ত এখানে পড়া যায় না। তোমার ক্ষমা চেয়ে ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা দরকার। কাল ওঁর বাসায় যাবে—

অনেক বাদানুবাদ হইল। অবশেষে স্থির হইল, রেবতীবাবু যদি কল্য নাই আসেন তবে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সকলে ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন।

পরদিন যথাসময়ে নরেনবাবু আসিয়া হাঁকিলেন—ওরে রামা, খবরের কাগজ দে। তামাক কই? বাবা, একটু তামাক দিও, কেবলই গুলে আগুন দাও—

নরেনবাবু যথাস্থানে ঠেস দিয়া বিগত দিনের সংবাদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারও সন্দেহ ছিল রেবতীবাবু হয়ত আর

আসিবেন না, কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া রেবতীবাবু সেদিনও আসিয়া তাঁহার স্থানটি দখল করিয়া বসিলেন।

নরেনবাবু কহিলেন—তুমি আবার এসেছ রেবতী? কাল যে তোমাকে অপমান ক'রলে ওরা, আর আসবে না বলে গেলে—

—আমাকে অপমান ক'রেছে। তুমি ক্ষেপেছ নাকি নরেন! ওরা কি তাই পারে,—হয়ত রহস্য করেছে, তুমি ভেবেছ তাই। বুদ্ধিটা তোমার একটু মোটাই রয়ে গেল—

নরেনবাবু কহিলেন—ভুলে বসে আছ? ব্যস—

শান্তিবাবু রেবতীবাবুর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—কাল আমি আপনাকে যে অসম্মানকর কথা বলেছি তার জন্যে সত্যই দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করুন—

—আমাকে অসম্মান ক'রেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রেবতীবাবু চিন্তা করিয়া কহিলেন—কই না। মনে ত পড়ে না—

শান্তিবাবু ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন—না পড়ুক, ক্ষমা করেছেন বলুন। অনুশোচনায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল, এমনি লোককে কি অসম্মান করা যায়!

রেবতীবাবু কহিলেন—আরে খামকা ক্ষমা করব কেন?

—না, করেছেন বলুন।

রেবতীবাবু শান্তিবাবুকে টানিয়া কাছে বসাইয়া কহিলেন—হ্যাঁ, বাবা করেছি। তাই বললেই যদি সুখী হও তবে এক-শ বার ক্ষমা করেছি।

রেবতীবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—মোট কথা, সম্মানই কর আর অসম্মানই কর—আমরা আসবই। কি বল নরেন?

রেবতীবাবু তখনও হাসিতেছিলেন। নরেনবাবু চাহিয়া দেখিলেন, রেবতীবাবুর কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ দুইটি অশ্রুর প্রলেপে চিক্ চিক্ করিতেছে। নরেনবাবু কহিলেন—আসবই তা, নইলে যাব কোথা?

আশার সমাধিক্ষণে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভরা তটিনীর ভাঙনের গান দূর হ'তে আসে কানে,
মরা নদীটির কিনারে আমরা, কবি!
হেথায় সে গান সুরু হবে কবে কোন্ যুগ অবসানে?
দুখের বাদলে কখন উদিবে রবি!
বিহানের বুকে ফুটে-ওঠা ফুল সন্ধ্যা-বিতানে ঝরে,
জীবিকার পথে সামরিক কোলাহল।
ভীরু ছায়া কাঁপে যাতনা-কাতর দিশাহারা প্রান্তরে,
সময়ের রীতি মন্থর বিহ্বল।
বিব্রত মন বিক্ষত হয়ে উদাসীর মত চায়,
প্রেতে-পাওয়া সব বিস্মৃত কথা দেখাতে এসেছে ভয়।
আয়ু-বিহঙ্গ ডানা ভেঙে পড়ে অজানা আশঙ্কায়,
ব্যতীপাতযোগে দুর্জ্জয় হ'ল যুগের বিপর্য্যয়।
মৃত আশাটিরে পাষাণের তলে সমাহিত করো এবে
ঝরা-কুসুমের ব্যথার গুচ্ছ রাখি।
তূর্য্য-নিনাদ শোনা যায় দূরে,—কেন ওঠ তুমি কেঁপে!
দাস-জীবনের লাঞ্ছনা ভোগ এখনো অনেক বাকি।

নিবেদন

শ্রীকমলরাণী মিত্র

ফুল হয়ে আমি মুখপানে তব চাহিয়া রব',
গান হয়ে তব পূজায় স্তবের মন্ত্র হব'।
তারার প্রদীপে জ্বলিয়া রহিব সন্ধ্যারতি,
শিশির-ঝরায় মিনতি ঝরিব অশ্রুমতী,
চাঁদের আলোর ভাষায় গোপন-কথাটি কব!!

মোর প্রেম মোর কামনার মাঝে মিশায়ে আছে
আলোকের মাঝে জ্যোতির পুণ্য দীপ্তি সম;
ফুলের গন্ধ ফুলহারা হয়ে কত বা বাঁচে?
ধরার ধূলায় রচিত সোনার স্বর্গ মম॥
ভালবাসা দিয়ে তাই বাঁধি ঘর,
তাই কাছে চাই, করি নির্ভর;
দেহ-প্রাণ-মন করি নিবেদন শরণে তব!!

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে এই বৎসরের জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মিত্রশক্তির আপেক্ষিক যুদ্ধক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব লাভ করিবে। অর্থাৎ এই সময়ে অক্ষশক্তি ও মিত্রপক্ষের শক্তির মধ্যে প্রভেদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। বর্ত্তমান মাসে ইহার পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। রুশ রণক্ষেত্রে, ইটালীতে এবং সম্প্রতি কর্সিকায় অক্ষশক্তি এখন প্রবলভাবে আক্রান্ত এবং অন্য দিকেও তাহার আক্রান্ত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কোন রণস্থলেই এখন অক্ষশক্তি বিপক্ষের আক্রমণের গতি প্রতিরোধ করিয়া স্থায়ু ভাব স্থাপনা করিতে পারে নাই। সুদূর পূর্ব্বের সলোমন দ্বীপমালায় এবং নিউগিনিতেও জাপান জেনারেল ম্যাকার্থারের সেনাদলকে ঠেকাইতে পারিতেছে না, যদিও ঐ সকল অঞ্চলের যুদ্ধ এখনও খণ্ডযুদ্ধেরই প্রকৃতিতে দেখা যাইতেছে, ব্যাপক অভিযানের কোনও চিহ্ন এখনও প্রকাশিত হয় নাই। চীন দেশে জাপানের আক্রমণ-শক্তি পূর্ব্বেকার মত আর এখন প্রবলভাবে প্রযোজিত হইতেছে না ; ব্রহ্মসীমান্তে জাপানের কোনও সাড়াশব্দ নাই। সুতরাং এখন অক্ষশক্তির যুদ্ধ প্রকরণ রক্ষণ-চেষ্টাতেই ব্যপ্ত এবং মিত্রশক্তির অভিযান চালনার ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরীক্ষার আরম্ভ হইয়াছে।

বিগত বৎসর অক্ষশক্তির শেষ সুযোগের সময় ছিল। ঐ বৎসরের শেষের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষশক্তির ব্যাপক দিগ্বিজয়ের —অর্থাৎ মিত্রশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিয়া নিজস্ব সর্ত্তে সন্ধি স্থাপনের—সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। এখন অক্ষশক্তির চেষ্টা যেদিকে চলিতেছে তাহার লক্ষ্য মিত্রশক্তিকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আক্রমণ রোধ করিতে বাধ্য করায় অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা আনয়ন করা যাহাতে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ চালনা করা এরূপ ক্ষয় ও ব্যয় সাপেক্ষ হয় যাহাতে মিত্রপক্ষের চালকবর্গ ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য যে, মিত্রপক্ষের অধিকারীবর্গ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযান গঠন ও চালনায় বিশেষ ভুল না করিলে এরূপ অবস্থা-আসিতে পারে না। এরূপ অবস্থা আসিতে পারে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অতি প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণ হইলে, যাহার ফলে উভয় পক্ষই ক্লান্ত ও ক্ষীণবল হইয়া পড়ে। জার্ম্মানি এখন বিষম ক্ষতি-গ্রস্ত, ইটালী যুদ্ধের বাহিরেই চলিয়া গিয়াছে—যদিও তাহাকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে আনিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে—কেবলমাত্র জাপান এখনও শক্তি গঠন করিয়া চলিতেছে। জার্ম্মানির অন্য মিত্রদলের মধ্যে রুমানিয়াই এখনও কিছু ক্ষমতা রাখে, ফিনল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর অবস্থা প্রায় ইটালীরই মত। এদিকে সোভিয়েট যদিও পূর্ণ বিক্রমে অভিযান চালনা করিতেছে, কিন্তু তাহার ক্ষতির পরিমাণ এতই:অধিক যে তাহার পক্ষে এইরূপ আক্রমণ চালনা আর কত দিন সম্ভব হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। ক্ষতির পরিমাণ অধিক হওয়ার ফলে সোভিয়েটবাহিনী নিস্তেজ হইয়া পড়িলে রুশ রণক্ষেত্রে জার্ম্মানি পুনর্ব্বার নূতন সুযোগ পাইতে পারে যাহার ফল বিষম হইতে পারে। অক্ষশক্তির পূর্ণ দুই-তৃতীয়াংশ এখনও রুশ রণক্ষেত্রে রহিয়াছে, যাহা রুশের পক্ষে ক্রমে গুরুভারে পরিণত হইতে পারে। সুদূর পূর্ব্বে চীনের অবস্থার বিশেষ উন্নতি এখনও হয় নাই যাহার ফলে জাপান তাহার শক্তি গঠনের চেষ্টায় বিশেষ কোনও বাধা পাইতেছে না। চীন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে তাহার শৌর্য্য ও সহশক্তির গৌরব জগতে চির-স্থায়ী হইতে পারিবে, কিন্তু তাহার হৃত উদ্ধার হওয়া ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে এবং এরূপ পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় অধিক দিন থাকিতে হইলে তাহার ভিতরের অবস্থাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে।

শক্তি বৃদ্ধির কোটায় অক্ষশক্তির ইয়োরোপীয় অংশের কোন বিশেষ আশা-ভরসা নাই। যন্ত্রকৌশল বা নূতন যুদ্ধাস্ত্রের নির্ম্মাণে যাহা কিছু হইতে পারে তাহাতে ইটালীর পতনের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহারই পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ। তবে প্রতিরোধ যুদ্ধে আক্রমণকারীর অস্ত্র অপেক্ষা রক্ষণকারীর অস্ত্র উৎকৃষ্টতর হইলে আক্রমণ অতিশয় ক্ষতি ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। সেরূপ নূতন কোন অস্ত্র বা উৎকৃষ্টতর অস্ত্রের কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত অক্ষশক্তির নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। মিত্রশক্তির আকাশপথে আধিপত্য এখনও অক্ষুণ্ণই আছে এবং মিত্রশক্তির যুদ্ধকৌশলেও ঐ বিমানশক্তির সম্যক্ প্রয়োগের উপরেই সবকিছুই নির্ভর করিতেছে। মিশরের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি মিত্রপক্ষের জয়ের হিসাবে যাহা কিছু আরব্ধ হইয়াছে, সে সকলেরই মূলে মিত্রপক্ষের বিমান-সেনার আকাশ-পথে প্রবল এবং অক্ষুণ্ণ

আধিপত্যই আছে। আমেরিকার যুদ্ধে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আকাশ যুদ্ধের অস্ত্রে মিত্রপক্ষের প্রাধান্য লাভ ঘটে এবং বর্ত্তমানে ইটালীর পতন এবং জার্ম্মানির ক্লিষ্ট-ভাবের মূলে এই আকাশযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভই রহিয়াছে। সুদূর পূর্ব্বে জাপানের প্রতিরোধ-চেষ্টারও প্রধান অন্তরায় এই আকাশ-শক্তি, যাহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষ এখন জলে, স্থলে এবং আকাশে বিপক্ষের চলাচল ও কার্য্যক্রমে প্রতিপদে প্রবল বাধা দিতে সক্ষম। বস্তুতঃ অক্ষশক্তির সমস্ত প্রতিরোধ-চেষ্টা এখন নির্ভর করিতেছে এই আকাশ-যুদ্ধের অস্ত্রের উন্নতির উপর। যদি সেখানে অক্ষশক্তি অগ্রসর হইতে পারে তবেই তাহারা আত্মরক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহাতে যুদ্ধের সময় বিস্তৃতি ঘটিতে পারে, নহিলে সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ করা মিত্রপক্ষের নিকট দুরূহ না হওয়ারই কথা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গতি এবং যন্ত্রকৌশল অশেষ, সুতরাং অবহেলা ভিন্ন অন্য কোনও কারণে বর্ত্তমানে প্রাধান্য হারাইবার সম্ভাবনাও খুবই কম।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে যুদ্ধাস্ত্রের ঔৎকর্ষে অক্ষশক্তি সমকক্ষতাও লাভ করে—যাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে—তাহা হইলে জাপানের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, জার্ম্মানি বা ইয়োরোপের অক্ষশক্তির তাহা নাই বলিলেই চলে। জাপানের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসিয়ায় অন্য অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যাহার ফলে এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও জটিলতর হইতে পারে, কেননা এসিয়ায় যুদ্ধচালনায় মিত্র-পক্ষের অনুকূল উপাদান খুবই কম, প্রতিকূল অবস্থাই সর্ব্বত্র আছে। এবং জাপান আকাশ পথে এবং যুদ্ধশকট হিসাবে মিত্রপক্ষের সহিত সমতালাভ করিতে পারিলেই এই প্রতিকূল ব্যাপারগুলি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিত্রপক্ষের সম্মুখে প্রধানতম সমস্যা এখন জাপানের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা লোপ করা, অর্থাৎ তাহা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই জাপানের শক্তির আকরগুলিকে তাহার হস্তচ্যুত করা। এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট কালক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং ইহার পর প্রতিদিনই সমস্যা জটিল হইতে থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে ইয়োরোপের অবস্থা বিপজ্জনক ছিল, সুতরাং এদিকে কিছু করা মিত্র-পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—বিশেষতঃ ইটালীর পতনের পর—সুতরাং হয়ত এসিয়ায় অভিযান গঠন অতটা দুঃসাধ্য আর নাই। অবশ্য এরূপ বলিবার অর্থ ইহা নহে যে ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হইতে চলিয়াছে। অবস্থা মোটেই সেরূপ নহে। যুদ্ধ ইটালীতে যেভাবে চলিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জার্ম্মানি এখনও প্রবল যুদ্ধশক্তি রাখে এবং যে ভাবে ইটালীতে ধ্বংসোদ্ধারের এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যেই গঠিত হয় তাহা হইতে বুঝা যায় যে জার্ম্মানির উচ্চতম অধিকারীবর্গ এখনও যথেষ্ট সজাগ ও সক্ষম অবস্থায় থাকিয়া মিত্রপক্ষকে লক্ষভ্রষ্ট করিবার আশা রাখে। [illegible]াও অসম্ভব নহে যে এই বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দারুণ আঘাত যদি জার্ম্মানি এই শীতের শেষ পর্য্যন্ত কাটাইতে পারে তবে আগামী বৎসর তাহার প্রতিরোধশক্তি দৃঢ়তর হইতেও পারে কেননা তত দিনে তাহার অস্ত্রশস্ত্র উন্নততর এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও সুগঠিত হইতে পারে। ইহাও সত্য যে জার্ম্মানির যুদ্ধশক্তি এবং অস্ত্রগঠন-ব্যবস্থা[illegible] যে প্রচণ্ড আঘাত চলিতেছে তাহা চরমে উঠিতে পারে আগামী ২½ মাসের মধ্যে এবং সে সময় যদি তাহাতে ভাঙ্গন ধরে তবে তাহার মেরামত করা জার্ম্মানির সাধ্যের অতীত হইতে পারে। যাহার ফলে জার্ম্মানির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইটালীর মত বিকারগ্রস্ত হইলে তাহার দ্রুত পতন অনিবার্য্য।

সুতরাং মিত্রপক্ষের সমগ্রশক্তি ইয়োরোপে প্রয়োগ করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেওয়া যায় কেন না সাধারণ বিচারে মনে হয় অক্ষশক্তির প্রবলতম অংশ ধূলিসাৎ হইলে অবশিষ্টের উচ্ছেদ সহজেই হইবে। কিন্তু তাহা কি একেবারে নিঃসন্দেহ সত্য? জার্ম্মানির ভিতরে ফাটল ধরিলেও তাহা পড়িতে পড়িতে বেশ কিছু সময় লাগিবে একথা মিত্রপক্ষের উচ্চতম অধিকারীবর্গও বলেন। ইতি-মধ্যে জাপান যদি নির্ব্বিবাদে অস্ত্রনির্ম্মাণ ও শক্তিগঠন করিয়া অতি প্রবল হইয়া উঠে তবে জার্ম্মানির পতনের পর, অতি প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া, আর এক প্রচণ্ড যুদ্ধক্ষম শত্রুকে পরাজিত করার ভার মিত্রপক্ষের সম্মুখে আসিবে। অন্যদিকে জার্ম্মানি যদি এ বৎসরের আক্রমণ কাটাইয়া লড়িবার শক্তি রাখে তবে জাপান প্রবল হইয়া উঠিলে মিত্রপক্ষের কার্য্যক্রম এরূপ জটিল হইয়া উঠিতে পারে, যাহার ফলে জগতের এই দুর্দ্দিন আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে।

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য্য

বর্ত্তমান দেশব্যাপী ঝঞ্ঝা-প্লাবন ও নিদারুণ অন্নসঙ্কটের দিনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বিশেষ শক্তি নিয়োগপূর্ব্বক আর্ত্ত-ত্রাণের চেষ্টা করিতেছে। সঙ্ঘ মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা ও ত্রিপুরা জেলায় পরিচালিত। ৭টি সেবাকেন্দ্র হইতে ২৩,৩৩১ জন দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে চাউল; কলিকাতা, বেলফুলিয়া (খুলনা), আশাশুনি (সুন্দরবন অঞ্চল), বাজিতপুর (ফরিদপুর) ও কুমিল্লার অন্নসত্র হইতে দৈনিক ৩৫০০ জন বুভুক্ষু নরনারীকে খিচুড়ী; পাঁচটি দাতব্য চিকিৎসালয় লইতে সপ্তাহে গড়ে ২৭১০ জন রোগীর চিকিৎসা এবং উক্ত সমুদয় কেন্দ্র হইতে সপ্তাহে গড়ে প্রায় ৪৩৫০ জন শিশুকে দুগ্ধ ও বার্লি বিতরণ করিতেছে। অর্থাৎ সর্ব্বসমেত প্রায় ৩৩৮৯১ জন নরনারী শিশু ও রোগী সঙ্ঘের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এতদ্ব্যতীত অল-ইণ্ডিয়া বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটির সহযোগিতায় বর্দ্ধমানের বন্যাপ্লাবিত আমাদপুর কেন্দ্র হইতে দুঃস্থগণের মধ্যে চিড়া ও গুড় বিতরণ করা হইতেছে।

উক্ত দায়িত্ব বহন এবং বিভিন্ন স্থানে আরও নূতন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ, খাদ্য-দ্রব্য, ঔষধ ও বস্ত্রের আবশ্যক। যিনি যাহা পারেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ, ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পরলোকে রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ প্রসিদ্ধ দেব-বংশে রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই স্বামী

বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসরণে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবাব্রত গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের অধুনাবিলুপ্ত 'ডন সোসাইটি'র সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি এই সোসাইটির শিক্ষাগুণে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের



রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব

পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইয়া ১৯০১ সাল হইতে কংগ্রেসের মধ্যে কর্ম্মী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। বিগত অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে তিনি একান্তভাবে দেশের কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের কাজে একাধিক বার তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি দেশ-মাতৃকার সেবা করিয়াছেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন।

পরলোকে প্রভাতচন্দ্র বসু

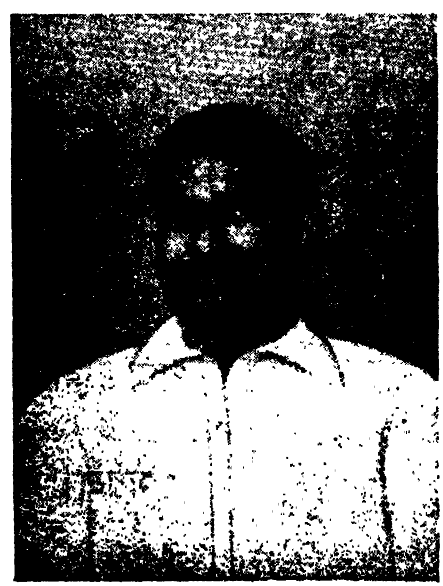
দেওয়ান বাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ৫ই আগষ্ট পাটনায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রেলওয়ে-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এই বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে রেটস এড্‌ভাইসরি কমিটির সেক্রেটরী ও মেম্বর ছিলেন। এই পদে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হন।



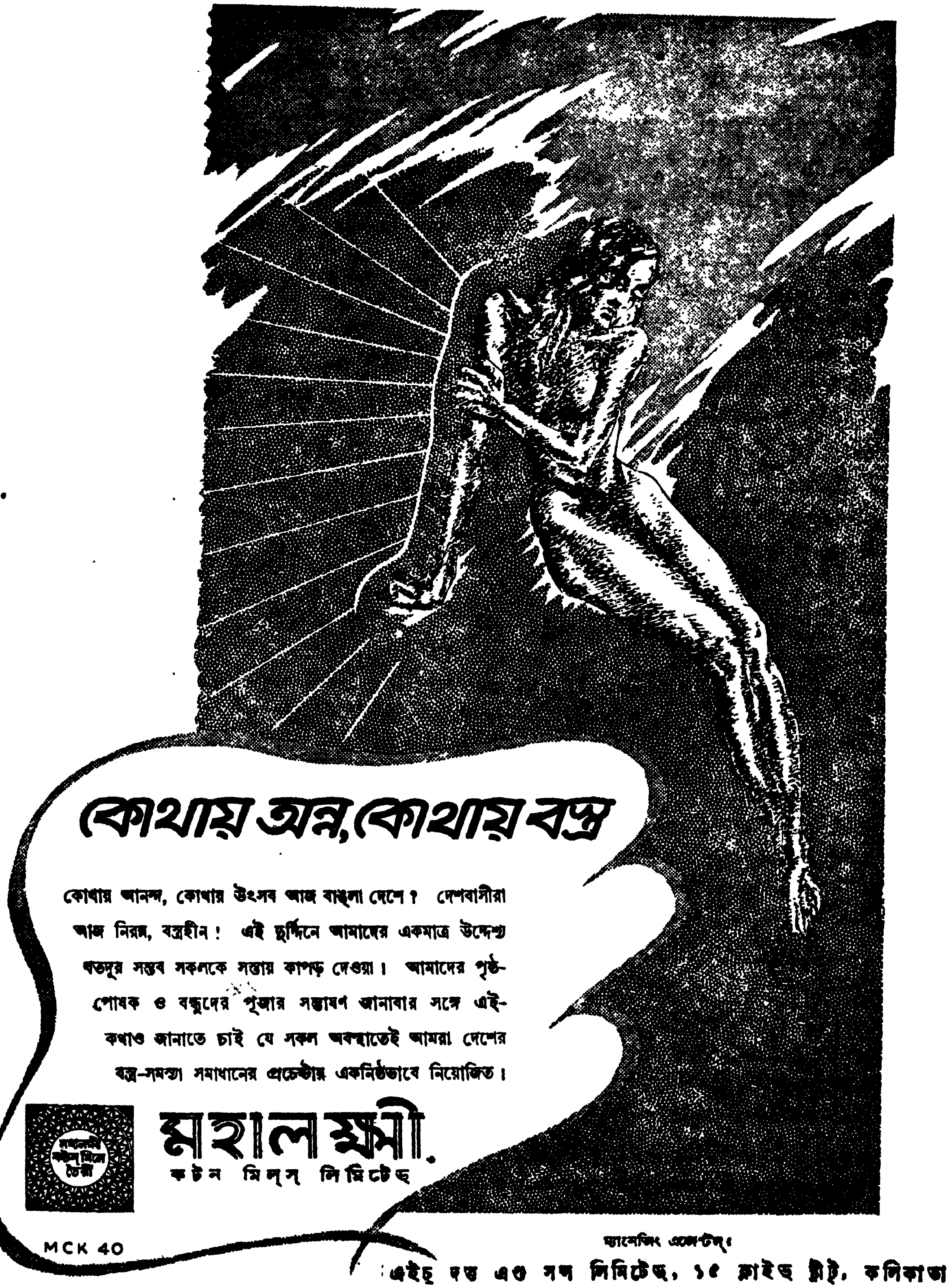
প্রভাতচন্দ্র বসু

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ মান্না (গোপালবাবু)

প্রসিদ্ধ গ্লোব নার্শারীর অন্যতম পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ মান্না মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে বিগত ২৯শে জুন পরলোক গমন করিয়াছেন। চাষের উন্নতি, এবং অধিকতর খাদ্যউৎপাদন প্রচেষ্টায় তাঁহার জীবন নিযুক্ত ছিল।



ধীরেন্দ্রনাথ মান্না


কোথায় অন্ন, কোথায় বস্ত্র
কোথায় আনন্দ, কোথায় উৎসব আজ বাঙ্‌লা দেশে? দেশবাসীরা আজ নিরন্ন, বস্ত্রহীন! এই দুর্দিনে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব সকলকে সস্তায় কাপড় দেওয়া। আমাদের পৃষ্ঠ-পোষক ও বন্ধুদের পূজার সম্ভাষণ জানাবার সঙ্গে এই-কথাও জানাতে চাই যে সকল অবস্থাতেই আমরা দেশের বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত।
মহালক্ষ্মী
কটন মিল্‌স্ লিমিটেড্
MCK 40
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ঃ
এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড্, ১৫ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

পুস্তক পরিচয়

ভাড়াটে বাড়ী—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। আরতি এজেন্সি, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন অষ্টাংশিত, ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

ষোলটি ছোট গল্পের সংগ্রহ। এই সুপরিচিত লেখকের অসাধারণতা এই যে, তিনি মোটেই অসাধারণ হবার চেষ্টা করেন না। তাঁর ভাষায় মুদ্রাদোষ নেই, তাঁর পাত্রপাত্রীরা কৃত্রিম ভাষায় কথা বলে না, বাক্-চাতুরীর তলোয়ার খেলাও দেখায় না। বালিগঞ্জ আর লেকভূমির কল্লোক, ক্যাসানোভায় প্রগতিচর্চা, অস্বাভাবিক ঘটনা সংস্থান এবং উৎকট সাইকলজি বর্জন ক'রে তিনি সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ রাগদ্বেষ সুকৃতি-দুষ্কৃতি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সেজন্য তাঁর লেখায় কিছুমাত্র বৈচিত্র্যের অভাব হয় নি। বইটির ভাষায় এবং ঘটনাচিত্রণে এমন একটি স্নিগ্ধ শান্ত রসধারা আছে যাতে পাঠকের মন তৃপ্ত হয়, উত্তেজিত না হয়েও নূতনের স্বাদ পায়। 'উৎসর্গ' 'আত্মহত্যা' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প বাংলা-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য।

শ্রীরাজশেখর বসু

মহাযুদ্ধে সোভিয়েট—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮৩। মূল্য ২।০।

বর্ত্তমান মহাসমরে জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে আজ দুই বৎসরেরও উপর। এই সময়ে উভয় পক্ষেই অহরহ শক্তি-পরীক্ষা হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া আধুনিক সর্ব্বোত্তম রণনীতি-কুশলী জার্ম্মানদের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া যেরূপভাবে বাধা দিতেছে তাহা সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই সময় সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক। গ্রন্থকার এই পুস্তকে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা সহজবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেই ইহার শক্তির উৎস নিহিত। রাশিয়ার সমরায়োজন ও বর্ত্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার কৃতিত্বের কথাও তিনি শেষ দুইটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সমররত সোভিয়েটের একটি মানচিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু ছবিও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ)—স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য তিন টাকা।

এই গ্রন্থে সমগ্র ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ভাগের ন্যায় ইহাতেও মূল সংস্কৃত, যথাসম্ভব আশয় বাক্য, অন্বয় মুখে বাঙ্গলা শব্দার্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, মূলের প্রাঞ্জল অনুবাদ এবং দুরূহ স্থলে শঙ্কর-ভাষ্যের মর্ম্মানুযায়ী টীকা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রথম ভাগের ন্যায় ইহাও পাঠকের সমাদর লাভ করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই ভাগে যে ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে, তাহা সম্পাদক মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ছান্দোগ্যের বহু স্থানেই বিবিধ উপাসনার উল্লেখ আছে, সুতরাং সম্পাদক-মহাশয় ভূমিকাতে সাধারণ ভাবে উপাসনার অর্থ, জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সহিত তার সম্বন্ধ, তার প্রকার-ভেদ এবং বিশেষভাবে এই উপনিষদে উক্ত উপাসনাসকলের মর্ম্ম প্রাঞ্জল ভাষায়, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ বর্ণনা করিয়াছেন; উপাসনা-অনুরাগী মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনায় নিষ্ঠাবান্ এবং ব্রহ্মোপাসনা প্রচারে আগ্রহান্বিত তাঁহারাও এই ভূমিকা পাঠ করিলে উপকৃত বোধ করিবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

ভারতবর্ষ ও মার্ক্সবাদ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩৩।২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১০৩+৬৫, মূল্য দুই টাকা।

লেখকের মতে "মার্ক্সবাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলিত না হ'লে সমাজের ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা" দূর হইতে পারে না। বইখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভারতীয় বিষয়, যথা "ভারতের জাতীয়তার জন্ম," "ভারতবর্ষ ও কার্লমার্ক্স," "ভারতের ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য", "লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য," "দেশের দুর্গতি ও কর্ত্তাদের কৈফিয়ত" এবং "ভারতে শ্রমিক আন্দোলন" আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে "রুশবিপ্লব ও লেনিন", "সোভিয়েট রাষ্ট্রে ধর্ম্মের স্থান", "সোভিয়েট রাষ্ট্র" প্রভৃতি ছয়টি প্রবন্ধ আছে। লেখক বাংলার মার্ক্সবাদী শক্তিশালী লেখকগণের মধ্যে অন্যতম, এজন্য তাঁহার লেখায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা, যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি সুন্দর ফুটিয়াছে। যাঁহারা মার্ক্সপন্থী নহেন তাঁহারাও এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন। মার্ক্সবাদ জাতি-সমূহের তথা পৃথিবীর জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বাধীনতা লাভের সময় নির্দ্দেশ করে যদিও এই স্বাধীনতা-

—শারদোৎসবের উপহার—

মার্গো সোপ

সম্পূর্ণ জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত নিমের সুগন্ধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ সাবান।

নিম টুথ পেষ্ট

দাঁতের পক্ষে একান্ত উপকারী নিম ও অন্যান্য উপকরণে প্রস্তুত অনুপম মাজন।

ক্যাষ্টরল

কেশ-প্রাণ "ভিটামিন-এফ" সংযুক্ত মনোমদ সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল।



তুহিনা বিউটি মিল্ক

এই সৌন্দর্য্যশ্রীর সর্ব্বাঙ্গে সুষমা আনে।

সিলট্রেস

কেশ মার্জ্জনার উৎকৃষ্ট সুগন্ধি শ্যাম্পু চুলের গোড়া নির্ম্মল ও নীরোগ করে দেয়।

লা:

অতুলনীয় লাইম ক্রীম গ্লিসারিণ

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

ভবিষ্যতের ধর্ম্মনিরপেক্ষ শ্রেণীহীন সমাজের জন্য। মার্ক্‌সবাদ মানুষের শক্তি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবেষ্টনের উপরে বেশী জোর দেয়, সুতরাং ইহার একমুখী যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি সর্ব্বগ্রাহ্য না হইলেও ইহার গুরুত্ব অস্বীকার্য্য নহে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আতঙ্ক—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ। কমলা পাবলিশিং হাউস্, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বার আনা।

আতঙ্ক-মিশ্রিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। পড়িতেও যথেষ্ট আতঙ্ক বোধ হয়। তবে কষ্টকল্পনা যা উদ্ভট দুর্ব্বল কাহিনী-সঞ্জাত সে আতঙ্ক নহে। সব কয়টি গল্পের ঘটনাতে অলৌকিক রহস্যের আভাস বা কার্য্য-কারণ পরম্পরায় সুবুনন কৌতূহলকে এমন প্রখর করিয়া রাখে যে, শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া নিস্তার নাই।

একটি গল্প এডগার আলান পো হইতে লওয়া; বাকি কয়টিও অনুবাদ বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্যের নহে।

মোট কথা, অবসর যাপনের সঙ্গী-হিসাবে গল্পগুলিকে নেহাৎ অবাঞ্ছিত বোধ হয় না। কৌতূহল জাগ্রত রাখে বলিয়া আতঙ্কের মধ্যেও আনন্দের রস প্রচুর।

জটিলতা—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৸০।

গল্প-সাহিত্যে শ্রীযুত ঘোষ নবাগত হইলেও, এই সংগ্রহের গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়—জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন। সব কয়টি গল্পের নিখুঁত গঠন বা সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গী সম্বন্ধে মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু স্থূল কার্য্যের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম হেতু সক্রিয়—তাহার সঠিক তথ্য জানাইতে তিনি প্রায়ই ভুল করেন নাই। জটিলতা, অভিমান প্রতিঘাত প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে তাঁহার লিপি-দক্ষতা পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্প বলিবার সহজ রীতিটি তাঁহার আয়ত্ত বলিয়াই পাঠককে অনায়াসে গল্পের শেষ প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। নূতন লেখকের পক্ষে এটি কম কৃতিত্বের কথা নহে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জুপিটার—শ্রীবাণী রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

লেখিকার কবিকল্পনা বিদেশী সাহিত্য ও পুরাণ হইতে অনায়াসে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। অবলম্বিত 'টেক্‌নিক'ও অনেক ক্ষেত্রে মূলতঃ বৈদেশিক। সেজন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠক ব্যতীত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতাগুলির পূর্ণ রসাস্বাদন করা সম্ভব হইবে না। যাঁহারা উপরোক্ত বাধা অতিক্রম করিতে পারিবেন, এ কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে তাঁহাদের ভাল লাগিবে। ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠতায় এবং বিষয়বস্তুর মৌলিকতায় কবিতাগুলি বাস্তবিকই উপভোগ্য।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি সুলিখিত ভূমিকা ও গ্রন্থশেষে সংযোজিত টীকা গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন, প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই বৃহৎ অভিধানখানির ৯৫তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "সুরুম্না" এবং শেষ পত্রাঙ্ক ৩০২৪।

ড.

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্যজীবনচরিত—স্বামী বেদানন্দ। ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। পৃ., ৩০+৪৯৬ মূল্য ৩৲ টাকা।

সাধুজীবন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই বাক্যের সার্থকতা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনে যে বিশেষ ভাবে সাধিত হইয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। স্বামী প্রণবানন্দ ভারতময় ত্যাগ এবং সেবাধর্মের অভয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা তথা ভারতে গৃহী ও ত্যাগী শিষ্য যেমন তাঁর অগণিত, তেমনই তীর্থের গ্লানিশোধনে এবং আর্তসেবায় তৎপ্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখাপ্রশাখাও অনেক। আলোচ্য গ্রন্থে তদীয় অন্যতম প্রিয় শিষ্য বেদানন্দজী স্তরে স্তরে বেশ সুখপাঠ্য ভাষায় এই বীর সন্ন্যাসীর জীবনযজ্ঞের পরিপূর্ণতা বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থটি শিষ্যের শ্রদ্ধার্ঘ্য ছাড়াও জ্ঞাতব্য বহু তথ্য এবং শিক্ষণীয় বহু সদুপদেশে পরিপুষ্ট।

কুলসপর্য্যামৃতম্—শ্রীভৈরবানন্দনাথ, 'কালিকাশ্রম', পোঃ বেলুড় মঠ, (হাবড়া)। ১১৬ পৃ. মূল্য ১৷০।

তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনার দীক্ষা ও সাধনক্রম যে পদ্ধতিতে কলিপাবন কৌলসিদ্ধকামগণের ভিতর প্রচলিত, পর্য্যায়ক্রমে সেই সুগুপ্ত সাধনরহস্য

।ও অনুবাদ সহ গ্রন্থে সন্নিবেশিত; এতদ্ভিন্ন সাধনার অঙ্গ হিসাবে একটি স্তবও গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। দীক্ষিত শক্তি-সাধকদের জন্য এই গ্রন্থ অতীব উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হ্যাভেলক এলিস্ ও যৌনবিজ্ঞান—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নবজীবন সংঘ, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

মনোবিদ্যা এবং সমাজতত্ত্বের দিক হইতে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ এবং তাহাদের যৌনজীবনের বিশেষত্ব এই পুস্তকের আলোচনার বিষয়। কামপ্রবৃত্তির স্বরূপ, নারীর এবং পুরুষের যৌনজীবনের পার্থক্য, জন্মশাসন, ব্রহ্মচর্য্য, বিবাহ, "আধুনিকাদের (কদর্থে নয়) মনের জীবনের বৈশিষ্ট্য", কাম এবং প্রেমের সম্পর্ক সম্বন্ধে গ্রন্থকার, শুধু এলিস্ নয় আরও কয়েকটি খ্যাতনামা পণ্ডিতের (যেমন, Ellen Key, Froud, Carpentar, Huxley, প্রভৃতির) মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া, ঐ সকল বিষয়ে নিজের চিন্তা-ধারার ইঙ্গিত দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অত্যুক্তি থাকা সত্ত্বেও (যেমন পৃষ্ঠা ২৪, ২৫), মোটের উপর কামসম্বন্ধীয় তথ্যগুলি যথাযথ ভাবেই বলা হইয়াছে। জন্মশাসনের যে উপায় গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা কম বলিয়াই মনে হয়, এবং হইলেও মনের স্বাস্থ্যের উপর তাহার ফল ভাল হইবে কি না তাহাও বিচার্য্য। আধুনিক কালে কলেজে, কর্মক্ষেত্রে, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর দেখাশোনা, এবং মেলা-মেশার অবসর আমাদের সমাজে যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের অবসানে আরও বাড়িবে, তাহাও ধরিয়া লওয়া যায়। সুতরাং প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধের পরিবর্ত্তন যে আবশ্যক তাহা গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন, তবে উচ্ছৃঙ্খলতা যাহাতে প্রশ্রয় না পায় সে বিষয়ে আধুনিক-দিগের (কদর্থে নয়) সতর্ক করিয়াছেন।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

তত্ত্ব-বিদ্যালয়ের বক্তৃতা—শ্রীমথুরানাথ নন্দী কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী, বি-এ, ১ নং ডাক্তার রাজেন্দ্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য।০ আনা মাত্র।

মার্কিন মনীষী এমার্সনের 'তত্ত্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা' কেম্ব্রিজ (মেসেচুসেট) তত্ত্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত প্রচারার্থী ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বক্তা আক্ষেপ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের ভাব ম্লান হইয়াছে এবং মানুষের আত্মা যে অনন্ত, এই ভাবটি কোন খ্রীষ্টধর্ম্ম-মন্দিরে মানব চিত্তে জাগ্রত করিয়া দেওয়া হয় না। ঈশ্বর-পূজার বিলোপই হইতেছে বর্ত্তমান যুগের দুর্গতির মূল কারণ এবং ইহার ফলে বিশ্বে দাবানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। ভগবানে বিশ্বাসের অভাবই ধর্ম্মসমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও মানব জীবনে অবনতি ঘটাইয়াছে। বক্তা নূতন ধর্ম্মশিক্ষকের প্রত্যাশা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি শিক্ষা দিবেন যে জগৎটা আত্মারই প্রতিবিম্ব এবং সর্ব্বশেষে তিনি নিজ জীবন দ্বারা দেখাইবেন যে যাহা কর্ত্তব্য ও করণীয় তাহা বিজ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও আনন্দেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। রেভারেণ্ড ডব্লিউ সি গেনেটের মতে বক্তৃতাটি অতীত শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং স্থায়ী একমাত্র ধর্ম্মোপদেশ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র-জীবনকথা— শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইণ্টার ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

রবীন্দ্রনাথের মত মহাপুরুষের জীবন-কথা সকলেরই জানা উচিত, বিশেষ করে, বাঙালীর। ছেলেমেয়েদের তিনি ছিলেন একান্ত আপন। শিশুমনের চিরনবীন কল্পনা ও ঔৎসুক্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর হৃদয়কে রেখেছিল সরস করে। তাই তারা সহজেই তাঁকে অন্তরে স্থান দিয়েছে। সকল খেয়ালের খেলায় তারা পেয়েছে তাঁকে সঙ্গীরূপে; ভয়ে নয়, স্নেহের টানে ছুটে গিয়েছে তাঁর কাছে। কাননবাবু সুন্দর গল্পের মত করে বালক-বালিকাদের জন্যে এই জীবনকথাখানি লিখেছেন। বহি-র্জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, কবির ভাবজীবনের পরিচয়ও যথাসম্ভব দিয়েছেন। আশা করি, গ্রন্থখানি ছেলেমেয়েদের মহলে সমাদর লাভ করবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের নবযুগ—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা।০+৪০৮, মূল্য ৩।০।

আলোচ্য প্রবন্ধ পুস্তকখানির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত দেখে লেখকের রচনার লোকপ্রিয়তা অনুমান করা যেতে পারে। এই বইয়ের ১ম ও ৫ম প্রবন্ধ ছাড়া অন্য প্রবন্ধগুলি ১ম সংস্করণে বর্তমান ছিল তবে সর্বথা বর্তমান আকারে ও প্রকারে নয়। উপস্থিত সংস্করণে কোনো কোনো প্রবন্ধের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সকল রচনায় গ্রন্থকার আধুনিক কালের কয়েক জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের লিখনভঙ্গী ও আদর্শ-আদির যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে রসজ্ঞসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিদ্বজ্জনোচিত বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি। প্রথম প্রবন্ধটি বাদ দিলে বইয়ে প্রায় সর্বত্র গ্রন্থকারের প্রকাশভঙ্গী সরল ও হৃদয়গ্রাহী। উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে ভাষার পারিপাট্য ও সমারোহ বক্তব্য বিষয়কে আড়ালে ফেলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, বিহারি-লাল, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার যে আংশিক আলোচনা লেখক করেছেন তা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তথা সাধারণ পাঠক উভয়েই যথেষ্ট উপকৃত হবেন। স্থানে স্থানে বহুপরিচিত মতবাদ বা তর্কযুক্তি উপস্থিত করলেও লেখকের লিপিকৌশলে সে সকল নীরসত্ব কাটিয়ে উঠেছে; এবং বিহারিলালের কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্পর্ক বিচারে গ্রন্থকার বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, এ বিষয়ে এমন নিপুণ আলোচনা ইতঃপূর্বে আর কেউ করেন নি। ছোটখাট ভুলত্রুটিগুলি উপেক্ষা করলে বইখানি বেশ আন্তরিক ভাবে প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

রামায়ণিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। এ মুখার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্স, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।০।

স্বল্পপরিসরের মধ্যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মূল চরিত্র ও ঘটনাগুলির সহিত বালক-বালিকাগণের পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে এই বইখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

হাবুল চন্দোর—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৷৵০।

হাবুল চন্দোর নামে এক পণ্ডিত-মূর্খ খেলাধুলায়, পড়াশুনায়, ক্রিয়াকর্ম্মে ও কর্ম্মজীবনে কিরূপ আহাম্মকির পরিচয় দিতেছে, তাহা পড়িয়া ছেলেরা হাসিবে, কিন্তু স্থানে স্থানে নিছক ভাঁড়ামি ও অর্ব্বাচীনতা না থাকিলেই ভাল হইত।

কুমড়োপটাস্—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রাপ্তিস্থান—৩২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৮, মূল্য ।০।

একটি কুমড়া-জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনী। চাষীর হাতে সযত্নে লালিতপালিত হইয়া অকালে এক ধনলোভী জমিদার কর্ত্তৃক হাটে পাহাড়ের মত গাদা হইয়াও জমিদার ও ব্যবসায়ীদের লোভের চক্রান্তে পড়িয়া অবশেষে কতক পচিয়া, কতক শৃগালের ভক্ষ্য হইয়া ক্ষুধার্ত্ত জন-গণের কোন কাজেই লাগিল না, তাহা লইয়া গ্রন্থকার কল্পনার রঙে রাঙাইয়া গল্প রচনা করিয়াছেন। সামান্য বিষয়বস্তুও বর্ণনার গুণে কিরূপ সরস ও মনোরম হইতে পারে, বইটিতে তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। প্রচ্ছদ-পটে পাহাড়-প্রমাণ কুমড়ার গাদার উপরে কুমড়াপটাসের ছবিটি উপভোগ্য।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

এ যুগের যুদ্ধ—শ্রীগোপাল হালদার। পুথিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৮৮ পৃষ্ঠা, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এ, মুখার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্স, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৩৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য চার টাকা।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যুদ্ধবিদ্যার আলোচনা আমাদের দেশে অল্প দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষ্মীলাভের আশায় দেবাসুরে মিলিয়া পৃথিবীব্যাপী যে জনসমুদ্র-মন্থন চলিতেছে তাহাতে অমৃতের সন্ধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে কি না জানি না, কিন্তু মন্থন-জর্জরিত অনন্তনাগের উত্তপ্ত বিষ-নিশ্বাসে আজ আকাশ-পৃথিবী পরিপূর্ণ। এই বিশ্বগ্রাসী বিষবাষ্প হইতে আমরাও নিস্তার পাই নাই, স্বভাবতই এই দিকে আমাদের উচ্চকিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

যুদ্ধকে জানিবার এবং জানাইবার এই প্রেরণার ফলেই আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানির সৃষ্টি। 'এ যুগের যুদ্ধে' শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার আরম্ভ করিয়াছেন একেবারে গোড়ার কথা হইতে। গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে যুদ্ধবিদ্যার মূলসূত্র-গুলির আলোচনা করিয়া গোপালবাবু প্রাচীন কালের গোষ্ঠী-যুদ্ধ হইতে বর্তমান কালের টোটেল-যুদ্ধ পর্যন্ত যুদ্ধের বিবর্তনের ধারা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নাৎসী-ফ্যাসিস্ত দেশগুলিতে টোটেল-যুদ্ধ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার সহিত সোভিয়েটের টোটেল-যুদ্ধের পার্থক্য তাঁহার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাষায়, "এই যুগের যুদ্ধ মাত্রই টোটেল। উহাতে সর্বাঙ্গীণ রণসজ্জা চাই। কিন্তু সোভিয়েটের মতবাদে যুদ্ধ হইয়াছে শুধু সর্বাঙ্গীণ নয়, সার্বজনীন—সর্বদেশের জনগণকে উহা স্বপক্ষে আনিতে চায়। এই হিসাবেই বলা চলে—নাৎসী টোটেল-

যুদ্ধ মানুষকেও যন্ত্রে পরিণত করিয়া চালায় যন্ত্রযুদ্ধ (mechanised war), আর সোভিয়েট যুদ্ধনীতি মানুষকে যন্ত্রে সজ্জিত করিয়া চালায় জনযুদ্ধ।"

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে গোপালবাবু বর্তমান যুদ্ধকে (ক) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, (খ) সার্বজনীন যুদ্ধ এবং (গ) পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধ এই তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করিয়া ইহার গতিধারার আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় ভাগে "ভারতবর্ষেও আমরা এই যুগের যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে পারি" কি করিয়া তাহার ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। গোপালবাবু একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন; কাজেই তাঁহার কাছে নির্বিকার ঐতিহাসিকের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাশা করা যায় না। তৎসত্ত্বেও এ যুগের যুদ্ধ বুঝিবার পক্ষে গ্রন্থখানি যে বিশেষ উপযোগী সে কথা মুক্ত-কণ্ঠেই স্বীকার করিতে হইবে। যুদ্ধবিদ্যা এবং যুদ্ধের বিবর্তন সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বোধ করি তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক রীতিতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিলেন, সেই দিক দিয়া গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। তবে বর্তমান যুদ্ধের গতিধারা সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। তিনি মোটামুটি ১৯৪২ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত আসিয়াছেন। তার পরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ক্রমোন্নতিতে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। তার বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন বর্তমান অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না। আশা করি, গোপালবাবু শীঘ্রই 'এ যুগের যুদ্ধে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া তাঁহার আলোচনা 'আপ-টু-ডেট' করিয়া লইবেন।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য যুদ্ধবিশারদ-গণের গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিয়াই বর্তমান গ্রন্থ বিরচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসও অবজ্ঞা বা উপেক্ষার যোগ্য নহে। রামায়ণ, মহাভারত, বিশেষ করিয়া মহাভারতের যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের কূট-নীতি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, প্রাক্-মুসলমান এবং মুসলমান আমলের হিন্দু, মুসলমান, রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির রণ-কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনার সময় আসিয়াছে। আমরা ভারতীয় সমর-বিদ্যার্থী এবং গবেষকবৃন্দের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতে চাই।

'এ যুগের যুদ্ধ' এবং 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' একখানি আর একখানির পরিপূরক বলা যাইতে পারে। অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠায় গোপালবাবু পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধের আলোচনা সমাপ্ত করিয়াছেন; সেখানে বিবেকানন্দবাবু সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা জাপ-অভিযানের দৈনন্দিন গতিধারার পর্যালোচনা করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া পরবর্তী মে মাসের মধ্যেই ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত দখল করিয়া লয়। এই ছয় মাসের অভিযান 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'তে সংকলিত হইয়াছে। "কোনো রাজনৈতিক মতবাদের সংস্কার বা বদ্ধমূল ধারণা লইয়া" তিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। 'যুগান্তর' পত্রিকায় ধারা-বাহিক ভাবে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি অল্পবিস্তর পরি-বর্তিত ও পরিমার্জিত করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বিবেকানন্দবাবুই প্রথম বাংলা ভাষায় যুদ্ধের ধারাবাহিক সম্পাদকীয় আলোচনার প্রবর্তন করিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া তাঁহার কৃতিত্ব এবং অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় আলোচনাকে গ্রন্থাকারে সংকলনের প্রয়াসও বোধ হয় বাংলা দেশে এই প্রথম। "সহজ, স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষার সহিত সাহিত্য-রস" মিশাইয়া তিনি জাপ-অভি-যানের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেমন তথ্য-বহুল তেমনি গবেষণাপূর্ণ। জাপ-অগ্রগতি ও সাফল্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি জাপ-রণনীতি ও রণকৌশল এবং জাপানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উন্নয়নের ইতিহাসও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পূর্ব-এশিয়ার এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ভৌগোলিক সংস্থানের নীরস আলোচনাও তাঁহার লেখনীমুখে সরসতা অর্জন করিয়াছে।

'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' পড়িয়া যুদ্ধবিদ্যায় বিবেকানন্দবাবুর পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির প্রশংসা সকলেই করিবেন। কিন্তু যেভাবে প্রবন্ধগুলি সংকলিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আয়ু চব্বিশ ঘণ্টাব, গ্রন্থের আকারে তাহাকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে হইলে অনেক স্থলেই রচনারীতির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে টীকা-ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণীও চলে। বক্তব্য স্পষ্ট করিবার জন্য পূর্বের পুনরুক্তিতেও পাঠকগণ আপত্তি করেন না, এমন কি অনেক সময় তাহা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু গ্রন্থ-রচনায় অতীতের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী অনাবশ্যক এবং অর্থহীন। বিবেকানন্দবাবু এই বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হন নাই বলিয়া গ্রন্থের স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ও অনাবশ্যক মন্তব্য রহিয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থ-সম্পাদনায় অধিকতর সতর্ক হইলে অনায়াসেই এই ত্রুটি সংশোধন করা চলিবে। গ্রন্থ-খানি অতিশয় উপাদেয় এবং মূল্যবান্ বলিয়াই এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিলাম।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

বেঁচে থাকার মালিক তারা নয়

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সত্য যেথায় বিদায় নিল রঙ্গীন হয়ে মিথ্যা দিল দেখা
পড়লো ভেঙে প্রেমের মহাবীণ,
লৌহলোকের ঝন্‌ঝনিতে অস্ত্র দিয়ে উঠলো বেজে ভেরী
হিংসা দিয়ে তিক্ত হ'ল দিন,
বিরাট মনের মুক্ত আকাশ লক্ষ হাজার সংস্কারেতে ঘেরি
বন্দী যারা করল খাঁচাতলে,
নিজের মহাসভ্যতা আর কৃষ্টিধনে বিস্মরিয়া যারা
পরের মেকী সভ্যতারে পূজলো দলে দলে,
সাহিত্য ও কাব্যে যেথায় ছদ্মবেশী চলছে পশুলীলা
নর ও নারীর মর্ম্ম নিয়ে নিত্য হানাহানি,
যাদের দেশের আকাশ জুড়ে উঠছে জ'মে পাপের কালো
পাহাড়
দুর্নীতি আর অত্যাচারের গ্লানি,
বাইরে নকল সভ্য সেজে তারাই যদি জন্মভূমির কাজে
জাতির লাগি মাগে পরিত্রাণ,
তারাই যদি বিশ্বসভায় অমর হয়ে থাকতে চাহে বেঁচে
তার চেয়ে আর নেইকো ফাঁকি নেইকো অপমান।
আত্মীয়েরি সঙ্গে যাদের নিত্যবিরোধ চলছে হানাহানি
জ্ঞাতির সাথে যুদ্ধ নিশিদিন,
পল্লিকারি কথার ভারে জীর্ণ হয়ে কর্ম্মপথে যারা
রথের চাকা করল গতিহীন,
মিথ্যা ফাঁকা তর্ক নিয়ে দাঙ্গা করি প্রতিবেশীর সাথে
রক্তস্রোতে বইল যেথা বান,
মানব-পশু দেহের দাহে যাদের ঘরের সতীর পুণ্যবেদী
কর্দ্দমেতে করছে নিতি স্নান,
লজ্জিত সেই বর্ব্বরতার হস্ত থেকে ঘরের সতীমাকে
রক্ষা করার শক্তি নাহি যার,
তাদের মত কাপুরুষের ভীরুর কভু বিশ্বমানব-সভায়,
বেঁচে থাকার নেইকো অধিকার।

নিজের দেশের রাষ্ট্রে যারা দাসত্বেরি গদীর তলে ব'সে
বুকের দিয়ে চেতন বলিদান
জন্মভূমির বাসিন্দাদের স্বার্থে সুখে আগুন জেলে দিয়ে
নিজের লাগি ভাবছে শুধু ত্রাণ,
তারাই সেরা শত্রু দেশের বেতনভোগী গোলাম সেজে যারা
বিপন্ন ঐ দেশের ভাইয়ে আঘাত করে নিতি,
আপন জাতির অন্ন কেড়ে বসন কেড়ে ভদ্র সেজে যারা
আত্মসুখে বাজিয়ে বীণা ছন্দে গাহে গীতি,
বিশ্বে তারা কক্ষণো নয় নিত্যদিনের বেঁচে থাকার মালিক
তাদের চেয়ে নেইকো পাপী—তাদের মহাপাপ,
মৃত্তিকা আর আকাশ ছেয়ে উঠছে কেঁপে ধাতার বেদীতলে
বক্ষে তারা সর্ব্বহারার বইবে অভিশাপ।

সেই পাপীদের আত্মসুখের অন্যায় এবং অত্যাচারের যারা
করতে নারে একটু প্রতিকার,
ঐক্যহারা—অধম তারাও বিশ্বে তারাই জীবন্মৃত জাতি
বেঁচে থাকার তাদের কভু নেইকো অধিকার।

আপন পাপে হিংসাপিছল পড়ল যারা মরণমহাখাদে
ভাবছে নাকো—আবার কিসে বাঁচি?
আট-শ ন-শ বছর ধরে মরণখাদে বসত ক'রে যারা
বলছে সদাই—আমরা খাসা আছি;
মুক্তি এবং আনন্দেরি শয্যা তাদের দাবা এবং তাসে
নিত্য তারা থাকবে পরাধীন,
তাঁদের বেঁচে থাকার কথা মাসিক এবং সংবাদেরি পাতে
কথায় রচা চলবে চিরদিন।

হিংসা দ্বেষে মগ্ন রহি চাপিয়ে দিয়ে মুক্তি ভগবানে
তর্কে যারা কর্ম্ম করে ক্ষয়,
হয়ত তারা এই জগতে সাবধানেতে থাকতে পারে বেঁচে
সত্যিকারের বেঁচে থাকার মালিক তারা নয়।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



অনশনে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কার্তিকের প্রবাসী পূজার পূর্বে প্রকাশিত হইবার পর ১৩ই আশ্বিন সন্ধ্যা প্রায় ৭টা ৪০ মিনিটের সময় প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যু একেবারে অপ্রত্যাশিত না হইলেও শেষ মুহূর্ত যে এত সন্নিকট তাহা বুঝা যায় নাই। শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বেও তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত স্বাভাবিকভাবেই কথা বলিতেছিলেন। প্রায় আট বৎসর যাবৎ তিনি ভুগিতেছিলেন। রোগের মূল কারণ শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে ধরা পড়ে নাই। রোগের বাহ্যিক লক্ষণ ছিল চর্মের উপর জালা ও চুলকানি। যতক্ষণ এই যন্ত্রণা থাকিত তিনি এক বিন্দু শান্তি পাইতেন না। গত ৫৫ বৎসর যাবৎ তিনি নিরামিষাশী ছিলেন এবং অত্যন্ত কঠোরতার সহিত সকল প্রকার আমিষ বর্জন করিতেন। খাদ্য সম্বন্ধে এত কড়াকড়ির ফলেই হয়ত রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার কমিয়া আসিয়াছিল। ১৯৪০-এর শেষের দিকে যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শে একজন প্রসিদ্ধ চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করা হয়। ইনি একজিমার চিকিৎসার ব্যবস্থা দেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন বুঝা গেল রোগের মূল চর্মে নহে, খাদ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত কড়াকড়ির ফলে সম্ভবতঃ তাঁহার দেহে কোন প্রকার ভাইটামিনের অভাব ঘটিয়াছিল এবং উহাতেই চর্মের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বহু প্রকারে চিকিৎসা করা হইল, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যত রকম ব্যবস্থা আছে তাহা দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তোলা গেল না। অল্প সময়ের জন্য কতকটা শান্তি দেওয়া ভিন্ন আর কিছু করাও সম্ভব হইল না। তার পর ১৯৪৩-এর জানুয়ারী মাসে পড়িয়া গিয়া তাঁহার উরুর একখানি হাড় ভাঙিয়া যায়। এই দুর্ঘটনার পর তাঁহার আরোগ্যলাভের সকল আশা দূর হইল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ইহার পর নানা প্রকার উপসর্গ দেখা দেয়। অবশেষে সেপ্টিসেমিয়ার আক্রমণ হয় এবং উহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি অটুট ছিল।

১৯৪০ হইতে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৪২এর নবেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি অপরিমাণ সহিষ্ণুতার সহিত সম্পাদকের এবং জনসাধারণের পথ-নির্দেশকের কার্য বর্তমান সহস্র বাধাবিঘ্ন অসুবিধার মধ্যেও পূর্বের ন্যায় পরিচালনা করিয়াছেন। তার পর শারীরিক অবস্থা এমন হইয়া উঠে যে কোন শ্রমসাধ্য কার্যই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয়। কিন্তু তখনও তাঁহার মনের শক্তি অক্ষুণ্ন ছিল। শুধু প্রবাসী বা মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় বিভাগের সহকারিগণকেই যে তিনি উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন তাহা নহে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও অনেকে আসিয়া তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বর্তমানের বহু সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

জনসাধারণের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে এ বৎসর অভিনন্দিত করিয়াছেন এবং নিদারুণ শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেই প্রত্যেক অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে ধীর স্থির ও তেজস্বিতাপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন তাহা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। কোন ক্ষেত্রেই তিনি পূর্বাহ্নে উত্তর প্রস্তুত

করিবার সময় পান নাই, শরীরের সে ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না, প্রত্যেকের বেলাতেই তিনি অভিনন্দন-পত্র পাঠ শুনিবার পর উত্তর দিয়াছেন। তীব্র রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও উহার প্রতিটিতেই তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হইয়াছেন। অতীতের বহু বিস্মৃত ঘটনাও তিনি ঐ সময় যেভাবে বলিয়াছেন, সমবেত সকলের অন্তরে তাহা নূতন প্রেরণা দিয়াছে।

দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে তাঁহাকে সংবাদ-পত্র পড়িয়া শোনানো হইত এবং ঐ সময় তিনি যে-সব মন্তব্য করিতেন তাহাতেই বুঝা যাইত তাঁহার বুদ্ধি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ছিল। বহু কঠিন সমস্যাপূর্ণ ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণের জন্য যাঁহারাই গিয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধীর বিশ্লেষণ-ক্ষমতা বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন হয় নাই।

বর্তমান মহা সঙ্কটের সময় "প্রবাসী" পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ঋষিপ্রতিম সেই প্রবীণ কাণ্ডারীর অভাব প্রতি মুহূর্তে আমরা অনুভব করিতেছি। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টায় আমরা কখনও বিরত হইব না।

বাংলা দেশ কি সুন্দরবনে পরিণত হইবে ?

বাংলা দেশে ইংরেজ রাজত্ব বর্তমান থাকিতেই যে অবস্থা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহাকে এই ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, ঘরের চালে খড় নাই, শীতে পশমী বস্ত্র নাই, এবং জনসাধারণের জীবিকার্জনের পথ নিষ্ঠুর ভাবে সঙ্কুচিত হওয়ায় জীবনধারণেরও উপায় নাই। যে প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট বাঙালীর নিকট প্রতি বৎসর ১৫।২০ কোটি টাকা কর গ্রহণ করে, যে ভারত-গবর্মেণ্ট ১৫০।২০০ কোটি টাকার বাজেটের এবং যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট হোম-চার্জ্জের ৪০।৫০ কোটি টাকার একটা মোটা অংশ বাঙালীর নিকট আদায় করে, তাহাদের কেহই একটা দুর্ভিক্ষের কবল হইতে বাঙালীকে বাঁচাইতে পারিল না। আটলাণ্টিকের প্রচণ্ড ইউ-বোট সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট হাজার হাজার জাহাজ পাঠাইয়া সুদূর দেশ হইতে ব্রিটেনের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই গবর্মেণ্টই সময় থাকিতে অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আনিবার জন্য জাহাজ দিতে পারিলেন না। হাজার হাজার নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধের অনশনে মৃত্যুর পর শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ৫ খানি জাহাজ গম লইয়া ভারতে পৌঁছিয়াছে, অল্প কয়েক দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্যসচিব এই সংবাদ জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষে জাহাজ তৈয়ারি বন্ধ করিবার জন্য ভারত-সরকার যে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, বাংলার বিপদের দিনে জাহাজ সংগ্রহে তাঁহাদের সেই উৎসাহের একাংশও দেখা গেল না।

বস্ত্র, ঔষধ, পশম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে গবর্মেণ্ট যেখানেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সেখানেই দর চড়িয়াছে, জিনিস দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অতিরিক্ত লাভ-করের ভাগ সংগ্রহের লোভে বৎসরের পর বৎসর ভারত-সরকার কাপড়ের কল-ওয়ালাদের লাভ করিতে দিয়াছেন, বাংলায় কাপড়ের দর ছয়-সাত গুণ পর্য্যন্ত চড়িতে দেখিয়াও নীরব রহিয়াছেন। অবশেষে জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া তাঁহারা নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু দর প্রথমটা অল্পদিনের জন্য সামান্য কমিয়া আবার প্রায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথের উৎপাদন সম্বন্ধে বড় বড় অঙ্কের ঘোষণা সংবাদপত্রে দেখা যায় কিন্তু জনসাধারণের অঙ্গে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

বাংলায় সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ঔষধ কুইনাইন অগ্নি-মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। কেন, তাহা আজ সুবিদিত। শ্বেতাঙ্গ কিনা বুরোর স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতে কুইনাইন উৎপাদন কঠোরভাবে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার ফলে বাংলায় সিঙ্কোনা চাষের পর্য্যাপ্ত সুযোগ থাকিতেও বাঙালীকে কুইনাইনের অভাবে হাজারে হাজারে ম্যালেরিয়ায় মরিতে হইতেছে। রোগীর পথ্য বার্লি ও সাগু পর্য্যন্ত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য।

ঋণভারগ্রস্ত কৃষককে চাউল কিনিবার জন্য ঘরের চাল ঘটিবাটি বাসন ইত্যাদি সব কিছু এ বৎসর বেচিতে হইতেছে। আবার সে কোথায় উহা পাইবে সে কথা গবর্মেণ্ট আজও ভাবিয়া দেখিবার সময় পান নাই। নৌকা কাড়িয়া লইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে জোর করিয়া বেকার করা হইয়াছে। জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা আর নাই, ব্রহ্ম-অভিযানের আয়োজন দেখিয়া ইহাই বুঝা যায়; তথাপি আজও পর্য্যন্ত নৌকা ফিরাইয়া দিবার কোন প্রস্তাব পর্য্যন্ত উঠিল না।

নানা দিক হইতে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কি ভাবে তাহাকে স্বার্থপর স্ব-স্বপ্রধান কূপমণ্ডুক করিয়া তোলা হইতেছে, তাহার বহু প্রমাণ গত দুই-তিন বৎসরে পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই আমেদাবাদের দেখাদেখি বাঙালী কাপড়ের

কলওয়ালা দরিদ্র ক্ষুধার্ত স্বজাতির নিকট হইতে অন্যায় ভাবে লাভ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, বাঙালী দোকানদার সুযোগ বুঝিলেই অন্ততঃ গোটা কয়েক পয়সাও অতিরিক্ত লাভ করিয়া লইয়াছে, অসহায় ভাড়াটের গলা টিপিয়া বাড়ীওয়ালা বেশী টাকা আদায় করিয়াছে, বাঙালী কয়লা-ওয়ালা রাতারাতি কয়লায় জল ঢালিয়া উহার ওজন বাড়াইয়াছে। যে সমাজপ্রীতি, মানবপ্রীতি, ঔদার্য্য ও মহানুভবতার জন্য বাঙালী এক শত বৎসর পূর্বেও সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, সেই বাঙালীই জাতির মহা দুর্দিনে যে যাহাকে যেরূপ পারিয়াছে দোহন করিতে ছাড়ে নাই।

বাঙালীর এই অর্থনৈতিক ও মানসিক অবনতি আপনা আপনি হয় নাই, ইহার পিছনে সুদূরপ্রসারী এক অদৃশ্য হস্তের সন্ধান একটু খুঁজিলেই ধরা পড়িবে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বর্দ্ধিষ্ণু বাংলা ইংরেজকে যেমন এদেশে টানিয়া আনিয়াছিল, বাংলায় পদার্পণ করিয়াই ইংরেজও তেমনি বাংলাকে ভয় করিতে শিখিয়াছিল। বাঙালীকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্ব-স্ব-প্রধান ও নিত্যবিবদমান স্বার্থপর জাতিতে পরিণত করিয়া তুলিবার দৃশ্যমান চেষ্টা সুরু হইয়াছে লর্ড কার্জনের আমল হইতে। ইহার পর হইতে সকল দিক দিয়া বাংলাকে বঞ্চিত করিবার সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়াস চলিয়াছে। মেষ্টনী বন্দোবস্তে বাংলার ঘাড়ে অপর প্রদেশের সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপানো হইয়াছে, পাট-শুল্কের টাকা, আয়করের টাকা হইতে বাংলাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, বাংলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান তপশীলী প্রভৃতি বহু ভাগে ভাগ করিয়া এমন ভাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইয়াছে যেন প্রগতিশীল বাঙালী মাথা তুলিতে না পারে, বাঙালী যেন কোন প্রকারে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনে ক্রমপ্রবেশমান দোষগুলি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারে।

বাঙালীর জীবনের আজিকার এই সন্ধিক্ষণে জাতীয় অবনতির মূল তাহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। নতুবা তাহার বাঁচিবার পথ থাকিবে না। পোর্তুগীজ ও মোগলের অত্যাচারে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাট অঞ্চল যে-ভাবে সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সমগ্র বাংলা দেশ সেই ভাবে সুন্দরবনের কুক্ষিগত হইবে।

—

বাংলা দেশে ধানের দর

হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ শাসনে এ দেশে চাউলের দর কি ছিল এবং কি দাঁড়াইয়াছে, কার্তিকের প্রবাসীতে তাহা দেখানো হইয়াছে। বাংলায় ইংরেজ-আগমনের পর ধানের দর কি ভাবে ধীরে ধীরে বাড়িয়াছে এবং ফলন কমিয়াছে নিম্নে তাহা দেখান হইল। আকবরের আমলে চাউলের দর কিছু বাড়িয়াছিল। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসিয়াই শায়েস্তা খাঁ সর্ব-প্রথমে চাউলের দর কমাইবার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় উহা দুই আনা মণে নামিয়া আসে। ধানের দর তাঁহার আমলে হইয়াছিল চার আনায় তিন মণ। ১৬৮৯ সালে ঢাকা পরিত্যাগের সময় তাঁহার এই সাফল্যের চিরস্থায়ী নিদর্শন রাখিবার জন্য শায়েস্তা খাঁ ঢাকার পশ্চিমে একটি তোরণ নির্মাণের আদেশ দেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের দেওয়ানী লাভের পর হইতে ধানের দর ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে, বিঘা-প্রতি উৎপাদন কমিয়াছে, লোকের আয়ও কমিয়াছে।

বৎসর	মণকরা ধানের দর	কোথায় উল্লেখ আছে
১৬৭৫	/৪ পাই	ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার
১৭৬৮	।/৩ "	বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট রেকর্ডস্, রংপুর ১৭৭০-৭৯
১৭৮৮	।৶৫ "	বীরভূম সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট ১৯২৪-৩২
১৮০৮	৸০ "	এডমিনিষ্ট্রেশন অব হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট, ১৭৯৫-১৮৪৫, জি টয়েনবি প্রণীত
১৮২১	১/৩ "	ঐ
১৮৭০	১।৮ "	ষ্টাটিষ্টিক্যাল একাউণ্ট অব বেঙ্গল, রংপুর—হাণ্টার প্রণীত।
১৮৮০	১।২ "	কলিকাতা গেজেট
১৮৮৫	১৸/১১	এগ্রিকালচারাল ষ্টাটিষ্টিক্স্ অব ইণ্ডিয়া
১৯০৯	২৶৫ "	ফরিদপুর সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট ১৯০৪-১৪
১৯১৯	৪।৵ "	এগ্রিকালচারাল ষ্টাটিষ্টিক্স্ অব ইণ্ডিয়া
১৯২৯	৪৸৵০	সেটেলমেণ্ট অফিসারের রিপোর্ট, রংপুর

১৯৩০-এর মন্দার বাজারে ধানের দর অনেক কমিয়া যায়। ১৯৩২-এ দর ছিল ১৷৶৪ পাই, ১৯৩৬-এ উহা বাড়িয়া হয় ২৶৭ পাই। ইহার পর হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত ধানের দর মোটামুটি গড়পড়তা ২৲ টাকা হইতে ২৷৹ ছিল। ১৯৪২-এর পর হইতে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ধানের দর বলিয়া আর কিছু নাই।

রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চিন্ত ভারতবাসীর সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে। আমেরী সাহেব জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার নির্গলিতার্থ এই যে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ কি আছে না আছে তাহার হিসাব না করিয়াই ভারতবাসী যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই বর্তমান ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের একটি প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে নিম্নলিখিত হারে—

বৎসর	শতকরা হার
১৯০১-১১	৬·৪
১৯১১-২১	১·২
১৯২১-৩১	১০·৬
১৯৩১-৪১	১৫

জনসংখ্যা ১৯২১-এর পর হইতে বাড়িতে দেখিয়াও গবর্ন্মেণ্ট খাদ্য উৎপাদনের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেন নাই। এ দেশের গবর্ন্মেণ্টের অর্থ—মন্ত্রিত্ব নহে, সিভিলিয়ানতন্ত্র; মন্ত্রী অপেক্ষা সেক্রেটরীর ক্ষমতা এদেশে অনেক বেশী এবং জোরালো; সেক্রেটরী গবর্ণরের নিকট দায়ী, মন্ত্রী বা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিকট নহেন, ব্রিটিশ শাসনের এই সকল তত্ত্ব ভারতবর্ষে সুবিদিত। এই শাসকদের পরিচালনায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের অবস্থা ছিল—

বৎসর	চাউল (হাজার টন)	গম (হাজার টন)
১৯১৩-১৪	২৪,৭৮২	×
১৯৩২-৩৩	২৬,২০১	৯৪৫৫
১৯৪০-৪১	২২,১৪৩	১০,০২৭
১৯৪১-৪২	২৫,৩৫১	১০,০৭০
১৯৪২-৪৩	২৪,৫৩৩	×

ইহার সবগুলি সংখ্যাই সরকারী বিবরণ হইতে সংগৃহীত। ইহাতে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধের আরম্ভে চাউল উৎপাদনের অবস্থা যাহা ছিল, গত বৎসর পর্য্যন্ত তাহা অটুট রহিয়াছে। এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরে বিজ্ঞানের বহু উন্নতি হইয়াছে, চীন-জাপান প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত নিজ নিজ কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে, শুধু ব্রিটিশ সুশাসনে ও অভিভাবকত্বে ভারতবর্ষের ফসল উৎপাদনের অঙ্ক বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই। অথচ শুধু সার প্রয়োগের দ্বারা ভারতবর্ষের ফসল উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ, এমন কি তিন গুণ পর্য্যন্ত অনায়াসে বাড়িতে পারিত। কোন বড়লাট বা কোন প্রাদেশিক লাট ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করেন নাই। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্বে অবস্থা যাহা ছিল তাহাও অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

—

চাউল মজুতে কৃষকের দায়িত্ব

বাংলার খাদ্যসচিব, ভারত-সরকারের খাদ্যসচিব এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ভারতসচিব সকলেই বাজারে চাউলের অভাবের একটা প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, বাঙালী কৃষক প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল ধরিয়া রাখিতেছে। এই মজুত চাউল ছাড়িতে তাহাকে বাধ্য করিবার জন্য আইন বা অর্ডিনান্স প্রয়োগের কথা যেমন উঠিয়াছে, তেমনি আবার এক দল বলিয়াছেন যে সোনা রূপা এবং অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের সুযোগ দিয়া কৃষককে ভুলাইয়া চাউল বাহির করিবার চেষ্টা করা হউক। কৃষকের নিকট চাউল মজুত আছে কি না বাংলা-সরকার ঘরে ঘরে তাহা মাপিয়া দেখিয়াছেন এবং ইহার পর হইতে বাংলার খাদ্যসচিব এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। চারি বৎসর পূর্বে ফ্লাউড কমিশনও বাঙালী কৃষকের আর্থিক সামর্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জেলায় ছোটবড় নানাবিধ গ্রামের ২০০০০ পরিবারে সন্ধান লইয়া তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক-পরিবারকে মাত্র ১২ বিঘা জমি চাষের উপর নির্ভর করিতে হয়। কমিশনের হিসাব এই—

জমির পরিমাণ	পরিবারের শতকরা হার
৬ বিঘার কম	৪৬
৬ হইতে ৯ বিঘা	১১·২
৯ „ ১২ ”	৯·৪
১২ „ ১৫ ”	৮
১৫ „ ৩০ ”	১৭
৩০ বিঘার বেশী	৮·৪

ফ্লাউড কমিশন নিজেই রিপোর্টের ১৫৬ প্যারায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ১২ বিঘার কম জমি যাহাদের আছে, সম্বৎসরের খোরাক তাহাদের পোষায় না। ইহাদিগকে দিনমজুরি প্রভৃতি করিয়া অতিরিক্ত উপার্জন করিতে হয়। ১২ হইতে ৩০ বিঘা জমি যাহাদের আছে তাহাদের কায়ক্লেশে দিন চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত ধান ইহাদের হাতেও থাকে না। ইহাদের অধিকাংশই ভাগে চাষ করে, সুতরাং ফসলের অর্দ্ধেক

বাহির হইয়া যায়। কমিশনের হিসাবে দেখা যায় শতকরা ৬৫.৯টি পরিবার নিজেরা চাষ করে এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে শতকরা ২১.১ বর্গাদার ও ১৩.১ দিন-মজুর। নিজ খামার চাষের সংখ্যা নীচের দিকেই বেশী, ১২ বা ১৫ বিঘার অধিক জমি যাহাদের আছে তাহাদের অধিকাংশই চাষের জন্য বর্গাদারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ধান আটকাইবার ক্ষমতার দিক হইতে দেখিতে গেলে ৩০ বিঘা জমির মালিক পর্য্যন্ত ১২ বিঘার পর্য্যায়ে আসিয়া পড়ে। বাকি থাকে শতকরা মাত্র ৮টি পরিবার; ইহাদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু চাষীদের হয়ত কিছু ধান মজুত রাখিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহাও যে হয় নাই, প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

—

ধানভানার প্রশ্ন

বাংলা-সরকার আমন ধান ক্রয় ও ধান ভানা সম্বন্ধে কি করিবেন তাহার কোন সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ এখনও (২৭শে কার্তিক পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হয় নাই। সংবাদপত্রে সামান্য যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অনুমান হয় তাঁহারা দেশের সমস্ত অথবা অধিকাংশ ধান ক্রয় ও চাউলের কলের দ্বারা উহা ভানিবার কথাই চিন্তা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে বহু অসহায়া নারীর, বিশেষতঃ বিধবার, উপার্জনের একটি প্রধান পন্থা ধান ভানা। দেশে চাউলের কলের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অন্ন উঠিতেছে এবং এদিকে বাংলা-সরকার বা দেশবাসী কেহই দৃষ্টি দেন নাই। ডাঃ হাসিম আমীর আলি পি-এইচ ডি, বীরভূম জেলায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে বোলপুরে ১৮টি চাউলের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঐ জেলায় ৮০০০ ঢেঁকী বন্ধ হইয়াছে অর্থাৎ অন্যূন ১৬ হাজার নারীর জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ডাঃ হাসিমের পুস্তিকাটি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সাধারণ অবস্থায় এই ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা বর্ত্তমানে আরও বেশী বাড়িয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। গবর্ন্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে এদিকে অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন। আমন ধান সমস্ত না হউক অন্ততঃ কিছু পরিমাণে গবর্ন্মেণ্ট ক্রয় করিবেনই ইহা বিশ্বাস করা যায়। এই ধান ভানিবার আয়োজন চাউলের কলের দ্বারা না করিয়া তাঁহারা অনায়াসে গ্রামের নারীদের দ্বারা করাইতে পারেন। এক একটি ইউনিয়নে ক্রীত ধান ঐ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে মাপিয়া দিয়া হিসাব করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে চাউল তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিবার বন্দোবস্ত করিলে এবং সমস্ত ধান গ্রামের স্ত্রীলোকদের দ্বারা ভানাইবার আদেশ দিলে এই অনশন যাহারা কাটাইয়া উঠিয়াছে তাহাদের জীবিকার্জনের একটা পথ হইতে পারে।

—

বিহার গবর্ন্মেণ্টের আদেশ

বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্যশস্য চলাচলের বাধা-নিষেধ প্রত্যাহৃত হইবার পর গত ১৫ই মে হইতে ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে বাংলার জন্য বিহারে যে-সব ফসল ক্রয় করিয়া সেখানে মজুত রাখা হইয়াছিল, গত ১০ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ বিহার-সরকার তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। বাজেয়াপ্ত ফসলের পরিমাণ কত তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ভারত-শাসন আইন অনুসারে এই প্রকার আদেশ দান বে-আইনী, বিভিন্ন পত্রিকায় তাহা দেখাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ভারত-সরকার এই ধরণের প্রাদেশিক স্ব-স্ব-প্রধানত্ব বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা যে করেন নাই, বিহার-সরকারের আদেশ তাহার প্রমাণ।

মে, জুন, জুলাই মাসে ক্রীত ফসল পার্শ্ববর্তী প্রদেশ হইতে ছয় মাসের মধ্যেও আনা সম্ভব হইল না কেন, তাহাও রহস্যজনক। ইহার জন্য কে দায়ী, বাংলা-সরকার, বিহার-সরকার অথবা রেল-কর্তৃপক্ষ, তাহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকার বহুবার আশ্বাস দিয়াছেন যে প্রাদেশিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তাঁহারা অতঃপর যথাবিহিতভাবে হস্তক্ষেপ করিবেন। বিহার-সরকার তাঁহাদের আদেশের দ্বারা ভারত-সরকারকে যে চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন তাহার সমুচিত জবাব না দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মান ও প্রতিপত্তি অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

—

অতিলাভের মামলায় হাইকোর্টের রায়

কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটেরা অতিলোভী দোকানদারদের সামান্য জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন এবং পুলিস ইহাদের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল করিতেছে না দেখিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি মামলার আসামীদের দণ্ডবৃদ্ধি হইবে না কেন তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য আদেশ দেন। আসামীদের অধিকাংশই সামান্য দোকানদার। ইহাদের অনেকেই বলিয়াছে যে

পাইকারদের নিকট হইতে চড়া দরে মাল ক্রয় করিয়াছে বলিয়া ইহারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে পারে নাই। রায়ে প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন যে এই সব দোকানদারের নিকট সন্ধান লইয়া অতিলোভী পাইকারদের খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ কর্তৃপক্ষ পাইয়াছিলেন। আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁহারাও বড় ব্যবসায়ীদের ধরিবার পথের সন্ধানও পাইয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতির মতে পাইকারদের নাম বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে সাহায্য করা এই সব দণ্ডিত ব্যক্তিদের উচিত ছিল।

এখানে কিন্তু পুলিসের দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পুলিসের নিকট অভিযোগ করিয়া ফল হয় কি না সে সম্বন্ধে সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনে এখনও সন্দেহ আছে ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই এবং পুলিস বা আদালতের সংস্রবে আসিবার আগ্রহের অভাবের ন্যায়সঙ্গত কারণও এদেশে আছে। দণ্ডিত বা অভিযুক্ত দোকানদারদের নিকট হইতে পাইকারদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে অভিযুক্ত করা পুলিসেরই কর্তব্য ছিল। দোকানদারেরা যে অভিযোগ করিয়াছিল অনুসন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল।

অপরাধী দোকানদারদিগকে হাইকোর্ট কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ইহাতে কিছু সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। রায় দানের পরদিন হইতেই ম্যাজিষ্ট্রেটরাও কঠোরতর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন ইহাও দেখা গিয়াছে। কিন্তু আসল অপরাধী—যাহারা টাকার আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করিতে না পারিলে রায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের কথা প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করিয়াছেন। পুলিসের "দরিদ্র ভাণ্ডারে" (Poor Box) টাকা দিয়া পূর্বে অনুরূপ অভিযোগে অব্যাহতি পাইয়াছে এই কথা কেহ কেহ বলিয়াছে এবং উহা প্রমাণিতও হইয়াছে। পুলিসের বাক্সে সেলামী দিয়া আইনের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতি তীব্র মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রথা দীর্ঘকালের হইতে পারে কিন্তু ইহা অন্যায়, বহু ক্ষেত্রে ইহার অসদ্ব্যবহার হইতে পারে এবং যাহারা এই ভাবে টাকা আদায় করে তাহারা নিজেরাও আইনের আমলে আসিতে পারে। শুধু "দরিদ্র ভাণ্ডার" নয়, এই ধরণের কোন "সমর-সাহায্য ভাণ্ডারে"র বাক্সও পুলিসের নিকট থাকে কি না সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

—

সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের খিচুড়ী

বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কমিটি একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বাংলা-সরকার লঙ্গরখানায় যে পরিমাণ ও যে শ্রেণীর খিচুড়ী বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা হইতে প্রতিবারে মাত্র ৮২৫ ক্যালোরি পাওয়া যাইতে পারে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাব ব্যতীত উহাতে অত্যাবশ্যক খাদ্য-উপাদানেরও যথেষ্ট অভাব আছে। তদুপরি উহাতে বাজরার পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের অনেকেই উহা খাইয়া পেটের অসুখে ভুগিতেছে।

পাঁচ সহস্রাধিক খিচুড়ী-বিতরণ-কেন্দ্র হইতে প্রত্যহ বিশ লক্ষাধিক লোককে এত দিন ধরিয়া এই অমূল্য বস্তুই পরিবেশন করা হইয়াছে। সর্ জগদীশপ্রসাদ এই খিচুড়ীর পরিমাণ ও নমুনা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাতে মানুষ বাঁচে না, মরিতে একটু সময় লাগে মাত্র।" সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এই খিচুড়ীর প্রতি খাদ্যসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে উহা খাইয়া একটি বড় ইঁদুরও বাঁচিতে পারে না। বাংলা-সরকার ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে সেপ্টেম্বর মাসে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন এখনও তাহা কোন কেন্দ্রে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

—

সেবাকার্য্যে বাধাদান

বর্তমান দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের তরফ হইতে যে-সব সাহায্যের আয়োজন হইয়াছে গবর্মেণ্ট তাহাতে নানা ভাবে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন, এই অভিযোগ অনেকে করিয়াছেন। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের জনসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, যেন একটি সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত উপায়ে বে-সরকারী সাহায্য প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং শ্রীমতী রাজন নেহরুও এই একই উক্তি করিয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন,

"সরকারী লঙ্গরখানাসমূহের সংখ্যা যে শুধু প্রয়োজনের অপেক্ষা বহু কম তাহা নয়। তথায় যে ঘেঁট দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ এত কম যে, লোকে অবাক্ হইয়া ভাবে, কেন এই ঘেঁট একান্তই দেওয়া হইতেছে। অনেক জেলার লঙ্গরখানার ঘেঁটের বর্ণ একেবারে কাল। আমাকে অনেকে বলিয়াছেন যে, বে-সরকারী লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সহিত সহযোগিতা করেন না। উপরন্তু সকল সময় সরকারী কাজের সমালোচনা করিয়া কাজের বিঘ্ন করিয়া

থাকেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমি জনসাধারণের নিকট একটি বিষয় জানাইতে চাহি। আমি কাঁথীতে যে ভদ্রলোকের অতিথি হইয়া গিয়াছিলাম তিনি নিজ ব্যয়ে প্রত্যহ দুই শত দুঃস্থকে অন্ন দান করিতেছেন। দলে দলে লোকে এখানে আসিত। কিন্তু আমি যেদিন সেখানে যাই সেই দিন স্থানীয় মহকুমা হাকিম তাঁহাকে তাঁহার লঙ্গরখানা তুলিয়া দিতে নির্দেশ দেন। ইহার কারণ-স্বরূপ বলা হয় যে, তাঁহার লঙ্গরখানার দরুন লোকে বহুদূর হইতে শহরে আসিতেছে। ফলে শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষেত্রে মাত্র এইটুকুই বলিতে চাই যে, এই শহরের কোথাও স্বাস্থ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থাই আমার নজরে পড়ে নাই। আমি এ সম্পর্কে খবর জানিতে চাহিলে আমাকে বলা হয় যে, সেখানে ধাঙ্গড় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।"

এই সব অভিযোগ প্রকাশিত হইবার প্রায় এক মাস পরেও অবস্থা যে পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে, ১০ই নবেম্বরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘাটালের দেশসেবক ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পত্র তাহার প্রমাণ। ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন,

"ঘাটালের মহকুমা হাকিমের স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বে-সরকারী লোকেরা মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অপর কোথাও কোন খাদ্য-বিতরণ-কেন্দ্র খুলিতে পারিবেন না এবং সরকারী নির্দ্দেশানুযায়ী' তাঁহাদিগকে খাতাপত্র রাখিতে হইবে। ইঁহারা প্রকাশ্য বাজার হইতে চাউল ও আটা ক্রয় করিতেও পারিবেন না, সরকারী গুদাম হইতে উহা ক্রয় করিতে হইবে।" মেদিনীপুরে জনসেবায় বাধাদান বাংলা সরকারের পক্ষে নূতন নহে। গত বন্যার পর হইতে ইহা বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে।

—

লর্ড ওয়াভেলের বাংলায় আগমন

বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কয়েক দিনের মধ্যেই লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আসিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। সাত মাসের মধ্যেও লর্ড লিনলিথগো বাংলায় আসিবার সময় পান নাই, কিন্তু লর্ড ওয়াভেল সাত দিনের মধ্যেই সে সময় করিয়া লইয়াছিলেন। বড়লাট যে-সব স্থানে গিয়াছেন সেখানে পূর্ব্বে কোন সংবাদ দেন নাই। মন্ত্রীদের কেহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না ইহা উল্লেখযোগ্য। পরিদর্শনের পর বড়লাট মন্ত্রী ও সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতিদের লইয়া এক সভা করেন এবং উহাতে নিম্নোক্ত কার্য্যসূচী স্থির হয়:

(১) অতঃপর কলিকাতায় যে-সকল দুর্গত রহিয়াছে তাহাদিগকে সাময়িক আশ্রয়স্থলে অপসারণ করিতে হইবে। সেখানে তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে, বস্ত্রাদি দেওয়া হইবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে স্থানান্তর করার উপযুক্ত মনে হইলে নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হইবে। (২) যেহেতু কলিকাতা হইতে বিভিন্ন জেলায় খাদ্যশস্য প্রেরণে নানাপ্রকার অসুবিধা বর্ত্তমান জরুরি অবস্থার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেহেতু যানবাহন পরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক সামরিক কর্ম্মচারীর সহায়তা যাহাতে বাংলা-সরকার পাইতে পারেন সেজন্য একজন মেজর জেনারেলকে নিযুক্ত করিতে প্রধান সেনাপতি সম্মতি দিয়াছেন। (৩) যে-সকল জেলার সমস্যা অত্যধিক জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে-সকল জেলায় যাহাতে অবিলম্বে খাদ্যশস্য প্রেরণ, দুর্গতদের সাময়িকভাবে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা ও রিলিফ ষ্টোর স্থাপনের কার্য্যে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্য বড়লাট প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ জানাইবেন। কোন কোন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ ও চিকিৎসাদি ব্যাপারে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় সেরূপ অনুরোধও জানাইবেন।

দুর্ভিক্ষ প্রশমনে লর্ড ওয়াভেলের তৎপরতা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় জন-নেতাদের সাহায্য গ্রহণ করিলে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। মন্ত্রীরা যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, জন-নেতারা বাহির হইতে সেবাকার্য্যের দ্বারা তাহার খানিকটা পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সংবাদপত্রের রিপোর্ট হইতে ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রীদের প্রতি নূতন বড়লাটের অনাস্থার ভাব স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু সাহায্য-প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতায় আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

লর্ড ওয়াভেল সেনাদলের সাহায্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন, তাহাতে সুফলও যথেষ্ট হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি কিছু চাউল এবং টিনের দুধ প্রভৃতি নিজের গুদাম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট অবিলম্বে নৌকা পুনরায় চালাইবার আদেশ দিলে জলপথেও মফস্বলে বহু ফসল চালান দেওয়া যাইত। সৈন্যবিভাগের লরীর উপরই একমাত্র নির্ভর করিতে হইত না।

—

দুর্ভিক্ষের প্রকৃত প্রতিকার

বিলাতের কমন্স সভায় বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ছয় ঘণ্টা ব্যাপী যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে একমাত্র

শ্রমিক-সদস্য মিঃ কোব সমস্যার আসল দিকটির প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। ভারতে বা বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান ভিন্ন ইহার প্রকৃত প্রতিকার যে হইতে পারে না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় ইহাই তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মিঃ কোব বলেন,

"দায়িত্ব কাহার তাহা অবিলম্বে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কোন সিলেক্ট কমিটি বা রয়্যাল কমিশনের দ্বারা তাহা করা যাইতে পারে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মিঃ আমেরি সব কথা খুলিয়া বলেন নাই। আরও অনেক কথা প্রকাশের দরকার। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। আমরা দুই শত বৎসর শাসন করিতেছি, অথচ দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের মত একই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সমস্ত ব্যবস্থা চুরমার হইয়া যায়। ইহা আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচায়ক। বৈষয়িক অসুবিধা দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা রাজনৈতিক অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা না করি তাহা হইলে সমস্যা সমাধান হইবে না। পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি আমাদের বন্ধুবর্গ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আমি খোলা কথাই বলিতেছি। ভারতীয় নেতারা আমাদের মহতী প্রচেষ্টায় যে সহায়তা করিতেছে না তাহার জন্য দোষী আমরাই। জাহাজ বোঝাই করিয়া খাদ্যশস্য ভারতে পাঠাইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারাগার হইতে মুক্তি দিতে হইবে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে বর্ত্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাদের করিতেই হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কংগ্রেসী নেতাদের কারারুদ্ধ করিবার বেলায় সরাসরি যেরূপ ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ভারতীয়দের অন্ন যোগাইবার বেলায় সেরূপ করা হয় নাই কেন? বর্ত্তমান সর্বাত্মক যুদ্ধে ভারতীয়দের দেহ ও মনের বল যাহাতে অটুক থাকে তাহার জন্য কি করা হইয়াছে?

"ইহার জবাবে সরকারের কি বলিবার আছে? এই সভায় প্রশ্নোত্তরে মিঃ আমেরি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিশ্চেষ্টতা, মূর্খতা এবং মানবপ্রীতির অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।" মিঃ কোব মিঃ আমেরির জানুয়ারী মাসের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। "ঐ সময়ে মিঃ আমেরি বলিয়াছেন—আতঙ্কের কারণ নাই, উপযুক্ত সতর্কতা ও সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা পার হওয়া যাইবে, কিন্তু বণ্টন সমস্যা অতীব গুরুতর। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে। আগামী দুই তিন মাসে যুদ্ধে সমস্ত রাষ্ট্রের যে পরিমাণ লোক মারা যাইবে তদপেক্ষা ভারতে বেশী লোক মারা যাইবে। আমরা প্রচার করিয়া থাকি আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও ফ্যাসিস্ত অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি। ভারতবাসীদের নৈতিক সমর্থন লাভের জন্য আমরা কি আহ্বান জানাইব। আমি অস্বীকার করি যে, পণ্ডিত নেহরু আমাদের যুদ্ধের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন। একথাও অস্বীকার করি যে কংগ্রেস মনে প্রাণে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। ভারতের নেতৃবৃন্দের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইবে। বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যাইতে পারে।"

বিতর্কে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মুখপাত্র মিঃ আমেরি ও সর জন এণ্ডার্সন সমস্যার এই দিকটা একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত মীমাংসা না হইলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন একেবারেই যে অসম্ভব, এই সত্য নানা দিক দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ যোশীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, এখনও (১লা সেপ্টেম্বর তারিখে) ১২৮৮৪ জন কংগ্রেস-কর্ম্মী কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং ৮০৭৩ জন ভারত-রক্ষা আইনে বন্দী আছেন। কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মীদের মুক্তিদান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা অর্জন করিলে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ প্রশমন করা সম্ভব হইত, ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষার ব্যবস্থাও অনেক সহজ হইত।

—

"রেলওয়ে বিভাগের অব্যবস্থা"

"মাননীয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার পত্রিকার ১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যার ৪৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত টিপ্পনিতে রেলওয়ে ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মন্তব্য করা হইয়াছে। আপনার সাধারণভাবে আলোচিত টিপ্পনীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আপনার ভাষ্যের সমর্থনের জন্য অব্যবস্থার বিশেষ উদাহরণ-স্বরূপ রামকৃষ্ণপুরে গমের মালগাড়ী প্রেরণ এবং চেতলায় চাউলের মালগাড়ী পৌঁছানর কথা, উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, যে প্রকৃতপক্ষে গমের মালগাড়ীগুলি চেতলায় ও চাউলের মালগাড়ীগুলি রামকৃষ্ণপুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং চাউল ও গম পূর্ণ মালগাড়ীগুলিকে পুনরায় যথাস্থানে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।

এই উক্তির মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা জানাইতে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে ব্যবহৃত রেলওয়ে সম্পর্কীয় তথ্যগুলির সততা

নির্ণয় ও তৎপ্রসূত অনুসন্ধানের জন্য আপনাকে সাদরে আমার দপ্তরে আহ্বান করিতে, আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

তারিখ ১লা অক্টোবর ৪৩ ইতি
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস আপনার বিশ্বস্ত
১০৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা চীফ কমারসিয়াল ম্যানেজার"

আশ্বিনের প্রবাসীর একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া রেলওয়ের তরফ হইতে আমাদের নিকট যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহা অবিকল উপরে প্রকাশিত হইল। গত ৮ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহা কি সত্য যে বাংলা-সরকারের মতে রেল কর্তৃপক্ষ মালগাড়ী চলাচলের যে আদেশ দিয়া থাকেন তাহা অনেক সময় ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হয় এবং ফলে গমের সাইডিং-এ চাউল এবং চাউলের সাইডিং-এ গম যায়? জবাবে সর্ এডোয়ার্ড বেন্থল বলেন যে, রেল-বিভাগ হইতে এরূপ আদেশ যায় নাই। ঐ সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন যে মালগাড়ী চলাচলের বন্দোবস্ত এখন সন্তোষজনক হইয়াছে। নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি জিজ্ঞাসা করেন, বাংলা-সরকারের ত্রুটি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাঁহারা উহা অস্বীকার করিয়াছেন যানবাহন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাহা দেখিয়াছেন কি?

সর্ এডোয়ার্ড বলেন—"আমার মনে হয় ঐরূপ করা হইয়াছে।"

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হইতে দেখা যাইবে যে চাউল ও গমের সাইডিং-এ ভুল মালগাড়ী প্রেরণের ঘটনাটি অনেকেরই জানা ছিল এবং ইহা লইয়া রেল-বিভাগ ও বাংলা-সরকারের মধ্যে বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছে।

—

ভারতবর্ষে ও বিদেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার

ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক কি না ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ ও আমেরিকার সহিত তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

১৮৮০ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির শতকরা হার

আমেরিকা—১৮৬
ইংলণ্ড—৫৪·১
ইতালি—৪৬·৮
সুইজারল্যাণ্ড—৪৩·৫
জার্ম্মেনী—৪২·২
স্পেন—৩৬·৮
ফ্রান্স—১১·৩

এশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—

জাপান—৭৪·১ (১৮৮০—১৯৩০)
রাশিয়া—১৬ (১৯২৬-এর ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৯-এর জানুয়ারির মধ্যে)

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—

১৮৯১ হইতে ১৯৪১—মোট ৫০ বৎসরে শতকরা ৪০ (২৭ কোটি ৯০ লক্ষ হইতে ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ)

১৮৯১-১৯০১—১·৪
১৯০১-১৯১১—৬·৪
১৯১১-১৯২১—১·২
১৯২১-১৯৩১—১০·৬
১৯৩১-১৯৪১—১৫

এই সময়ের মধ্যে প্রতি দশ বৎসরে আমেরিকার জনসংখ্যা নিম্নলিখিত হারে বাড়িয়াছে—

১৯০০—২০·৭
১৯১০—২১
১৯২০—১৪·৯
১৯৩০—১৬·১

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা ৮ গুণ বাড়িয়াছে, ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে ৪ গুণও বাড়ে নাই।

গত ১০ বৎসরে ভারতবর্ষের সেন্সাসে ৫ কোটি লোক বাড়িতে দেখিয়া যে-সব ব্যাখ্যা সুরু হইয়াছে, সেন্সাস কমিশনার মিঃ এম ডব্লিউ ইয়েটস নিজেই তাহার জবাব দিয়াছেন। ১৯৪১-এর সেন্সাস রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন, "দৃশ্যতঃ এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি কি কি কারণে ঘটিয়াছে তাহা যাঁহাদের জানা নাই, তাঁহাদের পক্ষে ইহা দেখিয়া চমকিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি প্রধান কথা ভুলিলে চলিবে না যে, গান্ধী-আন্দোলনের বয়কয়টের জন্য ১৯৩১-এর সেন্সাসে সঠিক গণনা হয় নাই, কম গোনা হইয়াছে। এই কারণে ১৯৪১-এর সংখ্যা একটু বেশী দেখাইতেছে।

"আর একটি প্রধান কারণ, ১৯৪১-এর সেন্সাসে জনসাধারণ লোকগণনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ১৯৩৫-এর ভারতশাসন-আইনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আমদানী অথবা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় নিছক সংখ্যাধিক্যের উপর অত্যধিক জোর দিতে শেখে। একক ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রত্যেক নরনারী নিজের নাম গণনাকারীর খাতায় তুলিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ফলে এবার শতকরা একশত জনই গনতির মধ্যে

পাইকারদের নিকট হইতে চড়া দরে মাল ক্রয় করিয়াছে বলিয়া ইহারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে পারে নাই। রায়ে প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন যে এই সব দোকানদারের নিকট সন্ধান লইয়া অতিলোভী পাইকারদের খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ কর্তৃপক্ষ পাইয়াছিলেন। আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁহারাও বড় ব্যবসায়ীদের ধরিবার পথের সন্ধানও পাইয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতির মতে পাইকারদের নাম বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে সাহায্য করা এই সব দণ্ডিত ব্যক্তিদের উচিত ছিল।

এখানে কিন্তু পুলিসের দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পুলিসের নিকট অভিযোগ করিয়া ফল হয় কি না সে সম্বন্ধে সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনে এখনও সন্দেহ আছে ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই এবং পুলিস বা আদালতের সংস্রবে আসিবার আগ্রহের অভাবের ন্যায়সঙ্গত কারণও এদেশে আছে। দণ্ডিত বা অভিযুক্ত দোকানদারদের নিকট হইতে পাইকারদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে অভিযুক্ত করা পুলিসেরই কর্তব্য ছিল। দোকানদারেরা যে অভিযোগ করিয়াছিল অনুসন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল।

অপরাধী দোকানদারদিগকে হাইকোর্ট কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ইহাতে কিছু সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। রায় দানের পরদিন হইতেই ম্যাজিস্ট্রেটরাও কঠোরতর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন ইহাও দেখা গিয়াছে। কিন্তু আসল অপরাধী—যাহারা টাকার আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করিতে না পারিলে রায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের কথা প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করিয়াছেন। পুলিসের "দরিদ্র ভাণ্ডারে" (Poor Box) টাকা দিয়া পূর্বে অনুরূপ অভিযোগে অব্যাহতি পাইয়াছে এই কথা কেহ কেহ বলিয়াছে এবং উহা প্রমাণিতও হইয়াছে। পুলিসের বাক্সে সেলামী দিয়া আইনের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতি তীব্র মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রথা দীর্ঘকালের হইতে পারে কিন্তু ইহা অন্যায়, বহু ক্ষেত্রে ইহার অসদ্ব্যবহার হইতে পারে এবং যাহারা এই ভাবে টাকা আদায় করে তাহারা নিজেরাও আইনের আমলে আসিতে পারে। শুধু "দরিদ্র ভাণ্ডার" নয়, এই ধরণের কোন "সমর-সাহায্য ভাণ্ডারে"র বাক্সও পুলিসের নিকট থাকে কি না সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

—

সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের খিচুড়ী

বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কমিটি একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বাংলা-সরকার লঙ্গরখানায় যে পরিমাণ ও যে শ্রেণীর খিচুড়ী বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা হইতে প্রতিবারে মাত্র ৮২৫ ক্যালোরি পাওয়া যাইতে পারে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাব ব্যতীত উহাতে অত্যাবশ্যক খাদ্য-উপাদানেরও যথেষ্ট অভাব আছে। তদুপরি উহাতে বাজরার পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের অনেকেই উহা খাইয়া পেটের অসুখে ভুগিতেছে।

পাঁচ সহস্রাধিক খিচুড়ী-বিতরণ-কেন্দ্র হইতে প্রত্যহ বিশ লক্ষাধিক লোককে এত দিন ধরিয়া এই অমূল্য বস্তুই পরিবেশন করা হইয়াছে। সর্ জগদীশপ্রসাদ এই খিচুড়ীর পরিমাণ ও নমুনা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাতে মানুষ বাঁচে না, মরিতে একটু সময় লাগে মাত্র।" সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এই খিচুড়ীর প্রতি খাদ্যসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে উহা খাইয়া একটি বড় ইঁদুরও বাঁচিতে পারে না। বাংলা-সরকার ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে সেপ্টেম্বর মাসে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন এখনও তাহা কোন কেন্দ্রে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

—

সেবাকার্য্যে বাধাদান

বর্তমান দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের তরফ হইতে যে-সব সাহায্যের আয়োজন হইয়াছে গবর্ন্মেণ্ট তাহাতে নানা ভাবে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন, এই অভিযোগ অনেকে করিয়াছেন। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের জনসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, যেন একটি সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত উপায়ে বে-সরকারী সাহায্য প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং শ্রীমতী রাজন নেহরুও এই একই উক্তি করিয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন,

"সরকারী লঙ্গরখানাসমূহের সংখ্যা যে শুধু প্রয়োজনের অপেক্ষা বহু কম তাহা নয়। তথায় যে ঘেঁট দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ এত কম যে, লোকে অবাক্ হইয়া ভাবে, কেন এই ঘেঁট একান্তই দেওয়া হইতেছে। অনেক জেলার লঙ্গরখানার ঘেঁটের বর্ণ একেবারে কাল। আমাকে অনেকে বলিয়াছেন যে, বে-সরকারী লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সহিত সহযোগিতা করেন না। উপরন্তু সকল সময় সরকারী কাজের সমালোচনা করিয়া কাজের বিঘ্ন করিয়া

থাকেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমি জনসাধারণের নিকট একটি বিষয় জানাইতে চাহি। আমি কাঁথীতে যে ভদ্রলোকের অতিথি হইয়া গিয়াছিলাম তিনি নিজ ব্যয়ে প্রত্যহ দুই শত দুঃস্থকে অন্ন দান করিতেছেন। দলে দলে লোকে এখানে আসিত। কিন্তু আমি যেদিন সেখানে যাই সেই দিন স্থানীয় মহকুমা হাকিম তাঁহাকে তাঁহার লঙ্গরখানা তুলিয়া দিতে নির্দেশ দেন। ইহার কারণ-স্বরূপ বলা হয় যে, তাঁহার লঙ্গরখানার দরুন লোকে বহুদূর হইতে শহরে আসিতেছে। ফলে শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষেত্রে মাত্র এইটুকুই বলিতে চাই যে, এই শহরের কোথাও স্বাস্থ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থাই আমার নজরে পড়ে নাই। আমি এ সম্পর্কে খবর জানিতে চাহিলে আমাকে বলা হয় যে, সেখানে ধাঙ্গড় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।"

এই সব অভিযোগ প্রকাশিত হইবার প্রায় এক মাস পরেও অবস্থা যে পূর্ববৎই রহিয়াছে, ১০ই নবেম্বরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘাটালের দেশসেবক ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পত্র তাহার প্রমাণ। ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন,

"ঘাটালের মহকুমা হাকিমের স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বে-সরকারী লোকেরা মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অপর কোথাও কোন খাদ্য-বিতরণ-কেন্দ্র খুলিতে পারিবেন না এবং সরকারী নির্দেশানুযায়ী তাঁহাদিগকে খাতাপত্র রাখিতে হইবে। ইঁহারা প্রকাশ্য বাজার হইতে চাউল ও আটা ক্রয় করিতেও পারিবেন না, সরকারী গুদাম হইতে উহা ক্রয় করিতে হইবে।" মেদিনীপুরে জনসেবায় বাধাদান বাংলা সরকারের পক্ষে নূতন নহে। গত বন্যার পর হইতে ইহা বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে।

—

লর্ড ওয়াভেলের বাংলায় আগমন

বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কয়েক দিনের মধ্যেই লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আসিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। সাত মাসের মধ্যেও লর্ড লিনলিথগো বাংলায় আসিবার সময় পান নাই, কিন্তু লর্ড ওয়াভেল সাত দিনের মধ্যেই সে সময় করিয়া লইয়াছিলেন। বড়লাট যে-সব স্থানে গিয়াছেন সেখানে পূর্ব্বে কোন সংবাদ দেন নাই। মন্ত্রীদের কেহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না ইহা উল্লেখযোগ্য। পরিদর্শনের পর বড়লাট মন্ত্রী ও সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতিদের লইয়া এক সভা করেন এবং উহাতে নিম্নোক্ত কার্য্যসূচী স্থির হয়:

(১) অতঃপর কলিকাতায় যে-সকল দুর্গত রহিয়াছে তাহাদিগকে সাময়িক আশ্রয়স্থলে অপসারণ করিতে হইবে। সেখানে তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে, বস্ত্রাদি দেওয়া হইবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে স্থানান্তর করার উপযুক্ত মনে হইলে নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হইবে। (২) যেহেতু কলিকাতা হইতে বিভিন্ন জেলায় খাদ্যশস্য প্রেরণে নানাপ্রকার অসুবিধা বর্ত্তমান জরুরি অবস্থার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেহেতু যানবাহন পরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক সামরিক কর্ম্মচারীর সহায়তা যাহাতে বাংলা-সরকার পাইতে পারেন সেজন্য একজন মেজর জেনারেলকে নিযুক্ত করিতে প্রধান সেনাপতি সম্মতি দিয়াছেন। (৩) যে-সকল জেলার সমস্যা অত্যধিক জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে-সকল জেলায় যাহাতে অবিলম্বে খাদ্যশস্য প্রেরণ, দুর্গতদের সাময়িকভাবে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা ও রিলিফ ষ্টোর স্থাপনের কার্য্যে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্য বড়লাট প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ জানাইবেন। কোন কোন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ ও চিকিৎসাদি ব্যাপারে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় সেরূপ অনুরোধও জানাইবেন।

দুর্ভিক্ষ প্রশমনে লর্ড ওয়াভেলের তৎপরতা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় জন-নেতাদের সাহায্য গ্রহণ করিলে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। মন্ত্রীরা যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, জন-নেতারা বাহির হইতে সেবাকার্য্যের দ্বারা তাহার খানিকটা পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সংবাদপত্রের রিপোর্ট হইতে ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রীদের প্রতি নূতন বড়লাটের অনাস্থার ভাব স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু সাহায্য-প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতায় আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

লর্ড ওয়াভেল সেনাদলের সাহায্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন, তাহাতে সুফলও যথেষ্ট হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি কিছু চাউল এবং টিনের দুধ প্রভৃতি নিজের গুদাম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট অবিলম্বে নৌকা পুনরায় চালাইবার আদেশ দিলে জলপথেও মফস্বলে বহু ফসল চালান দেওয়া যাইত। সৈন্যবিভাগের লরীর উপরই একমাত্র নির্ভর করিতে হইত না।

—

দুর্ভিক্ষের প্রকৃত প্রতিকার

বিলাতের কমন্স সভায় বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ছয় ঘণ্টা ব্যাপী যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে একমাত্র

শ্রমিক-সদস্য মিঃ কোব সমস্যার আসল দিকটির প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। ভারতে বা বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান ভিন্ন ইহার প্রকৃত প্রতিকার যে হইতে পারে না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় ইহাই তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মিঃ কোব বলেন,

"দায়িত্ব কাহার তাহা অবিলম্বে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কোন সিলেক্ট কমিটি বা রয়্যাল কমিশনের দ্বারা তাহা করা যাইতে পারে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মিঃ আমেরি সব কথা খুলিয়া বলেন নাই। আরও অনেক কথা প্রকাশের দরকার। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। আমরা দুই শত বৎসর শাসন করিতেছি, অথচ দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের মত একই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সমস্ত ব্যবস্থা চুরমার হইয়া যায়। ইহা আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচায়ক। বৈষয়িক অসুবিধা দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা রাজনৈতিক অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা না করি তাহা হইলে সমস্যা সমাধান হইবে না। পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি আমাদের বন্ধুবর্গ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আমি খোলা কথাই বলিতেছি। ভারতীয় নেতারা আমাদের মহতী প্রচেষ্টায় যে সহায়তা করিতেছে না তাহার জন্য দোষী আমরাই। জাহাজ বোঝাই করিয়া খাদ্যশস্য ভারতে পাঠাইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারাগার হইতে মুক্তি দিতে হইবে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে বর্ত্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাদের করিতেই হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কংগ্রেসী নেতাদের কারারুদ্ধ করিবার বেলায় সরাসরি যেরূপ ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ভারতীয়দের অন্ন যোগাইবার বেলায় সেরূপ করা হয় নাই কেন? বর্ত্তমান সর্বাত্মক যুদ্ধে ভারতীয়দের দেহ ও মনের বল যাহাতে অটুক থাকে তাহার জন্য কি করা হইয়াছে?

"ইহার জবাবে সরকারের কি বলিবার আছে? এই সভায় প্রশ্নোত্তরে মিঃ আমেরি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিশ্চেষ্টতা, মূর্খতা এবং মানবপ্রীতির অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।" মিঃ কোব মিঃ আমেরির জানুয়ারী মাসের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। "ঐ সময়ে মিঃ আমেরি বলিয়াছেন—আতঙ্কের কারণ নাই, উপযুক্ত সতর্কতা ও সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা পার হওয়া যাইবে, কিন্তু বণ্টন সমস্যা অতীব গুরুতর। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে। আগামী দুই তিন মাসে যুদ্ধে সমস্ত রাষ্ট্রের যে পরিমাণ লোক মারা যাইবে তদপেক্ষা ভারতে বেশী লোক মারা যাইবে। আমরা প্রচার করিয়া থাকি আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও ফ্যাসিস্ত অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি। ভারতবাসীদের নৈতিক সমর্থন লাভের জন্য আমরা কি আহ্বান জানাইব। আমি অস্বীকার করি যে, পণ্ডিত নেহরু আমাদের যুদ্ধের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন। একথাও অস্বীকার করি যে কংগ্রেস মনে প্রাণে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। ভারতের নেতৃবৃন্দের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইবে। বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যাইতে পারে।"

বিতর্কে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মুখপাত্র মিঃ আমেরি ও সর জন এণ্ডার্সন সমস্যার এই দিকটা একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত মীমাংসা না হইলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন একেবারেই যে অসম্ভব, এই সত্য নানা দিক দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ যোশীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, এখনও (১লা সেপ্টেম্বর তারিখে) ১৯২৮৪ জন কংগ্রেস-কর্ম্মী কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং ৮০৭৩ জন ভারত-রক্ষা আইনে বন্দী আছেন। কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মীদের মুক্তিদান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা অর্জন করিলে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ প্রশমন করা সম্ভব হইত, ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষার ব্যবস্থাও অনেক সহজ হইত।

—

"রেলওয়ে বিভাগের অব্যবস্থা"

"মাননীয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার পত্রিকার ১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যার ৪৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত টিপ্পনিতে রেলওয়ে ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মন্তব্য করা হইয়াছে। আপনার সাধারণভাবে আলোচিত টিপ্পনীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আপনার ভাষ্যের সমর্থনের জন্য অব্যবস্থার বিশেষ উদাহরণ-স্বরূপ রামকৃষ্ণ-পুরে গমের মালগাড়ী প্রেরণ এবং চেতলায় চাউলের মালগাড়ী পৌছানর কথা, উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, যে প্রকৃতপক্ষে গমের মালগাড়ীগুলি চেতলায় ও চাউলের মালগাড়ীগুলি রামকৃষ্ণ-পুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং চাউল ও গম পূর্ণ মালগাড়ী-গুলিকে পুনরায় যথাস্থানে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।

এই উক্তির মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা জানাইতে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে ব্যবহৃত রেলওয়ে সম্পর্কীয় তথ্যগুলির সততা

নির্ণয় ও তৎপ্রসূত অনুসন্ধানের জন্ত আপনাকে সাদরে আমার দপ্তরে আহ্বান করিতে, আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

তারিখ ১লা অক্টোবর ৪৩ ইতি
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস আপনার বিশ্বস্ত
১০৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা চীফ কমারসিয়াল ম্যানেজার"

আশ্বিনের প্রবাসীর একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া রেলওয়ের তরফ হইতে আমাদের নিকট যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহা অবিকল উপরে প্রকাশিত হইল। গত ৮ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহা কি সত্য যে বাংলা-সরকারের মতে রেল কর্তৃপক্ষ মালগাড়ী চলাচলের যে আদেশ দিয়া থাকেন তাহা অনেক সময় ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হয় এবং ফলে গমের সাইডিং-এ চাউল এবং চাউলের সাইডিং-এ গম যায়? জবাবে সর্ এডোয়ার্ড বেন্থল বলেন যে, রেল-বিভাগ হইতে এরূপ আদেশ যায় নাই। ঐ সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন যে মালগাড়ী চলাচলের বন্দোবস্ত এখন সন্তোষজনক হইয়াছে। নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি জিজ্ঞাসা করেন, বাংলা-সরকারের ত্রুটি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাঁহারা উহা অস্বীকার করিয়াছেন যানবাহন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাহা দেখিয়াছেন কি?

সর্ এডোয়ার্ড বলেন—"আমার মনে হয় ঐরূপ করা হইয়াছে।"

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হইতে দেখা যাইবে যে চাউল ও গমের সাইডিং-এ ভুল মালগাড়ী প্রেরণের ঘটনাটি অনেকেরই জানা ছিল এবং ইহা লইয়া রেল-বিভাগ ও বাংলা-সরকারের মধ্যে বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছে।

—

ভারতবর্ষে ও বিদেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার

ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক কি না ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ ও আমেরিকার সহিত তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

১৮৮০ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির শতকরা হার

আমেরিকা—১৮৬
ইংলণ্ড—৫৪·১
ইতালি—৪৬·৮
সুইজারল্যাণ্ড—৪৩·৫
জার্ম্মেনী—৪২·২
স্পেন—৩৬·৮
ফ্রান্স—১১·৩

এশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—

জাপান—৭৪·১ (১৮৮০—১৯৩০)
রাশিয়া—১৬ (১৯২৬-এর ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৯-এর জানুয়ারির মধ্যে)

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—

১৮৯২ হইতে ১৯৪১—মোট ৫০ বৎসরে শতকরা ৪০ (২৭ কোটি ৯০ লক্ষ হইতে ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ)

১৮৯১-১৯০১—১·৪
১৯০১-১৯১১—৬·৪
১৯১১-১৯২১—১·২
১৯২১-১৯৩১—১০·৬
১৯৩১-১৯৪১—১৫

এই সময়ের মধ্যে প্রতি দশ বৎসরে আমেরিকার জনসংখ্যা নিম্নলিখিত হারে বাড়িয়াছে—

১৯০০—২০·৭
১৯১০—২১
১৯২০—১৪·৯
১৯৩০—১৬·১

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা ৮ গুণ বাড়িয়াছে, ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে ৪ গুণও বাড়ে নাই।

গত ১০ বৎসরে ভারতবর্ষের সেন্সাসে ৫ কোটি লোক বাড়িতে দেখিয়া যে-সব ব্যাখ্যা সুরু হইয়াছে, সেন্সাস কমিশনার মিঃ এম ডব্লিউ ইয়েটস নিজেই তাহার জবাব দিয়াছেন। ১৯৪১-এর সেন্সাস রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন, "দৃশ্যতঃ এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি কি কি কারণে ঘটিয়াছে তাহা যাঁহাদের জানা নাই, তাঁহাদের পক্ষে ইহা দেখিয়া চমকিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি প্রধান কথা ভুলিলে চলিবে না যে, গান্ধী-আন্দোলনের বয়কয়টের জন্য ১৯৩১-এর সেন্সাসে সঠিক গণনা হয় নাই, কম গোনা হইয়াছে। এই কারণে ১৯৪১-এর সংখ্যা একটু বেশী দেখাইতেছে।

"আর একটি প্রধান কারণ, ১৯৪১-এর সেন্সাসে জনসাধারণ লোকগণনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ১৯৩৫-এর ভারতশাসন-আইনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আমদানী অথবা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় নিছক সংখ্যাধিক্যের উপর অত্যধিক জোর দিতে শেখে। একক ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রত্যেক নরনারী নিজের নাম গণনাকারীর খাতায় তুলিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ফলে এবার শতকরা একশত জনই গনতির মধ্যে

পড়িয়াছে। ১৯৪১-এর সেন্সাসে এই ভাবে নাম লেখাইয়া যেন পূর্বের ভ্রমের সংশোধন করা হইয়াছে। (The enumeration in 1941 turned out therefore to be adequate with a vengeance.) ১৯৩১-এর পর এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ ইহাতে সহজেই বুঝা যায়। অন্যান্য অবস্থা সমান থাকিলে এই সংখ্যাবৃদ্ধিকে অত্যধিক বৃদ্ধির সূচনা বা মারাত্মক বলিয়া মনে করিবার প্রয়োজন নাই।"

—

"লিনলিথগোর বিচার হউক"—সেমুর কক্স, সিলভারম্যান ও কোব

বাংলার দুর্ভিক্ষ লইয়া পার্লামেণ্টে যে বিতর্ক হইয়াছে তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের বক্তব্য শুনিয়া রক্ষণশীল দল ভিন্ন অপর কোন দলের সদস্যেরাই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিতর্কের পূর্বে বিলাতে যে-সব পত্রিকা ভারত-সচিবকে সমর্থন করিতেছিল, পরে তাহারাও স্বর নামাইতে অথবা নীরবতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'সাণ্ডে টাইমসে'র ন্যায় আমেরীর গোঁড়া সমর্থক পত্রিকার উৎসাহ কমিয়া আসিয়াছে এবং অপর দিকে 'রেণল্ডস্ নিউজ' তীব্র ভাষায় ইণ্ডিয়া অফিস হইতে আমেরীর অপসারণ দাবী করিয়াছে। রক্ষণশীল ভিন্ন পার্লামেণ্টের অপর প্রায় সকল সদস্যেরই মত এই ছিল যে "পুনর্গঠিত মন্ত্রীসভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ আমেরীকে কোন্ পদ দিবেন না দিবেন তাহা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতে চাই না। ভারতবর্ষে মিঃ আমেরী যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষতঃ খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে যে কাণ্ড তিনি ঘটাইয়াছেন, তাঁহাকে আর যে কাজেই দেওয়া হউক ইহার চেয়ে খারাপ তিনি করিতে পারিবেন না।" প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের নিকট অবশ্য ৪০ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য অথবা ৬ কোটি বাঙালীর ধনপ্রাণ অপেক্ষা তাঁহার বন্ধু মিঃ আমেরীর ভূয়া প্রেষ্টিজেরও দাম বেশী, তাই তাঁহার পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভাতেও আমেরী সাহেবই ভারত-সচিবের পদে বহাল রহিয়াছেন। অন্য এক কারণ বোধ হয় যে ঐরূপ অকর্মণ্য "বাহাত্তুরে"গ্রস্ত লোককে অন্য কোথাও দিলে চার্চ্চিলের দল বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। যে চার্চ্চিল ও আমেরী এই ভাবে দলের নিছক সংখ্যাধিক্যের জোরে নিজের দেশের পার্লামেণ্টের বিরোধীদলসমূহের অতিশয় ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করিলেন তাঁহারাই ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রভাবের পিছনে ফাসিস্ত মনোভাব দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠেন এবং মিঃ জিন্না প্রভৃতির ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি-পরিচালিত বিরোধীদলের দরদে ব্যাকুল হন। যেদিন যে-মুহূর্ত্তে পার্লামেণ্টের বিরোধীদলের অভিমত পদদলিত করিবার কথা তিনি ভাবিতেছিলেন, ঠিক সেই দিন সেই সময়েই মিঃ আমেরী বক্তৃতায় বলিতেছিলেন, "ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যে সকল দলের এবং সর্বপ্রকার লোকের সম্মতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিবে তাহা ভুলিলে চলিবে না।" রাজনৈতিক ভণ্ডামির এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বক্তৃতার সময় আমেরী সাহেব লর্ড লিনলিথগোর গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে দলের কয়েক ব্যক্তি হর্ষধ্বনি করিয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সেমুর কক্স, সিলভারম্যান ও কোব বলিয়া উঠেন, "ইহার নামে হর্ষধ্বনি না করিয়া ইহাকে বিচারের জন্য লর্ড সভার নিকট অভিযুক্ত করা উচিত।" (He should be impeached not cheered.)

ইংলণ্ডে আজ বার্কের ন্যায় মানুষ থাকিলে শুধু লর্ড লিনলিথগো নহে, বাংলায় লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশুর মৃত্যু-মুখে নিক্ষেপের অভিযোগে চার্চ্চিল-আমেরী-লিনলিথগো তিন জনেরই ইমপীচমেণ্টের দাবী উঠিত।

—

কমন্স সভার বিতর্কে চার্চ্চিলের অনুপস্থিতি

কমন্স সভার বিতর্কে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের অনুপস্থিতি এত দৃষ্টিকটু হইয়াছে যে মিঃ জয়াকরের ন্যায় মডারেটও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশটির সম্বন্ধেও যখন কমন্স সভায় আলোচনা উঠে, মিঃ চার্চ্চিলের তাহাতে উপস্থিত থাকিবার সময়ের অভাব হয় না, কিন্তু তাঁহারই ন্যায় একই সাম্রাজ্যের ৪০ কোটি অধিবাসীর ভাগ্য লইয়া যে বিতর্ক হইয়া গেল তিনি তাহাতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। মিঃ জয়াকার তাঁহার বিবৃতিতে ইহাও দেখাইয়াছেন যে বিতর্কে পার্লামেণ্টের ৬০০ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩৫ হইতে ৫৩ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইহার দ্বারা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ৭০০০ মাইল দূরে ৬০০ ব্যক্তির দ্বারা ভারতশাসন সম্ভব এই কাহিনী অতঃপর ভুলিয়া যাইবার দিন আসিয়াছে।

মিঃ জয়াকর কিন্তু ইহার অপর দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। পার্লামেণ্টে বর্তমানে অধিকাংশ সদস্যই চার্চ্চিল ও আমেরীর দলভুক্ত। দলের এই সব নেতার প্রতি কার্য্য সমর্থন করা এবং ভোটের সময় হাত তোলা ছাড়া ইহাদের

আর কোন কাজ নাই—এ সত্য ইঁহারা অবগত আছেন। ভোটের সময় ইঁহাদিগকে হুইপ করিয়া অর্থাৎ ডাকিয়া আনা হইবে ইহা তাঁহারা জানেন। আলোচনার প্রতি আগ্রহ অথবা ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি ইহার কোনটাই ইঁহাদের নাই। সুতরাং বিতর্কে যোগদানের উৎসাহও ইঁহাদের থাকিবার কথা নহে। বিতর্কের দিন সদস্যদের অনুপস্থিতির দ্বারা একনায়কত্বের নিকৃষ্টতম রূপই প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ মনোবৃত্তিই ফ্যাসিষ্ট নীতির জঘন্যতম অংশ।

—

সর্ জর্জ স্থষ্টারের অভিযোগ ও সর্ জন এণ্ডার্স নের উত্তর

কমন্স সভার বিতর্কে সর্ জর্জ স্থষ্টার বলেন,

"স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যথাসময়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই—অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং শুধু ইতস্ততঃতা ভাব করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের আগে যে কোন খাদ্য-সম্মেলনে যে চাউল সম্পর্কে কোন কথা হইয়াছিল হোয়াইট পেপারে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্তমানে অবশ্য অবস্থা আয়ত্তে আনা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুদ্রানীতি, মূল্যনিয়ন্ত্রণ এবং বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তন না করিলে কিছু হইবে না। বর্তমান অবস্থার জন্য কেহ কেহ ভারতের কৃষকদের দোষ দিয়াছেন। বক্তা বলেন যে এবিষয়ে ভারতীয় কৃষকদের মাত্রই দোষ দেওয়া যায় না। অনুরূপ অবস্থায় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কৃষকই ঐরূপ করিয়া থাকে। হোয়াইট পেপারে প্রাদেশিক সরকারের উপর অপরাধ চাপাইবার চেষ্টা হইয়াছে। উহাতে যে কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই কাহিনী শোচনীয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টসমূহ যদি সহযোগিতা না করিয়া থাকে তাহা হইলে ভারত-সরকার আপৎকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন।" ডিসেম্বর মাসে চাউল সম্পর্কে কোন কথা তো হয়ই নাই, জানুয়ারী মাসে মিঃ আমেরী পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে কোন প্রকার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই। সব ঠিক আছে।

বিতর্কের উত্তর এবার ভারত-সচিব দেন নাই, দিয়াছেন সর্ জন এণ্ডার্স ন। 'রেণল্ডস্ নিউজে' ইঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ টম ড্রিবার্গ লিখিয়াছেন, "সার জন এণ্ডার্স নের কথা খুব পরিষ্কার—Lowland Scotদের ন্যায় তাঁহার ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। কৃতিত্বের সহিত পরম গম্ভীর ভাবে বৃহস্পতিবারের বিতর্কের উত্তর দানের সময় সমস্ত দুর্ভিক্ষটাকে তিনি ভগবানের কাজ বলিয়াই প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। সর্ জনের কথা শুনিলে মনে হয় ভগবানকে যেন তিনি ওয়েষ্টকোটের পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছেন। ভগবানের রোষ যাহাদের উপর পড়িয়াছে তাহারা নালিশ জানাইতে পারে না; বুদ্ধিমান্ লোকে পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়ায়, চলিয়া যাওয়ার সময় একটু মায়াকান্নাও কাঁদে।"

সর্ জর্জ স্থষ্টার ভারত-সচিব ও ভারত-সরকারের কার্য্যে সর্বত্র ভুল-ভ্রান্তি ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন, সর্ জন এণ্ডার্স ন তাহার পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন নাই। দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব ভগবানের উপর চাপাইয়া তিনি বিষয়টি এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পার্লামেণ্টে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং বিলাতে ও ভারতের বহু সংবাদপত্রের আলোচনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে বর্তমান দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণরূপ মানুষের সৃষ্টি, সময় থাকিতে সাবধান হইলেই এই বিপদ ঘটিত না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল গবর্ন্মেণ্টের, তাঁহারা নিজ নিজ কর্তব্য যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে পালন করেন নাই। ভারতবর্ষে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের হিসাব রাখিবার বিজ্ঞানসম্মত উপায় আজ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। আধুনিক প্রণালীতে সঠিকভাবে এগ্রিকালচারাল ষ্টাটিষ্টিক্স সংগ্রহের কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বাওলি-রবার্টসন রিপোর্টের পরও ভারত-সরকার বা প্রাদেশিক সরকারেরা অনুভব করেন নাই। ভারতবর্ষে খাদ্যের পরিমাণ হিসাব করা ভয়ানক কঠিন এই সংবাদ পার্লামেণ্টকে জানাইয়াই সর্ জন কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাটা বিতর্কে সকলেই খুব বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ জন এণ্ডার্স ন বা অপর বক্তারা একটু হিসাব করিলেই দেখিতে পাইতেন যে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পৃথিবীর দুই-একটি দেশ ভিন্ন অপর সকল দেশের চেয়ে কম। যে দেশের শতকরা ৭৫ জন লোক দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া কোনরূপে জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে, দুই বেলা আহার যাহাদের জোটে না, ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, কালাজ্বর প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য রোগে যাহারা লাখে লাখে মরিতেছে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যে-দেশে শিশু-মৃত্যুর হার ভয়াবহ, সে-জাতের জনসংখ্যা স্বাভাবিক হারে বাড়িতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বাড়েও নাই, ইহা আমরা দেখাইয়াছি।

সর্ জন এণ্ডার্স ন স্বীকার করিয়াছেন এ দেশে কৃষকের

জমির পরিমাণ কম, সঞ্চয়ের ক্ষমতা তাহার নাই, কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা যদি সে করিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ফ্লাউড কমিশনের হিসাব উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা দূরে থাকুক, সম্বৎসরের খোরাক তুলিবার মত জমিও তাহাদের নাই। জমিদারের খাজনা, মহাজনের দেনা প্রভৃতি মিটাইবার জন্য সম্বৎসরের খোরাক যাহাদের উঠে তাহাদিগকেও উহার একটা মোটা অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। গ্রামের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারা জানেন অর্ধেকেরও বেশী কৃষক তিন মাসের বেশী খোরাক রাখিতে পারে না। দিনমজুরি, নৌকা চালনা, গরুর গাড়ী চালনা প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করিয়া তাহাকে অবশিষ্ট নয় মাসের খোরাক সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রাম্য তাঁত, চরকা, ধানভানা, পিতল-কাঁসার কাজ প্রভৃতি বহু কুটির শিল্প কলের প্রতিযোগিতায় উচ্ছেদ হওয়ায় কৃষকের আয়ের পথ বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং জমিই হইয়াছে তাহার একমাত্র নির্ভর। এই সব দরিদ্র কৃষক ফসল আটকাইয়া রাখিতে পারে না। উন্নত কৃষি প্রবর্তন বা সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া কৃষির আয় বাড়াইবার চেষ্টা বাংলায় হয় নাই। পশ্চিম-বঙ্গে দু-একটি জেলায় সামান্য সেচ-ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে তাহার ফলে ফসল উৎপাদন বাড়ে নাই ফ্লাউড কমিশন ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং বিখ্যাত সেচ-বিশেষজ্ঞ সর্ উইলিয়ম উইলকক্স ঐগুলিকে 'শয়তানের খাল' আখ্যায় ভূষিত করিয়া বলিয়াছেন উহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট হইয়াছে অনেক বেশী। হাজামজা নদীগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া স্বাভাবিক সেচ-ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার কোন আয়োজন ত হয়ই নাই, বরং রেল-লাইন পাতিবার সময় টাকা বাঁচাইবার চেষ্টায় জল নিকাশের স্বাভাবিক পথগুলিকেও বহু স্থানে সঙ্কুচিত করিয়া ভীষণ বন্যার বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

বর্তমান দুর্ভিক্ষের কারণ বহু দূর বিস্তৃত এবং উহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের। সর্ জন এণ্ডার্সন দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব ভগবানের উপর চাপাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের যে অকৃত্রিম সুহৃদকে তুষ্ট রাখিবার জন্য স্বাধীনতার দাবীকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা চাপা দিয়া রাখিতেছেন সেই মিঃ জিন্নাও বলিয়াছেন এ দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ শাসনের দুরপনেয় কলঙ্ক।

—

মহীশূর মিউনিসিপাল নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়

মহীশূর শহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের গত নির্বাচনে কংগ্রেস ২৪টি নির্বাচিত আসনের সবগুলি অধিকার করিয়াছে। কাউন্সিলে মোট সদস্য সংখ্যা ৩০, তন্মধ্যে ৬ জন মনোনীত হন। অবশিষ্ট চব্বিশটির সব কয়টি কেন্দ্রেই কংগ্রেস-সেবকেরা নির্বাচনপ্রার্থী হন, তন্মধ্যে ৫ জন প্রার্থী বিনাবাধায় নির্বাচিত হন; অবশিষ্ট ১৯ জন ভোটে জয়লাভ করেন। সর্ জেমস গ্রীগ প্রভৃতি গোঁড়া রক্ষণশীলেরা বার বার দেখাইতে চাহিয়াছেন এদেশে কংগ্রেসের প্রভাব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং জনসাধারণের অতি নগণ্য অংশই কংগ্রেসের সমর্থক। শুধু ব্রিটিশ ভারতে নয়, দেশীয় রাজ্যেও কংগ্রেসের প্রভাব কি ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, সমগ্র দেশ কেমন করিয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইতেছে, মহীশূরের এই নির্বাচন তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

—

বাংলায় খাদ্য আমদানী

অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের রয়টারের টেলিগ্রামে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

বাণিজ্য ও কৃষিমন্ত্রী (মিঃ উইলিয়াম জোন্স স্কালি) বলিয়াছেন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট জাহাজ সরবরাহ করিলে অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষের অনশনপীড়িত জনসাধারণের জন্য যত গম দরকার সব পাঠাইতে পারে। জাহাজে তুলিবার অপেক্ষায় গম মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে। ব্রিটেন জাহাজ দিবে কি না সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পর্য্যন্ত এখনও পাওয়া যায় নাই। অষ্ট্রেলিয়া প্রস্তুত এবং প্রতীক্ষমান। এখানকার হিসাবে দেখা যায় অষ্ট্রেলিয়াতে ৮ হইতে ১০ কোটি বুশেল (প্রায় ৬ কোটি মণ) গম মজুত রহিয়াছে, কয়েক মাসের মধ্যে নূতন ফসলও উঠিবে। কাজেই জাহাজ পাওয়া গেলে প্রেরণ করিবার যোগ্য গমের অভাব হইবে না।

২০শে অক্টোবর, অর্থাৎ এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার প্রায় এক মাস পরে, লর্ড সভায় বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিতর্কে লর্ড হাণ্টিংডন বলেন,

"ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের দুঃস্থদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, কি ভাবে ক্ষিপ্রতার

সহিত তাহাদিগকে সাহায্য করা যায় তৎসম্পর্কে আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অনেক ভারতের অবস্থা সম্পর্কে নূতন অনেক সংবাদ জানিয়াছেন এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে তাহাও শুনিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া অথবা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আরও খাদ্যশস্য পাঠান যায় কি না এবং সৈন্যদের জন্য মজুত খাদ্যশস্যের মধ্যে কিছু কিছু অ-সামরিক অধিবাসীদিগকে বর্তমানে দেওয়া যায় কি না, তাহা আমি জানিতে চাই। আমি এ কথাও বলিতে চাই যে, বর্তমানে ভারতে খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যুদ্ধের জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন।"

ইহার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত-সরকারের খাদ্যসচিব জানাইয়াছেন যে প্রায় ৩০ হাজার টন, অথবা প্রায় ৮ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য জাহাজে করিয়া আসিয়া পৌছিয়াছে এবং আরও আসিয়াছে। কোন্ কোন্ দেশ হইতে এগুলি আসিয়াছে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি সবগুলি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছে ধরিয়া লইলেও দেখা যায় আড়াই কোটি মণ গমের মধ্যে মাত্র আট লক্ষ মণ আসিয়া পৌছাইতে দেড় মাস লাগিয়াছে এবং পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর হিসাবে এই সময়ের মধ্যে সপ্তাহে পঞ্চাশ হাজার হিসাবে অন্ততঃ তিন লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় জাহাজ পাঠাইবার সাধ্য ভগবানের ছিল না, ভারতবাসীর প্রতি কর্তব্যজ্ঞান থাকিলে ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তৃপক্ষই উহা পারিতেন।

—

আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গত ২৯শে অক্টোবর ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সতীশচন্দ্র যৌবনেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ধর্মনায়কদের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। বিহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন পাটনার রামমোহন সেমিনারী তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু বৎসর তিনি উহার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ১৯২০ সালে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ভবানীপুর ব্রাহ্ম সম্মেলন সমাজের প্রচারকার্য্যের ভার লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ভাষা জ্ঞানের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমানের মূল ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন এবং উহার মূল তত্ত্বগুলি নিরপেক্ষতার সহিত বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইতেন। সকল ধর্ম শ্রেণী ও জাতির লোকের প্রতি তাঁহার সমান সহানুভূতি ছিল। আজীবন তিনি সতেজ ও প্রাণবান্ ধর্মের বাণী প্রচার করিয়াছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত গুণগুলিকে বিকশিত করিয়া তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার শিক্ষাই তিনি তাঁহার দীর্ঘ জীবন ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। নিরুৎসাহের কথা, মানুষের অথবা নিজের দেশের দোষত্রুটিতে হতাশার কথা তাঁহার কাছে কেহ কোন দিন শোনে নাই। তাঁহার সান্নিধ্যে যিনি যখনই আসিয়াছেন, তিনিই প্রাণময়ী উদ্দীপনা লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এই ঋষিকল্প আচার্য্যের তিরোধানে শুধু ব্রাহ্মসমাজ নহে, সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

—

চাউলের মূল্য হ্রাসে কলওয়ালাদের আপত্তি

বাংলা-সরকার চাউলের মূল্য আরও কমাইয়া ১৫।৵০ মিলের দর বাঁধিয়া দেওয়ায় কলওয়ালাদের তরফ হইতে আপত্তি উঠিয়াছে। ইহাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, ধানের দর ৯।০ টাকা বাঁধিয়া দেওয়ায় উপরোক্ত দরে চাউল বিক্রয় করিতে ইহাদের মণকরা এক টাকা মাত্র লাভ থাকিবে এবং উহাতে তাঁহাদের পোষাইবে না। অর্থাৎ ধানের দর আরও কমাইয়া অথবা চাউলের দর বাড়াইয়া দেশবাসীকে আরও কিছু দিন দোহন করিবার পথ প্রশস্ত রাখা হউক। স্বাভাবিক অবস্থায় চাউলের দর যখন চার-পাঁচ টাকা ছিল, তখন কোন কলওয়ালা ধান ভানিয়া মণকরা চারি আনার বেশী অর্জন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বর্তমানে মিলের ব্যয় কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু উহা চারগুণ বাড়ে নাই ইহা নিশ্চিত। চাউলের কল বাংলা দেশে অনিষ্ট ছাড়া কোন উপকার করে নাই। চাউলের কল-প্রতিষ্ঠা জাতীয় শিল্পোন্নতির সহায়ক নহে, কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ নারীকে ধান ভানিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হয় সেখানে উহা ক্ষতিকর। এই সব কলওয়ালার অন্যায় আবদারে কর্ণপাত না করিয়া বাংলা-সরকার ঐগুলি বন্ধ করিয়া দিলেও মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোক ভিন্ন দেশবাসী ক্ষুব্ধ হইবে না, দেশের মঙ্গলই হইবে। বর্তমান জাতীয় দুর্দিনে কাপড়, চাউল, আটা প্রভৃতির কলওয়ালারা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের বড় বড় কল ভাঙিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে জাতীয় ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে কুটীরে কুটীরে ঐ সব দ্রব্য প্রস্তুত করিবার আয়োজন করা কর্তব্য। কারখানায় অল্প লোককে যে কাজ দেওয়া হয়, কৃষিজীবীর কুটীরে বহু জনের মধ্যে

সেই কাজ ছড়াইয়া দেওয়াই বেকার সমস্যার শ্রেষ্ঠ প্রতিকার। —

বাংলা দেশে জীবনযাত্রা

বর্তমান যুদ্ধ বাধিবার পর গত চারি বৎসরে বাংলা দেশে জীবনযাত্রার মান যে ভাবে নামিয়া আসিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা বিরল। কোন অসভ্য দেশের জীবনযাত্রাও আজ বাঙালীর চেয়ে নিম্নস্তরে নামিয়াছে কি না সন্দেহ। জীবনধারণ, খাদ্যসং ভ্রমণ, রেল-যাত্রা, বস্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ, চিঠিপত্র লেখা, (াম করা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় এবং নিত্য ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য বা কার্য্যই বর্তমানে বাঙালীর পক্ষে সহজলভ্য বা অনায়াসসাধ্য নহে। ১৯৩৯-এর পর হইতে সম্মুখে বিপদ দেখিয়া এবং জানিয়াও বাংলার গবর্ন্মেণ্ট দণ্ড দান, জীবন-যাত্রার সকল স্তরে বাধা-নিষেধ প্রয়োগ এবং জীবন দুর্বহ করিয়া তোলা ছাড়া আর কোন কাজই করেন নাই। জনমতের পূর্ণবিকাশের সকল পথ তাঁহারা রুদ্ধ করিয়া ত রাখিয়াছেনই, সেন্সরের কড়াকড়ি অতিক্রম করিয়া জন-মতের যে সামান্য প্রকাশও হইয়াছে তাহাও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। ভারত-সরকারও প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টকে সচেতন করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করিতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্টের সকল স্তরে যে ঘুষ ও দুর্নীতি চলিয়াছে তাহার কিছু কিছু ধরা পড়িতেছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত অনুসন্ধান হইলে উহা যে কত ব্যাপক,সরকারী কর্মচারীদের উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত কি ভাবে কলুষিত হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ভিন্ন এই অসহায় অবস্থা দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ইহা নিঃসন্দেহ। বাংলা দেশে গবর্ন্মেণ্ট চালনের ধারা এক দিন না এক দিন সাম্রাজ্যবাদ এবং দমননীতির ফলে শাসক ও শাসিত উভয়ের মনুষ্যত্ব লোপের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্বরূপে ইতিহাসে উঠিবেই। —

রেল-ভ্রমণ

রেলে-ভ্রমণ কমাইবার জন্য রেল-কর্তৃপক্ষ বার বার বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এদেশে রেলপথের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় এত কম যে স্বাভাবিক অবস্থাতেও তাহা জনসাধারণের বিলাস ভ্রমণের অনুপযুক্ত। ভ্রমণ বাড়াইবার জন্য নানাবিধ কনসেশন দিয়া যাত্রী আহ্বান করিয়াও প্রমোদ-ভ্রমণকারী পাওয়া যে কঠিন হয় রেল-কর্তৃপক্ষ নিজেরাও তাহা জানেন। যুদ্ধের মধ্যে রেল-ভ্রমণ দুর্বহ হইয়াছে, গাড়ীর সংখ্যা কমিয়াছে। ফলে পদে পদে ঘুষ ভিন্ন রেলে চড়িবার উপায় নাই। স্টেশনে পদার্পণ করিয়াই কুলীকে চার আনার স্থলে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইয়াছে। তাহার পর টিকিট কিনিতে ঘুষ, প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিতে ঘুষ, গাড়ীতে উঠিতে ঘুষ, রিজার্ভ করিতে ঘুষ, স্থান সংগ্রহে ঘুষ দিতে হইয়াছে। এখনও দিতে হয়। রেলওয়ের অতি সামান্য কয়েকজন কর্মচারী ভিন্ন উচ্চ নীচ সকল কর্মচারীই ঘুষ লইতে দ্বিধা করেন না। ইহার কিছু কিছু প্রতিকার হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও অতি সামান্য।

এ দেশে রেলওয়ে ভারতবাসীর টাকায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহা বিদেশীর কাজেই অনেক বেশী লাগে। যে কোন শ্বেতাঙ্গের পক্ষে রেল ভ্রমণ বা রিজার্ভ করা অনেক সহজ। ভারতীয় ব্যবসায়ীর পক্ষে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণেও যে অসুবিধা বোধ করিতে হয়, বিলাতী ব্যবসায়ীর পক্ষে বিলাস দ্রব্য প্রেরণেও তাহার একাংশ অসুবিধাও ভোগ করিতে হয় না। অথচ ইহার কোন প্রতিকার নাই।

ছোট ছোট যে-সব ব্রাঞ্চ লাইনের রেল সরানো হইয়াছে সে-সব জায়গার অধিবাসিবৃন্দের পক্ষে কিরূপে দেশে যাইবে বা মালপত্র চালান দিবে তাহার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। রেল স্থাপনের ফলে সে-সব জায়গার স্বাভাবিক পথঘাট নষ্ট হইয়াছে। নৌকা সরাইয়া লইয়া জলপথে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, একমাত্র যে উপায় ছিল তাহাও অপসারিত হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলে যাতায়াত কি ভাবে হইবে কেহই তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার বোধ করেন নাই। ষ্টীমার কমিয়াছে, পেট্রলের অভাবে বাস লরী অচল, নৌকা অপসারিত, তাহার উপর রেল-লাইনগুলি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়া বহু গ্রামকে সমগ্র দেশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। যানবাহনের অসুবিধার এই দিকটির প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত চিঠিপত্র, বক্তৃতাদির রিপোর্ট প্রভৃতি প্রবাসীর কোন পাঠকের নিকট থাকিলে তিনি দয়া করিয়া ঐ সব চিঠি বা বক্তৃতা অথবা উহার নকল প্রবাসী অফিসে প্রেরণ করিলে ভাল হয়। স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী লিখিবার জন্য ঐ গুলি ব্যবহৃত হইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়



১৮৯৯



১৯০৫





পিতৃ-তর্পণ

২৩শে আশ্বিন, ১৩৫০

শ্রীশান্তা দেবী

আমাদের পিতৃদেব বাঁকুড়ার পাঠকপাড়া নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পদ্মগর্ভ নবদ্বীপের এক সম্ভ্রান্ত অধ্যাপকবংশীয় ছিলেন। ইঁহারা নিজেদের পদ্মগর্ভের সন্তান ও চাটাতি নাদ বলিতেন। পিতৃদেবের পিতামহ রামলোচন ভট্টাচার্য্যকে বালকবয়সে বারাকপুরের নিকটস্থ চাণক হইতে বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে পোষ্যপুত্র লইবার জন্য আনা হয়। কিন্তু তেজস্বী বালক তাহাতে সম্মত না হইয়া পাড়ার নিকটে একটি কুঁড়ে ঘর করিয়া তাহাতে কাঁটার দরজা দিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিবার বহু-ভালমন্দ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি টলেন নাই।

পরে রামলোচন স্বচেষ্টায় গণ্যমান্য গৃহস্থ হইয়া উঠেন। ইঁহার পত্নীর নাম কমলাদেবী ছিল। তাঁহাদের চারি পুত্র। হরিনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, শম্ভুনাথ ও শ্রীনাথ। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন টোল করিতেন। কনিষ্ঠ শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় দেহবলে সুবিখ্যাত ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ইনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিজ উপস্থিত বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তিতে মুগ্ধ করিয়া জেলারের কাজ সুরু করেন।

স্বর্গীয় শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তৎপত্নী স্বর্গীয়া হরসুন্দরী দেবীর তিন কন্যা ও দুই পুত্রের জন্মের পর ষষ্ঠ সন্তান আমাদের পিতা রামানন্দ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১৬ই বা ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

বাঁকুড়া হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দূরে বলরামপুর গ্রামে ইঁহাদের মাতুলালয় ছিল। মাতুলবংশে সন্তানাদি না থাকায় মাতুলালয়ে তাঁহাদের খুব আদর ছিল। শৈশবে তাঁহারা সেখানে খুব যাওয়াআসা করিতেন। মাতুলগৃহের গল্প বৃদ্ধবয়সেও তিনি সানন্দে করিতেন। ১৪।১৫ বছর বয়সে বাড়ী হইতে চিঁড়ামুড়ি জাতীয় কিছু খাদ্য লইয়া বার ক্রোশ দূরে মামারবাড়ী হাঁটিয়া যাওয়া তাঁহার একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। দীর্ঘপথ দ্রুত হাঁটিবার ক্ষমতা বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর ছিল। পিতৃদেবের মামীমা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা ছিলেন। আমাদের পিতামহী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সেও তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও সুন্দর মুখশ্রী শিশুদের মুগ্ধ করিত। হরসুন্দরীদেবী আশ্চর্য্য সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি তাঁহার কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি অন্যায় সহিতে পারিতেন না। যে অন্যায় করিয়াছে তাহার সহিত বাক্যালাপও তিনি করিতে পারিতেন না, পাছে কথা বলিতে হয় তাই পিছন ফিরিয়া বসিতেন। তিনি পরিচ্ছন্নতার জন্য খ্যাত ছিলেন।

পিতৃদেবের বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহার সেজ জ্যাঠামহাশয়ের টোলে ৫।৬ বৎসর বয়সে। তার পর তিনি বাঁকুড়ার বাংলা ইস্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে ১০বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪৲ টাকা বৃত্তি ও জিলা ইস্কুলে বিনাবেতনে পড়িবার অধিকার পাইয়া তিনি জেলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন।

এই বিদ্যালয়ে একবার স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ছেলেদের পরীক্ষা করেন। পিতৃদেব তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। রমেশচন্দ্র তাঁহার ইংরেজী বিদ্যায় খুসী হইয়া তাঁহাকে শতকরা ৯৬ নম্বর দেন এবং একটি special prize দেন। ইহাতে স্কুলের শিক্ষক বলেন, "আপনি ছেলেদের বেশী নম্বর দিয়া মাটি করিতেছেন।" রমেশচন্দ্র বলিলেন, "৪ নম্বর ত কাটিয়াছি।" সম্ভবত ১৭ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং ২০৲ টাকা বৃত্তি পান।

শৈশবে পিতৃদেব অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার দিদি গল্প করিতেন যে ভাইকে একটু নড়াইবার চেষ্টায় তিনি বলিতেন, "ও নন্দ, একটু নড়্ না রে?" ভাই এপাশ ওপাশ একটু গামোড়া দিয়া আবার সেইখানেই চুপ করিয়া বসিতেন। তিনি পিতার প্রিয় পুত্র ছিলেন। অন্য ভাইরা সকলেই পিতাকে ভয় করিতেন। কোনো প্রয়োজনে তাঁহার নিকট টাকাপয়সা চাহিতে হইলে মাতা যখন আর কাহাকেও পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন তখন পাঠাইয়া দিতেন তৃতীয় পুত্রকে। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার পিতা হাসিয়া কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং দরকারমত টাকাপয়সা দিয়া দিতেন।

জিলাস্কুলে পড়িবার সময় হইতেই পিতৃদেব প্রায় স্বাবলম্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রবৃত্তির জলপানি ছাড়া পড়ার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের স্বল্প সাহায্য মাঝে মাঝে পাইতেন।

জিলাস্কুলের গণিতশিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় কেদারনাথ

কুলভি। কুলভি মহাশয় তাঁহার এই ছাত্রটিকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি সেকালের সাধারণব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। গুরুর সাহায্যে শিষ্যের মনের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব পড়ে। পিতৃদেব তাই বলিতেন।

প্রথম যৌবনে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সংস্পর্শেও তিনি আসেন। পিতৃদেব ইঁহার লিখিত পত্রগুলি বৃদ্ধ বয়সেও অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "রাজনারায়ণ বাবু আমাকে Sir Ramananda বলিতেন। বহুকাল পরে লেজনী সাহেব আমাকে প্রাগ হইতে Sir Ramananda বলিয়া চিঠি লেখেন।"

তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার আগের বৎসর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিবার সময় বৃত্তির ২০৲ টাকা তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। ইহার সাহায্যেই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের খরচ চালাইতে হইত। তাঁহার নিজের ধারণা ছিল যে অঙ্কশাস্ত্র তিনি ভাল জানিতেন না। এই কারণে F. Aতে তিনি অঙ্কশাস্ত্র উৎসাহ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাল করিয়া শিখিবার জন্য। সম্ভবতঃ বুথ সাহেব তখন অঙ্কশাস্ত্র পড়াইতেন। কর্ম্ম-জীবনে Statisticsএর প্রতি পিতৃদেবের ঝোঁক খুব ছিল। আধুনিক School of Tropical Medicine-এর কাছে শোভারাম বসাকের লেনে একটি মেসে বাঁকুড়ার কয়েকটি ছেলের সঙ্গে তিনি প্রথম বাসা করেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এই মেসে ছিলেন। তখনকার দিনে ঝি ও রাঁধুনী-বামুনের আংশিক বেতন এবং নিজের দুইবেলার খাওয়া দশ টাকাতেই চলিয়া যাইত। তাঁহার ছাত্রজীবনের সরঞ্জাম অতি সামান্যই ছিল। তাঁহার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বন্ধুরা তাঁহাকে খুব বাবু মনে করিয়া একবার বাক্স খুলিয়া দেখেন বাক্সে মাত্র একখানি বাড়্তি কাপড় আছে। বাল্যকাল হইতেই অন্তরে ও বাহিরে শুচিতার জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। অথচ কাপড়ের অভাবে তিনি কোরা কাপড় কিনিয়া ধোপার বাড়ী দিবার আগেই তাহা পরিয়া কলেজে যাইতেন। আজকালকার ছেলেদের মত রাত্রে আলো জ্বালাইয়া পড়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। দিনের বেলাতেই তাঁহার অধিকাংশ পড়া হইয়া যাইত। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী হইলেও রাত্রে নিয়মিত সময় শয্যাগ্রহণ করার অভ্যাস তাঁহার আজীবন ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন আইন-কানুন খুব কড়া ছিল। একবার জ্বরের জন্য পিতৃদেবের কয়েক দিন কলেজ কামাই হয়। তাহাতে ২০৲ টাকা বৃত্তির ১৩৲ টাকাই কাটা গেল। কিন্তু ঐ টাকার উপরেই পড়া নির্ভর করে বলিয়া তিনি বড়ই অসুবিধায় পড়িলেন। অগত্যা কলেজ ছাড়িতে হইল। সেণ্ট্‌ জেভিয়ার্স কলেজের বেতন কিছু কম ছিল। তাছাড়া পিতৃদেবকে বৃদ্ধ পাদ্রী (Father) ৪৲ টাকা বেতনেই ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। এই কলেজে বাকি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে দ্বিতীয়-ভাষারূপে ল্যাটিন শিখিয়া পরীক্ষা দিতে হইল।

সম্ভবত ১৮৮৫তে এখান হইতে এফ, এ, পাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার চতুর্থ হইয়া তিনি ২৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। বি, এ, পড়িবার জন্য আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। বি, এ, পরীক্ষার সময় একদিন কি কারণে মনে হইল ভাল লিখিতে পারেন নাই, তাই বিজ্ঞানের একটা পরীক্ষা না দিয়াই পরীক্ষা শেষ করিলেন। কাজেই সে বছর গেজেটে তাঁহার নাম উঠিল না। কিন্তু তিনি সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে প্রথম হইয়াছিলেন। ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার সতীর্থ ছিলেন শুনিয়াছি।

পরের বার সিটি কলেজ হইতে বি, এ, পাস করিয়া ইংরেজী অনার্সে পিতৃদেব প্রথম হন। মোটের উপরও প্রথম হইয়াছিলেন। সিটি কলেজে তখনও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। ইনি পিতৃদেবের একজন গুরু। ইঁহার প্রতি তাঁহার গুরুভক্তি চিরদিন ছিল।

বি, এ-তে প্রথম হওয়াতে States Scholarship পাইয়া পিতৃদেবের বিলাত যাইবার কথা হয়। কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেন। আলিপুর জেলে তাঁহার দাদা জেলার ছিলেন। দাদার পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়াই পিতৃদেব স্কলারশিপ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তিনি সেই বয়সেই ঠিক করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিবেন না। যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহাকে এই স্কলারশিপ দিতে চাওয়াতে তিনিও প্রত্যাখ্যান করেন। তখন আজিজ নামক একজন মুসলমান ছাত্রকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

বহু বৎসর পরে বেহারের কোনও শহরে গিয়া পিতৃদেব শোনেন যে সেখানকার বড় এক রাজকর্ম্মচারীর নাম আজিজ্। ইনি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, "If you are the same old Aziz, then accept my greetings, if not excuse me"। জবাব আসিল, "I am the good old Aziz. Come and see me."

২১ বৎসর বয়সে অগ্রহায়ণ মাসে বাঁকুড়া জেলার ওঁদাগ্রাম নিবাসী ও ধলভূম রাজষ্টেটের মোক্তার স্বর্গীয় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা

মনোরমা দেবীর সহিত প্রাচীন হিন্দুমতে তাঁহার বিবাহ হয়। মার বয়স তখন ১২২ বৎসর। পিতৃদেব কিছুদিন তাঁহাকে নিজে লেখাপড়া শিখাইতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ছাতের সিঁড়ির শেষ ধাপে ছাদের দরজার সম্মুখে টেবিল চেয়ার রেখে আমি তোমাদের মাকে কিছু পড়াতাম। ২।১ খানা বাংলা বহির অর্থপুস্তকও আমি তাঁর জন্য খাতায় লিখে দিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু বলেছিলেন এরকম অর্থপুস্তক নূতন, মুদ্রিত অর্থপুস্তকগুলার থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট।"

ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি সেকালে ছাত্রদের জন্য ছাত্রসমাজ স্থাপন করেন। ইহা বহু ছাত্রের ধর্ম্মজীবন ও নৈতিক চরিত্রগঠনে সাহায্য করে। সম্ভবত এইখানেই শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতিকে পিতৃদেব প্রথম দেখেন। ছাত্রসমাজে যাওয়া-আসা করিলেও তিনি নিজে কাহারও সহিত আলাপাদি করিতে যাইতেন না। স্বয়ং আগাইয়া মানুষের সহিত ব্যক্তিগতভাবে খুব মেলামেশা তিনি কোনোদিনই বেশী করিতেন না। তবে শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি খুব ভক্তি করিতেন এবং ভালবাসিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন ইঁহাদের উভয়ের যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের History of the Brahmo Samaj প্রভৃতি মূল্যবান্ বই এবং আত্মজীবনীর মত সরস সুন্দর জীবনী পিতৃদেবের উদ্যোগে সর্ব্বপ্রথম তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হয়। আশ্চর্য্য যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুদিন ৩০শে সেপ্টেম্বরেই বাবার মৃত্যু হয়।

পুরাকালে ছাত্ররা যে কলেজ হইতে বি, এ পাস করিত এম্, এ পরীক্ষাও সেই কলেজের নামেই দিত। সিটি কলেজ হইতে বি,এ, পাস করিবার পরেই কর্ত্তৃপক্ষ পিতৃদেবকে সেই কলেজেই অধ্যাপনা করিতে বলিলেন। এই সময়েই এম-এ পরীক্ষা দিয়া তিনি সিটি কলেজের এম-এ হন। শোনা যায় তাঁহার যে-সব সহপাঠী বি-এ পাস করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহপাঠীর শিষ্যত্ব গ্রহণের লজ্জায় সিটি কলেজ ছাড়িয়া অন্য কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন! "শেষকালে তোর কাছে পড়তে হবে!" বলিয়া একজন বিদায় লন। পিতৃদেব ১৮৮৯ হইতে ১৮৯০ পর্য্যন্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়ের সহকারীরূপে সম্ভবত বিনা বেতনে ইংরেজীর অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাস হইতে তাঁহার ১০০৲ টাকা বেতন হয়। তিনি এখানে ও।।পরে কায়স্থকলেজে প্রয়োজন মত যে কোন বিষয়ই পড়াইতেন।

সেকালে এম-এ কলেজ থাকুক বা নাই থাকুক বি-এ পড়াইতেন বহু বিখ্যাত পণ্ডিত। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন বি-এতে সংস্কৃতজ্ঞ টনি সাহেব ইংরাজি, ইলিয়ট সাহেব ফিজিক্স ও পেডলার সাহেব কেমিষ্ট্রি পড়াইতেন। আচার্য্য জগদীশও তখন প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই পিতৃদেবের গুরু। আচার্য্য জগদীশকে পিতা শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজ পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

ছাত্রাবস্থা হইতেই সাময়িকপত্র-চালনায় পিতার উৎসাহ ছিল। বহুকাল আগে অধরচন্দ্র বসু নামক এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক 'ধর্ম্মবন্ধু' পত্র প্রকাশ করেন। ইঁহার নিজেরই মুদ্রাযন্ত্র ছিল মণিকা প্রেস। পিতৃদেব যখন বি-এ পাস করেন নাই, তখনই এই কাগজের কাজ করিতেন। পরে তিনিই ইহার সম্পাদক হন। তৎপূর্ব্বেই Brahmo Public Opinion, Indian Messenger ও তত্ত্বকৌমুদী প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় কুলি-আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

এখন কলিকাতায় যে আতুরাশ্রম আছে, ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল প্রায় ৫৫ বৎসর আগে। কয়েকটি ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও তাঁহাদের পত্নীরা নিজেরা পথের ধার হইতে রুগ্ন মরণাপন্ন লোকদের কুড়াইয়া আনিয়া একটি গৃহে আশ্রয় দিতেন এবং নিজেরাই তাহাদের সেবা করিতেন। প্রথম কার্য্য আরম্ভ করেন মৃগাঙ্কধর রায়, তাঁহার পত্নী কমল দেবী, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, তাঁহার পত্নী প্রভাবতী দেবী ও উকিল শরৎচন্দ্র রায়। এই আশ্রমটির নাম ছিল দাসাশ্রম। পরে ইহাতে সস্ত্রীক ইন্দুভূষণ রায় প্রভৃতি যোগ দেন। এই দাসাশ্রমের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন পিতৃদেব। প্রথম প্রথম ভিক্ষালব্ধ অর্থেই ইহার ব্যয় চলিত। ক্রমে একটি চিকিৎসালয় হইল, তাহার আয় ইহারই কাজে লাগিত। তাহার পর হইল "দাসী" মাসিক পত্রিকা। ইহার গ্রাহক সেকালের বাংলা বেহার আসাম ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ৪০০০ ছিল শোনা যাইতেছে। পিতৃদেব ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই কাগজটি বাহির করেন। ইহার সমস্ত আয় সম্পাদক দাসাশ্রমে দিতেন। দাসীতে অনেক সময় গল্প কবিতা প্রবন্ধ সমস্তই সম্পাদককে একহাতে লিখিতে হইত। এই সময় তিনিই প্রথম বাংলা দেশে অন্ধদের জন্য বাংলা ব্রেল অক্ষর উদ্ভাবন করেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি দাসীর লেখক ছিলেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে ভীষণ প্লেগ দেখিতাম। মনে পড়ে তখন আমাদের শহরতলীর বাসা হইতে ৺ইন্দু-

ভূষণ রায়, পিতৃদেব ও তাঁহার অন্যান্য বন্ধুগণ সকালে উঠিয়া প্লেগ-রুগীদের সেবা করিতে যাইতেন। ফিরিয়া ফটকের কাছে জুতা জামা বদলাইয়া বাড়ী ঢুকিতেন।

প্রায় ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯০ খৃঃ পূজার ছুটির পর) ইনি কলিকাতায় সস্ত্রীক বসবাস আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার পুত্রকন্যাদের জন্ম হয় নাই। এই সময় হইতেই ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় পিতৃদেবের বন্ধু ছিলেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ও অনুরাগী হন। এই সময় সর্ব্বদা মা ও বাবা সমাজমন্দিরে যাইতেন এবং ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে একগৃহে একপরিবারের মত বসবাস করিতেন। সম্ভবত ১৮৮৯এর শেষে পিতৃদেব উপবীত ত্যাগ করেন ও আমাদের মা ইহার অনুমোদন করেন। আমাদের পিতামহী ইহাতে বাবাকে বিশেষ কিছু বলেন নাই।

পিতৃদেব ২০।২১ বৎসর বয়স হইতেই নিরামিষ খাইতেন। ইহাতে তাঁহার মাতার মনে বেদনা ছিল, তা ছাড়া তিনি মনে করিতেন সন্তানের শরীর নষ্ট হইবে। তাই অনেক সময় ঝোলের বাটি হইতে মাছ তুলিয়া লইয়া ঝোলটা নিরামিষ বলিয়া পুত্রকে খাইতে দিতেন।

অনেক কাল আগে সখা ও সাথী নামক শিশুপাঠ্য একটি পত্রিকা ছিল। তাহা উঠিয়া যাইবার পর এইরূপ কাগজের অভাব ঘটে। তখন শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও পিতৃদেব 'মুকুল' নাম দিয়া একটি শিশুপাঠ্য পত্রিকা প্রকাশ করিবার আয়োজন করেন। তাঁহারা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়া সম্পাদক করেন। চারিজনেই এই কাগজটিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কাগজটি সচিত্র ছিল। তখন ছবি সবই কাঠের ব্লকে ছাপা হইত এবং এক রঙাই ছিল। মুকুলে একটি কবিতায় রঙীন ছবি দিবার জন্য ইঁহারা পোটো ডাকিয়া কাঠের ব্লকে ছাপা প্রতি কপি ছবি আলাদা করিয়া হাতে রং দেওয়াইয়া ছিলেন।

এই সময়েই পিতা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক পত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

বহুপূর্ব্বে কলিকাতায় টিভোলি গার্ডেনসে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় স্যর ফেরোজ শা মেটার সভাপতিত্বে। তখন পিতৃদেব সস্ত্রীক কংগ্রেসের ডেলিগেট হন। পরে দাদাভাই নৌরজী, লোকমান্য তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে তাঁহার যোগ বহু দিন ছিল। তার পর হইতে ১৭।১৮ বৎসরের মধ্যে বহুবার তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। কাশী কংগ্রেসে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্ত্রীপুত্র কন্যা সকলকে লইয়া যান। বহু বৎসর রাজনৈতিক বিশেষ কোনও দলের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন না। তিনি পরিহাস করিয়া বলিতেন, "তোমাদের পিতা বিশ্ব-সমালোচক।" কিন্তু যে কোনও দলের যাহা কিছু ন্যায় ও সত্যসঙ্গত দাবী তাহার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন।

এলাহাবাদে কায়স্থপাঠশালা হিন্দুস্থানী লালাদের কলেজ। এই কলেজে প্রিন্সিপালের কাজ লইয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তাঁহাকে সপরিবারে এলাহাবাদে যাইতে হয়। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব বলেন, "কায়স্থ কলেজের শিক্ষার ভিত্তি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় সুদৃঢ় হয় ও উহা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। স্বদেশপ্রেম, দেশসেবা ও সুনীতির যে উচ্চ আদর্শ তিনি তাঁহার ছাত্রদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কেবল উহারা বা তাঁহার সহকর্ম্মীরাই নহে, অধিকন্তু যুক্তপ্রদেশের অধিবাসীরাও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।" এই কলেজে ১০।১১ বৎসর তিনি কাজ করিয়াছিলেন। পরে কমিটির সহিত বনিবনাও না হওয়াতে ১৯০৬ (?) খৃষ্টাব্দে চাকরী ছাড়িয়া দেন। চাকরী ছাড়িবার সময় তাঁহার পাঁচটি পুত্রকন্যার বাল্যাবস্থা। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনও কেহ কেহ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। অথচ তাঁহার কোনো স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি ছিল না। ব্যয় ছিল সবই, আয় ছিল না প্রায় কিছুই। সচিত্র বর্ণপরিচয় প্রভৃতি হইতে কিছু সামান্য আয় ছিল। তথাপি এলাহাবাদের চাকরী ছাড়িবার পর তিনি আর কোনো চাকরী গ্রহণ করেন নাই। যদিও এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস, লাহোরের লালা লাজপত রায় এবং কলিকাতার সিটি ও রিপন কলেজ প্রভৃতি তাঁহাকে চাকরী দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ফেলো হইয়াছিলেন। তিনি United Provincesএর Secondary Education Reform Committeeতে কাজ করিবার জন্য স্যর এ্যান্টনী মাকডোনাল্ড কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বহুদিন সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শিক্ষা-পরিষদ মহলে তাঁহার নাম ছিল "A terrible fighter"।

১৮৯৭ সালে 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পিতৃদেব ইহার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসর তাঁহার সম্পাদনায় থাকিবার পর ইহা যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাসের হাতে। প্রথম যুগের প্রদীপে ছবি বিশেষ থাকিত না। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রদীপে লিখিতেন।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে," প্রদীপে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রদীপে পিতা প্রথম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ও আনন্দমোহন বসুর সচিত্র জীবনী লেখেন। ইতিপূর্ব্বে কেহ লেখেন নাই। তখনকার দিনে বাংলা দেশে জীবিত খ্যাতনামা লোকদের কোনও জীবনী লেখা হইত না। পিতৃদেব এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ১৩০৪ সালের মাঘের প্রদীপে তিনি আচার্য্য জগদীশ বসু সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। ইহা ১৩৩৯ সালে প্রবাসীতে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

প্রদীপ যে আদর্শ লইয়া সুরু হইয়াছিল পরে প্রবাসীতে সেই আদর্শ আরও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়। তাছাড়া প্রবাসীর কতকগুলি নিজস্ব বিশেষত্ব লইয়াই সে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম বৎসরের প্রবাসী প্রকাশের সময় তাঁহার পত্নী ও শিশু পুত্রকন্যারা প্রবাসীর মোড়ক বাঁধা, আঠা লাগানো এবং টিকিট লাগানোর কাজ করিতেন। আশুতোষ চক্রবর্ত্তী নামক একজন ভদ্রলোককে প্রথম কর্ম্মচারী রাখা হয় কিছুদিন পরে।

এলাহাবাদে বাসকালে তিনি সেই প্রদেশের কয়েকটি সদনুষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মাদকতার বিরুদ্ধে দেশে তখন সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। ঐ প্রদেশের যে Provincial Temperence Association ছিল পিতৃদেব তাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইঁহাদের Abkari নামে একটি ইংরেজী কাগজ ছিল। এলাহাবাদ অনাথাশ্রমের সেক্রেটরীও ইনি ছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ওংদেদার এই কাজ গ্রহণ করেন। এই সময় Advocate কাগজে পিতার অনেক বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পিতৃদেব স্থায়ীভাবে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার বহু পরে ৺মোতীলাল নেহরু মহাশয় তাঁহাকে Independent পত্রের সম্পাদকরূপে এলাহাবাদে ফিরাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করেন। সম্পাদকের বেতন স্থির করিবার ভার তিনি তাঁহাকেই দিয়া লেখেন, "Name your own salary."

এলাহাবাদে বহু বাঙালীর বাস। ইঁহাদের মধ্যে যোগরক্ষার জন্য ও নানাভাবে ইঁহাদের বাঙালীত্ব বজায় রাখিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী প্রবাসী-বাঙালী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পিতৃদেব তাহার মধ্যে প্রধান ছিলেন। বৎসরে একবার ইহাদের খুব ঘটা করিয়া উৎসব হইত। সেখানে লাঠিখেলা, ছুরি খেলা, tent pegging, প্রভৃতি বহু খেলা। হইত, কলিকাতা হইতে ফনোগ্রাফ আনাইয়া রবীন্দ্রনাথের "ভুবনমনমোহিনী", "যদি তোর ডাক শুনে কেউ" প্রভৃতি গান, "বন্দেমাতরম্" গান ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান প্রভৃতি শুনাইবার ব্যবস্থা পিতৃদেব করিতেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "সুপ্রভাত" নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিতেন। পিতৃদেব নগেন্দ্রবাবুর প্রয়াগের সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁহার দু-একটি "সংবাদচিঠি" পড়িয়া নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন, "আপনার জর্ণালিষ্টিক ইন্সটিঙ্কট্ আছে।"

পিতৃদেব ও আমাদের মাতা তাঁহাদের আতিথ্যধর্ম্মের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। এলাহাবাদে তাঁহাদের বাড়ীতে বারমাসই অতিথির আসা-যাওয়া লাগিয়া থাকিত। তাহার মধ্যে মান্দ্রাজী, মরাঠী, মালয়ালী, হিন্দুস্থানী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, ধনী, নির্ধন, গৃহী, সন্ন্যাসীর কোনও ভেদাভেদ ছিল না। মাঘমেলার সময় বহু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু আমাদের বাড়ীতেই গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে অতিথি হইতেন। অনেক মানুষ অতিথি হইয়া আসিয়া তাঁহার অল্পস্বল্প ক্ষতি করিয়াও গিয়াছেন। তবু অপরিচিতকেও তিনি আশ্রয় দিতেন।

প্রবাসে প্রবাসীর দ্বারা পরিচালিত বলিয়া তাঁহার মাসিক পত্রটির নাম প্রবাসী হয়। ইহা বাংলা ১৩০৮ সালে প্রথম এলাহাবাদের সাউথ রোড হইতে প্রকাশিত। এলাহাবাদের ৺চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের ইণ্ডিয়ান প্রেসে প্রথম 'প্রবাসী' ছাপা হয়। প্রবাসী বাঙালীদের জীবনী, তাঁহাদের নানাবিষয়ক কার্য্যকলাপ, প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য, প্রবাসীদের স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি 'প্রবাসী'র একটা অঙ্গ ছিল। প্রথম দিকে 'প্রবাসী'তে প্রবাসী বাঙালীদের কথা অনেক থাকিত। পরে 'প্রবাসী'র ব্যাপক অর্থ হওয়াতে সমগ্র দেশবাসীই প্রবাসী পর্য্যায়ের মধ্যে পড়িলেন। তখন প্রবাসীর "মটো" হইল "নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে ইত্যাদি।" রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল।"

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'প্রবাসী' কবিতা :—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া" প্রকাশিত হয়।

তখন প্রবাসীর লেখকেরা অনেকেই ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, অবিনাশচন্দ্র দাস, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সর্ব্বপ্রথমযুগের লেখক। সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ইত্যাদিও তখন হইতে লিখিতেন। প্রবাসীর

বৈষয়িক দিকে আমাদের মাতৃদেবী বহু বৎসর পিতার সাহায্য করিয়াছেন।

প্রবাসীসম্পাদক ভারতে ভারতীয় শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় তিনিই অজণ্টাগুহা-চিত্রাবলী বিষয়ে প্রথম বাংলা প্রবন্ধ লেখেন। এ বিষয়ে বাংলার কোনো সাময়িকে কি পুস্তকে ইতিপূর্ব্বে কোনো চিত্র কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। তখন স্তর অতুল চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন "ইহার মতন প্রবন্ধ বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব।" দেশে ভারতীয় চিত্রপ্রথার প্রচলন লইয়া আন্দোলনও বিশেষ ব্যাপক ভাবে সুরু হয় নাই। চিত্রকরদের মধ্যে অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্যেই তখন উহা ব্যক্তিগতভাবে আবদ্ধ।

ভারতবর্ষের ও বাংলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা ছিল প্রবাসী-সম্পাদকের জীবন-ব্রত। সমস্ত পৃথিবীর সব মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতেই তিনি বিশ্বাস করিতেন। আজীবন এই বিষয়ে রাজর্ষি রামমোহন তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিলেন। তিনি শুধু রাজনীতি, শুধু সমাজসংস্কার, কি শুধু ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন না। মানুষকে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতেন না, সমগ্ররূপে দেখিতেন। সামান্য বানানভুল হইতে বিরাট্ সাম্রাজ্যের ও ধর্ম্মের উত্থানপতন সকল দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রবাসীতে প্রথম হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য দিনে দিনে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

এলাহাবাদে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহাদুর সাপ্রু, সচ্চিদানন্দ সিংহ, সি, ওয়াই, চিন্তামণি, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি। এলাহাবাদে প্রবাসী-সম্পাদকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মেজর শ্রীবামনদাস বসু। ৺শ্রীশচন্দ্র বসু পিতাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন। মেজর বসুর সহিত পরিচয় হইবার পর ইনি প্রবাসীতে বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেন। এই সকল প্রবন্ধে নানা ভাবে ও নানা দিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব প্রদর্শিত হয়। এই দুই বন্ধুর তিনটি ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল। দুইজনেই দেশগতপ্রাণ, একান্ত সত্যনিষ্ঠ এবং দুইজনেরই জীবনে কোনো আড়ম্বর ছিল না। আরও বহুক্ষেত্রে ইঁহাদের সাদৃশ্য ছিল। বসু-ভ্রাতাদের পাণিনি আপিস হইতে প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর দীর্ঘ ভূমিকা পিতৃদেব লিখিয়াছিলেন। বামনদাস বাবুর ঐতিহাসিক প্রায় সমস্ত পুস্তক প্রবাসী-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকগুলির সাহায্যে ভারতের ইতিহাস, তাহার গৌরব, তাহার অধঃপতন, তাহার শত্রুমিত্র উভয় দিক খাঁটি ও নূতন দৃষ্টিতে দেখিবার সাহায্য হয়। তখন প্রবাসীর পুস্তকপ্রকাশ-বিভাগ বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যই এই জাতীয় পুস্তকগুলি প্রকাশে তাঁহার আগ্রহ হয়। তাঁহার অন্যতম বন্ধু লালা লজপৎ রায়ের দুইখানি পুস্তক ও স্যাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেবের India in Bondage প্রভৃতি সম্পাদক মহাশয় এই সব কারণেই প্রকাশ করেন। India in Bondage-এর জন্য পিতৃদেবকে রাজদণ্ড পাইতে হয়।

প্রবাসীতেই প্রথম শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য নন্দলাল বসু প্রমুখ চিত্রকরের চিত্র প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কোনো সাময়িক পত্রে এই সকল চিত্র প্রকাশিত হইত না। চিত্রিত মানুষদের লম্বা হাত পা, ক্ষীণ কটি, লতানো আঙুল ইত্যাদি তখন অত্যন্ত হাসির জিনিষ ছিল। প্রবাসীতে বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী, সুজাতা ও বুদ্ধ, বিরহী যক্ষ, দীপান্বিতা ইত্যাদি দেখিয়া নানা জায়গায় মজলিসে হাসিতামাশা হইত, কাগজেও বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিত। তথাপি আজ পর্য্যন্ত প্রবাসী ভারতীয়-চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। প্রথমে একরঙা, পরে দুরঙা ও(১৩০৯ সালে) তিনরঙা ছবি প্রবাসীতেই বাহির হয়। যাঁহারা আগে হাসির খোরাক যোগাইতেন এখন প্রবাসীর কল্যাণে তাঁহাদের ছবি লোকে সাধিয়া পয়সা দিয়া আনিয়া ছাপাইতেছে। বাংলা দেশের লোক আজ দেশীয় চিত্রপদ্ধতির মর্য্যাদা কিছু বুঝিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের অনেক চিত্রের পরিচয় পুরাকালে M. Reviewএ ভগিনী নিবেদিতা লিখিতেন। ভগিনী নিবেদিতা পিতৃদেবের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার ইংরেজী রচনা তিনি পিতৃদেবকে ছাড়া আর কাহাকেও কখনও সংশোধন করিতে দিতেন না। মৃত্যুকালে পিতৃদেবকে তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দার্জ্জিলিং যাওয়ায় সময় ছিল না বলিয়া পিতা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

সকল দিক দিয়া স্বদেশের কল্যাণকামনা করিতেন বলিয়া পিতৃদেব নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর স্বদেশী ব্রতধারী ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বোধ হয় তিনি কখনও বিদেশী বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন নাই। আহমদাবাদ মিলের থান ধুতি ও দিশী টুইলের সাদা জামা ছিল তাঁহার পুরাকালের পোষাক। যত দিন কলেজে কাজ করিয়াছিলেন আসামের এণ্ডি ও মুগার গলাবন্ধ সুট ও হিন্দুস্থানী টুপি তাঁহার কলেজের

পোষাক ছিল। শীতকালে কলেজে লাহোরের পট্টুর পোষাক এবং বাড়ীতে ধুষা, মলিদা, ইত্যাদিতেই তাঁহার কাজ চলিত। বিছানা, বালিশ, মশারী, জুতা, মোজা এবং সংসারের আরও অনেক জিনিষই তাঁহার গৃহে বরাবর স্বদেশী ব্যবহৃত হইত। বাল্যকালে তাঁহার পুত্র-কন্যারাও কখনও বিদেশী বস্ত্রাদি পরে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীজীর মিলবস্ত্রের বিরুদ্ধতা ও সকলের চরকাগ্রহণ ইত্যাদি নীতির অনেক সমালোচনা পিতৃদেব করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজে সেই সময় হইতে খদ্দর ভিন্ন অন্য বস্ত্রের ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কেবল ইউরোপ যাইবার সময় একবার ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। লাহোর কংগ্রেসের সময় তিনি খদ্দরের কাপড়ের ভিতর তুলা দিয়া হিন্দুস্থানী প্রথায় শীতবস্ত্র করাইয়াছিলেন। সে পোষাক বিলাতী পোষাকের চেয়ে দেখিতে সুন্দর লাগিত। ইউরোপীয় পোষাক না পরিয়া বড়লাটের প্রাসাদে যাওয়া বারণ ছিল, কতকটা এই কারণে নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি কখনও বড়লাটের প্রাসাদে যান নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার এই স্বদেশী ব্রত আরও গভীর শিকড় মেলিল।

কিছুদিন তিনি Hindusthan Reviewতে নিজের নাম না দিয়া শিক্ষা-বিষয়ক নোট লিখিতেন। এই নোটগুলি পড়িয়া 'হিন্দু'র প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জী সুব্রমণি আইয়ার নোটগুলির অজ্ঞাতনামা লেখককে কথাপ্রসঙ্গে 'বড় সার্টিফিকেট' দিয়াছিলেন পিতৃদেব বলিয়াছিলেন।

ইহারই অল্পদিন পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে Modern Review প্রকাশিত হয়। বাংলার বাহিরে ও ভারতের বাহিরে নিজের বক্তব্য শুনাইতে হইলে ইংরেজির সাহায্য প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের দেশের হর্ত্তাকর্ত্তাদের সহিত বাংলাভাষায় লড়াই ত বেশী কার্য্যকরী নয়। মডার্ণ রিভিয়ুতে লড়াই ভাল করিয়াই সুরু হইল। ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন পাইবার পথে যত রকম সাময়িক সাতকেলে বিরুদ্ধযুক্তি আছে মডার্ণ রিভিয়ুর নোটসে বছরের পর বছর ধরিয়া তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। সেই সমস্ত নোটস পরে Towards Home Rule নামক কয়েক খণ্ড পুস্তক হইয়া প্রকাশিত হয়। পিতৃদেব কলিকাতা আসিবার পর তাঁহার পিছনে গোয়েন্দা অনুচরের অভাব একদিনও হয় নাই। কতবার তাঁহার গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা হইয়াছে। উপর হইতে কড়া গর্জ্জন আসিয়াছে; কত চিঠি-পত্র মাঝপথে খোলা অথবা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। এক এক সময় তাঁহার প্রত্যেক চিঠিই খোলা হইয়াছে বলিয়া বোঝা যাইত। ছাত্র ও বন্ধুরূপী গোয়েন্দা কত সময় তাঁহার পিছনে ঘুরিত। বাড়ীর কাছে ঘর ভাড়া লইয়া গোয়েন্দার বাসও সুরু হইল।

মডার্ণ রিভিয়ু প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পূর্ব্বে পিতৃদেব কলেজের কাজে ইস্তফা দেন। কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই হিন্দুস্থানী, তবু তাহারা এই স্বল্পভাষী, নিরাড়ম্বর বাঙালী অধ্যাপককে বিদায় দিতে আসিয়া ফিরিতে চাহে নাই। অপরাহ্ণের বিদায়-উৎসব রাত্রেও শেষ হয় না। নূতন ও পুরাতন সমস্ত ছাত্রের দল সভা ভাঙিয়া অধ্যাপকের গাড়ী নিজেরা টানিতে টানিতে তাঁহার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তাহার পর এক এক জন করিয়া পায়ে মাথা দিয়া দুই হাঁটু জড়াইয়া ধরে আর উঠিতে চায় না। সে দৃশ্য দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা শক্ত। এলাহাবাদে চাকরীর জন্যই তিনি গিয়াছিলেন, কিন্তু কতকটা রাজনৈতিক কারণে পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসা স্থির হইল।

কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশের গলিতে তিনি এবার বাসা লন। এই বাসাতে বাল্যকালে রবীন্দ্র-নাথকে পিতার শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে কত বার আমরা পাইয়াছি। এই শীর্ণ গলির কথা ইউরোপেও তাঁহার মনে পড়িত বলিয়া তিনি এক বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন। এই গৃহে ভগিনী নিবেদিতা, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, সি. এফ্. এণ্ড্রুজ, মিঃ পোলক, সেণ্ট নেহাল সিং, নারায়ণ চন্দ্রভারকর, প্রভৃতিকে আমরা বাল্যকালে দেখি। এইখানে আসিবার কিছুকাল পরে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার প্রথম সহকারী সম্পাদক হন। পূর্ব্বে পিতা সমস্ত কাজ একাই করিতেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু হইল একাধারে তাঁহার ব্রত ও তাঁহার জীবিকা। ব্যবসায়ের খাতিরে তিনি কখনও তাঁহার আদর্শ হইতে চ্যুত হন নাই। তাঁহার আদর্শই সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহার ব্যবসায়ের সুনাম ও সৌন্দর্য্যের কারণ।

কাগজ নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইবেই হইবে এই প্রথা প্রবাসীরই সৃষ্টি। প্রবাসীতে কোন্ আদর্শের লেখা বাহির হইবে, কোন্ বিজ্ঞাপন বর্জ্জিত হইবে এ বিষয়ে তাঁহার বাঁধা নিয়ম ছিল। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে মানুষের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব কোনো কিছুকেই স্পষ্ট সমালোচনার পথে বাধা বলিয়া কখনও স্বীকার করা হয় নাই। আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব

থাকা সত্ত্বেও পিতৃদেবের যখন যাঁহার বিষয়ে যাহা উচিত মনে হইয়াছে তিনি তাহা লিখিয়াছেন। সমস্ত দেশ এক কথা বলিলেও তিনি ঠিক বুঝিলে তাহার বিপরীত কথা বলিতে সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠতম বন্ধুদের বিরুদ্ধে কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, যতই না কেন তাহা তাঁহার আজীবন বেদনার কারণ হউক।

সাময়িক পত্রের সাহায্যে তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাজ করিয়াছেন বলিয়া লোকে সাংবাদিক বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেয়। কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। মহামানবতার প্রচার তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। এই উদ্দেশ্যে মাসিক পত্রে, পুস্তিকায়, সভা-সমিতিতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, গ্রামোন্নয়নে, অবনত সম্প্রদায়ের উন্নতি-প্রচেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাধনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের কাজও দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আসিয়া তিনি আবার সুরু করেন। তিনি কিছুকালের মধ্যেই ইহার সম্পাদক ও পরে প্রেসিডেণ্ট হন। ব্রাহ্মগণ যে হিন্দু এই লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক আলোচনা তিনি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করার বিশেষ চেষ্টা তিনি করেন। ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবাদিতে আনন্দের আয়োজন কম এবং দেশের অপৌত্তলিক উৎসবাদির সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোন যোগ নাই এবং শিশুদের উৎসবের বিশেষ কোনোই ব্যবস্থা নাই এই সকল কথা তিনি সমাজে বহুবার তুলিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ভাদ্রোৎসব প্রভৃতিতে বালকবালিকার সম্মেলন প্রবর্ত্তিত হয়। বিজয়ার দিনে বহু আত্মীয় ও বন্ধুকে তিনি প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লাহোরে তিনি নিখিল-ভারতীয় একেশ্বরবাদ সম্মিলনের সভাপতি হন। এই সময় জাত-পাত-তোড়ক সভারও সভাপতি তাঁহাকেই নির্ব্বাচন করা হয়। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যে তিনিই প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই একেশ্বরবাদী ও জাত-পাত-তোড়কের সভাপতিকেই সুরাট ও করাচীতে উপরি উপরি দুই বৎসর (?) হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। হিন্দু মহাসভার বিভিন্ন প্রদেশের ভোটে এই অপৌত্তলিক এবং জাত-পাত-তোড়ক হিন্দুই প্রায় সব প্রদেশের ভোট পান। হিন্দু মহাসভার যে "ক্রীড" এই সময় ছিল তাহাতে অবশ্য ইঁহার সভাপতি হওয়ায় কোনো বাধা ছিল না।

পূর্ব্বে তিনি যখন যেখানে থাকিতেন অধিকাংশ কাজ সেখানে বসিয়াই করিয়াছেন। কিন্তু বিগত কুড়ি বৎসরে ইউরোপ ভ্রমণ ছাড়া ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে, শহরে ও গ্রামে ঘুরিয়া সেখানকার নানাজাতীয় কাজের হোতা হইয়া দেশবাসীকে সৎকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা ১৩৩৯ সালের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি বোম্বাই, পুণা, মালদহ, দিল্লী, এলাহাবাদ (দুই বার), নাগপুর, রাজসাহী, কুমিল্লা (দুই বার), মৈমনসিং, ঢাকা, ঝাড়গ্রাম, কাশিমবাজার, ওয়াল্‌টেয়ার, বিজাগাপাটম ও মজঃফরপুরে কাজে গিয়াছিলেন।

লীগ অব নেশ্যন্সের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য বিগত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লীগ কর্ত্তৃক জেনিভায় নিমন্ত্রিত হন। লীগ তাঁহার ব্যয় ৬০০০৲ দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে তাঁহার স্পষ্ট সমালোচনার পথ আরও পরিষ্কার থাকিল। ১৯২৬ ১লা অগষ্টের জাহাজে যাত্রা করিয়া জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজরল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী ঘুরিয়া ৪।৫ মাস পরে তিনি ফিরিয়া আসেন। তিনি যখন জেনিভা যান তখন রোমা রঁল্যা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া রল্যাঁ লিখিয়াছিলেন—"ইঁহাকে দেখিলে টলষ্টয়ের কথা মনে হয়।"

মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কার্য্যের পর ফিরিয়া আসেন তখন প্রবাসী কার্য্যালয়ের সম্মুখে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রাঙ্গণে তাঁহার অভ্যর্থনা করা হয়। পিতৃদেব এই অভ্যর্থনার একজন উদ্যোগী ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দীভাষাকে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা করিতে চান। এই লইয়া বহুবার কংগ্রেসমণ্ডপে বহু বিবাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা নয় এমন কয়জন ভারতবাসী যে হিন্দী ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন বলা শক্ত। পিতৃদেব সমস্ত ভারতের হিন্দী-ভাষী হওয়ার সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু ১৯২৮ সালে বৃহত্তর ভারত পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি 'বিশাল ভারত' নামক প্রথম শ্রেণীর একটি হিন্দী মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাহা এ যাবৎ চলিতেছে ও ভারতের বাহিরের হিন্দীভাষী ও হিন্দীপাঠক ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের যোগ রক্ষা করিতেছে। বহির্ভারতের বিশেষতঃ সাউথ আফ্রিকার ভারতবাসীদের উন্নতিকল্পে ও তাহাদের সহিত যোগ রাখিবার চেষ্টায় ৺ সি, এফ্, এণ্ড্রুজ যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই চেষ্টায় পিতৃদেব তাঁহার একজন প্রধান সহায় ও বন্ধু ছিলেন। মহাত্মাজীর সহিতও এই সূত্রে তাঁহার প্রথম যোগ হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেব States Peoples Con-

ference-এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া বোম্বাই যান। সেখানে তাঁহাকে মহাসমারোহ করিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি দেশীয় ও করদ রাজ্যগুলির পক্ষে সুযুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। সেখানে তাঁহার যেরূপ অভ্যর্থনা হইয়াছিল ভারতে অল্প লোকেরই ভাগ্যে সেরূপ অভ্যর্থনা জুটিয়াছে।

পিতৃদেব বলিতেন, "সম্পাদক হইতে হইলে Jack of all trades and master of at least one হ'তে হয়।" তিনি যদিও 'Jack of all trades' বলিতেন, কিন্তু বাস্তবিক বহু বিদ্যা ও অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার যেন করতলে ছিল। তিনি যাহা লিখিতেন বা বলিতেন অনেকে তাহা অভ্রান্ত মনে করিতেন।

বয়স্ক বাঙালী ও ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে, আত্ম-মর্য্যাদায়, সংশিক্ষায়, মার্জ্জিত রুচিতে এবং দেহ ও মনের স্বাস্থ্যে গড়িয়া তুলিবার জন্য পিতৃদেব প্রায় ৫৫ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। আজকালকার বহু আন্দোলনের বীজ তিনিই তাঁহার লেখনীর মুখ দিয়া বহুদিন ধরিয়া বপন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বয়স্কের বন্ধু বলিয়া শিশুদের তিনি ভুলিয়া যান নাই।

যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্রহীন বর্ণপরিচয় শিশুদের সম্বল ছিল, সেই সময় তিনিই বহু চিত্রসম্বলিত সচিত্র বর্ণপরিচয় ছেলেদের জন্য প্রথম প্রকাশ করেন। তৎপূর্ব্বে বটতলার শিশুবোধকে আধইঞ্চি লম্বা ছবি থাকিত বটে, তবে সেটি উল্লেখযোগ্য বই নয়। পিতৃ-দেবের বর্ণপরিচয়ে ছেলেদের পড়াইবার প্রথাও একটু আধুনিক। আগে তাহা চলিত ছিল না। আমাদের দেশে বটতলার ছাপা রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস ইত্যাদি অশ্লীল রচনার জন্য গৃহস্থ পরিবারে ব্যবহার করা শক্ত। তাই পিতৃদেব সর্ব্বপ্রথমে আরব্য উপন্যাসটিকে ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া ছবিতে সাজাইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণও তিনি আধুনিক রুচি-সঙ্গত করিয়া প্রকাশ করেন। বহু পরে মহাভারতও প্রকাশিত হয়।

পিতৃদেব স্বভাবত স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কলমে তিনি সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলিলেও মুখে খুব বেশী বলিতেন না। তিনি চিরকাল নিজ গৃহকোণে বসিয়া নিজের কাজ করিয়াছেন, কখনও বন্ধু, খ্যাতি কি প্রতিপত্তি খোঁজেন নাই। নেতা হইবার ভয় তাঁহার চিরকালের। তথাপি নিজগুণে ও তাঁহার অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ বিচারবুদ্ধি ও অতুলনীয় চরিত্রের জন্য ভারতের বিশেষত বাংলার সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ্য সভায় তিনি হয়ত হাজার বারের বেশী নেতৃত্ব করিয়াছেন। তিনি সকল প্রকার পরাধীনতাকেই ভয় করিতেন বলিয়া বয়সের সঙ্গে শারীরিক যে সকল দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা বাড়িয়াছিল তাহাতে পরাধীন হইয়া থাকিবার ভয়টাই তাঁহার মনে সব চেয়ে বড় ছিল। তিনি আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব নিজ পর বহুজনের সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু পরের সাহায্য লইতে এমন কি অতি নিকট আত্মীয়ের সাহায্য লইতেও সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইতেন।

হরিজনআন্দোলনের বহু পূর্ব্বেই Depressed Classes Missionএর কার্য্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। বাংলা দেশে স্যর রাজেন্দ্র ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রভৃতি তাঁহাদের কার্য্যের সহায় ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ ছিল।

তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাধ ছিল তিনি ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা দেখিয়া যাইবেন। হয়ত সেই জন্য বলিতেন, "এখনও আমার কিছু কাজ বাকি আছে।"

তিনি বহু বৎসর সাধারণব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১১ই মাঘে তিনি যে উপাসনা ও উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার গভীরতা, জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহিতা ও সকল দিকে অতুলনীয়-তার কথা যাঁহাদের স্মরণ আছে তাঁহারা জীবনে তাহা ভুলিবেন না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আমাদের গৃহে এইরূপ অনবদ্য উপাসনা তিনি করিয়াছিলেন।

নারীজাতির কল্যাণের জন্য তিনি চিরজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলা দেশের নারীধর্ষণ ব্যাপারে তাঁহার রক্ত যে রকম গরম হইয়া উঠিত, এমন প্রায় কিছুতেই হয় নাই। নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে বিচার তিনি করিতেন না; কিন্তু নারীরা বহুকাল তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া তাহাদের ছোটবড় কৃতিত্ব সাফল্য ও দাবীদাওয়া সকল বিষয়ের প্রচারের জন্যই তিনি যত চেষ্টা করিয়াছেন পুরুষের জন্য হয়ত তত করেন নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি "প্রদীপে"র যুগ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর ছোটবড় সব কাজকে তিনি যেমন করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছেন এমন আর কেহ করেন নাই।

তিনি বলিতেন, "আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বলাভ।" মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "Rabindranath for ever এই আমার motto।"

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তাঁহাকে ভীষ্মের

সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি ভীষ্মের মতই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, ভীষ্মের মতই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, ভীষ্মের মতই অতুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরও বহু বিষয়ে তাঁহার ভীষ্মের সহিত সাদৃশ্য ছিল। তিনি অনেক সময় যে দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন বহু সময় সেই দলে তাঁহার অতি প্রিয়জন থাকিতেন। ছোটবড় অনেকের অতি নিষ্ঠুর আঘাতও কত সময় নীরবে সহ্য করিয়াছেন, ফিরিয়া আঘাত করেন নাই। সে আঘাতে কত বেদনা পাইয়াছেন তাহাদের জানিতেও দেন নাই। যাহা সত্য যাহা শিব যাহা সুন্দর তাহারই পূজায় আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন, "আমার সাহিত্যিক প্রতিভা নাই।" সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহার ছিল। কিন্তু তিনি ওজন করিয়া কথা বলিবার ব্রত লইয়াছিলেন বলিয়া সাহিত্যিকের ব্যবহৃত ভাষার অলঙ্কারকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সহজ ন্যায়, যুক্তি, তথ্য ও সরল ভাষার অস্ত্রকে কেহ আটকাইতে পারে না, এইজন্য ইহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত কোন কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনার শ্রেষ্ঠ লাইনগুলি সম্পাদক মহাশয়ের রচিত। লেখকগণ নিজেরাই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

পিতৃদেব ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক বড় শহরে ও বহু গ্রামে কোনো-না-কোনো কার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। ভারতের সমস্ত মঙ্গল কাজের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির সাধনাও তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল।

পিতৃদেবের মধ্যে কোথাও জড়তা ছিল না। তিনি ছিলেন প্রাণবান্ পুরুষ। পিতা নাই ইহা যেন তাই কেমন অসম্ভব অবিশ্বাস্য মনে হইতেছে। আমাদের পৃথিবী আমাদের জীবনধারার সঙ্গে তিনিই যে সব চেয়ে বেশী জড়িত ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যকে বুঝিয়া লইতে। তিনি আমাদের মুখে উপদেশ দিতেন না। কিন্তু কি যে আমাদের কর্ত্তব্য, কিসে যে আমাদের ভালমন্দ, কোথায় যে আমাদের আনন্দ, কোথায় যে আমাদের গভীর মর্ম্মবেদনা, তা যেন তাঁরই মুখে আঁকা থাকিত, মুখের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারিতাম, তিনি কি অনুভব করিতেছেন কি বলিতে চাহিতেছেন। তাঁর সেই যে আলোকশিখার মত উজ্জ্বল মুখ আর ত পৃথিবীতে দেখা যাইবে না, কে পথ দেখাইবে? আমাদের ঘরের সকল বাধা ও সংশয়-তিমিরের মধ্যে যে আলো চিরপ্রজ্জলিত ছিল সে আলো আজ চির-নির্ব্বাপিত। ঘরের বাহিরেও এই আলোক কতজনকে পথ দেখাইয়াছে তাহার হিসাব নাই।

তাঁর হৃদয়মনের সহস্র রশ্মিচ্ছটায় এই সমস্ত বাংলা-দেশটাই কেন ভারতবর্ষই আলো হইয়াছিল। সে স্মৃতির কথা সে মহা গৌরবের কথা ভাষায় বলিবার সাধ্য ও ক্ষমতা ত আমাদের নাই। তাঁহার মধ্যে যে মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহ ফুটিয়াছিল, ভাবী কালের ঐতিহাসিক হয়ত তাহার বিচার করিবেন।

তিনি আমাদের পিতা, তাঁর সঙ্গে ঘরের সম্পর্কটা সব চেয়ে আগে; তাই মনে হইতেছে তাঁর গৃহকে তাঁর পরিবারপরিজনকে তিনি কত ভালবাসিতেন! বাঁকুড়ার মাটি জল হাওয়া তাঁর কাছে স্বর্গের চেয়েও কাম্য ছিল। শেষজীবনে যখন জানিলেন যে তিনি আর হাঁটিতে পারিবেন না, তখন কতবার বলিয়াছেন, "আমি যদি ভাল হই, তবে আমার wheel chairএ করে বাঁকুড়ার কোন্ পথ দিয়ে কোথায় যাব সব মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি।" শুইয়া শুইয়া যখন দেশের আর কোনও কাজ করিতে পারিতেন না তখন আমাদের দিয়া চিঠি লিখাইয়া বাঁকুড়ার মেডিক্যাল স্কুলের সুব্যবস্থার জন্য কত চেষ্টা করিতেন। দেশে বিদেশে কোন্ আত্মীয়ের কি অভাব হইয়াছে, সে অভাবটা কি করিয়া মেটানো যায়, অসহ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যেও সেই কথা বলিয়াছেন। বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "অমুককে কি টাকা পাঠিয়েছ, তমুক কি আমার উপর রাগ করিয়াছে?" তিনি জীবনের শেষদিকে বাঁকুড়ার শহর ও গ্রামোন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করিয়া-ছিলেন। বার্দ্ধক্য ও শ্রান্তির বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছেন। বাঁকুড়ার শিক্ষার ও শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁহার খুব চেষ্টা ছিল।

তিনি যে কি আশ্চর্য্য পত্নীপ্রেমিক স্বামী ছিলেন, কি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত শেষদিন পর্য্যন্ত মা'র উল্লেখ করিতেন তাহা তিনি নিজেই বুঝিতেন না! আমাদের দেশে পাতিব্রত্যের যে উচ্চ আদর্শ আছে তাহার চেয়েও বড় আদর্শ ছিল তাঁর পত্নীপ্রেম সম্বন্ধে। তাহার পরিচয় শোকে আনন্দে তিনি জীবনে বহুদিন ধরিয়া দিয়াছেন। ১৯৩৫এ তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়।

সন্তানবাৎসল্যে তাঁহার তুলনা ছিল না। তিনি শেষ নিঃশ্বাসের সহিতও তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন।

তিনি মিতব্যয়ী মিতাচারী ছিলেন বলিলে তাঁহার

্তব্যয় ও মিতাচারের পরিচয় দেওয়া যায় না। তাঁর ীবনে সখের কিম্বা আরামের কোনও খরচ তিনি করেন াই বলা চলে। হাঁটিয়া দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা ছাড়া আর কোনও খেয়াল তাঁহার ছিল না। বাকি সব ছিল কাজ।

ভৃত্যদেরও তিনি গৃহের পরিজনের মত ভালবাসিতেন। রোগ-শয্যায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও শুশ্রূষাকারী ও ভৃত্যদের "বাবা, তুমি ভাল আছ ত?" বলিয়া কুশল প্রশ্ন না করিয়া নিজের প্রয়োজনের কথা বলিতেন না। নিজের যদি কোনও ত্রুটি হইয়া থাকে এজন্য তাহাদের নিকটও প্রত্যহ ক্ষমা চাহিতেন। ইহার মধ্যে কোনও কপটতা ছিল না, তাহা আন্তরিক ক্ষমা-প্রার্থনা।

তিনি অল্প বয়সে পিতাকে হারাইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ মাতার প্রতি তাঁহার ভালবাসা আশ্চর্য্য ছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিবার বহু পরেও প্রয়াগে নিজমাতার কল্পবাস প্রভৃতির সব ব্যবস্থা স্বয়ং করিতেন। নিজ মাতার মৃত্যুর পর বহুদিন তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ওই সময় ওই দিনে ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া অনাহারে থাকিতেন ও মাতৃচিন্তা করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর শোক তিনি জীবনে ভোলেন নাই। সেই বালকের প্রিয় কার্য্যগুলি বহু অর্থব্যয়ে আজীবন রক্ষা করিয়াছেন। সে শৈশবে যেখানে খেলিত বসিত সেই সব স্থানের ফোটো তুলাইয়া পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন। পিতৃদেবের শান্তিনিকেতন বড় প্রিয় স্থান ছিল। তাঁহার আকর্ষণের প্রধান কারণ অবশ্য ছিলেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু পিতার অন্তরের নিভৃত কোণে আর একটি কারণ ছিল; সে কারণ তাঁহার মৃতপুত্র প্রসাদ। প্রসাদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে প্রসাদনৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনি ভোজ দিতেন, তাহার প্রিয় স্থানগুলি দেখিয়া যাইতেন।

মানুষকে ভালবাসিবার ও ভালবাসাইবার যেমন অদ্ভুত ক্ষমতা লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন তেমন বাংলা দেশে আর কয়জনের ছিল জানি না। তাঁর মানব-প্রীতি, শিশুর মত সরল বিশ্বাস, শিশুর মত শুভ্র হাসি, দেবোপম উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পবিত্রতার দ্যুতি মানুষের চোখে পড়িবামাত্র মানুষের মন কড়িয়া লইত। শান্তিনিকেতনে তিনি যে বৎসর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের পাশের বাড়ীতে থাকতেন। পিতার অনুগত বালক-বালিকাদের দল বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি বাবাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "রামানন্দ বাবু মশায়, আপনি আমার দল ভাঙিয়ে নিচ্ছেন।" আজ বহু বন্ধুজন বলিতেছেন, "তাঁহার মত এমন মিষ্টভাষী ও প্রকৃত ভদ্রলোক দেখি নাই।"

মানুষের জীবনে কত পুরাতন বন্ধু চলিয়া যায়, কত নূতন বন্ধু আসে, মানুষ একদলকে ভোলে আর একদলকে গ্রহণ করে। বাবার জীবনে মনের ভিতর কখন তা হয় নাই। তিনি যাহাকে জীবনে একবার ভালবাসিয়াছেন, চিরদিনই তাহাকে ভালবাসিয়াছেন। বাহিরের যোগ অর্দ্ধ শতাব্দীও যেখানে ছিল না সেখানেও তাঁকে উস্কাইয়া দিলে দেখা যাইত পূর্ব্বদিনের ক্ষুদ্রতম স্মৃতিও তিনি ভোলেন নাই। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তিই ইহার কারণ নয়, ইহার কারণ তাঁর স্বজনপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি। তাই যদিও তিনি কর্ম্মজীবনে ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা-নটা পর্য্যন্ত কাজেই ডুবিয়া থাকিতেন তবু ছুটির দিনে তাঁর ছুটি নেওয়া হইত না। চিঠিতে চিঠিতে বাবার টেবিল বোঝাই হইয়া থাকিত, ছুটির দিনের কাজ ছিল চিঠির জবাব দেওয়া। এক দিনে তিনচারখানা চিঠি লিখিতে আমরা ভয় পাই, তিনি এক দিনে পঞ্চাশখানা চিঠির জবাব দিতেন। কত মানুষের চিঠির জবাব আমরা দিয়া উঠিতেই পারি না, বাবাকে চিঠি লিখিয়া কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকও কখন জবাব হইতে বঞ্চিত হইত না বোধ হয়। যতই দেরী হোক চিঠি জমা হইয়া থাকিত, প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ুর কাজ শেষ হইলে ছুটির দিনে বাবা জবাব লিখিতে বসিতেন। ইহাদের মধ্যে কত মানুষ ছিল যাদের ধারণা ছিল বাবা বুঝি তার মত আর কাকেও ভালবাসেন নাই। বিধাতা তাঁহাকে রক্তমাংস দিয়া গড়িয়াছিলেন কি স্নেহ-মমতা দিয়া গড়িয়াছিলেন তা বুঝিতে পারিতাম না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেমন বজ্রের মত কঠোর প্রেমে তেমনি কুসুমের মত কোমল ছিলেন।

উনচল্লিশ বৎসর আগে তাঁহার একটি দুই বছরের ছোট্ট শিশু পুত্র ডিপ্‌থিরিয়ায় মারা গিয়াছিল। উনচল্লিশ বৎসর পরে তাঁহার এক দৌহিত্রীর সেই রোগ হইয়াছিল। বাবা শুনিলেন সিরাম ইন্‌জেকশ্যন দিয়া তাকে সারানো হইল। তিন দিন ক্রমাগত তিনি শুইয়া শুইয়া বলিলেন, "ডাক্তার-দের জিজ্ঞাসা কর, চল্লিশ বৎসর আগে এই চিকিৎসা প্রণালী উঠেছিল কিনা, ভারতবর্ষে চলেছিল কিনা।" যতক্ষণ না ডাক্তাররা জবাব দিলেন তিনি বিশ্রাম লইলেন না। বাবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলা হইল মাত্র ত্রিশ বৎসর আগে এই চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাবা বলিলেন, "ওঁরা বোধ হয় ভুল করছেন। তখন এটা হয়ত হয়েছিল, আমি যদি সে চিকিৎসা করাতে পারতাম, তাহলে অনিলকে বাঁচাতে পারতাম।"

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণব্রাহ্মসমাজের পাশের আমাদের পূর্ব্বতন বাসাবাড়িটি উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসা তাঁহার একটি বিষাদমিশ্রিত আনন্দের জিনিষ ছিল। এই গৃহে পত্নী ও সন্তানগণের সহিত তাঁহার বহু আনন্দের দিন কাটিয়াছিল।

স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেন, "ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Familiarity breeds contempt। আমার জীবনে আমি তিনটি মানুষ দেখেছি—তাদের যত জেনেছি তত তাদের নূতন নূতন গুণে মুগ্ধ হয়েছি। তার ভিতর একটি তোমার বাবা।"

বিধাতা আমাদের পিতাকে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, চরিত্র, মেধা, সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞান, নির্ভীকতা, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, সংযম, ভগবৎভক্তি, বন্ধুবৎসলতা, ও স্বজনস্নেহের অতুল সম্পদ দিয়া সাজাইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেকে প্রচার করিবার এক বিন্দু ক্ষমতাও তাঁহাকে দেন নাই। যে দেশকে যে প্রিয়জনকে তিনি এত ভালবাসিয়াছিলেন তাদের হাতে রহিল তাঁর এই অপূর্ব্ব চরিত্রের উদ্‌ঘাটনের ভার।

নিখিল-ভারতের অতীত গৌরবের সকল স্বর্ণদ্বার যিনি দীর্ঘ ৫০ বৎসর ধরিয়া খুলিয়া দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান ভারতের সকল অভাব, দৈন্য, লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে যিনি আজীবন সব্যসাচীর মত দুই ভাষার তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে সংগ্রাম করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ভারতকে ধনে, মানে, সম্পদে, গৌরবে, মর্য্যাদায়, চরিত্রে, শিক্ষায়, আদর্শবাদিতায়, আশাশীলতায় যিনি গড়িয়া তুলিতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাধনা করিয়াছেন ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে বিশ্বাস করি।

আমরা তাঁহার পুত্রকন্যা ও প্রিয়জনেরা তাঁহার জন্য কি প্রার্থনা করিব? তিনি নিজ কীর্ত্তির ও নিজ সাধনার বলে পরলোকে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ পাইবেন ইহা অপেক্ষা বেশী কি চাহিতে পারি?*

* এই রচনার অধিকাংশ দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনের ধীরেন্দ্রমোহন সেনের অনুরোধে লিখিত হয়।

পত্রাবলী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে লিখিত

১

৩০এ মে ১৯২৫

কল্যাণবরেষু

তোমার ষষ্টিতম জন্মদিনে আমার শুভ আশীর্ব্বাদ পাঠাইতেছি।

প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

যে শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্ত্বের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মানুষ ভয়ের অতীত হইত, যে বীরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্ব্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত,—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই শিক্ষা তুমি জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছ এবং লেখা দ্বারা সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত করিতেছ। দিন দিন তোমার অন্তর্দৃষ্টি প্রখরতর হউক, এবং মনুষ্যসেবায় তোমার শক্তি বর্দ্ধিত হউক!

আশীর্ব্বাদক

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

২

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকারকে লিখিত

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন। আপনার ২০ তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। রামানন্দ বাবু প্রবাসী বাঙালীদের গৌরব, তাঁহাকে সম্মান করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

১৯০১ খৃঃ অব্দে আমি ছুটি লইয়া এলাহাবাদে আসিয়াছিলাম। তখন রামানন্দ বাবুর সহিত পরিচিত হই। তাহার পর ১৯০৫ খৃঃ অব্দে তিনি আমাদের বাটীতে কয়েক দিবস ছিলেন। সেই সময় "প্রবাসী" বাহির হইতেছিল। তখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ

পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। তিনি প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করিয়া নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন প্রবাসীর সম্পাদকতার ও পরিচালনার কার্য্য করিতেন। কার্য্য করিবার শক্তি, অমায়িকতা ও সামাজিকতা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ছিল। নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করিতে, লেখকদিগকে সাহিত্যরচনায় অনুরাগী করিতে, প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৃষ্টি নিজ মাতৃভাষার প্রতি ফিরাইতে ও তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে তিনি নিয়ত চেষ্টা করিতেন। তাঁহারই উদ্যোগে এলাহাবাদে তিন চার বৎসর ধরিয়া শ্রীপঞ্চমীর সময়ে বাঙ্গালী-সম্মিলন হইয়াছিল ;—শিক্ষা, উৎসব ও ব্যায়ামের অপূর্ব্ব সংযোগ সে সময়ে যেরূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য জীবনী-স্পন্দনের সঞ্চার করিয়াছিল, এরূপ তাঁহার এলাহাবাদ হইতে যাইবার পর আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এই সম্মিলনীতে বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও আলোচনা হইত। শিল্পসামগ্রী, লাঠিখেলা, অসিক্রীড়া ও নানা প্রকার ক্রীড়া প্রদর্শিত হইত। পুরস্কারও বিতরিত হইত।

তাঁহার উদ্যোগে অনেক প্রবাসী কৃতী বাঙ্গালীর নাম তাঁহার বিখ্যাত পত্রিকার পত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত জীবনী বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়। এই জন্য শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমগ্র বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন।

তিনি পুরুষকার ও স্বাবলম্বনেরও আদর্শ আমাদের সামনে ধরিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা তত ভাল ছিল না। তিনি কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁহার পোষ্যবর্গও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তিনি খোসামোদের দ্বারা কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টি করিবার লোক ছিলেন না। তিনি ২৭৫৲ টাকার চাকরী ছাড়িয়া দিলেন এবং অনেক চেষ্টা ও আয়াসের পর Modern Review পত্রিকা বাহির করিলেন। তাঁহার চাকুরীতে ইস্তাফা দেওয়া অনেকেই অনুমোদন করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে চাকুরী করিতে করিতে কি বই লেখা ও পত্রিকা সম্পাদন করা চলিতে পারে না? একেবারে নিশ্চিত হইতে কি অনিশ্চিতে পদার্পণ করা বিধেয়? কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি যে পথ উত্তম বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি ছাড়েন নাই। এবং কার্য্যসাধনের জন্য তিনি পরিশ্রমে কুণ্ঠিত ছিলেন না। ইহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়।

১৯০৭ খৃঃ অব্দে তিনি Modern Review বাহির করেন। অনেক সাধনার পর তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি দুইটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। ভারতবর্ষে…অল্প লোকই মাসিক পত্রিকার সম্পাদনে ও পত্রিকা পরিচালনায় তাঁহার ন্যায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। অতএব তিনি আমাদের সকলের অভিনন্দনীয় ও বরণীয় এবং আমরা সকলেই তাঁহার দীর্ঘ জীবনের কামনা করি। ইতি

ভবদীয়

শ্রীবামনদাস বসু

৩

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ষষ্টিতম বর্ষ পূর্ত্তি হইল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সালে। এই আনন্দের উপলক্ষ্যে তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

রামানন্দ বাবু যখন 'দাসী' পত্রিকার সম্পাদক তখন আমি বি-এ পড়ি। আমার এক সহপাঠী বন্ধুর মুখে তাঁহার বিনীত স্বভাবের খুব প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। আমাদের বৈষ্ণব প্রভাবের দেশে বিনয়ের মাহাত্ম্য খুবই বিঘোষিত হইয়া থাকে; তাই অতি বিনয়ী বলিয়া যাঁহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাঁহাকে না দেখিয়াও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রম মনের মধ্যে পোষণ করিতে লাগিলাম।

কিছু দিন পরে শোভন সুন্দর বেশে ও নূতন ধরণে 'প্রদীপ' জ্বলিয়া উঠিয়া রামানন্দবাবুর নাম বঙ্গদেশে সকলের গোচর করিয়া তুলিল। আমি আবাল্য সাহিত্য-রসপিপাসু; এই নূতন সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছিল, এবং এই আনন্দের পরিবেষক বলিয়া রামানন্দ বাবু আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাংলা ১৩০৯ সালে এক দিন আমি মজুমদার লাইব্রেরীতে গিয়া দেখিলাম এক জন গম্ভীরমূর্ত্তি অথচ স্মিতমুখ ভদ্রলোক লাইব্রেরীর এক বেঞ্চে বসিয়া আছেন। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে বলিলেন, "ইনি রামানন্দ বাবু।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

এই সময় প্রবাসী প্রকাশিত হইত। প্রবাসীর দ্বিতীয় বৎসর হইতে আমি তাহার নিয়মিত লেখক হইয়া উঠি। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত পত্র লেখার মধ্য দিয়া পরিচয় হইতে থাকে। সাক্ষাৎ আর হয় নাই বোধ হয়।

ইংরেজী ১৯০৬ সালে রামানন্দ বাবুর নাম দিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়,—দুটি ছেলের জন্য সর্ব্ব সময়ের সহচর শিক্ষক প্রয়োজন। আমি আবেদন করিলাম। প্রত্যুত্তরে রামানন্দ বাবু আমাকে

লিখিলেন—বহু এম-এ উপাধিধারী ঐ পদের জন্য প্রার্থী আছেন, কিন্তু আমি ঐ কর্ম্মগ্রহণ করিলে তিনি অপর সকলের চেয়ে আমাকেই অধিক পছন্দ করিবেন। সেই পত্রে আমার গুণপনা সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা ও আমি তাঁহার নিকটে যাইব বলিয়া যে অপ্রকাশিত আনন্দ সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে আমি অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলাম। এই শিক্ষকতা এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের পুত্রদিগের। রামানন্দ-বাবু পুনরায় আমাকে জানাইলেন—চিন্তামণি বাবুর প্রেসে এক জন প্রধান প্রুফ-রীডারেরও আবশ্যক আছে; শিক্ষকতা ও রীডার এই দুই কর্ম্মের মধ্যে যেটি ইচ্ছা আমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারি। আমি রীডারের কাজই নির্ব্বাচন করিলাম; ওয়েবষ্টার ডিক্‌শনারীর পিছনের প্রুফ-সংশোধনের নমুনা দেখিয়াই আমি ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলাম প্রুফ দেখা অতি সহজ অনায়াস কর্ম্ম। আমি তখন মালদহ জেলার চাঁচল-রাজবাড়ীতে ছিলাম; এলাহাবাদ যাইব বলিয়া কলিকাতায় গেলাম। তখন কলিকাতায় কংগ্রেস হইতেছিল। কংগ্রেসে প্রথম সংখ্যা মডার্ণ রিভিউ বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম—নূতন ধরণের ইংরেজী মাসিক পত্র, সম্পাদক রামানন্দ বাবু। ইহা আবার আমার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। কংগ্রেসে রামানন্দ বাবুর সহিতও সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অপরিচিত এলাহাবাদে যাইয়া কোথায় কাহার আশ্রয়ে থাকিব, কোথায় বাসা পাইব?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "এখন আমার বাড়ীতে গিয়া থাকিবেন, পরে বাসা খুঁজিয়া লইবেন।" আমি বলিলাম, "আপনি ত এখানে রহিলেন, আমাকে ত আর কেউ চেনেন না।" তিনি বলিলেন, "আপনার কোন অসুবিধা হইবে না।" রামানন্দ বাবু স্বল্পভাষী; তিনি বেশী কিছু বলিলেন না, আমিও বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। এলাহাবাদে গিয়া পথ হইতেই তাঁহার অতিথি বলিয়াই যে সমাদর লাভ করিলাম, প্রবাসীর লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তাহা আর বর্দ্ধিত হইবার অবকাশই পাইল না। এক দিনেই তাঁহার পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেল।

মাসখানেক তাঁহার বাড়ীতেই কাটিয়া গেল, কোন মেসে বাসস্থান আর পাই না। চিন্তামণি বাবু আমার কুণ্ঠার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বন্ধুর বাড়ীতে আছেন তাতে আর কুণ্ঠা কি?" রামানন্দ বাবু আমার বন্ধু! সেই স্বল্পভাষী সদাকর্ম্মরত গম্ভীরপ্রকৃতির ব্যক্তিকে কিছুতেই আমার সমান মনে করিতে পারি না, তাঁহাকে নিজের চেয়ে গরিষ্ঠ মনে হয়। কিছু দিন পরে রামানন্দ বাবু প্রবাসীতে পুস্তক-সমালোচনার ভার আমাকে দিয়া মাসিক পারিশ্রমিক দিতে স্বীকার করিলেন। এলাহাবাদের এক ভদ্রলোকের পরামর্শে আমি মূর্খের মতন রামানন্দ বাবুকে বলিলাম, "আমি যত দিন অন্যত্র বাসা না পাইতেছি তত দিন আমি পারিশ্রমিক লইব না।" এই কথায় তাঁহার মুখে যে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনো আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে, কিন্তু তাহা অবর্ণনীয়; তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, আমি পয়সা লইয়া আপনাকে আশ্রয় দিতে পারিব না।"

এই কথায় আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম; তাঁহার আতিথ্যের আমি যেরূপ অপমান করিয়াছিলাম ইহা আমার উচিত দণ্ড মনে করিলাম। কিন্তু পরদিন রামানন্দ বাবু আমাকে বলিলেন, "কাল আমি যাহা বলিয়াছি তাহার জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি বড় sensitive, একটুতেই বিচলিত হই; যত দিন আপনি অন্যত্র বাসস্থান না পাইবেন তত দিন আমার বাড়ীতে আপনি স্বচ্ছন্দে অসঙ্কোচে থাকুন।" এক দিনের পরিচিত ও প্রবাসীর এক জন সামান্য সেবকের প্রতি তাঁহার এই ঢালাও অনুরোধ।

রামানন্দ বাবু যখন এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ত্যাগ ও নাগপুরের অধ্যক্ষপদের নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেন, তখন চিন্তামণি বাবু তাঁহাকে মাসিক চারি শত টাকায় ইণ্ডিয়ান প্রেসে নিযুক্ত করিতে চাহেন।* অত বেশী বেতনে তাঁহাকে চিন্তামণি বাবু কেন নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করায় চিন্তামণি বাবু বলিয়াছিলেন —রামানন্দ বাবু একটি জীবন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া আর mine of informations! এই গুণের পরিচয় প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার পাঠকেরা পাইয়া থাকেন।

চিন্তামণি বাবু কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস খুলিবেন; চিন্তামণি বাবু তাঁহার কর্ম্মচারী ও আত্মীয়দের মধ্যে কাহার উপর এই কর্ম্মের ভার দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া রামানন্দ বাবুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার নাম করিয়া আমার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও আস্থার নূতন পরিচয় দেন।

---

* শুনিয়াছি চিন্তামণি বাবু ইহার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে লাভের অংশ দিতে চান।—শান্তা দেবী।

১৯১১ সালের এপ্রেল মাসে রামানন্দ বাবু অসুস্থ হইয়া দার্জ্জিলিং যাইতে বাধ্য হন; তাঁহার অনুপস্থিতকালে মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসী পরিচালনার জন্য এক জন সহকারী চাই; আবার তাঁহার নির্ব্বাচন আমাকেই বাছিয়া লইয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিল।

দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁহার সহকারী থাকিয়া তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার অবসর আমার ঘটিয়াছিল। রামানন্দ বাবুর চরিত্রের যেসব গুণ আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে তাহাদের কতকগুলি হইতেছে—দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, অকুতোভয়তা ও ন্যায়পরতা। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহাকে অধিক দিন চাকরী করিতে দেয় নাই। চাকরী ছাড়িয়া তাঁহার সাংসারিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি এক দিনের জন্যও দমিয়া যান নাই বা সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। এই দৃঢ়তার গুণেই তাঁহার অধ্যবসায় অসাধারণ; প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ শত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁহার অধ্যবসায়ের জয়স্তম্ভ হইয়া বিরাজ করিতেছে। সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি কোন দলেরই লোক হইতে পারেন নাই এবং অপ্রিয় সত্য বলিয়া বলিয়া তিনি সকলেরই অপ্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। যখন মহাত্মা গান্ধীর নামের মোহে দেশ ক্ষিপ্তপ্রায়, যখন দেশবন্ধু বলিয়া চিত্তরঞ্জন সকলের চিত্তরঞ্জন তখনও তিনি তাঁহাদিগকে সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

রামানন্দবাবুর আর একটি সদ্‌গুণ অসাধারণ আত্ম-নির্ভরতা। তিনি কাহারও প্রসাদপ্রার্থী নহেন। এই জন্য অনেকে তাঁহাকে আত্মম্ভরী বলিয়া ভুল করে।

মানুষ মানুষকে যত ঘনিষ্ঠভাবে জানে তত তাহার দোষ ত্রুটি চোখে পড়ে এবং ততই তাহার সম্বন্ধে ধারণা হীন হয়। তাই ইংরেজীতে প্রবচন হইয়াছে Familiarity breeds contempt, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে যত জানিয়াছি তত আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে তিন জনের উপর—তাঁহাদের দোষ ত্রুটি চোখে পড়া সত্ত্বেও—প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় রামানন্দ বাবু ও তৃতীয় শিক্ষিতা মহিলা।

স্বাস্থ্যহানির অসামর্থ্যবশতঃ রামানন্দ বাবুর কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি তখন ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে লিখিয়াছিলেন—বাংলা উপাধ্যায়ের উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া তাঁহারা আমার কথা স্মরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানন্দ বাবুর জীবদ্দশায় তিনিও আমাকে ছাড়িবেন না ও আমিও তাঁহাকে ছাড়িব না এই ধারণা থাকায় তাঁহারা আমার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রবাসীর চারু বলিয়া পরিচিত আমি প্রবাসীর সেবা ছাড়িয়াছি; কিন্তু সম্পর্ক ছাড়ি নাই।

রামানন্দ বাবুর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া নিজের কথাই বেশী করিয়া বলিলাম; তাহার কারণ—আমার প্রতি তাঁহার অহেতুক পক্ষপাতিত্ব ও আস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রের অনেক গুণের পরিচয় আমি পাইয়াছি। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবে আমার চরিত্র ও মত সংগঠিত হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী।

রামানন্দ বাবু নির্ভীক লেখনী চালনা করিয়া দেশের যে মহৎ উপকার করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য অনেকেই দিবেন; সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না।

তিনি আদর্শ গৃহী ও শক্তিমান্ ব্যক্তি বলিয়া আমি তাঁহাকে সম্মান করি ও শ্রদ্ধা করি। সেই শ্রদ্ধা তাঁহার ষষ্টিতম বর্ষ পূর্ত্তির দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছি।

১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২
রমনা, ঢাকা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৪

বহ্নুৎসবে যোগমায়ার হৃদয়ও নূতন করিয়া আলোকিত হইয়া উঠিল। মূঢ়স্নেহে এত দিন যে বিমলকে তিনি একান্ত আপনার বলিয়া মনে করিতেন—আজিকার অগ্নি যেন সেই নিশ্চিত-জানার ক্ষেত্রটিকেও দগ্ধ করিয়া দিতেছে। এ কি তাঁহার সেই বিমল? বিদ্ধত দেহের সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তনও যথেষ্ট হইয়াছে বিমলের। একান্ত মাতৃগতপ্রাণ—স্নেহের আব্দারে, জিদে, অবাধ্যতায়, দৌরাত্ম্যে ও ভালবাসায় গড়া সে বিমল ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। সে বিমলের চোখে জ্বলিত আদর-স্পর্দ্ধিত দুরন্তপনা, প্রতিবাদ-নম্র অবাধ্যতা, দায়িত্ব ও বিচারহীন দৌরাত্ম্য, এবং মা

বলিয়া বাহুবেষ্টনে যোগমায়াকে বাঁধিয়া মীমাংসা-প্রবণতার মধ্যে ভালবাসার প্রচ্ছন্ন রূপটির প্রকাশ সে ঘটাইত। সেই বিমলের চোখে আজ বেদনা-দীপ্ত অগ্নিকণা, কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর, আচরণে যত চাঞ্চল্যই প্রকাশ পা'ক—একটি নিশ্চিত লক্ষ্যের সঙ্কেত। মায়ের সঙ্গে রহস্য-প্রিয়তায় সেই প্রচ্ছন্ন ভালবাসা টুক্‌রা-টুক্‌রা রূপে প্রকাশ পায়—তবু আরও কি যেন এক বৃহত্তর বস্তু ওর ভালবাসার ক্ষেত্রটিকে জুড়িয়া বসিতেছে। মাতৃস্নেহের চেয়ে—কত রমণীয় সেই বস্তু যা বিমলকে অমন করিয়া আকর্ষণ করিল? যা অমন করিয়া বিমলকে সব ভুলাইবার পথে টানিয়া লইতেছে!

সংসারকে কেন্দ্র করিয়া যোগমায়া যেন আবর্ত্তিত হইতেছেন। সংসারের ক্ষতি তিনি সহ্য করিতে পারেন না। পরের ছেলে শরৎ না থাকিলে এই ক্ষতি লইয়া বিমলকে তিনি ভর্ৎসনা করিতে পারিতেন। এবং ভর্ৎসনা না করা পর্য্যন্ত ক্ষতির ক্ষতটা তাঁহার টন্‌টন্ করিতেই থাকিল।

অপরাহ্ণে বিমলকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, হাঁরে, তোদের একটুও হুঁস-পর্ব্ব নেই? অতগুলো কাপড় না-হোক পুড়িয়ে দিলি?

—দিলামই বা, মা। বিমল হাসিল।

—কি যে হাসিস—দেখে গা জ্বলে যায়! বয়স হচ্ছে—এখন সংসারের ক্ষেতি-অপচো যদি না বুঝবি—

—ক্ষতি বুঝি বলেই ত পুড়িয়ে দিলাম ওগুলো। আজ প্রায় দেড় শো বছর ধরে ওরা এই কাপড় যুগিয়ে যে ক্ষতি আমাদের করেছে—তা কি কোনদিনই আমরা বুঝব না? আমরা চিরকালই জাহাজ-বোঝাই কাপড় এনে এ ভাবে লজ্জা নিবারণ করব?

যোগমায়া বিমলের চক্ষে সেই অগ্নিকণা জ্বলিতে দেখিলেন। ছেলের কথার এক বর্ণও বুঝিলেন না। তবু সশঙ্ক মাতৃ-হৃদয় ঐ দৃঢ় প্রত্যয়ান্বিত স্বরে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বিমল বলিতে লাগিল, আজ আমাদের ঘুম ভেঙেছে মা। ও কাপড় পরে আমরা পূজোর ঘরে ঢুকতে পারব না, ও কাপড় লজ্জা না ঘুচিয়ে লজ্জা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের তাঁতীদের যারা অকর্ম্মণ্য ক'রে দিলে, আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে যারা জুড়ি-চৌঘুরী হাঁকাচ্ছে, বড় বড় বাড়ি তুলে ফূর্ত্তি-আহ্লাদ করছে—তাদের বাহবা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

যোগমায়া তর্ক তুলিলেন, তা পয়সা দিয়ে কেনা কাপড়গুলো যা পোড়ালি ক্ষেতিটা হ'ল কার?

—সামান্য ক্ষতি ত হবেই। যে-ক্ষতি দিনের পর দিন নিঃশব্দে হ'য়ে চলেছে—তার তুলনায় এ কতটুকু? আবার দেশী কাপড় চালু হ'লে—আমাদের সবাই পেট ভরে খেতে পাব।

যোগমায়া বলিলেন, তুই থাম বাপু, কেউ যেন তোকে পেট ভরে খেতে দেয় না!

বিমল বলিল, মা, তুমি অনেক বোঝ—এইটে বুঝতে পার না যে, আমি একলা পেট ভরে খেলেই দেশ বাঁচবে না, আমার একলার মুখের হাসিই সত্যিকারের হাসি নয়।

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, আমি অত বুঝতেও চাইনে বাপু। তোরা খেয়ে-পরে সুখে থাকিস এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার ভগবানের কাছে নেই।

বিমল বলিল, আমি তোমার ছেলে বলেই আমার সুখটাই তোমার লক্ষ্য, কিন্তু আমাদের সবাইকে নিয়ে যে দেশ সে দেশকে তুমি দেখতে পাও না, মা।

যোগমায়া বলিলেন, তোরাই আমার দেশ—অন্য দেশ আমি জানিনে।

—না মা, তুমি শুধুই মা—আর কিছু নও। একটু থামিয়া বলিল, তবু তোমাদেরও জানতে হবে—তোমাদেরও সইতে হবে। বলিয়া আবৃত্তি করিল:

না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত কভু জাগে না—জাগে না।

তোমার হাতে রাখী বেঁধে দিলাম আজ, সে রাখী কি মিছেই বেঁধে দিলাম!

বিমল অশান্ত পদে ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল। যোগমায়া আপন মনে বলিলেন, ভাল স্বদেশীর ঢেউ এলো বাপু! ছেলেগুলো এক দণ্ডও স্থির থাকে না।

আর একটু পরে বাহির হইতে ডাক আসিল, বউমা, বাড়ির মধ্যে থাক ত একটা কথা শুনে যাও। আমি বাইরের ঘরে বসলাম।

শ্বশুর-স্থানীয় দ্বারিক ভট্টাচার্য্যের গলা নয়? যোগমায়া বাহিরের ঘরের দুয়ারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া—শিকল নাড়িয়া জানাইলেন—তিনি আসিয়াছেন।

দ্বারিকের পুত্র বঙ্কু-ঠাকুরপো বলিতে গেলে রামচন্দ্রেরই সমবয়সী এবং এক সময়ের সহকর্ম্মী। পদবৃদ্ধি হইলেও রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কটি পূর্ব্ববৎই আছে। যোগমায়া বউদিদি সম্পর্কীয়া হইলেও কখনও ইঁহার সম্মুখে বাহির হন নাই। রহস্য বা আলাপ যা-কিছু এক পক্ষ হইতেই হইত এবং অন্তরালে থাকিয়া যোগমায়া তাহা শুনিতেন। কখনও পুত্র বা কন্যার দ্বারা প্রত্যুত্তর দিতেন। বঙ্কু বহুবার এই বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, এবং রন্ধনের সুখ্যাতি করিয়া যোগমায়ার মনে একটি বিশিষ্ট স্থানও দখল করিয়াছেন। সেই সম্পর্কেই বৃদ্ধ দ্বারিক যোগমায়াদের আত্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত। রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে এই বৃদ্ধই যোগমায়ার সংসারের সংবাদাদি লইতেন এবং কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইলে ছেলে বা মেয়েকে দিয়া যোগমায়া ইঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। বৃদ্ধ দ্বারিকের সম্মুখে যোগমায়া কখনও বাহির হইতেন না, অন্তরালে থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। দুই পরিবারের অল্পবয়স্ক যে কোন ছেলেমেয়েকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁহাদের কথোপকথন চলিত।

দ্বারিক ছোট নাতিটিকে সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। আট

বছরের বালক—একটু বেশী চঞ্চল। ইহাদের কথোপকথনের মধ্যবর্ত্তিতা করিবার চেয়ে খেলার দিকেই তাহার মনটা পড়িয়াছিল, কাজেই বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এক্ষুণি কথা শেষ ক'রে ফেল দাদু—নইলে আমি থাকতে পারব না—ব'লে দিচ্ছি!

বৃদ্ধ দ্বারিক হাসিয়া বলিলেন, হাঁরে শালা, ভারি খেলোয়াড় হয়েছিস তুই।

নাতি দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, আমি চললাম দাদু।

—যা। ভেবেছিলাম কলকাতা থেকে একটা ফুটবল আনিয়ে দেব তোকে—তা তোর বরাতে নেই। নাদুকেই দেব'খন।

—ইস—দেবে বই কি। জ্যেঠিমার সঙ্গে কথা বলতে রোজ রোজ নাদুদা আসে নাকি? বলিয়া দ্বারিকের নিকটে আসিয়া তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, এমন করলে তোমার লাঠি কেড়ে নেব কিন্তু।

যে কথা—সেই কাজ। লাঠি লইয়া নাতি ছুটিয়া অন্তরালবর্ত্তিনী যোগমায়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারিক হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, দেখলে বউমা, তামাদের ছেলেপুলের কীর্ত্তি। ওরা খালি চায় আমাদের জব্দ করতে। আর সেই কথা বলতেই আমার আসা। বলিয়া কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

ছেলেটি দুয়ারের এ পিঠে আসিয়া যোগমায়ার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা কহিল, তার পর সেইখান হইতেই উচ্চৈঃস্বরে বলিল, তামাক খাবে দাদু?

—আর খাতিরে কাজ নেই—ভাই। গরু মেরে জুতো দান। তুই বরং আমার লাঠিগাছা আমায় দিয়ে যা।

—তুমি নাদুদাকে বল দেবে না বল?

—তা কি করে দেব ভাই। যে একদিনও দৌত্য করি নি—তাকে বল দিই কি করে!

—আচ্ছা—এই নাও লাঠি। বলিয়া অন্তরাল হইতেই ঠক্ করিয়া লাঠিটা মেঝের উপর দিয়া দ্বারিকের দিকে ঠেলিয়া দিল।

অতঃপর মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যে তাঁহাদের কথোপকথন চলিতে লাগিল।

দ্বারিক বলিলেন, দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে—বউমা, একটু সাবধানে থাকা ভাল।

যোগমায়া বলিলেন, বল না পলটু, ও কথা বলছেন কেন?

দ্বারিক বলিলেন, আমাদের বিমলের যে বন্ধু এসেছে—ওরই কথা বলছি। এই বন্দেমাতরম্ গান, কাপড় পোড়ানো—এই সব নিয়ে পুলিসে খুব ধরপাকড় হচ্ছে। বরিশালে তো দাঙ্গা-হাঙ্গামাই হ'য়ে গেল।

যোগমায়া বলিল, বল না পলটু—আজকালকার ছেলেরা কি কারও কথা শোনে।

দ্বারিক বলিলেন, শুনতেই হবে। আজ সারা দিনটা গ্রামে যে হৈ হৈ হ'ল—ভেবেছ পুলিস সে খবর রাখে না? সব খবর ওরা রাখে। আমাদের মহীতোষ এখানকার থানার দারোগা কি না—সেই আধঘণ্টা আগে সাইকেল ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বললে, জ্যেঠা মশায়, বিমল ছোকরার বাবা শুনলাম দেশে থাকে না—আপনিই ওদের অভিভাবক, একটু সাবধান না হলে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে কিন্তু।

দ্বারের অন্তরালে যোগমায়া আর উদ্বেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। সরাসরি প্রশ্ন করিলেন, কি ব্যাপার বাবা?

—সে অনেক কথা। কিছু মারপিঠ—জেল সবই হতে পারে।

পুনরায় যোগমায়ার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপনি ওকে বুঝিয়ে দিন, বাবা।

দ্বারিক ম্লান হাসিয়া বলিলেন, বোঝাই নি মা, যথেষ্ট বুঝিয়েছি। কিন্তু রাগ করে না তো ওরা, খালি হাসে। সবই বোঝে—অথচ কিছুই না বোঝার ভাণ করে। তোমাকেই শক্ত হতে হবে—মা। রাম বাড়ি থাকলে—সে দায়িত্ব ছিল তার।

—যদি আমার কথা না শোনে?

—ভয় দেখাবে—শাসন করবে। না শুনলে নিজেদেরই ত ক্ষতি। তোরা ইস্কুল কলেজের ছেলে—লেখাপড়া ছেড়ে ও রকম হৈ হৈ করলে চলে? আজ বাদে কাল পাস দিয়ে চাকরিতে ঢুকবি, বিয়ে করবি।

আরও অনেক সদুপদেশ দিয়া—যোগমায়ার অন্তরে যথেষ্ট ভয়-সঞ্চার করিয়া দ্বারিক চলিয়া গেলেন।

যোগমায়া ভাবিতে লাগিলেন। শাসন তিনি কেমন করিয়া করিবেন বিমলকে। অভিমান করিয়া বড় জোর কথা না কহিতে পারেন, মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তীক্ষ্ণ বাক্যও প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু বড় চতুর সে ছেলে। মায়ের মন ওর কাছে যেন আয়নার মতই স্বচ্ছ। সে অভিমান ভাঙ্গাইবার কৌশল জানে, মৌখিক ক্রোধকেও গায়ে মাখে না। মাকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন মিষ্ট আর ব্যথাভরা কথাগুলি বলে—কথা বলিতে বলিতে এমন ছল ছল করিয়া উঠে দু'চোখ, এমন গদগদ হইয়া উঠে কণ্ঠস্বর—সেই দুর্ব্বলতা ব্যাধির মতই যোগমায়াকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সস্নেহে তিনি হাসিয়া ফেলেন, এবং চোখের কোলে আঁচল চাপিয়া আনন্দাশ্রুও মুছিতে হয়। ছেলের কাছে মা তাই স্বচ্ছ দর্পণতুল্য।

কিন্তু শাসন না করিলে ছেলের লাঞ্ছনা ঘটিবে। জেল হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। জেলের মধ্যে ঘানি টানা—পাথর ভাঙ্গা ইত্যাদি অমানুষিক পরিশ্রমগুলির কথাও তাঁহার মনে জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্পও দৃঢ় হইল।

আর একবার বিমলকে একান্তে পাইবার জন্য যোগমায়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে ফিরিল অনেক রাত্রিতে; উনানে ভাত চাপাইয়া দিয়া যোগমায়া মালা জপ করিতেছিলেন। ইষ্টমন্ত্র যত না জপিতেছিলেন—নানা চিন্তার ভারে প্রপীড়িতা হইয়া

ঈষৎ তন্দ্রাতুর আলস্যে চোখ দু'টি বুজিয়া দেওয়াল ঠেস দিয়া—বসিয়াছিলেন।

বিমল হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, শীগ্‌গির ভাত দাও মা—বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

যোগমায়ার জপ বা ঢুলুনি ভাঙ্গিয়া গেল। সচকিতে আলস্য ছাড়াইতে ছাড়াইতে একটু আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া কহিলেন, এত রাত অবধি তোদের কি হচ্ছিল? রাত্তিরেও কি কাপড় পোড়াচ্ছিলি?

—না মা, শরৎকে না হয় জিজ্ঞাসা কর—রায়দের বৈঠকখানায় বসে তর্ক করছিলাম। এত তর্ক করেছি বলেই তো বেজায় খিদে পেয়েছে।

—তা কিসের এত তর্ক?

—ওরা বসে বসে খালি তাস পাশা খেলে—পরের নিন্দে করে। বললাম, ওসব ভাল নয়। তার চেয়ে দেশের কাজ কর।

বিমল! যোগমায়ার তীব্র আর্ত্তস্বরে বিমল চমকিত হইল। ম্লান প্রদীপের আলো; তবু যোগমায়ার তীব্র কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কপালের কুঞ্চনে কয়েকটি রেখা উঠিয়াছে ফুটিয়া—আর সারা মুখে সে কি অসহায় কারুণ্য সেই সূক্ষ্ম রেখাগুলিতে পরিস্ফুট। বিমলের মনে হইল, মার বয়স যেন অকস্মাৎ অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল ভাবপ্রবণতার মুহূর্ত্তগুলিকে জয় করিবার শক্তি তাঁহার নাই। বিস্তৃত চক্ষের তারকায় শাসনের চেয়ে ভয়ের চিহ্নই প্রবল! হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে কহিল, তুমি এমন করে চাইচ—যেন আমি—

হাঁ—বিমল, আমাদের দুঃখু না দিলে তোদের বুঝি আনন্দ হয় না? তোরা দেশ দেশ করে ছুটবি—কিন্তু নিজের মায়ের দুঃখু বুঝবি কবে?

না, মার বয়স সত্যই বাড়িতেছে। এমন তুচ্ছ কথায় চোখের জলও বাহির করিতে পারেন। আগাইয়া আসিয়া তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া বিমল বলিল, তোমার দুঃখ বুঝি বলেই ত ভাত খেতে চাইছি। ওই দেখ—শরৎ আসছে।

যোগমায়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, খেয়ে দেয়ে একবার আমার কাছে যাবি—কথা আছে।

যোগমায়ার আহার যখন শেষ হইল—তখন বিমলরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যোগমায়া আজ বিমলের সঙ্গে বুঝাপড়া না করিয়া ঘুমাইতে পারিবেন না; পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে তিনি উপরের ঘরে আসিলেন। ভেজানো দুয়ার খুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন। দুই জনেই ঘুমাইতেছে। মাথার বালিশটা ভাল করিয়া টানিয়া লইবার তর সহে নাই, মশারিটা টাঙানো আছে—ফেলা হয় নাই, পাশবালিশ হাতখানেক দূরে পড়িয়া আছে। বিশৃঙ্খল কেশ পাশ—মুখে নিদ্রাতুর অসহায় ভাব, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়াছে—যত প্রয়োজনীয় পরামর্শ থাকুক—বিমলকে জাগাইতে বড় মায়া হইল তাঁহার। সারাদিন যা হুড়াহুড়ি করিয়া বেড়াইয়াছে—ইহাদের গভীর নিদ্রা যদি না আসিবে তো রাত্রি আসিবার সার্থকতা কি? শরৎ ছেলেটির উপর সারাদিন যোগমায়া প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিমল তো এমন ছিল না। বাড়ি আসিয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়ানো, স্বদেশী গান করা, কাপড় পোড়ানো—এই সব উদ্ভট খেলার সর্দ্দারই হইল—ওই শরৎ। যেমন কালো—তেমনই রোগা ছেলেটি। মা-বাবা বাঁচিয়া থাকিলে কি আর অমন ছন্নছাড়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত? বিমলের পাশে সে-ও ঘুমাইয়া আছে। কতটুকুই বা দেহ? ওর ওই দেহের মধ্যে আছে দুর্জ্জয় সাহস? আছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি? আছে অন্যকে কাজে মাতাইবার দক্ষতা? বিমলের পাশে যাহাকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া বোধ হইতেছে—সে চালাইবে বিমলকে? সে মন্ত্রণা দিবে বিমলকে খারাপ হইবার?

যোগমায়ার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। পাগলামি আর কাহাকে বলে! দ্বারিক ভট্টাচার্য্য বুঝিতে পারেন নাই—ছেলেমানুষের খেয়াল ছাড়া—নূতন খেলার আনন্দ ছাড়া—ওই স্বদেশীয়ানার মধ্যে এতটুকু সত্য বস্তু নাই। পাখার হাওয়া করিয়া মশারিটা ফেলিয়া দিলেন। পাশের বালিশ দু'টি মশারির মধ্যে গুছাইয়া রাখিলেন এবং আর এক বার অসহায় নিদ্রাতুর ছেলে দুটির পানে চাহিয়া মৃদুহাস্যে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া যোগমায়া বাহির হইয়া গেলেন। তখনও তাঁর অনেক কাজ বাকি। আজ দুখানা ভাল তরকারি রাঁধিয়া উহাদের পাতে দিতে পারেন নাই। কাল কি রাঁধিবেন—সেই চিন্তাটাই এইক্ষণে তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

বৈকালে বিমল আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আজ আমরা কলকাতায় যাচ্ছি।

শরৎ বলিল, জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় আবার আসব মা।

যোগমায়া বিস্মিত স্বরে বলিলেন, ও মা, এক্ষুনি যাবি কি? আজ যে সবি গয়লানীকে পাতক্ষীর দিয়ে যেতে বলেছি।

বিমল হাসিয়া বলিল, গাড়িতে যেতে যেতে খাওয়া যাবে—কি বলিস শরৎ?

শরৎ বলিল, চমৎকার।

যোগমায়া বলিলেন, তা যেন খেলি—ওবেলা যে তোদের ভাল ক'রে খাওয়া হয় নি।

বিমল হাসিয়া বলিল, জানিস শরৎ, যদি এক মাস এখানে থাকিস্ তো শুনবি—কোন দিনই তোর ভাল ক'রে খাওয়া হ'ল না! রোজই মা মনে করবেন—

—তুই থাম্!

আর জানিস্ শরৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত তরকারি আছে—আর তা এত রকমের রান্না হয় যে—এক বছর ধরে রাঁধলেও ফুরোয় না। তা ছাড়া যতই পাতে দেওয়া যায় মনে হয় বড্ড কম হ'ল। নয় মা?

যোগমায়া শরতের পানে চাহিয়া কহিলেন, আজকের দিনটা থেকে যাও—বাবা।

শরৎ নিরুপায়ের মত বিমলের পানে চাহিল। বিমল বলিল; মার ভাণ্ডার অফুরন্ত—অমন লোভীর মত তাকাস নে—শরৎ। বললাম তো পূজোর সময় আস্‌বি—তখন ইয়া বড় বড় রুই মাছ—তিন আনা সের।

যোগমায়া হাসিলেন, রুই মাছ খেয়ে তো রক্ষে রাখ না। না, আজ তোমাদের যাওয়া হবে না।

যোগমায়া চলিয়া গেলেন।

বিমল বলিল, তুই তো তাকিয়ে সব মাটি করলি। ওবেলা বড় মাছ আনিয়েছেন—শেষ না হলে কি আর যেতে দেবেন!

—বেশ তো রাজভোগ খাওয়া যাক্। কিন্তু রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে ওঁর স্নেহের জন্য অন্তত আমায় থাকতেই হবে।

যোগমায়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, এবেলা লুচি ভেজে দিই না হয়?

—না মা, গরম লুচি ভাল লাগবে না। কি বলিস শরৎ?

শরৎ বলিল, তা লুচিটাই বা মন্দ কি। মা যখন বলছেন।

বিমল বলিল, তোর বিশ্বাস মায়েরা খাওয়ার সম্বন্ধে কখনও ভুল করেন না?

শরৎ বলিল, তাই তো বিশ্বাস।

—ভুল শরৎ। ওঁদের খাওয়ানোর অত্যাচারে ছেলে চিররুগ্ন হয়—তা জানিস্?

যোগমায়া বলিলেন, তুমি বিশ্বাস করো না বাবা। মা যদি ছেলের ধাত না বোঝে তো তাকে ছেলেবেলায় অনেক ভোগ ভুগতে হয়।

বিমল বলিল, তা হয়। শরৎকে দেখলে সেটা বেশ টের পাওয়া যায়—মা।

যাট্! কথার ছিরি দেখ! যোগমায়া সেখানে দাঁড়াইলেন না।

বিমল বলিল, ছেলেদের খুঁড়লে মা সেখানে দাঁড়ান না। এমন অন্ধ স্নেহ—কোথাও দেখা যায় না, শরৎ।

শরৎ বলিল, যেখানে নিষ্ঠা বেশি—অন্ধত্ব সেখানে স্বাভাবিক। আমরা কবে এমন অন্ধত্ব নিয়ে দেশকে ভালবাসতে শিখব—বিমল?

বিমল বলিল, স্নেহই বল আর শ্রদ্ধা-ভক্তিই বল অন্ধত্ব ভাল নয়।

শরৎ বলিল, অন্ধত্বই ত শক্তি। ও শক্তিকে অস্বীকার করিস নে বিমল, পথ হারিয়ে ফেলবি।

বিমল বলিল, পথ চলব নির্ব্বিচারে? বিচার করব না—এ ত ভাল নয়।

—বিচার তর্ক আগে ক'রে নিস্, কিন্তু চলবার কালে সামনে থাক্‌বে শুধু পথ। শুধু চলবার সাধনা। তখন যদি বিচার করিস, তর্ক তুলিস—পথের লক্ষ্যে তোর পৌঁছোনো হবে না।

—এই কি তোমাদের দেশভক্তি শরৎ?

—এই আমাদের ভক্তি। এর জন্যই প্রাণ দেওয়া-নেওয়া চলে। বিচারের মূঢ়তা আমাদের আচ্ছন্ন করে না।

বিমল বলিল, কি জানি! আমার মনে হয়, ওই তোদের ফাঁক, ওরই মধ্যে নিষ্ফল হবার বীজ যেন পোঁতা রইল।

শরৎ বলিল, সেই জন্যই বলছি—সঙ্ঘ নেতার কাছে দীক্ষা গ্রহণ তোর আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

—দীক্ষার সময় হলেই নেব। তার আগে তোদের সঙ্গে হৈ হৈ করে দেশটাকে চিনে নেয়া যাক্। কে ওখানে!

যোগমায়া সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, আমি। একটু জল খাবি আয়।

বিদায়কালে যোগমায়া বিমলকে একটু দূরে লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্ বিমল—ওদের দলে তুই মিশবি নে।

বিমল যোগমায়ার পাদস্পর্শ করিল, কিন্তু শপথ করিল না। শুধু বলিল, আজ থাক—মা।

—না খোকা, আজ তুই কথা না দিলে আমার ভাবনা ঘুচবে না।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, কোন খারাপ কাজই আমি করব না। তোমার যাতে মাথা হেঁট হয়—এমন কাজ—

চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া যোগমায়া বলিলেন, থাক, থাক। তোদের জন্যেই না ভেবে মরি।

মায়ের উদ্বেগ বিমলের মনেও গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়া গেল। সে আপন মনে বলিল, পথ চলব—নির্ব্বিচারে নয়। বিচার চাই, যুক্তি চাই—তবে কাজ।

চিন্তার ভাগ কাহাকেও না দিয়া নিস্তার নাই; নিস্তারিণীর কাছে যোগমায়া সব খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া গালে হাত দিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, ওমা—আমি যাব কোথায়! থানা পুলিস এসব ভাল কথা নয় তো দিদি। তুমি এর বিহিত কর।

—কি বিহিত করব বোন। ছেলে বড় হয়েছে—

—বড় হয়েছে ব'লে মা'র কথা গেরাহ্যি করবে না? একটু ভাবিয়া হাসিয়া বলিলেন, হাঁ, যাতে গেরাহ্যি করবে তার উপায়ও একটা আছে।

—কি উপায় রে? যোগমায়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন।

—ছেলের বিয়ে দাও—দিদি। ও স্বদিশী-টদিশী কোথায় চলে যাবে।

যোগমায়ার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিস্তার যেন অন্ধকারে আলো জ্বালিয়া দিয়াছে। খুসিভরা কণ্ঠে তিনি কহিলেন, ঠিক বলেছিস—বোন। ওঁর তো খেয়াল নেই, চাকরি নিয়ে কোন্ তেপান্তরে পড়ে আছেন। আমি মরি আকাশ-পাতাল ভেবে। ঠিক বলেছিস।

নিস্তারিণী বলিলেন, তোমার ঠাকুরঝির দেশের সেই মেয়েটিকেই কেন দেখে এস না দিদি।

—কালই গোছগাছ করছি। এই অঘ্রাণেই ওর বিয়ে দেব —বোন। একটু থামিয়া বলিলেন, কা'কে বাড়ি আগ্‌লাতে রেখে যাই বল্ দেখি। বিশ্বাসী হয়—অথচ গরুগুলোর যত্ন করে।

—লোকের অভাব কি। রতনের বউকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—জিনিসপত্তর তছনছ করবে না তো? গরুকে শানি মেখে দেবে তো ঠিক সময়ে?

—মাত্তর দু'টি দিন তো—সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি পরশুই জিরেটে যাও দিদি। বেনেদের জীবনকে সঙ্গে নেবে তো?

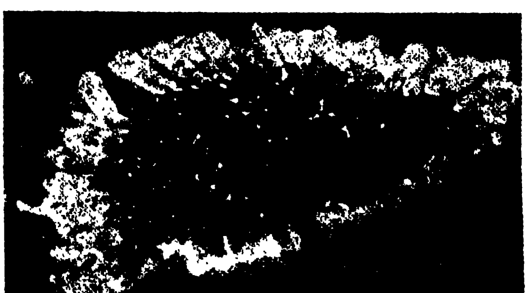
—হাঁ। ডাকতে-হাঁকতে ওই ছোঁড়াই তো যায়।—গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিলেই হবে। একটু থামিয়া বলিলেন শুধু হাতে তো যাওয়া যায় না। কিছু মিষ্টি আর তরিতরকারি নিতে হবে। আজ বরঞ্চ ঠাকুরঝিকে একখানা চিঠি লিখিয়ে দিই।

(ক্রমশঃ)

মশক দমনে জলজ-উদ্ভিদের অপূর্ব্ব প্রভাব

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বছর কয়েক পূর্ব্বে মশকভুক মাছ লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। খল্‌সে, পুঁটি, তেচোখা, চাঁদা, তেকাঁটা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ এবং শাল, শোল, বোয়াল প্রভৃতি মাছের ছোট ছোট বাচ্চাগুলি সকলেই কম-বেশী মশার বাচ্চা উদরস্থ করিয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখিয়াছিলাম, আমাদের দেশীয় পাতি-চাঁদা এবং কোলা-ব্যাঙের ব্যাঙাচিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মশক-শিশু উদরস্থ করিয়া থাকে। অবশ্য এই মশক-ধ্বংসের পরিমাণ অনেকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মশক-দমনে সাধারণতঃ তেচোখা মাছের কৃতিত্বের বিষয়ই বিশেষভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তেচোখা মাছগুলি সর্ব্বদাই জলের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে বলিয়া মশক-শিশুর প্রাচুর্য্য থাকিলেও অনেকেই তাহারা মাছের নজর এড়াইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। বাতাস গ্রহণ করিবার জন্য মশার বাচ্চাগুলি জলের উপরিভাগে উঠিয়া আসিবার সময় দৈবাৎ নজরে পড়িয়া গেলেই কেবল তাহারা তেচোখা মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাচ্চাগুলি জলের উপরে উঠিয়াই নীচু দিকে মুখ করিয়া নির্জীব খড়কুটার মত ঝুলিয়া থাকে; কাজেই অনায়াসেই মাছের নজর এড়াইয়া যায়। কিন্তু চাঁদা, খল্‌সে প্রভৃতি মাছেরা জলের মধ্যে বিচরণ করে। কিল্‌বিল করিয়া উপরে উঠিবার সময় বেশ দূর হইতেই মশার বাচ্চাগুলি তাহাদের নজরে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। বিভিন্ন জাতীয় মাছের মশার বাচ্চা উদরস্থ করিবার ক্ষমতা এবং তাহাদের রুচির তারতম্য পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে ছোট বড় অনেকগুলি কাচের জলাধারে মাছ ও মশার বাচ্চা রাখিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। দেখিলাম—প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই একটা জলাধারের পাঁচটা চাঁদা মাছ ছিয়াশীটি মশক-শিশু উদরস্থ করিয়া ফেলিল; কিন্তু অপর একটি জলাধারে সমানসংখ্যক তেচোখা-মাছেরা ঐ সময়ের মধ্যে বার-তেরটির বেশী মশার বাচ্চা উদরস্থ করিতে পারে নাই। মাছ ও মশার বাচ্চাগুলি স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবে বলিয়া কতকগুলি জলাধারে জলঝাঁঝি, পাটা-শ্যাওলা এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার জলজ উদ্ভিদ রাখিয়াছিলাম।



জলের উপরিভাগে মশার ডিম ভাসিতেছে



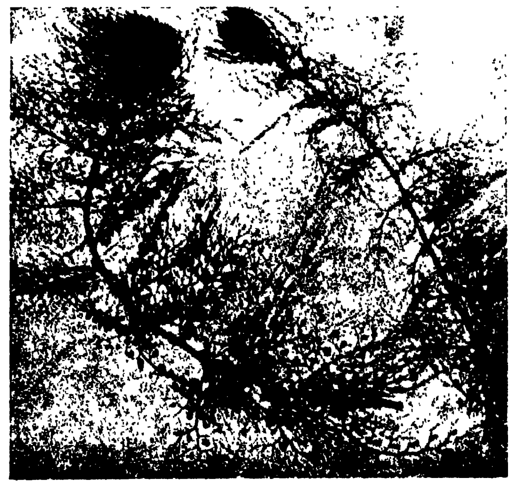
শ্বাসগ্রহণ করিবার জন্য নীচুদিকে মুখ করিয়া মশার বাচ্চাগুলি জলের উপরিভাগ হইতে ঝুলিয়া রহিয়াছে

কিন্তু ঘোলা জল এবং লতাপাতার প্রতিবন্ধকতার জন্যই খুব সম্ভব ঐ সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ সন্তোষজনক হয় নাই। বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি জলাধার রাখা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ছয়টি ছিল—জলজ উদ্ভিদপরিপূর্ণ; কিন্তু বাকী সবগুলিতেই পরিষ্কার জলে মশার বাচ্চা কিলবিল করিতেছিল। পরীক্ষার জন্য একবার সময়মত মৎস্য সংগ্রহ করিতে না পারায় জলজ-উদ্ভিদপূর্ণ জলাধার হইতে মাছগুলি তুলিয়া আনিয়া পরিষ্কার জলাধারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। লতাপাতাপূর্ণ জলাধারগুলিতে যে-সকল মশার বাচ্চা ছাড়িয়াছিলাম সেগুলি তেমনই রহিয়া গেল। তিন-চার দিন পর নজর পড়িতেই দেখিলাম—জলজ উদ্ভিদপূর্ণ জলাধারগুলিতে মশার বাচ্চার সংখ্যা যেন কম বোধ হইতেছে। আরও কয়েক দিন পরে ঐ সকল জলাধারে ক্বচিৎ দুই-একটি ছাড়া মশার বাচ্চা দেখিতেই পাইলাম না। এতগুলি মশার বাচ্চা কিরূপে অদৃশ্য হইল বুঝিতেই পারিলাম না;



মশার বাচ্চার তিনটি পুত্তলী দেখা যাইতেছে এবং অপর একটি পুত্তলী হইতে মশক নির্গত হইয়াছে

কারণ উহার কোনটিতেই একটিও মাছ ছিল না। এতগুলি বাচ্চা যে মশার রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া পলায়ন করে নাই তাহা সুনিশ্চিত। কারণ—ট্যাঙ্কগুলির মুখ পাতলা জালে আচ্ছাদিত ছিল। তার পর আরও কয়েকবার এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অনাবৃত জলাধারগুলি পাশাপাশি সজ্জিত রহিয়াছে। পরিষ্কার জলে মশার বাচ্চা কিলবিল করিতেছে অথচ জলজ-উদ্ভিদপূর্ণ জলাধারে মশার বাচ্চা নজরে পড়ে না। তবে কি জলজ উদ্ভিদপরিপূর্ণ জলাধারে মশকেরা ডিম পাড়ে না? ব্যাপারটায় যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার হইলেও মশকভুক মাছ সম্বন্ধে পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকায় এ বিষয়ে তেমন কিছু মনোযোগ দিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে কোলা-ব্যাঙের ব্যাঙাচির মশক-শিশু ভক্ষণের ব্যাপার অকস্মাৎ নজরে পড়ে। এই ব্যাঙাচির জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় সম্যক্ অবগত হইবার জন্য বহু স্থানে নালা, ডোবা ও অন্যান্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী জলাভূমিসমূহ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে মশার বাচ্চার উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে অনেকগুলি অদ্ভুত বিষয় নজরে পড়ে। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার সময় জলজ-উদ্ভিদপূর্ণ জলাধারে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও সেরূপ অনেকগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম। সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ-বিবর্জ্জিত পচা জল পরিপূর্ণ অস্থায়ী

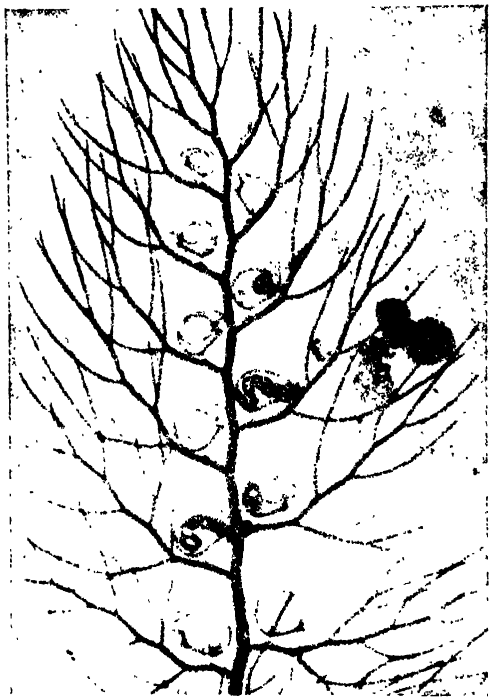


'ইউট্রিকুলেরিয়া ভালগারিস' নামক কীটভোজী জলজ-উদ্ভিদ। আমাদের দেশের খালে, বিলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়

জলাশয়েই মশক-শিশুর প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাটা-শ্যাওলা, জল-ঝাঁঝি ও অন্যান্য বহুবিধ জলজ-উদ্ভিদপরিপূর্ণ অথবা সম্পূর্ণরূপে পানায় আবৃত অধিকাংশ জলাশয়ে মশার বাচ্চা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

বিশেষ একটি পরীক্ষাকার্য্যের প্রয়োজনে কিছুকাল পূর্ব্বে পরীক্ষাগারে এক-কৌষিক আণবিক উদ্ভিদ ও সূত্রবৎ শৈবাল জাতীয় জলজ উদ্ভিদ জন্মাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। বড় বড় গামলা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে নাইটেলা, কারা, হাইড্রিলা, ভেলেস্‌নেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জলজ উদ্ভিদ প্রতিপালিত হইতেছিল। কিছু কাল পরে দেখা গেল—কতকগুলি গামলায় উদ্ভিদগুলি স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইলেও কয়েকটি গামলার উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-সকল গামলায় উদ্ভিদগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে তাহাতে একটিও মশার বাচ্চা নাই; কিন্তু যেখানে গাছগুলি মোটেই জন্মে নাই এবং যেখানে সেগুলি মরিয়া পচিয়া উঠিতেছিল তথায় প্রচুর পরিমাণ মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই ঘটনা লক্ষ্য করিবার পর এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে—দিনের বেলায় এই সকল জল-নিমজ্জিত উদ্ভিদ হইতে অনবরত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ সূক্ষ্ম সূত্রাকারে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। এগুলি অক্সিজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদ্। আলোর প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহে সংগঠন-উপযোগী খাদ্যবস্তু প্রস্তুতের সময় এই গ্যাস নির্গত হয়। অনেকবারই মনে হইয়াছিল—এই অক্সিজেন কি মশার বাচ্চা নিয়ন্ত্রণে কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে? কিন্তু

এরূপও ত হইতে পারে যে, ঐ সকল উদ্ভিদ হইতে কোন পদার্থ নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইবার ফলেই মশার বাচ্চাগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে জলজ-উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ কয়েকটি বদ্ধ জলাশয়ে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সেখানে মশার বাচ্চার সন্ধান না মিলিলেও অন্যান্য জলজ কৃমি,



'ইউট্রিকুলেরিয়া'র একাংশ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রন্থিতে দুইটি করিয়া শিকার ধরিবার ফাঁদ বা থলি রহিয়াছে

কীটের অভাব ছিল না। কাজেই সন্দেহ করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল যে, উদ্ভিদ হইতে কোন বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইলে সকল প্রকার কৃমি, কীটই বিনষ্ট হইত। যাহা হউক, মশক নিয়ন্ত্রণে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা কে কি গবেষণা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে দেখিতে পাইলাম, মশক বিনাশের উপায় নির্দ্ধারণকল্পে বিভিন্ন দেশের যে-সকল বৈজ্ঞানিক, গবেষণা এবং অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ কয়েক প্রকার জলজ উদ্ভিদের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা সাধারণ পর্য্যবেক্ষণের পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া প্রকৃত গবেষণার ক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। অনেকেই জলজ-উদ্ভিদ সমন্বিত জলাশয়ে মশার বাচ্চার অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু ইহার বিপরীত ঘটনাও যে লক্ষিত হয় নাই—এমন নহে। তবে এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে—বিশেষ বিশেষ জলজ-উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ জলাশয়ে সাধারণতঃ মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে না অথবা জন্মগ্রহণ করিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাদের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া যায়। পর্য্যবেক্ষণ এবং গবেষণার ফলে মশক-দমনে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মশকের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ হইলেও মশকেরা আমাদের সহিত যেরূপ ভয়াবহ শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কেবল মানুষই নহে, জন্তু-জানোয়ারেরাও ইহাদের আক্রমণ হইতে রেহাই পায় না। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের বীজাণুসমূহ বিভিন্ন জাতীয় মশক কর্ত্তৃকই মনুষ্যশরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। জীবজন্তুর কয়েকটি বিশেষ রোগও মশক কর্ত্তৃক দেহান্তরে পরিচালিত হয়। কেবল রোগবীজাণু সংক্রমণের ব্যাপারই নহে, মশকের অভাবনীয় আধিক্যহেতু ইহাদের দলবদ্ধ দংশন যন্ত্রণার ভয়ে বাসোপযোগী অনেক স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনুসন্ধানকারী এবং ভ্রমণকারীদের অনেকেই দলবদ্ধ মশকের ভীষণ আক্রমণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে আমাদের দেশেও যে কোন কোন অঞ্চলে দলবদ্ধ মশক আক্রমণে লোকের জীবন বিপন্ন হইত; এরূপ ঘটনার কথা বিরল নহে। মশকেরা যে ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু বহন করে একথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মানুষের অজ্ঞাত ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে সার রোণাল্ড রস্ তাঁহার এই অদ্ভুত



'ইউট্রিকুলেরিয়া'র থলিতে জলজ-কীট প্রবেশ করিতেছে

আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন যে, ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী জীবাণুগুলি তাহাদের জীবনের মধ্যমাংশে মশকের দেহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এই সময়ে মশক কর্ত্তৃক দংশিত হইলে রোগবীজাণু মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে **Culex pipiens** নামক সাধারণতঃ পরিচিত কেবলমাত্র এক

জাতীয় মশার মোটামুটি জীবনবৃত্তান্ত জানা ছিল। ১৯০০ খ্রীঃঅব্দে ডাঃ হাওয়ার্ড এক জাতীয় এনোফেলিস্ মশার জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। এনোফেলিস মশকেরাই ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে বলিয়া বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলিতে থাকে। ম্যালেরিয়ার মত ব্যাপক এবং মারাত্মক ব্যাধি বোধ হয় খুব



'এলোডিয়া' নামক এক জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ

কমই আছে। যদিও কুইনিন এবং তাহার অন্যান্য যৌগিক পদার্থসমূহ ম্যালেরিয়ার প্রতীকারার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তথাপি ইহা সম্পূর্ণ অব্যর্থ নিরোধক নহে। রোগবীজাণু-বাহক এনো-ফিলিস মশকের উৎপত্তি নিয়ন্ত্রণ করাই হইতেছে ম্যালেরিয়া দমনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

কেবল ম্যালেরিয়াই নহে—ক্রমশঃ দেখা গেল, অন্যান্য রোগও মশক কর্ত্তৃক মনুষ্যদেহে পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৯০০ খ্রীঃঅব্দে ডাঃ রিড্ মশক সম্বন্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় প্রকাশ করেন। তাহাতে দেখা যায় যে, **Aedes aegypti** অথবা **Aedes argenteus** নামক একজাতীয় মশকের দংশনের ফলেই পীতজ্বর মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়। পীতজ্বরের উৎপত্তি পশ্চিম-আফ্রিকায়; কিন্তু পণ্যবাহী জাহাজাদির আশ্রয়ে রোগবীজাণু বাহক মশকেরা আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে পরে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পীতজ্বরের বীজাণু বহনকারী প্রায় ১৩।১৪ রকমের মশকের অস্তিত্ব রহিয়াছে। এস্থলে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রোনাল্ড রসের আবিষ্কারের প্রায় ১৯ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৯ খ্রীঃঅব্দে সর্ প্যাট্রিক ম্যান্‌সন্ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, **Filaria bancrofti** নামক কৃমিবৎ একপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগবীজাণু জীবনের একাংশ মশকের উদরে অতিবাহিত করিয়া থাকে। কিন্তু কি ভাবে ইহারা মশকের উদরে আশ্রয় গ্রহণ করে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ১৯০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জানিতে পারা যায় যে, ব্যাপকভাবে সংক্রমণশীল ডেঙ্গু-জ্বরও **Culex fatigans** নামক মশকের সাহায্যে মনুষ্যদেহে পরিচালিত হইয়া থাকে। বিস্তৃত গবেষণার ফলে পরে দেখা যায় যে, **Aedes albo pictus** এবং **Aedes argenteus** নামক মশকেরাই এই রোগের প্রকৃত বাহক।

মশক কর্ত্তৃক এরূপ কয়েকটি সাংঘাতিক রোগ মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়, একথা প্রমাণিত হইবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মশকের জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবল উদ্যমে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলিতে থাকে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২৪২টি বিভিন্ন জাতীয় মশকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে তিন হাজারেরও বেশী বিভিন্ন জাতীয় মশকের অস্তিত্বের খবর জানা গিয়াছে। সকল জাতীয় মশকের বাচ্চাই জলে অবস্থান করে। তবে কোন কোন মশকের ডিম ফুটিতে পাঁচ-সাত দিন মাত্র সময় লাগে আবার কাহারও কাহারও ডিম ফুটিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। প্রবল স্রোত ব্যতীত পরিষ্কৃত, অপরিষ্কৃত, বদ্ধ বা মুক্ত, ছোট বড় যে-কোন জলাশয় বা জলাধারে মশকেরা তাহাদের ডিম পাড়িয়া রাখে। মশক-বংশ বিস্তারের অনুকূল অথবা প্রতিকূল স্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনুসন্ধানের



'কারা ফ্রাজিলিস্' নামক জলজ-উদ্ভিদ

জন্য বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে থাকেন। ইহার ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে যাঁহারা অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলেন—কতকগুলি জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছে



'হাইড্রিলা' নামক জলজ-উদ্ভিদ

অথচ তদনুরূপ অন্যান্য কতকগুলি জলাশয়ে একটিও মশক-শিশুর অস্তিত্ব নাই। তখন তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, খাদ্যের প্রাচুর্য্য বা অভাব বশতঃই এরূপ ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিলেন—ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ-পত্রাদি জলের উপরিভাগ আবৃত করিয়া রাখিলে সেখানে মশক-শিশুরা বাহিরের বাতাস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে আবার এই অভিমতও প্রকাশ করিলেন যে, জলের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের আধিক্য হইলে বাচ্চাগুলি তাহাতে জড়াইয়া গিয়া মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য বিভিন্ন জাতীয় মাছ ও অন্যান্য জলজ পোকামাকড়েরা যে মশার বাচ্চা ধ্বংস করিয়া থাকে ইহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

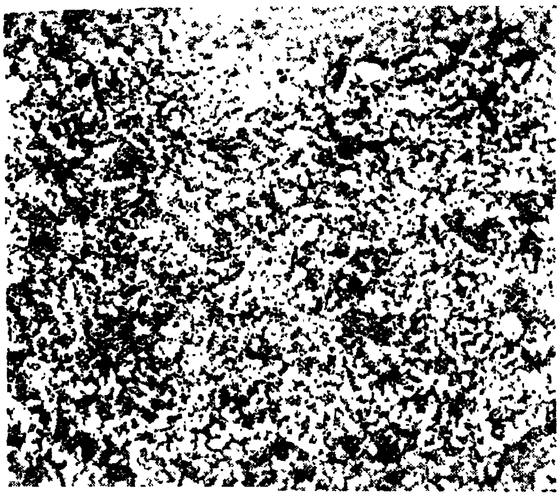
যাহা হউক, বিভিন্ন জাতীয় জলজ উদ্ভিদেরা যে মশার বাচ্চা ধ্বংসের কারণ হইতে পাবে এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অতি অল্পদিন পূর্ব্বে। কতকগুলি উদ্ভিদ যে মশা-মাছি উদরস্থ করিয়া থাকে এ ঘটনা অবশ্য অনেক পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ডারুইন কীটপতঙ্গভুক উদ্ভিদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ইহাদের শিকার ধরিবার কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হইতে পারেন নাই। ঐ সময়েই মিসেস্ ট্রীট কৃমি-কীটভোজী ইউট্রিকুলেরিয়া নামক জলজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলিয়ার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মৃত কীট দেখিতে পাইয়াছিলেন—কিন্তু ইহার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। ১৯১১-২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রোচার, হেগ্নার প্রমুখ গবেষণাকারীদের বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে একথা সঠিকরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয় জলজ উদ্ভিদেরা কীট-পতঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীড়া উদরস্থ করিয়া দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে। ৭ ফুট লম্বা একটা ইউট্রিকুলেরিয়ার থলিগুলির মধ্যে হেগ্নার ১৫০,০০০-এর অধিক সংখ্যক কীড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অসংখ্য মশার বাচ্চাও ছিল। এই হিসাবে মশক-নিয়ন্ত্রণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই উদ্ভিদের কার্য্যকারিতার বিষয় সহজেই উপলব্ধি হইবে। এতদ্ব্যতীত পানাজাতীয় বিভিন্ন রকমের ভাসমান উদ্ভিদের সংখ্যাধিক্যের ফলে যে অনেক ক্ষেত্রে মশক-জন্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ইহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

জলের উপরে ভাসমান পানাজাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও সাধারণ লতাগুল্মের মত অসংখ্য রকমের জলনিমজ্জিত উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জলের নীচে কর্দ্দমাক্ত মাটিতে শিকড় চালাইয়া জলের প্রায় উপরিভাগ পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'কারাসি' গণভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ লইয়া অনেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মশক দমনে তাহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা রহিয়াছে। কেহ কেহ আবার লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 'কারা' জাতীয় উদ্ভিদে আচ্ছন্ন এক জলাশয়ে মশার বাচ্চার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না; অথচ অনুরূপ আর এক জলাশয়ে অসংখ্য বাচ্চা কিলবিল করিতেছে। এইরূপ পরস্পরবিরোধী ফলাফল দেখিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রোঃ ম্যাথেসন্ Chara vulgaris নামক জলজ-উদ্ভিদ লইয়া ব্যাপকভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। প্রকৃত কারণ কি—তাহা নির্দ্ধারিত না হইলেও তাঁহার পরীক্ষার ফলে ইহাই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ অধ্যুষিত জলাশয়ে মশক-শিশুরা মোটেই বৃদ্ধি পাইতে পারে না।



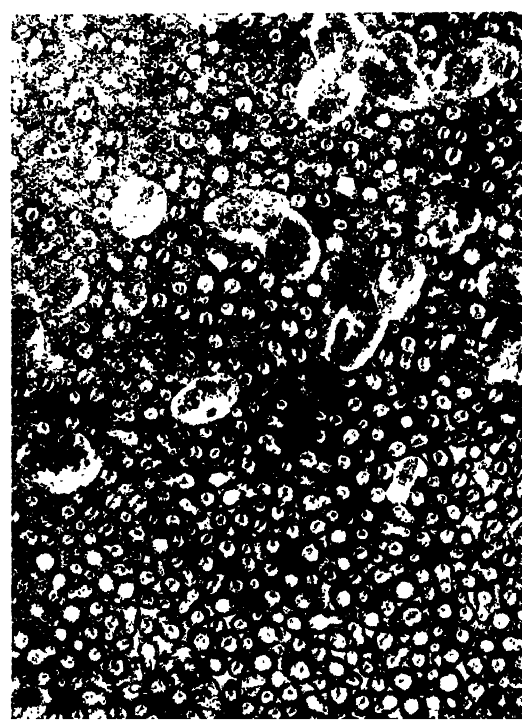
'ভ্যালিসনেরিয়া' বা পাটা-শ্যাওলা নামক জলজ-উদ্ভিদ

মশক দমনে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়-সমূহ অবগত হইবার পর কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশীয় এনোফেলিস্, কিউলেক্স এবং অন্যান্য দুই-এক জাতীয় মশকের কীড়া এবং নাইটেলা, হাইড্রিলা, কারা, ভ্যালিসনেরিয়া প্রভৃতি এদেশীয় জলজ-উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি। পরীক্ষার



গুঁড়ি-পানা পুকুরের উপরিভাগকে সবুজ আস্তরণের মত ঢাকিয়া রাখিয়াছে

ফলে এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে এস্থলে তাহার মোটামুটি বিবরণ দিতেছি। বিস্তৃত বিবরণ পরে অন্যত্র প্রকাশিত হইবে। প্রথমতঃ উপরোক্ত জলজ-উদ্ভিদগুলি কাচের জলাধারে উন্মুক্ত অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে রাখা হইয়াছিল। পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার জলপূর্ণ আরও কতকগুলি উন্মুক্ত কাচের জলাধার পাশাপাশিই সজ্জিত ছিল। ইহাদের একটিতেও জলজ-উদ্ভিদ রাখা হয় নাই। কয়েক দিন পরেই দেখা গেল জলজ-উদ্ভিদ-বিবর্জ্জিত জলাধারগুলিতে কম-বেশী যথেষ্ট মশক-শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ একটি জলাধারেও মশক-শিশু দেখা যাইতেছে না। দিন দুই পরে ভ্যালিস্‌নেরিয়ার জলাধারে গুটিতিনেক ক্ষুদ্রকায় মশার বাচ্চা দেখিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাও আবার দুই দিন পরেই অদৃশ্য হইয়া গেল। পরীক্ষার ফলে দেখিলাম—শেওলা অধ্যুষিত জল কিঞ্চিৎ ক্ষারধর্ম্মী হইয়াছে। তবে কি ক্ষারধর্ম্মী জলে বাচ্চাগুলি বাঁচিতে পারে না? ঐ জল অন্য পাত্রে ঢালিয়া রাখিয়া দিলাম। পাঁচ-সাত দিন পরে দেখি, তাহাতে কিছু কিছু মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উদ্ভিদ-বিবর্জ্জিত এবং উদ্ভিদ-সমন্বিত উভয় প্রকার জলেই দুই-চারিটি করিয়া ক্ষুদ্রকায় জল-পোকা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহারা যেমন ছিল তেমনই আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ হইতেই কম বেশী অক্সিজেন-বুদ্বুদ নির্গত হইত। হিঞ্চে, কল্‌মি, জল-ঘাস প্রভৃতি অর্দ্ধ নিমজ্জিত উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষার ফলে দেখিলাম সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিতেছে। কাজেই উদ্ভিদ-দেহ নির্গত অক্সিজেনই মশক-ধ্বংসের প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হইল। যাহা হউক, ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য জলজ-উদ্ভিদ পরিপূর্ণ জলাধারে অন্য স্থান হইতে মশক-শিশু আনিয়া ছাড়িয়া দিলাম। দুই-তিন দিনের মধ্যেই তাহারা প্রায় সকলেই অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই রকম ফল দেখিতে পাইয়া এবার সোজাসুজি অক্সিজেন প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলাম। অক্সিজেন সিলিণ্ডার হইতে সূক্ষ্ম টিউব সহযোগে পোর্সেলিন ফিল্টারের মধ্য দিয়া মশার বাচ্চা পরিপূর্ণ জলাধারের তলার দিক হইতে গ্যাস প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। জলজ-উদ্ভিদ হইতে যেভাবে সূত্রাকারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুদ্বুদ উত্থিত হয় এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবেই অসংখ্য বুদ্বুদ উঠিতেছিল। ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা গ্যাস প্রয়োগের সময় বাচ্চাগুলি যেন অস্বস্তিকর অবস্থায় কিলবিল করিতেছিল। দুই-তিন ঘণ্টা পর তাহাদিগকে আর বড় একটা উপরের দিকে উঠিতে দেখা গেল না। সকলেই তখন জলের তলায় আশ্রয় লইয়াছে। দুই দিন পর দেখিলাম জলাধারে একটিও মশার বাচ্চার অস্তিত্ব নাই। গ্যাসের চাপ হ্রাস করিয়া বুদ্বুদের সংখ্যা কমাইয়া দিলাম। তাহার ফলে দুই দিন পরে দেখিলাম, বাচ্চাগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইলেও সকলগুলিই বিনষ্ট হয় নাই। বুদ্বুদের সংখ্যা কম রাখিয়া গ্যাস প্রয়োগের সময় বাড়াইয়া দিলাম। দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল সমস্ত বাচ্চাই অদৃশ্য হইয়াছে। অথচ যে-সকল জলাধারে গ্যাস প্রয়োগ করা হয় নাই তাহাদের বাচ্চাগুলি যথাসময়ে ক্রমে ক্রমে মশকে রূপান্তরিত হইতেছিল। এই



'উলফিয়া পাঙ্কটাটা' এবং 'ল্যাম্‌না মাইনর' নামক পানা জলের উপরিভাগ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে

সকল ঘটনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, খুব সম্ভব জলজ-উদ্ভিদ হইতে নির্গত অক্সিজেনই মশক-শিশু বিনাশের

কারণ ঘটাইয়া থাকে ; কিন্তু কি ভাবে ইহা কার্য্যকরী হয় তাহা বলা অধিকতর পরীক্ষাসাপেক্ষ।

আমাদের দেশে খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়ে ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয় কীটভোজী জলজ উদ্ভিদের অভাব নাই। মশার বাচ্চা পরিপূর্ণ জলাধারে এই গাছগুলিকে রাখিয়া দেখিয়াছি তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলিকে উদরস্থ করিয়া ফেলে। অবশ্য ক্ষুদ্রকায় বাচ্চাগুলিই বেশীর ভাগ ইহাদের ফাঁদে পতিত হইয়া থাকে। তাছাড়া আমাদের দেশীয় গুঁড়ি-পানা, ইঁদুরকানী-পানা প্রভৃতি যে সকল জলাশয়কে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে আবৃত করিয়া রাখে তথায় মশার-বাচ্চা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হইবে। পানার আবরণ ভেদ করিয়া মশকেরা সাধারণতঃ ডিম পাড়িতে পারে না ; আর ডিম পাড়িলেও বাচ্চা বাহির হইবার পর তাহারা জলের উপর হইতে বাতাস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে-সকল জলাশয়ে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রং-বেরঙের আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের আধিক্য বশতঃ পুরু সরের মত আস্তরণ পড়ে সে-সকল জলাশয়েও বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত কারণেই মশক-শিশুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। পানা অথবা আণুবীক্ষণিক 'য়্যালগি' জাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা অংশবিশেষ আবৃত জলাশয়ের পক্ষে অবশ্য এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। মোটের উপর দেখা যায়, মশকেরা যেখানে সেখানে অনায়াসে জন্মগ্রহণ করিতে পারিলেও কেবলমাত্র মৎস্যাদি প্রাণীই নহে, বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদেরাও অহরহ প্রভূত পরিমাণে তাহাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। প্রকৃতির রাজ্যে এই ভাবেই সাম্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

জীবনে আদর্শবাদ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আমাদের অনেকের মনে এই রকম একটা ধাঁধা আছে যে আমরা অনেক দিক দিয়ে এত উন্নত কিন্তু তবু আমাদের দুর্দশা ঘোচে না কেন। ভারতবর্ষীয়দের, বিশেষ ক'রে বাঙালীর, একটা সম্পদ হ'ল তার ভালবাসবার শক্তি। এই শক্তি সম্বন্ধে আমরা কম-বেশী পরিমাণে সকলেই সজ্ঞান, হয়ত গৌরবান্বিতও। এখন একটু বিচার ক'রে দেখা যাক্ আমাদের এই ধারণা কতটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমরা মনে করি আমরা তিনটি জিনিসকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসি—কেউ প্রিয় বা প্রিয়াকে, কেউ দেশ বা জাতিকে, কেউ ধর্ম্মকে। বলা বাহুল্য, এর যে-কোন একটা ভালবাসা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে মানুষকে তার মনুষ্যত্বে, এমন কি দেবত্বেও নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আসলে সেটা সত্য কিনা তাই বিচারসাপেক্ষ।

আমরা যখন কোন মানুষকে বন্ধুভাবে ভালবাসি কিংবা কোন স্ত্রীলোককে প্রিয়াভাবে ভালবাসি, তখন আমরা স্বতই মনে করি যে পৃথিবীতে এমন কোন অসাধ্য বা দুঃসাধ্য কাজ নেই যা আমার প্রেমাস্পদের জন্যে করতে না পারি। কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, শেষ নাগাদ এ গৌরব টেঁকে না। প্রিয়াকে হারিয়ে প্রিয় দু-চার মাস বা দু-চার বছর বৈরাগ্য গ্রহণ করলেও তার পর আবার অন্য প্রিয়াকে গ্রহণ করেন এবং বাকী জীবন হাসিমুখে কাটিয়ে দেন—কোন দিন সে জীবনে যে অন্যের পদস্পর্শ ঘটেছিল তার কোন চিহ্নও থাকে না। এই রকম এক বন্ধু যায়, আর এক বন্ধু আসে—মনে হয় যে এল সে যেন আগের চেয়েও ভাল। প্রিয়ার দিকের অবস্থাও একই প্রকার। প্রিয়কে যে-রকম ভালবেসে-ছিলেন, মনে হয়েছিল মানুষ আর একজন মানুষকে তেমন ভালবাসতে পারে না, কিন্তু দেখা গেল সেটা দু-চার মাসের বা দু-চার বছরের ব্যাপার ; তার বেশী তার জীবনীশক্তি নেই। সুতরাং আবার তিনি অন্য অবলম্বন পেলেন, তাকে ভালবাসলেন, ঘর-সংসার পাতলেন—পূর্ব্বের ইতিহাস দুঃস্বপ্নের মত মনে উঠলে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। এর মধ্যে শতকরা কিছু লোক এমনও আছেন যাঁদের মনে পূর্ব্বের স্মৃতি হাহাকার জাগিয়ে তোলে—তাঁরা সাধারণ থেকে কিঞ্চিৎ উচ্চ স্তরের।

এই অবধি পড়ে কেউ কেউ মনে করবেন আমি নিরাশাবাদী (pessimist) লোক, যৌবনের রঙীন স্বপ্ন আমি ভেঙে দিতে চাই। কেউ মনে করবেন আমি আঘাত খেয়েছি বিস্তর—তাই আমার এই বর্ত্তমান মনোভাব তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপার আদৌ তা নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রেই কথা বলছি। এর উল্টো কথা বলতে পারলেই আমি খুশী হতুম কিন্তু তা হবার নয়। তার কারণ হচ্ছে **Man is so made.**

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে দেশ বা জাতিকে ভালবাসা। দেখা যাক, এই বিষয়েই বা আমরা কতটা সত্যনিষ্ঠ। ছোটবেলা থেকে যখন আমরা স্কুলে পড়ি, পাঠ্য পুস্তকে দেশপ্রেমের নানা কাহিনী এবং উদাহরণ শুনি, তখন আমাদের মনে সন্দেহ থাকে না যে আমাদের দেশকে আমরাও বুঝি ঐ রকমই ভালবাসি। তার পর আমরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি, নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিই, তর্ক করি, সমস্যার সমাধান করি, তখনও আমাদের সান্ত্বনা থাকে যে আমরা দেশ এবং জাতিকে সত্যিই ভালবাসি। তার পর আসে পরীক্ষার সময়। সেই পরীক্ষায় আমরা শতকরা নিরনব্বই জন করি ফেল। যখন দেখি আমার দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'লে আমাকে জেলে যেতে হয়, চাকরি ছাড়তে হয় বা প্রিয়জনের বিরাগভাজন হতে হয়, তখন মত বদলে ফেলি। গম্ভীরভাবে বলি, ও পথটা ঠিক নয়, তার চেয়ে অমুক রাস্তা ধরে চলাই যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি। এটা আসলে আমাদের যুক্তি নয়, এ হচ্ছে নিজেকে ভোলানো বা ঠকানো এবং কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ত্যাগ বা দুঃখকে এড়িয়ে চলা। আমাদের দেশপ্রেমকেও বিক্রয় করা চলে। যখন দেখি কৈশোরে যে দেশভক্তি বুকের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছিল তাকে পণ্যস্বরূপ ব্যবহার করতে পারলে বৎসরান্তে চৌষট্টি হাজার টাকা মুনাফা হ'তে পারে তখন আমাদের লোভ হয়ে ওঠে দুর্দমনীয়। কিন্তু এই লোভ এবং অহংকারের উদ্যত পানপাত্র ওষ্ঠপুট থেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে দিতে পারলে তবেই হয় দেশমাতৃকার জয়—স্বাদেশিকতা এবং স্বাজাত্যবোধের কষ্টিপাথরে যে দাগ অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে সে হ'ল আত্মাহুতির, আত্মরতির নয়। তাই আজ অবধি যত জন দেশভক্ত বা জাতি-অনুরক্ত সন্তান তাঁদের নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশের নামই সাধারণের অগোচরে রয়ে গেছে—তাদের দিন কেটেছে অনশনে, অর্ধাশনে, দুঃখে, দারিদ্র্যে, পীড়নে, রোগে, শোকে, লৌহকারাগারের পিছনে। নিজেদের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ ক'রে দেওয়ার সাধনাই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন—পালন করেছেন সে ব্রত। লোকে বলেছে বুদ্ধিহীন, কেউ বলেছে বিপথগামী। কিন্তু তবু এই কথাই সত্য যে যুগে যুগে এই রকম আত্মভোলা বিপথগামী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয় বলেই জগতের উচ্চ আদর্শগুলি এখনও আচরণের অভাবে লুপ্ত হয়ে যায় নি। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও আমাদের স্বদেশপ্রীতির অভিমান কতটা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সকলে বিচার ক'রে দেখবেন।

তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল ধর্মকে ভালবাসা। ধর্মের প্রসঙ্গ তুললেই কিছু লোক নাসিকা কুঞ্চিত করবেন জানি। তাঁরা বলেন ধর্ম ব্যাপারটা একটা বিশেষ বয়সের এবং একদল বাতিকগ্রস্ত লোকের এলাকাভুক্ত। সাধারণ জীবনে (normal life) ওটা না হলেও চলে, বরঞ্চ থাকলেই ধূমকেতুর মত তার পুচ্ছ দুলিয়ে অনেক শুভকে সে নষ্ট ক'রে দেয়। খাও দাও সংসারে উন্নতি কর—তার পর যখন বয়স পঞ্চাশ পেরবে, ভোগশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসবে, বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় জড়তাপ্রাপ্ত হবে, তখন ধর্ম-টর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করবার আসবে সুদীর্ঘ অবসর। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের মনোবৃত্তি কত দূর বিরূপ, একটা ঘটনার উপর আমাদের মন্তব্যের উল্লেখ করলে বোঝা যায়। শুনতে পাই কোন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন নাকি তাঁর গুরুদেবের নামে স্বীয় স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। ঘটনা শুনে তাঁর পরিবার থেকে আরম্ভ ক'রে দেশে এমন লোক কেউ রইল না যিনি না বললেন যে লোকটা বিকৃত-মস্তিষ্ক, তাঁর চিকিৎসা করানো দরকার। অর্থাৎ কিনা তিনি যদি তাঁর দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের নামে কিংবা তাঁর কোন প্রিয়তর ব্যক্তি বা স্ত্রীলোকের নামে সমস্ত দান ক'রে যেতেন আমরা সহ্য করতে পারতুম। বলতুম, তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি, তিনি দিয়েছেন—আমাদের বলার কিছু নেই। যদি তিনি দেশের বা জাতির নামে কোন কলেজ করতেন, কি কোন হাসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করতেন, আমরা আপামরসাধারণ সকলেই ধন্য ধন্য করতুম। কিন্তু যেই শুনলুম তিনি তাঁর গুরুদেবের নামে সব দিয়ে গেছেন, অমনি আমাদের ভালমন্দ বিচার করবার বুদ্ধি সজাগ হ'য়ে উঠল। অমনি মনে হ'ল নিশ্চয় এর মধ্যে গুরুদেবের তাঁর শিষ্যকে ঠকিয়ে বড়লোক হওয়ার বুদ্ধি কাজ করেছে—শিষ্য সেটা ধরতে পারেন নি। অর্থাৎ ধর্মের নামে কোন ব্যক্তিকে কিছু দিলে সেটা আমরা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নই। মনে হয় ওর মধ্যে নিশ্চয় কোথাও জুয়াচুরি আছে। মানুষ অন্যত্র দিলেও যেমন মনে তৃপ্তি অনুভব করে, গুরুকে দিলেও যে সেই তৃপ্তি সে লাভ করতে পারে, এ কথাটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য। ধর্মের প্রসঙ্গমাত্রই যে আমাদের কাছে কত অরুচিকর এ মন্তব্যে তারই পরিচয়।

ধর্মের জন্য সকল দেশে এবং সর্ব যুগে ঋষি এবং মনীষীদের যে সবচেয়ে বড় ত্যাগ করতে হয়েছে এ কথা সর্বজনবিদিত। শাক্যসিংহ তাঁর রাজ্যপাট ত্যাগ করেছিলেন, গৌরাঙ্গদেব তাঁর আত্মীয় এবং আত্মীয়াদের ত্যাগ

করেছিলেন, পাশ্চাত্য দেশে Spanish Inquisition-এর কাহিনীও কম রোমাঞ্চকর নয়। এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কোন ছোট ত্যাগই বড় লাভকে নিয়ে আসতে পারে না, মহৎ লাভকে করায়ত্ত করতে হ'লে মহৎ আহুতি প্রয়োজন। এই মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা আমাদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতাকে নিরিখ ক'রে দেখতে পারি।

উপরে যত দূর বলেছি তার থেকে বোঝা যাবে যে, মানুষ বা দেশ বা জাতি বা ধর্ম কোন কিছুর উপরেই আমাদের সত্যিকারের নিষ্ঠা নেই। মানুষকেও আমরা গভীর ভাবে ভালবাসি নে, দেশকেও নয়, জাতিকেও নয়, ধর্মকেও নয়। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই আমাদের সত্য-প্রতিষ্ঠা হয় না। আমাদের সবই ঠুনকো, ভাসাভাসা, বাহ্যিক—সামান্য প্রলোভনেই সব ভেসে যায়। অথচ আশ্চর্য এই যে সর্বক্ষেত্রে যে আন্তরিকতার অভাব আছে এ কথা আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। আমরা এই কথা মনে ক'রে সুখে থাকি যে আমাদের সব গুণই আছে, তবুও যে আমরা নিগৃহীত এবং লাঞ্ছিত এটা বিধাতার অবিচার ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ এক রকম জেগে ঘুমানো বা Fools' Paradise-এ বাস করার মত। অন্তত এ সত্য আমাদের কাছে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক যে আমাদের দুর্দশার জন্য আমরাই দায়ী, আমরাই শক্তির অভাবে অসহায়, নিষ্ঠা এবং ত্যাগস্বীকারের অভাবে পঙ্গু। এ বোধও যদি আমাদের না জাগে তবে আমাদের এই জেগে ঘুমানোর আর কোন দিন শেষ হবে না।

কেন এমন অবস্থা হয়েছে এই প্রশ্ন মনে উঠলে উত্তর আসে যে কোন আদর্শের উপর আস্থাহীনতাই এর একমাত্র কারণ। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা এমন পথ ধ'রে চলে যে মনে কোন আদর্শই এমন দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয় না যা উত্তরজীবনে ফলপ্রসূ হ'তে পারে। সস্তা রঙীন স্বপ্ন দেখাকে আমরা কবিত্বশক্তির পরিচায়ক ব'লে মনে করি। জীবনকে গভীরভাবে (seriously) নিতে আমরা ভুলে গেছি। ফলে কোন আদর্শই আমাদের জীবনে দানা বেঁধে ওঠে না। আমরা জীবন যাপন করি নে, drag করি অর্থাৎ দিন কাটিয়ে চলি মাত্র। প্রাতঃকাল থেকে শয্যাগ্রহণের সময় পর্যন্ত যদি আমাদের দৈনন্দিন কার্যসূচী বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাব যে সে এক অবসাদ থেকে জেগে আর এক অবসাদের মধ্যে ডুবে যাওয়ার ইতিহাস মাত্র। আফিং খাওয়া রুগীকে যেমন আঘাত দিয়ে দিয়ে তার চেতনাশক্তিকে জাগিয়ে রাখতে হয়, আমাদের চেতনাশক্তিকেও তেমনি উত্তেজনা দিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নিরর্থক অহমিকাপূর্ণ বাজে গল্প, তাস পাশা দাবা, সিনেমা থিয়েটার রেডিয়ো—এই সব হ'ল সেই উত্তেজনার ইন্ধন। কেউ যেন মনে না করেন যে এগুলিকে আমি ত্যাগ করতে বলছি। আমার বলার কথা এইটুকু যে, এরাই জীবন নয় যেমন এখন হয়েছে। এরা জীবনের আশে পাশের বস্তু (subsidiary)। জীবনে থাকবে সংকল্প, বিশ্বাস, কর্মশক্তি, আদর্শনিষ্ঠা, ঋদ্ধি ও সিদ্ধি। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, চরিত্রে এই সব বস্তু না থাকলে কোন ব্যক্তি স্মরণীয় হয় না এবং স্মরণীয় ব্যক্তির অভাব হ'লে কোন জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার যোগ্য হয় না।

আমাদের মধ্যে কারো কারো মনে এমন ধারণাও আছে যে, আমাদের দেশে যখন বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্বোচ্চ সত্য ঘোষিত হয়েছিল তখন অন্য জাতির চেয়ে আমরা কম কিসে। কেউ আবার এই ধাঁধার মধ্যেও পড়েছেন যে আমরা সেই ঋষি-মুনিদের বংশধর হয়েও পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পাচ্ছি নে কেন। এর একমাত্র কারণ এই যে, সত্য সর্ব দেশে এবং সর্ব কালে সতত বিরাজমান। তাকে বারংবার আবিষ্কার করতে হয় এবং যুগের সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত করতে হয়। সে কোন দেশের কোন লোকের সর্বকালের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। ইদানীন্তন সময়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু মহাপুরুষ জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের দেশকে, তাঁদের জাতিকে বড় ক'রে দিয়ে গেছেন। সেই অনুপাতে আমরা তেমন পারি নি। পাশ্চাত্য দেশে এক বার দৃষ্টি ফেরালেই ক্যাপ্টেন কুক, জর্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জর্জ ষ্টিফেন্‌সন্‌, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, গারিবল্ডি, এব্রাহাম লিংকন, লুই পাস্তর, ডেভিড লিভিংষ্টোন, ক্যাপ্টেন স্কট প্রভৃতি মহা-পুরুষদের নাম মনে পড়ে যাঁরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁদের পদচিহ্ন রেখে গেছেন। এঁদের এক জনের কথা ধরা যাক্—যেমন ক্যাপ্টেন স্কট। ইনি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করার চেষ্টায় প্রাণ হারালেন। এই অভিযানের পিছনে না ছিল অর্থের আকাঙ্ক্ষা, না পদবীর। যশের মোহ যদি বা কিছু থেকে থাকে তবে সে মৃত্যুকে একেবারে নিশ্চিত জেনে। এ ছিল নিছক আবিষ্কারের ঝোঁকেই আবিষ্কার। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদেরও স্ত্রীপুত্র পিতা-মাতা বেঁচে ছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। তাঁদের শেষযাত্রার কিছু বিবরণ আমি

এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না—

"On the 17th of January, 1911, they set out to meet the dangers of the march back. Day after day they faced biting blizzards. The wind blew and the snow blinded and baffled them. * * * Lt. Evans was ill with frost-bite, and for the first time he seemed worried and depressed. * * * They could not cook or even warm their food. The cold was intense.

Lt. Evans died. Days passed. Captain Oates, knowing that he could march no farther, walked out alone into the blizzard to meet his death, so that he need no longer delay the party. "Oates' last thoughts," wrote Scott, "were of his mother; but immediately before he took pride in thinking that his regiment would be pleased with the bold way in which he met his death."

Eleven miles from safety! On the 21st of March, a blizzard overtook Scott, Wilson and Bowers and on the 29th, Scott wrote in his diary, "Last entry. For heaven's sake look after our people."

Eight months later, when the Antartic winter was over, their bodies were found in their tent. They had died there of hunger and cold. Captain Scott had written letters to many friends. Thinking of his little son, he wrote to his wife: "Make the boy interested in natural history. It is better than games. * * * Make him a strenuous man."

কঠিন মৃত্যুর জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া নেই, কোন অনুশোচনা নেই। তার পর প্রত্যেক ইংরেজের উদ্দেশে স্কট যে চিঠি লিখে রেখে গেছেন সে চিঠি ইংলণ্ডে পড়া হয় কি না জানি নে, কিন্তু মৃত্যুভয়প্রপীড়িত ভারতবর্ষে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে পঠিত হওয়া উচিত—

There was a letter written to all English men and women, boys and girls:

"For four days we have been unable to leave the tent, the wind howling around us. We are weak, writing is difficult but for my own sake I do not regret this journey, which has shown that Englishmen can endure hardships, help one another and meet death with as great a fortitude as ever in the past. . . . Had we lived, I should have had a tale to tell of the hardihood and courage of my companions which would have stirred the heart of every Englishman."*

যাঁরা নিজেদের ধমনীর রক্তস্রোত দিয়ে জাতির প্রাণশক্তিকে দুর্বার ক'রে তোলেন ক্যাপ্টেন স্কট তাঁদের মধ্যে একজন।

* *Noble Lives* by Phyllis Wragge (pp. 159-160).

বন্যা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দামোদরে হঠাৎ বন্যা আসিয়া গেল। বন্যা না আসিলে নিউকর্ড ও মেনলাইন এ ভাবে বিপর্য্যস্ত হইত না। আসলে বিপর্য্যয়টা মানুষিক, রেললাইনগুলা কিছুদিন অন্তত জলের তলায় ডুবিয়া বাঁচিল। অবিশ্রান্ত লৌহচক্রের ঘর্ষণে যে জ্বালা উহাদের সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত—তাহার কিছুটা নিবৃত্তি ঘটিল তো!

অতি বর্ষার ফলে পাহাড়ে নামিল জল—দামোদরের বালুগর্ভ সে জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না।...বাঁধের আশ্রয়ে মানুষ বন্যাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে কতকাল হইতে, তবু বাঁধের বাঁধনে সে জলস্রোত রোধ করা গেল না কেন—তাহার ক্ষুদ্র হেতু আছে। অবশ্য হেতুটাই গল্প।

গ্রামের নামটা বাদ দিয়াই বলি। নন্দ ও উপানন্দ দুই ভাই (গোকুলের নয় এবং দ্বাপরেরও নয়)। দু'টি ভাইয়ে সদ্ভাব আছে। কেন না, অনেক বিঘা সোনা-ফলানো জমির মালিকানা স্বত্ব উহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। শুধু ধান নহে, আলুটা, খন্দ-কুটাটা, সরিষা-তিসিটাও জমি হইতে আসে। আনাজপাতি ঋতু অনুযায়ী যাহা জন্মায় গৃহস্থের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। মরাইয়ের শোভা, বউয়েদের মুখে হাসি, ছেলেদের সন্তৃপ্ত কলরব ইত্যাদিতে লক্ষ্মীশ্রী পরিস্ফুট। নিজেদের হালবলদ আছে—মুনিষজন আছে, বিলাসিতা ও আলস্য কম,—কাজেই লক্ষ্মী প্রীতিময়ী। বাড়িতে বৈষ্ণব ভিখারী 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলিলে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে এক মুঠা পায়—কিন্তু ভাতের দাবি জানাইলেই মুশকিল।

ভিখারী স্বাস্থ্যবান হইলে নন্দ বলে, কাজ করবি জমিতে? জমি নিড়োনো, বীজ ছড়ানো? পারিস যদি দেখ—দু'বেলা দু'মুঠোর ব্যবস্থা করি। ভিখারী কাল আসিব বলিয়া সরিয়া পড়ে। নন্দরা জানে—ও আর আসিবে না। যাহারা জনমজুরি করিতে আসে—তাহারা মুঠা বাঁধিয়া বিনা ভণিতায় আসে, হাতের তালু বাহির করিয়া পরকে ভুলাইয়া বিনা আয়াসে পেট ভরায় না।

উপানন্দের মনটা কিছু কোমল। বলে, দিলেই হ'ত দাদা এক মুঠো। একটা দিন বৈ ত না।

নন্দ বলে, ভাইরে, মনটা কোমল হওয়া ভাল; কিন্তু তারও মাত্রা আছে। পৃথিবীতে যে যুদ্ধটা বেধেছে তার ধাক্কা সামলানো সোজা ভাবিস?

উপানন্দ বলে, হয়ত এমন দিন আসবে—না খেতে পেয়ে ধানের গোলা লুটবে।

নন্দ হাসে, ওরা করবে লুঠ; কিছু কম দু'শো বছর হ'ল না? এ তো আর তোর দামোদর নয়—এ হ'ল গিয়ে ভৈরব। দেখতো যশোরের কাছে—কি হাল হয়েছে। কচুরিপানার

জগদ্দল বোঝা বুকের ওপর ; যখন ফুল ফোটে দেখলে দু'চোখ জুড়োয় !

—যদি পেটের দায়ে লুঠ করে ?

—ওরে বোকা—শেষ অবস্থায় লোকে মরিয়া হয়ে ওঠে। যেমন দপ্ করে ওঠে প্রদীপটা নিববার আগে। সে চেষ্টা করে পোড়াবার, পারে না। গোটাকতক উপোস দিলে ওদের অবস্থাও শেষ-জ্বলা পিদীমের মত হবে। জ্বলবে—তবে শেষবারের মত।

উপানন্দ বলে, যাই বল দাদা, দু-এক জনকে দিলে—

—কমে না ? কিন্তু একবার গন্ধ ছুটলে রক্ষা আছে ! দানের সৌরভ অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়, লাটসাহেবের গদী পর্য্যন্ত গেলে রায়সাহেব খেতাব জুটিয়েও দেয়। তা আমি চাই না।

উপানন্দর মনটা কোমল। গোপনে ভিখারীটাকে খিড়কি-দুয়ারে বসাইয়া কিছু পান্তা ভাত আনিয়া দিল।

নন্দর কথাটা মিথ্যা নহে। পরদিন খিড়কিতে জন তিনেক ভিখারীর আবির্ভাব হইল। তাহাদের করুণ কণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া উপানন্দ দরজা খুলিতেই একজন বলিষ্ঠ চেহারার ভিখারী হাত তুলিয়া আনন্দের আর্ত্তি তুলিল, জয় হোক বড়বাবুর।

—আমি ত বড়বাবু নই।

—যে দেয় সেই বড়। জয় হোক বড়বাবুর।

—রোজ রোজ লুকিয়ে খেয়ে যাচ্ছ—দাদা জানলে কিন্তু—

—ভগবান আপনার ভাল করবেন, তাঁর রাজত্বে একগুণ দিলে চারগুণ হয়।

—তা হয় না। তোমায় এক সের চাল দিলে এক সের কমবে না আমার ?

—না বাবু, ভগবান তা পুরিয়ে দেবেনই—এক দিক না একদিক দিয়ে।

—আচ্ছা, আজও ভাত দিচ্ছি, কাল আর—এসো না।

সাতদিন পরে বড় বধূ বলিল,—ঠাকুরপো, কাল গোলায় লাঠি নামিয়ে উনি চাল মাপবেন, যদি ধরে ফেলেন ?

—ইস্, গোলায় লাঠি দিয়ে ঠিক করা সোজা নাকি। বিশ মণের মধ্যে আধ মণ ঠাহর করা চাট্টিখানি কথা নাকি ?

শেষ পর্য্যন্ত লাঠি নামাইতে হইল না। প্রতিবেশী হারু আসিয়া বলিল, দাও না দাদা—পালি দুই চাল ধার।

নন্দ কঠিন কণ্ঠে কহিল, শুধবে কিসে ?

—যদি বেঁচে থাকি—

—যদি ! নন্দ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

জীবন-মরণের কথা কিছু বলা যায় না দাদা। হারু শুষ্কমুখে উত্তর দিল।

তাই ত বলছি—কেন ধারটা নিয়ে মরবে। চালের হিসেবে পিঠের ছাল থেকে খুঁটে নিলে হাড়-ছাড়া কিছু থাকবে কি কাঠামোতে ?

—সে কথা আমি ভাবছি না।

—তা জানি, আমিই ভাবছি।

—আজ তিন দিন আধপেটা খেয়ে আছি।

—মিথ্যা কথা। যতক্ষণ ঘরে থাকে—কেউ আধপেটা খায় না। দুর্ভিক্ষের দিনেও না। খিদের কাছে সঞ্চয়ের কোন দাম আছে ?

—নেই বলেই ত—

—যাও, বকিও না।

—দাদা, চাল যদি নেহাৎ না দাও ত খাতায় নামটা টুকে নাও। খিড়কী-দুয়োরে বসেই খেয়ে যাব না হয়।

—মানে ?

—উপানন্দ-ভায়াকে জিজ্ঞাসা কর। না খেতে পেলে মান-অপমান কি। দোহাই দাদা, নামটা টুকে নিও, কালই আসব না হয়।

উপানন্দকে ডাকিয়া নন্দ বলিল, এর মানে ?

—মানে ! মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঢোঁক গিলিতে গিলিতে উপানন্দ বলিল, যা কাঁদে—দেখলে কষ্ট হয়।

হুঁ—চর্চ্চা রীতিমত হচ্ছে। ভগবানের গোলায় পুণ্যির রসদ বাড়ছে—উঠোনের গোলায় কতখানি কমেছে জানা আছে ?

—ওতে কিছু যাবে না। একগুণ দিলে—

—এক গুণই কমে। অকালের দিনে চার গুণ—আট গুণ। বদ স্বভাব ছাড়।

উপানন্দ মরিয়া হইয়া বলিল, আমি সইতে পারি না।

—বেশ, নিজের ভাগ থেকে দিয়ো।

—কেন, আমার ভাগ থেকে দিতে পারি নে ? দিলে দোষ কি ?

—উপোস করে থাকতে পারবে ?

উপোস করতে যাব কোন দুঃখে ? জমিতে যা ফসল হয়—

ওঃ—ফসলের ভাগ ! লক্ষ্মীর মাথায় করাত বসাতে চাও ? এই দুর্ভিক্ষের বাজারে ?

—তুমি কঠিন হয়েছ বলেই—এই ব্যবস্থা।

—বেশ ভাই তাই হবে। জানবে একবার যা ছাড়বো হাজার মিনতিতে তা ফিরে আসবে না। তুমি যদি না খেতে পেয়ে সামনে উপোস দিয়ে মরে যাও—তবু না।

উপানন্দ রাগ করিয়া বলিল, বেশ।

তার পর যথারীতি জমি ও গোলা ভাগ হইয়া গেল। অদূরের চণ্ডীমণ্ডপ হুঁকোর ভড়র ভড়র শব্দে মুখরিত হইল, অন্দরের দুয়ারে ভিখারীদের জয় কোলাহল। কোলাহলটা যতই বাড়ে—হুঁকার শব্দ ততই প্রবল হইয়া উঠে। নন্দ মাঝে মাঝে কাসিয়া—লাঠি ঠুকিয়া কলিকা পাণ্টাইয়া দিবার জন্ত চাকরকে ডাকে। এদিকের কোলাহল নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ওদিকের কলিকায় আগুন জ্বালাইয়া রাখা চাই। শব্দের বদলে শব্দ।

তার পর যথারীতি ওদিকের গোলা নিঃশেষিত প্রায় হইল।

ছোট বধূ এক দিন উপানন্দকে বলিল, হাত কমাও—গোলায় এক ছটাক ধান নেই।

—বড় জালা ছুটোর ?

ওই ত সম্বল। সামনের কটা মাস কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঠেলতে হবে তো ?

—সামনের কটা মাস ? বাংলার পক্ষে দুর্য্যোগের মাস না ?

—পাঁজিতে তাই লিখেছে।

—লিখুক। ক-মণ চাল আছে ঠিক ক'রে বলত ?

—মণ ছয়েক হবে।

—তবে কালও চলুক।

—কিন্তু ভেবে দেখ।

—কি ভাবব ? যারা চেঁচায় দুয়োরে এসে—তারা ভাববার অবসর দেয় নাকি ?

—তুমি একা কি করবে ?

—আমার দেখে আরও পাঁচজন এগিয়ে আসবে।

—কই, দেড় মাসের মধ্যে—কাউকে ত দেখলাম না ?

—দেখবে। কাগজে অনেক লেখালেখি হচ্ছে।

—বট্‌ঠাকুর নাকি চাল সব বেচে দিচ্ছেন।

—পাগল !

—হাঁ গো, রোজ টাকার শব্দ শুনি।

—টাকা ! সাধ ক'রে বলি পাগল ! কাগজ বাজে নাকি ?

—টাকাও আছে—সত্যি।

—তা হলে রূপো জমাচ্ছেন দাদা। টের পেলে ওর শাস্তি জান ?

—টের পাবে কি ক'রে ?

—না, না, তাই বলছি। কিন্তু ওসব বেশিদিন সয় না ছোট বউ। ওঘরে বাজছে টাকা—এ-ঘরে বাজছে উপবাসী ছেলের কান্না। ও-মরাইয়ে লক্ষ্মী হাসছেন—এ-পাড়ায় ধুচুনি হাতে ঘরের বউ বেরিয়েছেন ভিক্ষেয় ! তবু সংসার চলছে।

—তাই ত চলে। ছোটবউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

জগৎ এক ভাবেই চলে। উপানন্দকে দানের নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ছোট বউ একটা বড় জালা ঘুঁটের স্তূপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। ভিখারীর জয়-ধ্বনিতে উপানন্দ রান্নাঘরে আসিয়া বলিল, আজ রাঁধ নি ?

—কাল বলি নি ঘরে চাল নেই।

—কিছু না ?

—পঞ্চাশ জনকে খাওয়াবার মত চাল নেই ?

—আমাদের জন্য যা রেঁধেছ ?

—ক-জনের মুখে দেবে ! লাভে হতে নিজেদের উপোস।

—আচ্ছা আসছি আমি, তুমি বড় উনুনটা জ্বালাবার ব্যবস্থা কর।

তামাকের ধূমে চণ্ডীমণ্ডপ আচ্ছন্ন। নিমীলিত চক্ষে নন্দ তক্তাপোষের উপর বসিয়া তামাক টানিতেছে। উপানন্দের পায়ের শব্দটা মৃদু নহে—তথাপি নন্দ চক্ষু চাহিল না।

—দাদা।

—বল। যেন উপানন্দ প্রত্যহই আসিয়া থাকে।

—চাল দেবে এক মণ ?

—চাল ! কাঙালী ভোজনে—না ভূত ভোজনে ? চাল নেই।

—অমনি নেব না—টাকা দেব।

—বাজারের দর জানিস্ ?

—জানি, তাই দেব।

—দয়ার পুকুর ! সাগর বলে আর একজন মহাপুরুষকে আর অপমান করলাম না।

—করলেই পারতে। তোমার আর বাধা কি !

—আমার বাধা আমিই। তাঁদের ওজন জ্ঞান ছিল—তেমনি চলতেন। তেমনি চলার মত মনের জোরও ছিল। নদীর জল নিয়ে খেলা ভাল নয়। বিশেষ করে বর্ষার নদী—বাঁধের কানায় কানায় যার জল।

—কথা থাক্, কত দাম চাও ?

নন্দ এতক্ষণে চক্ষু চাহিল। কহিল, তোমার টাকার আশায় আমি বসে নেই। ধান গেছে মহাজনের গোলায়। লক্ষ্মী বসেছেন ব্যাঙ্কের খাতায়।

—তুমি দেবে না ? সেই বেচলে—আমাকে দিলে কি ক্ষতি হ'ত ?

—অনেক। আর কিছু বলবে ?

—না। উপানন্দ চলিয়া যাইতেছিল।

নন্দ বলিল, শীঘ্রই শহরের বাসায় যাব ভাবছি।

সহসা উপানন্দ নন্দর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি জানি তোমার অনেক চাল এখনও মজুদ আছে। আজকের মত আমার মান বাঁচাও।

নন্দ কঠিন কণ্ঠে বলিল, আমার রীতি আর নদীর রীতি এক। যা ত্যাগ করি তা ফিরে পেতে চাই নে।

উপানন্দ সবেগে উঠিয়া কহিল, আচ্ছা।

উপানন্দ চলিয়া গেলে নন্দ বাড়ির মধ্যে গিয়া ডাকিল, বড়-বউ ?

—কি গা ?

—বাপের বাড়ি যাবে ? আরে অবাক হয়ে গেলে যে ! বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান।

—আজ—

—যেতে হলে আজই যেতে হবে—নইলে যাওয়া হবে না।

—কিন্তু—

—গাড়ি তৈরি করতে বলে দিই। চারখানার সব বাক্স ট্রাঙ্ক বিছানা ধান ধরবে তো ?

—অত লটবহর নিয়ে—

হাসিয়া নন্দ বলিল, যা যাবে সঙ্গে—তাই উঠবে অঙ্গে। তোমাদের ডাকপুরুষের কথা—সামান্য বদল করেছি। নাও, গুছিয়ে নাও।

রাত্রিতে বৃষ্টিটা চাপিয়া আসিল। এঁটেল মাটিতে পা রাখা কঠিন। তবু সেই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া কত লোক বাঁধ দেখিয়া গেল। জল বাঁধের কানায় কানায়। দুরন্তপনায়—কখনও তার গায়ে ধাক্কা মারিতেছে—কখনও কখনও ছলাৎ করিয়া কাঁধে চাপিতেছে। শক্ত মাটি বৃষ্টির জলে ভিজিয়া নরম ময়দার তালটির মত হইয়াছে। ওপারের জলের ধাক্কাকে যত না ভয়—উপরের বর্ষণকে তার চেয়ে অবিশ্বাস। জল চোঁয়াইলে বুঝা দুষ্কর।

রাত্রি বাড়িলে বাঁধের মুখে ক্ষুদ্র একটি আলোর রেখা দেখা গেল। মালকোঁচা মারিয়া একটা কালো মত লোক হেঁট হইয়া বাঁধের পাশে কি করিতেছে বোধ হইল। হাতে তার সূচ্যগ্র বাখারি। আলোটা আর জ্বলিল না। জ্বলিলেও উপরের রাস্তা হইতে ব্যাপারটা অনুমান করা দুঃসাধ্য হইত। বাঁধের অবস্থা বুঝিয়া লোকটি হয়ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সংস্কার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে!

একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। কড় কড় শব্দে কোথায় বজ্র পতন হইল। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, লোকটি বাঁধের এ পিঠে প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে। পিঠের ও হাতের পেশী তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাখারির অবশিষ্টাংশ তখনও ভিজা কাদার উপর ছপাৎ ছপাৎ শব্দে আপ্সাইয়া পড়িতেছে।

সকালে দেখা গেল—চারিদিকে জল থৈ-থৈ করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন নাই, মাঠের চিহ্ন নাই, শস্যাঙ্কুরের শ্যামলতা মুছিয়া গিয়াছে। দৌরাত্ম্যশীল লক্ষ তরঙ্গ বাহুতে আঁকড়াইয়া দামোদর বাঁধের মাটি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। মুক্তিপাগল দানবটা হুহুঙ্কার শব্দে মাঠের পর মাঠ—গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া ছুটিতেছে। দুই ধারে উঠিতেছে মরণ আর্ত্তনাদ, মুক্তির জয়-ধ্বনিতে তাহাও ধ্বনিহীন।

শহরের রাস্তায় ভাল করিয়া আলো জ্বলে না। নিষ্প্রদীপ শহর। ইহাতে শহরের রূপটি বুঝা যায় না, অনেক কুশ্রীতাও ঢাকা পড়িয়াছে। সৌধের ছায়ায় কুটীরের দীনতা তেমন ফুটিতেছে না। মোটরের পাশে ময়লা কাপড়পরা ভিখারী দাঁড়াইলে আলোর স্বল্পতায় তাহার দীন বেশটি চোখে আঘাত করে না। ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া ক্ষুধার তাড়নায় কোন্ ভাঙা ঘরে কাহার ছেলে কাঁদিতেছে—অন্ধকার তাহাও বুঝিতে দেয় না। দ্রৌপদীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণের মত অন্ধকার দুর্গত জনকে প্রতি রাত্রিতে ত্রাণ করিতেছে। তাহারা কৃতজ্ঞ বইকি!

একটি ত্রিতল বাড়ির নীচের নিষ্প্রদীপের অন্ধকারে একটি দুর্দ্দশাগ্রস্ত কুটীর আত্মগোপন করিয়া ছিল। ভিতরে যাহারা ছিল—তাহাদের কণ্ঠস্বর ক্লিষ্ট। ছেলেরা ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া ঘুমাইয়াছে—অর্থাৎ নিশ্চেতন হইয়াছে, বয়স্কেরা আলাপ করিতেছে।

স্ত্রী বলিল, বট্‌ঠাকুর চালাক, নিজের সর্ব্বস্ব বাঁচিয়ে সরে পড়লেন। এক মণ চাল বাছাদের জন্য রেখেছিলাম—গেল জলের গর্ভে।

—গরিবকে বঞ্চিত ক'রে রাখলেই যায়।

—তবে বট্‌ঠাকুরের কেন গেল না? ও সব অদৃষ্ট।

—কার?

—আমাদের। ভগবানের মার না হ'লে দামোদরে বান আসবে কেন?

—ভগবান! পুরুষ হাসিল।

—ভগবান নয় ত মানুষ নাকি? স্ত্রীকণ্ঠে বিরক্তির ধ্বনি।

পুরুষ কথা কহিল না। বাতাসে ভাজা-তরকারীর গন্ধ ভাসিতেছে। দুই দিন নিরম্বু উপবাসীর নাসিকায় তাহা মারাত্মক। পেটের ভিতর কয়েকটা ভীমরুল এক সঙ্গে হুল ফুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

পুরুষ সজোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল, শাস্ত্রকাররা মিথ্যে বলেছেন। এত নিশ্বাস টানছি অন্তত আদ্দেক পেটও যদি ভরত। আর মানুষের দুর্ভোগ ভগবান ঘটান না। ঘটিয়ে তাঁর লাভ?

—লাভ তাঁর নয়, মানুষের পাপ।

—কাল ভিক্ষেয় বেরুব। ওরা রোজ মাছ-মাংস খেতে পায়, আমরা এক মুঠো ভাতও পাব না? এক মুঠো ক্ষুদ সেদ্ধ? কি এক সরা ফ্যান?

বন্যার কলরোলকে ছাপাইয়া এই স্বর প্রবল হইতেছে বুঝি?

কিন্তু কোথায় বন্যা কোথায় বা কি? কাগজে বন্যার কথা পড়িতে পড়িতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ঠাকুর আহারের জন্য ডাকিতেছে। মাংসটা আজ ভালই উৎরাইয়াছে সুঘ্রাণে বুঝিতেছি!

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে এক ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীর করুণ কণ্ঠ কানে গেল, আজ দুদিন খাইনি বাবা। আমার বাছাদের মুখ চেয়ে এক মুঠো ভাত দাও, না-হয় একটু ক্ষুদ সেদ্ধ কি একটু ফ্যান?

ও পাশ হইতে অনিল বাবু বলিলেন, এখন নয়—এখন নয়। ঠাকুর দুয়োরটা বন্ধ কর। খাবার সময় যত সব—

আশুতোষ মিউজিয়ম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, এম-এ (লণ্ডন), এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

প্রায় সাত বৎসর হইতে চলিল স্বর্গীয় স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এই আশুতোষ মিউজিয়মটি স্থাপিত হইয়াছে। দেশে এইরূপ এক একটি মিউজিয়ম গড়িয়া উঠায় যে জাতীয় জীবনে উহা কত দূর প্রভাব বিস্তার করে তাহা অবর্ণনীয়। এই হিসাবে ইউরোপ এবং আমেরিকায়—বিশেষভাবে রাশিয়ার প্রত্যেক শহরে, এমন কি, প্রত্যেক ছোট ছোট নগরীতে মিউনিসিপালিটির চিত্রশালা আছে যেখানে বিখ্যাত শিল্পীদের প্রাচীন ও আধুনিক ভাল ভাল চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত মিউজিয়মের কল্যাণে প্রথমতঃ হইয়াছে শিল্পের সংরক্ষণ, দ্বিতীয়তঃ দেশের মধ্যে শিল্প-বিকাশ ও শিল্পানুভূতির অনুকূলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি, তৃতীয়তঃ সাধারণ্যে শিল্পরসগ্রাহিতার বিস্তারের উপযুক্ত ব্যবস্থা। ইহা ব্যতীত অসংখ্য আধুনিক শিল্পাগার, জনশিল্প প্রতিষ্ঠান, শত শত শিল্পপরিষদ্ ও শিল্পসভা আছে যেখানে প্রতিনিয়ত জাতীয় সংস্কৃতির সহিত জনসাধারণের ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছে।

আশুতোষ মিউজিয়মটি উহার তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার বৃদ্ধির গতি যেরূপ প্রবল, তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ইহা একটি জাতীয় মিউজিয়মে পরিণত হইয়া দেশের গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এই মিউজিয়মের গঠন এবং সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমোন্নতির মূলে কিউরেটর শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে এ যাবৎকাল কোন মিউজিয়মে জনশিল্পের (Folk Art) স্থান হয় নাই বা জনশিল্প-বিভাগ স্থাপিত হয় নাই। আশুতোষ মিউজিয়মে অতি সুষ্ঠু এবং সুচারুরূপে এই বিভাগের যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়ে পথপ্রদর্শনকারীর যাবতীয় সম্মান আমরা মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে দিতে পারি। 'দরবারী শিল্পে'র আপাত চাকচিক্যে আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া আছি; কিন্তু যেদিন প্রাগৈতিহাসিক, আদিম এবং জনশিল্পের রস প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিবার আগ্রহ এবং ক্ষমতা আমাদের ভিতরে আসিবে এবং রসিক ও মনীষিগণের নানা প্রকার গবেষণা এবং অনুসন্ধান যখন এই সমস্ত শিল্পের মাঝখানে জনসাধারণের নিকটে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যজগতের দ্বার



শিব-বুদ্ধ

পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে, তখনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের প্রকৃত মূল্য স্বীকৃত হইবে।

আশুতোষ মিউজিয়মটি নানা বিভাগে বিভক্ত : তন্মধ্যে প্রস্তর-মূর্ত্তি, ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি, মধ্যযুগের চিত্রাবলী, হাতীর দাঁতের শিল্পকাজ, হস্তলিখিত পুঁথির চিত্রিত পাটা, তাম্রশাসন লিপি, প্রাচীন মুদ্রা এবং জনশিল্পের সংগ্রহমধ্যে



সরস্বতী



ইন্দ্রাণী

জড়ানো পট, শাড়ী, কাঁথা, পোড়ামাটির ফলক, কাষ্ঠমূর্ত্তি এবং খেলনা ও পুতুলই সমধিক প্রসিদ্ধ। চিত্রশালার দৃশ্যবস্তুর অধিকাংশই উদার হৃদয় ব্যক্তিদিগের উপহার এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইতিমধ্যে আশুতোষ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ পুরীর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় এবং মজিলপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহোদয়ের সংগৃহীত উড়িষ্যা ও সুন্দরবনের দ্রব্যগুলি কয়েক সহস্র মুদ্রাব্যয়ে ক্রয় করিয়াছেন। আশুতোষ মিউজিয়মে এককালীন বৃহৎ দান করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বিজয় সিং নাহার। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নাহার-মিউজিয়মটি—যাহার মূল্য আনুমানিক চল্লিশ হাজার টাকা, সম্পূর্ণভাবে আশুতোষ মিউজিয়মকে দান করায় ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগৃহীত বাংলার জনশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শনগুলি তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ এই মিউজিয়মে দান করিয়া বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই সব প্রাচীন দ্রব্যের মধ্যে বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত দশম শতাব্দীর ব্রোঞ্জের মুখলিঙ্গ, পাহাড়পুরে প্রাপ্ত সপ্তম শতাব্দীর পোড়ামাটির ফলক, যশোহরে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীর অতিকায় বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্ত্তি, কিউরেটর শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের সংগৃহীত সুন্দরবনের উৎকীর্ণ চিত্রশোভিত তাম্রশাসন, বরিশাল হইতে সংগৃহীত ব্রোঞ্জের শিবমূর্ত্তি, শ্রীকালিদাস দত্তের সংগৃহীত নটরাজ বিষ্ণু সম্বলিত প্রস্তরনির্ম্মিত চক্র এবং নাহার-মিউজিয়মের সংগৃহীত প্রস্তরের হরগৌরী-মূর্ত্তি। ইহার মধ্যে সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্রশাসন এবং বরিশালে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের শিবমূর্ত্তি দুইটিই ঐতিহাসিক দিক হইতে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। দ্বাদশ শতাব্দীর এই তাম্রশাসনে বিষ্ণু ও গরুড়ের যে খোদিত চিত্র আছে, উহাদের চোখ এবং মুখের বিশেষ ভঙ্গিমা, দেহের সুঠাম গঠন এবং রেখা-সমন্বয় বিশ্লেষণ করিলে, বঙ্গীয় শিল্পের চিত্রাঙ্কন রীতিতে রেখার সুস্পষ্টতা ও অঙ্কননিপুণতা যে বৃহত্তর ভারতের শিল্পপদ্ধতির একই ধারায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বরিশালের ব্রোঞ্জের শিবমূর্ত্তিটি আশুতোষ মিউজিয়মে সংগৃহীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশের এবং বিদেশের মনীষীদের এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে দণ্ডায়মান শিবমূর্ত্তির উপরে উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপন একমাত্র জাভার শিল্পীদের নিজস্ব ভাস্কর্য্য-প্রতিভা, কেননা উহার মূল উৎস ভারতে এ যাবৎ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি বিভিন্ন খোদিত লিপি, তাম্রশাসনপত্রের বিবৃতি, স্থলপথে ও জলপথে বঙ্গদেশের সহিত দ্বীপময় ভারতের যোগাযোগ, জাভার মন্দিরগুলি হইতে তিন-চার শত বৎসর পূর্ব্বের পাহাড়পুর মন্দির আবিষ্কার এবং দক্ষিণ-বঙ্গে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনের উপর খোদিত



নারী ও মৃগ

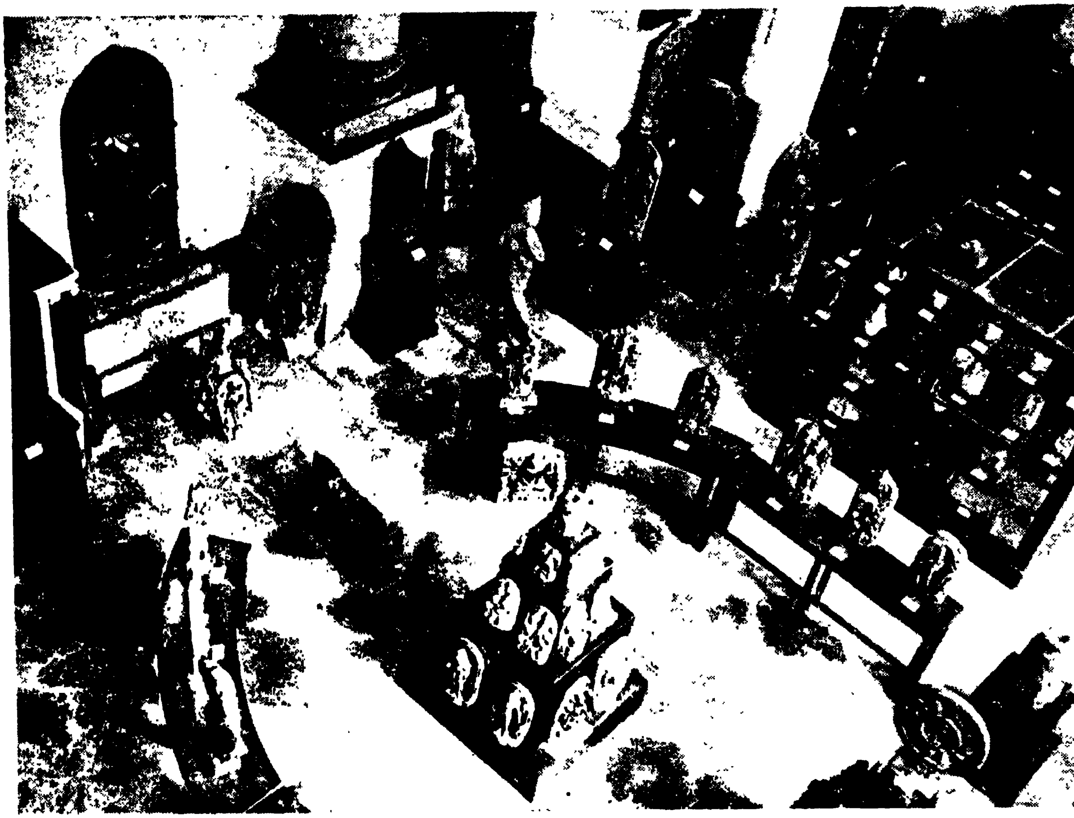
চিত্র প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিতেছে তাহাতে অনুমান হয় তাহার এইরূপ শিবমূর্ত্তির মূল উৎসও কেবলমাত্র বাংলায় প্রচলিত ছিল।

এই সব চারুশিল্পের সংগ্রহ ব্যতীত আশুতোষ মিউজিয়মে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ জনশিল্প সংগৃহীত হইতেছে। এই জনশিল্প-সংগ্রহ যে মিউজিয়মের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ একথা বলাই বাহুল্য। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ভাবধারা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে বাংলার জনশিল্পের মধ্য দিয়া; বাংলার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার জনশিল্পের প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে চারুশিল্প আসিয়াছে অনেকটা আমদানী দ্রব্যের মত, তাহার বাহিরের জৌলুসে হঠাৎ আমাদের চোখে ধাঁধা লাগে; কিন্তু বাংলার জনশিল্পের সহিত আছে বাঙালীর আত্মার আত্মীয়তা। মহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানে যে সুপ্রাচীন শিল্পসম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, জনশিল্পের সহিত তাহার সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য তাহা নানা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া বাংলার কন্যা, বাংলার বধূ, বাংলার পটুয়া, বাংলার ভাস্কর, বাংলার কারিগর তাহাদের সহজ সংস্কার লইয়া তাহাদের যে-স্বপ্নকে যে-কল্পনাকে জনশিল্পের আকারে যেভাবে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের যে রসবোধ এবং সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার তুলনা নাই। জনশিল্পের সহজ রেখা, স্বচ্ছন্দ লাবণ্যের পাশে চারুশিল্পের সাজসজ্জা শুধু এক কৃত্রিমতার আবহাওয়ারই সৃষ্টি করে। আশুতোষ মিউজিয়মের এই সুগঠিত জনশিল্প বিভাগ উন্নত হইতে উন্নততর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর বিকারগ্রস্ত মনে জনশিল্পের প্রতি মমতাবোধ এবং জনশিল্পের সৌন্দর্য্যকে প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিবার শক্তি জন্মাইতে থাকিবে ইহা আমরা বিশেষ-রূপে আশা করিতে পারি। বাঙালীর জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় এই বিভাগ সমস্ত মিউজিয়মটির ভিতরে যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান স্থান অধিকার করিয়া রহিবে একথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যায়।

আশুতোষ মিউজিয়মে এই চারুশিল্প ও জনশিল্পই কেবলমাত্র সংগৃহীত হইতেছে না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার বিভিন্ন স্থানে খননকার্য্য দ্বারা সুপ্রাচীন দ্রব্যাদি ও লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার-কার্য্যেও ব্যাপৃত আছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নায়কতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র দিনাজ-পুর জেলার অন্তর্গত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাণগড়ে খননকার্য্য



কুঞ্জবনে গোপিনীগণ



আশুতোষ মিউজিয়মের অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য

দ্বারা বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে উহা আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই সব প্রাচীন দ্রব্যের মধ্যে মৃন্ময় ফলক, পালিশ-করা মৃন্ময় দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর খণ্ড, কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আশুতোষ মিউজিয়ম হইতে যথাক্রমে "মিউজিয়ম ক্যাটালগ," "মিউজিয়ম মেথড্" প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে এবং ইতিমধ্যে মিউজিয়মে রক্ষিত বঙ্গীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-স্বরূপ ছয়খানি পোষ্ট কার্ড ছাপান হইয়াছে। ইহা ছাড়া মিউজিয়মের নিজস্ব একটি লেবোরেটরী আছে যেখানে দ্রব্যগুলির সংরক্ষণ কাজ করা হয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মিউজিয়ম-কক্ষে ছয়টি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়, তন্মধ্যে শিশু-শিল্প প্রদর্শনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকদের শিল্পরসগ্রাহিতা বৃদ্ধিকল্পে তিন মাসের জন্য "art appreciation" ক্লাস খোলা হয়। এই ক্লাসে শুধু শিল্প বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয় নাই; যাহাতে ছাত্রেরা নিজ হাতে শিল্প সৃষ্টি করিয়া উহার সমালোচনা করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা ছিল।

ইহা ব্যতীত আশুতোষ মিউজিয়মে যাহাতে বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ছাত্রবৃন্দ সংগৃহীত দ্রব্যাদি দেখিয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন গাইড্ লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই ভাবে আশুতোষ মিউজিয়মটি অল্প দিনের মধ্যেই নানা দিক হইতে যেরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই বাঙালী জাতি—বিশেষভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই মিউজিয়মটিকে লইয়া গৌরব করিতে পারিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে একটি কথার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জগতে মিউজিয়ম আন্দোলন অতি বিজ্ঞান-সম্বলিত পন্থায় গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার ফলে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয় ঐশ্বর্য্যের সহিত কেবলমাত্র পরিচয় লাভেরই সৌভাগ্য হইতেছে না, পাশ্চাত্য জগতে এক একটি মিউজিয়ম এক একটি জীবন্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে মিউজিয়ম এখনও "যাদুঘর"—প্রদর্শনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেই মনকে

বিশেষভাবে পীড়া দেয় প্রথমতঃ দ্রব্য-প্রসাধনের অভাব, দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যনির্ব্বাচন, তৃতীয়তঃ উহার লক্ষ্যহীন প্রতিষ্ঠা।

এই হিসাবে আশুতোষ মিউজিয়ম সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বলিবার আছে। প্রদর্শনী-কক্ষে প্রবেশ করিলেই মূর্ত্তিগুলি অর্দ্ধগোলাকৃতি বেষ্টনীতে সাজান দেখিতে পাওয়া যায়। সিনেট হলের এই কক্ষগুলি মিউজিয়ম স্থাপনের জন্য মোটেই নির্ম্মিত না হওয়ার ফলে বাহিরের দরজা দিয়া যে আলোক-রশ্মি ভিতরে প্রবেশ করে উহা চতুর্দ্দিকে সমভাবে বিস্তৃত হইতে পারে না। সুতরাং আমার মনে হয় কর্তৃপক্ষের উচিত কক্ষটির মধ্যস্থানে প্যারিসের বিখ্যাত "ট্রোকাডেরো মিউজিয়মে"র অনুকরণে ক্রুশ-চিহ্নিত আকারে "Show case" রাখিবার ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমানে আশুতোষ মিউজিয়মের "Show case"গুলি অত্যন্ত ভারী ও চওড়ায় বেশী। ইহার ফলে এক দিক হইতে মূর্ত্তিগুলি নিরীক্ষণ করিলে অন্য দিকের মূর্ত্তিগুলি চোখকে পীড়া দেয়। সুতরাং "Show case"গুলি এমন ভাবে করা উচিত যাহার মাঝখানে কাঠের পর্দ্দা আছে। উহা ফিকে সবুজ কিংবা নীল রঙের হওয়া উচিত, নতুবা কাঠের বার্নিস এবং কাচগুলি অত্যন্ত চকচকে বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের "Show case"-গুলি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। এগুলির প্রদর্শিত নিম্নের দ্রব্যগুলি দেখিতে হইলে মাটিতে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়। এই অবস্থায় শো-কেসগুলি ১২০/° ডিগ্রি কোণে নির্ম্মিত হওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, সুক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ পরিচ্ছদ কিংবা চিত্র উপর তলায় না রাখাই ভাল, কেননা সূর্য্যতাপে ভবিষ্যতে ইহার ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। এই হিসাবে অনেক পাথরের কিংবা ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি নীচ তলা হইতে উপরের তলায় আনিবার ব্যবস্থা করা উচিত। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেক সময় আশুতোষ মিউজিয়মে অঙ্কিত চিত্র রাখিবার জন্য বৃহৎ "কেস" ব্যবহার করা হয়—উহা মোটেই তৃপ্তিদায়ক নয়। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এই সব বিষয়ে আরও বেশী মনোযোগী হইবেন।

সত্য-পন্থী*

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

জনমি ব্রাহ্মণকুলে ব্রহ্মমন্ত্র নিলে তুলে,
হৃদয়ে হল ব্রহ্ম স্থাপনা,
সদা সত্য আচরণ সত্য বাক্য উচ্চারণ
যে-মন্ত্রের একাগ্র সাধনা;
জীবনে সে মহাব্রত পালনে ছিলে যে রত,
ছিলে শান্ত, সংযত, সুধীর,
সৌজন্যের অবতার, সুবিনম্র ব্যবহার,
কর্ত্তব্যেতে বুদ্ধি সদা স্থির;
বিভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত দেশ নাহি পায় সুনির্দ্দেশ
সঙ্গত সুপন্থা দিতে বলি',
সত্যে করি রবে ভর রক্ষা হবে আত্মপর
অতঃপর কোন পথে চলি'!
মানব-আত্মার মুক্তি জগতের শ্রেষ্ঠ উক্তি
সব হ'তে শ্রেয় বলে মানি,
বলহীন জন তারে কভু না লভিতে পারে,
শিরোভাগে লিখিলে এ বাণী।
কর্ম্ম হোক বাধামুক্ত, ধর্ম্ম হোক জ্ঞানযুক্ত,
সত্য হোক জীবনের সার,
গাঁথুক মানব-ঐক্য, জনে জনে বাঁধি সখ্য
লক্ষ্য হোক আদর্শ প্রচার।
একনিষ্ঠ সত্য দৃষ্টি দেখায় নূতন সৃষ্টি
জগতে নূতন বিবর্ত্তন,
আকাশে দুই-এর ঠাঁই বলে, সে যে নাই নাই,
বলে—"সত্য এক আত্মাধন",
কত নাম কর্ণে শুনি সংখ্যা কে করিবে গুণি,
বাণী তার ধ্বনিতে মিলায়,
আত্মা যে পরম ধন হৃদয়ে জাগিয়া রন,
প্রেমে তার সুরভি বিলায়।
চলিয়াছ মৃত্যুপারে লভ ইষ্টদেবতারে
জন্মমৃত্যু দুই-এর মিলনে,
জননী বাড়ায়ে কোল বিশ্বাকাশে দেন দোল,
জন্মমৃত্যু ঘটে ক্ষণে ক্ষণে।
রাজা রামমোহনের আত্মিক সন্তানদের
জানে সবে অন্যতম তুমি,
ভাবী বংশে সেই আলো শুভ সূত্রে জ্বালো জ্বালো,
সত্য হোক তব জন্মভূমি।

* রামানন্দ-স্মরণে

সমরোত্তর বিশ্বের পুনর্গঠন ও বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ

শ্রীশিশিরচন্দ্র বসু

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পরিচয়-পত্রে অস্থায়ী সেক্রেটরী-জেনারল্, সমরোত্তরকালে বিশ্বের পুনর্গঠন এবং বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেক্রেটরী-জেনারল্ বলিয়াছেন :—

যুদ্ধ থাম্‌লে দেখা যাবে, অনেক বড় বড় দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে—বিদেশী সেনানীর অধিকারে এসে বহু দেশ দুর্গতি ভোগ করেছে—দুর্ভিক্ষ ও অনটন ভোগ ক'রে জনসাধারণ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—পৃথিবীর অর্থনীতিক কল-কব্জা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে—কোটি কোটি লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। বর্ত্তমানে শিল্পসঙ্গতিকে ক্রমাগত যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরির কাজে লাগানো হচ্ছে এবং বদ্‌লি মাল উৎপাদনের কাজ বিরাট্ ভাবে বেড়েছে। এর ফলে, দেখা যাবে, যুদ্ধ থামলে বিশ্বের শিল্প-উৎপাদনের ধারা বদ্‌লে গেছে—বহু দেশকে জাতীয় রাষ্ট্রশক্তিহীন হয়ে থাকতে হয়েছে—সমাজ বিদ্রোহ করেছে—দেশের সীমান্তের পরিবর্ত্তন ঘটেছে—জনগণ বহুবার গৃহচ্যুত হয়েছে—যান-বাহনের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে—কোথাও বা যান-বাহনের ব্যবস্থা মাত্র নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবার চালু হয়েছে। বিশেষ ক'রে দেখা যাবে, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার স্মৃতি পৃথিবীকে ভাগভিন্ন করে দিয়েছে।

মানুষকে দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। নানান দেশে যাঁরা জনসাধারণের আশু প্রয়োজন এবং দেশের পুনর্গঠন কাজে লিপ্ত হবেন, তাঁদেরকে ভবিষ্যতে পুনরায় বিশ্ব-সহকারিতা গঠনের সমস্যাও সমাধান করতে হবে। বিগত মহাসমর দুটির মত ভবিষ্যতেও যাতে রণ-তাণ্ডব পৃথিবীকে ছারখার করতে না পারে, তার জন্য নূতনতর বিশ্ববিধানের কি ব্যবস্থা তাঁরা স্থির করবেন? নানান দেশের গবর্মেণ্ট—শুধু গবর্মেণ্ট নয়—জনসাধারণ আজ বুঝতে পারছে, শান্তির মূল্য কি?—ভবিষ্যতে শান্তি বজায় রাখতে কতটা ক্ষতিস্বীকার—কতটা স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হবে!

প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশগুলি নিয়ে ছত্রিশটি দেশ বর্ত্তমানে সমগ্র সমরে লিপ্ত। আরও কয়েকটি দেশ উপস্থিত বে-সামরিকত্ব বজায় রাখলেও ভবিষ্যতে যুদ্ধে নামবার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি দেশ অবশ্য নিরপেক্ষ ভাবে রয়েছে, কিন্তু এই নিরপেক্ষতা তারা বজায় রাখতে পারবে কি না বলা যায় না; কেন না, ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি দেশ গোড়াতে নিরপেক্ষ থেকে পরে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। সমরলিপ্ত দেশগুলিতে এবং সর্ব্বত্রই গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণ রণসামর্থ্য অর্জ্জনে মনোনিবেশ করেছেন—সমরায়োজনই তাঁদের প্রধান চিন্তা।

শান্তিগঠন বা শান্তির রূপ কি হবে তা নিঃসন্দেহ নির্ভর করবে—যুদ্ধবিরতির জন্য কতখানি ঐকান্তিকতা, স্বার্থত্যাগ এবং গঠনবিধি প্রয়োগ করা যায়, তার উপর। যুদ্ধাবসানে পৃথিবীকে কি আদর্শে বা কি আকারে গড়া হবে সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিদ্‌গণ ও গবর্মেণ্টগুলি নির্দ্দিষ্টভাবে কিছু বলতে ইতস্ততঃ করছেন। হয়ত এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই এখনও কিছু ধারণা করেন নি। এত আগে থেকেই কিছু ছকে না রাখা অবশ্য বুদ্ধির পরিচয়; কিন্তু তা হলেও, বিগত বছরের মধ্যে, রাষ্ট্রবিদ্, গবর্মেণ্ট এবং সুধীবর্গ বিশ্বের ভবিষ্যৎ বিধান কি হতে পারে তা দিব্য চক্ষে দেখতে সুরু করেছেন। ১৯৪১, ২২শে জুলাই—তখনও আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষ শক্তিরূপে পরিচিত—আমেরিকার অস্থায়ী রাষ্ট্রসচিব সাম্‌নার ওয়েল্‌স্ একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন,—"গত যুদ্ধের অবসানে আমেরিকার এক জন মহানুভব প্রেসিডেণ্ট দুর্গত মানব জাতির সম্মুখে এক চমৎকার আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। সেই আদর্শের রূপদান প্রতিষ্ঠায় তিনি আত্মবলি দিয়েছেন। আইন দ্বারা পরিচালিত সুনীতিবদ্ধ বিশ্বের রূপ ছিল তাঁর আদর্শ। তিনি যে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের কল্পনা করেছিলেন তা যে আংশিকভাবে অকৃতকার্য্য হয়েছে তার কারণ, আমেরিকার জনসাধারণ ও পৃথিবীর অন্যান্য অধিবাসীদের স্বার্থপরতা। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ যে সফলতা লাভ করতে পারে নি, তার কারণ গুটিকয়েক শক্তিশালী দেশ নিজ নিজ রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক বৃত্তি বিস্তারে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘকে ব্যবহার করেছে ব'লে। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের অসফলতার বিশেষ কারণ হচ্ছে কাউন্‌সিলের শক্তিশালী সদস্যদের পক্ষে নিজ নিজ রাষ্ট্রিক পদমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘকে বাধ্য করা। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রধান উদ্যোক্তা চেয়েছিলেন, অবস্থাবিশেষে—প্রয়োজন-মত পক্ষপাতশূন্য ও সুপ্রযোজ্য উপায় হিসাবে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ বিভিন্ন দেশের

মধ্যে নির্বিবাদে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা বিধান করতে পারবে। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘকে সেভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় নি।

"পৃথিবীর রাষ্ট্রসমষ্টি যখন বিধ্বস্ত জগতে আবার আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ভার নেবে তখন ঐ ন্যায়সঙ্গত ও নির্ব্বিবাদী মীমাংসার জন্য কোন-না-কোন উপযুক্ত বিধান স্থির করতেই হবে। তবে যে বিধানই স্থির হোক না কেন, দুটি জিনিসের বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

"প্রথমতঃ, আক্রমণের জন্য যে-সব যুদ্ধ-সরঞ্জামের প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ লোপ করা এবং রক্ষণোপযোগী অস্ত্রাদি ও যে-সমস্ত কলকব্জায় অস্ত্র প্রস্তুত হয় তা হ্রাস করা। তা করতে হ'লে, দৃঢ়তর আন্তর্জাতিক তদারক ও শাসনের ব্যবস্থা করতে হবে; কারণ, এমনি ধারা কোন শাসন-ব্যবস্থা না হ'লে নিরস্ত্রীকরণ কখনই সম্ভব হবে না।

"দ্বিতীয়তঃ, মানুষের সহজাত অধিকার হচ্ছে পৃথিবীতে সমান অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা। সুতরাং শান্তি-কামী বিশ্ববিধান যদি মানুষের এই অধিকারকে পরিপূর্ণ ও উপযুক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে তাহলে বিশ্বের শান্তি প্রকৃত ও স্থায়ী হ'তে পারবে না। যে-সমস্ত কাঁচা মাল বা প্রাকৃতিক সঙ্গতি পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের প্রয়োজন, সেই সমস্তের উপর যত দিন কোন রাষ্ট্র বা গবর্মেণ্ট নিজেদের একচেটিয়া আয়ত্ত বজায় রাখবেন, বিশ্ববিধানের ভিৎ তত দিন ন্যায় ও শান্তি সহযোগে গ'ড়ে উঠতে পারবে না।

"আমি এ কথা বিশ্বাস করি না যে জন-কল্যাণকামী ব্যক্তিরা আবার রাষ্ট্র সম্মেলনের মহান্ আদর্শের মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশের স্বাধীনতা, সুখ ও নিরাপত্তা গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করবেন না। দেশের নিরাপত্তাই হচ্ছে চরম পরিণতি—তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আজ বিশ্ব-মানবের হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠেছে।"

এই বক্তৃতার এক মাস পরেই আমেরিকার (আমেরিকা তখনও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন) প্রেসিডেণ্ট ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বজনবিদিত অ্যাটলাণ্টিক সনন্দ প্রকাশ করেছেন, তাতে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা রচিত হয়েছে। তেমনি আবার, জার্ম্মানী, ইটালী, ও জাপানের অভিপ্রায় এবং প্রস্তাব সকলেই জানেন। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ উক্তিও লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সুরু থেকে পোপ তিনটি কৃস্‌মাস্ উপলক্ষে বার্ত্তা ঘোষণা করেছেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের কৃস্‌মাস্-বার্ত্তাতে "নৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্ব-বিধান" সম্পর্কে পাঁচটি প্রকৃষ্ট কল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। প্রথম কল্পনা জোর দিয়েছে, ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার বিষয়ে। তৃতীয় কল্পনায় উক্ত হয়েছে, সার্ব্বজনীন অর্থনৈতিক সঙ্গতি ও মাল সম্পর্কে যাতে সমস্ত রাষ্ট্রই সমানভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান ক'রে সে সমস্যা সমাধানের কথা: চতুর্থ কল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রমশঃ সুরু ক'রে যথোপযুক্ত ভাবে যুদ্ধসরঞ্জাম হ্রাস করা এবং এমন প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা যা জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে সমর্থ হবে ও চুক্তি অনুযায়ী যাতে কাজ সম্পন্ন হয় বা প্রয়োজন হ'লে যা আইন ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে চুক্তিগুলি সংশোধন করবার মহৎ দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে পারবে।

এইরূপ পক্ষপাতশূন্য উক্তি, সযত্ন ইতিহাস অনুশীলন এবং গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মনোবৃত্তির বিকাশে রচিত হয়েছে। সমরোত্তর কালে, যাঁদের উপর বিশ্বের সহযোগিতাবিধান ও পুনর্গঠনের ভার পড়বে, তাদেরকে এই উক্তির মর্ম্ম বুঝে দেখতে হবে।

কখনও বা তুষ্টি—কখনও বা অনুশোচনা প্রকাশ ক'রে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের তিরোধানের কথা ঘোষিত হয়েছে। বিশ্ব-বিধানের হিতাকাঙ্ক্ষীরা শান্তিরক্ষার প্রথম মহৎ প্রচেষ্টার অসাফল্যে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন। কর্ম্মঠ রাজনৈতিক ক্ষমতা রূপে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের অস্তিত্ব অবশ্য কয়েক বছর থেকেই বিলীয়মান; কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত সঙ্গতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনহিতকর কাজের ক্ষেত্র এবং অনুশীলন-কেন্দ্ররূপে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ জীবিত রয়েছে। বিশ্ব-বিধানের উপায় ও রাষ্ট্রসমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা পুনর্গঠনের যন্ত্রস্বরূপ বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের জীবনীশক্তি আজিও অটুট।

সুগঠিত শ্রমিক ও মালিক সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ণ রেখে বিশ্ব-শ্রমিক আপিস সাহসী হয়ে কাজ চালাচ্ছে এক মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য। সে উদ্দেশ্য নিশ্চিত সফলতামণ্ডিত হবে।

আক্রমণহেতু হেগ্ থেকে অপসারিত হ'লেও এবং কর্ম্মতৎপরতা বর্ত্তমানে মুলতুবী থাকলেও আন্তর্জাতিক স্থায়ী আদালত আজিও বস্তুতঃ সজীব।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনুকূল মুহূর্ত্তে বিশ্বের পুনর্গঠন কাজ বা বিশ্ব-বিধানের ভিৎ নির্ম্মাণ বিষয়ে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। যুদ্ধাব-সানে বিশ্বের পুনর্গঠন কাজ যা হবে, এখন থেকেই প্রতিষ্ঠানগুলি তার জন্য তৎপর হ'তে পারে—কিন্তু, তা

নির্ভর করছে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য দেশগুলির ইচ্ছা ও সাহায্যের উপর।

পারিভাষিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ'ড়ে তোলার জন্য বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মানুশীলনের পশ্চাতে রাজনীতিক ধারণাকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠভাবে বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ বিশ্বের মুখ্য প্রয়োজন হচ্ছে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা। তাতে ক'রে সমস্ত কিছুই সম্ভব—তার অভাবে কোনও কিছুই সম্ভব হবে না। আমার স্থির বিশ্বাস যে, শিল্পোৎপাদনের আধুনিক উপায় ও আধুনিক বিধান সমস্ত শ্রেণী ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে নৈতিক দায়িত্বের দ্বারা পরিচালিত হ'লে পৃথিবীর ভগ্ন অর্থনীতিকে আবার গ'ড়ে তুলতে পারা যাবে। সকল শ্রেণীর লোকের মনে রাজনীতিক জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতার বিকাশ হ'লে, তবেই জগৎকে আবার অভাবের তাড়না থেকে উদ্ধার করা যাবে—মানুষের স্বাধীনতা নিরাপদ হবে এবং জীবন পবিত্র হবার সম্ভাবনা থাকবে। জীবনের পবিত্রতা ব্যতীত মনুষ্য-সমাজ নিতান্তই হতভাগ্য। কিন্তু এই পরিণামদর্শিতা, পরিচালনা-শক্তি ও রাজনীতিক জ্ঞান যদি আইন ও ন্যায় বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এমন কোন আন্তর্জাতিক শান্তি বিধানের উপায় স্থায়ী ভাবে গড়ে তুলতে না পারে, তা হ'লে যা-কিছু বর্ত্তমান তা হবে অনিশ্চিত এবং আর একটা দারুণ দুর্ঘটনার অবকাশ জেগে থাকবে।

রাষ্ট্রবিদেরা যেমন মহাপরীক্ষার প্রথম অবস্থা থেকেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তেমনি জনসাধারণের মধ্যেও পুনরুত্থানশীল ধারণা ও সঙ্কল্প দেখা যাচ্ছে। প্রথম বিফলতার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকে দোষ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন সময়ে কোন্ রাষ্ট্রেরই বা এই দায়িত্বের অংশ না ছিল? রাষ্ট্রধরবর্গ নিন্দিত হয়েছেন; কিন্তু পরিচালিত জনসাধারণ তারাও ত নিন্দার হাত এড়াতে পারে না। নিজেদেরকে নিরাপদ মনে ক'রে তারা নিশ্চিন্ত ছিল। দ্বীপের অধিবাসী হিসাবে তারা ভুল ধারণা নিয়ে ছিল, যে, সমৃদ্ধির মধ্যে থাকতে না পারলেও অন্ততঃ নিরাপত্তার মাঝে তারা রয়েছে। তারা ভুল ভেবেছিল যে, বহু দূরের দেশগুলিতে সমরাগ্নি জ্বলে উঠলেও তাদের নিজেদের জীবনধারা বেশ মন্থর গতিতেই বয়ে চলবে। পারস্পরিক আন্তর্জাতিক নির্ভরতা এবং দায়িত্ব বা অখণ্ড শান্তির কথাকে অবহেলা ক'রে কেহ কিছু বললে, তারা মেনে নিত এবং যখনই কোনও অধিনায়ক বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিজের রাজনীতিক পদমর্য্যাদা হানির আশঙ্কার দিকে না চেয়ে, তাদেরকে আসল সত্য বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, তখনই তারা তাঁকে আদর্শবাদী বা কল্পনা-বিলাসী মনে ক'রে অবজ্ঞা দেখিয়েছে। সুতরাং উপস্থিত বিপৎপাতের জন্য জনসাধারণের দায়িত্বও প্রচুর। অবশ্য, বর্ত্তমানে তারা চমৎকার সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিশ্চিত প্রয়োজন—সুব্যবস্থা এবং সহযোগিতা; নচেৎ শান্তি স্থাপিত হ'তে পারে না। পরীক্ষার প্রথম অবস্থায় যা ছিল, শান্তি প্রতিষ্ঠানের আকার তা থেকে ভিন্ন হোক আর না হোক, প্রতিষ্ঠানের কার্য্যবিধি অন্ততঃ ভিন্ন রকমের হবে। প্রাদেশিক ও মহাদেশীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে চিন্তা ও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রসম্মেলন বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা সুরু হয়েছে এবং এখানে-সেখানে গোষ্ঠী পত্তনের সূচনা হচ্ছে। নিরাপত্তা ও অর্থনীতিক সুরাহা অন্বেষণের মত ঐ সমস্ত সুব্যবস্থিত প্রচেষ্টাও উপকারী। কিন্তু যদি গবর্মেণ্টগুলি এ সম্পর্কে আংশিক সমাধান করাই স্থির করেন, তা হ'লে কেবল আংশিক সমাধানই হবে এবং তার চরম স্থায়িত্ব নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর। রাষ্ট্রসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আইন ও ন্যায়পরতা থাকা চাই; কিন্তু সেই আইন ও ন্যায়পরতার পশ্চাতে রাখতে হবে অর্থনীতিক ও সামরিক শক্তি। শান্তিরক্ষার জন্য স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, এ কথা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল না হ'লে বা জনসাধারণের সঙ্কল্প দ্বারা গঠিত না হলে কিন্তু ঐ শক্তি সরবরাহ করা যাবে না। গত মহাযুদ্ধ ও বর্ত্তমান সমরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শান্তিরক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা নেহাৎ মন্দ নয়—আসলে তা ভালই এবং ভবিষ্যতে নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ পেলে, বিশ্বে যে পুনর্গঠন সুরু হবে তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের অনেক অংশই সে কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারবে। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘকে সজীব রাখা হয়েছে। কতকগুলি রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করেছেন, তার কারণ, তাঁদের অভিপ্রায় বা যা তাঁরা নিজের স্বার্থ ব'লে মনে করেছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি তার প্রতিকূল হয়েছিল ব'লে। অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্র হয়ত ভয়ে বা সন্দেহে এই প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র জনসাধারণের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান আজিও আশার আলো—ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

যুদ্ধের বাস্তবিকতা যদিও জনসাধারণ ও গবর্মেণ্টগুলির সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা দখল করে রয়েছে, তা হলেও আজ সমরোত্তর বিশ্বের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথায় জোর

দেবার সময় এসেছে। যুদ্ধাবস্থাও আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে, যত দূর সম্ভব কর্ম্মশক্তি বজায় রাখা কর্ত্তব্য—শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের বিরাট্ সমস্যা সমাধান বিষয়ে গবর্মেণ্টগুলিকে সাহায্য করার জন্য নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের এখন থেকেই প্রস্তুত থাকা সমীচীন। যদি পৃথিবীতে পরিণামদর্শিতার অভাব ঘটে, তা হ'লে যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যার চেয়ে, যুদ্ধাবসানে অনেক বেশী সংখ্যক লোক ধ্বংস হবারই সম্ভাবনা।

ভারতের অন্ধ-শিক্ষায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দান

শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল (ক্যাল), এম-এ (কলাম্বিয়া)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজ সমগ্র ভারতবর্ষে একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ এবং অকপট স্বদেশহিতৈষী ব'লে পরিচিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "প্রবাসী", ''মডার্ণ রিভিউ" ও "বিশাল ভারত"—এই তিনখানি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা বহু বৎসর ধরে ভারতের অগণিত নরনারীদের জ্ঞান, শিক্ষা এবং আনন্দ বিতরণ ক'রে আসছে। "মডার্ণ রিভিউ"-এর খ্যাতি কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশেও এই পত্রিকার বহুল প্রচার ছিল। এই প্রবন্ধ লেখকের নিউ-ইয়র্কে অবস্থানকালে জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক উইল ডুরাণ্ট ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। মিঃ ও মিসেস্ ডুরাণ্ট উভয়েই রামানন্দবাবুর সুচিন্তিত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির বিশেষ প্রশংসা করেন।

কিন্তু ভারতের অন্ধ-শিক্ষায় রামানন্দবাবুর দানের কথা অল্পদিন পূর্ব্বেও প্রায় সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। এদেশের জনসাধারণের অন্ধ-শিক্ষা সম্বন্ধে একান্ত ঔদাসীন্যই এই শোচনীয় অজ্ঞতার একমাত্র কারণ। যা হোক, রামানন্দবাবুর এই দানের ফলে এদেশের দৃষ্টিহীনদের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

রামানন্দবাবু বাংলা ব্রেইল বর্ণমালার উদ্ভাবক; এবং এই ব্রেইল-লিপি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। তাঁর এই বাংলা অন্ধ-লিপি সামান্য পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বর্ত্তমানে প্রচলিত। রামানন্দবাবু নিজে অন্ধ-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানা সত্ত্বেও যে প্রায় ৫১ বৎসর পূর্ব্বে এটা উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন, এ অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। এতেই রামানন্দবাবুর বহুমুখী প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। রামানন্দবাবু নিজে অন্ধ-শিক্ষাব্রতী না হ'লেও, ভারতের সমস্ত অন্ধ-শিক্ষাব্রতী এবং দৃষ্টিহীন নরনারীগণ তাঁর এই উদ্ভাবনের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। লেখকের যতদূর জানা আছে, ১৯৪০ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রামানন্দবাবুর এই উদ্ভাবন সম্বন্ধে কিছুই লিখিত ভাবে প্রকাশিত হয় নি। এই মহান্ উদ্ভাবনের কথা কেমন ক'রে যে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল, সেটা অত্যন্ত বিস্ময়কর।

রামানন্দবাবু এদেশের দৃষ্টিহীনদের জন্য যা করেছেন তা সম্যক্ উপলব্ধি করতে হ'লে, ব্রেইল প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জানা, এবং রামানন্দবাবু যে সময়ে বাংলা ব্রেইল উদ্ভাবন করেছিলেন, এ দেশের তৎকালীন অন্ধ-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন স্থানাভাববশতঃ এখানে এসম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা সম্ভবপর নয়; অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হবে।

ব্রেইল-প্রণালী অন্ধদের লিখন ও পঠনের জন্য ছয়টি উচ্চ বিন্দুর (⠿) সাহায্যে গঠিত এক প্রকার লিপি। এর একটি হ'তে ছয়টি পর্য্যন্ত বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান অনুসারে সাজিয়ে এই বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে। অন্ধেরা আঙুল দিয়ে অনুভব ক'রে এগুলো পড়ে থাকে।

ব্রেইল-প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে ইউরোপ ও আমেরিকায় অন্ধদের জন্য লেখাপড়ার আরও অনেক প্রকার পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তার কোনটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নি। লুই ব্রেইল নামে একজন অন্ধ ব্যক্তি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রণালী আবিষ্কার করেন এবং তাঁর নামানুসারে এই লিপির নাম হয় ব্রেইল। বর্ত্তমানে অন্ধদের জন্য জগতের সর্ব্বত্রই এই পদ্ধতি প্রচলিত। কিন্তু পূর্ব্বে আরও অনেকগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতি বিদ্যমান থাকায় ব্রেইল-প্রণালীর প্রতিষ্ঠালাভ করতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। এমন কি যে-বিদ্যালয়ে লুই ব্রেইল নিজে অধ্যাপনা করতেন সেখানেও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আবিষ্কারের প্রায় ২৫ বৎসর পর এটা গৃহীত হয়। এই প্রতিযোগিতা সব চেয়ে তীব্র হয়েছিল আমেরিকায়। সেখানে এটা "ব্যাটল অব্ দি টাইপস্" অর্থাৎ "লিপিমালার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ।

অবশেষে ব্রেইল-প্রণালীই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হওয়ায় সকল দেশেই এটা প্রচলিত হয়, এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলি একে একে পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশের ভাষা ও বর্ণমালার পার্থক্য ও প্রয়োজনানুসারে এই অক্ষরগুলো অদল-বদল ক'রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব দেশের ব্রেইল বর্ণমালাই লুই ব্রেইল আবিষ্কৃত ছয়টি বিন্দুর উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত।

ভারতে ব্রেইল-পদ্ধতিতে অন্ধ-শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম প্রচলন হয় বিগত শতাব্দীর শেষভাগে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে যখন রামানন্দবাবু বাংলা ব্রেইল উদ্ভাবন করেন, তখন এ দেশে দুইটি মাত্র অন্ধ-বিদ্যালয় ছিল;—একটি দেরাদুনের নিকটবর্ত্তী রাজপুরে, এবং অপরটি মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত পালামকোট্টায়। এই দুইটি বিদ্যালয়ই ব্রিটিশ মিশনরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং তাঁরা ঐ সব অঞ্চলের ভাষার উপযোগী ক'রে ইংরেজী ব্রেইল পরিবর্ত্তিত করেন।

রামানন্দবাবু বাংলা দেশে একটি অন্ধ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা করলে অনায়াসেই করতে পারতেন। কিন্তু তা যে করেন নি তার কারণ বোধ হয় তিনি কেবল এক প্রকার নয়—সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণেরই কল্যাণকামী ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার অভাব ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের আশ্রয় ও ভরণ-পোষণের জন্য কলিকাতায় "দাসাশ্রম" নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এই আশ্রমের "দাসী" নামে একটি নিজস্ব মাসিক ছিল; এবং রামানন্দবাবু ছিলেন তার সম্পাদক। বাংলা ১২৯৯ সালে অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। রামানন্দবাবু দেশ ও সমাজের মঙ্গলকর অনেক বিষয়ে এতে লিখতেন। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি এদেশে অন্ধদের উপযুক্ত শিক্ষাদান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং ইংরেজী ব্রেইল কেমন ক'রে বাংলায় পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে,—তার একটি সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন। সে সময়ে বাংলা দেশে কোনই অন্ধ-বিদ্যালয় ছিল না; এবং এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টাও খুব সম্ভব কেউ করেন নি। সুতরাং রামানন্দবাবু বাংলা ব্রেইল উদ্ভাবন করা সত্ত্বেও সে সময়ে সেটা কার্য্যকরী ভাবে ব্যবহৃত হয় নি। তা ছাড়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে "দাসী" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রায় তৎপূর্ব্বেই রামানন্দবাবু কলিকাতা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ায়, বাংলা দেশে অন্ধ-শিক্ষার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি।

বাংলা ব্রেইল যে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে,—লালবিহারী শাহ ১৮৯৪ সালের পরবর্ত্তী কোন সময়ে সেই পরিবর্ত্তন সাধন করেন ব'লে শোনা যায়। এ সম্বন্ধে "কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ে"র ১৯৩৯ সালের কার্য্য-বিবরণীর ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সুতরাং লালবিহারীবাবুর প্রণালী উদ্ভাবনের অন্ততঃ দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বেই রামানন্দবাবুর বাংলা ব্রেইল উদ্ভাবিত হয়। তুলনা করলেই দেখা যায় যে, রামানন্দবাবুর ব্রেইলের সঙ্গে লালবিহারীবাবুর ব্রেইলের পার্থক্য, অল্প কয়েকটি অক্ষরের অদলবদল ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং মূল আদর্শ সম্পূর্ণ এক। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, রামানন্দবাবুই বাংলা ব্রেইলের উদ্ভাবক।

রামানন্দবাবুর ব্রেইল যে কেন কাজে লাগান হয় নি তার কারণ অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তাঁর এই মহান্ উদ্ভাবন কেন যে জনসাধারণের—বিশেষ ক'রে অন্ধ-শিক্ষাব্রতীদের নিকট অজ্ঞাত ছিল, তার কারণ দুর্ব্বোধ্য। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪০ সালের পূর্ব্বে রামানন্দবাবুর এই পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশিত হয় নি।

১৯৩৮ সালে এই প্রবন্ধের লেখক যখন তাঁর পি-এইচ ডি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন রামানন্দবাবুর উদ্ভাবিত বাংলা ব্রেইল যে "দাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি সংখ্যা তাঁর (লেখকের) হস্তগত হয়। লেখক তাঁর অনুসন্ধানের ফল অন্যান্য অন্ধ-শিক্ষাব্রতীদের জানালে, তাঁরা সকলেই ভারতের অন্ধ-শিক্ষায় রামানন্দবাবুর দানের কথা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করেন।

বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, রামানন্দবাবুর জীবিতকালেই তাঁর এই বহুকাল-বিস্মৃত ও উপেক্ষিত মহৎ কার্য্যের জন্য একটি সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল-ভারত অন্ধ-আলোক-নিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক তাঁর রোগশয্যায় এই অভিনন্দন দেওয়া হয়।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী বাণী ঘোষ এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাত্র চৌদ্দ বৎসর সাত মাস বয়সে বি-এ পাস করিয়াছেন। শ্রীমতী বাণী ১৯৩৯ সনে মাত্র দশ বৎসর সাত মাস বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাবে উত্তীর্ণা



শ্রীবাণী ঘোষ

হন। ইতিপূর্ব্বে কেহ এত অল্প বয়সে বি-এ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন নাই। শ্রীমতী বাণী ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ্ মেডিকেল অফিসার কাপ্তেন জে. এম. ঘোষ মহাশয়ের দুহিতা।

শ্রীমতী মীরা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বাধিক নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বাংলাতেও প্রথম হইয়া একটি স্বর্ণপদক লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন। ইনি ঢাকা শহর প্রবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগের কনিষ্ঠা কন্যা।

যাঁহারা অদ্যাবধি 'ভাটখাণ্ডে য়ুনিভার্সিটি অফ্ হিন্দুস্থানী মিউজিক' হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমতী অশোকা দেবী সর্ব্বকনিষ্ঠা। তাঁহার বয়স মাত্র এগার বৎসর আট মাস। বালিকাটি মীরাট সঙ্গীত-সমাজ মিউজিক কলেজের ছাত্রী। একাধিক নিখিল-ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল গানে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন।



শ্রীঅশোকা দেবী

পাবনার স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর মৌলবী আবদুল সামাদ খাঁর কন্যা মিস হামিদা খানুম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাস করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্টের



হামিদা খানুম

বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে পি-এইচ ডি উপাধি-লাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাস করিয়াছেন।

কালুর মা পাইকের বউ

শ্রীসাধনা কর

বাড়ির কাছে সকালবেলাই নীলামের ঢোল বেজে উঠল। শুনে পাইকের বউ আর স্থির থাকতে পারলে না। এত দিন পরে ছুটতে ছুটতে ভুইঞা-বাড়ি (এ অঞ্চলে এখনও জমিদার তালুকদার মনিবদের প্রজারা বলে—ভুইঞা) হাজির। বেশী দূর নয়। উত্তরের ছোট বনটা পেরিয়ে আর দু-পা। ভুইঞাদের সদরবাড়ি। সদরে তখন অনেক ভুইঞাই ছিলেন বসে। বোধ হয় তাদেরই বিষয় নিয়ে হচ্ছিল কথা, পাইকের বউ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব নীরব। শুধু যেন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সেজ ভুইঞা বললেন—পাইকের বউ যে! যাচ্ছ কোথায়?

কম্পিত স্বরে পাইকের বউ বললে—এলাম ভুইঞা আপনাদের এখানেই…।

—আমাদের এখানে! কেন? কি কাজ? আমাদের কাছেও তবে কালু মিঞা আর তার মার কাজ থাকতে পারে!

মাথা নীচু ক'রে রইল পাইকের বউ। ভুইঞাদের কঠিন শ্লেষের উত্তরে তার কিছুই বলার ছিল না। ছেলের চাপে পড়ে দু-তিন মাস সে একেবারেই আসে নি ভুইঞা-বাড়ির দিকে। খানিক চুপ থেকে সে আস্তে আস্তে বললে—ছোটলোক মুখখু মানুষ ভুইঞা আমরা, জানি নে, বুঝি নে কিছু। তা বলে এই কি ধম্ম কাজ, শেষটা ভিটেমাটি ছাড়া করালেন আপনারা…।

বাধা দিয়ে বড় ভুইঞা বললেন—সে দোষ কি পাইকের বউ আমাদের। সবই তুমি জান, তবু এ নিয়ে আজ এসেছ অনুযোগ করতে।

পাইকের বউ চুপ।

বড় ভুইঞাই আবার বললেন—তোমার ছেলেও দেখছে ভুইঞাদের কেরামতি কত, আগের দিন তাদের আছে কি না, আমরাও তাই দেখাতেই চাই, ভাঙতে চাই তার বেয়াদবি। যা হবার হবে, ও নিয়ে আর কথা বলে লাভ?

কাতর হয়ে পাইকের বউ বললে—আর কি কিছুই করবার নেই ভুইঞা। ছাড়তে হবে স্বামীর ভিটেমাটি, দাঁড়াব গিয়ে কোথায়…।

রগচটা মানুষ সেজ ভুইঞা, তিরিক্ষি-মেজাজে বললেন—ছাড়তে হয় ছাড়বে। সহজে না ছাড়, জোর ক'রে ছাড়াব আমরা। বেদখল করব বাড়ি।

ভুইঞাদের চোখে মুখে দৃঢ় কঠিনতার ছাপ। বড় ভুইঞা, যাকে পাইকের বউ সহজ এবং শান্ত মানুষ বলেই জানে, তিনিও দৃঢ়সঙ্কল্প। কেঁপে উঠল কালুর মার মন। ব্যাকুল কণ্ঠে বললে—আপনাদেরই পাইকের ছেলে বউ ভুইঞা, এককালে…।

—এক কালের কথা ছেড়ে দাও পাইকের বউ, সে সম্পর্ক চুকে গেছে। সে থাকলে আজ এমন হয় না। আজ শুধু আমরা মনিব, তোমরা প্রজা, সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে এই। দোষ একা তোমাদেরই বা দিই কেন, কালের হাওয়াই গেছে উল্টে, সবের মধ্যেই সম্পর্ক আজ এই।

কাতর মুখে মাথা নীচু ক'রে পাইকের বউ দাঁড়িয়ে রইল। কথাটা তার মনে রূঢ় ভাবে করল আঘাত। সদর বাড়ি নিস্তব্ধ। পাইকের বউ ধীরে ধীরে সেলাম জানিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, নরম স্বরে ডাকলেন বড় ভুইঞা, বললেন—শোন পাইকের বউ, তুমি বলেই বলছি, এখনও যদি ছেলেকে বুঝিয়ে সমঝিয়ে আনতে পার আমাদের কাছে, কথাবার্ত্তা বলে-কয়ে যা হোক কিছু ব্যবস্থা করতে পারি। ব'লো ছেলেকে, আর শোন, ছেলের উপর একটু কড়া নজর রেখ পাইকের বউ, যে-সব কাজ সে করছে, ভবিষ্যৎ তার অত্যন্ত খারাপ, বুঝেছ? সমঝিও ছেলেকে।

পাইকের বউ মাথা নাড়লে কিনা বোঝা গেল না। মন তার জ্বলছিল। ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে গেল সে।

ছেলে তার বাড়ি ছিল না। থাকে না প্রায় কোন দিনই। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তার এক খাওয়ার আর কচিৎ আসে রাত্রে শুতে। বাইরে তার কাজ—জল সেঁচা, মাছধরা, নৌকা বাওয়া, আরও কত কি, কালুর মা তা জানেও না। সেদিনও সে বাড়ি ফিরল একেবারে বেলা শেষে। অপেক্ষা ক'রে ক'রে কালুর মার ধৈর্য মানছিল না। ভাতের সান্‌কি সামনে দিয়েই বললে—নীলামের ঢোল যে আজ বাজিয়ে গেল…।

ভ্রূ কুঁচকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে কালু বললে—তাতে হয়েছে কি?

—যাবি কোথায়?

দীপ্ত স্বরে উত্তর হ'ল—কোথাও না। থাকব এখানেই, এই বাড়িতে।

—যদি তাঁরা বাড়ি বেদখল করেন, বলছিলেন আজ ভুইঞারা। এখনও বলছি কালু, শোন্ কথা, যা একবার…।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিয়ে কালু বললে—কখ্‌খনো না। গিয়েছিলে বুঝি তুমি? দয়া তারা করলে না? ভুইঞা, কত বড় ভুইঞা রে আমার। আর কখ্‌খনো যদি যাও ও বাড়ি, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে যাবে, বলে রাখলাম…।

ছেলের ঔদ্ধত্য, ভুইঞাদের প্রতি তার অবহেলা অনেক কষ্টে এত দিন সয়েছিল কালুর মা, আর পারলে না। রেগে বললে—অত তেজ ভালো নয় কালু, ভুইঞারা এমন কিছু অন্যায় করছেন না। খাজনা তুই না দিস, টাকা দে আমায়, আমি দেব।

তাচ্ছিল্যভরে কালু বললে—টাকা নেই আমার।

—সংসার চালাবার টাকা দে।

—কি আনতে হবে বল আমায়, এনে দেব। টাকা আমার হাতে থাকে না।

ক্রোধে আগুন হয়ে কালুর মা বললে টাকা নেই। এত খাটিস, কিছুই রোজগার হয় না? কি করিস সে-সব। বল্, বলতেই হবে আমায়।

কালু নিরুত্তর। তারপরে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললে সে সব হিসেব-নিকেশে তোমার কি দরকার। খেতে-পরতে পারছ, পরের দোরে ত ভিক্ষে ক'রে খেটে খেতে হচ্ছে না?

কথাটাতে খোঁচা ছিল, পাইকের বউ, ভুইঞা-বাড়ি আগে খেটে খেত। সে জ্বলে উঠে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—তাই কি? আমার কিছু শুনবার দরকার নেই?

—না।

বাইরে থেকে ডাক এল কালুমিঞা, বলি ভাই-সাব বাড়ি আছ?

ত্রস্ত হ'য়ে কালু বললে—যাচ্ছি ভাই-সাব, দাঁড়াও একটু।

লাফ মেরে উঠে পড়ল সে খাওয়া শেষ ক'রে। কোথেকে বের ক'রে আনলে স্বল্প দামী ছোট্ট একখানা আয়না, একখানা চিরুণী, উগ্রগন্ধী তেলের শিশি। বের করলে একখানা নতুন লুঙ্গি। বেশভূষায় পারিপাট্য করে বিড়ি ধরিয়ে সে বেরুচ্ছিল, মা এসে দাঁড়াল সামনে। কঠিন স্বরে বললে—ওদের আমি চিনি, রমজান সেখের ছেলে আবদুল, আর করিম ছেয়াল। ওরা চোর-বদমাস, ওদের সঙ্গে তুই কোথা যাস।

কালু বিরক্ত হয়ে বললে—পথ ছাড়। গোলমাল ক'র না।

—না। ওদের সঙ্গে তুই যেতে পারবি নে।

পাইকের বউর হাত ছিল দরজার গায়ে, অবহেলা ভরে কালু তা সরিয়ে দিয়ে বললে—বসে থাকব নাকি তোমার আঁচলের তলায়…। সে বয়েস আমার নেই। নিজের ইচ্ছে মত আমি চলব-ফিরব, যা খুশী তাই করব। অন্যের হুকুমে চলব না। যাও, সরো। রাত্রে আর আসতে পারব না আজ…।

বলতে বলতে কালু বেরিয়ে পড়ল বাইরে। বাঁকা চালে পা ফেলে, বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হেসে গল্প করতে করতে চলে গেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কালুর মা কালুর যাওয়া দেখলে। দৃপ্ত, ঋজু, সবল, সতেজ। কাউকে তার আর দরকার নেই আড়াল ক'রে রাখবার, সন্তর্পণে বাঁচাবার। মায়ের ছায়া এখন নিষ্প্রয়োজন। কি এক অবোধ্য সুতীব্র ব্যথায় অনেকক্ষণ দোরের কাছে নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল কালুর মা, চমক ভাঙল বাইরের ডাকে। চেয়ে দেখলে মাঠে নেমেছে ছায়া, শিমুলগাছে কাকের দল বাসায় ফিরে লাগিয়েছে কিচিমিচি। বড় ভুইঞা মেজ ভুইঞা এই পথেই কোথায় যাচ্ছিলেন, ডেকে বললেন—হ্যাঁ পাইকের বউ, বাড়ি তবে আমরা জোর ক'রেই করব বেদখল! ছেলে ত তোমার সবার কাছে বলে ফিরছে যা করতে পারে করুক ভুইঞারা, বাড়ি আমি ছাড়ব না। তোমারও কি তাই মত?

কথা শুনতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল কালুর মা, মাঝপথেই থমকে দাঁড়াল। সারাদিনের আহত অভিমান, সুপ্ত অপমান বেদনা অবরুদ্ধ অচেতন মন থেকে হঠাৎ একেবারে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। বিক্ষুব্ধ আলোড়নে নিপীড়িত কালুর মা শুধু রুদ্ধ স্বরে থেমে থেমে বললে—ভুইঞা, ছেলে আমার বড় হ'য়ে গেছে, মানুষ হ'য়ে গেছে, আমার দরকার তার নেই। কেমন ক'রে কি দিয়ে আজ আমি তাকে বাগ মানাব, ধরে রাখব! শুনবে কেন সে অন্যের হুকুম? তার সম্মানে বাধবে না? নিজেকে ছোট করবে সে কেন? সে যে আজ শক্তি-সামর্থ্যে নিজেই মানুষ, মায়ের কালু ত নেই?

কথা গেল তার আটকে। একটা ঢোক গিলে খানিক থেমে থেকে সে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে ফেললে—কাকে কি বলব ভুইঞা, এককালে ছিলাম আপনাদেরই পাইকের বউ, আপনাদেরই আশ্রয়ে। সেই আপনারাই আজ…থাক্, যাক্ গে, থাক্ গে সে সব, সে সম্পর্ক না কি ঘুচে গেছে। গেছে যাক্। করুন আপনারা যা খুসী তাই করুন। কিছু বলবার নেই আমার, কি আর বলব…।

বলতে বলতে দ্রুতবেগে পাইকের বউ ঘরে ঢুকে গেল।

* * *

কালুর মা কালুকে আপন বুকে ক'রে মানুষ করেছিল, ভুইঞাদের আশ্রয়ে থেকে নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে তাদেরই খেয়ে প'রে। ছেলে যখন বছরখানেকের, স্বামী গেল মারা। ভুইঞাদের পাইক ছিল সে, কোথায় গিয়েছিল দাঙ্গা করতে, পেটে আঘাত পেয়ে এল। মাস-ছয়েক নিঃশব্দে কাউকে না জানিয়ে ভুগে অকস্মাৎ গেল মারা। কালুর মা পাইকের বউ কেঁদে এক দিন বলেছিল, অসুখ তখন বাড়াবাড়ি, কিন্তু বাইরের লোকের টের পাবার জো ছিল না, টের পেয়েছিল কালুর মা, কেঁদে বললে—বল তুমি ভুইঞাদের। ডাক্তর চিকিচ্ছক এনে তারা নিশ্চয়ই চিকিচ্ছে করাবেন। ভাল হয়ে যাবে তুমি, বল।

একটা ব্যথা উঠেছিল। দম খিঁচে তাকে নিবারণ করছিল পাইক, খানিক উপশম হলে বললে—যেমন বুদ্ধি তোমার। লোকের কাছে আর তবে মুখ দেখাতে পারব? বলবে দাঙ্গা করতে গিয়ে পাইক হয়েছে জখম। ছিঃ ছিঃ, ভুইঞা-বাড়ির পাইক আমি, সম্মান আমার কত তা জান?

তার পরে হেসে দীপ্ত হ'য়ে বললে—বুড়ো হ'লে ত কাজ যেত, ভুইঞাদের জন্যে প্রাণ দেওয়া আর হ'ত না। এই জান-দেওয়ার কত বড় আনন্দ,—পেতাম কি? ভুইঞাদের জন্যে জান দিয়ে গেলাম, একা জিতে এসেছি দাসার্ত্তার মিঞাদের সঙ্গে। পেটে চোট পেয়েও।

পাইকের বউ চুপ ক'রে রইল। জানত ভুইঞা ছাড়া আশ্রফ আলির বড় এবং দরদের কিছু নেই। রাত-বিরেতে যখন পড়েছে ডাক, পাইক মাথায় জড়ানো পাগড়ি, কোমরে আঁটা গামছা, ডান হাতে নিজের মনোমত বাঁশের লাঠি, হাসিমুখে হাজির।

ভুইঞাদের হুকুম করতে দেরি, তামিল হতে সময় লাগে না। কাজ সেরে তবে পাইকের নাওয়া-খাওয়া। অনেকেই বলত—বড় একগুঁয়ে পাইক, মূর্খ। বিপদ-আপদ বোঝে না, হুকুম তামিল করা চাই-ই। এমনি করেই মরবে ও কোন দিন।

হাসে পাইক। ভুইঞাদের কাজ, জান ত ছাড। এখনকার বড় ভুইঞার বাবা বুড়ো কর্ত্তা হেসে ডাকতেন পাইক।

—ভুইঞা! দরজার পাশে খাড়া আছে সে। আর কথা নয়, দুটি কথাতেই দুজনের প্রাণ ভরা। মুসলমান আর হিন্দু, মনিব আর চাকর, ভুইঞা আর প্রজা, মনে বড় কারু থাকত না। ভুইঞারা জান্‌ত—তাদেরই পাইক।

পাইক জানে—তারই ভুইঞা।

মাইনের কথা ত বাদ, মায় বাড়ির খাজনা অবধি দিতে হ'ত না। মুখের কথায় বুড়ো কর্ত্তাই এক দিন বলেছিলেন—ওই অতদূর নাজিমপুর থেকে আসতে যেতে তোমার বড় অসুবিধা, কষ্ট হয় নিশ্চয়ই। উঠে এস তুমি আমাদের গাঁয়ে, পশ্চিমের ওই মুসলমান পাড়ায় যে উঁচু জমিটা আছে, বাঁধো সেখানে ঘর। খাজনা লাগবে না, উঠে এস।

আভূমি নত হয়ে সেলাম দিয়ে দান গ্রহণ করলে পাইক। শুধু তাই নয়, ভুইঞা-বাড়ির বকশিশে পাইকের ঘর পরিপূর্ণ। ভুইঞাদের অবস্থা তখন ভাল, বার মাসে তের পার্ব্বণের সিদের ভাগ পাইকের ছিল বরাদ্দ। দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিকেশের শেষে মিলত বুড়ো কর্ত্তার নিজ হাতের বকশিশ। কাজের সম্পর্ক ছাড়িয়েও ভুইঞা-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অনেক উপরে।

সেই পাইক মধ্য বয়সে হঠাৎ যখন গেল মারা, বুড়ো কর্ত্তা লোক পাঠিয়ে পাইকের বউকে ডাকালেন, বললেন—শোনো পাইকের বউ, পাইক গিয়েছে, তার ভুইঞারা এখনও বেঁচে। তোমার কোন কষ্ট বা দুর্দ্দশা হলে তাদের অপমান। যেমন ছিলে তেমনি থাক তুমি। ছেলে বড় হলে বাপের মত এ বাড়িতেই কাজ করতে পারবে।

সেই থেকে পাইকের বউ ভুইঞাদের আশ্রয়ে। তাদের ঋণ শোধ দিত সে ভুইঞা-বাড়ির অন্দর মহলে মা-ঠান্‌দের কাছে কাজ করে। চিঁড়ে কুটত, ধান ভানত, উঠোন নিকোত, বাসন মাজত। বাইরের নানা খুঁটিনাটি কাজের বদলে মা-ঠান্‌রা তাকে খুসী ক'রে দিতেন। দিতেন কাপড়, কুমড়োর ফালি, লাউ, মোচা, মুড়ি-মুড়কি। আনতে বলতেন তাকে তাঁদের শখের জিনিস—ক্ষেতের তাজা ধনেপাতা, মটর শাক, বনের ডুমুর—আরও কত কি। ভুইঞা-বাড়ির সঙ্গে দিনে দিনে পাইকের বাড়ির সম্বন্ধ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছিল দান প্রতিদানের ভিতর দিয়ে। এক দিন দুদিন নয়, দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোন দিন এদের অসদ্ভাব ঘটে নি। বিবাদ বাধল কালু যখন হ'ল বড়। যখন পাইকের বউ আশা করল বুড়ো বয়সে এবার সে ছেলের রোজগারে শান্তিতে কাটাবে দিন। কালুর বয়স বছর কুড়ি-একুশ, বলিষ্ঠ চেহারা, চোখে মুখে কঠোর গর্ব্বিত দৃপ্তি, বাপেরই মত একগুঁয়েমি তার কাজে কর্ম্মে। ভুইঞাদের পাইকের ছেলে, হয়ে দাঁড়াল তাদেরই বিরোধী এবং দিনে দিনে শত্রু।

ভুইঞাদের সে-দিন ছিল না। বুড়ো কর্ত্তা মারা যাবার পরে দেশের অবস্থা গিয়েছে বদলে। তা ছাড়া বহুগোষ্ঠী ভাগ ভিন্ন হয়ে তালুকদারী ছত্রখান। লাটের খাজনা কিন্তু একরত্তি কমে নি। অগত্যা বছর তিন-চার আগে ভুইঞারা কড়া হয়ে উঠলেন। নিয়ম করলেন যে-সমস্ত প্রজা বিনে খাজনায় বাড়ি-ঘর করে ভোগ, অবস্থানুযায়ী প্রত্যেককে তাদের খাজনা দিতে হবে। বছরে অর্থাৎ লাটের কিস্তির সময় দু-পয়সা চার পয়সা, আট আনা ছ-আনা থেকে এক টাকা দেড় টাকা অবধি খাজনা দেওয়া হ'ল বেঁধে। তাও যে না পারবে, তাকে ভুইঞা-বাড়ি বিনে মাইনেয় গাবুর খেটে দিতে হবে। খানিকটা অসন্তুষ্ট, বিরুদ্ধ মনোভাব হলেও অনেক প্রজাই মেনে নিলে কথাটা। মানলে না যারা, তাদের মধ্যে কালুই প্রধান। নৌকা বাইতে, মাছ বিক্রি করতে সে অনেক সময়ই যেত বাইরে, ঢাকা বিক্রমপুরের ওদিকে। বাইরের অনেক জ্ঞান অর্থাৎ উপরি উত্তেজনা তার খুবই লাভ হয়েছিল। এবং তারই বেগে সে হ'ল উদ্ধত, অবিনীত, হ'ল হিন্দু এবং ভুইঞাদের বিরোধী। ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে সে যখন পাকাচ্ছে দল এমনি সময়ে ভুইঞাদের এই খাজনার দাবী সে মাথা ঝাঁকিয়ে একেবারে দিলে অস্বীকার করে। বললে—দেবো না খাজনা। বাড়ি বুড়ো কর্ত্তা বিনে খাজনায় ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

কালুর ব্যবহারে এমনিতেই ভুইঞারা ছিলেন অসন্তুষ্ট, ঝাঁঝিয়ে বললেন—দিতেই হবে। সে-দিন নেই, অত বড় বাড়ি বিক্রি করলে আজ হাজার টাকা লাভ করতে পারি, উপরন্তু বছর খাজনা। ও আমরা অমনি ছাড়ব না। অন্তত নামমাত্র এক টাকা বছর তোমাকে দিতেই হবে।

কালু বললে—আমার টাকা নেই।

ভুইঞারা রেগে বললেন—সব চেয়ে বেশী টাকা তোমার। খেটে পাও, না খেটেও পাও, বদমায়েসী করে ওড়ালে থাকবে কোত্থেকে।

কালুর বদনাম সে চোর, সে লম্পট। কথাটা বোধ হয় সত্যি বলেই আঁতে ঘা লাগল কালুর। জেদ করে বস্‌লে টাকা সে কিছুতেই দেবে না। যা ইচ্ছে করতে পারেন ভুইঞারা। ভুইঞারাও বললেন—আচ্ছা !!

মুশ্‌কিল পাইকের বউয়ের। না পারলে ভুইঞাদের বুঝিয়ে নরম করতে, না পারলে বাগ মানাতে ছেলেকে। দিনে দিনে বিবাদ ঘোরাল হয়ে উঠল। ভুইঞারা করলেন মকদ্দমা। মেজো ভুইঞা মহকুমার নাম করা উকিল। দেখতে দেখতে নানা প্যাঁচে জড়িয়ে কালু মিঞার বাড়ি হ'ল নীলাম। ডিক্রি জারী হ'ল। কালু বাড়ি রইল আঁকড়ে, ছাড়বে না। কালুর মায়েরই মত নিয়ে ভুইঞারা তোড়জোড় সুরু করলেন বাড়ি বেদখল করতে।

* * *

দিনে রাতে পাইকের বউর মনে আর সোয়াস্তি নেই। আশঙ্কায় মন তার উদ্বেল। কবে না জানি ভুইঞারা আসেন

বাড়ি বেদখল করতে। এ ক-দিন সে ছেলের সঙ্গে কথা বলে নি একটি, বেরোয় নি বাড়ি ছেড়ে, আপন মনে স্তব্ধ হয়ে ছিল। সে-দিন ভোরবেলা পঞ্চাশ-ষাট জন হিন্দু-মুসলমান প্রজা নিয়ে ভুইঞারা দল বেঁধে এলেন বাড়ি ভাঙতে, পাইকের বউ বাড়ি ছেড়ে গিয়ে বসে রইল পাশের যবরালি মুন্সীর বাড়ি। বাড়িটা ছোট ডোবার ওপারে। স্পষ্টই দেখা এবং শোনা যায় সব। ভুইঞারা যে সে-দিন বাড়ি বেদখল করতে আসবেন, খবরটা আগেই হয়েছিল প্রচার। কালু মিঞা যে-সব সঙ্গী জুটিয়েছিল সময়কালে তাদের দেখা মিলল না। একাই দাঁড়াল কালু, লাঠি আর ধান-কাটা কাস্তে নিয়ে। বাড়ি ঢুকবার রাস্তাটা খুব সরু। দু-চারজন একসঙ্গে ঢুকতে পারে না। একপাশে খাড়া নেবে মাঠ, আর পাশে পোড়ো খানিকটা জমি। কুল ঝোপ, বেত ঝোপ, ইট, কাচে ভরা জঙ্গলা জমি। কালু মিঞা রাত জেগে বসে বসে সেই পথে বিছিয়ে রাখল কাঁটা-কুটো, বুনো লতাপাতা এনে বাড়ির উঠোনে ঢুকতেই যে দুই আমগাছ তার সঙ্গে শক্ত বেড়া বেঁধে করলে গেট্ মত। তার পরে সেই গেটের পাশে লাঠি আর কাস্তে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাত জেগে আর আক্রোশে আক্রোশে চোখ তার লাল, চুল তার খাড়া খাড়া, হাতের পেশী ফুলে উঠেছে। ওদিকে ভুইঞারা বড় বড় লাঠি, রাম-দা, সড়কি-লড়কি যা পেলে নিয়ে প্রস্তুত। প্রজাদের হাতে লাঠি। চারিদিকে রি রি হৈ হৈ রোল। কালুর মা সবই দেখছিল, সবই শুনছিল, বুঝছিল না কিছু। সমস্ত বোধশক্তি যেন তার নিথর নিস্পন্দ হয়ে মরে গেছে। শুধু অত্যন্ত গভীরে কি একটা স্পন্দন সূক্ষ্ম ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকে কেঁপে ফিরছিল।

ঘণ্টা আধেক পরে হঠাৎ সমস্ত তীব্র কোলাহল কলরব ছাপিয়ে একটা তীক্ষ্ণ করুণ আওয়াজ তার প্রাণের মধ্যে গিয়ে ঝন্ করে মারলে ঘা, আপনার অজ্ঞান্তে চকিতে উঠে দাঁড়াল কালুর মা। ব্যগ্র হয়ে চেয়ে দেখলে সেজো ভুইঞার হাতের ধাক্কা খেয়ে কালু ছিটকে উল্টে পড়ল। বাদ বাকিটা প্রজাদের ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু কালুর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল কানে—মেরে ফেললে, আমায় খুন করলে এরা।

তড়িৎ গতিতে—পাগলের মত ছুটল কালুর মা। মনের মধ্যে তীব্র বেগে জেগে উঠল ভুইঞাদের উপর রাগ-দ্বেষ-জিঘাংসা। দ্রুত বনবাদাড় ভেঙে নামল গিয়ে সে পাশের মাঠে। চৈত্র মাসে ক্ষেত তখন সবে হয়েছে চষা সুরু, রৌদ্রে কড়কড়ে বড় বড় কঠিন ক্ষেতের ঢেলা দু-হাতে উল্টোপাল্টা ছুঁড়তে লাগল কালুর মা, ক্ষিপ্তের মত ভুইঞাদের দিকে লক্ষ্য করে। বড় ভুইঞা ছিলেন সবার শেষে এক পাশে দাঁড়িয়ে। মাথা উঁচু করে করে দেখেছিলেন প্রজারা কতখানি বাড়িঘর ভাঙল। ঢেলা এসে কঠিন আঘাতে পড়ল তার নাকে মুখে ঘাড়ে কপালে। অস্ফুট চীৎকার করে বসে পড়লেন তিনি নাকে হাত চাপা দিয়ে। হাত ছাপিয়ে দরদর ধারে রক্ত ঝরতে লাগল। কপাল উঠল গোল গোল হয়ে ফুলে। সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। কালুকে সবাই তখন বেঁধে ফেলেছিল। একপাশে তাকে ফেলে রেখে ছুটে এলো সব বড় ভুইঞার কাছে। পাঁজা কোলে করে তিন-চার জনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাড়ি। দেখতে দেখতে বাড়ি-ঘরের বেড়া, চাল খুলে আনা হ'ল ভুইঞা-বাড়ির সদরে। ভিটে মাটি গুঁড়িয়ে হ'ল চুরচুর। মায় বাড়ির গাছপালা, ফল-ফসল সব একেবারে লণ্ডভণ্ড।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি খালি। যাবার সময় ভুইঞাদের হুকুমেই কালুর হাতে পায়ের বাঁধন দেওয়া হ'ল খুলে। কিছুই তার হয় নি। ভুঞাদের আক্রমণ করতে গিয়ে উল্টে পড়েছিল সে। উঠে দাঁড়িয়ে সে রোষে ফুলতে লাগল। এতক্ষণ ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কালুর মা, সবাই চলে গেলে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ছেলের দিকে, উঠল এসে বাড়িতে, ত্রস্ত ব্যাকুল দৃষ্টিতে বারবার দেখলে চারদিক, তারপরে যেন হাত পা ভেঙে ধপাস্ আছাড় খেয়ে পড়ল ভাঙা গুঁড়োনো ভিতের মাটিতে।

গাঁয়েরই রহিম সেখ সম্পর্কে পাইকের বউর চাচা, সে এসে বললে—ওঠো মুন্সীর ঝি, চলো আমাদের বাড়ি। কালুরও জেদ, ভুইঞারাও গেলেন চটে, দেখো ত কি হাঙ্গামা। ওঠো চলো, আয়রে কালু।

রহিম সেখ কালুর হাত ধরে টানতেই পাইকের বউ একেবারে সটান উঠল দাঁড়িয়ে। চোখে তার আগুন ঠিকরানো, তীব্রকণ্ঠে বললে—ও যদি তোমার বাড়ি যায় চাচা, আমি যাব না, কিছুতেই না, কখ্খনো নয়। দেখতে চাই না ওকে, আমি দেখতে ওকে চাইনে। ও আমার শত্রু, আমাকে আজ তাই পরের বাড়ি যেতে হবে,—আমি যাব না।

পাইকের বউ আবার ধপাস্ করে বসে পড়ছিল। রহিম চাচা অনেক সেধে বলে কয়ে তাকে তার বাড়ি নিয়ে গেলেন।

* * *

গাঁয়ে একেবারে সাড়া পড়ে গেল। পাইকের বউ বড় ভুইঞাকে করেছে জখম। বড় ভুইঞা শয্যাশায়ী। নাক মুখ ফুলে তার জ্বর, রাজনগর থেকে এসেছে পাস করা এম্-বি ডাক্তার। ভাল মতো চিকিৎসা চলছে। সবার যেন বিস্ময়ের সীমা নেই। পাইকের বউ, মুখ তুলে সে কোনদিন ভুইঞাদের সঙ্গে বলে নি কথা, মা-ঠানদের সঙ্গে দুমাস আগেও যে গিয়েছে হেসে খেলে কাজ করে, এতদিনের ঘনিষ্ঠতা, আর সেই কি না প্রতিদান দিলে এই! পাড়ায় পাড়ায় কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। পাইকের বউ থাকে রহিম সেখের বাড়ি। ঘর থেকে বেরোয় না। কথা কয় অতি কম। লোক দেখলে ভ্রূ কুঁচকে উঠে যায়। এমনিভাবে দিন দশ-বারো কেটেছে, সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে কালুর মা ঘাটে যাচ্ছিল বদনা হাতে। হাত পা ধুয়ে নমাজ পড়তে যাবে, শুনতে পেলো সেজো ভুইঞার ছেলে অশোক ভুইঞা মাছ খুঁজে ফিরছে এ বাড়ি ও বাড়ি। চৈত্র মাসে পুকুরের জল সব শুকনো। মুসলমানরা খালে বিলের জল সেঁচে ধরে মাছ। বড় ভুইঞা কাল

ভাত খাবেন, রোগীর খাবার মতো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। পাইকের বউর মন তীব্র আনন্দে চমকে উঠল। এতদিনের একটা প্রচণ্ড ভার তার মন থেকে গেল নেমে। বড় ভুইঞা সেরে উঠেছেন! পাইকের বউ অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হাত পা ধুয়ে ফিরছিল, দেখলে খালি হাতে অশোক ফিরে যাচ্ছে। মাছ মেলে নি। খানিক চেয়ে রইল পাইকের বউ, কি ভাবলে, তার পরে হাতের বদ্‌না মাটিতে রেখে দ্রুত পায়ে ঢুকল এসে নিজের বাড়ি। চারদিকে তেমনি ভাঙাচোরা, ছন্নছাড়া জিনিসপত্র। শুধু কালু আমতলায় একটা নৌকার ছই পেতে তার ভিতরে শোয়। ছইয়ের পাশে ইটের উনুনে রান্না করে খায়। এই তার উপস্থিত বাড়ি। বাড়ি ঢুকে পাইকের বউ একবার শুধু চকিত দৃষ্টিপাত করে দেখলে কালু আছে কি না। দূরে রাস্তার মোড় থেকে আবছা অন্ধকারে কালুর মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছিল, পাইকের বউ তাড়াতাড়ি দুটো বড় বড় বনকচুর পাতা ছিঁড়ে ঢুকল গিয়ে ছইয়ের ভিতরে। জানত এই মাত্র কালু কান্দাপাড়ার খালের জল সেঁচে ধরে এনেছে—কই খল্‌সে, ল্যাঠা। রহিম চাচাকে পাঠিয়েছিল কিছু আগে। পাইকের বউ ভিতরে ঢুকে একপাশের জালার ঢাকনা খুললে। দু-তিনটে ইট চাপা দিয়ে কালু সাবধান মতো ঢেকে রেখে গিয়েছিল, কাল হাটের বারে গঞ্জের হাটে বেচবে সে। পাইকের বউ যতটা পারলে খাবলে খাবলে তুলে নিল মাছ, কচুপাতায় মুড়ে বেগে বেড়িয়ে গেল বাড়ি থেকে।

রাতের অন্ধকার তখন ঘনতর। সারাদিনের বিশেষ ক'রে এই একটু আগের সন্ধ্যায় ছেলেদের হাডুডু খেলার ধুম চিৎকার, গরু মোষ তাড়িয়ে বাড়ি আসার হৈ হৈ এবং ঘরে ফেরা কৃষকদের রাগারাগি বকাবকি অথবা কথাবার্ত্তার মুখরতা কাটিয়ে এরই মধ্যে গ্রাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু বনের পথে সসংকোচে সন্ত্রস্তে গা ঢেকে ঢেকে পাইকের বউ গলিঘুঁচি দিয়ে এসে পৌছল ভুইঞা বাড়ি। ঢুকতে পা কাঁপল, থমকে দাঁড়াল আপনা থেকে, তারপরে জোর করে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঠেলে সরিয়ে ঢুকে পড়ল সদর বাড়ি। অন্ধকারে গা ঢুকিয়ে নিঃশব্দে ঢুকল অন্দর মহলে। থামল আবার। সামনেই বড় ভুইঞার ঘর। একটা উত্তেজিত কথার শব্দ কানে এলো, অনেকে কথা বলছেন। পাশ দিয়ে যেতে যেতে পাইকের বউ কৌতূহল দমাতে পারলে না। আস্তে দেয়ালে কান পাতলে। ঘরে আন্দাজ হ'ল মেজোভুইঞা, সেজো-ভুইঞা, বড় ভুইঞা, বুড়ো-ঠান্, বড়-ঠান্, সবাই আছেন। মেজো ভুইঞা বলছিলেন—সব ঠিক, এমন সুযোগ আর পাবে না। কালুর মা'র সম্বন্ধে তোমার আপত্তির কিছু মানে আমি বুঝিনে।

বড় ভুইঞা খানিক চুপ থেকে বললেন—কালুর সম্বন্ধে যা ইচ্ছে কর, তার মা···দেখো সে আমাদেরই পাইকের বউ, বাবা তাদের ভালবাসতেন···।

বাধা দিয়ে মেজো আর সেজো ভুইঞা বললেন—সে-সব দিনের কথা ছেড়ে দাও, সে-সব দিন থাকলে কি আর এ হাঙ্গামা হয়? সব চেয়ে আশ্চর্য্য পাইকের বউয়ের এত বড় সাহস···।

বাধা দিয়ে বড় ভুইঞা বললেন···তবু পাইকের বউকে আইন-আদালতে খাড়া করা আমাদের উচিত হয় না। অনেক দিনের লোক সে, তা ছাড়া সে এ কাজ করেছে রাগের মাথায়। তার বাড়ি যাচ্ছে, ঘর যাচ্ছে, এ কাজ তার পক্ষে স্বাভাবিক, এটা আমাদের বোঝা উচিত। তাদের উপরে তো আমার সত্যিকারের বিদ্বেষ নেই, কালুকে শায়েস্তা করতেই আমরা চেয়েছি।

সবাই চুপ। বুড়ো-ঠান্ ছেলের মাথার কাছে বসে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন, এক সময় বললেন—ভালোয় ভালোয় সেরে উঠেছিস বলে আজ বলছিস্ এ কথা। ওরে কি সর্ব্বনাশ সে বাধিয়েছিল, কি সর্ব্বনাশী, এমন কাজ তো তাকে দিয়ে ভাবতেই পারি নে।

বড় ভুইঞা বললেন—কখন কে কি অবস্থায় কি করে বসবে সে কেউ বলতে পারে না মা, নিজে করে ফেলে নিজেই হয়তো হয় আশ্চর্য্য অনুতপ্ত···।

পাইকের বউ আর দাঁড়িয়ে শুনতে পারল না। অতি-কষ্টে নিজেকে দমিয়ে পাইকের বউ দ্রুত পায়ে এলো রান্না ঘরের কাছে। ঘরের ভিতরে ছেলেমেয়েরা খেতে বসে জুড়েছিল কলরব। অন্ধকারে মিশে বারান্দায় কচুপাতাটা রেখে বেরিয়ে এলো পাইকের বউ। পথে হাঁটতে হাঁটতে তখনো তার পা কাঁপছে, তখনও তার বুকের ঢিপঢিপ নিজের কানে বাজছে। হঠাৎ সামনে একজন মানুষের ছায়া দেখে সে চমকে অবশ হয়ে থামল। যে এগিয়ে আসছিল সে কালু, কাছে এসে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে—মা, আমার মাছ নিয়েছ?

কালুর মা চুপ।

—নিশ্চয়ই তুমিই নিয়েছ। কি করলে মাছ নিয়ে? ভুইঞা-বাড়ি দিয়ে এলে?

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ হিংসার রূঢ়তা ফুটে উঠল তার স্বরে, বললে—যখ্‌খুনি দেখলাম মাছ সব মাটিতে ছড়ানো, রহিম্ চাচা খুঁজতে এলো তোমায়, বুঝলাম তোমারই এ কাজ। তুমি মাছ নিয়েছ। বেশ, দাও পয়সা দাও আমায়। ওঃ ভুইঞারা বুঝি তোমায় পয়সা দেন না? অমনি খাতির, অমনি সাট···।

ছেলের স্বর আর কথা শুনে কালু মা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইল। সমস্ত দেহমন তার ঝিম ধরে গিয়েছিল। খানিক দম নিয়ে কালু তীব্র জ্বলে বললে—এর প্রতিশোধ আমি নেবো না? আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! জান, কি পরামর্শ দিয়েছেন আমাকে মারবার জন্যে! বিবির ঘরে ঢুকলেই মিঞারা আমায় আচ্ছা করে সাজা দিয়ে দেবে।

বলতে বলতে তার চোখ জ্বলতে লাগল। দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল সে। কর্পূর উন্নেসা বিবি সুজাসার গাঁয়ের মেহের আলির বিধবা বউ, অল্পবয়সী সুন্দরী। বউটা ভালো। কিন্তু কালুর লুব্ধ নজর তার উপরে। মাঝে মাঝেই রাত-বিরেতে তার ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ভুইঞারা নাকি সুজাসার

গাঁয়ের মুসলমান মাতব্বরদের পরামর্শ দিয়েছেন কালুকে আচ্ছা ক'রে সাজা দিয়ে দিতে।

দাঁতে দাঁত ঘষে কালু বললে—এর উচিত শাস্তি দেবো না! আজই নেবো এর প্রতিশোধ। সিন্দুক ভেঙে সর্ব্বস্বান্ত করে আসব আজ ভুইঞাদের।

বলতে বলতে সে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

* * *

রাত্রি গভীর। নিঝুম ঘুমে গ্রাম নিঃসাড়। শুয়ে বসে পাইকের বউয়ের চোখে ঘুম ছিল না। বাইরে বেরিয়ে মন টিকল না। অজানা এক ভয়ে, কি আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপছিল। যে গোঁয়ার ছেলে তার, কি ঘটাবে কে জানে! কালুর মা আর থাকতে পারল না। অস্থির হয়ে এক সময় চলে এলো নিজের শূন্য ভিটেয়। দেখল কালু নেই। অধীর হয়ে কি করবে ভাবছে, হঠাৎ সমস্ত দেহমন তার দারুণ চমকে চমকে উঠল। ভুইঞা-বাড়ির দিকে প্রচণ্ড সোরগোল। চকিত হয়ে ছুটে চলল কালুর মা। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে, আছাড় খেয়ে পড়ে উঠে ছুটল সে ভুইঞা-বাড়ি। সদর বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলে কালু ছুটে বেরুতে বেরুতেও দাঁড়াল ঘুরে। পেছনে লাঠি হাতে সেজো ভুইঞা। কালু নিজের হাতের লাঠির ঘায়ে এক পিট্টিতে ছিটকে ফেললে তার হাতের লাঠি। পর মুহূর্ত্তেই দুই হাতে সজোরে প্রচণ্ড এক বাড়ি হাঁকলে ভুইঞার মাথা লক্ষ্য করে। সভয়ে সেজো ভুইঞা মহা আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করে পিছন হটল দু'পা। সঙ্গে সঙ্গে কালুর মা এসে ধরল কালুর হাত। বেগে টানতে টানতে বললে—ওরে আয়, পালিয়ে আয় শীগগির। একা তুই এত লোকের সঙ্গে তো পারবি নে। ওই দেখ্ আসছেন সব।

বলতে বলতে ছেলেকে নিয়ে কালুর মা বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ছুটতে ছুটতে তারা গাঁয়ের নামকরা সেরা জঙ্গলে এসে ঢুকল। এত ঘন বন দিনের বেলাই ঢুকতে কেউ সাহস করে না। শুধু দুর্দান্ত ছেলের দল ফলের লোভে মাঝে মাঝে আশেপাশে দেয় হানা। লোকে বলে—ভূত প্রেত, চোর ডাকাত, সাপ বাঘ সবের আস্তানা ওখানে। কালুর মা ঢুকতে গিয়ে অজানা ভয়ে থমকে দাঁড়াল। থামল না কালু, যেন জানাশুনা, কোন্খানের কোন্ লতা সরিয়ে কাঁটা উঠিয়ে এঁকেবেঁকে সে গহন ভিতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেতেও কালুর মার গা ছম ছম করছিল। খানিকটা গিয়ে সে সভয়ে কালুর কাঁধ ধ'রে বললে—থাম্ কালু, যাস্নে আর। এ কি কাঁধ তোর ভেজা কেন? ঘাম না রক্ত, ওরে জখম হয়েছিস বুঝি?

কালু এতক্ষণ ছুটে ছুটে ক্লান্ত। মাথায় কাঁধে যেখানে-সেখানে খেয়েছে লাঠির ঘা, গা মাথা তার ঝিম্ ঝিম্ করছিল। চোখে দেখছিল অন্ধকার। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল সে। পাশে বসে কালুর মা তার গায়ের জলীয় পদার্থ মোছাতে মোছাতে ব্যথিত স্বরে বললে—কেন তোর এমন হ'ল মতিগতি, কেন এ দুর্বুদ্ধি, খোদা। বলতে বলতে থামল সে; বনের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কারা, জোরে জোরে কথা ব'লে। কান পেতে শুনে কালুর মা বুঝলে গয়লা-বাড়ির বটকৃষ্ণ, রামপাল আর গোবিন্দ গোঁসাই। তারা বলতে বলতে যাচ্ছিল—কত বড় সাহস বাবাঃ। মায়ে পোয়ে দুজনে গেছে ভুইঞা-বাড়ি চড়াও করতে। বুকের পাটা বলি মায়ের। খুন জখম করে শাস্তি হ'ল না, বাড়িতে ঢুকে সর্বনাশ করবার ইচ্ছে। এবার বুঝবে মজা। রেগেছেন ভুইঞারা, জেলে না দিয়ে ছাড়ছে না দুজনকে। বুড়ো বয়সে এই প্রতিদান দিলে পাইকের বউর সারা জীবনের খাওয়া পরার। একেই না বলে দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা? নেবে এবার ভুইঞারা, জুড়বে নিয়ে জেলের ঘানিতে, বড় কর্ত্তার অবধি কি রাগ, রাগবেন নাই বা কেন? কত আর সইবেন।

কথায় কথায় তারা এগিয়ে গেল। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল তাদের সাড়া।

দারুণ উত্তেজনায় হঠাৎ কালু সোজা হয়ে বসল। অন্ধকারেও চোখ তার জ্বলছিল, নিশ্বাস পড়ছিল উত্তপ্ত। উত্তেজিত কম্পিত স্বরে সে মায়ের দিকে চেয়ে বললে—তুমি, তুমিই সব পণ্ড করলে আমার। জেলে তো যেতেই হবে, না হয় একটাকে খুন করে যেতাম ফাঁসি, তবু গায়ের ঝাল মিটত আমার। তুমিই মারতে দিলে না লাঠি। মিথ্যে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে আনলে আমায়। জানি আমি সাট আছে তোমার ভুইঞাদের সঙ্গে, সাট আছে।

রোষে ক্ষোভে ফুলতে লাগল কালু। একেবারে পাথরের মত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল পাইকের বউ। তারপরে দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি তোর মা কালু, আমি ভুইঞাদের পাইকের বউ, এ কথা মনে রাখিস। আমি থাকতে তোরও কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তোকেও কারুর ক্ষতি আমি করতে দেবো না। কিছুতেই নয়। চল্ কালু চল্…

আটকে গেল স্বর। কথা সে বলতে পারছিল না, তার ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল, তার দম আসছিল বন্ধ হয়ে, একেবারে কঠিনভাবে নিজেকে দৃঢ় করে কালুর মা রুদ্ধকণ্ঠে বললে—চল্ কালু, আজই আমরা এ দেশ ছেড়ে, ভিটে মাটি সব ছেড়ে চলে যাই। নতুন জায়গায় নতুন করে গিয়ে বাঁধি ঘর। যেখানে তোর জন্যে ভয় করব না, ভাবনা থাকবে না আর কারুর জন্যে, নিশ্চিন্ত হতে পারব আমি। সব, ওরে সব থাক পড়ে, কালু চল্, আমরা যাই। অসহ্য যন্ত্রণায় কথাগুলি যেন পাঁজর ভেঙে বেরুচ্ছিল, বলতে বলতে ব্যাকুল হয়ে সে কালুর হাত ধরলে।

বাংলা সাহিত্য ও রামানন্দবাবু

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ.ডি

বাংলা সাময়িক পত্রসমূহ আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য কি পরিমাণ কাজ করেছে সে কথা একেবারে অজ্ঞাত না হলেও যে খুব সুপরিজ্ঞাত তা বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে প্রতিমাসে প্রকাশিত ছোটবড় নানা আকারের গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধাদির পুস্তক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ব্যাপারে সাময়িক পত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেও উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত সাহিত্যের সংগঠন ও প্রচারের কাজে সাময়িক কাগজ ছিল প্রধান অবলম্বন। অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হওয়ার দশ বারো বছরের মধ্যে অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হয়। তখন থেকে সাহিত্যপদবাচ্য দুয়েকখানি বই বার হতে থাকে। এ শ্রেণীর গ্রন্থগুলির লেখকগণের প্রায় সকলেই ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী'র সঙ্গে সংসৃষ্ট, কিন্তু এ জন্যেই 'তত্ত্ববোধিনীর' প্রভাবকালকে (১৮৪৩-১৮৬৫) 'তত্ত্ববোধিনী যুগ' বলা যায় না। যে ভাবুক জনগণের চিত্তকে আশ্রয় ক'রে সাহিত্যের জন্ম ও পরিপুষ্টি ঘটে, তাদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্য করেই 'তত্ত্ববোধিনী' এ যুগের উপর নিজ নামের অক্ষয় ছাপ রেখে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ সালে বাংলা কথা-সাহিত্য তথা সমগ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন তাও সাময়িক পত্রের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল, কয়েক বৎসর পরে (১৮৭২)। নিতান্ত স্বল্পকালস্থায়ী হলেও নবোদ্ভূত বাংলা-সাহিত্যের প্রচারে ও গতিনিয়ন্ত্রণে 'বঙ্গদর্শন' পত্রের দান অতুলনীয়। মুখ্যত এ পত্রখানিকে আদর্শ ক'রে তার পরে যে কয়খানি উল্লেখযোগ্য কাগজ (যেমন 'বান্ধব' 'ভারতী', 'আর্য্যদর্শন', 'জ্ঞানাঙ্কুর' ইত্যাদি) প্রচারিত হয়েছিল তারাও কিয়ৎপরিমাণ প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু এ শেষোক্ত শ্রেণীর কাগজগুলির মধ্যে 'ভারতী'র প্রভাব অনেকাংশে 'বঙ্গদর্শনে'র মত গভীর ও সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। এর পরেই স্মরণযোগ্য 'সাধনা' পত্রিকা (১৮৯২)। বাংলা-সাহিত্যের অগ্রগতির ব্যাপারে এই স্বল্প-জীবী মাসিকখানি যে কাজ করেছে তার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু যতই মূল্যবান হোক এ সকল কাগজ (এক অধুনা-মৃত 'ভারতী' ছাড়া) দীর্ঘজীবী হয় নি।

'সাধনা' যখন বন্ধ হ'ল তখন বাংলা মাসিকপত্রের এই অবস্থা যে, তা প্রায়শ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় না। কাগজের এরূপ অনিয়মিত প্রকাশ পাঠক ও লেখক উভয় সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই বিরক্তিকর ছিল। যাঁরা দয়া ক'রে কাগজের বার্ষিক মূল্য আগাম দিতেন, মাসঅন্তে কাগজখানির পথ চেয়ে যখন তাঁরা নিরাশ হতেন এবং কোনো কোনো সময় মূল্য পরিশোধের আগেই কাগজ-খানির বিলোপের আশঙ্কা হ'ত তাঁদের তখনকার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য কাগজের অনিয়মিত প্রকাশের দরুণই হোক্ আর সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুরাগের অভাবেই হোক্, বহু লোক তখন দাম বাকী রেখেই কাগজের গ্রাহক হতেন বা হতে পারতেন। প্রকাশের অনিয়ম ও গ্রাহকদের মূল্যদানে শৈথিল্য এ দুয়ের পাপচক্রে (vicious circle) পড়ে বাংলার মাসিক সরস্বতী যে তখন সহজ গতিতে অগ্রসর হ'তে পারছিলেন না তা সহজেই অনুমেয়। এই ত গেল পাঠকদের অবস্থা; লেখকদের অবস্থাও কম কারুণ্যজনক ছিল না।

সেকালে সাহিত্যচর্চ্চা ছিল একেবারেই শৌখীন ব্যাপার। আজকালকার মতো লেখকদের অর্থলাভের প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু শখের তাড়ায় সাহিত্য-চর্চ্চা কিছু নিন্দনীয় নয়। সাহিত্যে যথার্থ শখ না থাকলে কারুর পক্ষে যথার্থ উত্তম রচনা সম্ভবপর নয়, যদিও কেবল-মাত্র এটিকে পুঁজি ক'রে লিখতে গেলে তা রসজ্ঞ পাঠকদের মনস্তাপের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে যাই হোক মানুষের এ দুর্বলতা আছে যে, তার কৃত ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোন কাজই হোক তার সম্বন্ধে অবিলম্বে লোকে জানুক এই সে একান্ত মনে চায়। তাই নিজের সযত্নরচিত গল্প প্রবন্ধাদিকে সম্পাদকের দরবারে পাঠিয়ে সে উৎসুকচিত্তে উত্তরের প্রত্যাশা ক'রে থাকে। সে কারণে মাসিকপত্রের অনিয়মিত প্রকাশ ছিল লেখকদের পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতিকর। বলা বাহুল্য, এতেও বঙ্গসাহিত্যের অগ্রগতির সুযোগ নষ্ট হচ্ছিল।

বাংলা মাসিকপত্র পরিচালনায় যখন এমন বিশৃঙ্খলা চলছিল তখন (১৯০১) 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্য্যায়) নিয়ে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং 'প্রবাসী' পত্র বার করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'

যে বাংলা সাহিত্যের যুগ পরিবর্তনের ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করেছে তা বলা একটা সুবিদিত ঘটনার পুনরুক্তি করা মাত্র। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ কাগজ দুরধিগম্য ছিল সেই সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটে। তাই কতকটা নিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত হ'লেও এ কাগজ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মাসিক কাগজের মারফৎ সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার কাজটি সুসম্পন্ন করলেন রামানন্দবাবু 'প্রবাসী' কাগজখানির নিয়মিত প্রকাশের দ্বারা। আজকাল যে মাসিকপত্র পড়া সাধারণ শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে তার জন্যে মুখ্যত রামানন্দবাবুই সর্বোত্তম সাধুবাদের পাত্র। এ কাগজ কোনো কোনো অংশে 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী' আদির প্রবর্তিত ভাব-ধারাকে অনুসরণ করলেও এর কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। এ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যে তাঁর কাগজখানির নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'প্রবাসী'র বৈশিষ্ট্যের সকল দিক আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয় নয়। * উপস্থিত আলোচনায় এই দেখতে হবে যে সাহিত্য প্রচার ও সৃষ্টি-সম্পর্কে এর কি কি বিশেষত্ব ছিল।

উল্লিখিত দিক দিয়ে প্রবাসীর প্রথম বৈশিষ্ট্য, সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধটি ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলা। শিক্ষা-ব্যবসায়ী হয়েও এবং শিক্ষাদান-কার্য্যে রত থেকেও তিনি যে সাহিত্য চর্চাকে আর্থিক দিক দিয়ে সফল ক'রে তুলতে পেরেছিলেন এটা রামানন্দবাবুর এক বিশেষ কৃতিত্বের কথা। কিন্তু শুধু অর্থাগমে কৃতকার্য্য হওয়াই তাঁর গৌরব নয়; এ অর্থাগম করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে সাহিত্যের আদর্শ তথা সমাজসেবা ও মানবহিতের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন সেটাই তাঁর মাসিক কাগজ সম্পাদনকে বিশেষ মহিমা দান করেছে। তিনি নিজ কাগজকে লোকপ্রিয় করতে গিয়েও এমন কোন কাজ করার কল্পনাও কখনো করেন নি যাতে তাঁর উপর সাধু ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা বিচলিত হতে পারে। তাঁর সাহিত্যসেবার এই সুমহান্ আদর্শ যে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর স্বজাতিকে সমুন্নত মনুষ্যত্বের প্রেরণা দান করবে এ কথা বলাই বাহুল্য। তিনি 'প্রবাসী'র লেখকদের জন্যে নিয়মিত যথাযোগ্য দক্ষিণাদানের যে অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তাও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এতে যুগপৎ তাঁর সাধুতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। লেখকদের শোষণ (exploit) করা রামানন্দবাবুর নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

রামানন্দবাবুর মাসিকপত্র পরিচালনার আদর্শ যদি তাঁর অনুকরণে সৃষ্ট একালকার মাসিক কাগজগুলির সবক'টিতে পুরোপুরি অনুসৃত হত তবে বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরও আশান্বিত হওয়া যেত। এ শেষোক্ত কাগজগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি বহুলাংশে কাঁচা লেখকদের যদৃচ্ছাদত্ত অমূল্য (=মূল্যহীন) লেখায় ভর্তি। পাঠকদের বা লেখকদের এমন করে ফাঁকি দেওয়ার কথা রামানন্দবাবু কখনও ভাবতেই পারতেন না। তাঁর কাগজের অর্থাগম সত্ত্বেও কোন বিশেষ কারণে তিনি যখন অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়েন তখনো তিনি লেখকদের দক্ষিণাদানের শৈথিল্য করেন নি। এ বিষয়ে অপরের ত্রুটিতে কখনও কোনো শৈথিল্য ঘটেছে জানতে পারলে তজ্জন্য বিশেষ মর্মপীড়া অনুভব করতেন এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রতীকার সাধনে যত্নবান্ হতেন।

রামানন্দবাবু যে লেখকদের যথাসাধ্য (অধিকাংশ স্থলে যথাযোগ্য) দক্ষিণা দিতেন তার ফলে অনেক লেখক সাহিত্যচর্চ্চায় নিয়মিত প্রয়াস করেছেন এবং পরিণামে সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছেন। এ ঘটনাটি লেখকদের নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীরও উপকার করেছে। কারণ, প্রবাসীর আকার ক্রমেই বেড়ে এসেছে এবং সংবর্দ্ধিত আয়তনের ভর্তির জন্যে বেশি বেশি ভাল লেখার প্রয়োজনও হয়েছে। অর্থের জন্য লিখলেই যে লেখার উৎকর্ষ নষ্ট হবে এমন কোনও কথা নেই। প্রাচীন কালেও অর্থের আশা ক'রে লেখার প্রথা ছিল। কারণ কোন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকের উক্তি থেকে জানা যায় 'কাব্যং যশসে অর্থকৃতে'। 'প্রবাসী' প্রকাশের পরে বাংলায় যে নূতন শক্তিমান্ লেখকমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায়শ তার জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী রামানন্দবাবুর প্রবর্তিত ব্যবস্থা।

নিয়মিতভাবে কাগজ প্রকাশ করেও রামানন্দবাবু বাংলা সাহিত্যকে নূতন গতিবেগ দান করেছেন। 'প্রবাসী'র আগে মাসিক কাগজের কি অবস্থা ছিল তা স্মরণ করলেই এ সম্বন্ধে ভাল ক'রে বোঝা যাবে। সাহিত্যপাঠ সম্বন্ধে লোকের অভ্যাসকে গঠিত করবার ব্যাপারে রামানন্দবাবু 'প্রবাসী' প্রকাশের সূত্রে যে সফলতা লাভ করে গেছেন আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক মাত্রেই তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে বাধ্য।

* ১৩৩৩ বাংলা সালের 'প্রবাসী'তে (পৃষ্ঠা ৯৭-১০২) পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'বাংলার উৎকর্ষ ও প্রবাসী' প্রবন্ধে 'প্রবাসী'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এ সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়াও 'প্রবাসী' ও তৎপূর্বে প্রকাশিত 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদনের ভিতর দিয়ে রামানন্দবাবু বাংলা-সাহিত্যকে উপকৃত করেছেন। তাঁর 'প্রদীপ' কাগজেই সর্বপ্রথমে বাংলার জীবিত বিদ্বান্ এবং মনস্বী ব্যক্তিগণের জীবন-কাহিনী প্রকাশিত হয়। উক্ত কাগজে রামানন্দবাবু কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত স্তর্ আশুতোষ, স্তর্ জগদীশ, স্তর্ পি, সি, রায় আদি বঙ্গের সুসন্তানগণের জীবনীই বোধ হয় তাঁদের সর্বপ্রথম প্রকাশিত জীবনবৃত্ত। এ জীবনকাহিনী প্রকাশের দ্বারা যে বাংলার ইতিহাসসাহিত্য পুষ্টিলাভের প্রেরণা পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। মাসিকপত্র সম্পাদনে রামানন্দবাবুর অতুলনীয় কৃতিত্বের আর এক দিক এই যে, তিনি এর দ্বারা আমাদের দেশের সাহিত্যিক রুচিকে বিশুদ্ধতর করবার বিশেষ সাহায্য করে গেছেন। এ বিষয়ে তিনি যে তাঁর যৌবনকালে ব্রাহ্ম নেতৃগণ-প্রচারিত সুরুচির আদর্শ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়; কিন্তু সাহিত্যকে লোকরঞ্জক করতে গিয়েও, যে-কদর্য্য রুচি গণসভায় তখন প্রবল ছিল তাকে তিনিই সুরুচিসঙ্গত প্রবন্ধাদি এবং কুরুচি-সংশোধক মন্তব্যাদির দ্বারা ক্রমশ হীনবল হতে বাধ্য করেছেন। এরূপে বাংলা-সাহিত্যের রুচির বিশুদ্ধি সম্পাদনে যথেষ্ট সাহায্য করেও তিনি দেশের সাধু ব্যক্তিদের চির-ধন্যবাদার্হ হয়ে রয়েছেন।

পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে রামানন্দবাবু বাংলা ভাষার এবং সাহিত্যের উপকার করে গেছেন। যে অতুলনীয় লিপিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি মাসের পর মাস ধরে বহু বর্ষ যাবৎ 'প্রবাসী'তে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন তাও তাঁর একটি বিশেষ দান। তাঁর য়ুরোপপ্রবাসকালে লিখিত 'সম্পাদকের চিঠি'ও এরূপ অনবদ্য ভাষায় লিখিত। এ সকল রচনার বিশেষত্ব এই যে, এদের মধ্যে হৃদয়াবেগ বা উচ্ছ্বাসের কোনো স্থান ছিল না। নিতান্ত ধৈর্য্যহানিকর ব্যাপারের আলোচনায়ও তিনি বেশ ধীরতার সঙ্গে অগ্রসর হতেন। তার ফলে যথোচিত যুক্তিতর্কে পরিপূর্ণ তাঁর মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে পাঠককে নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী ক'রে তুলত। কোনো প্রকার অলঙ্কার বা ভাষার বাহুল্য না করে কেবল অনুষ্ণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে জনমতকে পরিচালনা করার এই কৌশলটি একান্তভাবে তাঁর রচনা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত ছিল। এ বিষয়েও তাঁর প্রবর্তিত আদর্শের উপযোগিতা বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে আমাদের এই ভাবপ্রবণ জাতির মধ্যে। তাঁর রচনা-পদ্ধতির মধ্যে এমন একটি সংযম ও শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় যা কেবল প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের রচনায়ই সুলভ। যে-লোক সুশৃঙ্খল চিন্তায় অভ্যস্ত নয় তাঁর হৃদয়াবেগপ্রসূত অসংলগ্ন রচনা কখনও শিল্পানুসারী হয়ে দানা বাঁধে না। রামানন্দবাবুর অপূর্ব মনস্বিতাই তাঁর রচনার মধ্যে এরূপ একটা সংযত সুশৃঙ্খল ভাব এনে দিয়েছিল।

লিপিভঙ্গীর উল্লিখিত গুণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য গতিতে চলে ভাষার অসাধারণ সরলতা। রামানন্দবাবুর রচনার তাও এক স্বাভাবিক গুণ। এ বিষয়ে হয়ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'সুলভ সমাচার' আদির সরল ভাষা তাঁর আদর্শ ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও নানা জটিল বিষয়ের আলোচনায় তিনি ভাষার যে সরলতা রক্ষা করে গেছেন তা 'সুলভ সমাচারে'র যুগে চিন্তার অতীত ছিল। কেবল এমন সুন্দর ভাষা ও সুশৃঙ্খল যুক্তিতর্কের সাহায্যেই তিনি তাঁর দেশবাসী অগণিত যুবজনের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়ে গেছেন। তাঁর রচনারীতির এর চেয়ে আর কি প্রশংসা হতে পারে? তবু একথা বলা কর্তব্য যে, যাঁরা উত্তম গদ্য লেখার কৌশল আয়ত্ত করতে চান রামানন্দবাবুর লিখিত 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র টুকরাগুলি পড়ে গেলে তাঁরা বেশ মূল্যবান্ ইঙ্গিত লাভ করবেন।

বাংলা-সাহিত্যে রামানন্দবাবুর দান সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হ'ল সেগুলি সহজেই চক্ষুষ্মান পাঠকের নজরে পড়বে কিন্তু এ সকল ছাড়াও তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে সাহিত্যের সীমা ও আয়তন বাড়াবার সাহায্য করে গেছেন। একাধিক লেখক-লেখিকার (যাঁরা পরে খ্যাতনামা হয়েছেন) কাঁচা রচনা তিনি সুমার্জ্জিত করে ছেপেছেন এবং তার ফলে তাঁরা সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিপথে বাধাগুলি অতিক্রম করার সাহায্য পেয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আদির সঙ্গে তুলনীয়। তবে তিনি নিজে কোন গল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখেন নি বলে লোকের নজর হয়ত সেদিকে পড়বে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীচরিত্র

শ্রীতপতী সরকার

নারী-চরিত্র সম্বন্ধে কবির মত,—তাহা দুর্জ্ঞেয়। তাই বোধ হয় তাহাকে নানারূপে ও নানাভাবে জানিবার প্রয়াসে সাহিত্যসৃষ্টির একেবারে আদিকাল হইতে নারী উপন্যাসে ও কবির নিন্দা বা স্তুতি বন্দনায় আপনার নিজস্ব স্থান লাভ করিয়া লইয়াছে এবং তাহার সে স্থান ব্যোমকেশের পার্শ্বে গৌরীর মতই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু চিন্তাশীল মাত্রেই দেখিবেন যে, সে স্থান অক্ষুণ্ণ থাকিলেও অধিকাংশ স্থলে নারী আপনার ন্যায্য আসন পায় নাই,—হয় তাহাকে বাসনার বিহ্বল চিত্ত দিয়া পুরুষ দেখিয়াছে আপনার লীলা-সঙ্গিনী নর্ম্ম-সহচরীরূপে, নয় তাহার প্রচণ্ড মানসিক বৃত্তির আবেগ রহস্যকে না বুঝিয়া তাহাকে কখনও দেবীর আসনে বসাইয়া পুরুষ আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে, কখনও শিহরিয়া কহিয়াছে—নারী নরকের দ্বার। কখনও যুগধর্ম্ম অনুসারে নিষ্পেষণের রথচক্রে তাহার সমস্ত শক্তি ধূলিসাৎ করিয়া অবরোধে সহস্র নিষেধে তাহাকে ঘিরিয়া, করিয়া রাখিয়াছে বন্দিনী ও কেবলমাত্র ভোগের দাসী।

বঙ্কিমচন্দ্রের রসসৃষ্টির মধ্যে অথবা তাঁহার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যে-সকল স্ত্রীচরিত্র রূপ পাইয়াছে, তাহাদের আলোচনার পূর্ব্বে বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের নারীর আদর্শের ও আসনের যে কিরূপ অবমাননা করা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে বঙ্কিমের প্রতিভার অলোকসামান্যতায় বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতে হইবে। মনস্বীর মহৎ হৃদয়ে দেশমাতৃকার পুরাতন আদর্শের প্রতি যে কিরূপ আস্থা ছিল এবং বাঙালী নারীতে ও বাঙালী নারীর ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহার যে মৃত্যুঞ্জয়ী, কালজয়ী আশা ছিল—তাহা অবলোকন করিলে আমাদের মন বারংবার সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষির চরণে শ্রদ্ধার প্রণতি জানায়।

বঙ্কিম যে-যুগে লেখনী ধারণ করিলেন—তখন সংস্কৃত পণ্ডিত ও নব্য ইংরেজী শিক্ষিতগণের মধ্যে বাংলা ভাষার অবস্থা বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তখন সমাজের যে প্রতিচ্ছবি সাহিত্য দর্পনে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন যুগে নারীর একটা অবমাননা হয় নাই। বঙ্কিমের লোকরহস্যে দেখুন পত্নীর উপর পতির কি স্নেহহীন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি, ভগ্নীর উপর ভ্রাতার কি অত্যাচার—পুত্রের মাতার প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা। দুর্ব্বল, অবরুদ্ধ নারীর কণ্ঠস্বর উঠিলেই পুরুষশাসিত সমাজের কাছে তাহা বিদ্রোহ বলিয়া নিরুদ্ধ হইত। পুরুষের অবাধ ব্যভিচারের ক্ষমা সমাজ দিত, কিন্তু নারীর বিন্দুমাত্র স্খলন হইলে তাহা হইত মহাপাপ। কেবল বুদ্ধি বিদ্যায় নহে নারীর প্রকৃত শক্তি—স্নেহ, প্রেম, ভক্তিও সমাজ-নিয়ন্তার হাতে বিকৃত, পঙ্গু অবস্থা প্রাপ্ত হইল। নারী—সে হইয়া উঠিল কেবল সমাজসৃজনের একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। শ্রদ্ধার্হ, স্নেহার্হ নহে কেবল পুরুষের ভোগদাসী,—দীনা, মলিনা, শক্তিহীনা, অন্তঃপুরিকা, যাহার অবমাননায় সীতা, সাবিত্রী, উমা, দ্রৌপদী, রাধিকা ও গান্ধারীর অবমাননায়—সারা দেশ ও সাহিত্য কলুষিত হইয়া উঠিল। বঙ্কিম সেই দিনে নিপুণ চিকিৎসকের ন্যায় জাতীয় জীবনের নাভিস্পন্দনে রোগের দুর্ব্বলতা ও অবসাদটুকু ধরিয়া ফেলিলেন। বুঝিলেন—নারীর আসন যদি না পুরুষের পার্শ্বে শক্তি ও ভক্তির অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে নারী-অবমাননার মহাপাপে রাবণের স্বর্ণলঙ্কার মত আমাদের সোনার বাংলাও ছারখার হইয়া যাইবে। তাই তিনি নারী গড়িতে লাগিলেন। প্রতিভার মানসী-কন্যারূপে তাহারা কেহই পুতুল হইল না—একেবারে জীবন্ত মূর্ত্তিরূপে—আমাদের একান্ত আপনার ভাবে,—বাঙালী জাতির গৃহে গৃহে মিলাইয়া গেল—সেখানে বাসা বাঁধিল।

তাহারা দেখাইল—তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—নূতন জাগরণে আজ চক্ষু মেলিয়াছে কিন্তু বহু পুরাতনের স্বপ্ন তাহারা, বর্ত্তমানে আবার সত্য হইতে আসিয়াছে তাহারা, বলিতেছে—'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। ক্রমবিবর্ত্তনের ধর্ম্মে আর যাহাই হউক, নারী-চরিত্র রঞ্জিত হয় নাই কারণ পুরাকালের সে তেজোময়ী চরিত্রের উপর উন্নতি লাভ বঙ্কিমের পূর্ব্ব যুগ পর্য্যন্ত হয় নাই—এখন আবার বঙ্গবাসী বিস্ময়ে পুলকে চাহিয়া দেখিল যে জানকীর প্রিয়মঙ্গলার্থে সে মহান্ সহনশীলা ব্রতে ব্রতী হইয়াছে—বাংলারই কালো ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী। উমার সে নিঃস্বার্থ তপশ্চর্য্যা আবার মূর্ত্তি লইয়াছে যবনকুমারী আয়েষার সর্ব্বত্যাগী প্রেমে। পঞ্চভর্ত্তৃকা দ্রৌপদীর সে তেজোরাশি, সে প্রিয় ধর্ম্ম সাধনা—শান্তি ও দেবী চৌধুরাণীতে প্রদীপ্ত। সাবিত্রীর ঐকান্তিক প্রেম মৃণালিনীতে প্রোজ্জ্বল। কিন্তু এ কথা বলিলে বঙ্কিমের প্রতি শিল্পী হিসাবে অবিচার করা হইবে যে তিনি কেবল ভারতের চিরন্তন ও কল্যাণকর আদর্শকে আমাদের ঘরের বঁধু ও কন্যার মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

করিয়া জাতীয় জীবনে শক্তির সঞ্চার করিবার প্রাণপণ চেষ্টায়, বাস্তবতা বা realism-এর দিকে চাহিবার সময় পান নাই, তাই তাঁহার রসসৃষ্টি Propagandist literature-এর দোষে দূষিত। সংস্কারক বঙ্কিমের কাছে শিল্পী বঙ্কিম খণ্ডিত ও পরাভূত। এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা বঙ্কিমকে জানেন নাই, বুঝেন নাই—একথা জোর করিয়া বলিতেই হইবে।

বঙ্কিম জানিতেন যে সুন্দরকে বাদ দিয়া অসুন্দরের পূজা, অমঙ্গলকে পরিহার করিয়া কেবল মঙ্গলের মধ্যে সত্য শিব ভগবানের আরাধনা, ইন্দ্রিয়াতীতকে স্পর্শে ধরিয়া গোধূলির আলোছায়া মিশ্রণের ন্যায় কোমল করিয়া দেখা, কুটিল, কুৎসিতকে সযত্নে পরিহার করা ইহার নাম নিস্পৃহ বৈরাগ্যসাধন। ইহা জীবন নহে এবং আর্টও নহে। এ কথা সত্য যে নরনারীর সম্বন্ধে লিখিতে গেলে যে স্থূল ইন্দ্রিয়তত্ত্ব আসিয়া পড়ে তাহার মধ্যেও সত্যপ্রাণ আছে—তাহাই ইহার আনন্দ ও সৌন্দর্য্যস্বরূপ। কাজেই শিল্পীর দৃষ্টি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে ও সে জানে তাহার শিল্পের চরম বিকাশ মানুষের বুভুক্ষার মধ্যে যতখানি—তাহার সিদ্ধির মধ্যেও ততখানি, এবং যোগীর যোগ, ব্যথীর ব্যথা, পতিতের জাগরণ—ইহার প্রকাশই প্রকৃত শিল্পীর আধ্যাত্মিক সাধনা। ইহাই আর্ট।

তাই বলিতেছি যদি বা আমরা বঙ্কিমের অখণ্ড রসসৃষ্টির মধ্যে কোথাও ছেদ পাইয়াও থাকি, তাহা হইলেও সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহাই কি লক্ষণীয় ও নিন্দনীয় হইবে? তখনকার বাহির ও ভিতরের অবস্থা সকলকে এক বার মনে করিতে অনুরোধ করি। যে মহাব্রতে জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ করিতে মহারথী অগ্রসর হইলেন, তাহাতে কি তাঁহার কণ্ঠে লীলা বাঁশরীর পরিবর্ত্তে কম্বুনাদের প্রয়োজন ছিল না? বন্দে মাতরমের মহামন্ত্র কণ্ঠে ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভাষার ভাগীরথী উদ্ধার করিয়া আনিলেন—সাহিত্য-ভূমি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিল—সেই ভাবৈশ্বর্য্যসম্ভারে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে দেখি রসস্রষ্টা বঙ্কিম কেবল যে সতী ও মহান্ আদর্শ আঁকিলেন তাহা নহে, বুভুক্ষিত যুবতী বালবিধবার ভোগলিপ্সা, বাল্যপ্রণয়ের হতাশময় অভিশপ্ত পরিণাম, কুটিলা হিংসাকলুষিত সর্পীর স্বার্থান্বেষণের ছবি, সকলই ফুটিয়া উঠিল রোহিণী, শৈবলিনী, হীরাদাসী, ও মতিবিবিতে। দলে দলে তাহারা এই প্রভাতে জাগিয়া উঠিল। কেবল যুবতী তরুণীর উচ্ছ্বসিত কলহাস্য, সুখ দুঃখ, বিরহ মিলন নহে, পরিপক্ক সুগৃহিণী, রূপকথা-বলা ঠানদিদি, কোন্দলপরায়ণা যৌবন-অভিলাষী বামনঠাকুরাণী, হীরার আয়িবুড়ী যিনি নাতনীর হিষ্টিরিয়া বা ইষ্টিরস রোগে কেষ্টর অয়েল বা কেষ্টরস প্রয়োগ করেন, সুভাষিণীর শাশুড়ী কালির বোতল, শান্তির নিরীহ সাহেবের প্রণয়-নিবেদনের উত্তরে কলা ও শিকলের সাদর নিমন্ত্রণ, গোবরার মার বধিরত্ব—আর কত কহিব—এক অপূর্ব্ব সমাবেশে ইহারা হাস্যরসকে নির্ম্মল খরতরঙ্গে বহাইয়া দিল। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম যে কেবল নারীর আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা নহে, তিনি নির্ভীক ভাবে প্রচার করিলেন যে নারীর জন্ম শক্তির অংশে, তাহার স্থান কেবল পুরুষের দাসী হিসাবে নয়; কেবল প্রেয়সী হিসাবেও নয়—নারী পুরুষের কর্ম্ম-জীবনে প্রেরণা দিবে, কর্ম্মসাধনে সাহায্য করিবে, তাহার স্থান পুরুষের অন্তরে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনায়। বস্তুত নারীর কেবল এক মূর্ত্তি নয়,—বহুবলশালিনী সুখদাং বরদাং সে মূর্ত্তির আদর্শ।

এ স্থানে একটা জিনিস চোখে পড়ে—প্রতি ছত্রে যেন বঙ্কিমের নারীচরিত্র তাহাদের স্রষ্টিকর্ত্তার প্রতিভা-প্রসাদে তাহার পুরুষ-চরিত্রকে অপেক্ষাকৃতভাবে ছায়াচ্ছন্ন করিয়াছে। উপন্যাস হইতে উদাহরণ দিতেছি—দেবী চৌধুরাণীর বীর্য্যশালী প্রেম, নিষ্ঠা, বীরত্ব ও ত্যাগের কাছে বার-বার বহুদার ব্রজসুন্দরকে সুবোধ জমিদার-পুত্র মনে হয় আর কিছু নয়। জীবানন্দ সুন্দর পুরুষ চরিত্র, কিন্তু সে চরিত্র অটল পর্ব্বত ছবির ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে যতক্ষণ না নবীন বালসূর্য্যের মত নবীনানন্দের বেশে শান্তির আবির্ভাব, তখন সেই চরিত্রের আলোক-সম্পাতেই না জীবানন্দের বাহুতে নূতন বল; নূতন গুণরাজি ও নূতন গৌরবময় আত্মত্যাগের অধ্যায় সুরু হয়। নগেন্দ্র সে ত সাধারণ বাঙালী জমিদার,—কেবল সূর্য্যমুখী একনিষ্ঠ প্রেম দিয়া তাহাকে দেবতা করিয়া গড়িয়াছে—নহিলে আমাদের কাছে অসংযত জমিদার বই আর কি? রাজসিংহ—বীরশ্রেষ্ঠ, কিন্তু রূপনগরের কন্যাটি পার্শ্বে আসিয়া যেন ভবানী-ভৈরবের মূর্ত্তি স্মরণ করাইয়া তাহার গৌরব বাড়াইয়া দেয়। ইন্দিরার স্বামীর সবচেয়ে দুরবস্থা, ভূত-প্রেত-বিশ্বাসী কমিসেরিয়টের এ রত্নটি ইন্দিরার হাস্যোজ্জ্বল বুদ্ধিদৃপ্ত মধুর ছবিটির পার্শ্বে নেহাৎ নির্জীব ও হাস্যকর। তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের ইন্দিরার মত চরম দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যেও কি এমন করিয়াও বামনঠাকুরাণীকে কলপ মাখাইয়া তাঁহার বানর-মার্জ্জার-মিশ্রিত মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া কুটিপাটি হইতে পারেন?

তাহার পর আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। নারীর প্রেমকে বঙ্কিম কি উচ্চাসনই দিয়াছেন—ভাবিলে শ্রদ্ধাবনত হইতে হয়। মৃণালিনীতে দেখুন, পুরুষ হেমচন্দ্র প্রেমাস্পদার নামে মিথ্যা কলঙ্ক শুনিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। আরও দেখি জগৎসিংহের ও তিলোত্তমার পবিত্রতা সম্বন্ধে, মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। ইহাদের প্রেমে সেই ক্ষমা, সেই ত্যাগের গভীরতা—সে বিশ্বাস নাই—যাহাতে হেমচন্দ্র নিশ্চয় প্রত্যয়ে জগতকে ও নিজেকে বলিতে পারিতেন—যে অপবাদ হৃষীকেশ দিয়াছে তাহাকে, তাহাতে তাহারই মুখ কলুষিত হইয়াছে—মৃণালিনীর চরিত্র নহে। সেই ভাবে জগৎসিংহেরও মনে করা উচিত ছিল না যে তাহার তিলোত্তমা হয় পবিত্রভাবেই জীবন যাপন করিতেছে—কতলু খাঁর আশ্রয়ে থাকিয়াও,—না হইলে সে জীবনধারণ করিত না, কিন্তু উভয় নায়কেরই সন্দেহ প্রেম আপনি আসিয়া ভাঙে নাই—দুর্বৃত্তগণের মৃত্যুযন্ত্রণার সত্য স্বীকারোক্তির মধ্যে অত্যন্ত রোমান্টিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে নায়িকাদ্বয় অকলঙ্ক সতী। অপর দিকে দেখুন—সেই মৃণালিনীকে কি মহান্ তপস্যা ও ক্ষমা থাকিলে তাহার ন্যায় যে পুরুষ পুরুষকার কলঙ্কিত করিয়া প্রিয়তমাকে বক্ষচ্যুত করিয়া তাহার দূতী ও সখীকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলে—ক্ষমা না চাহিতেই অপরাধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া আবার সেই বক্ষে মাথা রাখিয়া মনে করিতে পারে—এই স্বর্গসুখ। সুরসিক বঙ্কিম তাই কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই, তিনি বলিয়াছেন নির্লজ্জা মৃণালিনী। আর স্বচক্ষে তিনি সুন্দরী—সুন্দরী—সুন্দরী মনোরমাকে হেমচন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিলেন—কিন্তু প্রেমের এ ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তাই বলিলেন, "মনোরমা যেই হোক হেমচন্দ্র আমারই।" ভ্রমরও এই কথা এক দিন বলিয়াছিল কিন্তু লোকাপবাদে অভিমান করিল—অবিশ্বাস করিল—তাই রায়-পরিবার ছারখার হইয়া গেল। প্রেমের এ গভীর বিশ্বাসের উপর বঙ্কিম বার-বার জোর দিয়াছেন। তিনি জানাইতে চাহিয়াছেন যে, বিশ্বাস ভিন্ন প্রেম—প্রেম নহে। তাই কমলমনির মুখ দিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন, যখন সূর্য্যমুখী স্বামীর উপর সন্দিগ্ধ হইল—"তুমি পাগল হইয়াছ নচেৎ স্বামীর হৃদয়ের প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না তাহার মরাই মঙ্গল।" সোনার কমলের এই উক্তি প্রেমগর্ব্বিতার অহঙ্কার নহে—সাধিকার সিদ্ধির ফল।

বঙ্কিমের নারী-চরিত্র আলোচনা করিতে গেলে জনাকীর্ণতায় ভীতিগ্রস্ত হইতে হয়। কত বয়সের—কত অবস্থার, বিভিন্ন জাতের রমণীর সমাবেশ। এস্থলে তাই Mrs. Jameson-কৃত শেকস্পীয়রের নায়িকার শ্রেণী-বিভাগ অনুসরণ করিয়া আমরাও বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাগণের শ্রেণী বিভাগ করিয়া, প্রধান চরিত্রগুলিতে কি ভাবে বঙ্কিম পুরাকালের আদর্শ ও ভবিষ্যতের আশা দেখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এ আমার পক্ষে ধৃষ্টতা জানি, তবুও সুধীমণ্ডলী ভুলত্রুটি ক্ষমা করিবেন—আশা করি। এইরূপে বিভক্ত করিলে আমরা চারিটি শ্রেণী পাই :—

১। বুদ্ধিপ্রধান নায়িকা, ২। স্নেহপ্রবণ নায়িকা, ৩। ভাবপ্রবণ নায়িকা, ৪। হাস্যরসপ্রধান নায়িকা।

১ম শ্রেণী—বুদ্ধিপ্রধান চরিত্র :—

যথা :—বিমলা, নির্ম্মলকুমারী, দেবী চৌধুরাণী, শান্তি, হীরাদাসী, মতিবিবি, সুন্দরী, ইন্দিরা, রোহিণী, জেবউন্নিসা ও চঞ্চলকুমারী।

২য় শ্রেণী—স্নেহপ্রবণ চরিত্র :—

যথা :—আয়েষা, সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, সাগর, নন্দা, রমা, নিমাইমণি, সুভাষিণী, কল্যাণী, মৃণালিনী, রজনী, রাধারাণী, কমলমণি, কামিনী, দলনী ও শৈবলিনী।

৩য় শ্রেণী—ভাবপ্রবণ চরিত্র :—

যথা :—কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী।

৪র্থ শ্রেণী—হাস্যরসপ্রধান :—

যথা :—হীরার আয়িবুড়ী, বামনঠাকুরাণী, গোবরার মা, হারাণী দাসী, নয়ান বৌ।

স্নেহপ্রবণ চরিত্রগুলি তাহাদের আপন ধর্ম্মে আমাদিগকে সমধিক আকৃষ্ট করে বলিয়া আমরা তাহাদের প্রথম দেখিব। সর্ব্বপ্রথম আয়েষা-চরিত্র—কারণ বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাসে এ মূর্ত্তি আলোকহীন আকাশপটে শুকতারার শুভ্র শুচি, স্নিগ্ধ আলো লইয়া উদিত হইয়াছে—অন্যান্য নক্ষত্রের সূচনা করিয়াছে। দূরের সেই শুকতারার ন্যায় অবর্ণনীয় ভাবে আমাদের অন্তরের বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা এই যবনকুমারীর উদ্দেশ্যে প্রদান করি, যাহার প্রেম প্রতিদানের আশা না রাখিয়া গঙ্গার ন্যায় আপনি পবিত্র। হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি—আত্মভোলা নিঃস্বার্থ প্রেমের গোমুখী-নিঃসৃত আয়েষার অমর প্রেম। অবশেষে সে যে আত্মহত্যায় তাহার একাকিত্বের ব্যথা ভুলিতে গিয়াও ভুলিল না—তাহাতে তাহাকে দেবী পর্য্যায়ে তুলিয়াছে।

সূর্য্যমুখীরও, তাহার নামের ন্যায় একটি প্রেম, কমলের

সহিত বাক্যালাপে কুন্দর সহিত স্বামীর বিবাহ দিবার পর শুনি। কমল জিজ্ঞাসা করিতেছে—সে সুখী হইয়াছে কি না? সূর্য্যমুখী যে দেবী নয় তাহা দেখাইয়া তাহার ত্যাগকে আরও মহৎ করিয়া বঙ্কিম দেখাইতেছেন। সে এ প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলিলে মিথ্যা বলা হইত, কারণ তাহার প্রেমের গুপ্তমন্ত্র আমরা পরেই পাই। সে negatively সুখী হইয়াছে, কারণ স্বামীর সুখে তাহার সুখ, স্বামীর বেদনায় তাহার ব্যথা। সত্যই সূর্য্যমুখীর যে কি ঐকান্তিক প্রেম ছিল, তাহা নগেন্দ্রের বিলাপে পরিস্ফুট।

কমলমণি সংসারে সোনার কমল। বালিকার ন্যায় কৌতুকে মাথায় ফুল গুঁজিয়া দিয়া বলে—'বুড়ো বয়সে সখ দেখ না,' মন্ত্রীবরের সহিত যুদ্ধ-সন্ধি লাগিয়াই আছে—আবার চিরদুঃখিনী উপেক্ষিতা কুন্দের প্রতি তাহার সহানুভূতিতে কোন খাদ নাই। সখীত্বে, পত্নীত্বে কমল অতুল। সংসার-পঙ্কে সত্যই অমল কমলটি। আর জননী হিসাবে বঙ্কিম-চন্দ্রের এই চরিত্রই সমধিক পরিস্ফুট—যেন দ্বিতীয় ম্যাডোনা-মূর্ত্তি। ইহাই বোধ হয় কমলের প্রতি আমাদের অত্যধিক টানের রহস্য—যে কমলের নারীত্ব মাতৃত্বে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'সতুবাবু তাহার নাসিকা ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন' এই ছবিটির কাছে শত সুন্দরীর রূপশ্রী যেন ম্লান হইয়া পড়ে এবং মৃতবৎসা নিঃসন্তান চরিত্রগুলির মধ্যে কমলের ছবিটি অতি মধুর।

ভ্রমর-চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া তাহাকে সতী-শ্রেষ্ঠা বলিয়া আর চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে চাই না। কিন্তু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ভ্রমর আধুনিক কালের দ্বন্দ্ব-বিপর্য্যস্ত দুঃখসাধিকা তেজোময়ী নায়িকার আদি জননী, দুদিন পূর্ব্বে যে স্বামীসোহাগিনী সাধারণ বালিকা বধূ ছিল। দুঃখের পরশ লাগিয়া তাহার জীবনের রঙীন বুদ্বুদ হইয়া উঠিল শুভ্র মুক্তা, তেমনই কঠিন, নির্ম্মল, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়। 'যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য তত দিন আমার ভক্তি' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্রের মুখ দিয়া ইহাই বলিয়াছেন। ঋষির কি প্রচণ্ড দূরদর্শী প্রতিভা ও মাহাত্ম্যের পরিচায়ক দুর্ব্বলা উৎপীড়িতা নারীর এই নির্ভীক উক্তি। প্রেমের প্রতি কি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য! ভাবিলে কি হৃদয় আপনি সেই নারীচরিত্র-স্রষ্টাকে প্রণতি জানায় না? অন্যান্য স্নেহপ্রবণ চরিত্রের আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছে। কাজেই আমরা ভাবপ্রবণ চরিত্র দেখি।

কপালকুণ্ডলা কবিত্বময় আধ্যাত্মিক চরিত্র বহু আলোচিত হইয়াছে। কুন্দনন্দিনীর দুঃখকাতরা অভিশপ্ত মূর্ত্তিটি দেখা যাক্। কুন্দ যাহা চাহিল তাহা ভুল করিয়া চাহিল এবং যখন পাইল তাহা কেবল হারাইবার জন্য। মরণকালে অজানার হাওয়া লাগিয়া চির-যৌবন কুন্দ-কুসুমের মুকুল যেন ফুটিয়া উঠিল এবং চিরসঞ্চিত যত বেদনা সব বলা না হইতেই হিন্দু নারীর চির-আকাঙ্ক্ষিত ভাবে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার জন্য কাঁদিবার সময় নাই আমাদের। সূর্য্যমুখীর প্রত্যাগমনের শুভ শঙ্খধ্বনিতে রোদন ডুবিয়া যায়।

সর্ব্বশেষে বুদ্ধিপ্রধান চরিত্র। বলা বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর নায়িকাদের বিশেষত্ব যে তাঁহারা অসাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা পুরুষের সমকক্ষ ও কোন কোন স্থলে তাহাদের শ্রেষ্ঠ হইলেও সেই এক প্রেমই তাহাদের কার্য্য করাই-তেছে। ইহারা দুঃসহ দুঃখতাপ মাথা পাতিয়া লইয়াছে। দুর্দ্দমনীয় বেগে প্রিয়জনের জন্য বিপদকে না মানিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—সহস্র মোগল সেনার সম্মুখে মা ভবানীর ন্যায় উলঙ্গ তরবারি হস্তে চঞ্চল, অচঞ্চল পাপবিপর্য্যস্ত বাদশাহের বিলাসপুরীতেই ইমলি বেগমরূপে নির্ম্মল চির-নির্ম্মল ক্ষুদ্র একটু বায়ুহিল্লোলের ন্যায় এই নির্ম্মলকুমারী রূপনগরের প্রাসাদে রুদ্ধ ছিল। প্রিয় সখীর উদ্ধার সাধনের জন্য গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইল, একেবারে পথে প্রেমের হিল্লোল তুলিয়া আলমগীর বাদশাহের প্রাসাদে উপস্থিত যেখানে বাদশাহকে ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরাইয়া আপনার গুণমুগ্ধ করিয়া তাহার প্রিয়তম বেগমকে দিয়া তামাকু সাজাইয়া দরিদ্র মানিকলালের গৃহিণী, চঞ্চলের সখী, কি অতুল বুদ্ধিতে কি সুগভীর প্রেমে অনুপ্রাণিত হইল। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের প্রলয়পয়োধি জলে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ছাড়িল এই বালিকা। ইহারই অনুরূপ বিমলা। কি ত্যাগ, কি বেদনা, যে এই হাস্যচটুল রঙ্গপ্রিয়া মোহিনীর নৃত্যগীতের অন্তরালে ছিল তাহা তাহার অন্তর্যামীই জানিতেন। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার সপত্নী-কন্যার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, সব ছাড়িয়া শেষ দৃশ্যটি দেখুন। যেখানে কতলু খাঁর বিলাস মহলে প্রিয়তমের মৃত্যুর প্রতি-শোধার্থে সালঙ্কারা সুসজ্জিতা বিমলা মধুর হাস্যে ললিত লাস্যে কতলু খাঁর হৃদয়ে বহ্নি জ্বালাইয়া নাচিতেছে গাহিতেছে। কে মনে করিবে বিধবা বিমলার মনে তখন কি শূন্যতার বেদনা। ইহাই কি যথার্থ কার্য্যকরী সতীত্ব নহে,—কেবল অশ্রুপ্লুত অসহায় তিলোত্তমাকে এ মূর্ত্তির পাশে কি নিষ্প্রভ বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন। কি কৌশল, কি চাতুরী বিমলার—অন্য দিকে কি প্রেম। এই বি ও নি উপসর্গের তফাতের মত বিমলা ও নির্ম্মলকুমারী

মূলতঃ একই। এই জন্যই কি সৃষ্টিকর্ত্তা নামের সাদৃশ্য রাখিয়াছেন? কুলবধূ সুন্দরীও এইরূপ নাপিতানী সাজিয়া সাহেবের বজরায় গিয়া উঠিয়াছে—আজ প্রয়োজনে তাহার কত বীরত্ব। প্রেমে, আত্মবিশ্বাসে সে মহিমময়ী। অথচ এক দিন সেই সাহেবকে জুজুর চেয়েও ভীতিপ্রদ মনে করিয়া পলাইয়াছিল।

দেবী-চৌধুরাণীর চরিত্র লইয়া একটি কথা আছে। প্রফুল্লের রাণীগিরি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ বধূর অনাড়ম্বর জীবন যাপন যেন অনেকেরই প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা বুঝিয়াই বোধ হয় বঙ্কিম তাঁহার শেষ বয়সের এই পুস্তকে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন—তাহা বলিয়াছেনও। প্রফুল্ল নিজ মুখে যখন বলিতেছে যে নিষ্কাম ধর্ম্মসাধন-ব্যাপারে সংসারে থাকিয়া সকলের পরিচর্য্যা করিয়া তাহার সুখ, তাহার নারীত্বের সার্থকতা, তখন আমাদের মনে করিলে চলিবে না যে, যে-দেবীরাণীর প্রতাপে সারা বাংলা কাঁপিত সেই পরম বিদুষী, শক্তিমতী রমণীকে যখন সতীনের সন্তানদের আদর যত্ন করিয়া, শাশুড়ী ভোলাইয়া পুকুর-ঘাটে বাসন মাজিতে দেখি তখন ছবিটি bathos হইয়া পড়ে, কারণ পরকে সুখী করিয়া যে সুখ সেই মহাব্রত প্রফুল্ল লইয়াছিল। ইহাতে আমাদের কি বলিবার আছে, ব্রজেশ্বরের পত্নীভাগ্যের তারিফ করা ছাড়া?

রোহিণীও বুদ্ধিমতী কিন্তু তাহার উপর বঙ্কিমের ভ্রুকুটি কুটিল হইয়া উঠিয়াছে, কারণ তাহার যে গোবিন্দলালকে পাইবার ইচ্ছা তাহার রূপজ মোহ, ভোগলিপ্সা,—প্রেম নহে।

সর্ব্বশেষে দেবী চৌধুরাণীর চেয়েও মনোহর একটি চরিত্র আছে যাহার মধ্যে দেখিতে পাই ভূত ও ভবিষ্যতের স্বপ্নের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। উষার উদয়ের ন্যায় আশাসূচক—তাহাকে দেখিয়াছি পুস্তকে কিন্তু আবার দেখিব—সে আসিবেই—হয় এই যুগে নয়ত যুগান্তরে, কিন্তু জগতের কল্যাণের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী তার আগমন। কে সে? ইহাকে ঘনপল্লবচ্ছায়ে সারেঙ্গ হস্তে গহন বনপ্রান্তর কাঁপাইয়া হরে মুরারে গাহিতে দেখিয়াছি। অনায়াসে বিশাল ধনুকে গুণ চড়াইতে দেখিয়াছি—স্বামীর সহিত ধর্ম্মসাধিকা,' ব্রতচারিণীরূপে দেখিয়াছি—মাতাহরীর ন্যায় শত্রুশিবিরে গিয়া, অশ্বারোহণে গুপ্ত সংবাদ দিতে, সেনা চালাইতে দেখিলাম—নবীনানন্দরূপে মঠের মহারাজকে দু-চারটি সোজা সোজা ধর্ম্মের কথা বিনম্রনম্র ভজনের সহিত সে বলিয়াছে, কল্যাণীর স্বামীর সহিত পুরুষবেশে সে নারীসুলভ রসিকতাটুকু করিতে ছাড়ে না, তাহার চরিত্রের বিশাল বিচিত্রতা, অদ্ভুত শক্তি, অপার প্রেম, ধর্ম্মে একনিষ্ঠার সহিত উদারতা, কর্ম্মে মহাপ্রেরণা, জলধির বিচিত্র শক্তিমত্তার ন্যায় অপরূপ। পুরুষের এরূপ আদর্শ অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে আমরা আবার দেখিতে চাই ভবিষ্যতের নারীকে, যে পুরুষের সহিত বিরোধে বড় নহে, সহকর্ম্মিতায় একত্র, কর্ম্মসাধনে জীবনব্রত পালনে সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে পার্শ্বচারিণী। কল্যাণী, সাধিকা তেজোময়ী নারী হিসাবে তাহার সার্থকতা। এই চরিত্রকে চিনিতে পারিয়াছেন পাঠক। সে আনন্দমঠের শান্তি। আজও আনন্দমঠের এই আনন্দ-প্রতিমার ন্যায় নারী, বিষাদিনী মূর্ত্তিতে একাকিনী, স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে, শ্মশান-ভূমিতে মশালালোকে আপনার শিব খুঁজিতেছে—যেমন শান্তি খুঁজিয়াছিল তাহার জীবিত সর্ব্বস্ব স্বামীকে। এ যে রূপকের মধ্য দিয়া বঙ্কিম নারীকে সকল রূপে দেখিয়া অবশেষে ভবিষ্যতে এইরূপে দেখিলেন।

বঙ্কিম সকল দিক দেখিয়া বহু নারী সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা সত্য, কিন্তু তাহাদের সকলের ভিন্নতা এক স্থানে আসিয়া এক মহামন্ত্রে প্রণোদিত, মিলিত, একাত্মিকা হইয়া গিয়াছে। কি সে মহামন্ত্র? কি সে আদর্শ? কি সে গৌরব? তাহা 'প্রেম'। চাহিয়া দেখুন—সেই এক প্রেম প্রতি চরিত্রভেদে নব নবোন্মেষে দেখা দিয়াছে। সেই প্রেম ইন্দিরার চপল চোখের হাসিতে নাচিতেছে—আয়েষাতে সে প্রেম আত্মসমাহিত নির্ব্বাক্, সংযত। সেই প্রেমের ধর্ম্মে আচ্ছাদিত বিমলা কতলু খাঁর বিলাস কক্ষে রঙ্গিনীবেশ ধরিয়াছে ভীষণ প্রতিশোধার্থে। সেই প্রেমের আদেশে কুলবধূ সূর্য্যমুখী গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে—এখানে সে প্রেম ত্যাগে মহৎ। সেই প্রেম দুঃখ-তাপরূপে কুন্দ-কুসুমকে অকালে ঝরাইয়াছে—আত্মদানের পথ বলিয়া দিয়া। ক্ষমায় সেই প্রেম উজ্জ্বল মৃণালিনীতে। সেই প্রেমের তপস্যার ফল হৃদয়ে ধারণ করিয়া নবাব-পুত্রী আয়েষা তপস্বিনী। সেই প্রেম বীর ও কর্ম্মীর কঠোর আজ্ঞা লইয়া শান্তির মুখে দৃপ্ত বাণী, শান্তির ব্রহ্মচর্য্য সেই প্রেমের দীক্ষা। সেই প্রেম বীরত্ব আনিয়াছে চঞ্চলকুমারীর বাহুতে ও কণ্ঠে, সেই প্রেমেই লবঙ্গলতা বৃদ্ধ স্বামীকে নবীন দেখিয়াছে, মনোরমাকে আপনাতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, শ্রীকে করিয়াছে সন্ন্যাসিনী ও অন্ধ রজনীকে চক্ষুষ্মতী, দরিয়াকে উন্মাদিনী, নির্ম্মলাকে নির্ম্মল, কমলকে কমলতুল্যা, ও বিলাসিনী গর্ব্বিতা বাদশাজাদী জেব্‌উন্নিসাকে দীনা দুঃখিনী। সেই প্রেমের সাধনায় ভ্রমর তিলে তিলে মরিয়াছে, তবুও চরিত্রভ্রষ্ট স্বামীর নিকট আত্মদান করিয়া সে প্রেমের অমর্য্যাদা

করে নাই। সেই প্রেমের স্মৃতিসাগরে সাঁতার দিয়া শৈবলিনী নরক দেখিয়াছে—দলনী বেগম বিষ পান করিয়া মরিয়াছে আর সাগর কলহাস্যে আমাদের স্নেহপ্রবাহ টানিয়া লইয়াছে তাহার প্রতি। আর সেই প্রেম নিষ্কাম ধর্ম্মের নিরহঙ্কার নম্রতার ত্যাগের মহিমাচ্ছটায় দেবী-রাণীর লক্ষ্মীস্বরূপা বধূমূর্ত্তিতে কি অপূর্ব্ব।

তিনি আনন্দমঠের শেষে বলিয়াছেন—"হায় মা! এমন দিন কি আবার হবে—শান্তির মত কন্যা, জীবানন্দের মত পুত্র কি আর গর্ভে ধরিবে।" তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে কি আমরা, আজ যাহারা উষা-পূর্ব্বের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া নূতন উষার কামনা করিতেছে, আমরা কি রক্তমাংসে সে আদর্শ দেখিতে বা দেখাইতে পারিব না? ঋষি বঙ্কিমের স্বপ্ন, তাঁহার আশা কি মিথ্যা হইবে? এক যুগসঙ্কটে যাহার জড়তা মোচনকারী বাঁশরীর স্বরলহরীতে অকস্মাৎ মরা গাঙে জোয়ার আনিল—জাতীয় জীবন-যমুনার কূলে কূলে ভাবতরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া আকাশে বাতাসে নবজীবনের শুভ উদ্বোধন-গীতি গাহিয়া উঠিল যে মোহন বাঁশরীর মন্ত্রশক্তির বলে নারী জাগিয়া উঠিল তাঁহার উপন্যাসের পাতায় পাতায়, তাদের পদক্ষেপে ছিল না অনভ্যাসের দ্বিধা বা ভীরুতা, কণ্ঠে রহিল না অনুচ্চারণের জড়তা, নয়নে রহিল না কুণ্ঠার রেশ যাহাদের মঙ্গল নূপুর স্পর্শে বঙ্গবাণীর প্রাঙ্গণে নবীন তৃণপুষ্পে উন্মুখ ভাবমুকুল জাগিয়া উঠিল—তাহাদের সেই স্রষ্টাকে বার বার প্রণাম করি।

হে ঋষি! "তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ,
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার বারংবার।"

আজ নবজাগরিত বাংলায় আবার সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া তাহার আদর্শের পতাকাকে উচ্চে উড়াইয়া সহস্র কণ্ঠে দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ভক্তিভরে এককণ্ঠে সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলি—

ধন্য বঙ্গমাতা এমন সন্তান গর্ভে ধরেছিলে,
ধন্য ভারতবাসী—বন্দেমাতরম্॥

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকরুণাময় বসু

শতাব্দীর ক্ষুব্ধজালে ঘেরিয়াছে সমস্ত পৃথিবী,
প্রাণের প্রদীপ-শিখা ঘূর্ণীমুখে যায় বুঝি নিভি
গাঢ় পুঞ্জ অন্ধকারে; উন্মথিছে সমুদ্র উত্তাল
নির্ম্ম মৃত্যুর মতো, কে জ্বালিবে প্রদীপ্ত মশাল?
দিকভ্রান্ত অমারাত্রে কে দেখাবে স্থির সত্যপথ,
নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ছুটিয়াছে সমস্ত জগৎ।
তরণীর পুরোভাগে তুমি ছিলে স্বাধীন নির্ভীক,
বন্দরের আলোরশ্মি দেখায়েছে হে বন্ধু নাবিক
জাতির যাত্রার পথে; পথে নাই কীর্ণ ফুলদল,
দুঃসহ দুস্তীর্ণ যাত্রা শেষ করি' মহিমা উজ্জ্বল
অনন্ত বাসরে সুপ্ত। লেখনীর বহ্নিমুখে জানি
ঘুমন্ত জাতির কর্ণে শুনায়েছ বজ্রগর্ভ বাণী।
দৃঢ় চিত্ত, সত্যবিদ্, অস্ত্রক্ষেপে অকুণ্ঠিত বীর
অসত্যের মর্ম্মস্থলে চিরদিন হানিয়াছ তীর।
যাও তুমি ধ্রুবলোকে জ্ঞানবৃদ্ধ গুরু ভীষ্মদেব,
তোমার যাত্রার কালে দূরে থাক্ দুর্ব্বল আক্ষেপ।

যুদ্ধ-দানব

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

দানব নাচিছে দিকে দিকে আজ দলিয়া ধরা।
কাঁদিছে জননী, কাঁদে শিশু ওই হাস্যভরা।
কাঁদে সুখী গৃহী ভগ্ন ভবনে,
কেঁদে যায় দুখী অন্ন বিহনে,
ভেঙে পড়ে যায় পূজার দেউল পুণ্য-করা।
দিকে দিকে আজ মাতিছে দানব,
গুঁড়া হয়ে যায় নিরীহ মানব,
ভীম ভৈরবে দানব নাচিছে শান্তিহরা।
সোনার ধরণী করিছে শ্মশান,
জ্ঞান-মন্দির পড়ে খান খান,
বিদ্যারে আজ দলে অবিদ্যা ভয়ঙ্করা।
শোভনা ধরণী সভয়ে ঝিমায়,
আঘাতে প্রহারে দেহ ভেঙে যায়,
জীবের ধাত্রী জীবনাশে আজ কম্প-জরা।
কে রয়েছ বীর দানব-দলন,
এস তুলি' শির শঙ্কা-হরণ,
এস হে শৌর্য্যে এস হে বীর্য্যে দৃপ্ত-করা।
দানব দলিতে বীর-গৌরবে এস হে ত্বরা।

পুস্তক পরিচয়

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। সমবায় পাবলিশার্স, ৩০-২, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৯ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

বইখানা 'আজ ও আগামী কাল' সিরিজের অন্তর্গত। তাহা হইতেই ইহার প্রকৃতি অনেকটা সূচিত হয়। অতীতের প্রতি খুব বেশী শ্রদ্ধা গ্রন্থকারের নাই। বর্ত্তমান যে ভবিষ্যৎ সূচনা করে, তাহাকে তিনি অনেক বেশী মূল্যবান্ মনে করেন। পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ-আশ্রম প্রভৃতিতে এক রকম সাধনা চলিতেছে; তাঁহার মতে উহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। অতীতের জীর্ণ কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সেখানে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পর-প্রতারণার চেষ্টা চলিতেছে, একথা বলিতেও হয়ত তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

মস্কোতে আর এক রকম সিদ্ধিলাভ হইয়াছে যাহা মানবের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আভাস দেয়। 'আজ ও আগামী কাল' মানব সমাজের অদৃষ্টে কি ঘটিতেছে এবং ঘটিবে তাহা জানা যায় কার্লমার্ক্সের শিক্ষায়, লেনিনের সাধনা ও সিদ্ধিতে এবং বর্ত্তমান রুশিয়ার রাষ্ট্রে।

লেখক কম্যুনিজমে পূর্ণ আস্থাবান্। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্লমার্ক্সের গীতা বড়। (১১ পৃষ্ঠা) আর, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, অরবিন্দ জগতের তেমন উপকার কিছুই করেন নাই যেমন করিয়াছেন লেনিন।

গ্রন্থ-সমালোচনায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে সমালোচনাও আর একখানা বই হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সে চেষ্টা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ কথা বলা বোধ হয় উচিত হইবে যে, লেখকের সকল সিদ্ধান্ত আমরা মানিতে প্রস্তুত নই; আর, আমাদের মত গ্রহণ করিবেন এমন আরও অনেকে হয়ত আছেন। আধ্যাত্মিক সাধনার অপব্যবহার যে মানব-সমাজে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আমরা সহজেই স্বীকার করিব। আর, ইহাও স্বীকার করিব যে, অতীতের জীর্ণ কঙ্কাল ধরিয়া বসিয়া থাকিলেই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া অতীত শুধু নিষ্ফলতার ক্ষেত্র মাত্র—শুধু বন্ধ্যাত্বের আধার— কোন সুফল সে প্রসব করে নাই একথা বলিলে ইতিহাসের অপচর্চ্চা হয়। মার্ক্স-গীতা ও লেনিন-মহাকাব্যও ত অতীতেরই ফল! যে অতীত উহা দিয়াছে তাহাকে অপূর্ণ মনে করিলেও কিছু শ্রদ্ধা করিতে হয়।

হিন্দু সভ্যতায় ব্রাহ্মণের দান সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে-সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মানিতে পারি না। ইহাতে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ যতটা প্রকাশ পাইয়াছে, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ততটা নয়। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ অনেকের কাছে এরূপ গাল অনেক খাইয়াছেন এবং আরও খাইবেন হয়ত। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস বদলায় না। উপনিষদ্ সব ক্ষত্রিয়েরা লিখিয়াছেন, এই মতটা ইউরোপে প্রথম চালু হয়, তার পর এ দেশে উহার জোয়ার আসে। কিন্তু উহা অর্দ্ধ-সত্য মাত্র। সমালোচনার পরিসরের মধ্যে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আমাদের মত সমর্থন করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইহার বেশী এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

গ্রন্থকারের লেখার জোর আছে, লেখনীতে তেজ আছে, গতি আছে, বেগ আছে। তাঁহার ভাষার খর-স্রোতের সম্মুখে অনেক যুক্তিই সহজেই ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। বইখানা পড়িতে ভাল লাগে,—আরম্ভ করিলে শেষ করিতেও ইচ্ছা হয়। এ সবই তাঁর প্রাপ্য ন্যায্য প্রশংসা।

কিন্তু একটা কথা। সাধারণ হিন্দু যেমন শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের গীতা কিংবা বেদব্যাসের মহাভারত পড়ে—যেরূপ নির্ব্বিচার ভক্তির সহিত উহা গ্রহণ করে, কম্যুনিজম-ওয়ালাদেরও কার্লমার্ক্স এবং লেনিনের প্রতি মনোভাবও কি ঠিক ঐ একই প্রকারের নয়? অর্থাৎ নির্ব্বিচার ভক্তি এবং অটল শ্রদ্ধা? মনুর বদলে লেনিন আর বেদের বদলে মার্ক্স লইলেই দৃষ্টি উদার হয় না, বিচার প্রসার লাভ করে না এবং বুদ্ধি স্বাধীন এবং কুসংস্কার বর্জ্জিত হয় না।

কম্যুনিজম এখন আর আমাদের একেবারে অপরিচিত নয়। ইহার আদর্শ ও শিক্ষা এবং কার্য্যপ্রণালী 'গত কাল ও আজ' এদেশে অনেক রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। আর ইহার অদৃষ্টে অনেক রকম অভ্যর্থনাও জুটিয়াছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মীরাট-ষড়যন্ত্রের মামলার সময় ইহার নাম লইলে অপরাধ হইত; আর, অধুনা কোন কোন ক্ষেত্রে উহা রাজভক্তি ও দেশ-প্রেম উভয়েরই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাল-মন্দ সব জিনিসেরই আছে—কম্যুনিজমেরও আছে। মতবাদ হিসাবে ইহার আদর্শকে অনেকে যেমন উচ্চ প্রশংসা করেন, তেমনই ইহার নিন্দুকেরও অভাব নাই। কম্যুনিজম বিচার সহ্য করিতে পারিবে না, মনে করি না। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার আদর্শ ও শিক্ষা আবার নূতন করিয়া—শুধু অতীতকে নিন্দা করিয়া এবং পণ্ডিচেরীকে উপহাস করিয়া নয়—যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিলে ভাল হয়। জগতের বর্ত্তমান ঘোরালো রাজনীতির মধ্যে রাষ্ট্র হিসাবে রুশিয়া এবং মতবাদ হিসাবে কম্যুনিজম যে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টি দিলে বিশেষ করিয়া এই কথাই আমাদের মনে উঠে। পণ্ডিচেরীর রহস্যাবৃত সাধনার উপর একটা ব্যর্থতার ছায়া পড়িয়াছে একথা যে বলিবে তাহাকেই কম্যুনিজম মানিতে হইবে, এমন নয়। একটা মধ্যপন্থাও আছে। মনু-পরাশর-শাসিত অতীত আর মার্ক্স-নিয়ন্ত্রিত লেনিন-গঠিত বর্ত্তমান—এই উভয়কেই যে বিচার করিয়া দেখিবে তাহার পক্ষে এই মধ্য পন্থা আবিষ্কার করা কঠিন হওয়া উচিত নয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা পৃষ্ঠা ৪০। মূল্য আট আনা।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক—একথা সকলেই জানেন। কিন্তু, তিনি তারবিহীন বার্ত্তা-প্রেরকযন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন—কেবল এইটুকু ছাড়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে অনেকেরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। তাহার প্রধান কারণ জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয়সমূহ বিদেশী ভাষায় লিখিত এবং বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত। এই বিপুল গ্রন্থরাজি মন্থন করিয়া তাহার সার সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ প্রকাশের ভাষায় এমন একটা পারিভাষিক বৈশিষ্ট্য থাকে যাহা অনেকের পক্ষেই সহজ বা সুখবোধ্য নহে। অন্যান্য দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্যাবলী সম্বলিত বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকাদিরও সহজ-

বোধ্য সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির পথ তো সুগম হয়ই, অধিকন্তু অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয় সম্পর্কেও প্রথম শিক্ষার্থীদের মনে এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ এবং আত্মপ্রত্যয় জন্মে যাহার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হইয়া থাকে। আমাদের মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য প্রচারে 'বিশ্বভারতী'র অনুরূপ প্রচেষ্টা যে দেশবাসীকে উৎসাহিত এবং আশান্বিত করিবে, আলোচ্য পুস্তকখানি তাহার অন্যতম প্রমাণ। পুস্তকখানিতে চারুবাবু অতি নিপুণতার সহিত জগদীশচন্দ্রের গবেষণাসমূহের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ও বর্ণনাভঙ্গীতে কিরূপ সুখপাঠ্য এবং সহজবোধ্য হইতে পারে এই বইখানিতে তাহার পরিচয় মিলিবে। ইহা হইতে যে কেহ অনায়াসেই জগদীশচন্দ্রের গবেষণাবলীর সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৈদিক গবেষণা—১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীউমাকান্ত হাজারী। কলিকাতা ১১, বিডন ষ্ট্রীট হইতে ডাক্তার কে, হাজারী, এম্-বি কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিন অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের (সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য) বিবরণমূলক আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে চার অধ্যায়ে আর্য্য জাতির আদিম বাসস্থান, বসতি বিস্তার, উপনিবেশ সংস্থাপন এবং ভাষা, ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালী প্রভৃতি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বেদ ও পুরাণ অবলম্বনে লেখকের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রচনা স্থানে স্থানে অযথা বিস্তৃত, শিথিলবন্ধন, পুনরুক্তি-দোষদুষ্ট ও বর্ণাশুদ্ধিবহুল হইলেও ইহার প্রতি পত্রে গ্রন্থকারের বিপুল পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশী বিদেশী অগণিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংকলন করিয়া তিনি নিজ বক্তব্য সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত অনেক স্থলে প্রচলিত মতের অনুকূল না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে—কোন কোনটি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে:—(১) সামবেদেরই বহু মন্ত্র অতি প্রাচীনকালে ঋগ্‌বেদে গৃহীত হইয়াছে—১।১৭; (২) এশিয়া মহাদেশের মধ্যস্থলে, কোন এক অশ্ববহুল শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসস্থান বা আর্য্যগণের আদি আবসথ বিদ্যমান ছিল—২।৭০; (৩) ইলাবৃত্ত বর্ষস্থিত জম্বু খণ্ডে ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মী বর্ণমালার উৎপত্তি এবং ভারতবর্ষে ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আমাদের বিশ্বকবি—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু। কো-অপারেটিভ বুক ডিপো। ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৮০

ভূমিকায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আপনি যে 'আমাদের বিশ্বকবি' বইখানিতে রবিকাকা মশায়ের জীবনের চুম্বক ঘটনাবলী দিয়েছেন, তার থেকে সকল বয়সের পাঠকরা কবির জীবনের একটি সুন্দর আভাস পাবে; সেইটুকুই পুস্তকের মূল্য।" কবির কাব্য ও রচনাবলীর সম্বন্ধে অসংখ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে কিন্তু কবির সম্পূর্ণ জীবনের ঘটনাবলী সম্বলিত একাধিক পুস্তক এখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। ছেলেদের জন্য লিখিত হইলেও যাঁহারা কবিবরের একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী হাতড়াইতেছেন, এখানি তাঁহাদের কাজে লাগিবে। কবি ও শান্তি-নিকেতনের সহিত এককালে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় গ্রন্থকার কবির জীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, এজন্য বইখানি সুলিখিত ও সুপাঠ্য হইয়াছে।

পাতালপুরীর আংটি—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত। ইষ্টার্ণ ল হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ক্রাউন আট পেজী, পৃঃ ৭৬, মূল্য ।৶০।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত Nibelungen-Lied নামক জার্ম্মান মহাকাব্য অনুসরণে ছেলেদের এই উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছে। এই পাতালপুরীর আংটির কতকগুলি গাথা অবলম্বনে জার্ম্মান সঙ্গীতবিশারদ Wagner তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত গীতিনাট্য রচনা করিয়াছেন। এই বইটি পড়িলে ছেলেরা এক মহাজাতির একটি মহাকাব্যের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে। মায়াধনের প্রকৃত অধিকারী রাইননদীর মায়াকন্যাগণ; যে এই মায়াসোনার তৈরি আংটি ধারণ করিবে, সে সারা জগতের উপর প্রভুত্ব করিবে। বামনগণ, দানবগণ এমন কি দেবতাগণও এই মায়াধন হস্তগত করিয়াও ইহার অভিশাপ এড়াইতে পারিল না। নানা ঘটনাবৈচিত্র্যে এই পৌরাণিক গল্পটি উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল; বইখানির বহিরঙ্গ সজ্জাও সুন্দর হইয়াছে।

মুকুর—শ্রীকেশব হাজারী। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় কর্তৃক ৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৩৭০, মূল্য ৩৲।

ইহা একখানি গানের বই, কয়েকটি কবিতা ব্যতীত প্রায় সবগুলিই গানের সুরে রচিত। কবিতা ও গানগুলি অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক, কতকগুলি দেশপ্রেমমূলক, কয়েকটি প্রকৃতির উদ্দেশ্যে রচিত। সহজ ও সরল ছন্দে রচিত গানগুলি ভাবের মাধুর্য্যে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কয়েকটি পদে লেখকের রচনাশক্তি ও ভাবুকতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

গীতামৃত—শ্রীবিধুভূষণ পাল, এল, এম, এস অনূদিত। দি বুক কোম্পানি লিঃ, ৪।৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১।০

ইহা গীতার পদ্যানুবাদ। যাঁহারা মূল সংস্কৃত পাঠ করিতে অপারগ তাঁহাদের জন্য গ্রন্থকার সহজ ও সরল বাংলায় এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকের ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু



উত্তর-সিসিলিতে পাহাড়ের উপর হইতে মার্কিন গোলন্দাজ সেনা পলায়নপর শত্রু-সেনাদের লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ করিতেছে
U.S.O.W.I.



সেনাধ্যক্ষ কিভিং মার্কিন জল ও স্থল উভচর সেনাদলকে সমুদ্র হইতে স্যালার্নো রণক্ষেত্রে সমভূমিতে অবতরণ করিতে



লণ্ডন। সেণ্ট পল্‌স গির্জ্জার পার্শ্বে বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিষ্কার করিয়া সেখানে জনসাধারণের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ ও প্রদর্শনী স্থাপনের দৃশ্য



বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মানে যুদ্ধের অবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, রুশ ক্ষেত্রের অংশ। একমাত্র এখানেই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের কৃতিগতভাবে বিরাট্ অনুপাতে সৈন্য ও শস্ত্র প্রয়োগ ইতেছে এবং স্থলযুদ্ধ-যন্ত্রের ব্যবহার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের উপর া চলিতেছে। এখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একপক্ষ—র্থাৎ জার্ম্মাণ দল—যুদ্ধপ্রান্তের দূরপ্রসারিত রেখা ধীরে রে সঙ্কুচিত করিয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে পশ্চাদপসরণ



দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তিবর্গের সর্ব্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন U.S.O.W.I.)

করিয়া প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিজের বলক্ষয়ের পরিমাণ কম রাখিয়া বিপক্ষদলের আক্রমণ-শক্তিকে প্রতিহত এবং ক্রমে ক্ষীণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অন্য পক্ষ—অর্থাৎ সোভিয়েট সেনাদল—ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুব্যূহ ছিন্ন করিয়া বিপক্ষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া জার্ম্মাণ সেনার প্রতিরোধশক্তি নষ্ট করিয়া তাহাকে ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। এ পর্য্যন্ত ঐ প্রান্তের যুদ্ধ যত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে জার্ম্মানদলকে বারংবার পিছু হটিয়া ছিন্নব্যূহ মেরামত করিতে হইয়াছে, যাহার ফলে বহু সুসংরক্ষিত অঞ্চল, বহু দুর্গমালা ও বহু রক্ষণ-উপযুক্ত প্রাকৃতিক বাধাযুক্ত প্রান্ত ছাড়িয়া দিয়া বিপন্ন সৈন্যদল ও ভগ্ন রক্ষণরেখা বাঁচাইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এরূপ যুদ্ধে আক্রান্ত অপেক্ষা আক্রমণকারীর ক্ষতি অধিক হয়, কিন্তু এখন রুশ রণক্ষেত্রে সোভিয়েট সেনা বিপক্ষ হইতে সংখ্যায় অনেক গরিষ্ঠ, সুতরাং তাহার ক্ষতি-সহন-শক্তিও অনেক অধিক। বিশেষতঃ এখন জার্ম্মানরক্ষীসেনা নূতন ও সতেজ সেনাদল আমদানী করিবার সুযোগ পাইতেছে না, কেননা ইটালী ও পশ্চিম-ইয়োরোপ রক্ষার জন্য জার্ম্মান সমরশক্তির এক বৃহৎ অংশকে নিযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে রক্ষীদল ক্রমেই শ্রান্ত হইয়া ক্ষীণ হইয়া পড়া খুবই সম্ভব। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত রক্ষণব্যূহ কোথায়ও সম্যক্ বা কিছুকাল স্থায়ী ভাবে ছিন্ন হয় নাই বা পশ্চাদপসরণের শৃঙ্খলাভঙ্গও হয় নাই, কিন্তু এইরূপ ক্রমাগত পিছু হটিয়া অবিশ্রান্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধের ফলে রক্ষীসেনার দেহমনের অবস্থার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। কোন ক্ষেত্রে তাহা আগে হয়—যেমন ইটালীতে হইয়াছে—আবার কোন ক্ষেত্রে তাহা অনেক পরে হয়। এখন জার্ম্মান সেনার রক্ষা পাইবার একমাত্র সম্ভাবনা আছে রুশ দেশের প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে যুদ্ধের বিরতিতে। যদি এইবারের শীতেও বিগত বৎসরের ন্যায় জার্ম্মানদলকে সোভিয়েটের প্রবল শীত



সেনাধ্যক্ষ আইসেনহাওয়ার ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ পরিদর্শনে রত U.S.O.W.I.)

অভিযানের সম্মুখীন হইতে হয় তবে তাহাদের বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিবে।



লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেল ষ্টিলওয়েল (বামে) ও তাঁহার পিতা লেফ্‌টেন্যাণ্ট-জেনারল ষ্টিলওয়েল। লেঃ জেঃ ষ্টিলওয়েল ভারতবর্ষস্থিত চীন ও মার্কিন-বাহিনীর সর্ব্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ U.S.O.W.I.)

অন্য দিকে সোভিয়েট সেনাকে এক দিকে বিষম ক্ষতি—সৈন্যের এবং যুদ্ধাস্ত্রের—সহ্য করিতে হইতেছে এবং জার্ম্মান সেনাব্যূহ যেভাবে পশ্চাদপসরণ করিতেছে তাহার ফলে পথঘাট-দুর্গ-আশ্রয়হীন বিশাল ধ্বংসলীলাক্ষেত্র পার হইয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে। জার্ম্মান-দলের পিছনে মালপত্র, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা এখনও অটুট, বরঞ্চ তাহারা ক্রমেই সরবরাহ-কেন্দ্রের নিকটতর হওয়ায় তাহাদের ঐ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সরল হইতে পারে। সোভিয়েট সেনার পিছনে এখন ১৫০ হইতে ৩০০ মাইল বিস্তৃত বিধ্বস্ত রণাঙ্গন, যাহার উপর দিয়া সৈন্যচালনা এবং যুদ্ধাস্ত্র, রসদ ইত্যাদির চলাচল এক অতি দুরূহ ব্যাপার। গত শীতের সময় দুই পক্ষের অবস্থা প্রায় বিপরীত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অক্ষশক্তির ভাগ্যচক্রের ফের এই সরবরাহের ব্যবস্থার বিপর্য্যয়ের ফলে অনেকটা ঘটিয়াছিল। অবশ্য সোভিয়েট সেনার অতুল সহ্যশক্তি এবং অদম্য শৌর্য্য ঐরূপ সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষায় অটুট না থাকিলে তাহা ঘটিবার সময় আসিতই না। সুতরাং এইবারকার শীতের পুনর্ব্বার প্রচণ্ড অভিযান যোজনা সোভিয়েট সেনার পক্ষে নিদারুণ কষ্টসাধ্য ও ক্ষতিকর ব্যাপার হইতে পারে। অন্য দিকে দ্বিতীয় প্রান্ত যোজনা প্রকৃতপক্ষে হইলে রুশ সেনার ভার লাঘব হইবে নিশ্চয় এবং তাহা হইলে ঐ প্রকার বিরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া অভিযান চালনার আবশ্যকতাও কিছু কমিতে পারে।

দ্বিতীয় ভাগে ইয়োরোপে দ্বিতীয় সমরপ্রান্ত যোজনার ব্যাপার। ইটালীতে জার্ম্মান দল প্রতিরোধ-চেষ্টায় ব্যস্ত, কিন্তু এখানে যুদ্ধপ্রান্ত অল্প প্রসরের এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রক্ষীদলের অনুকূল। মিত্রপক্ষ এখানে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত বোধ হয়, কেননা তাহাদের অভিযান এখনও ব্যাপক ভাব ধারণ করে নাই। এখানে জার্ম্মান-দলের চেষ্টা তিনমুখী। প্রথমতঃ, মিত্রপক্ষের গতিরোধ, যাহাতে ইটালীর মহাদেশ অঞ্চল রক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার অবসর পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, মিত্রপক্ষকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অভিযান চালনায় বাধ্য করা যাহাতে তাহারা বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়ে এবং তৃতীয়তঃ, মুসোলিনীর দলকে ইটালীতে পুনর্ব্বার যুদ্ধপ্রচেষ্টা গঠনের সময় দেওয়া। বলা বাহুল্য,-এসব কিছুই পশ্চিম-ইয়োরোপে বিস্তৃতভাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় যুদ্ধপ্রান্ত যোজনাব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টা। কেন না সেদিন যতই দূরে থাকে জার্ম্মানীর পক্ষে ততই মঙ্গল।

তাহার পর তৃতীয় ভাগে এশিয়ার এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধক্ষেত্রগুলির ব্যাপার। ইহার প্রথম অংশ এংগ্লো-আমেরিকান যুক্তশক্তির জাপান দমন প্রচেষ্টা এবং দ্বিতীয় অংশ স্বাধীন চীনের জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা। যুক্তপক্ষের পাল্টা আক্রমণের দুই কেন্দ্রের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রস্থ জেনারেল ম্যাকার্থারের অভিযান এখনও প্রাথমিক খণ্ডযুদ্ধের পর্য্যায়েই রহিয়া গিয়াছে। অতি মন্থর গতিতে তাহা এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে চলিতেছে। তবে আক্রমণকারী কোথাও হটে নাই এবং এইরূপ আক্রমণেও জাপান ক্রমেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ভারতীয় কেন্দ্রের অভিযান এখনও লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের অধ্যক্ষতায় গঠিত হইতেছে, লিখিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার সূত্রপাত হয় নাই। ইতিমধ্যে মূল অভিযান কোন্ কেন্দ্র হইতে এবং কাহার অধ্যক্ষতায় চালিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে নানা প্রকার বাদানুবাদ চলিতেছে। স্বাধীন চীন পূর্ব্বেকার মতই অটল দৃঢ়সংকল্পের সহিত স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্যস্ত রহিয়াছে। জাপান অল্পে অল্পে তাহার অবরোধ-শৃঙ্খল সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এখনও সেই অবরোধ লঙ্ঘনের একমাত্র উপায় বোধ হয় আকাশপথ। স্থলপথে সুদূর সোভিয়েট এশিয়ার দিকে রাস্তা আছে এবং অন্য আর এক পথ আছে দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতের উপর দিয়া, কিন্তু সোভিয়েট এখন নিজেই প্রার্থী, এবং অন্য দিকের পথের ব্যবস্থা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই।

আলোচনা

"নিবর্ত্তন ও গোচর্ম্ম"

শ্রীবিমলাচরণ দেব

কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার, এম. এ , পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের "নিবর্ত্তন এবং গোচর্ম্মের ভূমি-পরিমাণ" প্রবন্ধ পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। তাঁহার গবেষণায় অনেক কথা জানিলাম। এক্ষণে ঐ বিষয়ে আমার কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি।

যত দূর বোধ হয়, প্রথমে গোচর্ম্ম অর্থে প্রকৃতই যে পরিমাণ ভূমি একখানি গোচর্ম্ম পাতিলে ঢাকা পড়িত, উহাই ছিল। পরে মানুষের কূটবুদ্ধিতে অন্যরূপ হয়। যেমন, কোন ভূমিদাতা "এক গোচর্ম্ম ভূমি তোমাকে দান করিলাম" বলিলেন। গ্রহীতা করিলেন কি - একখানি গোচর্ম্মকে সরু সরু ফিতার মত কাটিয়া ঐ ফিতা দ্বারা খানিকটা জমি বেষ্টন করিয়া লইলেন। দাতার অভিপ্রেত ভূমির অপেক্ষা যে অনেক বেশী জমি গ্রহীতা এইরূপে লইলেন, বলা বাহুল্য।

এই কূটবুদ্ধিপ্রসূত মাপের উল্লেখ পাই—মহাভারত, ১. ৩০. ২৩ (চিত্র-শালা সংস্করণ)-এর নীলকণ্ঠ টীকাতে "বধ্রী একতন্তকা চর্ম্মরজ্জুঃ...একেন গোচর্ম্মণা কৃতয়া রজ্জ্বা আক্রান্তভূর্গোচর্ম্মমাত্রা", অর্থাৎ চামড়া সরু সরু করিয়া ফিতার মত কাটিলে প্রত্যেক ফিতাকে বধ্রী বলে। একখানি গোচর্ম্মকে ঐরূপ কাটিলে যে ফিতাগুলি হইবে, তদ্দ্বারা বেষ্টিত ভূমি এক "গোচর্ম্ম"। অবশ্য ইহা হইতে "গোচর্ম্ম"-এর পরিমাণ পাওয়া যায় না। কারণ চামড়াখানির আকার ও ফিতাগুলি কিরূপ চওড়া, তাহার উপর নির্ভর করিবে।

এভাবে কূটবুদ্ধি দ্বারা জমি লওয়া হইয়াছিল, অন্ততঃ দুইটি ঘটনার উল্লেখ পাইয়াছি—

(১) যখন টিপ্রাদের রাজা Zawlthliaর নিকট Uithovi একটু জমি চাহিলেন, Zawlthlia বলিলেন, "বেশ, একখানা মোষের চামড়ার মাপে নাও"। Uithovi করিলেন কি—একখানা মোষের চামড়াকে কাটিয়া ঐ রকম ফিতা করিয়া অনেকখানি জমি ঘিরিয়া লইলেন। (Shakespear, "The Lushei-Kuki Clans", ch. V. pp. 98-99)। লুসাইকুকিরা বলে—ইংরেজরা ঐ Uithoviর বংশধর।

(২) Dido (বা Elissa) যখন তাঁহার ভ্রাতা Pygmalionএর রোষ এড়াইবার জন্য Phoenicia হইতে উত্তর-আফ্রিকায় পলাইয়া আসিলেন, তখন সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হইতে জমি কিনিলেন, যতখানি একখানি গরুর চামড়া দিয়া ঢাকা যায় এই বলিয়া। কিন্তু মাপিয়া লইবার সময় চামড়াখানা ঐ রকম ফিতা করিয়া কাটিয়া Dido অনেকখানি জমি দখল করিলেন। এই জমির উপরই কার্থেজ শহর ও তাহার দুর্গ স্থাপন হয়। গরুর চামড়াকে গ্রীক ভাষায় বলে Byrsa, তাই নূতন কেল্লার নাম হইল Byrsa. (Shuckburgh তাঁহার History of Rome-এ এই ব্যুৎপত্তি কাল্পনিক বলিয়াছেন)।

যাহা হউক, এই রকম দুইটি গল্প ও নীলকণ্ঠ হইতে বুঝিতে পারি যে "গোচর্ম্ম" অর্থে শেষে দাঁড়াইয়াছিল, যে পরিমাণ জমি একখানি চামড়া দিয়া ঢাকা দেওয়া যায় তাহার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু ঠিক কতখানি তাহাই জিজ্ঞাস্য।

বৃহস্পতিস্মৃতি (আনন্দাশ্রম প্রেস), শ্লোক ৯—

"সবৃষং গোসহস্রং তু যত্র তিষ্ঠত্যতন্দ্রিতম্।
বালবৎসাপ্রসূতানাং তদ্ গোচর্ম্ম ইতি স্মৃতম্।

জমি অনেকখানি, কিন্তু পরিমাণ ঠিক বুঝা যায় না।

পরিমাণ সম্বন্ধে কতকটা পাই

বৃহস্পতিস্মৃতি (আনন্দাশ্রম প্রেস), শ্লোক ৮—

দশহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব বিস্তারো গোচর্ম্মৈতন্মহাফলম্।

এক্ষণে—

১০ হস্তে — ১ দণ্ড
৩০ দণ্ডে — ১ নিবর্ত্তন (=৩০০ হস্ত)
১০ নিবর্ত্তন × ১০ নিবর্ত্তন, অর্থাৎ ৩,০০০ হস্ত × ৩,০০০ হস্ত = ১ গোচর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, আচারাধ্যায়, শ্লোক ২১০, মিতাক্ষরা, বৃহস্পতিস্মৃতি উদ্ধার করিয়াছেন, একটু পাঠান্তর আছে—"গোচর্ম্মলক্ষণং চ বৃহস্পতিনা দর্শিতম্। সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্ দণ্ডং নিবর্ত্তনম্। দশ তান্যেব গোচর্ম্ম দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে"।

অর্থাৎ —

৭ হস্তে — ১ দণ্ড
৩০ দণ্ডে — ১ নিবর্ত্তন (=২১০ হস্ত)
১০ নিবর্ত্তন × ১০ নিবর্ত্তন, অর্থাৎ ২,১০০ হস্ত × ২,১০০ হস্ত = ১ গোচর্ম্ম

আবার—প্রাণতোষণীতন্ত্র (বসুমতী সংস্করণ) পৃ. ১০৬, (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)—"নিবর্ত্তনপ্রমাণং তু সিদ্ধান্তশিরোমণৌ লীলাবত্যাভিধে পাটীগণিতে—তথা করাণাং দশকেন বংশঃ, নিবর্ত্তনং বিংশতিবংশসংখ্যৈঃ। ক্ষেত্রং চতুর্ভিশ্চ ভুজৈর্নিবদ্ধমিতি। স্বরোদয়টীকাকারস্ত—সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্ দণ্ডো নিবর্ত্তনমিত্যাহ। তদুভয়মতং প্রামাণ্যম্।"

অর্থাৎ, লীলাবতী সিদ্ধান্তশিরোমণি মতে—

১০ করে — ১ বংশ,
২০ বংশে — ১ নিবর্ত্তন

এখানেও সম্ভবতঃ ১০ × ১০ নিবর্ত্তনে ১ গোচর্ম্ম।

তাহা হইলে ২,০০০ হস্ত × ২,০০০ হস্ত = ১ গোচর্ম্ম।

স্বরোদয়টীকাকার ও উপরোক্ত মিতাক্ষরাধৃত বৃহস্পতি একই।

মোট কথা, সমচতুরস্রের প্রত্যেক ভুজ ১০ নিবর্ত্তন হইলে তাহাতে ১ গোচর্ম্ম হয়।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Jolly & Schmidt) ২. ২০. ৬-২৮ পর্য্যন্ত পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে সমস্তই দৈর্ঘ্যের কথা। Square areaর কথা মোটেই নহে এবং এ স্থলে গোচর্ম্মের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। কাজেই আমার মনে হয় নিবর্ত্তন দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক, ২৪০ হস্ত দীর্ঘ।

তাহা হইলে—

সিদ্ধান্ত শিরোমণি, লীলাবতী মতে	২০০ হস্তে	১ নিবর্ত্তন
মিতাক্ষরাধৃত বৃহস্পতি মতে	২১০ „	„
স্বরোদয়টীকাকার মতে	„	„
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র মতে	২৪০ „	„
বৃহস্পতিস্মৃতি (আনন্দাশ্রম) মতে	৩০০ „	„

তাহা হইলে দেখিতেছি নিবর্ত্তনের দৈর্ঘ্য ২০০ হস্ত হইতে ৩০০ হস্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে। হয়ত দেশাচার এই প্রভেদের কারণ।

এক্ষণে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র মতে ২৪০×২৪০ বর্গহাত=১ নিবর্ত্তন, এবং আরও বলিয়াছেন যে "কৌটিল্য স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও টীকাকার বলিয়াছেন নিবর্ত্তন ক্ষেত্রফল পরিমাপের সংজ্ঞা।" অধ্যাপক মহাশয় টীকাকারের নাম দেন নাই বা তাঁহার উক্তি উদ্ধার করেন নাই। কাজেই এ বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। তবে "নিবর্ত্তন" যে Square area অর্থেও ব্যবহৃত হইত, ইহা পাওয়া যায় (Bhandarkar, "Early History of the Dekkan", Sect. IV., p.15)। বলিতে পারি না, হয়ত ১ নিবর্ত্তন লম্বা, ১ নিবর্ত্তন চওড়া ভূমি ১ বর্গ নিবর্ত্তন, তাহাকে সংক্ষেপে কখনও কখনও ১ নিবর্ত্তন বলা হইত। তজ্জন্য বিশেষ পরিভাষা ছিল না। যেমন, ইংরেজিতে ১ স্কোয়ার ফুট, বা মাইল বলে।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে এবং উপরি উদ্ধৃত স্মৃতির বচনসমূহে যে স্থলেই নিবর্ত্তনের কথা আছে বেশ বুঝা যায় যে, সে সমস্ত স্থলেই "দৈর্ঘ্য" সম্বন্ধে কথা হইতেছে, Square area সম্বন্ধে মোটেই নহে। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের এই স্থলে শ্রীযুক্ত শাম শাস্ত্রী তাঁহার ইংরেজী অনুবাদে (পৃষ্ঠা ১৩৩) বন্ধনী মধ্যে "Square measure" দিয়া ঐ পৃষ্ঠাতেই পাদটীকায় বলিয়াছেন—"This is used in measuring squares—COM." ঠিকই আমি যাহা বলিতেছি। অন্ততঃ এখানে, "নিবর্ত্তন" Square measure হইতে পারে না। "Square measure"-এর অনুরূপ বা সমর্থক কোনও কথা সংস্কৃতমূলে নাই। মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদের মূলে বন্ধনীস্থ "Square measure" যত গণ্ডগোলের কারণ।

তাহা ছাড়া, "দশ তাম্বেব বিস্তারো" ইহার সার্থকতা একমাত্র দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেই হয়।

আরও একটি কথা—৩ রজ্জুতে ১ নিবর্ত্তন। রজ্জু দৈর্ঘ্যের মাপ। ১ রজ্জু ১০ দণ্ডে হয়। ৮ হস্তে এক দণ্ড, তাহা হইলে ৮০ হস্তে এক রজ্জু। আমাদের দেশে ৮০ হাতে ১ রশি। "রশি" ও "রজ্জু" এক দেখিতেছি। উভয়ই দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক। এখানেও Square measure পাইতেছি না।

এ অবস্থায় আমার নিবেদন, "নিবর্ত্তন" Square area নহে, দৈর্ঘ্য-জ্ঞাপক মাত্র। Square area গোচর্ম মাপিতে উহা আবশ্যক। উহা ২০০ হইতে ৩০০ হস্ত পর্য্যন্ত স্থানবিশেষে হইতে পারে। ১০ নিবর্ত্তন×১০ নিবর্ত্তন=১ গোচর্ম।

অতঃপর, নর্মান্ বিজয়ের পর ইংলণ্ডে জমি পরিমাপ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি। সে সময়ে ইংলণ্ডে একটি পরিমাপ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নাম Hide যাহাতে "গোচর্ম", Byrsa মনে পড়ে। ইহা যে ঠিক কতখানি জমি, তাহা জানা যায় না। তবে কতকগুলি charter হইতে অনুমান হয় যে, Hide-এ ১২০ acre (অর্থাৎ আমাদের ৩৬০ বিঘা) হইত। (Palgrave, "Dictionary of Political Economy.")।

দেশ-বিদেশের কথা

বঙ্গের মন্বন্তরে নানা স্থানে সাহায্য-প্রচেষ্টা

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গের সর্ব্বত্র ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। কলিকাতায় ও বিভিন্ন জেলায় বিস্তর নর-নারী শিশুর অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সংবাদ সরকারী ভাবেও প্রকাশিত হইতেছে। দীর্ঘ দিনের অনশন ও অর্দ্ধাশনের ফলে মানুষ কঙ্কালসার ও ব্যধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। নিম্নের চিত্রদৃষ্টে ইহা বেশ বুঝা যাইবে। বর্ত্তমান দুর্গতি অপনোদনে যাঁহারা যতটুকু সাহায্য করেন তাহাই কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণীয় ও স্মরণীয়। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিব।

(১)

উত্তর-বোম্বাই দুর্গোৎসব সমিতির পক্ষে বাংলার দুঃস্থগণের সাহায্য-প্রচেষ্টা

এই বৎসর উত্তর-বোম্বাই দুর্গোৎসব সমিতি প্রায় দে[illegible] হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া বাংলার দুঃস্থদের জন্য পাঠাইয়া[illegible]ছেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সমিতির এই কার্য্যে সাহায্য করিয়া[illegible]ছেন। এমন কি ছোট ছোট শিশুও তাহার এক আনা, দু-আ[illegible] যাহা ছিল তাহা সাহায্যের জন্য দান করিয়াছে। যাঁহারা এ[illegible] চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণে[illegible] মিত্র, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেশলোভন সেন, ভূপেশলোভ[illegible] সেন ও জগদীশচন্দ্র মৈত্র মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।



অনশনক্লিষ্ট মাতা-পুত্র



অনশনক্লিষ্ট মাতা ও শিশু

(২)

ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন

কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেবাকেন্দ্রে নিরাশ্রয় দুর্গত-দিগের জন্য একটি সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। অদ্যাবধি প্রায় চারি শতাধিক নর-নারী ও শিশুকে নূতন ও পুরাতন বস্ত্র ও পরিচ্ছদ বিতরণ করা হইয়াছে। গত তিন মাসে অন্নসত্র হইতে ৩২,৬২৮ ও দুগ্ধসত্র হইতে ২৭,০০০ নর-নারী ও শিশুকে আহার্য্য ও পথ্য প্রদান করা হইয়াছে। ঐ সঙ্গে রুগ্নদের ঔষধ ও প্রদান করা হয়। মফঃস্বলে ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত মধুসূদনপুর কেন্দ্র হইতে ১৬টি গ্রামে বিভিন্ন প্রকারের সেবাকার্য্য চলিতেছে। দুর্গতরা যাহাতে পুনরায় স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। হাওড়া জেলার অন্তর্গত দেউলটি গ্রামে একটি শস্যবিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ঐ স্থানে কিছু বস্ত্রও বিতরণ করা হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় তিনটি কেন্দ্রে সেবাকার্য্য চলিতেছে। মেদিনীপুর সদরে একটি অন্নসত্র, তমলুকে বস্ত্র-বিতরণ কেন্দ্র এবং কাঁথিতে সুলভ শস্যভাণ্ডার ও নিরাশ্রয় দুর্গতদের একটি আবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রের সেবাকার্য্যকে চালু রাখিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

(৩)

স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিতেছেন,—

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা চরমে দাঁড়াইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকল দেশেই সমাজের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। ইহাদের বিপর্য্যয় ঘটিলে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি যুগ-যুগান্তর পিছাইয়া পড়িবে। এই জন্য আমরা সংকল্প করিয়াছি যে, দুঃস্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক এক শত বালক এবং দশ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স্কা এক শত কুমারী ও বিধবা স্ত্রীলোকের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব। ক্রমশঃ এই সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আছে। তাহারা কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরে ধামুয়া (২৪ পরগণা) রেল-ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে জনসেবামণ্ডলীর আশ্রমে বাস করিবে; তাহাদের শিক্ষার জন্য সেখানে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে একটি শিক্ষয়িত্রী ট্রেনিং ক্লাসও খোলা হইবে। ইহা ছাড়া নানা প্রকার শিল্প শিক্ষারও আয়োজন করা হইতেছে। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৪)

দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডার

উত্তর-কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার গত ৮ই আগষ্ট হইতে প্রত্যহ দুই হাজার ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতেছেন। ইহার অর্দ্ধেক ব্যয়ভার মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি বহন করিতেছেন। ভাণ্ডার প্রত্যহ পাঁচ হাজার শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইতেছেন। ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, লিলি বিস্কুট কোম্পানি ও শ্রীযুত জি. ডি. স্বাইকা ইহার আংশিক ব্যয় বহন করিতেছেন। ইহা ছাড়া রোগীদের চিকিৎসা ও পথ্যাদি প্রদানেরও তাঁহারা ব্যবস্থা করিতেছেন। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির সহায়তায় তাঁহারা চারি হাজার দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছেন। গৃহহীনদের আশ্রয় দানের জন্য সাময়িক চালাঘরও নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। দুর্গত সেবায় দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের উদ্যম প্রশংসনীয়।

"লীলা প্রাইজ" ও "লীলা লেকচারশিপ"

শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে সাড়ে সাত হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। এই অর্থের সুদ হইতে এক বৎসর এক শত টাকা মূল্যের "লীলা প্রাইজ" এবং পর বৎসর চারিশত টাকা বৃত্তির একটি "লীলা লেকচারশিপ" প্রবর্ত্তিত হইবে। প্রতি দুই বৎসর মধ্যে বাংলা-সাহিত্যে যে মহিলার পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিবেন তাঁহাকে এই "লীলা প্রাইজ" দেওয়া হইবে। এক বৎসর অন্তর বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিককে "লীলা লেকচারার" নিযুক্ত করা হইবে। এই লেকচারার নিয়োগ করিবার সময় মহিলা সাহিত্যিকের দাবী অগ্রে বিবেচনা করিবার শর্ত্ত দাতা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।



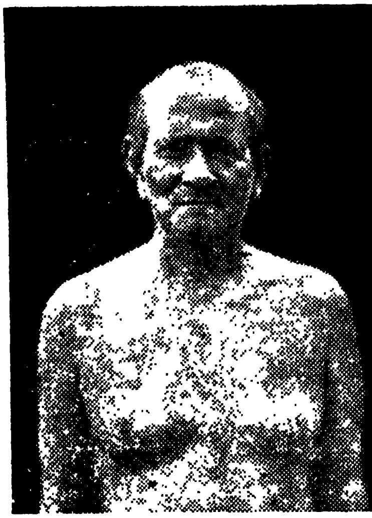
লীলা দেবী

রণেন্দ্রবাবু কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে কয়েক শত টাকার সুদে একটি বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পরলোকে আশুতোষ দেব

গত ১৪ই অক্টোবর পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা আশুতোষ দেব মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। আশুতোষ দেব ১৮৬৬ সালে হাওড়া জেলার পাতিহাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি পিতার পুস্তক ব্যবসায়ে যোগদান করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও সততার বলে তিনি নিজ ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন ও দেব-সাহিত্য-কুটীর, এ. টি. দেব, পি. সি. মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, বরদা টাইপ ফাউণ্ড্রী ও দেব লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের পুস্তকের সহিত বাঙালী মাত্রেই পরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি

নিরহঙ্কার ও সদাশয় প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। ১লা অক্টোবর হইতে তিনি নিজ গ্রামবাসীদের



আশুতোষ দেব

অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির সহায়তায় পাতিহাল গ্রামে দৈনিক আট শত লোককে বিনামূল্যে খিচুড়ী খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সত্তর বৎসর পূর্ত্তি উৎসব

আগামী ২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী ১৯৪৪) 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর (ঠাকুর) সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাঁহার গুণমুগ্ধগণ আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা, সমাজ-সেবা ও জীবন-কথা একটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিবার পরিকল্পনা হইয়াছে। এই উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা বঙ্গবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ভ্রম-সংশোধন :—গত কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম রঙীন চিত্রখানির নাম 'মাতৃকা' স্থলে 'চণ্ডালিকা' পড়িতে হইবে।

মোহিনী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

হে মোহিনী মায়াবিনী, আদিকালে সাগরমন্থনে
নারীরূপে ধরণীতে কি অমিয় করিলে বর্ষণ,
মহাবিজ্ঞানের মাঝে কবিতার রসমূর্ত্তি ধরি,
কী রহস্যে দেব আর অসুরেরে দিলে দরশন।

কামনার নাগপাশে দেবাসুরে চলিছে মন্থন,
ঊর্দ্ধমুখে উঠে সুধা ঝ'রে পড়ে নিম্নে হলাহল ;
ধরণী দহিবে বলি হে কল্যাণী তোরি ভোলা শিব
ঘোষিয়া তোমারি জয় নিজ কণ্ঠে ধরিল গরল !

সেই হ'তে নিত্য তুমি আছ দেবী সুধাভাণ্ড হাতে
সংসারের সিন্ধুতটে মহিমার নারী মূর্ত্তি ধরি',
মানবের মনোরাজ্যে স্বর্গ রচি দেবতার দল,
মৃত্যুরে করিল জয় তব ভাণ্ডসুধা পান করি।

সেই হ'তে শিবরূপে কণ্ঠে মোরা বহি বিষ-ক্ষুধা,
জুড়াতে মোদের দাহ তুমি দেবী বহিতেছ সুধা।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



সাধনান্তে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫০

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

এশিয়াবাসীর ভবিষ্যৎ ও জেনারেল স্মাট্‌স

দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বনামধন্য জেনারেল স্মাট্‌স লণ্ডনের এম্পায়ার পার্লামেণ্টারি এসোসিয়েশনের সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন পুস্তিকাকারে তাহা বিতরণ করা হইয়াছে। তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পর পৃথিবীতে তিনটি মাত্র শক্তি থাকিবে—আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া। ফ্রান্স মরিয়াছে, ইতালি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, জার্ম্মেনীর অস্তিত্ব লোপ পাইবে এবং জাপানকেও পঙ্গু করিয়া তাহার নিজের দ্বীপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। অতঃপর পৃথিবী শাসন ও ভোগ করিবে তিনটি শক্তিশালী দেশ—আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতি স্মাট্‌স সাহেবের মতে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিবে। ব্রিটেনের জনসাধারণ দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর সকল কথায় সায় দিতে পারে নাই; তাঁহার উক্তির মূলে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সায় থাকিবে এ সন্দেহও অনেকের মনে জাগিয়াছিল। পার্লামেণ্টে কথাটা উঠিলে এটলী সাহেব জানাইয়াছেন যে জেনারেল স্মাট্‌স যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সরকারী মত নহে। জেনারেল স্মাট্‌সের বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"নূতন যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহার নেতৃত্ব ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া এই ত্রিশক্তির হাতে যাহাতে থাকে তৎপ্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সময়েই নেতৃত্ব এই বিরাট ত্রিশক্তির হাতে রাখিতেই হইবে। ইহারাই পৃথিবীর নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য দায়ী থাকিবে। এই যুদ্ধের পর ইউরোপে তিনটি বড় শক্তির চিহ্নমাত্র থাকিবে না। ইউরোপখণ্ডের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। ফ্রান্স মরিয়াছে, আর যদি সে কখনও উঠিতে চাহে সে জন্য বহু সময় ও পরিশ্রম দরকার হইবে। তাহাকে হয়ত আমরা বড় শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু ইহাতে তাহার কোন লাভ হইবে না। ফ্রান্স গিয়াছে, আমাদের জীবদ্দশায়, এমন কি হয়ত তাহারও কিছুদিন পর পর্য্যন্ত তাহার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইতালির চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে, হয়ত ভবিষ্যতে কোন কালেও আর সে শক্তিশালী দেশ রূপে পরিচয় দিতে পারিবে না। জার্ম্মেনীর অস্তিত্বও লোপ পাইবে, হয়ত পুরানো জার্ম্মেনীর অভ্যুদয় আর কখনও ঘটিবে না। সঠিক কিছু বলা কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, এই যুদ্ধের পর বহুদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের মানচিত্রে জার্ম্মেনীর চিহ্ন থাকিবে না।

"অতএব অবশিষ্ট রহিল বৃটেন ও রাশিয়া। ইউরোপে রাশিয়া এক নূতন দৈত্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আর অপর সকলের পরাজয়ের পর ইউরোপে তাহার প্রাধান্য একচ্ছত্র হইয়াছে; শুধু এই কারণেই তাহার শক্তি অপরিমিত রূপে বাড়িবে না, জাপসাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব্বদিকেও তাহার আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না।

"ইতিহাসে কোন জাতি যে সম্মান ও গৌরব লাভ করে নাই ব্রিটেন তাহার অধিকারী হইবে, কিন্তু অর্থনীতিক্ষেত্রে তাহাকে দারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে।

"ইউরোপের বাহিরে আমেরিকা হইবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তিশালী দেশ। আমেরিকা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে গভীরতর মিলনের কামনা অনেকেই করিয়া থাকেন।

আমি কিন্তু এই মিলন অপেক্ষা উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার অধিকতর পক্ষপাতী। আমার মতে ইহারই উপর ভবিষ্যৎ মানবজাতির সকল আশা নির্ভর করে। ব্রিটেনকে এই ত্রিশক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াই থাকিতে হইবে। বিপুল সম্পদ ও শক্তির অধিকারী রাশিয়া ও আমেরিকা হইবে তাহার অংশীদার।

"নিরপেক্ষতা নীতি এ যুগে অচল। নিরপেক্ষ দেশগুলি বুঝিয়াছে ইউরোপে কোন-না-কোন শক্তি প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। তাহাদের বুঝিতেই হইবে যে, এই ত্রিশক্তির সহিত তাহারা যোগ দিতে বাধ্য। ব্রিটেনের জীবনযাত্রা তাহাদের বাঁচিবার উপায় এবং ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ তাহাদেরও ভবিষ্যৎ।

"সহস্র বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্য গঠনের যে মিশনরী-সুলভ চেষ্টা চলিয়াছে তার চেয়ে ভাল আর কিছু হইতে পারে না। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট দেশগুলিকে ভাঙ্গিয়া বৃহত্তর দেশে পরিণত করিয়া চেহারাটা একটু ভদ্রগোছের করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে কোথাও এশিয়ার নামগন্ধ নাই, ভারতবর্ষের তো নাই-ই। আফ্রিকার দেশসমূহের জন্য কিঞ্চিৎ অধিকার প্রাপ্তির ওকালতি অবশ্য আছে! ভারতবর্ষের কথা এই ব্যক্তির মুখে শোনা যাইবে না, কারণ গত মহাযুদ্ধে এবং এই যুদ্ধে দুই বার দক্ষিণ-আফ্রিকার বিপন্ন স্বাধীনতা ভারতীয় সৈন্যের বাহুবলে রক্ষা পাইয়াছে। গত যুদ্ধে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্যেরা যে বীরত্ব ও ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা উহাকে রক্ষা করিয়াছিল, সমগ্র যুদ্ধের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধেও উত্তর-আফ্রিকায় রোমেলের বাহিনীকে মিশরের মাটি হইতে টিউনিসিয়া পার করিয়া দিয়াছিল ভারতীয় সৈন্য। পূর্ব-আফ্রিকায় আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ও ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ডের যুদ্ধেও ভারতীয় সৈন্যেরাই বিজয়-গৌরব অর্জন করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকাকে বিপন্মুক্ত করিয়াছে। মিশর রোমেলের বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইলে দক্ষিণ-আফ্রিকার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইতে বেশী দেরি হইত না। ফন আর্নিম এবং আওস্তার ডিউক বন্দী হইয়াছিলেন ভারতীয় সৈন্যের হাতে, জেনারেল স্মাট্‌সের বাহিনীর হাতে নয়। এই ব্যক্তি দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে তাহাকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করিলেও অন্যায় হইবে না। পৃথিবীর প্রকৃত মঙ্গল চিন্তা করিবার সামর্থ্য ইহাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের থাকে না, বাহুবলে বলীয়ান্ যাহারা তাহাদের সহিত ভিড়িয়া অস্ত্রবলে পৃথিবী শাসনের স্বপ্ন দেখাই ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

ব্রিটিশ কূটনীতির একটা ধারা এই যে, তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তির মুখে প্রথমে উচ্চারিত হয়। এদেশে বিরোধী দল এই প্রকার উক্তিতে আপত্তি করিলে সরকারের তরফ হইতে ভাষা ভাষা রকমে উহা অস্বীকার করা হয়। পরে দেখা যায় প্রথম উক্তিই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। জেনারেল স্মাট্‌স যে-অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন অন্ততঃ এশিয়ার বেলায় তাহা সত্যে পরিণত হইবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

কায়রোতে চিয়াং-চার্চিল-রুজভেল্ট বৈঠক

কায়রোতে চিয়াং-চার্চিল-রুজভেল্ট বৈঠকে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জাপ-কবলিত দেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও প্রস্তাব উঠিয়াছে। বৈঠকের পর নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রটি প্রচারিত হইয়াছে:

"বিভিন্ন সামরিক প্রতিনিধি দল জাপানের বিরুদ্ধে কি ভাবে সমর পরিচালনা করা হইবে তৎসম্পর্কে একমত হইয়াছেন।

"মিত্ররাষ্ট্রত্রয় জাপানের বিরুদ্ধে জল, স্থল ও আকাশে নিরবচ্ছিন্ন চাপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই চাপের তীব্রতা ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানের পররাষ্ট্র গ্রীস-প্রবৃত্তি দমন ও তাহার জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়ার জন্যই এই তিন রাষ্ট্র যুদ্ধ চালাইতেছে। তাহারা নিজেদের কোন লাভ চাহে না এবং নিজেদের রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও তাহাদের নাই।

"তাহাদের লক্ষ্য হইল, ১৯১৪ সালের যুদ্ধের আরম্ভ হইতে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের যে সমস্ত দ্বীপ দখল করিয়াছে সেগুলি তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া এবং মাঞ্চুরিয়া, ফর্মোসা, পেসকাদ্রেস প্রভৃতি চীনের যে সমস্ত স্থান জাপান কাড়িয়া লইয়াছে তাহা চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া। জাপান বল প্রয়োগ করিয়া এবং লোভবশতঃ অন্য যে সমস্ত স্থান দখল করিয়াছে সেখান হইতেই জাপানকে বিতাড়িত করা হইবে। পদানত কোরিয়ার কথাও স্মরণ রাখা হইয়াছে এবং যাহাতে যথাসময়ে কোরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। জাপানকে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করাইবার জন্য যে সুদীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন, জাপানের সহিত যুদ্ধরত সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গ সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা চালাইয়া যাইবেন।"

এই ঘোষণাপত্রের কোন অংশে অধিকৃত দেশসমূহকে স্বাধীনতা দানের কথা নাই। মাঞ্চুরিয়া ও ফর্মোসা চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে এবং ঘোষণা

পাঠে ডাচ-গবর্নমেণ্টকে তুষ্ট হইতে দেখিয়া মনে হয় ঈষ্ট ইণ্ডিজ তাঁহাদিগকে ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হইয়াছে। আমেরিকান সিনেটের সামরিক কমীটির চেয়ারম্যান রোণাল্ডসও বলিয়াছেন যে ঈষ্ট ইণ্ডিজ ডাচ গবর্নমেণ্টকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। হংকং সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকিলেও রোণাল্ডস বলেন যে চীনকে হংকং প্রত্যর্পণ করা হইবে ঘোষণাপত্র হইতে ইহাই নাকি বুঝা যায়। কোরিয়ার উপর ম্যাণ্ডেটের ন্যায় একটা কিছু ব্যাপার বসিবে। কায়রো ঘোষণায় ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে বর্তমান যুদ্ধে এশিয়াবাসী ধনপ্রাণ প্রচুর দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নতির কোন আশা নাই। ব্রিটিশ ডাচ ও ফরাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী গবর্নমেণ্ট স্ব-স্ব পুনরুদ্ধার করিয়া লইবেন এবং এশিয়ার কামধেনু দোহনকার্য্য পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে। জাপানকে কোণঠাসা করিয়া রাখা হইবে এবং গত যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ যে-সব দ্বীপ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল এবার সেগুলি কাড়িয়া লইয়া অপর কাহারও রক্ষণাবেক্ষণে তাহাদিগকে রাখা হইবে। অষ্ট্রেলিয়া তো ইতিমধ্যেই দরখাস্ত পেশ করিয়া রাখিয়াছে।

—

তুরস্কের নিরপেক্ষতা

কায়রোতে তুরস্কের সভাপতি ইনোনু উপস্থিত ছিলেন। চার্চিল ও রুজভেল্টের সহিত তাঁহার আলোচনাও হইয়াছে। সম্পূর্ণ সম্মানের সহিত যে নিরপেক্ষতা সে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা অটুট থাকিবে বলিয়া তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন। নিরপেক্ষতা এ যুগে অচল, ত্রিশক্তির পক্ষপুটচ্ছায়া হইতে এখনও যাহারা দূরে রহিবে মৃত্যু ছাড়া তাহাদের গতি নাই—জেনারেল স্মাট্‌সের এই সব ব্যঙ্গোক্তি তুরস্ককে উত্তেজিত করিতে পারে নাই; কৌশলপূর্ণ সংবাদ প্রচারের দ্বারা তাহাকে চোরাবালির মধ্যে টানিয়া আনা সম্ভব হয় নাই। এশিয়ার মধ্যে তুরস্কই শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ। বহু দিক দিয়া তুরস্ক আমেরিকা অপেক্ষা অধিক প্রগতিশীল। আমেরিকা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিলেও নিগ্রো রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি কতকগুলি জাতিগত সমস্যায় গণতন্ত্রের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। তুরস্ক এই শ্রেণীর ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক দেশটিকে যুদ্ধে জড়িত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবার স্বার্থ ও ইচ্ছা যাহারই থাকুক না কেন, তাহাতে ক্ষতি হইত সমগ্র এশিয়ার।

—

ষ্টালিন-রুজভেল্ট-চার্চিল বৈঠক

ব্রিটিশ কূটনীতির আর এক পরাজয় ঘটিয়াছে তেহরানে। ষ্টালিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই ইংরেজের পক্ষে ইহা অসুবিধাজনক। ষ্টালিনের সহিত সাক্ষাতের জন্য রুজভেল্ট ও চার্চিলের সহিত চিয়াংও রওনা হইয়াছেন এই সংবাদ বিজ্ঞপিত হইবার পরও দেখা গিয়াছে ষ্টালিন-চিয়াং সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। ইউরোপের যুদ্ধের সহিত চিয়াঙের কোন সম্পর্ক নাই, ষ্টালিনের সহিত বৈঠকে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতে পারে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের মনোভাব সংশয়পূর্ণ করিয়া তোলা। জাপানের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারিলেই ব্রিটিশ কূটনীতির ষোলকলা পূর্ণ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু ষ্টালিনের বুদ্ধিকৌশলে আপাততঃ সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল বলিয়াই বোধ হইতেছে।

বলকানে ও বালটিক উপকূলে রাশিয়ার স্বার্থ আছে। পোলাণ্ডের সহিতও তাহার সম্বন্ধ সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়। তেহরান বৈঠকের পর প্রকাশিত বিবৃতিতে এই সব সমস্যার একটিরও উল্লেখ নাই। ইরানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব আছে কিন্তু ভারতবর্ষ বা এশিয়ার নাম মাত্র নাই। চিয়াং কাই-শেক যেমন শুধু চীনের ভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তেমনি রাশিয়ার নিজস্ব সমস্যা ভিন্ন বিশ্ববাসীর মঙ্গল চিন্তার কোন পরিচয়ও ষ্টালিনের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। বর্তমান যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হইতে এশিয়া ও আফ্রিকা মুক্তি পাইবে, স্বাধীন সমাজ গঠন করিতে পারিবে, পরাধীনতার অভিশাপ পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইবে, রুজভেল্ট-চার্চিল-ষ্টালিনের ঘোষণার পর এ আশা পোষণ করা কঠিন। আটলাণ্টিক চার্টার বলিতে বুঝায় ইউরোপের স্বাধীনতা, সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্য-সমিতির (U.N.R.R.A.) অর্থ ইউরোপে সাহায্যদান, ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষে নয়, যদিও ভারতবাসীর নিকট হইতে চাঁদা আদায়ে আপত্তি নাই। এক ত্রিশক্তির স্থলে আর এক ত্রিশক্তির অভ্যুদয়ে যুগপরিবর্ত্তনের আভাস এশিয়াবাসী, বিশেষতঃ ভারতবাসী আজও পায় নাই।

—

বাঙালী সমরবিমুখ কেন ?

বাঙালী দুর্বল ও ভীরু, যুদ্ধে যোগদানের উপযুক্ত সাহস শক্তি ও শৃঙ্খলাবোধ তাহার নাই—এই কথাটা নানা ক্ষেত্রে নানা সূত্রে বাঙালীকে শোনানো হয়, বিশ্ববাসীকেও জানানো হয়। ভারতবর্ষের একটি বিলাতী পুস্তক-প্রকাশক কয়েক বৎসর যাবৎ সস্তা দামে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য-

সম্বলিত যে-সকল পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন, উহাদের কোন কোনটির দ্বারাও এই শ্রেণীর অসত্য প্রচার পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছে। অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়াম্‌স্‌ 'ভারতবর্ষ' নামক পুস্তিকাটিতে দেখাইয়াছেন যে ভারত-বাসীদের মধ্যে সমরকুশল ও সমরবিমুখ এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণী আছে। ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য যাহা কিছু সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ হয় সবই ঐ পূর্বোক্ত শ্রেণী হইতে। বাংলা দেশে ৫ কোটির‌ও অধিক লোক থাকা সত্ত্বেও সেখান হইতে কেহ সৈন্যদলে যোগদান করিতে চায় না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি খাঁটি সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; "সমরকুশল ও সমরবিমুখ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সুস্পষ্ট একটি ভেদরেখা আছে। সমরকুশল জাতিগুলির মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ বড় একটা দেখা যায় না, বিচারবুদ্ধিও তাহাদের থাকে না।" অপরের সাম্রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানের অসার্থকতা বুঝিয়া বাঙালী সৈন্যদল হইতে দূরে থাকিতে চাহে—উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেব ইহা সত্য মনে করিলেও ইহা সুবিদিত যে বাঙালী যুবক সামরিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাইলেই তাহা গ্রহণ করিয়াছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের টেরিটোরিয়াল ফোর্সে প্রবেশ করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাই হইয়াছে, পাইলট বা সামরিক-শিক্ষা কলেজের জন্য ছাত্র আহ্বান করিয়া বাংলা দেশ হইতে যথোপযুক্ত সাড়া মিলে নাই—সামরিক কর্তৃপক্ষকে কখনও একথা বলিতে শুনি নাই। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সৈন্যদলে যোগদানের অন্তরায় নয়, ইংরেজ, আমেরিকান ও চীনা সৈন্য ইহার প্রমাণ।

সত্য বটে, বর্তমান বাঙালীর মধ্যে ভীরু ও দুর্বলের সংখ্যা বড় বেশী যদিচ জাতি হিসাবে বাঙালী ভীরু ও দুর্বল নয়। আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাঙালীর আছে, সামরিক শক্তিতে বাঙালী পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন ছিল না ইহা আজ কল্পনার কাহিনী নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কাশীপ্রসাদ জয়সোবাল ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে অধ্যাপক হেম-চন্দ্র রায়চৌধুরী এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের লিখিত অধ্যায়গুলি বাঙালীর সামরিক শক্তির প্রমাণ বহন করিতেছে। বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার বঙ্গ মগধের শৌর্য ও সামরিক বলের সংবাদ পাইয়া বিপাশা অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। ইংরেজ জাতির পরিচয় তখনও ধরাপৃষ্ঠে নামিয়া আসে নাই ; বঙ্গ মগধের অভিন্নতাও তাই অটুটই ছিল।

পাঠান ও মোগল আমলে বাংলায় যত অভিযান হইয়াছে বাঙালী তার কোনটিকেই নীরবে মানিয়া লয় নাই। প্রত্যেক অভিযানকারী বাঙালীর নিকট প্রবল বাধা পাইয়াছে, বাংলায় রাজ্য-বিস্তার করিয়াও কেহ নিশ্চিন্ত আরামে রাজ্যভোগ করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হইতেই সর্বপ্রথম সুকৌশলে বাঙালীকে ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র ও সর্বতোভাবে গবর্ন্মেণ্টের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। অনেকখানি সাফল্যও তাঁহারা অর্জন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে বাঙালী যে মনোভাব দেখাইয়াছে তাহাকে অন্ততঃ ভীরুতা আখ্যা দেওয়া চলে না।

বাঙালী বালক পর্য্যন্ত শারীর-চর্চার অপরাধে গোয়েন্দা পুলিসের নেক-নজরে উদ্ব্যস্ত হইয়াছে, অভিভাবকদের লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইয়াছে—এ কাহিনী ইতিহাসে লেখা নাই বটে, কিন্তু এণ্ডার্সনী বাংলার ইহা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। জাতীয় জীবনের এই মহা সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া বাঙালী সবিস্ময়ে ভাবে—আড়াই হাজার বৎসরের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস দেড়শত বৎসরের মধ্যে লেপিয়া মুছিয়া যাহারা একাকার করিয়া দিল, কৌশলে হাতের লাঠি যাহারা সরাইয়া লইল তাহারাই আজ উচ্চরবে ঘোষণা করে বাঙালী জাতি-হিসাবে সমরবিমুখ!

জাতি-হিসাবে বাঙালী যদি সমরবিমুখই হইবে তাহা হইলে বাংলায় লাঠি ও রিভলবারের উপর এত প্রখর দৃষ্টি কেন?

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কর্ম-তৎপরতা সুরু হইয়া গিয়াছে। কমীটি অনেকগুলি আগে হইতেই করিয়া রাখা হইয়াছে, এবার উহাদের মধ্যে কোন কোনটি কাজ আরম্ভ করিয়াছে। গত ২১শে ও ২২শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য ও শিল্প পুনর্গঠনের নীতি নির্ধারণ কমীটির অধিবেশন হইয়াছে। সভাপতিত্ব করিয়াছেন সর্ মহম্মদ আজিজুল হক। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা সরকারী মহলে চলিতেছে তাহার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না; ভারতবাসীকে যুদ্ধের পর নূতন করিয়া শৃঙ্খলিত করিবার জন্য কোন্ কোন্ অস্ত্রে শান দেওয়া সুরু হইয়া গিয়াছে সঠিকভাবে তাহা বুঝিবার উপায়ও থাকে না। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কয় ইঞ্চি অগ্রসর হইল, হিটলার ও তোজো অতঃপর কে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন ইহা লইয়াই সংবাদপত্র হইতে পাঠক পর্য্যন্ত

সকলেই ব্যস্ত, অলক্ষিতে ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র সংস্থানের পথের উপর আবার কোন্ জগদ্দল পাথর নামিয়া আসিতেছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় কাহারও নাই।

পুনর্গঠনের নমুনার কতকটা আঁচ সর্ মহম্মদ আজিজুল হকের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে:

আমার মনে হয় বর্ত্তমানে কলকব্জা বদলাইবার সমস্যা কারখানা প্রসারের সমস্যার সামিল। এ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নীতিগত প্রশ্নের সহিত জড়িত। কি ধরণের নূতন কলকব্জার দরকার হইবে তাহার নির্ণয় নির্ভর করে নূতন যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান চাই তাহার কর্মপদ্ধতির ব্যাপকতার উপর। নূতন ব্যবসায় এবং নূতন কর্মোদ্যমে সাহায্য করা সরকারের কর্তব্য, কিন্তু সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মতে ঐ সকল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রই বা কি রকম এবং উন্নতিরই বা কি সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাও সরকার জানিতে চাহেন। সম্মুখে বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। সকল ব্যবসা প্রচেষ্টাই যে সেখানে সমান সাফল্য দেখাইতে পারিবে এমন নহে। এই বাধা নিষেধের মধ্যে ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতি অংশতঃ অথবা পুরাপুরি কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। তাহা বাজারের চাহিদা এবং ক্রয়শক্তির উপরও নির্ভর করে। তা ছাড়া নূতন ব্যবসা-প্রচেষ্টাকে বর্তমান ব্যবসাগুলির সহিত তুলনায় দেখিতে হইবে।

শুধু সংরক্ষণ-শুল্কের উপরেই ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না—সর্ আজিজুলের এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সংরক্ষণ-শুল্ক ছাড়া কোন দেশের নবগঠিত শিল্প বাঁচিতে পারে না অর্থনৈতিক ইতিহাসের ইহা সুবিদিত তথ্য, ভারতবর্ষ ইহার ব্যতিক্রম নয়। যুদ্ধের পর বিলাতী শিল্পকে পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারতীয় শিল্পকে দাবাইয়া রাখিবার সরকারী চেষ্টা হইবে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহস্র বাধানিষেধ আরোপ করিয়া সকল কর্তৃত্ব ভারত-সরকারকে স্বহস্তে তুলিয়া লইতে দেখিয়া এ আশঙ্কা অনেকের মনেই জাগিয়াছিল। এ আশঙ্কা যে অমূলক নয় সর্ আজিজুল প্রায় স্পষ্ট করিয়াই তাহা জানাইয়া দিয়াছেন।

শুধু ইংলণ্ডের প্রয়োজনে নয়, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার তাগিদেও এবার ভারতীয় কামধেনু দোহনের আয়োজন করা হইবে এ আশঙ্কারও কারণ ঘটিয়াছে। গত ২০শে অক্টোবর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বোর্ড অফ ট্রেডিং-এর সভাপতি ডাঃ ডালটন জানাইয়াছেন যে, পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন এবং উহার আমদানী-রপ্তানীর উন্নতি ব্যাহত হইতে পারে এমন কোন সাধারণ বাণিজ্য-চুক্তি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট করিবেন না। এরূপ চুক্তি করিবার পূর্বে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিতও পরামর্শ করা হইবে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকার দাবি পূরণের পর ভারতবর্ষের কথা শোনা হইবে এবং সে বৈঠকে ভারতবাসীর হইয়া 'মত' দিবার জন্য সর্ আজিজুলের ন্যায় লোকেরও অভাব হইবে না, এটা অনুমান করা খুব অসঙ্গত নয়। কমীটির আলোচনায় আর একটি ত্রুটি লক্ষণীয়। শিল্পোন্নতি অর্থে ইঁহারা শুধু যন্ত্রশিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠাই বুঝিয়াছেন। কুটীর-শিল্পের সহিত যন্ত্রশিল্পের সমন্বয় সাধন করিয়া কোটি কোটি জনসাধারণের কর্ম্মপ্রাপ্তির পথ সুগম করিবার কথা ইঁহারা চিন্তাও করেন নাই।

—

পুনর্গঠন সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকরের মন্তব্য

মূল পুনর্গঠন কমীটিরও আবার একটা নীতিনির্ধারক কমিটি আছে। গত ২৫শে অক্টোবর ডাঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে উহারও একটি অধিবেশন হইয়াছে। ডাঃ আম্বেদকরের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশে বুঝা যায় ভারতবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক দুর্গতির মূল কারণ তাঁহার অজানা নাই। তিনি অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত, সুতরাং তাঁহার না জানিবার কথাও নয়। তিনি বলিয়াছেন,

ভারতবর্ষের উপর চাপ পড়িয়াছে দুই দিক্ হইতে। একটা দিক হইতেছে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি এবং অপর দিকটি হইতেছে জমির ক্রমবর্ধমান অবনতি। ফলে সর্বনাশা এক অবস্থা দেখা দিয়াছে। ইহা হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় কৃষিকার্য্যকে লাভজনক করিয়া তোলা। কিন্তু শিল্প-প্রসার-প্রচেষ্টার অনুকূলে গুরুতর মনোযোগ না দিলে ভারতে কৃষিকার্য্যকে লাভজনক করিয়া তোলা যাইবে না। কারণ যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় প্রসার হইলেই বহু লোক ঐ সমস্ত কাজে যোগ দিয়া জীবিকার্জন করিতে পারিবে, জমির উপর অতিরিক্ত চাপ কমিয়া যাইবে।

ডাঃ আম্বেদকর সমস্যাটা ধরিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বড়লাটের শাসন-পরিষদে চাকুরী করিয়া উহার সমাধান নির্দেশ করিতে সাহসী হন নাই। বিশেষতঃ ঐ অধিবেশনে সর্ রামস্বামী মুদালিয়র উপস্থিত ছিলেন। দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথাটা ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কুটীর-শিল্পের সহিত যন্ত্রশিল্পের কি সম্পর্ক হইবে, কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা তিনি চিন্তা করিয়াছেন কি না, ইহা তিনি জানান নাই। সর্ রামস্বামী সোভিয়েট রাশিয়ার দোহাই পাড়িয়া অত্যন্ত চাতুর্য্যের সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল দায়িত্ব ভারত-সরকারের হাতেই থাকা উচিত, অর্থাৎ যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে কুটীর-শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজনানুসারে সঙ্কোচের অপ্রতিহত ক্ষমতা

ভারত-সরকারের হাতে রাখিয়া দেওয়াই অধিকতর সুবিধাজনক। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে নূতন নূতন 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত-সরকার এখন হইতেই সচেষ্ট।

এই কমীটির অধিবেশনে বাংলার কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

—

ট্রেনে সৈন্যদের ব্যবহার

লাহোরের 'ডেলী হেরাল্ড' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ,

অমৃতসরের স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট লুধিয়ানার অধ্যাপক হেৎসিংকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। মামলাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। অধ্যাপক হেৎসিংকে ভারতরক্ষা আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রকাশ, তিনি নাকি সেনাদলে ভর্তি না হইবার জন্য যাত্রী সৈন্যদিগকে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন। অভিযুক্ত অধ্যাপক তাঁহার সওয়ালে বলেন যে, যে গাড়ীতে ভারতীয় সৈন্যেরা যাইতেছিল সেই গাড়ীতে প্রবেশ করার চেষ্টা তিনি করেন। সৈন্যরা তাঁহার চেষ্টায় বাধা দেয় এবং সৈন্যদের সঙ্গে ইহা লইয়া তাঁহার ঝগড়া বাধে। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। অধ্যাপক হেৎসিংকে মুক্তি দিয়া বিচারক অভিযুক্তের যুক্তিকেই মানিয়া লইয়াছেন। নিজে যে নানা ভাবে যুদ্ধের কাজে লিপ্ত আছেন তাহারও লিখিত প্রমাণ অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে প্রদর্শন করেন। জনসাধারণ এবং সৈন্যদের ভিতর সম্বন্ধ হৃদ্যতাপূর্ণ রাখিবার জন্য যাঁহারা সদা সচেতন ও উদ্বিগ্ন অধ্যাপক হেৎসিঙের মুক্তির এবং উক্তির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার।

এমন অনেক সৈন্য আছে যাহারা সত্যই ভদ্র এবং বিবেচক; যাত্রীসাধারণের সুবিধার জন্য অনেক সময় ইহারা নিজেরা নানা অসুবিধা ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু এমন সৈন্যও অনেক আছে যাহারা মনে করে যাহা খুশী তাহাই করিবার অধিকার তাহাদের আছে। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তিল ধারণের স্থান নাই তথাপিও তাহারা পুরা একটি বেঞ্চ দখল করিয়া চলে। বিন্দুমাত্র বিরক্তির কারণ ঘটিল ত অমনি রণমূর্তি, এমন কি মারামারিও।

বাংলা দেশেও রেল-ভ্রমণে অনেকের ভাগ্যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়াছে। বড় বড় ষ্টেশনে দায়িত্বশীল অফিসার নিয়োগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদের উপদ্রব হইতে যাত্রীদের অব্যাহতি লাভের সুবন্দোবস্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে, অবশ্য যদি কর্তৃপক্ষের সে ইচ্ছা থাকে।

—

ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারার অপব্যবহার

১৯৪৩ সনের ১৪ নম্বর অর্ডিনান্সের ২ দাগ ধারার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া আগ্রার য্যাডভোকেট পণ্ডিত বৈজনাথের পক্ষে 'হেবিয়াস কর্পাস' অনুযায়ী একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটির রায়দান স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে গবর্মেণ্ট য্যাডভোকেটের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এই উক্তি করেন :—

"যদি আমি বুঝি যে, বিশেষ একটি আদেশের অর্থই হইতেছে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারার বিধানাবলীর অপপ্রয়োগ তাহা হইলে সেই আদেশ বাতিল করিয়া দিতে আমি পারি কি না বিশেষ করিয়া তাহাই আপনার নিকট হইতে শুনিতে চাই।

"প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট অথবা কমিশনার কর্তৃক ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী গঠিত কোন আইনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যে এই আদালতের ক্ষমতা-বহির্ভূত তাহা আমি জানি। সুতরাং আমার এই কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আপনি জানাইতে পারেন যে, এই মামলা লইয়া প্রধান বিচারপতি অসুবিধায়ই পড়িয়াছেন এবং কমিশনার যে আমার অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন ইহাও প্রায় দুরাশা।"

পণ্ডিত বৈজনাথের আবেদনে বলা হইয়াছে যে, রাজনীতিতে তিনি যোগদান করেন নাই এবং তিনি না ছিলেন কংগ্রেসের সভ্য না হিন্দু মহাসভার। বন্দী থাকিতে থাকিতে তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাঙিয়া পড়ে এবং সেই জন্য সাময়িক ভাবে কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আবেদনকারীর পক্ষের সওয়াল প্রসঙ্গে বিচারপতি ইহাও বলেন, "ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারার সুযোগ লইয়া তাহারা বিচারালয়ের স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে চায়। কমিশনারকে আপনি একথাও বলিতে পারেন যে, প্রকাশ্য আদালতে প্রধান বিচারপতি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিচারালয়ের সুবিধাদি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ২৬ ধারার অপপ্রয়োগ করা হইতেছে।" মামলা সম্পর্কিত যাবতীয় নথিপত্র আদালতে উপস্থিত করিতে বলিয়া তিনি বলেন, "উহা করিতে আপনি যদি অস্বীকৃত হন তবে কমিশনারকে স্বয়ং এখানে আসিয়া সাক্ষ্যদান করার আদেশ আমি দিব। তিনি যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষক আমি তেমনি বিচারালয়ের রক্ষক। শাসন-কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কি করিতে চান সে সম্বন্ধে নির্দেশ আপনি লইতে পারেন।"

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "অধুনা যে সমস্ত গোলযোগ হয় সে সম্পর্কিত ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলীর অভিযোগে অভিযুক্তদেরই পক্ষে কতকগুলি মামলা এই ভদ্রলোক চালাইতেছিলেন এবং ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হয় এই সমস্ত মামলায় হাত দেওয়ার পর। ইহাই হইতেছে মামলার সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত দিক। আসামীদের পক্ষে কৌঁসুলীর কাজে অসুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা পুলিস কোন

কোন সময় করে এবং মনে করে যে, জেলে পুরিয়া রাখাই এই লোকের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়।"

প্রধান বিচারপতিকে লইয়া গঠিত 'ফুলবেঞ্চে' মামলাটির চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। ১৪ নম্বর অর্ডিনান্সের বৈধতা সম্পর্কে বিচারপতি অলসপ এবং বিচারপতি বাজপাই তাঁহাদের রুলিং দিয়াছেন।

মামলাটি এখনও বিচারাধীন।

—

মাদ্রাজে গবর্ণরী শাসনে মদ্যপান পুনঃপ্রবর্তন

মাদ্রাজের কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্ট মদ্যপান নিবারণের যে আয়োজন করিয়া গিয়াছিলেন, বর্তমান গবর্ণর তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই কার্য্যের প্রতিবাদে মাদ্রাজের এক জনসভায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন,

"মাদ্রাজের গবর্ণরকে এই আইন (মদ্যপান নিষেধাত্মক) রদ্ করার পরামর্শ যে কে দিয়াছেন তাহা আমি জানি না। লাখ লাখ চাষী পয়লা জানুয়ারি তারিখে চোখের জল ফেলিবে, পরিশ্রমী হাজার হাজার তাঁতীর ঘরের মা ও বউ এবং অন্যান্য প্রকার শিল্পীরা নববর্ষের দিনে গবর্ন্মেণ্টের মুণ্ডপাত করিবে।

"সামান্য কিছু বেশী রাজস্বের জন্য এবং অন্যান্য আবশ্যক যুক্তির অবতারণা করিয়া গবর্ণর নিজের কাঁধে অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি কাজের দায়িত্ব লইয়াছেন।

"অর্থ-সংস্থানের ভাল ব্যবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে মাদ্রাজ গবর্ন্মেণ্ট আমার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

"যুদ্ধ এবং জনরক্ষার ব্যয়ের জন্য অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যখন নানা রকমের আর্থিক অসুবিধা পোহাইতে হইতেছে মাদ্রাজ গবর্ন্মেণ্ট তখন নির্ভাবনায়ই আছেন। ভাল যে আয়ারসায়ারী গরুটি আমি মাদ্রাজ গবর্ন্মেণ্টকে দিয়াছিলাম পরমানন্দে উহারা এখন তাহাকেই দোহন করিয়া চলিতেছে।

"বড় একটা উদ্দেশ্য লইয়া তামাক, মোটরস্পিরিট এবং জেনারেল সেলস্ ট্যাক্স আমি প্রবর্তন করি। ইহার জন্য অনেক নিন্দা-মন্দের ভাগী আমাকে নিজেকে হইতে হইয়াছে।

"মাদ্রাজ গবর্ন্মেণ্ট এই জন্য এই বছর টাকা পাইতেছেন প্রায় চার কোটি। অথচ আমার উদ্দেশ্য ছিল এই টাকা দিয়া তাড়ি মদ ইত্যাদির কবল হইতে প্রদেশের লোকদিগকে মুক্ত রাখা। আমার ইচ্ছা ছিল ধীরে ধীরে ১৯৪৩ সালের মধ্যেই সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে মাদক দোষ মুক্ত করিয়া পৃথিবীতে একটি উদাহরণ স্থাপন করি।

"মদে যে মুনাফা হয় তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র যায় গবর্ন্মেণ্টের তহবিলে আর বাকীটা যায় মদ্য-ব্যবসায়ীদের পকেটে এবং মদ্যপান চালু রাখার ফলে দেখা দেয় ঘরে ঘরে অশান্তি এবং দুর্নীতি। অথচ যে-পথ আমি দেখাইয়া দিয়াছি তদনুযায়ী চলিলে মদ প্রস্তুত করিতে যে শ্রম ও মূলধন নিয়োজিত হয় তাহা নূতন নূতন কল-কারখানায় নিয়োগ করা যাইতে পারিত এবং সঞ্চয়ের বুদ্ধি লইয়া চলিলে প্রতি বছর ব্যাঙ্কে জমা হইতে পারিত কুড়ি কোটি টাকা।"

মদ্যপান নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট কারণ দিয়াছেন, (১) জনসাধারণ গবর্ন্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা পূর্বের ন্যায় করিতেছে না, (২) মদ্যপান পুনঃপ্রবর্তিত হইলে রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, এবং (৩) তাড়ির ন্যায় একটি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিক সমাজের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' এই কারণগুলি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

—

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির সহজ উপায়

জমায়েৎ-উল উলেমার মৌলানা মহম্মদ রুহুল আমিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহকারী সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :

"গত ৬ই নবেম্বর মুসলিম ইনষ্টিটিউটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে এবং আমার অনুমতি ব্যতিরেকেই সভা আমাকে সভ্য হিসাবে কো-অপ্ট করিয়া লয় এবং আমাকে লীগের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করে। লীগের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং সভ্যতালিকাভুক্ত থাকিতে দৃঢ় ভাবে আমি অস্বীকার করিতেছি। সকলেরই বেশ ভাল জানা আছে যে, জমায়েৎ-উল-উলিমা এবং অন্যান্য মুসলীম প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগ হইতে তফাৎ আছে। বৎসর দুই পূর্বে ফুরফুরা তারিফে গৃহীত জমায়েৎ-উল-উলেমার প্রস্তাবে লীগের কার্য্যাবলীর নিন্দাবাদ করা হয় এবং ইসলামের দীন সেবকদিগকে লীগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিবার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। জমায়েৎ-উল-উলেমার উক্ত নির্দেশ আমাদের উপর এখনও বলবৎ এবং এই অবস্থায় জমায়েৎ-উল-উলেমার সভ্য হিসাবে লীগের সঙ্গে কোন ভাবেই কোন সম্পর্ক আমি রাখিতে পারি না।"

মৌলানা সাহেবের অজ্ঞাতে ও অমতে তাঁহাকে শুধু

সহকারী সভাপতি নয়, লীগের সদস্যতালিকাভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। লীগের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির এই উপায়টি সহজ হইতে পারে, কিন্তু সম্মানজনক নয়।

—

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নরহত্যার মামলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে একটি নরহত্যার মামলার বিচারের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া সন্দেহ হয়। কলিকাতার কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রও উহার প্রতি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সুবিচারের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। ঘটনার বিবরণ এই :

জন উইণ্ডের বেইন্স নামে একজন সৈন্যকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (খুন) কিম্বা ৩০৪ (ক) ধারা (অবহেলাক্রমে মৃত্যু ঘটানো) অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত বৎসর ১৬ই জুন তারিখে আসামী বুধাইর গ্রামের মণীন্দ্রচন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। মণীন্দ্র সামরিক পুরুষদের জিনিসপত্র বিক্রয় করিত। ঘটনার আগের দিন আসামী তাহাকে তিনটি হাঁস জোগাড় করিয়া দিতে বলে এবং ঐ তিনটি হাঁসের জন্য সে ২৲ টাকা মূল্য দিতে রাজী হয়। মণীন্দ্র আসামীর ফরমায়েস মত তাহাকে হাঁস আনিয়া দেয়। কিন্তু আসামী তাহাকে মাত্র ১৲ টাকা দেয়। মণীন্দ্র ইহাতে আপত্তি করে এবং পুরা ২৲ টাকা চাহে। ইহা লইয়া আসামীর সহিত তাহার কথা কাটাকাটি হয়। মণীন্দ্র তখন বলে যে, এই ব্যাপার লইয়া সে বড়সাহেবের কাছে যাইবে। কিন্তু আসামী টাকা দেওয়ার বদলে তাহার রাইফেল তুলিয়া ধরে এবং মণীন্দ্রকে গুলী করে। গুলী মণীন্দ্রের চিবুক বিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায় এবং সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। অতঃপর আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু তদানীন্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তের পর সে খালাস পায়। ইহার বিরুদ্ধে সরকার-পক্ষ হইতে আপীল করা হইলে আসামীকে ৩০২ এবং ৩০৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ত্রিপুরার দায়রা জজ মিঃ এস. কে. সেনের আদালতে এই মামলার বিচার হয়। গত ২৯শে নবেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই মামলার বিচার চলে। দায়রা জজ ৯ জন সদস্য লইয়া স্পেশাল জুরীর সাহায্যে ইহার বিচার করেন। ৯ জন জুরীর মধ্যে ৮ জনই ছিলেন সামরিক পুরুষ এবং ইহার মধ্যে আবার ৭ জন ছিলেন ইউরোপীয়ান। জুরীগণ একবাক্যে আসামীকে ৩০২ ধারার অভিযোগে নির্দোষ বলেন এবং ৩০৪ (ক) ধারার অভিযোগেও ৯ জন জুরীর মধ্যে ৮ জনই আসামীকে নির্দোষ বলিয়া অভিমত দেন। দায়রা জজ ৩০২ ধারা সম্পর্কে জুরীদের অভিমত গ্রহণ করেন, কিন্তু ৩০৪ (ক) ধারা সংক্রান্ত অভিযোগে জুরীদের রায় গ্রহণে অসম্মত হন। তথাপি দায়রা জজ মামলাটি হাইকোর্টে পাঠাইতে এই বলিয়া অস্বীকৃত হন যে উহা 'সুবিবেচনাসম্মত' হইবে না অর্থাৎ আসামীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কলিকাতা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মামলাটির নথিপত্র তলব করিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে পুনর্বিচারের আদেশ দিবেন, জনসাধারণ ইহা প্রার্থনা করে। সুবিচার হওয়া যেমন দরকার, ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে রায় শুনিয়া জনসাধারণের মনে এই ধারণা হওয়াও তেমনি আবশ্যক।

—

কলিকাতায় রেশনিং-এর প্রথম নমুনা

ডিসেম্বর মাসের অর্দ্ধেক অতীত হইল, এখনও কলিকাতার সকল স্থানে রেশন কার্ড বিলি হয় নাই। যে-সব স্থানে বিলি হইয়াছে, সেখান হইতেও বহু ত্রুটির সংবাদ আসিতেছে। যুগান্তরে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রটি উল্লেখযোগ্য :

এ-আর-পি'র লোকগণনার সময় যেরূপভাবে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, রেশনকার্ড লিখিবার কালে তৎপ্রতি মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। অধিকাংশ রেশনিং কার্ডেই নাম ও উপাধি ঠিকমত লেখা হয় নাই। রেশনিং কর্ম্মচারীর পাণ্ডিত্যের ফলে যে-সব গুরুতর ভুল হইয়াছে, তাহার কিছু নমুনা দিতেছি। এ-আর-পি'র P. XIV. 1. 143 পত্রে এক ভদ্রলোকের ছেলের বয়স ১০ মাস ও মেয়ের বয়স ১৩ বৎসর লেখা আছে, কিন্তু রেশনিং কর্ম্মচারীর কৃপায় ছেলেটির বয়স ১ বৎসর এবং মেয়েটির বয়স মাত্র ১১ মাস ধার্য্য হইয়াছে। ফলে তাহাদের খাদ্য দেওয়ার হুকুম হয় নাই। একই ব্যক্তির ছেলে-মেয়ের বয়সের এই প্রকার পার্থক্য আদৌ সম্ভবপর কিনা তাহা রেশনিং কর্ম্মচারীর মগজে স্থান পায় নাই। এ-আর পি'র P. XIV. 1. 143 পত্রে আমার সম্বন্ধে লেখা আছে 'যুগান্তর পত্রিকার কর্ম্মচারী, বয়স ৩২ বৎসর" কিন্তু সুযোগ্য রেশনিং কর্ম্মচারীর বিবেচনায় রেশনকার্ডে "যুগান্তর পত্রিকার কর্ম্মচারী"র বয়স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ৩ বৎসর ২ মাস এবং ঐ বয়সের শিশুর খাদ্য এক ইউনিট পাইবার হুকুম হইয়াছে।

এ আর পি পরচা দেখিয়া লিখিতে গিয়াও যে-স্থলে এরূপ মারাত্মক ভুল হয়, এবং দৃষ্টিপাত মাত্র যে ভুল ধরা পড়িবার কথা তাহাও যেখানে সংশোধিত হয় না, সেখানে বিভাগীয় ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীর কৃতিত্ব সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ জাগে। সৎ ও সুদক্ষ লোক লইয়া এই বিভাগ গঠিত না হইলে শহরবাসীর লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিবে না এ আশঙ্কা ধীরে ধীরে সত্য প্রমাণিত হইতেছে। শহরের দোকানপাটে প্রকাশ্য বেচাকেনা বন্ধ করিয়া রেশনিং বিভাগের উপর দৈনন্দিন আহার্য্যের জন্য ৫০ লক্ষ লোককে নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে গিয়া গবর্ন্মেণ্ট যে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সর্বদা সচেতন রাখা জনসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য। রেশনিঙের

ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপক সমালোচনা এবং গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক উহার দ্রুত প্রতিকার এই বিভাগের সাফল্য আনয়নেই সাহায্য করিবে।

বর্ত্তমানে যে প্রকার কার্য্যক্ষমতার নমুনা দেখা গিয়াছে তাহাতে সাফল্যের বিপরীতই ঘটিবে মনে হয়।

—

মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্টের বেতার বক্তৃতা

সামরিক বিভাগ বাংলা-সরকারকে কতটা সাহায্য করিতেছে মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্ট এক বেতার বক্তৃতায় তাহার বিবরণ দিয়াছেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক চিকিৎসা বিভাগের সাহায্যে ৯০ লক্ষ লোককে কলেরার প্রতিষেধক চিকিৎসা করা হইবে বলিয়াও তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

"সামরিক বিভাগ বিভাগীয় প্রয়োজন সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে এযাবৎ ৬০ জন চিকিৎসক, ৪৫টি সেনাদল, বহু ভ্রাম্যমাণ ঔষধাগার ও প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র নিয়োগ করিয়াছে। বিমানবহরও ঔষধাদি আনা-নেওয়ার ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ১৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রদেশের অন্য প্রান্তে সাহায্য পাঠান হইতেছে। সম্প্রতি যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা আছে প্রদেশের এমন বিচ্ছিন্ন স্থান ছাড়া অন্য কোথাও খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব নাই। তবে যানবাহনের অসুবিধাও ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে। সমর বিভাগীয় এঞ্জিনীয়ররা সেতু ও পথ-ঘাট নির্ম্মাণ ও উহার উন্নতি সাধন করিতেছে। এখন সবচেয়ে প্রয়োজন ঔষধ-পথ্যের, খবরের কাগজে প্রকাশিত ঔষধ ও বস্ত্রাভাবের সংবাদ একটুও অতিরঞ্জিত নহে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দরিদ্রদের অল্পেই ম্যালেরিয়া ধরিতেছে; তাহার উপর আসন্ন শীতের উপযোগী কম্বল বা কাপড়চোপড়েরও বিশেষ অভাব আছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া ও নিউমোনিয়া বহু জেলা ছাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী বহু দুরধিগম্য গ্রামে অতর্কিত পরিদর্শনে গিয়া শত শত লোককে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও ম্যালেরিয়ায় মরিতে দেখিয়াছি। আবার অপর এক শহরের জরুরী হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে সেনাবিভাগ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলে যে-সাহায্য দিতেছে তাহাতে জনসাধারণ ও সেনাদলের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

দুর্ভিক্ষের পর বাংলায় মহামারীর যে ভয়াবহ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্টও তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ ও বস্ত্রাভাবের প্রকাশিত বিবরণ অতিরঞ্জিত নয় বলিয়া তিনিও বলিয়াছেন। খাদ্যাভাব লইয়া যে-সময়ে সমগ্র দেশে আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় হইতেই আমরা বাংলা-সরকারের জনস্বাস্থ্য কৃষি শিল্প সমবায় প্রভৃতি বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা এবং ঔষধ ও বস্ত্রের অভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সময় থাকিতে গবর্ন্মেণ্ট এই সব অভাবের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন নাই। ম্যালেরিয়া ও কলেরায় হাজার হাজার লোকের মৃত্যু আরম্ভ হইবার পর জনস্বাস্থ্য বিভাগ কতকটা সক্রিয় হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ সমুদ্রে বারিবিন্দুর সমান। কৃষি সমবায় ও শিল্প বিভাগ এখনও নীরব, দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত গ্রামগুলিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ পর্য্যন্ত ইহাদের দেখা যায় না। ইহাদিগকে সচেতন করিবার জন্যও কি সৈন্য আমদানীর প্রয়োজন হইবে? প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের এই প্রহসনের চেয়ে সোজাসুজি সামরিক আইন জারী করাও যে ছিল ভাল। অন্ততঃপক্ষে তাহাতে দেশবাসী অকর্ম্মণ্য শাসকবর্গের হাত হইতে রেহাই পায়।

—

বাংলা-সরকারের কৃষি-উন্নতি-পরিকল্পনা

বাংলা-সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ,

"সরকারের নয়া কৃষিসংক্রান্ত নীতির আসল লক্ষ্যস্থল হইল খাদ্যশস্য সম্পর্কে স্বয়ম্পূর্ণতা অর্জন। বাংলা-সরকারের কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে শীঘ্রই এক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে উদ্যত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রদেশের আবেদনযোগ্য পতিত জমি আবাদ, পাটের একচেটিয়া ব্যবসায় কোন রকম ক্ষতি না করিয়া যথাসাধ্য খাদ্যশস্যের চাষ, এক-ফসলী জমিতে দুইটি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং উন্নত ধরণের বীজ ও সার ব্যবহার দ্বারা জমির ফসল বৃদ্ধি করাই হইল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ইহার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সমুদয় আবাদযোগ্য পতিত জমির শুমারী গ্রহণ করা হইবে। তবে এতদিন কৃষি-বিভাগে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই; গবর্ন্মেণ্ট এই জন্য তাঁহাদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার সুযোগ পান নাই। নূতন পরিকল্পনায় ৩০ জন জেলা উন্নয়ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে। রেল-লাইনের দুই দিকে প্রায় এক লক্ষ একর জমি চাষের যোগ্য হইবে। বাংলায় অনুমান ৩৭॥ লক্ষ একর জমি পতিত রহিয়াছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।"

গবর্ন্মেণ্ট এখনও সেই চিরপুরাতন পদ্ধতিতে চাষের

জমি বাড়াইয়া অধিকতর ফসল উৎপাদনের কথা চিন্তা করিতেছেন। উন্নত ধরণের বীজ ও সার ব্যবহারের কথা এত দিন পরে তাঁহারা মুখে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ এদিক দিয়া এক বিন্দু অগ্রসর তাঁহারা হন নাই। ধান উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন জেলার কৃষকেরা ডাল বুনিয়া দেয়, এবার দুর্ভিক্ষে ঐ সব ডাল খাইয়া ফেলায় বীজের অভাবে ডালের চাষ খুব কম হইয়াছে। উন্নত বীজ দূরে থাকুক, ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মারফৎ ডালের সাধারণ বীজ সরবরাহের বন্দোবস্ত গবর্ন্মেণ্ট অনায়াসেই করিতে পারিতেন। আলুর চাষও এবার অন্যান্য বার অপেক্ষা কম হইয়াছে। এবার আলুর দর প্রায় ৩০ টাকা মণের কাছাকাছি রহিয়াছে, সাধারণ চাষীর পক্ষে এই দরে বীজ-আলু সংগ্রহ একরূপ অসম্ভব। আলুর জমিতে সার অত্যাবশ্যক, কৃষকেরা এজন্য খোল ব্যবহার করিয়া থাকে। সাধারণ বৎসরে যে খোলের দর থাকে দেড় হইতে দুই টাকা মণ, এবার তাহা ছয় হইতে আট টাকার কমে পাইবার উপায় নাই। এই টাকাই বা কৃষক পায় কোথায়? সমবায় সমিতিগুলি মরিয়াছে, ঐগুলি পুনর্জীবিত করিয়া কৃষিঋণ-দানের সুবন্দোবস্ত করা যে বর্ত্তমান সময়ে একান্ত প্রয়োজন ইহা উপলব্ধি করিবার মত ক্ষমতাও কৃষি বা সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সিভিলিয়ান সেক্রেটরীদের মধ্যে দেখা যায় না।

কলিকাতা শহরে পোষ্টার আঁটিয়া, ইংরেজী দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়া এবং পার্কে অথবা সরকারী আপিসের হাতায় তরকারি লাগাইবার হুকুম দিয়া যে খাদ্যসমস্যার সমাধান হয় না, দুই বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করিয়াও গবর্ন্মেণ্টের সে শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। খাদ্যশস্যের দরবৃদ্ধিতে কিছু উৎপাদন বাড়িতে বাধ্য, ইহাকেই 'আরও ফসল ফলাও' আন্দোলনের সাফল্য বলিয়া জাহির করিতে গেলে সাহেবলোকেরা বাহবা দিতে পারেন, কিন্তু বাঙালী ইহাকে ফকিরের কেরামতি বলিয়া মনে করিবে না। ৩০ জন জেলা-উন্নয়ন কর্ম্মচারী নিয়োগে নিযুক্ত লোকেদের আর্থিক উন্নতি ভিন্ন অন্য কিছু হইবে কিনা তাহা পরে দ্রষ্টব্য।

সার, বীজ ও কৃষিঋণ-দানের সুবন্দোবস্ত না করিলে, কুটীর-শিল্প বাড়াইয়া কৃষকের অতিরিক্ত আয়ের পথ খুলিয়া না দিলে এবং সমবায় সমিতি মারফৎ তাহার ফসল ও উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে দুর্ভিক্ষে বিপর্য্যস্ত বাংলাকে বাঁচাইবার পথ থাকিবে না। বাংলার কৃষি শিল্প ও সমবায় বিভাগ একযোগে সকল শক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে হয়ত কতকটা ফল ফলিতে পারিত।

ঢাকায় মিঃ সুরাবর্দীর বক্তৃতা

খাদ্যসচিব মিঃ সহীদ সুরাবর্দী ঢাকায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :

"রাজনৈতিক মতবিরোধ যদি কিছু থাকিয়া থাকে তবে তাহা অন্য স্থানের জন্য রাখিয়া দিয়া বাংলার সকলের মুখে অন্ন যোগাইবার কাজে আসুন আমরা একসঙ্গে মিলিত হই। আমি যেমন বাংলার জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছি, আমি আশা করি তাহারাও তেমনি আমার ও বাংলা-সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে।"

সম্মিলিত মন্ত্রীসভার জন্য মিঃ সুরাবর্দীর বিরোধী দলও দাবী তুলিয়াছেন; মৌলবী ফজলুল হক সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনের প্রতিশ্রুতি পাইয়াই সর্ জন হার্বার্টের হস্তে পদত্যাগপত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। তথাপি সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয় নাই। গঠিত হইলেও ফল যে ইহাপেক্ষা বেশী ভাল হইত এতটা আশাও করা কঠিন। হক সাহেবের আমলে চাউলের দর এক শত টাকা হয় নাই সত্য, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব কালেই হইয়াছিল এবং দিল্লী খাদ্য-সম্মেলনে তাঁহার অসতর্ক উক্তি কম ক্ষতিকর হয় নাই। সর্ নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীসভা ত মারাত্মক অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়াছেন এবং দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণের চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষে সেবাকার্যে নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলের মন্ত্রীদের যেমন প্রত্যেকের অক্ষমতা প্রতিপন্ন হইয়াছে ভূতপূর্ব হক-মন্ত্রিমণ্ডলের একমাত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভিন্ন অপর কাহারও তেমনি দর্শন মিলে নাই। বড় জোর দু-একটি সভায় বক্তৃতা করিয়াই ইঁহারা কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন। ব্যবস্থা-পরিষদের দায়িত্বশীল সদস্যরূপে ইঁহাদের যে কর্তব্য ছিল তাহাও ইঁহারা পালন করেন নাই। দেশবাসীর প্রতি ইঁহাদের সহানুভূতির মধ্যে বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা থাকিলে ইঁহারা বিরোধী দলে থাকিয়াও এই দুর্ভিক্ষের তীব্রতা প্রশমনে অনেক সাহায্য করিতে পারিতেন। ঘুষখোর সরকারী কর্ম্মচারী এবং অতিলোভী অসাধু ব্যবসায়ীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা ইঁহাদের পক্ষে যতটা সহজ; সাধারণ নাগরিকের পক্ষে উহা ততখানি অনায়াসসাধ্য নহে।

মৌলবী ফজলুল হক এবং সর্ নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে

দুই মন্ত্রিমণ্ডলের ক্ষমতার যে পরিচয় দেখা গিয়াছে তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হইবে না যে মন্ত্রিমণ্ডলের বাহিরে থাকিয়াই দেশের সেবা ভাল করিয়া করা যায়, অবশ্য যদি সে ইচ্ছা থাকে।

—

সরকারী ও বে-সরকারী রেশনিং

ঢাকায় মিঃ সুরাবর্দীর উপস্থিতিতে স্থানীয় রিলিফ কমীটির সভাপতি জেলা জজ মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন স্থানীয় নাগরিকগণকে লইয়া গঠিত বে-সরকারী কমীটির দ্বারা রেশনিং সরকার-পরিচালিত রেশনিং অপেক্ষা বিশেষ সুষ্ঠুভাবে ও স্বল্পব্যয়ে পরিচালিত হয়। তিনি বলেন,

বোম্বাইয়ের ২০ লক্ষ লোকের 'রেশনিং'-এর জন্য বোম্বাই সরকার মাসিক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন কিন্তু এই কমীটি একটা পরিকল্পনা অনুসারে 'রেশনিং' চালাইতেছে অথচ তাহাতে সরকারের কিছুই ব্যয় হইতেছে না। তিনি নিজে ছাড়া এই কমীটিতে কোন সরকারী কর্মচারী নাই। এই কমীটিকে সরকারী প্রভাবান্বিত করিতে গেলে ইহা ভাঙিয়া যাইবে।

কিন্তু এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার ন্যায় সৎসাহস, দূরদর্শিতা ও ঔদার্য্য বাংলার মন্ত্রী ও সিভিলিয়ানবৃন্দের আছে কি?

—

কলিকাতা হইতে দুঃস্থ অপসারণ

শহরের রাস্তা ও ফুটপাথ হইতে বাংলা-সরকারের দুঃস্থ সংগ্রহ-কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। ২৫শে নবেম্বর পর্যন্ত মোট ২৫,২৮৮ জন দুঃস্থ সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৬,২৯৮ জনকে শহরের বাহিরের সাহায্য-কেন্দ্রে অথবা স্ব-স্ব গ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে, ৩৯৪৬ জন সাহায্য-কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছে অথবা ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ১১৮৮ জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, ৭৫ জন মারা গিয়াছে ও ৩৭৮১ জন কলিকাতার গ্রহণ-কেন্দ্রে রহিয়াছে। দুঃস্থদিগকে গ্রহণ-কেন্দ্রে আনিবার পরেই তাহাদিগকে গ্রাম ও জেলা অনুসারে বাছাই করা হয়। দুঃস্থ নহে এইরূপ কাহাকেও ধরিয়া আনা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর ভবঘুরেদিগকে 'ভবঘুরে নিবাসে' পাঠান হয়। এ পর্যন্ত দুঃস্থদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ লোককেই সাহায্য কেন্দ্র হইতে স্ব-স্ব গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৫৪২ জনকে কলিকাতা হইতে সরাসরি গ্রামে পাঠান হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের দুঃস্থ সংগ্রহের জন্য রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে একটি বিশেষ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এ পর্যন্ত মোট ১৫০ জন পূর্ববঙ্গীয় দুঃস্থকে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে স্ব স্ব গ্রামে ফেরত পাঠান হইয়াছে। চট্টগ্রামের ন্যায় দূরবর্তী অঞ্চলের কয়েক জন নিরাশ্রয় স্ত্রীলোককে লোক দিয়া তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ দুঃস্থদিগকে তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে বস্ত্র ও কম্বল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ল্যান্সডাউন রোডে একটি 'পুনর্মিলন কেন্দ্র' খোলা হইয়াছে। এই কেন্দ্রটি ২৭শে নবেম্বর পর্যন্ত ৩৪টি ভাঙ্গা পরিবারের মধ্যে ১৭টি জোড়া লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে।

এই সব দুঃস্থ শিবির কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহার নির্ভরযোগ্য বিবরণ জননেতাদের প্রকাশ করা উচিত ছিল। শিবিরগুলি খুলিবার সময় গবর্ন্মেণ্ট জানাইয়াছিলেন যে উহাদের কার্য্যে কোন গোপনতা থাকিবে না, দায়িত্বশীল নেতারা ইচ্ছা করিলেই ঐগুলি পরিদর্শন করিতে পারিবেন। এগুলি কারাগার নয়, সুতরাং জননেতা বা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের পক্ষে উহা পরিদর্শনে আপত্তি হইবার কথাও নয়। এই সব শিবিরে আহার্য্য বস্ত্র শীতবস্ত্র ঔষধ প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা সন্তোষজনক কি না জনসাধারণের তাহা জানা দরকার। ব্যয় কিরূপ হইতেছে, হাজার লোককে ৫০০ জনের খোরাকী খাওয়াইয়া দুই হাজারের বিল হইতেছে কি না, বস্ত্রাদি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য কি পরিমাণে ক্রীত ও বিতরিত হইতেছে সে সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া দরকার। সত্য প্রকাশ গুজব বন্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। গবর্ন্মেণ্ট স্বয়ং অগ্রণী হইয়া জনসাধারণে আস্থাভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা শিবির পরিদর্শন ও তাহার বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে ভাল করিবেন।

—

ছয় কোটি টাকা ঘুষের অভিযোগ

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা কালে সর্ জিয়াউদ্দীন বলিয়াছেন যে ব্যবসায়ীদের নিকট তিনি শুনিয়াছেন যে একটি মাত্র অঞ্চলে তাহারা ঘুষ বাবদ ছয় কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

ইহার পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে। সর্ জিয়াউদ্দীনের সহায়তায় এই বিরাট্ ঘুষখোরদের ধরিবার কোন চেষ্টা গবর্ন্মেণ্ট করিয়াছেন বলিয়া কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

—

বাংলায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু

বাংলার প্রত্যেক জেলায় সহস্র সহস্র লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে। সরকারী কাগজপত্র হইতে একটিমাত্র জেলার মৃত্যুর যে হার প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভয়াবহ। অপর জেলাগুলিতে কি এইভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার মত লোক নাই? গত কয়েক মাসে অনশনে বাংলায় অন্ততঃ দশ লক্ষ লোক মরিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন নয়। মহামারীর তাণ্ডব এই ভাবে চলিতে থাকিলে আর কয়েক মাসের মধ্যে এই সংখ্যা ৬০ লক্ষে পৌছিলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকিবে না।

ফরিদপুরের হিসাব—

সরকারী কাগজপত্রে জেলার ২৩৮ ইউনিয়নের মধ্যে ১৭০টি ইউনিয়নের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে উক্ত মাসে প্রত্যেক ইউনিয়নে গড়ে ১৭৭ জন করিয়া মারা গিয়াছে অর্থাৎ জেলার জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতি হাজারে ১৫ জন করিয়া মারা গিয়াছে।

জেলায় কয়েকটি ইউনিয়ন যেখানে ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

ইউনিয়ন লোকসংখ্যা	আক্রান্তের সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা
	সদর মহকুমা	
কানাইপুর		
৯৩৭৪	৬৫০০	৪২০
কাইজুরী		
১০৬৩৫	৭০০০	২৪৩
গৃধা		
৮৯১৭	৫০০০	৩১৩
গাজিরটেক		
১২৪০১	৯২৩৩	১৫১
ভাঙ্গা—		
১৭৪৪২	১২৫৭৫	১৩৪
মধুখালি—		
৮৬১৬	১৬৯৫	৩৮৯
	রাজবাড়ী মহকুমা	
বাগমারা—		
৬১১৪	৫৯৮০	১৩৩
নিমতলা—		
৩৭০৩	১৫৭৭	৬৩
পাংসা থানা		
১০৫৯৭২	৫৯৫০৯	১৪৫০
	মাদারিপুর মহকুমা	
মুস্তাফাপুর—		
১৩৪৭৯	৭০০০	১২৫
লক্ষীপুর—		
১০৮৮৩	৫১২৫	১৯২৫
দিঘর মহিষাখালি—		
২০৮৬৩	৭৪০০	১৪৯০
বরিশার—		
৩৫৮৫৫	৩০০০	২০০০
	গোপালগঞ্জ মহকুমা	
ওরাকান্দি—		
৯০৫১	১৭৩৫	১১৯১
পাইজুরি—		
১৪৩৪০	৩২৬	২২০
বাকুনি—		
১৭১৩৪	৯৯৩০	৩২৯

—যুগান্তর

কুইনাইনের অভাব এবং অনশনে জনসাধারণের স্বাস্থ্য-হানি ম্যালেরিয়ায় এই ভয়াবহ মৃত্যুহারের কারণ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে জানানো হইয়াছে যে বাংলার কোন অঞ্চলে কুইনাইনের অভাব আর নাই, কারণ প্রত্যেক থানায় গড়পড়তা অন্যূন ৫০ পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন পাঠানো হইয়াছে। সংখ্যা প্রকাশে অর্দ্ধসত্য প্রচার মিথ্যাভাষণ অপেক্ষাও ক্ষতিকর হইতে পারে। ডাঃ বিধান রায়ের মতে এক পাউণ্ড কুইনাইন ৭০ জনের অর্থাৎ ৫০ পাউণ্ডে ৩৫০০ রোগীর চিকিৎসা হইতে পারে। ফরিদপুরের একমাত্র পাংসা থানাতেই ৫৯৫০৯ জন রোগী ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, সেখানে বাংলা-সরকার কয় পাউণ্ড পাঠাইয়াছেন? থানাপিছু ৫০ পাউণ্ড করিয়া পাঠাইয়াছি এই কথা বলিলেই সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না, প্রয়োজনের তুলনায় উহা পর্য্যাপ্ত কিনা তাহাও ঐ সঙ্গে বলা দরকার।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের মারফৎ কুইনাইন বিতরণ সন্তোষজনক ভাবে হয় নাই—এ অভিযোগ আগেও উঠিয়াছে, বেঙ্গল রিলিফ কমীটিও এই বণ্টন ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখিতে না পারিয়া নিজেদের কেন্দ্রগুলির দ্বারা বিতরণের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মারফৎ গবর্ন্মেণ্টের নিকট কুইনাইন চাহিয়া হাজার পাউণ্ড পাইয়াছেন। ঐ সঙ্গে এক সংবাদ প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যেন এই হাজার পাউণ্ড বাংলা-সরকার বিনামূল্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে বিতরণের জন্য দিয়াছেন। ডাঃ রায় এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে গবর্ন্মেণ্ট যথারীতি ৩৭৲ টাকা পাউণ্ড হিসাবে মূল্য লইয়াই উহা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের জন্য হ্যালিবাট অয়েল ক্যাপসুল

লণ্ডনে এক অভ্যর্থনা-সভায় বর্তমান হাইকমিশনার সর্ সামুয়েল রঙ্গনাথন ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলাসমূহে মহামারী প্রতিরোধের জন্য অতি শীঘ্র এরোপ্লেনে করিয়া দশ লক্ষ ক্যাপসুল হ্যালিবাট অয়েল বিখ্যাত একটি বিলাতী রাসায়নিক কোম্পানী হইতে প্রেরণ করা হইবে। হুইস্কী প্রেরণের আগ্রহাতিশয্যে যাঁহারা ভারতবর্ষে কুইনাইন পাঠাইবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই অপরিসীম দয়ার সংবাদ পাইয়া ভারতবাসী সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাইয়া অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারে এই দয়ার জন্য বুভুক্ষু জনসাধারণের প্রদত্ত করপুষ্ট গৌরী সেনের তহবিল হইতে কি পরিমাণ অর্থ মূল্য-স্বরূপ গ্রহণ করা হইল এবং বিলাতী কোম্পানীটি মহামারী প্রতিরোধের জন্য এই অমূল্য ঔষধটি পাঠাইয়া সামান্য কয় পার্সেণ্ট লাভ রাখিলেন? সাধারণ লোকে জানে পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য ভোজনের পর কয়েক ফোঁটা হ্যালিবাট অয়েল খাইলে স্বাস্থ্য ভাল হইলেও হইতে পারে। দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর শূন্য উদরে অথবা সরকারী লঙ্গরখানা হইতে বিতরিত অপূর্ব ঘ্যাঁটের সহিত গৃহীত হ্যালিবাট অয়েল কোন্ অজ্ঞাত শক্তিবলে কঙ্কালসার নরনারীকে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ছাড়াই বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম করিয়া তুলিবে, হাইকমিশনার ও সার্জন-জেনারেল সাহেবেরা তাহা জানাইলে অজ্ঞ ভারতবাসী বিলাতী আলোকে পথের সন্ধান পাইতে পারে।

—

ভারতবর্ষে পাইকারী জরিমানা

পার্লামেণ্টে মিঃ সোরেনসেন ভারত-সচিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে গত দেড় বৎসরে কতকগুলি গ্রাম ও শহরে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে এবং কত টাকা আদায় হইয়াছে। আমেরী সাহেবের জবাবে জানা গিয়াছে গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে ১১৫৬টি গ্রাম ও শহরের উপর ৯০ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।

এক জন নিরপরাধ ব্যক্তির সাজা হওয়া অপেক্ষা দশ জন অপরাধীরও মুক্তি পাওয়া ভাল—আমেরী সাহেবের নিজের দেশে ন্যায়বিচারের এই নীতি প্রচলিত। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শাসনাধীন ভারতবর্ষের বেলায় এই নীতি প্রযোজ্য নহে; এখানে এক জন অজ্ঞাত অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার জন্য শত শত নিরপরাধের দণ্ডবিধানও আইনতঃ সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

—

কলিকাতায় দিবালোকে বোমা-বর্ষণ

রবিবার ৫ই ডিসেম্বর জাপানী এরোপ্লেন দুই ঝাঁকে কলিকাতার উপর আসিয়া বোমা বর্ষণ করিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী। এই আক্রমণে শহরবাসী ভীত হয় নাই, দৈনন্দিন কাজকর্ম বিন্দুমাত্রও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

আক্রমণের যে স্বল্প সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে অনেকেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। প্রধান মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীন পরে এক বেতার বক্তৃতায় বোমা বর্ষণের সময়ে আশ্রয়স্থলে আত্মগোপন করিবার উপযোগিতার কথা বলিয়াছেন যদিও শহরে এখনও উপযুক্ত সংখ্যক ইষ্টকনির্মিত আশ্রয়স্থল নির্মিত হয় নাই। বালির বস্তার দ্বারা নিজ ব্যয়ে যাঁহারা বাড়ীতে আশ্রয়স্থল তৈরি করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই মূল্য দিয়াও বালি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; অথচ বিনামূল্যে বালি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি বাংলা সরকারই দিয়াছিলেন। ইট অথবা বালির অভাবের দোহাই এ দেশে অবশ্য চলিতে পারে; বিলাতে কিন্তু সর্ জন এণ্ডার্সন সিমেণ্টের অভাবের কথা জানাইতে গিয়া রেহাই পান নাই, যেন তেন প্রকারেণ সিমেণ্ট সংগ্রহ করিয়া পাকা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন।

আর একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। সামরিক ও বেসামরিক শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয়বিধ কর্তৃপক্ষই ব্ল্যাক আউটের কড়াকড়ি বাড়াইয়া বাঙালীকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চলিতে শিখাইতেছেন এবং জাপানী বিমান আগমনের সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণমাত্র গর্তে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু দিবালোকে, মধ্যাহ্নে এত বড় আক্রমণ চালাইয়া শত্রুপক্ষ যে চলিয়া গেল তাহার ক্ষতির পরিমাণ এত কম হইল কেন সে-বিষয়ে দেশের লোকের নিকট জবাবদিহি করিবে কে?

—

বাংলা-সরকারের খাদ্যনীতি

আগামী বৎসর বাংলার খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য গবর্মেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, বহুসংখ্যক

সরকারী ইস্তাহার এবং সরকারী ও বে-সরকারী সংবাদ হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতায় রেশনিং প্রবর্তন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় খাদ্যদ্রব্য বাংলার বাহির হইতে আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পাঁচ জন সরকারী এজেণ্ট নিয়োগের কি দরকার ছিল বুঝা কঠিন। মিলিটারী, মিলমালিক-এবং ফাঁপতি টাকার অধিকারী কলিকাতার আড়তদার —চাউলের বাজার হইতে ইহাদিগকে সরাইয়া দিবার পরও বাংলা-সরকার পাঁচ জন নিজস্ব এজেণ্টের মারফৎ বাজারে আসিতে চাহেন কেন? মফঃস্বলে যে-সব শহরে রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে বা হইতেছে, সেই সব শহরের রেশনিং কমীটিকে নিজ নিজ এলাকার জন্য চাউল ক্রয়ের অধিকার অর্পণ করিলে গবন্মেণ্ট আর কাহার জন্য ক্রয় করিবেন? কলিকাতার ক্রেতা ও সরকারী এজেণ্ট বাজারে না থাকিলে এবং জেলায় জেলায় অবাধ বাণিজ্য খুলিয়া দিলে চাউলের দর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসা সহজ হইবে। গবন্মেণ্টের উপর জনসাধারণের লুপ্ত আস্থাও পুনরায় ফিরিবার উপায় হইবে।

—

৭ই পৌষ

বাংলার ইতিহাসে ৭ই পৌষ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এক শত বৎসর পূর্বে এই দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও কুড়ি জন যুবক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাংলার ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতিক্ষেত্রে নবযুগ প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করেন। এই দীক্ষার পর হইতে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা নূতন জীবন লাভ করে। বাংলার তথা ভারতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে তত্ত্ববোধিনী সভার দান অতুলনীয়। তত্ত্ববোধিনীর সেবকরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় মনীষিবৃন্দ ভারতের জাতীয় জীবনে নব জীবনের সঞ্চার করেন। এক অভিন্ন আদর্শে উদ্বুদ্ধ অল্প কয়েক জন লোকের আন্তরিক চেষ্টার ফলে অখণ্ড ভারত ব্যাপিয়া যে কত বড় আলোড়ন উঠিতে পারে তত্ত্ববোধিনী সভা তাহার প্রমাণ। কলিকাতায় ও শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়।

—

খুচরা মুদ্রার অভাব

মাসে ১৭ কোটি খুচরা মুদ্রা তৈরি হইতেছে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া ভারত-সরকার এক ইস্তাহারে আশ্বাস দিয়াছেন যে ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে খুচরা মুদ্রার অভাব শীঘ্রই মিটাইয়া দেওয়া হইবে। হঠাৎ এক-একটি মস্ত বড় সংখ্যা দেখাইয়া সরকারী কৃতিত্ব জাহির করিবার সময় গবন্মেণ্টের প্রচারকর্তারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে এইরূপ বিচ্ছিন্ন সংখ্যাদ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। পূর্বে প্রচলিত রূপা ও নিকেলের কত কোটি টাকার মুদ্রা কারেন্সী আপিসের গহ্বরে ফিরিয়া গিয়াছে, উহার পরিবর্তে মোট কত কোটি টাকার নূতন মুদ্রা তৈরি হইয়াছে, ১০০ কোটি ফাঁপতি টাকার নোট ভাঙাইবার পক্ষে ঐ পরিমাণ মুদ্রা পর্যাপ্ত কিনা—এ সব কথা পরিষ্কার করিয়া না জানিয়া কারেন্সী-কর্তৃপক্ষের কৃতিত্ব স্বীকার করা কঠিন। ১৭ কোটি মুদ্রা কয় কোটি টাকার, গবন্মেণ্ট তাহা গোপন রাখিয়াছেন। প্রতি টাকার জন্য একটি করিয়া আধুলি সিকি দুয়ানি ও একানি এবং দুইটি ডবল পয়সা ধরা হইয়া থাকিলে বড় জোর মাসে তিন কোটি টাকার খুচরা তৈরি হইতেছে। এই হিসাবে মুদ্রা তৈরি চলিতে থাকিলে সমগ্র দেশে খুচরার অভাব ঘুচিতে অন্তত ২০০ মাস অর্থাৎ ১৫ বৎসরেরও অধিক কাল লাগিবার কথা।

খুচরা মুদ্রার চাহিদা গবন্মেণ্টের নিজের সৃষ্টি। রেলওয়ে স্টেশনে, কণ্ট্রোলের দোকানে প্রভৃতিতে খুচরা দিতে বাধ্য করিয়া এবং টাকার ভাঙ্গানি না দিয়া গবন্মেণ্ট নিজেই জনসাধারণকে যে-কোন প্রকারে খুচরা সংগ্রহে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কার্য্যে প্রশ্রয় পাইয়া শহরের ট্রাম বাস কোম্পানী প্রভৃতি টাকার ভাঙ্গানি দিতে অস্বীকার করিয়াছে, ভাঙ্গানি চাহিয়া জনসাধারণকে বহু ক্ষেত্রে লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছে। বাজারের অসুবিধার তো কথাই নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে চার আনার ভাঙ্গানি সঙ্গে রাখিলেই যথেষ্ট হইত সেখানে এখন গবন্মেণ্টই প্রত্যেককে অন্ততঃ চার টাকার ভাঙ্গানি হাতে রাখিতে বাধ্য করিতেছেন। যথাশক্তি মুদ্রা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করাই কারেন্সী-কর্তৃপক্ষের উপর জনসাধারণের আস্থা ফিরাইয়া আনিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

—

মিঃ ইডেনের বক্তৃতা

জেনারেল স্মাট্সের বক্তৃতার উপর মন্তব্যে এশিয়াবাসীর

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মনোভাবের যে আশঙ্কা আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা ছাপা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেণ্টে মিঃ ইডেনের বক্তৃতায় উহা সুস্পষ্ট হইয়াছে (২৯শে অগ্রহায়ণ) এবং পার্লামেণ্টে উহা যে সমর্থিত হইবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মিঃ ইডেনের বক্তৃতায় পৃথিবীর সকল সমস্যার আলোচনা আছে, কোরিয়ার স্বাধীনতার কথাও আছে, কিন্তু এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। "জোর যার মুল্লুক তার"—ভবিষ্যৎ পৃথিবীতেও যে এই মহাবাক্য অনুসারেই নূতন ত্রিশক্তির রাজনীতি পরিচালিত হইবে, মিঃ এটলী ব্যক্তিগত ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিলেও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব সরকারী ভাবে তাহা সমর্থন করিয়াছেন। মিঃ ইডেন বলিয়াছেন :

"বার বার যুদ্ধের আশঙ্কা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় শক্তিতে ও ঐক্যে দৃঢ়বদ্ধ এমন একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন যাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কোন শত্রুই সাহসী হইবে না। আজ আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি এ আয়োজন সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, যুদ্ধের মধ্যে, সন্ধির অব্যবহিত পরে এবং সুদূর ভবিষ্যতেও চিরদিন পৃথিবীর শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট রাখিবার জন্য চিরস্থায়ী সহযোগিতার বাসনা ত্রিশক্তির মনে জাগিয়াছে। এই বাসনার ভিত্তি রচিত হইয়াছিল মস্কোতে, তেহরাণে উহা দৃঢ়তর হইয়াছে। ত্রিশক্তি এক যোগে কাজ করিতে পারিবে।"

তেহরাণে ইউরোপের যুদ্ধই ছিল আলোচনার সর্বপ্রধান বিষয়, বৈঠকের পর প্রকাশিত ঘোষণায় ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। মিঃ ইডেনের বক্তৃতায় জানা গেল, সেখানে এশিয়ার ভবিষ্যৎ লইয়াও আলোচনা হইয়াছে। নিউইয়র্কের একটি খ্যাতনামা সংবাদপত্রের সংবাদদাতাও লিখিয়াছেন যে, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগর সম্বন্ধেও ষ্টালিনের সহিত চার্চিল-রুজভেল্টের আলোচনা হইয়াছে। এই যুদ্ধে এশিয়ার কোন আশা নাই, ব্রিটিশ ফরাসী ও ডাচ্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে আরও দীর্ঘকাল পরাধীনতার শৃঙ্খল বহন করিয়া চলিতে হইবে, ভারতবাসীর এই বিশ্বাস ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে।

—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্য-বিতর্ক

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এবং ডাঃ দেশমুখ বাংলার দুর্ভিক্ষে ভারত-সরকারের দায়িত্ব যে যথাবিহিত ভাবে পালিত হয় নাই তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও ভারত-সরকার কেহই এড়াইতে পারেন না মিঃ জিন্নাও ইহা বলিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদে হৃদয়নাথ কুঞ্জরু তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত-সরকারের খাদ্য-বিভাগের কর্তারা দুভিক্ষ ও মহামারীর কবল হইতে বাংলাকে মুক্ত করিবার জন্য কোন কর্মপন্থা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ১লা অক্টোবর বোম্বাইয়ে খাদ্য-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ বিনয়রঞ্জন সেন বলিয়াছিলেন, "বাংলা-সরকারের চাউল সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।" পরবর্তী আড়াই মাসে ব্যর্থতার বোঝা আরও বাড়িয়াছে, কলিকাতা হইতে বুভুক্ষু জনসমষ্টিকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্দশার মাত্রা কিছুমাত্র কমে নাই।

—

তুলা ও বস্ত্রের মূল্য

নূতন দিল্লী হইতে ১৮ই নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারত-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা তুলার দাম (৭৮৪ পাউণ্ড ওজনের) কান্দি প্রতি সর্বনিম্ন ৪০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৫৫০ টাকা বাঁধিয়া দিয়াছেন ও এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ইংরেজী বৎসর ১৯৪৩-৪৪ মরশুমের নূতন ফসলের তুলা যত অধিক পরিমাণেই হউক কিনিতে প্রস্তুত আছেন। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে, সরকারের এই সংকল্প অনেকটা দুই দিক বজায় রাখিবার চেষ্টাপ্রসূত ও সেই জন্যই ইহাতে দরিদ্র দেশবাসীর কাপড়ের কষ্ট আশানুরূপ হ্রাস পাইবে না। বর্তমানে বোম্বাইয়ের বাজারে তুলার দাম মোটামুটি ৪৬০ টাকা। ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, কারণ ইংরেজী ১৯৪২ অব্দের জানুয়ারী মাসে এই দাম মোটে ১৭৬ টাকা ছিল। ফাটকা খেলা ও তুলা ধরিয়া রাখাই এই অন্যায় মূল্য বৃদ্ধির কারণ। গত এপ্রিল মাসে যখন দর ৬১০ টাকা হইয়াছিল তখন বোম্বাইয়ের কয়েকজন তুলার বড় ব্যবসায়ী এই ধরিয়া রাখার কথা স্বীকারও করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্বোচ্চ মূল্য ৫৫০ টাকায় বাঁধিয়া দিবার ভিতর কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কৃষকের তুলার চাষে যে খরচ পড়ে তাহার সহিত ইহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কৃষকও ন্যায্য মূল্য পাইবার অধিকারী কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের মূল উপাদান তুলার

দাম চড়াইয়া অত্যধিক লাভ করিতে কৃষককেও দেওয়া যায় না।

সরকার বলিয়াছেন তুলার মূল্য সর্বোচ্চ সীমা ৫৫০ টাকায় পৌঁছিলে তাঁহারা কাপড়ের কলগুলির প্রয়োজনানুসারে তুলা আইনের দ্বারা আটক করিবেন। তাঁহারা যদি কাপড়ের কলওয়ালাদের সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন না করেন তাহা হইলে তুলার দর বাঁধিবার এই সামান্য চেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। প্রথমে তাঁহারা নিয়ম করিয়াছিলেন, ১লা আগষ্ট তারিখের পূর্বে যে-সকল কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে কাটাইয়া দিতে হইবে কিন্তু পরে কলওয়ালাদের চাপে ঐ তারিখ পিছাইয়া ৩১শে ডিসেম্বর করেন। যদি তাঁহারা ইহা না করিতেন, তাহা হইলে কাপড়ের দাম অনেক পড়িয়া যাইত ও অন্ততঃ বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট সহস্র সহস্র লোকের জীবন এই শীতকালে রক্ষা পাইত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, বাংলা-সরকার যদি মাদ্রাজ-সরকারের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রদেশের কাপড়ের কলগুলি হইতে সূতা ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে ন্যায্য মূল্যে গ্রহণ করিয়া তন্তুবায়দিগকে সরবরাহ করেন তাহা হইলে বহু দুঃস্থ লোকের এখন অন্নসংস্থান হয়।

তুলা কিনিয়া লইবার বিষয়ে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এদেশে ইংরেজ সরকারের বাণিজ্য নীতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বঙ্গদেশের মূল্যবান্ সম্পদ পাটের ক্রেতা একমাত্র বিদেশীয় বণিক্ বলিলেই চলে। পাটচাষীর ন্যায্য স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার যদি ক্রেতা দাঁড়ান তাহা হইলে পাট ও চট-থলিয়ার মূল্যের পার্থক্য অনেকটা হ্রাস পাইতে পারে।—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সর্ জন আর্থার হার্বার্টের পরলোকগমন

বাংলার ভূতপূর্ব গবর্ণর সর্ জন আর্থার হার্বার্ট কিছুকাল রোগভোগের পর গত ২৫শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

"লেফ:-কর্ণেল সর্ জন আর্থার হার্বার্ট গত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরলোকগত সর্ আর্থার হার্বার্ট জি সি ভি ও'র পুত্র। তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওয়েলিংটনে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৬ সালে লেঃ-কর্ণেল হার্বার্ট রয়াল হর্স গার্ডস্ সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করেন এবং তথায় দুই বৎসর কার্য্য করেন; ১৯৩০ সালে তিনি মেজর পদে উন্নীত হন। তিনি ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড আরুইনের (লর্ড হ্যালিফাক্স) এডিকং ছিলেন। ভারতে থাকাকালে খেলোয়াড় হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৯৩৪ সালে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

"তিনি ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের রক্ষণশীল দলের (মন্‌মাথ্ নির্বাচনকেন্দ্র) সভ্য ছিলেন। ১৯৩৭ সাল হইতে তিনি রক্ষণশীল দলের অবৈতনিক সহকারী হুইপ হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। তৎপর ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে তিনি বাংলার গবর্ণরপদে নিযুক্ত হন।

"তিনি ১৯২৪ সালে ইলচেষ্টারের ৬ষ্ঠ আর্লের অন্যতমা কন্যা লেডী মেরী থেরেসা ফক্স-ষ্ট্রাঙ্গুয়াকে বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র আছেন।"

আমরা লেডী হার্বার্ট ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদকের নিবেদন

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলির সম্পাদন ও ফুটনোট লিখন ইত্যাদি শ্রীশান্তা দেবীর সাহায্যে করা হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাজারে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বর্ত্তমানে অর্দ্ধ-পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপনদাতা বা এজেণ্টগণকে সম্পূর্ণ প্রবাসী এক খণ্ড দিতে আমরা অসমর্থ। তাঁহারা বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিদর্শনরূপে যে পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে তাহার কাটিং মাত্র পাইবেন। কাগজ প্রাপ্তির অবস্থার উন্নতি ঘটিলে তখন অনুরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫

আমবাগানের ঘাটে ষ্টীমার ভিড়িল। দূর হইতে ছবির মত মনে হইতেছিল—গ্রামখানিকে। গঙ্গার ঈষৎ উঁচু পাড়—ভাঙনের ভ্রূকুটি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ নদীও একদিক ভাঙিয়া অন্য দিকে নীচু তট রচনা করিয়া যায়। তবে পদ্মার মত ভূমিগ্রাসের লোলুপ ক্ষুধা ইহার নাই। পূর্ব্বে হাতষাটেক দূরে শ্মশান-ঘাটের প্রান্তে আসিয়া ষ্টীমার লাগিত। কুড়ি বৎসরের মধ্যে ওইটুকু মাত্র জমি গঙ্গা গ্রাস করিয়াছেন। আমবাগানের কয়েকটি বৃক্ষও গঙ্গাগর্ভশায়ী হইয়াছে এবং আমবাগানের ও-পিঠেই কমলাদের বাড়িখানি লইয়াও ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছিল কিছুদিন আগে। এখন পূজা-অর্চ্চনায় গঙ্গাদেবী তুষ্ট হইয়াছেন। ভাঙনের বেগ মন্দীভূত হইয়া খানিকটা সমতল বালু-আকীর্ণ প্রান্তরও যেন দেখা দিতেছে। বাগানটা বাঁচিলে—বাড়িখানিও রক্ষা পাইতে পারে।

গঙ্গার ঘাটে কমলা নিজে আসিয়াছেন। তাঁহার ছোট ছেলে ও নয় বৎসরের মেয়েটিও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দূর হইতে ছেলেদের কাপড়-আন্দোলনের ঘটা দেখিয়া যোগমায়া সেটুকু অনুমান করিয়াছিলেন। ঘাটে ষ্টীমার ভিড়িতেই ছেলেরা কোলাহল করিয়া উঠিল, মামীমা।

কাঠের সিঁড়ি তখনও ভাল করিয়া লাগানো হয় নাই, ছোট ছেলে লাফাইয়া ষ্টীমারে উঠিল। একজন চট্টগ্রামবাসী মাঝি মোটা নারিকেল কাছি ধরিয়া তক্তাখানি ঠিক করিতেছিল, বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, আঃ—লাফাইছেন ক্যান কর্ত্তা। সারেং দোতলার ছোট ঘরটির বাহিরে রেলিঙ ঠেস দিয়া যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখিতে লাগিল।

ভিড় একটু কমিলে যোগমায়া নামিয়া আসিলেন। মণীশ খালাসীদের মাল নামাইতে দিল না, নিজেই কাঁধে তুলিয়া লইল ও জীবনের কাঁধে কিছু বা চাপাইয়া দিল। কমলা হাসিয়া যোগ-মায়াকে অভ্যর্থনা করিলেন।

বেশ ছোট গ্রামখানি। বসতি ঘন না হইলেও বিরল নহে। সকলেরই বসতবাটী ছাড়া—অন্ততপক্ষে একখানি বাগান আছে, একটা পুকুর আছে। মেটে পথ—ধুলা হাঁটুভোর নহে। মোড়ে মোড়ে সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো ঝাঁকড়া বকুল গাছ; অশ্বত্থ গাছের তলায় নোড়ানুড়ি অর্থাৎ ষষ্ঠীদেবীর আবাসস্থল। ছোট ময়রার দোকান, মুদিখানা, ছোট পাঠশালা। গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির হইতে কাঁসর ঘণ্টাবাদ্য সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় শোনা যায়। বাগানময় গ্রাম বলিয়া গুমোটভরা দিনেও বেশ স্নিগ্ধ বোধ হইতেছে। আমবাগানের মধ্যেই একটা পানাভরা পুকুর আছে—টোপা পানায় ভরা পুকুর। ঘাটের কাছে খানিকটা তকতকে জল দেখা যায়—লোকজনের হাতের ঠেলায় সেখানে পানা জমিতে পায় নাই। এ-ঘাটে পানার ভয়ে স্নান বড় কেহ করে না—শুধু বাসন মাজিবার জন্য কুলবধূরা সকালে ও দুপুরে এখানে আসে। স্নান করিবার জন্য ঠিক একখানি ফালি বাগানের ওপারে চক্রবর্ত্তী-দের বড় পুকুর আছে। শান-বাঁধানো চওড়া ঘাট। ঘাটে যাইবার দু-পাশে অশোক চন্দন প্রভৃতি তরুরাজি, আম, নারিকেল ও কাঁঠাল গাছের ঘনত্ব মনকে খুসি করিয়া তুলে।

আমবাগানের মধ্য দিয়া যোগমায়া কমলাদের বাড়ির সামনে আসিলেন। প্রকাণ্ড সিং-দরজার দু-পাশেই দু'টি প্রশস্ত বৈঠক-খানা। চওড়ায় হাতআষ্টেক হইলেও লম্বায় কুড়ি-পঁচিশ হাতের কম নহে। ঝাড়-লণ্ঠন দেয়ালগিরি ও ছবি আয়নায় বৈঠকখানা ঘর সুসজ্জিত। সবগুলিই বিলাতী ছবি নহে। বুয়র যুদ্ধের, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার, ইংলণ্ডের রাজ-দরবারের ছবির পাশে হর-কোপানলে মদন ভস্ম, গৌরীর পিত্রালয়ে আগমন, রাস-পূর্ণিমায় গোপীমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা, শ্রীচৈতন্যের নগর সংকীর্ত্তন, বিজয়ায় হিমালয়পুরীর শোকমলিন ভাব—রুচিসম্মতভাবেই সাজানো। হরিশবাবু লোকটি রসজ্ঞ। সাপ্তাহিক হিতবাদীর তিনি গ্রাহক এবং হিতবাদী-প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নাটক নভেল প্রভৃতির নিয়মিত সংগ্রাহক। এই সব সৎ গ্রন্থাবলীর কল্যাণে ক্ষুদ্র একটি পাঠাগার গড়িয়া উঠিয়াছে এখানে।

কমলার পুত্রবধূ আসিয়া যোগমায়ার পায়ের ধুলা লইল। দিব্য ফুটফুটে ছোটখাটো বউটি। সলজ্জ চলন, হাসি হাসি মুখ—আধ-ঘোমটা দিবার ভঙ্গিটুকুও মনোরম। কোলের হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটিও ভারি শান্ত। হাত পাতিতেই যোগমায়ার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মিষ্টির হাঁড়ি পরে খোলা হইবে, যোগমায়া তাহার হাতে একটি টাকা দিলেন।

কমলা হাসিয়া বলিলেন, টাকার তো সবই বোঝে ও!

যোগমায়া বলিলেন, বোঝে না কি ঠাকুরঝি। কাঠের পুতুলও টাকার জন্য হাঁ করে। এই দেখ—কেমন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে।

আপ্তসারা ছেলে। বলিয়া গাল টিপিয়া কমলা নাতিটিকে আদর করিলেন।

বারান্দার ওপার হইতে হরিশবাবু বলিলেন, হঠাৎ পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠলো কেন—বউ?

—পূবের সূর্ষ্যি পশ্চিমে না উঠলে তোমাদের দর্শন পাওয়া যায় না যে ঠাকুরজামাই।

—তবু ভাল! পর্ব্বত মহম্মদের কাছে না গেলেও মহম্মদ আসেন পর্ব্বতের কাছে।

—তোমরা কি পর্ব্বত ঠাকুরজামাই?

—আর বয়স তো হচ্ছে। পাহাড়কে তবু নড়ানো সম্ভব—আমরা দিন দিন অনড় হয়ে পড়ছি। থাকবে তো দু-এক দিন?

—কোথায়! পরশুই যেতে হবে।

—কেন, পায়ে কাক বেঁধে আসার মানে?

—মানে পরে বুঝো'খন। কমলা চাপা ধমকের সুরে বলিলেন। মানুষটা তেতেপুড়ে এলো—একটু জিরুক, তার পর তোমার উকিলের জেরা চালিও।

—উকিল আমি নই, কনট্রাক্টরি করি। তা ভয় নেই, জলটল খেয়ে জিরোও। জেরা আর করব না।

যোগমায়া হাত-মুখ ধুইয়া মাদুরের উপর বসিয়া বলিলেন, দিব্যি ফুটফুটে বউটি এনেছ ঠাকুরজামাই, দেখে হিংসে হয়।

হরিশবাবু বলিলেন, কনট্রাক্টার হলেও ঘটকালিতে আমার হাতযশ আছে। তোমার হিংসা দূর করবার ক্ষমতাও রাখি—বউ।

—বেশ ত, আমার বিমলের জন্য অমনি টুকটুকে আর লক্ষ্মী বউ একটি এনে দাও না।

—টুকটুকে বউ এনে দিতে পারি, কিন্তু দেবীটেবী আনবার কথা দিতে পারি না। ওটা কপাল।

—কপাল তো বটেই। ভাল ঘর—ভাল বংশ এই সব দেখলেই যথেষ্ট।

—তাই আছে। তোমার ঠাকুরঝি তোমাদের লেখেন নি কিছু?

—লিখেছিলেন অনেক দিন আগে। তখন বিমলের বিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না।

—আজ মেয়ে পরের ঘরে পাঠিয়ে পরের একটি মেয়ে আনবার সাধ বুঝি খুব বেড়ে উঠেছে?

যোগমায়া হাসিলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তা ছাড়া—শোন তবে সব খুলে বলি।

সমস্ত শুনিয়া হরিশবাবু বলিলেন, তা ও রোগের যে ওই দাওয়াই—তোমাকে বাত্‌লালে কে বউ?

—কে আবার বলবে—আমি বুঝি জানি নে!

হরিশবাবু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তোমরা জান না—এ কথা আমি বলি না। তোমরা যদি না জানবে তো ঘরে ঘরে আমাদের এমন সুশীল সুবোধ বালকরা এলো কোথা থেকে? একটি দু'টি নয়, ঘর বোঝাই।

যোগমায়া অবাক্ হইয়া হরিশবাবুর মুখের পানে চাহিলেন।

হরিশবাবু বলিলেন, অবাক্ হচ্ছ কেন—বউ, শান্তিপূর্ণ সংসার ত তোমাদেরই সৃষ্টি! যেখানে আগুন জ্বলে—জল ঢেলে তোমরা নিবিয়ে দাও। যেখানে দুষ্ট ঘোড়া রাশ ছেঁড়বার যোগাড় করে—সেইখানেই বল্গা টেনে রাখ তোমরা। তোমরা যে শান্তিময়ী।

যোগমায়া বলিলেন, ঠাট্টা করছ—ঠাকুরজামাই?

—ঠাট্টা! কেন—শক্তিময়ী বলি নি ব'লে ঠাট্টা মনে করছ। তা বউ, শক্তিময়ীর দরকার ত চিরদিন থাকে না। সে এক কালে ছিল, যখন ওঁদের প্রভাব ছিল বেশি, স্তুতি করত লোকে। এখন শান্তির যুগ আসছে—কাজেই শান্তিময়ীর প্রশস্তিই আমরা করি।

কমলা বলিলেন, বসে বসে আদিখ্যেতার কথা শুনিস্ নে বউ, মেয়ে যদি দেখতে চাস, আজ বিকেলেই দেখাতে পারি।

—বেশ ত—কোন্ মেয়েটি শুনি না।

—জয়ন্তী-দিদির নাম জানিস্ ত। বাঁড়ুয্যে-বাড়ির জয়ন্তী-দিদির একটি ভাই-ঝি আছে। পরমা সুন্দরী। আর তেমনি গুণ। লেখাপড়াও জানে।

হরিশবাবু বলিলেন, সুর করে রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে, দাশু রায়ের অনেক পাঁচালী তার কণ্ঠস্থ। আর রাম প্রসাদী গান এমন গায়!

কথা শুনে গা জ্বালা করে! মুখ ঘুরাইয়া কমলা বলিলেন, গেরস্থর বউ—গান গেয়ে কি করবে শুনি?

—কেন, পরকালের পথে খানকটা এগিয়ে দেবে। দেহ-তত্ত্বের গান।

যোগমায়ার হাত ধরিয়া কমলা টানিয়া তুলিল ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, নাস্তিক মানুষের কথা শুনলেও প্রাশ্চিত্তি করতে হয়। তুই এ ঘরে এসে বস বউ।

হরিশবাবু হাসিমুখে উঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এক কাপ চা আর দুখানা বিস্কুট পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর। তবে রোগ নির্ণয়ে ভুল করলে, বউ। ছেলের মধ্যে যদি তোমার বারুদ থাকে—লাভে হ'তে আর একটি প্রাণীকে জ্বালাবার ব্যবস্থা করছ।

যোগমায়া বলিলেন, ঠাকুরজামাই কি বললেন ভাই?

—ওঁর ওই রকম। নিজে এক বার স্বদেশী করে জেলের দুয়োর পর্য্যন্ত এগিয়েছিলেন কিনা তাই।

—উনি আবার স্বদেশী করলেন কবে?

—সে অনেক দিন আগে। তখন বোম্বায়ে থাকতেন। প্রথম স্বদেশী সভা ত ওখানেই হয়। উনি গিয়েছিলেন।

—তার পর?

—তার পর আবার কি, দু-দিনের সখ দু-দিনেই শেষ! একটু জল খেয়ে নাও।

—ওমা, তুমিও আবার কুটুম্বিতে আরম্ভ করলে ঠাকুর-ঝি!

—কুটুম্বের বাড়ি এসেছ—কুটুম্বিতে করব না? নাও—বস।

আহার শেষ করিয়া একটু গড়াইতেই যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন জাগিলেন—বেলা অনেক পড়িয়া আসিয়াছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন, যাঃ—সন্ধ্যে হ'য়ে এল! আমায় জাগালে না কেন—ঠাকুর-ঝি?

কমলা হাসিয়া বলিলেন, মেয়ে ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না, কাল দুপুরে দেখলেই হবে।

—কাল যে আমি ফিরব মনে করছি।

—তোমার ঠাকুরজামাই কি সাধে বলেন—পায়ে কাক বেঁধে এসেছ!

—বাড়িতে কেউ নেই যে ভাই ঠাকুরঝি।

আচ্ছা—আচ্ছা—পরশু যেয়ো। একটি দিনে আর কিছু ভাঁড়ে খাড় খেয়ে যাবে না। একটু হাসিয়া বলিলেন, তা ছাড়া বাচা নেমন্তন্ন কখনও ছাড়তে আছে!

—কে আবার নেমন্তন্ন করলে?

—জয়ন্তী-ঠাকরুণ এসেছিলেন যে। ছেলের মা তুমি তোমার এখন খাতির কত!

—কি বললেন ঠাকরুণ?

—বললেন, কাল একাদশীর পারণ, গুটি-পাঁচেক বামুন ত খাবেই—তোমরাও অমনি—

—সংসঙ্গে কাশীবাস বল।

—না লো, ব্যাগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।

কমলার পুত্রবধূটিকে যোগমায়া বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কেমন ঘুর ঘুর করিয়া ঘুরিতেছে। শাশুড়ীকে মৃদু ও মিষ্ট স্বরে কখনও বলিতেছে, পান খাবেন মা? কখনও বলিতেছে, দোক্তা আর একটু দেব? একটু পা টিপে দিই না মা? পাকা চুল তুলে দেব? চুলটা বেঁধে দিন তো। খোকাটা আজ বড় দুষ্টুমি করছে—একটু কোলে নিন না। আজ একটু তেঁতুলের টক খাব মা? না, খোকা ত এখন মাই ছেড়েছে—কিচ্ছু হবে না। আজ মামীমা এসেছেন—ওঁকে ওলের চাটনি করে খাওয়াব। মন্তর না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না কেন মা?

এমনি সব সেবা-মমতার অনুনয়, সহজ আব্দার ও নির্ব্বোধ প্রশ্ন। বউটির কথার মত হাতের স্পর্শটিও ভারি মিষ্ট। এক বার শাশুড়ীর নির্দ্দেশে যোগমায়ার পা টিপিতে আসিয়াছিল। যোগমায়া তাহার হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার কষ্ট হবে মা, থাক।

—নাত! আমার কষ্ট হয় না।

কেমন মিষ্ট কথা। সারা অপরাহ্ণ ও রাত্রির মধ্যযাম নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত এই সেবাপরায়ণা ও প্রতিমময়ী বধূটিকে কল্পনা করিয়া যোগমায়া আবিষ্ট হইয়া রহিলেন। উদ্যানের শোভা যেমন ফুল, সংসারের শোভা তেমনই বধূ।

বেলা দশটার পরই জয়ন্তীদের বাড়িতে যোগমায়ারা আসিয়াছেন। মেয়ের মা আদর করিয়া গালিচা পাতিয়া ইঁহাদের বারান্দায় বসাইয়াছেন। জয়ন্তী দেবীও হাতাখুন্তি হাতে এক বার দর্শন দিয়া আপ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন, একটু বস মা। পায়েসটা চাপিয়ে এসেছি—লুচি ক-খানা ভেজেই বেরাস্তন ভোজন করিয়ে—মেয়ে দেখাবো 'খন।

সুতরাং ভাবী পুত্রবধূ ব্যতীত এই বাড়ির অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে যোগমায়ার একটু-আধটু পরিচয় হইয়াছে। জয়ন্তী দেবীর প্রবল প্রতাপ এ-বাড়িতে। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার সাহস মেয়েদের তো দূরের কথা—পুরুষদেরও নাই। তখন কৌলীন্য-প্রথার যুগ। কুলরক্ষার্থ জয়ন্তীর পিতা অশীতিবর্ষের এক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদারের সঙ্গে অষ্টম বর্ষীয়া জয়ন্তীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের সেই ধুমধামের বর্ণনা এখনও জয়ন্তী দেবীর মুখে শোনা যায়, কিন্তু স্বামীকে লইয়া তিনি কোন দিন গৌরবের গল্প ফাঁদেন নাই। এক বার মাত্র শ্বশুর-বাড়ি গিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে সভয়ে জয়ন্তী দেবী সেই আবক্ষলম্বিত পক্ক শ্মশ্রুযুক্ত পুরুষপ্রবরটিকে দেখিয়াছিলেন, আর দেখেন নাই। যাত্রাদলের নারদ ঋষিকে দেখিয়া জয়ন্তী দেবীর স্বামীর কথা মনে পড়িত এবং মুখ ঘুরাইয়া কতবার মন্তব্য করিতেন, মুখ-পোড়া মিন্‌সের রকম দেখ! মরেও না।

মনের অসুখকে ঢাকিতে বাবা ধনের পাহাড় চাপাইয়াছিলেন মেয়ের মাথায়। শ্বশুরকুলের বিষয় বুঝিয়া লইবার শিক্ষাও দিয়াছিলেন। ফলে—বাপের আদরে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে ও স্বাধীন চিত্তের অকুণ্ঠ প্রসারে জয়ন্তী দেবী মুখরা নারীতে পরিণত হইয়াছিলেন। অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করাতেই যেন তাঁর আনন্দ, লোককে রসনা-বাণ নিক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াই বুঝি তাঁহার তৃপ্তি। তাঁহার সম্মুখে কাহারও মাথার কাপড় খাটো হইবার উপায় ছিল না, জোরে হাসিবার শক্তি ছিল না; তিনি 'না' বলিলে 'হ্যাঁ' করাইবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। তীর্থধর্ম্মের উপর তিনি ছিলেন বীতস্পৃহ কিন্তু প্রতি দ্বাদশীতে নিয়ম করিয়া পাঁচটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। বলিতেন, একাদশীর জ্বালা—বড় জ্বালা। বোশেখ-জ্যষ্টির দুপুরে জল তেষ্টায় প্রাণ টা—টা করতে থাকে; বুকে ভিজে গামছা দিয়ে ছেলেবেলায় বেহুঁস হয়ে থাকতাম। মা কাঁদতেন, বাবা কাঁদতেন—তবু এক ফোঁটা জল কেউ খাওয়াতে পারে নি। বিধবার পেরাণ কি অমনি বেরয় গো। তাই বামুন খাওয়াচ্ছি, আরজন্মে যেন একাদশীর জ্বালা সইতে না হয়।

জয়ন্তী দেবীর ভ্রাতৃ-বিয়োগের দিনটি এখনও এই গ্রামে গল্পচ্ছলে কথিত হয়। ভ্রাতার মৃতদেহ ঘিরিয়া সকলেই কাঁদিতেছে—জয়ন্তী দেবীও কাঁদিলেন। দাহকার্য্য শেষ হইবার পর তিনি উঠিয়া বসিয়া সংসারের কাজ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবধূ তখনও কাঁদিতেছে দেখিয়া বলিলেন, কাঁদবে না, অনেক সুখভোগ করেছে—অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবে বইকি। আমি যতটুকু সুখভোগ করেছিলাম—ততটুকু কাঁদলাম।

এখন জয়ন্তী দেবী বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, বিষয়ের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। যাহা আছে—কোন প্রকারে তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে পারে। আর কতদিনই বা! দেহের সামর্থ্য কমিয়া আসিতেছে; চোখের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ঘটিতেছে—শুধু সতেজ আছে রসনাটি।

কেহ যদি বলেন, আর ক'টা দিনই বা, বৈকুণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে শীগ্‌গির মিলবে দিদি।

জয়ন্তী দেবী ঝঙ্কার দিয়া উঠেন, কেন, কি দুঃখে ওর সঙ্গে

মিলতে যাব লো ? সুখের মধ্যে তো দিলেন সারাজীবন একাদশী, ওর সঙ্গে কোন্ সুখে মিলবো লো ? মরি—ভাগাড়ে টেনে ফেলে দিস, গঙ্গায় দিসনে। আমার নরকই ভাল।

বারান্দায় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন আহার করিতে। যোগমায়ারা পাশের ঘরে বসিয়া ইঁহাদের ভোজন-ক্রিয়া দেখিতেছেন। জয়ন্তী দেবী নিজে পরিবেশন করিতেছেন। অশীতিপর বৃদ্ধার কর্ম্মপটুত্ব অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন যোগমায়া। অত বড় পায়েসের কড়াইটা একাই টানিয়া আনিলেন—জয়ন্তী দেবী। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আর দু'খানা লুচি দিই—পায়েস দিয়ে খাও।

সে ছোকরা ঘাড় নাড়িয়া প্রবল আপত্তি জানাইতেই তিনি মুখ ভঙ্গিমাসহকারে বলিলেন, খাবে কোত্থেকে? বাড়িতে না খেতে পেয়ে পেট তো মরে গেছে। পায়েস খেয়েছ কখনও, না কপাল করেছ কখনও ?

স্থূলোদর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, আমাকে আর দু'খানা লুচি দেবেন, দিদি ?

দিই। জয়ন্তী দেবী হাসিমুখে লুচি দিয়া বলিলেন, আর দেব ?

ঘাড় নাড়িয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, তা দিন।

ছোট ধামিতে যতগুলি লুচি ছিল দু'হাতে সবগুলি তুলিয়া তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া জয়ন্তী দেবী মুখভঙ্গিমাসহকারে বলিলেন, খাও, রাক্ষস, খাও। দু'খানা খাব বলে রেখেছিলাম—তা তোমার গর্ব্বেই যাক। এইবার অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা হাসিয়া উঠিলেন। এ ঘরে মেয়েরাও হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িল।

জয়ন্তী দেবী এমন ধারা অপ্রিয় কথাই বলিয়া থাকেন। তাঁহার কথায় লোকে রাগ করে না, কৌতুক অনুভব করে।

কনে দেখা ও পছন্দ হইল। ঠিক কমলার পুত্রবধূটির মত সুন্দরী নহে, তবু যোগমায়ার ভালই লাগিল। তাঁহার পা ছুঁইয়া মেয়েটি যখন প্রণাম করিল—তখন স্নেহবিগলিত হইয়া যোগমায়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন। সেই প্রণাম ও চুম্বনের মধ্য দিয়াই ভাবী সম্বন্ধটি তিনি মনে মনে পাকা করিয়া লইলেন।

বলিলেন, আর দেরী করব না, দিদি। বাড়ি গিয়েই ওঁকে চিঠি দেব। অঘ্রানের প্রথমে যদি ভাল দিন থাকে—

জয়ন্তী দেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, অঘ্রানে তো হবে না, বোন। কুমুর বয়স কত লা ছোটবউ ?

ছোটবউ অর্থাৎ মেয়ের মা বলিলেন, গেল চোতে বারো উৎরে তেরয় পা দিয়েছে।

জয়ন্তী দেবী বলিলেন, তবে ? আসছে বোশেখে মেয়ে চোদ্দয় পড়বে। বোশেখ মাসেই দিন স্থির কর।

—বড্ড দেরি হবে না ?

—কি করব ভাই, যে বাড়ির যে নিয়ম। চোদ্দয় না পড়লে এ বাড়িতে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ নেই—ভাই।

জয়ন্তী দেবীর কথার উপর কথা চলে না। বিদায় লইবার সময় মেয়ের মা বাড়ির দুয়ার গোড়ায় আসিয়া—যোগমায়ার দু'টি হাত চাপিয়া ধরিয়া অনুনয়ভরা কণ্ঠে কহিলেন, কুমুকে পায়ে ঠাঁই দেবেন, দিদি। আমরা বড় আশায় রইলাম।

যোগমায়া চিন্তিত মুখে বলিলেন, বড্ড দেরি হয়ে যায়, তা ওঁকে চিঠি লিখি।

—কথা দিন, দিদি।

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, মানুষের কথার দাম কতটুকুই বা। তবু অঘ্রানে যদি খোকার বিয়ে না হয় তো কথা দিলাম তোমার মেয়েকেই ঘরের বউ করব। ভারি পছন্দ হয়েছে আমার।

ক্রমশঃ

শিশু-শিল্প

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

এক টুকরো কাগজ ও পেন্সিল হাতে পেলে ছোট শিশুরা পরম উৎসাহে মনের আনন্দে হিজিবিজি কাটতে শুরু ক'রে দেয়, এটা বোধ করি সকলেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। দু-বছর আড়াই বছরের শিশু থেকে দশ-বার বছরের বালক-বালিকাদের মধ্যে এই বৃত্তিটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, তফাৎ এই যে অপেক্ষাকৃত ছোটদের প্রয়াসমাত্র হিজিবিজিতে দাঁড়ায় আর বড়দের দাঁড়ায় ছবিতে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন ক'রে দেখলে দেখা যাবে—অল্পবয়স্ক শিশুদের এই আঁচড় রেখা নিতান্ত এলোমেলো অর্থহীন হিজিবিজি মাত্র নয় পরন্তু তা উদ্দেশ্যমূলক ও অর্থপূর্ণ। এই হিজিবিজিই হ'ল শিশুর ছবি আঁকার সূত্রপাত। শিশুর মুখের কাকলি ধীরে ধীরে স্ফুরিত হয়ে যেমন ভাষায় পরিণত হয়, তার এই

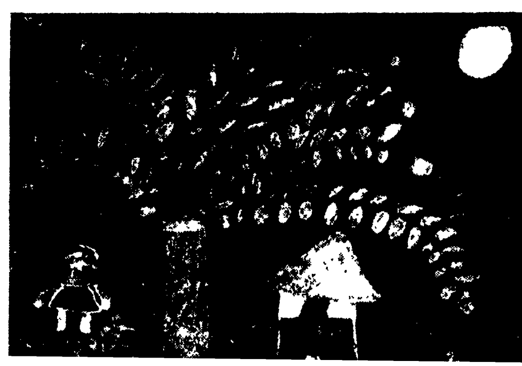
অসংলগ্ন রেখাবলী তেমনই ধীরে ধীরে আকৃতি লাভ ক'রে চিত্রে পরিণত হয়। শিশুর এই দু-প্রকার প্রচেষ্টাই তার অনুকরণ প্রয়াসলব্ধ। বয়স্কদের মুখের ভাষা এবং লেখার বা ছবি আঁকার ভঙ্গী হ'তেই শিশুরা অনুকরণ করতে শেখে।



মেষপালিকা
বার বৎসরের বালিকা কর্ত্তৃক অঙ্কিত

মুখের ভাষা স্ফুরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই রেখার ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করবার ইচ্ছা শিশুদের মধ্যে জাগে। কিন্তু শব্দ-ভাষা অপেক্ষা রূপ ও রঙের ভাষা শিশুদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট এবং ভাবপ্রকাশের সহজতর বাহন, তার কারণ-শব্দ ভাষা হ'ল প্রতীকরূপ (symbolic) আর রূপের ভাষা বাস্তব (concrete)। শিশুরা তাদের মনের ভাবগুলি রূপ ও বর্ণবিন্যাসের সাহায্যে যেমনটি ভাবে ব্যক্ত করতে ভালবাসে তেমনটি আর কিছুতে নয়। এই কারণেই শিশুরা হাতে ধুলা-মাটি বা রং-তুলি পেলে সকল ভুলে এমন বিভোর হ'য়ে রূপ রঙের খেলা খেলতে ভালবাসে। তাদের এই খেলায় সৃষ্টি হয় শিশু-শিল্প।

শিল্পে আমরা পাই শিল্পীর মনের স্পর্শ। বহির্জগতের স্পর্শে শিল্পীর মনে একটি অন্তর্জগতের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রকাশেই শিল্পের সার্থকতা, মাত্র বহির্জগতের অনুকরণে তা ব্যর্থ হয়। একই বস্তু একই দৃশ্য বিভিন্ন শিল্পীর মনের স্পর্শে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকাশ-নৈপুণ্য গুণে সেই রূপ শিল্পজগতে চিরন্তন আসন লাভ করে। শিশুদের নিজেদের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ কল্পনাধারা এবং বহির্জগতের সহিত একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে; এ ক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তিদের সহিত তাদের কোথাও মিল নেই। তা ছাড়া রং ও রূপের আস্বাদন শক্তি শিশুদের মধ্যে যেমন জীবন্ত ও প্রখর বয়স্কদের মধ্যে তেমন নয়। এ সবের দ্বারা তারা বাস্তব জগৎকে রূপান্তরিত ক'রে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র কল্পনাময় জগৎ সৃষ্টি ক'রে তাতেই মনের আনন্দে বাস করে। এখানকার আইন-কানুন নিয়ম প্রভৃতি স্বতন্ত্র। এই জগৎ একান্ত তাদেরই। এই স্বপ্নজগতে বিচরণ ক'রে শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎ মনের খাদ্য সংগ্রহ ক'রে থাকে। বাস্তব জগতের সহিত এ জগতের কতই না প্রভেদ, অথচ এ জগৎ কতই না সত্য! সৃষ্টির পরমানন্দে উৎফুল্ল হয়ে শিশু যখন তার এই পরমাশ্চর্য জগতের বার্তা রূপ ও রঙের লিখন খেলায় প্রকাশ ক'রে থাকে তখন সে-সকল আশ্চর্য সৃষ্টি যে অভিনব হবে তাতে আর সন্দেহ কি? প্রাকৃতিক জগতে সে-সকল রূপের অনুরূপ কোথাও হয়ত মিলবে না কিন্তু তারা যখন আপন সত্য নিয়ে প্রকাশ পায় তখন ত তাদের অগ্রাহ্য করা চলবে



শিশুর বাগান
ছয় বৎসরের বালিকা কর্ত্তৃক অঙ্কিত

না। তবে এ কথা ঠিক যে, বয়স্কদের মাপকাঠিতে এ বস্তুর বিচার করা কখনই সম্ভব নয় এবং তা করতে যাওয়ায় হবে পরম ভুল। যদি সহজ দৃষ্টিভঙ্গী ও সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গী শিল্পের বড় গুণ হয় তাহ'লে আমি বলি শিশু-শিল্প-কলায় আমাদের দেখবার ও শেখবার অনেক কিছু আছে।

শিশু-শিল্পে মুগ্ধ হয়ে ইউরোপের একদল শিল্পী (Post impressionist এবং Surrealist গোষ্ঠীর Matisse, Paul Klee, Franz Marc প্রভৃতি) শিশুর এই সহজ দৃষ্টিভঙ্গী ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী তাঁদের শিল্পে প্রবর্তিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু শিশুর পক্ষে যা স্বাভাবিক



একখানি মুখ
এগার বৎসরের বালিকা কর্তৃক অঙ্কিত

বয়স্কদের পক্ষে তা কৃত্রিম হয় মাত্র। সুতরাং তাঁদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল বলতে হবে।

পূর্বেই বলেছি শিশুদের একটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে যা বয়স্কদের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিশুদের মনস্তত্ত্ব যদি আমরা সম্যক্ বুঝতে পারি, যদি তাদের এই মনোজগতে আমাদের প্রবেশাধিকার জন্মে তাহলে শিশু-শিল্প বুঝা কঠিন হবে না। প্রথমেই বলে রাখি সৃজনীশক্তি শিশুর জন্মগত, কল্পনাশক্তি তার তীব্র এবং সীমাহীন ও বাধাহীন। পর্যবেক্ষণ-শক্তিও শিশুর তীক্ষ্ণ, কিন্তু তার প্রণালী ভিন্ন রকম। সে যা দেখে তা নিজের দৃষ্টি দিয়ে মন দিয়ে দেখে, বাইরের দৃষ্টি দিয়ে সে কখনও দেখতে জানে না। এই ক'টি মূলধন নিয়ে তার মনোজগতের কারবার শুরু হয়। বস্তু-জগৎ থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে তার স্বভাবগত সৃজনী-শক্তি ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে সে নিজের একটি মনো-জগৎ সৃষ্টি করতে থাকে। সে জগৎ কিরূপ? সেখানে মানুষজন পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ আছে, গাছপালা বন জঙ্গল নদী পর্বত আছে, চন্দ্র সূর্য তারা আছে, জাহাজ রেলগাড়ী এরোপ্লেন মোটর গাড়ীও আছে, আর আছে আশেপাশে শিশুরা সদা সর্বদা যা দেখে শোনে তাই। কথা হতে পারে, বস্তুজগতের যদি সবই থাকল তাহলে সে-জগতে এ জগতে প্রভেদ রইল কোথায়? প্রভেদ হচ্ছে উপাদান-গুলির রূপভেদে এবং তাদের অভিনব পরিবেশে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করি। দেখা গেছে শিশুরা তাদের তাজা অভিজ্ঞতা থেকে চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে ভালবাসে। তারা যা দেখে যা শোনে তাই আঁকবার জন্য ব্যগ্র হয়। সেইমত জাহাজ দেখে একটি শিশুর মনে জাহাজ আঁকবার ইচ্ছা জাগল। জাহাজটিকে সে পর্যবেক্ষণ করল তার নিজের প্রণালীতে। বিরাট্কায় জাহাজের অজস্র খুঁটিনাটিসকল তার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় এবং সে তা দেখতেও চায় না। জাহাজের আসল রূপটি তার চোখে পড়ল—বিরাট্কায় একটি আকৃতিবিশেষ। তার পর জাহাজের যে-অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল সেগুলি তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে সচল ধূমোদ্গীরণকারী দুটি প্রকাণ্ড চিমনিই শিশুদের অবাক্বিস্ফারিত নয়ন দুটি আকৃষ্ট ক'রে থাকে। দৈবক্রমে জাহাজের বাঁশীটি যদি সেইক্ষণে বেজে ওঠে তাহলে সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটিও তার মনে মুদ্রিত হয়ে যাবে। এমন আশ্চর্য বস্তুটি আঁকবার জন্য শিশু স্বভাবতই ব্যগ্র হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।



ফানুসওয়ালা
নয় বৎসরের বালিকা কর্তৃক অঙ্কিত

বাড়ী ফিরে এসে শিশু যখন জাহাজের ছবি আঁকতে বসবে তখন দেখা যাবে যে প্রায় সমস্ত কাগজখানি জুড়ে বসেছে জাহাজের বিপুল কায়াটি এবং অন্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে হচ্ছে দুটি প্রকাণ্ড চিমনি যা থেকে কালো ধূম উৎক্ষিপ্ত

হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর বাঁশীটিও তার স্বাভাবিক আকারকে লঙ্ঘন ক'রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এখন এ হেন আশ্চর্য বস্তু দেখতে কত আনন্দই না হয়! এ বস্তুটি যদি তার বাড়ীর পাশেই বাঁধা থাকত তাহলে সে কি আনন্দের বিষয়ই না হ'ত! শিশুর মনে এই ইচ্ছা জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল জলের ধারে এক টুকরো ভূখণ্ডের ওপর একটি ক্ষুদ্র গৃহ গড়ে উঠেছে এবং তার বহিরঙ্গনে দাঁড়িয়ে দুটি শিশু বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে। এখানে প্রশ্ন করলে জানতে পারা যাবে যে, শিশু দুটির মধ্যে একটি সে-নিজে অপরটি তার ছোট বোন।



মাটির মূর্ত্তি
দশ হইতে বার বৎসরের বালক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

শিশু আর্টিষ্ট বিরাট্‌কায় জাহাজটিকে সমুদ্র থেকে টেনে এনে আপন গৃহপাশে বাঁধল। তার পর তার ইচ্ছা জাগল এমন বিচিত্র বস্তুতে চড়ে বেড়াতে পেলে কত স্ফূর্তিই না হবে! ইচ্ছা জাগবামাত্র দেখা গেল দুটি শিশু জাহাজের ওপর ইতস্তত: বিচরণ করছে। এই শিশু দুটিই যে উক্ত তীরবর্তিনী শিশু বালিকা দুটি, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্ফূর্তি হয় যদি জাহাজের ডেকের ওপর থেকে ঘুড়ি ওড়ানো যায়। দেখতে দেখতে একটা প্রকাণ্ড ঘুড়ি শিশুদের হাত থেকে আকাশে উড়ল। ঘুড়ি আকাশে উড়ল, সেই আকাশে যদি সুন্দর চাঁদ থাকে? শুধু চাঁদ কেন, তারাও সুন্দর, সূর্যও সুন্দর? সুতরাং দেখা গেল আকাশে চন্দ্র সূর্য তারার উদয় হ'ল। পাখীর সঙ্গে অনেক সময় ঘুড়ির সংঘাত লাগে, সে ঘটনাটি বড় কৌতুককর নিশ্চয়, সুতরাং ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীও উড়ল। জলের তলে থাকে মাছ, কচ্ছপ, ওপরে ভাসে হাঁস, শিশু তাদের ভালবাসে দেখতে, সুতরাং এ আনন্দ-যজ্ঞে তারাও একে একে এসে জুটল।

এইরূপে শিশুর ছবির ড্রইং সমাধা হ'ল। এখন রং লাগাবার পালা। এত বড় বিচিত্র আনন্দের বস্তু জাহাজটিতে একটা কালো বা ঐরকম কোন একটা ম্লান রং লাগাতে শিশুর মন চায় না। সুতরাং বিচিত্র বর্ণসম্ভারে ভরে উঠল জাহাজের দেহখানি। তেমনই রঙের লীলায় ভরে উঠল সূর্য-চন্দ্র-তারা, শিশুর পরিচ্ছদ, পক্ষীর পক্ষপুট, জলের তরঙ্গমালা প্রভৃতি। এমনই ক'রে শিশুর জাহাজের ছবিখানি আঁকা শেষ হ'তে দেখা গেল——সমস্ত চিত্রখানিতে ভরে উঠেছে শিশুর খুশি-খেয়াল ও আনন্দ।

এখন ছবিখানি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাতে যে উপাদানগুলি আহৃত হয়েছে সেগুলি সবই বস্তু জগৎ হ'তে হয়েছে সত্য, কিন্তু তবুও কি বলতে পারব যে জাহাজটি অমুক কোম্পানির বা যেখানে বাঁধা আছে সেটা অমুক ডক্ অথবা যারা ডেকে আরোহণ করে আছে তারা যাত্রীবর্গ?

শিশুর জগৎ হচ্ছে এই। এই জগতের বার্তা যখন তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়ে আবেগময় সহজ ভঙ্গীতে প্রকাশ পায় তখন হয় তা শিশু-শিল্প। এতে বয়স্কদের রচনার কারিগরি বা করণকৌশলের বাহাদুরি নেই, আছে সহজ সরল দৃষ্টি এবং অফুরন্ত কল্পনার সাবলীল প্রকাশ। এ বস্তু কি কখনও কম মধুর বা কম উপভোগ্য হ'তে পারে? এ যে শিশুর মতই সহজ সুন্দর মনোহর!



মাটির মূর্ত্তি
আট হইতে দশ বৎসরের বালিকা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন যে শিশু তার অক্ষমতার দরুন বস্তুর রূপ যথাযথ চিত্রিত করতে পারে না। তার চোখে হয়ত বস্তুর প্রকৃত রূপটি ঠিক ধরা পড়ে কিন্তু হাতের অক্ষমতা হেতু সেই রূপটি সে প্রকাশ করতে অসমর্থ হয়। এ কথাটি ঠিক নয়। বয়স্কদের চোখে ও মনে বস্তুর রূপ যেভাবে প্রতিফলিত হয় শিশুদের চোখে ও মনে তেমনটি হয় না। আসলে শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীই হচ্ছে বয়স্কদের থেকে ভিন্ন এবং তা হচ্ছে নিছক শিল্পীর দৃষ্টি। পর্যবেক্ষণের সময় শিশু হয়ত বস্তুর বৃহৎ কোন একটা লক্ষণ লক্ষ্য করল না অথচ সামান্য কোন একটা লক্ষণ তার মনকে আকৃষ্ট ক'রে তার চোখে বৃহৎ হয়ে দেখা দিল। সুতরাং মূলে প্রকাশের অক্ষমতার পরিবর্তে তার দৃষ্টিভঙ্গীই হচ্ছে ভিন্ন। অপর দিকে তার হাতের অপটুত্ব কিছু আছে সত্য, কিন্তু এই অপটুত্বই হচ্ছে তার পটুত্ব অর্থাৎ এই অপটুত্বতার শিল্পে এমন একটা টেক্‌নিক সৃষ্টি করে যার জন্য তা অননাসাধারণ হয়ে ওঠে।



বিমান আক্রমণ

এগার বৎসরের বালক কর্তৃক অঙ্কিত

শিশুর কল্পনা-শক্তির তীব্রতার পরিচয় পেয়ে অনেক সময় আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। শিশুর জীবনের অধিকাংশ সময়টা হচ্ছে make believe-এর অবস্থা। কল্পনার অতি প্রাচুর্য হেতু এই অবস্থার উদ্ভব হয়। এই অবস্থার শিশুর খেলাঘরে যে-সকল উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকে তা দেখলে সত্যই অদ্ভুত ঠেকে। অন্যান্য অজস্র দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে গৃহস্থালীবর্জিত ভাঙা-টুটা-ফুটা বস্তুসকল আবর্জনা-স্তূপ থেকে সযত্নে সঞ্চিত হ'তে দেখা যায়। বয়স্কদের চোখে এ সবের কোন মূল্য নেই সত্য, কিন্তু শিশুদের নিকট সেসব অমূল্য ধন! শিশুর সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হ'তে এমনই একটি ভগ্ন যষ্টি দেখিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এর প্রয়োজন কি? অমনই উত্তর মিলবে ওটা তার ঘোড়া-বিশেষ, অতএব অতীব প্রয়োজনীয়। তার পর ঐ ভাঙা লাঠিটার ওপর সওয়ার হয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে দিনের পর দিন তাকে কাটাতে দেখা যাবে। মাত্র একটা ভাঙা লাঠিতে জীবন্ত ঘোড়ার সকল গুণাবলী আরোপ ক'রে তাকে সম্পূর্ণ করে নেওয়া সামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় নয়। নিজেকে কুমীর, বাঘ অথবা অমনই কিছু কল্পনা ক'রে অনেক শিশুকে সেইমত আচরণ করতে দেখা যায়। এই অপূর্ণকে কল্পনা দ্বারা সম্পূর্ণ ক'রে নেওয়াতে শিশুরা আনন্দ পায়। সম্পূর্ণ তৈরি জিনিসে তাদের মন ভরে না, তার কারণ সেখানে তাদের কল্পনা খেলা করবার অবাধ অবকাশ পায় না। ঠিক এই কারণেই আমার মতে শিশুদের খেলার সামগ্রী নূতন ছাঁচে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে তাদের কল্পনা অবাধে ছুটি পেয়ে অসম্পূর্ণকে তাদের স্বভাবগত সৃজনীশক্তি দ্বারা পূর্ণ করে নিতে পারবে। তবেই তাদের খেলা সার্থক হবে। তৈরি খেলনা হ'তে তাদের রুচি শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাছাড়া বয়স্কদের দৃষ্টি দিয়ে যে-বস্তু তৈরি তা শিশুদের নিকট নিরর্থক, তার কারণ বয়স্কদের দৃষ্টি আর শিশুদের দৃষ্টি এক নয়। শিশুরা ঠিক কি চায় আমরা সব সময় তা বুঝি না, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে যে-বস্তু তাদের উপহার দিয়ে থাকি অনেক সময় তাদের নিকট তা মূল্যহীন হয়ে যায়।

শিশুর এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং কল্পনার অবাধ গতি থাকায় তার শিল্পে কতকগুলি অভিনব লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যে-বস্তু তাকে আকৃষ্ট করে সেটি তার ছবির পটভূমিতে পারিপার্শ্বিক পরিমাপ ছাড়িয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। ফুলটি যদি শিশুকে মুগ্ধ করল ত সেটি তার ছবিতে সকল ছাড়িয়ে বড় হয়েই ফুটবে। তেমনই শিশুর মনের প্রবল বাসনাটি অনেক সময় প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন ক'রে তার ছবিতে প্রকাশ পাবে। ছবির আকাশে একটি চন্দ্রে আশ না মিটলে দুটি চন্দ্রেরও উদয় ঘ'টে থাকে,

যদিও সে ভালরূপে জানে যে একটি বই দুটি চন্দ্রের উদয় হয় না। দেখা গেছে শিশু যা দেখে শুধু তাই এঁকেই ক্ষান্ত হয় না, যা জানে তাও তাতে যোগ ক'রে দেয়। শিশু গাছ দেখে গাছ আঁকল, কিন্তু সে জানে মাটির নীচে শিকড় আছে এবং দৃষ্ট না হ'লেও সে তা এঁকে থাকে।



ঘোড়দৌড়

সাত বৎসরের বালক কর্তৃক অঙ্কিত

পারসপেকটিভ্ ও এ্যানাটমির বন্ধন শিশুরা কোন কালে মানে না। টেবিলের চারটি পায়া আঁকবার সময় সবগুলিই সমান মাপের এঁকে থাকে। তেমনই বাড়ীর পাশের দেওয়ালটিকে দেখাতে গিয়ে সম্মুখের দেওয়ালের সমরেখায় টেনে এনে দেখিয়ে থাকে। এ্যানাটমির ক্ষেত্রেও শিশুরা এমনই স্বাধীন। গাছ থেকে ফুল পাড়বার সময় মানুষের হাত যদি তার স্বাভাবিক মাপে না পৌছয় ত তাকে লম্বা ক'রে দিতে শিশুরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। এই প্রকার আরও অনেক অভিনব লক্ষণ শিশু-শিল্পে দৃষ্ট হয়, যেগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝতে হ'লে শিশু মনের পরিচয় থাকা চাই। বলা বাহুল্য এই লক্ষণগুলিই শিশু-শিল্পে একটা বৈশিষ্ট্য দান করে।

রংএর খেলায় শিশুদের আনন্দের সীমা থাকে না। তাদের ছবিতে দেখা যায় যে, বাস্তব জগৎ থেকে বস্তুর রূপ ধার করলেও রং সম্বন্ধে তারা অবাধ স্বাধীন হ'তে ভালবাসে। আকাশে সবুজ, ঘোড়ায় নীল, হাঁসে লাল রং লাগাতে তাদের একটুও বাধে না। কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে তাদের মনের ইচ্ছা ঐ প্রকার। খেয়াল-খুশিমত রং ব্যবহার করলেও শিশুদের চিত্র কখনও অশোভন রঙে ভারাক্রান্ত হয় না। বড় চিত্রকরের চিত্রে যে বর্ণসামঞ্জস্যের সুষমা থাকে শিশুদের চিত্রেও তা দৃষ্ট হয়। তেমনই তাদের চিত্রে স্বাভাবিক রচনা-সৌন্দর্যেরও পরিচয় মেলে।

আদিম মানবের শিল্পকলার সহিত শিশু-শিল্পের অনেকাংশে মিল দেখা যায়, কারণ আদিম মানব-মনের সহিত শিশু-মনের অনেক ক্ষেত্রে সম্বন্ধ অতি নিকট। বৈজ্ঞানিকরা নাকি বলেন যে অভিব্যক্তির ধারায় মানবদেহ যে-যে অবস্থা উদ্‌যাপন ক'রে এসেছে শিশুর দেহ মাতৃগর্ভাবস্থানকালে সেই-সেই অবস্থার ভিতর দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। গর্ভ-কালীন শিশুদেহের ক্রমবিবর্তমান আকৃতি থেকে এ সত্য উপলব্ধি হয়। শিশুর মন সম্বন্ধেও এ উক্তি প্রযোজ্য। তাই শিশু-মনের বিশেষ এক অবস্থায় আদিম মানব-মনের সহিত মিল আছে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে উভয়ের কার্য-কলাপ, চিন্তাপ্রণালী প্রভৃতি সমভাবাপন্ন হবে তা আর বিচিত্র কি? শিশু-শিল্প ও আদিম মানব-শিল্প অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে উভয় শিল্পই অনেক ক্ষেত্রে একই লক্ষণাযুক্ত, এইটুকু প্রভেদ যে আদিম শিল্প শিশু-শিল্প হতে কিছু পরিপক্ক।

রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকা অথবা ধুলোমাটি কাঠ-কাটরা দিয়ে কোন কিছু গড়া, এগুলি শিশুদের নিকট এক প্রকার খেলা মাত্র। শিশুরা তাদের এই খেলার স্বপ্নময় জগতের অতলে ডুবে থাকে। সে জগতের বিধি-ব্যবস্থা সবই আলাদা। সেখানে না আছে কোন দায়িত্ব, না আছে কোন convention। সেখানে তারা অবাধ স্বাধীন। সুতরাং এই খেলার জগতে যা সব সৃষ্ট হবে তা যে অভিনব হবে তাতে আর সন্দেহ কি? শিল্প-জগতে এ সকল সৃষ্টি এক নূতন সম্পদ নিশ্চয়।

মৎস্য-উৎপাদনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অনেক কাল পূর্ব্বে একবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ভোরের বেলা প্রকাণ্ড একটা দীঘির চতুষ্পার্শ্বে লোকজনের কোলাহল শুনিয়া গিয়া দেখিলাম—এক অবাক কাণ্ড। তখনও ভাল করিয়া ফর্সা হয় নাই। দীঘিটা প্রকাণ্ড; লম্বালম্বি এক পাড় হইতে অপর পাড়ের মানুষ চেনা যায় না। অত বড় দীঘিটার চার পাড়েই ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের অসংখ্য চিংড়ি জল ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিয়া রহিয়াছে। মনে হইল —কেহ যেন চিংড়িগুলিকে তুলিয়া জলের ধারে ধারে সারবন্দি করিয়া বিছাইয়া রাখিয়াছে। উহাদের একটাও কিন্তু মৃত নয়; প্রায় প্রত্যেকটিই দেহ গুটাইয়া নিস্পন্দভাবে পড়িয়াছিল। সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। চিংড়িগুলিকে কুড়াইবার জন্যই লোকের এত কোলাহল। দীঘিটাতে রুই, কাৎলা, চিতল, বোয়াল, আড় প্রভৃতি বড় বড় মাছও ছিল যথেষ্ট। স্বাভাবিক অবস্থায় রুই, কাৎলা প্রভৃতি মাছগুলিকে মাঝে মাঝে জলের উপরের দিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু আড় মাছকে কখনও জলের উপরে ভাসিতে দেখি নাই। কিছুক্ষণ বাদে আরও ফর্সা হইবার পর দেখিতে পাইলাম—বড় বড় রুই-কাৎলা এমন কি দুই হাত, আড়াই হাত লম্বা আড়-মাছগুলিও খাবি খাইতে খাইতে জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চাঁদা, পুঁটি প্রভৃতি চুনো মাছের তো অভাবই নাই। গাং-চিল, শঙ্খচিলদের মৎস্য-শিকারের মরশুম পড়িয়া গিয়াছে। কোন একটা চিল ছোঁ-মারিবার মাত্রই সে স্থলের ছোট-বড় সবগুলি মাছই একসঙ্গে ডুব দিয়া অদৃশ্য হইতেছে; কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই পুনরায় ভাসিয়া উঠিতেছে। রোদ উঠিবার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্য্যন্ত মাছগুলির খাবি-খাওয়ার ব্যাপার চলিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে তাহারা জলের নীচে অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ কেন এরূপ ব্যাপার ঘটিল তখন ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। পুরাতন হইলেও দীঘিটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং আগাছাবর্জ্জিত। সাধারণতঃ পরিষ্কার অবস্থায় থাকিলেও ভাংরা পড়িয়া কিছুকাল হইতেই জলটা সবুজাভ হইয়া উঠিয়াছিল। (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গোলাকার শ্যাওলা জাতীয় এক প্রকার আণুবীক্ষণিক পদার্থকে প্রাদেশিক ভাষায় ভাংরা বলে। পুরাতন অনেক জলাশয়ে সময় সময় ইহারা এত অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে যে, জলের রং গাঢ় সবুজ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে)। জলের রং পরিবর্ত্তন যে এই ঘটনার অব্যবহিত কারণ নহে তাহা সহজেই বুঝা গিয়াছিল; কারণ তাহা হইলে অনেক পূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে মৎস্য-মড়ক দেখা দিত অথবা এরূপ ঘটনা আরও দু-এক বার ঘটিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। কেবল একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম —ঘটনার পূর্ব্বদিন মেঘলার দরুন একবারও সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই এবং সারারাত অসহ্য গুমোটে কাটিয়াছিল। উন্মুক্ত স্থলের বৃহৎ জলাশয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় সর্ব্বদাই ছোট ছোট ঢেউ খেলিয়া বেড়ায়। জল কখনও একেবারে স্থিরভাবে থাকে না। তাহার ফলে বাতাস জলের সহিত সহজেই মিশ্রিত হইতে পারে। কাজেই মৎস্যাদি জলচর প্রাণীদের শ্বাস-গ্রহণোপযোগী অক্সিজেনের অভাব ঘটে না। অক্সিজেনের অভাবেই যে উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে কি কারণে হঠাৎ অক্সিজেনের অভাব ঘটিল তাহা অনেকটা অনুমান করা চলে। মেঘলা আবহাওয়ায় গুমোটের ফলে সারাদিন সারারাত বাতাসের চিহ্নমাত্র ছিল না। তা ছাড়া পর্য্যাপ্ত আলোর অভাবে জলমধ্যস্থিত অসংখ্য আণবিক উদ্ভিদ-সমূহের 'ফটোসিন্থেসিস্' প্রক্রিয়ার নিশ্চয়ই ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল কারণেই খুব সম্ভব জলে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত হইতে পারে নাই। কোন কারণে জল দূষিত হওয়ায় অথবা আবহাওয়ার গোলযোগে ছোটখাট বদ্ধ-পুকুরে আরও কয়েকবার মাছগুলিকে উপরে ভাসিয়া উঠিয়া খাবি খাইতে দেখিয়াছি; কিন্তু অসংখ্য চিংড়ির এরূপ একযোগে ডাঙ্গায় অভিযান আর কখনও নজরে পড়ে নাই।

পরিবেশ অনুযায়ী মৎস্যাদির শরীর গঠন, বৃদ্ধি এবং শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীরবৃত্তি সম্পর্কিত গবেষণার উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে রূপনারায়ণ, যমুনা প্রভৃতি বিভিন্ন নদনদী হইতে সংগৃহীত সদ্যনির্গত বিবিধ মৎস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্চাগুলিকে পরীক্ষাগারের ট্যাঙ্কে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছিলাম। সংগ্রহ করিবার পর প্রথমতঃ বাচ্চাগুলিকে বিভিন্ন ট্যাঙ্কে রাখিয়া দুই ইঞ্চি, আড়াই ইঞ্চি লম্বা হইলেই তাহাদিগকে ৪ × ৩ হাত পরিমাপের কাচের জলাধারে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। প্রথম বারের পরীক্ষার সময় সদ্যপ্রস্ফুটিত মাছের বাচ্চাগুলিকে তিনটি বিভিন্ন ট্যাঙ্কে রাখা হইয়াছিল। একটি ট্যাঙ্কে কল হইতে অনবরত জল পড়িত এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল জমা থাকিয়া অতিরিক্ত জল 'সাইফনে'র সাহায্যে বাহির হইয়া যাইত। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটিতে স্বয়ংক্রিয় পাম্পের সাহায্যে জলের নীচের দিক হইতে অনবরত বাতাস ছাড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় ট্যাঙ্কটিতে এরূপ কোনই ব্যবস্থা ছিল না। এই ট্যাঙ্কের জল সর্ব্বদাই নিশ্চল অবস্থায় থাকিত। কিন্তু এই ট্যাঙ্কের একটি বাচ্চাও বাঁচে নাই। অপর দুইটি ট্যাঙ্কের মাছগুলি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল—বড় বড় কয়েকটি বোয়াল-মাছের বাচ্চা ব্যতীত রুই, কাৎলার বাচ্চাগুলি প্রায় সকলেই অদৃশ্য হইয়াছে।

বোয়াল-মাছের বাচ্চাগুলিই যে রুই, কাৎলার বাচ্চাগুলিকে উদরস্থ করিয়াছিল, পেট চিরিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

যাহা হউক, স্থির জলের ট্যাঙ্কে মাছগুলি কি ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এনামেলের বড় গামলায় কতকগুলি বাচ্চা-মাছ রাখিয়াছিলাম। অসাবধানতাপ্রযুক্ত গামলার জলে কতকগুলি কুচো-চিংড়ি আসিয়া পড়িয়াছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেল কুচো-চিংড়িগুলি এক একটি করিয়া জল হইতে ছিটকাইয়া উঠিয়া গামলার গায়ে ঠিক মৃতের মত নিস্পন্দভাবে আটকাইয়া রহিয়াছে। আট-দশ মিনিট এইভাবে অবস্থান করিবার পর অনেকেই আবার লাফাইয়া জলে পড়িয়া যায়। পাত্রের জল অনবরত আন্দোলিত অবস্থায় রাখিলে অথবা তাহাতে পাম্পের সাহায্যে নিয়মিত ভাবে বাতাস পরিচালন করিলে চিংড়িগুলি জল হইতে লাফাইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে না। জলের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত হইবার ব্যবস্থা না থাকিলেই এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। বড় বড় হাঁড়িতে মাছের বাচ্চাগুলিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার সময় এ জন্যই জেলেরা হাত দিয়া অনবরত জল আন্দোলিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যাহা হউক, কুচো-চিংড়ির এই অদ্ভুত স্বভাব লক্ষ্য করিবার পর জলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করিয়া সুফল লাভ করিয়াছিলাম।

৬×৪ ফুট লম্বা কাচের জলাধারে দেড় ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি লম্বা প্রায় ৬০।৬৫টি রুই, মৃগেলের বাচ্চা ছাড়িয়াছিলাম। বাচ্চাগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। দুপুরবেলা এক দিন দেখিতে পাইলাম—কয়েকটি মাছ জলের উপর ভাসিয়া খাবি-খাইতেছে এবং গোটা দুই বাচ্চা চিৎ হইয়া ভাসিতেছে। দেখিতে দেখিতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব মাছই চিৎ হইয়া ভাসিয়া উঠিল এবং একে একে মরিতে লাগিল। এতগুলি মাছের হঠাৎ একসঙ্গে মরিবার কারণ কি—কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কতকগুলি কুচো-চিংড়ি জলে ছাড়িয়া দেখিলাম—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহাদের অনেকেই লাফাইয়া উঠিয়া কাচের দেওয়ালে আটকাইয়া রহিল। যত বার সেগুলিকে জলে ফেলিয়া দিলাম তত বারই তাহারা সেই ভাবে শুষ্ক কাচের গায়ে লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। পরিষ্কার টলটলে জল; বিশুদ্ধতা নষ্ট হইবার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জলাধারটির মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা ছিল। ফোয়ারার সরু মুখ হইতে জল অনেক উঁচুতে উঠিয়া চতুর্দিকে বৃষ্টি-ধারার মত ছিটকাইয়া পড়িত। ইহাতে এক দিকে যেমন জলাধারে তাজা জল সরবরাহ হইত অপর দিকে তেমনই জলের সহিত প্রচুর পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত হইবার সুবিধা ঘটিত। কিন্তু পরে দেখা গেল ঘটনার দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই ফোয়ারাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কিছুকাল পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া শ্বাসরোধের ফলে মাছের মৃত্যু সম্বন্ধে ডাঃ দাস ও ডাঃ হোরার বিতর্কমূলক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর কই, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছ লইয়া ঐরূপ পরীক্ষা করিবার সময় কতকগুলি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। কই, সিঙ্গি প্রভৃতি জীয়ল মাছগুলি জল ছাড়া শুষ্ক ডাঙ্গাতেও অনেকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পর জলের উপর উঠিতে না দিলে জলে ডুবিয়া শ্বাসরোধের ফলে ইহাদের মৃত্যু ঘটে। স্থলচর প্রাণীরা জলে ডুবিয়া যেভাবে ছটফট করিয়া মরে এই মাছগুলিও সেরূপ ভাবেই ছটফট করিয়া মৃত্যু বরণ করে। প্রবল জীবনীশক্তিসম্পন্ন জীয়ল মাছেরই বাতাস অভাবে যখন এই অবস্থা তখন রুই, কাৎলার ছোট ছোট বাচ্চাদের তো কথাই নাই। জলে যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত না হইলে অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে। ঘনসন্নিবিষ্ট ভাসমান পানায় আচ্ছাদিত জলাশয়ে বোধ হয় এই কারণেই রুই, কাৎলা প্রভৃতি মাছ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জলনিমজ্জিত শৈবাল-জাতীয় বিবিধ উদ্ভিদপরিপূর্ণ জলাশয়ে এই সকল মাছের বাচ্চার স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনে তেমন কোন অসুবিধা ঘটিতে দেখি নাই। মৎস্যাদি জলচর প্রাণীদের জীবনরহস্য-সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই সকল পরীক্ষাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সকল অসুবিধার প্রতীকারের উদ্দেশ্যে কোন পরীক্ষা পরিচালন সম্ভব হয় নাই।

আমাদের আহার্য্য বস্তুর মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থরূপে মাছ অতীব প্রয়োজনীয় তো বটেই, অধিকন্তু অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি'র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অংশ রূপে মৎস্য-উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বর্ত্তমান দারুন খাদ্য-সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের দরুন অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির ফলে নদীর মোহানা ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে মৎস্য সংগ্রহ এবং তাহার আমদানী রপ্তানী ব্যাপারে বাধানিষেধ অপরিহার্য্য হওয়ায় মৎস্য এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে দেশের অভ্যন্তরস্থ জলাশয়-গুলিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর নানা প্রকার বাধানিষেধের ফলে মিশর দেশে মাছের আমদানী বছরে ১২০০০ টন হইতে কমিয়া ২০০০ টনে দাঁড়ায়। তথাকার 'ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট' তখন সমুদ্র হইতে লক্ষ লক্ষ মাছের পোনা সংগ্রহ করিয়া দেশের অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন হ্রদে ছাড়িয়া দেয়। ইহার ফলে সেখানে বছরে এখন প্রায় ৪০,০০০ টন মৎস্য সংগৃহীত হইতেছে। আমাদের দেশে মৎস্য-উৎপাদনের কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যাহা কিছু মৎস্য-চাষ হইয়া থাকে তাহাতেও সুনিয়ন্ত্রিত কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হয় না। জলাশয়ে মাছের বাচ্চা ছাড়িয়া দিয়া অনেকেই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অজ্ঞতার ফলেই যে অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলার 'ফিসারী

ডিপার্টমেন্টে'র ডিরেক্টর ডাঃ হোরা মৎস্য-বৃদ্ধির পরিপন্থী কতকগুলি বিষয় এবং তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া সময়োচিত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন (Indian Farming March & April, 1943)। মৎস্য-উৎপাদনে উৎসাহী প্রত্যেকেরই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণের অবগতির জন্য এ স্থলে তাহার সারমর্ম প্রদান করিতেছি। যে-সকল ব্যবস্থার কথা হইয়াছে তাহা অভিনব না হইতে পারে। অনেকেই হয়ত প্রয়োজন মত উহার কোন-না-কোন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু গতানুগতিক ভাবে না করিয়া প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে এবং সাফল্যের সহিত অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, সাধারণতঃ রুই, কাৎলা, মৃগেল প্রভৃতি মৎস্য-চাসেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্য প্রতিপালন ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ব্যাপক মড়কও কম ঘটে না। প্রতি বৎসর ইহার ফলে যে কিরূপ বিপুল ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা সহজেই অনুমেয়। গ্রীষ্মের সময়ই মৎস্য-মড়ক বেশী হইতে দেখা যায়। মৎস্য-উৎপাদনকারীদের এই সময় বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যাহাতে জল দূষিত হইয়া মৎস্য-বৃদ্ধির প্রতিকূল না হইয়া পড়ে। বর্ষার পর অনেক জলাশয়েই জল কমিতে থাকে। যে-সকল জলাশয়ে মাছের বাচ্চা ছাড়া হইয়াছে সেগুলির জল যাহাতে অসম্ভবরূপে হ্রাস না পায় এবং কোন রকমে দূষিত হইয়া বাচ্চাগুলির স্বাস্থ্য-হানি ঘটাইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। বহু বাচ্চা ছাড়া সত্ত্বেও অনেক সময় পুকুরে দুই-চারিটির বেশী বড় মাছ দেখিতে পাওয়া যায় না। সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বনের অভাবেই অনেক বাচ্চা অকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায়—কোথাও কিছু নাই, অকস্মাৎ মাছের বাচ্চাগুলি দলে দলে পুকুরের জলে মরিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। ডাঃ হোরা কলিকাতা মিউজিয়মের পুকুরে মৎস্য-মড়কের এরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন পুকুরের তলদেশে পচনশীল অসংখ্য জৈবপদার্থ সঞ্চিত হইবার দরুনই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায় এরূপ জলাশয়ে অথবা নূতন খনিত পুকুরে খুব কমই মৎস্য-মড়ক ঘটিতে দেখা যায়। পুরাতন পুকুরের তলদেশে প্রচুর পরিমাণ পাঁক ও তাহার সহিত পচনশীল নানা প্রকার জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সকল পদার্থের পচনক্রিয়ার সময় জলের সহিত মিশ্রিত অক্সিজেন নানাভাবে নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, এ্যামোনিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। তখন রুই-কাৎলার বাচ্চাগুলি সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণ অবস্থায় আবহাওয়া ভাল থাকিলে জলজ-উদ্ভিদের খাদ্য-প্রস্তুত-প্রক্রিয়া চলিবার সময় উদ্ভিদ-দেহ হইতে যে অক্সিজেন নির্গত হয় তাহাতে জল অনেকটা দোষমুক্ত হওয়ায় মাছ সেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। গরমের সময় পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত উদ্ভিজ্জ ও জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হইয়া থাকে। তা'ছাড়া মেঘলা, গুমোট, তাপের প্রখরতা, বৃষ্টির অভাব প্রভৃতি নানাবিধ কারণে জলের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত হইতে পারে না। এরূপ যে কোন অবস্থা ঘটিলে অক্সিজেনের অভাবে মাছগুলি জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া বাহিরের বাতাস সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। (ইহাকেই খাবি খাওয়ার অবস্থা বলিয়াছি)। এই অবস্থায় কোমল-প্রাণ মৎস্য-গুলি অতি সহজেই দলে দলে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে পুকুরের এক পাড় হইতে অপর পাড় পর্য্যন্ত বারংবার জাল টানিয়া জলটাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করিয়া দিলে জলের সহিত প্রচুর পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত হইতে পারে এবং কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত আবদ্ধ গ্যাস-সমূহ বুদ্বুদ আকারে বহির্গত হইয়া জলকে দোষমুক্ত করিতে পারে। জাল টানিয়া তলদেশে সঞ্চিত পচা, ময়লা পদার্থসমূহ নিষ্কাষণ করিয়া ফেলিতে পারিলেই সুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক। অনেক লোক একসঙ্গে সাঁতার কাটিয়া অথবা বংশদণ্ড সাহায্যে বারংবার আঘাত করিয়া প্রবলভাবে জল আন্দোলিত করিলে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে এই অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে। পার্শ্ববর্ত্তী কোন জলাশয় হইতে দূষিত পুকুরে স্রোত কিংবা ঝরণার আকারে জল প্রবাহিত করাইতে পারিলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়।

কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ এবং বিবিধ জৈবাম্ল মিশ্রণের ফলে জল অম্লগুণ সম্পন্ন হইয়া পড়িলে সামান্য পরিমাণ কলিচুণ ব্যবহারে তাহার প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু চুণের পরিমাণ বেশী হইলে ফল বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। লক্ষ ভাগ জলে দশ হইতে বারো ভাগ চুণ মিশ্রিত করা চলে। এই হিসাবে ১৫০০ কিউবিক ফুট জলে আধসেরের মত চুণ প্রয়োগ করা যায়। জল-মিশ্রিত বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় পদার্থে পরিণত করিয়া চুণ জলকে পরিশুদ্ধ করিবে। জল অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত হইয়া পড়িলে পটাসিয়াম পারমেঙ্গানেট ব্যবহার করিয়া সুফল লাভ করা যাইতে পারে। এক গ্যালন জলে ১/৮ গ্রেণ— এই হিসাবে পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত করিতে হইবে। অনেক সময় মাছের গায়ে নানা প্রকারের পরভোজী কীটাণু জন্ম-গ্রহণ করিয়া তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে। পার-ম্যাঙ্গানেট প্রয়োগের ফলে মাছগুলি এই সকল কীটাণু-মুক্ত হইয়া সুস্থ সবল হইয়া উঠিতে পারে। সাধারণ সোডা, সাজি-মাটি, ডেওডার, চির্ এবং কলাগাছের ছাই প্রয়োগেও জলের অম্লাত্মক দোষ বিদূরিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব হইতেই পুকুরের অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলে ব্যাপক মৎস্য-মড়ক ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই কম হইবে। গ্রীষ্মঋতু আবির্ভাবের পূর্ব্বেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসেই পুরাতন পুকুরগুলিতে মাঝে মাঝে জাল টানিয়া পচনশীল জৈব

এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের জঞ্জাল তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে জাল টানিলে মাছগুলিও বেশ সক্রিয় হইয়া উঠিবে। ছুটাছুটি লাফালাফির ফলে তাহাদের যথেষ্ট স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে। শোল, বোয়াল, চিতল, ফলুই প্রভৃতি মাছ পুকুরে থাকিলে তাহারা রুই-কাৎলার ছোট ছোট বাচ্চাগুলি খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলে। এই সকল মাছের কতকগুলি দূষিত জলেও অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কারণ জলের বাহির হইতে সোজাসুজি বাতাস গ্রহণ করিবার জন্য ইহাদের অতিরিক্ত শ্বাস-যন্ত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে। মাঝে মাঝে জাল টানিয়া এই মাছ-গুলিকে নিঃশেষ না করিতে পারিলে সতর্কতামূলক অন্যান্য ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। এ সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার পরেও যদি মৎস্য-চাষের উন্নতি পরিলক্ষিত না হয় তবে পুকুরের জল সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করিয়া পাঁক ও অন্যান্য আবর্জ্জনা তুলিয়া ফেলা দরকার। মোটের উপর পুরাতন পুকুরকে তখন অনেকটা নূতন কাটা পুকুরের অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে। যাহাতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব ঘটিতে না পারে এজন্য উপযুক্ত পরিমাণ জলজ উদ্ভিদ এবং পানা-জাতীয় কিছু ভাসমান উদ্ভিদও রাখা প্রয়োজন। ঝাঁঝি, পাটা-শ্যাওলা, হাইড্রিলা, কারা প্রভৃতি জলজ-উদ্ভিদ হইতে দিনের আলোতে অনবরত অক্সিজেন গ্যাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুদ্বুদ নির্গত হইয়া থাকে। তা'ছাড়া রুই, মৃগেলের বাচ্চারা যথেষ্ট পরিমাণ শৈবাল জাতীয় বিবিধ জলজ-উদ্ভিদ উদরস্থ করিয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কোন রকমেই যেন জলজ-উদ্ভিদে পুকুর ভর্ত্তি না হয় অথবা পানায় পুকুরের উপরিভাগ ঢাকিয়া ফেলিতে না পারে। জলের উপরিভাগ পানায় আবৃত হইলে আলোর অভাবে জল-নিমজ্জিত উদ্ভিদগুলি হইতে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন নির্গত হইবে না বরং বহুবিধ দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া জলকে মাছের পক্ষে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। অতিরিক্ত ভাংরা জন্মিয়া জলের উপর যাহাতে সরের মত আবরণ জমিতে না পারে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ জলের উপরিভাগে এরূপ সর জমিলে জলের সহিত বাতাস মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

মাছের বাচ্চাগুলি যাহাতে নিয়মিতভাবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পাইতে পারে সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পুকুর এবং অন্যান্য বৃহৎ জলাশয়ে স্বাভাবিক উপায়ে নানা জাতীয় শৈবাল ও অসংখ্য আণুবীক্ষণিক কীটাণু জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। মাছ সাধারণতঃ এইগুলি খাইয়াই জীবন ধারণ করে। কিন্তু সকল পুকুরের অবস্থা সমান নহে। স্বাভাবিক উপায়ে জাত এই সকল খাদ্যবস্তু কোথাও কম, কোথাও বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়, কাজেই অবস্থানুযায়ী খাদ্যবস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পরীক্ষাগারের ট্যাঙ্কে মৎস্য প্রতিপালন করিবার সময় প্রথমতঃ খাদ্যহিসাবে শুটকি মাছের মোটা চূর্ণ ব্যবহার করিতাম। কিন্তু দেখা গেল—বাচ্চা মাছগুলি এই সকল মোটা চূর্ণ গলাধঃকরণ করিতে পারে না। তার পর সূক্ষ্ম চূর্ণ ব্যবহারে খাইবার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ চূর্ণই জলের সহিত মিশিয়া নষ্ট হইত এবং তাহার ফলে দুই এক দিনের মধ্যেই জল ঘোলা হইয়া দূষিত হইয়া পড়িত। এগুলি পচিবার সময় বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য প্রোটোজোয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মাছের শরীরে পর-ভোজীর ন্যায় বাস করিয়া তাহাদিগকে অসুস্থ করিয়া ফেলে। শান্তিনিকেতনের কর্ম্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাছের বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইবার জন্য একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। রুটির টুকরা, ভাত, মাছ প্রভৃতি পরিত্যক্ত পদার্থসমূহ ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে ভরিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত বংশদণ্ডের সহিত অর্দ্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। মাছগুলি তাহা হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাতে খাদ্য বস্তুর অপচয় ঘটে না, বিশেষতঃ জল দূষিত হইবার সম্ভাবনাও কম। পরীক্ষাগারের ট্যাঙ্কে এই উপায় অবলম্বন করিয়া বিশেষ সুফল লাভ করিয়াছি। এস্থলে মৎস্য-উৎপাদনের কতকগুলি অসুবিধার প্রতিকারের বিষয় মোটামুটি আলোচিত হইল। এই বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা সুবিধা বা অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদের দেশের মৎস্যচাষের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিতে পারেন।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি

শ্রীবিমলাচরণ দেব

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্তরের সভ্যতায় অবস্থিত মনুষ্য সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, প্রথমে মনুষ্য, অন্যান্য জন্তুর মত, মিথুন অবস্থায় থাকিত ও চতুপার্শ্বস্থ প্রকৃতি হইতে তজ্জাত জৈব ও অজৈব পদার্থ খাদ্যরূপে সংগ্রহ করিত। এই আদিমতম অবস্থায় খাদ্যসংগ্রহ একক, তাহার হস্তমাত্র দ্বারা এবং প্রথমে কেবল মাত্র নিজের জন্য, ইহা বেশ বুঝা যায়। কালক্রমে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ হইলে সে অকৃত (unworked) ও পরে কৃত (worked) প্রস্তরাদি খাদ্যসংগ্রহব্যাপারে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এই রূপেই পুরোপলীয় (Palaeolithic)

ও নবোপলীয় (Neolithic) যুগের আবির্ভাব যথাক্রমে হয়। এই অবস্থার আরম্ভের সহিতই উপরোক্ত একক, অ-সহায়, কেবল নিজের জন্য, খাদ্য সংগ্রহের অবদান হয়। অস্ত্রনির্মাণ প্রয়োগাদি পরসাহায্যসাপেক্ষ ও তজ্জন্য একাধিক লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই কারণে একাধিক মিথুনের সমবায় বা সঙ্ঘের উৎপত্তি হয় এবং সেই চেষ্টাজনিত দ্রব্যে সেই সমস্ত সমবেত লোকগণের অধিকার হওয়া স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে আদিম 'মিথুন", স্থলে "সমজ" এবং আদিম "একক বা ব্যষ্টি" ভাবের স্থলে "যৌথ বা সমষ্টি"ভাবের অঙ্কুরোদ্গম হয়।

পরে কালক্রমে মনুষ্যের সংখ্যাবৃদ্ধি, দেশের জলবায়ু পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কারণে খাদ্যসংগ্রহ উত্তরোত্তর আয়াস-সাধ্য হইয়া পড়ে। সেই কারণে মনুষ্য খাদ্যের জন্য উপায়ান্তর অন্বেষণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ, সঞ্চয় ও রক্ষার জন্য পশুপালন অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থায় খাদ্যসংগ্রহাদি ও আত্মরক্ষার জন্য সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইহা হইতেই সমবেত চেষ্টার ফলভূত পশুপাল প্রভৃতিতে "যৌথ সম্পত্তি"র ভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

এই সমজের প্রথমাবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, যদি কোনও দ্রব্য, যে ভাবেই হউক, এই সমজের অধিকারে বা প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহাতে সমজভুক্ত ব্যক্তি-সমূহের প্রত্যেকের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আছে—ডারুইনের Voyage of H. M. S. Beagle chapter, X-এ, টিয়েরা ডেল ফিউএগোর (Tierra del Fuego) আদিম অধিবাসিগণের সম্বন্ধে,—

"At present, even a piece of cloth given to one is torn into shreds and distributed; and no one individual becomes richer than another."

কিন্তু উপরোক্তভাবে একাধিক মনুষ্যমিথুনের সমবায় বা সহাবস্থানে যে সমজের উৎপত্তি হয় বলা হইয়াছে, তাহা শ্লথবন্ধন। কার্য্যব্যপদেশ, অর্থাৎ ক্ষুধা ও খাদ্য সংগ্রহ জন্য মাত্র। এ অবস্থায় একত্রিত হইবার কারণ নিবৃত্ত বা উদ্দেশ্য সাধিত হইলে, বা সমজ অকস্মাৎ কোনও গুরুতর আঘাত পাইলে, এই সমজ বিশ্লিষ্ট হইয়া তাহার উপাদান অর্থাৎ আদিম মিথুন মাত্রে পুনঃ পরিণত হইয়া পড়ে এবং অগত্যা নবোদ্গত যৌথভাবও অন্তর্হিত হয়।

বস্তুতঃ পক্ষে কিন্তু দেখা যায় যে, এই সমবেত চেষ্টা, সমবায় বা সহাবস্থানের আবশ্যকতা প্রথমে মৃদুভাবে অনুভূত হইয়া কালক্রমে ইহার উপকারিতা ক্রমবর্দ্ধমানভাবে উপলব্ধ হয়, এবং তজ্জন্য এই কারণে আবির্ভূত সমজের স্থায়িত্ব কামনা আসে। এই সমজের স্থায়িত্বকামনা স্পষ্টতর হইয়া উঠে, যখন মনুষ্য দেখে যে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান অভাবসমূহ পূরণের জন্য পশুপালন অপর্য্যাপ্ত এবং তজ্জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন আবশ্যক। এই ভাবে মনুষ্য যাযাবর পশুপালক হইতে স্থায়ীবাসকারী কৃষক হইয়া পড়ে। ক্রমে এই কৃষি হইতে অন্যান্য শিল্পাদি আবির্ভূত হয়।

এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের জন্য পারস্পরিক সাহায্য উত্তরোত্তর আবশ্যক হয়। শুধু খাদ্যসংগ্রহের জন্য নহে, আত্মরক্ষার জন্যও বটে। এই সাহায্যের পরিধি বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে মিথুন হইতে কুল বা গণ (family or clan), এবং কুল বা গণের সমবায়ে রাষ্ট্রাদি গঠিত হইয়া এইরূপে একাধিক রাষ্ট্র সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এইরূপেই মহাভারতে পাই—পৌলোমগণ ও কালকেয়গণের সমবায়ের অভ্যুদয়; এই রূপেই বৃষ্ণি, যাদব, দাশার্হ প্রভৃতি সপ্ত সমবায়ে "বৃষ্ণিচক্র" আবির্ভাব; এই রূপেই "নবরাষ্ট্র" এর উৎপত্তি। (এই নবরাষ্ট্রই মনে করাইয়া দেয় মালয় উপদ্বীপের অন্যতম রাজ্য Negri Sembilan (নব-সম্মেলন) ("Confederacy of Nine States")। এই ভাবেই প্রাচীন গ্রীসের hegemony ও প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে জার্মান Zollverein ও সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। এই অবস্থার সূচনায় নেতার আবির্ভাব। নেতা হয় ব্যক্তি (রাজা) বা শ্রেণী-বিশেষ (oligarchy) বা গণ (democracy)। এই নেতাই ক্ষত্রিয়।

এই নেতার দ্বারা সঙ্ঘবন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময়েই সমবায়ের ব্যষ্টিগুলির মধ্যে স্থায়ী ও দৃঢ় বন্ধনের আবশ্যকতা যে শুধু অনুভূত হয়, তাহা নহে। প্রাকৃতিক নিয়মে উক্তরূপ বন্ধনের উৎপত্তি হয়। এই বন্ধনগুলিই নেতা দ্বারা স্পষ্টীকৃত ও নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাই আদি "ধর্ম", "শাসন" বা "আইন"। এই আদি নেতা বা ক্ষত্রিয় দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে মহাভারত বলিয়াছেন—"লোকজ্যেষ্ঠং ক্ষাত্রধর্মং বদন্তি" এবং "ক্ষাত্রো ধর্মো হ্যাদিদেবাৎ প্রবৃত্তঃ পশ্চাদন্যে শেষভূতাশ্চ ধর্মাঃ" এবং "সর্বে ধর্মাঃ সোপধর্মাস্ত্রয়াণাং রাজ্ঞো ধর্মাদিতি বেদাচ্ছৃণোমি।" ইহাই সমাজকে বন্ধন দ্বারা ধারণ করিয়া রাখে—"ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ" এবং religion (legio, to bind)। এই নেতা ও তন্নির্দ্দিষ্ট "ধর্ম" বা "শাসন" বা "আইন"এর আবির্ভাবেই শ্লথবন্ধন "সমজ" নিয়মশাসিত স্থায়ীবন্ধনযুক্ত "সমাজ"রূপ সত্তায় পরিণত হয়।

কিন্তু এই নেতার উৎপত্তি হয় সমষ্টির ইচ্ছাতে। কাজেই এই ব্যাপারে সমষ্টির প্রাধান্য ও প্রভাব বেশ বুঝা

যায়। কোনও কারণে নেতা সমষ্টির অনভিমত (persona non grata) হইয়া পড়িলে সমষ্টি তাঁহাকে অপসৃত করিয়া দেয় ও নূতন নেতা আনে। যেমন (বেন-পৃথু উপাখ্যান)। ঐ রূপ—নেতার অভাব ঘটিলে সমষ্টি একজন নেতা করিয়া লয় (যেমন ইন্দ্র-নহুষ উপাখ্যান)। নেতা না থাকিলে সমষ্টি ও ব্যষ্টি দুইয়েরই অস্তিত্ব সংশয়িত।

কিন্তু মনুষ্য তাহার অস্তিত্বের এক স্তর হইতে অপর স্তরে উপনীত হইলে পূর্ব্ব স্তরের সমস্ত চিহ্ন লোপ হইয়া যায়, তাহা নহে। বস্তুতঃ পক্ষে মনুষ্য পর পর যত স্তরেই চলিয়া যাউক না কেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত স্তরেরই নিদর্শন তাহার প্রত্যেক পরবর্ত্তী স্তরে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে।

যেমন—মনুষ্যসমাজ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতায় উপনীত হইলেও আদিমতম একক বা ব্যষ্টিভাবের পর যে যৌথ বা সমষ্টি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বহু দিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। এই যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক কুল (family or clan), কুলের ব্যক্তিবিশেষ নহে। কুলান্তর্গত সকল ব্যক্তিই ভোগ করিবার অধিকারী, কিন্তু কোনও অংশ কাহারও একান্ত নয়। কাজেই ব্যক্তির দেহান্ত হইলে তাহার ভোগ্য সম্পত্তি বা তাহার কোনও অংশ যৌথভাব হইতে বিচ্যুত হয় না। কুলের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের যৌথভোগের জন্য পূর্ব্বের মত যৌথই থাকিয়া যায়। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—আমাদের দেশে মিতাক্ষরা আইন। ইহারই আর এক রূপ দেখিতে পাই—ত্রিবাঙ্কুরের "কারেইয়ীদ্", যুক্তপ্রান্তে বাঁদা জেলায় "পৌথ", উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবে "বেশ" বা "বাশ"। এই সমস্ত অবস্থায় গ্রামের সমস্ত চাষের জমি গ্রামের সম্পত্তি, ইহার কোনও অংশ কোনও এক ব্যক্তির নহে। মধ্যে মধ্যে জমি সমস্ত গ্রামস্থ ব্যক্তির মধ্যে চাষের জন্য পুনর্বণ্টন হয়। কোনও অংশে কোনও ব্যক্তির কোনওরূপ স্থায়ী স্বত্ব থাকে না। সমষ্টির নির্দ্দেশানুসারে ব্যক্তিবিশেষ জমির অংশবিশেষ নির্দ্দিষ্টকালের জন্য ভোগমাত্র করে।

এই অবস্থায় আদিমতম এককভাবের উপর তৎপরবর্ত্তী যৌথভাবের, ব্যষ্টির উপর সমষ্টির, ব্যক্তির উপর সমাজের প্রাধান্য বেশ দেখা যায়। সমষ্টি বা সমাজের জন্য ব্যষ্টি বা ব্যক্তির প্রাধান্য অনেকাংশে খর্ব্ব হইতে হয়। ইহাতে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে—এককভাব ও যৌথভাব, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের উপর ঘাতপ্রতিঘাত, এক অপরের উপর প্রাধান্য লাভ বা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ঘাতপ্রতিঘাতের মোট ফলেই (resultant of forces) সমাজের গতি ও আকার নির্দ্ধারিত হয়। এই গতি ও এই আকারের উপরই সমাজ তথা ব্যক্তির শুভাশুভ ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই গতির প্রকৃতি ও এই আকারানুসারেই সমাজের তাৎকালিক নাম দেওয়া হয়।

আদিমতম এককভাব ও তৎপরবর্ত্তী যৌথভাবের পরস্পর-বিরোধিতা ও প্রাধান্যচেষ্টার একটি উদাহরণ দিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যৌথভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের দেশের মিতাক্ষরা আইন। এই মিতাক্ষরার প্রকৃতিও কি তাহা বলিয়াছি। একক বা ব্যষ্টি ভাব এই মিতাক্ষরার সহিত "যুদ্ধ" করিয়া প্রাধান্য লাভ করিল বাংলায়—এই প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হইল দায়ভাগ আইন। এই আইনে সমাজের, যৌথভাবের, স্থান নাই, তাহা নহে, কিন্তু এককের, ব্যক্তির, প্রাধান্য তাহার উপর। ব্যক্তিই সম্পত্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী ও বিধায়ক। কেবল যদি কুলের অর্থসাহায্যে সম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্যক্তির এই অধিকার কিয়দংশে খর্ব্ব হয়। কিন্তু সমস্ত বিষয় প্রণিধান করিলে ব্যক্তির প্রাধান্য সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। এইরূপ এককভাবের পুনঃপ্রাধান্য আবার দেখিতে পাই মনুসংহিতা ৯,১১১ তে, যেখানে বলা আছে—তস্মাদ্ ধর্ম্ম্যাঃ পৃথক্ক্রিয়া। এখানেও দেখিতেছি যে, আদিম এককভাব যৌথভাবের ভিতর দিয়া গিয়া আবার "পৃথক্ক্রিয়া" বা বাঁটোয়ারা দ্বারা এককভাবে পৌঁছিতেছে। যৌথভাবনাশক বাঁটোয়ারা "ধর্ম্ম্য" বলিয়া অনুমোদন লাভ করিতেছে।

এইরূপে এককভাব হইতে যৌথভাব এবং যৌথভাব হইতে পুনরায় এককভাবের আবির্ভাব আর এক বিষয়ে দেখিতে পাই—স্ত্রী সম্বন্ধে। বর্ত্তমান সময়ে হয়ত অনেকের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হইবে, কিন্তু ইহা বোধ হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শারীরিক গঠন ও দুর্ব্বলতার জন্য স্ত্রী সাধারণতঃ পুরুষের নিম্নে ও অধীনে থাকিতে বাধ্য। যত দূর বোধ হয়, আদিম অবস্থায় স্ত্রী পুরুষের অধীন সাহায্যকারিণীরূপে থাকিত। এই ভাব এখনও আছে। এমন কি, সুসভ্য ইউরোপে কেহ কাহারও স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লইয়া গেলে অপরাধীর বিরুদ্ধে স্বামী যে খেসারত দাবী করে, তাহা loss of service-এর জন্য—যেন স্ত্রী পুরুষের অধিকৃত সজীব "দ্রব্য" বিশেষ (chattel)। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২,৫১তেও এই ভাবের কথা পাই। মৃতের ঋণ শোধ করিতে বাধ্য দুই জন—

(১) "রিক্থগ্রাহ," অর্থাৎ যে তাহার "রিক্থ" (ধন-সম্পত্তি) গ্রহণ করিয়াছে এবং (২) "যোষিদ্গ্রাহ" অর্থাৎ যে তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিয়াছে।

ইহাও শোনা যায়, "The birth-right of an

Englishman is to beat his wife," আরও "A cow, a wife and an apple-tree, the more you beat them the better they be," আমাদের দেশেও মহাভারতে আছে—"পালিতা নিগৃহীতা চ স্ত্রী শ্রীর্ভবতি ভারত।" শতপথ ব্রাহ্মণেও ব্যবস্থা আছে—"ষষ্ট্যা পাণিনা বোপহত্যোতিক্রামেৎ"। এই হিসাবে যাহাকে "মিথুন" বলিয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায়—পুরুষ ও তাহার অধিকৃত স্ত্রী। পুরুষ প্রকৃতপক্ষেই স্বামী (lord & master)। আমাদের দেশে বিবাহের কনকাঞ্জলির সময় "শ্রীচরণের দাসী" আনিতে যাওয়ার কথা এই সুরেরই রেশ বলিয়া মনে হয়।

এই অধিকার ও শারীরিক বলাধিক্যের জোরেই পুরুষ স্ত্রীর কার্য্যাদির পরিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে—"তোমার কাজ গৃহসম্পর্কে মাত্র।" ইহাই বর্ত্তমান "আর্য্য" জার্ম্মানীতে Three K's রূপে ব্যক্ত—Kinder, Küche, Kirche অর্থাৎ সন্তান, রন্ধনশালা, গির্জ্জা। শেষোক্তটি আমাদের দেশের কথায়—বারব্রতপূজাদি।

ক্রমে যৌথভাবের আবির্ভাবের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের মত স্ত্রীও সমজের ও পরে সমাজের যৌথসম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইল। এই যৌথভাবই মহাভারত-কথিত উত্তর কুরু, মাহিষ্মতী প্রভৃতি স্থানে "স্বৈরিণীভাব," "অনাবৃত ভাব" প্রভৃতি দ্বারা সূচিত হয়। একক বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তনের পরও ইউরোপে কোনও কোনও সমাজে যে jus primae noctis প্রথা ছিল, তাহা এই যৌথভাবেরই শেষ চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী বিবাহসূত্রে তাহার স্বামীর সম্পূর্ণ একক অধিকারে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমাজ সেই স্ত্রীতে তাহার এতাবৎকাল অব্যাহত যৌথ অধিকার শেষ বার স্থাপন করিয়া লইত।

সমাজের যৌথ অবস্থায় পিতৃত্বনির্দ্ধারণ অনেক সময় অসম্ভব, কিন্তু মাতৃত্বনির্দ্ধারণ শক্ত নহে। এই জন্যই বোধ হয় আদিম বংশপরম্পরা মাতৃক্রমে, পিতৃক্রমে নহে। তাহার উদাহরণ দেখিতে পাই ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম-জাবাল উপাখ্যানে ও শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ অধ্যায়ে প্রবচনবংশে—মাতার নামে পরিচয়।

এই অবস্থা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় মৈত্রায়ণী সংহিতা ১,৪,১০ হইতে—"ন বৈ তদ্বিদ্ম যদি ব্রাহ্মণা বা স্মোঽব্রাহ্মণা বা যদি বা তস্য ঋষেঃ৩ স্মোঽন্যস্য বা যস্য ব্রুমহে…যোঽস্মি স সন্ যজে, যোঽস্মি স সন্ করোমি।" কাজেই মাতৃক্রম অনুসারে সমাজে সমস্তই নিয়মিত। এই মাতৃক্রমই দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত "মারুমাক্কাথায়াম" ও "মুপ্পু" এবং পঞ্জাবে "মাঁও বটু" প্রথার মূলে। মহাভারতের সময়কার মদ্রদেশ ও বর্ত্তমান সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হওয়ার মূলেও এই মাতৃক্রম। এই মাতৃক্রম এখনও ভারতের বাহিরে পৃথিবীর একাধিক স্থলে আছে—যথা আরবের বেদুইন ও আফ্রিকায় সাহারার তুয়ারেগ জাতির মধ্যে।

স্ত্রী লইয়া সারা সমাজ জুড়িয়া পুরুষদের অবশ্যম্ভাবী বিরোধ প্রবল হওয়ায় বোধ হয় এইরূপ বিরাট্ স্বৈরিণী বা অনাবৃত ভাবের পরিধি কালক্রমে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়া স্ত্রীর অধিকারী, সমগ্র সমাজ না হইয়া, কুল হইল, অর্থাৎ স্ত্রীর অধিকারী বা "স্বামী" (পরে বিবাহকর্ত্তা) সমাজ নহে, সমাজের অন্তর্ভুক্ত কোনও কুল। অর্থাৎ স্ত্রীকে দান করিত কুলের হস্তে, সেই কুলভুক্ত সমস্ত পুরুষই তাহার অধিকারী বা স্বামী। এরূপ হওয়ায় স্ত্রী সম্বন্ধে বিরোধ অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক ও তীব্র হইল।

এই অবস্থার রেশ দেখিতে পাই মহাভারতে দ্রৌপদীর বিবাহে। পক্ষগণকে ঐরূপ বিবাহে রাজি করিতে ব্যাসদেবকে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা হইতে বোধ হয় যে তখন ঐ প্রকার বিবাহ (অন্ততঃ আর্য্যাবর্ত্তে) অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কারণ "জটিলা নাম গৌতমী" ও "মুনিজা বার্ক্ষী" এই দুইটি মাত্র উদাহরণ দিবার সময় ব্যাসদেব বলিতেছেন—"পুরাণেঽপি শ্রূয়তে হি।"

তবে আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যদিগের মধ্যে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়িলেও অন্যান্য শ্রেণীর ভিতর ও ভারতের অন্যত্র এই প্রথা ঐতিহাসিক যুগেও চলিত ছিল এবং এখনও আছে। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি।

"স্মৃতিচন্দ্রিকা" (ঘারপুরে সংস্করণ), আহ্নিক প্রকরণ, পৃঃ ১০, পং ২৬এ আছে—"তথা চ গৌতমঃ (অ ১১, সূ ২০) "দেশজাতিকুলধর্ম্মাঃ আম্নায়ৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণম্" ইতি। তত্র বিরুদ্ধা অপি ক্বচিদ্ দৃশ্যন্তে। যথা "বিরুদ্ধাস্ত প্রদৃশ্যন্তে দাক্ষিণাত্যেষু সম্প্রতি। স্বমাতুলসুতোদ্বাহো মাতৃবন্ধুত্বদূষিতঃ। অভর্ত্তৃকভ্রাতৃভার্য্যাগ্রহণং চাতিদূষিতম্। কুলে কন্যাপ্রদানং চ দেশেষ্বন্যেষু দৃশ্যতে॥ তথা মাতৃবিবাহোঽপি পারসীকেষু দৃশ্যতে॥" এখানে উক্ত শ্লোকগুলির স্পষ্ট আকর নির্দ্দেশ নাই।

ইহাতে অন্য কথা বাদ দিয়া তিনটি বিষয় পাইতেছি—"স্বমাতুলসুতোদ্বাহ", "অভর্ত্তৃকভ্রাতৃভার্য্যাগ্রহণ" ও "কুলে কন্যাপ্রদান।"

এক্ষণে "অভর্ত্তৃকভ্রাতৃভার্য্যাগ্রহণ" ও "কুলে কন্যাপ্রদান" এই দুইটি যে পৃথক জিনিস, ইহা বেশ বুঝা যায়। প্রথমটি—কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার স্বামীর ভ্রাতা তাহাকে

গ্রহণ করা, সপুত্রাই হউক বা অপুত্রাই হউক। "গ্রহণ" অর্থে বিবাহ হইতে পারে, যথা উড়িষ্যার ঘঁইতো। "গ্রহণ" অর্থে নিয়োগও অন্যায় হইবে না, উর্দ্ধসংখ্যায় দুইটি পুত্র উৎপাদনের জন্য দেবর, তদভাবে সপিণ্ড, তদভাবে সগোত্র নিয়োগ হইতে পারে।

কিন্তু "কুলে কন্যাপ্রদান" সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিস। কেহ কেহ "কুলে কন্যাপ্রদান" অর্থে নিয়োগ বলেন শুনিয়াছি, বোধ হয় তাহা ঠিক নয়। কারণ—বিধবা "কন্যা"-পদবাচ্যা হইতে পারে না। বিধবা-বিবাহকে "কন্যাপ্রদান" বলা যায় না। নিয়োগেও "প্রদান" হয় না। "কন্যাপ্রদান" শব্দের অর্থ কুমারীর বিবাহ দেওয়া।

আবার—আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র ২,১০,২৭,৩এ আছে—"কুলায় হি প্রদীয়ত ইত্যুপদিশন্তি।" এখানে হরদত্তকৃত উজ্জ্বলা টীকাতে আছে—"কঃ পুনঃ সগোত্রস্য বিশেষস্তমাহ। কুলায়েতি। স্ত্রী কন্যা কুলায়ৈব প্রদীয়ত ইত্যুপদিশন্তি ধর্ম্মজ্ঞাঃ। তস্মাৎ সগোত্রায়ৈব সমাচক্ষীতেতি। কুলায় কন্যা কচিদ্দেশেষু দীয়তে গোত্রজেন কেনচিদপ্যনুভূয়তে। উক্তং চ বৃহস্পতিনা—"অভর্তৃকভ্রাতৃভার্য্যাগ্রহণং চাতিদূষিতম্। কুলে কন্যাপ্রদানং চ দেশেষ্বন্যেষু দৃশ্যতে॥" (এখানে দেখিতেছি এই শ্লোকটির আকর বৃহস্পতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট)।

উক্ত স্থানে নিয়োগের কথা হইতেছে। নিয়োগ জন্য সগোত্রকেই নিযুক্ত করিবে। অর্থাৎ গোত্রের বাহিরে কাহাকেও নহে। সগোত্রকেই নির্দ্দেশ করার কারণ দিতেছে—কন্যাপ্রদান করা হয় কুলকে, কোনও কোনও দেশে। কন্যাপ্রদান ব্যক্তিবিশেষের হস্তে না হইয়া কুলবিশেষের হস্তে হয়। কুল অর্থাৎ সেই কুলে যে কয় জন পুরুষ (ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসম্পর্কীয়) আছেন, তাঁহাদের সকলের সহিত বিবাহ হয়, ব্যক্তিবিশেষের সহিত নহে। এই জন্য সগোত্র পুরুষকে নিয়োগ করিবে। ইহুদিদের মধ্যে levirate প্রথা এই ভাবেরই উপর প্রতিষ্ঠিত (Levir = দেবর)।

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে নিয়োগপ্রথা ও অভর্তৃকভ্রাতৃভার্য্যাগ্রহণ উভয়েরই মূলে এই "কুলে কন্যাপ্রদান।" "কুলে কন্যাপ্রদান" নিয়োগ নহে। "কুলে কন্যাপ্রদান" হয় বলিয়াই নিয়োগ হইতে পারে। এখানে মনে পড়ে সাঞ্চী স্তূপের কয়েকটি উৎকীর্ণ লিপির কথা। কনিংহাম তাঁহার "Bhilsa Topes" গ্রন্থে কয়টি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে Fleet, Epigraphia Indica, Vol. II-তে ঐ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে দেখি যে তাঁহার অনুমান উজ্জয়িনীতে তাপসিয় নামে একটি জাতি বা কুল বা শ্রেণী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে "কুলে কন্যাপ্রদান" রীতি ছিল, উক্ত লিপিগুলি খ্রীঃ পূঃ ৩য় ও ২য় শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়।

এখনও ভারতবর্ষের অন্তর্গত অন্ততঃ এক স্থানে এই "কুলে কন্যাপ্রদান" প্রথা প্রচলিত আছে। জেলা দেরাদূনের উত্তরাংশে অবস্থিত জৌনসার পরগণায়। চারি-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রচলিত প্রথাস্থলে একজনের সহিত বিবাহ সমর্থন করেন। তাহাতে তাঁহার জীবনান্ত হয় ও "কুলে কন্যাপ্রদান" প্রথা অব্যাহত থাকে।

তিব্বতেও এই প্রথা বর্ত্তমান, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সেজন্য ইহার বিস্তৃত উল্লেখ করিলাম না।

বৃহত্তরপরিধি সমাজ হইলে ত কথাই নাই, স্বল্পতরপরিধি কুলেও সহপতিগণের মধ্যে যৌথপত্নী লইয়া বিরোধের উৎপত্তি খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে মহাভারতে সভাপর্ব্বে সুন্দ-উপসুন্দ উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া নারদ পাণ্ডবগণকে সতর্ক করিয়া দিলেও অর্জ্জুন-বনবাসের কারণ ইহা ভিন্ন কিছু নয়। এইরূপ কারণেই শ্বেতকেতু কর্তৃক যৌথবিবাহ প্রথা স্থলে একক বা একপতিবিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এইরূপে একক বা একপতিবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলেও আদিমতম স্ত্রীর "একপুরুষাধীন" ভাব বা তৎপরবর্ত্তী স্ত্রীর যৌথভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। স্ত্রীর একপুরুষাধীন ভাব সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে, মহাভারতে স্ত্রীকে "ভস্ত্রা" বলা হইয়াছে, এবং মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় শিষ্য দ্বারা নিজ পত্নীতে শ্বেতকেতুকে উৎপাদিত করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে, কিন্তু তজ্জন্য তিনি নিন্দিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। এই অবস্থা স্ত্রীর একান্ত একপুরুষাধীনভাব সূচিত করিতেছে। আবার—যৌথভাব যে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা দেখা যায় পূর্ব্ববর্ণিত নিয়োগপ্রথা হইতে। অবশ্য নিয়োগ-প্রথা কলিতে বর্জ্য বলিয়া আদিষ্ট, কিন্তু তাহারই অপর রূপ "অভর্তৃকভ্রাতৃভার্য্যাগ্রহণ" এখনও ভারতবর্ষে দেখা যায়, যথা পঞ্জাবে কয়েকটি জাতির মধ্যেএবং উড়িষ্যায় পূর্ব্বকথিত ঘঁইতো।

বস্তুতঃ পক্ষে একপতিবিবাহ-প্রথা চলা সত্ত্বেও পঞ্জাবে জাঠদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী অনেক স্থলে প্রকৃত পক্ষে সমস্ত ভ্রাতাদিগের যৌথপত্নী বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দীতে জ্যেষ্ঠতাতকে "বড়া বাপ" বলে, ইহা মনে পড়ে। ঐ রূপই পঞ্জাবে রাওলপিণ্ডি জেলায় গাক্কার জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুপতিত্ব বিদ্যমান। মাদ্রাজে মাদুরা জেলার

কারকাট বেল্ললার জাতির মধ্যে কোনও স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর পরিবার বা জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কাহারও সহিত ব্যভিচার করিলে তাহা দূষ্য নহে। কিন্তু উক্ত পরিধির বহির্ভূত কাহারও সহিত লিপ্ত হইলে তাহা অপরাধগণ্যে সেই স্ত্রীলোককে জাতিচ্যুত হইতে হয়। "কুলে কন্যাপ্রদান" এই সমস্তের মূলে বলিয়া মনে হয়।

এই ব্যাপার যেন একটা বৃত্তের মত—আদিমতম "এক-পুরুষাধীন ভাব" হইতে আরম্ভ করিয়া "যৌথভাব"এ পৌছিয়া পুনরায় "একপুরুষাধীনভাব"এ পৌছিয়া বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। যে বিন্দু হইতে আরম্ভ, ঘুরিয়া পুনরায় সেই বিন্দুতে পৌছিল। অথবা—ঘড়ির দোলকের মত—এক প্রান্তে "একপুরুষাধীন ভাব" হইতে দুলিয়া অপর প্রান্তে "যৌথ-ভাব"এ পৌছিল। আবার বিপরীত দিকে দুলিয়া "যৌথ-ভাব" হইতে "একপুরুষাধীন ভাব"এ পৌছিল। এইভাবে দোলন সম্পূর্ণ হইল।

একটু চিন্তা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ইহা ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত, পরস্পরের উপর প্রাধান্যলাভের চেষ্টার একটি ফল। এইরূপেই দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা, একক সম্পত্তি এবং কারেইয়াদ, বেশ প্রভৃতি, একপত্নীত্ব (ও বহুপত্নীত্ব) এবং বহুপতিত্ব, যথাক্রমে ব্যষ্টির জয়লাভ ও সমষ্টির জয়লাভের সূচক। এই ভাবেই রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র হইতে একনায়কত্ব (Dictator)।

মানবেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাত সর্ব্বক্ষণ বরাবর চলিতেছে, কখনও তীব্র, কখনও মৃদু, কখনও শান্ত গতিতে, কখনও বিদ্রোহ ও ক্রান্তির আকারে। সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পূর্ব্ব ইতিহাস মিলিয়া ফল নির্দ্ধারণ করে—কে জয়ী হইবে। এই জয়ের মধ্যেই আবার পরাজয়ের বীজ নিহিত থাকে। কারণ আবার কিছু দিন পরে সমাজ মধ্যে এমন কতকগুলি ভাবের উদ্ভব হয়, তাহারা প্রতি-ক্রিয়ায় এতাবৎকাল জয়ী ভাবকে পরাস্ত করিয়া এতাবৎ-কাল পরাজিত ভাবকে সিংহাসনে স্থাপন করে। এই ভাবেই সমাজ চলিয়া আসিতেছে এবং বোধ হয় সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত এইভাবেই চলিবে।

(বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত)

রবীন্দ্রনাথের পত্র*

(৺রমলা দেবীকে লিখিত)

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পড়ে তোমার ব্যথা আমার হৃদয়ে অনুভব করলুম। কিন্তু দুঃখ যেখানে গভীর সেখানে কি আমাদের বাণী পৌঁছয়? আমাদের শক্তি কতই অল্প—যখন সান্ত্বনার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি তখনই বুঝতে পারি এই সান্ত্বনার দাম আমাদের হাতে নেই। বাইরের থেকে দুটো চিরপ্রচলিত উপদেশবাক্য খুব সহজ কিন্তু আমার মনে হয় তার দ্বারা দুঃখকে অপমান করা হয়। আমি জানি আমাদের নিজের ভিতরেই শান্তির পথ—সে হচ্চে প্রতিনিয়ত সাধনার পথ। সে পথে প্রবেশের অধিকার সব সময়ে পাওয়া যায় না—কারণ, আমরা সংসারে কেবলমাত্র সংসারকেই আঁকড়ে ধরা চিরকাল অভ্যাস করেচি—সংসারের উপরে যে বড় জিনিষ আছে তার সম্বন্ধে চিরকাল আমাদের কথা মুখের কথা হয়েই আছে—তাকে প্রত্যক্ষ করে অন্তরের মধ্যে দেখ্‌তে শিখি নি তাই তার সম্বন্ধে বিশ্বাস আমাদের অত্যন্ত অস্পষ্ট। এই জন্যেই আমরা এত দুঃখ পাই।

আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি—অধিক কথা তোমাকে লেখবার সময় নেই কিন্তু জেনো তোমার জন্যে আমার চিত্ত ব্যথিত।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* শ্রীমতী রমা চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পৃথিবী

শ্রীকমলচন্দ্র সরকার, এম্. এ.

মাঠের পর মাঠ। মাটিতে ঢেউ তুলে ছুটছে তো ছুটছেই। ইচ্ছেটা—পলাতক অতীতকে কোনক্রমে একবার ঝাপ্‌টে ধরে। দেখে কে বলবে, ওরা পৃথিবীর স্থাবর সম্পত্তি! মাঝে মাঝে খোড়ো ঘরের যৌথ পরিবার আর তাদের উষ্ণীষধারী প্রহরী—দীর্ঘ, ঋজু তাল নারকেল গাছ—মাথা উঁচু ক'রে ওদের থামবার ইসারা জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। মাঠ অক্লেশে পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়েছে। ষ্টেশনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ওদের শ্যামল গতিবেগ কিছুক্ষণের জন্যে যেন থম্‌কে দাঁড়ায়; তার পর যেই ট্রেন চলতে সুরু করে, অমনি দূর-দূরান্তরের তেপান্তর রাজ্যে ওদের আবার ছড়িয়ে পড়া।

মানুষের বসতি চোখে পড়ে না বললেই হয়। আর যাও আছে দেখে মনে হয় যেন পৃথিবীর বিরাট্ জমিদারিতে দু-এক ঘর দুঃস্থ প্রজার কুঁড়েঘর। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে পেছন দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। বেশীর ভাগই চাষের জমি—আল দিয়ে বাঁধা আর তার উপর সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র বাব্‌লা গাছের দল পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বহুদূর বিস্তৃত পাঁচ-মিশেলী জঙ্গল। অভিজাত শ্রেণীর গাছগাছড়া থেকে আরম্ভ ক'রে কাসুন্দী, বুনো নিম, ঘেঁটু আর ফণীমনসা নানা রকম লতার প্ররোচনায় বিরাট্ চক্রান্ত ক'রে বসেছে। মাইলের পর মাইল এই একই দৃশ্য আলাদা রঙে আলাদা ফ্রেমে আঁকা।

ট্রেনের কামরায় ব'সে আজ এই প্রথম মলিনার মনে হ'ল, আঃ, মাটির এই পৃথিবীটা কত বড়! এই প্রথম বাড়ীর বার হয়ে সে যাচ্ছে, তাও সেই সব দূর দেশ নয়, সেই যে কোথায় কত দিনের পথ—দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন! এ তো খালি চাঁদপাড়া থেকে শেয়ালদা। চল্লিশ মাইল—টিকিটে লেখা আছে। বাবাঃ, চল্লিশ মাইল এত দূর? এই তো সবে দু-একটা ষ্টেশন পেরিয়ে এল, এরি মধ্যে কত দূরে পিছিয়ে পড়লো তার পুরনো গ্রাম!—সেই বোস পুকুর! অত বড় দীঘি ঝাঁঝিতে আর সাঁপলাতে বুজতে বসেছে। ঐ দীঘির পাড় দিয়ে গাঁয়ের মেয়েদের কলসী-কাঁখে সারি সারি ঘরে ফিরে আসা; বকুল-তলায় কাঁখের কলসী ভুঁয়ে রেখে একটু বা জিরিয়ে নেওয়া। তার পর রণরক্ষিণীতলার বাঁক ঘুরলেই সেই আশ্শাওড়ার জঙ্গল! ওখানে নাকি কারা সব থাকেন—সন্ধ্যের ঝোঁকে ওপথে কেউ যেতে চায় না, কেমন গা ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে। বিকেলের পাট সারবার জন্যে খিড়কির পুকুর। কত দিন ঐ পুকুরের চাতালে পা ডুবিয়ে একা একা ব'সে থেকেছে। ঘাটের দু'পাশে কল্‌মির দামে ফুল ধরেছে। একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে সেই ফুল ছিঁড়ে জল ভাসিয়ে দেওয়া, একটা বা খোঁপায় পরা।...

কত দূর রইল এরা! এই যে দস্যি দানব ধোঁয়া উড়িয়ে হুস্ হুস্ ক'রে নিশ্বেস ছেড়ে ছুটেছে তো ছুটেইছে, ওকি থামবে না? কেন কলকাতা এত দূরে? গ্রামের পাশেই তো কতো জায়গা খালি প'ড়ে রয়েছে! তা'হলে কেন একদেশ থেকে অর এক দেশ এত দূর? কেন যে সব দেশের লোক কাছাকাছি ঘর বাঁধে না!

পনেরো বছর পর্য্যন্ত কখনও মলিনা চাঁদপাড়ার বাইরে পা বাড়ায় নি। অবকাশ আর সুযোগ কোনটাই ছিল না। শিবপূজো করত, পাড়া বেড়াত; সংসারের ধকল কখনও ভালবেসে, কখনও বা অভিমানে মাথায় তুলে নিত। আর গাছের ছায়া পূবদিকে হেলে পড়লে খিড়কির পুকুরের চাতালে পা ডুবিয়ে ব'সে হঠাৎ এক এক সন্ধ্যায় ভাবত—রাজার কুমার কবে তাকে নিতে আসবে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে এক দিন তাঁর আসবার সময় হ'ল। সন্ধ্যার সময় পাল্‌কী আর পেট্রোম্যাক্স আলো নিয়ে ষ্টেশনে লোক ছুটলো। বহুদিনের পুরনো সরিকানি দুর্গাদালান, যেখানে সারাবছর খড়ের বিচালী গাদা ক'রে রাখা হ'ত, সেইখানটা পরিষ্কার ক'রে আলো দিয়ে তাঁর আসন তৈরি হ'ল। হুলুধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ আর আত্মীয়স্বজন পাড়া-পড়শীর আনন্দ-কলরবের মধ্যে তিনি এসে বসলেন। তার পর—

রাজপুত্রের রাজত্ব 'ক্যালকাটা ওয়ার্কস্'-এর সাবান বিভাগ, যুদ্ধ করেন যন্ত্র-দানবের সঙ্গে। রাজস্ব সামান্য—'মাণিকতলা চীপ্ মেস হাউসে' একটি প্রাসাদকক্ষের অধিকার বজায় রাখতে আর রাজবাড়ীতে টাকা পাঠাতে তার অধিকাংশ খরচ হ'য়ে যায়। এসব খবর মলিনা বিয়ের আগেই শুনেছিল—দরজার আড়ালে কান পেতে। শুনে এক সময় নির্জ্জনে ব'সে নিজেকে অনেক বোঝালে।...এমনটা কখনই হয় না যে তুমি যা চাইলে সবটা পেয়ে গেলে। তাছাড়া যাই বলো বাপু, বড়লোকের বাড়ী ঘর করতে যাওয়া এক দায়। উঠতে বসতে বড়লোকী ধরণ-ধারণ মেনে চলতে হবে—একচুল এদিক ওদিক হ'লে অপ্রস্তুতের একশেষ। ঐ তো দেখ না ঘোষালপাড়ার যমুনা। আদুরে মেয়ে—বাপ মা সাধ ক'রে বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিলেন। এমন বরাত, এক মাস যেতে-না-যেতে সুরু হ'ল মনকষাকষি। এর মধ্যে দু'বার নাকি বেয়াইবাড়ী থেকে তত্ত্ব ফেরৎ এসেছে।...

এসব হ'ল গিয়ে—দাঁড়াও—এগারোই অঘ্রাণ থেকে আজ হ'ল আষাঢ়ের আটাশ তারিখ। সাত মাস সতেরো দিন। আচ্ছা, এই সাড়ে সাত মাসের মধ্যে চার বারের বেশী কি আসা যেত না? চিঠিতে এদিকে লিখছেন, ভয়ানক কাজ। হুঁঃ, কাজ যেন আর

কেউ করে না! ইচ্ছে থাকলে শনিবার শনিবার খুব আসা যেত। সাম্‌নাসাম্‌নি বলতে গেলেই তো ঝগড়া, বলে—এ তো আর লাটসায়েবের দপ্তর নয় যে রাববার ঘুমোবার ছুটি দেবে। আমরা হলুম মজুর ক্লাসের লোক। একটা রবিবার 'ওভারটাইম' করলে নগদ দেড়টা টাকা লাভ। আর কিছু না হোক্‌, এক শনিবার শ্বশুরবাড়ী আসবার গাড়ীভাড়াটা তো আদায় করা যায়। ব'লে এমন হো হো ক'রে হেসে উঠবে যে থামানো দায়।··· দেখ তো কথার ছিরি! এমন কি পয়সার টানাটানি যে নিজের শরীর নষ্ট ক'রে খাটতে হবে। হপ্তায় একটা দিন ছুটি না পেলে মানুষ বাঁচে? শরীরের কথা বলতে যাও, ধমক দিয়ে উঠবে। কার সাধ্যি কাছে ঘেঁসে! মুখ ভার করলে তো আরও বিপদ। চেঁচিয়ে, ভাল কথা ব'লে, অভিমান ক'রে এমন কাণ্ড ক'রে বসবে যে না হেসে থাকা যায় না।

যে ক'বার নিবারণ চাঁদপাড়ায় এসেছে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে? থাক্‌, থাক্‌, এ প্রশ্ন ক'রে ওকে আর লজ্জা দেওয়া কেন?—নিবারণ সাধারণতঃ আসত রাত আটটার ট্রেনে, কিন্তু বিকেল হ'তে না হ'তে মলিনার খালি মনে হ'ত, ঐ বুঝি এসে পড়লো, পাঁচটা পনেরোর ট্রেনে এলে এই তো আসবার সময়, তাড়াতাড়ি ও একবার সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়াত, দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের চেনা পথটার দিকে চেয়ে থাকত, যে-পথ কত বাঁক ঘুরে ষ্টেশনে গিয়ে মিশেছে।

বাড়ীর লোক একাজে-ওকাজে ব্যস্ত—কোথায় মাছ ধরানো, কোথায় নারকেলের ছাপা তৈরি, কেউ নতুন জামাইয়ের ঘর গোছাতে লেগেছে। এসব কাজে মলিনাকে কেউ কাছে ঘেঁসতে দেবে না। কাজেই ও ঘরে এসে নিজেকে সযত্নে কোলে তুলে নিত। তেল-সিঁদুর-মাখা আয়না, হোক্‌ গে তা,—তার সামনে ব'সে ঘন কালো চুলের ওপর চিরুণীর একটা টান দিয়ে মলিনা বিভোর। গলার নীচে দিয়ে চুলের ফিতে কষে বাঁধলে মুখখানা লাল হয়ে উঠত। চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে হঠাৎ চমকে উঠত—দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? জানলার কাছে এসে একবার দাঁড়িয়েছে—কাগজী লেবুর ঝোপের ওপর দিয়ে রাস্তার একটুখানি দেখা যায়।···তার পর চিরুণীর মুখে সিঁদুর লাগিয়ে কপালের প্রশস্ত ভাগ্যপথ রঙীন ক'রে তোলা, কাঁচপোকার টিপ পরা, আর গা ধুয়ে এসে প্রসাধন সমাপন করায় কখন যে বেলা পড়ে আসত সেদিকে খেয়াল থাকত না।

মলিনার কলকাতা যাবার কথা তখন থেকেই চলে আসছে। এত দিন না যাবার কারণ নিবারণ সুবিধেমত বাসা যোগাড় ক'রে উঠতে পারে নি। কখনই পারত না যদি না হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে তাঁর পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি ও কিছু থোক্‌ টাকা 'বোনাস' প্রাপ্তি হ'ত। স্ত্রীর ভাগ্যে এর মধ্যে ওর কায়েমী বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে। এর পরে আর মলিনাকে বাপের বাড়ী ফেলে রাখা ভাল দেখায় না। আত্মসম্মান আছে, তার ওপর অপর পক্ষই আকারে ইঙ্গিতে দু-একবার জানিয়েছে। কাজেই চেষ্টাচরিত্র ক'রে বহু খোঁজাখুঁজির পর নিবারণ মাণিকতলা অঞ্চলে দশ টাকায় একখানা ঘর ভাড়া ক'রে মলিনাকে নিয়ে যাচ্ছে। দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নেই। সংসার-খরচের স্রোত কখনও ছক-কাটা পথে যায় না; যত চলে ততই তার আয়তন বেড়ে যায়, আর আয়তন বাড়া মানেই কূল ছাপাবার ঝোঁক। এ ঝোঁক কেমন ক'রে সামলাবে তা কি নিবারণ ভেবে দেখে নি? দেখেছে, কিন্তু বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নি। সে স্বভাব তার নয়। তাছাড়া সংসার-যাত্রায় ভাগ্যের ওপর খানিকটা নির্ভর তো করতেই হয়।

দমদমে বনগাঁ লোক্যাল এসে থামতেই জানলায় মুখ বাড়িয়ে মলিনা সামনের দিকে তাকালো। ঐ যে নামছে! এমন মানুষ, প্রত্যেক ষ্টেশনে নেমে জিজ্ঞাসা করতে আসবে, কিছু চাই কিনা। আচ্ছা, এইটুকু পথ রেলে আসতে একজন মেয়েছেলের কি-ই বা দরকার হতে পারে? বড়জোর পানটা। সেও তো সঙ্গে এক কৌটো সেজে এনেছে। এদিকে ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী যে এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না সেদিকে ভ্রূক্ষেপই বা কার আছে আর বললেই বা শুনছে কে? কিছু দরকার নেই বললেও নিবারণ নড়ে না; মলিনার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ পারে গল্প করবে, তার পর বাঁশী দিয়ে গাড়ী যখন ছেড়ে দেবে তখন ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠবে। মলিনা দু-তিন বার ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

—আর কি, এসে তো পড়লুম। এর পরের ষ্টেশন উল্টো-ডাঙ্গা, তার পরেই ব্যস্—কলকাতা। ও কি, চোখ লাল হ'ল কেন? কাঁদছিলে নাকি?

—না তো।

—তা হ'লে নিশ্চয় চোখে কয়লা পড়েছে। পই পই ক'রে বলে গেলুম, এঞ্জিনের দিকে মুখ করে বসো না, এখন দেখ। কাপড়ে হাই দিয়ে চোখে চেপে ধরো। জল আনবো? চোখে ঝাপটা দিলে—

নিবারণের রকমসকম দেখে মালিনা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে ফেললে। বললে, কিছু হয় নি। অমন করে চেয়ে থাকলে—

নিবারণ চট করে চোখ নামিয়ে অপ্রস্তুত ভাবে হেসে ফেললে। তারপর একটু গম্ভীরভাব ক'রে বললে, তুমি বরং এখানে কিছু খেয়ে নাও।

—হ্যাঁ, এই তো বেলা একটার সময় খেয়েদেয়ে গাড়ীতে উঠলুম, বিকেল না হ'তে হ'তে খাব কি?

—মেলা ব'কো না বাপু, বাসায় পৌঁছে গোছগাছ ক'রে বসতে রাত কত হবে সে খেয়াল আছে?

বলে নিবারণ একদৌড়ে কিছু এলাচদানা আর এক ঠোঙা আলুকাবলী কিনে এনে বললে ধরো। আমি দেখি যদি ডাব পাওয়া যায়।

এবার কিন্তু মলিনা কিছুতেই তাকে যেতে দিলে না। বললে, ওমা, এ কি? এত কিনলে কেন? যা আছে তাই খেয়ে ওঠা যাবে না। আবার—

—হ্যাঃ, ভারি তো জিনিস! মুখে দিতে-না-দিতেই মিলিয়ে যাবে।

—তুমিও তাহলে নাও।

—কি যে বলে। এখনও ভাতের ঢেঁকুর উঠছে। আর এই তো আগের ষ্টেশনে এক কাঁড়ি কালোজাম খেয়ে নিলুম। নাও, তুমি খাও দেখি।

ক্ষণমাত্র মলিনা চেয়ে রইল নিবারণের মুখের দিকে। কি কারণে কে জানে ওর কেমন মায়া বোধ হতে লাগল। কপাল দিয়ে ঘামের ধারা নেমে এসেছে, পড়ন্ত রোদে মুখখানা রাঙা।

—দাঁতে, ঠোঁটে একটুও রঙ লেগে নেই, জাম খেলে কি রকম?

নিবারণ থতমত খেয়ে গেল। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে, না, মানে খাবো ভাবলুম, ট্রেন ছেড়ে দিলে যে।

সম্মতির অপেক্ষা না রেখে মলিনা আলুকাব্‌লীকে সাজির মধ্যে রাখলে। নিবারণ বুঝলে, শক্ত ঠাঁই। চুপ করে গেল, কিন্তু চাপা আহ্লাদের একটা গদগদ ভাব মুখে লেগে রইল।

—কলকাতা এখান থেকে কত দূর?

অন্যমনস্কভাবে নিবারণ বললে, কত আর, মাইল সাত-আট হবে।

—আর চাঁদপাড়া?

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে নিবারণ কিছুক্ষণ সকৌতুকে মলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলে কি? এ যেন নৌকো থেকে ডাঙায় নেমে জোয়ার-ভাঁটার খবর নেওয়া। একটা রসিকতা করতে গিয়ে নিবারণ কিন্তু সামলে নিলে।

মলিনার দৃষ্টি পেছনে তাকিয়ে আছে।···ষ্টেশনে আসবার আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, স্থলপদ্মের ছায়ার ছাপ দেওয়া বাড়ীর উঠোন, রান্নাঘরের চাল ফুটো করা নারকেল গাছ, যেখানে বসে মা কুটনো কোটেন, ছোটভাই হরিশ ছিপ ফেলে মাছ ধরে—গ্রামের এই সব নানা আনাচে কানাচে এখনও ওর মন বাঁধা।···

খানিকটা আন্দাজ করে নিয়ে নিবারণ শুধু বললে, তিরিশ-বত্রিশ মাইল হবে হয়তো?

—মোটে? আমি ভেবেছিলুম আরও অনেক বেশী।

—কত? দুশো-পাঁচশো? নিবারণ পরিহাস করে বললে।

—তাই বুঝি বলেছি?—ঐ ঘণ্টা দিয়েছে, যাও শীগ্‌গির।

·

মাইল দিয়ে পৃথিবীকে একটু যদি বোঝা যায়! চল্লিশ মাইল না হয় শুধু পথটাই হ'ল; কিন্তু আশেপাশে, সামনে পেছনে ঐ যে অবারিত জমি, জঙ্গল, জনপদ পেরিয়ে এল, তার হিসেব কে রাখে? নিবারণ নিশ্চয় কমিয়ে বলেছে, ভেবেছে বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী বেশী দূর শুনলে মলিনা হয়তো মন খারাপ ক'রে বসবে। আসলে চাঁদপাড়া থেকে কলকাতা বহুদূর—দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে তবে।···

বনগাঁ লোকাল ছুটতে ছুটতে ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছে। আর ছুটছে মলিনার কল্পনা—ঐশ্বর্য্যবান্ ভবিষ্যৎ কি হাতে তুলে দেবে তাই নিয়ে।···কেমন সে দেশ? এত বড় শহরে সে থাকতে পারে?

গলির মধ্যে একতলা বাড়ীটা যেন ধুঁকছে। সারা অঙ্গে বার্দ্ধক্য আর অনাহারের ছাপ। কত দিন যে চুণবালির মুখ দেখে নি কে বলবে। এই সঙ্গতির ওপর পোষ্য জুটেছে একদল। দু'টো সংসার ওরই মধ্যে পাশাপাশি মাথা গুঁজেছে; মলিনারা এলে আর একটি বাড়বে। এখানে জায়গা পাবার তাদের কোনও সম্ভাবনা ছিল না, যদি না দক্ষিণ-অংশবাসী মন্মথনাথ হঠাৎ কিছু বেকায়দায় পড়তো। ভূষিমালের দোকানে কিছু থোক্ টাকা লোকসান দিয়ে বেচারী মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। গোনাগুনতি ক'টি টাকা আয়, তার মধ্য থেকে কম পড়লে গেরস্ত সামলায় কি ক'রে! কাজেই কর্ত্তাগিন্নী পরামর্শ ক'রে ঠিক করলে যে তাদের যে-ঘরখানায় এখন ভাঁড়ার, ভাঙা জিনিসপত্তর, কাঠকুটো জড়ো করা আছে, সেইটে ভাড়া দিয়ে দেবে। মস্ত সুবিধে—ঘরটার পেছনদিকে একটা দরজা আছে, নতুন ভাড়াটেরা ঐখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। একটা কলপায়খানায় দুটো ছোট সংসার স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে। শুধু রান্নাঘর নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা ছিল; তা সে সমস্যারও মন্মথ সমাধান ক'রে দিয়েছে। ভেতরের বারাণ্ডার একফালি জায়গা চাঁচ দিয়ে ঘিরে নতুন ভাড়াটেদের জন্যে যে পাকশালা তৈরি হয়েছে তা দেখে কারও কিছু বলবার নেই।

অতএব নব-দম্পতির গৃহ-প্রবেশের আয়োজন সম্পূর্ণ। নিবারণ ইতিমধ্যে একবার এসে ঠিকে লোক ধ'রে ঘরদোর ধুয়ে মুছে, জিনিসপত্র কিছু কিছু আনিয়ে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরা এলেই হয়।···

ঐ ঘোড়ার গাড়ী এসে থামলো। নামলো নিবারণ, মলিনাকে নামালো হাত ধ'রে। জিনিসগুলো গুণে নিয়ে বললে, ও এখন ঐখানে থাক্, পরে হাতাহাতি ক'রে তখন তোলা যাবে। এখন এসো ঘরের ভেতর।

ঘরে এসো!···কৃপণ পৃথিবীর কাছ থেকে এই আশ্রয়টুকু আমি কেড়ে নিয়েছি। কেন নিয়েছি, জানো? তুমি বলবে, 'এ আর শক্ত কথা কি, আমি এসে থাকব বলে।' কথাটা অস্বীকার করি না, কিন্তু আরও একটা মস্ত গোপনীয় কারণ আছে। পুরুষেরা কত স্বার্থপর হয় জান তো? আমারও স্বার্থ আছে। আজ আমি যে ডাক তোমায় একবার মাত্র শোনালুম, ঐ ডাক আমি তোমার ভালবাসার নিঃশব্দতায় বারে বারে ফিরে শুনতে চাই। এ ঘরের যাতেই তুমি ভালবেসে হাত ছোঁয়াবে, আমি

জানি, সে আমাকে অনুক্ষণ টানবে, চুপে চুপে মিষ্টি আহ্বান পাঠাবে—'ঘরে এসো'।...

কিন্তু কার গায়ে ভালবেসে হাত দেবে? ঘরের চেহারা কি এত নির্মম হয়? চৌকাঠ পেরিয়ে মলিনা থমকে দাঁড়াল।

আশাভঙ্গ? তা'হলে তো মলিনা ভুল ক'রে বসল। ঘর নয়, এ তার বাসাবাড়ী। বাসিন্দের সঙ্গে ওর সম্পর্ক টাকার। তাই বাড়ীর চোখে মুখে অত বিরক্তি; ভাবছে, আবার এক দায় এল।

কিন্তু ভাড়াবাড়ী হ'লেও তার মধ্যে কিছু বিস্ময়, কিছুটা কৌতূহলের অবকাশ ছিল বৈকি। অপরিচিত ঘরের সঙ্গে আলাপ জমাবার আলাদা একটা উন্মাদনা আছে। কিছুই তার জানা নেই; কোন্ দোর দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, কোথায় তার উঠোনের মুক্তি, চোখের আড়ালে লুকোনো সিঁড়ি দুড়দাড় ক'রে লাফিয়ে হঠাৎ কেমন ক'রে ছাদে ওঠা যায়—এ তো রীতিমত নতুন দেশ আবিষ্কারের আনন্দ। বাড়ীটার কোথায় কি আছে, কিছুতেই বাইরের চেহারা দেখে ধরা যায় না। আন্দাজে খালি ভুল, আর যত ভুল তত আমোদ। একটা বন্ধ দরজা দেখে কেউ হয়তো ভাবছে, ওদিকে নিশ্চয় আর একখানা ঘর। খুলে ফেললে দরজা, দেখে ছোট একফালি বারান্দা! রান্নাঘর খুঁজতে গিয়ে বেরলো ছাতে যাবার সিঁড়ি। আল্‌সের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে পাড়াটা যদি একবার দেখে নিতে চাও, তড়বড় ক'রে ছাদের চারিদিকে একবার চর্কিপাক খেয়ে নাও।—থাক্ বাইরের কথা আপাততঃ, ঘরে অনেক কাজ। এসো, বাঁধা বাক্স-বিছানার ওপর ব'সে পড়ো; ঘর-সাজানোর পরামর্শ শেষ ক'রে কোমর বেঁধে কাজে লাগা যাক্।...

মলিনাদের বাসার একখানাই ঘর—একবার চোখ মেলে তাকাতেই চেনা অক্ষরের মতন মুখস্ত হয়ে গেল।

—ঘরখানা ভয়ানকই ছোট, নিবারণ বললে—তাই কত মেহন্নৎ ক'রে পাওয়া গিয়েছে। বারো টাকার কমে তো প্রথমে কথাই বলতে চায় নি। অনেক বলে কয়ে কোনওক্রমে দশ টাকায় রাজী করিয়েছি।...দেখেশুনে কি রকম মনে হচ্ছে বলো তো? দু'জন লোকের চলবে?

—খুব। এই তো চারদিকে কতো—ব'লে মলিনা পাক খেয়ে বাস্তবের সামনে জেগে উঠে হঠাৎ থেমে গেল।

—চারদিকে কি? অঢেল জায়গা? নিবারণ উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লো।—এর মধ্যে হাত পা ছড়াবার স্থান কোথায় দেখাতে পারো?

এমনভাবে বললে, যেন মলিনাই দেখেশুনে পছন্দ ক'রে বাড়ী ঠিক করেছে। কিন্তু নিজের সংসার—এই অনুভূতির নেশা মলিনার তখন লাগতে আরম্ভ হয়েছে। চট্ ক'রে হাসিমুখে বললে, পারিই তো। কিন্তু সবুর করতে হবে। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে বসলে তখন দেখো।

সে কথায় কান না দিয়ে নিবারণ বললে, এত ক'রে বললুম মন্মথ বড়ালকে সিঁড়ির তলার ঐ ছোট ঘরখানা দিতে—পুরো বারো টাকাই নয় দিতুম। নাঃ, কিছুতেই টললো না। বললে, দু'খানা ঘর যোল টাকার কম হ'তেই পারে না। দেখো তো, ঐ ঘুপ্‌সী ঘর, চাল-ডাল বাসন-কোসন রাখা ছাড়া যা আর কোনও কাজে আসবে না, তার জন্তে একটা নয়, দুটো নয়—ছ-ছ'টা টাকা! বাড়ীআলাদের দস্তুরই এই। ভাড়ার টাকাটা তো কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিলে, তার পর মেয়েছেলে নিয়ে তুমি মর আর বাঁচ!

—ব'সে ব'সে গল্প করলে রাত্তিরে আর রান্নাবান্না হবে না .কিন্তু।

নিবারণ হেঁকে উঠল, একলাহাতে আজ আর রাঁধাবাড়ার হাঙ্গাম করতে হবে না। আমি তো দাঁতে কুটোটি কাটছি না বাবা, দিনের বেলায় যা খাওয়াটা খেয়েছি! ব'লে সত্যি সত্যি ও একটা ঢেঁকুর তোলবার চেষ্টাই ক'রে ফেললে।

মলিনা মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল। রাত্তিরে না খেয়ে কেমন থাকতে পারেন তা ত আর জান্‌তে বাকী নেই। নিজের মুখেই কত বার বলেছে, দিনের বেলায় দাও না দাও আমি পরোয়া করি না, কিন্তু রাতে অন্ততঃ একটা ভাতে-ভাত আমার না-হ'লেই নয়।

—হাসছ যে বড়? সত্যি আমি কিছু খাচ্ছি না। তোমার জন্তে বরং দোকান থেকে কিছু নোন্‌তা আর মিষ্টি এনে দিই।

ভালমানুষের মত মুখ ক'রে মলিনা বললে, সেই ভাল! অম্‌নি বাজারটা যদি একবার ঘুরে এস; বেশী কিছু নয়—আলু আর দু-চার পয়সার পাঁপর। রাত্তিরে তাহ'লে চালে-ডালে ফুটিয়ে নিই।

'চাল-ডালে'র নাম শুনে নিবারণ হঠাৎ ভিজে গেল। জিনিসটা ওর ভারী পছন্দসই। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যা বলেছ, এখন মনে হচ্ছে রাতে একটু একটু খিদে পাবে। আচ্ছা, দাও দিকি ঝাড়ন কি গামছাটা—

মলিনা মুখ টিপে হেসে উঠল। বললে, দেরি ক'রো না যেন। কাঠের উনুনে চায়ের জল চাপাব।

ফিরে এসে নিবারণ দেখে সারা ঘরময় জিনিস ছড়িয়ে মলিনা কাজে লেগেছে। গাছ-কোমর বাঁধা, মাথায় ঘোমটা নেই, কপালে বিন্দু বিন্দু জমেছে ঘাম! দেখে হঠাৎ ভাল লাগল। বললে, এ-হে-হে, তুমি একা একা দেখছি নাকালের একশেষ হ'চ্ছ। দেখি, আমি একটু।—কিন্তু দেখো, একটা বড় মুশকিল হবে।

মাথায় আঁচল টানতে টানতে মলিনা কাছে এসে উৎসুক ভাবে বললে, কি?

—দোকান থেকে আসতে আসতে তাই ভাবছিলুম। মাঝে মাঝে তোমায় যে চেঁচিয়ে ডাকব, 'কই গো কোথায় গেলে',

এ বাড়ী নিয়ে তার আর উপায় রাখি নি। ব'লে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

অন্ত সময় হ'লে মলিনাও হাসত। কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে যে বেদনা ছিল তার ছোঁয়া এসে ওর মনে লাগল। লাগতেই ওর সঙ্কোচের আবরণ যেন খসে পড়ল। হাতের কাজ রেখে নিবারণের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, আবার ঐ কথা!—আচ্ছা, আমরা ত দুটি প্রাণী! তাও তুমি থাকবে সারাদিন বাইরে বাইরে। আমার একলার জন্তে এই ঘর কি কম হ'ল? এই আমি বলে রাখলুম, আমার সামনে ও কথা আর খবরদার নয়।

—বাবা, এরি মধ্যে হুকুম?

—নয়ই বা কেন?

মুখে বললে বটে, কিন্তু কাজে নেমে মলিনা আতান্তরে পড়ল।

ওদের ঘরখানা চওড়ায় ছ'হাত, লম্বায় বোধ হয় হাত দশ-বার হবে। ছাদটাও নীচু, একজন লম্বা লোক চেয়ারের হাতলের ওপর দাঁড়ালে প্রায় কড়িকাঠ ছুঁতে পারে। বাড়ী ভাড়া দেবার আগে মন্মথ বড়াল দু-তিন বার নিবারণকে শুনিয়েছিল যে এত কম ভাড়ায় তিন দিক খোলা ঘর কলকাতা শহরে আর কোথাও মিলবে না। তার কথা সত্যি—ঘরটার তিন দিক খোলা। কিন্তু এমন মুশকিল, কোনও দিকই সারাক্ষণ খুলে রাখা যায় না। দক্ষিণে সদর দরজা, নিবারণ যতক্ষণ না থাকে ওটা বন্ধ রাখতে হবে, রাত্তিরে ত বটেই। উত্তর-মুখো যে দোর, তার সামনেই ওদের চাঁচের বেড়া দেওয়া রান্নাঘর। সেদিকও সামলে রাখতে হয়। বাকী রইল পূবের জানলা। ওটার ওপর অনেক আশা ছিল, কিন্তু আশালতা ছিঁড়ে পড়েছে। জান্‌লাটার সাম্‌নেই পাড়ার জোয়ানদের এক কুস্তীর আখড়া। সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, এক জন-না-এক জন হয় গায়ে মাটি মেখে কুস্তী লড়ছে, নয় বারবেল ভাঁজছে। নিবারণের কাছে খবরটা শুনে মলিনা রীতিমত থাব্‌ড়ে গিয়েছে। বাইরে চাওয়া দূরে থাক, জানলা খুলতেই রাজী হবে না। নিবারণ অবশ্য এক বুদ্ধি দিয়েছে, বলেছে ছেঁড়া শাড়ী দিয়ে সময়মত একটা পর্দা তৈরি ক'রে নিতে।

এই হ'ল ঘর। এদিকে কায়েমী বাসিন্দের সংখ্যা অফুরন্ত। খাটিয়া, বিছানা প্রভৃতি নিবারণের 'মেসে'র কিছু কিছু জিনিস ছিলই, তার ওপর চাঁদপাড়া থেকে এটা-ওটা ক'রে একরাশ মোট-ঘাট এসে পড়েছে। নতুন সংসার পাতবার উত্তেজনায় কেনা-কাটিও মন্দ হয় নি। তাদের ফেলাও যায় না, আর ঘরে স্থান দেওয়া আরও শক্ত।

দেখেশুনে নিবারণ বললে, যে রকম ব্যাপার দেখছি, এঁদের ঘরে রেখে চল আমরা উঠোনে গিয়ে বাস করি। তোমার কাছে বিছানা-বাঁধা দড়ি ছিল না?

—হাঁ, আছে, কি করবে?

—কড়িকাঠ থেকে একটা বাঁশ টাঙিয়ে বাড়তি বিছানাগুলো তুলে দিই। আর রোজকার পরবার কাপড়-চোপড়গুলো দেয়ালে একটা দড়ি টাঙিয়ে দিচ্ছি, তাইতে রাখ। তাহ'লে হয়ত খানিকটা জায়গা হ'তে পারে।

হ'লও। কিন্তু ভিড়ের সময় সামনের ষ্টেশনে কোনও লোক নেমে যাবে শুনলে আশপাশের যাত্রীদের মুখের ভাব যেমন হয়, বাক্স-প্যাটরাগুলোর সেই অবস্থা। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জায়গা দখল করবে বলে। না দিয়ে রক্ষে নেই।

গোছগাছ মোটামুটি শেষ ক'রে মলিনা আর নিবারণ যখন জিরোতে বসল, তখন ঘরের চেহারা দাঁড়িয়েছে এই রকম।—পূব-দিকে জানলার ধারে পাশাপাশি দু'খানা কেরোসিন কাঠের তক্তপোষ। উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে মলিনার বিয়ের সময়কার কেনা গোলাপফুল আঁকা তোরঙ্গ, দাঁড়-করান দু-খানা মাদুর, কাপড়ের আল্‌না, একখানা ছোট চৌকির ওপর কালীঘাটের কয়েকটা পট, কাঠের ব্র্যাকেট দেওয়ালে টাঙিয়ে তার ওপর রাখা আয়না, চিরুণী, চুলের ফিতে, সিঁদুর-কৌটো। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমই এই দরজার দিকে নজর পড়ে বলে ওরা ইচ্ছে ক'রেই এই দিকটায় জিনিস কম রেখেছে, আর যতটা পেরেছে সাজিয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ-সীমান্ত আর সামলাতে পারে নি। ওদিকে ভাঁড়ারের জিনিসপত্র, থালা-গেলাস, কুটনোর চুপড়ী, পান-সাজার সরঞ্জাম, জলের কলসী—সব। এর মধ্যে বেশীর ভাগ জিনিস রান্নাঘরে রাখবার কথা প্রথমে হয়েছিল, কিন্তু নিবারণ ভেবে বললে যে, ও ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে দরকার নেই। চাঁচের বেড়া দেওয়া ঘর, ওপরের দিক অর্দ্ধেক খোলা—চুরি-চামারি কিছু একটা হয়ে গেলে বসে বসে হাত কামড়াতে হবে। তার চেয়ে ওসব ঘরের মধ্যেই বরং থাক্।

—ঐটে মিছিমিছি কিনতে গেলে কেন বল ত? তোমার একখানা ত ছিলই। ব'লে মলিনা তক্তপোষের দিকে আঙুল দেখালে।

—ওটা? বাঃ, তুমি তা না হ'লে শোবে কোথায়? এ সব বাড়ীর মেঝেতে এমন ড্যাম্প্‌ ওঠে যে নীচে বিছানা পেতে আর শুতে হয় না।—কাল এক কাজ করব। কতকগুলো বাড়তি জিনিস খাটিয়ার তলায় ঢুকিয়ে দোব। এদিকে তাহ'লে চলবার খানিক জায়গা হবে।

—ঢুকবেই না। আর যদি ঢোকে একশ বার টেনে বার করতে হবে।

—রোজ রোজ বার করবার দরকারই বা কি? আর নয় ত সকালবেলা একখানা তক্তপোষ দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে দিলেই হবে। হাল্কা আছে।

সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল না।

তখন গভীর রাত। পাশাপাশি ওরা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। এমন

সময় হঠাৎ মলিনা জেগে উঠল। ওর কপালের ওপর এক ফোঁটা জল যেন কোথা থেকে এসে পড়েছে। কি আশ্চর্য্য, বাইরে এত বড় একটা সোরগোল বেধেছে টেরই পায় নি। ঝমঝম্ ক'রে নেমেছে বৃষ্টি, ঠাণ্ডা হাওয়া জান্‌লা দিয়ে ঘরে ঢুকছে, বাড়ীর পাশের নারকেল গাছটা হাওয়ার দাপট আর জলের আছড়ানিতে হাঁপাচ্ছে। কখন আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি সুরু হয়েছে হুঁসই ছিল না। এইমাত্র যা জানা গেল তা এই যে—ভাঙা ছাদ চুঁইয়ে ওদের ঘরের মধ্যে জল পড়ছে।

পায়ের কাছে কমিয়ে-রাখা লণ্ঠনটা উস্‌কে দিয়ে মলিনা ভাল ক'রে চার দিকে চেয়ে দেখলে। টের পেলে, কেবল এক জায়গায় নয়, এখানে-ওখানে সর্বত্র টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ছে; দেওয়ালের গা বেয়েও কয়েকটা ক্ষীণধারা নেমে এসেছে। খালি কি ভাগ্যি, নিবারণ যে কোণটায় শুয়েছে সেই দিকটা এখনও শুকনো আছে। ও তাই জাগে নি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অকাতরে ঘুমোচ্ছে। থাক্, ওকে ডেকে কাজ নেই। জেগে উঠে করবেই বা কি? শত চেষ্টাতেও ছাদের জল এখন বন্ধ করা যাবে না।

বাল্‌তি গামলা যা মলিনা হাতের কাছে পেলে, এনে পেতে দিলে যেখানে-যেখানে বেশী জল পড়ছে। দু-একখানা পুরনো কম্বল, সতরঞ্চি মেলে দিলে বাক্স আর কাপড়-চোপড়গুলোর ওপর, তুলে ফেললে নিজের বিছানা। নিজের অসহায় অবস্থা তখন যেন এক চেহারা নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। কোথাও এমন একটু জায়গা নেই যেখানে বসে এই দুর্য্যোগের রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। স্বামীর বিছানা এত ছোট, তাতে একজনই শুতে পারে। একবার ভাবলে জান্‌লার ওপর গিয়ে বসবে। গেলও, কিন্তু বসতে-না-বসতে বৃষ্টির ছাট জান্‌লার ফাঁক দিয়ে ওর শাড়ী ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

গরমের পরে বৃষ্টি। ভিজে হাওয়ার মিষ্টি নেশার আমেজ। চোখের পাতা দুটি এসেছে ভারী হয়ে, সারা অঙ্গ কামনা করছে ধরিত্রীর স্পর্শ। কিন্তু স্থান নেই। পৃথিবীর কোল জুড়ে ভূচর, খেচর, বনবিটপীর খেলা। মানুষ যারা আছে তারা দুর্য্যোধনপন্থী—বিনাযুদ্ধে এক মুঠো ধুলোও দিতে চায় না।

চাঁদপাড়া থেকে শেয়ালদা আসবার পথে ঐ যে যোজনের পর যোজন জমি পড়ে রয়েছে, ওকি কারও থাকবার কাজে লাগবে না? তাহ'লে ও মিথ্যে, আরও মিথ্যে পৃথিবীর আয়তনের অঙ্ক।···মলিনার পৃথিবী সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে কোথায় এসে ঠেকেছে কেউ কি দেখছে? তারা-আঁকা আকাশ, মেঘে-ঢাকা আকাশ এতদিন ওকে রূপই দেখিয়ে এসেছে; কে জানত সে এত ভয়ও দেখাতে পারে? পৃথিবীর সবুজ ঐশ্বর্য্য মুছে গিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে চূণ-বালি-ওঠা দেওয়ালের কুৎসিত চিত্র। মাথার ওপর ঝুলছে কাপড়-বিছানার মোট। চোখ চাইলে কে যেন ধাক্কা মেরে বুজিয়ে দেয়।···

আচ্ছা, চাঁদপাড়ার বাড়ীতে ওর যে তক্তপোষ, তাতে আজ কে শুয়েছে? হরিশের একা শোবার আর সাধ্যি হয় না। যে ভীতু ছেলে, হয় মার কোলের কাছটিতে না-হয় মলিনার কাছে শোবেই, একা ওর ঘুমই আসবে না। আজ নিশ্চয় ও মার কাছে শুয়েছে। ঘরের মেঝেতে যে বিউলি কড়াইয়ের ধামা আর পাকা কুমড়ো ছিল সেইগুলোই হয়তো মা ওর বিছানা সরিয়ে ওপরে রেখেছেন।···এই বাদ্‌লার রাতে ওর জানলার পাশে সজনে গাছের পাতা বেয়ে জল পড়ার শব্দ মলিনা যেন এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে। ঝড়ের মুখে নারকেল গাছের একটা শুকনো পাতা যেন ধপ করে মাটিতে এসে পড়ল। আঃ, এইবার পায়ের ওপর কাপড়টা টেনে দিয়ে—

না না, চোখ বোজাবার এখনও অনেক দেরি। পৃথিবীকে আরও ছোট না করলে ও শুতে পাবে না। বাইরের দুর্য্যোগ ওর শোবার জায়গা কেড়ে নিয়েছে।

বড় নীচু হয় বলে নিবারণের খাটখানা ইটের ওপর বসিয়ে উঁচু করা হয়েছিল। তলায় জিনিষপত্র তখনও প্রবেশ করে নি। সেইখানে একটা মাদুর বিছিয়ে কোনওক্রমে মাথা সাম্‌লে মলিনা গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে নিলে একটা বালিশ। দেহভার এলিয়ে দিলে ভূমিশয্যায়, স্বামীর আশ্রয়েরই আড়ালে।

স্বামী দোতলায় শুয়ে রইল, স্ত্রী একতলায়। তা হোক্, এ মলিনার নিজের ঘর। নিজের সংসারে সে রাণী বইকি!···যাকে নিয়ে সে ঘর পেতেছে সে তো ঐ তক্তার ওপর রয়েছে। হঠাৎ ওর কৌতুক বোধ হ'ল এই ভেবে—হঠাৎ মানুষটি যদি ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন মলিনা ঘরে নেই, তাহ'লে—

নিঃসঙ্গ আনন্দে মলিনার হাসি রেখায় রেখায় ঠোঁটের বাঁকা ধনু পেরিয়ে দাঁতের শুভ্রতায় মিশে গেল। তন্দ্রার ঘোরে মনে হ'ল, সে যেন রেলের বেঞ্চিতে আর তার স্বামী 'বাঙ্কে' শুয়ে। হুস্ হুস্ ক'রে গাড়ী ছুটেছে। হাত পা ছড়াবে যে ভেতরে এমন জায়গা নেই; বাইরে অবারিত মাঠ কখনও গৈরিক, কখনও সবুজ ঢেউ তুলে পাক খেতে খেতে অতীতের দিকে পিছিয়ে পড়ছে।···

বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও 'চীনা'র চাষ

শ্রীমনোমোহন দে

পল্লীর কৃষকশ্রেণী আজিকার দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর পীড়নে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরিয়া পেটের জ্বালায় দেশান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। মানুষ ও পশুর মধ্যের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। অনশনে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বাংলার পথে ঘাটে শবদেহ লইয়া শিয়াল, কুকুরে কাড়াকাড়ি করিতেছে।

সরকারী নজিরে প্রকাশ, বাংলায় যে ফসল জন্মে তাহা দ্বারা বাংলার সম্বৎসরের চাহিদা মিটে না। বাংলা পর-মুখাপেক্ষী; তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা দেশে বহু পতিত জমি থাকা সত্ত্বেও ফসল-বৃদ্ধির জন্য কোন সার্থক সরকারী প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাই নাই। বাংলার ফসলের অবস্থা কোন সময় জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে সচেতন করাও সরকার বোধ হয় এত দিন আবশ্যক মনে করেন নাই।

গত মহাযুদ্ধে খাদ্যাভাব হেতু জার্ম্মান প্রভৃতি শক্তিশালী রাজ্যের শোচনীয় পরিণতির ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান ভীষণ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে 'অধিক খাদ্যশস্য ফলাও' আন্দোলন কার্য্যকরী ভাবে সুরু হইয়াছে। গত বৎসর বাংলা-সরকার নাকি এই খাতে কিছু অর্থব্যয় করিয়া কতক কর্ম্মচারীও পুষিয়াছেন। আসলে বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে কয়েকখানা প্লাকার্ড, ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া ঐ আন্দোলনের কোন সুফল হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগেও এদেশের কৃষকশ্রেণীর সহিত সংবাদপত্র ও শহরের কিরূপ সম্পর্ক আছে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষকদের নিকট কোন কার্য্যকরী পন্থা না দেখাইলে এদেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে কোন কাজ হইতে পারে না। সত্যই যদি বাংলা দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম ফসল জন্মে, তবে এমন সব শস্য চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় ও বাংলার মাটিতে জন্মান যাইতে পারে।

বহু বৎসর যাবৎ ত্রিপুরা জেলার কোন কোন অংশে, ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায়, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায়, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় এবং বাখরগঞ্জের গৌরনদী থানার কোন কোন অংশে 'চীনা' ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। ঐ সকল এলাকায় এক শ্রেণীর দরিদ্র কৃষক বৎসরে কয়েক মাস চীনা খাইয়া জীবনধারণ করে।

চীনা সাধারণ চাউলের চেয়ে আকারে অনেক ছোট। ইহা দেখিতে অনেকটা 'কায়ন' জাতীয় চাউলের ন্যায়। ইহা সাধারণ চাউলের ন্যায় সিদ্ধ করিয়া ফেন ফেলিয়া বা না ফেলিয়া আহার্য্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ চাউল সিদ্ধ করিতে পঁচিশ হইতে ত্রিশ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। চীনা পনর হইতে কুড়ি মিনিটে সিদ্ধ করা যায়। চীনা দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়। দরিদ্র চাষীরা চাউলের ন্যায় শুধু চীনা সিদ্ধ করিয়া খায়। চীনার ভাত সাধারণ ভাতের ন্যায় সুস্বাদু নয় বলিয়া অনেকে চাউলের সঙ্গে চীনা মিশাইয়া ব্যবহার করে। দ্বিতীয় প্রথায় একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, এক সের চাউলের সহিত এক পোয়া চীনা মিশাইয়া সিদ্ধ করিলে দেড় সের হইতে পৌনে দুই সের চাউলের ভাতের সমপরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এ জন্যই চীনা এক শ্রেণীর চাষীর নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন স্থানের মধ্যবিত্ত পরিবারে চীনার মিষ্টান্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনার মিষ্টান্ন ও পিষ্টক সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য, প্রায় সর্ব্বত্রই চাউলের পরিবর্ত্তে চীনা ব্যবহার করা যাইতে পারে। চীনার উপরের খোসা অত্যন্ত পাতলা ও মসৃণ, অল্প পরিশ্রমে ও সহজ উপায়ে উহার খোসা ছাড়াইয়া চাউল বাহির করা যায়।

যে-জমিতে আউস বা আমন ধান্য জন্মে সে-জমিতেই অতি সহজে ও অল্প পরিশ্রমে চীনা জন্মান যায়। সাধারণতঃ পশ্চিম বঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকেই প্রায় সমস্ত জমির আমন ধান্য উঠিয়া যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গেও পৌষের মাঝামাঝি কৃষকরা নূতন ধান্য তুলিয়া ফেলে। পৌষ মাসের শেষের দিকে যখন জমি ঈষৎ আর্দ্র থাকে অথচ মাঠে ফাটল ধরিতে আরম্ভ করে না তখনই জমিতে অল্প চাষ করিয়া চীনা রোপণ করিতে হয়, অনেক সময় মজুর ও সময়ের অভাববশতঃ জমি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া বীজ ছড়াইয়া দিলেও চীনা জন্মান যায়। সাধারণ ধানের ন্যায় চীনার চাষ তেমন শ্রমসাধ্য নহে। বিশেষ যত্ন না করিলেও কিছু ফসল অন্ততঃ পাওয়া যাইবে। জমি-বিশেষে বীজ রোপণের সময় হইতে আড়াই হইতে তিন মাসের মধ্যে চীনার পাকা ফসল পাওয়া যায়

চীনা রবিশস্য। শীতকালে জমি ঈষৎ আর্দ্র থাকে বলিয়া চীনা-চাষের জন্য জলের প্রয়োজন হয় না। চীনা দেখিতে ধানগাছের ন্যায়, তবে ইহার আকার অনেক ছোট।

চীনা সাধারণতঃ শীষসহ পনর-ষোল ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না।

পশ্চিম বঙ্গে কোন স্থানে চীনা চাষ হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চীনা ফসল সম্বন্ধে কৃষকরা অজ্ঞ বলিয়াই বাংলা দেশে চীনা-চাষের প্রচলন প্রসার লাভ করে নাই। বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই চীনা-চাষের উপযুক্ত জমি আছে, বাংলা দেশে বছরে যে-জমিতে যে পরিমাণ চাউল জন্মে তার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চীনা সহজেই ঐ জমিতে জন্মান যাইতে পারে। ইহাতে বাংলার খাদ্যাভাব কতকটা লাঘব হইবে। যশোহর প্রভৃতি জেলায় জল-সেচের সুব্যবস্থা না থাকায় প্রায় প্রতি বৎসরই বহু ধানী জমিতে চাষ হয় না, অথচ ঐ সকল পতিত জমিতে অনেক রবিশস্য জন্মে। জল-সেচের অব্যবস্থার মধ্যেও ঐ সকল জমিতে চীনার চাষ করিলে সুফল পাইবার আশা আছে। চীনা-চাষের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, বাঙালীকে কেবল চীনা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আউস ও আমন ফসলের পরে একই জমি হইতে অল্প পরিশ্রমে প্রচুর চীনা পাওয়া যাইতে পারে। আজ বাংলার সর্ব্বত্র চীনা চাষ হইলে এবং গবর্ণমেণ্টের বণ্টনশৃঙ্খলা ও সদিচ্ছা থাকিলে হয়ত আজ বাঙালী জাতির একটা বিরাট্ অংশ এরূপভাবে বিনাশ পাইত না। গবর্ণমেণ্ট চীনা-চাষ সম্বন্ধে শীঘ্রই একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভাল হয়। চীনার বীজ সংগ্রহ করা, এবং চাষীদের চাষের প্রণালী, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করাই গবর্ণমেণ্টের প্রথম কাজ হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত*

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রনাথ শুধু বড় কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মস্ত কর্ম্মী; তাই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগে আমরা যখন জাতি-নিষ্ঠার উদাত্ত তালে নাচিয়া উঠিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁহার মোহন বীণায় সেই নিষ্ঠার আসল কথা শুনাইয়া বলিলেন—

"আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে পাঁজিপুঁথি ধরে
কোথা পাবি বল ভাই!
* * *
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!"

আগে চলার এই আহ্বান আমরা ইংরেজ-যুগের প্রথম আমল থেকেই কত না স্বদেশ-প্রেমিকের নিকট হইতে পাইয়াছি। অধিকন্তু, পিছে যাহারা আছে রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে আমাদিগের সেই সমস্ত দেশবাসীর কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন—"পিছায়ে যে আছে, তারে ডেকে নাও, নিয়ে যাও সাথে করে," আর "তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে, ওই আছে রসাতল ভাই।"

এই ভাবে আগে চলার পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়—বহু বাধা-বিপত্তি আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বেশ স্পষ্ট ভাষায় আমাদিগকে জানাইয়া গেছেন—

"(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি, সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান!
আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি
কোটরে রাজত্ব, ছোট ছোট প্রাণী, ধরা করি সরা জ্ঞান!
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে, ভায়ে ভায়ে করি রণ!
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তায় বেলা প্রাণপণ!
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
হেথা আপন কলঙ্ক উঠিছে উচ্ছ্বসি, রাখিবার নাহি স্থান!"

* National song=জাতীয় সঙ্গীত? আমি তো বলি, national song=জাতিনিষ্ঠামূলক সঙ্গীত, জাতিনিষ্ঠা-সঙ্গীত।

দেশের কাজ আমাদের কাছে আজকাল বেশ সাধারণ হইয়াছে, কিন্তু তৎসম্পর্কীয় উক্ত বাধা-বিপত্তি সরাইবার চেষ্টা আমরা করি না বলিলেই হয়; তাই, রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখেই দেশ-জননীকে বলিয়াছেন—

"কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে!
এরা চাহে না, তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে!
এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু, কত কি ভাণে!
তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমারই,
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবী-বারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী;
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না,
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে!
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন-বারি নিবার নয়নে,
মুখ লুকাও মা, ধূলি-শয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে!
শূন্য পানে চেয়ে, প্রহর গণি গণি,
দেখ, কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে!"

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আশাবাদী ছিলেন—তিনি বিশ্বাস করিতেন, এক নবীন প্রভাতে আমাদের গগনে এক নূতন তপন উদিত হইবে, আর তাহার কিরণে আমরা এক নূতন জীবন বপন করিব, আর সে জীবন হইবে ঠিক সেই দিনকার মতনই গরীয়ান ও মহীয়ান্, যে দিনকার স্মৃতি চিত্তে ধরিয়া কবি দেশমাতৃকাকে সম্বোধন করিয়া গরবের সহিত বলিয়াছিলেন—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী!
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্য পিযূষ-স্তন্য বাহিনী!"

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস অলীক নহে, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন—আসিবে, সে দিন আসিবে"। আমরা কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবি—কবে, সে দিন আসিবে কবে! এই দীর্ঘ-নিশ্বাসের তরঙ্গ আমাদের কবির চিত্তে আঘাত করিল; সেই দিন আগাইয়া আনিবার জন্য তখন তিনি আমাদের প্রতিভূ-স্বরূপ এক নববরষের প্রভাতে বলিলেন—

"নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা!
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা!
নব বৎসরে করিলাম পণ,
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা!
... ...
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা!
তব গরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা!"

আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ডাক দিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—"জননীকে কে দিবি দান, কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ!" আমরা ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম, কারণ আমাদের সবকিছুই "শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা।" আমাদের অবস্থা বুঝিয়া রবীন্দ্র-বীণা আবার ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—

"আপনি অবশ হলি, তবে
বল দিবি তুই কারে!
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ না রে!
করিস্ নে লাজ, করিস্ নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি যা'রে!
বাহির যদি হলি পথে,
ফিরিস্ নি আর কোনো মতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস্ নে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ করে
বাহির হয়ে যা রে!"

পরাধীন জাতির ব্যর্থতা সর্ব্বগ্রাসী, নিজেদের এই সর্ব্বগ্রাসী ব্যর্থতার মাঝেও আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ সফলতার সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই মনীষী রবীন্দ্রনাথ নিজেদের চিন্তাধারা বিশ্বের দরবারে উপহার পাঠাইতে সঙ্কোচ বোধ

করেন নাই—এই অসঙ্কোচের মূল কথা তিনি বিশ্বপতির চরণে 'গীতাঞ্জলি' নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছেন—

"জীবনের যত পূজা
হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে ;
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।
জীবনে আজও যা'রা
রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও
হয় নি মিছে।
আমার অনাগত,
আমার অনাহত,
তোমার বীণার তারে
বাজিছে তা'রা ;
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।"

বাংলার এই বাঙালী কবি ছিলেন ভারত-মাতা গরবের সন্তান, বিশ্ববরেণ্য কবি-ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন—"ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ; তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।" এই ভালবাসার অর্ঘ্য সাজাইয়া কবি ভারত-জননীর চরণে নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান !
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান !
... ...
এনেছি মোদের প্রাণ !
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান !"

রবীন্দ্রনাথের বাঙালীত্ব-প্রীতি—ভারত-জননীর চরণে নিবেদিত অর্ঘ্য, বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্ব-প্রীতিতে পরিণত হইয়াছিল ; এই প্রীতিতে ভরপুর হইয়া কবি বাউল-সুরে গাহিলেন—

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা !
তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা !"

রবীন্দ্রনাথ বাঙলার বুকে মহান্ ভারতের বেদী-পীঠ স্থাপনে রত হইয়াছিলেন—মহান্ ভারতের মাঝে তিনি বিশ্বের প্রতীক বাঙলার মাটিতে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাই বিশ্ব-কবি প্রার্থনা করিলেন—

"বাঙলার মাটি, বাঙলার জল,
বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান !
বাঙলার ঘর, বাঙলার হাট,
বাঙলার বন, বাঙলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান !
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কায, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান !
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক, হে ভগবান !"

মাটির ডাক

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

হা অন্ন, হা অন্ন করি হারাইল প্রাণ,
কোথা সে শ্রমিকদল কৃষক-সন্তান ?
বাংলার মাটি আজ তোমাদের লাগি'
বেদনা-ব্যাকুল বক্ষে রহিয়াছে জাগি' ;
রাশি রাশি ধানে তার ক্ষেত আজি ভরা,
কোথা চাষী, কোথা শ্রমী—ডাকে, 'এসো ত্বরা
কাট ধান, বাট সবে, মুখে অন্ন দাও,
যে-কটি রয়েছে প্রাণ তাদের বাঁচাও।'

নাই নাই—সাড়া নাই, নাই যে শ্রমিক
সিক্ত শীষ নুয়ে পড়ে, অশ্রু ভরা দিক্।
শূন্য হতে ঘটিতেছে অগ্নি বরষণ,
মাটিতে তবুও শ্রম বড় প্রয়োজন।
দুর্দ্দিন দু-দিন রহি শেষে শান্ত হবে
অন্নধন বাংলায় চিরদিন রবে।

বাংলার রাজবন্দীদের পারিবারিক অবস্থা

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সনের এই মধ্য-শতাব্দিক বৎসর বাঙালীর দুঃখের ভরা একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। এমন দুর্বৎসর বাংলা দেশের ইতিহাসে আর কখনো আসে নি; এই দুঃখের শিক্ষা যদি বাঙালী যথার্থ ভাবে লাভ করে থাকে, তবে আশা করা যায়, এমন দুর্বৎসরের প্রত্যাবর্ত্তন তার ইতিহাসে আর কখনো ঘটবে না।

এই কয়েক মাসে খাদ্যাভাবে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করেছে—এখন আবার খাদ্যাভাবের সঙ্গে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসার অভাব এবং শীতকালীন আশ্রয় ও বস্ত্রাভাবের সমস্যা যুক্ত হ'য়ে দুর্গতের জীবনযাত্রাকে জটিলতর করে তুলেছে,—মৃত্যুর হার আগের মতই রয়েছে, হয় ত বা কিছু বেড়েও থাকবে। ফল কথা, কত লক্ষ হতভাগ্য যে এ পর্য্যন্ত মারা গেল, তার সংখ্যা নিশ্চয় করে জানা যাচ্ছে না, সঠিক ভাবে কোনদিন জানা যাবে কি না সন্দেহ।

এ দুঃখ এমনি নিদারুণ যে লিখে বোঝাবার প্রয়োজন করে না; তবু এর মধ্যে এই সান্ত্বনা আছে, যদি একে সান্ত্বনা বলা যায়, যে এ দুঃখ লোকসমক্ষে প্রকাশিত হ'য়ে প'ড়ে সহৃদয়ের সমবেদনা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

এই দুর্গতদের অধিকাংশই সমাজের নিম্নস্তরের লোক। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের পরিধি এমন বিস্তীর্ণ যে সমাজের কোন অংশবিশেষ মাত্র এতে ক্ষতিগ্রস্ত নয়—সমগ্র সমাজটাই যেন বুভুক্ষার কবলিত। সমাজের মধ্যবিত্ত স্তরের দুঃখ-কষ্ট নিম্নস্তরের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। যদিচ মধ্যবিত্ত ঘরের অভাব রাজপথের উপরে অবারিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে নি, তাই ব'লে তার নিদারুণতা লঘু নয়। ছাই-চাপা আগুনের মত ক্ষীয়মান আত্মমর্য্যাদা এবং ছিন্ন বস্ত্র ও জীর্ণ গৃহের অন্তরালে মধ্যবিত্ত সমাজ যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে—তা জানবারও কোন উপায় নেই। এবং উপায় নেই বলেই এদিকে দেশের দৃষ্টি যতখানি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল, ততখানি, হয় নি। হয়ত এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না—যদি না বর্ত্তমান উপলক্ষ্যটি উপস্থিত হ'ত।

আমরা আর্ত্ত-ত্রাণের জন্য উদ্যোগী হওয়াতে বাংলা দেশ ও বাংলা দেশের বাইরে থেকে সহৃদয় ব্যক্তিরা আমাদের কাছে টাকা পাঠাতে আরম্ভ করেন। আর্ত্ত-ত্রাণের জন্যই এই সব সাহায্য। এই টাকার মধ্যে কিছু অংশ আমার নিজের বিবেচনা অনুসারে খরচ করবার স্বাধীনতা ছিল। আমরা স্থির করলাম এই টাকা দিয়ে বাংলার বিনা-বিচারে বন্দীদের পরিবারকে সাহায্য করা হবে। আজও বিনা-বিচারে বন্দী বা নিরাপত্তা বন্দীর (Security Prisoner) সংখ্যা পনেরো-শ-র উপরে। এদের পরিবারবর্গ কি ভাবে জীবন যাপন করছে তা কল্পনা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের উপার্জ্জক লোকটিকে বন্দী করে রাখা হ'য়েছে। কাজেই এই সব পরিবার উপার্জ্জনহীন হ'য়ে পড়েছে, তার উপরে এমন totalitarian বা সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। এই সব দুর্গত পরিবারের উপার্জ্জক বা উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিটি কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অন্তর্হিত, তাদের বিষয় সাধারণের জানবার কোন অধিকার নেই—আবার পরিবারের অন্যান্য সব লোক মফঃস্বলের কোন দূর গ্রামের রেল-টেলিগ্রাফ খবরের কাগজের অতীত স্থানে মধ্যবিত্ত ঘরের অপ্রকাশিত কষ্টের দুর্ভেদ্য পরিখার দ্বারা বেষ্টিত; তাদের কথাও জানবার কোন উপায় নেই।

বিনা-বিচারে, বিনা-প্রমাণে, কেবলমাত্র গোয়েন্দা-বিভাগের আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর ক'রে, কেবলমাত্র পুলিসের সতত সন্দেহাকুল কল্পনার বা বাস্তবতাহীন সন্দেহ মাত্রের উপর নির্ভর ক'রে গবর্ণমেণ্ট যাদের বন্দী করে রেখেছে, ন্যায়ধর্ম্মের খাতিরে অন্ততঃ তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ভার গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ভার স্বীকার করেন নি।

আমরা সিদ্ধান্ত করি যে প্রত্যেক নিরাপত্তা বন্দীর পরিবারকে পূজার সময়ে এককালীন পঞ্চাশ টাকা ক'রে সাহায্য দেওয়া হবে—যদিচ এ সাহায্য প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর।

খবরের কাগজে এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত হ'লে নানা স্থান থেকে বন্দী পরিবারের খবর আসতে থাকে। এই উপলক্ষ্যে বন্দী-পরিবার থেকে যে-সব চিঠিপত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তা থেকে দেখা গেল অভাবের যে-চিত্র আমরা কল্পনায় স্থির করে রেখেছিলাম, প্রকৃত দুর্গতি তার চেয়ে অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক। মধ্যবিত্ত

পরিবারগুলি, আমাদের দেশে বড় ছোট নয় এক জনের উপরে অনেকে নির্ভর করে। এখন প্রত্যেক পরিবারের জনসংখ্যা গড়ে দশজন ক'রে ধরলে প্রায় পনেরো হাজারের বেশি লোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং নারী, চরম আর্থিক দুর্গতি ভোগ করছে। মনে রাখতে হবে—এ দুর্গতি কেবল সাময়িক নয়, যদিও দুঃসময়ের সঙ্গে তা, ভীষণতর হয়েছে। এমন অনেক পরিবার আছে, যার উপার্জ্জক বহু বছর ধ'রে বিনা-বিচারে কারাবদ্ধ রয়েছে। এমন অনেক পরিবার আছে, এক সময়ে যাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল—এখন তারা প্রায় অনাহার ও ভিক্ষার প্রান্তে উপস্থিত! কিন্তু দুর্ভিক্ষের দিনে কে কাকে ভিক্ষা দেয়!

এই সাহায্য-ভাণ্ডার থেকে এ পর্য্যন্ত চৌত্রিশ হাজার টাকার উপরে সাহায্য দান করা হয়েছে; এখনো পত্র আসার বিরাম নেই; আরও কয়েক হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। ৬৮০টি পরিবারের উপর সাহায্য পেয়েছে—কিন্তু তাদের প্রয়োজনের অনুপাতে এককালীন পঞ্চাশ টাকা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—প্রতিমাসে এই পরিমাণ টাকা হ'লে কিছু সাহায্য হয় বটে; কিন্তু টাকার পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কাজেই তাদের জন্য আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করবার নেই।

২

আমরা বন্দী পরিবারের দুর্দ্দশার কথা নিজের মুখে বর্ণনা করব না—প্রাপ্ত চিঠিপত্র থেকে উদ্ধার ক'রে উপস্থিত করব। এ জন্য হাজারখানা চিঠিই আগাগোড়া উদ্ধার করা যেতে পারে—কিন্তু তা বাহুল্য হবে, পাঠকের ক্লান্তিও আসতে পারে। এই সব চিঠির মধ্যে যেগুলিতে নানা কারণে বিশিষ্টতা আছে, সেইগুলি থেকেই প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দেবো। ভুক্তভোগীর কলমে দুর্দ্দশার যে করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে, তার উপরে শিল্পের রঙ ফলাবার আর কোন প্রয়োজন হবে না। বলা বাহুল্য, বিশেষ কারণে আমরা পত্রের নাম ধাম গোপন রাখলাম।

একজন বন্দীর পত্নী লিখছেন—

"বন্দীর আয়ের দ্বারা আমাদের সংসার প্রতিপালিত হইত। তাহার আয় বন্ধ হওয়াতে আমরা কোন দিন অর্দ্ধাহারে, কোন দিন অনাহারে দিনপাত করিতেছি। গত জুলাই মাসে আমার **তিনটি ছেলে মেয়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ** করিয়াছে।"

এই পরিবারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ভাতা দান করেন না।

মনে রাখতে হবে প্রায় সমস্ত স্থলেই আবেদনকারিণী স্ত্রীলোক, হয় পত্নী, নয় মাতা, নয় ভগ্নী; কোন কোন স্থলে বৃদ্ধ পিতাও আছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের সক্ষম পুরুষটিকে আটক করে রাখা হয়েছে, এতে যে কেবল উপার্জ্জন বন্ধ হয়েছে তা নয়; চোর ডাকাত আততায়ীর হাত থেকে তাদের রক্ষার উপায়ও নেই।

উক্ত পত্রে আবেদনকারিণী পুনরায় বলছেন—

"স্থানীয় মাতৃমন্দির হইতে আমার মেয়ে তিনটি দৈনিক মাথাপিছু ১০ পয়সা দিয়া খিচুড়ি আনিয়া ছয় জনে খাই। যে খিচুড়ি পাওয়া যায় তাহাতে একজন লোকের পেটও ভরে না; ছয় জনে উহা একবার খাইয়া থাকি। পয়সা যেই দিন জোটে না সেই দিন সম্পূর্ণ উপবাসী থাকি।"

একজন নিরাপত্তা বন্দী লিখছেন—

"বাইরে থাকতে আমি ছাত্র পড়িয়ে অতিকষ্টে মা বোনের মুখে দু'মুঠো অন্ন দিতাম। বাড়ীতে রোজগার করবারও কেউ নেই। বাড়ীতে মা, ভাই, বোন ও পিসি আছেন। গত পত্রে জানলাম পিসির মৃত্যু হ'য়েছে। বড়ভাই রক্তামাশয়ে শয্যাগ্রস্ত। অখাদ্য, কুখাদ্য খাওয়ার ফলে মা ও বোন শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; গবর্ণমেণ্টের কাছে বার বার দরখাস্ত করেও (ভাতার জন্য) কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছি না।"

তাঁর বাড়ী থেকে সাহায্যের জন্য আবেদন নিশ্চয় পৌছয় নি কল্পনা করে তিনি বলছেন—

"বাড়ীর সবাই মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করছে বলে' বোধ হয় বাড়ী থেকে কোন আবেদন পৌছায় নি। মনে হয় তাঁরা সংবাদ না পাওয়ায় ঠিকানাও জানতে পারেন নি।"

আর একজন বন্দীর পত্নী লিখছেন—

"এই এক বৎসরে আমাদের বাড়ীতে যে বড় গাছ ছিল তাহা বিক্রি করিয়াছি এবং ঘরের প্রায় তৈজস বিক্রি করিয়াছি। এমন কি আমার ৪ খানা কাপড় ছিল তাহার দুইখানা বিক্রি করিয়া এক বেলা খাইয়া চলিয়াছি। এখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া গ্রামের একজন ধনী লোকের বাড়ীতে রান্নার কাজ করিয়া বিসর্পগ্রস্ত শাশুড়ী এবং ছেলেপুলে লইয়া যে কি ভাবে আছি তাহা কি করিয়া বুঝাইব।"

বন্দী উপার্জ্জন ক'রে সংসার চালাতেন; তাঁর পরিবার কোন ভাতা পান না; সংসারে আর কোনও উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি নেই।

আর এক বন্দী লিখছেন—

"সরকার বাহাদুর দয়া করিয়া আমার দুঃস্থ দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের ছয় জন লোকের জন্য মাত্র ২৫৲ টাকা সংসার-ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন।"

ইঁহার আর কোন আয়ের পথ বা ভূসম্পত্তি নেই, সে অঞ্চলে টাকায় ৵১ সের চাল বিক্রি হয়। তিনি লিখছেন—

"আমার পরিবারের সকলে চাউলের মণ্ড খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। তাহাও সকল দিন জুটিতেছে না। তাহারা এখন বস্ত্রাভাবে উলঙ্গপ্রায়।"

এই বন্দীর পিতা পুত্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। পিতা পুত্রকে লিখছেন—

"তুমি বন্দী হওয়ার পর হইতে আমার গৃহটি ছাড়া স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করিয়া এতদিন সংসার চালাইয়া আসিয়াছি—এখন আর বিক্রি করিবার কিছু নাই। টাকায় /১ সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে। সংসার-ভাতার টাকাতে একজনেরও চলিতেছে না। /১ সের চাউল গুঁড়া করিয়া ছয় জনে জাউ করিয়া শাকপত্র দিয়া খাই। জীবন ধারণের জন্য ঘরের থালা বাটি সমস্তই বিক্রি করিয়াছি। থালা বাটির অভাবে পাতার টুকরি বানাইয়া ঐ টুকরির মধ্যে জাউ রাখিয়া খাইতেছি।"

একজন রাজবন্দী লিখছেন যে তিনি বন্দী হইবার আগে মাষ্টারী ক'রে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও ধান চালের কারবার ক'রে সংসার চালাতেন। তাঁর পরিবারে তাঁকে বাদ দিয়ে ছয় জন লোক, তার মধ্যে একজনও উপার্জ্জনক্ষম নয়; গবর্ণমেণ্ট এই ছয় জনের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা ভাতা দিয়ে থাকেন।

ইঁহার পরিবার হতে যে চিঠি আমরা পেয়েছি—

"জমিজমা যে লোক দিয়ে রোপণ করাইব সে পয়সা নাই; লবণ তৈল কাপড়-চোপড় কিনবার পয়সাও নাই; এদিকে ঘর দুয়ার সব খসিয়া পড়িতেছে!"

অপর একজন বন্দীর পিতা লিখছেন—

"আমি অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন ও অচল অবস্থায় আমার বিধবা কন্যাসহ অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছি। আমার কোনরূপ আয়ের পথ নাই এবং সরকারের নিকট হইতেও কোনরূপ সাহায্য পাইতেছি না। আমার বিধবা কন্যা মুড়ি বিক্রয় করিয়া যা কিছু পায় তদ্দারাই কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতেছি।"

এই পরিবারের পোষ্য সংখ্যা ছয় জন।

নিম্নোল্লিখিত ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধ'রে বন্দী-অবস্থায় আছেন, ফলে তাঁর পরিবারের অবস্থা অভাবের চরমে পৌঁছেছে। তাঁর স্ত্রী লিখছেন—

"আমরা ছয় মাসের উর্দ্ধ কাল কেবল একবেলা কোনদিন খিচুড়ি, কোনদিন ছাতু, কোনদিন রুটি খাইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আমাদের কাহারও আবশ্যকীয় কাপড় নাই, এজন্য কেহ ঘরের বাহির হইতে পারি না। ছেলেমেয়েদের স্কুলের খরচ চালাইতে না পারায় তাহারা সব লেখাপড়া ছাড়িয়া বসিয়া আছে। অনাহারের ফলে তাহাদের শরীরেও এমন শক্তি নাই যে কুলি মজুরী করিবে। পাকের ঘর ভাঙিয়া পড়ায়—এখন বাহিরে রান্না করিয়া খাই, বৃষ্টির সময়ে অনেক দিনই রান্না করিতে না পারায় কেবল ছাতু খাইয়াই কাটাইতে হইয়াছে।"

বর্ত্তমান বন্দী ঠিক নিরাপত্তা বন্দী নন্; স্বগ্রামে অন্তরীণ, কিন্তু ফল তাঁর পক্ষে সমান। কারণ তিনি অন্যত্র চাকুরী ও 'লাভজনক' ব্যবসা করতেন। তাঁর স্ত্রী লিখছেন—

"আমার স্বামীর মুক্তির অথবা ভাতার জন্য দরখাস্ত করিয়াও কোন ফল পাই নাই। এমনি অভাবের মধ্যে দিন যাইতেছে যে বোধ হয় অনাহারে মরিতে হইবে। এই দেড় বৎসর মধ্যে আমার পিতৃকুল হইতে সামান্য যে দুই-চারখানা গহনা দিয়াছিল তাহা বেচিয়া খাইয়াছি, এমন কি শ্বশুরের যে সামান্য জমি ছিল তাহাও বিক্রি করিয়া খাইতেছি।"

একজন বন্দিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের ছাত্রী। বন্দিনীর পিতা পুলিস বিভাগে সামান্য কাজ করতেন; তাঁর কন্যা ও কয়েক জন নিকট-আত্মীয় রাজনৈতিক বন্দী হওয়াতে তাঁর চাকুরী গিয়েছে। বন্দিনীর মাতা লিখছেন যে "উক্ত কন্যাটি আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-স্থল ছিল।"

একজন বন্দীর মাতা লিখছেন যে তাঁর একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্র আজ বন্দী হওয়ায় তাঁদের আর্থিক অবস্থা এমনি খারাপ হয়েছে যে "২০।৯।৪৩ তারিখে আমার চারি বৎসর বয়স্ক একটি পৌত্র অনাহারের যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

অপর একজন আবেদনকারিণী কাঁথি মহকুমার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসিনী। তাঁর স্বামী বহু কালের কংগ্রেস কর্ম্মী, এবং তাঁকে এ পর্য্যন্ত চার বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবারে তিনি বন্যার্ত্তদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, এখন পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর পত্নী লিখছেন—

"পুলিসে আমাদের পর্ণ কুটীরটি পুনঃ পুনঃ সার্চ্চ করিয়া আমার তৈজসপত্রসমূহ নষ্ট করিয়াছে। অধিকন্তু আমাকে এক বার গ্রেপ্তার করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি দীনহীনা পথের ভিখারিণীর মত কালাতিপাত করিতেছি।"

আবেদনকারিণী একজন বন্দীর পত্নী, তিনি লিখছেন—

"আমার স্বামীই সংসারের উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। ** আমি এখন অনশনে দিন কাটাইতেছি।"

এঁর স্বামী এঁকে যে পত্র লিখেছিলেন তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। তিনি লিখছেন—

"আমি বন্দী অবস্থায় আছি বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত পাইতেছি। আমি খাইতেছি বটে, কিন্তু তুমি, বাবা ও সন্ধ্যা (বন্দীর কন্যা) খেতে পাইতেছ না ভাবিয়া মন বড়ই উতলা হয়ে পড়ে।"

অন্য একজন বন্দী স্বগ্রামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা ক'রে পরিবার ভরণ-পোষণ করতেন। তিনি লিখছেন—

"কিছু দিন পূর্ব্বে স্ত্রীর পত্রে জানিতে পারিলাম যে অভাবের তাড়নায় একটি ঘর বিক্রি করিয়াছে। ঋণ, কর্জ্জ যাহা পাওয়া যায় তাহা করিয়া অবশেষে মিষ্টি আলু খাইয়া দিন কাটাইতেছে। কাপড়ের অভাবে লোকের নিকট বাহির হইতে পারে না।"

একজন আবেদনকারিণী লিখছেন যে, তাঁর দুই পুত্রই নিরাপত্তা বন্দী। তাঁদের একজন বই-বাঁধানোর ব্যবসা করে সংসার চালাতেন। আর কোন আয় ছিল না। এখন সেই একমাত্র আয় বন্ধ হওয়াতে, এবং ভাতা না পাওয়াতে তাঁর অচল অবস্থা।

আর একজন বন্দী লিখছেন যে জেলে থাকবার সময়ে

তিনি কঠিন 'প্লুরিসি' ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর আর তিন ভাই সকলেই নিরাপত্তা বন্দী—কাজেই তাঁদের আয়ের পথ অনেক দিন বন্ধ। এখন তিনি পীড়িত অবস্থায় মুক্তি পেয়ে নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়েছেন।

একজন মুসলমান বন্দী সাহায্যের আবেদন ক'রে জানাচ্ছেন—

"আমার বড় ভাই নিরুদ্দেশ। তাঁহার স্ত্রী সন্তানাদি আমার আয়ের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এ পর্যান্ত গবর্ণমেণ্ট আমার সহায়-সম্বলহীন পরিবারবর্গের ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থাদি করেন নাই।"

অপর একজন মহিলা লিখছেন—

"আমার দুই পুত্র আজ দীর্ঘকাল যাবৎ হাজতবাস করিতেছে। আমাদের বাড়ীর সমস্ত দ্রব্য খাট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সম্পূর্ণ এমন কি থালা, বাটি খেতের ধানা সমস্ত থানায় নিয়াছে ও ঘরে তালা বন্ধ করিয়া তারের বেড়া দ্বারা চারি দিক ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে।"

বলা বাহুল্য, এঁর অন্য কোন আয় নেই কিম্বা ভাতার ব্যবস্থাও করা হয় নি।

এই সব বন্দীদের কোন কোন পরিবারকে গবর্ণমেণ্ট মাসিক কিছু ভাতা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে কোন নীতি অনুসরণ করেন, তা বুঝে ওঠা মুস্কিল—আদৌ কোন নীতি আছে কি না সন্দেহ। গবর্ণমেণ্ট ভাতা এমন ভাবে দেন—যেন বিশেষ অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মনে রাখা উচিত এতে অনুগ্রহের মোটেই স্থান নেই—ভাতা-প্রদান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট যাদের বিনা প্রমাণে ধরবার ও বিনা-বিচারে বন্দী ক'রে রাখবার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত ক'রে, বিচারের পরে দণ্ড প্রমাণিত হ'তে দিন। যদি সেরূপ করতে তাঁদের সাহসের অভাব হয়, তবে অগৌণে তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আর তা যদি না করেন—তবে প্রত্যেক পরিবারের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করুন। এই ভাতার পরিমাণ খেয়ালের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করলে চলবে না।

প্রত্যেক পরিবারের উপার্জ্জনকারী ব্যক্তি বন্দী হবার আগে যে পরিমাণ উপার্জ্জন করতেন, ঠিক সেই পরিমাণ টাকা দিতে হবে—এবং বর্ত্তমান দুর্মূল্যের বাজারে যে-পরিমাণ খরচ বৃদ্ধি হয়েছে, তাও গবর্ণমেণ্টকে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। বিনা-বিচারে বন্দীর পরিবার বিনা কারণে কেন কষ্ট সহ্য করবে? প্রত্যেক পরিবারের জীবন যাপনের মান (standard) গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববৎ বজায় রাখতে বাধ্য। তার পরে কোন বন্দী যদি জেলে থাকতে পীড়িত হয়ে পড়ে, তাকে খালি মুক্তি দিলেই চলবে না; মুক্তির পরে তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণ্টকে বহন করতে হবে—কারণ তার ব্যাধির জন্য গবর্ণমেণ্টই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আর এ রকম কোন রাজবন্দীর যদি মৃত্যু ঘটে, জেলের মধ্যেই হোক, কিম্বা জেলে থাকাকালীন পীড়ার ফলে জেলের বাইরেই হোক, তবে তার পরিবারকে ক্ষতি পূরণ-স্বরূপ পর্য্যাপ্ত টাকার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই করতে হবে।

এদেশের গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই নিজেদের সভ্য মনে করেন, কাজেই সভ্য দেশের নীতি অনুসরণ তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

এখন গবর্ণমেণ্টের ভাতা দানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব; তা হতে বোঝা যাবে,—এ ব্যাপারটার মধ্যে জুলুম, খেয়াল ও অনুগ্রহের ভাব কতটা মিশ্রিত।

একজন বন্দীর পত্নী লিখছেন—

"আমার স্বামী প্রায় হাজার টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিতেন। কর্ম্মচারী ব্যতীত তাঁহার আত্মীয় পোষ্যবর্গও অনেক ছিল। পোষ্যবর্গ-প্রতিপালনের জন্য আমার ও আমার একমাত্র কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য ১৫০৲ টাকা দাবী জানাইয়া সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম। মাত্র ৬০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।"

মাসিক হাজার টাকা আয়ের পরিবর্ত্তে মাত্র ৬০৲ টাকা মঞ্জুর—এর মধ্যে আদৌ কোন নীতি আছে কি? ইহা কি কেবল অনুগ্রহ মাত্র নয়? এই পরিবারের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনযাত্রার মান (standard) কি ৬০৲ টাকায় অব্যাহত থাকবে? মহিলাটি একটি শিক্ষাশ্রমে-শিক্ষালাভ মানসে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আর একজন অন্তরীণাবদ্ধ বন্দী লিখছেন যে, আগে তাঁর মাসিক আয় ছিল প্রায় ১৩৫৲ টাকা। গবর্ণমেণ্ট তাঁর পরিবারের জন্য ভাতা মঞ্জুর করেছেন—মাত্র ১৫৲ টাকা। তাঁর অবশ্য প্রতিপাল্যের সংখ্যা ৮ জন। ১৫৲ টাকায় এই বাজারে ৮ জনের কি করে চলতে পারে—এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট একটা বিবৃতি প্রচার করলে দেশের লোক বিশেষ উপকৃত হবে।

অপর একজন ভদ্রলোক জানাচ্ছেন যে, তাঁর দুটি পুত্র বন্দী। গবর্ণমেণ্ট এই পরিবারের জন্য ভাতা নির্দ্ধারণ করেছেন মাসিক ২০৲ টাকা। পরিবারের পোষ্যের সংখ্যা পাঁচ জন। একে দেশজোড়া দুর্দ্দিন, তার পক্ষে এই

পরিবারটি বন্যাবিধ্বস্ত মেদিনীপুরের। ৪৲ টাকায় কি একজনের চলে? এ কি কেবল লোক-দেখানো কর্ত্তব্য-সমাপন নয়?

একজন বন্দী কোন জেলা-আদালতের অন্যতম প্রধান উকীল ছিলেন। তা ছাড়া তিনি একাধিক ব্যাঙ্ক ও চা-বাগান প্রভৃতির ডিরেক্টর ও আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। কাজেই তাঁর আয় যে প্রচুর ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর পরিবারে সতর জন লোক। এই বৃহৎ পরিবারের জন্য গবর্ণমেণ্ট মাত্র ৬০৲ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

একজন মুসলমান মহিলা লিখছেন যে, তাঁর স্বামীকে বন্দী করবার পরে তাঁর পরিবারের সাত জন লোকের জন্য গবর্ণমেণ্ট মাত্র ৪০৲ টাকা ভাতা মঞ্জুর করেছেন। মুসলমান ভদ্রলোকটি জেলে থাকাকালীন কঠিন পীড়াগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েন, তখন তাঁকে চিকিৎসা করবার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। ঠিক মুক্তি নয়—চিঠির ভাষা হচ্ছে—"was sent home on leave for medical treatment."

কি চমৎকার ব্যবস্থা! জেলে অসুখ হ'য়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য ছুটি দেওয়া হবে; সুস্থ হ'য়ে উঠলেই আবার ধরা হবে নিশ্চয়।

কিন্তু এখন যে চিঠিখানির উল্লেখ করছি, তা পূর্ব্বের সব দৃষ্টান্তকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

"আমার স্বামী বর্ত্তমান আন্দোলনে প্রায় আট মাস যাবৎ জেলহাজতে আটক আছেন। বর্ত্তমান তাঁর অবস্থা ভীষণ খারাপ, তিনি আটক হওয়া অবধি আমার সংসার চালানো কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি কোন কোন দিন উপবাসেও থাকিতে হয়। বর্ত্তমান আমি ও আমার দুইটি খোকাখুকি লইয়া ভীষণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি। আমার উপায় করবার মত সংসারে আর কেউ নাই। তা ছাড়া গত সাইক্লোনে আমার বাসস্থান ও ফসলাদিসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ১৬ই শ্রাবণ কোলঘাই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবল বন্যায় আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আপনারা ছাড়া একটি মেয়ে ও দুইটি নাবালক শিশুকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করবার মত আর কেউ নাই। সরকার ভাতা প্রতি দিন একটি মাত্র খোকার ৵ ছটাক চাউল ও ১০ অর্দ্ধ ছটাক ডাল মঞ্জুর করিয়াছেন।"

ইহার উপরে টীকা নিষ্প্রয়োজন। এ কি পরিহাস, না ক্ষতস্থানে লবণ নিক্ষেপ। দানের ছদ্মবেশে এমন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ কোন সভ্য মানুষে যে করতে পারে তা সহজে কে বিশ্বাস করবে?

৪

গবর্ণমেণ্ট আজ হোক বা দুদিন পরে হোক, এক দিন এই সব বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু মুক্তি দিলেই তাঁদের দায়িত্বের শেষ হবে না—এ কথা এখন থেকেই মনে করিয়ে দিতে চাই। গবর্ণমেণ্টের বিচারহীন জুলুমের ফলে যে-সব সংসার ভেঙে গিয়েছে, আর্থিক দুর্গতির চরমে নেমে গিয়েছে, ক্ষেত খোলা উজাড় হয়ে গিয়েছে, সে সমস্তই আবার গবর্ণমেণ্টকে নিজের ব্যয়ে পূর্ব্ববৎ ক'রে দিতে হবে।

দুর্ভিক্ষে যেমন ক্ষুধিতকে ভিক্ষা দিলেই বা মৃতকে সমাধি দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না; গৃহহীনেরা যাতে আবার গৃহ পায়, চাষীরা যাতে আবার বীজ পায়, চাষ করবার মত সংস্থান পায়, তা যেমন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, ঠিক তেমনি কর্ত্তব্য আছে এই সব বন্দীদের প্রতি।

এ বিষয়ে মূল নীতিটি হচ্ছে—বন্দী করবার আগে বন্দীর আর্থিক অবস্থা যেমনটি ছিল, মুক্তি পাবার পরে ঠিক সেই পূর্ব্ব আর্থিক ভিত্তির উপরে তাকে পুনঃস্থাপন করা। যদি কারো চাকুরী গিয়ে থাকে, গবর্ণমেণ্ট তাকে চাকুরী দিতে বাধ্য; যদি কারো ব্যবসা নষ্ট হ'য়ে গিয়ে থাকে, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, যদি কারো ঘর-বাড়ী পড়ে গিয়ে থাকে, তা পুনরায় গড়ে দিতে হবে; মুক্তির পরেও কিছুকাল অবধি তাকে নিয়মিত মাসিক ভাতা দিতে হবে। এর মধ্যে অনুগ্রহ বা ইচ্ছার স্থান নেই—গবর্ণমেণ্টের দুষ্কৃতি-ক্ষালনের ইহাই একমাত্র পন্থা।

মুক্তির পরে এক ভদ্রলোক লিখছেন—

"গত ৭।৯।৪২ তারিখে 129 D. I. R-এ আমাকে গ্রেপ্তার করে। এপ্রিল মাসে Release করেছে। আবার গত ৮।৮।৪৩ তারিখে 129 D. I. R-এ গ্রেপ্তার ক'রে ২২।৮।৪৩ তারিখে release করেছে। আমি —Practice [ডাক্তারী] করিতাম। জেলে থাকাকালীন অভাবের তাড়নায় সমস্ত রকম instrument বিক্রি করে সংসার চালাতে হয়েছে। এরূপভাবে মাঝে মাঝে ধরিয়া উন্নতির রাস্তা বন্ধ করিয়াছে ও বর্ত্তমানে সেই সব গ্রামে যাহাতে না যেতে পারি Police Department হইতে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে ও করিতেছে।"

ভাতা সম্বন্ধে লিখছেন—

"আমার income যাহা ছিল তাহার এক-চতুর্থাংশও দেয় নাই—এখন এমন অবস্থায় পড়িয়াছি যে দুই দিন পরে আমাকে street beggar হইতে হইবে।"

'ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা' গবর্ণমেণ্টের অতি প্রিয় ও প্রাচীন নীতি। এক্ষেত্রেও তাই দেখা যাচ্ছে।

আরও একটি দৃষ্টান্ত। আবেদনকারিণীর একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্র জেলে আবদ্ধ। তাঁর স্বামীও বন্দী ছিলেন। তিনি লিখছেন—

"My husband who has also suffered imprisonment for more than a year has been released a few days ago only to be bed-ridden due to old age and broken and shattered health."

আর একজন বন্দী মুক্তির পরে লিখছেন—

"I joined Congress movement when I was a school student and was arrested in 1921. Since then I underwent imprisonment for more than 20 years but for a few days' release in-between the imprisonments. I have come out from behind the bars last February. Since then it has become very difficult for me to make my family's both ends meet. My family now being at the point of death due to starvation, I am approaching you for some relief."

ইহার প্রতি কি গবর্ণমেণ্টের কোনই দায়িত্ব নেই ?

৫

এই সব বন্দীদের দুঃখ-কষ্টের বিবরণ মাত্র দিলে তাঁদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। এমন অকারণ দুঃখ, বিনা-বিচারে নির্যাতন, আত্মীয়-স্বজনের যৎপরোনাস্তি অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও অনেকে কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে মনুষ্যত্বের পতাকা সগর্ব্বে উঁচু করে রেখেছেন, দেশবাসীর সে কথাও জানা আবশ্যক। তাঁদের ভবিষ্যতের প্রতি এই দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যেই দেশের সত্যকার ভবিষ্যৎ নিহিত।

একজন লিখছেন—

"একদিন বাহির হইব, যত দূরেই আজ সেদিন থাকুক না কেন। কালের অব্যাহত গতি আবার আমাকে আমার সমাজ ও পরিবারের মধ্যে ফিরাইয়া দিবেই—এ আশা লইয়া আজ আমাদের জীবন গঠন করা ছাড়া আর কোন কর্ত্তব্য নাই। সেদিন যেন যাইয়া নিজেকে গলগ্রহের মত সমাজ ও পরিবারের স্কন্ধে না চাপাই, নিজের জীবনকে বহন করিতে পারি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্ব্বশক্তি দিয়া সাহায্য করিতে পারি, এ শুধু আমাদের ভাবনা নহে, দৈনন্দিন অক্লান্ত কর্ম্মপদ্ধতি।"

আর একজন সাহায্য গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে লিখছেন—

"আজকার এই দিনে যেখানে আমার কর্ত্তব্য ছিল সাহায্য করা, সেখানে আমাকে হাত বাড়াতে হচ্ছে, এর চেয়ে লজ্জাকর কি হতে পারে? অদৃষ্টের পরিহাস বলতে হবে।"

অপর একজন সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে জানাচ্ছেন—

"আমি তাহার [সাহায্যের] প্রত্যাশী নই, কারণ আমার পরিবারবর্গ এখনও নুন ভাত পাইতেছেন, কিন্তু কত নিরাপত্তা বন্দীদের পরিবারবর্গ ২।৩ দিন অন্তর নুন ভাতও পাইতেছে না, তাহার ইয়ত্তা নাই। আপনি খুঁজিয়া এই রকম অভাবগ্রস্ত পরিবারবর্গের অসময়ে যতটুকু পারেন করিলে তাঁহাদের যে কি মহোপকার করা হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।"

নির্যাতিতদের মুখে এমন সাহসের কথা শুনে মনে হয়—দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

৬

আমরা যখন বাংলার রাজবন্দীদের সাহায্য করতে উদ্যত হই, তখন কোন কোন লোক বলেছিলেন যে আর্ত্ত-ত্রাণ-ব্যাপারের মধ্যে রাজনীতিকে টেনে আনা উচিত হবে না। কিন্তু রাজবন্দীদের সাহায্যের মূলে রাজনীতির কোন সংস্রব নেই; মানব-সেবার ভাবেই উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আমরা সাহায্য দানে অগ্রসর হয়েছিলাম—এবং সুখের বিষয় এই যে রাজবন্দীরাও এই সাহায্য-দানকে ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করেছেন।

এই দুঃখের কাহিনী দেশের লোকের জানা যে উচিত তার কারণ প্রায় পনেরো শ রাজবন্দীর পনেরো শ পরিবারের উপর দিয়ে দুরদৃষ্টের কি ঝড়ঝঞ্ঝা যাচ্ছে, তা না জানলে বাংলা দেশের দুর্গতির চরম চিত্র তাঁরা কখনো পাবেন না। বাঙালী সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার। আজ দেড় শ বছর ধ'রে বাংলা দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক যা-কিছু উন্নতি ঘটেছে—তার মূলে প্রত্যক্ষতঃ রয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাধনা। দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ যত দিন বলিষ্ঠ থাকবে, তত দিন দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয়ের কিছু নেই; মধ্যবিত্ত সমাজের উপর আঘাত পড়লে দেশ অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়তে থাকে।

এখন এই পনেরো শ রাজবন্দীকে অকারণে আবদ্ধ ক'রে রাখায় এতগুলি মধ্যবিত্ত পরিবারকে যে আঘাত ও অপমান করা হ'য়েছে—তা দেশের মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছেছে। এই রকম নির্ব্বিচার জুলুম যদি দীর্ঘকাল ধ'রে চলে, এবং তার ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ যদি দুর্ব্বলতর হ'য়ে পড়তে থাকে, তবে তার ফলে সমগ্র বাঙালী জাতির ভেঙে পড়বার সমূহ আশঙ্কা আছে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হবার সময় এসেছে।

রাজবন্দী-পরিবারের দুর্দ্দশার সঙ্গে জাতির স্বার্থ এমন কার্য্য-কারণ-সূত্রে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ব'লেই এই সব বন্দীর অবিলম্বে মুক্তির দাবী করবার অধিকার আমাদের আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল আসন্ন মন্ত্রিত্ব-লাভের উৎসাহে ঘোষণা করেছিলেন যে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁদের ঘোষণা বাস্তব রূপ লাভ করে নি। অবশ্য শ-চারেক বন্দী তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখনও প্রায় দেড় হাজার রাজবন্দী বিনা-বিচারে জেলে আবদ্ধ। আর ইহার মধ্যে কয় শত নূতন বন্দী আটক করা হয়েছে তার হিসাব এখনও সঠিক জানা যায় নি।

এখন, রাজবন্দীদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যেমন কর্ত্তব্য আছে, দেশবাসীরও তেমনি কর্ত্তব্য আছে, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল সেখানে দেশবাসীর দায়িত্বই যেন বেশী।

আমরা যে পরিমাণ টাকা বন্দী-পরিবারের সাহায্য-স্বরূপ পাঠিয়েছি, প্রকৃত অভাবের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎ-

কর। শীতের প্রারম্ভে পুনরায় এককালীন কিছু সাহায্য পাঠাতে পারলে তাঁদের অনেক সুবিধা হ'ত। অনেক ক্ষেত্রেই মাসিক সাহায্য পাঠানো একান্ত প্রয়োজন। এ সমস্যা কেবল সাময়িক মাত্র নয় বিবেচনা ক'রে আমরা একটি স্থায়ী রাজবন্দী-সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করেছি। এই ভাণ্ডারে টাকা পাঠালে তা বন্দী-পরিবারের হাতে গিয়ে পৌছবে—এ বিষয়ে দেশবাসী নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

এ সমস্যা যে কেবল রাজনীতিক বা সাম্প্রদায়িক মাত্র নয়—এ যে জাতীয় সমস্যা, এই অতিবাহুল্য কথাটা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ বিষয়ে বাঙালী জাতিকে আগ্রহশীল হবার জন্য আহ্বান করছি এবং সেই সঙ্গে এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে রাজবন্দী-পরিবারের প্রকৃত চিত্র দেশের লোকের সম্মুখে উপস্থিত করলাম।

রংপুর-ভাষার একটি দিক্

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি-টি

রংপুর ও কুচবিহারের কোন কোন অংশের ভাষায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি। ভূতপূর্ব্ব কামতাপুর রাজ্যে, অর্থাৎ বর্ত্তমান রংপুর ও কুচবিহারের অঞ্চল-বিশেষে অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ অথবা কিঞ্চিৎ-বিকৃত সংস্কৃত শব্দ অনেক পাওয়া যায়, যা বাংলা দেশের আর কোন স্থলে প্রচলিত নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত "রংপুর ভাষার ব্যাকরণ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি আমার সংগৃহীত এইরূপ একটি তালিকার কিয়দংশ বাংলার সুধীমণ্ডলীর নিকটে উপস্থাপিত করিতেছি।

	শব্দ।	অর্থ।	মন্তব্য।
(১)	কষাল	হরীতকী	'কষ' বা কষায় দ্রব্য যাহাতে অধিক এইরূপ ফল-বিশেষ।
(২)	ঝটিতে	শীঘ্র	সংস্কৃত 'ঝটিতি' শব্দের অপভ্রংশ
(৩)	জিটি	টিকটিকী	সংস্কৃত 'জ্যেষ্ঠী' শব্দ হইতে।
(৪)	ছাদা	বমি করা	সংস্কৃত "ছর্দ্দি" (বমন) হইতে আগত।
(৫)	বির্ত্তি	এক প্রকার ঔষধের গাছ।	আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'বৃহতী' শব্দ হইতে সমাগত।
(৬)	"দীয়াইড়্"	যে মৃৎ-ভাণ্ডে দীপ দেওয়া হয়।	'দীপাধার'-শব্দের অপভ্রংশ।
(৭)	বিন্দি	সূঁচ	যাহা বিদ্ধ করে এইরূপ সূক্ষ্মাগ্র দ্রব্য।
(৮)	নিন্দ্	নিদ্রা	সংস্কৃত 'নিদ্রা' হইতে।
(৯)	নিওর	হিম	সংস্কৃত 'নীহার'।
(১০)	মান্দ্যমান্দ্য	ধীরে ধীরে	মন্দং মন্দং
(১১)	ডাং	মা'র, আঘাত	"দণ্ড" হইতে?
(১২)	ঝষা	ঘাম হওয়া	সংস্কৃত "ঝৄ" ধাতু হইতে; অর্থ, ক্ষয় হওয়া।
(১৩)	ছেওটা	চীর-বস্ত্র	সংস্কৃত "ধটি" শব্দের উচ্চারণ-বৈষম্যে উদ্ভূত। (ধ = ঝ = ছ)
(১৪)	হোঁত্লাই	চিবুক.	"হনু"-শব্দের সঙ্গে যোগ অনুমেয়।
(১৫)	বীচন	বীজ	'বীজ' হইতে।
(১৬)	গীদাল্	গীত-ব্যবসায়ী	গীত+আল্ ত্ = দ্
(১৭)	বাও	বাতাস	'বায়ু' হইতে।
(১৮)	ছেব্	থুথু	'স্রাব' হইতে—এখানে লালা-স্রাব
(১৯)	সোন্দা	প্রবেশ করা	'সন্ধান' করা হইতে।
(২০)	ভাতার	স্বামী—অন্নদাতা	'ভর্ত্তৃ' হইতে।

এই তালিকা-পাঠে বুঝিতে পারা যায়, রংপুর ও তৎ-সংলগ্ন ভূভাগে এককালে সভ্যতার প্রসার ও প্রগাঢ়তা যথেষ্ট হইয়াছিল। এই জেলার অধিবাসিগণের ও স্থানের নাম-করণে কাব্যগন্ধ পাওয়া যায়।

খুকুর পুতুল খেলা

শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়

সুশীলা খুকুর হাত ধ'রে টানতে টানতে বারান্দার কোণে এনে বসিয়ে বলে—এই নাও তোমার পুতুল, চুপ ক'রে ব'সে খেলা করগে, ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ ক'রো না বাছা। আজ তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবার ফুরসৎ আমার নেই। সারাদিনের বাসন ঝাঁট সমস্ত পড়ে আছে, ঘরদোর থই থই করছে, এদিকে বাবুর ফেরবার সময় হয়ে এল।

বন্ধ দরজার দিকে উদ্দেশ করে বলে,—যাই বলি মেয়েমানুষের এত রাগ ভাল নয়। পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু করেই থাকে, তা না হলে পুরুষমানুষ বলেছে কেন? মান কর গোসা কর আবার যে-কে সেই,—এমন সকল ঘরেই আছে।

গজ গজ করতে করতে সুশীলা নীচে চলে গেল। কলতলায় জল পড়ার শব্দ হয়, অন্ত দিনের চেয়ে আজ যেন একটু বেশী আওয়াজ ক'রে সুশীলা বাসন মাজ্‌তে থাকে।

খুকু সাবানের বাক্সে পুতুল কোলে নিয়ে চুপ করে ব'সে থাকে, খেলা করতে ইচ্ছা করে না, শুধু কাঁদতে ইচ্ছা হয়।

অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে বাক্সের ডালা খুলে ফেলে। দুটি কাঁচের পুতুল জামাজোড়া পরা পাশাপাশি শোয়ানো। এরা খুকুর ছেলেমেয়ে, বর-বৌও আবার। এই ত সেদিন রবিবারে এদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। মা জামা কাপড় তৈরি ক'রে পরিয়ে দিয়েছে, সাবানের বাক্সের মাপে তৈরি ক'রে দিয়েছে তোষক, দু'টি মাথার বালিশ, দুটি পাশ-বালিস। ছোট এতটুকু। একটি বালিশ মাটিতে রেখে খুকু শুতে গিয়েছিল আর মাথা ঠুকে গিয়েছিল ঠক্।

গলার পুঁতির মালা সুশীলার তৈরি। সুশীলা বলেছে এই সাদাগুলো আসল মুক্তো, আর ঐ বড় বড় লালপুঁতি ওগুলো মাণিক—সাত রাজার ধন মাণক, গহন বনে অজগর সাপের মাথায় থাকে, রাত্রে সাপেরা ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি গিয়ে নিয়ে আসতে হয়।

বিয়ের দিন খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল সত্যি সত্যি, খেলাঘরের নয়। মা উপরে ষ্টোভ জেলে তৈরি করেছিল লুচি, আলুভাজা, মোহনভোগ। বিয়ে হয়ে যেতে বাবা দুটি চকচকে পয়সার গিনি দিয়ে বর-বৌয়ের মুখ দেখে।

কোথায় গেল গিনি দুটো? এই যে তোষকের তলায় চাপা পড়ে গেছে।

বাবা বলেছে পালিশ-করা একটি ছোট খাট কিনে আনবে, আর মা তৈরী করে দেবে ফুলকাটা নেটের মশারি। রাত্রে খাটের উপর খুকু ঘুমাবে, আর নীচে নিজেদের খাটে ছেলেমেয়ে ঘুমাবে—মজা হবে খুব।

কেবল একটি দুঃখ। বিয়ের সময় বাজনাবাদ্যি হয় নি কিছুই। খুকু নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত, বাজায় কে? ওবাড়ির পাকুর মতন তার যদি একটি মোটাসোটা ছোট ভাই থাকত ত মাথা নেড়ে নেড়ে নেচে নেচে অনেকক্ষণ বাঁশী বাজাতে পারত। খুকুর দুঃখ হয় ভারি একটিও ছোট ভাই নেই তার।

খুকু বাক্সর ভিতর থেকে মেয়েকে সাবধানে তুলে নেয়। গলার হার এক পাশে বেঁকে ঝুলছিল ঠিক করে দেয়, মাথার ঘোমটা খুলে গিছল পরিয়ে দেয় আবার। দু'হাতে ধ'রে দুলিয়ে দুলিয়ে আদর করে, শব্দ করে, আলতো আলতো চুমু খায়, বলে—ও আমার লক্ষ্মী মেয়ে, আমার সোনা, আমার মাণিক।

খুকুর এবারে ইচ্ছা হয় পুতুল নিয়ে একটু খেলবে।

দেওয়াল ঠেসিয়ে বিছানা-বালিশ পাতা হ'ল, সাবানের বাক্সের ডালাদুটি দাঁড় করিয়ে আড়াল করে ঘর তৈরি হ'ল, খুকুর একটি পা মোড়া ও অন্ত পা ছড়ানর জায়গাটুকুর মধ্যে নীচের রান্না-ঘর কলতলা উঠান। দরজা দিয়ে বেরিয়ে খুকুর পায়ের গোড়ালি ঘুরে ওদিকটা—বারান্দার রেলিঙের দিকটা—রাস্তা।

মেয়ে পুতুল—মা, ছেলে পুতুল—বাবা, খুকু কে? আর ত পুতুল নেই। আচ্ছা এই একটা চকচকে পয়সার গিনি খুকু আরেকটা সুশীলা। চিৎ-করা রাজার মুখওয়ালা সুশীলা—উপুড়-করা ফুলকাটা খুকু। না, রাজার মুখ খুকু, ফুল সুশীলা। খুকু কথা ব'লে ব'লে খেলতে সুরু করে।

সন্ধ্যা হয়েছে। সুশীলার সঙ্গে খুকু পার্কের মাঠ থেকে বেরিয়ে ফিরলো। ঘরে মাকে দেখতে পেয়েই বলতে গেল—জান মা, কমলার ফুল কোথায় হারিয়ে গেল খেলতে খেলতে।

—চুপ কর্ বাপু, বক বক করিস না, ভাল লাগছে না আমার।

মার হ'ল কি? আপিস থেকে বাবা ফেরে নি তখনও। ফিরলে খবরটা দেওয়া যাবে, হারানো ফুল সম্বন্ধেও অনেক কিছু প্রশ্ন করবার আছে। সুশীলা আজেবাজে আপদ চোকানো উত্তর দেয়, বোঝা যায় না, ভাল ক'রে।

খুকু রাজামুখো পয়সাটা সাবানের বাক্সের একটি ডালার উপর রেখে দেয়, খুকু মার বকুনি খেয়ে জানলায় উঠে বসেছে।

ডালার দিকে মুখ ক'রে মা আয়নার সামনে চুল ঠিক করছে, সিঁদুর-টিপ পরছে।

মেয়ে-পুতুলকে ধ'রে না থাকলে পড়ে যায়; আপনি দাঁড়াতে পারে না।

খুকু এক হাতে পুতুলকে ধ'রে থাকে—মা চুল ঠিক করছে, সিঁদুর-টিপ পরছে।

গা ধুয়ে সাজবার পর মাকে এমন সুন্দর দেখায়, যেন সকালের মা এ নয়, আরেকজন অন্য মানুষ। খুকুর চুপ ক'রে ব'সে মার মুখের দিকে দেখতে বড় ভাল লাগে। অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে ঘুম এসে যায়।

হঠাৎ মা ফিরে কটমট ক'রে তাকায়। খুকু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। চারিদিকে ছাপ ছাপ কত অন্ধকার নানা জায়গায় ছড়ানো, এগুলি মিলিয়ে দিলেই রাত্রি হয়ে যাবে। ঐ দিকের বাড়ির ছাদে রোজকার মত খুব কালো কালো ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে। এদের দিনের বেলায় কিন্তু এত কালো দেখায় না। ঐ দূরের তালগাছের মাথায় তারা ফুটেছে—একটা দুটো তিনটে অনেকগুলো।

বারান্দায় বাবার জুতার শব্দ হ'ল।

ছেলে-পুতুল বারান্দার রেলিঙের ধার দিয়ে দিয়ে হেঁটে বাড়ি আসছে, বাবা বাড়ি ফিরছে। বাবা ঘরে এসে ঢুকলো, কি গো মা খুকুরাণী হচ্ছে কি?

খুকু জানে এ কথার উত্তর দেবার দরকার নেই। হাসে শুধু। কিন্তু হাসি তখুনি মিলিয়ে যায়।

মা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তীক্ষ্ণস্বরে বলে—এত দেরি হ'ল যে, গিছলে ওখানে আবার?

বাবার মুখটা কি রকম হয়ে গেল। জোর ক'রে কেটে কেটে হেসে বলে, কি করি শৈল গজেনবাবু রাস্তা থেকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেলেন।

—মিছে কথা! নিজে গিছলে একলা!

খুকুর হাসি পায় এমন মার কথা শুনে। বাবা কি খুকু যে পথ চিনতে না পেরে হারিয়ে যাবে একলা?

—সত্যি বলছি। গজেনবাবুর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা, বললেন, চলুন আজ আমাদের বাড়িতে, অনেক দিন আসেন নি। বললাম, আজ একটু কাজ আছে যাই আরেক দিন আসব—শৈলকে নিয়েই না হয় আসব'খন—কিন্তু ছাড়লেন না কিছুতে কি করি?

—মিথ্যে কথা। আমাকে কি যা-তা পেয়েছ যে গল্প দিয়ে ভোলাচ্ছ? আমি জানি গজেনবাবু বাড়ি ছিলেন না, একথা তুমি আগে থেকে জানতে তাই গিছলে!

বাবা ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, শৈল ছেলেমানুষী ক'রো না। এই এলাম ঠাণ্ডা হই একটু, তুমিও শান্ত হও, পরে বুঝিয়ে দেবো'খন তুমি যা ভাবছো তা নয়।

ফুল-পয়সা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সুশীলা বলে—বাবুর জলখাবার আনবো মা?

—না, দরকার নেই আমি খেয়ে এসেছি—

—ছেলে-পুতুল উত্তর দেয়।

মা বলে—সেখানে রাতটা কাটিয়ে এলেই পারতে?

সুশীলা কি রকম মুখ করে হাসি চেপে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

খুকু ভাবে মা এমন উল্টো কথা বলে কেন। যে-দিন বাবা কোথাও নিমন্ত্রণে যায় ফিরতে অনেক রাত হয়, খুকু জানতে পারে না কখন বাবা ফেরে, সে-দিন সুশীলা এসে ঘরের মেঝেতে শোয় আর মা মাঝে মাঝে চমকে ব'লে উঠে—হ্যাঁরে সুশীলা, কিসের আওয়াজ হ'ল রে, দরজা সব ভাল করে বন্ধ করেছিস, তোর বাবু বাড়ি না থাকলে বড় ভয় করে বাপু। আর মা কিনা অম্লান মুখে বলে দেয় সমস্ত রাত্রি সেখানে থেকে এলে না কেন! বড়রা এত ভুল কথা বলে!

এবার বাবা রাগের সঙ্গে বলে উঠে, তোমায় কতবার বলেছি ঝি-চাকরের সামনে ভদ্রভাবে কথা কইবে।

—আর অভদ্র কাজগুলো যে ওদের চোখে আগে পড়ে যায়, তার কি?

বাবার এতক্ষণে আপিসের জামা কাপড় ছাড়া হয়ে গেছে। আর কথার কোন উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল আর ধমক দেওয়া প্রশ্নে ঘুরে দাঁড়াতে হয়।

—কি কোন জবাব না দিয়ে চলে যাচ্ছ যে?

—কি কথার জবাব দিতে হবে?

—কেন গিছলে আবার?

—ঐ ত' বললাম।

—ও মিছে কথা। আসল কথা বল, গজেনবাবু বাড়ি ছিলেন না ত?

এবার বাবা রুখে বলে, দেখ শৈল, কোন জিনিষের বাড়াবাড়ি ভাল নয়, বাজে ঘ্যানঘ্যানানি কতক্ষণ সহ্য করা যায়?

—সহ্য করতে না পারো সিধপুরে আমায় পাঠিয়ে দিলেই ত হয়।

—কেউ ত আর আটকে রাখেনি যে-দিন ইচ্ছা চলে যেতে পার—বাবা তিক্তস্বরে বলে।

—ও তাই বুঝি! আমি তোমার পথের কাঁটা, সরাতে পারলে বাঁচো। আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে তুমি খুশীমত মনের মানুষ নিয়ে ফুর্ত্তি করবে—না?

বাবা এবার সত্যি ভয়ানক রেগে গেছে। মুখটা ছুঁচালো আর কালো দেখায়। আঙুল উঁচু করে বলে, দেখ শৈল সাবধানে কথা বলবে। আমার যা খুশী যখন খুশী করব, কারুর তাঁবে-দারীতে থাক না আমি, বুঝলে? কিছুদিন ধরে বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তুমি।

কিন্তু আজ থেকে এ বাড়িতে থাকতে হ'লে এ সমস্ত চলবে না,—এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম!—ওঃ তাই, তাই বুঝি? ও মা মা গো আর যে সইতে পারি না—হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠে মা মাটিতে বসে পড়ে। হঠাৎ মা যেন-ক্ষেপে গেল। কি ভীষণ, কত খারাপ চেহারা হ'য়ে গেল মুখের এক নিমেষে। নিজের মাথায় চটাচট্ চাপড় মারে, বুকে কিল মারে গুমগুম, ঢপ্ ঢপ্ ক'রে মাটিতে মাথা ঠোকে। আর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে, আমি কি করি—আমি কি করব গো—ওমা আমার কি হবে!

খুকু ভয়ে চীৎকার করতে গেল, পারল না। সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হয়ে যায়। কি ভীষণ চেহারা হয়েছে মায়ের, নিজেকে খুন ক'রে আর সকলকে ও খুন ক'রে ফেলবে নিশ্চয় !

বাবা সামনে বসে পড়ে আর হাত ধরে ধস্তাধস্তি করে, মাকে মাথা ঠুক্‌তে বুকে কিল মারতে বাধা দেয়। মিনতি ক'রে বলে, আঃ কি করছো শৈল, কি ছেলেমানুষি করছ, আহা অমন করে না।

বাবার গলায় যেন ভয়ের ও কান্নার সুর।

—ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে। চাও না যখন তখন আর দরদ দেখিয়ে লাভ কি হবে? যাও তুমি নির্ম্মলার কাছে· যাও, গিয়ে খোস-মেজাজে গল্প করগে, দরদ দিয়ে আদর করগে। এতক্ষণ ত ফুর্ত্তি ক'রে এসেছ, আবার যাও !

খুকু এবারে কিছু কিছু বুঝতে পারে যেন। বাবা কাকীমার সঙ্গে গল্প ক'রে এসেছে বলে মার রাগ হয়েছে, কাকীমার সঙ্গে একলা গল্প করাটা মার পছন্দসই নয়। খুকু ভাবতে থাকে এতে দোষ কোথায় !

বাবার বন্ধু কাকাবাবু একটু চুপচাপ গম্ভীর লোক বটে, কিন্তু কাকীমা কি সুন্দর মানুষ। খুকুর খুব ভাল লাগে কাকীমাকে। কত কথা, হাসি, গল্প, খুকুরা ওদের বাড়ি বেড়াতে গেলেই।

খুকুকে ত আদর ক'রে পাগল ক'রে দেয়। কোলে নিতে কষ্ট হয় তবু জোর ক'রে কোলে তুলে নিয়ে বলে এস খুকু একটা জিনিস দি।

নিজের সেই বড় আয়না-দেরাজওয়ালা শোবার ঘরে ধবধবে বিছানার উপর বসে খুকুকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়—কত চুমু খায়—গালে কপালে মুখে চোখে সব জায়গায়। দম আট্‌কে ফিস ফিস ক'রে বলে, খুকু তুমি শুধু আমার খুকু, আর কারুর নয়। বল তুমি আমার খুকু ! বল তুমি আমায় সকলের চেয়ে ভালবাস !

খুকু আদরের দাপটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে। ভাবে কিছু না উত্তর দিলে বোধ হয় আরও জাপটে ধরে পিষে দেবে একেবারে। খুকু ঘাড় নেড়ে নেড়ে জানায়, হ্যাঁ তারই খুকু, তাকেই ভালবাসে সকলের চেয়ে !

আবার চলে আদর ও অজস্র চুমু। যখন দুজনাই হাঁপিয়ে ওঠে তখন উঠে আলমারি খুলে সবচেয়ে ভাল পুতুল বা খেলনা দিয়ে দেয় তাকে। এমনই কত না জিনিস লাভ হয়েছে খুকুর, নিজেদের বাড়ির ঘরে এনে এনে জমা করেছে। কাকীমার দেওয়া পুতুল খেলনা তার অগুনতি।

খুকুর মনে একটা সমস্যা এসে জাগে কাকীমা ত মার মতই বড় তবে ওর খোকা কি খুকু নেই কেন? বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সাহস হয় না। অনেক প্রশ্নে বড়রা আজকাল এমন মুখ-চোখ করে যেন ভয়ানক কিছু বিপদ ঘটতে শুরু হ'ল। সেজন্য কত কথা তার আর জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠে না।

বাবা তেমনই মার হাত ধরে বলে, চুপ কর শৈল, সকলে শুনতে পাবে, ওসব নিয়ে আর মাথা গরম করতে হবে না। তুমি কল্পনায় এ সমস্ত সৃষ্টি ক'রে নিজের মনে নিজেই কষ্ট পাও। কখনও বেচাল দেখেছ কিছু?

মা আরও ক্ষেপে গিয়ে বলে—দেখি নি? সেই চিঠি? মনে নেই তোমার?

—আহা-হা সে ত একবার মাত্র একটি বার তার বুঝি আর শেষ নেই, মাপ নেই কোন দিন?

—লুকিয়ে যে কি হচ্ছে কে জানে? সেবারে ধরা পড়ে গিছলে তাই বলছ একবার। মাগো কি করি আমি, আমার কি হবে?

মা আবার জোর ক'রে বুকে কিল মারতে যায়, মাথা ঠুকতে যায়, বাবা হাত ধ'রে থাকে ধস্তাধস্তি ক'রে। একটু আগে বাঁধা মার মাথার চুলগুলি খুলে পড়ে উস্ক-খুস্ক হয়ে মুখের সামনে এসে যায়। খুকুর মনে হয় গল্পে শোনা রাক্ষসীর মত মাকে ঠিক দেখাচ্ছে যেন।

ফুল-পয়সা আবাব ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। আড়াল থেকে ডাকে, খুকু, ও খুকু শুনে যাও।

খুকু বেঁচে গেল। জান্‌লা থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে সুশীলাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেলে, নীচে গিয়েও কাঁদতে থাকে অনেকক্ষণ।

মনে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে সুশীলার কাছে খেয়েছিল, কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, এর চেয়ে বেশী কিছু মনে পড়ে না আর।

পরের দিন। সকাল থেকে খুকু মাকে দেখে নি, ভয়ে যায় নি মার কাছে। সুশীলার পিছনে পিছনে নীচে ঘুরেছে যা-কিছু দরকার তার কাছেই চেয়ে নিয়েছে। বাবার আপিস যাবার সময় দরজায় দুম দুম ঘা শুনে বুঝতে পারে শোবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, মা ঐ ঘরেই আছে।

শুনতে পায় বাবা আপিস যাবার জামা-কাপড় চাইছে। ধড়াস ক'রে দরজা খুলে জামা-কাপড় বারান্দায় ফেলে দেবার শব্দ শুনতে পেল, আবার দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়।

এই সঙ্গে শুনতে পেল মার ভারী গলার আওয়াজ, বলছে—যখন আজ ফিরে আসবে তখন দেখতে পাবে বিষ খেয়ে মরে পড়ে আছি !

এরপর সারাদিন সুশীলা এসে কত বার ডাকল মাকে, কত কাকুতি-মিনতি ক'রে, কত বুঝিয়ে—কত বার—কিন্তু দরজা খুলল না, কোন উত্তরও এল না। খুকু নীচে থেকে চুপ ক'রে ভয়ে ভয়ে শুনেছে এই সব। মার গলার এতটুকু আওয়াজের জন্য কান পেতে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে, শুনতে পায় নি কিছুই। সারাটা

দিন কাটতে চায় নি, সমস্ত বাড়িটা শুধু থম থম করেছে. বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করেছে ভয়ে। যত রাজ্যের যত ভয় এসে যেন এই বাড়িতে হঠাৎ বাসা বেঁধে নিল।

খুকুর পুতুল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। মেয়ে-পুতুল ঘরের বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে, ছেলে-পুতুল বারান্দার রেলিঙের দিকে দাঁড়িয়ে—আপিস গেছে। ফুল-পয়সা উঠানে বাসন মাজছে, আর রাজা-মুখো বারান্দার কোণে চুপ ক'রে ব'সে! এর পর কি খেলতে হবে খুকু জানে না, ভেবে পায় না কিছু। ভাবতে চেষ্টা করে বাবা বাড়ি ফিরে এল তার পর—তার পর কি হবে।

কথাটা মনে প'ড়ে যায়। মা বলেছে বিষ খেয়ে মরে পড়ে থাকবে। বিষ কি জিনিস, কেমন খেতে লাগে, খেলে মরে যায় কেন? নানা প্রশ্ন মনে জাগে, খুকু ভেবে কুল-কিনারা খুঁজে পায় না।

মেয়ে-পুতুলকে কোলে নিয়ে ঝিনুকে ক'রে দুধ খাওয়াবার মত খুকু খাইয়ে দিলে বিষ। বড় বড় চোখ ক'রে চেয়ে দেখে হচ্ছে নাকি কিছু, ভাবে হ'তে পারে কি?

হঠাৎ মনে হয় মা নিশ্চয় ঐ বন্ধ ঘরের ভিতর বিষ খেয়ে নিয়েছে অনেকখানি, এতক্ষণে মরে পড়ে আছে, তা না হ'লে সুশীলার অত ডাকাডাকিতে সাড়া দেয় নি কেন। ভাবে বাবা আপিস থেকে এসে দরজা ভেঙে ঢুকে দেখবে মা মরে গেছে, একেবারে মরে গেছে! তার পর লোকজন এসে মাকে খাটে শুইয়ে নিয়ে চলে যাবে কোথায় যেন,—বিনুর ঠাকুমাকে যেমন নিয়ে গিছল। মা আর ফিরে আসবে না,—খুকুকে আর আদর করবে না, চুমু খাবে না, কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেবে না, গল্প ব'লে ঘুম পাড়াবে না! হু হু ক'রে চোখে জল এসে পড়ে। খুকু ককিয়ে কেঁদে ওঠে, মেয়ে-পুতুলকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে মাটিতে গড়াগড়ি খায়!

চেঁচিয়ে কাঁদতে সাহস হয় না, মা হয়ত সেই ভীষণ উস্ক-খুস্ক চুলওয়ালা মুখ নিয়ে বেরিয়ে এসে কিছু একটা ভয়ানক ক'রে বসবে। হয়ত সকলকে খুন ক'রে মেরে ফেলবে, হয়ত খুকুকেও খাইয়ে দেবে বিষ জোর ক'রে চেপে ধ'রে।

কেঁদে কেঁদে খুকুর দম আটকে যায়, বুকের ভিতর নিশ্বাস কে যেন টেনে ধরে। মনে হয় সেও এবারে মরে যাচ্ছে, মরে যাবে এক্ষুনি!

কখন বাবা এসেছে খুকু জানতে পারে নি। বাবা খুকুকে দেখেই চীৎকার করে উঠে,—ওরে ও সুশীলা, সুশীলা, খুকু এমন ছট্‌ফট্ করছে কেন, এত কাঁদছে কেন,—যেন তড়কার মতন হয়েছে। চট্ ক'রে জল নিয়ে এস, পাখা নিয়ে এস—খুকু, ও খুকু মা—

বাবা মাটিতে বসে পড়ে খুকুকে কোলে তুলে নেয়। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে দেয়, পাখার বাতাস করে, মাথায় গায়ে ঝাকুনি দিয়ে দিয়ে নাড়া দেয়। খুকু তেমনই ছট্‌ফট্ করে, তেমনই কাঁদে ঠিক!

ধড়াস করে খিল খুলে মা বেরিয়ে এল। একটু চেয়ে দেখে চুপ করে, তার পর বাবার পাশে বসে খুকুকে নিজের কোলে তুলে নেয়। খুকুর ছোট মাথাটি নিজের কাঁধে আলতো রেখে বুকে জড়িয়ে ধ'রে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

বাবা ব্যস্ত হয়ে বলে—ডাক্তার ডেকে আনি শৈল, ওর ত তড়কা ছিল না কোন দিন।

মা বলে—না তড়কা এ নয়, এখুনি চুপ করবে।

—তুমি বুঝছ না শৈল, ঐ একটা মেয়ে আমাদের—শেষ করতে পারে না, বাবা যেন কান্নায় ভেঙে পড়বে এখুনি।

মা মিষ্টি সুরে বলে—না না, কিছু হয় নি বিশেষ আমি বলছি। দেখ না কত শান্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ আর ছটফট্ করছে না। তুমি জামা-কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধোও গে আমি এখুনি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। ও সুশীলা, বাবুর খাবার এনে দে—ও তৈরি নেই বুঝি—যা চট করে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আয়। শীগগির আসবি দাঁড়িয়ে গল্প করিস না যেন, সকাল থেকে খাওয়া নেই কিছু।

বাবাও খুশি ভাবে বলে—হ্যাঁ যাও বেশী করে নিয়ে এস তোমার বৌদির জন্যও।

খুকু আস্তে আস্তে ছোট ছোট হাত দুটি দিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরে। মার চুলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দেয়। মা ছোট মাথাটি নিজের মুখের উপর চেপে ধরে, হাত দিয়ে খুকুকে বুকের উপর আরও নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে, মাথায় কানের উপর বার বার চুমু খায়। কানের কাছে ফিসফিস ক'রে মা বলে,—কাঁদছিস কেন রে—আর কাঁদিস না—এই ত আমি কোলে নিয়েছি, আদর করছি—কি হয়েছে রে খুকুসোণা, লক্ষ্মী মেয়ে আমার?

মার গলা জড়িয়ে ধ'রে খুকু কাঁদে, কাঁদতে ভাল লাগে—মার ছড়ান চুলের ভিতর মুখ লুকিয়ে বড় ভাল লাগে কাঁদতে খুকু শুধু কাঁদে—মুখ বুজে গান গাওয়ার মত সুর ক'রে কাঁদে, কাঁদে খালি—বলে না কিছু।

চাষবাসের কথা

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

৪

সার

যে-সকল রাসায়নিক উপাদানের দ্বারা মাটি গঠিত, সেই সকল উপাদানের প্রায় প্রত্যেকটি অল্পবিস্তর পরিমাণে উদ্ভিদের খাদ্যের জন্য দরকার হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান উপাদান চারিটি, যথা—নাইট্রোজেন (যবক্ষারজান), ফসফরিক্ এসিড্ (প্রস্ফুরক), পটাস্ (ক্ষার) ও চূণ।



গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনের জন্য আহার্য্য হিসাবে এই চারিটি উপাদানেরই প্রয়োজন বেশী হয় এবং এই কারণে বার বার চাষের ফলে মাটিতে ইহাদের অভাবই অধিক দেখা যায়। অবশিষ্ট উপাদানগুলি মাটিতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং বার বার ফসল উৎপাদনের ফলেও উহাদের তত অভাব হয় না।

সুতরাং ভাল ফসল পাইতে হইলে প্রধানতঃ মাটির এই চারিটি উপাদানের ক্ষয় উপযুক্ত পরিমাণে পূরণ করিতে হয়। জমিতে যে-সকল পদার্থ প্রয়োগ করিয়া ইহাদের ক্ষয় পূরণ করা হয় তাহাদিগকেই সার বলে।

সারকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) সাধারণ সার, এবং (২) বিশেষ সার। যে-সকল পদার্থে যবক্ষারজান, ফস্ফরিক্ এসিড, পটাস্ এবং চুণ—এই চারিটি উপাদানের প্রত্যেকটি অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাহাদিগকে "সাধারণ সার" বলে। কিন্তু এই সকল উপাদান গলিত অবস্থায় থাকে না এবং সেই জন্য গাছের ব্যবহারের পূর্ব্বে ইহাদের গলিত অবস্থায় পরিণত হওয়া দরকার। আর যে-সকল পদার্থে উহাদের একটি বা মাত্র দুইটি উপাদান বর্ত্তমান থাকে তাহাদিগকে "বিশেষ সার" বলা হইয়া থাকে। বিশেষ সারে এই উপাদানগুলি অপেক্ষাকৃত গলিত অবস্থায় থাকে এবং গাছ অতি সহজে এবং শীঘ্র তাহা হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে।

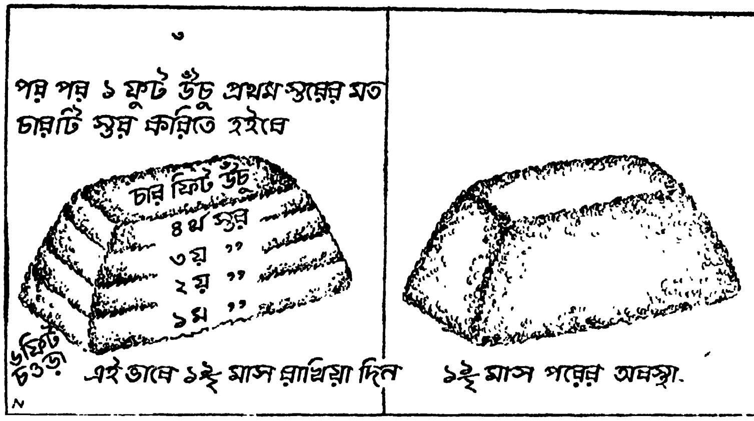
প্রধান প্রধান সাধারণ সার :

(ক) গোবর ও গোমূত্র সার

আমাদের দেশে গোবরই প্রধান সার; কিন্তু অনেকেরই চাষের জমির তুলনায় উহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। আবার অনেকেই তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর জমিতে প্রয়োগ করেন না; উহার কতকটা ঘুঁটে করিয়া জ্বালানীর জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। সারের অভাব দূর করিতে হইলে যাঁহার যতটুকু গোবর উৎপন্ন হয় তাহা সমস্তই জমিতে প্রয়োগ করা উচিত; জ্বালানীর জন্য গোবর নষ্ট করা কোনমতেই উচিত নয়। গ্রামের বন-জঙ্গল হইতে কাঠ জোগাড় করিয়া এবং অড়হর, ধঞ্চে, পাট, শণ ইত্যাদি গাছের শুক্না ডাঁটা ও ডালপালা প্রভৃতির দ্বারা জ্বালানীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আর একটি কথা এই যে, সারের জন্য যেভাবে গোবর রাখা উচিত সাধারণতঃ ঠিক সেই ভাবে গোবর রাখা হয় না। ফাঁকা জায়গায় গাদা করিয়া কিম্বা একটা নীচু জায়গায় বা গর্ত্তে গোবর ফেলিয়া রাখা হয়; ইহাতে গোবরের মধ্যে যে সার পদার্থ থাকে তাহার প্রায় সব অংশই রৌদ্রে এবং বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপ গোবর জমিতে প্রয়োগ করিলে ফসলের বিশেষ কিছু উপকার হয় না; অর্থাৎ ইহার দ্বারা ফসলের ফলন বিশেষ বাড়ে না।

সারের জন্য গোবর ফাঁকা জায়গায় ফেলিয়া না রাখিয়া একটি গর্ত্ত করিয়া এবং গর্ত্তের উপর একটি চালা দিয়া, সেই গর্ত্তে গোবর রাখা একান্ত দরকার; গর্ত্তটি যেন সর্ব্বাপেক্ষা



উঁচু জায়গায় করা হয় যাহাতে বর্ষা-কালে গর্ত্তের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে না পারে, ইহা খুব গভীর করিলে চলিবে না, তাহাতে মাটির ভিতর হইতে জল উঠিয়া সার নষ্ট করিয়া ফেলে। গর্ত্তের উপরে খুব খরচ করিয়া শক্ত ও মজবুত চালা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। খানকতক বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া তার উপর খড়, উলু বা ছন্ এমন কি তালপাতা দিয়াও চালা করা যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ কিছুই খরচ হয় না; প্রত্যেক কৃষক অবসর সময়ে নিজে একটু পরিশ্রম করিয়া এই রকম চালা অনায়াসে করিতে পারেন। গোবর রাখিবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িবার যদি অবসর না হয় তবে কোন উঁচু জায়গায় গাদা করিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু সেই গাদার উপর চালা দেওয়া একান্ত আবশ্যক, কেননা চালা না দিলে রৌদ্রে এবং বৃষ্টিতে গোবরের শক্তি অনেক নষ্ট হইয়া যাইবে।

গোচোনাও অতি মূল্যবান সার। সেই জন্য কোন কারণেই ইহা নষ্ট করা উচিত নয়। গোয়ালঘরের মেঝের একটা দিক্ ঢালু করিয়া, সেই ঢালুর দিকে একটা নালা করিতে হইবে এবং নালার মুখে একটা গামলা রাখিলে, মেঝে হইতে গোচোনা গড়াইয়া নালায় পড়িবে এবং নালা বহিয়া গামলায় গিয়া জমা হইবে। গামলা হইতে গোচোনা উঠাইয়া গোবরের গর্ত্তে ফেলিতে হইবে। ইহাতে সার হিসাবে গোবরের তেজও অনেক বাড়িবে।

(খ) "কম্পোষ্ট" সার

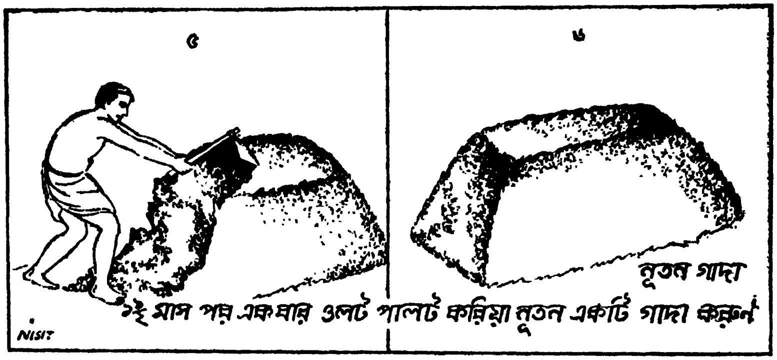
ক্ষেত নিড়ানো সকল প্রকার আগাছা, আখের ছাড়ানো পাতা, ক্ষেত-খামারের জঞ্জাল, জঙ্গল, গাছের পাতা, তরি-তরকারির খোসা, সকল প্রকার আবর্জ্জনা, কচুরি পানা, এবং ইহার মত জলীয় সর্ব্বপ্রকার আগাছা প্রভৃতিকে পচাইয়া একটি অতি মূল্যবান্ সারে পরিণত করা যায়। ইহাকে ইংরেজীতে "কম্পোষ্ট" বলে। এই সার গোবর-সার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সকল রকমের মাটি ও শস্যের পক্ষে উপযুক্ত। ঘরে ঘরে এই সার প্রস্তুত হইলে গোবর-সারের অভাব ইহার দ্বারা পূরণ হইবে। "কম্পোষ্ট" সার প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ কিছু খরচ হয় না, কেবল একটু পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু এই পরিশ্রমের অনুপাতে শস্যের ফলন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে।

এই প্রসঙ্গে কচুরিপানার কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। সকলেই জানেন কচুরিপানার দ্বারা আমাদের দেশে কত দিকে কত অনিষ্ট হইতেছে, সুতরাং কচুরিপানা উঠাইয়া এবং উহাকে পচাইয়া সারে পরিণত করিতে পারিলে একসঙ্গে দুই কাজই হয়—কচুরিপানাও ধ্বংস হয়, সঙ্গে সঙ্গে এক অতি মূল্যবান্ সার পাওয়া যায়। কচুরিপানার দ্বারা সার প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ ইহা সহজে এবং কম সময়ে পচিয়া যায়।

"কম্পোষ্ট" সার প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ :—

স্থান-নির্ব্বাচন—বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া না যায় এইরূপ উঁচু এবং সমতল জমির উপরেই এই সার প্রস্তুত করিতে হয়; কোন বড় গাছের ছাওয়ায় এই জমি হইলে খুব ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে এই সার প্রস্তুত করিবার জন্য যে গাদা বা স্তূপ করা হইবে তাহা সহজে শুকাইয়া যাইবে না। গাদা বা স্তূপ সরস রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে উহা গোয়ালধোয়া জল বা কেবল জল দিয়া ভিজাইয়া দিতে হয়; সেই জন্য গোয়ালের বা পুকুরের কাছাকাছি এই সার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলে অনেক সুবিধা হয়।

আবর্জ্জনা-সংগ্রহ—উপরে লিখিত সকল প্রকার আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া যেখানে সারের গাদা বা স্তূপ হইবে সেখানে জড় করিয়া রাখিতে হইবে; খড়, আখের পাতা প্রভৃতির মত শক্ত ও শুকনো জিনিস প্রথমে দুই-তিন দিন গোয়াল-ঘরের মেঝেতে বিছাইয়া রাখিলে ঐগুলি গরুর পায়ের মাড়ানির দ্বারা এবং গোমূত্র শোষণ করিয়া নরম হইয়া যাইবে এবং পরে উহাদের দ্বারা গাদা করিলে উহারা শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যাইবে। খুব শক্ত এবং কেঠো জিনিস হইলে তাহা প্রথমে রাস্তায় বিছাইয়া তাহার উপর দিয়া কয়েক



১½ মাস পর একবার ওলট পালট করিয়া নূতন একটি গাদা করুন

দিন গরু বা মহিষের গাড়ী চলাচল করাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া লইয়া পরে ঐগুলির দ্বারা গাদা করা উচিত।

সারপ্রস্তুত-প্রণালী—সকল প্রকার আবর্জ্জনা স্তরে স্তরে সাজাইয়া গাদা করিতে হয়; পর পর চারিটি স্তর করা দরকার। জমির উপরে সমান ও আলগাভাবে সকল প্রকার আবর্জ্জনা ছড়াইয়া ৬ ফুট চওড়া (৪ হাত) ও ১ ফুট ১½ ইঞ্চি উঁচু (৩ পোয়া হাত) একটি স্তর প্রথমে করিতে হইবে। স্তরের দৈর্ঘ্য আবর্জ্জনার পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। স্তরের মধ্যে বায়ু চলাচল বিশেষ ভাবে আবশ্যক; সুতরাং স্তরটি যেন কোনমতে মাড়াইয়া বা পিটাইয়া চাপিয়া না দেওয়া হয়।

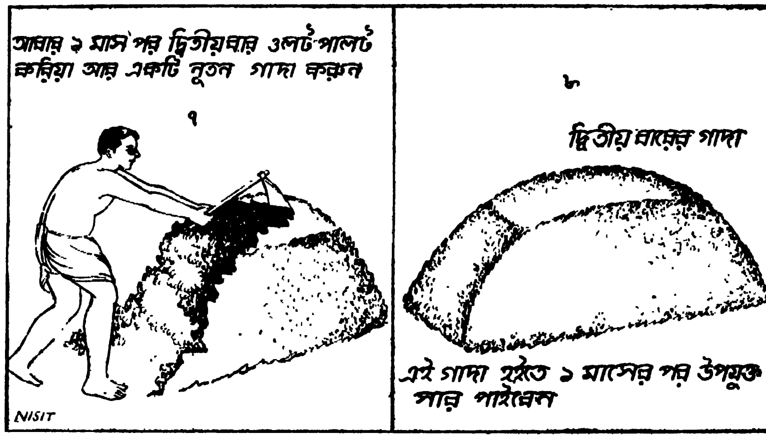
উপরোক্তভাবে প্রথম স্তর করিয়া তাহার উপর প্রতি ১০০ বর্গফুট হিসাবে দুই-তিন সের হাড়ের গুঁড়া সমান ভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে। হাড়ের গুঁড়া যদি সহজে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে স্তরের উপর প্রথমে দুই আঙুল পুরু টাট্‌কা গোবর এবং গোবরের উপর দুই আঙুল পুরু মাটি ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং স্তরের উপর গোয়াল ধোয়া জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। গোয়াল ধোয়া জল না পাওয়া গেলে গোচোনা বা টাট্‌কা গোবর ১০ হইতে ১৫ গুণ জলে গুলিয়া স্তরের উপর ছিটাইয়া দেওয়া দরকার। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, স্তরটিকে সম্পূর্ণ সরস রাখিতে যে-পরিমাণ জল ছিটানো দরকার ঠিক সেই পরিমাণ জল ছিটাইতে হইবে। স্তরের মধ্যে আল্‌গা জল যেন না থাকে। যদি কেবল কচুরি-পানার দ্বারা সার প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় পদার্থ থাকার জন্য উহাকে ভিজানোর দরকারই হয় না; কিন্তু যে-কোন কাঁচা জিনিসের পচনের জন্য এবং তাহাকে শীঘ্র গলিত অবস্থায় আনিবার জন্য একটি "পচাই" পদার্থের বিশেষ দরকার হয়; সুতরাং সারের জন্য কেবলমাত্র কচুরিপানা ব্যবহার না করিয়া উহার সহিত এক-তৃতীয়াংশ অন্য কোন শুক্‌না আবর্জ্জনা ব্যবহার করা উচিত এবং উপরোক্তভাবে উহাকে ভিজানই যুক্তিযুক্ত।

উপরোক্ত প্রণালীতে প্রথম স্তরটি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর ঐভাবে দ্বিতীয় স্তর তৈয়ারি করিতে হইবে এবং দ্বিতীয় স্তরের উপর তৃতীয় স্তর করিতে হইবে এবং তৃতীয় স্তরের উপর চতুর্থ স্তর ঠিক ঐ একই ভাবে করিতে হইবে।

এখন চারিটি স্তরের দ্বারা ছয় ফুট চওড়া এবং সাড়ে-চারি ফুট উঁচু একটি সারগাদা প্রস্তুত হইল। ভালরূপে পচিবার জন্য এইরূপ ভাবে গাদাটিকে কিছু দিনের জন্য একই অবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে এবং পরে গাদার ভিতরের সকল আবর্জ্জনা আধপচা হইলে গাদাটিকে একবার উল্টাইয়া নূতন একটি গাদা প্রস্তুত করিতে হইবে। শুষ্ক আবর্জ্জনার দ্বারা গাদা প্রস্তুত হইলে সাধারণতঃ দেড় মাস বাদে গাদাটি আধ-পচা হইয়া যায়; আখের পাতা আধ-পচা হইতে ইহাপেক্ষা দ্বিগুণ বা আরও অধিক সময় লয়। কাঁচা সরস আবর্জ্জনা হইলে উহা আধপচা হইতে দেড় মাসেরও কম সময় লাগে।

প্রথম বার গাদা উল্টাইয়া নূতন গাদা করিবার সময় উহাকে ভাঙিয়া তাহার পাশেই ঠিক আগের নিয়মে একটি গাদা করিতে হইবে; পুরাতন গাদার উপরের স্তর দিয়া নূতন গাদার নীচের প্রথম স্তর প্রস্তুত করিতে হইবে। এই-রূপ করিবার সময় পুরাতন গাদার না-পচা বা আংশিক পচা আবর্জ্জনাসমূহ নূতন গাদার মাঝখানে রাখিতে হইবে। যদি পুরাতন গাদা হইতে গাছের ডাল, শরের ডাঁটা ইত্যাদির মত শক্ত জিনিস বাহির হয় তাহা হইলে সেগুলি সরাইয়া ফেলা উচিত। কারণ একই রকম না-পচা আবর্জ্জনার দ্বারা নূতন গাদা প্রস্তুত করিলে উহারা সমান ভাবে পচিয়া যাইবে এবং উহাতে সারও ভাল হইবে। নূতন গাদা করিবার সময় যদি আবর্জ্জনাসমূহ বেশ সরস না থাকে প্রয়োজন মত জল দিয়া তাহা ভিজাইয়া দেওয়া দরকার। নূতন গাদাকেও সব সময়ে ঠিক পুরাতন গাদার মত সরস রাখিতে হইবে। গাদা ভাঙিয়া নূতন গাদা করিবার সময়ে বাঁশের "আকড়া" ব্যবহার করা যাইতে পারে; ইহাতে কাজের সুবিধা হইবে।

প্রথম বার উল্টাইয়া দিবার প্রায় এক মাস পরে গাদাটিকে ঠিক প্রথম বারের মত করিয়াই দ্বিতীয় বার উল্টাইয়া দিয়া নূতন একটি গাদা করিতে হয় এবং যত দিন উহা সম্পূর্ণ-রূপে পচিয়া সারের উপযুক্ত না হয় ততদিন উহাকে সরস রাখিতে হয়। দ্বিতীয় বার নূতন গাদা করিবার সময় উহার মাথা খোড়ো-ঘরের চালের মত দুই পাশে ঢালু করিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে বৃষ্টির জল গাদার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।



ঠিকভাবে গাদা প্রস্তুত হইলে এবং উহাকে সর্ব্বদা সরস অবস্থায় রাখিলে উহা পচিয়া সারে পরিণত হইতে সাধারণতঃ সাড়ে-তিন মাস সময় লাগে। কাঁচা আবর্জ্জনার দ্বারা সার প্রস্তুত করিতে ইহাপেক্ষা কম সময়ের প্রয়োজন হয়। গরমকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে আবর্জ্জনা কম সময়ে পচিয়া যায়।

বিশেষ কথা :—এই সার প্রস্তুত করিবার সময় দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(১) গাদার মধ্যে অবাধ বায়ু প্রবেশ, (২) গাদার মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য গাদার স্তর করিবার সময় উহাকে কোন কারণেই মাড়ানো বা চাপিয়া দেওয়া উচিত নয়; গাদা কখনও যেন ছয় ফুটের বেশী চওড়া ও সাড়ে-চারি ফুটের বেশী উঁচু না হয়। গাদার মধ্যে সর্ব্বদা যথেষ্ট পরিমাণে রস রক্ষা করিবার জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন সময়েই গাদা যেন নীরস না থাকে। বর্ষাকালে গাদা ভিজাইবার দরকার হয় না; সেই জন্য বর্ষাকালই এই সার প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত সময়। অন্যান্য ঋতুতে গাদা শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইলেই উহাতে জল দিতে হইবে।

গাদাতে যেন অতিরিক্ত জল দেওয়া না হয়। কেবল সরস রাখিবার জন্য যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তাহাই দিতে হইবে।

গাদাকে সম্পূর্ণরূপে পচাইবার জন্য কত বার জল দিতে হইবে তাহা আবর্জ্জনার প্রকৃতি, স্থানীয় আবহাওয়া এবং ঋতুর উপর নির্ভর করে; কচুরিপানা এবং অন্যান্য জলীয় আগাছা, তরিতরকারির পরিত্যক্ত কাঁচা অংশ প্রভৃতির দ্বারা সার প্রস্তুত করিলে সাধারণতঃ জল দিবার কোন দরকার হয় না; শুষ্ক আবর্জ্জনা পচাইতে বেশী জলের প্রয়োজন হয়। বর্ষাকালে গাদায় জল দিবার আবশ্যক হয় না, তবে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে জল দিতেই হয়।

(গ) সবুজ সার

খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে এইরূপ শুঁটি জাতীয় কোন শস্য উৎপাদন করিয়া উহাকে লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়াকে "সবুজ সার" বলে। শুঁটি জাতীয় শস্যের শিকড়ে এক প্রকার বীজাণু বাস করে এবং উহারা বাতাস হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া মাটিতে সঞ্চয় করে, ইহাতে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বাড়ে ও জমির স্বাভাবিক অবস্থারও উন্নতি হয়; এবং সবুজ সারের জন্য শস্য ঘনভাবে জন্মায় বলিয়া জমিতে আগাছা, জঙ্গল প্রভৃতির জন্ম কম হয়। এই সকল শস্যের মধ্যে ধঞ্চে, শণ ও বরবটি প্রধান; সবুজ সারের জন্য এই সকল শস্য কখন বুনিতে হইবে তাহা যে ফসলের জন্য সবুজ সার দেওয়া হইবে তাহার বপনের সময়ের উপরই নির্ভর করে। গাছে যখন ফুল ধরে তখনই সবুজ সার লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়। মাস খানেকের মধ্যে উহা পচিয়া মূল্যবান সারে পরিণত হয়।

গোবর সারের অভাব পূরণ করিবার জন্য ঘাস, জঙ্গল, আগাছা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি দ্বারা সার প্রস্তুত করা এবং জমিতে সবুজ সার দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(ঘ) বোঁদ মাটি বা পাঁক

পুকুর, ডোবা, দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ের তলায় যে মাটির স্তর থাকে তাহাকে বোঁদ মাটি বা পাঁক মাটি বলে। এই মাটি তুলিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে ভাল রকম সারের কাজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে জলাশয়গুলিও গভীর হয়।

(ঙ) খইল সার

সাধারণ সারের মধ্যে খইল অন্যতম প্রধান সার। ইহাতে নাইট্রোজেনের (যবক্ষারজানের) পরিমাণ বেশী

থাকে। সরিষা, তিল, মসিনা, রেড়ী, চীনাবাদাম, কার্পাস বীজ, কুসুম ফুল প্রভৃতির খইল উৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে সরিষা, তিল ও চীনাবাদামের খইল গরু বলদকে প্রথমে খাওয়াইয়া উহাদের গোবর জমিতে সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। খইল সার গুঁড়া করিয়া বীজ বপনের ঠিক পূর্ব্বে বা অবস্থা-বিশেষে পরে মাটির উপরেই ছিটাইয়া বা মিশাইয়া দিতে হয়।

(চ) মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির বিষ্ঠা

গোময় অপেক্ষা অশ্ব-বিষ্ঠা অধিক কার্য্যকরী, গোময় ও অশ্ববিষ্ঠা একত্র মিশাইয়া জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে; আবার ছাগ, মেষ ইত্যাদির বিষ্ঠা গোময় ও অশ্ব-বিষ্ঠা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই কারণে অনেক স্থানে জমিতে ছাগ, মেষ ইত্যাদি চরাইবার প্রথা আছে। জমি যখন উহাদের বিষ্ঠায় ভরিয়া যায় তখন উহা লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি পক্ষীর বিষ্ঠাও ফসলের পক্ষে খুবই উপকারী; কিন্তু ইহাদের বিষ্ঠা অতিশয় উগ্র। সেই জন্য জলের সহিত মিশাইয়া জমিতে প্রয়োগ করা উচিত। পতঙ্গ-বিষ্ঠা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু ইহা সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। তবে যে অঞ্চলে রেশম চাষ হয়, সেই অঞ্চলে রেশম-কীটের বিষ্ঠা সংগ্রহ করা কঠিন নয়। মনুষ্য বিষ্ঠা একটি উৎকৃষ্ট সার।

(ছ) মৎস্য, রক্ত, চর্ম্ম, শৃঙ্গ, ক্ষুর, চুল প্রভৃতি—এই সকল পদার্থও সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই সকল দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য বলিয়া কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

(২) "বিশেষ সার"

"বিশেষ সারকে" চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে—যথা

(ক) যবক্ষারজান-প্রধান সার—ইহাতে যবক্ষার-জানের পরিমাণই বেশী থাকে; গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনের জন্য যবক্ষারজান বিশেষ প্রয়োজন; ইহা গাছের পাতাকে পুষ্ট ও সতেজ করে। গাছের রং হলদে হইলে বুঝিতে হইবে যে মাটিতে যবক্ষারজানের অভাব হইয়াছে, আবার মাটিতে যদি ইহা অধিক পরিমাণে থাকে গাছ খুবই সতেজ হইয়া উঠে—পাতা ও কাণ্ড দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায় ও পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু ফুল, ফল ধরে না। পাতার জন্য যে-সকল ফসলের চাষ হয় যেমন বাঁধাকপি, নানাবিধ শাক, পান, তামাক ইত্যাদি—সেই সকল ফসলের জন্য যবক্ষারজান-প্রধান সার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পটাসিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়ম নাইট্রেট, ক্যালসিয়ম সায়না মাইড, এমোনিয়ম সলফেট্ ইত্যাদি যবক্ষারজান-প্রধান সার।

(খ) প্রস্ফুরক-প্রধান সার—এই সার প্রয়োগ করিলে ফল, ফুল ও শিকড়ের পরিমাণ বাড়ে; ফল ও ফুল অধিক মিষ্ট হয়; ফসল শীঘ্রই পাকে; চারা গাছ খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। অস্থিচূর্ণ, বেসিক সুপার ফস্ফেট, সুপার ফসফেট অফ লাইম, বেসিক শ্লাগ ইত্যাদি প্রস্ফুরক-প্রধান সার। হাড়ের গুঁড়া একটি মূল্যবান সার; গ্রামের ভাগাড়ে ও অন্যান্য স্থানে যে-সকল হাড় পড়িয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া একটা গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া উহার উপর ঘনভাবে চূণ ছড়াইয়া দিলে মাস কয়েক পরে হাড়গুলি হাজিয়া যাইবে; তখন উহাদের ঢেঁকিতে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

(গ) পটাস-প্রধান সার—এই সার প্রয়োগ করিলে শস্যের শিকড় পুষ্ট হয়; গাছের খাদ্য প্রস্তুত ও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্যের চলাচলের জন্য এই সার বিশেষ উপকারী। সলফেট্ অফ পটাশ, কাইনাইট প্রভৃতি পটাস প্রধান সার।

(ঘ) চূণ প্রধান সার—মাটির মধ্যে উদ্ভিদের যে-সকল খাদ্য-উপাদান থাকে চূণ প্রয়োগ করিলে উহাদের কতক-গুলি শীঘ্র শীঘ্র তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপ-যোগী হয়; এই সার ফল ও ফুল সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী।

উপরোক্ত সারগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; কোন্ সার কখন কি পরিমাণ, কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা বিশেষভাবে জানিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বাংলার দুর্দ্দশা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি. এ. (ক্যাণ্টাব), বার-এট্-ল

বাংলায় এই যে দুর্দ্দিন এসেছে (যার তুলনা এ দেশের ইতিহাসে মেলা ভার) তার যে-সব আলোচনা রাজনীতিক এবং সাংবাদিকদের কাছে শুনতে পাই তাতে সত্যই আমার মনে নৈরাশ্য এসে দেখা দেয়। কোন্ ব্যক্তি, কোন্ দল, কোন্ মন্ত্রী অথবা কোন্ শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী এই সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের মধ্যেই

সে আলোচনা সীমাবদ্ধ। আমি ভাবি এ বিষয় যদি সত্য আবিষ্কারই হয়, তাতে আমাদের লাভ কি হবে? আর তা থেকে আমাদের দেশেরই বা কি স্থায়ী উপকার হবে?

আমার মনে হয় বর্ত্তমান পরিস্থিতির সব চেয়ে দুঃখ-জনক ব্যাপার এ নয় যে অনেকগুলি লোক অনশনে মারা যাচ্ছে, যদিও সেটা একান্ত পরিতাপের বিষয় বটে। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে (আর এ দুঃখ থেকে সত্যই মনে নৈরাশ্য আসে) এই ভীষণ দুর্দ্দিনেও হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায় একাত্মবোধের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারছে না। কোথাও এমন কিছু দেখলুম না যা থেকে মনে হ'ল বাংলার হিন্দু মুসলমান বাঙালী হিসাবে বর্ত্তমান দুঃখ নিবারণের এবং ভবিষ্যতের নব সৃষ্টির পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করেছে। তা যদি দেখতে পেতুম তাহলে ক্রন্দনের মধ্যেও আমার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠত। আর তা দেখতে পাই না বলেই দুর্গতদের সাহায্যের বিভিন্ন প্রচেষ্টা, রাজনীতিকদের উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা, কবি এবং সাহিত্যিকদের মসীধারার অজস্র প্রবাহ আমার মনে কোন আশা অথবা আনন্দের সঞ্চার করছে না। জাতির মধ্যে যখন একাত্মবোধের অনুভূতি জাগে তখন দুর্দ্দিনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের প্রতি কি মধুর ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দেয় তার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত আজকের (১০ই নভেম্বর, ১৯৪৩) কাগজেই দেখতে পেলুম। লিবানন-বাসীদের সঙ্গে ফরাসী শাসক-সম্প্রদায়ের তুমুল কলহ চলেছে। রক্তপাতও হচ্ছে। মুসলমান খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে লিবানন-বাসীরা ফরাসীদের বাধা দিচ্ছে আর তাদের কর্ম্মধারার প্রতিবাদ করছে। এ ব্যাপার নিয়ে বিশদ আলোচনা করবার উদ্দেশ্য আমার নাই। আমি কেবল একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে করছি। সংবাদদাতা বলছেন,

"Further incidents occurred when Moslem crowds proceeded to mosques for mid-day prayers. A crowd of Lebanese Christians helped Moslems to clear the way to the mosques and afterwards stood guard outside during prayers."

লিবাননের খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে যে সুমধুর ঐক্য এসেছে এই ক্ষুদ্র ঘটনা থেকে তা স্পষ্টই বুঝা যায়। শত দুর্দ্দশার মধ্যেও এ মিলন আশার দীপক বাজিয়ে তুলে। আমাদের মধ্যে এ মিলনের দৃশ্য কি সত্যই দুষ্প্রাপ্য নয়?

মোট কথা, বর্ত্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতি এই সত্যটিকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে যে, বাংলার হিন্দু-মুসলমান বাঙালী হিসাবে এখনও ভাবতে শেখে নি। আমার মনে হয়, যত দিন না আমরা বাঙালী হিসাবে ভাবতে শিখব, বাঙালী হিসাবে কাজ করতে শিখব, বাঙালী হিসাবে জীবন-সমস্যাকে দেখতে শিখব, আর বাঙালী হিসাবে সে সমস্যার সমাধান করতে শিখব, তত দিন আমাদের দুর্দ্দিনের অবসান হবে না, ততদিন আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ব্যাধির প্রকৃত প্রতিকার হবে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সমস্যাটির স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন আর তার সমাধানের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তার আদর্শ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

ধর্ম্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি নির্ব্বিশেষে বাংলার লোক নিজেদের বাঙালী হিসাবে ভাবতে শিখুক, আর তাদের সাধনাকে, কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে বাঙালী হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখুক, তার জন্য বাংলার বর্ত্তমান রাজনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক প্রভৃতিরা কি করেছেন বা করবার চেষ্টা করছেন? এ বিষয় কি তাঁদের মনে কোন স্পষ্ট পরিকল্পনা আছে? তাঁরা কি এ বিষয়ে কোন ধারাবাহিক কর্ম্মসূচীর সুনির্দ্দিষ্ট কোন সাধন পন্থার প্রয়োজন অনুভব করেছেন? এ বিষয় কি কোন জাতীয় মানসিকতা তাঁরা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন? এ সব নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলেই মনে গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়।

ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেদের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই। আর দোষ নাই কার? তবে তাদের একটা বড় গুণ আমি লক্ষ্য করেছি; তারা সত্যই Objective অথবা Realistic, বাংলা ভাষায় যাকে বলা যায় বাস্তবতাবাদী। বাস্তব জীবনের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে সেই পথে তাঁরা অগ্রসর হন যা থেকে লাভজনক কিম্বা সুবিধাজনক কিছু পাওয়া যেতে পারে। এই ইংলণ্ডের লোকেরা, প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল এবং তাঁর সহ-কর্ম্মীরা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সোভিয়েট রাশিয়ার বিষয়, লেনিন, ষ্টালিন, প্রভৃতি রুশ-রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিষয় কত কি না বলেছেন। আর আজ দেখুন কেমন করে তাঁরা সেই সোভিয়েটবাদীদের গলায় হাত দিয়ে সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছেন। Objective মূলক মানসিকতার এই হচ্ছে মঙ্গলময় ফল।

আমাদের মানসিকতা হচ্ছে কিন্তু একান্তভাবে Subjective বা ভাবমূলক। বাস্তব জীবনের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি না, ভাবের নির্দ্দেশেই চলি। ভাবের খেয়ালী ঢেউই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের জীবনের নৌকাকে পরিচালিত করে, কবে আওরঙ্গজেব আর শিবাজী ভারতের আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন! এখন রাজ্য আওরঙ্গজেবের বংশধরদের হাতেও নাই, আর শিবাজীর বংশধরদের

হাতেও নাই। ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে মোগল-মারাঠার শক্তি পরীক্ষার যে পুনরভিনয় হবে না সে কথা নিশ্চিন্ত রূপেই বলা যেতে পারে। অথচ আমরা এমনই ভাবপ্রবণ যে, আওরঙ্গজেব এবং শিবাজীকে নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের কলহ এবং তর্কাতর্কি এখনও চলেছে। সুদূর অতীতের দুই রাজনৈতিক খেলওয়াড়ের শক্তি পরীক্ষার স্মৃতি আমাদের বর্ত্তমানের জীবনকে বিষাক্ত, ব্যাহত ক'রে তুলছে।

বাংলা দেশকে, তথা ভারতবর্ষকে যদি আমরা দুঃপ-দুর্দ্দশার সুগভীর পঙ্ক থেকে শুষ্ক ভূমিতে তুলতে চাই তা হলে ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকদের মত আমাদেরও Realistic mentalityর সাহায্যে জীবন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

রাজনৈতিকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আপাততঃ বিশেষ কিছুর আশা করলে বিফলমনোরথ হতে হবে, কেননা, বর্ত্তমানের কোন্দলে তাঁরা এমন গভীর ভাবে মেতে গেছেন যে Objective ভাবে জীবন এবং রাজনৈতিক সমস্যাকে দেখা তাঁদের পক্ষে একরকম অসম্ভব বললেই চলে। তবে আমরা সকলেই কিছু পোলিটিসিয়ান নই। ধীর, স্থির ভাবে বাস্তব জীবনকে দেখবার, সেই জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করবার, আর সেই শিক্ষাকে সাহিত্যের সাহায্যে দশের কাছে পৌছে দেবার অবসর আমাদের অনেকের আছে। সেই অবসরের কি আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারি না? পোলিটিসিয়ানদের চেয়ে একটু গভীর ভাবে কি আমরা জীবন-সমস্যাকে দেখতে পারি না, আর সে সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিকদের মুষ্টি-যোগের চেয়ে মূল্যবান কিছু কি দেশকে আমরা দিতে পারি না?

বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে দেখতে পাই ভাবুক এবং সাহিত্যিকেরাই জাতীয় জীবনে প্রকৃত কর্ম্মপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হবে না। দেশ যদি কখনও জাগে, নূতন এবং স্থায়ী আদর্শ নিয়ে আমাদের দেশবাসী যদি কখনও জীবন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে সাহিত্যিক এবং ভাবুকদের প্রচেষ্টার ফলেই যে তা হবে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য 'প্রফেট' হবার দরকার নেই। আশা করি আমাদের ভাবুক এবং সাহিত্যিকেরা তাঁদের সুমহান দায়িত্বের বিষয়ে যথোচিত ভাবে সজাগ হবেন। যে কাজ পোলিটিসিয়ানরা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন সে-কাজের ভার ভাবুক এবং সাহিত্যিকদের নিতে হবে। জীবন-মন্ত্রের এবং জীবন-দর্শনের আলোচনার ভার তাঁরা যদি 'প্লাটফরম্ স্পীকারদের' হাতে ছেড়ে দেন তাহলে তাঁদের জ্ঞান-সাধনা যে সার্থক হয়েছে একথা বলবার অধিকার তাঁদের এবং তাঁদের প্রসূতি ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের থাকবে না।

শিখ

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

শিখ ধর্ম্ম ও শিখ জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালী সমাজের ঔদাসীন্য সত্যই বিস্ময়কর। বাঙ্গালী রাজপুতের বীরত্বগাথা কীর্ত্তন করিয়াছে, শিবাজীর জয়ধ্বনি করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালীর কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে শিখের স্থান নাই। রবীন্দ্রনাথের 'বন্দীবীর' নামক কবিতা সময় সময় বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু একথা আমাদিগকে লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিখ জাতির অবদান সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। টডের 'রাজস্থান' বহু দিন বাঙ্গালীর মানসিক উত্তেজনার খোরাক জোগাইয়াছে, কিন্তু কানিংহামের 'শিখদের ইতিহাস' সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে সুপরিচিত নয়, মেকলিফের 'শিখ ধর্ম্ম' বিষয়ক সুবৃহৎ গ্রন্থ কয়জন বাঙ্গালী পড়িয়াছেন জানি না। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু দিন যাবৎ শিখ জাতির ইতিহাস অধ্যাপনার বিশেষ বন্দোবস্ত রহিয়াছে, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন বাঙ্গালী অধ্যাপক এই বিষয়ে তিন খানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।* আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় ন্যূনাধিক দুই শত বাঙ্গালী ছাত্র শিখ জাতির ইতিহাস বিশেষভাবে পঠনীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া ইতিহাসে এম-এ ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা বাঙ্গালী

* ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ***Evolution of the Khalsa*** নামক গ্রন্থের লেখক। ডক্টর নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ***Rise of the Sikh Power*** এবং ***Ranjit Singh*** নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

সমাজের সহিত শিখ জাতির ঐতিহ্যের সংযোগ সাধনে সহায়তা করেন নাই। বহু বাঙ্গালী বিভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে দীর্ঘকাল পঞ্জাবে বসবাস করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই শিখ ধর্ম্ম বা শিখ জাতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কানিংহাম ও মেকলিফ বিদেশী হইয়াও শিখ জাতিকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা বহু পরিশ্রমে এই জাতির মর্ম্মোদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আমরা অদ্যাপি ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের মজ্জাগত ঔদাসীন্য ত্যাগ করিতে পারি নাই।

অথচ এই ঔদাসীন্য আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। যে-যুগে রাজপুতের বীরত্ব বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন উন্মাদনা সৃষ্টি করিতেছিল, যে-যুগে রঙ্গলাল গাহিতেছিলেন, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়?" সেই যুগেই শিখ জাতি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর অভিশাপে ইংরেজের পদতলে অবলুণ্ঠিত হইয়াছিল। হল্‌দীঘাটে রাজপুতের আত্মোৎসর্গ রঙ্গলালের যুগে অতীতের স্মৃতি মাত্র; মুদকী, ফিরোজশা, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁ ক্ষেত্রে শিখ সৈন্যের আত্মবলিদান সেকালের বাঙ্গালীর পক্ষে সমসাময়িক ঘটনা। আমাদের মত ভাবপ্রবণ জাতির দৃষ্টি সাধারণতঃ পরিচিতকে অতিক্রম করিয়া অপরিচিতের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সমসাময়িক ঘটনার প্রখর দীপ্তি অপেক্ষা অতীতের রহস্যাবৃত কুহেলিকা আমাদের শিথিল দেহে অধিকতর উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বোধ হয় এই কারণেই দাম্ভিক ডালহৌসীর বিরুদ্ধে আত্মবলিদানে দৃঢ়সঙ্কল্প শিখ জাতি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

হয়ত আর একটি কারণও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালীর নবজাগ্রত জাতীয়তা-বোধ সিপাহী যুদ্ধের কালে শিখ জাতির ইংরেজ ভক্তি সমর্থন করিতে পারেনাই। পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে-না-হইতেই শিখ জাতির মনে এক আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল। স্বাধীনতা হারাইয়া মারাঠা জাতি নিস্তেজ হয় নাই, দেহ ইংরেজের বশীভূত হইলেও মন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত স্বাধীন ছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিখ জাতির মানসিক শক্তি বিলুপ্ত হইল, মনে প্রাণে ইংরেজের দাসত্ব স্বীকার করিয়া গুরু-গোবিন্দের খাল্‌সাবাহিনী সিপাহী বিদ্রোহ দমনে রাজশক্তির সহায়তা করিল। বাঙ্গালীর মনে তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন রূপ গ্রহণ করিতেছিল, তাই জাতীয় আদর্শের প্রতি শিখদের এই বিশ্বাসঘাতকতা বাঙ্গালী ক্ষমা করিতে পারে নাই।

গুরু নানকের জীবিতকালে বোধ হয় কেহই মনে করে নাই যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কালক্রমে এক নূতন সমাজের সৃষ্টি করিবে। ধর্ম্মপ্রচারকের অভ্যুত্থান ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন কথা নহে। ধর্ম্মপ্রচারকের তিরোভাবের পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য-বিলোপ—ভারতীয় হিন্দুর দৃষ্টিতে ইহাই নবধর্ম্ম স্থাপনের স্বাভাবিক পরিণাম। রামানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় বহুধাবিভক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়াছিল। কবীরের মৃত্যুর পর কবীরপন্থীরা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়রূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। নানকের মৃত্যুর পর নানকপন্থীদের ভাগ্যেও অনুরূপ আত্মবিলোপ ঘটিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু নানকের একটি কার্য্যের ফলে এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নানক মৃত্যুর পূর্ব্বে একান্ত অনুগত শিষ্য অঙ্গদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। ফলে শিখধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতার তিরোভাবের পরেও শিখ-সম্প্রদায়ের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ নেতৃহীন হইল, রামানন্দের মৃত্যুর পর রামানন্দী সম্প্রদায় ঐক্য হারাইল, কবীরের মৃত্যুর পর কবীরপন্থীরা দ্বাদশটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইল, কিন্তু নানকের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে নয় জন গুরু দীর্ঘকাল শিখ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

ঐক্য রক্ষার অন্যান্য উপায় ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষের কল্যাণে (?) 'লঙ্গর' শব্দটি আজ বাঙ্গালীর কাছে সুপরিচিত। শিখ সমাজেই লঙ্গরের উৎপত্তি। যে-সকল শিখ গুরুর দর্শনার্থী হইয়া গুরুর আবাসে উপস্থিত হইত তাহাদের ভোজ্য ও পানীয় লঙ্গর হইতে দেওয়া হইত। সময় সময় দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় নরনারী লঙ্গর হইতে আহার্য্য পাইত। লঙ্গরে জাতি-ভেদের বিধিনিষেধ পালিত হইত না। যিনি জাতিগৌরব বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য লঙ্গরে খাদ্যগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইতেন তিনি শিখগুরুর দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিতেন। জাতিভেদ প্রথার বিলোপ করিয়া সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবার পক্ষে লঙ্গর কম সাহায্য করে নাই।

গুরুর ভরণপোষণ এবং লঙ্গরের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শিখেরা স্বেচ্ছাক্রমে যে উপহার দিত তাহা সংগ্রহের জন্য

নানকের মৃত্যুর কিছুকাল পরে 'মসন্দ' নামে পরিচিত কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। রাজকর্ম্মচারিগণ যেভাবে প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করে, মসন্দগণও অনেকটা সেভাবেই শিখদের নিকট হইতে গুরুর জন্য উপহার সংগ্রহ করিত। শিখদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুর আয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গুরু অর্জ্জুন রাজোচিত জাঁকজমক সহকারে দরবারে বসিতেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি এত দূর প্রসারিত হইয়াছিল যে লাহোরের বাদশাহী দেওয়ান তাঁহার পুত্রের নিকট কন্যাদানের জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শিখেরা গুরুকে বলিত 'সাচ্চা পাদশাহ'। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেই শিখ সম্প্রদায় যেন গুরুর নেতৃত্বে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল।

রামানন্দী সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল না, কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের পক্ষেও কবীরের রচিত দোঁহা ব্যতীত অন্য কোন অবলম্বন ছিল না। এই দুইটি সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবিলোপের ইহাও অন্যতম কারণ। নিজস্ব ধর্ম্মগ্রন্থ না থাকিলে কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই স্বাতন্ত্র্যরক্ষা সম্ভব হয় না। গুরু অর্জ্জুন 'আদিগ্রন্থ' সঙ্কলন করাইয়া শিখ সম্প্রদায়ের এই গুরুতর অভাব দূর করেন। পরবর্ত্তী কালে গুরু গোবিন্দ সিংহ যখন গুরু নিয়োগের প্রথা রহিত করেন তখন আদিগ্রন্থই শিখ সম্প্রদায়ের গুরুর স্থান অধিকার করে।

বাহিরের সংঘাত ব্যতীত কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের ঐক্য পরিপূর্ণ ও সার্থক হয় না। শিখ সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্য মুঘলের অত্যাচারে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইল। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর গুরু অর্জ্জুনের প্রাণদণ্ড করিলেন, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীবের আদেশে গুরু তেগবাহাদুর নিহত হইলেন। গুরু অর্জ্জুনের পুত্র গুরু হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীরের আদেশে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। ঔরংজীব গুরু হরকিষণের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বশীভূত করিয়া শিখ সম্প্রদায়কে নিজের আয়ত্তাধীন করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল সাম্রাজ্যের খরদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিখ সম্প্রদায় সামরিক দীক্ষা গ্রহণ করিল, মুঘলের দূরদৃষ্টির অভাবে অপ্রতিহতশক্তি খালসাবাহিনী জন্মগ্রহণ করিল।

সপ্তদশ শতাব্দী শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষে নিদারুণ সঙ্কটের কাল। এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই গুরু অর্জ্জুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দ নাবালক। এই নাবালক গুরুও জাহাঙ্গীরের রোষে দীর্ঘকাল গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ রহিলেন। মুক্তিলাভের পর সম্রাট্ শাহজাহানের সহিত তাঁহার প্রকাশ্য যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অন্য যে-কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় বোধ হয় অর্জ্জুনের ন্যায় গুরুর নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত, রাজরোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশাল হিন্দু সমাজে নিজের স্বাতন্ত্র্য নিমজ্জিত করিত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতেই শিখ সম্প্রদায় এতখানি মানসিক বলের অধিকারী হইয়াছিল যে অর্জ্জুনের মৃত্যু এবং হরগোবিন্দের দীর্ঘ কারাবাস ইহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিল না, নেতৃহীন হইয়াও এই সম্প্রদায় স্বধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিল। শিখ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রথম পরিচয় এখানে পাওয়া গেল।

হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পৌত্র হর রায়, এবং হর রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র হরকিষণ গুরুর পদে অভিষিক্ত হন। নাবালক গুরুর পক্ষে শিখ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মজীবন যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু শিখগুরুর পক্ষে শিষ্যগণের ধর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রণই একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল না, রাজশক্তির রোষ হইতে সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার গুরু দায়িত্বও তাঁহাকেই পালন করিতে হইত। নাবালক গুরুর পক্ষে শাহজাহান এবং ঔরংজীবের সহিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জয়লাভ করা কল্পনাতীত ছিল। তথাপি শিখ সম্প্রদায় আত্মরক্ষায় অকৃতকার্য্য হয় নাই। গুরু সমগ্র সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতীক রহিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ গুরুর পরিচালনা হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্প্রদায় নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইতে শিখিল। এই শিক্ষাই জাতীয় জীবনের চরম শিক্ষা, ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল-পাঠানের আক্রমণ হইতে শিখের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল।

ঔরংজীবের আদেশে কৈফিয়ৎ দানের জন্য বাদশাহী দরবারে উপস্থিত হইয়া নাবালক গুরু হরকিষণ অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দুর্ঘটনার পর গুরু-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শিখ সম্প্রদায়ে মতভেদের উৎপত্তি হয়। কিছুকাল পরে হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগবাহাদুর গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও পূর্ব্ববর্ত্তী নাবালক গুরুদের ন্যায় নামে মাত্র গুরু ছিলেন, শিখ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মজীবন পরিচালনা এবং রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা করিবার সুযোগ তিনি পান নাই। গদীলাভের কিছুকাল পরেই নানা কারণে তিনি পঞ্জাব পরিত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল যুক্তপ্রদেশে, বিহারে, বাংলায় ও আসামে ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবে প্রত্যাগমনের অল্প দিন পরেই তিনি ঔরংজীবের আদেশে প্রাণ-

ণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী গোবিন্দ রায় নাবালক। তেগবাহাদুরের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ পরে গোবিন্দ রায় প্রকাশ্যভাবে শিখ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গুরু অর্জ্জুনের মৃত্যু (১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বগ্রহণ (আনুমানিক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল শিখ সম্প্রদায় কার্য্যতঃ নেতৃহীন ছিল।* এই দীর্ঘকালের মধ্যে শিখ সম্প্রদায়কে বারংবার মুঘলের রোষবহ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাতে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, বরং ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে শিখগণ ভবিষ্যতের মহাসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিখ-সম্প্রদায়ের শক্তি সঞ্চয়ের গুরুত্ব অদ্যাপি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, কিন্তু আমার মনে হয় এই যুগেই শিখগণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া আত্মোপলব্ধির যথার্থ পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিল।

অদ্যাপি কোন ঐতিহাসিক অদ্ভুতকর্ম্মা গুরু গোবিন্দের কার্য্যাবলীর প্রকৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখা করেন নাই। এই জন্যেই ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁহার স্থান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি অস্পষ্ট। শিখসম্প্রদায়কে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-দান তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য্য। এত দিন পর্য্যন্ত শিখেরা বিবাহাদি সামাজিক আচার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি আংশিক ভাবে মানিয়া চলিত। গুরু গোবিন্দের আদেশে হিন্দু সমাজের সহিত শিখ-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে এবং হিন্দুদের সামাজিক রীতি-নীতি শিখ সমাজ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। হিন্দু সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে এই বিচ্ছেদ সমাজ-বিপ্লবের একটি অবাঞ্ছনীয় পরিণতি মাত্র, কিন্তু শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এইরূপ বিচ্ছেদের প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিপূর্ণতা লাভ না করিলে কোন সম্প্রদায় আত্মোপলব্ধির সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌছিতে পারে না। গুরু গোবিন্দের সংস্কারের ফলে হিন্দু সমাজের সহিত শিখ সমাজের নাড়ীর টান অক্ষুণ্ণ রহিল, কিন্তু দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের মত শিখ সমাজ পিতৃকুল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজস্ব সংসার প্রতিষ্ঠিত করিল।

গুরু গোবিন্দের অপর কীর্ত্তি শিখ সম্প্রদায়কে ব্যাপক-ভাবে সামরিক শিক্ষা দান। অর্জ্জুনের সময়ে না হউক, হরগোবিন্দের সময়ে যে শিখেরা সামরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক-গণ বলেন যে মুঘলের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজনেই সামরিক দীক্ষার উৎপত্তি হইয়াছিল। যাহা হউক, হরগোবিন্দের সময়েই শিখদের সহিত মুঘলবাহিনীর প্রকাশ্য সামরিক সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্য তখন শক্তি ও সৌভাগ্যের উচ্চতম স্তরে সমাসীন; এই সাম্রাজ্যের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইবার সাহস ক্ষুদ্র শিখ সম্প্রদায়ের ছিল না। তাই গুরু গোবিন্দের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে মুঘল-শিখ-সংঘর্ষের আর কোন উদাহরণ পাই না। কিন্তু শিখ সম্প্রদায় যে সামরিক দীক্ষার প্রভাব হইতে বিমুক্ত হয় নাই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গুরু তেগ বাহাদুর মুঘলবাহিনীর পক্ষে আহোমরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লুঠতরাজ করিতেন, এরূপ ইঙ্গিতও কোন কোন শিখ গ্রন্থে এবং মুসলমান-রচিত ইতিহাসে পাওয়া যায়। মোটের উপর তেগ বাহাদুর যে আধ্যাত্মিক-তার সহিত সামরিক প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গুরু গোবিন্দের চরিত্রে এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

গুরু গোবিন্দের সময়ে শিখ-সম্প্রদায় সামরিক শক্তি বিকাশের অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্য তখন পতনোন্মুখ; সমগ্র উত্তর-ভারতে শিথিলায়মান রাজ-শক্তি মাৎসন্যায়ের পূর্ব্বাভাস সূচনা করিতেছে। সম্রাট্ ঔরংজীব তখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠা-দমনে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, উত্তর-ভারতের শাসনকার্য্য পরি-চালনার অবসর তাঁহার ছিল না। বৃদ্ধ সম্রাটের জীবনী-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বার্দ্ধক্যজীর্ণ সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতেছিল। আমাদের জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে গুরু গোবিন্দ তরবারি হস্তে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু এই তরবারি কেবলমাত্র ম্লেচ্ছনিধনে নিয়োজিত হয় নাই। পঞ্জাবের পার্ব্বত্য অঞ্চলে শক্তির উপাসক রাজপুতবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বাস। হিন্দু সমাজ হইতে শিখ সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ তাহাদের মনঃপূত হয় নাই। সম্ভবতঃ শিখদের সামরিক সংগঠন তাহাদের আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, তাহাদের সহিত গুরু গোবিন্দের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ চলিয়াছিল। এই সংঘর্ষ পরে 'মুঘল শিখের রণে' পরিণত হয়, কারণ পার্ব্বত্য রাজগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বাদশাহী ফৌজের সাহায্য লইয়াছিলেন। শিখের বিরুদ্ধে

* অবশ্য হরগোবিন্দের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর এবং হররায়ের গুরুপ্রাপ্তির পর কয়েক বৎসর সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযুজ্য নহে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি প্রয়োগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা।

গুরু গোবিন্দের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর গুরুর পদ বিলুপ্ত হইয়া যায়, আদিগ্রন্থ গুরুর স্থান অধিকার করে। এই সময় হইতে সমগ্র সম্প্রদায় নেতৃত্বের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনভাবে আপনার গতিপথ নির্দ্ধারণ করিতে থাকে। গণতন্ত্রের এই অপূর্ব্ব বিকাশ শিখ জাতির ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় ঘটনা। নায়কবিহীন গণতন্ত্রের উদাহরণ ইতিহাসে আর নাই। প্রাচীন গ্রীসে এথেনীয় গণতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগে উহার অধিনায়ক ছিলেন পেরিক্লেস। রোমের গণতন্ত্র সিনেট সভার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। আধুনিক কালের গণতন্ত্রে রুজভেল্ট, চার্চ্চিল প্রভৃতির ন্যায় নায়কের প্রয়োজন হয়। জনশক্তি প্রয়োজনমত নায়ক পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু নায়ক না থাকিলে আত্মপরিচালনা করিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে জনশক্তির ব্যাপকতম ও গভীরতম প্রকাশ ঘটিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ায়, কিন্তু সেখানেও ষ্টালিনের উপস্থিতি অপরিহার্য্য। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখেরা সম্পূর্ণ নায়কবিহীন গণতন্ত্র গঠন করিয়াছিল। প্রতি বৎসরে এক বার মাত্র 'সরবৎ খালসা' নামক সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া শিখগণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিত। তাহারা কোন ব্যক্তিবিশেষের নির্দ্দেশ মান্য করিত না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে চলিতে পারিত। কিন্তু কেহই এই অবাধ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নাই। যখন ভারতের অন্যান্য জাতি আত্মকলহে দুর্ব্বল তখন নেতৃহীন শিখজাতি অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের ইহাই সফলতম পরিণতি। শিখ জাতি দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় কতখানি শক্তির অধিকারী হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ গুরু গোবিন্দ গুরুর পদ বিলুপ্ত করিয়া একনায়কত্বের অবসান করিয়াছিলেন।

নেতৃবিহীন শিখ জাতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনযুদ্ধের একটি অপূর্ব্ব উদাহরণ দেখাইয়াছিল। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ উপলক্ষে কিছুদিন যাবৎ বাংলা ভাষায় 'জনযুদ্ধ' শব্দটি প্রচলিত হইয়াছে। শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি তাহা বোধ হয় অনেকেই অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। অনেক সময় ইহা 'গেরিলা' যুদ্ধের সমার্থক শব্দরূপে প্রযুক্ত হইতেছে, কিন্তু এরূপ প্রয়োগ বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। 'গেরিলা' যুদ্ধ রণনীতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ; প্রধানতঃ বেতনভোগী সৈন্য দ্বারাই ইহা পরিচালিত হয়। যখন উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সহিত সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব হয় না, যখন শত্রু জনবলে, অস্ত্রবলে বা রণকৌশলে এত শ্রেষ্ঠ যে তাহাকে সম্মুখ যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত করিবার সম্ভাবনা থাকে না, তখনই 'গেরিলা' যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। যে সৈন্যদল সুযোগ পাইলে সম্মুখযুদ্ধে শত্রু-বিনাশের চেষ্টা করিত তাহারাই অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইয়া 'গেরিলা' নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। দেশের জনসাধারণ 'গেরিলা' যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু জনসাধারণের সামরিক সহযোগিতা 'গেরিলা' যুদ্ধের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। সাধারণতঃ আক্রান্ত পক্ষই 'গেরিলা' নীতি গ্রহণ করে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে আক্রমণকারীও সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া শত্রুর শক্তিক্ষয় করিবার চেষ্টা করিতে পারে। জনযুদ্ধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্বাধীনতা লাভের জন্য অথবা লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দেশের জনসাধারণের যে সংগ্রাম তাহাই যথার্থ জনযুদ্ধ। অতএব জনযুদ্ধ সর্ব্বদাই আক্রান্ত পক্ষের অস্ত্র, আক্রমণকারীর পক্ষে এই অস্ত্র প্রয়োগের সুযোগ নাই। বেতনভোগী সৈন্যদল জনযুদ্ধে যোগদান করিতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনযুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য তাহাদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু জনযুদ্ধের প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা একান্তভাবে জনগণেরই যুদ্ধ। কোন কোন সময়ে জনযুদ্ধ এমন একনায়কের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় যিনি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক, জাতির স্বপ্নের শরীরী বিকাশ। আবার অবস্থাভেদে জনযুদ্ধের এমন কোন নেতা থাকেন না, জনসাধারণ নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামে আত্মবলিদান করে, দেশের মাটি হইতে যে-শক্তির উৎপত্তি হয় তাহাই ক্রমাগত সংঘর্ষে দীপ্যমান ও ক্ষুরধার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শত্রুর বিনাশ সাধন করে। নেতৃহীন জনযুদ্ধই জনযুদ্ধের চরম রূপ। যে-জাতি জাতীয় সংগ্রামের এই চরম রূপের মধ্য দিয়া জাতীয় অধিকার লাভ করে তাহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। শিখ জাতির ইতিহাসে আমরা এই শোণিতসিক্ত ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তি প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত শিখের শত্রু ছিল মুঘল, তার পর আসিল পাঠান। ঔরংজীবের দুর্ব্বল বংশধরগণ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও রাজধানীর নিকটবর্ত্তী পঞ্জাব হস্তচ্যুত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুঘল-প্রতিনিধি জ্যাকারিয়া খাঁ প্রায় কুড়ি বৎসর কঠোর হস্তে পঞ্জাব শাসন করিয়া শিখ দমনে

আংশিকভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, প্রত্যহ প্রভাতে কয়েকজন শিখের ছিন্ন মুণ্ড দর্শন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। এই বীভৎস নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বহু শিখ কেশ বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দু সমাজে আত্মগোপন করিয়াছিল, কিন্তু শিখ জাতি সমগ্রভাবে অত্যাচারীর নিকট মস্তক অবনত করে নাই। জ্যাকারিয়া খাঁর মৃত্যুর পর পঞ্জাবে বাদশাহী অধিকার বিলুপ্ত হইল, আফগানিস্থানের অধিপতি আহম্মদ শাহ্ আবদালী স্বরাজ্যের সংলগ্ন এই প্রদেশটি কাড়িয়া লইলেন। বিশ বৎসরের মধ্যে নয় বার তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন; পঞ্জাবই তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এই দুর্দ্ধর্ষ পাঠান দলপতি পাণিপথক্ষেত্রে ভারত-বিজয়ী মারাঠাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শিখদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবিত কালেই শিখেরা পঞ্জাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করিয়াছিল।

দীর্ঘ এক শতাব্দী কাল শিখ জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল। মুঘল সম্রাট্-গণের দুর্ব্বলতার ফলে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত (পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর) আফগানি-স্থানের সহিত সংযুক্ত হইয়া আবদালী বংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। মারাঠারা একবার আহম্মদ শাহ্ আবদালীর সৈন্যদল বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু আহম্মদ শাহ্ অল্পদিনের মধ্যেই পঞ্জাবে স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর মারাঠারা আর পঞ্জাবের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে নাই। এই সময় হইতেই পঞ্জাবে শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর ও বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন। ইংরেজদের নিকট বাধা না পাইলে সিন্ধুদেশও তিনি অধিকার করিতেন। রণজিৎ সিংহের সময়ে সিন্ধু দেশের মুসলমান আমীরগণ নামে কাবুলাধিপতির আনুগত্য স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়াছিলেন। সুতরাং আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, শিখদের দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফলেই উত্তর-পশ্চিম ভারত কাবুল-রাজের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। শিখ-শক্তির অভ্যুত্থান না হইলে এক শতাব্দী কাল উত্তর-পশ্চিম ভারত কাবুল-রাজের অধীন থাকিত, কারণ অযোধ্যারাজ্য অধিকারের পূর্ব্বে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পঞ্জাব জয়ের চেষ্টা করিত বলিয়া মনে হয় না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহিত আফগানিস্থানের যে যোগসূত্র স্থাপিত হইত তাহা ইংরেজেরা ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইত কিনা সন্দেহ, অগ্রসর হইলেও এই প্রচেষ্টায় তাহারা কতখানি সাফল্যলাভ করিত তাহা বলা কঠিন। বর্ত্তমানে যাহারা উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহারা আবদালী-বংশের কৃতিত্ব পুনরুদ্ধারের জন্যই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। শিখদের কৃতিত্বের ফলেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সেই মারাত্মক অঙ্গচ্ছেদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

আবদালী-বংশের সহিত সংগ্রাম উপলক্ষে শিখ জাতি কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়াছিল। এই দলগুলি ইতিহাসে 'দ্বাদশ মিসিল' নামে পরিচিত। এই দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই গণতন্ত্রের আদর্শ বিলুপ্ত হইতে থাকে, দলপতিগণ ক্রমশঃ স্বাধীন রাজার ন্যায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনে অভ্যস্ত হন। এই দুর্লক্ষণ সমসাময়িক ইংরেজ পর্য্যবেক্ষকগণের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই; গণতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপরে শিখেরা শীঘ্রই রাজশক্তি গঠন করিবে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহের অসাধারণ প্রতিভা এই অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিল। যে-শিখ জাতি নেতৃহীন অবস্থায় আহম্মদ শাহ্ আবদালীকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, একনায়কত্বের মন্দিরদ্বারে অকালে তাহার বলিদানের ব্যবস্থা হইল।

রণজিৎ সিংহের সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই শিখ জাতি অবনতির নিম্নতম স্তরে উপনীত হইয়াছিল। প্রাণহীন ধর্ম্ম জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছিল। সাফল্য-গৌরবে বিভ্রান্ত হইয়া শিখ জাতি সাফল্যের মূল কারণ সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। শিখ রাষ্ট্রে রাজস্ব বিভাগের ভার পাইল হিন্দু, কূটনৈতিক পরামর্শদাতার পদ পাইল মুসলমান। যুদ্ধক্ষেত্রেও শিখের একাধিপত্য রহিল না, পাশ্চাত্য দেশের ভাগ্যান্বেষীরা মারাঠাদের পতনের পর লাহোর-দরবারে শেষ আশ্রয় পাইল। শিখ জাতি রাজ্য-শাসনে আপনার অক্ষমতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধ্বংস—রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর দশ বৎসরের মধ্যে শিখ রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। যে-শিখ জাতি নেতৃহীন হইয়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীন রাজ্য গঠন করিয়াছিল তাহার পক্ষে রণজিৎ সিংহের পরিচালনা ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীতে আত্মরক্ষা করাও সম্ভব হইল না।

বিজ্ঞাপন

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

বিজ্ঞাপন—'বিজ্ঞাপন' নয়; অর্থাৎ বিজ্ঞাপন নামক এই প্রবন্ধটি কেহ যেন কোনও কিছুর 'বিজ্ঞাপন' বলিয়া ভুল না করেন।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই এই সতর্ক-বাণীর তাৎপর্য্য এই যে, 'বিজ্ঞাপনে' আমাদের অরুচি ধরিয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে, ট্রামে, বাসে—যেখানেই যাও, দেখিবে বিজ্ঞাপন।

ছোট মেয়েটির অসুখ। হন্ হন্ করিয়া ফুটপাথ ধরিয়া ছুটিয়াছি, আর একটু দেরী হইলে হয়ত ডাক্তারকে পাওয়া যাইবে না—এদিকে আপিসেরও বেলা হইতেছে! ঠিক এমনি সময়ে হাতের মধ্যে কে একজন একটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম, রূপালী পর্দ্দার অমুক তারকার সহিত কুমারী অমুক অমুক মেঘ-মন্দার ছন্দে শিখী-নৃত্য দেখাইবেন তাহারই বিজ্ঞাপন! অথবা ধরিয়া লউন, বিশেষ কোনও ব্যক্তির সহিত আপনার উটরাম ঘাট হইতে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে যাইবার কথা। আপনারা যথাসময়ে সুসজ্জিত হইয়া এসপ্লানেডের ওখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন—অমনি কে একজন আপনাদের হাতের মধ্যে একখানি কাগজ গুঁজিয়া দিয়া গেল। আপনারা পড়িয়া দেখিলেন, 'সু-সংবাদ! সু-সংবাদ!!' আপনার কি কুষ্ঠরোগ হইয়াছে? এই ভাবে কত না বিজ্ঞাপন নিত্য আমাদের চক্ষু ও মনের পীড়াদায়ক হয়! ছাপার অক্ষরে 'বিজ্ঞাপন' কথাটির উপর এই জন্য আমাদের বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছে।

আসল কথা, উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনগুলি এতই একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে যে, ওগুলি দেখিলেই আমাদের নাসিকা কুঞ্চন করিতে ইচ্ছা হয়! বিজ্ঞাপনে আমাদের বিতৃষ্ণা নাই, অরুচি হইয়াছে আমাদের অপটু হস্তের একঘেয়ে বিজ্ঞাপনে।

বিতৃষ্ণা নাই, তাহার প্রমাণ—বিদেশী কোনও বিজ্ঞাপনের ভাল বই। এইরূপ একখানি বই পাইলে বৃদ্ধেরাও বসিয়া বসিয়া পাতা উল্টাইয়া থাকেন। ছেলেরাও গল্পের বই ফেলিয়া বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে!

ব্যবসায় হিসাবে বিজ্ঞাপন জিনিসটা আমাদের দেশে বহুকাল অনাদৃতই ছিল। তাই বলিয়া বিজ্ঞাপন কিছু আধুনিক আবিষ্কারও নয়;—মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা চিরকালই আছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে শাঁখ বাজে, হুলুধ্বনি পড়ে। ইহা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান; কিন্তু সেই সঙ্গে লোককে সংবাদটি বিজ্ঞাপিত করাও ঐ সব অনুষ্ঠানের পরোক্ষ উদ্দেশ্য। এইরূপে বিবাহের শোভাযাত্রা, অন্নপ্রাশন বা উপনয়নের অনুষ্ঠান-গুলির মধ্যে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের অনুশাসন যতই থাকুক, উহা যে আত্ম-প্রকাশেরই নামান্তর সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে দেশে সংবাদপত্র ছিল না। ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তখন কোনও বিশেষ সংবাদ সাধারণকে জানান হইত। পাড়াগাঁ অঞ্চলে হাটে টিন পিটাইয়া জলাশয়-বিশেষে 'পোলো' নামাইবার সংবাদ অথবা ঘোড়দৌড় বা নৌকা-বাচ প্রভৃতির সংবাদ বিজ্ঞাপিত করার প্রথা প্রচলিত আছে।

বর্ত্তমানে দেশে অনেকগুলি দৈনিক ও মাসিকের প্রচলন থাকায় বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে; সুতরাং আজকাল বিজ্ঞাপনের 'এজেন্ট'-হওয়া ব্যবসায় জীবিকার্জ্জনের অন্যতম লাভজনক শিষ্ট পন্থা। এখন সকলেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্যবসায়ের যত শ্রীবৃদ্ধি হয় অন্য আর কিছুতেই তেমন হয় না। এই জন্য ইহাকে 'heart and soul at all business' বলা হইয়াছে। অনেক প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-এজেন্টই তাঁহাদের ব্যবসায়ীকে ধনবান্ করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক বিজ্ঞাপন প্রচারের মধ্যে যে কলাকৌশল এবং পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োজন তাহা অনায়াস-লভ্য নয়। বিক্রেতা হিসাবেও বিজ্ঞাপনের স্থান উচ্চে। দোকানের বিক্রেতার নিকট যখন ক্রেতা আসিবে তখনই সে তাহার সহিত জিনিসটি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞাপন নিজে গিয়া ডাকিয়া আনে ক্রেতার দল। তাহাদের প্রলুব্ধ করে, জিনিসের প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার কথা বুঝাইয়া দেয় এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্যব-সায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে-কোনও স্থানে যেভাবে হউক একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়া দিলেই যে হুড় হুড় করিয়া খরিদ্দার আসিয়া জুটিবে এমন নয়। ব্যবসায়ের গতি, পণ্যবস্তু সম্বন্ধে জনসাধারণের মত, রুচি এবং অভিজ্ঞতার উপর বিজ্ঞাপনের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। এই জন্য বিজ্ঞাপন আর্ট এবং সায়েন্স দুই-ই। বিজ্ঞাপন ইচ্ছামত এবং সুবিধামত যেখানে সেখানে প্রকাশ করিলে

কোনও ফল হইবে না—এমন কি তাহাতে পণ্য জিনিসের উপর সাধারণের শ্রদ্ধা নষ্ট হইতে পারে। পর্য্যবেক্ষণ (observation), পরীক্ষা (experiment) প্রভৃতির পর সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে এবং কোনও সমাদৃত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন লিখিবার মধ্যে কলা-কৌশলও যথেষ্ট চাই। মনে রাখা প্রয়োজন, কেবলমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলেই বিজ্ঞাপন ভাল লেখা যায় না—চারিদিকের হাবভাব, হুজুক, ফ্যাশান প্রভৃতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এককথায়, বিজ্ঞাপন যিনি লিখিবেন তাঁহার 'অলরাউণ্ড ম্যান' হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজকাল আবার কেহ কেহ কাজ না পাইয়া নিজেদের বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট বলিয়া প্রচার করেন! ইহাদের অনেকের না আছে তেমন শিক্ষা না আছে বিশেষ অনুসন্ধিৎসা। তাঁহারা ভুলিয়া যান, প্রকৃত কার্য্যক্ষম এজেণ্টকে শিক্ষা এবং মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন হইতে হইবে। মনুষ্য-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা না থাকিলে কোন এজেণ্টই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

বিজ্ঞাপন মাত্রেই আবার এক শ্রেণীভুক্ত নয়। বিভিন্ন জিনিসের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনের ভাষা (style) পণ্য জিনিসের রকমারির উপর নির্ভর করে। তথাপি বিজ্ঞাপনকে আমরা সাধারণভাবে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি। যেমন, বড় অক্ষরে আকর্ষণী শীর্ষক, বা হেড্ লাইন, ছবি, জিনিসের নাম, বক্তব্য বিষয়, মূল্য এবং বিজ্ঞাপনদাতার নাম। এই বিভাগগুলি যে সব সময়ে ঐরূপ ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হইবে অথবা সব বিজ্ঞাপনেই উক্ত বিভাগের সবগুলিই বর্ত্তমান থাকিবে এরূপ নয়। এক এক করিয়া সংক্ষেপে আমরা বিভাগগুলির বিষয় আলোচনা করিব।

আকর্ষণী শীর্ষক

আকর্ষণী শীর্ষকের উদ্দেশ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। শীর্ষকটি যদি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে বিষয়-বস্তুর দিকেও তাঁহার নজর পড়িবে। আকর্ষণী শীর্ষক সংক্ষিপ্ত, অর্থযুক্ত এবং সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে এইরূপ হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ আকর্ষণী শীর্ষকে চারি-পাঁচটির অধিক শব্দ না থাকাই উচিত্। অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে এ নিয়ম লঙ্ঘন করাও হয়।

'লাহার নারিকেল তেল সর্ব্বোৎকৃষ্ট'।—এই শীর্ষকটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক নয়, কারণ ইহাতে খুব বেশী আত্ম-প্রশংসা প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞাপনে আত্ম-প্রশংসা ভাল নয়। ক্লড হপ্‌কিন্স একজন উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-এজেণ্ট। পামওলিফ সাবান, কোয়েকার ওটস্ বা গুড ইয়ার মোটর টায়ারের বিজ্ঞাপন কাহার না দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে? হপ্‌কিন্স এই বিজ্ঞাপনের স্রষ্টা। আত্ম-প্রশংসা, স্বার্থপরতা ও মিথ্যা কথা ছিল হপ্‌কিন্সের পরম অশ্রদ্ধার জিনিস। আমার জিনিষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমি খরিদ মূল্যে জিনিস দিতেছি, খরিদ মূল্য হইতেও কম দামে দিতেছি, দাম, কোন দিন যাহা হয় নাই—কখনও হইবেও না সেই দামে দিতেছি এবং অন্যত্র যাহার মূল্য ঢের বেশী ইত্যাদি মিথ্যা বা স্বার্থপরতার কথা হপ্‌কিন্স কখনও ব্যবহার করেন নাই। ১৯১০ সালে আমেরিকায় বিজ্ঞাপন খরচ ছিল ১২ কোটি পাউণ্ড; ১৯২৫ সালে সেখানে তাঁহারা খরচ করিয়াছেন ৩০ কোটি পাউণ্ড। ইহার অন্যতম কারণ, ১৯১১ সালে—আইন দ্বারা বাজে, মিথ্যা প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন উঠাইয়া দেওয়া হয়। ফলে, বিজ্ঞাপনে তঞ্চকতা না থাকায় অনেক বাজে কথাও উঠিয়া যায় এবং বিজ্ঞাপনের উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে। সততার উপর বিজ্ঞাপনের অনেকখানি নির্ভর করে।

লাহার নারিকেল তেলের কথা হইতেছিল। ওটাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লেখা যায়—

'কেমন করিয়া লাহার তৈল তৈরী হয়'

অথবা

'কোথায় লাহার তৈল তৈরী হয়'

দেখা গিয়াছে, যে-সব বিজ্ঞাপনের শীর্ষক আকর্ষণী লাইনের প্রথমে কেমন, কোথায়, কিসে প্রভৃতি শব্দ থাকে উহা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী; কিন্তু উহা অপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী বিজ্ঞাপন হইবে—

'সিংহলেই সব চাইতে বেশী নারিকেল উৎপন্ন হয়'।

তার পর বিভিন্ন দেশের নারিকেল উৎপন্নের সংক্ষিপ্ত হিসাব দিয়া লাহার নারিকেল তৈল কেন এত জনপ্রিয় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্রথম শ্রেণীর শীর্ষক আকর্ষণী আমরা তাহাকেই বলিব যাহার মধ্যে সমস্ত কথাই সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত থাকে। প্রথম শ্রেণীর দৈনিক কাগজগুলি খুলিলেই এইরূপ বিজ্ঞাপন আমরা অনেক দেখিতে পাইব।

ছবি

বিজ্ঞাপন বেশীর ভাগই কার্য্যকরী হয় ছবি দ্বারা। ছবি সুন্দর হইবে এবং উহার বিজ্ঞাপিত জিনিসের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে ভাল হয়; কিন্তু পিটম্যান বিজ্ঞাপনের

phrase সম্বন্ধে তাঁহার *Guide to Commercial Correspondence* পুস্তকে বলিতেছেন—

"That the phrase is nonsense need not matter much. We may detest the refrain of a foolish song; we may despise ourselves for giving attention to it; yet it will still continue to ring in our heads. So, if the phrase keeps the article in the minds of the public, we need care little about its sense or otherwise."

ছবি সম্বন্ধেও বোধ হয় একথা খাটে। যে-ছবি আমাদের মনে লাগে, বিজ্ঞাপিত জিনিসের সহিত তাহার সম্বন্ধ যত কমই থাকুক, তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। এইজন্য অনেক স্থলেই 'ফিল্‌ম্ ষ্টার'দের ছবি বিজ্ঞাপনের সহিত সংযুক্ত থাকে।

কোনও রূপযৌবনা কুমারী মাথা হেঁট করিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে বলিতেছেন—'পিতা, আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না' ছবিটি চিত্তাকর্ষক; কারণ ইহাতে যথেষ্ট suggestiveness আছে। তার পর আপনার প্রয়োজন-মত সিগারেট, সেণ্ট, শাড়ী যাহা হয় ঐ মিথ্যা না বলিবার কারণের সহিত জুড়িয়া দিন।

পণ্য জিনিসের কৌটা, শিশি বা লেবেলের ভিতর যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তবে উহা বিজ্ঞাপনের ছবির সহিত দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। একটা ভাল ছবি বিশ লাইন লিখিত বিজ্ঞাপনের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী হয়। খুব কম লোকেই সাধারণ বিজ্ঞাপনের ভিতর কি লিখিত আছে তাহা পড়িবার চেষ্টা করেন; কিন্তু একটা সাধারণ ছবি দেখিলেও তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। সুতরাং ছবিটি যদি এমন হয় যে দেখিবা মাত্র ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য একটা ঔৎসুক্য আসে, তাহা হইলে সেইখানেই বিজ্ঞাপনের পূর্ণ সার্থকতা। সেই জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীরা বহু টাকা খরচ করিয়া ভাল আর্টিষ্ট দ্বারা ছবি আঁকিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন।

দুই রকমের ছবি করা হয়—লাইন-ব্লক ও হাফটোন। লাইন-ব্লকগুলি কালি, পেন্সিল বা crayon দ্বারা zinc-etching প্রথায় ড্রইং হইতে করা হয়। ইহা সাদাসিধা ভাবে মাত্র জিনিসটির একটা নক্সা হইতে পারে—(plain outline drawing) অথবা, জিনিসটির খুঁটিনাটি সমস্তটাও (shaded drawing) দেখান যাইতে পারে। হাফটোন —সাধারণতঃ ফোটোগ্রাফ হইতে এই ছবি লওয়া হয়। আসল ফোটোর নেগেটিভটাকে কতকগুলি বিন্দুতে পরিণত করিয়া ব্লক করা হয়। ভাল কোনও হাফটোন ছবি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়া দেখিলেই এই সব বিন্দু পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ছবির ভালমন্দ এই বিন্দু সমষ্টির উপর নির্ভর করে। বিন্দু যত বেশী হইবে (বর্গ ইঞ্চি হিসাবে) ছবির ব্লকও তত সুন্দর হইবে। যেমন, ৮০ বিন্দু দ্বারা যে-ছবি তৈরি হইবে—উহা অতি সাধারণ এবং উহা খারাপ কাগজেও ছাপান চলে; কিন্তু ২০০ বিন্দুর mesh screen দ্বারা যে ব্লক হইবে উহার অতি সুন্দর ছবি উঠিবে এবং উহা ছাপাইতেও খুব ভাল কাগজের প্রয়োজন—নতুবা সাধারণ কাগজে উহা ভাল উঠিবে না। এই জন্য সাধারণ কাগজে ছাপান অনেক বিজ্ঞাপনের ছবি দেখিয়া উহা ভূত না মানুষ,—প্রাকৃতিক দৃশ্য না পশুপক্ষীর ছবি তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

বিজ্ঞাপনের ব্যক্তব্য বিষয়

বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয়গুলি পরিষ্কার হইবে কিন্তু বিস্তৃত হইবে না। প্রত্যেক জিনিসের বিজ্ঞাপনে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিভাগ (selling points) আছে। বিজ্ঞাপন লিখিবার সময় সেগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ধরা যাক্, আমাদের একটি ফাউনটেন পেনের বিজ্ঞাপন দিতে হইবে—

জিনিষ	ফাউনটেন পেন
নাম	ঝরণা কলম
কোথায় তৈরি ?	কলিকাতা
কাহারা ব্যবহার করেন ?	ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, ডাক্তার এবং ব্যবসায়ীরা
বিশেষত্ব কি ?	নিজে নিজেই কালি তুলিতে পারে (self-filling), কখনও চুয়াইয়া কালি পড়ে না (non-leaking)
রকমারি (finish)	বিভিন্ন বর্ণের, স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিবযুক্ত
মূল্য	রকমারি অনুসারে—হইতে—মূল্যের পার্থক্য আছে।

এগুলি বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয় হিসাব যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত বাজে কথা লিখিয়া বিজ্ঞাপনের কলেবর বৃদ্ধি করিলে অথবা 'ঝরণা কলম সব চাইতে ভাল'—'একটি ঝরণা কলম আজই কিনিয়া ফেলুন' ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আদেশ প্রচার করিলে তাহাতে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে।

বিজ্ঞাপন-দাতার নাম

বিজ্ঞাপন-দাতাদের অনেক সময়ে নিজের নামটি মোটা অক্ষরে প্রকাশ করিবার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যায়। এরূপ করা ঠিক নয়। অবশ্য বিক্রেতা নিজে যেখানে সুপ্রসিদ্ধ সেরূপ স্থলে তাঁহার নাম কার্য্যকরী হইতে পারে। অনেক সময়ে আবার দোকানের নামেও জিনিস কাটতি হয়। বিজ্ঞাপন লিখিবার পূর্ব্বে মনে করিতে

হইবে—কিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে? কোনও জিনিসের, দোকানের বা নিজের? বলা বাহুল্য, যেটি প্রধান উপলক্ষ্য সেইটিকেই বিশিষ্ট স্থান দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত।

বিজ্ঞাপনের অক্ষর ও চারি ধারের লাইন

বিজ্ঞাপনের অক্ষর ও চারি ধারের লাইন সম্বন্ধেও অনেক বিবেচনার বিষয় আছে। এ স্থলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক বিভিন্ন আকারের অক্ষরের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা আছে। কতকগুলি অক্ষর বেশ সরু এবং পরিষ্কার—এগুলি মূল্যবান্ গহনা বা সিল্কের বিজ্ঞাপনে প্রযুজ্য। কতকগুলি অক্ষর মোটা এবং বেশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ—এগুলিকে মোটর গাড়ীর বিজ্ঞাপনে চালান যাইতে পারে। আবার কতকগুলি অক্ষর দেশের প্রাচীন পদ্ধতির প্রতীক এবং কতকগুলি অক্ষর নিজেই যেন নিজেকে ঘোষণা করিতে চায়।

বড় বড় অক্ষরগুলি ব্যবহার করিবার সময় সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ একই প্রকারের বড় অক্ষরের দুই-একটির বেশী লাইন বিজ্ঞাপনে দিলে উহা সুস্পষ্ট হয় না। বোল্ড ফেস্, লাইট ফেস্ এবং ইটালিক্স্ একটা বিজ্ঞাপনে থাকিলেই আত্মপ্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রত্যেক ছাপাখানাতেই তাহাদের নিজের 'প্লেন ও ফ্যান্সি' নানারূপ অক্ষর আছে। বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় সকল ছাপাখানাতেই যে একই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হইবে এরূপ নয়। ছাপাখানায় অক্ষরের একটা নমুনা-পুস্তক থাকে। বিজ্ঞাপন-দাতা ঐ অক্ষর দেখিয়া নিজের প্রয়োজনীয় অক্ষর বিবেচনা করিয়া লইতে পারেন। 'প্রিন্টিং ফেস্' অক্ষরগুলির উপরই বিজ্ঞাপন-লেখকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পয়েন্ট হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হয়। এক ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট অক্ষরকে ৭২ পয়েন্টস্ ধরা হয়। বিজ্ঞাপনের অক্ষরগুলি সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৪ পয়েন্টস্-এ করা হয়। হেড লাইনে অবশ্য আরও বড় অক্ষর লাগে।

লাইন

বিজ্ঞাপনের চারিদিকে কখনও কখনও বিভিন্ন রূপ লাইন করিবার পদ্ধতি দেখা যায়। কোন্ লাইন কিরূপ বিজ্ঞাপনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে ইহাও ভাবিবার বিষয়। ছাপাখানায় এই সব লাইনকে 'রুল' নামে অভিহিত করা হয়।

ট্রেডমার্ক, নামের প্লেট ও শ্লোগ্যান

ব্যবসায়ীর পক্ষে তাহার নামের একটা বিশেষ ছাপ থাকা প্রয়োজন। অবশ্য কোন্ ট্রেডমার্ক,—কি ভাবের নাম তাঁহার পণ্য জিনিসের পক্ষে কার্য্যকরী হইবে তাহা নির্ব্বাচন করা খুব শক্ত। কিন্তু একবার উহা বাজারে দাঁড়াইয়া গেলে ব্যবসায়ের পথ অনেকটা সুগম হইয়া পড়ে।

কোন ব্যক্তির নিজের নামের দস্তখত দিয়া কোন কিছু বলা এবং ব্যবসায়ীর নিজের নামে পণ্য দ্রব্য প্রচার একই কথা। ট্রেডমার্ক তাঁহার নিজস্ব জিনিসের প্রতীক, সুতরাং ইহা যে তাঁহারই জিনিস, তাহার একটা গ্যারাণ্টি। অবশ্য এইরূপ গ্যারাণ্টিযুক্ত জিনিসের দায়িত্বও খুব বেশী। কোন সময়ে একই ট্রেডমার্কযুক্ত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ভালমন্দ রকমারি প্রকাশ পাইলে বাজারে ঐ জিনিস চালান খুব শক্ত। তখন, "সাবধান, জাল হইতেছে" বা "ভ্যাজাল প্রমাণে এক হাজার টাকা পুরস্কার' এইরূপ বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করিতে হয়। ট্রেডমার্কের ন্যায় নামের প্লেটও বিক্রেতার খাঁটি জিনিসের পরিচয় ঘোষণা করে।

বিজ্ঞাপন হইবে সংক্ষিপ্ত অথচ সেই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যেই অনেকখানি বলা থাকিবে। কথাগুলি আবার এমন সুন্দর হইবে যেন মনে রাখিবার পক্ষে উহা বেশ সহজ হয়। জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোগ্যান লেখা উচিত। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞাপনে শ্লোগ্যানের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। যেমন, "Milton's for motor, Zumbuk for wound" বাংলায়—'গায়ে মাখো দেলখোস ধন্য হোক এইচ বোস'—এই ধরণের আর কি!

লে-আউট, ডামি বা বিজ্ঞাপনের আকৃতি

যেমন তেমন করিয়া একটা বিজ্ঞাপন ছাড়িলেই তাহা কার্য্যকরী হয় না। বিজ্ঞাপনের ছবি, নাম, ট্রেডমার্ক প্রভৃতি কি ভাবে সাজাইলে উহা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহা জানা দরকার।

উপরিউক্তরূপ বিজ্ঞাপন ছাড়া আরও কত প্রকারের বিজ্ঞাপন হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে ধরাবাঁধা ভাবে কিছুই বলা যাইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে, আজ যে-বিজ্ঞাপন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে কাল তাহা পুরাতন একঘেয়ে হইয়া যাইতে পারে। পিটম্যান তাঁহার '*Guide to Commercial Correspondence*'এ বলিতেছেন—

'**The device which has once proved a success fails**

flat and is stale and unprofitable after a time, the method which at first created an intense interest at last becomes wearing and distasteful'

বিজ্ঞাপন প্রচারের নূতনত্বই প্রাণ

কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়াও আরও অনেক প্রকারে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে। বড় ষ্টেশনে ইলেকট্রিকের সাহায্যে কতকগুলি বিজ্ঞাপন কিরূপ ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া থাকে তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। রাত্রিবেলায় বিবিধ বর্ণের আলোর সাহায্যেও বিজ্ঞাপন প্রচার হয়।

আমেরিকার এক রেষ্টুরেন্টে খরিদদার হয় না দেখিয়া দোকানী বিজ্ঞাপন প্রচার আবশ্যক মনে করিলেন। তিনি তাঁহার ঘরের উপরে একখানি কৃত্রিম এরোপ্লেন এরূপভাবে তৈরি করিলেন, যেন উহা উপর হইতে তাঁহার ছাদে পড়িয়া ভাঙিয়া গিয়াছে! দূর হইতে লোকে উহা দেখিয়া কি না কি হইয়াছে ভাবিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। লোকে মোটর থামাইয়াও দেখিতে আসে ব্যাপার কি! তার পর তাহারা সেই রেষ্টুরেন্টে বসিয়া একটু চা না খাইয়া যাইতে পারে না। এইভাবে দোকানটি দাঁড়াইয়া গেল!

প্রমদ্বরার প্রতি

শ্রীমমতা ঘোষ

বিষম নাগের বিষনিঃশ্বাস ঘায়
ঝরিয়া পড়েছে প্রাণপুষ্পের দল,
সোনার বরণ চমক দেয় না গায়;
কনকরশ্মি খোঁজে বিদায়ের ছল।
নীল হ'য়ে গেছে স্বর্ণলতিকা মোর,
নয়নে নেমেছে চিরনিদ্রার ঘোর।

সুপ্ত কি তুমি সুচিরকালের মত—
জাগিবে না আর সকাতর আহ্বানে?
দেহমন মম বিষাদে মূর্চ্ছাগত,
চাহিবে না ফিরে বারেক আমার পানে?
জাগো, জাগো, জাগো, এই তো জীবন সুরু,
জলভরা চোখে রয়েছে দাঁড়ায়ে রুরু।

বরষা আসিয়া দিবস আঁধার করে,
চারিদিকে মেঘ দাদুরীর কোলাহল;
আকুল কানন ময়ূর মাতন ভরে,—
নদী নির্ঝর ছুটে চলে চঞ্চল।
শ্যামল শোভায় সাজিল কাননভূমি,
এমন সময়ে ঘুমায়ে থেকো না তুমি।

ব্যাকুল বরষা বেদনার মেঘ ল'য়ে
নেমেছে নয়নে নেমেছে অঝোর ধারে,
জাগিছে হৃদয়ে কত স্মৃতি র'য়ে র'য়ে—
কত না দিনের কত কথা বারে বারে।
পারি না সহিতে বিচ্ছেদ-ব্যবধান,
হে প্রাণলক্ষ্মি, আর বার পাও প্রাণ।

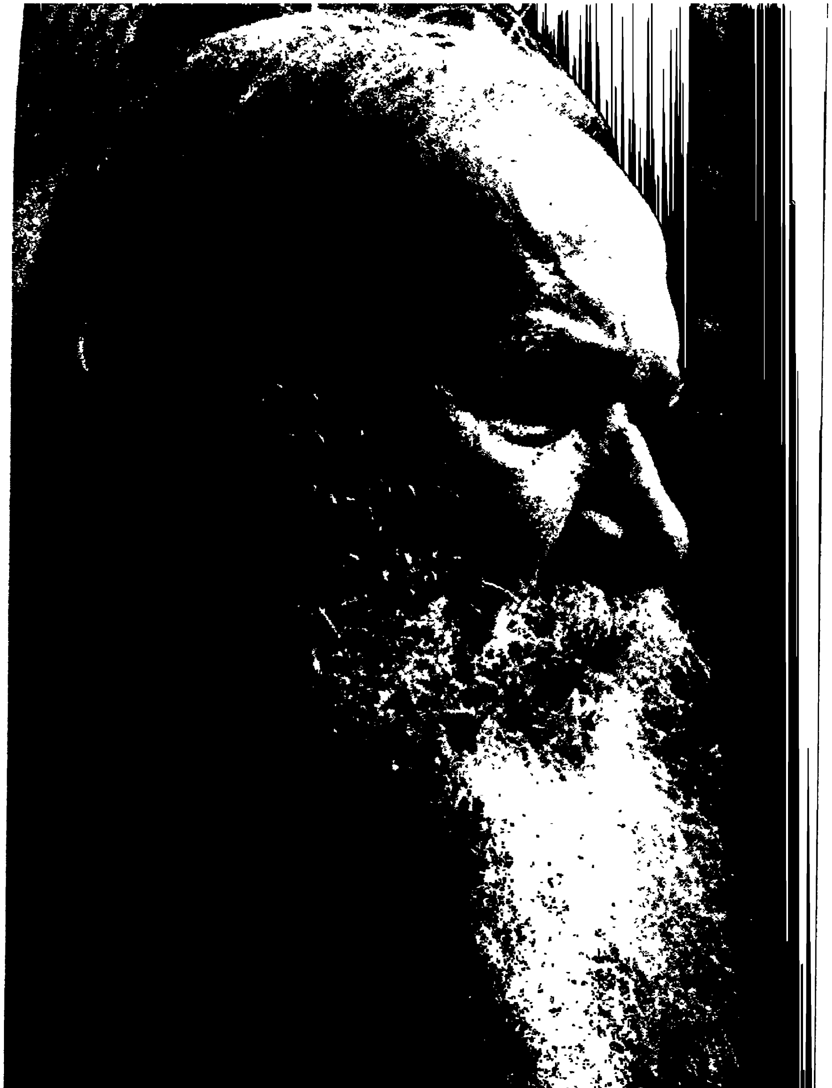
জীবন মৃত্যু দুই লোকে দোঁহে আছি,
এপারের কথা ওপারে কি নাহি যায়?
আমার আধেক আয়ুতে ওঠ গো বাঁচি,
প্রাণসঞ্চার হোক্ দেহে পুনরায়।
আমার জীবনে আবার জীবন লভ,
হোক্ জীবনের স্বাদ-রস অভিনব।



লিখন-রত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪০ [ফোটো—শ্রীরাম শর্ম্মা



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪০ [ফোটো—শ্রীরাম শর্মা





ফোটো—দেবেন্দ্র সত্যার্থী, ১৯৩৯]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[ফোটো—সত্যেন্দ্রনাথ বিশী, ১৯৩৮



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অনুমান ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ

ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিক কোন্ সাল—তা' মনে পড়ছে না ;—আমি তখন এলাহাবাদে লম্বা ছুটি কাটাচ্ছি ; সঙ্গে মাও আছেন। চার্চ্চ রোডে মস্ত একটা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে। কুইন ভিক্টোরিয়া সেই বছরেই মারা যান। কয় দিন থেকেই খবরের কাগজে তাঁর অসুখ অসুখ শুনি। তা যাবার পথে কি কলকাতায় চ'লে আসবার মুখে—মনে নেই ;—মোকামা ষ্টেশনে দেখি এঞ্জিনগুলো সব কালো বনাতে মোড়া—গার্ড ষ্টেশনমাষ্টার সকলের গায়ে কালো কোট ; চার দিকেই কালো কালো সব ঘুর-ঘুর করছে। কি ব্যাপার? মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করি গার্ডকে—কি হল কি? তারই মুখে জানতে পারি কুইন ভিক্টোরিয়া মারা গেছেন।* সেই বছরেই আমার রামানন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ। রাজ-কাহিনী তখনকার লেখা। একটা ক'রে গল্প লিখি আর বাড়ীর ছেলেদের পড়ে শোনাই। দুরন্ত শীত। সকাল বিকেল হেঁটে বেড়াই। এক দিন সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি—খানিকটা যাবার পর দেখি এক ভদ্রলোক—মাথায় কালো কোঁকড়া চুল, কালো লম্বা দাড়ি—গলায় মাথায় কানঢেকে কম্ফার্টার জড়ানো,—গৌরবর্ণ—শান্ত সৌম্য চেহারা ;—এগিয়ে এসে বল্লেন 'নমস্কার, আমি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।'—ওঃ ; নমস্কার নমস্কার। আপনার নাম শুনেছি আগে। কোথায় আপনার বাড়ী?

তিনি বল্লেন—'এই কাছেই।'

বল্লুম—বেশ তো, চলুন আপনার বাড়ীতে বসেই গল্প করা যাক। দু-জনে মিলে গেলুম তাঁর বাড়ীতে। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের কাছে—একটা বড় চার্চ্চের পিছনে বাংলো-ধরণের একটি সুন্দর বাড়ী। সীতা শান্তা কেদার অশোক ওরা তখন খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—সামনে খেলা করছে। বড় ভালো লাগলো। দেখেই মনে হয়—যেন সুখী পরিবার একটি। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হ'ল। অতি ভালোমানুষ ছিলেন তিনি।

সেইখানেই রামানন্দবাবুর সঙ্গে কথা হয়। তিনি বল্লেন—প্রবাসীটা সচিত্র কাগজ করতে চাই।

বল্লুম—সে তো ভাল কথা।

—আপনাদের ছবি দিতে হবে।

—সে তো দেবো ; কিন্তু ছাপাবেন কি ক'রে? তা' ছাড়া খরচ পোষাবে কি আপনার?

তিনি বল্লেন—তার জন্য ভাবনা নেই—খরচ যা লাগে লাগুক। সচিত্র কাগজ বের করতেই হবে। আর ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করবো—চিন্তামণি বাবু আছেন—তিনি ছবি ছাপিয়ে দেবেন।

বল্লুম—আচ্ছা, ছবি দিয়ে যাবো এবার থেকে ; ছাপাবেন আপনি কাগজে।

রামানন্দবাবু আমাকে চিন্তামণি বাবুর কাছেও নিয়ে গেলেন। তিনি রাজী হলেন ছবি ছাপিয়ে দিতে। বল্লেন—এক জন আর্টিষ্ট দিন না আমায়—এ কাজের জন্য। যামিনীকে দিলুম তাঁর কাছে। ছবি ছাপা হ'তে লাগলো।

প্রথম ছবি ছাপা হয়—আমার শাজাহানের মৃত্যু, ছবি-খানি তখন দিল্লীর দরবার ঘুরে এসেছে—সেখানাই দিলুম।** তখনও রামানন্দবাবু কলকাতায় আসেন নি—প্রবাসেই আছেন। রঙীন ছবি ছাপা হয় নি এর আগে। উপেন্দ্রবাবু হাফটোন করতেন ; কিন্তু রঙীন ছবি ছাপা হয়ে বের হয় প্রবাসীতেই প্রথম।

---

* ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। প্রবাসী-সম্পাদক

* ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীদরবার হয়। প্রবাসীতে (মাঘ ও ফাল্গুন ১৩০৯) দরবার-বিষয়ক কয়েকটি সচিত্র প্রবন্ধ ও অবনীন্দ্রের চিত্র এই সময় প্রকাশিত হয়।

দরবারের পূর্ব্বে প্রবাসীর (১৩০৯ ভাদ্র) বিবিধ প্রসঙ্গে আছে "ঠাকুর-পরিবারের শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রবিদ্যায় প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতেছেন। তাঁহার কয়েকখানি চিত্র শীঘ্রই বিলাতের Studio পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।"

দরবারের পূর্ব্বে প্রবাসীর (অগ্রহায়ণ ১৩০৯) 'চিত্র' প্রবন্ধে আছে :—"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত ষ্টুডিওতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ ছবি দুখানি আমরা গত শীতকালে কলিকাতায় অবনীন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রবাসীতে মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে কলিকাতায় নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ছবি মুদ্রিত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। প্রবাসীর (১৩০৯ মাঘ ও ফাল্গুন) 'বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্র' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের 'সুজাতা ও বুদ্ধ' এবং 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' চিত্রের পরিচয় আছে এবং এই সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফ এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ছবি দুইটির এক-রঙা প্রতিলিপি আছে।

এই ছবি দুইটির পরে প্রবাসীতে (আশ্বিন ১৩১০) 'শাহজাহানের জীবনের শেষ দশা' ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। প্রঃ সঃ

ছাত্রেরাও তখন উৎসাহিত হয়ে উঠলো, তাদেরও ছবি ছাপা হয়ে বের হ'তে লাগলো। আমিই বেছে বেছে প্রতিমাসে রামানন্দবাবুকে ছবি পাঠাতুম। তিনি বলেছিলেন,—আপনি যা' পছন্দ করে পাঠাবেন—তা-ই ছাপাবো।

ঐ পর্য্যন্তই কথা হয়েছিল আমাদের। এতকাল ধরে সেই কাজ সমানভাবে তিনি চালিয়ে দিলেন। যে কথা দিয়েছিলেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছবি দিয়ে যান, আপনাদের ছবি আমি প্রকাশ করবো—" সে সত্য চিরকাল পালন ক'রে গেলেন। কত বাধা তিনিও পেয়েছিলেন—থাক্ সে সব কথা আজ। আমিও পেয়েছিলুম অনেক বাধা। ব্লাণ্ট সাহেব বলতেন—এই সব চীপ রিপ্রোডাকশনে আসল ছবির ক্ষতি করে।* সোসাইটি থেকে প্রিন্ট করাও—ভাল জিনিষ হবে। আমি বল্লুম—"সাহেব, সে তো হবে দামী জিনিষ। সৌখীন কয়েক জন লোক মাত্র কিনবে তা। আমাদের দেশের লোক দেখতে পাবে না আমাদের দেশের ছবিকে।" দেখতুম তো—একজিবিশন হ'ত—ক'টা লোকই বা আসত। যারা যারা ছবি কিনতো—ছবি ঘরে নিয়ে রেখে দিত। ব্যাস্ ঐ অবধি।

কিন্তু রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে ঘরে। এই যে ইণ্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচার—এ এক তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব হ'ত না। আর্ট সোসাইটি পারে নি। চেষ্টা করেছিলুম। হ'ল না। রামানন্দবাবু একনিষ্ঠভাবে এই কাজে খেটেছেন—টাকা ঢেলেছেন—চেষ্টা করেছেন—পাবলিকে ছবির ডিমাণ্ড ক্রিয়েট করিয়েছেন। তিনি ছাড়া আরও তিনটে জিনিষ হ'ত না এ দেশে। কালার্‌ড্ প্রিণ্টের আজ এতখানি উন্নতি হ'ত না, হাফটোনও নয়,—আর মাসিক কাগজও এই আলোতে আসতো না। আর্ট সোসাইটিরও এই উদ্দেশ্যই ছিল বটে—ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রচার করা। কিন্তু আর কারো দ্বারা তা'ত সম্ভব হ'ল না। আমরা ছবি আঁকিয়ে ছেড়ে দিতুম,—উনি ঘুরে ঘুরে কোথায় কি করতে হবে,—কাকে দিয়ে করাতে হবে,—কি ক'রে গরিবেরও ঘরে ঘরে দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র ছবির প্রচার করতে হবে, সবই নিজে করতেন। এ আমরা কখনই পারতুম না।* তিনিই হাত বাড়িয়ে এই ভার তুলে নিলেন।

আজ বুঝতে পারি—আমাদের আর্ট ও আর্টিষ্টদের কতখানি কল্যাণ তিনি ক'রে দিয়ে চলে গেলেন।

দেশের আর্ট ও আর্টিষ্টদের জন্য তাঁর মনে কতখানি দরদ ছিল—চিরকাল এ কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখব।

* মাসিক পত্রের আয় ও খরচের অনুপাতে এই সব ছবি ছাপা 'চীপ' ছিল না অবশ্য। প্রঃ সঃ

* প্রবাসী-সম্পাদক স্বয়ং এবং কিছু পরে ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি এই সব দেশীয় ছবির নামে সুদীর্ঘ সুন্দর চিত্র-পরিচয় লিখিতেন। প্রঃ সঃ

পুণ্যচরিতকথা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

"অংতি সংতং ন জহাতি অংতি সংতং ন পশ্যতি"॥

(অথর্ব, ১০, ৮, ৩২)

অর্থাৎ "যত দিন কাছে আছে তত দিন তাহার গৌরব বুঝিতে পারা যায় না, হারাইলে তখন দেখা যায় তাহার মহিমা।" বাণীটি যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম তখন তাহার গভীরতা বুঝি নাই। তার পর জীবনে আঘাতের পর আঘাতে এই বাণীর গভীরতা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। দৃষ্টিশক্তি হারাইলে বুঝি দৃষ্টির মহিমা, স্বাস্থ্য হারাইলে বুঝি স্বাস্থ্যের মহত্ত্ব, বয়স বহিয়া গেলে বুঝি তাহার মূল্য। মানুষকেও না হারাইয়া আমরা তাহার মূল্য বুঝিতে পারি না। হারাইবার পরেও যদি মূল্য না বুঝি তবে সেই দুঃখের আর স্থান কোথায়?

দূরের চন্দ্র সূর্য যে গোল তাহা দেখিতে পাই। পৃথিবীও যে গোল তাহা জানি। কিন্তু কাছে আছে বলিয়া শুধু এই পৃথিবীর উচ্চ-নীচতাই দেখি। তাহার সমগ্রতা তাহার গোলত্ব চক্ষে ধরাই পড়ে না। মানুষও যত দিন জীবিত থাকে তত দিন তাহার প্রতিক্ষণগত বিশেষ বিশেষ খুচরা দোষত্রুটিগুলিই ধরা পড়ে, তাহাকে পূর্ণভাবে তখন

দেখিতেই পাই না। মৃত্যুর পরে হয়তো উদ্ভাসিত হয় তাহার জীবনের সমগ্র তাৎপর্য। কাছের মানুষকে আমরা তাই যথার্থভাবে দেখিতে পাই না।

রামানন্দবাবু নানা মহদ্‌ব্রত লইয়া এত দিন আমাদের মধ্যেই ছিলেন। তবু মৃত্যুর পরে তাঁহার সমগ্রতার যে মহিমা উপলব্ধি করিবার অবসর এখন আসিয়াছে তাহা এত দিন আসে নাই। আজ তাঁহার জীবনের ছোটখাট সুন্দর সুন্দর সব ঘটনাগুলি বিশেষ-বিশেষ ভাবে মনে আসিতেছে না। মনে আসিতেছে তাঁহার জীবনের একটি অখণ্ডিত মহিমা ও সার্থকতা।

যে-দেশ লক্ষ্মীমন্ত সেখানে একটি বৃক্ষ গেলে তার স্থানে অন্য আর একটি বৃক্ষাগমের ব্যবস্থা হয়। যে-দেশ শক্তিমন্ত সেখানে এক নেতা চলিয়া গেলে অন্য নেতা দাঁড়ান। কিন্তু এই লক্ষ্মীছাড়া শক্তিহীন দেশে যে মহাপুরুষ চলিয়া যান তাঁহার স্থানে আর নূতন মহাপুরুষ আসিয়া সেই তপস্যার আসন পূর্ণ করেন না। তাই দুঃখ আরও বেশি। রবীন্দ্রনাথ গিয়াছেন তাঁহার আসন শূন্যই থাকিবে, রামানন্দ গেলেন তাঁহার আসনও পূর্ণ হইবে না।

রামানন্দবাবুর জীবনের কথা অন্যেরা অনেকে যেমন পর্যায়ক্রমে বলিতে পারিবেন তেমন আমি পারিব না। কারণ ঠিক তেমন করিয়া তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখি নাই। তবে আজ তাঁর বিষয়ে ভক্তিপূত যে একটি অখণ্ড স্মৃতি মনে জাগিতেছে তাহারই একটু পরিচয় দিতে পারি। মাঝে মাঝে এক একদিনের কথা হয়তো কিছু কিছু বলিতে পারি। আগাগোড়া একটি সূত্র আমার মনে নাই।

আমরা প্রবাসী বাঙালী। প্রবাসী বাঙালীর কি দুর্গতি আমাদের বাল্যকালে ছিল, তাহা এখন কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না। তখন কাশীতেও এত বাঙালী ছিলেন না। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায়ই তীর্থাশ্রয়ী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কাশীবাস করিয়া কাশীতে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছেন। তাঁহারা সাহিত্যের ধার ধারেন না, তাই বাংলা ভাষার চর্চাও কোথাও নাই। বাঙালীর ছেলেরা উর্দু বা হিন্দী শিখিয়া পরীক্ষা পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অচল। এই জন্য কাহারও মনে কোনো খেদও নাই। এই ছিল কাশীর অবস্থা। বাংলার বাহিরে সর্বত্রই ছিল এই দুর্গতি।

এমন অবস্থার মধ্যে ১৮৯৮ সালে বাংলা দেশ হইতে একজন রবীন্দ্রভক্ত কাশীতে বেড়াইতে গেলেন। তাঁহারই মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম শুনিলাম এবং তাঁহার কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রথম দেখিলাম।

বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে তখন আমার কিছুমাত্র পরিচয় নাই, জানি শুধু কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস এবং কাশীখণ্ড গ্রন্থ। আমার নিজের সম্বলের মধ্যে আর ছিল কিছু সংস্কৃত সাহিত্যের ও মধ্যযুগের কবীর-রবিদাসপ্রভৃতির সন্তসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। এই সম্বলটুকু লইয়াই রবীন্দ্রকাব্য শুনিলাম এবং মুগ্ধ হইলাম। বাংলা-সাহিত্যের টানে বাংলার সংস্কৃতির খোঁজ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এমন সময় খোঁজ পাইলাম এলাহাবাদে প্রবাসী বাঙালীরা একটা বড় রকমের আয়োজন করিতেছেন। কাশীতে থিয়সফিকাল সোসাইটিতে আগত স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই খবরটুকু দিলেন।

তখন আমার বয়স খুবই কম। তবু বাংলা দেশের সংস্কৃতির ও সাহিত্যের খবর মিলিতে পারে এই জন্যই কয়েক দিন পরেই এলাহাবাদে গেলাম। গিয়া প্রথমেই পরিচয় হইল অভিধান-প্রণেতা স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও সরকারী কেরাণী গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে।

শুনিলাম শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়, তাঁহার ভাই মেজর বামন দাস বসু মহাশয় ও কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ রামানন্দবাবু প্রভৃতি মিলিয়া বাংলা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবাসীদের সম্বন্ধ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তাহার জন্য নানাবিধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছেন। গুরুপ্রসন্নবাবু আজ জীবিত আছেন কিনা জানি না। আর কয়জন তো এখন পরলোকগত। সর্বত্রই শুনিলাম কায়স্থ পাঠশালার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবংশীয় এই অধ্যক্ষটি প্রাচীনকালের শিক্ষা, সদাচার ও সেবার যে আদর্শ আপন চরিত্রগুণে এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তাহাতে সকলেই বিস্মিত।

রামানন্দবাবুর সহিত পরিচয় হইল। স্বল্পভাষী, শান্ত সংযত মানুষ। চালচলন একেবারে সাদাসিধা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শুনিয়াছিলাম ব্রহ্মের মধ্যে জ্ঞান-বল-ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত (স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ, শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)। ব্রহ্মনিষ্ঠ এই ভক্তটির মধ্যেও দেখিলাম জ্ঞান, চরিত্রবল ও ক্রিয়া একেবারে সহজভাবে এক হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অগাধ জ্ঞানকে ধারণ ও চালন করিতেছে তাঁহার মহনীয় চরিত্র।

স্থানীয় দুর্নীতি ও দুর্গতি দূর করিবার কাজে রামানন্দবাবুই অগ্রণী, সেখানে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার ও তাঁহার ভাই দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার সহায়। জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার সাথী শ্রীশচন্দ্র বসু ও বামনদাস বসু মহাশয়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহার নির্ভীক সাধনা। সেখানে মালবীয়জী, মোতিলাল নেহরু প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার

একাধারে তিনি এলাহাবাদের সর্বপ্রকার সাধনাকে অগ্রসর করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীশচন্দ্র বসু ছিলেন মহা পণ্ডিত লোক। পাণিনি ব্যাকরণ সম্পাদন করায় তাঁহার নাম সকলেই জানেন। কাশীতে তাঁহাকে চিনিতাম। তাঁহার ভাই বামনদাস-বাবুকেও চিনিলাম। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বামনদাসবাবু বলিলেন, "স্পেনের এক দল মানুষ প্রাচীন কালে আমেরিকাতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা স্পেনের প্রাচীন কালের ভাষার ও সাহিত্যের সাধনা এমন ভাবে রক্ষা করিতেছেন যে খাঁটি স্পেনেও প্রাচীন কালের স্পেন-দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অর্থবোধের জন্য অনেক সময় আমেরিকার স্পেন-উপনিবেশেই খোঁজ করিতে হয়। আসল স্পেন-সংস্কৃতি নিজ দেশ অপেক্ষা আজ তাহার উপনিবেশেই ভালভাবে সংরক্ষিত। আমরাও যদি ভারতের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া-পড়া প্রবাসী বাঙালীদের মূল বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে একটি ঐক্য দান করিতে পারি তবে হয়তো বাংলা দেশ এক সময়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতি বিষয়ে এই সব স্থান হইতেও অনেক কিছু নূতন আলোক পাইতে পারে।" শ্রীশবাবু বলিলেন, "বৈদিক আর্য্যেরা ভারতে নানা শাখায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন পড়িলেন তখন তাঁহাদের আচার-বিচার কর্মকাণ্ড ও ভাষা শাখায়-শাখায় একটু একটু বিভিন্ন হইয়াও যাইতে লাগিল। নানা শাখায় আর্য্যগণ পরস্পরে যাহাতে পরস্পরকে বুঝিতে পারেন সেই জন্য তখন প্রতিশাখ্যগুলি রচিত। প্রতি-শাখার ভাষাগত বিশিষ্টতা রক্ষা করার চেষ্টা বলিয়াই তাহার নাম 'প্রতিশাখ্য'।"

সেইখানে একজন তামিল দেশীয় থিয়সফিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কোনো এক সময় তামিলদের এক শাখা ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে যায়। সিংহলের একটি দিক বৌদ্ধ, অপর দিকটি হইল তামিলদের বংশধর ভাগবত-হিন্দুদের উপনিবেশ। কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, ভারতের তামিলেরা তাহাদের পুরাতন ভাষা ও গ্রন্থের অর্থ ভুলিয়াছে অথচ সিংহলের তামিলেরা এখনও সেই প্রাচীন আলওয়ার ভক্তদের ভাষাতেই কথা বলেন। ভারতের একজন তামিল পণ্ডিত বহু টীকা-টিপ্পনীর সহায়তাতে কুরালের যে-সব বাণী বুঝিবেন না, সিংহলের একজন মুচী-মেথরও তাহা অনায়াসে বুঝিবেন। তিরুবাচকমের বাণী কি নম্বালোয়ায়ের গান তাঁহাদের মুখে মুখে চলিতেছে।"

ঐ সভায় বলিবার মত বয়স তখন আমাদের হয় নাই তাই চুপ করিয়া রহিলাম। এখনকার দিন হইলে বলিতাম, ভারতের এমন বহু লুপ্ত মুদ্রা, আচার ও ক্রিয়া-কাণ্ড এখন ভারতের প্রাচীন উপনিবেশ কি বালি প্রভৃতি দ্বীপে বিদ্যমান যাহা ভারত হারাইয়া ফেলিয়াছে। মধ্য এসিয়াতে ভারতের কুচার প্রভৃতি উপনিবেশ হইতে চীন জাপান কোরিয়াতে কত কত মনীষীই না ধর্মদেশনার জন্য গিয়াছেন। কুমারজীব প্রভৃতি মহাত্মাও সেই উপ-নিবেশেরই ভারতীয়। মধ্যযুগেও কাশীতে মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি যে আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই আলোক তখনকার দিনের খোদ বাংলা দেশেও দুর্লভ ছিল। যাক্ সব কথা তখন জানাও ছিল না এবং জানিলেও তাহা বলিবার বয়স তখন হয় নাই।

বামনদাসবাবু বলিলেন, "মিশর, পারস্য, ভারত প্রভৃতি দেশের উপনিবেশে মুসলমান সাহিত্য ও সাধনার এমন অনেক জিনিস জন্মলাভ করিয়াছে যাহা আরব দেশের পক্ষেও যত্নে দেখিবার মত।"

এইরূপ চমৎকার আলাপের মধ্যেও রামানন্দবাবু চুপ করিয়া কি একটা গভীর চিন্তায় ডুবিয়া রহিলেন। বামন-দাস বাবু বলিলেন, "রামানন্দবাবু, আপনি ত কিছু বলিতেছেন না। আপনার কি কিছু বলিবার নাই?" রামানন্দবাবু বলিলেন "এই সব কথার পর বলিবার আর কি থাকিতে পারে? কিছুই বলিবার প্রয়োজনও নাই। ভাবিতেছি এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আপনারা উভয়ে পণ্ডিত মানুষ, আমি সেখানে আপনাদের নাগাল যদি না-ও পাই তবু সাধনার দ্বারা আমি আমার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারি।"

শ্রীশবাবু ও বামনদাসবাবু উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আপনার এই বিনয়ের কোন অর্থই নাই। এখানকার লাইব্রেরির বইগুলির বিষয় আমাদের চেয়ে আপনি বেশি জানেন। তবে আমরা জানিয়াই তৃপ্ত, আপনি জানিয়াই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন না। তাহা কাজে পরিণত করিতে না পারিলে আপনার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। আপনি একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের ন্যায় আপনার জানিবার স্পৃহা এবং ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সেই জ্ঞানকে অশ্বমেধের অশ্বের মত সর্বক্ষেত্রে জয়ী করিয়া আনিতে চান।"

রামানন্দবাবু বলিলেন, "ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি আমি করি না। বড় জোর আমি শূদ্র। সেবাই আমার কাজ। তাই দাসাশ্রমের কাজ লইয়াছিলাম। দাসী পত্রিকা চালনার যে কাজ সেই কাজই আমাকে মানায়।"

বহুদিন পরে শান্তিনিকেতনে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রামানন্দবাবুকে বলিয়াছিলেন, "বিরাট্ পুরুষের চারি অঙ্গে চারি বর্ণের মূলাধার। আপনার মধ্যেও তেমনি ব্রাহ্মণের মনীষা, ক্ষত্রিয়ের নির্ভীক সাধনা, বৈশ্যের জ্ঞানভাণ্ডার এবং শূদ্রের ঐকান্তিক সেবা আছে। আপনি সেই হিসাবে পরিপূর্ণ মানুষ। শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইলে এমন পরিপূর্ণতা হইত না।"

যাহা হউক, বামনদাসবাবুদের বৈঠকখানায় সেই দিনের কথোপকথনে বুঝিয়াছিলাম এই স্বল্পবাক্ মানুষটির মধ্যে যেমন জ্ঞানের গভীরতা, তেমনি চরিত্রের দৃঢ়তা, তেমনি সেবার আগ্রহ, সমানভাবে বিদ্যমান। আমাদের দেশে জ্ঞান ও মনীষা তবু দেখা যায়। চরিত্রই আমাদের দেশে দুর্লভ অথচ এখন সব চেয়ে এই দেশে চরিত্রেরই প্রয়োজন।

এলাহাবাদে শ্রীপঞ্চমীর সময় বাঙ্গালীদের একত্র করিয়া যে সাহিত্য-সঙ্গীত-শক্তিচর্চা প্রভৃতির আয়োজন তাঁহারা যেমন সুন্দরভাবে করিয়াছিলেন আমরা কাশীতে চেষ্টা করিয়াও তেমনটা করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্দশা দেখিয়াই তাঁহারা সেই সব দেশের জন্য যে-সব চেষ্টা করিতেছিলেন ক্রমে তাহা হইতেই প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্যসম্মেলন এবং প্রবাসী পত্রের উদ্ভব হয়। এই সব উৎসবে উৎসাহী-বলিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই যে রামানন্দবাবু ব্রাহ্ম। আর ব্রাহ্ম বলিতে কি বুঝায় তখনকার দিনে তাহা ঠিক বুঝিতামও না।

১৯০০ সালে এলাহাবাদে অর্দ্ধকুম্ভ হয়। সেবার মাঘ মাসে এলাহাবাদে গিয়াছিলাম। সেই বারও রামানন্দবাবুকে দেখিবার সুযোগ খুঁজিয়াছি এবং দেখিতে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি। তখনও আমার প্রধান পরিচয় ছিল শ্রীশবাবু, মহেন্দ্র ওহ্‌দেদার মহাশয় এবং দেবেন্দ্র ওহ্‌দেদার মহাশয়দের সঙ্গে। ১৯০০ সালের মাঘ মাসে একদিন ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইল। মাঘ-মেলার কুম্ভযাত্রীরা কেহ কেহ শীতেই মারা গেল। তাই রামানন্দবাবুকে সেই বারে নানাবিধ মানবসেবার কাজেই ব্রতী দেখিলাম। কথাবার্ত্তা শুনিবার অবসর বড় একটা হইল না। আমাদের তখন বয়স অল্প। তাই তাঁহার স্বাধীন ভাব, নির্ভীক সাধনা এবং সেবাপরায়ণতা আমাদের চিত্তকে আরও ভক্তিপ্রণত করিল।

ব্রাহ্ম কি তাহা তখন জানিতাম না। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা কাশীর বাহিরের খোঁজখবর কিছুই রাখিতাম না। আমাদের চারিদিকে দেবমন্দির, শাস্ত্রপাঠ, গঙ্গাস্নান, পূজাসন্ধ্যা-ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠান। কাজেই ব্রাহ্মসমাজের কথা কিছুই জানি না। তখন শুনিতাম ব্রাহ্মেরা নাকি শাস্ত্রধর্ম কিছুই মানেন না। মদ্যপান এবং গোমাংস ভক্ষণ না করিলে নাকি ব্রাহ্ম হইতে পারে না। এমন সময় ঢাকার ব্রাহ্ম ভক্ত স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র সেন মহাশয় পাগলা কুকুরের কামড়ের চিকিৎসার্থ কসৌলী গিয়া ফিরিবার পথে কাশী আসেন। দেখিলাম তিনি নিরামিষাশী সাত্ত্বিক মানুষ এবং ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির একান্ত অনুরাগী। তাঁহার কাছেই শুনিলাম রামানন্দবাবুও ব্রাহ্ম।

কাশীতে বহুকাল ধরিয়া একজন ব্রহ্মপরায়ণ ভক্ত বাস করিতেন, তাঁহার নাম রামচন্দ্র মৌলিক। তিনি রামমোহনের শিষ্য এবং রামমোহনকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়াছিলেন; বোধ হয় ১৯০০।১৯০১ সালে ১০৪ বৎসরে কাশীতে মারা যান। ঈশান সেন মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়কে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। তাঁহার কাছে রামমোহনের সব গ্রন্থ এবং তখনকার ও মহর্ষির সময়ের সব গ্রন্থ ও কাগজপত্র ছিল। মহর্ষির অপেক্ষা তিনি বয়সে বড়। তাঁহার কাছে পরে রামমোহনের রচিত গ্রন্থাদি লইয়া পাঠ করিয়াছি। তাঁহার বাড়ীও একটি তীর্থস্থানের মতই ছিল। তাঁহার ভাইপো শম্ভু মৌলিক মহাশয় ছিলেন কাশী হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক। হাতিফট্‌কায় তাঁহার বাড়ীতেই সনাতন ভাগবত ধর্ম্মের আলোচনার ক্ষেত্র ছিল। শম্ভু মৌলিক মহাশয়ের পুত্র প্রমদা মৌলিক ছিলেন আমাদের বন্ধু। প্রমদা এখন রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী। প্রমদা এখন কোথায় আছেন জানি না। রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে গাড়ীচাপা পড়িয়া পা ভাঙ্গেন। তাই শয্যাগত হইয়া তেতলার ঘরে শুইয়া থাকিতেন বলিয়া কাশীতে থাকিয়াও তাঁহাকে আমরা জানিতাম না।

রামমোহনের আর এক ঘর অনুরাগী ছিলেন মির্জাপুরে। সেই বাড়ীর অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে রামমোহনের মুদ্রিত গ্রন্থাদি দেখিয়াছি। রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যা কাশীর তখনকার বহু পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে প্রশংসিত হইতে শুনিয়াছি। কাজেই ক্রমে বুঝিলাম ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই একটি বিশুদ্ধ ও উদার রূপ।

রামানন্দবাবু সেইরূপ ব্রাহ্মই ছিলেন। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল অথচ তিনি একজন খুবই যুক্তিবাদী (rational) মানুষ ছিলেন। জাতিপংক্তি তিনি মানিতেন না। তিনি মনে করিতেন জাতিপংক্তি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির

বড় কথা নহে, এই জন্য পঞ্চনদ প্রদেশের "জাতপাত তোড়কের দল" তাঁহাকে সভাপতি করেন। অথচ হিন্দু মহাসভার সঙ্গেও তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। দুই বার তিনি তাহার সভাপতি হন। এলাহাবাদে ও পশ্চিমের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার গভীর প্রীতি ছিল। মালবীয়জী নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি চিরদিন রামানন্দবাবুর একজন অনুরাগী বন্ধু। মাঘ-মেলাতে ও কুম্ভের মেলাতে যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ভাল ভাল সাধুদের প্রতি রামানন্দবাবুর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই তাঁহার বাড়ী তীর্থযাত্রী আত্মীয়স্বজন এমন কি অপরিচিত প্রয়াগযাত্রী লোকেরও আশ্রয়-স্থান ছিল। তিনি তাঁহাদের সব তীর্থকৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পূর্বে উল্লিখিত কয়জন ব্রাহ্ম এবং রামানন্দবাবুকে দেখিয়া ব্রাহ্ম সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্তিত হইল।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ঋতুর পূজা, অর্চনা, উৎসব, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, রামায়ণ গান প্রভৃতির প্রতি রামানন্দবাবুর গভীর অনুরাগ ছিল। ব্রাহ্মসমাজে এই সব উৎসবানন্দ না থাকাতে ছেলেমেয়েদের মন যে নীরস হইয়া যায় তাহা তিনি বুঝিতেন এবং এই জন্য ব্রাহ্মসমাজেও নানা ভাবে উৎসব ও ছেলেমেয়েদের নির্দোষ আমোদ ও উৎসবের প্রবর্তন চেষ্টা তিনি করিয়াছেন।

যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রামানন্দবাবু তাঁহার যৌবনের সাধনা গ্রহণ করিলেন, সেই রামমোহনও ছিলেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির একজন মহাভক্ত। কিন্তু তাঁহার প্রাচীন কালের ভক্তি তাঁহাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি ভক্তিহীন বা দায়িত্বহীন করে নাই। ভূতভব্যবর্তমান জ্ঞানকে যুক্ত না করিলে পূর্ণ যোগী হওয়া যায় না। যোগী হইলেই তাঁহার ত্রিকালদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। সাধকেরও সাধনাতে ঠিক তাই ত্রিকালের প্রতি কর্তব্য পূর্ণ করা চাই। রামমোহন যেমন সনাতন, তেমনি আধুনিক, তেমনি ভবিষ্যতের। তাঁহাদের এক যুগ অন্য যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। গঙ্গা-যমুনা সরস্বতী এই ত্রিধারার যুক্তবেণী হওয়াতেই প্রয়াগ হইল মুক্তিতীর্থ। তেমনি ত্রিযুগের যুক্তবেণীর সাধক রামমোহন ও রামানন্দ মুক্তির দীক্ষা দিতে পারিয়াছেন।

একই কালে প্রবাসী-সম্পাদকরূপে ছিলেন তিনি বঙ্গ-সংস্কৃতির উপাসক এবং মডার্ন রিভিয়ুর সম্পাদকরূপে ছিলেন তিনি সারা ভারতের ব্রতসাধক। ভূত ও ভব্যের সাধনার মত একই সঙ্গে রামানন্দ এই দুই সাধনাও যুক্ত করিয়াছিলেন। সূর্যের আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে যেমন কোন বিরোধ নাই তেমনি তাঁহার মধ্যে এই বিষয়ে কোনো বিরোধ কখনও দেখি নাই। একই নারী একসঙ্গে মাতা-পত্নী ও কন্যার ব্রত সুচারু রূপে সাধন করিতে পারেন। নানাবিধ তথাকথিতবিরোধ রামানন্দবাবুর মহত্ত্বের মধ্যে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিয়াছিল।

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে যেখানে যে দোষ ত্রুটি আছে তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ ছিল। আমাদের সমাজে তিনটি ত্রুটির কথা তাঁহার মনে সর্বদা দুঃখ দিত।

এই প্রসঙ্গে অনেক পরবর্তী কালের একটি ঘটনার কথা বলি। বোধ হয় ১৯২২ সাল, শীতকাল। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী যখন বিশ্বভারতীতে আসেন তখন রামানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এক দিন রবীন্দ্রনাথ, সিলভ্যাঁ লেভি ও রামানন্দবাবু বসিয়া আলাপ করিতেছেন। তখন সিলভ্যাঁ লেভি সাহেব বলিলেন, "ভারতবর্ষে চিরকালই ভগবানের বালকরূপের পূজা প্রচলিত আছে। বালকৃষ্ণ, বাল-গোপালের আপনারা ভক্ত। হয়তো Infant Christ-এর প্রতি ভক্তি আপনাদের কাছেই পাওয়া। তাই জিজ্ঞাসা করি আজ আপনাদের দেশে শিশুদের জন্য আনন্দ ও উৎসবের কিরূপ আয়োজন আছে? শিশুদের জন্য সাহিত্য আপনাদের দেশে অতুলনীয় হওয়া উচিত, কারণ শিশু-ভগবানের আপনারা ভক্ত।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই কথা বলিয়া আর আমাদিগকে দুঃখ দিবেন না। আমাদের দেশে নামেই শিশু-ভগবানের পূজা। শিশুদের এত দুর্গতি আর কোন দেশে নাই। শিশুদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই আমি এই শান্তিনিকেতনের মাঠে শিশু-ভোলানাথদের আশ্রয় স্থাপন করিয়া* তাহাদের ডাক দিয়াছিলাম। আর আমাদের দেশে দুঃখ মেয়েদের। বিশ্বভারতী যেন মেয়েদের দুঃখ দূর করিতে পারে ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। তাহা ছাড়া দুঃখী আমাদের সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণী। তাহাদের জন্যও আমি সুরুলে কিছু গড়িয়া তুলিতে চাই। এই তিনটি দুঃখ রামানন্দবাবুর মনেও আছে। এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার সর্বদাই আলাপ হয়।"

রামানন্দবাবু বলিলেন, "ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আমার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহা আমার পক্ষে বুঝাইয়া বলা কঠিন। প্রাচীন ভাল জিনিস সবই যাহাতে বজায়

---

* রবীন্দ্রনাথ যখন শিশুভোলানাথ গ্রন্থ বাহির করেন তখন কি এই সব কথা মনে করিয়া গ্রন্থটির নামকরণ করিয়াছিলেন?

থাকে তাহাই আমি চাই তবে আমাদের দেশে শিশুদের নিরানন্দ জীবন আনন্দময় করিতে ও শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কবিগুরু যাহা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। সেরূপ কৃতিত্বের দাবি আমার নাই। ভারতীয় নারীর কথা লইয়া কবিগুরুর যে সাহিত্যরচনা তাহাও অপূর্ব। সেরূপ কিছু আমি যদিও করিতে পারি নাই তবু আমি চিরদিন নারীদের ও শিশুদের দুর্গতি দূর করিবার কথা আমার সব লেখাতেই বলিয়াছি। আমার কাগজ দুইখানিতে দেশের নিম্ন শ্রেণীর প্রতি যাহাতে অবিচার না হয় তাহার জন্যও চিরদিন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।"

"সঙ্গীত ও কলার আনন্দ-রশ্মিপাতে যাহাতে শিশুদের ও দেশের চিত্তকমল বিকশিত হয় তাহার জন্যও আমার একান্ত আগ্রহ ছিল। এই জন্য আমি আমার "প্রবাসী"র আরম্ভেই অজন্তা চিত্রাবলীর পরিচয় দিয়া সুরু করিয়াছিলাম। ব্রাহ্ম-সমাজেও আমি নানাভাবে আনন্দ-উৎসবের প্রবর্তন চেষ্টা করিয়াছি। তবে এই বিষয়ে শ্রীমান্ সুকুমার রায়ের শক্তি অনেক বেশি।"

কবিগুরুও সুকুমার রায়ের কথা লেভি সাহেবকে বলিলেন। তাই তাহার পর একদিন আমি লেভি সাহেবকে লইয়া সুকুমার রায়ের বাড়ীতে গড়পার গিয়াছিলাম। তখন সুকুমারবাবু শয্যাগত। ইহাতেই বুঝা যায় মহাভারত, রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি বিশেষ ভাবে শিশুদের উপযোগী করিয়া রামানন্দবাবু কেন সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এই সব পরবর্তী কথা ছাড়িয়া আমাদের এলাহাবাদের সেই দিনের প্রসঙ্গে যাওয়া যাউক। রামানন্দবাবুর আর একটি বন্ধুর কথা বলিতে ভুলিয়াছি। তিনি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস-এর প্রতিষ্ঠাতা চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়।

ইঁহারা সকলে মিলিয়াই প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে বঙ্গীয় সংস্কৃতিটি স্থাপনের কাজে লাগিয়াছিলেন। অন্য সকলে একটুকু কাজ করিলেই তৃপ্ত হন, রামানন্দবাবুর সেই স্বভাব নয়। তিনি যাহা করিতেন তাহাতে আপনাকে একেবারে ঢালিয়া না দিয়া পারতেন না।

প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্তরের সব কথা প্রকাশিত করিতে, তাহাদের সব দুঃখ-দুর্গতি দূর করিতে, তাহাদের জীবনের অন্ধকারকে আলোকময় করিতে, সকল প্রবাসী-বাঙ্গালীর মধ্যে একটি মৈত্রী ও সংহতি স্থাপন করিতে ১৯০১ সালে রামানন্দবাবু 'প্রবাসী' পত্রিকাখানি বাহির করিলেন।

তাহার পর বৎসর এলাহাবাদে ভীষণ প্লেগ। তবু আমাকে একবার বাধ্য হইয়া এলাহাবাদে যাইতে হইল। তখন আমি রামানন্দবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত কিছু আলাপ করি। অল্পভাষী রামানন্দবাবু এত সহৃদয় ছিলেন যে কম কথায় কোনো অসুবিধা হইত না। সেবার শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে আসেন এবং দুই জনের মধ্যে বেশ একটি শ্রদ্ধার সম্বন্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথকে আমি তখন দূর হইতে জানি মাত্র। তাই রামানন্দবাবুকে বলিলাম, "আপনার সঙ্গে কি করিয়া তাঁহার আলাপ হইল?" রামানন্দ বাবু বলিলেন, "তাঁহার মত প্রতিভা আমার নাই বটে, তবে তিনিও মাসিক পত্র লইয়া কাজ করেন, আমিও মাসিক পত্র লইয়া কাজ করি। কাজেই সেই হিসাবে আমি তাঁর সমব্যবসায়ী, তাই তিনি কৃপা করিয়া আমার এখানে আসেন।" রামানন্দবাবুর বিনয়ও ছিল অসামান্য, অথচ যেখানে তেজস্বিতার প্রয়োজন সেখানে তিনি ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা।

সেই সময় দেখিলাম বামনদাসবাবুর ও শ্রীশবাবুর বিরাট গ্রন্থাগারকে তাঁহার কাজের জন্য তিনি তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে অপূর্ব সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই জ্ঞানভাণ্ডার হয়তো অনেকেরই থাকিতে পারে, কিন্তু নব নব উদ্যোগের জন্য সাহস ও নূতন সব মহাসত্যকে চিনিবার মত মনীষা তো সকলের থাকে না।

ইহার কিছু দিন পূর্বে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দবাবুর পরিচয় হইতেই রামানন্দবাবু বলিলেন, "প্রবাসীকে সচিত্র করিতে চাই, আপনাদের ছবিগুলি যদি পাই তবে তাহা ছাপিবার ব্যবস্থা করিতে পারি।" এই নূতন প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে হয়তো তাঁহার বিপদ হইতে পারে অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাহা জানাইলেন তবু রামানন্দবাবু ভয় পাইলেন না। তখন নানাবর্ণ চিত্র হয় নাই। বাংলা দেশে তখন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় হাফ্‌টোন লইয়া ব্রতী ছিলেন। কাজেই এই সব নানাবর্ণের চিত্র কি ভাবে ছাপা যায় তাহার পরামর্শ করিতে রামানন্দ বাবু গেলেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের কাছে।

চিন্তামণিবাবু আর এক অপূর্ব কর্মবীর। তিনি প্রায় নিঃসম্বল অবস্থা হইতে নিজ চরিত্র ও কর্মবলে বিরাট প্রেস গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আমার এখানে ভাল জার্মান কারিকর আছে। যদি এখানে লোক পাঠান তবে তাদের শেখাতেও পারি আর রঙীন ছবি ছাপাতেও পারি।" তখন এইরূপ কারিকর য়ুরোপ ছাড়া কোথাও মিলিত না।

চিন্তামণিবাবু ও রামানন্দবাবু দুই জনে পরস্পরের

সহায় হইলেন। রামানন্দবাবুর অন্তরে দেশীয় শিল্প-সাহিত্যের সেবার প্রেরণা। সেই প্রেরণা ও ভগবানের আশীর্বাদ লইয়া বিনা পুঁজীতে রামানন্দবাবু অসীম সাহসিকতার সহিত ইণ্ডিয়ান আর্ট নামে প্রসিদ্ধ এই নূতন প্রণালীর ছবিগুলি ছাপিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইণ্ডিয়ান আর্ট তখন দারুণ প্রতিকূলতার পথে অগ্রসর হইতেছে। অবনীন্দ্র বাবুর নিজ বাড়ীতেও এই ছবির প্রতি তখন ছিল দারুণ প্রতিকূলতা। শুধু গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-সমরেন্দ্র তিন ভাই পরস্পরের সহায় এবং রবীন্দ্রনাথ আছেন অভয়দাতা। তবু রামানন্দবাবু ভারতীয় এই শিল্পরীতির ভিতরের সার সত্য উপলব্ধি করিলেন এবং দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন। আজ যে ঘরে-ঘরে ইণ্ডিয়ান আর্ট ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ "প্রবাসী" আর "মডার্ণ রিভিয়ু"। কলামগুলীর কোনো কাগজের চেষ্টায় হইলে আজ পর্য্যন্ত এই সব চিত্র দুই-চার জন মাত্র বিশেষজ্ঞের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত।

রামানন্দবাবু তো শিল্পী নহেন তবে এই নবশিল্পের মহত্ত্ব তিনি বুঝিলেন কেমন করিয়া? অল্পবাক্ হইলেও রামানন্দবাবুর মধ্যে চমৎকার রস ও সৌন্দর্য্যের জ্ঞান ছিল। এবং ঘনিষ্ঠ হইয়া দেখিয়াছি অন্তরঙ্গদের মধ্যে তিনি বেশ মন খুলিয়া মজলিশও জমাইতে পারেন। সেই শক্তিটা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে ক্রমশঃ পরিণত হইতে দেখিয়াছি। এই সব কথা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র তিনি ইহাকে তাঁহার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা সমর্পণ করিলেন। চারিদিকের নিন্দা গঞ্জনা প্রভৃতি কিছুই তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। যেখানে শ্রদ্ধা করিতেন সেখানে আপনাকে নিঃশেষে দান করিবার মত মনে বলিষ্ঠতা এই রাঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণটির ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার এমন একটি অনুরাগ ছিল যে তাহার জন্য তিনি কোন বিপদ বাধাতেই ভীত হন নাই ও বিরুদ্ধ কোন সমালোচনাতেই টলেন নাই।

এই বলিষ্ঠ স্বদেশানুরাগের জন্যই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁহার গভীর একটি যোগ ঘটিল। ঠিক সাল আমার মনে নাই, বোধ হয় ১৯০৬ সালে ভগিনী নিবেদিতা কিছু দিন কাশী তিলভাণ্ডেশ্বরে একটি বাড়ীতে বাস করেন। তিনি এক দিন রামানন্দবাবুর "প্রবাসী"র প্রচুর প্রশংসা করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কেমন করিয়া "প্রবাসী"র প্রশংসা করিলেন ইহাই ভাবিতেছিলাম, কারণ 'প্রবাসী' ত বাংলা কাগজ। তবু দেখিলাম 'প্রবাসী'র সব মতামত, সব খোঁজ-খবর তিনি রাখেন এবং রামানন্দবাবুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন। ভগিনী নিবেদিতা এক দিন কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "এই যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ-দুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন এক দিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনাপ্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র এক দিন আরও প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।

হয়ত এই প্রেরণার তাগিদ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াই এই সময়ে রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপালের পদত্যাগ করেন। ইহাও সত্য যে কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও তাঁহার মতভেদ ঘটিতেছিল। তবু তখন তিনি পরিবার-ভারগ্রস্ত, আত্মীয়স্বজনদিগকেও অনেক সাহায্য করিতে হয়, 'প্রবাসী'তে তখনও লাভ দাঁড়ায় নাই। কিন্তু এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ এই সব কিছু না ভাবিয়া তাঁহার কর্মে ইস্তাফা দিলেন। ইহাতে আর একজন রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণের কথা মনে হয়, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়েরই জন্মভূমি রাঢ়দেশে, কাছাকাছি স্থানে। এই তেজস্বিতার জন্যই তিনি লীগ অফ নেশ্‌নস্‌-এ নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াও পাথেয় বাবদ বহুসহস্র টাকা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সরল অনাড়ম্বর ব্রাহ্মণ বলিয়াই তিনি নিজের এই স্বাধীনতাটুকু বলি দিলেন না। তাঁহার পক্ষে এতগুলি টাকা অস্বীকার করা বড় সহজ কথা নয়।

এই ঘটনার পরেই ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে রামানন্দবাবু সমস্ত ভারতের অন্তরের বেদনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য 'মডার্ন রিভিয়ু' কাগজখানা বাহির করিলেন। তখন তাঁহার হাতে অর্থ নাই, চাকুরী ছাড়িয়াছেন, অথচ 'প্রবাসী'র সঙ্গে 'মডার্ন রিভিয়ু'রও দায় কাঁধের উপরে। সকল দায় তিনি নির্ভয়ে গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার কাগজের ও চিত্রাদির ছাপার বিষয়ে সর্বভাবে সহায়তা তিনি পাইলেন চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের কাছে এবং কাগজের বিষয়-বস্তুর কাজে সহায়ক ছিলেন শ্রীশবাবু ও বামনদাসবাবু। তবে সকলের উপরে ছিল তাঁহার আপনার অন্তরের প্রেরণা, স্বদেশপ্রীতি ও ভগবানের উপর নির্ভর।

পরে 'মডার্ন রিভিয়ু' বাহির হইবার পর ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হইলে আমি বলিয়াছিলাম, "আপনার সেই ভবিষ্যদ্বাণী এত দিনে সফল হইয়াছে। কিন্তু আপনি এত আগে হইতে কি করিয়া এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন?" ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, "গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার

মতই তাহাতে আলোকশক্তি দেন। এই যে একটি প্রদীপ জ্বলিল দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। তখনই বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ-প্রদীপ হইবে। আলোকস্তম্ভের মহাদীপের মত যেই শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতেই নিঃশেষিত হয়?"

ভগিনী নিবেদিতা আর এক দিন বলিয়াছিলেন, "ভারতের অন্তর্গূঢ় ব্যথাকে প্রকাশের ভার যাঁহাকে বিধাতা দেন তাঁহার কি আর চাকুরী করা চলে? শুধু বাংলার কথা বলিয়াই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, তাঁহাকে সকল ভারতের কথা বলিতে হইবে এবং সকল জগতের কথাও ভুলিলে তাঁহার চলিবে না। তিনি বাঙ্গালী, তিনি ভারতীয়, তিনি বিশ্ববাসী।"

এলাহাবাদে রামানন্দবাবুদের চেষ্টাতেই বাঙ্গালীদের বাংলা শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা হয়। সেই সূত্রেই তিনি শ্রীযুত নেপালচন্দ্র রায়কে এলাহাবাদে লইয়া যান। দাসাশ্রমের সেবার সঙ্গী ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ও এই উপলক্ষে এলাহাবাদে যান। ইঁহাদের সরস ও সর্ব্বাঙ্গীণ চেষ্টায় এলাহাবাদে বাঙ্গালীদের জীবন ও বাঙ্গালী ছাত্রদের শিক্ষা যে কিরূপ জীবন্ত ও আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তখনকার এলাহাবাদবাসীরা এখনও বলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে-সব বক্তৃতা ও সভাসমিতির ব্যবস্থা ইঁহারা করিতে লাগিলেন তাহা সেখানকার কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। রামানন্দবাবু চিরদিন স্বাধীনতার উপাসক পরম দেশভক্ত। সেখানে লাটের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি বিদেশী পোষাক পরিতে হইবে বলিয়া নিমন্ত্রণ অস্বীকার করেন।

এই সব নানা কারণে ক্রমে সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। এ দিকে কায়স্থ পাঠশালারও কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর 'মডার্ন রিভিয়ু' কাগজের জন্য হয়তো তাঁহার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনও হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ নানা হেতুতে ১৯০৮ সালে রামানন্দবাবু এলাহাবাদ ছাড়িলেন।

নেপালবাবুও অনুরূপ সব কারণে এলাহাবাদ ছাড়িতে বাধ্য হন এবং সরকারের বিরাগভাজন ছিলেন বলিয়া এক বন্ধুর নামে ভারত-ইতিহাসের গল্প লেখেন। ভারত-ইতিহাস শিক্ষা ইহাতে ছেলেদের পক্ষে অনেক সরস হইয়াছে। পরে অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের আগ্রহে নেপালবাবু দিন কয়েকের জন্য শান্তিনিকেতনে আসিয়া এখানেই দীর্ঘকাল রহিয়া গেলেন। নেপালবাবুর শেষ জীবনের সাধনার প্রধান ভূমি হইয়া দাঁড়াইল শান্তিনিকেতন।

নেপালবাবুকে আমি আগেই জানিতাম। লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। চারুবাবু এলাহাবাদে গেলেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাজে কিন্তু তাঁহার প্রধান উপজীব্য হইল রামানন্দবাবুর সাহচর্য্য। এই চারুবাবু ও নেপালবাবুর মারফতে আমার রামানন্দবাবুর সঙ্গে যোগ গভীরতর হয়।

যখন রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালার কাজ ছাড়েন তখন পঞ্জাবে ও নাগপুরে শিক্ষাকার্য্যে তাঁহার ডাক পড়ে। চিন্তামণিবাবু তখন তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান প্রেসের ভার দিয়া প্রচুর বেতন ও লাভের ভাগ দিতে চাহেন। তাহা হইলে রামানন্দ বাবুর কোনো আর্থিক দুর্ভাবনাই আর থাকে না। কিন্তু তখন তাঁহার অন্তরে আসিয়াছে যে প্রেরণা সেই প্রেরণাই তাঁহাকে এই সব আরামের বন্ধনের মধ্যে বদ্ধ হইতে দিল না।

শুনিয়াছি এক সময় তিনি অন্ধদের জন্য অক্ষর-রচনা করিয়াছিলেন। এখন তিনি ভারতের অন্তর্গূঢ় মূক বেদনাকে প্রকাশ দিতে চাহিলেন। আমাদের দেশে চলিত কথায় আছে ভগবানের কৃপায় "অন্ধে দেখে বোবায় গায়"। তাঁহার মধ্যেও অন্ধকে দেখাইবার এবং বোবাকে বলাইবার এই যে সাধনা তাহা ভগবানেরই প্রেরণা বলিয়া তাঁহাকে আজ নমস্কার করি।

এলাহাবাদ এই মুক্তসাধককে কোনো বাঁধনেই বাঁধিতে পারিল না। ১৯০৮ সালে তিনি কলিকাতা আসিলেন। ঘটনাক্রমে আমিও ১৯০৮ সালে পঞ্চনদ প্রদেশের হিমালয় ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনে আসিলাম। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দবাবুর যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাতে আমাদের সঙ্গে তাঁহার যোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁহার যোগের কথা প্রসঙ্গান্তরে হইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবনস্মৃতি"-তে বাল্যে ও তরুণ অবস্থায় তাঁহার রস-পিপাসু চিত্তকে সাহিত্য-রস দিয়া উদ্বুদ্ধ বা উজ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিতে যে যে বস্তু বা অবস্থা সহায়ক হইয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ অথবা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন-ভারত-বিদ্যা-বিৎ ও শিক্ষাব্রতী রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর কথা বলিয়াছেন। প্রয়াগ হইতে ১৩০৮ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমার বয়স ১১ কি ১২ বৎসর। প্রবাসী বাহির হইবার পাঁচ ছয় মাস কি এক বৎসর পরে, ইহার প্রথম সংখ্যাখানি আমার হাতে কি করিয়া আসিয়া পড়ে। এখনও পর্য্যন্ত সেখানি আমি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। বেশ মনে পড়ে, ইহাতে প্রকাশিত অজন্তা-চিত্রাবলী সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ—কাহার লেখা, তাহার উল্লেখ নাই*—প্রাচীন ভারতের চিত্রে ধৃত কল্পলোকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। প্রথম-প্রথম কয়েক বৎসর 'প্রবাসী' নিয়মিত পড়িতে পাইতাম না; কিন্তু এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলেজে ভর্ত্তী হইলাম, সঙ্গে-সঙ্গে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সদস্য হইলাম, তখন ইন্‌স্টিটিউটের গ্রন্থাগারে নিয়মিত 'প্রবাসী' পাঠ করিবার সুবিধা হইল। এখন এই ঘটনার প্রায় ৪০ বৎসর পরে, অতীত জীবনের কৈশোর ও যৌবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং নিজ মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি—সাহিত্যের অমৃত রসের দ্বারা চিত্তের প্রসারণে ও পরিপোষণে 'প্রবাসী' পত্রিকা হইতে যাহা লাভ করিয়াছি তেমন বোধ হয় অতি অল্প কয়েকটী বস্তু ছাড়া আর কিছু হইতে লাভ করিতে পারি নাই। 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'বান্ধব', 'সাহিত্য' প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পত্রিকার পরে, এই গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র যুগই চলিয়া আসিয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে 'নারায়ণ', 'সবুজ পত্র', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' প্রভৃতি বিভিন্ন-ধর্ম্মী কয়েকটী পত্র-পত্রিকার উদয় ও অস্তগমন ঘটিয়াছে; কিন্তু 'প্রবাসী' যেন এত দিন ধরিয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। 'প্রবাসী'র এই সম্মাননীয় প্রতিষ্ঠা যে রামানন্দ-বাবুর ব্যক্তিত্বের কল্যাণেই ঘটিয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। 'প্রবাসী' ও পরে ইহার সঙ্গে-সঙ্গে 'মডার্ন রিভিউ', এই পত্রিকা দুইটী সারা বাঙ্গালা দেশের ও ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। তাহার মূলে ছিল রামানন্দ-বাবুর সত্য-নিষ্ঠা, তাঁহার সহজ সাহিত্য-বুদ্ধি, এবং তাঁহার নির্ভীক দেশসেবা। তিনি উচ্চশিক্ষিত শিক্ষাব্রতী অবস্থায় মাসিক পত্র সঞ্চালনের ভার গ্রহণ করেন; শিক্ষার সহিত তাঁহার প্রথম জীবনে যে যোগ ছিল তাহাতে শিক্ষকের প্রাপ্য মর্য্যাদা তিনি নিজ পাণ্ডিত্য ও চারিত্র্য-গুণে অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি যখন পত্রিকা-সম্পাদকত্ব বরণ করিয়া লইলেন তখন সেই মর্য্যাদা তাঁহার আসনকে মহীয়ান্ করিয়া রাখিল—সমাজচক্ষে একাধারে তাঁহার স্থান হইল শিক্ষা-গুরুর এবং সাহিত্যিকের, চিন্তা-নায়কের এবং রস-পরিবেশকের। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে creative artist অর্থাৎ রসস্রষ্টা বলিলে যাহা বোঝায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেরূপটী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবনের সমালোচক, জনগণের ও শাসকবর্গের বিবেকের উদ্বোধক; তবে পত্রিকা-সম্পাদকের কাজে তাঁহার মত শিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তির আগমনে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে নূতন সাড়া পড়িয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাগ্রহ সহযোগিতা, প্রথম হইতেই নিজ ব্যক্তিত্বের বলেই তিনি পাইলেন; 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রয়াগ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব হইতেই ইহা বাঙ্গালাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মনীষার সর্বপ্রধান প্রকাশ-ভূমি হইয়া দাঁড়াইল;* ক্রমে 'প্রবাসী'র মধ্যে স্থান পাওয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে to be a peer of the Gods-এর মত সমস্ত উদীয়মান সাহিত্যিকের কাম্য হইল। কলেজে

* প্রবাসী-সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত। প্রঃ সঃ

* প্রয়াগে থাকিতেই প্রবাসীতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতা, 'গোরা' উপন্যাস ইত্যাদি প্রয়াগে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৺বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ৺দেবেন্দ্র সেন, যোগেশচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালের সকল লেখকের নামের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রঃ সঃ

পড়িবার কালে এবং তাহার পরে বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাব যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা আমরা 'প্রবাসী'র মাধ্যমেই পাইতাম; সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রধান দর্শন-ঝরোখা ছিল 'প্রবাসী'র পত্র, সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-রসিকগণ সেখানেই মাসের পর মাস নিয়মিতভাবে তাঁহার রচনার দর্শন পাইত। শুধু রবীন্দ্রনাথ নহে; বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রস-সাহিত্যের সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ লেখকগণও এইরূপে যথাসম্ভব নিয়মিত 'প্রবাসী'তে প্রকট হইতেন। 'প্রবাসী'র সহায়তায় এই যুগের বহু প্রথিতনামা লেখক বাঙ্গালী পাঠকগণের সমক্ষে পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। আর আমরা যাহারা লেখক ছিলাম না, আগ্রহবান্ পাঠক ছিলাম, আমরা মাসের পর মাস উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতাম, কবে মাস-পয়লা হইবে, 'প্রবাসী' দেখিতে পাইব। সে আগ্রহ ভুলিবার নহে। ইন্‌স্টিটিউটের পাঠাগারে আমরা সকাল-সকাল আসিয়া উপস্থিত হইতাম; গ্রন্থাগারের খাতায় জমা হইলেই এবং 'প্রবাসী'তে ইন্‌স্টিটিউটের রবারের সীল-মোহরের ছাপ পড়িলেই, অপেক্ষমাণ তিন-চারিজনের মধ্যে প্রায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। যিনি প্রথম দখল করিতেন, সেদিনের মত তিনি 'প্রবাসী' ছাড়িতেন না; প্রথমেই ধরিতেন ধারাবাহিক গল্প রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' কিংবা প্রভাতকুমারের 'নবীন সন্ন্যাসী' তার পরে নানা তথ্য-পূর্ণ বা বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধ তো আছে, ছোট গল্প আছে, এবং রামানন্দবাবুর 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' আছে; কিছুই বাদ যাইত না। আর সকলে হতাশ হইয়া একবার 'প্রবাসী'খানি চাহিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতাম, প্রথম দখলকার ঔদার্য্যের সঙ্গে আমাদের দেখিতে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পড়িতেন এবং 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য পথ চাহিয়া থাকিতেন, আমাদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তদপেক্ষা কম ছিল না। ইংরেজী 'মডার্ন রিভিউ'-র জন্যও আমাদের এই রূপই আগ্রহ হইত এবং 'মডার্ন রিভিউ'-র চাহিদা কিছু কম ছিল না। কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইবার পরে দক্ষিণের তেলুগু তমিল মারাঠী যুবকদের কাছে শুনিয়াছি, কাশীর সাধারণ পাঠাগার কারমাইকেল লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি, এলাহাবাদের, লাহোরের কলেজের ছাত্রদের কাছেও জানিয়াছি, 'মডার্ন রিভিউ'-র জন্য শিক্ষিত জনগণের আগ্রহ সেই রকমই ছিল—এবং এখনও বহুল পরিমাণেই আছে।

বৎসরের পর বৎসর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র বিভিন্ন মাসের সংখ্যা ধরিয়া, বাঙ্গালা দেশের তথা ভারতবর্ষের এই ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখিতে পারা যাইবে; এইরূপ ইতিহাস লিখিতে হইলে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র ফাইল বা পূর্বাপর সংগ্রহ অপরিহার্য্য হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিতে 'প্রবাসী'র কার্য্য সম্বন্ধে আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি লিখিবেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' আরও দুই-তিনটী কাজ হাতে লইয়া ও সেগুলিতে আত্মনিয়োজিত হইয়া, আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে ও প্রবর্ধন করিতে এবং আধুনিক হিন্দু জাতির মধ্যে আত্মমর্য্যাদা-বোধ ও সংহতি-শক্তি জাগাইয়া তুলিতে সমগ্র ভারতীয় জনগণের যে উপকার করিয়াছে, তাহা আর কোনও পত্র-পত্রিকার অথবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করার সৌভাগ্য হয় নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার কঠিন সংঘাতে আমাদের শিক্ষিত জন আপনার অজ্ঞাতসারে নিজ সংস্কৃতির মৌলিক প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিল, নিজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে যে সত্যকার উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল, একদেশদর্শী বিদেশী সভ্যতার ও দৃষ্টিভঙ্গীর মোহে পড়িয়া সে উৎকর্ষ সম্বন্ধে বোধশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, একদিকে স্বদেশে ও বিদেশে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা বিশেষ জোরের সঙ্গেই চলিতে থাকায়, এবং স্বদেশে মধ্য-যুগের ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে নূতন করিয়া আমাদের পরিচয় ঘটিতে থাকায়, ইউরোপীয় সাহিত্য আমাদের কাছে কোনও-কোনও বিষয়ে আদর্শ বলিয়া আদরণীয় হয় এবং আমাদের সাহিত্যের সত্যকার মূল্য যাচাই করিবার কষ্টিপাথর রূপে কার্য্যকর হয়; ইহাতে আমরা সাহিত্য বিষয়ে শীঘ্রই, অর্থাৎ বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করিয়া ইহার চতুর্থ পাদে, স্বারাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদের দেশের প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সাহিত্য চেষ্টার মূল্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হই, আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীনের যোগ বা পারম্পর্য্য রক্ষা সম্বন্ধে কতকটা অবহিত হই—আধুনিকতাকে বর্জন করিয়া নহে, বরং যথাসাধ্য আমাদের জীবন-প্রবাহের উপযোগী করিয়া লইয়া। সাহিত্য বিষয়ে এই emancipation বা নিষ্কৃতির ফলে আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একজন বঙ্কিমচন্দ্র, একজন মধুসূদন ও একজন রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছি।

সাহিত্য ভিন্ন অন্য প্রকাশাত্মক কলার মধ্যে সঙ্গীতে

বিশ্বমানব সমক্ষে আমরা এখনও তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারি নাই, যদিও আমাদের সঙ্গীত নিজ বিশিষ্ট পথে 'স্বে মহিম্নি' অর্থাৎ আপন বিশেষ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের নিজের ইতিহাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী লক্ষণীয় নবীন বিকাশ ঘটিয়াছে। উত্তর-ভারতের তানসেন কর্তৃক বিশেষভাবে যাহার গৌরব বর্ধিত হইয়াছিল, সেই 'ধ্রুপদ' সঙ্গীত, দক্ষিণ-ভারতের ত্যাগরায় কর্তৃক পরিবর্ধিত 'কীর্তনম্' সঙ্গীত, বাঙ্গালা দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তিত 'কীর্তন', পাঞ্জাবের শোরী মিয়াঁর 'টপ্পা', মধ্য ভারতের গায়কদের 'দাদরা',—অতীত যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের এই-সব বিভিন্ন প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা সুর এবং রীতিকেও ধরিতে হয়। কিন্তু ইউরোপের সঙ্গীতের harmony অর্থাৎ বিবাদীর আধারে গঠিত সংবাদী রীতি আমরা এখনও গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়া, আমাদের সঙ্গীত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারদের composition বা কৃতির পাশে স্থান করিয়া লইতে পারিতেছে না; অদূর ভবিষ্যতে যিনি ইউরোপের harmony ভারতীয় সঙ্গীতে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারিবেন, তিনি যে এ বিষয়ে যুগ-প্রবর্তক হইবেন, সন্দেহ নাই; এবং এ বিষয়ে অল্প-স্বল্প চেষ্টা যাহা হইতেছে, তাহা হইতে যুগ-প্রবর্তকের আগমনের আভাস পাইতেছি।

রূপ-শিল্পে ইংরেজের ছোঁয়াচে পড়িয়া আমরা একেবারে রসবোধ-হীন দৃষ্টিশক্তি-হীন বর্বর বনিয়া যাইতেছিলাম। ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজী শিল্পের ও শিল্প বিষয়ে ধারণার প্রভাবে পড়িয়া গিয়া, আমরা রূপ দেখিবার মত চোখ এবং রূপ ধরিয়া রাখিবার মত হাত দুই-ই হারাইয়া ফেলিতেছিলাম। পতনের যুগের গ্রীক ও রোমান ভাস্কর্য্য এবং রেনেসাঁস যুগের চিত্র, এই দুইয়ের নাম লইয়া মাতিয়া গিয়াছিলাম। ভারতীয় শিল্পের প্রতি আমরা তাকাই নাই, তাকাইবার অবকাশ ও সুযোগ দুই-ই ছিল না। আমরা অজ্ঞ, রসহীন এবং অনুভূতিহীন ইংরেজ শিল্পী ও শিল্প সমালোচকদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া, উৎসাহের সঙ্গে বড় গলা করিয়া বলিতেছিলাম—ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্প জানিত না, তাহারা এতাবৎ যাহা করিয়াছে, তাহা, সত্য কথা বলিতে গেলে আদিম জাতিরই মতন, শিশু-চেষ্টিতের মতন, প্রৌঢ় সুসভ্য জাতির উপযুক্ত শিল্প তাহা নহে। 'প্রবাসী' প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে এইরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে কতগুলি জিনিস দেখা দিল। সেগুলির ফলে ভারতে জাতীয়-শিল্প বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিকোণ বদলাইয়া গেল, ভারতীয় শিল্পেতিহাসের ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া নূতন করিয়া এক অভিনব শিল্প-রচনার ধারা প্রবর্তিত হইল,—আমরা শিল্প-বিষয়ে আবার জাতীয় প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম, ভারত-শিল্পের এক নবযুগ আরম্ভ হইল। তখন এদিকে শিল্পকলাবিৎ রসিকের চোখে দেখিবার লোক খুব কম-ই ছিল, বেশীর ভাগ লোক-ই—ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ-যুক্ত বুদ্ধিমান্ লোকও অনেক ছিলেন—এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর এবং নূতন শিল্পবিষয়ক জাগৃতির ও শিল্প-প্রচেষ্টার বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সবল ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং সহজ ও সুবুদ্ধি-যুক্ত রসবোধ প্রথম হইতেই এই নবীন শিল্পের অনুকূলে নিজ মত এবং কর্তব্য ঠিক করিয়া লইয়াছিল এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' উভয় পত্র, বহুবর্ণ চিত্রের নিয়মিত প্রকাশ দ্বারা ও এই জাতীয় চিত্রের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী এবং প্রবন্ধ দ্বারা, ভারতের পুনরুজ্জীবিত চিত্রকলার সাদর আহ্বান করিয়াছিল, এবং সোৎসাহ প্রচারের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে অমূল্য সহায়তা করিয়াছিল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'তে প্রকাশিত চিত্রাবলী পৃথক্ আকারে Chatterjee's Picture Albums-এর আঠারোটী খণ্ড এই নবীন চিত্রকলার classic বা প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ রচনার প্রকাশক স্বরূপ হইয়া আছে। ইহার জন্য ভারতীয় ও বৈদেশিক কলারসিক এবং নবীন চিত্রকর-গোষ্ঠীর চিত্রকরেরা, উভয়েই রামানন্দ-বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

পনেরোর ও ষোলোর শতকে যখন পোর্তুগীসেরা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিতে চাহিল, ইতালীয় নাবিক কলম্বসের নেতৃত্বে স্পেনীয়েরা আমেরিকা আবিষ্কার করিল, পোর্তুগীস নাবাধ্যক্ষ ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিলেন, পোর্তুগীস নাবিক Magelhaens মাঝেল্যাইশ্ বা Magellan মাজেল্লান-এর নৌবহর ভূ-গোলক প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল, তখন ইউরোপের কতকগুলি কর্মী জাতির লোকেরা সমগ্র পৃথিবী জয় করিবার এবং পৃথিবীময় আধিপত্য বিস্তার করিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাহির হইল। স্পেনীয় লোকেরা আমেরিকা জুড়িয়া বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করিল, পোর্তুগীসেরা আফ্রিকায় ও প্রাচ্যে ভারতের উপকূলে ও দ্বীপময় ভারতে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল, তাহাদের পায়ে-পায়ে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী, এমনকি দিনেমার ও জরমান গিয়া হাজির হইল। ষোলোর সতেরোর ও

আঠারোর শতক—এই তিন শ' বৎসর ধরিয়া আমেরিকা আফ্রিকা ও এশিয়ায় ইউরোপীয়দের অবাধ ধন-সংগ্রহ চলিল; ব্যবসায় দ্বারা এবং লুণ্ঠন দ্বারা। কল্পতরু এশিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধিদোহন কার্য্য যখন চলিতেছে, তখন ইউরোপের জ্ঞানীরা, ভাবুকেরা ও তত্ত্বান্বেষীরা চাহিলেন এশিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তা দর্শন আদির ভাণ্ডার খুলিয়া দেখিতে—আর্থিক সমৃদ্ধির পিছনে তাঁহারা মানসিক ও পারমার্থিক সম্পদের কথা ভাবিলেন। আঠারোর শতকের শেষ পাদে সংস্কৃত ভাষা ইউরোপের জিজ্ঞাসুদের সমক্ষে দেখা দিল—ইতিপূর্বেই আরবী, ফারসী ও চীনা ভাষা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন —ভারতের হিন্দু জগতের, ইস্লামীয় জগতের এবং চীনা জগতের ভাব-সম্পদ্ শতবর্ষের মধ্যে ইউরোপের পণ্ডিতদের দ্বারা বিশ্বমানব সংস্কৃতির সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

বাকী রহিল প্রাচ্যের রূপকলা; তাহারও প্রতি বিশ্বন্ধর বা সর্বগ্রাহী সুসভ্য পাশ্চাত্ত্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, উনিশের শতকের শেষ পাদে; ফেন্নেলোসা প্রমুখ দুই-চারি জন সত্যকার শিল্প-রসিকের চোখে জাপান ও চীনের শিল্পের মহনীয় ও লোকোত্তর সৌন্দর্য্য ধরা দিল। পরে ইস্লামীয় শিল্প ও ভারতের হিন্দু শিল্পও আর অজ্ঞাত রহিল না; এবং তদনন্তর আফ্রিকা ও আমেরিকা এবং ওশে-নিয়ার আদিম শিল্পকলাও আত্মপ্রকাশ করিল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে জাপানীদের ও পরে চীনাদের চোখ খুলিল, তাহারা নিজ প্রাচীন শিল্পের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিল। এ বিষয়ে তাহারা প্রথম ইউরোপীয়দের মুখেই ঝাল খাইয়াছিল। জাপানে, সম্ভবতঃ ১৯০১ সালে আমেরিকার চীন-জাপান-শিল্পকলাবিৎ পণ্ডিত ফেন্নেলোসার বন্ধু কাকুজো ওকাকুরার চেষ্টায়, Nippon Bijitsu-In নিপ্পোঙ্ বিজিৎসু-ইঙ্ নামে জাপানে স্বদেশীয় শিল্পের অনুরাগীদের একটা পরিষৎ স্থাপিত হইল, এই পরিষদের চেষ্টায় জাপানে শিল্প-বোধ সম্বন্ধে একটা যুগান্তর আসিয়া গিয়াছে। ওকাকুরা ভারতে আসিয়াছিলেন, ভারতীয় শিল্পী ও চিত্রকরদের সঙ্গে তিনি মিলিত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় শিল্পের কতকগুলি ইউরোপীয় অনুরাগী এবং কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারের শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গগনেন্দ্রনাথ ও অন্য কয়জন উচ্চ সংস্কৃতিযুক্ত ভারতীয়, শিল্পের চর্চায় সমবেত হইলেন; হাইকোর্টের জজ স্যর জন্ উড্রফ, সুইডেন হইতে আগত বণিক হ্যাল্মার পণ্টেন্-মোলর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংরেজ ব্যবহারজীবী ব্লাণ্ট, প্রভৃতি সকলে মিলিয়া Indian Society of Oreintal Art স্থাপন করিলেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতশিল্পের সৌভাগ্য বশে ইহার কিছু পূর্ব হইতে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য E. B. Havell হাভেল সাহেব। তিনি অবনীন্দ্র-নাথকে খুঁজিয়া পাইলেন, এবং কলিকাতা আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথকে তাঁহার সহকর্মী করিয়া লইলেন। অবনীন্দ্র-নাথের প্রতিভা তখন আত্মপ্রকাশের অবকাশ পাইল; তিনি আর্ট স্কুলে নন্দলাল, পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বেঙ্কটাপ্পা, শমী-উজ্জমান প্রভৃতি ছাত্রদের লইয়া, আধুনিক ভারতে চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন করিলেন। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। কলিকাতায় Indian Society of Oriental Art-এর প্রচার এবং আর্ট-স্কুলের অবনীন্দ্র-শিষ্যদের প্রতিভা, উভয়ের মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিল। সোসাইটিতে এবং আর্ট স্কুলে এই নবীন শিল্পীদের ও তাঁহাদের গুরু অবনীন্দ্রনাথের ছবির বাৎসরিক প্রদর্শনী হইতে লাগিল। ইতিপূর্বে গুণগ্রাহী হাভেল সাহেব আর্ট-স্কুলের চিত্র সংগ্রহে অবনীন্দ্রনাথের ছোট-ছোট কয়খানি ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন—ভারতের শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এই ছবি কয়-খানির মূল্য অসাধারণ—'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'অভিসারিকা' ও 'মেঘবিহারী সিদ্ধদ্বন্দ্ব' (মেঘদূত), 'গ্রীষ্ম' ও 'শীত' (ঋতু-সংহার) এবং 'দীপাবলী', এগুলি কাগজে আঁকা, এবং দুই-খানি ফ্রেস্কো অর্থাৎ ভিত্তি-চিত্র বা আরায়েশ-চিত্র—'কচ ও দেবযানী' ও 'রাধাকৃষ্ণ'। হাভেল সাহেব আর একটা বড় কাজ করিয়াছিলেন—আর্ট-স্কুলের চিত্র-সংগ্রহে কতক-গুলি বাজে ইউরোপীয় তৈলচিত্র ছিল, সেগুলি বিক্রী করিয়া, লব্ধ অর্থে তিনি একটী অতি মূল্যবান প্রাচীন ভারতীয়—মোগল রাজপুত ও অন্যবিধ (তিব্বতী প্রভৃতি)—চিত্রের সংগ্রহ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কেবল এই কাজের জন্যই আমাদের তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে হাভেল সাহেব লণ্ডনের বিখ্যাত শিল্পকলা-বিষয়ক পত্রিকা Studio-তে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান্ রঙীন ও অন্য ছবি দিয়া একটী প্রবন্ধ লেখেন; ইহার পরে Studio পত্রিকায় হাভেল সাহেবের লেখা রঙ্গীন-চিত্র-সমেত আরও প্রবন্ধ বাহির হয়। এই-সব প্রবন্ধের দ্বারা বাহিরের শিল্প-রসিক ও ভারতীয় এবং অন্য প্রাচ্য শিল্পের অল্প কয়েকজন সমঝদারের নিকট এই-শুভ সমাচার ঘোষিত হয় যে, ভারতে আবার সত্যকার শিল্প-সর্জনের যুগ আসিতেছে। কিন্তু ভারতীয় শিল্পানুরাগীদের কাছে এই শুভ সমাচার প্রথমতঃ

পঁহুছিল, সোসাইটির ও আর্ট-স্কুলের প্রদর্শনীর মারফৎ। এই বার্ষিক প্রদর্শনীগুলিতে একটী উদীয়মান শিল্পগোষ্ঠীর প্রথম শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। আর্ট-স্কুলের একটী প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয়, নন্দলাল ও তাঁহার সতীর্থদের অনেকগুলি লক্ষনীয় কৃতির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। সোসাইটি ক্রমে ইঁহাদের চিত্রের ও প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের একরঙ্গা ও রঙ্গীন প্রতিলিপি বাহির করিতে লাগিলেন, জাপান হইতে অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কতকগুলি, ছবি, রঙ্গীন কাঠে-খোদাই ছাপায় তৈয়ারী করিয়া আনিলেন, নন্দলালের 'নটরাজ' চিত্র ও রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক তিন খানি চিত্র হইতে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষাল কর্তৃক খোদিত-চিত্র রূপে প্লাস্টারে তৈয়ারী করিয়া তাহা হইতে তামায় ঢালাইয়া আনিলেন। এই ভাবে ধনী, গুণগ্রাহী এবং শিল্প-সম্বন্ধে লব্ধচেতন দুই-দশজন ভাগ্যবানের সমক্ষে ভারত-শিল্পের বাণী প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তেমন ইহার খবর তখনও, অর্থাৎ সোসাইটি স্থাপনের পরে প্রথম তিন-চারি বৎসর ধরিয়া, পঁহুছাইতে পারে নাই।

এমন সময়ে ১৯০৭ সালের গোড়া হইতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম হইতেই রামানন্দ-বাবু প্রাণ দিয়া এই নবীন শিল্প-প্রচেষ্টার হামরাহ বা হম্‌রাহী অর্থাৎ সামরথ্য বা এক-পথের-পথিক হইয়া, দেশমধ্যে ইহার প্রচারের ভার লইলেন। ইহাতে তাঁহার লাভ কিছুই ছিল না; মূর্খ ও অজ্ঞ দেশবাসীর নিকট তিনি এই জন্য অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে ভারতের সংস্কৃতির এই অভিনব ও যুগোপযোগী কলাময় প্রকাশের অকারণ-মিত্র ও পৃষ্ঠপোষক রূপে ছিলেন। এই ভাবে শিল্প-বিষয়ে তিনি যে গঠন-মূলক কার্য্য করিয়া গেলেন তাহা অমূল্য। 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী' উভয় পত্রিকাতেই বোধ হয় ১৯০৭ সাল* হইতেই তিনি নিয়মিত ভাবে মাসের পর মাস ধরিয়া অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের চিত্র, ত্রিবর্ণ ব্লকে মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। এই প্রচার-কার্য্যে এবং ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখনে রামানন্দ-বাবু সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দত্ত-চিত্তা ভগিনী নিবেদিতাকে, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারস্বামীকে। প্রথমে সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশের শিল্প-রসিকম্মন্য ব্যক্তিগণ, যাঁহারা তাৎকালীন ইউরোপীয় শিল্পের টলটলায়মান বিচার-ধারার উপরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের শিল্পের হাওয়া বহিতে দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র প্রতিক্রিয়া তাঁহাদের মনের ভিতরে অস্বস্তি আনিয়া দিল। ভারতীয় চিত্রকলা ইউরোপীয় চিত্রের perspective বা পারিপ্রেক্ষিক মানে না, ইহাতে মানুষের দেহ realistic অর্থাৎ বাস্তবানুকারী করিয়া আঁকা হয় না, এইরূপ আপত্তি চারিদিক হইতেই উঠিতে থাকে। কিন্তু ধীরে-ধীরে শিল্পকলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় একটু-একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে-সঙ্গে আমরা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পকে গা-সহা করিয়া লইলাম; যখন দেখিলাম, সারা বিশ্বে ইহার জয়গান হইতেছে, তখন আমাদের পূর্ব-শিক্ষার উপযোগিতা বা মূল্য সম্বন্ধে আমরা একটু সন্দিহান হইতে লাগিলাম। এই ভাবে, মুখ্যতঃ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র মারফৎ রামানন্দ-বাবুর প্রসাদে, বাঙ্গালী ও ভারত-বাসী স্বদেশে শিল্পকলার—চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের—পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইল।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' কর্তৃক এই ভাবে চিত্রময় প্রচারের মাধ্যমে নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভারত-শিল্পের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদের মত দুই-দশ জনের কাছে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ও আনন্দের সংবাদ হইয়াছিল; মনে-মনে আমরা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র এই প্রচেষ্টার শত সাধুবাদ করিয়া আসিয়াছি। বোধ হয় ১৯০৪ সালের শীতকাল, তখন বয়স আমার ১৪।১৫ বৎসর, কলিকাতা Y. M. C. A. Boys Branch অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় যুবসঙ্ঘের কিশোর বিভাগের সদস্য ছিলাম; ঐ বিভাগের পরিচালক পাদ্রি Arthur Lefevre আর্থর লিফিভ্‌র্ সাহেব আমাদের এক দিন আর্ট-স্কুলের ছবির সংগ্রহ দেখাইতে লইয়া যান। সেই দিনটী আমার কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, যদিও তাহার তারিখ ভুলিয়া গিয়াছি। আর্ট-স্কুলে তখন হাভেল সাহেবের সংগৃহীত মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলী দেখিলাম, অবনীন্দ্র-বাবুর ছবি কয়খানি দেখিলাম। যেন নূতন এক কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। মোগল বা রাজপুত—এই নাম জানিতাম না, এরূপ নামকরণ তখনও হয় নাই। চিত্র-গুলির শৈলী বা প্রকৃতিও বুঝিতাম না; কিন্তু এগুলির

---

* Art Society প্রতিষ্ঠিত হইবার বছর দুই আগে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবাসী অবনীন্দ্রনাথের 'সুজাতা ও বুদ্ধ' এবং 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী'র প্রতিলিপি মুদ্রিত করিবার অনুমতি পায়। এই সময় হইতেই প্রবাসীতে মোগল চিত্র, পারস্য শিল্পীর চিত্র ও জাপানী চিত্র প্রকাশিত হইত। প্রঃ সঃ

একটী অভাবনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম। প্রথম দর্শনের পর হইতে আমি মাঝে-মাঝে, বুধবার দিন বিকালে অল্প সময়ের জন্য যখন এই সংগ্রহ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিত তখন, আমার প্রিয় এই ছবিগুলি দেখিতে যাইতাম; এই সংগ্রহের অনেকগুলি ছবির সঙ্গে আমার প্রায় ৪০ বৎসরের সৌহার্দ্য। এই-সব ছবির সুন্দর-সুন্দর রঙ্গীন প্রতিলিপি সহজ-লভ্য হইতে পারিবে, এরূপ চিন্তা তখন স্বপ্নের অগোচর ছিল। কিন্তু যখন অবনীন্দ্রনাথের ছবিগুলি একে-একে রামানন্দ-বাবু তাঁহার পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন, তখন আমার (এবং আশা করি আমার মত দুই-চারিজন ছবি-কাঙ্গাল আধপাগলেরও) আনন্দ ও পুলক বর্ণনার নহে। মাঝে-মাঝে কেবল এই ছবির জন্যই 'প্রবাসী' বা 'মডার্ন রিভিউ' কিনিতাম—এইরূপ 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত চিত্রের একটী সংগ্রহ আমি এই ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছি, সেটী আমার প্রিয় সঙ্গী।

নিজের ব্যক্তিগত কথাটীর উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, রামানন্দ-বাবুর এই সৎকার্য্য তাঁহার অজ্ঞাতে আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ও আনন্দ বিধানে কতটা সাহায্য করিয়াছিল তাহার একটু আভাস ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। সোসাইটি ও আর্ট-স্কুলের দ্বারা আনীত এই শিল্প-বিষয়ক জাগৃতির সহিত রামানন্দ-বাবুর সহযোগিতার ফল আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি। ভারতীয় শিল্পের জয়-জয়কার এখন ভারতময় সর্বত্র। বাঙ্গালাদেশে এই শিল্পের উৎস ছিল বলিয়া, বাঙ্গালা এখন শিল্প-বিষয়ে প্রায় সারা ভারতে পথিকৃতের সম্মান পাইতেছে, বাঙ্গালীকে আধুনিক ভারতের শিল্প-গুরু বলা অসঙ্গত হইবে না। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ এখন ভারতের প্রায় তাবৎ শিল্পকেন্দ্রে শিক্ষক বা নেতার মর্য্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইহার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, তাহার কথা আমরা এখন মনে করি না, যাঁহারা তরুণ তাঁহারা তাহার কল্পনা করিতে পারিবেন না। রামানন্দ-বাবু যে তীক্ষ্নদৃষ্টি শিল্পজ্ঞ বা শিল্প-সমালোচক ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার সহজ সুবুদ্ধি নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া, ভারত-শিল্প তাহার যোগ্য মর্য্যাদা পাইতে পারিয়াছে। Nation-building বা সংগঠন-কার্য্যে রামানন্দ-বাবুর এই সহায়তা যেন আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল স্মরণে রাখি—ভারতীয় শিল্পের কৃতী সন্তানগণের এ বিষয়ে বিশেষ-রূপে অবহিত হওয়া উচিত।

এই সম্পর্কে রামানন্দ-বাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সংযোগের কথার একটু উল্লেখ করিব। কত বার তিনি আমাকে শিল্পানুরাগী জানিয়া কলিকাতার ও অন্যত্র বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনী সম্বন্ধে অথবা বিভিন্ন চিত্রকরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র জন্য কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়া আমায় সম্মানিত করিয়াছিলেন, এবং আমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ খুশী হইয়াই ছাপাইয়াছেন—তাঁহার এই আগ্রহের জন্যই আমার দুই-চারিটী শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধ, লেখাও প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছিল। রামানন্দ-বাবু বোধ হয় ইহাও চাহিতেন যে আমাদের মত শিল্পবিষয়ে ব্যসনী লোকের বিচার-শক্তি লেখা দ্বারা পরিমার্জ্জিত হউক; এই জন্যই তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে উৎসাহ পাইতাম।

রামানন্দ-বাবু 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' আরম্ভ করিয়াছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির একজন উদ্যোগী পরিপোষক-রূপে—ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় জাতীয়তার 'যোগ' অর্থাৎ ইহার পরিবর্ধন এবং 'ক্ষেম' অর্থাৎ ইহার অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ বস্তুর সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁহার অনুপ্রাণনা। ইহার অতিরিক্ত তিনি সত্যের এবং ন্যায়ের উচ্চ আদর্শ লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সত্যাগ্রহ ও ন্যায়নিষ্ঠাই তাঁহার জাতীয়তা-বাদের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। তিনি 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'মডার্ন রিভিউ'র Notes শীর্ষক অংশে নিয়মিত ভাবে ভারত ও বাঙ্গালাদেশের ঘটনা ও কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতেন, এবং নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাহিত্যে এই 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' ও Notes একটী মস্ত বড় স্থান—এবং সম্মাননীয় স্থান—পাইয়া আছে। তাঁহার আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বরাজ্য এবং স্বাধীনতা; এই আদর্শের আবাহনে তিনি অনুচিত ভাষার লঘুতা বা উষ্মা প্রকাশ না করিয়া, কেবল তথ্য ও যুক্তি দ্বারা ভারতের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের কথায় আলোক-পাত করিতেন, এবং ভারত-সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের খণ্ডন করিতেন। সত্য ও ন্যায়ের সেবক হিসাবে, অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের প্রতি তাঁহার দরদ যে থাকিবে তাহা স্বাভাবিক; এবং এই দরদের বশেই তিনি শেষে ধীরে-ধীরে, ভারতের স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণ আদর্শ-গত ঐকমত্য বজায় রাখিয়া, হিন্দুর প্রতি অন্যায় ও অবিচার এবং হিন্দুর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারের হানির বা বিলোপের চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হিন্দু-মহাসভার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘরের ছেলে রামানন্দ-বাবু উপবীত ত্যাগ করিয়া

যৌবনে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন, প্রচলিত 'সনাতন' হিন্দু ধর্ম ও তাহার অনুমোদিত প্রতীকের মাধ্যমে পূজাদি উপসনার অনুষ্ঠান তাঁহার মনোভাবের অনুকূল ছিল না বলিয়া। এরূপ ক্ষেত্রে রুচির স্বস্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিবর্তন করিলে যাহা অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে দেখা যায়, রামানন্দ-বাবুর মনে সেরূপ কোনও গোঁড়ামি বা superiority complex অর্থাৎ আত্মগৌরবের গূঢ়েষণা দেখা দেয় নাই। এদিকে হিন্দু-মহাসভার দ্বারা গৃহীত 'হিন্দু' নামের সর্বব্যাপক সংজ্ঞা, ওদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সুযুক্তি-পূর্ণ নির্দেশ যে ব্রাহ্ম-সমাজ বিরাট্ হিন্দু সমাজেরই এক অচ্ছেদ্য অংশ,* এবং সঙ্গে-সঙ্গে রামানন্দ-বাবুর মনে হিন্দু ইতিহাস, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু কৃতিত্বের প্রতি সত্যনিষ্ঠ, ঐতিহাসিকতা-বোধযুক্ত শ্রদ্ধা; তাহার উপরে এক দিকে ভেদনীতি-মূলক ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মুসলমান-প্রীতির উদ্দেশ্যে হিন্দু-দলন রীতি, মুসলমান-সমাজের একটী মুখর অংশের হিন্দু-বিরোধী মনোভাব, এবং হিন্দুদের মধ্যে সংহতি-শক্তির অভাবে রাষ্ট্রের একতার পক্ষে প্রতিকূল এই-সব শক্তির সমক্ষে অসহায়তা; এই সব দেখিয়া, কর্মী ও বস্তুতান্ত্রিক রামানন্দ-বাবু কেবল গগন-বিহারী আদর্শের বুলি আওড়াইয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই; হিন্দু-মহাসভার সহিত সহযোগিতা করা ছাড়া তাঁহার মত ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে আর কিছুই সম্ভবপর ছিল না; তিনি হিন্দু জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ আপৎকালে 'দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে' বলিয়া, সরিয়া দাঁড়াইবার লোক ছিলেন না; 'হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাসে', 'বাঙ্গালাদেশে হিন্দু হিন্দুকে রক্ষা করিতে চাহে না, হিন্দুর হইয়া একটা কথা বলিবার কেহ নাই, সকলেই উদার-হৃদয়,মুখে বড়-বড় বুলি আওড়ায়; এ অবস্থা, দুঃস্থের প্রতি দরদী রামানন্দ-বাবুর সহ্য হইল না। হিন্দু-মহাসভা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র মত দুইখানি প্রভাবশালী কাগজে রামানন্দ-বাবুর মত কর্মী ও মনীষীর পূরা সহযোগ পাইয়া, আরও শক্তিশালী হইল; দুই-চারিজন অদূর-দর্শী অন্য মতের রাজনৈতিক ইহা দেখিয়া খুশী হন নাই, কিন্তু রামানন্দ বাবু নিজে ইহাতে সৎকর্মের ফল মানসিক শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছিলেন, এবং হিন্দু-মহাসভার মাধ্যমে, ন্যায় ও সত্যের পথে আরও উৎসাহের সহিত দেশের সেবা করিয়াছিলেন। হিন্দু-মহাসভা সম্পর্কে রামানন্দ-বাবুর সম্পাদকীয় মন্তব্য-সমূহ, এবং সাধারণ্যে তাঁহার কার্য্যাবলী, তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সমুদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল। এখানে কর্তব্যের সঙ্গে বিশেষ গঞ্জনা ও ভীতির সমাবেশ ছিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিরোধ-শক্তি আরও কার্য্যকরী হইয়াছিল। মধ্যে কংগ্রেসের পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই মোসলেম-লীগ প্রমুখ ভেদ-নীতি-মূলক মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের খুশী রাখিবার আশায়, হিন্দুর প্রতি নানাবিধ অত্যাচার, হিন্দুর 'চোটী বেটী রোটী'র প্রতিকূলে অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান, হিন্দু নারীর মর্য্যাদা এবং হিন্দুর অর্থনৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে, অভিযানের কথা অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার ফলে, এক প্রকার অভূতপূর্ব ক্লৈব্য আসিয়া, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিতেছিল। ইহার প্রতীকার করা স্বরাজ-সাধনের পথেরই একটী অবশ্য-পালনীয় অঙ্গ বলিয়া রামানন্দ-বাবুর নিকট প্রতিভাত হয়। বিগত কয় বৎসর ধরিয়া 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকীয় টিপ্পনী এবং বিভিন্ন লেখকের ও স্বয়ং রামানন্দ-বাবুর প্রবন্ধ, হিন্দু-মহাসভার সময়োপযোগিতা ও সার্থকতার অকাট্য প্রমাণ-রূপে, ঐতিহাসিক নথীপত্রের ভাণ্ডারে চিরতরে সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

হিন্দু-মহাসভার কার্য্য সম্পর্কে রামানন্দ-বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ডাক্তার মুঞ্জে, ভাই পরমানন্দ, বিনায়ক দামোদর সাবরকর প্রমুখ মহাসভার নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে যে কতটা আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা দেখিবার মত ছিল। তিনি কেবল হিন্দু-মহাসভার নেতাদের নহে—সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর দেশহিতৈষী ও কর্মীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। হিন্দু-মহাসভার ময়মনসিংহ অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেখানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতি হইয়া যান, অবস্থা-গতিকে আমাকেও তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সেখানে হিন্দু-মহাসভা-বিরোধী দল, দুই-একটী বিষয়ে বিভিন্ন-মতাবলম্বী হইয়া, মহাসভার অধিবেশন পণ্ড করিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামানন্দ-বাবুর সুযুক্তি তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য ছিল,—এমন কি সেখানে মারামারিরও সম্ভাবনা ছিল; প্রবীণ রামানন্দ-বাবুর শান্ত ও ধৈর্য্যপূর্ণ সাহস সেদিন আমাদের সকলেরই বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩৩৫ সালে সুরাতে নিখিল-ভারতীয় হিন্দু-মহাসভার দ্বাদশ বার্ষিক

* উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আদি ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মকে "হিন্দুধর্মের পূর্ণাকার" মনে করিতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই জাতীয় কথা বলিয়াছিলেন। প্রঃ সঃ

অধিবেশনের সভাপতি হইয়া রামানন্দ-বাবু সুরাতে যান। তাঁহার সঙ্গে একত্র ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, হিন্দু-মিশনের শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত পদমরাজ জৈন, শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশ এবং আমার। কলিকাতা হইতে আগরা, আজমের ও আমেদাবাদের পথ ধরিয়া আমরা সুরাত গিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্তনও এক সঙ্গে জয়পুর পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ফিরিবার পথে আমেদাবাদে, আবু-পাহাড়ে ও আজমীরে আমরা অবতরণ করি। হিন্দু-মহাসভার সভাপতি বলিয়া সর্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছে রামানন্দ-বাবুর বিপুল সংবর্ধনা দেখি। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল; এবং পত্রিকা-মারফৎ তাঁহার দেশসেবার সর্বজন-স্বীকৃত খ্যাতি, সে বারের হিন্দু-মহাসভার অধিবেশনকে বিশেষ একটা মর্য্যাদা দিয়াছিল। রামানন্দ-বাবু সুরাত-ভ্রমণের এবং আমেদাবাদে অবস্থানের ও আবু-পাহাড়ের জৈন-মন্দির-দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

নিজ নিষ্কলুষ ও সত্যনিষ্ঠ জীবনে স্বনির্বাচিত সাংবাদিক ও পত্রিকাচালকের পথে অতন্দ্র ভাবে দেশের ও সমাজের সেবা-দ্বারা সমগ্র দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের হার্দিক শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এখন তিরোধান করিয়াছেন। তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন নিজ জীবনের অবদান, নিজ আদর্শের মহত্ব, নিজ কর্মের সার্থকতা; রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্মৃতি, এবং উন্নত ও কৃতকার্য্য সাহিত্যিকের ধর্মের দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দীর মাধ্যমে তাঁহার বাণী তিনি দেশবাসীর নিকট এতদিন ধরিয়া শুনাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কৃতি 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'বিশাল ভারত' চিরজীবী হউক, দেশের জাতিগঠনকারী প্রতিষ্ঠান রূপে চিরকাল ধরিয়া বিরাজ করিয়া তাঁহার নামের ও তাঁহার আদর্শের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুক, দেশবাসীর নিকটে তাঁহার স্মৃতিকে চির-নবীন করিয়া রাখুক, এবং তাঁহার পুণ্যনাম আমাদের দেশসেবায় ও জাতির সেবায় সদাই উদ্বুদ্ধ করুক ॥

এলাহাবাদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীনেপালচন্দ্র রায়

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেশের নিকট আজ বিখ্যাত সাংবাদিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে যত অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে সকলেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান কারণ ছিল তিনি কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক। তিনি "প্রবাসী' ও "মডার্ন রিভিয়ু" যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এজন্য তিনি যে পূজার্হ তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন তখন তিনি সাংবাদিক রূপে জীবন অতিবাহিত করিবেন ইহা তাঁহার কল্পনার কোথাও স্থান পায় নাই। বস্তুত তিনি যে জীবনের অধিকাংশ সময় সংবাদপত্র সম্পাদনে ব্যয় করিয়াছেন, বলিতে গেলে ইহা তাঁহার অদৃষ্টের পরিহাস। তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যৌবনের প্রারম্ভে যে মহান্ আদর্শ লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন,—সে আদর্শ তিনি সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারেন নাই ও তাঁহার প্রতিভারও উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় নাই। ম্যাটসিনির সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কথা আছে যে তাঁহার যেরূপ সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল তাহাতে ইতালীয় সাহিত্যকে সম্পদবান করিয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনই দেশসেবক ম্যাটসিনির শ্রেষ্ঠ ও মহান্ ত্যাগ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

বাঁকুড়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি তাঁহার শিক্ষক ৺কেদারনাথ কুলভি মহাশয়ের শিক্ষা-প্রণালী ও মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট হন। তাঁহারই সংস্পর্শে আসিয়া যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করেন।

শিক্ষকের মহান্ ব্রতে দেশসেবার সুযোগ ঘটিবে এই আকাঙ্ক্ষাতে শিক্ষকতাই তিনি জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় তিনি ইংরেজি অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা রামসদন চট্টোপাধ্যায় তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পরিবারের একান্ত ইচ্ছা ছিল তিনিও এই পরীক্ষা দিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। রামানন্দবাবুর পারিবারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের কারণ অনুমান করা কঠিন নহে। কিন্তু রামানন্দবাবু দারিদ্র্যের সহিত বিদ্যানুরাগ, নির্ভীকতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা পৈত্রিক সম্পত্তিস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। কোন অনুরোধই তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি অটল রহিলেন। পরে তাঁহার ইহা অপেক্ষাও কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইল। বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য তিনি স্টেট স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে এই সুযোগ গ্রহণের জন্য ধরিয়া বসিলেন এই বলিয়া যে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণে না হয় আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চশিক্ষালাভার্থ বিলাত যাত্রায় সেরূপ কোন বাধা থাকিতে পারে না। রামানন্দবাবু তাহাতেও সম্মত হইলেন না। পাছে দেশসেবার সুযোগে বঞ্চিত হন এই আশঙ্কায় তিনি বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। সামান্য বেতনে সিটি কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ণোদ্যমে তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশসেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

তিনি অদম্য উৎসাহে নানাক্ষেত্রে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কলেজে অধ্যয়ন কালেই তিনি তাঁহার বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শশিভূষণ বসুকে 'ধর্ম্মবন্ধু' পরিচালনে সাহায্য করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সঞ্জীবনী, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার এবং অন্যান্য পত্রিকাতেও লিখিতেন।

সিটি কলেজে এই সময়ে তাঁহার বেতন ১৪০৲ ছিল। এলাহাবাদে তিনি ২৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তাঁহার শিক্ষক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় রামানন্দবাবুর বেতন বৃদ্ধি করিয়া ২০০৲ টাকা করিয়া দিবার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। রামানন্দবাবু দুইশত টাকা পাইলে এলাহাবাদের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু হেরম্ববাবু এই প্রস্তাবে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে সম্মত করিতে পারিলেন না।

কয়েক বৎসর সিটি কলেজে কাজ করিবার পর তাঁহার প্রথম সন্তান শ্রীমান্ কেদারনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সিটি কলেজের সামান্য বেতনে পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল।

অগত্যা তাঁহাকে এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালায় অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে হইল। এলাহাবাদে অবস্থানকালেও তাঁহার শিক্ষাকৌশলে শীঘ্রই তিনি ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সামাজিক কোন বাধা নিষেধ তিনি মানেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এলাহাবাদের নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সম্প্রদায়ও তাঁহাকে একান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এবং কায়স্থ পাঠশালার সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শীঘ্রই এলাহাবাদেও অধ্যাপনা ব্যতীত অন্যান্যক্ষেত্রে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি দেশনায়কগণের ইনি সহকর্ম্মী হইয়া উঠিলেন। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দেশসেবক তখন কংগ্রেসকে বলশালী করিবার জন্য ইহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, রামানন্দবাবু তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি নিয়মিত ভাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং কোন বাধা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার বন্ধু সি ওয়াই চিন্তামণি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্ত্বেও কি তিনি সুরাট যাত্রার আয়োজন করিতেছেন? উত্তরে রামানন্দবাবু বলেন, "I shall mourn in sackcloth and ashes if I cannot attend the Congress." কথাটা আমি শ্রীযুক্ত চিন্তামণির নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছি। চিকিৎসক ও বন্ধুদের সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই তিনি সুরাট কংগ্রেসে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হন, এবং কিছুদিনের জন্য তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে।* কাশীতে গোখ্‌লের সভাপতিত্বে যে কংগ্রেস বসে তাহার অভ্যর্থনা-সমিতিতে তিনি যোগ দেন। এই কংগ্রেসে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা হইয়াছিল। কাশী একেশ্বরবাদী সম্মেলনেরও তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সকল প্রধান কংগ্রেসসেবীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার একান্ত অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন। পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

কায়স্থ কলেজের পরিচালকগণ সঙ্কীর্ণচিত্ত ও প্রতিক্রিয়া-

* মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের চিকিৎসায় এবং ভক্তিভাজন নেপালবাবু, ইন্দুবাবু, গিরীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির সেবাযত্নে তিনি রোগমুক্ত হন। প্রঃ সঃ

শীল ছিলেন। কলেজ পরিচালনা লইয়া অনেক সময় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত। তিনি একাধিক বার কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু মালব্যজী বুঝিয়াছিলেন যে এলাহাবাদে তাঁহার জীবনের আদর্শ যে শুধু তাঁহার ছাত্রগণের পক্ষেই অত্যাবশ্যক ছিল তাহা নহে, দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানেও তাঁহার সাহায্য এলাহাবাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি কিছুতেই তাঁহাকে এলাহাবাদ ত্যাগ করিতে দেন নাই এবং তাঁহারই মধ্যবর্ত্তিতায় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার সমস্ত বিরোধ মীমাংসা হইয়া যায়। মালব্যজীর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার এলাহাবাদ পরিত্যাগ করা অসম্ভব হয়। কলিকাতায় থাকিতে কোন কোন সংবাদপত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। এলাহাবাদে আসিয়াও তাঁহার লেখনী অলস হয় নাই। তখন এলাহাবাদে ভারতীয় পরিচালিত একমাত্র পত্রিকা ছিল লক্ষ্ণৌয়ের এডভোকেট। বাবু গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মণ ছিলেন তাহার সম্পাদক। রামানন্দবাবু ঐ পত্রিকার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠেন। দেশের নানা অত্যাচার-অবিচারের তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহার অনেক প্রবন্ধ এডভোকেটের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিতে থাকে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-সম্প্রসারণে রামানন্দবাবুর অবদান অতুলনীয়। এই সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ঐ প্রদেশে একান্ত বাধাগ্রস্ত ছিল। বোধ হয় বাংলা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ফল দেখিয়া ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে শিক্ষা যাহাতে বহুল প্রচার না হয় এ বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা বোধ হয় অন্যান্য সমস্ত প্রদেশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার্থীদিগকে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর একবার কর্ত্তৃপক্ষের কসাইখানার মধ্য দিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে হইত। উচ্চ এবং মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের ৭ম, ৫ম ও ৩য় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনের ভার স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ছিল না, উহা গ্রহণ করিতেন সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশলাভ এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিত। বলা বাহুল্য, তিন বার এই কসাইখানার চৌকাঠ পার হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম ছাত্রের ভাগ্যেই ঘটিত।

এই ভাবে নিম্নশ্রেণীতেই অধিকাংশ ছাত্রকে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইত। রামানন্দবাবু সর্ব্বপ্রথম এই শিশু-হত্যার (slaughter of innocents) বিরুদ্ধে এডভোকেটের স্তম্ভে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার লেখা কতকটা ফলপ্রসূ হয়। তদানীন্তন লেঃ-গবর্ণর সর্ এন্টনী ম্যাকডোনেল এই অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত করেন এবং রামানন্দবাবু উহার একজন সভ্য মনোনীত হন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় কমিটি সপ্তম ও পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা দুইটি তুলিয়া দিতে সম্মত হন কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা তখনই বন্ধ করিতে সরকারী সভ্যেরা আপত্তি করিল। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এবং ইন্সপেক্টর তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বিবেচনা করিবেন। ইঁহাদের এই প্রতিশ্রুতিতে রামানন্দবাবু তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রিপোর্ট টি দাখিল করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘকাল তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। অনেক দিন অপেক্ষা করিবার পরও এই পরীক্ষা গ্রহণ চলিতে লাগিল এবং আরও নানাবিধ বিধিনিষেধ শিক্ষাক্ষেত্র কণ্টকিত করিতে লাগিল। এই সময় আমি এলাহাবাদের এ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। রামানন্দবাবুর চেষ্টাতেই আমি এই পদ লাভ করি। আমি শিক্ষার নানাবিধ বাধা ও অসুবিধা দেখিয়া এই সব বিষয়ে রামানন্দবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি পুনরায় এডভোকেটে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সময় সর্ জেমস ডিগ্‌জিস লাটুশ লেঃ-গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এডভোকেটের অভিযোগ সম্বন্ধে দেশের প্রধান শিক্ষা-ব্রতিগণের মতামত চাহিয়া পাঠান। হাইকোর্টের প্রথিতযশা উকিল পণ্ডিত সুন্দরলাল তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তখনকার গবর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়ে পণ্ডিত সুন্দরলালের মতামতের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিত সুন্দরলালের অভিমত চাহিলে তিনি রামানন্দবাবু, মালব্যজী, শিউ-রতন (রাখন ?) পাঠশালার পরিচালক পণ্ডিত সুন্দরলালের ভ্রাতা পণ্ডিত বলদোরাম দাবে প্রভৃতি কয়েকজনকে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেন। আমিও এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আহূত হইবার সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই আলোচনার ফলে পণ্ডিত সুন্দরলাল রামানন্দবাবুর অভিযোগ সমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন। এইবার সমস্ত ক্ষুদ্র বাধা অপসারিত হইল এবং শিক্ষার্থীদিগের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত পথ সরল ও সুগম হইল। আজ এই প্রদেশে শিক্ষার বহুল বিস্তার ঘটিয়াছে। ইহার মূলে ছিল রামানন্দবাবুর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা।

কায়স্থ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মুন্সী কালীপ্রসাদ তাঁহার স্বজাতিদিগের শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে বিপুল সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তো কথাই নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ট্রষ্ট-ডীড সুগঠিত হয় নাই। ইহার ফলে এই সম্পত্তির প্রচুর আয়ের যে সদ্ব্যবহার হইত এ কথা বলা যায় না। কায়স্থ পাঠশালার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তাঁহার মনে যে পরিকল্পনা সর্ব্বদা জাগিতেছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহই ছিল একান্ত প্রবল। কিন্তু কায়স্থ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের অধিকাংশেরই মনে মনে বর্ত্তমান কালোপযোগী সুশিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ পরিস্ফুট ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কলেজের উন্নতিকল্পে উদার ভাবে আদর্শের অনুরূপ প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। ইহাতেই রামানন্দবাবুর সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে রামানন্দবাবু এই মতানৈক্যের দরুণ কয়েকবার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু মালব্যজীর মধ্যবর্ত্তিতায় উভয় পক্ষের মনোমালিন্য ঘুচিয়া যায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কলেজ পরিচালনা সম্পর্কে ১৯০৬ সালে যে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার মীমাংসার প্রচেষ্টা মালব্যজীর ধৈর্য্য এবং বুদ্ধি কৌশলকেও পরাস্ত করিল। রামানন্দবাবু এবার কিছুতেই তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলেন না।

আমাদের এই দুর্ভাগ্য অধঃপতিত দেশের সকল ক্ষেত্রে নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার মনে যে আদর্শ সর্ব্বদা জাগিতেছিল তাহা শুধু কলেজের ছাত্রদিগকে পড়াইয়াই পরিতৃপ্ত ছিল না। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সংবাদপত্রের সহিত গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ছাত্রাবস্থাতেই (১৮৮০ খ্রীঃ) তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ব্রাহ্মপ্রচারক শশিভূষণ বসু মহাশয় ধর্ম্মবন্ধু নামক ক্ষুদ্র কাগজ পরিচালনা আরম্ভ করেন। (আন্দাজ ১৮৮৭ খ্রীঃ) রামানন্দবাবু তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দবাবু ইহার সম্পাদক হন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙালী জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে সর্ব্বক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন, তাহার ফলে এলবার্ট হল, বামাবোধিনী পত্রিকা, সুলভ সমাচার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে নূতন যুগের সূচনা করেন। শিশু-সাহিত্য বোধ হয় তাঁহার এই প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল না। সম্ভবতঃ স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন এই শিশু-সাহিত্যের জনক। প্রমদাচরণের 'সখা' বাংলার তরুণ ছাত্রদের জীবনে এক নূতন প্রাণ আনিয়া দিয়াছিল। ধর্ম্মবন্ধু সখার ন্যায় বিবিধ তথ্যে পূর্ণ ছিল না বটে, কিন্তু ছাত্রজীবনের নূতন আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা দানের পক্ষে ইহার সরস ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ কম সাহায্য করে নাই।* তাঁহার শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর সিটি কলেজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময়েও সঞ্জীবনী, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার প্রভৃতি পত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া রাজনৈতিক মন্তব্য প্রভৃতি তিনি নিয়মিতরূপে লিখিতেন। বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিলেও সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই। দাসীর পর প্রদীপ নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকার্টির সম্পাদনভার তিনি গ্রহণ করেন। বাংলা-দেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছবি দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রথম সচিত্র পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। রামানন্দবাবু প্রদীপে উহা পূর্ণরূপে বিকশিত করেন। আধুনিক সচিত্র মাসিক পত্রিকার মধ্যে প্রদীপই প্রথম বলা যাইতে পারে।

এই সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় দেশের যুব-সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অপর পক্ষে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং তাঁহার বন্ধুগণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচক। প্রদীপ ছিল রবীন্দ্রনাথের সমর্থক। সাহিত্যের এক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নিন্দাসূচক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এক প্রধান ভক্ত এক কবিতায় সাহিত্যের লেখককে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া উহা প্রদীপে পাঠান। রামানন্দবাবু তখন এলাহাবাদে। কলিকাতার প্রদীপ-পরিচালক কবিতাটি প্রদীপে ছাপিয়া দেন। ফাইল কপি প্রাপ্তিমাত্র তিনি এই কবিতাটি বন্ধ করিবার জন্য পরিচালক বৈকুণ্ঠনাথ দাসকে টেলিগ্রাম করেন। সমস্ত কাগজ তখন ছাপা হইয়া গিয়াছে, অথচ রামানন্দবাবুর আদেশ অমান্য করিবারও উপায় নাই। কাজেই আর একটি কাগজে নূতন একটি কবিতা ছাপাইয়া উহা আলোচ্য কবিতাটির উপর আঁটিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজপতি মহাশয়ও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি আচ্ছাদনটি তুলিয়া উক্ত কবিতাটি সাহিত্যে ছাপিয়া দেন। এই ঘটনায় রামানন্দবাবু বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। তিনি দেখিলেন এত দূর হইতে পত্রিকা সম্পাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্খলন অপরিহার্য্য। তখন তিনি প্রদীপের সংস্রব ত্যাগ করেন।

প্রদীপের সংস্রব ত্যাগ করিবার পর হইতেই একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা তাঁহার

* ধর্ম্মবন্ধুতে গর্ডন, মুলার প্রভৃতির জীবন-কথা, ব্রাউনিঙ প্রভৃতিকে লইয়া আলোচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ, বাংলাগ্রন্থ সমালোচনা, মানব-প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইত।

মনে জাগে। এই সঙ্গে আরও একটি অসুবিধা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। প্রদীপ পরিচালনকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যে অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক মত প্রকাশে, সম্পাদককে স্বত্বাধিকারীর উপর নির্ভর করিতে হয়। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ে সমালোচনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্বয়ং স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক হইয়া পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কর্ম্মবীর ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ এই সঙ্কল্পে তাঁহার প্রধান সহায় হন এবং তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। রামানন্দবাবুর আর্থিক অবস্থা তখন তেমন সচ্ছল ছিল না। তাঁহার জীবন সরল ও আড়ম্বরশূন্য ছিল। তাহাতে বিলাসিতার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ঔদার্য্যবশতঃ নানাক্ষেত্রে তাঁহাকে ব্যয় করিতে হইত। সুতরাং তাঁহাকে ঐ আয়ে এক প্রকার দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইত। তাঁহার পরিবারও তখন নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহার উপরে তাঁহার গৃহে ছিল মধ্য প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের এবং অবাঙ্গালীদিগেরও সাধারণ অতিথিশালা। "প্রবাসী" প্রকাশের জন্য যে-টাকা দরকার তাহা তখন তাঁহার হাতে ছিল না। ইহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। তাঁহার মিতব্যয়ী জীবনের যে যৎসামান্য ব্যয় তাহাও সঙ্কোচ করিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সঙ্কল্পে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তিনি "প্রবাসীর" পরিচর্য্যার পথ সহজ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তখন আমি এলাহাবাদে এবং রামানন্দবাবুর পরিবারে অতিথি। "প্রবাসী"র সূতিকাগৃহে উপস্থিত ছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবাসীর তখন এক জন নামমাত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। এখন বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী যে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, বলিতে গেলে রামানন্দবাবুর সহধর্ম্মিণী একাই তাহা সম্পন্ন করিতেন। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা বোধ হয় ৫০০০ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পত্রিকা তাঁহার গৃহে আসিলে রামানন্দবাবুর পত্নী স্বহস্তে এই পাঁচ হাজার পত্রিকার মোড়ক আঁটিয়া দেন এবং দুজনে মিলিয়া ঠিকানা লেখেন। বোধ হয় এইভাবে দুই-তিন মাস তাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

পরে "প্রবাসী" যখন কলিকাতায় আসে তখন তাহার প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত থাকিত—"নিজবাসভূমে পরবাসী হলে পরদাসখতে সমুদায় দিলে।" এখন হইতে "প্রবাসী"র নামের সার্থকতা অন্য প্রকারে হয়। বস্তুতঃ এই জন্মভূমিতেও আমরা কিরূপ প্রবাসীর ন্যায় বাস করিতেছি স্বদেশবাসীর হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগ্রত করাই ছিল "প্রবাসী"র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এই দুরন্ত পরিশ্রমের মধ্যেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধনে যতগুলি প্রতিষ্ঠান এলাহাবাদে বর্ত্তমান ছিল সবগুলিরই সহিত তাঁহার অল্পবিস্তর সম্বন্ধ ছিল। এলাহাবাদের ব্রাহ্মসমাজের তিনি আচার্য্য ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং সমাজের ব্যয়ভার বোধ হয় তাঁহাকে একাকী বহন করিতে হইত। এলাহাবাদ অঞ্চলে তখন যে কয়টি ইংরেজি পত্রিকা প্রচলিত ছিল তাহার প্রধান কয়েকটিতে তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। এডভোকেটের সহিত তাঁহার সংস্রবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরিশেষে এলাহাবাদে যখন ইণ্ডিয়ান পিপল নামক পত্রিকাটি স্থাপিত হয় তাহারও তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দুস্থান রিভিয়ু বোধ হয় তখন কায়স্থ রিভিয়ু নামে পরিচিত। ঐ পত্রিকারও তিনি একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তাঁহার বন্ধু অধুনা বিহারের বিখ্যাত নেতা সচ্চিদানন্দ সিংহ যখন এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান পিপল স্থাপন করেন এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন তখন এই পত্রিকারও প্রায় নিয়মিত লেখক তাঁহাকে হইতে হইয়াছিল। এই সব পত্রিকায় তিনি শুধু অনুরোধে পড়িয়া লিখিতেন তাহা নহে, দেশের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের জন্য শত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও প্রাণের তাগিদেই তিনি লিখিতেন এবং কোন লেখার জন্যই অর্থের প্রত্যাশা করিতেন না। নগেন্দ্র বাবুর পর সি ওয়াই চিন্তামণি ইণ্ডিয়ান পিপলের ভার গ্রহণ করিলে উঁহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয়। রামানন্দবাবু ছিলেন শ্রীযুক্ত চিন্তামণির প্রধান সহায় ও উপদেষ্টা। এই সময়েই চিন্তামণির সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটিতে তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। এলাহাবাদ হইতে ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হইয়া সমস্ত কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। এবিষয়ে তিনি মালব্যজীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেশে মদ্যপান নিবারণের জন্য তখন যে চেষ্টা চলিতেছিল এলাহাবাদে রামানন্দবাবুই তাহার কেন্দ্র ছিলেন। বিলাতে Temperance Society-র প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের সদস্য কেন সাহেব এবং তাঁহার পরে এই সমিতির সম্পাদক

গ্রাব সাহেব যখন ভারতবর্ষে আবগারী নীতির অনুসন্ধানে আগমন করেন তখন তাঁহাদিগকে আবগারী নীতি দেশের যে ঘোর অনিষ্ট করিতেছিল তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একটি একটি জাতির মধ্যে যে অসংখ্য শাখা প্রচলিত ছিল তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ ও আহারাদি প্রচলনের জন্য ও অন্যবিধ সামাজিক উন্নতিকল্পে একটি সভা সংস্থাপিত হয়। ইহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে রামানন্দবাবু ছিলেন প্রধান। এলাহাবাদের স্মল কজ কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ ছিলেন ইহার সভাপতি ও পণ্ডিত মনোহর লাল জ্যোৎশী ছিলেন ইহার সম্পাদক।

এলাহাবাদে বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তাহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ সংস্থাপন ও তাহাদিগকে নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বাঙালীদিগের একটি সম্মেলন স্থাপিত হয়। এলাহাবাদের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুত হরিমোহন রায় ও বাঙ্গালী সমাজের শিরোভূষণ স্বর্গগত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামানন্দবাবু ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে যে জাগরণ আনিয়া দেয় এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙালীরা আজিও তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। এলাহাবাদে প্রবাসী বাঙালীদের যে কয়েকজন নেতার সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় তাঁহারা পাণ্ডিত্যে, চরিত্রে ও স্বদেশ-হিতৈষণায় সমগ্র বাঙালী জাতির অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল ওহ্‌দেদার, রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু, মেজর বামনদাস বসু এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষের তুলনা বাংলা দেশেও পাওয়া কঠিন। তিনি যখন এলাহাবাদের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন তখন চিন্তামণি ঘোষ তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে পাইবার জন্য একান্ত আগ্রহশীল ছিলেন। রামানন্দবাবুর কর্ম্মকুশলতার প্রতি চিন্তামণিবাবুর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন ১০০০৲ টাকা* মাসিক পারিশ্রমিক ভিন্ন এলাহাবাদে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন তিনি প্রাপ্ত হইবেন। তখনই যে সমুদয় পুস্তক প্রচলিত ছিল ন্যূনকল্পে তাহার বার্ষিক আয় ছিল ৪০,০০০৲ টাকা। চিন্তামণিবাবুর ভরসা ছিল রামানন্দবাবুকে পাইলে তিনি উহা লক্ষ টাকায় পরিণত করিতে পারিবেন। কিন্তু রামানন্দবাবু সম্মত হইলেন না।

এলাহাবাদ শহরে যখন প্লেগের দুরন্ত প্রকোপ, চারি পাশে মৃত্যুর দারুণ বিভীষিকা, তাহার মধ্যে রামানন্দবাবু কিছুমাত্র ভীত হন নাই। তখন তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন সেবাব্রতী ইন্দুভূষণ রায়। বীরহৃদয় ইন্দুভূষণ যেরূপ অকুতোভয়ে এবং নিষ্ঠার সহিত প্লেগরোগীর সেবা করিয়া বেড়াইতেন এবং মৃত্যুভয়গ্রস্ত রোগীদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতেন তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে ভয়গ্রস্ত একান্ত কাপুরুষেরও হৃদয়ে বলসঞ্চার হইত। ইন্দুভূষণের স্নেহপ্রবণ কোমল অথচ অসাধারণ তেজস্বী ও বিশাল হৃদয়ের পরিচয় অধিক লোকে পাইল না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা এই গম্ভীর সংযতবাক্ বীরপুরুষের ধৈর্য্য, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, অনন্যসাধারণ দৈহিক ও নৈতিক বল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই দুরন্ত রোগে নিউ সেণ্ট্রাল কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ঘোষের পত্নীর মৃত্যু হয়। তখন ইন্দুভূষণ এবং রামানন্দবাবুই উমেশবাবুর প্রধান সহায় হন। তাঁহার মৃতপত্নীর সৎকারের পর তিনি সপরিবারে রামানন্দবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

"প্রবাসী" প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই বাংলার সাময়িক সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। প্রবাসী তাহার ঋণদায় হইতে রামানন্দবাবুকে যখন মুক্তি দিল, তখন বৃহত্তর জগতে দেশের শাসনের ব্যভিচারজনিত মর্ম্মপীড়া ও বিশ্ববাসীর নিকট ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবী জানাইবার জন্য তাঁহার যে ব্যকুল আগ্রহ তাহা রূপ পরিগ্রহ করিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন "প্রবাসী"র ন্যায় একটি ইংরেজি মাসিক পত্র বাহির করিয়া সমগ্র দেশে ও দেশের বাহিরে বিশ্ব-জগতে ভারতবর্ষের প্রকৃত তথ্য প্রচার করিবেন। "মডার্ন রিভিয়ু" প্রকাশিত হইল। প্রবাসী প্রকাশ করিবার সময়ে তাঁহাকে যেরূপ আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, "মডার্ন রিভিয়ু" বাহির করিবার সময়েও এই আর্থিক সমস্যা আরও গুরুতররূপে দেখা দিল। "মডার্ন রিভিয়ু" প্রকাশের সকল আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন তাঁহাকে কায়স্থ কলেজের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু রামানন্দবাবু পশ্চাৎপদ হইলেন না। ১৯০৬ সালে তিনি কায়স্থ

---

* কেহ কেহ বলেন মাসিক ৪০০৲চারি শত টাকা। প্রঃ সঃ

চিন্তামণিবাবু তাঁহার প্রস্তাব আমার দ্বারাই রামানন্দবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সহসা এত অধিক বেতনে কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল। তাহার উত্তরে চিন্তামণিবাবু বলিয়াছিলেন, "মহাশয় আমরা ব্যবসায়ী লোক, টাকা কি করিয়া উপার্জ্জন করিতে হয় জানি। আমি যে টাকা দিতে চাহিতেছি তাহার চতুর্গুণ উঁহার দ্বারা আদায় করিয়া লইব।" —লেখক

কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন এবং পরবৎসর জানুয়ারি মাসেই "মডার্ন রিভিয়ু"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু "মডার্ন রিভিয়ু"র প্রকাশ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সেই সময় খুব সহজসাধ্য হয় নাই। তখন ঐ প্রদেশের লেঃ-গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঝুনা বুরোক্রাট সর্ জন হিউয়েট। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভঙ্গের তীব্র আন্দোলনের ঢেউ ঐ প্রদেশে পৌঁছিয়াছিল এবং শুধু বাঙালীর হৃদয় নহে, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেরই হৃদয় বিচলিত করিয়াছিল। সর্ জন হিউয়েট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি ছিল কয়েকজন বাঙালীকে আদর্শ দণ্ড দিয়া তিনি সমগ্র বাঙালী সমাজে ভীতি উৎপাদন করিয়া আন্দোলন দমন করিবেন। তাঁহার প্রথম শিকার হইলেন আগ্রা সেণ্ট জন কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক বেণীবাবু। ইহার অল্পকাল পরেই এংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইলাম। বলা বাহুল্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই ছিলেন হিউয়েটের দণ্ডনীতির প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু রামানন্দবাবুকে জালে তিনি কিছুতেই ফেলিতে পারিতেছিলেন না। তাহা হইলেও কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে "মডার্ন রিভিয়ু" পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পরিবারবর্গকে এলাহাবাদে রাখিয়াই এলাহাবাদ ছাড়িতে হইল। কলিকাতায় আসিয়াও এলাহাবাদের সহিত তাঁহার যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই। এলাহাবাদেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সখ্যের সুত্রপাত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরজনীকান্ত গুহ

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মাবকাশের পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি বি-এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র* সিটী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। তিনি সকলের পশ্চাতে বসিতেন, সহাধ্যায়ীদিগের সহিত বেশী কথাবার্ত্তা বলিতেন না, অধ্যাপকেরা কেহই তাঁহাকে চিনিতেন না। এক দিন অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ছাত্রগণকে কি বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন। সপ্তাহ কাল পরে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপনাকক্ষে আসিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "Who is Ramananda Chatterjee?" "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কে?" রামানন্দবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গুরু-শিষ্যে এই যে দৃষ্টিবিনিময় হইল, তাহার ফলে উভয়ে আমরণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অনতিবিলম্বে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনে যে গুরুতর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার মূলে মৈত্র মহাশয়ের প্রভাব সামান্য ছিল না।†

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দবাবু বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজী অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০০ সনে বাঁকিপুরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন পূর্ব্ব বৎসরও তিনি ঐরূপ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং দুই বারই তৎকালীন মোট নম্বর ৩০০ মধ্যে ২৫০ হইতে অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমি সিটী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম। ইংরেজী সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যাপক অল্পকাল পরেই অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তার পর যাঁহারা ঐ বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে আসিতেন, আমরা একটির পর একটি সকলকেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিলাম। তখন হেরম্ববাবুর পরামর্শে কর্ত্তৃপক্ষ সদ্য বি-এ উপাধিপ্রাপ্ত রামানন্দবাবুকে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে কোন কোন ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, প্রথম দিন তথায় অধ্যাপনা করিবার কালে গায়ের জামা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই নবীন অধ্যাপককে পাইয়া আমরা শান্ত হইলাম। অল্পকাল পরে এক দিন প্রাতঃকালে আমি গোলদীঘির পূর্ব্ব দিকের পথে যাইতেছি, এমন সময়ে হেরম্ববাবু অপর দিক্ হইতে আমাকে দেখিতে

* ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দেন নাই বলিয়া অনুত্তীর্ণ হন। প্র. স.

† বাল্যে বাঁকুড়া স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি রামানন্দবাবুর ঝোঁক ছিল। গণিত শিক্ষক ৺কেদারনাথ কুলভির প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ। যৌবনে তিনি কলিকাতায় আসিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করেন। প্র. স.

পাইয়া নিকটে আসিয়া সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামানন্দ কেমন পড়াইতেছে?" আমি বলিলাম, "তাঁহাকে পাইয়া ছাত্রেরা সন্তুষ্ট হইয়াছে।" শুনিয়া তিনি খুব প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন, "নব্য-গ্রাজুয়েটদিগের মধ্যে (among the young graduates) আমি রামানন্দের ন্যায় খুব অল্পই দেখিয়াছি।"

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষায় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের কাগজ পরীক্ষা করিলেন। বাঁকুড়ায় পরীক্ষার কাজ শেষ করিয়া ফল পাঠাইবার লিপিতে মন্তব্য করিলেন, "Rajanikanta Guha writes the best English." অপরাপর মন্তব্যও ছিল। চুয়ান্ন বৎসরেও ইহা আমার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া আমি ঢাকায় চলিয়া গেলাম। পর বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের পরে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া পুনশ্চ ইঁহাকে অধ্যাপকরূপে পাইলাম। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার পরে ইনি ১৮৯০ মার্চ্চ মাস হইতে সিটী কলেজের স্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রামানন্দবাবু এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন নাই। ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার কালে তাঁহার পাঠ্য পুস্তক পড়িতে ভাল লাগিত না।*

তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও সৌজন্যের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। অধ্যাপনা-কর্ম্মের প্রথম বৎসর ইনি তাঁহার আড়াই বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ এই শিষ্যটিকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ক্রমশঃ সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলে সঙ্কোচ কাটিয়া গেল।

আবার এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার কালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে নিজের কয়েকখানি পুস্তক ঋণ দিয়া এবং অধ্যেতব্য গ্রন্থ সম্বন্ধে উপদেশ দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমি অন্যতম অধ্যাপকরূপে সিটী কলেজে ইঁহার সহযোগী হইলাম। সেই অবসরে বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ইংরেজী পরীক্ষার কাহিনীটি ইঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম। বাঁকুড়ার তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইংরেজী পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করিয়া রামানন্দবাবুকে ১০০ মধ্যে ৯৬ দিয়াছেন দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় দত্ত মহাশয়কে বলিলেন, "ছেলেটির বয়স অল্প; আপনার ন্যায় ইংরেজী ভাষায় সর্ব্বজনবিদিত সুপণ্ডিত ব্যক্তির নিকটে এত অধিক নম্বর পাইলে তাহার মাথা বিগড়াইয়া যাইবে। আপনি নম্বরটা কমাইয়া দিন।"

দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আমি কি করিব? বালকটি হয়ত সমস্তই বই মুখস্থ করিয়া লিখিয়াছে, কিন্তু তাহার উত্তরগুলিতে ভুল নাই, আমি কি করিয়া নম্বর কমাইব?" হেডমাষ্টার মহাশয় কিছুতেই ছাড়িবেন না। অগত্যা দত্ত মহাশয় বোধ হয় কাটিয়া-ছাঁটিয়া নম্বরটা নব্বই করিয়া দিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শারদীয় অবকাশের পূর্ব্বে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদের কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া সিটী কলেজ ত্যাগ করিলেন। এখানে যাহা পাইতেন, বেতন তদপেক্ষা শতাধিক টাকা বেশী হইল। পূজনীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্র উচ্চতর বেতন দিয়া তাঁহাকে সিটী কলেজে রাখিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। রামানন্দবাবু নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। তৎপূর্ব্বে ছাত্রগণ তাঁহাকে বিদায়সূচক মানপত্র প্রদান করিয়াছিল।

অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই নব কর্ম্মক্ষেত্রে নানা দিকে স্বীয় অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি বিস্তার করিয়া যে অতুলনীয় সাফল্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার শুধু সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্ক ছিল। সেই কথাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

এলাহাবাদে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই-এক বৎসর পরে তিনি প্রদীপ নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। সম্ভবত বৈকুণ্ঠনাথ দাস ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

১৮৯৯ সনে আমি সম্পাদক মহাশয়কে "প্রাচীন জর্ম্মন জাতি" নামক একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করি। উহা ১৩০৬ সনের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই রামানন্দবাবু উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাটনায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইল; আমি এজন্য মাঘ মাসে বহুদূরবর্ত্তী পল্লীতে পৈত্রিক বাসবাটীতে গিয়া দুই-তিন মাস যাপন করিলাম। এই সময়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পত্র পাইয়া অবগত হইলাম, তিনি বৈশাখ মাস (১৩০৮) হইতে "প্রবাসী"

*এই সময় তাঁহাকে "ধর্ম্মবন্ধু"র কাজ, "মেসেঞ্জারে"র কাজ ও সিটী কলেজে অধ্যাপনা করিবার জন্য প্রচুর পরিশ্রমও করিতে হইত। প্র. স.

নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, এবং আমাকে উহার জন্য প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গিয়া "হিন্দু, গ্রীক ও রোমান" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠাইলাম। দ্বিতীয় (জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইল। অধিকন্তু তিনি আমাকে যথোচিত পারিশ্রমিক পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন, আমাকে যে-হারে পারিশ্রমিক দিলেন, তিনি এবং দীনেশ সেন ঠিক সেই হারে ভারতী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার ন্যায় অজ্ঞাতনামা লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরব কি হইতে পারে?

ইহার পরেই আমি বরিশালে চলিয়া গেলাম। সেখানে দশ বৎসরে 'প্রবাসী'র জন্য অবৈতনিক লেখকরূপে পাঁচ-ছয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম। সম্পাদক মহাশয় "বয়কট্" নামক প্রস্তাবটি 'প্রবাসী'র পুরোভাগে মুদ্রিত করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই কালে আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পত্র-বিনিময় ও রাজনৈতিক আলোচনা। ঠাকুর মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ, আমার সমালোচনা, তাহার প্রত্যুত্তর এবং পরিশেষে পত্রযোগে আমি তাঁহাকে যে-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহার উত্তর—এগুলি "প্রবাসী"র চারি সংখ্যায় বর্ত্তমান আছে। ঠাকুর মহাশয়ের একখানি বৃহৎ পত্র আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। এই উপলক্ষে তাঁহার চিঠির কাগজ ভাঁজ করিবার নানা বিচিত্র ভঙ্গীর পরিচয় পাইয়াছিলাম।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে "প্রবাসী"র জন্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলাম। রামানন্দবাবু আমাকে জানাইলেন উহা দুই ভাগে পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রকাশ করিবেন। প্রথমটি "ইংরেজ শাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ" এবং দ্বিতীয়টি "স্বদেশী আন্দোলন—তাহার ত্রিবিধ কার্য্য" ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে তাহা প্রকাশিত হইল। কয়েক মাস পরে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, ভারত- সরকার ঐ দুইটি সম্বন্ধে আইন-বিভাগের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দবাবুর ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শী সম্পাদকের হাতে যাহা উৎরাইয়াছে, তাহা আইনের ফাঁদে পড়িবে কিরূপে? ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে আমি বেশী কিছু লিখিতে পারি নাই; কিন্তু এই কালে 'প্রবাসী'র অর্থনৈতিক বিষয়ে একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মৎপ্রণীত সোক্রাটীস নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তাহার সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে উহার অন্তর্ভুক্ত প্লেটোর তিনটি সন্দর্ভের বঙ্গানুবাদ "প্রবাসী"তে সাত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমটি প্রকাশিত হইবার পরে কার্য্যোপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয়ে যাইতেই কর্ম্মাধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনার কিছু প্রাপ্য আছে, রামানন্দবাবু হিসাবের বহিতে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।" আমি ত শুনিয়া অবাক, এই তিনটি এবং পরে আরও দুইটির জন্য তিনি "না চাহিতে" পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন।

আমি "প্রবাসী"র নিয়মিত লেখক না হইলেও বহু বৎসর পত্রিকাখানি বিনামূল্যে পাইয়াছি, তাঁহার এই স্নেহের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি Modern Review প্রকাশিত হয়। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে তৃতীয় (মার্চ্চ) সংখ্যায় "The Residential Colleges in india" শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

পূজনীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহদাতা ও সহায় ছিলেন। বিগত শতাব্দীর অবসানকালে তাঁহাকে "লিখিলাম, আমি "বৈদিকযুগে নারী জাতির অবস্থা" সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চাই। তিনি উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সমগ্র ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। উপকরণ সংগৃহীত আছে, কিন্তু পরিকল্পনা চল্লিশ বৎসরেও কায়া গ্রহণ করে নাই।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে আমার অন্তরে মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ অনুবাদ করিব সংকল্প জাগিল। এ জন্য ম্যাক্‌-ক্রিণ্ডল-এর ইংরেজী অনুবাদ অত্যাবশ্যক। উহা তখন একান্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। রামানন্দবাবুকে আমার প্রয়োজনের কথা জানাইলে তিনি লিখিলেন, বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ঐ পুস্তক আছে, এবং উহার তদানীন্তন শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মহেশ-চন্দ্র ঘোষকে অনুরোধ করিয়া আমাকে উহা পাঠাইয়া দিলেন। আমি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং প্রকাশক হইলেন। প্রুফ দেখা ছাড়া আমাকে আর কিছু করিতে হয় নাই। তিনি 'প্রবাসী'তে মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণের যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাহাতেই উহার আশাপ্রদ বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছিল। এক হাজার খণ্ড ছাপা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর ইংরেজী অনুবাদের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম্, এ পরীক্ষার্থীরা এই অনুবাদই পাঠ করিত। পরে ম্যাক্‌ক্রিণ্ডলের নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার দ্বিতীয় পুস্তক "মার্কাস অরেলিয়াস্ আন্টো-

নীয়াসের আত্মচিন্তা" ঢাকায় ছাপা হয়। রামানন্দবাবু প্রকাশকরূপে তাঁহার নাম ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছিলেন।

শ্রুতকীর্ত্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা-সম্পাদকরূপে দেশে-বিদেশে সমাদৃত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ সংবাদপত্র-সেবীর নিকটে শিক্ষানবিসী করেন নাই। এ ক্ষেত্রে তাঁহার বর্ণপরিচয় হইল ক্ষুদ্রকায়া দাসী পত্রিকা সম্পাদনে*। তার-পর তদীয় অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইল প্রদীপ-সম্পাদনে। অল্পকাল পরেই "প্রবাসী" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যেন একেবারে স্বয়ংসিদ্ধ সম্পাদকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তিনি ছিলেন একাধারে "প্রবাসী" এবং ছয় বৎসর পরে, "মডার্ন রিভিউ" এই দুইখানি বৃহদায়তন মাসিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ। "প্রবাসী"র কর্ম্মবিভাগে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। কলিকাতার যে প্রেসে কয়েক বৎসর প্রবাসী মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার সহিত আমারও পরিচয় ছিল; আমি তো ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাই যে, রামানন্দবাবু কোন্ যাদুবলে সুদূর এলাহাবাদ হইতে এই প্রেসে "প্রবাসী" ছাপাইয়া বৎসরের পর বৎসর প্রতি মাসের প্রথম দিনে প্রকাশ করিতেন। ছয় বৎসর পরে "প্রবাসী"র সহিত "মডার্ন রিভিউ" আসিয়া জুটিল, এবং দুইটিই সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় অনতিক্রম্য নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রবাসী প্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বহুবৎসর যে প্রেসে পত্রিকাযুগল মুদ্রিত হইত, তৎসম্বন্ধেও আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আছে। আমি জানি না, কোন্ দৈবশক্তিবলে এই পত্রিকা-পরিচালক চিরদিনের নিয়মবিরোধীকে নিয়মের নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

পত্রিকা-সম্পাদকরূপে তাঁহার একটি বিশেষত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা এই যে তিনি অবিচ্ছেদে একটি বাঙ্গালা পত্রিকার বিয়াল্লিশ বৎসর, এবং তৎসহ একটী ইংরেজী পত্রিকার ছত্রিশ বৎসর সম্পাদকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সময়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমার জানিতে কৌতূহল হয় যে ভারতবর্ষে একই ব্যক্তি স্বদেশী ও বিদেশী ভাষায় দুইখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন, এরূপ দ্বিতীয় কেহ আছেন কিনা।

কিন্তু ইহা বাহ্য। স্বয়ংসিদ্ধ সম্পাদকরূপে তাঁহাতে যে-সকল গুণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বক্ষ্যমাণ বিষয়টিকে যুগপৎ সমগ্রভাবে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দর্শন করিবার শক্তি; সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ (analysis and synthesis) প্রণালীতে তাহার নিরপেক্ষ বিচার; সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল ভাষায় আপনার মতামত নিঃশেষে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা—এই সকল গুণের সমাবেশ তাঁহাকে সম্পাদকমণ্ডলীতে সম্মানিত স্থান প্রদান করিয়াছিল। "A clear style comes of clear thinking"—প্রাঞ্জল চিন্তা হইতেই প্রাঞ্জল লিপিকৌশল প্রসূত হয়। তিনি মনোজগতে মন্তব্য বিষয়টিকে উজ্জ্বল আলোকে দর্শন করিতেন, সুতরাং তাঁহার ভাষা সরল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইত, অথচ পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিতেন না যে, ভাষাটিকে মাজিয়া ঘষিয়া লোকপ্রিয় করিবার জন্য তিনি এতটুকুও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন।

সম্পাদক-সমাজে তাঁহাতে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল তাঁহার প্রখর বুদ্ধি এবং অপূর্ব্ব লিপিকৌশল। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া জননী জন্মভূমির পরিচর্য্যায় নিয়োজিত ছিলেন, এই সেবাব্রতে কত বার তাঁহাকে শাসকবর্গের ভ্রমপ্রমাদ দোষত্রুটি সুস্পষ্ট ওজস্বিনী ভাষায় প্রদর্শন করিতে হইয়াছে; কিন্তু চিরকাল তিনি সুকৌশলী সারথির ন্যায় নিজের বাহন দুটিকে দাবানল হইতে রক্ষা করিয়াছেন, অথচ ইনি আজীবন সত্যসন্ধ ও সত্যব্রত ছিলেন।

একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। পরলোকগমনের পূর্ব্ব বৎসর তিনি মেদিনীপুরের মহাপ্রলয় সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্যটি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমার হৃদয় বিস্ময়পুলকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সরল ওজস্বিনী, অথচ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়, বিধিনির্দ্দিষ্ট বর্ত্ম হইতে রেখামাত্র চ্যুত না হইয়া প্রজাপালকবর্গের কৃত ও অকৃত সমুদায় কর্ম্মের এমন নির্ম্মম উদ্ঘাটন বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভবপর হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহা জানিতাম না।

পত্রিকা-সম্পাদনের কার্য্যে তিনি পূর্ব্বাপর এই ঋষিবাক্য অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। "সত্যং ব্রুয়াৎ"—তিনি সত্য বলিতেন। "প্রিয়ং ব্রুয়াৎ" যেখানে সম্ভব, সত্যকথা প্রিয়-রূপেই বলিতেন; কিন্তু "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"।—অপ্রিয় সত্য বলিবে না, এ বিধান তিনি মানিতেন না। তাঁহাকে অপ্রিয় সত্য নিরন্তর বলিতে হইয়াছে। "প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ"—দেশ কাল পাত্রের খাতিরে প্রিয় অসত্য বাক্য কদাচ তাঁহার রসনা হইতে নিঃসৃত হয় নাই।

এই গৌরবমণ্ডিত কর্ম্মজীবনের অটল প্রতিষ্ঠা ছিল

* তৎপূর্ব্বে ইনি ধর্ম্মবন্ধুর সম্পাদক ছিলেন। প্রঃ সঃ

তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসে। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম ছিলেন। যৌবন কালে তিনি যে ব্রহ্মানুগত জীবনযাপনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরণ তাহা একনিষ্ঠ ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পত্রিকা-সম্পাদকরূপে তিনি স্বদেশে বিদেশে যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ গৌরবান্বিত হইয়াছে, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইল না। তিনি নানাভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করিয়াছেন। ব্রহ্ম-মন্দিরের বেদীতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের স্বরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উপগতযৌবন পুত্রের এবং তৎপরে দ্বিতীয়হৃদয়তুল্যা পত্নীর শোকবহনে আমরা তাঁহার অন্তঃসত্তার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার স্মৃতি ধন্য হউক।

মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর নাম যখন আমি প্রথম শুনি, তখন তিনি প্রয়াগে, আর আমি কাশীতে। প্রথম অবস্থায় তিনি ছিলেন আমার নিকটে একজন বিশিষ্ট সম্পাদক মাত্র, পরে একজন মনীষী, এবং শেষে একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু, এবং ইহা হইয়াছিল তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কাশীতে, শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতায় যে সংযোগ হইয়াছিল তাহা হইতে। তাঁহার সহিত সাধারণ পরিচয় মাত্র শেষে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল, এবং ইহাকে প্রধানভাবে ঘটাইয়া তুলিয়াছিল আমাদের কিছুকাল শান্তিনিকেতনে একত্র অবস্থিতি। বহু বিষয়ে আমাদের উভয়ের মত ভিন্ন হইলেও তাহা আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় কোন বাধাই উৎপাদন করে নাই, বরং উত্তরোত্তর ইহা বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

রামানন্দবাবু কিছুকাল সপরিবারে শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিতেছিলেন। "প্রবাসী" ও "মডার্ন রিভিয়ু"-এর কাজ সেখানে তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে ছিল, ঐ স্থান হইতেই তিনি পত্রিকা দুইখানি সম্পাদন করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে কি বিপুল পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এই কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবার লোক সেখানে খুব কম ছিল। উভয় পত্রিকার বিনিময়ে রাশি-রাশি কাগজ আসিত। নিজেই তিনি সেই সব পড়িতেন, দাগ দিতেন, উল্লেখ্য বিষয়গুলি কাটিয়া রাখিতেন এবং মন্তব্য লিখিতেন। শত-শত ভি. পি. বা মনি-অর্ডারের টাকা আসিত, নিজেই তিনি ডাকঘর হইতে ইহা লইতেন, এবং হিসাব-পত্র রাখিতেন।

গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) সহিত অপরাহ্ণে তাঁহার নানা আলাপ-আলোচনা হইত। এই আলোচনায় অনেকেই থাকিতেন। গুরুদেব ইস্কুলের ছেলেদিগকে অনেক সময়ে বড়-বড় ইংরেজী কাব্য পড়াইতেন। তাঁহার পড়াইবার কৌশল এইরূপই ছিল যে, তাহাতে ছোট ছেলেরাও তাহা বুঝিতে পারিত। রামানন্দবাবু এই শ্রেণীতে যোগ দিতেন। এই অধ্যাপনায় ঐ অধ্যাপক ও ঐ ছাত্র উভয়ই লক্ষ্য করিবার মত ছিলেন। রামানন্দবাবু এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেন তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র।

রামানন্দবাবুকে এই সময়ে কিছু কালের জন্য শান্তিনিকেতন কলেজের বা শিক্ষাভবনের অবৈতনিক অধ্যক্ষতার ভার লইতে হইয়াছিল।

রামানন্দবাবু যখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ, তখন সেখানে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষতার ভার ছিল আমার উপরে। সেই হিসাবে আমি ইহা বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি যে, তিনি ছিলেন আমার সহযোগী। শিক্ষাভবনে অধ্যাপকগণের মধ্যে তখন এণ্ড্রুজ সাহেবও ছিলেন। বিশ্ববন্ধু দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের বিশ্বজোড়া কাজ, এ জন্য বাহিরের কাজে অনেক সময়ে তাঁহাকে যাইতে হইত, এবং তাহাতে কলেজের ছাত্রদের পড়ানর ক্ষতি হইত। রামানন্দবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া এণ্ড্রুজ সাহেবকে একটু মৃদুমন্দ তিরস্কার করিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অধ্যাপক তখন তিনি কিছুতেই নিয়মিতভাবে না পড়াইয়া পারেন না। উদারমতি এণ্ড্রুজ ইহাতে কোনরূপ অসন্তুষ্ট না হইয়া সরলভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আর কখনো ওরূপ করিতেন না। রামানন্দবাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা কেমন ছিল তাহা এই একটি সামান্য ঘটনাতেই বুঝা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়।

এণ্ড্রুজ সাহেব ও রামানন্দবাবুর মধ্যে পরস্পর গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এক বার কোন কারণে রামানন্দবাবু এণ্ড্রুজ সাহেবের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং তাঁহার লেখা ছাপা বন্ধ করেন, বা যে লেখা তাঁহার কাছে ছিল তাহাও ফেরত দেন। এণ্ড্রুজ সাহেব ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং নানা অনুনয়-বিনয় করিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া রামানন্দবাবুর ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং সমস্ত মনোমালিন্য চুকিয়া যায়। যতক্ষণ ইহা না হইয়াছিল ততক্ষণ এণ্ড্রুজ সাহেব যে কি অশান্তিতেই ছিলেন তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

এখানে আমরা আর একটি কথা বলিতে পারি। জেনিভায় লীগ অফ্ নেশন্‌সের এক বিশেষ অধিবেশনে নানা দেশের প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন রামানন্দবাবু। লীগ প্রতিনিধিগণকে পাথেয় দিয়াছিলেন, কিন্তু রামানন্দবাবু ইহা এই আশঙ্কায় প্রত্যাখ্যান করেন যে, পাছে তাহা হইলে লীগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁহার স্বাধীন অভিপ্রায় অন্যরূপ হইয়া পড়ে। ইহা তিনি নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন। ঐ দেশে ভ্রমণ করিবার সময় লোকেরা তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া কেমন ভ্রম করিত, এবং কেমন সে দেশেও সব সভা-সমিতিতে সদস্যগণের ঠিক সময়নিষ্ঠা দেখা যাইত না, ইহাও তিনি গল্পের মধ্যে বলিয়াছিলেন।

গুরুদেব বা এণ্ড্রুজ সাহেবের অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে সমাগত বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতের সহিত শান্তিনিকেতন-সম্বন্ধে রামানন্দবাবুই আলাপ-আলোচনা করিতেন।

শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ধর্মোপদেশ সাধারণত বাঙ্‌লাতেই দেওয়া হইয়া থাকে। গুরুদেব বরাবর ইহাই করিয়া আসিয়াছেন। এণ্ড্রুজ সাহেব অবশ্য ইংরেজীতে দিতেন, এবং মহাত্মা গান্ধী সেখানে যে দুই-এক বার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাও হইয়াছিল ইংরেজীতেই। শান্তিনিকেতনে অবাঙালী ছাত্র-ছাত্রী অনেক, বাঙ্‌লায় কিছু বলিলে তাহাদের অনেকেরই ইহাতে অসুবিধা হয়। তিনি ইহা আমাকে বলিয়াছিলেন এবং ইহাই মনে করিয়া মন্দিরে একাধিকবার ইংরেজীতে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের গৌরববর্ধনে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই রামানন্দবাবু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনে যে-বাড়ীতে বাস করিতেন আজ তাহার চিহ্নও নাই। অগ্নিদেব তাহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আশ্রমের নব অধিবাসীরা হয় ত ইহার কোন কথাই জানেন না। ইহা ছিল নেপাল রোডের উত্তরে, যেখানে এখন কলেজের ছাত্রগণের বাসা হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষেরা যদি একখানি ক্ষুদ্র শ্বেতপ্রস্তরফলকে "এই স্থানে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাস করিয়াছিলেন," অথবা এইরূপ কোন কথা উৎকীর্ণ করাইয়া স্থাপন করেন ত ভাল হয়। ইহা তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়াই আমার মনে হয়। যাহাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপে শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর অনুকূলে কিছুমাত্র করা যাইতে পারিত এমন কোন সুযোগ তিনি নিজের জীবদ্দশায় ত্যাগ করেন নি। গুরুদেবের চিন্তার নানারূপে প্রচার তিনি যত করিয়াছেন আর কেহ তত করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

এক দিকে এ কথা যেমন সত্য যে, রামানন্দবাবু "প্রবাসী" ও "মডার্ন রিভিয়ু"কে প্র বা সী ও ম ডা র্ন রি ভি য়ু করিয়াছিলেন, অপর দিকে এ কথাও তেমনি সত্য যে, ঐ দুই পত্রিকা রামানন্দবাবুকে রা মা ন ন্দ বা বু করিয়াছিল। ঐ দুই পত্রিকায় পরিমিত ও সংযত বাক্যে লিখিত যুক্তিযুক্ত, নির্ভীক ও তেজঃপূর্ণ মন্তব্যগুলির কথা দেশবিদেশের পাঠকগণের সুপরিচিত। ইহা তাঁহার অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। এই সমস্ত মন্তব্য কখনো কখনো খুব তীব্র হইত। কিন্তু যাহাতে এগুলি ন্যায়- বা সত্য-ভ্রষ্ট না হয়, অনুচিত না হয়, যাহাতে তিনি অকারণে কঠোর বাক্য বলিয়া কাহাকেও দুঃখ না দেন, বা কোনরূপ পক্ষপাত না করেন, তজ্জন্য তিনি সেগুলি লিখিবার পূর্বে প্রার্থনা করিতেন। এ কথা নিজেই তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন।

তাঁহার চিত্ত খুব স্নেহপ্রবণ ছিল। আমার পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কাহারো সহিত তাঁহার এক-আধ বারও দেখা বা পরিচয় হইয়া থাকিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহার নাম উল্লেখ করিয়া কুশল প্রশ্ন করিতেন। রোগশয্যাতেও তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছি। তিনি সকলকে মনে রাখিয়াছিলেন।

কাশীতে সারনাথে গন্ধকুটীবিহারের প্রতিষ্ঠার সময় স্বর্গীয় অনগারিক ধর্মপালের (দেবমিত্রের) আমন্ত্রণে রামানন্দবাবু ও আমি উভয়েই সেখানে গিয়াছিলাম। আমাদের বাসা সেখানে পৃথক্ পৃথক্ ছিল। অতিথিগণের জন্য সেখানে ব্যবস্থা ঠিক তেমন করা সম্ভব হয় নাই। খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধাই ছিল। এক দিন দুপুরে আমি রামানন্দবাবুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করি, তিনি তাহা আনন্দে গ্রহণ করেন। 'বিশালভারতে'র তদানীন্তন

সম্পাদক বন্ধু শ্রীযুত বেনারসীদাস চতুর্বেদী মহাশয়ও সেখানে গিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকেও নিমন্ত্রণ করিলাম। আমি স্বপাক করিয়া থাকি। রান্না করিলাম কেবল নুন দিয়া (আর কোন উপকরণ পাওয়া যায় নাই) কাঁচা মুগের ডাল, তাহাতে আলু সিদ্ধ ও আতপ চালের ভাত। আমার সঙ্গে দুইটি ছাত্র ছিল শ্রীমান্ সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রভুভাই পাটেল। * আমরা সকলেই উহাই আনন্দের সহিত আহার করিয়াছিলাম। রামানন্দবাবুর জন্য সামান্য কিছু তরকারী অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার এই কথা জীবনের শেষের দিকেও যে মনে ছিল তাহা পরে জানা যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করার পর আমি শান্তিনিকেতনে যাবার ফিরিয়া যাই, রামানন্দবাবুর এই ইচ্ছা খুবই ছিল। তিনি বহুবার আমার কাছে বলিয়াছেন যে, আমি ওখানে গেলে তিনিও ওখানে যাইবেন ও থাকিবেন। মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক পূর্বে এক দিন যখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনি সারনাথের ঐ খাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয়, সারনাথের সেই খাওয়ার কথা আপনার মনে আছে কি? আমি ভাবিতেছিলাম, আপনি অবসর লইয়া শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন। আর আমিও ওখানে গিয়াছি, এবং আবার ঐরূপ কাঁচা মুগের ডাল, আলু সিদ্ধ ও ভাত একসঙ্গে খাইতেছি।" দৈবের ইচ্ছায় তাহা হইল না!

শেষের দিকে যদিও তাঁহার শরীর অত্যন্ত বিকল হইয়াছিল তথাপি চিত্তবৈকল্য বিন্দুমাত্রও হয় নি। চিত্তের উপর তাঁহার শক্তি এতই প্রভূত ছিল, এবং সেই জন্যই আমরা তাঁহাকে আজীবন স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া আসিয়াছি।

প্রকৃতিতে তিনি কালিদাসের ভাষায় ছিলেন "অধৃষ্য-শ্চাধিগম্যশ্চ," হৃদয়ে ছিলেন সদাশয় ও মহাশয়, এবং কর্মে ছিলেন আজীবন ভারতের নির্ভীক মুক্তিদূত।

এই সময়ে, রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থানের অল্পকালের মধ্যে তাঁহারও মহাপ্রস্থান ভারতের, বিশেষত বঙ্গদেশের পক্ষে দুর্বিষহ। কী এ দৈবদুর্বিপাক! কে এখন বিশ্বের সম্মুখে বঙ্গদেশের হইয়া ভারতের মুক্তির বার্তা শোনাইবার ভার গ্রহণ করিবেন? কাঁহার দিকে বঙ্গভূমি এ জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ করিবেন?

* হায়! এই ছাত্রটি আমার খুব প্রিয় ছিল; তিব্বতী, চীনা ও সংস্কৃত লইয়া কাজ করিতেছিল, বেশ অগ্রসর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপরে আমার বিশেষ আশা ছিল। বিশ্বভারতী-গ্রন্থাবলীর জন্য তিব্বতী অনুবাদের সহিত মিলাইয়া "চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ" নামে একখানি পুস্তকের বর্তমান রীতিতে সে একটি সংস্করণ করিয়াছিল, ছাপাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ছাপান ফর্মাগুলি ছাপাখানা হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। আর আমার ছাত্রটিও পরলোকে গমন করিয়াছে! যদি ইহা আমি পুনরুদ্ধার করিতে পারি তবে আমার প্রিয় ছাত্রের প্রতি আমার একটি কর্তব্য সম্পাদন করা হইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতি-কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গত বৎসর ইং ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে রামানন্দবাবু বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। প্রায় সাত মাস থেকে পূজার কিছু দিন পরে অক্টোবর মাসে কলিকাতা ফিরে যান। তখন ব'লেছিলেন—মাসখানেক পরে আবার আসছি। মাস দুই তিন পরে শুনলাম তিনি কটিদেশে দৈবাৎ আঘাত পেয়ে শয্যাগত আছেন। আর এলেন না।

বাঁকুড়ায় ইস্কুল-ডাঙ্গা নামে এক পাড়া আছে। সেখানে তিনি এক বাড়ী কিনেছিলেন। সে বাড়ী ভাড়ায় থাকত। তাঁর আসবার পূর্বে সে বাড়ীর রীতিমত সংস্কার হ'তে লাগল। পরে বিস্তর জিনিসপত্র এল। আমরা ভাবলাম, এবার তিনি বাঁকুড়ায় স্থায়ী হবেন।

তিনি সকালে ও বিকালে একটু একটু বেড়াতেন। তাঁর বাড়ী হ'তে আমার বাড়ী বেশী দূর নয়। তিনি এক একদিন সকালে আমার এখানে আসতেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা হ'ত। তিনি এত বিষয় জানতেন, আমি অবাক্ হয়ে শুনতাম। তিনি তখন এক দুশ্চিকিৎস্য কণ্ডূ রোগে ভুগছিলেন। দেহে স্বস্তি ছিল না, মনেও ছিল না।

এক দিন আমাদের কাছে একখানা প্রবাসী ছিল। আমি বললাম, "প্রবাসীর রঙ্গিন মলাটের জন্যে নিশ্চয় অনেক খরচ হয়। কিন্তু মলাট থাকে না, কয়েক দিন পরে খসে পড়ে। আমি এত খরচের প্রয়োজন বুঝতে পারি না।" তিনি বললেন, "কিন্তু আপনিই এক বার প্রবাসীতে

লিখেছিলেন বহিঃআবরণ সুশ্রী হওয়া চাই। আপনার মঞ্জুষা শব্দটি আমার মনে আছে। আমি তখন এর অর্থ বুঝতে পারি নি।"

আমি কোন্ প্রবন্ধে লিখেছিলাম আমার মনে ছিল না। বললাম, "আপনি কত প্রবন্ধ পড়েন, আপনার মনে থাকে? আপনার স্মরণ-শক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।" তিনি একটু হেসে বললেন, "এখন একটু কমেছে, পূর্বে আরও প্রখর ছিল। যখন আমি এখানকার জিলা ইস্কুলে পড়তাম Bain's English Grammar আমাদের পাঠ্য ছিল। এক বার আমাদের শিক্ষকমশায় আমাদের অবহেলা দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন। আমি সেই Grammar-এর এক পৃষ্ঠার প্রথম লাইন হ'তে শেষ লাইন পর্যন্ত অবিকল আবৃত্তি করেছিলাম।"

তিনি তাঁর বাল্যকালের কথা ব'লতে ভালবাসতেন। "শীতকালে (আমরা পাঠকপাড়ার) বাড়ী হ'তে বেরিয়ে (ডক্টর) অবিনাশ দাসদের বাড়ীতে নূন নিতাম (পাঠক-পাড়া হ'তে আড়াই মাইল দূরে)। পাঁচবাঘা (গ্রামের) মিশ্রদের গাছের কুল খেতে যেতাম। তাদের গাছে বড় বড় কুল হ'ত। আমরা তিন-চার জন যেতাম।" এই কথা ব'লতে ব'লতে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

আর এক দিন বলেছিলেন,"যখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি তখন মিঃ আর. সি. দত্ত এখানকার মেজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং ইস্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইস্কুলের মধ্যে যার ইংরেজী রচনা উৎকৃষ্ট হবে, তিনি তাকে পারিতোষিক দিবেন। আমি সে প্রাইজ পেয়েছিলাম। বাঁকুড়া সম্বন্ধে লিখবার কথা ছিল। আমি লিখেছিলাম, Chandidas, the foremost poet of Bengal, was the glory of Bankura. আমরা বাল্যকাল হ'তে শুনে এসেছি লিখব না কেন? এখন নাকি প্রমাণ দিতে হবে।"

"আপনি এইখানেই থাকুন। কলিকাতা যাবেন না। এখান হ'তেই ত আপনি কাগজ দুখানা চালাচ্ছেন। প্রভেদ বুঝতে পারছি না।"

"চালাচ্ছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অসুবিধা হয়। আমার সহকারীদিকে লিখতে হয় এখানে অমুক বই দেখে পূরণ করে দিবেন। সব সময় স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রতে পারা যায় না। আর, নানা দিকে এত জড়িয়ে পড়ে'ছি কলিকাতায় না থাকলেও চলে না।"

তাঁর তুল্য আর একটি মানুষ মনে প'ড়ছে।

এখানে সঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে মনে প'ড়ছে। সেই নির্ভীক, ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী দেশপ্রাণ মানুষটিও দেশের জন্যে আজীবন খেটে গেছেন। রামানন্দবাবুও সেইভাবে গেলেন।

ইহার পূর্বে দুই তিন বৎসর তিনি দু'তিন মাস অন্তর আসতেন। তিনি বিষ্ণুপুরে কাপড়ের কল বসাতে উদ্‌যোগী ছিলেন। সেই উপলক্ষে বিষ্ণুপুর আসতেন। আর, সুবিধা হ'লে বাঁকুড়ায় আসতেন। বিষ্ণুপুর হ'তে বাঁকুড়া রেলে এক ঘণ্টার পথ। যখনই বাঁকুড়ায় দুদিন থাকতেন, তখনই একদিন এসে দেখা ক'রতেন। আমি বলতাম,—"আপনিই আমাকে বাঁকুড়ায় এনেছেন, কিন্তু আপনাকে দেখতে পাই না। আর ধন্য আপনার ক্ষমতা! এই বয়সে দুখানা বড় বড় মাসিক পুস্তক যথাসময়ে চালিয়ে আসছেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধ বাছাই করা কাজ হ'লে বরং বুঝতে পারতাম। কিন্তু মাসে মাসে "প্রবাসী"তে বিবিধ প্রসঙ্গ ও মডার্ন রিভিয়ুতে notes লিখছেন। সে দুই পুস্তকে এক বিষয়ের নয়। একটি অপরটির অনুবাদ নয়। কত বই, কত সংবাদপত্র, কত সাময়িক পুস্তক প'ড়তে হয়, ভাবতে হয়, ধারণা ক'রতে হয়। তার পর টিপ্পনি ক'রতে পারা যায়। তা ছাড়া, আজ এখানে যাচ্ছেন, কাল সেখানে বক্তৃতা ক'রছেন, সেনসস্ রিপোর্ট মুখস্থ রেখেছেন, আটঘাট বেঁধে আইন বাঁচিয়ে লিখছেন, মানহানির ধারা মনে রাখছেন। কেমন করে' করেন, বুঝতে পারি না।"

"চালিয়ে ত আসছি।"

"তা ত দেখছি।"

"আমার পিতৃপুরুষ ভট্টাচার্য ছিলেন। তাঁদের আলো-চালের গুণে ও আশীর্বাদের ফলে চালাচ্ছি।"

রামানন্দবাবু ভট্টাচার্য বংশের সন্তান। তাঁর পিতা ভট্টাচার্যকর্ম ও ভট্টাচার্য্য-উপাধি ত্যাগ ক'রে কুলোপাধি চট্টোপাধ্যায় ধরেন।

রামানন্দবাবু এত বিষয়ে লিখতেন, আর এমন দক্ষভাবে লিখতেন যে আমার আশ্চর্য বোধ হ'ত। সে সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে লিখতে পারতেন না। সাধারণ ইংরেজী শিক্ষিতের জ্ঞানের সাহায্যে কিছুতেই লিখতে পারতেন না। তিনি মোক্ষধর্ম বিষয়ে লিখতেন না। কারণ তদ্দ্বারা উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধর্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের অন্তর্গত যাবতীয় বিষয় তাঁর আলোচ্য হয়েছিল। প্রথম বর্ষের প্রদীপে আমি "পরজীবী" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তিনি প্রদীপের সম্পাদক, এলাহাবাদে থাকতেন। তিনি প্রবন্ধ

পেয়ে প'ড়ে আমায় লিখেছিলেন আমি একটা বিষয় ছেড়ে গেছি। সেটা জুড়ে দিলে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হয়। বাস্তবিক আমি পরস্পর-জীবীর উল্লেখ করি নি। আমি সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত সামান্ত ভাবে লিখেছিলাম। তিনি এ বিষয়ে জানেন দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। প্রবন্ধটি ফেরৎ এলে পরস্পর-জীবী সম্বন্ধে কিছু লিখে পাঠিয়ে ছিলাম, ছাপা হয়েছিল।

আমি প্রবাসীতে অনেক লিখতাম। কেহ কেহ মনে করতেন প্রবাসী পরিচালনায় আমার হাত আছে, আর আমি ইচ্ছা ক'রলেই রামানন্দবাবুকে দিয়ে যে-সে রচনা ছাপাতে পারি। কটক কলেজের এক বাঙ্গালী ছাত্র কবি হয়ে উঠেছিল, আমি জানতাম না। একদিন একখানা বাঁধা বই নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত। সেখানা কবিতার বই, কবিতা তার রচিত। অন্ততঃ গোটাকয়েক কবিতা প্রবাসীতে ছাপাতে হবে। আমি যত বলি, আমি প্রবাসীর সম্পাদক নই, প্রবাসী আমার কাগজ নয়, সে কিছুতে মানবে না। আমাকে একটা কবিতা রামানন্দবাবুর কাছে পাঠাতে হ'ল। যদি যোগ্য বিবেচনা করেন, ছাপাবেন।" ফেরৎ ডাকে পদ্যটি ফেরৎ এল, রামানন্দবাবু একটা টিপে লিখেছেন, "চলিবে না, ক্ষমা করিবেন।" কবিতা দশজনকে শোনাতে না পেলে কবিরা ছটফট করেন। আমি এই কবিকে সান্ত্বনা দিতে পারি নি। এক চিত্রকর ছাত্রের চিত্রও রামানন্দবাবু ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। আমি এক নবীন লেখকের রচনা পাঠিয়েছিলাম রামানন্দবাবু ছাপান নি। প্রবাসীর অনেক লেখককে এইরূপ ফেরে পড়'তে হয়ে থাকবে। কিন্তু বোধ হয় সম্পাদকীয় বিবেচনা কভু উপহত হয় নাই।

একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রামানন্দবাবু রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রবাসীতে কবির "সোনার তরী"র প্রতিকূল সমালোচনা ছাপিয়েছিলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সমালোচক। "সোনার তরী"র অস্পষ্টতা-দোষ আরও কেহ কেহ ধরেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অকবি অরসিক অব্যবসায়ী হ'লে সমালোচনাটি লঘু চিত্তের বামাগতি মনে করা চলত। সম্পাদকের মনোমত না হ'লে তিনি ফেরৎ দিতেন। পূর্বে বারমাসিকের —যেমন নব্যভারতের—মুখপত্রে লেখা থাকত, "প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী" লেখকগণ দায়ী বটেন, কিন্তু পাঠকের গোচরে আনবার ভার সম্পাদকের। আইনে সম্পাদককে দায়ী করে, ঠিক করে। সম্পাদক নাম ঠিক নয়, তিনি সংস্কর্তা। সংস্কর্তা প্রবন্ধ বেছে নিয়েছেন, হয়ত প্রয়োজন বোধে প্রবন্ধের কোন অংশ কেটেছেন, পাল্‌টেছেন। তাঁর কাজ বড় সোজা নয়। এই কারণে সংস্কর্তার সম্মান। রামানন্দবাবু "সোনার তরী"র সমালোচনায় দোষ দেখলে সেটা নিতেন না। তিনি সমালোচনার প্রতিবাদ করেন নি, অন্য দ্বারা "তরী"র ব্যাখ্যাও করান নি। আমি জানি তিনি সে কবিতাটি অস্পষ্ট মনে করতেন।

আমরা বাইরের লোক। বারমাসিক পুস্তকের* সম্পাদকের কষ্ট বুঝতে পারি না।

একবার আমি এক পত্রে প্রবাসীতে প্রকাশিত গল্প সম্বন্ধে সমালোচনা করেছিলাম। যে গল্পে দুগ্ধ আছে কিনা সন্দেহ, শুধু জল, সে গল্প ছাপিয়ে প্রবাসীর কলেবর বৃদ্ধি না করাই ভাল। তৎকালে সাহিত্য নামক বারমাসিক পুস্তকে প্রকাশিত "আগন্তুক" নামে একটি গল্পের উল্লেখ করে লিখেছিলাম, সেরূপ গল্প ছাপালে প্রবাসীর গৌরব বৃদ্ধি হবে, উত্তরে তিনি লিখেছিলেন—"সে সব বুঝি, ভাল গল্প পাই না এই দুঃখ। নির্দোষ মনোরঞ্জন গল্পের লেখক অতি অল্প। গল্প না ছেপে শুধু জ্ঞানের ও শিক্ষার প্রবন্ধ ছাপালে প্রবাসী টিকতে পারবে না। বহু গ্রাহক কেবল গল্প ও উপন্যাস পড়েন সে যেমনই হ'ক। যদি তাঁরা প্রবাসীর অন্য পাতা দৈবক্রমে পড়েন তাহলেও আমার উদ্দেশ্য কিছু সিদ্ধ হবে।" তিনি আমার অনুরোধে সে গল্পের লেখককে ধরে একটি গল্প পেয়েছিলেন। কিন্তু ফরমাশী গল্প ও পদ্য ভাল উৎরায় না।

চার পাঁচ বৎসর পূর্বে আমার এক প্রবন্ধে রামানন্দবাবুকে একটা কাজ করতে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি লিখেছিলেন—"অনেক কাজ আছে, আমি জানি আমার করা উচিত। কিন্তু আমি করিতে পারি না। আমাকে একা সকল কাজ করিতে হয়। আমার সেক্রেটারি নাই, সেক্রেটারি রাখিবার অর্থও নাই।"

তাঁর কাজের শৃঙ্খলা ছিল। পত্রের উত্তর দিতে কখনও দেরি করতেন না। সব নিজের হাতে লিখতেন। লৈখিক ভাষায় লিখতেন। তাঁর হাতের বড় বড় অক্ষর দেখলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, তিনি থিরবুদ্ধি ও স্থিরবুদ্ধি ছিলেন।

* "প্রবাসী"কে পত্র বলি কি করে'? বাঁধান বই, পত্র ব'লতে পারা যায় না। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পত্র বটে। পাতা বাঁধা নয়, খোলা। "প্রবাসী"কে মাসিক পুস্তক বলাই ঠিক। কিন্তু তদ্দারা এমন বুঝায় না, ইহা সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত নানা লেখকের রচিত পুস্তক। অতএব 'বারমাসিক পুস্তক' এইরূপ নাম হ'লেই ভাল হয়। এখানে 'বার' সংস্কৃত, অর্থসমূহ অনেক, যেমন বার আরী (বারোয়ারী), অনেকের দ্বারা কিম্বা অনেকের নিমিত্ত সম্পন্ন। ধর্মপুরাণে বারমতি পূজা, বহু ধর্মরাজের পূজা।

বস্তুতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রখর স্মৃতি ও ধৃতিশক্তি অধ্যবসায় ও নিরালস্য গুণে তিনি নানা বিষয় জানতেন। এসব গুণ ভগবদ্ দত্ত। কেহ বলে পূর্বজন্মের ফল, কেহ বলে দৈব। দৈব অনুকূল না হ'লে পুরুষকার পঙ্গু হয়ে থাকে; আর, কাল অনুকূল না হ'লে পুরুষকার কিছু ক'রতে পারে না। রামানন্দবাবু প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুতে যে-সব আলোচনা করেছেন, সাধারণ পুস্তকের আকারে ছাপালে প্রতি বৎসর ২০০।৩০০ পৃষ্ঠার দুখানা বই হ'তে পারে।

প্রায় ৫১ বৎসর পূর্বে ইং ১৮৯২ সালে আমি রামানন্দ-বাবুর নাম প্রথম শুনতে পাই। সে বৎসর কলিকাতায় কয়েকজন বন্ধুর সহিত তিনি আতুরের নিমিত্ত এক আশ্রম খুলেছিলেন। তাঁরা আপনাদিকে নরনারায়ণের দাস মনে করতেন। এই কারণে আতুরাশ্রম নাম না দিয়ে 'দাসাশ্রম' নাম দিয়েছিলেন। আংশিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত তাঁরা দাসী নামে একটি ছোট মাসিক পুস্তক প্রকাশ করতেন। আশ্রমের পরিচালকদিগের মধ্যে আমার এক পুরাতন ছাত্র মৃগাঙ্কধর রায় ছিলেন। দাসীতে লিখতে তিনি আমায় অনুরোধ করেন। ইহার পূর্বে আমি মাঝে মাঝে নব্যভারতে লিখতাম। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী নব্য-ভারতের সম্পাদক ছিলেন। দাসী ছোট ডিমাই আট পৃষ্ঠার বোধ হয় ৩২ পৃষ্ঠা। রামানন্দবাবু দাসীর সম্পাদক ছিলেন এবং দেশের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে লিখতেন। আমি "নানা কথা" নাম দিয়ে ছোট ছোট বিষয়ে কিছু কিছু লিখতাম। আমার কাছে দাসী একখানিও নাই। কত বৎসর চলেছিল তাও মনে নাই।

ইং ১৮৯৫ সালে রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালার প্রিন্সিপাল হয়ে এলাহাবাদ চ'লে যান। সেখানে থাকতে ১৩০৪ সালে পৌষ মাসে (ইং ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে) তিনি প্রদীপ নামে এক বারমাসিক পুস্তকের সম্পাদক হন। প্রদীপের কার্যালয় কলিকাতায় ছিল। কার্যাধ্যক্ষের নাম বৈকুণ্ঠনাথ দাস। প্রদীপ প্রকাশের পূর্বে রামানন্দবাবু তাতে লিখবার জন্য অনুরোধ করে' আমায় এক পত্র লিখেছিলেন। ক্রমশঃ পত্রদ্বারা তাঁর সহিত পরিচয় হয়েছিল। প্রথম বর্ষের প্রদীপে আমি তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাঁর উপদেশ অনুসারে একটায় আমার নাম ছিল না। তিনি আমার একখানা বাঙ্গালা কিমিতি বিদ্যার (রসায়ন) পাঠ্য পুস্তকের সমালোচনা করিয়ে ছিলেন। এই সময়ে কিম্বা কিছু পরে নব্যভারতে "ফুলের বাগান" নামে আমার একটি ছোট রচনা বেরিয়েছিল। সেটি তাঁর ভাল লেগেছিল। আমায় লিখেছিলেন—"আমার ফুলের বাগান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। পাঁচ (?) বিঘা জমি কিনিয়াছি।" কোথায় কিনেছেন, লেখেন নাই। (পরে বুঝেছি তিনি সে সময়ে বাঁকুড়ার ইস্কুল-ডাঙ্গায় জমি বাড়ী কিনেছিলেন)। তৃতীয় বর্ষের প্রদীপে তিনি দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র সমালোচনা লিখেছিলেন। দীনেশবাবু কতকগুলি শব্দ অপ্রচলিত বলেছিলেন। কতকগুলি পুরাতন শব্দের অর্থও ধরতে পারেন নাই। রামানন্দবাবু দেখিয়েছিলেন বাঁকুড়ায়, "আমাদের জেলায়" সে সকল শব্দ প্রচলিত আছে এই এই অর্থে। হফটন সাহেব-কৃত বাঙ্গালা ইংরেজী অভিধানেও প্রায় সেই অর্থ। আমি তখন বুঝি বোধ হয় রামানন্দবাবুর নিবাস বাঁকুড়া। সেই সময়ের কিছু পূর্বে তাঁর এক পত্র হ'তে জানতে পারি তিনি বাঁকুড়াবাসী। বাঁকুড়া নাম শুনে আমি তাঁকে লিখেছিলাম, বাঁকুড়া আমার একেবারে অজানা নয়। আমি সেখানে বাল্যকালে এক বৎসর কাটিয়েছি। সেখান-কার জেলা ইস্কুলে আমার ইংরেজী হাতে খড়ি হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি যে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে ছাতে উঠে ঘুড়ী উড়াতাম তার পুরা নাম মনে পড়ছে না। যিনি আমায় বাড়ীতে পড়াতেন তাঁর মূর্তি মনে আছে, কিন্তু নাম মনে আসছে না। বাঁকুড়ার ইস্কুলের বেড় কি প্রকাণ্ড! ইত্যাদি আরও দুই-এক কথা লিখেছিলাম। দিন কুড়ি পরে তাঁর পত্রে দেখি তিনি আমার বাঁকুড়াবাসের হাটহদ্দ সমুদায় আবিষ্কার ক'রেছেন। মনে হ'তে লাগল তিনি শিক্ষক না হয়ে টিকটিকী পুলিস হ'লে এতদিন নাম ক'রতে পারতেন।

তিনি ও আমি দূরে দূরে থাকতাম। চাক্ষুষ আলাপের সুযোগ হয় নি। যখন এলাহাবাদ ছেড়ে কলিকাতায় বসেছেন, তখন কর্ণআলিশ ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা-গৃহের পাশের সরু গলিতে প্রবাসী আপিস ছিল। এক দিন সন্ধ্যার সময় রামানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেছলাম। দুঃখের বিষয় তখন তিনি ছিলেন না। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। টেবিলের উপরে আলো ছিল।

ইং ১৯১২ সালে আমি অসুস্থ হয়েছিলাম। শুনলাম বাঁকুড়ার জলবায়ু ভাল। সেখানে মেলেরিয়া নাই। আমি পূজার ছুটিতে বাঁকুড়ায় আসি। ইস্কুল-ডাঙ্গায় বাসা পেয়ে-ছিলাম। কিছু দিন পরে রামানন্দবাবু এসেছিলেন, আমি জানতাম না। কোন্ বাড়ীটা তাঁর, তাও জানতাম না। এক দিন বেলা প্রায় তিনটার সময় এক ভদ্রলোক আমার বসবার ঘরে ঢুকলেন। নমস্কার করে বললেন, "আমি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।" আমি তখন এক কম্বল আসনে

বসেছিলাম। তাঁর দর্শনের আশা করি নি। যথোচিত সমাদরও করতে পারি নি। তিনি আসনের এক ধারে অতি বিনীত ভাবে বসলেন। গৌরকান্তি, পুষ্টদেহ প্রশান্ত চক্ষু, গম্ভীর মুখ, পূর্ণযৌবন। দুই-এক কথার পর তিনি শুধালেন, "বাঁকুড়া কেমন দেখছেন?"

"আপনি যে আমার বাল্যবন্ধুর নাম আবিষ্কার করেছিলেন তিনি ছাড়া এখানে আমার জানাশোনা কেহই নাই। আমি বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াই, লোক চলাচল দেখি। আমার:বোধ হচ্ছে বাঁকুড়া অত্যন্ত দরিদ্র। আমি কয়দিনে শতাবধি লোক দেখে থাকব। কিন্তু স্থূলকায় একজনকেও দেখি নি। দোহারা কিছু আছে। কিন্তু অধিকাংশই একহারা, শীর্ণ।"

"মোটা একজনও দেখতে পেলেন না?"

"না। মনে হয় লোকে যথোচিত আহার পায় না। বাঁকুড়া এক জেলার প্রধান নগর। যদি নগরেই এই দশা, গ্রামবাসীর দশা আরও শোচনীয় মনে হয়। সকলের মুখ শুষ্ক মলিন।"

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন যেন কি ভাবতে লাগলেন।

"আর কি দেখলেন?"

"আর যা দেখলাম তাতেও মনে হয় পুষ্টিকর ও তেজস্কর আহারের অভাবে এখানকার লোকের মুখে উৎসাহের চিহ্ন নাই"

তিনি আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বোধ হয় তিনি যেন কথাটা নূতন শুনলেন। তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। এর পরে আর দু-এক কথা বলে তিনি চলে গেলেন। তার পর এগার বৎসরের মধ্যে আর দেখা করবার সুযোগ হয় নি। ৩১ বৎসর পূর্বে এই আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল।

বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের দেশ। তিনি দেশের দারিদ্র্য মর্মে মর্মে অনুভব ক'রতেন। প্রথম বর্ষের প্রথম মাসের (১৩০৪ পৌষ) প্রদীপে দেখছি, প্রথম প্রবন্ধ 'মরিব কি বাঁচিব?' লেখক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় (কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দাদা এম-এ, বি-এল, উকীল)। প্রবন্ধটি ৪৬ বৎসর পূর্বে লেখা। কিন্তু তখন যে প্রশ্ন উঠেছিল অদ্যাপি সে প্রশ্ন রয়েছে বরং বর্তমান দুর্দিনে গুরুতর হয়ে উঠেছে।

"আমরা মরিতেছি ক্ষুধায়, রোগে, মামলায়, কুশিক্ষায়, পাপে। * * *হে পণ্ডিত, হে স্বদেশভক্ত, হে মহাপুরুষ, আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

প্রবন্ধটি প্রবাসীতে ছেপে দিলে পাঠক বুঝতে পারবেন দুই পুরুষ কালেও আমাদের দেশের অন্নকষ্ট দূর হয় নাই। প্রাণ-রক্ষা সকল প্রশ্নের আদি প্রশ্ন। সেটাই দুর্ঘট হয়েছে। ধান যব গম কলাই তিল সরিষা, সবই জন্মে; কিন্তু কোনটা পর্য্যাপ্ত নয়। আখ-চাষ হয়, কিন্তু অন্য প্রদেশ হতে চীনি না এলে আমরা গুড়ও খেতে পেতাম না। কাপাস জন্মে, নগণ্য। কুইনিন গাছের চাষ হয়, কিন্তু কুইনিন পাই না। প্রাণরক্ষার্থে পরবশ হ'লে যে দশা ঘটে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হ'চ্ছে। দুঃখের বেদনা লোপ মৃতের লক্ষণ। সে লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

প্রবন্ধ-গৌরবে প্রথম বর্ষের প্রদীপ বর্তমান প্রচারিত বারমাসিক পুস্তকের সমকক্ষ, বরং উপরে উঠেছিল। তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'সিরাজদ্দৌলা' পুস্তকের সমালোচনা করেছিলেন। আর কয়েকজন ভারত-প্রসিদ্ধ পুরুষের, যথা রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, সর্দার দয়াল সিং, স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, যোদ্ধা প্যারিমোহন, ডক্টর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চরিতাখ্যান লিখেছিলেন। দেশের কীর্তিমান্ পুরুষের চরিত-প্রকাশ রামানন্দবাবু প্রথম আরম্ভ করেন। ষ্টেড সাহেব তাঁর রিভিয়ু অব রিভিয়ুজ নামক বিখ্যাত বারমাসিকে এইরূপ আখ্যান প্রকাশ করে যশস্বী হয়েছিলেন। প্রথম বর্ষের প্রদীপে আরও দেখছি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "লালপল্টন" লিখে বাঙ্গালীর কাপুরুষতা অপবাদ মোচন ক'রেছিলেন। রামানন্দবাবু প্রদীপে আরও কয়েকখানি পুস্তকের সমালোচনা করে'ছিলেন, কীর্তিমান্ দেশগৌরব পুরুষের চরিত লিখেছিলেন। তাঁর ভাষা স্বাভাবিক, তাতে কৃত্রিমতা কুটিলতা নাই। সোজা সরল শুদ্ধ বাংলা। ফেনা নাই, আড়ম্বর নাই, বিদ্যাপ্রকাশ নাই, বাচালতা নাই। এই ভাষা প'ড়লেই তাঁর স্বভাব স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রবাসীতে যা লিখেছেন তা হ'তে তাঁর চরিত্রের স্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এখানে তাঁকে যুক্তিতর্ক ক'রতে হয়েছে। নানাদিক সামলে লিখতে গেলে স্বাভাবিকতা থাকে না।

আমার কাছে তিন বৎসরের খণ্ডিত প্রদীপ আছে। তৃতীয় বর্ষের (১৩০৬ সালের) ফালগুন মাসের প্রদীপে শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদকের নিবেদনে লিখেছেন, 'শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদীপের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদেশে বাস বশতঃ সম্পাদকের যে অসুবিধা তাহা তিনি অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আনুষঙ্গিক আরও কতকগুলি অসুবিধা ঘটিয়াছিল।" কিন্তু দেখছি এই নূতন সম্পাদকও স্থায়ী হইতে

পারেন নাই। সে বর্ষের ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রদীপে কে একজন লিখেছেন, "কয়েক জন সাহিত্যানুরাগী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক লইয়া প্রদীপ-পরিষদ গঠিত হইল। এখন হইতে প্রদীপ সম্পাদনভার এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইল।" কে কর্তা, তাঁর নাম নাই। আমার বোধ হয় যিনি প্রথমে কার্যাধ্যক্ষ, পরে প্রকাশক, এবং অন্তিম-কালে সম্পাদক হয়েছিলেন, সেই বৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রদীপের কর্তা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। রামানন্দবাবুর কাগজ হলে তিনি প্রদীপ তুলে দিতেন। এই নাম অন্যকে দিতেন না, গ্রাহক দিতেন না। প্রদীপ ৪০০ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। দ্বিতীয় বর্ষে এক ক্রমশঃ মূল্য-প্রাপ্তি-স্বীকার পত্রে দেখছি, গ্রাহক প্রায় ৩০০০ ছিলেন।

রামানন্দবাবুর প্রদীপ ত্যাগের পর প্রদীপের অবনতি হচ্ছিল। গল্পের পরিসর বাড়ছিল। বোধ হয় প্রদীপ-পরিষদ প্রদীপের ঘৃত সংগ্রহ করতে পারেন নাই। আমার মনে পড়ছে, প্রকাশক বৈকুণ্ঠনাথ দাস সম্পাদকের আসনে বসেছিলেন। কিন্তু চলতি দোকানও যে-সে চালাতে পারে না। লোকে যাকে তাকে মাল যোগায় না, যার তার দোকান হতে কেনে না। প্রদীপের সঞ্চিত-ঘৃত ফুরিয়ে গেল, প্রদীপও নিভল। নূতন সম্পাদকের হাত দিয়ে এমন কদর্য গল্প বেরল, আমার মনে আছে, পাতাগুলা ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয়েছিল। পরের মাসের প্রদীপেও দেখি সেইরূপ অশ্রাব্য অপাঠ্য গল্প। আমার নামে প্রদীপ পাঠাতে নিষেধ করতে হ'ল। এ দুঃখ এখনও যায় নি। নিত্য প্রয়োজনীয় বই কিনে গোড়ার বিজ্ঞাপন পড়ে দেখতে হয়। পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে রাখতে পারা যায়।

প্রদীপ নিভবার পরে এলাহাবাদ হ'তে রামানন্দবাবু প্রবাসীর সূচনা করে' আমায় এক পত্র লিখেছিলেন। আমি তাঁর সংকল্প অনুমোদন করে'ছিলাম। বাংলা ভাষায় একখানা জ্ঞান-বিতরণের ও চিত্তবিনোদনের উত্তম বারমাসিক বাহির হয়, তখনকার দিনে সকলেরই ইচ্ছা ছিল। আমরা তাঁর প্রদীপ দেখে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়েছিলাম। বাস্তবিক প্রবাসী প্রদীপেরই বর্ধিত সংস্করণ।

তিনিই প্রথমে বারমাসিকে চিত্র দিতে থাকেন। প্রদীপের কালে হাফটোন চিত্র হয়েছিল, কিন্তু দুর্মূল্য ছিল, তথাপি প্রদীপে থাকত। তৃতীয় বর্ষের প্রদীপে বহু লেখকের হাফটোন চিত্র ছাপা হয়েছিল, ইট-রঁগা চিত্রও হয়েছিল। রামানন্দবাবুর চিত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথের চিত্র ভাল হয় নাই, চোখ দেখলে মনে হয় পাগল। উৎকীর্ণ কাষ্ঠ হতেও চিত্র ছাপা হ'ত। তিনিই প্রথমে চিত্রকলার আদর করেছিলেন। বিদ্যা ও কান্তকলার সমাবেশ করে'-ছিলেন। তিনিই প্রথমে বারমাসিকের বর্তমান আকার দিয়েছিলেন।

প্রদীপে সম্পাদকীয় সমালোচনা থাকত না, রাজনীতি চর্চা থাকত না। প্রবাসীতে রামানন্দবাবু প্রথম আরম্ভ করেন। যাঁরা ভারতভূমিকে মাতৃভূমি জ্ঞান করেন তাঁরা সজাত। সজাতের ভাব—সখ্য, সমদুঃখতা, মৈত্র, ঐক্য—সাজাত্য বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রদীপ ও প্রবাসীতে দেশহিতৈষী স্মরণীয়-কীর্তি নর-নারীর চরিত প্রকাশিত করতেন। তিনি সাজাত্যমতি ছিলেন। কংগ্রেস ভারত-সাজাত্যমতিদের মহাসভা। রামানন্দবাবু তার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন।

রাজনীতি সকল জাতির আদি, কাজেই তাঁকে রাজ-নীতির সমালোচনা করতে হ'ত। কিন্তু এই হেতু তাঁকে সাংবাদিক বলা সঙ্গত মনে হয় না। আমরা বার্তাবহ অর্থে সংবাদপত্র বলি। প্রবাসীতে বার্তা থাকত, কিন্তু সে পুরাতন বার্তা। তাও প্রবাসীর পত্র-সংখ্যার তুলনায় কতটুকু। তিনি প্রবাসী দ্বারা শিক্ষকের কাজ করে গেছেন, অন্যের সাহায্যে একটা কলেজ চালিয়ে গেছেন। রামমোহন রায় তাঁর আদর্শ ছিলেন।

প্রবাসী বার হবার পূর্ববৎসরে সাহিত্য নামক বার-মাসিক বার হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদক। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিমান লঘু হতে দেন নাই। উপযুক্ত প্রবন্ধ-অভাবে মাসে মাসে যথাকালে সাহিত্য বার করতে পারতেন না। ফলে পাঠকসংখ্যা বাড়ে নাই। নাই বাড়ুক, তেমন বারমাসিক আমাদের দেশের গৌরব মনে করি। বিশেষতঃ সমাজপতি-কৃত "মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা" দ্বারা অসংখ্য লেখকের উপকার হয়েছে। কোন কোন মন্দ কবি যশঃপ্রার্থী কশাঘাতের জ্বালায় ছটফট করে থাকবেন, কিন্তু বহু কবির শিক্ষা হয়েছে। সমাজপতি গত হলেন, সাহিত্যও অদৃশ্য হ'ল। সম্পাদকের শুধু নামের গুণেও বারমাসিক চলে না। প্রবাসী বার হবার সময় (বৈশাখ ১৩০৮) নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব হ'ল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক। তথাপি বঙ্গদর্শন কয়েক বৎসরের জীবন যুদ্ধের পর অদৃশ্য হ'ল। সম্পাদকের লোকচরিত্রজ্ঞান, দেশজ্ঞান ও কালজ্ঞান না থাকলে বার-মাসিক চলতে পারে না। রামানন্দবাবুর এই তিন জ্ঞান ছিল। যার এই তিন জ্ঞান আছে সে বণিক হতে পারে এবং দক্ষতা থাকলে ক্রমশঃ বাণিজ্য বাড়াতে পারে। কিন্তু যে বণিক্ অর্থলোভে ভোজ্য ঘৃতে চর্বি মিশায়, সজ্জনে

তাকে কখনও ক্ষমা ক'রতে পারে না। কুৎসিত গল্প, বীভৎস চিত্র, অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা অর্থ আসতে পারে। চৌর্য দ্বারাও আসতে পারে, কিন্তু চিরদিন আসে না রামানন্দবাবু সর্বদা সতর্ক থাকতেন, তথাপি দু-একটা গল্পে তাঁর খরদৃষ্টির অভাব হয়েছিল। গত বৎসর তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি দুঃখিত হ'লেন, লেখকের নাম দেখে ছাপতে দিয়েছিলেন। নিজে প'ড়তে পারেন নি। তিনি কায়স্থ পাঠশালা ছেড়ে অন্য কলেজে ঢুকতে পারতেন, অক্লেশে অন্য সম্মানিত পদ পেতেন। কিন্তু তিনি বারমাসিক চালনাই জীবনের ব্রত ক'রেছিলেন, আত্ম-প্রত্যয় ও দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁর ব্রত সফল ক'রেছিল। পূর্বে কারও ভরসা হয় নাই। যিনি বৃত্তির সঙ্গে দেশের সেবা ক'রতে পারেন তিনি ধন্য। কায়েন মনসা বাচা,—এই ত্রিবিধ উপায়ে ভক্ত তার অভীষ্টের সেবা করেন। রামানন্দ-বাবু মনন দ্বারা সেবা ক'রে গেছেন। এর ফল অলক্ষ্যে অল্পে অল্পে ফ'লতে থাকে, আমাদের চোখে সহজে পড়ে না।

তিনি আমার প্রতি চিরদিন অনুকূল ছিলেন। আমি যখন যা লিখেছি তিনি তখন তা নিয়েছেন। কখনও একটি শব্দ, একটি শব্দের বানান কাটেন নাই। আমি যখন বাংলা অক্ষর-সংস্কারে মগ্ন ছিলাম, কত বিজ্ঞজনে উপহাস ক'রেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন নূতন অক্ষর দ্বারা বাংলা ভাষার সর্বনাশ হবে। অক্ষর ও বানান যে এক পদার্থ নয়, সেটা বুঝতে পঁচিশ বৎসর লেগেছে। এখন আনন্দবাজার পত্রিকার পাঠক প্রত্যহ নূতন অক্ষর প'ড়ছেন, উপহাস করেন না। কিন্তু আরম্ভে নূতন অক্ষরের সহিত পাঠকের পরিচয় করাতে আমি সেই অক্ষরে লিখতাম। রামানন্দবাবু দ্বিরুক্তি না ক'রে ছাপাতেন। কম্পজিটর বিরক্ত, টাইপ নাই; প্রিণ্টর বিরক্ত, টাইপ ভেঁগে যায়, তথাপি রামানন্দবাবু ছাপাতেন। ভারতবর্ষের সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়ও যথাসাধ্য যত্ন ক'রতেন। তিনি কয়েকটা নূতন টাইপ করিয়েছিলেন। আমি দুই জনের নিকট সাহায্য পেয়েছিলাম।

রামানন্দবাবু সম্বন্ধে কত কথা মনে আসছে, সব লিখতে পারলাম না। গত বৎসর বিজয়া দশমীর পরদিন অপরাহ্ণে আমরা তিন বন্ধু রামানন্দবাবুর বিজয় জানাতে তাঁর বাড়ী গেছলাম। তিনি মৃদু হাস্যদ্বারা আনন্দ জানিয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম আমরা অবশ্য জানতাম, কিন্তু তিনি আপনাকে উচ্চ, অপরকে নীচ মনে ক'রতেন না, কারও সদ্ভাব হারান নি। এই মহাগুণের জন্য হিন্দু মহাসভা বার্ষিক অধিবেশনে তাঁকে সভাপতি বরণ ক'রেছিলেন। তাঁর বড়াই ছিল না। এই কারণে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন।

রামানন্দ-বন্দনা

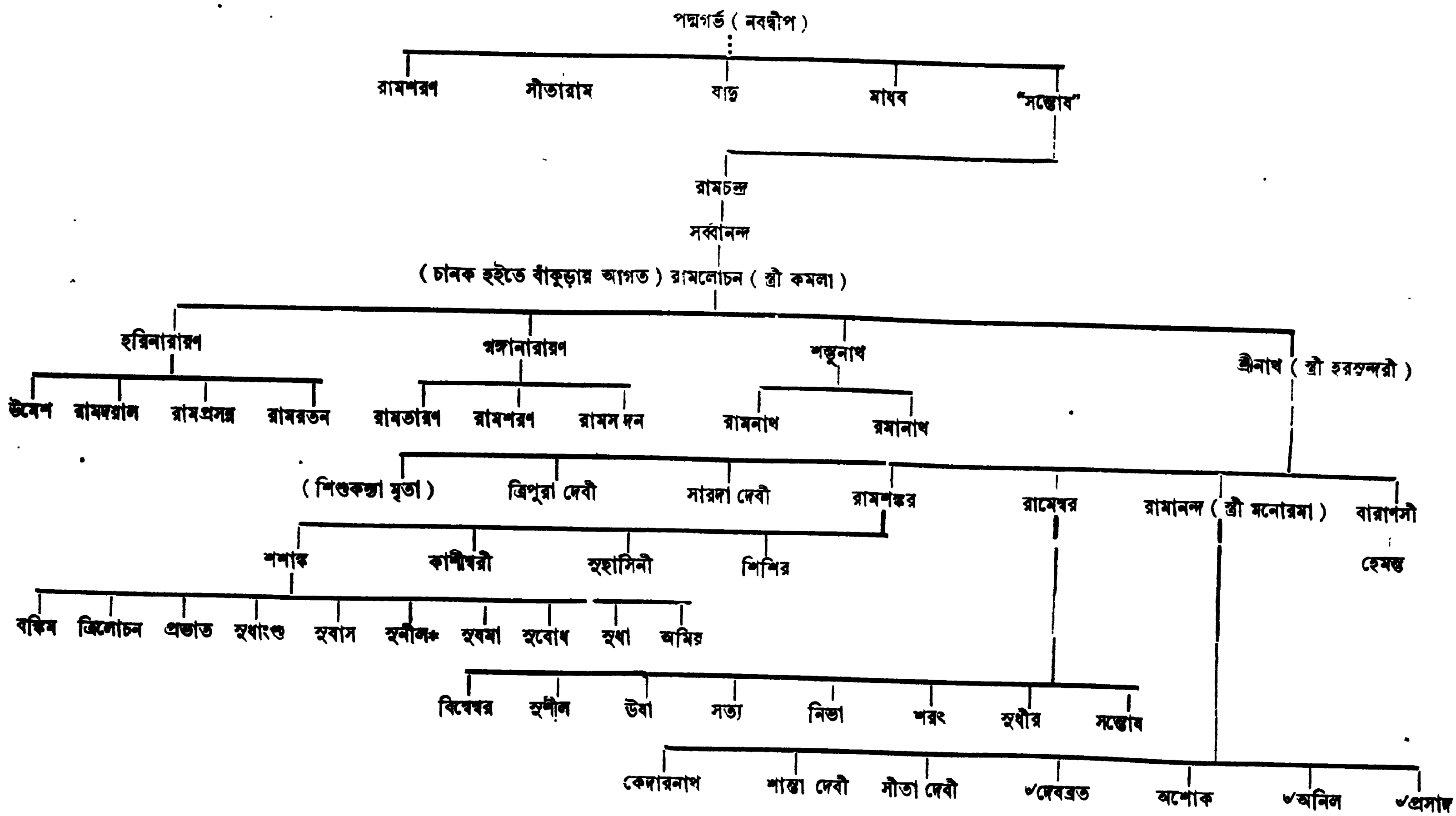
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

রঘু-বংশের জ্যোতি, নির্মল রাম
কান্ত কোমল আর বলে উদ্দাম।
গুহকের বন্ধু সে রাবণের ত্রাস,
শিষ্টে সে মিষ্টতা, দুষ্টে বিনাশ।
ত্যাগে সেই মহীয়ান, ভোগে উদাসীন,
জন-মন রঞ্জিতে নিজে সুখহীন।
ধৈর্য্যে সে হিমালয়, জ্ঞানে পারাবার,
শক্তিতে বজ্র সে, প্রেমিক উদার।
সুন্দর সুকঠোর সেই রাম আজ
রামানন্দের রূপে করেছে বিরাজ।

সন্তানে রচেছিল আনন্দমঠ—
দেশপ্রেম-ছায়াভরা অক্ষয় বট।
ত্যাগী দুর্ব্বার যত সন্তানদল
সেবিল স্বদেশমাতা হর্ষে উজ্জ্বল।
সে মঠের নিরমল আনন্দভার
রামানন্দের রূপে মূর্ত্ত অপার।
সেবায় যে ভয়হীন আনন্দময়,
তাহারে প্রণাম করি, গাহি তারি জয়॥

চট্টোপাধ্যায় বংশ (পণ্ডিত রত্নী মেল)

পাঠকপাড়া—বাঁকুড়া



* শ্রীসুনীলশেখর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত



সিসিলির যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অর্দ্ধ মাইল পশ্চাতে মার্কিন সামরিক চিকিৎসক জনৈক আহত মার্কিন সেনার শরীরে রক্তের প্লাজ্‌মা ভরিয়া দিতেছেন U.S.O.W.I.



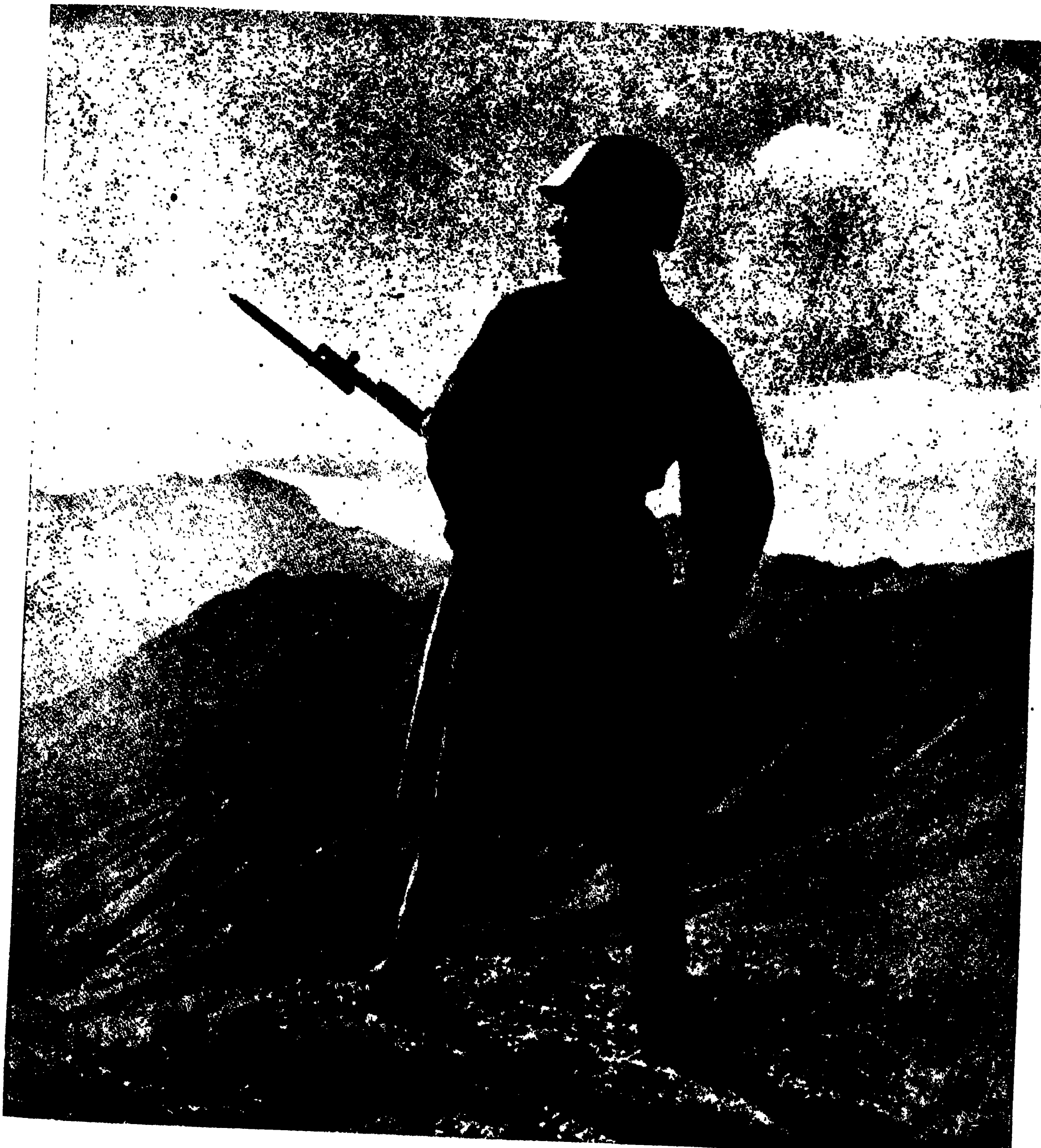
এই নৌ-সেনা তুলাগিতে আহত ও অগ্নিদগ্ধ হয় এবং তাহাকে বিমান যোগে একটি হাসপাতাল-জাহাজে সত্বর লইয়া যাওয়া হয়। চিকিৎসক কর্ত্তৃক সযত্নে ও যথাসময়ে ঔষধ এবং রক্ত প্রয়োগ করা না হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল



লণ্ডনের হাইড পার্কস্থিত সার্পেণ্টাইন হ্রদে স্নান-রত নর-নারী

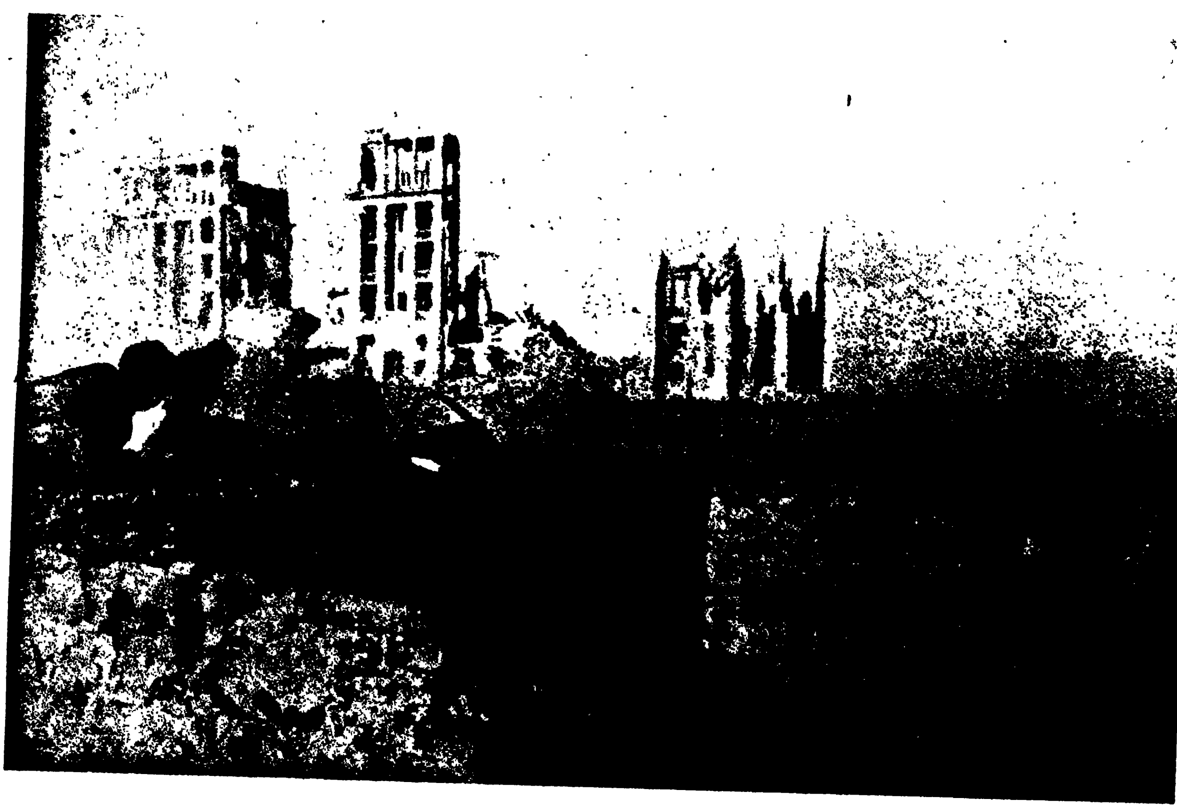


সল্‌সবেরীর বিশপ সমরকালীন 'নারী স্থল-বাহিনী' সমভিব্যাহারে শস্যক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে যাইতেছেন। নবোৎপন্ন শস্যকে আশীর্ব্বাদ করা ব্রিটেনের একটি প্রাচীন রীতি



ককাশসে সোভিয়েটের সশস্ত্র প্রতীক্ষা





স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের দুইটি দৃশ্য [যুদ্ধক্ষেত্রে গৃহীত চিত্র

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

রুশ যুদ্ধ-প্রান্তে শরৎকালীন অভিযান শেষ হইতে চলিয়াছে। অভিযানের গতি ক্রমেই মন্থর এবং পথ ক্রমেই তির্য্যক্ হইয়া এখন অনিশ্চিত লক্ষ্য ভাব ধারণ করার উপক্রম করিয়াছে। মনে হয় যে রুশ কর্ত্তৃপক্ষ শীত-অভিযান কোন্ পথে এবং কি ভাবে চালিত হইবে তাহা এখনও প্রকাশ করিতে পারেন না। কিয়েভের দিকে যে প্রবল জার্ম্মান পাল্টা আক্রমণ চলিতেছে তাহারও গতি ক্রমে ধীর হইয়া আসিয়াছে। উক্রাইন-এর শ্বেত রুশ অঞ্চলে বোধ হয় এত দিনে শীতের প্রকৃত রূপ দেখা দিয়াছে। রুশ যুদ্ধ-প্রান্তের মধ্যভাগে এবং ডিপার নদের বাঁকের ভিতর রুশ সেনার আক্রমণ এখনও দৃঢ়ভাবেই চালিত হইতেছে শুনা যাইতেছে কিন্তু তাহার ফলে জার্ম্মান সেনা যেরূপ বিপন্ন হইবার কথা সেরূপ অবস্থার কোনও সুস্পষ্ট লক্ষণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এখনও জার্ম্মান সেনানায়কগণ সমর-রেখার অংশবিশেষ আগুপিছু হটাইয়া, চলাইয়া ব্যূহ রক্ষায় সমর্থ। তবে শীতের প্রকোপ বাড়িলে জার্ম্মান সেনার চলাচলের পথে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হইবে—যাহার সূচনা এখনই দেখা গিয়াছে—এবং তখন যদি সোভিয়েট রণনায়কদিগের পক্ষে শীত-অভিযান প্রচণ্ড ভাবে চালনা সম্ভব হয় তবেই জার্ম্মান সেনা সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন হইবে।

এখন অক্ষশক্তির ইয়োরোপীয় অংশ নিজ শক্তি রক্ষা করিয়া মিত্রপক্ষকে শ্রান্তক্লান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া যুদ্ধবিমুখ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সম্মুখ সমরে মিত্রপক্ষকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইবার আশা এখন জার্ম্মান রণনেতাদিগের মনে আর নাই। "শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ" ইত্যাদি যে-সকল কথা এখন হিটলার গোবেল প্রমুখ জার্ম্মান নায়কগণের মুখে মাঝে মাঝে শুনা যায়, তাহার অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারা সহজ। প্রথমতঃ ঐরূপ কথায় অক্ষশক্তির অন্তর্গত অসামরিক জনসাধারণের মন হইতে নৈরাশ্য দূর করিবার চেষ্টা স্পষ্টই দেখা যায় এবং দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ কথার সঙ্গে যে-সকল যুক্তির অবতারণা থাকে তাহা হইতে মনে হয় যে জার্ম্মানীর উচ্চতম অধিকারীবর্গের এখনও বিশ্বাস আছে যে বিপক্ষদল যুদ্ধে পরাস্ত না হইলেও সুদীর্ঘ যুদ্ধের ফলে ক্লান্ত ও হতাশ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের উপরেই অক্ষশক্তির সমস্ত আশা-ভরসা স্থাপিত এবং সে জন্যই অক্ষশক্তির নেতৃবর্গ এখন চতুর্ম্মুখে নিজ নিজ দেশবাসীকে সুদীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছে। এখন দেখা দরকার তাহাদের এই বিশ্বাসের মূলে সত্যই কিছু আছে কি না এবং যদি সেরূপ কিছু থাকে তবে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কি না। বলা বাহুল্য, ঐ সকল কর্ত্তব্যই প্রধানতঃ ওয়াসিংটন ও লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষবর্গের অধিকারের মধ্যে। যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, কেবলমাত্র ফলাফল বিচারে বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা চলে, এবং যুদ্ধের গতি বা প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার পর্য্যন্ত আমাদের নাই, সুতরাং এ বিষয়ে "আরাম-কেদারার চর্চ্চা"য় ভূতভবিষ্যৎ বিচারই শ্রেয়ঃ।

যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা চলিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, অক্ষশক্তির সাফল্য যে-যে কারণে হইয়াছিল, সেই কারণগুলি বিচার করিয়া স্থির করিবার পর সেই পথেই অক্ষশক্তিকে পরাজিত করার চেষ্টা চলিতেছে। কেবলমাত্র প্রত্যেক ব্যাপারেই অক্ষশক্তির কার্য্যশক্তিকে জনবলে ও অস্ত্রবলে অতিক্রম করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। জার্ম্মান দল যুদ্ধ-শকট ব্যবহারে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, অতএব আরও ভারী ও শক্তিশালী যুদ্ধ-শকট আরও বেশী সংখ্যায় ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। জার্ম্মান সমর-বিভাগ বোমাক্ষেপণে বিপক্ষের অসামরিক লোকজনকে বিব্রত এবং সমরোপকরণ নির্ম্মাণের ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করিয়াছিল সুতরাং আরও অধিক সংখ্যায় বৃহত্তর বোমাক্ষেপক বাহিনীর ব্যবহার চলিতেছে। এক কথায় নূতন রণকৌশল বা নূতন অস্ত্র ব্যবহার পন্থার আবিষ্কারের কোনও লক্ষণ এ দিক হইতে এখনও দেখা যায় নাই, দেখা গিয়াছে কেবলমাত্র "ভারে কাটার" ব্যবস্থা। কিন্তু জার্ম্মান-রণনায়কগণ অবস্থাভেদে ব্যবস্থারও ভেদ যথেষ্টই করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নরওয়ের তুষারাবৃত পর্ব্বতমালায় স্কী (ski) যুক্ত পাহাড়ী-বাহিনীর প্রয়োগ, ক্রীটে প্যারাস্যুটবাহিনীর প্রয়োগ, আফ্রিকার জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত "আফ্রিকা কোর" সেনাদল গঠন ইত্যাদি। এ পক্ষে একমাত্র কমাণ্ডো দল গঠনে সেরূপ চেষ্টার কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে। তাহা ভিন্ন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় মিত্রপক্ষের এই অপরিসীম যন্ত্রযুদ্ধাস্ত্র, এরোপ্লেন এবং অস্ত্রচালনায় সুশিক্ষিত সেনাদল উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র নির্ণয়ের অপেক্ষায় হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে। অক্ষশক্তির নেতৃবর্গ যুদ্ধকুশলী, সুতরাং তাহারা ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে যাহাতে মিত্রপক্ষ যে প্রলয়কারী বিরাট্ শক্তি গঠন করিতেছে তাহার প্রয়োগ যথাযথভাবে না হয়। জার্ম্মান দল যখন এই সকল অস্ত্র ও এইরূপ অস্ত্রবাহী শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিল তখন তাহাদের বিপক্ষের লোকে ঐরূপ অস্ত্রের ক্ষমতা সম্যকভাবে

জানিত না, সুতরাং উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা কোথায়ও বিশেষ হয় নাই। অক্ষশক্তির দল সে বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সেই কারণে তাহারা সব দিকেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছে। অক্ষশক্তি তাহার ক্ষমতার সীমা পর্য্যন্ত—জাপানের ক্ষেত্রে সীমার বাহিরেও—বিপক্ষকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছিল। এখন সেই জোয়ারের জল ভাটার মুখে এমন ভাবে সরিতেছে যাহাতে অন্য পক্ষকে প্রতি পদে বাধা পাইতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

কিন্তু অক্ষশক্তি যে বিশাল ভূমিখণ্ডের উপর ছড়াইয়া বসিয়া আছে তাহার প্রত্যেকটি অংশকে যন্ত্র-যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত আধুনিক সমর-প্রথায় সুশিক্ষিত সেনাদলের আক্রমণের বিরুদ্ধে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা এত অল্পদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই সম্ভব হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা মনে হয় দুর্গের বহিঃপ্রাকারের ন্যায় প্রাথমিক বাধা। তাহার ভিতরের ব্যবস্থা এখনও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হয় নাই, যদিও সে কার্য্যে দিবারাত্র প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে সন্দেহ নাই। ইয়োরোপদুর্গের—বা দুর্গমালার—ভিতরের দিকে কাঁচামাটির গাঁথুনি এখনও আছে বলিয়াই অনেকের বিচার। এখন মিত্রপক্ষের কর্ত্তব্য ব্যাপক আক্রমণে পশ্চিম দিকের দুর্গ-মালার বহিঃপ্রাকার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করা এবং সেখানে বিরাট্ অনুপাতে যন্ত্র-যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োগ—এই কথাই সোভিয়েটের যুদ্ধবিশারদগণ এত দিন বলিয়া আসিতেছেন।

ইটালীর পথে ইয়োরোপ আক্রমণ ছিল ছিদ্র অন্বেষণের চেষ্টা। বাঁধের মধ্যে ছিদ্রপথে জল ঢুকিলে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার জলে দেশ ছাইয়া যায় এই চেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল তাই এবং কার্য্যতঃ তাহা প্রায় সফলও হইয়াছিল। ইটালীর পতনে অক্ষশক্তির ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং সেই জন্য মিত্রপক্ষের সমরমণ্ডলীর এই ব্যবস্থা এবং তাঁহাদের রণনেতাদিগের চেষ্টারও প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু বিপক্ষ সজাগ ছিল এবং মুসোলিনীর পলায়নে মিত্রপক্ষের কার্য্যক্রমে এক দারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে, এই কারণে অক্ষশক্তি এখন ইটালীর রক্ষণব্যবস্থার সময় এবং সুযোগ দুইই পাইতেছে। যেভাবে ইটালীতে এখন যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে ইহা মনে হয় না যে সেখানে অক্ষশক্তি শীঘ্রই কোনও প্রচণ্ড আঘাত পাইবে, কেননা ইটালীর বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্র ব্যাপকভাবে যন্ত্র-যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত। অন্য দিকে ইহাও সত্য যে, যতই দিন যাইতেছে ততই ইয়োরোপের অন্যান্য অংশে সংরক্ষণী দুর্গমালা দৃঢ়তর হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম-ইয়োরোপে দ্বিতীয়—অথবা তৃতীয়—যুদ্ধপ্রান্ত গঠন ভিন্ন এই মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্য কোনও পথ নাই। কাইরো এবং টেহেরাণে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা বাহিরে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু পরে যে যুক্তঘোষণা করা হয় তাহাতে এই ব্যাপক আক্রমণের প্রতিশ্রুতি আছে। এইরূপ প্রতিশ্রুতি পূর্ব্বেও করা হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা উপযুক্তরূপে কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং ফলে সোভিয়েট আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল হইয়াছে। ইয়োরোপের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সত্বর সাফল্যলাভের সম্ভাবনা তত দিনই আছে যত দিন সোভিয়েট প্রচণ্ড যুদ্ধদানে সক্ষম। সোভিয়েট ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিস্তেজ এবং প্রবল আক্রমণ করিতে অক্ষম হইলে মিত্রপক্ষের জয়লাভ সুদূর ভবিষ্যতের অনিশ্চিতের মধ্যে গিয়া পড়িবে এবং রুশ যুদ্ধ-প্রান্তের অবস্থা বিচারে মনে হয় যে সেরূপ অবস্থা আসা নিতান্তই অসম্ভব নহে।

ইয়োরোপে যাহা ঘটিতেছে, এশিয়ায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরে তাহা আরও জটিলতর ভাবে চলিতেছে। ইয়োরোপে অক্ষশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির আর কোনও বিশেষ সম্ভাবনা নাই ইহা সুনিশ্চিত। সেখানে যাহা ঘটিতে পারে তাহা নূতন যন্ত্রযুদ্ধ-কৌশলের উদ্ভব এবং যন্ত্রযুদ্ধাস্ত্র ও এরোপ্লেনের উন্নতি। কিন্তু এশিয়ায় জাপানের ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে তাহা নিঃসন্দেহ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা চলে যে স্বাধীন চীনের অবস্থার উন্নতি সত্বর না ঘটিলে এই ক্ষেত্রে মিত্রশক্তির বাধা বিপত্তির অশেষ বৃদ্ধি হইতে পারে। কলিকাতায় দিবালোকে জাপানী এরোপ্লেন-আক্রমণে ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে জাপানের সমর-প্রচেষ্টায় কোনও মন্দা পড়ে নাই। চীন দেশে চাংটেহ অঞ্চলের যুদ্ধ আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণ দিতেছে যে জাপান তাহার চীন-অবরোধ আরও দৃঢ়তর করিবার আশা বিন্দুমাত্রও ছাড়ে নাই।

সম্মিলিত জাতিদলের পক্ষে জাপান দমন এখনই অতি বিষম ব্যাপার। জাপান আরও সময় পাইলে ক্রমে তাহা কিরূপ জটিল সমস্যায় দাঁড়াইবে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ক্রমেই দেখা দিবে মনে হয়। এরূপ অবস্থায় ইয়োরোপের যুদ্ধ সাঙ্গ হইবার পর এশিয়ায় অভিযান গঠনের কার্য্যক্রম কতটা সমীচীন সে-কথা যুদ্ধবিশারদগণই বলিতে পারেন। যেভাবে যুদ্ধ এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে তাহাতে মনে হয় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের শান্তিপর্ব্ব আরম্ভ হইতেই এখনও যথেষ্ট দেরি আছে, শেষ কবে দেখা যাইবে সে বিষয়ে বিচার করাই বৃথা।

পুস্তক পরিচয়

প্রভাতরবি—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। প্রকাশনী, ১৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম বিশ বৎসরের বিবরণ। পুস্তকের আরম্ভে লেখক তাঁর সংকল্প জানিয়েছেন—'কবি এই কালকে "প্রাগৈতিহাসিক" বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন।···সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া তিনি ওই কালের সমস্ত রচনাকে বর্জন করিয়াছিলেন। সেই কারণে সে কালের কাব্যকে ভুলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে কবিকেও ভুলিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উদ্‌বোধন ও উৎসারণের ইতিহাস অঙ্কে ধারণ করিয়া যে "গুপ্তযুগ" আমাদের স্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে, কবি নিজে যতই অবজ্ঞা করুন, আমাদের কাছে তার মূল্য অপরিমেয়। সে যুগকে আমরা ব্যক্ত দেখিতে চাই। বর্তমান গ্রন্থে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।'

গ্রন্থকারের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় সফল হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সংগ্রহ আর লিখনভঙ্গীর গুণে সেই প্রাচীন পরিবেশ এবং তার কেন্দ্রবর্তী বালক, কিশোর ও নবযুবক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে জীবন্তের মতন ফুটে উঠেছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার একটি অঙ্গাঙ্গিভাব আছে, রচয়িতাকে যত বেশী জানা যায়, রচনার মর্মও তত পরিস্ফুট হয়। এই কারণে রবীন্দ্রনাথকে নানা দিক দিয়ে জানবার প্রয়োজন আছে। যাঁদের সাহিত্যে আগ্রহ নেই তাঁদেরও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল আছে। কবির রচনা আর কীর্তির পরিচয় যথেষ্ট নয়, তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, অনুরাগ, বিরাগ, ধর্ম, কর্ম, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, মিত্র, শিষ্য, সেবক, মায় তাঁর ব্যবহারের জিনিস, সমস্তই সাধারণের পক্ষে কৌতূহলের বিষয়। বিজনবাবু তাঁর নিপুণ তুলিকায় কবির প্রভাত কাল বিকাশিত করেছেন। আশা করি মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন এবং সায়াহ্নের চিত্রও তাঁর হাত থেকে বার হবে।

শ্রীরাজশেখর বসু

আহার—শ্রীবিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক শ্রীবিমানচন্দ্র ঘোষ, ৬৭।১ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা। ৪১৪ পৃঃ, মূল্য ২৲।

খাদ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিত হইলেও বইখানি খাদ্য-বিজ্ঞানের পুস্তক নয়। লেখক বলিয়াছেন যে ইহাতে খাদ্য সম্বন্ধে তত্ত্ব, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, শিল্প, বিভ্রাট ও বিলাস, সকল বিষয়েরই রকমারি আলোচনা আছে। বস্তুত এই লইয়া তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং আহার্য সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু উক্ত আছে সমস্তই নির্বিচারে এই পুস্তকে সমাবেশ করিয়াছেন। অতএব ইহাতে খনার বচন, বৃদ্ধের বচন, সাধুর বচন, তুকতাক, মুষ্টিযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্বেদ, হকিমী, হোমিওপ্যাথি এবং আধুনিক বিজ্ঞান সকল দিক হইতেই খাদ্য সম্বন্ধে কে কি বলে এই পুস্তক পাঠে ধারণা করিতে পারা যাইবে। যাঁহারা নিছক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিতে চান তাঁহাদের হয়ত এই পুস্তক মনঃপূত হইবে না, কিন্তু যাঁহারা ডিসপেপসিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া খাদ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু এবং যাঁহারা দেশীয় খাদ্যাদির সম্বন্ধে নানারূপ খুঁটিনাটির কথা জানিতে চান তাঁহারা এই বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা আলোচনা অত্যন্তই অল্প, সুতরাং এই বিষয় লইয়া যিনি যেভাবেই লিখুন, ইহার উদ্যম মাত্রই প্রশংসার্হ।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

বাংলার কবি ও কাব্য—(১) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, (২) বলদেব পালিত—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা, সাহিত্য নিকেতন হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। মূল্য ।০ ও ।৵০ আনা।

ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় বলিতেছেন, বাংলা দেশের কয়েক জন ক্ষমতাশালী অথচ অধুনা-বিস্মৃত কবির কাব্য-প্রচারই এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য। গ্রন্থ দুইখানিতে উনবিংশ শতাব্দীর দুই কবির নির্বাচিত কাব্যসংগ্রহ ও তৎসঙ্গে কবিদের রচনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বিহারীলাল ছাড়াও মধুসূদনের পরে কয়েক জন কবির আবির্ভাব হয় যাঁহাদের কাব্যে বৈশিষ্ট্য ছিল এবং যাঁহারা স্মরণযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার একজন প্রকৃত কবি।

"এলোকেশে কে এল রূপসী,
কোন্ বনফুল কোন্ গগনের শশী।"

সত্যই সুন্দর। কাব্যপ্রিয় পাঠকের কাছে তাঁহার কবিতা একেবারে অপরিচিত নয়। 'মহিলা' কাব্যের নামের খ্যাতি এখনও থাকিলেও সাধারণের নিকট তাঁহার রচনা বিস্মৃতপ্রায়। নির্বাচিত রচনাবলী ছাড়াও পুস্তকে সুরেন্দ্রনাথের অধুনাবিলুপ্ত 'সুরমা' কাব্যখানি সম্পূর্ণ ছাপা হইয়াছে।

বলদেব পালিত বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ লইয়া বহু পরীক্ষা করিয়াছেন এবং এক দিক দিয়া তাহাতে সাফল্য লাভও করিয়াছেন। তাঁহার মতে "সমুদায় সংস্কৃত ছন্দ অনতিযত্নে লেখা যাইতে পারে।" তাঁহার "ভর্তৃহরি কাব্য' সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত। 'ললিত কবিতাবলী'র কবিতাগুলি 'বিবিধ সংস্কৃত ছন্দে'র উদাহরণস্থল। 'দ্রুতবিলম্বিতচ্ছন্দে' গ্রীষ্মের বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন,

"তপন কাঞ্চন-শীর্ষক মস্তকে
বিহরিছে দহি জীব সমস্ত-কে।"

ইহা ছাড়া বাংলা ছন্দেও তিনি বহু সুপাঠ্য কবিতা লিখিয়াছেন। ছন্দের ইতিহাসে বলদেব পালিতের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পুস্তক দুইখানিতে কবিদের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী আছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জাতির বরণীয় যাঁরা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস্. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকে—অতীত ও বর্তমানের যে-সব বরণীয় কর্মবীর জগৎ-ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পিতৃ-মাতৃ পরিচয় লেখক দিয়াছেন। সামান্য উপকরণ লইয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছে, তথাপি স্বল্প পরিচয়ে তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার মূল সূত্রটিকে শিশুরা অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারিবে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, প্রেসিডেণ্ট মাসারিক, কামাল আতাতুর্ক, মুসোলিনী, হিটলার, চিয়াং কাই-শেক প্রভৃতির জনক-জননীর সম্বন্ধে অনেক ছেলেই হয়ত বিশেষ কিছু জানে না, এবং স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবাজী প্রভৃতির জনক-জননী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানে। অল্পপরিচিত চরিত্রগুলিতেও

যোগেশবাবু নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। মোট কথায় ছেলেদের মনে রাখিবার মত করিয়া কাহিনীগুলি তিনি গুছাইয়া বলিয়াছেন।

মুদ্রণ-পারিপাট্যের সঙ্গে হিটলার, মুসোলিনী, চিয়াং কাই-শেক প্রভৃতির জনক-জননীর ছবিগুলিও উল্লেখযোগ্য।

অনবগুণ্ঠিতা—শ্রীনবগোপাল দাস। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পারিশার্স লিঃ। মূল্য আড়াই টাকা।

কোমল শুভ্র ফুলের মত একটি মেয়ে সংসারের উত্তাপে কি করিয়া অকালে ঝরিয়া পড়িল—তাহার বেদনাময় কাহিনীকে লেখক রূপ দিয়াছেন। সংসারে তাহার অভাব কিছুরই ছিল না, অথচ দুর্জ্ঞেয় কামনা তাহাকে মরীচিকার পিছনে ছুটাইয়াছে। স্বামীগৃহত্যাগিনী এই অপরাধী অমার্জ্জনীয় হইলেও শুচিতার প্রশ্ন ছাড়াইয়া নারীমনের অদ্ভুত পিপাসার কথাই মনে জাগে। অগ্নিরূপের মধ্যে একটু বাতাসের প্রচ্ছন্ন সংযোগ যেমন থাকেই—ভালবাসার মধ্যে তেমনই আসঙ্গ-লিপ্সা। তাহার আধিক্য কোন কোন নারীচিত্তে বিপ্লব বাধায়। সেই বিপ্লবে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিঘ্নিত হয় বলিয়াই ভালবাসার এই উগ্র রূপটিকে মানুষ তথা সমাজ মানিয়া লইতে পারে নাই। এমনই চরিত্র প্রতিমা। তাহার কোন দিকে লেখক অবগুণ্ঠন রচনা করেন নাই। নিজের অবমা কামনা সম্বন্ধে সে সচেতন, এবং তাহা উদ্‌ঘাটিত করিতে তাহার কুণ্ঠা নাই। এই দীপ্ত তেজই দরদের সহিত লেখক পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব অস্বীকৃত হইবে না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কোরআন্‌-প্রবেশিকা—প্রণেতা ও প্রকাশক মোহাম্মদ তৈমুর। বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ১৩৭ +পৃ. ২২৫।

আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ এই দুই শ্রেণীর লোকই যাহাতে কোরআনের সারমর্ম গ্রহণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই বইখানা সংকলিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার সাহায্যে যে-কোন ব্যক্তি ইহাতে কোরআনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ইহাতে মূল আরবীর পাশে কথায় কথায় বাংলা অনুবাদ রহিয়াছে। তার পর বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজন মত বিস্তৃত আলোচনাও করা হইয়াছে। যিনি একেবারেই আরবী জানেন না তাঁর পক্ষেও ইহা পাঠ করা মোটেই কষ্টকর নয়।

অনুবাদে কোথাও কোনও ত্রুটি রহিয়াছে কি না তাহা আরবীতে, বিশেষত কোরআনের আরবীতে—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে অপারগ। কিন্তু এইরূপ গ্রন্থ দ্বারা যে বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা সহজেই বলা যায়। বাংলা বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের সাধারণ ভাষা উভয়ের ঐক্য বন্ধন। ইহাতে ভারতের ও আরবের অতীত সভ্যতার সার সংগৃহীত হইতেছে দেখিলে আনন্দ হয়। আর ভাবী ভারতের মহত্তর সভ্যতার বীজও এখানেই উপ্ত হইতেছে ভাবিলে মনে আরও আনন্দ হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যদি পরস্পরের ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্য যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর দেশের এই মহৎ

কল্যাণ বাংলা ভাষার সাহায্যেই সাধিত হইবে, ইহাও বিশ্বাস করা চলে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রূপরেখা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। দেব-সাহিত্য কুটির, ২২।৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বার্ষিক শিশুসাথীর ন্যায় ইহাও একখানি ছেলেদের পূজাবার্ষিকী, প্রতি বৎসর বিভিন্ন নামে পূজার সময় বাহির হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ইহা বহু প্রসিদ্ধ লেখকের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ ও অসংখ্য চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দিবার জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয় ধন্যবাদার্হ।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

উপনিষদের সাধন পথ ও কেশব—শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। নববিধান পাব্লিকেশন কমিটী, ৯৫, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে উপনিষদের সাধনপথ ও কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত কতিপয় প্রবন্ধ আলোচ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

মীরাবাঈ—স্বামী বামদেবানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

এই পুস্তকে মীরাবাঈর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে পঁচিশটি ভজনের বাংলা পদ্যানুবাদ সংযোজিত হইয়াছে। 'কোমলমতি বালকবালিকাদের জন্য লিখিত' হইলেও ইহা পড়িয়া পাঠক মাত্রেই যথেষ্ট তৃপ্তি ও উপকার পাইবেন। কেবলমাত্র জনপ্রবাদ অবলম্বনেই এই পুস্তক রচিত হয় নাই—অনেক স্থলে ঐতিহাসিকদের আলোচনা হইতেও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে পরিগৃহীত কয়েকটি সিদ্ধান্ত এইরূপ—মীরার জন্মবৎসর ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ, তাঁহার স্বামী সংগ্রাম সিংহের পুত্র ভোজ, তাঁহার মৃত্যু বৃন্দাবনে নয়, দ্বারকায়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

টমাস বাটার আত্মজীবনী—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত। জেনারেল প্রিণ্টার্স র‍্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য চার টাকা।

টমাস বাটার জীবনের ঘটনাবলীর বিষয় অনেকে সম্যক্ অবগত না থাকিলেও তাঁহার নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ১৮ বৎসর বয়সে পিতার কারখানায় শিক্ষানবিশী সমাপ্ত করিয়া বাটা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে কৃতসংকল্প হন। সামান্য চর্ম্মব্যবসায়ীর পুত্র হইয়াও প্রবল আত্মবিশ্বাস, অসাধারণ ধৈর্য্য এবং অসামান্য কর্ম্মদক্ষতার বলে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি পৃথিবীর প্রধান শিল্পপতিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। টমাস বাটা তাঁহার

আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াও শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই অসম্পূর্ণ আত্মচরিতে যে-সকল ঘটনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতেই জীবনে সফলতা লাভের মূল কারণ তাহার অপূর্ব্ব কর্ম্ম-প্রতিভা, চরিত্রবল, দূরদৃষ্টি এবং আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভূতিবাবু তাঁহার এই আত্মচরিত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাংলাভাষাভাষীদের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। এমন অনাড়ম্বর সহজ ভাষায় বইখানি লিখিত হইয়াছে যে, অনুবাদ বলিয়া মনেই হয় না। বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্রে, নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া যাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন টমাস বাটার জীবনী তাঁহাদিগকে তো অনুপ্রাণিত করিবেই, অধিকন্তু অনেককে ব্যবসায়ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিতেও উৎসাহিত করিবে। বইখানি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মায়াবাদ—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সাংখ্য ও বেদান্ত বিষয়ে যে বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তিনটি পরে মায়াবাদ নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়; বিশ্বভারতী সেই পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বহুলোকে পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের সেই বক্তৃতাগুলি অন্ততঃ আংশিক ভাবে পাঠ করিবার সুযোগ পাইবেন। হিন্দু দর্শনের কার্য্যকারণতত্ত্ব অতি জটিল; এই পুস্তিকায় তাহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে কত সহজে প্রকাশ করা যায় তাহার নিদর্শন পাঠকেরা ইহাতে পাইবেন এবং সেই সঙ্গে হিন্দুর Dialectical method-এর কিছু পরিচয়ও লাভ করিবেন। সুতরাং হিন্দু দর্শনে অনুরাগী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা প্রয়োজন।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

বার্ষিক শিশু-সাথী—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২॥০।

বাংলার শিশু-সাহিত্যে 'বার্ষিক শিশু-সাথী' একটি বিশেষ অবদান। এবারেও ইহা যথারীতি পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে। শিশুর উপভোগ্য গল্প কবিতাদি ছাড়া, সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগের কথা, যেমন—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিস্তর আলোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বার্ষিকীখানি চিত্র সম্পদ সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের ছবি বাংলার কিশোরদের খুবই ভাল লাগিবে।

ইউরোপ ভ্রমণ (প্রথম খণ্ড) শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গড়িয়া, ২৪-পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।৶০।

গ্রন্থকার ১৯৩৩ সনে পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হন। এই পুস্তকখানিতে তিনি মাত্র ইটালী ও ফ্রান্সের ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই দুইটি দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি যে-সব আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞাতব্য কথা বহু আছে। বর্ত্তমান মহাসমরে এই দুই দেশের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। এজন্যও ইহাদের কথা পাঠক-পাঠিকাদের অধিকতর উপভোগ্য হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যার ২৮২ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ২৫শ ও ২৬শ পঙ্‌ক্তিতে 'মহেন্দ্রলাল ওহ্‌দেদার' স্থলে 'দেবেন্দ্র ওহ্‌দেদার' পড়িতে হইবে।

গত মাসের প্রবাসীতে 'পিতৃ-তর্পণ' প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল যে, স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ রামলোচন ভট্টাচার্য্য চানক হইতে বাঁকুড়ায় প্রথম আসেন। এখন জানা গিয়াছে যে, তাঁহার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য বাঁকুড়া পাঠকপাড়ার জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ পাঠক কর্ত্তৃক তাঁহাদের সভাপণ্ডিত রূপে বাঁকুড়া মালিয়াড়ায় প্রথম আনীত হন। ইনি চানক হইতেই আসিয়াছিলেন।

আলোচনা

"সমুদ্রগুপ্ত ও কৃষ্ণচরিত"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

গত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে (পৃঃ ২৬-২৯) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহাশয় রচিত "সম্রাট্ কবি সমুদ্রগুপ্ত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে ডক্টর চৌধুরী জানাইয়াছেন, "সম্প্রতি সমুদ্রগুপ্ত রচিত কৃষ্ণচরিত নামক একখানা হস্তলিখিত পুঁথির মাত্র আড়াইটি পৃষ্ঠা আবিষ্কৃত হয়েছে—যা থেকে সমুদ্রগুপ্তের কবিত্বশক্তির কিছু পরিচয় এবং সমুদ্রগুপ্ত প্রশংসিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদের বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য জানা যায়।" তাঁহার ধারণা, "এ গ্রন্থ যে সমুদ্রগুপ্ত বিরচিত, তা গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক এবং প্রাপ্ত দুই পরিচ্ছেদের অন্তস্থিত পরিচয়বিবরণী বা কলোফোন থেকে প্রমাণিত হয়।" প্রবন্ধের একটি পাদটীকা হইতে জানা যায় যে, উল্লিখিত পরিচায়িকায় "ইতি শ্রীবিক্রমাঙ্ক-মহারাজাধিরাজ-পরমভাগবতশ্রীসমুদ্রগুপ্তকৃতৌ কৃষ্ণচরিতে কথা-প্রস্তাবনায়াং মুনিকবি-কীর্ত্তনম্" ইত্যাদি লিখিত আছে।

দুঃখের বিষয়, এইরূপ একখানি মূল্যবান্ পুঁথির বিবরণ দিতে গিয়া ডক্টর চৌধুরী উহার আবিষ্কারক; আবিষ্কার স্থান এবং আবিষ্কার কাল সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। পুঁথিখানি কতকালের পুরাতন, উহা কিসের উপর লিখিত, একই কালিতে ও একই ব্যক্তির হস্তাক্ষরে লিখিত কিনা, এবং পুঁথিটি বর্ত্তমানে কোথায় আছে—এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়েরও কোনই আলোচনা করা হয় নাই। মাত্র আড়াই পৃষ্ঠার পুঁথি; সুতরাং অধ্যাপক মহাশয়ের সমস্তটাই উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। এমন কি, ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক হইতে দেখিলে ঐ আড়াই পৃষ্ঠার আলোকচিত্র প্রকাশ করিলেই ঠিক হইত।

সমুদ্রগুপ্ত-রচিত একটি শ্লোকও এ পর্য্যন্ত কোন সংগ্রহ গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং তাঁহার কবিখ্যাতির কতখানি নির্জ্জলা "প্রশস্তি" তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তৎসত্ত্বেও যদি সত্যই গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইত, তাহা হইলে ঐতিহাসিকগণের আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু আমার মনে হয়, কোন দুষ্টবুদ্ধি অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ঐ পৃষ্ঠা কয়টি অথবা ঐ পরিচায়িকাটি জাল করিয়া অধ্যাপক চৌধুরীকে প্রতারিত করিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয়ের উদ্ধৃত কলোফোন হইতেই প্রতারক ব্যক্তিটির মূর্খতা ধরা পড়ে। যদি ভারতীয় ইতিহাস এবং লেখবিদ্যায় তাহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিত, তবে আর সে সমুদ্রগুপ্তকে "বিক্রমাঙ্ক" ও "পরমভাগবত" উপাধিতে ভূষিত করিত না। গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী থাকিলেও থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই ভাগবতমার্গাবলম্বী বৈষ্ণব ছিলেন না। গুপ্তসম্রাটগণের লেখমালায় সর্ব্বত্রই সমুদ্রগুপ্তকে স্পষ্টতঃ উপেক্ষা করিয়া তদীয় উত্তরাধিকারিগণকে "পরমভাগবত" উপাধিমণ্ডিত করা হইয়াছে।

"নিবর্ত্তন এবং গোচর্ম্ম"

(উত্তর)

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

গত কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী"তে আমি "নিবর্ত্তন এবং গোচর্ম্মের ভূমি পরিমাণ" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহাতে আমি উল্লিখিত ভূমি পরিমাপদ্বয়ের বিষয়ে কতিপয় গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া, আর কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের মত আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য "প্রবাসী"র সুপণ্ডিত পাঠকবর্গের সাহায্য প্রার্থনা করি। সুখের বিষয়, প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া পাবনা-সৎসঙ্গ হইতে শ্রীযুক্ত কালীপদ মৈত্র মহাশয় বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত ঊনবিংশতি সংহিতার অঙ্গবদ্ধ বিষ্ণু, বৃহস্পতি এবং শাতাতপসংহিতার প্রতি আমারদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সম্প্রতি অগ্রহায়ণের "প্রবাসী"তে (পৃ. ১৮৩-৮৪) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয়ও মহাভারতের (১।৩০।২৩) নীলকণ্ঠকৃত টীকা, এবং বসুমতী হইতে প্রকাশিত প্রাণতোষণীতন্ত্রের (তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ.১০৬) নিবর্ত্তন এবং গোচর্ম্ম সম্পর্কিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাকে অত্যন্ত উপকৃত করিয়াছেন। তবে দেব-মহাশয় নিবর্ত্তনকে ক্ষেত্রপরিমাণ ফল না ধরিয়া উহাকে রৈখিক মাপ হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহারই উদ্ধৃত প্রাণতোষিণীতন্ত্রের "ক্ষেত্রং চতুর্ভিশ্চ ভুজৈর্নিবদ্ধম্" এই নিবর্ত্তনবিষয়ক সুস্পষ্ট উক্তিটির অর্থ লক্ষ্য করেন নাই। কিছু না বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ভাণ্ডারকর এবং শামশাস্ত্রী-মহাশয়দ্বয়ের অভিমত একেবারে উড়াইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই। শামশাস্ত্রী টীকাকারের নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু নিবর্ত্তন যে ভূমি পরিমাপের সংজ্ঞা ছিল, তাহার আরও অকাট্য প্রমাণ আছে। প্রাচীন ভারতীয় রাজগণ অনেক ক্ষেত্রে শত শত নিবর্ত্তন ভূমি দান করিতেছেন, দেখা যায়। আমার প্রবন্ধে আমি রাজশাসনাদিতে আধুনিক বিঘা প্রভৃতির ন্যায় নিবর্ত্তনের উল্লেখ আছে বলিয়া লিখিয়াছিলাম। বুঝা যাইতেছে, কথাটাকে দেব-মহাশয় নিতান্তই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি যদি দয়া করিয়া অন্তত আমার Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization গ্রন্থে উদ্ধৃত শাতবাহনবংশীয় রাজগণের লেখমালা পড়িয়া দেখেন, তবে আর নিবর্ত্তনকে ক্ষেত্র পরিমাপের সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি থাকিবে না। কৌটিল্য যে ভূমি-বিভাগের কথা বলিতে গিয়া তৎকাল প্রচলিত কোন ভূমি-পরিমাপের উল্লেখ করেন নাই, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে হয়।

যাহা হউক, গোচর্ম্ম সম্পর্কে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তদতিরিক্ত কতিপয় নূতন তথ্য পাওয়া গেল। প্রথমতঃ, নীলকণ্ঠের—"বধ্রী একতন্তুকা চর্ম্মরজ্জু…একেন গোচর্ম্মণা কৃতয়া রজ্জ্বা আক্রান্তভূর্গোচর্ম্মমাত্রা।" অবশ্য ইহাতে গোচর্ম্মের প্রকৃত পরিমাণ জানা যায় না। তবে ইহা হইতে গোচর্ম্মসংজ্ঞাটির উৎপত্তির হেতু অনুমান করা যায়; কিন্তু সে বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বৃহস্পতি সংহিতার—

সবৃষং গোসহস্রং তু যত্র তিষ্ঠত্যতন্দ্রিতম্।
বালবৎসাপ্রসূতানাং তদ্ গোচর্ম্ম ইতি স্মৃতম্।

ইহা হইতেও গোচর্ম্মের পরিমাণ জানা যায় না; কিন্তু শ্লোকটি মদুদ্ধৃত পরাশরবচনের সহিত তুলনীয়। তৃতীয়তঃ, বঙ্গবাসী এবং আনন্দাশ্রম প্রকাশিত বৃহস্পতি সংহিতার পাঠ আমার উদ্ধৃত বৃহস্পতিবচন হইতে ভিন্ন। এ স্থলে পাইতেছি—

দশ হস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব বিস্তারো গোচর্ম্মৈতন্মহাফলম্।

বঙ্গবাসীর শাতাতপসংহিতাতেও আছে—

দশ হস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডং নিবর্ত্তনম্‌।
দশ তান্যেব গোচর্ম্ম দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে ॥*

সুতরাং দেখা যাইতেছে। দশ নিবর্ত্তন ভূমিতে এক গোচর্ম্ম পরিমাণ স্থির থাকিলেও, এস্থলে নিবর্ত্তনের, এবং সেই হেতু গোচর্ম্মের, পরিমাণফল অনেক অধিক। এই গোচর্ম্ম কিঞ্চিদধিক ১৪০ বিঘা ভূমির সমান হইবে। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ হইতে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতে গোচর্ম্মের অপর দুইটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ প্রচলিত ছিল।

নিবর্ত্তন সম্বন্ধেও দুইটি নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ, বিজ্ঞানেশ্বর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বৃহস্পতিবচন এবং প্রাণতোষণী তন্ত্রধৃত শ্লোকার্দ্ধের —"সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্‌"—স্থলে বৃহস্পতি সংহিতার বঙ্গবাসী এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণে এবং বঙ্গবাসীর শাতাতপসংহিতার "দশহস্তেন দণ্ডেন" ইত্যাদি পাঠ আছে। এ স্থলে এক নিবর্ত্তন ভূমি ১০×৩০=৩০০, অর্থাৎ ৩০০×৩০০=৯০০০০ বর্গ হাত বা কিঞ্চিদধিক ১৪ বিঘার সমান হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাণতোষণীতন্ত্রমতে—"নিবর্ত্তন-প্রমাণং তু সিদ্ধান্তশিরোমণৌ লীলাবত্যাখ্যে পাটীগণিতে—তথা করাণাং দশকেন বংশঃ; নিবর্ত্তনং বিংশতিবংশসংখ্যৈঃ—ক্ষেত্রং চতুর্ভিশ্চ ভুজৈর্নিবদ্ধম্‌ ইতি। স্বরোদয়টীকাকারস্তু 'সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তন'-মিত্যাহ। তদুভয়মতং প্রামাণ্যম্‌।" সুতরাং লীলাবতীমতে, ১০ হাত=১ বংশ (অর্থাৎ দণ্ড, measuring rod), এবং যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চারি বাহুই ২০ বংশ বা ২০০ হস্ত দীর্ঘ তাহাই নিবর্ত্তন। এস্থলে ২০০×২০০=৪০০০০ বর্গহাত ক্ষেত্র অর্থাৎ ৬১/৪ বিঘা ভূমি এক নিবর্ত্তনের সমান। অতএব আমার লিখিত তিন প্রকারের বিভিন্ন নিবর্ত্তনের ন্যায় এই ভূমি পরিমাপের অপর দুইটি স্বতন্ত্র পরিমাণ জানা গেল।

এ পর্য্যন্ত নিবর্ত্তন এবং গোচর্ম্মের যে সকল উল্লেখ পাওয়া গেল, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা ছাড়াও কোন স্বতন্ত্র পরিমাণের নির্দ্দেশ থাকা অসম্ভব নহে। "প্রবাসী"র পাঠকগণের মধ্যে অপর কাহারও এ সম্পর্কে আর কিছু জানা থাকিলে, তিনি যেন দয়া করিয়া উহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই অনুরোধ করি।

* দেব মহাশয়কে এই শ্লোকের ভাষা লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। এস্থলে "বিস্তার" কথাটি নাই। এ শব্দটির অর্থ কেবল breadth নহে; expansion, extension-ও হইতে পারে। আমার মতে বৃহস্পতি শব্দটি এই দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

দেশ-বিদেশের কথা

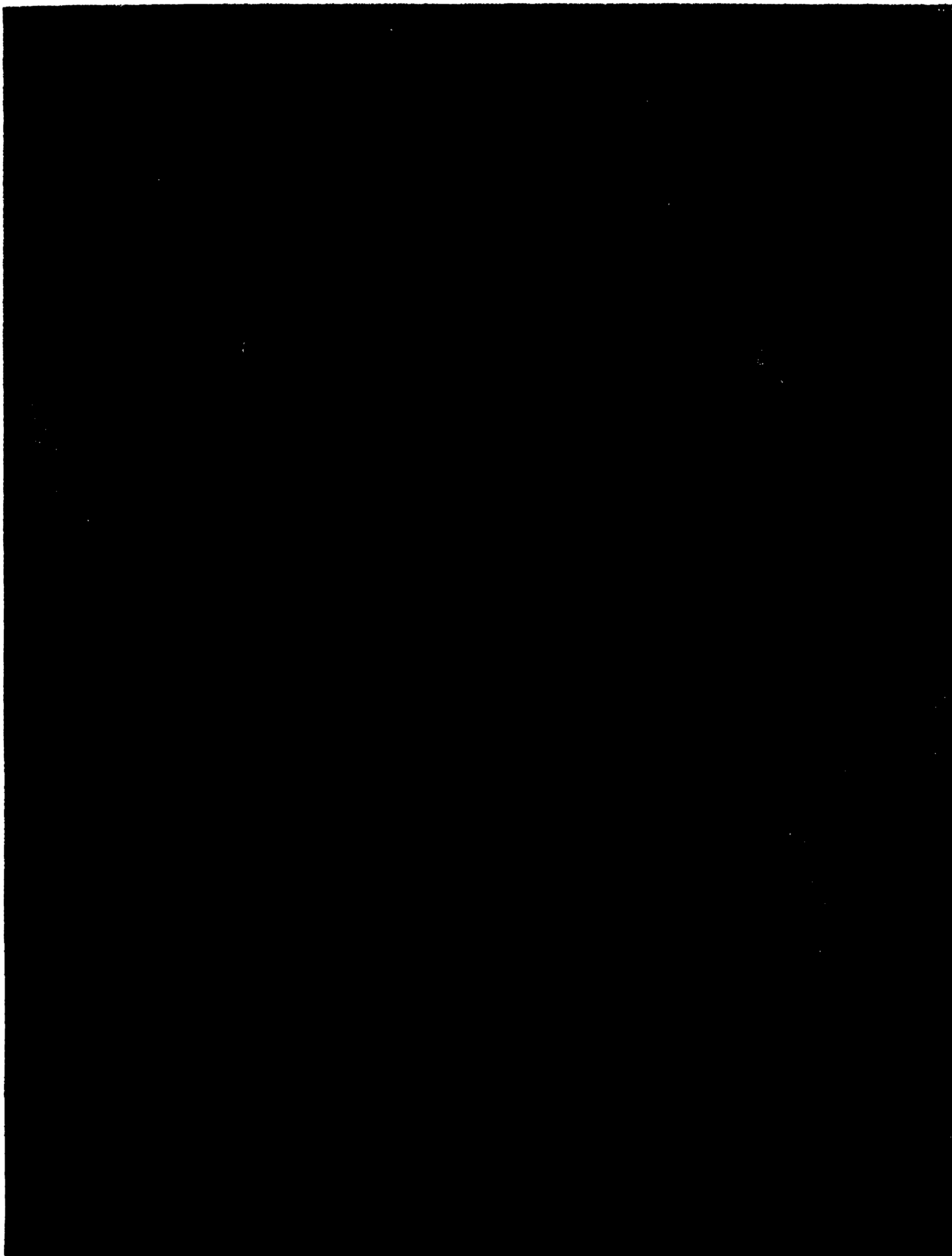
পরলোকে ভবানী দেবী

গত ১২ই কার্ত্তিক হুগলীর প্রাক্তন সরকারী উকিল ৺শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ভবানী দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। বহু দুঃস্থ দুর্গত ও দুঃখী জনের নিকট তিনি ছিলেন করুণাময়ী জননী। নিজ পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহার স্বজনের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু দুঃস্থ পরিবার গোপনে তাঁহার নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিত, বহু দুর্গত ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষার ভার তিনি লইয়াছিলেন। কেবল যে সকল মানুষের প্রতিই তাঁহার মমতা ছিল তাহা নহে, ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত তাঁহার স্নেহধারা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। দুঃস্থ অবস্থায় মানুষকে দেখিলে যেমন তিনি মমতাময়ী জননীর মত তাহাদিগকে কাছে টানিয়া লইতেন সেইরূপ ক্ষুধাকাতর ও পীড়িত মূক প্রাণীরাও তাঁহার সেবাযত্ন লাভ করিত। ঈশ্বরপ্রীতি ছিল তাঁহার জীবনের সকল সৎকর্ম্মের অনুপ্রেরণা। জীবনের বহু দুঃখের মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁহার বিধানকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন।



ভবানী দেবী

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বুভুক্ষা

শ্রীখগেন রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৫০

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালী চাষী ও বাঙালী গৃহস্থ

ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে আবদ্ধ বাংলা যেভাবে ধ্বংসের অতলস্পর্শী গহ্বর অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে অদূর ভবিষ্যতেই তাহার পরিণাম কি হইবে শিক্ষিত বাঙালী আজ তাহা ভাবিয়া দেখিতেও অক্ষম। সাময়িক অর্থোপার্জনে মত্ত ধনী বাঙালী ভুলিয়া গিয়াছেন যে বাংলার চাষী ও সাধারণ গৃহস্থের সহিত তাঁহাদেরও ভবিষ্যৎ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত; কৃষক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবনযাত্রায় যে বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে তাহা রোধ করিতে না পারিলে তাঁহাদেরও ধ্বংস অনিবার্য্য। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে আসে, বাংলায় তখন পূর্ণ অরাজকতা। এক দিকে বর্গীর হাঙ্গামা অপর দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট ইংরেজের দোহন; সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম ও নন্দকুমারের বাধাদানের ক্ষীণ ও ব্যর্থ চেষ্টা। আজও সেই একই বিশৃঙ্খলা বাঙালীর জীবনের প্রতি স্তরে বিরাজমান, শুধু তফাৎ এই যে সকল অনাচার ও অবিচারের উৎস আজ বহু নয়, এক।

স্বদেশী যুগের পর বাঙালী শিল্পে, বাণিজ্যে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিল তাহা হইতে আজ পদে পদে পিছাইয়া পড়িতেছে। জীবনযাত্রায় অপরিহার্য্য প্রতিটি দ্রব্যের জন্য বাঙালী ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে বিদেশের এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলা আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য বিশ্বের দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান, এই অপমানে এই লাঞ্ছনায় বাঙালীর নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইবে। ধীরে ধীরে কালক্রমে নয়, ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে অকস্মাৎ একদিন। দরিদ্র বাঙালীর বুকের রক্তে গড়িয়া তোলা তাসের ঘর ধূলিসাৎ হইতে বেশী সময় লাগিবে না।

কোম্পানীর সহিত যাঁহারা নিজেদের স্বার্থ জড়াইয়া লইয়াছিলেন, সেদিন তাঁহাদেরও অর্থের অভাব হয় নাই। কোটি কোটি টাকা তাঁহারাও উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই হঠাৎ-নবাবদের বংশধরেরা প্রায় প্রত্যেকেই আজ পথের ভিখারী। বাস্তভিটা পর্যন্ত অনেকের রক্ষা পায় নাই। সন্তান-সন্ততিকে ইহারা শিখান নাই যে চাষী ও গৃহস্থের স্বার্থের সহিত ইহাদেরও স্বার্থ জড়িত, তাহাদের উত্থান-পতনের সহিত ইহাদেরও উত্থান-পতন। বাংলার অর্থনীতির এই মূলসূত্র উপেক্ষার যে পরিণাম ইহাদের বংশধরদের জীবনে ঘটিয়াছে আজিকার যুদ্ধে হঠাৎ-নবাবদের বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই। যে কোটি কোটি কাগজের টাকা উপার্জন করিয়া ইহারা আজ চৌদ্দপুরুষের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম ভাবিয়া পুলকিত, ধুইয়া জল খাইবার জন্যও সে টাকা হয়ত এক পুরুষ পরেই আর অবশিষ্ট থাকিবে না। টাকা উপার্জনের সার্থকতা ইহার ব্যবহারে, যে ব্যবহারে শুধু নিজে নয়, দেশবাসীও সমানভাবে উপকৃত হয়। বংশধরদের এই শিক্ষা যাঁহারা দেন নাই, টাকার ব্যবহারের পথ খুলিয়া দিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, দুই-এক পুরুষের মধ্যেই তাঁহাদিগকেও কোম্পানীর আমলের হঠাৎ-নবাবদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে হইবে ইহা ইতিহাসের নিষ্ঠুর শিক্ষা।

বাঙালীর শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্প বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক পরিচালনায় সারা ভারতবর্ষ ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ, কিন্তু সকল শক্তিতে উহা ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অন্যান্য প্রদেশ

যতখানি সচেষ্ট, বাংলা তাহার একাংশও নহে। অপর প্রদেশের ধনীরা যেভাবে পারেন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া নূতন নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। বাংলার বাজার দখলের জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। বাংলার মুষ্টিমেয় কারখানাগুলির দৃষ্টি এদিকে নাই, চড়া দামে যুদ্ধের মাল সরবরাহের আনন্দে ইহারা মত্ত। বাংলায় তৈরি কাপড়, সাবান, ঔষধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য প্রায় প্রত্যেক দ্রব্য বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে—ওজুহাত—"যুদ্ধের কাজ করিয়া সময় পাই না", নয়ত, "কাঁচা মাল পাই না।" এই অর্থহীন কৈফিয়ৎ দিয়া যুদ্ধোত্তর তীব্র প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়া যে অসম্ভব হইবে, স্বদেশী যুগের পর হইতে বহু চেষ্টায় দেশবাসীর অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারের ফলে যে বাজারে ইহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এক বার সেখান হইতে বিতাড়িত হইলে প্রবেশের পথ আর খোলা থাকিবে না। বিপদের দিনে ইঁহারা যে অপরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহার পর স্বদেশীর ও "বাংলার শিল্পে"র ধুয়া তুলিয়া চড়াদামে খেলো জিনিস বিক্রয়ের চেষ্টা ভবিষ্যতে ইঁহারা কোন্ মুখে করিবেন? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কারখানাগুলি আজ বাংলার কাঁচা মাল পর্য্যন্ত কিনিয়া লইতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে যুদ্ধের পর বাঙালীকে বিদেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য নির্ভর তো করিতেই হইবে, কৃষিজাত পণ্য ও কাঁচা মাল বিক্রয়ের জন্যও তাহাকে উহাদেরই দ্বারস্থ হইতে হইবে। বাস্তব জীবনে বাঙালীকে কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালার পর্য্যায়েই নামিয়া আসিতে হইবে।

কৃষি ও চাষী

অন্নবস্ত্র ও ঔষধের জন্য বাঙালী অনায়াসে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত হইতে পারে, ইহার সর্ববিধ সুযোগ ও উপায় রহিয়াছে। অভাব শুধু মস্তিষ্কের, টাকাওয়ালা লোকদের আগ্রহের এবং আন্তরিক স্বদেশপ্রীতির। বৈজ্ঞানিক-প্রথায় চাষ হইলে বাঙালীর অন্নাভাবের কোন কারণ নাই ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। পাট প্রভৃতি যে-সব কৃষি-পণ্যের উপর চাষী অর্থের জন্য নির্ভর করে সেগুলি সম্বন্ধেও বাঙালীর মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার। পাট বাংলার অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার লাভের সবটাই যায় শ্বেতাঙ্গ কলওয়ালা ও কৃষ্ণাঙ্গ দালালদের পকেটে, লোকসানের সবটা বহন করে চাষী। অর্থক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে ফাউ আছে।—পাট পচানো জলের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বর্ধিত নানাবিধ রোগ। এই সর্বনাশা পাটচাষ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেও বাঙালীর লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। প্রয়োজন হইলে গবর্মেণ্ট এক-চেটিয়া চাষ হিসাবে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে উহা করিতে পারেন অথবা নিম্নতম দর বাঁধিয়া ফসল বীমার ভিত্তিতে পাটকলের নিকট হইতে ন্যায্য মূল্য আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া তারপর উহার চাষের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কৃষিজাত পণ্যের দর সকল সময় সমান চড়া থাকে না, স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যশস্যের দর অস্বাভাবিক ভাবে কমই থাকে। যুদ্ধের পর বাংলার যে-সব চাষী ধান উৎপাদন করিবে তাহারা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় তাহাদিগকে বোনাস দেওয়ার জন্য গবর্মেণ্টকে এখন হইতেই বাধ্য করা দরকার। সাত বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙালী চাষী ও গৃহস্থ যদিও বুঝিয়াছে যে কোন মন্ত্রিমণ্ডলের নিকটেই তাহার আশা করিবার কিছু নাই, তথাপি ইহাদেরই উপর চাপ দিতে হইবে। ইহাদের মারফৎ জনগণের দাবি প্রতিদিন গবর্ণর ও সিভি-লিয়ানদের উপর প্রতিফলিত হইতে থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত উহা রোধ করা আমলাতন্ত্রের পক্ষেও কঠিন হইবে। সর্ জন হার্বার্টের আমলে ৯৩ ধারার প্রয়োগে বাঙালী দেখিয়াছে উহা তপ্ত কটাহ হইতে অগ্নিকুণ্ডে পতন ভিন্ন আর কিছু নয়! দেশের জাগ্রত জনমত ব্যবস্থা-পরিষদের প্রত্যেক বাঙালী সদস্য এবং মন্ত্রীকে কর্তব্য পালনে বাধ্য করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা একেবারে নাই ইহা বলা চলে না। জমিদারদেরও এ সম্বন্ধে কর্তব্য আছে। চাষী ও গৃহস্থের স্বার্থ তাঁহাদেরও স্বার্থ, এই পরম সত্য আজও যদি তাঁহারা বুঝিতে না চান, জীবন-সংগ্রামে ইহাদের নেতৃত্বে আজও যদি ইঁহারা অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ধ্বংসের মুখ হইতে ইঁহাদের নিজেদেরও রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ইহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইবে এ ইঙ্গিত আজ সুস্পষ্ট।

ঔষধের অভাব

তারপর ঔষধ। চাষী ও গৃহস্থের পক্ষে চিকিৎসা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সংগ্রহে অসমর্থ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে বিনা চিকিৎসায় মরা ভিন্ন গতি নাই। বাংলার দোকান হইতে বাংলায় তৈরি ঔষধ অদৃশ্য। এখানে কৈফিয়ৎ যুদ্ধের মাল সরবরাহ ও কাঁচামালের অভাবের। যুদ্ধের অর্ডার সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ক্রেতার অভাবটাও যে দেখা দরকার অপর সকলের ন্যায় অজ্ঞাত লাভের লোভে ইঁহারা তাহা উপেক্ষা

করিয়াছেন; মূল রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করিয়া বাংলাকে ঔষধ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ধনী ব্যক্তি বা বড় বড় রাসায়নিক কারখানাগুলি একত্র হইয়া কাজ করিবার কোন আগ্রহ অনুভব করেন নাই। ফলে বাঙালীকে হয় বিদেশী ঔষধ অসম্ভব চড়া দরে সংগ্রহ করিতে হইতেছে, নতুবা ঔষধের নামে বাজে জিনিস কিনিয়া অর্থ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে হইতেছে। কুইনাইনের অভাবে ম্যালেরিয়ায় দেশ উজাড় হইতেছে। গত বৎসর ভারত-সরকার সমস্ত কুইনাইন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, ফলে গত বৎসর ম্যালেরিয়ার কোন চিকিৎসা হয় নাই। গত বারের ধাক্কা যাহারা কোনক্রমে সামলাইয়া উঠিয়াছিল, বিনা ঔষধে রোগের সহিত সংগ্রামে তাহাদেরও জীবনীশক্তি এত ক্ষীয়মাণ হইয়াছে যে প্রথম আক্রমণও এবার তাহারা সামলাতে পারে নাই। ম্যালেরিয়ায় এ বৎসরের ভয়াবহ মৃত্যুর পূর্ণ দায়িত্ব ভারত-সরকারের। জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া এবার যে কুইনাইন তাঁহারা বাহির করিয়াছেন, গত বার ইহার অর্দ্ধেক বিতরণ করিলেও মৃত্যুহার এত ভীষণ হইত না। অথচ বাংলার ও আসামের বহু স্থানে কুইনাইন চাষ হইতে পারে ইহা জানিয়াও সমৃদ্ধিশালী বাঙালী এদিকে উদাসীন। আসামে, গারোপাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে কুইনাইন হইতে পারে সেখানেও বাঙালী জমিদার আছেন, কিন্তু কুইনাইন চাষে ইহাঁদের কাহারও আগ্রহ বা উৎসাহ নাই। যে ভারত-সরকার শ্বেতাঙ্গ কিনা ব্যুরোর স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতবর্ষে এই অতিপ্রয়োজনীয় ঔষধের চাষ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকা বৃথা।

শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ বাঙালী যদি আজও জাতির ভবিষ্যৎকে নিজের ভবিষ্যৎ বলিয়া ভাবিতে না শিখেন, প্রতিকারের জন্য আজও যদি ইঁহারা অগ্রসর না হন, চাষী ও গৃহস্থের স্বার্থের সহিত তাঁহাদেরও স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ সত্য যদি স্বীকার করিতে না চান, সর্বনাশ শুধু দরিদ্র বাঙালীর হইবে না, ধরাপৃষ্ঠ হইতে ইহাদেরও অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবে।

—

কৃষি ও শিল্পের উন্নতির উপায়

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর মিঃ দেশমুখ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্সের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নত বিধান করাই যে দেশের শাসকদের বৈষয়িক ও সমাজ সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাহাতে কোন ভুল নাই। তিনি বলেন যে, ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ভয়ানক নীচু। বাংলার শোচনীয় ব্যাপার হইতেই বোধগম্য হয় যে ভারতের জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিতে নিদারুণ গলদ রহিয়াছে। দেশের কৃষি সমস্যাকে দেশের অন্যান্য বৈষয়িক সমস্যা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। সম্প্রতি বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় দেশের শিল্প ও কৃষির সমতাল উন্নতির যে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছে। তিনি বলেন যে কি ভাবে সমতালে ও দ্রুতগতিতে শিল্পের ও কৃষির উন্নতি সম্ভব হইতে পারে তাহাই হইল বর্ত্তমান সমস্যা।

কৃষিসংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করিয়া এবং সমস্যা আলোচনা করিয়া সোসাইটি দেশের সেবা করিতেছেন। সরকারী কৃষি গবেষণাগারের ন্যায় ইঁহাদের কার্য্যকলাপ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া কৃষকের পক্ষে সহজলভ্য হইলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। কৃষির সহিত কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তন এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কুটীরে কুটীরে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা এবং যতদূর সম্ভব অধিক লোকের কর্ম সংস্থানের চেষ্টা ভিন্ন ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

সভাপতি সর্ মণিলাল নানাবতী প্রস্তাব করেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভের টাকা অর্দ্ধেক কৃষির উন্নতিতে ব্যয় করা হউক, কারণ ইনফ্লেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ এবং চাষীর ক্ষতি। ভারত-সরকার এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবে রাজী হইবেন কি না সন্দেহ।

—

কৃষিজমি বিক্রয় অর্ডিনান্স

বর্ত্তমান বৈষয়িক দুর্দশার ফলে ১৯৪৩ সালে যে-সকল রায়ত ও নিম্নস্বত্বভোগী চাষী তাহাদের জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে, যাহাতে তাহারা তাহাদের জমি ফিরিয়া পাইতে পারে, তজ্জন্য বাংলা-সরকার ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় কৃষিজমি বিক্রয় (সাময়িক) অর্ডিন্যান্স নামে এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। অর্ডিনান্সটি অবিলম্বে সমগ্র বাংলায় প্রযুক্ত হইবে। অর্ডিনান্সে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে বা তাহার পর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখের পূর্ব পর্য্যন্ত কোন রায়ত বা কোন নিম্নস্বত্বভোগী চাষী যদি আড়াই শত টাকার অনূর্দ্ধ দরে কোন জমি বিক্রয় করিয়া থাকে এবং এই জমি

বিক্রয় না করিলে তাহার পক্ষে যে সংসার চালান সম্ভব হইত না ইহার প্রমাণ দিয়া যদি এখন হইতে দুই বৎসরের মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে সে কোন দরখাস্ত করে এবং জমির ফসল বাবদ ক্রেতা যে অর্থ পাইয়াছে সেই অর্থ বাদ দিয়া সে যদি শতকরা ৩৸৹ সুদ সমেত জমির দাম বাবদ টাকা এবং ইতিমধ্যে ক্রেতা জমির কোন উন্নতি সাধন করিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা কালেক্টরের নিকটে জমা দেয়, তাহা হইলে কালেক্টার তাহার জমি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে নির্দেশ দিবেন।

অর্ডিনান্স জারি করিয়াই যেন বাংলা-সরকারের দায়িত্ব শেষ না হয়। নিরক্ষর কৃষকেরা ইহার সুবিধা যাহাতে লাভ করিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত হওয়া দরকার।

—

ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে নয়া দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে অবশেষে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্বাচিত হন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে বলেন: "আমাদের মধ্যে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, বর্তমান মহাসভার উদ্বোধনী বক্তৃতায় দেশের ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হইবে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই বিষয়ে দেশের কি প্রয়োজন তাহা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। খুব বেশী দিনের কথা নহে, আমাদের দেশে বহু অগ্রণী বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পপতি তাঁহার নেতৃত্বে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন সম্পর্কে সমস্ত কথা অতিশয় অবধানতার সহিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই বিবেচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত বর্তমান সময়ে একটা অমূল্য জিনিস হইত। অতীব দুঃখের কথা এই যে, দৈব আসিয়া আমাদিগকে বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক ও সুসংহত চিন্তার সুফল হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সে ফলাফল যদি আমি জানিতে পারিতাম তাহা হইলে তাহা আমি এখানে উপস্থিত করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে অধিকাংশ রিপোর্টই আমার পক্ষে অনধিগম্য।"

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সকল দিক লইয়া অনুসন্ধান করিয়া বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের পথ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করেন। পণ্ডিত নেহরু কারারুদ্ধ হইবার পর তাঁহাকে কমিটির সহিত কোন সংস্রব রাখিতে দেওয়া হয় নাই, ফলে উহার কাজ বহুদূর অগ্রসর হইবার পর আপাততঃ বন্ধ রহিয়াছে। গবন্মেণ্ট কোন দিনই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই, এখনও উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টাই তাঁহারা করিতেছেন। এই কমিটির প্রতি দেশের বৈজ্ঞানিকদের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব এবং উহার সহিত সহযোগিতার ইচ্ছা সুখের বিষয়। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সূচনা হইয়াছিল, ইহাও আজ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে।

—

পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের দায়িত্ব

মাদ্রাজে যুব-সমিতির পক্ষ হইতে নিখিল-ভারত সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রসমূহ দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে, মিঃ ব্রেলভী এই সম্বর্ধনা সভায় সেই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন, কোন কোন মহলে এইরূপ ধারণা বিদ্যমান আছে যে, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহ অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ অল্পাধিক পরিমাণে দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন। পরাধীন দেশে সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে না। স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং স্বাধীন সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিরত দেশে সংবাদপত্রসমূহ জনগণের মুক্তি লাভের শক্তিশালী অস্ত্র। সংবাদপত্রসমূহের উপর সর্বদাই আমলাতন্ত্রের দৃষ্টি রহিয়াছে এবং আমলাতন্ত্র সর্বদাই সংবাদপত্রসমূহের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করিবার জন্য চেষ্টিত। যখনই গবন্মেণ্ট সংবাদপত্রসমূহের মৌলিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিবার কিংবা দেশের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ ব্যাহত করিবার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তখনই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন। সংবাদপত্রসমূহ সম্মিলিতভাবে এইরূপ দাবী করিয়াছেন যে, যাহাতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে সংবাদপত্রসমূহ এইরূপ কিছু করিবেন না; কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট যদি দেশের আইনসঙ্গত রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিতে চাহেন তবে

সংবাদপত্রসমূহ তাহাতে কোনওরূপ সহায়তা করিবেন না। সংবাদপত্রসমূহ এইরূপ চুক্তির ভিত্তিতেই কাজ করিতেছেন। মিঃ ব্রেলভী সকলকে এইরূপ আশ্বাস দেন যে, এই চুক্তি-বহির্ভূত কোনওরূপ বিধি-নিষেধ মানিয়া লইতে সংবাদপত্রসমূহ কখনই সম্মত হন নাই।

ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ নূতন নয়। ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতেই সুপরিকল্পিত ভাবে উহা চলিয়া আসিতেছে। ১৮২৩ সালের অ্যাডাম রেগুলেশন এবং ১৯৩৯ সালের ভারতরক্ষা আইনে প্রদত্ত আদেশগুলির মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। সামরিক প্রয়োজনের নামে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যেক স্তরের সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান অহরহ ঘটিতেছে। কিছু দিন যাবৎ নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ পর্য্যন্ত দণ্ডনীয় করিয়া এক অদ্ভুত সতর্কতা অবলম্বন করা সুরু হইয়াছে। অস্থায়ী বড়লাট অ্যাডাম সাহেব এই ফন্দীটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অতীত ও বর্ত্তমান কর্ত্তাদের মধ্যে এই প্রভেদটুকু স্বীকার করিতেই হইবে।

—

নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনে সভাপতির মন্তব্য

নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী তাঁহার অভিভাষণে বলেন :

"বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে এমন বিশেষ কিছু নাই যাহার জন্য নিছক সামরিক ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে সংবাদপত্রের উপর কঠোর বিধান বলবৎ রাখা সঙ্গত হইতে পারে। বরং রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কিত বৈধ অভিযোগ প্রকাশ ও আলোচনা করিবার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াই কর্ত্তব্য। সাংবাদিক সমিতির কার্য্যনির্বাহক-সভার সহিত গবর্ন্মেণ্টের যে চুক্তি হইয়াছিল, মোটের উপর ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সে চুক্তি মান্য করিয়া চলিয়াছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত সংবাদপত্রকে প্রভিন্সিয়াল এ্যাডভাইসরি বা সেণ্ট্রাল এডভাইসরি কমিটির পরামর্শ অনুসারে মাথা পাতিয়া শাস্তি বহন করিতে হইয়াছে। আমরা বড়াই করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা চুক্তি রক্ষা করিয়াছি, অপর পক্ষ কি তাহা বলিতে পারেন? কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কমিটির পরামর্শ একেবারে অগ্রাহ্য হইয়াছে। আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, ভারত-সরকার যে নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের অজুহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সে নীতি ভঙ্গ করিতে দেওয়া হইয়াছে। বৈধভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা সম্পর্কেও দিল্লীর চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিধি-নিষেধ জারি হইয়াছে।"

সংবাদপত্র সম্মেলনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার পরও ভারত-সরকার সকল প্রদেশে একই প্রকার নীতি অনুসরণ করেন নাই, বহুবার-বহুক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। রাজনৈতিক বন্দীদের অভাব-অভিযোগ অথবা দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারিতে কোন সামরিক কারণ থাকিতে পারে না, দেশবাসীর এই বিশ্বাস সকল সময় উপেক্ষা করিয়াছেন। এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি বাধা না দিলে এবং বিলাতের সংবাদপত্র আপত্তি না করিলে দুর্ভিক্ষের সংবাদ-প্রকাশ দমনের চেষ্টা অব্যাহত ভাবেই হয়ত চলিতে থাকিত।

প্রেস এডভাইসরি কমিটি গঠনের দ্বারা সংবাদপত্রের কোন লাভ হয় নাই ইহাও বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ ব্রেলভীও তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে প্রাদেশিক এডভাইসরি কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়াই "যুগান্তর", "ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া" এবং বোম্বাইয়ের "জন্মভূমি"র প্রকাশ বন্ধের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সংবাদপত্র দমনে সরকারী আগ্রহ বহু ক্ষেত্রে নগ্নভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। কোন লেখা ভারতরক্ষা বিধানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে কিনা সে বিচারের ভার তাঁহারা নিজ হস্তেই রাখিয়াছেন, আদালতকে সাধারণতঃ তাঁহারা এড়াইয়াই চলিয়াছেন। সংবাদপত্রের সহযোগিতা লাভে সরকারের মৌখিক আগ্রহে আন্তরিকতার অভাব বার বার ধরা পড়িয়াছে।

—

মানুষের অখাদ্য চাউল সরবরাহ

কলিকাতা কর্পোরেশন এতকাল কর্ম্মচারীদিগকে যে চাউল যোগাইয়া আসিতেছিলেন, তাহা অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে পাওয়া যাইতেছিল। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাল চাউলই আসিত, মাঝে মাঝে দুই-একটা অভিযোগ অবশ্য শুনা যাইত, কিন্তু তাহা এমন কিছু গুরুতর নহে। অক্টোবর হইতে অতি বিশ্রী রকমের চাউল আসিতে থাকে; ঐ চাউল এত বিশ্রী যে শ্রমিকরা উহা লইতে অস্বীকার করে। চাউলের বস্তাগুলি খুলিয়া দেখা যায় যে, চাউলের সহিত বালি, কাঁকড় এবং সুরকি মিশান আছে। ঐ চাউলের নমুনা কর্পোরেশনের প্রধান রসায়ন-বিশ্লেষকের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া

অভিমত প্রকাশ করেন যে, ঐ চাউল মানুষের অখাদ্য। তখন উৎকৃষ্টতর চাউল যোগাইবার জন্য অথবা কর্পোরেশনকে বাজার হইতে উৎকৃষ্টতর চাউল খরিদ করিবার সুবিধা দিবার নিমিত্ত অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নিকট আবেদন জানান হয়। এই দরখাস্তের উত্তরে বলা হয় যে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চাউল তাহাদের কাছে নাই। অতঃপর 'ডেপুটি ডিরেক্টর অব প্রকিওরমেণ্ট' আশ্বাস দেন যে, কর্পোরেশন যদি ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে উৎকৃষ্টতর চাউল খরিদ করিতে পারেন তাহা হইলে কোন আপত্তি করা হইবে না। এতদনুসারে কর্পোরেশন কাটোয়ার কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ১৬৲ অর্থাৎ মণকরা সরকার-নির্দিষ্ট মণ-অপেক্ষা এক টাকা কম দরে দশ হাজার মণ চাউল খরিদের ব্যবস্থা করেন। ঐ কথা অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে জানান হইলে উত্তর পাওয়া যায় যে, ঐ রিজিয়নের ডেপুটি-কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত ঐ চাউল বর্ধমান হইতে আনান যাইবে না। উক্ত কনট্রোলারের নিকট হইতে অনুমোদন প্রার্থনা করা হইলে, তিনি অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনারের সহিত পরামর্শান্তে জানান যে বর্ধমান হইতে চাউল আনাইবার অনুমতি দিতে তিনি অসমর্থ। এদিকে কর্পোরেশনের হাতে ৫০ মণের বেশী চাউল নাই, এই চাউলও অতি বিশ্রী অথচ ৩রা জানুয়ারি হইতে চাউল দেওয়া আরম্ভ করিতে হইবে।

মানুষের অখাদ্য এবং স্বাস্থ্যের হানিকর দ্রব্য বিক্রয় করিলে দণ্ডবিধি আইনে তাহাকে সাজা দিবার ব্যবস্থা আছে। গবর্মেণ্ট স্বয়ং অখাদ্য বিক্রয় সুরু করিলে ভয়ের কথা। এই শ্রেণীর চাউল সরবরাহের জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সরবরাহকারীদের নামে আদালতে মামলা করা উচিত ছিল।

টেলিফোনের "অপব্যবহার"

বাংলা-সরকার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে বিমান-আক্রমণের পর কলিকাতায় টেলিফোনে সংবাদ আদান-প্রদান এত বৃদ্ধি পায় যে উহাতে নাকি পুলিসের কাজের ক্ষতি হয়। টেলিফোনের এই "অপব্যবহার" বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা চিরাচরিত প্রথায় হুমকী দিয়া বলিয়াছেন যে, এরূপ করিলে বিমান-আক্রমণের পর পুলিসের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণকে টেলিফোন ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।

পয়সা দিয়া জিনিস কিনিতে গিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করান বর্তমান বাংলা-সরকারের—মন্ত্রী এবং সিভিলিয়ানতন্ত্র উভয় শাখারই বিশেষত্ব। কলিকাতায় যাঁহারা টেলিফোন ব্যবহার করেন পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা বোধ হয় তাঁহারা উহার জন্য বেশী পয়সা দেন এবং সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা কম সাহায্য পান। কথা শেষ করিবার পূর্বেই অকস্মাৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া এখানকার টেলিফোনে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

কলিকাতায় বিমান-আক্রমণের পর উহার নাম ঠিকানাহীন একটা আবছা রকমের সংবাদ পাইতেও অন্ততঃ একদিন লাগে। বিস্তৃততর বিবরণ ৩।৪ দিনের আগে প্রকাশিত হয় না, যদি বা একান্তই সরকারের দয়ায় উহা প্রকাশ করা ঠিক হয়। কাজেই বিমান-আক্রমণের পর প্রত্যেকের পক্ষেই দূরস্থিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সংবাদ লওয়া শুধু আগ্রহের ব্যাপার নহে, একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে "অপব্যবহার" আখ্যা দিয়া ইহাই বুঝানো হইতেছে যে এ দেশের পাবলিক সার্ভিসের প্রতিটি অঙ্গ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্টাফিস, টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস প্রভৃতি প্রত্যেকটি পোষণ করিবার জন্য এদেশের জনসাধারণকে অকাতরে টাকা দিতে হইবে, কিন্তু উহাদের ব্যবহার সর্বাগ্রে হইবে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য রক্ষায়। বিদেশীর সাম্রাজ্য অটুট রাখিবার তাগিদে পুলিসের প্রয়োজন ফুরাইবার পর গবর্মেণ্ট দয়া করিলে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ টেলিফোন প্রভৃতি জনসাধারণ ব্যবহার করিতে পাইবে—নহিলে তাহা "অপব্যবহার" এই মনোবৃত্তি একমাত্র পরাধীন দেশেই সম্ভব।

কলিকাতার টেলিফোন সরকারের হাতে যাওয়ার পর উহার কর্মকুশলতা রসাতলে গিয়াছে, কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য বাড়িয়াছে এবং উহার কোন প্রতিকার হয় না।

সীমান্ত গবর্ণরের নামে অভিযোগ

সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেব এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বিগত পরিষদ উপনির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ আনিয়া এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "যাহারা আসল কথা না জানে তাহারা প্রতারিত হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেণ্ট যদি একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন তাহা হইলে সেই ট্রাইব্যুনালের সম্মুখেই উপনির্বাচন-সংক্রান্ত সমস্ত সত্য ও প্রকৃত তথ্যাদি উদ্ঘাটিত হইবে। তখনই জনসাধারণ সব ব্যাপার জানিতে পারিবেন। গবর্ণরের নিকট আমার চ্যালেঞ্জের এখনও কোন নড়চড় হয় নাই। গবর্ণর ও

আমি ভোট গণনা করিব এই সর্তে যদি সুদাম কেন্দ্রে পুনরায় উপনির্বাচনের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে মুস্লিম লীগ কিছুতেই শতকরা দশটিও ভোট পাইবে না। ইহার ব্যতিক্রম হইলে আমি কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিব।"

৩রা জানুয়ারী এই বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, সীমান্ত গবর্ণর সর্ জর্জ কানিংহাম আজও ইহার জবাব দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। বাংলা দেশেও ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সর্ জন হার্বার্টের সম্বন্ধেও মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে দলবিশেষের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করিয়াছিলেন এবং তাহারও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। গবর্ণর স্পীকার নহেন, রাজনীতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠতম। রাজনৈতিক বিতর্কে যোগদান তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত বা অশোভন হওয়া উচিত নহে, বিশেষতঃ যখন এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে উঠে।

—

কলিকাতা কর্পোরেশনের মশক নিবারণের চেষ্টা

জল আবদ্ধ থাকিলে মশক জন্মিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া কর্পোরেশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলা-সরকার কোন বাড়ীতে যাহাতে আবদ্ধ জল না থাকে তজ্জন্য এক আদেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে বাড়ীর মালিকের ২০০৲ পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে এবং ক্রমাগত লঙ্ঘন করিতে থাকিলে যত দিন পর্যন্ত সরকারী নির্দেশ পালিত না হইবে তত দিন গৃহস্বামীকে প্রত্যহ ৫০৲ করিয়া জরিমানা দিতে হইবে।

কলিকাতায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়া দমনের উপযুক্ত চেষ্টা কর্পোরেশন বা বাংলা-সরকার কেহই করেন নাই। স্লিট ট্রেঞ্চগুলির বদ্ধ পচা জল নিকাশের কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কাগজপত্রে হুকুমনামা জারি করিয়া কর্তব্য সমাপনের যে দৃষ্টান্ত বাংলা-সরকার দেখাইয়াছেন, কর্পোরেশনও দেখা যাইতেছে দায়িত্ব এড়াইবার সেই সহজ পন্থাই অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

—

মুসলিম লীগ সম্মেলন ও মিঃ জিন্না

করাচীতে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে মিঃ জিন্না পাকিস্থানের দাবি তীব্র ভাষায় ঘোষণা করিয়া ইংরেজকে ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া সরিয়া যাইবার জন্য জানাইয়াছেন। এবারকার নূতনত্ব একটি কর্মপরিষদ গঠন। মিঃ জিন্না মুসলমান-কল্যাণের জন্য যে দশ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন তাহা উঠে নাই। পাকিস্থানের রথ চালু করিবার জন্য "কাউন্সিল অফ অ্যাকসন" গঠনে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভয় পান নাই। কোন কোন বিলাতী সংবাদপত্র ইহাকে কংগ্রেসের ব্যর্থ অনুকরণ বলিয়া ব্যঙ্গও করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের "ফোরাম" পত্রিকায় মিঃ সাহনী জিন্না সাহেবের মুসলমানত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। ইহার কথায় ও কার্য্যে আন্তরিকতা অপেক্ষা সুবিধাবাদ সাধারণ মুসলমানের নিকটেও অনেক সময় কি ভাবে স্পষ্ট হইয়া ওঠে তাহা বুঝা যায়। সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু ও জিন্না একবার হায়দরাবাদের একটি মামলায় দুই পক্ষের এডভোকেট হিসাবে উপস্থিত হন। কোরানের কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা লইয়া মামলাটির উদ্ভব। সর্ তেজবাহাদুর কোরানের মূল আরবী অংশগুলি পাঠ করিয়া উহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া জজকে শোনান। মিঃ জিন্নার সওয়াল-জবাবের সময় তিনি কোরানের যে-সব স্থল প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিতে চাহেন তাহার মূল আরবী পড়িয়া শুনাইতে জজ তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ঘর্মাক্ত কলেবরে মিঃ জিন্না অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে সর্ তেজবাহাদুর উহা পড়িয়া দিতে চাহেন এবং উহার যে ইংরেজী অনুবাদ তিনি করিয়া দেন জিন্না সাহেবকে তাহারই উপর নির্ভর করিতে হয়। মামলার বিবরণ পরদিন প্রকাশিত হইলে দেখা গেল হায়দরাবাদের একটি সংবাদপত্র শিরোনামা দিয়াছে—মৌলানা তেজবাহাদুর সপ্রু কর্তৃক পণ্ডিত জিন্নার জন্য কোরান অনুবাদ।

গোল টেবিল বৈঠকের সময় আর একটি ঘটনা ঘটে। বিলাত যাত্রাকালে সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু, মিঃ জিন্না, সর্ শফাৎ আহমদ খাঁ এবং ডাঃ মুঞ্জে সুয়েজে নামিয়া উটের পিঠে চড়িয়া পিরামিড দর্শনে যাত্রা করেন। আরব উটচালক সর্ তেজবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিল তিনি মুসলমান কি না। সর্ তেজ উত্তরে "ইনশা আল্লা" বলিয়া আরবীতে কোরানের কয়েকটি বয়েৎ আবৃত্তি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া দিলেন যে মিঃ জিন্না ও সর্ শফাৎ আহমদ মুসলমান এবং ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু। উটচালক মুসলমান নেতৃদ্বয়কে আরবীতে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একটিরও জবাব দিতে পারিলেন না। বিরক্ত হইয়া সে সর্ তেজবাহাদুরকে বলিল, "মহাশয়, দেখিতেছি এই দলের মধ্যে একমাত্র আপনিই খাঁটি মুসলমান।"

—

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির জন্মশতবার্ষিকী

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি এবং ডাঃ কালিদাস নাগ ও কুমারী সাধনা ব্যানার্জ্জিকে যুগ্মসম্পাদক করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ভবনে একটি প্রাথমিক সভাও হইয়া গিয়াছে। কমিটি উমেশচন্দ্রের একটি জীবনীপ্রকাশ, কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি স্থাপন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নামে একটি লেকচারশিপ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

—

মৌখিক আলোচনার আবশ্যকতা

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "সরকারী সমস্যা সমাধানে লেখালেখি অপেক্ষা মৌখিক আলোচনা অনেক বেশী উপযোগী বলিয়া আমি মনে করি। আমি যেখানেই মৌখিক আলোচনার সুযোগ পাইয়াছি সেখানে সেনানায়ক হিসাবে আমার অধস্তন কর্মচারীদিগকে লিখিত আদেশ দিই নাই। আমার কর্মচারীদিগকেও আমি এই ভাবে চলিতে উৎসাহ দিয়াছি।"

ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সহিত বাংলা দেশের পরিচয়। মৌখিক আলোচনার নামে মাঝে মাঝে সরকারী দপ্তরখানায় দু-একটা বৈঠকের অনুষ্ঠান হয় বটে, কিন্তু উহার অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়িতেও বিলম্ব হয় না। গত খাদ্যাভিযানের প্রাক্কালে "পরামর্শ" করিবার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতাদের আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বৈঠকেই তাঁহাদিগকে জানান হইল যে সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই সব বৈঠকেও সত্য কথা বলিবার চেষ্টা কেহ কেহ করিলেও তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ফলে এ দিক দিয়াও সত্য উদ্ঘাটনের পথ রুদ্ধ। মৌখিক আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার দ্বারা সত্য উদ্ঘাটন। বাংলা-সরকার সর্বদা ইহা এড়াইয়া চলিয়াছেন; চলাও স্বাভাবিক। সুবিধাবাদী ও চাকুরী-লোভী মন্ত্রী এবং জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বলেশহীন সিভিলিয়ান কর্মচারী কাহারও পক্ষেই সত্যের আলোক সহ্য করা কঠিন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর অন্ধকার কক্ষে যাহারা পুষ্ট ও বর্ধিত, সর্বতোভাবে অন্ধকারকেই তাহারা বরণ করিয়া লইতে চাহিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

—

অমৃতসরে হিন্দু মহাসভা সম্মেলন

অমৃতসরে হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণে জাতীয়তাবোধের সুর দেশবাসীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। হিন্দু মহাসভার একজন সভাপতির পক্ষে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠিয়া সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে দর্শন নূতন ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মহাসভারও লক্ষ্য ইহা এবার পরিষ্কার ভাবেই বলা হইয়াছে। অবশ্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষে ইহাতে ভয়ের কারণ নাই, কারণ স্বাধীনতা-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সংগঠন বর্তমান মহাসভার নাই ইহা সর্বজনবিদিত; তথাপি এরূপ ঘোষণার মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়া মহাসভা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

—

বানিয়াচঙ্গের জন্য সাহায্য প্রার্থনা

শ্রীহট্ট হইতে শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী জানাইতেছেন:

শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গ ভারতের অন্যতম বৃহৎ গ্রাম। এই বানিয়াচঙ্গ গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বর মহামারীরূপে দেখা দিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রামবাসীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। একজন লোকও সুস্থ নাই গ্রামে এমন বহুসংখ্যক পরিবার রহিয়াছে। বহু পরিবার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মৃতের সৎকার করিবার লোকের অভাব অনেক দিন আগে হইতেই অনুভূত হইতেছে। এখনও প্রতি সপ্তাহে চারি শত হইতে পাঁচ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই মহামারীকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার লোকের বাসভূমি বানিয়াচঙ্গ অচিরেই এক মহাশ্মশানে পরিণত হইবে।

ইহার জন্য লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীহট্ট হইতে এত টাকা উঠিবে না। এই জন্য দেশের ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলকেই এই আর্ত্তসেবার কার্য্যে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যে কোনও রূপ সাহায্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম, এল, এ, শ্রীহট্ট, ঠিকানায় পাঠাইলে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে।

—

ভাইকাউণ্ট ওয়াভেলের বক্তৃতা

বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণের দুই মাস পরে কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের বাৎসরিক সভায় ভাইকাউণ্ট ওয়াভেল তাঁহার প্রথম বক্তৃতা করিয়াছেন। বড়লাটের এই প্রথম উক্তির ভিতর আন্তরিকতার সুর স্পষ্ট, পেশাদার রাজনীতিবিদের ন্যায় কথার মারপ্যাঁচ ইহাতে কম,—তাঁহার সকল কথায় একমত হইতে না পারিলেও ইহা স্বীকার্য্য। ভারতে পদার্পণ করিয়াই তাঁহাকে এক বিরাট্ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড লিনলিথগো অথবা বাংলার লাট সর্ জন হার্বার্টের ন্যায় দায়িত্ব এড়াইবার অথবা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া দুর্ভিক্ষের সংবাদ চাপিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। কার্য্যভার গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই উপযুক্ত সৈনিকের ন্যায় তিনি দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উহার তীব্রতা প্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙালী ইহা কৃতজ্ঞতার সহিতই স্মরণ করিবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের একটি প্রধান কারণ ফাটকাবাজি ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি আজ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে দমন অথবা সংযত করিতে পারেন নাই।

ওয়াভেল বলেন, "খাদ্য-সমস্যার সমাধানই আমাদের প্রথম কাজ; কি করিয়া এই সমস্যার উদ্ভব হইল, সে সম্পর্কে এখানে কোনও আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। পিছনের পানে নয়, সুমুখ পানে তাকানই আমাদের কর্তব্য। ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য দ্বারাই সাধারণ অবস্থায় ভারতের প্রয়োজন প্রায় পূরণ হয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে—অতি ভোজন নয়, স্বল্পভোজন, সুতরাং দুঃসময়ের জন্য উদ্বৃত্তও কিছু থাকেনা। তা ছাড়া খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণও সব অঞ্চলে একই রকম নয় এবং অধিকাংশ উৎপাদকই ক্ষুদ্র চাষী, কোনওক্রমে নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করে মাত্র। জাপানের যুদ্ধাবতরণ ও মালয় ও ব্রহ্মে আমাদের বিপর্য্যয়ের ফলে (যাহার ফলে যুদ্ধ ভারতের সীমান্তে আসিয়া হাজির হয়) খাদ্যাবস্থায় একটা অস্থিরতার ভাব দেখা দেয়। ফলে ছোট ছোট চাষী ও সাধারণ গৃহস্থরা প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য ধরিয়া রাখে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপক আস্থাহীনতার ভাবই বর্তমান সমস্যার প্রথম ও প্রধান কারণ; এই আস্থাহীনতা অস্বাভাবিকও নয়, এবং দোষেরও নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অপরাপর দেশের মত ভারতেও এমন লোক আছে যাহারা নির্দোষ নয়; ইহারা শুধু নিজ নিজ সুখসুবিধার কথাই ভাবে এবং কোন প্রকার বাচবিচার না করিয়া খাদ্যাভাবের সুযোগ লইয়া টাকা রোজগার করিবার ফিকিরে থাকে। তাহাদের এই অন্যায় কার্য্য যে দুর্গতি ও মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিতে পারে, সেদিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপমাত্রও থাকে না। এই শ্রেণীর লোকেরা যে মাল ধরিয়া রাখিয়াছে এবং ফাটকাবাজি করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে মানুষের লোভই হইতেছে দ্বিতীয় প্রধান কারণ। খাদ্য-সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে না দেখিয়া স্থানীয় সমস্যা হিসাবে দেখিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ, বিভাগ বা জেলার মধ্যে একটা ঝোঁক দেখা গিয়াছিল; এই ঝোঁক দূর করিতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহাই হইতেছে তৃতীয় কারণ। উপরোক্ত প্রধান কারণ-গুলি ছাড়াও তুফান ও বন্যার ফলে বাংলার অবস্থা আরও জটিল হয়।

"সমগ্র দেশে মোটামুটি একই ধরণের খাদ্য নীতি পরিচালনার একটি সুব্যবস্থা প্রবর্তন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা যদি সুষ্ঠুভাবে খাদ্য-ব্যবস্থা পরিচালনায় অসমর্থ হই এবং বাহির হইতে আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য আনাই তাহা হইলে আমরা অন্যান্য দেশের কষ্টের কারণ হইব এবং তাহার ফলে পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধও অধিক দিন স্থায়ী হইবে। বড় বড় শহরগুলিতে পুরাপুরি বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণই আমাদের খাদ্য পরিকল্পনার মূল কথা।"

বড়লাট এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কেমলমাত্র কাগজ-পত্রে নির্দেশ জারী করিবার উপর নির্ভর না করিয়া গ্রামের খুচরা দোকানদার হইতে সুরু করিয়া বড় বড় হাট-বাজারের মহাজন ও পাইকারী বিক্রেতাদের বেচা-কেনা অফিসারগণকে ব্যক্তিগত ভাবে তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টের খাদ্যশস্য সংগ্রহের নীতি বিবেচনার সঙ্গে চালাইতে হইবে এবং খাদ্যশস্য চলাচলও কঠোর-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সমগ্র ভারতের আমরা একটি খাদ্যনীতি স্থির করিয়াছি। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য-সমূহের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা পাইলে ঐ নীতি সাফল্য-মণ্ডিত হইবে বলিয়াই আমি স্থির বিশ্বাস রাখি এবং ইহাকে সার্থক করিবার জন্য আমি কঠোরতম ব্যবস্থা-বলম্বনেও কুণ্ঠিত হইব না।

বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, বর্ত-মানে সমগ্র বিশ্ব বাংলার প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু বাংলা নিজেকে সাহায্য করিবার জন্য যদি চেষ্টান্বিত

না হয় তাহা হইলে এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি থাকিবে না। আগামী ছয় মাস হইবে বাংলার পরীক্ষার সময়। এই সময়ের মধ্যে বাংলা-সরকারকে তাহাদের নীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইবে এবং ইহার শাসন-ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করিতে হইবে। এখন বাংলার উপরই বাংলার খাদ্য-সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী কয়েক মাসের জন্য কলিকাতার খাদ্য সরবরাহের ভার লইয়াছেন বটে, তবে প্রকৃতিদেবীর প্রচুর শস্যদান সত্ত্বেও যদি নিজেদের অক্ষমতার দরুণ প্রাদেশিক সরকার ঐ শস্য ঠিকমত সংগ্রহ ও বণ্টনে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার যে 'একটি প্রদেশকে' অনির্দিষ্ট কালের জন্য চালাইয়া নিবেন তাহা হইতে পারে না।

খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে বড়লাট শেষ পর্য্যন্ত বলেন, "আমি মনে করি, দেশের সঙ্কটকালে যে-সব লোক খাদ্য ও ঔষধ বিক্রয় করিয়া বে-আইনীভাবে অধিক লাভ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাদই যথেষ্ট নহে এবং কোন শাস্তি-ব্যবস্থাকেই বেশী বলা যায় না। গড়িমসিভাব ও দীর্ঘসূত্রিতাকে আমল দেওয়া যাইতে পারে না এবং রাজনৈতিক দলাদলি প্রত্যেকের আবশ্যক খাদ্য পাইবার পথে যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

ফাঁপাই ('ইনফ্লেশন') সমস্যা সম্পর্কে বড়লাট বলেন,"কার্য্যকরীভাবে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করিতে না পারিলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে ফাঁপাই দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান হইতে পারে না। কারণ খাদ্যের উপরই সমস্ত দরপত্র নির্ভর করিয়া থাকে। অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য জিনিসপত্রের দর বাড়াইয়া দিয়া কেহই লাভবান হইতে পারিবে না। কারণ তাহা দ্বারা তাহার লাভের মূল্যও কমিয়া যাইবে, অথচ অন্য সকলের পক্ষে তাহা অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও ফাঁপাইর দিকে যে ঝোঁক দেখা যাইতেছে তাহা নিরোধ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ।"

উপসংহারে বড়লাট বলেন, "ভারতের শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলি নাই। ইহার কারণ এই নয় যে, এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে আমি চিন্তা করি না, অথবা ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি নাই। যুদ্ধ চলিতে থাকা কালে কোনরূপ রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান অসম্ভব, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই যে আমি এ সম্পর্কে নীরব আছি তাহাও ঠিক নহে এবং যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। আসল কথা হইল এই যে, এখানে এই-সব সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিলে উহাদের সমাধান সহজতর হইবে বলিয়া আমি মনে করি না।"

ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা, ইনফ্লেশন সমস্যা এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা—এই তিনটি একসূত্রে গ্রথিত। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অপরটির সমাধানের কোন উপায় নাই। বড়লাট যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা বেশী করিয়া বলিয়াছেন এবং রাজনীতি বাদ দিয়া অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে রাজনীতি ও অর্থনীতির অভিন্নতার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য মাত্র। এ দেশেও ভারত-শাসন আইনে রক্ষাকবচ বসাইয়া বিলাতী অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভারতরক্ষা আইনে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে এমন বহু আদেশ জারি হইয়াছে যাহার ফলে রাজনীতির সহিত বিন্দুমাত্র সম্পর্ক যাহাদের কোন কালেও ছিল না এবং নাই, তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সর্ জন হার্বার্টের ভীতিগ্রস্ত চিত্তের ফল নৌকাপসারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক কারণে প্রদত্ত এক অপ্রয়োজনীয় আদেশের ফলে কর্ম্মহীন হইয়া বাংলার লক্ষ লক্ষ মাঝি ও মৎস্যজীবী সপরিবারে অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহারই বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখা যায় সোভিয়েট রাশিয়ায়। দেশের রাজনীতি যেখানে জনসাধারণের রাজনীতি, মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ-প্রসূত রাজনীতি নয়, দেশের অর্থনৈতিক জীবন সেখানে দীর্ঘকালব্যাপী করাল সংগ্রামের মধ্যেও বিপর্য্যস্ত হয় না। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতির প্রয়োজনও সেখানে হয় না।

খাদ্য-সমস্যা, ইনফ্লেশন সমস্যা এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা—এই সব কয়টিরই কারণ রাজনৈতিক। যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কোন কথা বলিতে অস্বীকার করিলে কংগ্রেস এ যুদ্ধে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিল, মুসলিম লীগ সহযোগ ও অসহযোগের দুই নৌকায় পা দিয়া স্বার্থসিদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইল, হিন্দু-মহাসভা বিনাসর্ত্তে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিল যদিও কার্য্যতঃ কোন সাহায্য করিতে পারিল না। কংগ্রেসের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টকে অকাতরে অর্থ-ব্যয়ের পথ বাছিয়া লইতে হইল, কৃষকের নিকট দুই টাকায় ক্রীত দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ দালালকে দশ টাকা দিতে

হইল, নিছক টাকার লোভ দেখাইয়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্যপতিগণকে ভারত-সরকার দলে টানিতে পারিলেন। অতিরিক্ত লাভকর আদায় বন্ধ করা হইল, বড় বড় শিল্পগুলিকে নানা ভাবে সুবিধা দেওয়া হইল, দালালদের ক্রয়-কার্য্যের সুবিধার জন্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি হইল—ইনফ্লেশন অপরিহার্য্য। ৬০০ কোটি বাড়্তি টাকার মধ্যে এক শত কোটি পাইল কৃষক—অবশিষ্ট ৫০০ কোটি জমা হইল শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও দালালের ব্যাঙ্কে। মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারের দালাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ক্রয় করিতে পারিয়াছে, পারে নাই জনসাধারণ; আর ফাঁপ্তি টাকার ৬ ভাগের ৫ ভাগ জমিয়াছে ৩০।৪০টি ব্যাঙ্কে, অভিজ্ঞতা এবং ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে এই সত্যই প্রমাণিত হয়। গবর্ন্মেণ্ট আজ সম্পূর্ণরূপে এই শ্বেত ও কৃষ্ণ বণিক সম্প্রদায়ের করায়ত্ত। ফাটকাবাজি ও মাল আটক করা অবাধে চলিতেছে এই সংবাদ জানিয়াও ফাঁকা আওয়াজ করা ভিন্ন তাঁহাদের কোন উপায় ন'ই, ইহাদিগকে চিনিয়া এবং জানিয়াও ধরিয়া শাস্তি দিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা গবর্ন্মেণ্টের আছে বলিয়া মনে হয় না।

—

যুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় আমেরিকান বিমান-ঘাঁটির ভবিষ্যৎ

এশিয়া ও আফ্রিকায় বর্তমান যুদ্ধের প্রয়োজনে আমেরিকা যে-সব বিমান-ঘাঁটি নির্মাণ করিতেছে যুদ্ধের পর সেগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে এ সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন, মিঃ রুজভেল্ট তাঁহাদের সন্দেহ মোচন করিয়াছেন। আমেরিকান কংগ্রেসে উপস্থাপিত ত্রয়োদশ ঋণ ও ইজারা রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন, "পৃথিবীর সর্বত্র সামরিক ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে-সব বিমান-ঘাঁটি নির্মিত হইয়াছে ভবিষ্যতে ঐগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে সে প্রশ্নের বিচার করিতে গেলে ঋণ ও ইজারা ছাড়াও আরও অনেক কথা ভাবিতে হইবে। যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সম্মিলিত জাতিসমূহ একযোগে কার্য্য করিয়া সাফল্য অর্জন করিলে এবং আমেরিকা ও অন্যান্য সম্মিলিত জাতি উভয়ের স্বার্থ রক্ষিত হইবে এমন একটি সামরিক নিরাপত্তার আয়োজন করা হইলে তখনই এই প্রশ্নের শেষ ও সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যাইবে।". অর্থাৎ শুধু বর্তমান যুদ্ধে নয়, পরেও সামরিক ও বিদেশী বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই সব ঘাঁটি সক্রিয় থাকিবে। সম্মিলিত জাতি বলিতে যে শুধু ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া বুঝায়—জেনারেল স্মাটস্ ও মিঃ ইডেন ইহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার পর রুজভেল্টের রিপোর্টে ভারতবাসী আর এক অদৃশ্য বিপদেরই ইঙ্গিত দেখিতে পাইবে।

—

পেট্রোল কোথায় যায়?

ভারতবর্ষে পেট্রোলের অভাবের প্রকৃত কারণ রুজভেল্টের উল্লিখিত রিপোর্টেই জানা গিয়াছে। রিপোর্টের এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "মধ্য-এশিয়ায় ব্রিটেনের বৃহত্তম পেট্রোলের কারখানা আবাদানে এত খনিজ তৈল উদ্বৃত্ত ছিল যে উহা রাখিবার স্থানাভাব ঘটে। ঐ সমস্ত তৈল তখন পুনরায় পাম্প করিয়া খনির মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ব্যবসায়ের দিক দিয়া ইংরেজের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর, কিন্তু ইহাতে তৈলবাহী জাহাজে স্থান বাঁচিয়াছে।"

আবাদানের এই কারখানাটি ১৯৪১-এর শেষের দিকে অনেক বাড়ানো হয় এবং এখনও উহা ক্রমাগত বড়োনো হইতেছে।

জাহাজের অভাবে ভারতবর্ষের কয়েক শত মাইলের মধ্যে অবস্থিত খনি হইতে তৈল আসে না এবং উহার ফলে জনসাধারণের যানবাহন, বাস ও লরী প্রায় অচল হইয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে, এমন কি জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও সিদ্ধিয়ার কারখানা বাড়াইয়া সেখানে কতকগুলি তৈলবাহী জাহাজ নির্মাণ করাইয়া লইলে বাস ও লরীগুলি সচল থাকিতে পারিত, রেলের উপর অযথা চাপ পড়িত না, জনসাধারণেরও আয়ের একটি পথ সঙ্কুচিত হইত না।

—

বাংলার নূতন গবর্ণর

মিঃ রিচার্ড কেসি নামক জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদ্ বাংলার গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের বাহিরে কোন দেশ হইতে বড়লাট বা গবর্ণর প্রেরণ, ভারতবর্ষে অথবা অন্যান্য ডোমিনিয়নেও, বোধ হয় এই নূতন। দেশের লোককে বড়লাট বা গবর্ণর পদে নিযুক্ত করা ইতিপূর্বে অবশ্য ঘটিয়াছে। এই নিয়োগে ভারতবাসী ও বাঙালী আপত্তি করিয়াছে বিশেষভাবে এই কারণে যে, যে অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতবাসীর প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ সেই দেশের এক ব্যক্তিকে প্রাদেশিক লাটের পদে নিযুক্ত করা সমগ্র ভারতবর্ষের অপমান। এই মৌখিক প্রতিবাদে ব্রিটিশ-গবর্ন্মেণ্ট বিচলিত হন নাই, অথবা কেসি সাহেবও পদত্যাগ করেন নাই। কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষের কয়েকটি উচ্চ পদে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী নিয়োগ সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রতিবাদ উঠিয়াছিল এবং ভদ্রতার খাতিরে ইহারা পদত্যাগ করিয়াছিলেন। মিঃ কেসির নিয়োগে প্রমাণ হইল যে,

কাল আমেরিকা হইতে বাংলার লাট সংগ্রহ করিয়া আনিলেও উহা অস্বাভাবিক মনে করা চলিবে না।

গবর্ণর পদে নিয়োগের পূর্বে মিঃ কেসি মধ্য-এশিয়ায় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রতিনিধি ছিলেন। অথচ এই নিয়োগে তিনি তাঁহার সন্তোষ চাপিতে পারেন নাই, এমন কি এইরূপ বড় বড় পদে আরও অষ্ট্রেলিয়ান নিয়োগের আবেদনও মিঃ চার্চিল সমীপে পেশ করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ বাংলার লাটগিরিকে সম্মান ও অর্থের দিক দিয়া ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মন্ত্রিত্ব অপেক্ষাও লোভনীয় মনে করেন এরূপ লোকের অভাব নাই। ইহার অন্ততঃ একটি প্রকাশ্য প্রমাণও পাওয়া গেল।

মিঃ কেসির সব চেয়ে বড় যোগ্যতা-স্বরূপ আমেরী সাহেব বলিয়াছেন যে মধ্য-এশিয়ায় মাল ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে তাঁহার অভিজ্ঞতা খুব বেশী। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলা দেশ হইতেও যুদ্ধের প্রয়োজনে দোহন কার্য্যটি যাঁহার দ্বারা সব চেয়ে ভাল চলিতে পারিবে বলিয়া মিঃ চার্চিল ও মিঃ আমেরী মনে করিয়াছেন সেইরূপ এক জনকেই বাছিয়া পাঠানো হইতেছে। বাংলা দেশের ভরসা করিবার কিছু নাই, আশঙ্কার কারণই বরং আছে বলা চলে। কেসি সাহেব অবশ্য আশা দিয়াছেন যে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ঘাঁটি বাংলাকে তিনি শান্তিপূর্ণ করিবেন, কিন্তু বিলাতী শান্তির নামে যে বস্তুর সহিত বাংলার পরিচয় ঘটিতেছে সেটা শ্মশানের শান্তি, ভারতবাসীর চিরন্তন তৃপ্তি নয়।

—

খাদ্য-সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ও বাংলা-সরকারের মতভেদ

বাংলার খাদ্য-সমস্যা সমাধানে বর্তমান গবর্ন্মেণ্টের অক্ষমতা শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে। জনসাধারণ ইহাদের উপর আস্থা হারাইয়াছে ইহা মন্ত্রীরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং লুপ্ত আস্থা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। ৫ই জানুয়ারি এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বাংলার খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন, "গবর্ন্মেণ্ট জনসাধারণের লুপ্ত আস্থা পুনরানয়নের জন্য চাউল ক্রয় করিতেছেন।" (Government purchases are being made for the purpose of *restoring* confidence.)

সর্ জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কয়েক বার কলিকাতায় আসিয়া বাংলা-সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থাহীনতা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব এই অযোগ্য-অকর্মণ্য মন্ত্রিমণ্ডলের উপর ফেলিয়া না রাখিয়া অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের যে দাবি প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে উঠিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। ফলে ২৩শে ডিসেম্বর ভারত-সরকার ভারতশাসন আইনের ১২৬এ ধারা অনুসারে কলিকাতার বরাদ্দ-ব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলা-সরকারকে কতকগুলি নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বাংলা-সরকারকে ১৯৪৪ সালের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্তনের জন্য খুচরা দোকান খুলিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সরকারী দোকান (সরকারী টাকায় এবং সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত) এবং এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্বাচিত সাধারণ খুচরা দোকানও এই দোকানগুলির অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার মধ্যে কতকগুলি খুচরা দোকান কলিকাতা শহরে খোলা হইবে। বাংলা-সরকার বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্তনের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কলিকাতার সাধারণ খুচরা দোকানগুলিকে তাহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

এই সব দোকানের মধ্যে শতকরা ৫৫টি বে-সরকারী এবং অবশিষ্ট ৪৫টি সরকারী দোকান হইবে।

বাংলা-সরকার বরাবরই মুষ্টিমেয় এজেন্টের মারফৎ চাউল ক্রয় করিতে চাহিয়াছেন, সরকারী এজেন্টের প্রতিযোগীরূপে সাধারণ ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা রাখিতে দেন নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করিয়া কেবলমাত্র এজেন্টদের সাহায্যে এই বিরাট প্রদেশের সর্বত্র চাউল সরবরাহ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সর্ জোয়ালাপ্রসাদ এই তিক্ত অভিজ্ঞতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সরকারী এজেন্ট বা দোকানের প্রতিযোগীরূপে সাধারণ দোকান খোলা রাখিবার আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, ভারত-সরকারের আদেশ ইহার প্রমাণ।

বাংলা-সরকারের ভ্রান্ত নীতি সংশোধনের যে চেষ্টা সর্ জোয়ালাপ্রসাদ করিয়াছেন, মন্ত্রীরা তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই নানাভাবে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। মিঃ সুরাবর্দী ইহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন কিন্তু প্রকাশ্য প্রতিবাদে সাহসী হন নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা-সরকার চাউল ক্রয়ের জন্য যে ক্রমহ্রাসমান মূল্যের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। এবারও ঠিক ঐ পদ্ধতিতে চাউল সংগ্রহের যে-চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন তাহাও এখনই ব্যর্থ হইয়াছে। নূতন ধান উঠিবার এক

মাসের মধ্যেই কোন কোন জেলা হইতে সংবাদ আসিতেছে যে, ম্যাজিষ্ট্রেট চাউলের সরকারী মূল্য কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজার হইতে চাউল অদৃশ্য হইতেছে। ৫ই জানুয়ারির বিবৃতিতে মিঃ সুরাবর্দী নিজেই বলিয়াছেন যে, গবর্মেণ্ট "কম দামেই" আমন ফসল ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কত দামে এই ক্রয়কার্য্য চলিতেছে তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতায় খাদ্য-সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই বাংলা-সরকারকে খুব বেশী কিছু ক্রয় করিতে হইবে না। ফলে গ্রামের চাউল গ্রামেই থাকিবার কথা। বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানীও যখন বন্ধ হইয়াছে, তখন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র স্বাভাবিক বাণিজ্যের পথ খুলিয়া দিতে এত আপত্তি কেন? আমরা বার বার বলিয়াছি স্বাভাবিক বাণিজ্য অব্যাহত রাখিয়া অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার বন্দোবস্ত করিলে চাউলের দর অস্বাভাবিক হারে বাড়িতে পারিবে না। তবে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে হইলে একটি সৎ ও কর্ম্মী পুলিসবাহিনী গঠন সর্বাগ্রে আবশ্যক।

কলিকাতায় তিনটি কমার্স চেম্বার এক যুক্ত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, বাংলা-সরকার ৪০০ বে-সরকারী দোকানের প্রত্যেককে ১৫০০ করিয়া এবং ৪৫০ সরকারী দোকানের প্রত্যেককে ৩০০০ করিয়া রেশন কার্ডের মাল সরবরাহের ভার দিতে চাহিতেছেন। ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার জন্য ইহারা এখনও সক্রিয় রহিয়াছেন।

বঙ্গীয় কোয়ালিশন দলের বিবৃতি

বোম্বাই ও মাদ্রাজের নাম-না-করা দুইখানি সংবাদপত্রে নয়াদিল্লীর একটি সংবাদ প্রকাশ উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয় কোয়ালিশন দলের যুগ্ম-সম্পাদক যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীরা স্বয়ং অন্তরীক্ষে আছেন বটে, কিন্তু দলের সেক্রেটারীদ্বয় সর্ জোয়ালা-প্রসাদের প্রতি যে বিষোদ্গার করিয়াছেন তাহার দায়িত্ব তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। বিবৃতিটির যতখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, গুরুত্ব বোধে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :

"আমরা নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্তব্য বোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যদি বাংলার প্রাদেশিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন, তাহা হইলে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিকল্পনার বিঘ্ন উৎপাদনের উপক্রম করিয়াছেন। উহার ফলে যদি বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার বা যাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নামে খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহারাই বাংলার লোকের সম্ভাবিত প্রাণহানি এবং দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী হইবেন।

"ভারত-সরকারের রাজধানী নয়াদিল্লীস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত বোম্বাইয়ের একখানি এবং মাদ্রাজের একখানি সংবাদপত্রে প্রেরিত কতকগুলি বার্ত্তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বার্ত্তাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে উহার পিছনে ভারতের সহিত জড়িত কোন কোন লোক রহিয়াছেন। বাংলার মন্ত্রিসভাকে একটা বদনাম দিবার উদ্দেশ্যেই যে এই প্রচারকার্য্য করা হইতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠিক কে কে ইহার মধ্যে আছেন তাহা আমরা জানি না; তবে কি না আমরা সন্দেহ না করিয়া পারিতেছি না যে, বড়লাটের শাসন-পরিষদে হিন্দু মহাসভার যে প্রতিনিধি রহিয়াছেন, ঐ প্রচারকার্য্যের মধ্যে তাঁহার অভিমত প্রতিফলিত হইয়াছে। বাংলার খাদ্য-সমস্যার আভ্যন্তরীণ পরিচালনা সম্পর্কে মন্ত্রিমণ্ডল সম্বন্ধে বিরোধীদল যে মনোভাব পোষণ করেন উক্ত সদস্য মহাশয়ের মনোভাবের সহিত তাহার বিস্ময়জনক মিল রহিয়াছে। ঐ সব বিশেষ সংবাদদাতাকে বলা হইয়াছে যে, (১) বাংলায় আমন ফসল আহরণের এমন কোন ব্যবস্থা হয় নাই যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আস্থার সঞ্চার হইতে পারে; (২) বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে আগে খাদ্য মজুদ করা প্রয়োজন; কিন্তু তাহা করা হয় নাই; (৩) খাদ্যশস্যের ব্যবসায় মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্যই বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল ব্যস্ত; (৪) ওয়াকেবহাল মহল মনে করেন যে বাংলার অবস্থা ভাল না হইলে ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করা হইবে। প্রথম দফা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য—আমরা যত দূর জানি, স্যার জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং কোন কোন সংবাদপত্র এবং একশ্রেণীর রাজনৈতিক যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সে অভিমত সম্পর্কে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, আমন ফসল আহরণে বাংলা-সরকার যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা বিন্যাস করিয়াছেন তাহা তলে তলে ব্যর্থ করিবার জন্য মতলব আঁটা হইয়াছে। খাদ্য আহরণে এরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিলে যাহারা বাংলায় দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধানতঃ দায়ী, তাহারাই সুবিধা পাইবে।

"দ্বিতীয় দফা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইবার ভার লইয়াছেন। এমত অবস্থায় বাংলা হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া মজুত করার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। যাহারা উক্ত বার্ত্তার উস্কানি দিয়াছেন তাঁহারা ঐ প্রশ্ন তুলিয়াছেন দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

"তৃতীয় দফায় আসল কথা ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যত দূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, বাংলা-সরকার যে কয়টি মুসলমান দোকান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তুলনায় তাহা খুবই কম। কিন্তু এই সামান্যসংখ্যক মুসলমান দোকান লওয়াটাও নয়াদিল্লীস্থ হিন্দু-মহাসভার প্রতিনিধির পক্ষে অসহ্য। এমত অবস্থায় বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলকে সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা নিছক হীনতা। কেননা অপরপক্ষই এই দোষে দোষী। আশ্চর্য্যের কথা এই, নয়াদিল্লীর সরকারী মহল অকস্মাৎ সাম্প্রদায়িকতার উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ আমরা এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না। হয়ত এক দিন সময় আসিবে যে-দিন ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য কে দায়ী, সে সম্পর্কে আমাদিগকে বিস্তারিত কথা বলিতে হইবে।"

অতঃপর সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া বিবৃতিদাতাদ্বয় চতুর্থ

দফা সম্পর্কে বলেন —"স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, স্বার্থলুব্ধ ব্যক্তিবর্গ নয়াদিল্লীর সরকারী মহলস্থ বন্ধুদের সাহায্যে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলের অবসান ঘটাইবার জন্য একটা কিছু খাড়া করিবার চেষ্টায় আছেন। নয়াদিল্লীর কর্তাদের হস্তক্ষেপে বাংলার দুর্গতি মোচন বন্ধ হইবে এবং তাহা হইলেই বাংলার দুর্গতি দূর হইল না। এই ধুয়া ধরিয়া ভারতরক্ষা বিধানের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করা যাইবে। আমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখিতে পারি যে, আগেও আমরা বে-সরকারী দলেই ছিলাম; কাজেই ৯৩ ধারাকে আমরা ডরাই না। পক্ষান্তরে ঐ ধারা প্রয়োগ করা-হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মূল্য কতটা, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে। আমাদের মনে হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যসচিব স্যার জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব খাদ্য ব্যাপারে রাজনীতি আমদানী করিয়া অযথা প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত কলহ খোঁচাইয়া তুলিতেছেন। সুতরাং যিনি অধিকতর আস্থার সঞ্চার করিতে পারেন, এরূপ কোন ব্যক্তির উপর খাদ্যদপ্তরের ভার দিয়া তিনি যত শীঘ্র সরিয়া পড়েন; সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল।"—এ. পি.

কোন প্রমাণ না পাইয়াও মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে প্রকাশিত সংবাদ প্রচারের দায়িত্ব সর্ জোয়ালাপ্রসাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে। সংবাদদাতা যে চারিটি কারণ দেখাইয়াছেন তাহার কোনটিই মিথ্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। (১) বাংলায় আমন ফসল আহরণ-ব্যবস্থা গত সেপ্টেম্বরে এবং আউস ফসলের ন্যায় এবারও এখনই ব্যর্থ হইয়াছে। উহা সফল হইয়াছে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া মন্ত্রীরাও ইহা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। জনসাধারণের লুপ্ত বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের জন্যই যদি চাউল ক্রয়ের প্রয়োজন হয় তবে উহার পরিমাণ ও দর দুই-ই প্রকাশ্যে জানানো দরকার। গত দুর্ভিক্ষে ঘাটতি মজুত ও সরবরাহের কথা প্রকাশে যখন ভারত রক্ষায় ব্যাঘাত ঘটে নাই, তখন এবার উহাতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি যখন জাপানী আক্রমণের কোন আশঙ্কা আর করেন না, তখন জেলায় জেলায় কোথায় কত চাউল আছে সেই পরিমাণগুলি সঠিক ভাবে জানাইয়া দিলে লুপ্ত বিশ্বাস পুনরুদ্ধারে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

(২) রেশনিং প্রবর্তনে বাংলা-সরকার প্রায় এক বৎসর ধরিয়া গড়িমসি করিতেছেন। কলিকাতায় রেশনিং অক্টোবরে আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রথমে বলা হইয়াছিল। তারপর হইতে ক্রমাগতই উহা পিছাইতেছে, বাংলা-সরকারের ফসল সংগ্রহে অক্ষমতার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে কলিকাতার ভার গ্রহণ করিতে হইল ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। রেশনিং আরম্ভের তারিখটিও কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাংলা-সরকারের যে কাজ করিবার কথা, তাহা আজ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ হয় নাই, রেশন কার্ড বিতরণ এখনও শেষ হয় নাই।

(৩) খাদ্যশস্যের ব্যবসায় মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্যই বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল ব্যস্ত, এই অভিযোগের যে জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নহে। ইস্পাহানী কোম্পানীর কথা বাঙালী ভুলিয়া যায় নাই। কয়টি দোকান নয়, কত টাকার কাজ বাংলা-সরকার মুসলমান এজেন্টদের এবং কতটা হিন্দু বা শ্বেতাঙ্গ এজেন্টদের দিয়াছেন, ঐ সঙ্গে কাহাকে কত কোটি টাকা আগাম দেওয়া হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ না করিলে এই অভিযোগ উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

(৪) সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ধুয়া ধরিয়া বর্তমান মন্ত্রীরা সর্ জন হার্বার্টের সহায়তায় মন্ত্রীর মসনদে বসিয়াছেন। সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন তাঁহারা করেন নাই। পূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলে ছিলেন ৯ জন মন্ত্রী ও জনা-তিনেক মাত্র পার্লামেণ্টারি সেক্রেটরী, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলে ১৩ জন মন্ত্রী ও প্রায় দেড় ডজন পার্লামেণ্টারি সেক্রেটরী। তফাৎ এই, পূর্ব মন্ত্রিমণ্ডল ছিল ইউরোপীয় দল নিরপেক্ষ, আর ইঁহারা শ্বেতাঙ্গদলের মুখাপেক্ষী, সিভিলিয়ান কর্মচারীদের হস্তচালিত পুত্তলিকা। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যাঁহাদের মুখপাত্ররূপে ইঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে জনপ্রিয়, প্রতিনিধিমূলক সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল নহে ইহা এই মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ইতিহাস হইতে বুঝা যায়। সুতরাং ৯৩ ধারার প্রয়োগের কথা উত্থাপন এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের নামে আমেরিকার অভিযোগ

আমেরিকার এটর্নি-জেনারেল নিউ ইয়র্কের জেলা আদালতে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ, আমেরিকান দুপোঁ কর্পোরেশন এবং রেমিংটন আর্মস কোম্পানীর নামে এই মর্মে অভিযোগ আনিয়াছেন যে ইহারা রাসায়নিক দ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের স্বাভাবিক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি করিয়া আমেরিকার ট্রাষ্ট-বিরোধী আইন ভঙ্গ করিয়াছে। সহকারী এটর্নি-জেনারেল ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল এবং দুপোঁর নামে আরও মারাত্মক অভিযোগ তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহারা উভয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে এবং শত্রুকে সাহায্য করার ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট আছে। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের চেয়ারম্যান লর্ড ম্যাক গাওয়ান এই সব উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভারত-সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট এই একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের রাসায়নিক শিল্পের কম ক্ষতি করে নাই। কিন্তু এদেশে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ

রুদ্ধ করা বর্তমান আইনে বে-আইনী নহে। কোটিপতি বিলাতী একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা শিশুশিল্পকে পিষিয়া মারিলেও ভারতবাসীর পক্ষে বাধা দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

—

অতিলোভী ফাটকাবাজদের ধরিবার জন্য গবর্মেণ্ট কি করিয়াছেন ?

১৯৪৩ সালের ১০ই মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্তমান মন্ত্রিদলের অন্যতম সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন :

"আজ গবর্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি : চাল গেল কোথায় ? তাঁরা বলেছেন ২৫% চাল কম উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু দাম বেড়েছে ৫০০% ; এত বাড়্‌ল কেন ? Hoarding বন্ধ করবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ? Political absconder-দের ধরবার জন্য এবং political unrest কমাবার জন্য যে ব্যবস্থা করা আছে সেই ব্যবস্থা কি সর্বনেশে hoarderদের ধর্‌বার জন্য করা যায় না ? সেই তৎপরতা অবলম্বন করা হয়েছে কি না জান্‌তে চাই। একটা political absconder সমাজের কতটুকু অন্যায় কর্‌তে পারে ? কতটুকু চাঞ্চল্য আন্‌তে পারে ? কিন্তু এই সব ঘৃণ্য সমাজদ্রোহী, দেশের শত্রু এদের যেমন ক'রে হোক খুঁজে বের করতে হবে, প্রকাশ্য রাস্তায় এদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। রাস্তায় কুকুর দিয়ে খাওয়াতে হবে। এমন শাস্তি দিতে হবে যা কল্পনা করতে এদের প্রাণ শুকিয়ে যাবে—এরা পাগল হয়ে যাবে। এমনি একটা কি দুটো—বাকীগুলো এই দেখে শিক্ষা পাবে। আমি মনে করি আজও যে চাল বাংলায় আছে, তা যদি সমানভাবে বেঁটে দেবার ব্যবস্থা করা যায় তবে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।"

কোয়ালিশন দলের সম্পাদকরূপে নয় মাস কাজ করিবার পর ইনি এ বিষয়ে কত দূর কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করাইতে পারিয়াছেন ?

ঐ দিনই শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রকাশ্যে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে অসাধু এবং ঘুষখোর সরকারী ও বে-সরকারী লোকেরাই জনসাধারণের দুর্দশার জন্য দায়ী। তাঁহার সঠিক উক্তিটি এই :

"আজ আমি বলিতে চাই খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক অনুসৃত নীতি এবং তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। একদল অসাধু চরিত্রের লোকের জন্য এবং উৎকোচগ্রহণকারী কতকগুলি সরকারী ও বে-সরকারী লোকের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক মহাজন ও ব্যবসায়ী প্রফিটিয়ারিং করে একথা সত্য কিন্তু আমি বলিব মন্ত্রি-মণ্ডলীর কতিপয় সভ্য থেকে আরম্ভ করে তাহাদের কতিপয় সমর্থকগণ এবং উর্দ্ধতম সরকারী কর্মচারী থেকে নিম্নতম কর্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই মূল্য-সরবরাহ ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে অতি জঘন্যভাবে প্রফিটিয়ারিং করে। আজ তারা বাংলার লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলিতেছে।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রায় নয় মাস যাবৎ বাংলার মন্ত্রী হইয়াছেন। ঘুষখোর কর্মচারীদের ধরিবার এবং অসাধু বে-সরকারী লোকদের সংযত করিবার জন্য তিনি কি করিয়াছেন ?

মিঃ সিদ্দিকী বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াই আমি বলিতেছি যে দীর্ঘসূত্রিতার দ্বারা শুধু যে ফাটকাবাজ প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, বিভাগীয় কর্মচারীরাও ইহাতে প্রশ্রয় পাইয়াছে। যাহারা লাইসেন্স এবং প্রায়রিটি সার্টিফিকেট দেয় তাহাদের এবং চতুর ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। ইহা সত্ত্বেও বলা হয় যে কেবল অতিলোভী ব্যবসায়ীরাই চোরা বাজার সৃষ্টি করিতেছে। সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগের অর্থই চোরাবাজার এবং জনসাধারণের দুর্দশা ইহার পরিণাম।...প্রত্যেকটি চাউলের কণা কোথায় যায় এবং কোথায় উহা রাখা হয় ব্যবসায়ীরা তাহা জানে। অযোগ্য এবং অনভিজ্ঞ বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দ তাহাদের আটক করা মাল বিক্রয় না করা পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীরা উহা ধরিয়া রাখিতে জানে। ৫০ লক্ষ টাকা তাহাদের নিকট মশার কামড়, কলিকাতায় এমন ব্যবসায়ীও আছে যাহারা ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারে।"

মিঃ সিদ্দিকীর দলের লোকেরা মন্ত্রী হইবার পর ফাটকাবাজ ও ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীদিগকে ধরিবার জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আজও জানা যায় নাই।

—

দুর্ভিক্ষপীড়িত নারীদের অবস্থা

"দুর্ভিক্ষপীড়িত নারীদের অবস্থা কত দূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীমতী এলা রীডের নিয়োদ্ধৃত বিবৃতি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় :

"দুর্ভিক্ষজনিত অনাহারের ফলে বাংলার পল্লী অঞ্চলের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকদের স্বাস্থ্যহানির জন্য কর্মক্ষমতা লোপ পাইয়াছে ; গ্রামগুলিতে

আজ কেবল অভিভাবকহীন কতকগুলি বিধবা, অল্পবয়স্কা বালিকা ও অনাথ শিশু ছাড়া আর কিছুই নাই। সরকারী লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ হইয়াছে, ফলে গ্রামের মেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় এক মুষ্টি অন্নের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইতেছে। চাঁদপুরে নৌকা বোঝাই করিয়া মেয়ে আনিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। এই সমস্ত মেয়ের মধ্যে অধিকাংশের বাড়ী যশোহরে। শুধু এই স্থানেই নহে—চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার অবস্থাও অনুরূপ। ইহার ফলে দেশের সমাজ-জীবন ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িতেছে। এই অধঃপতনের হাত হইতে বাংলার নারী সমাজকে বাঁচাইবার জন্য আমি সমস্ত জন-প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন জানাইতেছি। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সামর্থ্য খুবই অল্প, তবুও এই সব দুঃস্থ নারীকে পুনরায় সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বঙ্গীয় মহিলা খাদ্যসমিতির সহযোগিতায় তাহাদের অক্ষর-পরিচয়, ধাত্রীবিদ্যা, কুটিরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই বিষয়ে আমি সকলের নিকট হইতে সহযোগিতা কামনা করিতেছি।”

অন্যান্য সাহায্য সমিতিগুলিও এই গুরুতর বিষয়টি সম্বন্ধে উপযুক্ত মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গত কয়েক মাস যাবৎ আমরা এই সমস্যাটির প্রতি দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি।

—

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তপশীলদের বিরোধিতা

তপশীলী সম্প্রদায়গুলির নিখিল-ভারত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতির এক বৈঠকের সভাপতিরূপে ডাঃ মাণিক-চাঁদ এম-এল-এ (আগ্রা) পাকিস্তান প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, “ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীদের পক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এই মারাত্মক প্রস্তাবে তপশীলী সম্প্রদায় কোনরূপ সাহায্য করে ইহা আমি চাই না। তপশীলী সম্প্রদায়ই ভারতের আদিম অধিবাসী। তাই নিজের মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিতে সাহায্য করা অপেক্ষা তাহাদের পক্ষে বেশী নিন্দনীয় কাজ আর কি হইতে পারে?” হিন্দু সমাজ হইতে তপশীলী সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টারও তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলেন, আমরা কোন পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে স্থান পাইতে চাহি না। আমরা শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে সাহায্য করিব না।”

সকল ধর্ম জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক লইয়া অখণ্ড অবিভক্ত ভারতবর্ষ গঠনই যে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ এই সত্য যত শীঘ্র সকল সম্প্রদায় অনুভব করেন ততই মঙ্গল।

—

দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ডারবান মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে (যাঁহারা সেখানে বসবাস করিতেছেন) বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদে কলিকাতা কর্পোরেশন সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের কাহাকেও কলিকাতা করপোরেশনে চাকুরী দেওয়া হইবে না অথবা করপোরেশনের অধিকারভুক্ত কোন জমি সেখানকার কোন ইউরোপীয় বাসিন্দাকে লীজ দেওয়া অথবা বিক্রয় করা হইবে না।

মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিকি প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন,—সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ট্রান্সভালের একটি করপোরেশনের একজন সদস্য নাকি বলিয়াছেন, তিনি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে ভারতীয় সদস্যদের সহিত একসঙ্গে বসিতে অপমান বোধ করেন। মিঃ সিদ্দিকি বলেন যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যদি ব্যাপারটি যথাযথভাবে দেখিতেন তাহা হইলে এই প্রস্তাব আনয়নের কোন প্রয়োজনই থাকিত না। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার ফিল্ড মার্শাল প্রধান মন্ত্রীবরের সম্মুখে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের যে রকম ক্লীবত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে তাহাতে তাঁহাদের সম্বন্ধে মিঃ সিদ্দিকি কোন আশাই পোষণ করেন না—তবুও যদি দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ইংরেজ হইতেন। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট এই ব্যাপার লইয়া কিছুই করিতেছেন না এবং কি করিবেন তাহা জানা নাই।

সারা বাংলার সমস্ত মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড যেন অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সভায় সেই মর্মে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রকৃত জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবাসী ভারতবাসীর বিরুদ্ধে অন্যায় অবিচার বন্ধ হইবার উপায় নাই।

—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

সর্ব্বজনপ্রিয় মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক-গমনে ভারতাকাশের এক দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক অন্তর্হিত হইলেন। বিশ্বমানবের ঘোর দুর্দ্দিনে—বিশেষতঃ ভারতের জাতীয় জীবনের এই নিদারুণ সন্ধিক্ষণে—আমরা এক অকৃত্রিম বন্ধু হারাইলাম।

প্রায় ষাট বৎসর হইল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তিনি আমাপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের বড় ছিলেন। পঠদ্দশায় বয়সের সামান্য প্রভেদ সত্ত্বেও তাঁকে শ্রদ্ধা অর্পণ না ক'রে পারি নাই। যৌবন-উষায় মানবজাতির কল্যাণের জন্য স্বদেশহিতকর যে-সকল শুভকামনা তাঁর হৃদয়ে জেগেছিল, আমরা সেই সময়েই তাঁর কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছি। সরল রেখার ন্যায় তাঁর জীবন সেই আদর্শের সম্মুখে অবিচলিত পদে অগ্রসর হয়েছিল। স্বদেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য তাঁর চেষ্টা দেখেছি। নানা ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অসাধারণ ছিল। শুধু বাংলা দেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরেও তাঁর যশ প্রচারিত। সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অতুলনীয় ছিল এ কথা অত্যুক্তি নয়। তাঁর জীবনের যে বৈশিষ্ট্য প্রথম যৌবন হ'তে দেখেছি, তা ছিল নির্ভীকতা ও ন্যায়পরায়ণতা। এক দিকে পর্ব্বতের ন্যায় অটল, আর এক দিকে সুকোমল পুষ্পের ন্যায় মাধুর্য্যে পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। তিনি স্বদেশবৎসল ছিলেন। তাঁর স্বদেশ-বাৎসল্যের ভিতরে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। নিরপেক্ষ স্বদেশহিতৈষণার ভিতরে নিঃস্বার্থ এবং বাহ্যাড়ম্বর-শূন্য ঐকান্তিক কল্যাণকামনা দেখেছি। যাঁরা তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁরা জানেন তিনি কি সুমিষ্ট সুন্দর বক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় তরঙ্গবিক্ষেপ ছিল না, কোন রূপ দম্ভ থাকত না। আর এক কথা, তিনি কোন সাম্প্রদায়িকভাবে কখনও পরিচালিত হন নি। ব্রাহ্ম ছিলেন ভেবে তিনি গৌরব বোধ করতেন, কিন্তু আমি অবিসম্বাদিত ভাবে বলতে পারি, সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মধ্যে ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে, তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেছে। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে নির্ভীকভাবে তিনি সত্য কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন সুমিষ্ট ভাব ছিল যে সকল বৈরিতা দূর হয়ে যেত। সাহিত্যিকদের মনো-রাজ্যেও তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। বিনয় তাঁর জীবনের ভূষণ ছিল। অসাধারণ গুণী ছিলেন, অশেষ গুণাবলী জীবনকে অলঙ্কৃত করা সত্ত্বেও জীবন বিনয়ে শোভিত ছিল। নির্ভীকতার সঙ্গে মাধুর্য্যের আশ্চর্য্য সমাবেশ এই মহাত্মার জীবনে দেখেছি—সত্য-পরায়ণতা, সুস্পষ্ট বচন অথচ সদাশয়তাভরা।

তাঁর আদর্শ ছিল সত্য। সর্ব্বদা সত্য বলতেন। কোন রাজনৈতিক বিশেষ মন্ত্র গ্রহণ ক'রে, বিশেষ দলের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর পত্রিকা পরিচালন করেন নি। সাহিত্যজগতে "মডার্ন রিভিউ"এর প্রভাব অসাধারণ। জগতের সর্ব্বত্র কি ব্যাপার ঘট্‌ছে তা সরলভাবে বর্ণনা করতেন এবং তাদের কি ত্রুটি, কোথায় কি গলদ আছে তা সুস্পষ্ট ও নিরপেক্ষভাবে দেখিয়ে দিতেন। রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে শাসনকর্ত্তাদের ত্রুটি গলদ নির্ভীকতার সহিত দেখিয়েছেন অথচ এ কথাও বলতে শুনেছি—আমরা অনেক সময়ে নিজ কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে সকল ত্রুটি শাসন-কর্ত্তাদের উপর চালিয়ে দিতে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত হই। সত্য ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, সত্যের জয় তিনি সতত অকুণ্ঠিতভাবে ঘোষণা করেছেন।

তার পর মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি—আধ্যাত্মিকতা—তাঁর জীবনে কি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছিল—সে বিষয় অনেকের জানবার সুযোগ হয়ত হয় নি। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু এ কথাতেই তাঁর উন্নত ধর্ম্মজীবনের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হ'ল না। তিনি ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ। ব্রহ্মে সঞ্জীবিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্মসাধন করেছেন—তাই তাঁর হৃদয় এত সরসতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর জীবনের সকল উদ্দীপনা, সকল শক্তি, সকল গুণাবলীর মূল প্রস্রবণ ঐখানেই। বিশ্বপতির পতাকা বহিবার আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি তাঁর ছিল, ও সেই শক্তি তিনি আজীবন ব্রহ্মের আদেশে তাঁরি কার্য্যে নিয়োগ করেছেন—নীরবে পুণ্যময় জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে ভালবাসতেন কেন? তার উত্তরে দ্বিধাশূন্য হয়ে বলেছেন,—"ব্রাহ্মসমাজ ক্ষুদ্র—কিন্তু বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সমার্থক নয়। ক্ষুদ্রেও মহত্ত্বের মহাশক্তির

বীজ লুক্কায়িত থাকে—যে বটগাছ বড় হয়ে কত পথিককে ছায়া, কত পক্ষীকে আশ্রয় ও খাদ্য দেয়, তার বীজ অতি ক্ষুদ্র। আদিতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ক্ষুদ্র ছিল। আমরা ক্ষুদ্র হলেও বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষের ও নিখিল-বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্তে।"* এই মহান্ ব্রাহ্মধর্ম্মের ছায়ায় থেকে—এর আদর্শে দৃঢ়-বিশ্বাসী হয়েও তিনি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করে বলেছেন, "ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য সমন্বয় ও সদ্ভাব আমরা চাই, তা কোন রফা বা চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে নয়, প্রত্যুত শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে।" * কি আদর্শের বিশালতা ও হৃদয়ের উদারতা!

তাঁর দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমরা পরিচয় পেয়েছি তাঁর জীবন কিরূপ সুসঙ্গত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। সেই ধর্ম্মানুগত জীবনের প্রত্যেক কাজই ব্রহ্মে সমর্পিত হ'ত।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

"গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।"* ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অনুজ্ঞা পালনে অবিচলিত পদে তাঁর জীবন পরিচালিত দেখেছি। ছোট বড় সকল কাজেই তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে নিয়ত সজাগ ও প্রয়াসী ছিলেন। "যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" এ কোন্ কোন্ কর্ম্ম?—তিনি বিশদরূপে বর্ণনা করেছেন—"শুধু ধর্ম্ম কর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম নামে বিদিত কর্ম্ম নয়। চাষ বাস সব রকম ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার, কারখানার কাজ, নানা রকম চাকুরী, ওকালতী, ডাক্তারী, কবিরাজী, ঝাড়ুদার ও মেথরের কাজ, এঞ্জিনীয়ারীং, ব্যাঙ্কিং, মহাজনী, জীবন-বীমার কাজ, অধ্যাপকতা, শিক্ষকতা, ধর্ম্মাচার্য্যের কাজ, সাংবাদিক ও গ্রন্থকারের কাজ, সঙ্গীতের ওস্তাদের কাজ, চিত্রকর ভাস্কর স্থপতি আদির কাজ, সব রকম যান-বাহন পরিচালকের কাজ—এই সমুদয় কাজ ও আরও বহুবিধ কাজ তাঁকে সমর্পণ করতে হবে—এই উপলব্ধি ক'রে করতে হবে যে, "ভবদাজ্ঞয়ৈব হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।" "তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।"* এ কথা-গুলি বক্তৃতার কথা মাত্র নহে—পরন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে তাঁর আদর্শের পরিচয় পেয়ে আমরা শ্রদ্ধাবনত হয়েছি। "গৃহী ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া জ্ঞানী হইবেন তবেই তিনি প্রকৃত গৃহী। গৃহীর আদর্শই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা ধার্ম্মিক গৃহী হওয়া কঠিন। অতএব কোন গৃহস্থ ব্যক্তি যদি ঈশ্বরানুগত অর্থাৎ ধার্ম্মিক হন তাহা হইলে ঈশ্বরানুগত সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় মন আত্মার অধিকতর পুষ্টি (spiritual growth) হইয়াছে মনে করি। নানা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও গৃহী যদি সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধির মূল্য অনেক বেশী।"† এই সুমহৎ আদর্শ তাঁর জীবনে প্রতিভাত দেখা গিয়েছে।

তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের মুখজ্যোতি তাঁর অন্তরকে আলোকিত করেছিল। শুদ্ধ শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি আমাদের সেই আলোকের অনুসরণ করতে উদ্বোধিত করেছিলেন। "যে উজ্জ্বল বিমল আলোক ঋষিরা পেয়েছিলেন, খুব সামান্য হ'লেও আমরাও তা কিঞ্চিৎ পেতে পারি। আমরা ভগবানের নিকট থেকে যতটুকু আলোক পাই, তা যত ক্ষীণই হোক, কর্ত্তব্যবুদ্ধি যতটুকু আছে তা যত অল্পই হোক, তার অনুসরণ করলে আমরা আরও আলো, কর্ত্তব্যবুদ্ধির আরও প্রেরণা নিশ্চয়ই পেতে পারি। যা পেয়েছি, যা পাব, একাগ্র মনে, অবিচলিত অপরাজিত অপরাজেয় চিত্তে, তার অনুসরণ করতে হবে। তা হ'লে আরও পাব, আরও দৃঢ় পদ, আরও সবল হস্ত হোক। সদা সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু, ভ্রমপ্রমাদ স্খলন যাতে না হয়। Eternal vigilance is the price of realization—অসীম অবিরাম অতন্দ্রিত পাহারা নিজের উপর দিয়ে ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করতে হয়।"*

মর-চক্ষে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না—তাই আজ শ্রদ্ধাভরে সেই লোকান্তরিত ঋষিকল্প সাধুর আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করি—

"যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে।"

"তোমার যে আত্মা দূরে পরলোকের দেবতার নিকটে গিয়াছে আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।"

---

* "ধর্ম্ম ও বিশ্বপরিস্থিতি।" শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১১১তম মাঘোৎসবে, ১১ই মাঘ প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশ। তত্ত্বকৌমুদী ১লা ও ১৬ই ফাল্গুন ১৩৪৭।

† "সামাজিক ধর্ম্ম" শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। "উৎসব" (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রকাশিত ১৯৪০) ৯৮ পৃষ্ঠা।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬

আরও একদিন থাকিয়া যোগমায়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন—বিমল ও শরৎ বাহিরের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে। যোগমায়াকে দেখিয়া দুই জনেই বাহির হইয়া প্রণাম করিল। যোগমায়া অবাক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কখন এলি রে?

বিমল বলিল, কখন কি, কাল দুপুর বেলায় এসে দেখি, বাড়ি ভোঁ-ভোঁ। শরৎকে বললাম—পালাই চ। ও বললে, দূর—তাকি হয়! মাকে দেখতে এসেছি—না দেখে যাব না। কাল তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

শরৎ বলিল, তুই তো বাজী ফেলে বললি, কাল কক্‌খনো আসবেন না। কেমন?

যোগমায়া বলিলেন, কাল খেলি কি?

—কেন, তোফা খিচুড়ি রাঁধলাম এক বেলা—এক বেলা দুধ দিয়ে চিঁড়ের ফলার করলাম। শরৎ খাসা খিচুড়ি রাঁধতে পারে—মা।

—আজ সকালে কি খাওয়া হ'লো?

আজ ভাত রাঁধলাম। ভাতে-ভোতে ভাত ঘি দিয়ে এমন মিষ্টি লাগে! একটু ফ্যান সপ্‌সপ্‌ করছিল কি না, বেশ লাগল।

—আর আমার কপাল—ফেনটা গালবার যুগ্যতা তোদের নেই! তাহ'লে তো উপোস করে আছিস বল।

—পিসিমার বাড়ি থেকে কি এনেছ—দাও না। উপোস করার দুঃখ যাক।

—দাঁড়া হাত পা না ধুয়ে জিনিসপত্তরে হাত দিচ্ছি কি না?

সত্য বলিতে কি শরৎকে দেখিয়া যোগমায়া প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। বিমলকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, আবার হঠাৎ যে এলি?

বিমল বলিল, শরৎ বললে—কালনা যাব। সেখান থেকে পূর্ব্বস্থলী—কাটোয়া—

যোগমায়া আর বিরক্তি দমন করিতে পারিলেন না। বলিলেন, তা ওর সঙ্গে হৈ হৈ করে তুমিও ঘুরবে নাকি? এই বুঝি তোমার পড়াশোনা! একেবারে পৈতে পুড়িয়ে ভগবান্‌ হ'য়েছ?

মায়ের ক্রোধে বিমল কৌতুক বোধ করিল। কহিল, পৈতে তো অনেক কাল খুইয়েছি—মা।

—হ্যাঁরে—একথা বলতে তোর লজ্জা করল না? বামুনের ছেলে হ'য়ে পৈতে ফেলে দিয়েছিস?

—বারে, আমি দিলাম বুঝি? সেদিন ধোপাবাড়ি গেঞ্জি খুলে দেবার পর দেখি পৈতে নেই। কখন গেঞ্জির সঙ্গে—

থাক—থাক খুব বীরত্ব তোদের। কালই সকালে যদি পৈতে না নিবি তো মাথা খুঁড়ে মরব বলছি। আর, একটু থামিয়া বলিলেন, ওর সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুরতেও তোমায় দেব না।

বিমল হাসিয়া বলিল, কালনা যাবার পথে বললে, আমাদের বাড়ি একদিন থাকবে—তাই এলাম। তোমাকে ওর ভারি ভাল লেগেছে—মা।

যোগমায়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, সকাল সকাল রাঁধতে যাই। সন্ধ্যের পরই খেয়েদেয়ে আমায় নিশ্চিন্দি করো বাপু।

বিমল ফিরিতেছিল—যোগমায়া ডাকিলেন, শোন খোকা। কেন জীরেট গিয়েছিলাম—জানিস? ঠাকুরঝি অনেক দিন থেকেই যাবার জন্তে বলছিল—বাঁড়ুজ্জেদের চমৎকার একটি মেয়ে দেখে এলাম।

বিমলের মুখে ছায়াপাত হইল। সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তা যত ইচ্ছে মেয়ে তুমি দেখ, মা। কিন্তু—

—কিন্তু কি? বিয়ে করবি নে?

—করব—কিন্তু এখন নয়। পাস দিয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে না দাঁড়ালে—ও সব কথা তুল না। সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

যোগমায়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শুধু চেহারায় নহে—কণ্ঠস্বরেও বিমলের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যায়, এবং নিজের মত জানাইয়া মায়ের মতামতকে লঘু করিয়া দিবার চেষ্টাও সে করে। কিন্তু সে ভাবনা অল্পক্ষণের জন্ত। মৃদু হাসিয়া যোগমায়া মাথা নাড়িলেন। অর্থাৎ তোমার মত ত আমি মানিয়া লইলাম আর কি!

যেদিন উহারা চলিয়া গেল—সেইদিন অপরাহ্নে ঢাকা হইতে রামচন্দ্রের পত্র আসিল। এবং সেই পত্রই যোগমায়াকে ভাবাইয়া তুলিল। জীরাটের সংবাদ জানাইয়া যোগমায়া এখনও ঢাকায় পত্র দেন নাই, অথচ যোগমায়ার ভাবনাগুলি রামচন্দ্রের মনেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! নতুবা তিনি কি করিয়া লিখিলেন: এই অগ্রহায়ণে খোকার বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছি। তুমি বোধ হয় জান—ঢাকায় সরকারী উকিল রায় বাহাদুর চুনিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি আমাকে বেহাই বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মেয়েটি তাঁর সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। এইবার এফ-এ .দিবে। তিনি অত্যন্ত জিদ ধরিয়াছেন—তুমি একবার এখানে আসিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া যাও। কোষ্ঠীর মিল হইয়াছে, আমার অমত নাই। শুধু তোমার মতটি জানিতে পারিলেই—

যোগমায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ঢাকা শহর তিনি কখনও দেখেন নাই। জীরাট গ্রামের ছবিই তাঁহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল এবং ব্রীড়াবনতমুখী উকিল কন্যার স্বপ্নাভিষিক্ত হইয়া কুমুদিনী সেই পটভূমিকায় স্পষ্টতর হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ দ্বারিকের সঙ্গে যোগমায়া পরামর্শ করিলেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান নাতিটিকে উদ্দেশ করিয়া দ্বারিক বলিলেন, আমার মতে উকিলের মেয়েটিই ভাল, কি বলিস পণ্টু? দেখতে শুনতেও ভাল—পাওনা-থোওনাও হবে।

যোগমায়া বলিলেন, পাওনা-থোওনার কথা আমি ভাবছি নে পণ্টু, আমি যে কথা দিয়ে এলাম।

দ্বারিক পাকা লোক। যোগমায়ার কাছে জীরাটের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া কহিলেন, পাকা কথা আর কি দিয়েছ—বউমা। যদি অঘ্রাণে বিয়ে হয়—তবেই তুমি বাঁক্যদত্ত। কিন্তু ওঁরা ত অঘ্রাণে বিয়ে দিতে চান না।

—মেয়ের মা আমার হু'টি হাতে ধরে—

—মেয়ে থাকলে সবাই হাতে পায়ে ধরে বউমা, ও তুমি ভেবো না। শীগ্‌গির বিয়ে না দিলে—বলেছি ত 'স্বদেশী' করে ছেলের তোমার পরকাল ঝরঝরে হবে।

পুত্রের এই অপবাদ যোগমায়া সহ্য করিতে পারিলেন না। নম্রকণ্ঠে কহিলেন, না বাবা, অঘ্রাণে এত তাড়াতাড়ি কিসের। ওঁর সঙ্গে ভাল ক'রে পরামর্শ করি। আপনি বরঞ্চ একখানা পত্র গুছিয়ে লিখে দিন।

কার্ত্তিক মাসের রাস-পূর্ণিমায় শরৎকে লইয়া বিমল পুনরায় বাড়ি আসিল। বলিল, মা, শরৎ বললে কখনও শান্তিপুরের রাস দেখে নি।

—বেশ করেছিস—এনেছিস। শান্তিপুরের রাস একটা দেখবার জিনিস। কত মুলুক থেকে কত লোক আসে—তবু সে জাঁকজমক আর নেই।

শরৎ হাসিয়া বলিল, তাই ত দেখতে এলাম। বিমল খালি বলে—মা রাগ করবেন।

যোগমায়া স্নেহের দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া বলিলেন, হাঁরে খোকা, তুই কেবল রাগ করা ছাড়া আর কিছু দেখিস নে। পড়া কামাই করে নিত্যি হৈ হৈ করা অবিশ্যি আমি ভালবাসিনে।

বিমল বলিল, শরৎটা যে হুড়ে। হৈ হৈ করা ছাড়া ওর কাজ আছে নাকি!

কেন—চাকরি কর না তুমি? শরতের পানে চাহিয়া যোগমায়া প্রশ্ন করিলেন।

—কে আমায় চাকরি দেবে—মা। চাল নেই—চুলো নেই—

—ষাট—ষাট! ওকি কথা! এত লোকের চাকরি হচ্ছে—

—বিমল বলিল, চাকরি মানে ত খোসামুদি! সে ওর দ্বারা হয় না, মা! বলে, এক দাসত্বে জ্বলে পুড়ে মরছি—

যোগমায়া বলিলেন, তোদের ওসব কথা আমি বুঝতে পারি নে—খোকা। চাকরি না করলে—সংসারধর্ম্ম চলে কখনও?

বিমল বলিল, ও বলে কি জান মা, সংসার করলেই ত ধর্ম্ম করা হ'লো না। ধর্ম্ম হ'লো আলাদা জিনিস।

যোগমায়া স্নেহ-সকোপ কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, বেশ ত, ওর কথা ওই বলুক না, তোমায় আর আদালুতি করতে হবে না!

বিমল বলিল, মাতৃ-আদেশ—অমান্য করবি নে শরৎ। সংসার মানে যদি ধর্ম্ম না হয় ত—ধর্ম্মের চেহারা কি রকম মাকে বুঝিয়ে দে।

শরৎ হাসিয়া বলিল, ধর্ম্মের ত একটা রূপ নয়—আমি বোঝাবো কি? কেউ বোঝেন—সংসার করা ধর্ম্ম, কেউ বোঝেন জপ তপ ধর্ম্ম, কেউ বোঝেন মাতৃপিতৃসেবা ধর্ম্ম, কেউ বোঝেন দেশসেবা ধর্ম্ম, কেউ বোঝেন মানুষের সেবা—

বিমল বলিল, শুনছ মা—কত রকমের ধর্ম্ম আছে।

যোগমায়া বলিলেন, শুনছি। তোমরা ছেলেমানুষ বাবা—ধর্ম্মের কি-ই বা বোঝ। সে বোঝেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। সংসারের মায়ায় আমরা যতটুকু করি—

তাও ধর্ম্ম মা—তাও ধর্ম্ম। কিন্তু মা, মানুষকে ঠেলে ফেলে দেবতাকে পূজো দেওয়া ঠিক ধর্ম্ম নয়। যোগমায়ার চক্ষে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল, মানুষের মধ্যেও তো দেবতা বাস করেন মা, নইলে তোমাকে নমস্কার করি কেন।

যোগমায়া সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, পাগল ছেলে!

তা শরৎকে যোগমায়ার নেহাৎ মন্দ লাগে না। ওর ওই হৈ হৈ করা বাতিক—যে বাতিকে বিমলকে পর্য্যন্ত টানিয়া নাচাইয়া ফিরে—ওইটুকুই যোগমায়ার ভাল লাগে না। কালবৈশাখীর হঠাৎ-ওঠা ঝড় গ্রামের হয় তো কল্যাণ করে, গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। স্বাস্থ্যতত্ত্বের দূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া ত গৃহস্থ সব বিপর্য্যয়কারী বৈশাখী ঝড়কে খুশি মনে গ্রহণ করে না, আপাত ক্ষতির আশঙ্কাই তার মনে প্রবল হইয়া উঠে। স্বদেশীর গান গাহিয়া বেড়াক না উহারা, কিন্তু স্নান-আহার বন্ধ করিয়া অমন কণ্ঠ ফাটাইয়া চীৎকার করিবার প্রয়োজন কি? সেই চীৎকারের পিছনে পুলিসের ভয়ই যদি থাকে ত অমন গান গাহিবারই বা দরকার কি? আহা—মা-মরা ছেলে, মা থাকিলে এমন হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতে পারিত?

রন্ধন-ঘরে আজ যোগমায়ার অখণ্ড মনোযোগ। যত রকমের তরকারি সংগ্রহ করা যায় এবং সে-সব দিয়া যত রকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়—সমস্তই আজ যোগমায়ার কাজের তালিকায় উঠিয়াছে। বৈকালে শরৎ কালনা যাইবে—কালনা হইতে ধাত্রী-

গ্রাম হইয়া নবদ্বীপ। সেখান হইতে তাহার গন্তব্য স্থান সে নিজেই জানে না। অদ্ভুত ছেলে; আহারের বিলাস ওর নাই, পরিচ্ছদের বাহুল্যও নহে, শয়নের আরামও কি করিতে জানে! তবু যোগমায়ার আশ্রয়ে আসিয়া যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ও পায়—

—মা, তেল দাও, নাইতে যাব।

তেলের বাটি আগাইয়া দিয়া যোগমায়া বলিলেন, কোথায় নাইতে যাবি রে?

—গঙ্গায় চান ক'রে আসি। তোমার ত রান্নার এখনও অনেক দেরি।

—তা বলে বেলা তিন প'র করে এস না যেন। পায়েস হ'তে আমার বড় জোর ঘণ্টা দুই।

—আমরা যাব আর আসব।

বিমলেরা চলিয়া যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই হইবে—তখন বেগুন ভাজা নামাইয়া যোগমায়া সবেমাত্র পটোলের দালনা চাপাইয়াছেন—বাহির হইতে ডাক আসিল, বাড়ি আছেন? বলি কে বাড়ি আছেন—উত্তর দিন না গো।

কর্কশ কণ্ঠস্বর। যোগমায়ার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! অভ্যাসবশতঃ বাম হাতের উল্টা পিঠে মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া অনুচ্চ স্বরেই বলিলেন, ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই।

উত্তর আসিল, আপনি একবার এদিকে আসুন। ইন্‌সপেক্টর বাবু এসেছেন, কি জিজ্ঞাসা করবেন।

হাত হইতে ঠকাস করিয়া খুন্তিটা পড়িয়া গেল—যোগমায়ার বুকটা আর একবার ধড়াস করিয়া উঠিল। এক মিনিট কাল দ্রুত স্পন্দমান বুকের টিপটিপানি শুনিতে শুনিতে তিনি উনানের জ্বলন্ত কাঠখানি ঠেলিয়া আঁচ বাড়াইবার কথাটুকুও ভুলিয়া গেলেন।

পুনরায় বাহির হইতে শ্রুত হইল, একবার বৈঠকখানা ঘরে আসুন, ইনসপেক্টরবাবু গোটাকতক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

বসন সম্বৃত করিয়া যোগমায়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রান্নাঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দুয়ারটায় শিকল তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে পল্টু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, তোমায় যে ওরা ডাকছে জেঠিমা।

—কে ডাকছে রে?

—মেলাই পুলিস। দাদুও এসেছে, ওদের সঙ্গে কথা কইছে। ও ঘরের চাবিটা দাও।

অঞ্চল-গ্রন্থি হইতে চাবি খুলিয়া যোগমায়া পল্টুর হাতে দিয়া বলিলেন, পুলিসেরা কি বলছে রে?

—কি জানি। যা লাঠি সব হাতে—ইয়া বড় বড় লাঠি। দুই হাত বিস্তার করিয়া লাঠির দৈর্ঘ্য দেখাইয়া পল্টু দ্রুত পদেই চলিয়া গেল।

৭

বৈঠকখানা ঘর লোকে লোকারণ্য। শুধু পুলিসের লোকই নহে—পাড়ার বহু লোকই আসিয়াছেন। চেয়ারের উপর স্ব মর্য্যাদায় গম্ভীর হইয়া ইনসপেক্টর বাবু বসিয়া আছেন; তাঁহার নিম্নতন কর্ম্মচারী দুই জনের মুখেও অনুরূপ মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্যের ছাপ। ভোজপুরী কন্‌ষ্টেবলের লাল পাগড়ী, লম্বা মোটা লাঠি ও গালপাট্টাসমেত গোঁফ বুকের স্পন্দন দ্রুততর করিবার যথেষ্ট সহায়তা করে। আর প্রতিবেশী যে-সব অল্প বা অধিক বয়স্ক লোক ঐ ঘরে জমায়েৎ হইয়াছেন—তাঁহাদের মুখ থমথম করিতেছে। কি যেন আকস্মিক বিপদপাত যে-কোন মুহূর্ত্তে এখানে হইতে পারে। দ্বারিক শুধু দ্বারান্তরালবর্ত্তী যোগমায়াকে উদ্দেশ করিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিলেন, এঁরা তোমায় যা যা জিজ্ঞেস করবেন—ঠিক ঠিক উত্তর দেবে মা। কোন ভয় নেই। তোমার জ্ঞানমত যা জান—বলবে।

কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করিয়া পুলিশ ইনস্‌পেক্টর প্রশ্ন করিলেন, যোগমায়ার বুকে সেই প্রশ্ন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতই খোঁচা দিতে লাগিল। ভয় যথাসম্ভব দমন করিয়া মৃদু অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন।

—শরৎ ছেলেটিকে আপনি কত দিন থেকে জানেন?

—গেল আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন ও এখানে এসেছিল।

—ঠিক জানেন, এর আগে কখনও আসে নি?

—না।

—আপনার ছেলে বিমলের মুখে ওর নাম এর আগে শোনেন নি?

—না।

—বিমলবাবু কোন দিন ওর সম্বন্ধে বা অন্য কোন ছেলের সম্বন্ধে আপনার কাছে কোন কথা বলে নি?

—মনে পড়ে না।

—ওরা কখনও কি বলে নি যে, ইংরেজকে তাড়াব ভারতবর্ষ থেকে?

প্রশ্নের ধরণে যোগমায়ার ভয় কাটিয়া বিস্ময় বাড়িল। খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ইনস্‌পেক্টর অধৈর্য্য স্বরে বলিলেন, কথার উত্তর দিন।

যোগমায়া বলিলেন, আমি বুঝতে পারছি নে আপনার কথা।

ইনস্‌পেক্টর প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিলেন।

যোগমায়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, ওকথা ওরা বলবে কেন?

ইনস্‌পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, বলে, কেননা ওই ওদের অভ্যাস। তাহ'লে বলে নি ও কথা? একটু থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা—আপনার ছেলে কত দিন থেকে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে? জানেন না? ছেলেটি কি করে জানেন? তা-ও জানেন না। না জেনে-শুনে যাকে-তাকে বাড়ি ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়।

যোগমায়ার অন্তর পুড়িতেছিল, ভয়ে নহে—অভুক্ত ছেলেদের

কথা ভাবিয়া। ইনসপেক্টরের প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' 'না' কিছুই তিনি বলিলেন না। মনে মনে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ইনস্পেক্টর বলিলেন, আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, ধর্ম্ম ভেবে সত্যি কথা বলবেন।

যোগমায়া আর ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। ঝাঁজাল স্বরে কহিলেন, মিথ্যা কথা বলা আমা'দের স্বভাব নয়। বুড়ো হ'য়ে মরতে চললাম—ধর্ম্ম-অধর্ম্মও কাউকে শেখাতে হবে না।

ইনস্পেক্টর ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, কিন্তু মনে করবেন না, আমরা কর্ত্তব্যবোধে অনেক অপ্রিয় কার্য্যও করে থাকি। ওই শরৎ ছেলেটি আপনার কাছে কোন পুঁটুলি কি বাক্স কি অন্য কিছু রাখতে দিয়েছে কি?

—না।

—ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখুন।

—না। সুস্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠস্বর। এমন সময়ে তরকারি পোড়ার একটা তীব্র গন্ধ সকলের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ইনস্পেক্টর বলিলেন, আর একটি কথা—

পণ্টু ও পাশ হইতে বলিল, জেঠিমা চলে গেছেন।

দ্বারিক বলিলেন, বললাম ত সংক্রান্তির দিন ওই ছেলেটি গ্রামে আসে। আগে আমরা কেউ ওকে দেখি নি, বউমাও ওর বিষয় বিশেষ কিছু জানেন না। কেন, কিছু করেছে নাকি ছেলেটি?

ইনস্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, খবরের কাগজ আপনারা পড়েন না?

—রবিবারে সাপ্তাহিক হিতবাদী কি বঙ্গবাসী আসে তাই সকলে পড়ি।

—কলকাতার রায় বাহাদুর ননী মজুমদারকে জানেন? সি-আই-ডির এক জন নামজাদা অফিসার। তিনি খুন হ'য়েছেন।

—কি সর্ব্বনাশ আপনি কি মনে করেন—

—সন্দেহ করি। ওদের একটা বিপ্লবী দল আছে—শরৎ সেখানকার একজন বড় কর্ম্মী। এই দেখুন ওর হুলিয়া আমাদের কাছে আছে।

—কিন্তু অত ভাল ছেলে—

—ভাল ছেলেদের নিয়েই ত আমাদের মাথাব্যথা। আচ্ছা আসি, নমস্কার। দুই পা অগ্রসর হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমাদের সন্দেহ যদি সত্য হয়—দেখবেন আপনাদের ভাল ছেলেটি গঙ্গাস্নান করে আর ফিরবেন না।

ইনস্পেক্টার চলিয়া যান দেখিয়া বৃদ্ধ দ্বারিক অগ্রসর হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, আমাদের বিমলের কি কিছু—

কিছু নয়—যথেষ্ট বিপদ। সন্ধান নিয়ে সন্দেহের যদি কিছু না থাকে ছাড়ান পাবেন।

—সত্য মিথ্যা বুঝবেন কি করে?

আমরা অন্তর্যামী। ব্রিটিশ প্রভুরা শুধু সামনে দুটো চোখ রেখেই রাজ্য চালান না—অনেকগুলো চক্ষু ও'দের আছে। সহসা ঘরের চারিদিকে সন্ধানী আলোর মত দৃষ্টি বুলাইয়া হাসিলেন: বাড়িটা এক দিন পুলিস পাহারায় থাকবে। বাড়ি সার্চ্চের একটা ওয়ারেণ্ট আনাতে হবে—আর বিমলবাবুর—হোষ্টেলের ঘরটাও। সন্দেহজনক কিছু না পেলে উনি খালাস পেতে পারেন।

গট্ গট্ করিয়া ইনস্পেক্টর দলবলসহ নামিয়া গেলেন।

—গঙ্গার রাস্তা কোন্‌টা হে? দক্ষিণে? অল্‌রাইট।

মোড়ের মাথায় বিমলকে দেখা গেল।

থানার দারোগা বলিলেন, এই যে বিমলবাবু।

ইনস্পেক্টর ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনিই বিমলবাবু? আপনার বন্ধুটি কোথায়?

বিমল তাঁহার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন পরিপাক করিয়া সহজ স্বরেই জবাব দিল, সে নবদ্বীপ গেল।

নবদ্বীপ! দ্বারিকের পানে চাহিয়া ইনস্পেক্টর মৃদু হাস্য করিলেন। নবদ্বীপ—কেমন? মায়ের হাতের প্রসাদটুকু খেয়ে যাবার অবসর তাঁর হ'ল না? কি এত জরুরী কাজ?

—জানি না।

—জানেন বৈকি কিছু কিছু বন্ধু যখন আপনার!

বিমলের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। দৃঢ়স্বরে সে বলিল—জানি না।

দ্বারিকের পানে চাহিয়া ইনসপেক্টর কহিলেন, আপনার বিমল-বাবুর এ্যাটিটিউড ভাল নয়, ভুগতে হবে ওঁকে।

বিমল বলিল, মানে?

মানে প্রাঞ্জল। এ বেলা মায়ের হাতের রান্না খাওয়া—আপনার অদৃষ্টে নেই! ভগবান্ যখন যাকে যেখানে মাপান। অদৃষ্ট—অদৃষ্ট! বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

ধরা পটোলের ডালনা নামাইয়া যোগমায়া ততক্ষণে পায়স চাপাইয়াছেন। আরও কয়েকটি তরকারি কোটা পড়িয়া আছে। যোগমায়ার উৎসাহ নাই সেগুলি রাঁধিবার। উৎকণ্ঠায় উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছে। ঘরের ঘড়িটা টং টং করিয়া অনেক বার শব্দ করিল। শব্দ শুনিয়া যোগমায়া বেলার আন্দাজ করেন। শুধু বারোটার পর কিছু গোলমাল হইয়া যায়। ঘড়ি দেখিতে জানেন না বলিয়া কেহ যোগমায়াকে ঠাট্টা করিলে বলেন, ওঠোনের রোদ দেখে বেলা বলে দিতে পারি—ভারি তো তোদের ঘড়ি। দম দাও রে, ঘর গোন রে—অত হাঙ্গামা কে করে রে বাপু!

অন্যমনস্কতার দরুণ আজ শব্দ শুনিতে ভুল হইয়া গেল। উঠানের কাঁঠাল গাছের ছায়া পূর্ব্বমুখী হইয়াছে দেখিয়া বেলা যে অনেকখানি বাড়িয়াছে—সেটুকু অনুমান করিলেন। উদ্বেগ বাড়িল। নিষ্ঠুর পুলিসের লোক বাছাকে ছুটি খাইতে দিবে তো?

শরতের আগমনে এই বিভ্রাটের সৃষ্টি, কিন্তু সেজন্য এতটুকু বিরক্তি তাঁহার মনে লাগিয়া নাই। আহার্য্য প্রস্তুত, ছেলে স্নানে গিয়াছে। হাজার অন্যায় করিলেও অভুক্ত সন্তানের উপর ক্রোধ পোষণ করিয়া ভর্ৎসনার মহলা দেওয়া মায়ের যুক্তিতে বাধে! ক্রোধের সবটুকু বেগ বরঞ্চ এই শান্তিভঙ্গকারী শান্তিরক্ষক দলের উপর গিয়াই পড়িতেছে।

পায়স নামাইয়া যোগমায়া কর্পূর ও এলাচের গুঁড়া দিলেন। একখানি পরিষ্কার থালা দিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া উনানের কাঠ টানিয়া আঁচ কমাইয়া দিলেন। মাটির হাঁড়িতে জল ঢালিয়া এইবার মৃদু আঁচে ভাত চড়াইয়া দিবেন; উহারা আসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতেই ভাত নামিয়া যাইবে।

পন্টু আর এক বার ছুটিয়া আসিল; দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, জেঠিমা গো, বিমলদাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিনটি এমনই অকস্মাৎ মরিয়া গেল। এক ঘর রান্না ও ভরা বুকের আশা একটি মাত্র কথায় আঘাতে নষ্ট হইয়া গেল। যোগমায়া জল স্পর্শ করিলেন না। নিস্তারিণী আসিয়া সাধ্যসাধনা করিলেন, প্রতিবেশিনীরা বুঝাইলেন। যোগমায়ার কণ্ঠে সেই এক কথা, বাড়া ভাত বাছাদের সামনে ধরে দিতে পারলাম না, খাবার কথা আমায় বলো না গো।

অগত্যা দ্বারিক রামচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করিলেন। রামচন্দ্র একা আসিলেন না—ঢাকার সেই সরকারী উকিলটিও সঙ্গে আসিলেন।

বাংলায় তখন আগুন জ্বলিতেছে। বরিশালের যজ্ঞধূম বাংলার আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিয়াছে। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ধ্বনিতে ঋত্বিকরা নব জীবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। বিপ্লবী বাংলার পূর্ণ জাগরণের দিন। ওরা রক্তচক্ষুকে ডরায় না, শক্ত লাঠির সামনে বুক ফুলাইয়া চলে, ওরা লাঞ্ছনা নির্যাতনকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নবোদ্যমে চীৎকার তুলিতেছে—বন্দেমাতরম্। হে মাতা—তোমার বন্দনা করি। তুমি তো অচেতন ভূমিরূপিণী মাতা নহ, শস্যরূপিণী-জীবনী শক্তি নহ, সেবারূপিণী প্রিয়াও নহ, তোমার মাটিতে আমরা অগ্নি মন্ত্রের উপাসকেরা প্রণাম রাখিয়া দিলাম। ভক্তিভারাবনত শুধু শ্রদ্ধা আর বিগলিত-হৃদয়বৃত্তির প্রণতি নহে, আপনাদের নব তপস্যালব্ধ জীবন-অঙ্কুরের দলগুলি প্রথম বর্ষাস্নাত শ্যাম দূর্ব্বার মত তোমার রাতুল চরণ অর্ঘ্যমণ্ডিত করুক। আমাদের জীবন-অর্ঘ্যে তোমার মৃত্তিকা-রূপিণী দেহে প্রাণ সঞ্চার হউক। হে রুদ্রভয়রূপিণী মাতা—অগ্নিরূপে তুমি উজ্জ্বল হও—আহুতিতে আমরা সেই তেজকে বিকশিত করিয়া তুলি। এই আমাদের বন্দনা-গান।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের গভীর নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া এই বন্দনা-গানের ধ্বনি বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া চলে, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের মূর্চ্ছাতুর পৃথিবীর বুকে এই ধ্বনি 'ফটিক জল'-প্রার্থী পাখীর স্বরের মত মেদুর হইয়া উঠে, সকালে প্রভাতী বন্দনা আর সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনির সঙ্গে এই সুরের অদ্ভুত সংযোগ। যোগমায়া চমকিত হইয়া উঠেন। এই ধ্বনির সঙ্গে একটি দ্বিপ্রহরের কত আয়োজন—কত স্নেহ-মমতারই শেষ হইয়া গিয়াছে! কাঁদিতে গেলেও চোখে জল আসে না, বুকে শুধু ব্যথার কাঁটা মচ্ মচ্ করিয়া পীড়া দেয়। এত ব্যথার মাঝে প্রতিজ্ঞার বেগ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। জল এবং জীবনধারণের জন্য যতটুকু আহার দরকার সেটুকু যোগমায়া স্বীকার করিয়াছেন; শুধু অন্ন গ্রহণ করেন নাই। বিমল না ফিরিলে অন্নগ্রহণও তিনি করিবেন না।

রামচন্দ্র বলিলেন, চেষ্টার ত্রুটি হবে না, কিন্তু তুমি শক্ত না হলে—

গৌরী হাতে ধরিয়া কাঁদিয়াছে—মা একটু বোঝ।

জামাতা সাহস দিয়াছে। আপনাকে দিয়ে দরখাস্ত দেওয়াব। বাড়ি সার্চ্চ করে যখন কিছু পায় নি—

নবাগত উকিলবাবু ভাবী সম্বন্ধের সূত্রটি পাকা করিয়াই বলিয়াছেন, বেয়ান, স্থির হোন। আপনার ছেলেকে উদ্ধার না করলে আমার প্রতিজ্ঞা যে ব্যর্থ হবে।

নীরব শিরশ্চালনে যোগমায়া অন্নগ্রহণের অস্বীকৃতি জানাইয়া-ছেন। গত বারই তিনি চতুর্মাস্য ব্রত করিয়াছিলেন। চারি মাস কাল অন্নগ্রহণ করেন নাই। পারলৌকিক পুণ্য সঞ্চয়ের চেয়ে পুত্রের কল্যাণ-কামনা কিছু কম নহে।

আয়োজনের ত্রুটি রহিল না। সকলের সমবেত চেষ্টায় বিমল খালাস পাইল। অল্লায়ু অগ্রহায়ণের বেলা শেষে সদল বলে বিমল ফিরিয়া আসিল। যোগমায়া ছুটিয়া বহির্দ্বারে আসিলেন। লোক-লজ্জার বাধা মানিলেন না, বিমলের একখানি হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে দ্বিতলের ঘরে আসিয়া উঠিলেন। বিমলকে প্রণামটুকু করিবার অবসর দিলেন না।

দুয়ারের খিল বন্ধ করিয়া বিমলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বিমলের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

প্রথম আবেগ কাটিলে যোগমায়া বিমলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন, খোকা?

মা, একটু চুপ কর।

কান্নার বেগ এক বার একটু কমিয়া আসে, সেদিনের কথা মনে পড়াতে আবার বাড়িয়া উঠে। যে কথাটি বলিবার, অনেক কষ্টে ও অনেক বিলম্বে যোগমায়া হৃদয় সমুখ-অশ্রুর সঙ্গে মিশাইয়া ধরা গলায় বলিলেন, আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্ খোকা—

পূর্ণ দৃষ্টিতে যোগমায়া বিমলের পানে চাহিলেন। বড় শুকনা সে মুখ। কতকাল না খাইয়া, কত পীড়ন ও কষ্ট সহিয়া সে এমন শুকাইয়া গেল—কে জানে! বিমল ঘাড় হেঁট করিয়াই আছে। চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তামাটে হইয়া গিয়াছে, সারা মুখে অবসাদ ও হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর জল সেচিয়া ফেলিলে সেখানকার পদ্মগুলি যেমন দল-সমেত ভাতাইয়া পড়ে—তেমনই হইয়াছে বিমল।

এই মুহূর্ত্তে এই নির্জ্জীব ছেলেটিকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইবার ক্ষণ ইহা নহে। মুহূর্ত্তে যোগমায়া আপনাকে সম্বৃত করিয়া কণ্ঠ আরও পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, না, না, খোকা। দিব্যি তোকে করতে হবে না। আমি বলছি—দিব্যি তোকে—

বিমল হেঁট হইয়া এতক্ষণে যোগমায়ার পায়ের ধুলা তুলিয়া মাথায় দিল। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, সরকারকে যা লিখে দিয়ে এলাম তোমার কাছে তা বলতে বাধা নেই। তোমার পা ছুঁয়েই বলছি—

যোগমায়া পা সরাইয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, তুই কাঁদছিস কেন বাবা?

মা। ছোট ছেলেটির মত মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া বিমল সমস্ত অভিযোগ, ব্যথা ও অপমানকে নিঃশেষ করিতে চাহিল হয় তো। ক্রমশঃ

চাষবাসের কথা

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

বীজ

৫

বীজ হইতেই ফসল উৎপন্ন হয়; যেমন বীজ তেমন ফসল—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিলে ফসল উৎকৃষ্ট হইবে এবং নিকৃষ্ট বীজ বপন করিলে ফসলও নিকৃষ্ট হইবে; বিশেষজ্ঞগণ বলেন বীজই কৃষির ভিত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদন-প্রথা নাই বলিলেই চলে, সাধারণতঃ ক্ষেত্রে যে শস্য জন্মে তাহা ক্ষেত্র হইতে একসঙ্গে উঠাইয়া এবং একসঙ্গে ঝাড়াই মাড়াই করিয়া তাহা হইতেই পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য বীজ রাখা হয়—ঐ বীজই বাজারে বিক্রয় হয়। এই বীজের সঙ্গে অন্য জাতীয় শস্যের বীজ, আগাছার বীজ, ধুলা, মাটি, বালি ইত্যাদি ত থাকেই—তাহা ছাড়া রোগ ও কীট-পতঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত বীজও থাকে; সুতরাং ইহাকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ বলা চলে না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ পাইতে হইলে বীজের জন্য ফসল পৃথক্‌ভাবে অতি যত্নপূর্ব্বক উৎপাদন করা দরকার—যাহাতে উক্ত ফসল সবল, সুস্থ, সতেজ হয়, কোন প্রকারের কীট বা রোগের দ্বারা আক্রান্ত না হয়—ঐ ফসল হইতে যে বীজ পাওয়া যাইবে, তাহা হইতেই সবল, সতেজ ও সুস্থ ফসল উৎপন্ন হইবে। বীজ উৎপাদনের জন্য এইরূপ পৃথক ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও ক্ষেত্রে শস্যের যে-সকল গাছ বেশ পুষ্ট, সবল ও সতেজ হয় এবং যে-সকল গাছে অপরাপর বাঞ্ছনীয় গুণগুলি থাকে সেই সকল গাছ বাছিয়া বাছিয়া কেবল সেই সকল গাছ হইতেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত; ইহাতে একটু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু সেই পরিশ্রমের ফলে পরবর্ত্তী বৎসরের ফসলের দ্বারা লাভও প্রচুর হইবে।

বীজ রাখা সম্বন্ধেও বিশেষ যত্ন লওয়া দরকার; এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলি পালন করা উচিত:

১। যে-পাত্রে বীজ রাখা হইবে তাহার মুখ এমনভাবে বন্ধ রাখা উচিত, যাহাতে পাত্রের মধ্যে বাতাস, আলো, কিম্বা কোন পোকামাকড় প্রবেশ করিতে না পারে।

২। পাত্রের চারিদিকের জায়গা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

৩। বীজ ভাল ভাবে শুকাইয়া পাত্রে রাখা আবশ্যক।

বীজ হইতে কি পরিমাণ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া বীজ বপন করিলে ভাল হয়; এই পরীক্ষা শক্ত নয়, একখানা মাটির ছোট থালায় কিম্বা কাঁচের ডিসে একখানা ব্লটিং কাগজ পরিমাণ মত কাটিয়া উহার ভিতর ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে হয়; পরে ঐ থালায় কিম্বা ডিসে জল ঢালিয়া ব্লটিং কাগজখানা ভালভাবে ভিজাইয়া পাত্র হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া উহা হাত দিয়া চাপিয়া শক্ত ভাবে বসাইয়া দিতে হইবে; ইহার পর কোনরূপ বাছাই না করিয়া ১০০টি বীজ ঐ ব্লটিং কাগজের উপর অল্প একটু ফাঁক ফাঁক করিয়া বিছাইয়া দিতে হইবে; একটি চিমটার সাহায্যে এই কাজ হইতে পারে। পরে থালাটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে; ব্লটিং কাগজ শুকাইয়া গেলে উহা আবার ভিজাইয়া দিতে হইবে—ভিজাইবার সময় বীজগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া গেলে একটা চিমটার দ্বারা উহাদের পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক দিন যে-বীজগুলি হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহা গণনা করিয়া রাখিতে হইবে; সকল শস্যের বীজ হইতে সমান সময়ে অঙ্কুর বাহির হয় না; বীজ উৎকৃষ্ট হইলে অল্পদিনের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণভাবে অঙ্কুরিত হইবে। শেষ পর্য্যন্ত কয়টি বীজ

অঙ্কুরিত হইল তাহা গণনা করিয়া বীজের শতকরা কতটি গজাইল তাহা দেখিতে হইবে। মোটামুটি শতকরা নব্বইটি বীজ গজাইলেই উহাকে ভাল বীজ বলিয়া গণ্য করা হয়।

৬

শস্যের শ্রেণীবিভাগ

অতি সাধারণ ভাবে শস্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন বন্যজাত ফসল, ক্ষেত্রজাত ফসল এবং উদ্যান-জাত ফসল। কিন্তু শস্যের বপন, বৃদ্ধি বা শস্য কাটার ঋতু অনুসারে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাহাই অধিক প্রচলিত। এই শ্রেণীবিভাগ এইরূপ :

(১) রবি বা চৈতালি ফসল—যে-সকল ফসল পৌষ মাঘ মাসের পর কাটা হয় তাহাদিগকে রবি বা চৈতালি ফসল বলে ;

(২) ভাদুই বা খরিপ ফসল—যে-সকল ফসল শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসে কাটা হয় তাহাদিগকে ভাদুই বা খরিপ ফসল বলে ;

(৩) যে-সকল ফসল অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে কাটা হয় তাহাদিগকে অঘ্রানী ফসল বলে।

উপরোক্ত দুই রকম শ্রেণীবিভাগ ছাড়া নিম্নের শ্রেণী-বিভাগও প্রচলিত আছে :

(১) ঘাস জাতীয় শস্য—ধান, গম, যব, ভুট্টা, কাওন ইত্যাদি।

(২) ডাল শস্য—ছোলা, মটর, মুসুর, মুগ ইত্যাদি।

(৩) তৈল শস্য—সরিষা, তিষি, তিল, রেড়ী, চীনা-বাদাম ইত্যাদি।

(৪) তন্তু শস্য—পাট, শণ, কাপাস, রিয়া।

(৫) রং শস্য—কুসুম ফুল, নীল ইত্যাদি।

(৬) মাদক জাতীয় শস্য—তামাক, গাঁজা, চা ইত্যাদি।

(৭) মসলা—আদা, হলুদ, লঙ্কা, পিঁয়াজ, রসুন, ধনে, জিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি।

(৮) সব্জী—আলু, বেগুন, মূলা, লাউ, কুমড়া, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়শ, কচু, সীম, বিলাতী বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট, পটল ইত্যাদি।

(৯) শাকজাতীয় শস্য—পুঁই শাক, নটে শাক, কলমী শাক, ডাঁটা শাক ইত্যাদি।

(১০) বিবিধ—আখ, মাদুর কাঠি, বাঁশ, উলু, সুপারি, তুঁত, শসা, তরমুজ, ফুটি, শাঁকালু, খেজুর ইত্যাদি।

(১১) ফল—আম, নারিকেল, কাঁঠাল, পেঁপে, লিচু ইত্যাদি।

(১২) পশুখাদ্য—গিনি ঘাস, সুদান ঘাস, নেপিয়ার ঘাস, লটা ঘাস ইত্যাদি।

৭

শস্যপর্য্যায়

সকল শস্য মাটি হইতে খাদ্যের উপাদানগুলি সমান পরিমাণে গ্রহণ করে না ; ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ খাদ্যের উপাদানের প্রয়োজন হয় ; সুতরাং একই শস্য বার বার একই জমিতে উৎপন্ন করিলে উহার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তখন উহা উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাববশতঃ উত্তমরূপে বাড়িতে পারে না—কাজে কাজেই উহার ফলনও কম হয়। আবার সকল শস্য মাটির একই স্তর হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে না ; যাহাদের শিকড় মাটির ভিতর অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায় তাহারা সেইখানকার স্তর হইতে খাদ্যের উপাদান লইয়া থাকে—আবার যাহাদের শিকড় অধিক দূর যায় না—তাহারা অপেক্ষাকৃত উপরের স্তর হইতেই খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে ; সুতরাং একই শস্য বার বার একই জমিতে উৎপন্ন করিলে মাটির একই স্তরের খাদ্যের উপাদানগুলি খরচ হইয়া যায়। খাদ্যের অভাবে উহার ফলন কম হয়। সুতরাং একই জমিতে বার বার একই ফসল উৎপন্ন না করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করিলে জমির উর্ব্বরতাশক্তি অনেক পরিমাণে রক্ষা করা যায় এবং সার প্রয়োগের আবশ্যকতাও কম হয়। এইরূপ একই ভূমিতে পর্য্যায়ক্রমে মাটির বিভিন্ন স্তর হইতে খাদ্যগ্রহণকারী ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষের প্রণালীকে শস্যপর্য্যায় বলে।

বিভিন্ন প্রকারের কীট বিভিন্ন শস্যের ক্ষতি করে, যেমন যে-সকল কীট ধানের অনিষ্ট করে, সে-সকল কীট আলুর অনিষ্ট করে না—আবার যে-সকল কীট আলুর শত্রু তাহারা পাটের শত্রু নহে ; ফসলের অনিষ্টকারী কীটেরা অনেক সময়ে শস্য কাটিয়া লইবার পরও মাটিতেই বসবাস করে, মাটিতেই ডিম পাড়ে, সুতরাং পরবর্ত্তী বৎসর ঐ মাটিতে সেই শস্য উৎপাদন করিলে উহা আবার একই কীটের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়—কিন্তু পর্য্যায়-ক্রমে বিভিন্ন শস্যের চাষ করিয়া কীটের দ্বারা শস্যের ক্ষতি অনেক পরিমাণে কমান যায়।

বিভিন্ন শস্যের বিভিন্ন রোগ আছে—পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন শস্যপর্য্যায়ের প্রয়োজন,—সেইরূপ রোগের প্রকোপ হ্রাস করিবার জন্যও শস্য-পর্য্যায়ের প্রয়োজন।

"সবুজ সার" প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে শুঁটি জাতীয় শস্য জমিতে উৎপাদন করিলে জমির ফলনশক্তি বাড়ে এবং জমিতে যে-সকল আগাছা জন্মায় তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে; মাটিতে যে-সকল আগাছা জন্মায় তাহার বীজ মাটিতেই পড়িয়া থাকে এবং তাহা হইতে পুনরায় আগাছা উৎপন্ন হয়; সুতরাং শস্যপর্য্যায়ে শুঁটি জাতীয় শস্য যথা মটর, মুগ, কলাই, সরিষা ইত্যাদি উৎপাদন করিলে পরবর্ত্তী ফসলের জন্য জমির উর্ব্বরতা শক্তিও বাড়িবে এবং জমি অনেকটা পরিমাণে আগাছাশূন্য হইবে।

শস্যপর্য্যায় নির্ণয় করিবার জন্য মাটির প্রকৃতি, বিভিন্ন শস্যের শিকড়ের স্বভাব অর্থাৎ উহা জমির অভ্যন্তরে কত দূর প্রবেশ করে, বিভিন্ন শস্যের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, জমির আগাছা, বিভিন্ন শস্যের ব্যাধি ও পোকা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বর্ষার সময় যে-সকল জমিতে বন্যার জল আসে সে সকল জমিতে পলিমাটি সঞ্চিত হয়। এই সকল জমিতে শস্যপর্য্যায়ের প্রয়োজন হয় না।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব একেবারে আকস্মিক নহে। তাঁহার সাক্ষাৎভাবে রাজনীতিতে যোগদান স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু উৎসাহ ও উপদেশ দ্বারা রাজনৈতিক কর্ম্মীদের প্রেরণা দিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে মাত্র প্রথম চল্লিশ বৎসরের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এই অংশ কর্ম্মতৎপরতায় উজ্জ্বল। ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, এমন কি রাজনীতিতেও তিনি এই সময় মধ্যে সাক্ষাৎ ও সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মজীবনীতে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইলেও রাজনীতিক কার্য্য সম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ নীরব। তবে ইহার মধ্যেই এক স্থলে ঐ বিষয়ের সূত্র পাইতেছি। দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,—

> "যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার পূর্ব্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে,—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।"*

ইহা ইংরেজী ১৮৪৫-৪৬ সালের কথা। ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভিত্তিতে মিলিত হইলে ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনও যে সম্ভব এ বিশ্বাসও তিনি এই সময়ে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন। প্রয়োজন অনুভব করিবামাত্র ইহাতে শুধু যোগদান নয়, দেবেন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে লিপ্তও হইয়া পড়িলেন।

২

মহর্ষির রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম্মধারা অনেকটা পৈতৃক। পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের জীবিতকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলোপের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে একযোগে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় চারি বৎসর পরে কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেকার আইন রহিত করায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশে ও বিদেশে ভারত-হিতের জন্য যে-সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, দ্বারকানাথ তাহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালের বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ও ১৮৩৭ সালের ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠার মূলে তিনি ছিলেন। বিলাতে এডাম-প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বারকানাথ প্রথম বার (১৮৪২) বিলাত পর্য্যটন শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিরই একজন উৎসাহী সভ্য, পার্লামেণ্ট-সদস্য প্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ টমসনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। বঙ্গের তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ নব্যদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বারকানাথ টমসনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। নব্যদল ইহার পূর্ব্বেই রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। টমসনকে পাইয়া তাঁহারই সাহায্যে তাঁহারা রাজনীতি-চর্চ্চাকে সুনিয়ন্ত্রিত, নিয়মানুগ ও স্থায়ী করিবার

*বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃঃ ১০৭।

জন্য বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা ভারতবর্ষীয় সভা (এপ্রিল ১৮৪৩) স্থাপন করিলেন। প্রবীণেরা ইহার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের অগ্রণীস্থানীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর যে এই সভা প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্বেকার মৃতপ্রায় ভূম্যধিকারী সভাও টমসন ও দ্বারকানাথের প্রেরণায় এই সময় কতকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্র হইল প্রথম দিকে ইহা অপেক্ষা কতকটা ভিন্ন ধরণের। তিনি তখন প্রকাশ্য ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দিয়া শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য উচ্চাঙ্গের হিন্দু বা ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে সমাজ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় সে দিকেই বিশেষ যত্নপর হইয়াছিলেন। এই সময়ে যাঁহারা মুখ্যতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারাও অনেকে তাঁহার কার্য্যে সহায় হইলেন।

৩

কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই উপযুক্ত প্রেরণার অভাবে কি ভূম্যধিকারী সভা, কি ভারতবর্ষীয় সভা (বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি) উভয়ই যেন নির্জীব হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষে ১৮৪৯ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন! এই বৎসরে ভারত-সরকারের ব্যবস্থা-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন শাসন-সৌকর্য্যার্থ চারিটি আইনের খসড়া রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন। এ খসড়া আইন চারিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল—ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মফস্বলস্থ সরকারী আদালতসমূহের অধীনে আনা এবং ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে যে বিচার-বৈষম্য দেখা দিতেছিল তাহা কথঞ্চিৎ দূরীভূত করা। পরবর্ত্তী কালের ইলবার্ট বিলের মূলও আমরা এই খসড়াগুলির মধ্যে পাই। খসড়াগুলি যেমনি প্রকাশিত হইল অমনি যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়িল। তখন ইউরোপীয় সমাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, এবং আইন যেন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ ভান করিয়া ইহার নাম দেয় "Black Acts" বা কাল আইন! বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি রামগোপাল ঘোষ ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে খসড়া আইনগুলির সমর্থন করিয়া ইউরোপীয় সমাজের অহেতুকী উষ্মার তীব্র নিন্দাবাদ করিলেন। ইউরোপীয়েরা তখন এতই হিতাহিত-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়াছিল যে, এগ্রিকাল্‌চারাল্ এণ্ড হরটিকাল্‌চারাল্ সোসাইটির সহকারী সভাপতির পদ হইতে রামগোপাল ঘোষকে তাহারা ভোটের জোরে অপসারিত করিল! শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমাজের জিদই বজায় রহিল, ভারত-সরকার প্রস্তাবিত আইনের খসড়াগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতনা বা মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে এই ঘটনাটী বিশেষ স্মরণীয়। ইহার পরই, ইউরোপীয় সার্থক ঐকমত্য দৃষ্টে ভারতবর্ষের প্রবীণ নবীন, রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকলেই ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। ভারতবর্ষীয় সভা ও ভূম্যধিকারী সভা যাহাতে একযোগে কাজ করিতে অগ্রসর হন সেই উদ্দেশ্যে রামগোপাল ঘোষ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আর একটি কারণেও একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। ১৮৫৩ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন করিয়া সনন্দ পাইবার কথা। সুতরাং নূতন সনন্দ যাহাতে ভারতবর্ষের অধিকতর হিতকর হয়, সেজন্য ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নিজেদের মত জ্ঞাপন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সব প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্তই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠানটিও বাংলায় ভারতবর্ষীয় সভা নামে অভিহিত হইত।

৪

ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠার কথা অল্প-বিস্তর অনেকেই জানেন। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় সম উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বেকার ভূম্যধিকারী সভা পুনরুজ্জীবনের আশায় আর একটি রাজনৈতিক সভারও অনুষ্ঠান হয়। সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, মনে হয়, এই রাজনৈতিক সভাটিই পরে ভারতবর্ষীয় সভায় রূপান্তরিত হয় এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির নেতৃবৃন্দও ইহার সঙ্গে যোগদান করেন। প্রথম সভাটির কথাই আগে কিছু বলিব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন। ইহার উদ্বোধন-অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে এই মর্ম্মে লেখেন, "প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কোন কাজের সঙ্গে তাঁহাদের নাম যুক্ত হইতে দিবেন না যাহাতে তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিবার আশা না

রাখেন।...এবারে ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্বাধীনচেতা মান্যগণ্য লোকই আমরা পাইয়াছি।"* এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হইল—"The National Association।" "দেশহিতার্থী সভা" নামে 'সমাচার দর্পণে' ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। 'বেঙ্গল হরকরা' উক্ত তারিখে এই সভা সম্পর্কে আরও লেখেন,—

"Revival of the Landholders' Society.—

. . . A meeting of the respectable native Zemindars, resident in and about Calcutta, was called last Sunday [Sept. 14] at the house of Raja Protap Narayan (?) Sing, at Paukparrah. It was composed of about fifty native gentlemen, amongst whom the following names may be mentioned, namely, Baboo Prosunno Coomar Tagore, Baboo Debendernauth Tagore, Raja Protap Narayan (?) Sing, and Baboo Kally Coomar Roy. The Society was christened the 'National Association.' Amongst other things it was resolved that the meeting take into their consideration some effective means to ensure the permanency of the Association. . . ."

নেশনাল এসোসিয়েসন বা দেশহিতার্থী সভার এই অধিবেশনেই ইহার উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপ্রণালীও কয়েটি প্রস্তাবের আকারে নির্ণীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি পরবর্ত্তী ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা' প্রকাশ করেন। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আনুপূর্ব্বিক আলোচনায় ইহার গুরুত্ব কম নহে। দেবেন্দ্রনাথ এই সভার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনিও যে এই প্রস্তাবসমূহের প্রধান সমর্থক ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও ইহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"Whereas it appeared that some of the laws which have emanated for the last few years from the Legislative Council of the British Indian Empire, militate against the rights and possessions of the subjects of this empire, and whereas the proceedings of some of the officers connected with the judicial administration of the country in applying a departure from the resolutions as to the manner in which the country is to be governed, and thereby frustrating the expectations as to the nature of the administration of this empire, it is resolved that a Society be formed under the designation of the "National Association" for the purpose of adopting measures which may contribute to the welfare of the country. The Society to be composed of members of all classes of the subjects of this empire, without any distinction of creed, caste, or colour. That by the help of this Association, we may be able to assert our legal rights by legitimate means, it is resolved to apply for any amendment or reform, as the case may be, either to the Local Government or to the authorities in England.

"That in order to carry out the views of the Society a fund be raised by subscription, such fund to defray the expenses of a local office and to support an agent in England to act for this association before the Imperial Parliament of Great Britain.

"Agreeably to this resolution we subscribe the sums affixed against our names, and bind ourselves and our heirs and representatives to pay the same at least for the three following years, as that period embraces the most important of the operations of the Association, since it is expected that the East India Company's Charter will be renewed during that time, so we may have an agent in that time in England to lay before the Imperial Parliament our wants and grievances when that question comes on for discussion before that body.

"In order to carry out the objects proposed by this Association, we do hereby most solemnly declare that we will do all that lies within the sphere of our respective means and abilities, for the furtherance of these objects."

উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। যে বিষয়টি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল এই যে, নেতৃবর্গ ইংরেজাধিকৃত সমগ্র ভারতবর্ষকেই সম্মুখে রাখিয়া ইহার শাসন-কার্য্যের সংস্কারপ্রার্থী হইয়াছেন। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। তৃতীয় কথা হইল—সভার স্থায়িত্ব সাধনের উপায় সম্পর্কে অবধারণ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ প্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত (১৮৫৩)—অন্ততঃ এই তিন বৎসর এদেশে ও বিদেশে আন্দোলন চালাইবার নিমিত্ত যে অর্থের প্রয়োজন তাহা জোগাইতে সভ্যগণ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ বাধ্য থাকিবেন। ভারতবর্ষে একটি আপিস পরিচালনা ও বিলাতে একজন প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য ভাণ্ডার খুলিবার প্রস্তাবও ধার্য্য হইল। এই প্রস্তাবগুলির শেষাংশে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সভ্যগণের দৃঢ় সঙ্কল্পের দিকেও আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। 'সমাচার দর্পণ' (১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫১) কিন্তু এই সভাকে জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গঠিত সভা বলিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই!

৫

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার দেড় মাসের মধ্যেই ঐ একই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সভা দেশহিতার্থী সভারই পরিণতি বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শেষোক্ত সভার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেন। তিনি ইহার প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক হইলেন। এই সভা প্রতিষ্ঠার কথা ঐ সময়কার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ফ্রেণ্ড অফ্

* "We have an assurance, that such men as Baboos Prosunno Coomar Tagore and Debenderanath Tagore will never associate their names with an undertaking which they do not hope to carry out. . . . This time we have independent and honourable men for leaders and prime movers."

ইণ্ডিয়া' ২৭শে নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'সিটিজেন' হইতে সভা-প্রতিষ্ঠার সংবাদটি এইরূপ উদ্ধৃত করেন,—

"British Indian Association :—The *Citizen* of the 18th instant informs us, that a meeting of the most worthy and influential native gentlemen of Calutta was held on the 29th of the last month, when it was resolved that 'a Society be formed for a period of not less than three years under the denomination of the British Indian Association, and that the object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interests of Great Britain and India and ameliorate the condition of the native inhabitants of the subject territory.' The rules have been drawn up with the most elaborate care, and amount to no fewer than 47."

এই উদ্ধৃতি হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার মূল উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ ২৯শে অক্টোবর পাইতেছি। প্রচলিত পুস্তকাদিতে প্রতিষ্ঠার তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১৮৫১, ৩১শে অক্টোবর। রাজা রাধাকান্ত দেব ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই সভা সম্পর্কে তিনখানি পত্রের পাণ্ডুলিপি পাইয়া আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র * প্রকাশিত করিয়াছি। তাহাতেও ইহার উদ্দেশ্য এবং প্রথম দিক্‌কার কার্য্যাবলীর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। এসোসিয়েশনের পরিচালক-সভায় রক্ষণশীল প্রগতিবাদী উভয় দলের প্রতিনিধিই গৃহীত হইলেন। ইহার সভাপতি হইলেন—রাজা রাধাকান্ত দেব; সহকারী সভাপতি—রাজা কালীকৃষ্ণ; সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সম্পাদক—দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা); সদস্য—রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

৬

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানাদির পর দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক রূপে সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। উপরে যে তিনখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে চৌকীদারি ব্যবস্থা ও লাখেরাজ ভূমি সম্পর্কে আবেদনের কথা আছে। এই সময়ে গ্রামে গ্রামবাসীদের ব্যয়ে চৌকীদার নিয়োগের প্রস্তাব হয়। চৌকীদার নিয়োগের ব্যয়ভার বহন করা যে গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য, কারণ দেশ-



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩০ বৎসর বয়সে)

শাসনের জন্য ও শান্তি রক্ষা কল্পে তাঁহারা নানা ভাবে কর আদায় করিয়া লইতেছেন—এসবের স্পষ্ট উল্লেখ এই আবেদনে ছিল। সভা-প্রতিষ্ঠার পক্ষকাল মধ্যেই ১১ই ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে একযোগে কার্য্য করিবার জন্য একখানি লিপি প্রেরণ করেন। তখন বোম্বাইয়ে একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সভাও স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই মর্ম্মে লিখিলেন যে, ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণপ্রায়, এ সময় একযোগে কাজ করিলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা হইবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বতন্ত্র এজেণ্ট নিয়োগের জন্য অর্থ ব্যয় হইবে প্রচুর। সমগ্র দেশের তরফে একজন এজেণ্ট নিযুক্ত হইলে শুধু ব্যয়ভারই লাঘব হইবে না, পরন্তু ভাবী শাসন-সংস্কার বিষয়ে সমগ্র দেশবাসীর ঐকমত্য প্রকাশেও সুবিধা হইবে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে আরও জানান যে, ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষীয় সভা এই জন্য ষোল হাজার টাকা তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।* এই লিপিখানিতে যে সমগ্র-ভারতীয়

* *The Calcutta Municipal Gazette*, July 11, 1942. পৃঃ ২৬৫-৬৬।

* এই লিপিখানির কিয়দংশ সি. এফ্. এণ্ড্রুজ ও গিরিজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত *The Rise and Growth of the Congress* পুস্তকে (পৃঃ ১৫৬-৫৭) উদ্ধৃত হইয়াছে।

মনোভাব প্রকট, তাহারই পূর্ণ বিকাশ হইল ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেসে।

দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বসাকুল্যে দুই বৎসর দেড় মাস কাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। এ সময় মধ্যে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা-যত্নে এই সভা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজে ইহার একটি শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে অন্যত্রও ইহার আদর্শে সভা-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমে অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য গঠিত হইলেও, ভারতবর্ষীয় সভা যে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিয়াছিল তাহার মূলেও দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অনেকখানি।

দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকা কালে চৌকীদারি আইন, লাখেরাজ ভূমি সম্পর্কীয় আইন, গবর্ণমেণ্ট লবণ উৎপাদন একচেটিয়া করিয়া লওয়ায় জমীদার ও প্রজার অসুবিধা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভা আলোচনা করেন, প্রতিবাদলিপিও সরকারে পেশ করেন। কিন্তু এই সময়কার সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল ভারতবর্ষীয়—সভার তরফে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে স্মারক-লিপি প্রেরণ। এই স্মারক-লিপি রচনায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিল বলিয়া জানা যায়। হরিশ্চন্দ্র পরে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই স্মারক-লিপিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহের শাসন-নীতির আদর্শে ভারতবর্ষেও স্ব-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞাপিত হয়, এবং ইহার প্রথম ধাপ-স্বরূপ প্রস্তাবিত ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পদে ভারতীয় গ্রহণের আবেদনও জানান হয়। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ যে এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন তাহা আর বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

৭

দেবেন্দ্রনাথ কখন্ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন তাহা এত দিন অনেকেরই জানাই ছিল না। শ্রীযুক্ত বিমান-বিহারী মজুমদার তাঁহার *History of Political Thought, etc.* পুস্তকে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনিও ইহা জানিতে পারেন নাই (পৃঃ ২০২)। সম-সময়ের সংবাদপত্র হইতে দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদক-পদ ত্যাগের সঠিক সংবাদ ও সময় জানা যায়। ১৬ই জানুয়ারি, ১৮৫৪ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' ১৪ই জানুয়ারির 'সিটিজেন' পত্রিকা হইতে এই সংবাদটি উদ্ধৃত করেন,—

"The British Indian Association.—

"Yesterday was held the Third (?) Annual Meeting of that flourishing Institution, the British Indian Association.

"Baboo Debendernath Tagore tendered his resignation of the post of Secretary, which he has very ably filled since the first formation of the Society, and has been succeeded in the honorary but onerous appointment by Isser Chunder Singh, brother of Rajah Protaub Chunder Singh.

"We understand it to be the intention of several of the members of the movement (?) party among the Natives to relieve one another in succession as Secretaries to the Association at intervals of two years or thereabouts, in order that the acceptance of the office may not be considered so arduous an undertaking as to deter applicants."

এই উদ্ধৃতিতে একটি ভুল রহিয়াছে। এই অধিবেশন ভারতবর্ষীয় সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন নহে, দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। দেবেন্দ্রনাথ ১৩ই জানুয়ারি ১৮৫৪ তারিখে ভারতবর্ষীয় সভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। উপরের উদ্ধৃতিতে দেবেন্দ্রনাথের পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধেও কিছু জানা যাইতেছে। সভার সদস্যদের মধ্যে এক দল এই মত পোষণ করিতে লাগিলেন যে, দুই বৎসরের অধিক কাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে একই ব্যক্তি অধিষ্ঠিত না থাকিয়া অন্যদের এই ভার বহনের সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। দেবেন্দ্রনাথও সানন্দে এই গুরু ভার অন্যের স্কন্ধে ছাড়িয়া দিলেন।

পরবর্ত্তী ১৭ই জানুয়ারি তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় এই দ্বিতীয় বার্ষিক সভার একটি পূর্ণতর বিবরণ প্রকাশিত হয়। একটি প্রস্তাবে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ও সহকারী সম্পাদক দিগম্বর মিত্রের কার্য্যের প্রশংসাবাদ করা হয়। এবারে সভার সম্পাদক হইলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। 'হরকরা'র বিবরণ হইতে আবশ্যক অংশ এখানে দিলাম,—

"British Indian Association.

"The second annual meeting of the Association was held on the 13th instant, Rajah Kalikrishna, Vice-President, in the Chair.

* * * *

"III. Proposed by Rajah Pertaubchunder Singh, and seconded by Baboo Ramgopaul Ghosh.

"That the meeting accept with regret the resignation by Baboo Debendernauth Tagore and Baboo Digumber Mitter of the offices of Secretary and Assistant Secretary of the Association, which they have respectively held from its institution; and that their cordial thanks be tendered to those gentlemen for the able and zealous services rendered by them to the Association."

এই দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষীয় সভার যে নূতন পরিচালক সভা গঠিত হয় তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ এক-

জন সদস্য রহিলেন। পরিচালক-সভার সদস্যের তালিকায় এবারে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরও নাম পাইতেছি।

৮

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অতঃপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে দেখি না। তবে সুপ্রসিদ্ধ নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলার পশ্চাতে (১৮৬৭ সাল) যে তাঁহার মহতী প্রেরণা ছিল তার প্রমাণ আছে। পরবর্ত্তী কালের ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেসের প্রতিও তিনি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বহু বার কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বদেশ সেবায় উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনের সম্পাদক রূপে তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই আজ সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। বিভিন্ন অঞ্চলের ভারত-বাসীর মনে সমগ্র-ভারতীয়ত্ব বোধের উন্মেষে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কখনও ভুলিবার নয়।

রামানন্দ-স্মরণে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তিনি কর্ম্মযোগী ছিলেন। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি—দেখেছি তাঁর মধ্যে নিরলস কর্ম্মীর রূপ। ছোট টেবিলটি কাগজে চিঠিপত্রে ভর্ত্তি। চেয়ারে ব'সে তিনি একমনে কাজ করছেন। সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে যখনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি—একই মূর্ত্তিতে আমার কাছে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন—কর্ম্মযোগীর মূর্ত্তিতে। কোন রকমে জড়তাকে তিনি ত্রিসীমানায় ঘেঁষ্‌তে দিতেন না। বিরাট্ কর্ম্মীপুরুষ ছিলেন ব'লেই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধ'রে 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিউ'র মত এত বড় বড় দু'খানা কাগজ চালান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

জীবনব্যাপী এই যে ক্লান্তিহীন কর্ম্মতৎপরতা—এর মূলে ছিল প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি। মনে পড়ছে শান্তিপুরের ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরে একটি প্রভাতের স্মৃতি। আচার্য্যের আসনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ভাবাবেগে তিনি কাঁদ্‌ছেন—দু-চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। কণ্ঠস্বরে সে কি ব্যাকুলতা! স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির মধ্যে ভক্তির এই আবেগ লক্ষ্য ক'রে সেদিন বিস্মিত হয়ে-ছিলাম। আজকে বুঝতে পারি তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রবল গতিবেগ কোথা থেকে তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তাঁর চিত্ত ছিল ঈশ্বরমুখী। ঈশ্বরের মধ্যে তাঁর সত্তাকে তিনি ডুবিয়ে রাখতেন। কর্ম্মযোগের পথকে তিনি গ্রহণ করে-ছিলেন—কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের পথ ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে নিয়ত যুক্ত রাখার প্রকৃষ্ট পথ। এক-একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের বিদ্যুদ্দীপ্তিতে এক একজন মানুষের অন্তরের চেহারা আমাদের কাছে সহসা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। শান্তিপুরের একটি প্রভাতের স্মৃতি আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা থাকবে।

একটি সহজ আধ্যাত্মিকতা তাঁর মধ্যে ছিল বলেই তাঁর স্বভাবে অহঙ্কারের কোন উত্তাপ ছিল না। নিজের মতের উপরে তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রচুর কিন্তু যারা তাঁর কাছে আস্‌ত তাদের কারো উপরে সেই মত কখনো তিনি চাপাতে যেতেন না। নিজের মুখরতায় অন্যের কথাকে ডুবিয়ে দেওয়া অসাধারণ মানুষদের অনেকেরই একটা দুর্ব্বলতা। নিজেকে অপরের কাছে অনবরত উদ্‌ঘাটিত করতেই তারা ব্যস্ত। অন্যে কি ভাবে, অন্যে কি চোখে দেখে—তা বুঝবার কোন চেষ্টাই নেই তাদের মধ্যে। আপনাকে নিয়ে তারা এতই মশ্‌গুল! রামানন্দবাবু অসাধারণ মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা করবার মত উদারতা ছিল তাঁর মনে। অন্যের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন—তাদের বিশ্বাসের উপরে কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। আমার মতের সঙ্গে যে-মতের মিল নেই তা ভুল হ'তে বাধ্য এবং সেই ভুলের আবর্জ্জনা থেকে প্রতিবেশীর বিভ্রান্ত চিত্তকে মুক্ত করা আমার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য—এই ধরণের আত্মকেন্দ্রিক (ego-centric) পরোপকার-স্পৃহা তাঁর স্বভাবের বিরোধী ছিল। স্বাধীনতার আদর্শকে তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়েই ভালবেসেছিলেন। নিজের মনকে তিনি সত্যের পানে চিরমুক্ত রেখেছিলেন। এই জন্য নিজের চোখ দিয়ে তিনি দেখতেন, নিজের কান দিয়ে শুনতেন, নিজের মন দিয়ে বিচার করতেন। যেহেতু স্বাধীনতা তাঁর এত প্রিয় ছিল

সেই হেতুই তিনি অন্যের মনকে কখনো শৃঙ্খলিত করতে চাইতেন না। আমরা যারা তাঁর কাছে আসবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম—আমাদিগকে তাঁর উদারতা এবং পরমতসহিষ্ণুতা মুগ্ধ করে রেখেছিল। প্রতিভার লক্ষণ নম্রতা। এক দিকে যিনি আত্মমর্য্যাদায় অবিচলিত ছিলেন অভ্রভেদী হিমাচল পর্ব্বতের মত আর এক দিকে তাঁর নম্রতারও সীমা ছিল না। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের মধ্যে যে একটি আভিজাত্য আছে তাকে তিনি স্বীকার করতেন। যে-সব মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারা তাঁর এই স্বীকৃতিকে তাঁর আচরণের মধ্যে পরিস্ফুট দেখত। নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হ'য়ে বাংলার অনেক শহরে, অনেক পল্লীতে তিনি গেছেন। সেই সব পল্লীতে এবং শহরে যারা তাঁকে নিজেদের গৃহে অতিথিরূপে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা জানে কত নিরহঙ্কার মানুষ ছিলেন তিনি। সেই সব বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও কত নিকটে তিনি টেনে নিয়েছেন। এক দিকে যিনি এত গম্ভীর ছিলেন আর এক দিকে তিনি ছিলেন রসিকের চূড়ামণি। তাঁর ভাণ্ডার অজস্র হাসির গল্পে পূর্ণ থাকত। সেই সব গল্প যখন তিনি পরিবেশন করতেন তাঁর মধ্যে কৌতুকপ্রিয় সহজ মানুষটিকে দেখে ভারি আনন্দ পেতাম।

তাঁর সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই সঞ্চারিত ছিল একটি শান্ত ছন্দ। কখনো কোন বিষয়ে তাঁকে বিচলিত হ'তে দেখি নি। বক্তৃতা করতেন কিন্তু তার মধ্যে কোথাও উত্তেজনা থাকত না। অত্যন্ত সহজভাবে তাঁর কথাগুলি ব'লে যেতেন। প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে বলতেন, প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে লিখতেন। নিজেকে নিজের শাসনে রাখবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। তাঁর কোন কাজের মধ্যে শিথিলতার লেশমাত্র থাকত না। সর্ব্বদার জন্য নিজেকে জাগ্রত রাখতেন, উদ্যত রাখতেন। ইংরেজীতে যাকে self-possessed বলে, তিনি ছিলেন তাই। তাঁর জীবনের ধারা তাঁর শুভবুদ্ধির নির্দ্দেশকে সর্ব্বদা অনুসরণ ক'রে চলত।

নিজে মহৎ ছিলেন ব'লে মহতের সমাদর করতে পারতেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিরাটত্ব প্রথম যাঁদের দৃষ্টির কাছে ধরা দিয়েছিল রামানন্দবাবু ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিরক্ষার যাতে ব্যবস্থা হয় তার জন্য তাঁর কতই না আগ্রহ ছিল। কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-বার্ষিকীতে আমন্ত্রিত হ'য়ে সেবার একত্র চলেছিলাম। আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম। তিনি আমার পাশেই আসন নিলেন। বললেন: 'তীর্থস্থানে চলেছি, থার্ড ক্লাসে যাওয়াই উচিত।' বড়কে কেমন ক'রে সম্মান দিতে হয়—তা তিনি ভাল ক'রেই জানতেন।

কিন্তু মানুষের মর্য্যাদায় আঘাত দিয়েছে যারা তাদের কখনো তিনি ক্ষমা করতেন না। কোন রকমের দুর্ব্বলতাই তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেত না। মানুষের জীবনের মূল্য আর সব কিছুর মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে এবং সেই জীবনের মর্য্যাদায় যারা আঘাত দেয় তারা ক্ষমার যোগ্য নয়—এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। এই জন্য শাস্ত্রের মুখোস প'রে যা-কিছু মানুষকে অনাদরের ধুলায় ঠেলে রাখতে চেয়েছে তাকে তিনি নিমেষের জন্যও মার্জ্জনা করেন নি। তাঁর লেখায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নির্ম্মম অভিযানের ডমরু নিনাদ। অবরোধ-প্রথাকে জোরের সঙ্গে বারম্বার তিনি আঘাত হেনেছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সবল লেখনী মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর 'প্রবাসী'র এবং 'মডার্ন রিভিউ'র পাতায় অগ্নি উদ্গীরণ করেছে। শান্তি তিনি কামনা করেন নি, তিনি চেয়েছিলেন জীবনকে আর সেই জীবন—যেখানে মানুষের ব্যথা, যেখানে সংগ্রাম, যেখানে ঝড় এবং শিলাবৃষ্টি—সেখানে। তাই তাঁর মধ্যে আমরা দেখলাম ভীষ্মের প্রচণ্ড-মনোহর যোদ্ধরূপ। প্রবলের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা ক'রে তিনি আজীবন লড়াই ক'রে গেছেন। অন্ধকারের শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে চিরজয়ী আলোকের লড়াই! মৃত্যুর জালকে ছিন্ন করবার জন্য চিরন্তন প্রাণের লড়াই!

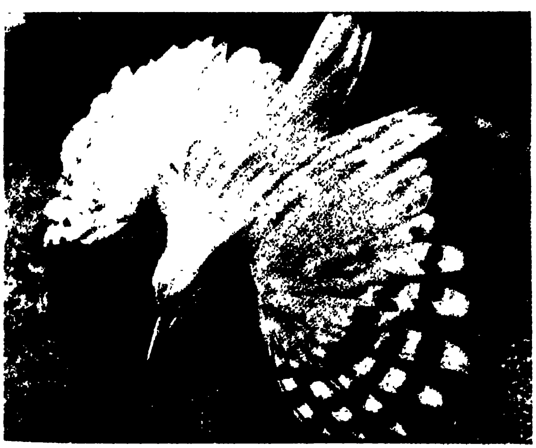
তাঁর অন্তরলোকে চিরজাগ্রত ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেই ভারতবর্ষকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্য তাঁর লেখনীকে তিনি তরবারির মত ব্যবহার করেছিলেন। What we think determines what we are and do—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমাদের চিন্তা যেমন হবে—আমাদের আচরণও তেমনই হবে। রামানন্দবাবু তাই আমাদের চিন্তাধারাকে নতুন আদর্শের দ্বারা রাঙিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আর সে আদর্শ জ্বলন্ত আত্মসম্মান-বোধের আদর্শ। ন্যাশনালিজ্‌ম্ বা জাতীয়তাবাদের মধ্যে এই আত্মমর্য্যাদার শঙ্খধ্বনি। ভারতবর্ষকে শাসন করবার অধিকার আছে একমাত্র ভারতবাসীদের। অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র মর্য্যাদা নেই আর যেখানে জীবন হারিয়ে ফেলেছে তার মর্য্যাদা সেখানে অস্তিত্ব একটা বিরাট্ অভিশাপ। আত্মমর্য্যাদাবোধ তাঁর অতিশয় তীব্র ছিল—তাই পরাধীনতার বেদনা তাঁর পক্ষে

এত দুঃসহ ছিল। রণক্ষেত্রের একেবারে মাঝখানে তিনি অবতীর্ণ হ'তে পারেন নি সত্য—কিন্তু তাঁর জ্ঞানকে কর্ম্মের সেবায় তিনি সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বীরের যে কর্ম্মধারা দিকে দিকে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে স্বদেশকে গৌরবের মধ্যে মুক্ত করবার জন্য—রামানন্দবাবু তাঁর লেখনীকে নির্ভয়ে ব্যবহার ক'রেছিলেন সেই কর্ম্মধারার সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে। দুর্ভাগা সেই দেশ যেখানে কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিচ্ছেদ—এ সত্য তাঁর কাছে অজানা ছিল না। স্বদেশকে স্বাধীনতার পথে আগিয়ে যেতে 'প্রবাসী'র এবং 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি কতখানি যে সাহায্য করেছে—তার কোন পরিমাণ হয় না। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আধুনিক ভারতবর্ষের একজন স্রষ্টা। জাতির ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার অশ্রুসজল প্রণাম নিবেদন করি।

পাখীর নৃত্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার মধ্যেও জীবমাত্রেরই আমোদ-আহ্লাদ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। খেলাধুলা, নৃত্যগীত প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে তাহার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। মনুষ্য-সমাজের তো কথাই নাই, মনুষ্যেতর



কণ্ডি-পাখী নৃত্য করিবার পর সঙ্গিনীর সম্মুখে ডানা প্রসারিত করিয়া অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাটিতে বসিয়া পড়ে

প্রাণীদের মধ্যে পাখীর গান, ব্যাঙের ঐকতান, কীট-পতঙ্গের বাজনা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু নৃত্যকলার চর্চ্চা মনুষ্য-সমাজেরই একচেটিয়া—আপাত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিতে বলীয়ান; অন্যান্য প্রাণীদের মত সে কেবল সংস্কারের বশেই পরিচালিত হয় না। বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় সে তাহার সংস্কারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। অনুশীলনের ফলে সে রুচি বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী নৃত্যকলার বহুবিধ উৎকর্ষ সাধন করিয়া লইয়াছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়াই মনুষ্যেতর বিভিন্ন প্রাণীর নৃত্যগীত নির্দ্ধারিত সময়ে বৈচিত্র্যহীন ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সমগ্রভাবে



মিলনের পূর্ব্বে পুরুষ টার্কি সঙ্গিনীকে তাহার পালকের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছে

দেখিলে বিভিন্ন প্রাণীর নৃত্যভঙ্গীর একটা বিস্ময়কর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইবে। মনুষ্যসমাজে যেমন নরনারী-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী-জগতে কিন্তু সাধারণতঃ সেরূপ কোন ঘটনা ঘটে না। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে যৌন-নির্ব্বাচন অথবা যৌন-মিলনের প্রাক্কালেই সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী অথবা উভয়ে

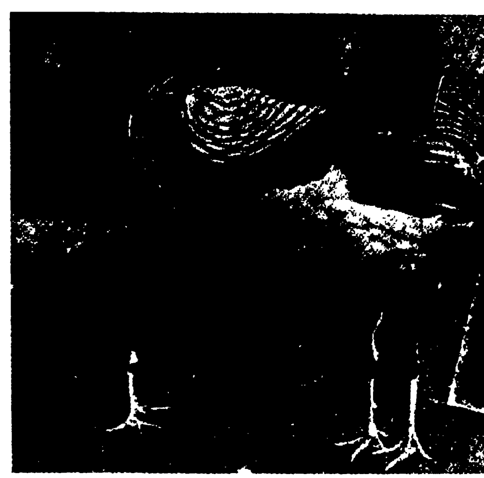
একযোগেই সঙ্গীত অথবা নৃত্যচর্চ্চা করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রকায় ডোরাদার মক্ষিকা, কাণকোটারি এবং উকুন্তু-পিঁপড়েরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিরূপ অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করে তাহা অনেকেরই হয়তো নজরে পড়িয়া থাকিবে। আমাদের দেশের মৎস্য-শিকারী জলচর



'ইগ্রেট' পাখীর অপূর্ব্ব বর-সজ্জা

মাকড়সা এবং ক্ষুদ্রকায় মেঠো-মাকড়সার নৃত্যপদ্ধতি দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। যৌন-মিলনের পূর্ব্বে সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত পুরুষ-মাকড়সা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে থাকে। মিলনের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ-মাকড়সা স্ত্রী-মাকড়সার উদরস্থ হয়। কোনক্রমে পলায়ন করিয়া দৈবাৎ কেহ কেহ মাত্র আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ডেঁয়ো-পিঁপড়ের অনুকরণকারী কয়েক জাতীয় পুরুষ-মাকড়সা শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ঊর্দ্ধে তুলিয়া আন্দোলন করিতে করিতে লুকোচুরি খেলিয়া স্ত্রী-মাকড়সার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন জাতীয় মাছের যৌন-নৃত্য হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যৌন-মিলনের প্রারম্ভে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পাখনা প্রসারিত করিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য-ভঙ্গীতে লুকোচুরি খেলায় মত্ত হয়। এরূপ নৃত্য-পদ্ধতির আরও অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে পাখীদের মধ্যেই যৌন-নৃত্যের আধিক্য এবং বৈচিত্র্য দেখা যায় বেশী। অবসরসময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য মানুষ যেমন গান বাজনা, নৃত্য ও অন্যান্য ললিতকলার চর্চ্চা করিয়া থাকে, খঞ্জন, দোয়েল, কাদাখোঁচা, বুলবুল, ছত্রপুচ্ছ, শ্যামা প্রভৃতি পাখীদের মধ্যে সেরূপ নৃত্যগীত, লুকোচুরি খেলাধুলা করিবার রেওয়াজ থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন-মিলনের সময়ে তাহাদের নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। বসন্তকালে যৌন-মিলনের সময়েই কোকিলের কণ্ঠস্বর খুলিয়া যায় কিন্তু অন্য সময়ে কুক্ কুক্ কিক্ কিক্ শব্দ করে মাত্র। তাছাড়া যে-সকল পাখী শারীরিক সৌন্দর্য্য অথবা নৃত্যভঙ্গী দেখাইয়া সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর মনোহরণ করিতে অভ্যস্ত যৌন-মিলনের প্রাক্কালেই তাহারা পালকসজ্জায় এবং বর্ণবৈচিত্র্যে অপরূপ শোভা ধারণ করিয়া থাকে।

মনুষ্যসমাজের বিবাহবন্ধনের বৈচিত্র্যের মত পাখীদের মধ্যেও বিবাহবন্ধনের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কাক, ঘুঘু, দোয়েল, শালিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পাখীরা এক-পত্নীক। একবার স্ত্রী-পুরুষরূপে মিলিত হইবার পর ইহারা সাধারণতঃ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ যৌন-নির্ব্বাচনের প্রারম্ভেই প্রণয়-জ্ঞাপক নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হাঁস, মুরগী, টার্কি প্রভৃতি পাখীরা বহুপত্নীক। বহুপত্নীক পাখীরা সাধারণতঃ নৃত্য-গীতের চর্চ্চা করিয়া সঙ্গিনীর মনোরঞ্জন করিবার পরিবর্ত্তে দৈহিক বলপ্রয়োগেই সঙ্গিনীদের বশীভূত করিয়া রাখে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না এমন নহে। টার্কি নামক উত্তর এবং মধ্য আমেরিকা হইতে আগত এক প্রকার পাখী আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই প্রতিপালিত হইয়া থাকে।



'আমহার্ষ্ট ফেজান্ট' তাহার গলার পালকের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সঙ্গিনীর মনোহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে

ইহারা বহুপত্নীক হইলেও যৌন-মিলনের সময়ে সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অদ্ভুতভাবে অঙ্গভঙ্গী করিয়া পালক-সজ্জা প্রদর্শন করে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর অবশেষে পুচ্ছের পালকগুলিকে পাখার মত প্রসারিত করিয়া এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত

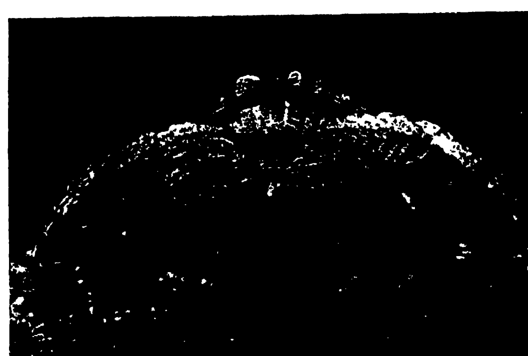
গলার পালকগুলিকে দেখাইয়া সঙ্গিনীর সম্মুখে মাটিতে বসিয়া পড়ে। কিছুক্ষণ এরূপ ব্যাপার চলিবার পর সঙ্গিনী অবশেষে স্বেচ্ছায়ই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী এবং পুরুষ পাখীদের সাময়িক ভাবে



ময়ূরীর সম্মুখে ময়ূর পুচ্ছ মেলিয়া নৃত্য করিতেছে

মিলন ঘটিতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন-মিলনান্তে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছানাগুলি উড়িতে শিখিবার সময় পর্য্যন্ত বিবাহবন্ধন স্থায়ী হয়। পুনরায় ডিম পাড়িবার সময় আবার নূতন সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে একপত্নীক এবং বহুপত্নীক পাখীদের মধ্যে যৌন-নৃত্যের প্রচলন থাকিলেও যে-সকল পাখী সাময়িকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহাদের মধ্যেই নৃত্য-চর্চ্চার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পাখীরা তাহাদের সঙ্গী নির্ব্বাচন করে; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ-পাখীরাও তাহাদের সঙ্গিনী মনোনয়ন করিয়া থাকে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই নৃত্যকুশলতার উপরই নির্ব্বাচনের সাফল্য নির্ভর করে। ইহা ছাড়া কয়েক জাতীয় পাখী দেখা যায় যাহারা উভয়েই যৌন-নৃত্যে বা প্রণয় জ্ঞাপনে সমভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মনুষ্যসমাজের নৃত্য-পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলায়িত গতি-ভঙ্গীর সহিত ছন্দোবদ্ধ পদসঞ্চালন যেমন অপরিহার্য্য পাখীদের নৃত্য-পদ্ধতি সর্ব্বক্ষেত্রেই সেরূপ নহে। ইহাদের কেহ কেহ অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, কেহ কেহ পক্ষ সঞ্চালন করিয়া আবার কেহ কেহ ছন্দোবদ্ধ পদসঞ্চালন করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। কাকেরা সাধারণতঃ বিচিত্র গ্রীবাভঙ্গী সহকারে বিচিত্র সুরে শব্দ করিয়া এবং পরস্পরের অঙ্গ কণ্ডূয়ণ করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করে। আমাদের দেশীয় শালিক, ঘুঘু, টিয়া, চিল, ছাতারে, বাবুই, টুনটুনি প্রভৃতি পাখীরা যৌন-নির্ব্বাচনের প্রারম্ভে অপরূপ ভঙ্গীতে ডানা কাঁপাইয়া, লুকোচুরি খেলিয়া কম বেশী নৃত্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। দোয়েল, বুলবুল, শ্যামা, খঞ্জন প্রভৃতির পুরুষ-পাখীরা লেজ নাচাইয়া এবং নৃত্যের ভঙ্গীতে পদ সঞ্চালন করিয়া স্ত্রী-পাখীর মনোহরণ করিতে চেষ্টা করে। স্ত্রীলাভের নিমিত্ত পুরুষ-বুলবুলদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটিতে দেখা যায়। বিজেতা তাহার মাথার ঝুঁটি ফুলাইয়া লেজ নাচাইয়া স্ত্রী-পাখীর প্রীতি অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করে। সময় সময় সুপক্ক ফল বা পোকামাকড় ঠোঁটে করিয়া প্রণয়িনীকে উপহার দিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় ছত্রপুচ্ছ-খঞ্জনের যৌন-নৃত্য একটা দেখিবার মত জিনিস। সাদা কালো পালকসমন্বিত লম্বা পুচ্ছটিকে ছত্রাকারে প্রসারিত করিয়া পুরুষ-পাখীটি অর্দ্ধ বৃত্তাকারে একবার এদিক আবার ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে থাকে। এরূপ নৃত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকে। মনে হয় যেন সোলা-নির্ম্মিত একটি সুদৃশ্য পাখী যন্ত্রসাহায্যে গতিভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছে।

কোচ-বক ও শ্বেত-বকের স্ত্রী-পুরুষেরা যৌন-নির্ব্বাচনের সময়ে অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ডাহুক, জল-পিপি প্রভৃতি পাখীরা যৌন-মিলনের প্রারম্ভে ক্ষুদ্র লেজটিকে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দ্রুত গতিতে উঁচুনীচু করিয়া টক্‌টক্ শব্দ করিতে করিতে স্ত্রী-পাখীর আশেপাশে নৃত্যের ভঙ্গিতে পদ-চারণা করে। তার পর ডানা প্রসারিত করিয়া উভয়ে মিলিয়া কিছুক্ষণ ছুটোছুটি এবং লুকোচুরি খেলিবার পর বিবাহবন্ধন পাকা হইয়া যায়। অবশেষে ঝোপের মধ্যে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া সমস্বরে গান জুড়িয়া দেয়।



পুরুষ 'সান বিটার্ণ' পাখার মত ডানা প্রসারিত করিয়া স্ত্রী-পাখার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে

সারস-পাখীরা অতি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে প্রণয়-নৃত্য করিয়া থাকে। প্রথমতঃ উভয়ে মুখোমুখি ভাবে লম্বা গলা একবার উঁচু আবার নীচু করিয়া সুবিন্যস্ত পদসঞ্চারে নৃত্য করিবার পর দুই জনেই পক্ষ বিস্তার করিয়া চক্রাকারে ছুটিতে আরম্ভ করে। তারপর উভয়েই কোন একটা ফুল, লতাপাতা বা পাখীর পরিত্যক্ত পালক ঠোঁটে করিয়া লম্ফ প্রদানে নৃত্য সুরু করিয়া দেয়। মাঝে মাঝে উঁচুতে লাফাইয়া উঠে এবং ঠোঁটের ফুল, ফল বা পালকটিকে ঊর্দ্ধে

ছুঁড়িয়া দিয়া পুনরায় লুফিয়া লয়। এরূপ নৃত্য করিবার সময় মাঝে মাঝে প্রায়ই উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহ-বন্ধনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে দেখা যায়।



পুরুষ এবং স্ত্রী কাণ্ড-পাখীরা নৃত্যের ভঙ্গীতে উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিতেছে

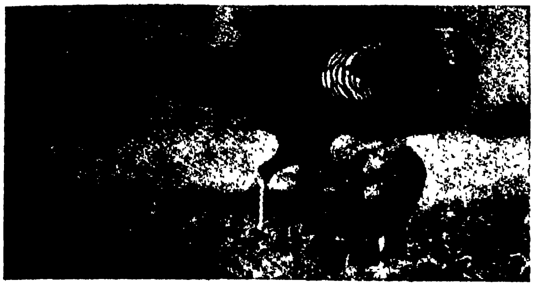
চড়ুই আমাদের অতি পরিচিত পাখী। গৃহপ্রাঙ্গণে, মাঠে, ঘাটে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-পাখী অপেক্ষা পুরুষ-পাখীগুলি দেখিতে অধিকতর সুশ্রী। পালকের বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়া স্ত্রী বা পুরুষ চড়ুই চিনিতে কষ্ট হয় না। স্ত্রী-চড়ুইয়ের পালকের রং হাল্কা খয়েরী; কিন্তু পুরুষ-পাখীর রং গাঢ় খয়েরী, তা ছাড়া গালের উভয় দিকের পালক সাদা। গলার নীচের দিকের খানিকটা অংশ কালো রঙের পালকে আবৃত। স্ত্রী-পাখীরাই তাহাদের সঙ্গী মনোনীত করিয়া থাকে। যৌন-নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পুরুষ-পাখী ডানা দুইটিকে অর্দ্ধ-প্রসারিত অবস্থায় শরীরটাকে কিঞ্চিৎ অবনমিত করিয়া সুললিত ছন্দে স্ত্রী-পাখীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। স্ত্রী-পাখী কিন্তু তাহার নৃত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অমনোযোগিতার ভাবই প্রদর্শন করে। হয়ত সে তখন আহারান্বেষণে ব্যাপৃত অথবা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে। নৃত্য করিতে করিতে পুরুষ-পাখীটি খুব নিকটে আসিয়া পড়িলে স্ত্রী-পাখীটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়া করিয়া যায়। পুরুষ-পাখীটি কিন্তু তাহাতেও না দমিয়া পূর্ণোদ্যমে নৃত্য চালাইতে থাকে। এই সহিষ্ণুতার ফলেই অবশেষে সে তাহার সঙ্গিনীর মনোহরণ করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে উভয়ে মিলিয়া বাসা নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করে। ইহার পর যৌন-মিলন ঘটে; তখন কিন্তু আর এরূপ নৃত্যানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অন্যান্য পাখীদের বেলায়ও যৌন-নির্ব্বাচনের পর উভয়ে মিলিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিবার ব্যাপারটা প্রণয়-ব্যাপারের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়।

'লুইসিয়ানা ইগ্রেট' নামক বকজাতীয় পাখীর পরস্পরের প্রতি প্রণয়-নিবেদন-পদ্ধতি এমনই অদ্ভুত যে, ইহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ-সংস্কারের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয় না। কোন সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ ইহারা পরস্পরের মনোরঞ্জন করে না। কিন্তু প্রণয়-জ্ঞাপক প্রত্যেকটি কর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে নৃত্যের ভঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গাছের ডালে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া স্ত্রী-পাখী তাহার ঠোঁটের অগ্রভাগ পুরুষ-পাখীটির ঘাড়ের উপর রক্ষা করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরূপ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিবার পর দুই জনেই অকস্মাৎ ডানা প্রসারিত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিতে সুরু করে এবং উভয়েই উভয়ের গলায় জড়াইয়া এক প্রকার নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতে থাকে। কিছুকাল এরূপ চলিবার পর একজন আর একজনের ঘাড়ে ঠোঁট গুঁজিয়া পুনরায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যে-কোন একজন খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিবামাত্রই অপর পাখীটি পায়ের উপর খাড়া হইয়া উঠিয়া উচ্চ চীৎকারে



স্ত্রী-পাখীর সম্মুখে 'ম্যাকোয়ারি ইর্কের' অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী

তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ডালে আসিয়া উপবেশন করিবার পর ঠোঁট দিয়া অতি যত্নসহকারে তাহার মস্তকের পালক বিন্যাস করিয়া দেয় এবং ডানা প্রসারিত করিয়া নৃত্যের



সোনালী-ফেজান্টের নৃত্যভঙ্গী

ভঙ্গীতে এমন ভাবে আদর-আপ্যায়ন করিতে থাকে যে তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাচ্চাগুলি উড়িতে শিখিবার পরও তাহাদের মধ্যে এরূপ আদর-আপ্যায়ন এবং নৃত্যলীলা চলিতে দেখা যায়।

পুরুষ-পায়রাদের নৃত্যকুশলতা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সঙ্গিনীকে মুগ্ধ করিবার জন্য পুরুষ-পাখীটি কখনও গলা ফুলাইয়া, কখনও বা গ্রীবাদেশ উন্নত বা অবনত করিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে। সর্ব্বশেষে উভয়ে উভয়ের ঠোঁট চাপিয়া ধরে এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের গ্রীবাদেশ একযোগে উর্দ্ধাধঃভাবে সঞ্চালিত হইবার পর যৌন-মিলন ঘটে। নিউ ক্যালিডোনিয়া এবং দক্ষিণ-সমুদ্রের কোন কোন দ্বীপে কাগু নামক এক প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রণয়-ব্যাপারে এবং যৌন-নৃত্যে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। উভয়ে প্রথম মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মস্তকের ঝুঁটি উঁচু করিয়া অবস্থান করে। তারপর শরীরটা উঁচুনীচু করিয়া উভয়েই একযোগে সমতালে কিছুক্ষণ নৃত্য করে। সর্ব্বশেষে মিলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে পুরুষ-পাখীটি গাম্ভীর্য্যের সহিত নাচিতে নাচিতে ডানা দুইটিকে প্রসারিত করিয়া অভিবাদনের ভঙ্গীতে স্ত্রী-পাখীটির সম্মুখে লুটাইয়া পড়ে।

বংশ-বিস্তারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবেই প্রাণী-সমাজে সাজসজ্জা ও বর্ণগৌরবের ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে এবং যৌন-প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ প্রাণীরা দৈহিক উৎকর্ষের অধিকারী হইয়াছে। পক্ষী-সমাজেও সাজসজ্জা ও বর্ণবৈচিত্র্যে সাধারণতঃ পুরুষ-পাখীরাই অধিকতর সৌন্দর্য্যের অধিকারী। আমাদের দেশীয় পাখীদের মধ্যে ময়ূর সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। ময়ূরী দেখিতে কদাকার তো বটেই, তাছাড়া ময়ূরের মত তাদের পুচ্ছের অস্তিত্ব নাই। সাধারণ অবস্থায় ময়ূরের সুদীর্ঘ পুচ্ছ গুচ্ছাকারে ভূমির সহিত প্রায় সমান্তরাল ভাবে থাকে; কিন্তু যৌন-মিলনের পূর্ব্বে সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত পুচ্ছটিকে পিঠের উপর খাড়াভাবে পাখার আকারে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই প্রসারিত পুচ্ছকে মা মাঝে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কাঁপাইতে থাকে এবং গ্রীবাদেশ উন্নত করিয় নৃত্যের ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ময়ূরীকে লেজের শোভা প্রদর্শন করে। প্রসারিত পুচ্ছের অপরূপ সৌন্দর্যে ময়ূরী তো দূরের কথা মানুষ পর্য্যন্ত মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকে ময়ূরী কাছাকাছি থাকিয়াও কতকটা যেন উদাসীনতার ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু এইভাব বেশীক্ষণ রক্ষা করিতে সমর্থ হ না।



গলার পালক ফুলাইয়া পুরুষ-'রাফ' স্ত্রী-পাখীর সম্মুখে নৃত্য করিতেছে



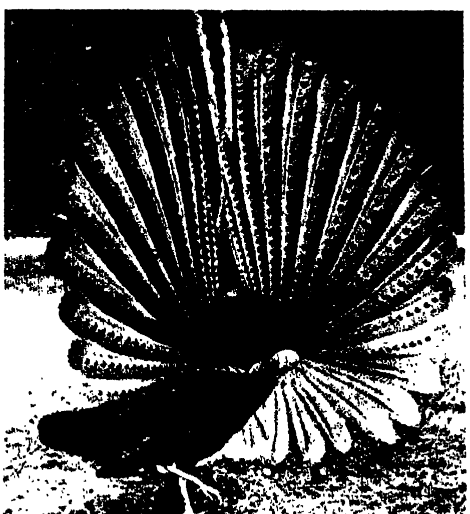
একজাতীয় পুরুষ টার্কি ডানা প্রসারিত করিয়া গলার পালক ফুলাইয়া স্ত্রী-পাখীর মনোহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার 'সান্ বিটার্ন' নামক পাখী বর্ণ গৌরবে এবং শারীরিক সৌন্দর্য্যে খুব সুশ্রী নহে। ইহাদের গায়ে রং এবং দৈহিক আকৃতিও বিশেষত্ববর্জ্জিত। যৌন-মিলনের স

পুরুষ-পাখী যখন স্ত্রী-পাখীর সম্মুখে ডানা ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে তখন কিন্তু ইহাদিগকে অতীব সুশ্রী বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মনে হয় যেন খয়েরী, সাদা এবং লাল রঙে চিত্রিত পালক সমন্বয়ে তিনখানা পাখা তাহার শরীরের তিন দিকে সজ্জিত রহিয়াছে।

আমেরিকার বক জাতীয় তুষারধবল 'ইগ্রেট' পাখীদের পালকে রঙের বৈচিত্র্য না থাকিলেও যৌন-মিলনের পূর্ব্বে ইহাদের শরীরে রেশমের মত উজ্জ্বল সুচিক্কণ কতকগুলি পালক জন্মায়। এই সুদৃশ্য পালকসমন্বিত ডানা অর্দ্ধ-প্রসারিত করিয়া এবং অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী করিয়া তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

কতকটা মুরগী এবং কতকটা ময়ূরের মত আকৃতিবিশিষ্ট 'ফেজাণ্ট' নামক কয়েক জাতীয় পাখীদের মধ্যে পূর্ব্বরাগের অপূর্ব্ব



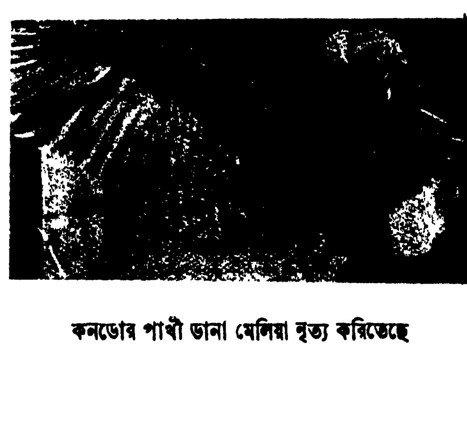
স্ত্রী-পাখীর সম্মুখে পুরুষ 'অর্গাস-ফেজাণ্টে'র নাচ

অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সকল জাতীয় 'ফেজাণ্টের'ই পুরুষ-পাখীরা সাজসজ্জায়, বর্ণগৌরবে স্ত্রী-পাখী অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর। পুরুষ-পাখীদের পুচ্ছের বাহার অপূর্ব্ব। পুচ্ছ ব্যতীতও ইহাদের গলদেশে বেষ্টনীর মত কতকগুলি ছোট ছোট পালক স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখা যায়। স্ত্রী-পাখীদের সাজসজ্জা বা বর্ণবৈচিত্র্যের বালাই নাই। যৌন-মিলনের প্রাক্কালে সাজসজ্জা ও বর্ণবৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখাইয়া পুরুষ-পাখীরা তাহাদের প্রণয়িনীদের মনোহরণ করিয়া থাকে। চীন ও তিব্বতের অরণ্যাঞ্চলে একজাতীয় সোনালী 'ফেজাণ্ট' দেখা যায়। ইহাদের পুচ্ছ অপেক্ষা গলার পালক-বেষ্টনীর লাল এবং সোনালী বর্ণবৈচিত্র্য অতীব মনোরম। নৃত্যের ভঙ্গীতে সঙ্গিনীর সমক্ষে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে গলার বেষ্টনীর সৌন্দর্য্য



'ময়ূর-ফেজাণ্ট' তাহার পালকের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া সঙ্গিনীকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে

দেখাইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করে। পুরুষ ময়ূর-ফেজাণ্টের পুচ্ছ ও গলার পালকে উজ্জ্বল সবুজ ও বেগুনী রঙের চক্রাকার দাগ খুবই সুদৃশ্য। ইহারা যৌন-মিলনের প্রারম্ভে স্ত্রী-পাখীর সান্নিধ্যে গলার বেষ্টনী ও পুচ্ছের পালক প্রসারিত করিয়া কিছুক্ষণ নৃত্যের ভঙ্গীতে ঘোরাফেরা করিবার পর হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন করে। সঙ্গিনী প্রথমতঃ উদাসীনতার ভান করিলেও অবশেষে উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। 'আর্গাস-ফেজাণ্ট' তাহার প্রণয়িনীকে মুগ্ধ করিবার জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সে তাহার ডানা ও পুচ্ছের সুচিত্রিত পালকগুলিকে পাখার মত প্রসারিত করিয়া খাড়াভাবে পিঠের উপর দিয়া প্রায় মস্তকের নিকট লইয়া আসে এবং মুখখানাকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করিয়া রাখে। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সঙ্গিনীর মনোভাব কিরূপ হয় তাহা দেখিবার জন্য পালকের মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া থাকে। সঙ্গিনী যেন এসব আমলেই আনে না; সে তাহার আহার সংগ্রহের চেষ্টায়ই ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নৃত্যভঙ্গীতে ঘুরিয়া গিয়া অন্য দিক হইতে পুনরায় তাহার সৌন্দর্য্যলীলা প্রদর্শন করিতে থাকে।



কবুতর পাখী ডানা মেলিয়া নৃত্য করিতেছে

চীন দেশীয় পুরুষ 'আমহার্ষ্ট ফেজেণ্টে'র গলার বেষ্টনীর সৌন্দর্য্য অতীব মনোমুগ্ধকর। স্তরে স্তরে সজ্জিত এই বেষ্টনীটিকে ইহারা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারে। স্ত্রী-পাখীকে মুগ্ধ করিবার জন্ম পুরুষ-পাখী গলায়-বেষ্টনীটিকে মাঝে মাঝে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে থাকে এবং প্রসারিত পালকের ফাঁক দিয়া সঙ্গিনীর মনোভাব লক্ষ্য করে।

ম্যাকোয়ারি নামক সারসজাতীয় পুরুষ-পাখীরা যৌন-মিলনের পূর্ব্বে স্ত্রী-পাখীর সম্মুখে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া থাকে। ইহার লম্বা গলাটিকে পিঠের উপর উল্টাইয়া রাখিয়া গলার পালকগুলিকে খাড়া করিয়া অপূর্ব্ব পদসঞ্চালনে নৃত্য করিয়া থাকে।

শকুনি, কনডোর প্রভৃতি পাখীরা যৌন-মিলনের পূর্ব্বে তাহাদের প্রকাণ্ড ডানা প্রসারিত করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ট্যাগোপান নামক পুরুষ-পাখীরা তাহাদের বিচিত্র বর্ণসমন্বিত ডানা প্রসারিত করিয়া সঙ্গিনীদের সম্মুখে নৃত্য করিয়া তাহাদের মনোহরণ করে।

'হুইট-ইটার' নামক পুরুষ-পাখীরা যৌন-মিলনের প্রারম্ভে স্ত্রী-পাখীদের সম্মুখে মন্থর গতিতে বিঘূর্ণিত লাটিমের মত এক স্থানে থাকিয়া ঘুরিতে থাকে। 'ল্যাপ-উয়িং' জাতীয় পুরুষ-পাখীরা যৌন-মিলনের পূর্ব্বে যেন এক রকম সম্মোহিত অবস্থায় প্রণয়িনীর সম্মুখে উপনীত হয়। অগ্রসর হইতে হইতে কখনও থামিয়া থাকে আবার কখনও বা লেজ তুলিয়া নাচিতে থাকে। অবশেষে ঘুরপাক খাইতে খাইতে মাটিতে গড়াইয়া পড়ে।

বিভিন্ন জাতীয় অন্যান্য পাখীর মধ্যেও যৌন-মিলনের পূর্ব্বে এরূপ বিবিধ প্রকারের নৃত্যকুশলতা পরিদৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এ বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসের একত্রিংশৎ অধিবেশন হবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। যে কয়জন ভারতীয় বিজ্ঞানী মৌলিক গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ এঁদেরই বিশিষ্ট একজন। তিনি ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ মেকানিক্‌সে যে গবেষণা করেছেন তার নামকরণ হয়েছে 'বসু ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্'।

বসুর উদ্ভাবিত এই তত্ত্বের পরিচয় এই প্রবন্ধে আছে। প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা থেকে শেষ পর্যন্ত কোথায় বিজ্ঞানীর কল্পনা এসে পৌছল ও কেন সত্যেন্দ্রনাথ নূতন তত্ত্ব প্রকাশে ব্রতী হলেন, সেই আলোচনাই এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও বিজ্ঞানীর ধারণায় ছিল বিশ্বের মূল উপাদান পরমাণু। এ সময়েই পরমাণুর গঠন-প্রকৃতির নূতন পরিচয় মিলল। ইলেকট্রন, রঞ্জন-রশ্মি ও নূতন তত্ত্বসমূহের আবিষ্কারে গবেষণার নূতন পর্ব্ব দেখা দিল। বিজ্ঞানীর চিন্তাধারা নূতন পরিকল্পনা আশ্রয় করে বিজ্ঞানে নবযুগ সূচিত করল। বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড-এর গবেষণা থেকে পরমাণুর গঠন-প্রকৃতির অভিনব পরিচয় হ'ল। পরমাণুর গঠন-প্রকৃতির বিজ্ঞানী যে-চিত্র পরিকল্পনা করলেন সংক্ষেপে তারই আভাস দিচ্ছি। বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত এরূপ:

পরমাণু তড়িৎশূন্য। পরমাণুর অভ্যন্তরের অংশ নিউ-ক্লিয়স, কেন্দ্রে আছে কয়েকটি প্রোটন বা ধনাত্মক তড়িৎ অর্থাৎ নিউক্লিয়স কয়েকটি প্রোটন বা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত এককের (unit) সমষ্টি। ইলেকট্রন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত, নিউক্লিয়সের বহির্দেশে নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরছে। এই কক্ষ-সমূহেরও একটা বিশেষ আকার আছে। পরমাণু ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত এককের সমষ্টি। ঋণাত্মক যুক্ত ইলেকট্রনেরা কক্ষে ঘুরছে, ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত এককের প্রোটনেরা কেন্দ্রে আবদ্ধ। পরমাণুর আণবিক সংখ্যা বাইরের ইলেকট্রনের সংখ্যার সমপরিমাণ। বাইরের ইলেকট্রনসমূহের ঋণাত্মক তড়িতের পরিমাণ ও কেন্দ্রের ধনাত্মক তড়িতের পরিমাণ সমান। হাইড্রোজেন পরমাণু একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটনের সমষ্টি। ক্রমপর্য্যায়ে ভারী পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা বেশী হয়। একটি পরমাণু পূর্ণসংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি অর্থাৎ এতে ভগ্নাংশের প্রশ্ন নেই। এক কথায় আণবিক ওজন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর গুণিতক। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা যে শুধু বিভিন্ন হয় তাই নয় এর গঠন-কৌশলও বিভিন্ন। বিভিন্ন পরমাণুর মূল উপাদানে কিন্তু সেই একই ইলেকট্রন ও প্রোটন। যে বিভিন্নতা তা সংখ্যায় ও গঠন-কৌশলে। প্রকৃতি ও রূপগত পার্থক্য, সংখ্যাগত পার্থক্য বিভিন্ন

পদার্থের পার্থক্য প্রকাশক। পরমাণুর ভর, প্রায় সমস্ত অংশই কেন্দ্রে অল্পপরিসর স্থানে অর্থাৎ নিউক্লিয়সে সংহত। এর ব্যাসার্ধ $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটারের কিছু কম। নিউক্লিয়সে ধনাত্মক তড়িতের পরিমাণ আণবিক সংখ্যার অনুরূপ। পরমাণুর ব্যাসার্ধ $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটর। ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ $১০^{-৩}$ সেন্টিমিটর। অর্থাৎ ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়সের ভিতর অনেকটা স্থান শূন্য। শূন্য স্থানের অংশ বেশী হওয়ায় পরমাণুর ভিতর সহজেই যাবতীয় দ্রুতগামী কণিকা প্রবেশাধিকার পায়। তড়িৎ পরিমাণ সমান হ'লেও ইলেকট্রন ও প্রোটনে ভর-এর পার্থক্য যথেষ্টই। হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ভর '০০০৫৪ কেন্দ্রে প্রোটনের ভর বেশী, ১'০০৭২ অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর দুয়ের যোগে হয় ১'০০৭৭৪।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে পদার্থে নূতন অস্তিত্বের সন্ধানও মিলল। এসময়ে প্রকাশিত হয়, আলফা কিংবা গামা রশ্মির আঘাতে পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তন হয়। নিউক্লিয়সকে রশ্মির সাহায্যে আঘাত দিলে প্রোটনের মত এক অদ্ভুত গঠনের উৎপত্তি হয়। আয়তনে ও ওজনে প্রোটনের মত হলেও এরা তড়িৎ-শক্তিবিহীন। এর নামকরণ হয় 'নিউট্রন'। এই নূতন পদার্থ একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সমাবেশে গঠিত। যদিও হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন অনুরূপ কিন্তু পার্থক্য যথেষ্টই আছে। নিউট্রনে প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভিতর যে ব্যবধান, তার লক্ষ গুণ ব্যবধান হাইড্রোজেন পরমাণুতে। উভয়ের ভরেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বিটা রশ্মির গবেষণা হতেও আর একটি অস্তিত্ব কল্পিত হয়। এর নামকরণ হয় 'নিউট্রিনো'। এই নিউট্রিনোও তড়িৎ-শূন্য। ভর প্রায় নেই এ কল্পনায়ও কোন অসঙ্গতি নেই। ইলেকট্রনের মতই ভারী, ইলেকট্রনের সমান, অবশ্য ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক, তড়িৎ পরিমাণ নূতন একটি পদার্থের অস্তিত্বও কল্পিত হয়। একে বলা হয় 'পজিট্রন'। পজিট্রন ক্ষণস্থায়ী, প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হয়। প্রকৃতিতে শেষ পর্যন্ত পজিট্রন, নিউট্রন ও নিউট্রিনোর অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়।

ইলেকট্রনের গতিবিধি, দৃশ্য আলোক-রশ্মি, আলফা-রশ্মি, গামা-রশ্মি ও ইলেকট্রনের পারস্পরিক প্রতি-ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়েও আশ্চর্য্যজনক নূতন তত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত হয়। প্ল্যাঙ্কের আলোক-রশ্মি সম্বন্ধীয় গবেষণা 'শক্তিকণাবাদ' (Quantum Theory) ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এ সময় বিপ্লবকারী মতবাদের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি রঞ্জন-রশ্মি কোন ধাতব পদার্থের উপর এসে পড়ে তবে ইলেকট্রন পদার্থ হতে নির্গত হয়। এই ইলেকট্রন কি বেগে নির্গত হচ্ছে তার রশ্মি যে ঈথার-তরঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। রশ্মির ঔজ্জ্বল্য মৃদু কিংবা তীব্র যাই হোক, নির্গত ইলেকট্রনের বেগ সব সময়েই এক। এই ঔজ্জ্বল্য হতে জানতে হয় ইলেকট্রন সংখ্যায় কত বের হচ্ছে। অর্থাৎ নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্ভর করে। রশ্মির আঘাতে ইলেকট্রন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে 'রশ্মি-তড়িৎ-ক্রিয়া' বলা হয়। এই ক্রিয়ার মীমাংসা পূর্বের তরঙ্গবাদ হতে সম্ভব হয় না। প্রথমে 'কোয়ানটামবাদে'র উৎপত্তি হয় এই সব নানা তত্ত্বের মীমাংসার জন্য।

রঞ্জন-রশ্মি, আলফা-রশ্মি, অতি-বেগুনি-রশ্মি ঈথার-তরঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে। 'তরঙ্গবাদ' অনুসারে এই তরঙ্গের এক অবিচ্ছিন্নতা, এক ধারাবাহিকতা আছে। প্ল্যাঙ্কের মতে, উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের বিকিরণ-ক্রিয়ার গবেষণা হতে নানা জটিল তত্ত্বের মীমাংসা তরঙ্গবাদ অনুসারে অসম্ভব। শক্তিকণাবাদ অনুসারেই বিকিরণ-ক্রিয়ার মীমাংসা সম্ভব। আলোক-রশ্মি সম্বন্ধে প্ল্যাঙ্ক বলেন রশ্মি বা শক্তি বিচ্ছিন্ন-ভাবে পদার্থ হতে নিঃসৃত হয়। এই রশ্মি-নির্গম প্রক্রিয়ায় কোনই অবিচ্ছিন্নতা নেই, ধারাবাহিকতা নেই।

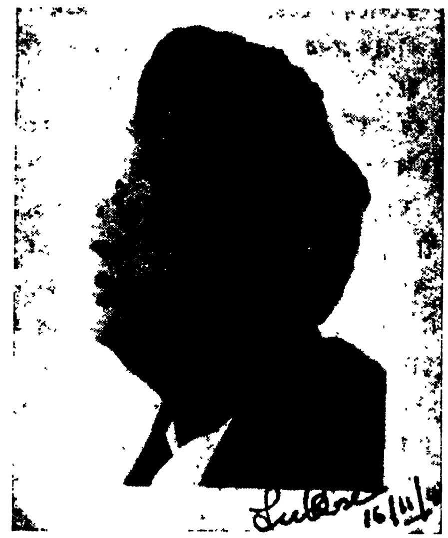
পদার্থ হতে যে শক্তির বিচ্ছুরণ হয় তা একাদিক্রমে হয় না, শক্তি এক এক ঝলকে নিঃসৃত হয়। প্রতি নির্গমে শক্তির এক এক গুচ্ছ ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসে। প্ল্যাঙ্কের শক্তিকণাবাদ শক্তির বিচ্ছুরণের কথাই বলল। পদার্থের পরমাণু বা ইলেকট্রন যে শক্তি গ্রহণ করছে তা কল্পনা করা হ'ল অবিচ্ছিন্ন ভাবেই হচ্ছে। ইলেকট্রনের এই শক্তিগ্রহণ একটা বিশেষ অবস্থায় পৌছলে তবেই শক্তি ঝলকে ঝলকে নিঃসৃত হয়। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন বলেন, যে শক্তি যখন এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিচালিত হয় শক্তির এক এক গুচ্ছ এক এক ঝলকে প্রবাহিত হতে থাকে। অর্থাৎ শক্তির প্রবাহও অবিচ্ছিন্ন নয়। আইনস্টাইনের মতবাদ অনুসারে শক্তিকণাবাদের সিদ্ধান্ত হ'ল আলোক বা যে-কোনও রশ্মি কোথাও একটানা তরঙ্গে প্রবাহিত হয় না, বিচ্ছিন্নভাবে এক একটা গুচ্ছে ঝলকে ঝলকে প্রবাহিত হয়। পদার্থের ইলেকট্রন হয় এক এক গুচ্ছের শক্তি একবারে গ্রহণ করে, না হয় একটুও করে না, শক্তি যখন ইলেকট্রন হতে বের হয়, এক এক গুচ্ছই এক এক বারে নিঃসৃত হয়, না হয় কিছুই হয় না।

রশ্মি যে শুধু এক এক গুচ্ছেই নিঃসৃত হয়, তাই নয়; যে-শক্তির বিচ্ছুরণ হচ্ছে তার এককও নির্দিষ্ট নয়। শক্তির এককের নির্ভর কম্পন-সংখ্যার ওপর। কম্পন-সংখ্যা যে-শক্তির কম গুচ্ছও তার ছোট। কম্পন-সংখ্যা যার বেশী গুচ্ছও অনুপাতে বড়। এই মতবাদ অনুসারে প্রমাণিত হয় শক্তির গুচ্ছ লাল আলোর রশ্মির চেয়ে অতি-কোণি-রশ্মির বড়। রঞ্জন-রশ্মির এ তুলনায় খুবই বড়, গামা-রশ্মির আরও বড়।

এই ভাবে রশ্মি-তড়িৎ-ক্রিয়ার শক্তিকণাবাদ স্পষ্ট-ভাবে মীমাংসায় পৌঁছল। রশ্মির এক এক গুচ্ছের নাম-করণ হ'ল ফোটন বা আলোকণিকা। ইলেকট্রন ও ফোটনের পারস্পরিক ক্রিয়া তা হ'লে অল্প কথায় এরূপ: ইলেকট্রন একস্-রশ্মি টিউবে রঞ্জন-রশ্মি সৃষ্টি করে অর্থাৎ ইলেকট্রনের শক্তি ফোটনে রূপান্তরিত হয়। এই ফোটন আলোকের গতিতে বের হয়। এবার যদি এই ফোটন ধাতব পদার্থের উপর এসে পড়ে, মুহূর্তেই পদার্থ হতে ইলেকট্রন বের হবে। এ ভাবে ইলেকট্রন হ'তে ফোটন ও ফোটন হতে ইলেকট্রনে শক্তি চালিত হয়। এক জনের যে মুহূর্তে মৃত্যু হয়, অপরের জন্ম হয় সেই মুহূর্তেই। শক্তিকণাবাদের যুক্তিতে এর বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট হ'ল।

ইলেকট্রনের আবর্তন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা শক্তিকণা-বাদের যুক্তিতে নির্ণীত হয়। বিজ্ঞানী বোর কল্পনা করেন, ইলেকট্রনের ঘুরবার যে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষ আছে, তার কয়েকটি বিশেষ কক্ষে বিকিরণ-ক্রিয়া হয় না। ইলেকট্রন বিশেষ অবস্থায় কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে লাফিয়ে পড়ে, ইলেকট্রনের যে তেজ বিকিরণ, তার উৎপত্তি এ কারণেই। কক্ষ হ'তে তেজ বিকিরণ ইলেকট্রনে শক্তির প্রাচুর্য্য কত হ'লে সম্ভব বোরের গাণিতিক নিয়ম হতে সে হিসাবও হয়েছে। ইলেকট্রনের কোন কোন বিশেষ কক্ষে তেজ বিকিরণ কিছুই হয় না কেন বোরের কল্পনা হতে এরও মীমাংসা হয়েছে। বোরের নিয়ম হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। বর্ণালী-রেখার উৎপত্তি সম্বন্ধে বোরের কল্পনার সারবত্তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভর-এর অনুপাতও বোরের নিয়মে নির্ণীত হয়। বিজ্ঞানী বোরের যুক্তির ধারা অনুসরণ করে বর্ণালী-রেখার যাবতীয় গবেষণা নানা বিজ্ঞানীর নূতন নূতন যুক্তিতে সুস্পষ্ট হয়। বিজ্ঞানী সোমারফিল্ডের নাম বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়।

বিজ্ঞানী দেখলেন তরঙ্গবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বলবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগে পরমাণুর নূতন রশ্মি-সমূহের গতিবিধির মীমাংসা সম্ভব নয়। প্রাচীন বল-বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ঘটনাসমূহ যে হিসাব বা গাণিতিক



সত্যেন্দ্রনাথ বসু

নিয়মে নিখুঁতভাবে মীমাংসা হ'ত তাতে পরমাণুর চিত্রের কোন কল্পনা ছিল না। বলবিদ্যার সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সাধারণ বস্তুর গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু নূতন কণিকাসমূহ তা থেকে বহু গুণে ক্ষুদ্র। এরাও যে সাধারণ নিয়মাবলী মেনে চলবে এমন ধারণার কোনও যুক্তি নেই। শ্রডিংগার তরঙ্গবাদের ভিত্তিতে এক নূতন বলবিদ্যার সাহায্যে ইলেকট্রনের গতিবিধি পরমাণুর এক অভিনব চিত্রের কল্পনায় হিসেব করেন। কিন্তু শ্রডিংগারের তরঙ্গ-বলবিদ্যাও ইলেকট্রনের আবর্তন ও গতিবিধি সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী সম্যক্রূপে প্রকাশে অসমর্থ হয়। প্রাচীন বল-বিদ্যার ভিত্তিতে গঠিত তরঙ্গ-বলবিদ্যা, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ হতে যে নূতন সিদ্ধান্ত আলোকরশ্মির ক্ষেত্রে এল তার সঙ্গে একটুও মেলে না এমন প্রত্যয় হয়। এভাবে ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স্-এর গবেষণা পরিত্যক্ত হয়। বিজ্ঞানী শক্তিকণাবাদের ভিত্তিতে নূতন গণনা-পদ্ধতি উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। এ সময়ে কোয়ানটাম মেকানিক্স্ সৃষ্টি হয়। প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ ও পরে ফেমিওডিরাক সমষ্টিগত গণনাক্ষেত্রে পরিসংখ্যান-প্রণালী উদ্ভাবন করেন।

আলোকের যে বিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টি রূপের আলোচনা হ'ল বিকিরণ ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। শক্তিকে এই ব্যষ্টি রূপে প্রতিষ্ঠা করেন প্ল্যাঙ্ক ও আইনস্টাইন। কিন্তু সমষ্টিগণিতের প্রয়োগ না হওয়ায় সমস্যা পূরণ হয় নি। সমষ্টিগণিতের উদ্ভাবক ম্যাক্সওয়েল অণুদের সমাবেশ ক্ষেত্রে বা গ্যাসে

অণুর গতির বণ্টনহার বা distribution সমষ্টি হিসাবে গণনা করেন। আলোক-তাপ বিকিরণ ক্ষেত্রে সমষ্টিগত হিসাব প্রয়োগের চেষ্টা হয়। তাপ বিজ্ঞানের বিকিরণ-ক্রিয়ায় বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বণ্টন-ধারার সাধারণ হিসাব হয়েছে। আদর্শ কৃষ্ণকায় (black-body) বস্তু কল্পিত হয় একটি উত্তপ্ত, ফাঁপা, ছিদ্রহীন গহ্বর। আদর্শ কৃষ্ণকায় বস্তুর বিশেষ পরিচয়, এর বিকিরণ গ্রহণ করবার ক্ষমতা যত বিক্ষেপ করবার ক্ষমতাও ততই। এরই অন্তর্বর্তী ক্ষেত্র বিকিরণের উৎপত্তিস্থল। এই কৃষ্ণকায় বস্তুর অন্তর্দেশে বিকিরণের বণ্টনধারার হিসাবের জন্য বিজ্ঞানী উইয়েন, বোল্টস্‌ম্যান, র‍্যালে ও জিনস্‌ এক একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। প্ল্যাঙ্ক যে সূত্র উদ্ভাবন করেছেন, শক্তির ব্যষ্টি রূপ কল্পনায় ঘটনার সঙ্গতি এই সূত্রেই মেলে। কিন্তু প্ল্যাঙ্কের এই হিসাব সমষ্টিগত হিসাবে হয় নি; প্রাচীন প্রথায় হয়েছে। আইনস্টাইনও পরিবর্তিত এবং উন্নত ধরণের এক হিসাব করেন—তাহাও প্রাচীন গণিতেরই সাহায্যে। সমষ্টি রূপে প্রথম হিসাব করেন বসু। এই পদ্ধতি বসুর সমষ্টি গণিত বা বসু-পরিসংখ্যান-প্রণালী। বসুর গণনায় প্রাচীন গণিতের প্রশ্ন নাই। তিনি শক্তির ব্যষ্টি রূপ কৃষ্ণকায় বস্তুর অন্তর্দেশে আলোক-কণিকার সমাবেশ ক্ষেত্রে কল্পনা করেন। প্ল্যাঙ্কের বণ্টন-হারের নিয়ম বসুর সূত্র অনুসারে নির্ণীত হয়।

১৯২৪ সালে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ ফোটন বা আলো-কণিকার হিসাবের জন্য নূতন এক প্রণালী উদ্ভাবন করেন। এই সমষ্টিগত নূতন হিসাব, এমনও বলা হয়, শক্তিকণা-বাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের বিকিরণ-ক্রিয়া সম্বন্ধে প্লাঙ্কের নিয়ম সত্যেন্দ্রনাথ নূতন প্রণালীতে হিসাব করেন। তিনি ষষ্ঠ পরিমাণ বিশিষ্ট কাঠামোর পরিকল্পনায় অন্তর্বর্তীক্ষেত্রে অসংখ্য ফোটনের সম্মিলিত কার্যাবলী নিজের উদ্ভাবিত প্রণালীতে মীমাংসা করেন। অধ্যাপক বসুর উদ্ভাবিত এই তত্ত্ব 'বসু-ষ্টাটিষ্টিকিস্‌' বা বসু-পরিসংখ্যান নামে বিদিত। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন সমষ্টিগত গণনাক্ষেত্রে বস্তু-কণিকার কার্যাবলী বসু-পরিসংখ্যান প্রণালীতে হিসাব করেন। এই তত্ত্বের ব্যাপকতা আইনস্টাইনের গণনায় বৃদ্ধি পেয়েছে একথা বিশেষভাবে স্বীকৃত। এই তত্ত্বের নূতন নামকরণ হয় 'বসু-আইনস্টাইন ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌'। ফের্মিওডিরাক গবেষণার প্রেরণা এই তত্ত্ব হতেই পেয়েছেন একথাও স্বীকৃত। এই তত্ত্বের ধারা অনুসরণ করেই সমষ্টি-গত গণনাক্ষেত্রে ফের্মিওডিরাক আর একটি পরিসংখ্যান-প্রণালী উদ্ভাবন করেন। একে 'ফের্মিডিরাক ষ্ট্যাটিষ্টিকিস্‌' বলে। ক্ল্যাসিক্যাস্‌ ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ পরিত্যক্ত হয়ে বসু ও ফের্মিওডিরাকের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের সহায়তায় আধুনিক বিজ্ঞান গঠিত হয়।

বিজ্ঞান আজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান-প্রণালীর নিয়ম মেনে চলে কয়েক-প্রকার কণিকা—প্রধানতঃ বস্তুকণিকা ও আলো-কণিকা (Photons, & particles, deutons), কিন্তু অন্যান্য কণিকার (Electrons, Protons) কার্যকলাপ ফের্মিওডিরাকের পরি-সংখ্যান-প্রণালী হতে মীমাংসা হয়। সত্যেন্দ্রনাথের গণনা-পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে তিনি একমাত্র ফোটন অর্থাৎ আলো-কণিকার সাহায্যে হিসাব করেছেন। উত্তপ্ত কৃষ্ণ-বর্ণ পদার্থের বিকিরণ-ক্রিয়াও ফোটনের সাহায্যেই তিনি স্পষ্টভাবে প্রথম মীমাংসা করেন। এভাবে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেছে। *

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তার পরিচয় আছে 'বিশ্ব-পরিচয়ে'—'এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে এমন বিজ্ঞান-সম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার-প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ কচ্ছি, হয় তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হ'ল না।'

---

* এ তত্ত্ব অধ্যাপক বসু ১৯২৪ সালে জার্মান পত্রিকায় (Zeits. f. Physik) প্রকাশিত করেন। এসময় পাশ্চাত্যে, বিশেষ জার্মানীর বিজ্ঞানী মহলে তিনি প্রভূত সম্মান ও সমাদর পেয়েছেন। বিদেশে গবেষণা কালে গণিতের জটিল প্রশ্ন সমাধানের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও অনেক সময় তাঁর সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গোড়াপত্তন হয়েছে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনায়। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ আচার্যদেবের মতই বিজ্ঞান-সাধনায় মগ্ন আছেন।

জনগুরু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

স্বর্গগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন সে-যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী যুবকগণের জীবনধারা সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ পথেই প্রবাহিত হইত। সরকারী অথবা বে-সরকারী চাকুরী এবং উকীল, ডাক্তার ও এঞ্জিনীয়ারের ব্যবসায় ইহাই তাঁহাদের প্রধান কাম্য ও লক্ষ্য ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রথমে কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ছিল যাহার প্রভাবে তিনি এই গতানুগতিক ভাব ত্যাগ করিয়া একটি নূতন পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। অধ্যাপকের পদ ছাড়িয়া যখন তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা এমন সচ্ছল ছিল না যে সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই অনিশ্চিত জীবন-যাত্রার পথ স্বচ্ছন্দে বাছিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তথাপি ভবিষ্যতের ভাবনা না করিয়া তিনি যে এই নূতন কার্য্যে ব্রতী হইলেন ইহাতে তাঁহার অনন্যসুলভ মনোবৃত্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামানন্দবাবুর মনস্বিতা ধীশক্তি ও চরিত্রের নানা সদ্‌গুণের সমাবেশ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং তিনি নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাকে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকরূপেই প্রধানতঃ স্মরণ করিবে, এবং এই দুইটি কাগজের সম্পাদনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং এই দুইটি কাগজ এ দেশের জাতীয় জীবন গঠনে অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া যে সহায়তা করিয়াছে তাহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ও স্মৃতিরূপে বিরাজ করিবে। রামানন্দ জনগুরু।

প্রবাসী পত্রিকা যখন প্রথম প্রসিদ্ধিলাভ করে তখন আমাদের ছাত্রজীবনের আরম্ভ। সুতরাং নব্য বাংলার ইতিহাসে ইহার স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমার কিছু বলিবার অধিকার আছে এবং আমি সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিব।

তখন প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশের অপেক্ষায় আমরা মাসের পর মাস কিরূপ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতাম তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। কারণ ইহা একাধারে আনন্দ ও জ্ঞানলাভের উপাদান ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ যে কত চিত্তাকর্ষক ছিল আজ তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকের কবিতা, গল্প ও উপন্যাস ইহাতে মাসের পর মাস আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। কিন্তু মনোরঞ্জনের বিচিত্র ও প্রচুর আয়োজনই 'প্রবাসী'র একমাত্র বিশেষত্ব ছিল না; জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া রামানন্দবাবু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। আমরা তাহার সাহায্যে যে শিক্ষালাভ করিতাম তখনকার দিনে স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই প্রকার শিক্ষার কোন সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, উন্নতিশীল জাতির আধুনিক বিবরণ, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি যত বিবিধ তথ্য এই পত্রিকার সাহায্যে জানিয়াছি এবং শিখিয়াছি অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইত না। এই হিসাবে রামানন্দবাবু আমাদের যুগের যুবকগণের শিক্ষাগুরু এবং আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে চিরদিন সে কথা স্মরণ করিব। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া তিনি একটি মাত্র বিদ্যায়তনের শিক্ষকতার পরিবর্ত্তে সমস্ত দেশবাসী যুবকগণের শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি।

তাঁহার আর এক প্রধান কীর্ত্তি জাতীয় জীবন গঠন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্য দিয়াই তিনি এই মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। এই সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের সৃষ্টি—তাঁহার পূর্ব্বে কোন মাসিক পত্রিকায় ইহার অনুরূপ কিছু ছিল বলিয়া জানি না। দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ক যত কিছু প্রশ্ন সমস্যা ও সাময়িক আন্দোলন ও অভাব-অভিযোগ—সে সমস্তই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাঁহার সরল সুচিন্তিত নির্ভীক ও নিরপেক্ষ আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। অপূর্ব্ব যুক্তিমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতি সমস্যার অন্তর্নিহিত তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া তিনি তাহার স্বরূপ নির্ণয় ও প্রতি-

কারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি কোন দিন কোন বিশিষ্ট দলে যোগদান করেন নাই, সুতরাং প্রতি বিষয়েই স্বাধীন ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিতে কোন প্রকার দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই সমুদয় আলোচনার মধ্য দিয়া তাঁহার যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছি এ যুগে তাহা এক প্রকার দুর্লভ বলিলেই চলে। এই জন্যই তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্য সকলেই আগ্রহভরে পাঠ করিতেন এবং ইহা জাতীয় মতবাদ ও চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ইহার জন্য তিনি রাজপুরুষদের রোষকটাক্ষে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এদেশীয় শক্তিশালী. জনপ্রিয় নেতাদের বিরক্তি বা অসন্তোষের ভয়েও কখনও স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত আচরণে বা মতামত প্রকাশে কোনদিন কোন সাম্প্রদায়িকতার ভাব কেহ লক্ষ্য করে নাই। তাঁহার উদারতা সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ন্যায়ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস তাঁহাকে সম্পাদকের কঠোর কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইতে দেয় নাই। এই দিক দিয়া তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের একটি চিরন্তন সম্পদ বলিয়া আমি গণ্য করি। যদি স্বাধীনদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে সম্পাদকীয় প্রতিভার জন্য তিনি অতুল সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইতেন। রামানন্দবাবুর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের খুব বেশী সুযোগ আমার হয় নাই; কিন্তু ঢাকায় ও কলিকাতায় কয়েকবার তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও তাঁহার মধুর সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় এবং সুমধুর আলাপ-আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়াছি। ভগবানের নিকট প্রর্থনা করি তিনি এই নির্ভীক লোকহিতৈষীর আত্মার শান্তি বিধান করুন।

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০৮ সালে আমি হিমালয় হইতে আসিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগ দিলাম। সেই বৎসরেই রামানন্দবাবু এলাহাবাদ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং ঠন্‌ঠনিয়ায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে একটি ছোট্ট বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ এই দুইখানি কাগজ চালাইতে লাগিলেন। রামানন্দবাবু একেবারে সাদাসিধা মানুষ, নিতান্তই সরল তাঁহার জীবনযাত্রা। সেই বাড়ীখানির ক্ষুদ্র একখানি ঘরে প্রবাসী-মডার্ন রিভিউর অফিস। ক্রমে সেই স্থানটুকু নানাদেশীয় মনীষীদের একটি তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠিল। সেখানে হার্বার্ট ফিশার, রামসে মাক্‌ডোনাল্ড সিষ্টার নিবেদিতা, অধ্যাপক গেডিস প্রভৃতি বিদেশী বিশিষ্ট লোকদের, এবং . রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্র শীল গোখলে প্রভৃতি ভারতীয় মহাপুরুষদের দর্শনীয় স্থান হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বহুবার গিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পিছনেই ভুবন সরকার লেনে একটি বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় থাকিতেন। কবিগুরু প্রায়ই জোড়াসাঁকো হইতে পদব্রজে তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। সেই আসিবার পথে এমন একটি সঙ্কীর্ণ গলি তিনি আবিষ্কার করিলেন যাহাতে এক জনের বেশি একসঙ্গে চলিতে পারে না এবং যাহা বস্তির মধ্যস্থিত দুই দিকের খোলার ঘরের মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আগে তাহার তলা দিয়া একটি ড্রেনও বহিত। এখন ড্রেনটা অন্যত্র সরিয়াছে তবে সঙ্কীর্ণতা সেইরূপই আছে। সেই গলিটুকু আমাকে শ্রীশবাবুর পুত্র পরলোকগত সন্তোষ মজুমদার দেখাইয়াছিলেন। এই গলি-পথে পথের দূরত্ব অনেকটা কমিত।

রামানন্দবাবুর উপর রবীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার বহু বাংলা গ্রন্থ প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। প্রবাসীর পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। মডার্ন রিভিউ কাগজেও তাঁহার অনেক ইংরাজি লেখা বাহির হইয়াছে। তখনকার দিনের প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নাই এমন একটি সংখ্যাও বড় মিলিবে না। আর একখানি বাংলা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া—মধ্যে কয়েক বছর কাল রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে তেমন লেখা দেন নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার বহু লেখাই প্রবাসীর মধ্য দিয়া প্রথম প্রকাশিত। এই কয়েকটি বৎসর বিগত হইলে

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার লেখা প্রবাসীর জন্য পাঠাইয়া দেন।

যখন কবির ইংরাজি গীতাঞ্জলির জন্ম হয় নাই তখনও তাঁহার ইংরাজি লেখা মডার্ন রিভিউ পত্রে বাহির হইত। ১৯১১ সালে রামানন্দবাবু একবার তাঁহার কাছে তাঁহার কবিতার কিছু ইংরাজি অনুবাদ চাহেন। কবি তাঁহার বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের করা "নিষ্ফল কামনা" (মানসী) কবিতার অনুবাদ রামানন্দবাবুকে পাঠাইয়া দেন। Fruitless Cry" নামে তাহা ১৯১১ সালের মে মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে (পৃঃ ৪৬৩) বাহির হয়। লোকেন্দ্রনাথেরই করা রবীন্দ্র-কবিতার আর একটি অনুবাদ কবির কাছে ছিল। তাহার নাম সন্ধ্যাসঙ্গীতের "তারকার আত্মহত্যা"। "Death of a Star" নাম দিয়া তাহা ১৯১১ সালের আগষ্ট মাসের (পৃ. ২০১) মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আর একটি অনুবাদ মড ম্যাকার্থির করা ১৯১১ সালের মডার্ন রিভিউ কাগজের সেপ্টেম্বর মাসে (পৃঃ ২৬১) "My Father's House" নামে বাহির হয়। ইহার পর রামানন্দবাবু স্বয়ং কবিকে ধরেন তাঁহার কবিতা নিজেই অনুবাদ করিতে। 'কবি বাল্যকালে ইংরাজি শিক্ষায় অবহেলা করিয়াছেন এই অজুহাত দেখাইয়া নিষ্কৃতি চাহিলেন। কবি তাঁহার মায়ার খেলা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলেন—

"বিদায় করেছি যারে নয়নজলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে ?"

এই কবিতাটি কড়ি ও কোমলে ভুল নামে ছাপা হইয়াছে। রামানন্দবাবু ও ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমার মনে আছে রামানন্দবাবু একদিন কবিকে বলিলেন, "আপনি ইংরাজিকে নয়নজলে বিদায় করেন নাই। প্রেমের লীলার ওসব লোকদেখানো উপেক্ষার ভঙ্গীতে আমি ভুলিব না। তাহার সঙ্গে আপনার যে হৃদয়ের প্রীতিযোগ আছে সে কথা আমার কাছে লুকাইবেন না।" দেখিলাম অবশেষে কবিকেই হার মানিতে হইল। ১৯১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে (২০৪ পৃঃ) বাহির হইল "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী" গানের অনুবাদ। তাহার পরই এপ্রিল মাসের (৩৫১ পৃঃ) মডার্ন রিভিউ পত্রে কণিকা হইতে কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইল। তাহার পরেই আবার সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউতে দেখা দিল "অনন্ত প্রেম" (মানসী) কবিতার অনুবাদ। ইংরাজি নাম তাহার "The Infinite Love"। তাহার বাংলা কথা "তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার।" ইংরাজি বেশে কবিতাগুলি যেন অভিনব শোভা ধারণ করিল। "গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা" কবিতাটির (ঐ মাসেই ২২৫ পৃঃ) অনুবাদ "The Small" নামে দেখা দিল। ইহা উৎসর্গের ১২ নম্বরের কবিতা। ঐ সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউতে (পৃঃ ২৯৮) "Youth" নামে আর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহাও উৎসর্গেরই কবিতা।

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম (৭নং কবিতা)

এই যে আপন কবিতার অনুবাদে কবি প্রবৃত্ত হইলেন তাহারই ফল হইল গীতাঞ্জলি। কিন্তু এই অনুবাদের কর্মে যাঁহারা কবিকে প্রবৃত্ত করান তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দবাবু একজন প্রধান। তাঁহার কাগজেই এই কবিতাগুলির প্রথম আবির্ভাবের স্থান হয়।

আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে "ঠাকুর ফেলা" বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। কৃপণ গৃহস্থকে বাধ্য করিয়া পূজা করাইবার জন্য লোকে গোপনে তাহার বাড়ীতে ঠাকুরের প্রতিমা রাখিয়া আসে। বাধ্য হইয়া কৃপণকে ব্যয়বাহুল্য করিয়া পূজা করিতে হয়। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কৃপণ ছিলেন এই কথা বলি না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তিনি আপনার অপরিমিত শক্তি সত্বেও সঙ্কুচিত হইতেন এবং এক এক সময় নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বুঝিতে পারিতেন না। তখন বাহিরের উপদ্রবে শুক্তির মধ্যে মুক্তার মত তাঁহার রচনাগুলি একটি একটি রত্নের মত সৃষ্ট হইয়া উঠিত।

একবার শ্রীযুক্তা সরলা দেবী কবিকে না জানাইয়া নিজের কাগজে এক বিজ্ঞপ্তি দেন যে কবি একটি নাটক লিখিবেন। আমরা পাইলাম "চিরকুমার সভা"। শান্তিনিকেতনে ১৯০৮ সালে আমরা তাঁহাকে আমাদের জন্য ঋতু-উৎসবের গান ও নাটক রচনার জন্য ধরি। তাহার ফলে শারদোৎসব প্রভৃতি নাটকের সৃষ্টি। তিনিও তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন আমাদের অভিনয়ে নামাইয়া। প্রথম বার শারদোৎসবে কবি বাধ্য করিয়া আমাকে সম্রাট্-সন্ন্যাসীর বেশে রঙ্গমঞ্চে নামাইলেন। আমার গান গাহিবার অসামর্থ্যের ওজর কবি মানিলেন না। অন্তরাল হইতে আমার হইয়া অপূর্ব গান তিনি গাহিলেন। তাহার দুর্গতি আমি দীর্ঘকাল বহন করিয়াছি। সর্বত্রই সভাস্থলে গানের জন্য বহুদিন আমাকে লোকে ব্যর্থ পীড়াপীড়ি করিতেন।

কর্মশ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ এক এক সময় 'প্রবাসীতে' লেখার কথা ভুলিয়াই যাইতেন। এমন সময় শেষ মুহূর্তে যখন রামানন্দবাবুর তাগিদ সহ লোক আসিত তখন তিনি তাহাকে বসাইয়া সেই মুহূর্তেই লেখার জন্য বসিতেন। "গোরা"র * জন্য এইরূপ অনেক কিস্তী তাঁহার লোক বসাইয়া লেখা। তাই মাঝে মাঝে সেই সব পুস্তকে ছোট-খাট ভুলচুকও রহিয়া গিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম, জানালা কবাট সব খোলা, বাহিরে 'প্রবাসী'র লোক, রবীন্দ্রনাথ মাদুরে বসিয়া লেখা শেষ করিতেছেন, এই দৃশ্য বহুবার দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বহু লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের লেখার অন্যের কৃত ইংরাজি অনুবাদও রামানন্দবাবু চিরদিন আগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন।

রামানন্দবাবুর সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে যে কবির মতভেদ হইত না তাহা নহে তবে তাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই। ১৯১৭ সালে মিসেস্ বেসান্টকে যখন কবি কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিতে চাহেন তখন রামানন্দবাবু তাহাতে সম্মত ছিলেন না। ননকো-অপারেশনের অনেক প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও রবীন্দ্র-নাথের এমন মতভেদ কত বারই হইয়াছে। অসহযোগ লইয়াও মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রবল লোকমতের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ "সত্যের আহ্বান" পড়িয়াছেন। মহাত্মাজী রামমোহনকে ক্ষুদ্র বলায় কবি অত্যন্ত আহত হইয়া তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অসহযোগের স্থলে তিনি "শিক্ষার মিলন" বিষয়ে ইন্‌স্টিটিউটে ও আলফ্রেড থিয়েটারে বলেন। তবু মহাত্মাজীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা যে ছিল অপরিসীম তাহা সকলেই পরে জানিয়াছেন। ননকো-অপারেশনের বহুপূর্বে মহাত্মাজী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে দেশে আসেন তখন গুরুশিষ্য সমেত মহাত্মাজীর সমস্ত ফিনিক্স্ বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেই দীর্ঘকাল আতিথ্য লাভ করিয়াছিল। মহাত্মাজীরও কবির ও তাঁহার আশ্রমের প্রতি গভীর প্রীতি যে রহিয়াছে সে কথাও সকলেই জানেন।

* এরই কিছুকাল পরে একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্য স্বরূপ পাঠালেন তিনশো টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবী করব না। এত বড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম "গোরা"—আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারো ফাঁক দিই নি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম।" রবীন্দ্রনাথ, (প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৪৪)।

'প্রবাসী'তে মাঝে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখা দেন নাই। তার পর একদিন যে নিজেই 'প্রবাসী'র জন্য রামানন্দবাবুকে তাঁহার লেখা দেন সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

রাজা, শারদোৎসব প্রভৃতি যে-সব নাটক আশ্রমে অভিনীত হইত তাহাতে প্রত্যেক বারেই সপরিবারে রামানন্দবাবু আসিতেন। এই ভাবে বহুবার তাঁহারা শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। নোবেল প্রাইজ পাইবার পরে কবিকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য স্পেশাল ট্রেনে যে এক দল সাহিত্যিক কলিকাতা হইতে আসেন সেই ১৯১৩ সালের ২৩শে নবেম্বর সপরিবারে রামানন্দবাবু তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।* ১৯১৭ সালের রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে আসিয়া রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনের সব ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার ছেলে প্রসাদকে এখানে রাখিয়া পড়াইতে উৎসুক হইলেন। প্রসাদের ডাকনাম ছিল মুলু। মুলুর তো উৎসাহের সীমা নাই। কিন্তু মুলুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলিয়া কথা হইল যদি একখানা কুঁড়ে ঘর পাওয়া যায় তবে তাহাতে মুলুকে এখানে রাখা যায়, সঙ্গে তাহার মা বাবা বোন কেহ থাকিতে পারেন।

নাগপুরের স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্র বসু মহাশয় ছিলেন আগরার রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের শিষ্য। তিনি কিছুকাল এই আশ্রমে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ করেন। সে সময় কঠোর সাধনায় তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। তাঁহার স্ত্রী তাই তাঁহাকে লইয়া এখানে বাস করিবার জন্য একটি কুটির করেন। পরে তাঁহাদের এক কন্যা পীড়িত হওয়ায় এবং পরে কন্যাটি মারা যাওয়ায় তাঁহারা এই বাস উঠাইয়া লইয়া যান। ১৯১৭ সালে রামানন্দবাবুরা সেই কুটিরখানি কিনিয়া শান্তিনিকেতনে বছর দুই কাল বাস করেন। তখন রামানন্দবাবু মাঝে মাঝে কলিকাতায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর জন্য গেলেও প্রায়ই এখানেই

* বাংলা ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়ায় টাউন হলে যে কবি-সম্বর্দ্ধনা ১৪ই মাঘ হয়, সেখানেও তিনি সপরিবারে উপস্থিত হন, সেই উপলক্ষে রামানন্দবাবুর লেখার উপসংহারে ছিল, "তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বাঙালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না।" রবীন্দ্রনাথের সত্তর পূর্ণ হওয়ার পর কলিকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় "গোল্ডেন বুক অব ঠাকুর" কমিটির সভাপতি ও গোল্ডেন বুকের সম্পাদক রামানন্দবাবু রবীন্দ্রনাথকে "গোল্ডেন বুক" উপহার দেন। "গোল্ডেন-বুক"-এর ভূমিকা রামানন্দবাবুর লেখা। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎপূর্তি উৎসব কমিটির একজন প্রধান সভ্য রামানন্দবাবু ছিলেন। কবির সত্তর বৎসরের জয়ন্তী কমিটির প্রথম সভা আহ্বান স্যর জগদীশ, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র ও রামানন্দবাবু প্রভৃতির নামে হয়।

থাকিতেন। মুলুর সঙ্গে সীতা দেবী ও শান্তা দেবীও থাকিতেন। তাঁহাদের মাতা মাঝে মাঝে এখানে আসিতেন। রামানন্দবাবুর বড় ছেলে কেদারনাথ তখন বিলাতে।

এই সময়ে প্রায়ই রামানন্দবাবু কবির কাছে দেহলী গৃহের ছাদে আসিয়া বসিতেন। চমৎকার নানা প্রসঙ্গ হইত। রামানন্দবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিশুদের জন্য জগতের নানা সাহিত্য হইতে ভাল ভাল জিনিস লইয়া বাংলা ভাষাতে নূতন নূতন সব গ্রন্থ রচনা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্যের ভাল ভাল পুস্তক অনুবাদ করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে অনেক আলাপ চলিত। পরে সেই বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা বিশ্বভারতী হইতে করাও হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাংলা-সাহিত্য অপেক্ষা হিন্দুস্থানী, গুজরাটি ও মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যেই কাজ হইতেছে অনেক বেশি। কোন্ কোন্ সাহিত্য হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি বই অনুবাদ করিতে হইবে তাহারও একটি সম্পূর্ণ তালিকা রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এক-এক দিন য়ুরোপীয় রাজনীতির কথা উঠিত। এক দিন কবিগুরু বলিলেন, "যত দিন লোকে যাহা উৎপন্ন করিতে পারে তাহার চেয়ে বেশি ব্যয় ও সম্ভোগ করিতে বিরত না হইবে তত দিন পররাজ্যের প্রতি লোভ, অন্যকে নানাভাবে প্রবঞ্চনা, জোর-জুলুম প্রভৃতি নানাবিধ পাপের অন্ত হইবে না। প্রাচীন ভারত তাহার জীবন অত্যন্ত শান্ত সরল ও সংযত করিয়াছিল অথচ তাহার তত্ত্বচিন্তা ছিল খুব উচ্চ ধরণের। যত দিন ভারতীয় এই প্রাচীন পুণ্য আদর্শ লোকে গ্রহণ না করে তত দিন জগতে জোর-জুলুম যুদ্ধ কিছুতেই থামিতে পারে না। ভারতের ব্রাহ্মণেরা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেরাও দীর্ঘকাল সেইরূপ জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার পর ব্রাহ্মণদের সেই আদর্শ হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও দুর্গতি হইল। এখন জগতের অন্য সব দেশে কোন্ লজ্জায় এই যুগের ব্রাহ্মণেরা এই আদর্শের কথা প্রচার করিবেন? আপনি রামানন্দবাবু কিন্তু ব্রাহ্মণদের সেই আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বড় বড় চাকুরী করিয়াও ব্রাহ্মণত্বের বড়াই ও আদর্শ প্রচারের মত নির্লজ্জতা আর নাই।"

রামানন্দবাবু বলিলেন, "দেখুন আপনিও এই বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে উপদেশ দিতে পারেন। দূর হইতে আপনাকে দেখিলে মনে হয় আপনার বুঝি খুব আড়ম্বরময় জীবন। কিন্তু কাছে আসিয়া দেখি আপনার জীবনযাত্রাও খুব সাদাসিধা। আপনার ঘরে একখানি হাতপাখা পর্যন্ত নাই। দারুণ গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নে আপনি সব জানালা দরজা খুলিয়া সারা দুপুর চৌপর দিন কাজ করেন। চেয়ার নাই, টেবিল নাই, মাদুরে বসিয়া সামান্য ডেস্কে রাখিয়া লেখেন। ঘরের জিনিস শিকাতে ঝুলাইয়া রাখেন। আসলে আপনার চেহারাটাই রাজসিক। একখানি ফর্সা কাপড় পরিলেই আপনাকে রাজার মত দেখায়।"

রামানন্দবাবু ও তাঁহার কন্যাগণ খুবই সহজভাবে জীবনযাপন করিতেন। রান্না-বান্না কন্যারা নিজেরাই করিতেন। অনেক সময় চাকরের অভাবে কাজকর্ম সবই নিজেরা সারিতেন।

১৯১৭ সালের ৮ই পৌষ মধ্যাহ্নে আহারান্তে কবিগুরু রামানন্দবাবুকে বলিতেছিলেন, "এইরূপ সহজভাবে শিক্ষা-লাভ করাই ছিল ভারতের আদর্শ। আমাদের দেশে আলো-বাতাসের মত জ্ঞানও ছিল সর্বসাধারণের সাধারণ ধন। তাহা গুরুর কাছে পয়সা দিয়া কিনিতে হইত না। শিষ্যের কাছে পয়সা লইয়া তাহা বেচাও চলিত না। ছেলেদের পড়ার ব্যয় পিতা বা অভিভাবককে বহন করিতে হইত না। ছাত্ররা সব ব্রহ্মচারী। যেখানেই সে দাঁড়াইয়া অন্ন চাহিবে,'ভবতী ভিক্ষাং দেহি' বলিবে, সেখানেই তাহার জন্য অন্ন আছে। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের হইয়া সে জ্ঞানের সাধনা করিতেছে। জ্ঞান যে ছিল তখন সবারই ধন।"

"গ্রীকদের মধ্যে ছিল অন্যরূপ। প্রচুর মূল্য দিয়া তাহাদের বিদ্যা কিনিতে হইত। তাই তাহা বেচাও চলিত। বিদ্যা ছিল সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আজ য়ুরোপের সেই দুষ্ট আদর্শ আমাদের দেশে চাপিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন কালে তপোবনে বসিয়া ভারতের যে সরল উন্নত ও মহান আদর্শ ছিল তাহাই স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলাম এই শান্তিনিকেতনে। আমার তখনকার দিনের সীমাবদ্ধ আয় লইয়াও আমি আমার দিক হইতে কম চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তবু পারিলাম না। সমাজের সেই সহযোগিতা পাই নাই। তাই পরিশেষে আপন আপন ছেলেদের ব্যয়ের জন্য অভিভাবকদের শরণাপন্ন হইতে হইল। প্রথমে আমি বহুকাল এই জন্য ছেলেদের পিতামাতার কাছেও কিছুই চাহি নাই। যখন পিতা-মাতারা ছেলেদের ব্যয় কিছু কিছু দিতেই আরম্ভ করিলেন তখন আর 'বিদ্যা সর্বসাধারণের' এই কথা এখানে বলা চলিল না। পিতামাতারাই যখন সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেছেন তখন এই শিক্ষার মালিকও তাঁহারাই। ইহা এখন তাঁহাদের বৈষয়িক সম্পত্তিরই মধ্যে।"

গভীর দুঃখে কবি এই কথা কয়টি বলিলেন। রামানন্দবাবু বলিলেন, "দেখুন আমিও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান ; প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের মধ্যে শিক্ষার যে সর্বজনীন সামাজিক রূপ ছিল তাহার কতকটা আজও আছে আমাদের দেশের টোল ও চতুষ্পাঠীর মধ্যে। আমিও এইরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরেরই ছেলে। আমি আপনার মনের দুঃখটা বুঝতে পারি। আজ শিক্ষার জন্য যে ব্যয়, তাহাতে কয়জন লোক সন্তানকে শিক্ষিত করিতে পারেন? ব্রহ্মদেশে শিক্ষাটা সমাজ-ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া সেখানে কেহই নিরক্ষর নাই। আজ ভারতে সর্বত্র অজ্ঞান ও অন্ধকার। আপনি সেই সাধনাকে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে এত সহজে ছাড়িয়া দিবেন না। নিষ্ফল হইলেও আবার চেষ্টা করুন।"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার এই কথা আমারও মনে জাগিতেছে। যদি ভুলিয়া যাই তবে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিবেন।" তার পরই প্রায়ই দেখিয়াছি রামানন্দবাবুর সঙ্গে গুরুদেবের দেখা হইলেই রামানন্দবাবু তাঁহার সেই আদর্শ পুনঃ-স্থাপনার কত দূর হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্রের কল্পনা গুরুদেবের মনে স্থির হইল তখন তিনি রামানন্দবাবুকে এক দিন বলিলেন, "দেখুন এখন আমি আমার সেই সঙ্কল্পকে যে আবার প্রাণবান করিতে পারিব সেই সম্ভাবনা আসিয়াছে।"

শিক্ষাসত্রের কার্য্য তখনও আরম্ভ হয় নাই, তাহার কিছুদিন পরেই শিক্ষাসত্রের কাজ কবি আরম্ভ করিলেন। রামানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার শিক্ষার প্রণালীর কি কিছুটা ঠিক করিয়াছেন?" গুরুদেব বলিলেন, "একেবারে আগে হইতে সব ঠিকঠাক করিয়া রাখা আমার স্বভাব নহে, জীবনের ধর্ম্মও তাহা নহে, এবং তাহা আমি প্রার্থনীয়ও মনে করি না। তবু আমার মনে মনে যে একটা সুস্পষ্ট রূপ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা মোটামুটি এইরূপ :

১। প্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও সহজ জীবন যাত্রার মধ্যে খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে "শিশুরা আনন্দের সহিত জ্ঞানে ও কর্ম্মে প্রকৃতির সঙ্গে অজ্ঞাতসারে যুক্ত হইয়া উঠিবে।"

"মধ্যাহ্নের আলোর মত প্রভাতের আলো বর্ণহীন নয়। শিশুর মনে তাই বর্ণ গন্ধ গীত চাই। ফুল ও ফল তাই বীজের মত প্রাণমাত্রসম্বল নয়, তাদের মধ্যে বর্ণগন্ধরস আছে। শিশুর মনের মধ্যেও সেই বর্ণগন্ধরসময় আনন্দ-স্পর্শ থাকা চাই। বীজরূপে যে পরিণতি তাহা পরে স্বভাবের নিয়মে ধীরে ধীরে আসিবে।"

২। "বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু খেলা ছাড়িয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাস লাভ করিবে। ব্রতে ও সাধনায় ক্রমে সে শক্তিলাভ করিয়া বীর্য্যবান হইয়া উঠিবে নানাবিধ সেবা ও ব্রতের দ্বারা সে আপনার পূর্ণ স্বরূপকে তখন উপলব্ধি করিবে।"

৩। "এইজন্য তাহার চারিদিকে প্রকৃতির ও মানবের একটি নির্ম্মল ও বিশাল পরিমণ্ডল থাকা প্রয়োজন। যাহাতে তাহার সমস্ত জীবন ও সাধনা দূষিত ও বিকৃত না হইয়া উঠে সেদিকে সচেতন থাকিতে হইবে। তরুণ জীবনের সহজ আবেগগুলিও যেন তাহাকে অধঃপাতের দিকে না টানিয়া দিনে দিনে নব নব শক্তিলাভের ক্ষেত্রেই অগ্রসর করিতে থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত।"

৪। "মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষার মধ্যে ভয় বা লোভের কোনো স্থান থাকিবে না। জিগীষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও শিক্ষাকে বিকৃতির পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।"

৫। "বালকের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক বোধকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে ধীরে ধীরে উন্মেষিত করিতে হইবে।"

৬। "প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভাল করিয়া অনুভব করিবার জন্য বালকের মনোবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ ও সুকুমার করিয়া তুলিতে হইবে। এই সুকুমারতা দুর্বলতা নহে। অরণ্যের কঠিন কাষ্ঠের মূলে যেমন সুকুমার পুষ্প, তেমনি বীর্য্যবান মানবের সাধনার মূলে এইরূপ সব সুকুমার তপস্যা।"

৭। "শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে। সেইজন্য শুধু জ্ঞান বা ভাবের দিকে ঝুঁকিলেই চলিবে না। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত কলা প্রভৃতি সর্ব দিকেই মানুষকে সম্পন্ন হইতে হইবে। এবং তাহার সকল কর্ম্মে ও জীবনে তাহার এই ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ যাহাতে হয় তাহাও দেখিতে হইবে। তাহার ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে যেন কোথাও অর্থহীন একটা বিচ্ছেদ বা বিরোধ না থাকে।"

৮। "শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে তাহার চারিদিকের মানবসমাজের সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদের যেন যোগ থাকে। দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সামাজিক উৎসব আনন্দাদির সহিতও তাহার যোগ থাকা চাই। স্বদেশেরই দীর্ঘ প্রাচীন কাল এবং স্বকালের ও সর্বদেশের সঙ্গে তাহার কোথাও যেন বিচ্ছেদ বা বিরোধ না ঘটে। জীবনে কোথাও চীনের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতে দেওয়ার মত দুর্গতি আর নাই। সংস্কারগুলি জ্ঞানরাজ্যের এইরূপ অলঙ্ঘ্য প্রাচীর।"

৯। "কাজেই জগতের সর্বদেশ ও সর্বজাতির সঙ্গে তাহার জ্ঞান ও হৃদয়ের একটি যোগ ও সম্বন্ধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠা চাই।"

১০। "ব্যক্তিত্বের সাধনার সঙ্গে যদি স্থান কাল ও সামাজিক সাধনার যথাযথ যোগ থাকে তবে অহমিকার নানা দুঃখ ও দুর্গতি ঘটিতে পারে না। ধারার মধ্যে পাথর গড়াইয়া গড়াইয়া গোল হইয়া শালগ্রাম হইয়া উঠে। জগতের বহমান ধারার মধ্যে নিজেকে এই জন্য স্থাপন না করিলে অহমিকার দুঃখময় নানা তীক্ষ্ণ ও তীব্র বিকার হইতে রক্ষার আর কোনো উপায় থাকে না।"

১১। "এই জন্য শিক্ষার্থীকে অন্যসব শিক্ষার্থীর সঙ্গে নানা মঙ্গলচেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। সেই উৎসর্গও নীরস হইলে চলিবে না। তাহাতে শিল্প-কলা সঙ্গীত প্রভৃতির আনন্দ যাহাতে থাকে তাহা দেখা চাই। জলের ধারার মধ্যেই পাথরের তীক্ষ্ণতা ক্ষয় হইয়া শালগ্রাম হয়। মানুষও রসের ধারাতেই আপনার তীক্ষ্ণতা পরিহার করিতে শেখে।"

এই সব শুনিয়া রামানন্দবাবু বলিলেন, "আপনার মনে যে শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট রূপ আসিয়াছে তাহা চমৎকার ও পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু তাহা কি আপনি ছেলেদের জন্যই বদ্ধ রাখিতে চাহেন? এই সঙ্গে কি মেয়েদের কথাও ভাবেন?"

গুরুদেব বলিলেন, "মেয়েদের কথাই আমার সর্বাগ্রে মনে হয়। শিশুদের দুঃখ দেখিয়াই আমি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম করি। এখন আরও কোথাও কোথাও ছেলেদের জন্য চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু মেয়েদের জন্য এখনও তেমন কোনো আয়োজন হয় নাই। আর মেয়েদের দুঃখও অনেক আছে। তাহা আমার অন্তরকে বড়ই ব্যথিত করে। কিন্তু শুধু মেয়েদের দিয়াই তাহা চালানো যাইবে না। আপনি ও নেপালবাবু প্রভৃতি না থাকিলে তো চলিবে না। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার দুঃখ দূর হয় ইহাই আমার বিশেষ ইচ্ছা।"

নেপালবাবু তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবালিকাবিদ্যালয়ের আদি কালে নেপালবাবু যুক্ত থাকিয়া বহু কন্যাকে তখন শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁহার একটু যশও ছিল। এই জন্য মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে তিনি নেপালবাবুর মতামত নিতেন। শান্তিনিকেতনে মেয়েদেরই জন্য বিশেষ ভাবে ক্রমে প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিবে ইহা তাঁহার মনেও ছিল, মুখে ও পত্রাদিতে তাহা বার বার ব্যক্ত হইয়াছে।

গুরুদেব বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে রীতিমত ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। তাহার পরও তিনি ছেলেদের লইয়া শেলি ব্রাউনিং প্রভৃতি কবির কঠিন কঠিন কবিতা লইয়া অধ্যাপনা করিতেন। যে বয়সের ছেলেদের লইয়া যেরূপ কঠিন বিষয় তিনি আলোচনা করিতেন তাহাতে অনেকের মনে হইতে পারে যে ছেলেরা তাহা কখনই বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব পড়াইবার পদ্ধতিতে সকলেই চমৎকার বুঝিতে পারিত। এই সব অধ্যাপনার সময়ে রামানন্দবাবুও এখানে থাকিলেই আসিয়া বসিতেন। কলিকাতার বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক কোনো কারণে আশ্রমে আসিলে তাঁহারাও রবীন্দ্রনাথের সেই অধ্যাপনার ক্লাসে যোগ দিতেন। কবি তাহাতে সঙ্কুচিত হইলেও তাঁহারা বাধা মানিতেন না। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুকে বলিতেন, "মহাশয়, আমি ছোট ছেলেদের পড়াই। তাদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু বড়দের পড়াইবার অভিজ্ঞতা আমার নাই। সেখানে আপনি আমাদের চালাইতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে তো আমি দেখিতে যাই না। আপনি কেন এই ছোটদের আসরে আসেন?"

বিশ্বভারতীতে যখন শিক্ষাভবন অর্থাৎ কলেজ বিভাগ স্থাপিত হয় তখন কবি রামানন্দবাবুকে আনিয়া সেই বিভাগের অধ্যক্ষতা দেন। রামানন্দবাবু বিনা বেতনে সেই কাজে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল কাজ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগের বিষয়ে তাঁহার অন্য মত থাকায় তিনি অধ্যাপক পদ ছাড়িয়া দেন। ১৩৩২ সালের ৬ই ভাদ্র লেখা সেই বিষয়ক পত্রও আমি দেখিয়াছি।

যাহা হউক ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে যখন রামানন্দবাবু এখানে ছিলেন তখন অনেক সময় তিনি ছাত্রদের সাহিত্য-সভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং সভাপতির কাজও করিতেন। তাহাতে নানা বিষয়ে ভাল ভাল উপদেশও রামানন্দবাবু দিয়াছেন। সেই সব সভার কার্য্যবিবরণী খুঁজিয়া দেখিলে রামানন্দবাবুর অনেক আন্তরিক অপূর্ব উপদেশের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

গুরুদেবের ক্লাসে ছেলেদের চট্‌পট্ উত্তর শুনিয়া রামানন্দবাবু বিস্মিত হইতেন। গুরুদেব ছেলেদের ভুল উত্তরে দুঃখিত হইতেন না। নিরুত্তর থাকিলে বিরক্ত হইতেন। একদিন রামানন্দবাবু আমাকে বলিলেন, "ঐ সব কবিতা যে কি করিয়া কবিগুরু এই সব শিশুদের মনের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেন তাহাও একটা বিস্ময়ের বস্তু।"

১৯১৮ সাল, বর্ষাকাল। একদিন সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পের মূল সূত্রগুলি কেমনভাবে পাইলেন, সেই কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কাবুলীওয়ালা গল্পের মিনি হইল আমার বড় কন্যা বেলা। সে ঠিক ঐ রকম। সারাদিন বক্ বক্ করিত। তার মা ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন, আমিই ছিলাম তাহার একজন একনিষ্ঠ শ্রোতা। আমার চিরদিনই নানাদেশের কথা নানাজাতির সুখ-দুঃখ জানিতে কৌতূহল আছে। তাই অধিক দেশভ্রমণ না করিলেও আমি চিরদিনই দেশভ্রমণের গ্রন্থ পড়িতে ভালবাসি। আমার 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) প্রভৃতি কবিতায় তাহা বুঝা যায়। 'দুরন্ত আশা' (মানসী)তে আমি বেদুইনদের হিংসা করিয়াছি। কাবুলীওয়ালা আমার মনের মধ্যেকার সেই বেদুইনের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। কাবুলীওয়ালার মধ্যে আমি আমার সেই ইচ্ছাকেই প্রত্যক্ষ রূপ দিয়াছি।"

কবির লাইব্রেরিতে Sven Hedin, Hudson প্রভৃতির চমৎকার সব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ছিল। তিনি বহু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়াছেন। শেষ জীবনে দেশভ্রমণও তিনি কম করেন নাই। গল্পের মূলগুলির কথা বলিতে গিয়া তিনি বলেন, "'জীবিত ও মৃত' গল্পের প্লটটা মনে আসে একবার মধ্যরাত্রিতে। ঘুম ভাঙিল, আমি বেড়াইতেছি, মনে হইল আমি যেন এ বাড়ীর কেউ ছিলাম, এখন আর আমি যেন নাই। আমাকে দেখিলে হয়ত এখন সবাই চমকিয়া উঠিবে।"

রামানন্দবাবুকে একদিন কবি বলিলেন, "দেখুন আমেদাবাদে যে বাড়ীতে মেজদাদা ছিলেন তারই ছাতের একটা চিলেকোঠাতে আমি থাকিতাম। বাড়ীটা প্রাচীন বাদশাহদের। তার প্রত্যেক পাথরের মধ্যে ক্ষুধিত সব পাষাণ আছে তাই আমার মনে হইত। ক্ষুধিত পাষাণের তাহাই মূল।"

১৯২০ সালে সেই বাড়ী ও সেই চিলেকোঠাটা কবিগুরু আমাকে ও সন্তোষ মজুমদার মহাশয়কে লইয়া দেখাইয়াছিলেন। আমরা সেবার তাঁহার সঙ্গে গুজরাট সাহিত্য পরিষদের উৎসবে আমেদাবাদ গিয়াছিলাম।

এমন ভাবেই এক-এক দিন রামানন্দবাবু এক এক করিয়া তাঁহার পুরাতন সব গল্পের জন্মকথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কবি তাঁহাকে একে একে সেই সব কাহিনী শুনাইতেন। এই সব মজলিশ প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বসিত। এমন ভাবে "সমাপ্তি", "পোষ্টমাষ্টার", "দুরাশা" প্রভৃতি অনেক গল্পের জন্মকথা তিনি বলিয়াছেন।

স্বল্পভাষী রামানন্দবাবু দেখিতে গম্ভীর হইলেও রীতিমত রসজ্ঞ ছিলেন। নিজেদের মজলিশে তিনি বেশ জমাইয়া গল্প করিতেন। জীবনের শেষভাগে দেখিয়াছি তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার মেয়েদের ও নাতনীদের লইয়া খুব গল্প জমাইয়া বসিয়াছেন। দেখা হইলেই তাঁহার মুখে শুনিতে পাইতাম আমার কন্যাদের ও নাতনীদের বিষয়ে অনেক গল্প ও তাঁহার নাতনীদের সব গল্প।

রামানন্দবাবু নীতিপরায়ণ বলিয়া কাব্যরস ও জীবনের রস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁহার মত খুব উদার ছিল। ১৯২০-১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করার কথা উঠে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যগীতঅভিনয় প্রভৃতির কথা তুলিয়া অনেক ব্রাহ্ম ইহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু প্রবীণ হইলেও রামানন্দবাবু আগাগোড়া তরুণদের দলে যোগ দিয়া রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে লড়িয়াছেন।*

রবীন্দ্রনাথের কাছে মাঝে মাঝে সব মজার মজার চিঠি নানা স্থান হইতে আসিত। কবি তাহা রামানন্দবাবুকে দেখাইলে দুইজন বৃদ্ধ বসিয়া রীতিমত তাহার রস সম্ভোগ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন নাতবৌ কমলা দেবীর সঙ্গে রসিকতা করিতেছেন এমন সময় রামানন্দবাবু বলিলেন, "আপনি এঁদের নিয়ে কেন চিরকুমার সভা অভিনয় করুন না? চিরকুমার সভা বইটা ইংরাজিতে অনুবাদ করিলে কেমন হয়? বইটার মধ্যে অপূর্ব সব রসিকতা আছে।"

কবি বলিলেন, "ওদের দেশে শালী ও নাতনীদের লইয়া এইরূপ সরস সম্বন্ধ যে নেই।"

তখনকার দিনে আশ্রমে দিনেন্দ্রনাথের পিতা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেন। দ্বিপুবাবু খুব মজলিশী মানুষ ছিলেন। রামানন্দবাবু নেপালবাবু এই দুইজনে মিলিয়া দ্বিপুবাবুর দরবার সরগরম করিয়া তুলিতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাহাতে যোগ দিতাম।

মুলু ছেলেটি পিতার এই সরসতা পাইয়াছিল। সুকুমার রায় মহাশয়ের সহিত মুলু এখানে অনেকবার সুকুমারবাবুর অদ্ভুত রামায়ণ গান করিয়াছে। আবার মুলুর হৃদয় চারিদিকের দুঃখী দুর্গতদের দুঃখেও সদাই ব্যথিত হইত। এমন সহৃদয় বালক বড় একটা দেখা যায় না। নিকটবর্ত্তী গ্রামের দরিদ্রেরা ছিল তার পরমবন্ধু। তাহাদের জন্য সে একটি নৈশ বিদ্যালয় করিল। ইহার জন্য আপন যাহা কিছু সঞ্চয় তাহা সে ব্যয় করিত। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পরিত্যক্ত সব খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া কাঁধে করিয়া বহিয়া সে

* তিনি প্রবাসীতেও রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য করা বিষয়ে লিখিয়াছিলেন।

বোলপুর শহরে বিক্রয় করিয়া আসিত। অর্থ যাহা পাইত তাহা সে নৈশ বিদ্যালয়ে ও দুর্গতদের সহায়তায় ব্যয় করিত। এই জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে আশ্রমের উৎসবে আনন্দবাজারে ছেলেদের লইয়া সে প্রদর্শনী খুলিত, সার্কাসের আয়োজন করিত। তাহার এই সব উৎসবের কাজে গুরুদেব ও রামানন্দবাবু অর্থ সাহায্য করিতেন। মাঝে মাঝে মুলু নৈশ বিদ্যালয়ের গরীব ছেলেদের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইত। তাহাতে রামানন্দবাবুর বিশেষ উৎসাহ ছিল। খুব অল্পদিন মুলু বাঁচিয়াছিল। ১৯১৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মুলু কলিকাতায় সামান্য কয়েক দিন রোগে ভুগিয়া মারা যায়। রামানন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাহাতে বড়ই মর্মাহত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে এই শোকের সময় প্রায়ই সান্ত্বনা দিয়া পত্র লিখিতেন। পরদুঃখকাতরতায় ও লোকসেবাতেও মুলু রামানন্দবাবুরই পুত্রের যোগ্য ছিল।

মুলুর পূর্ণ নাম ছিল মুক্তিদাপ্রসাদ। প্রসাদ বা মুলু নামেই সে পরিচিত।

তাহার মৃত্যুর পর রামানন্দবাবু তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ দান করেন তাহার সহায়তায় এখনও সেই প্রসাদ-বিদ্যালয়ের সেবাকার্য্য চলিতেছে। গ্রামবাসী দরিদ্র শিশুরা এখনও সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া মুলুর সেই সেবার স্মৃতিকে জীবন্ত রাখিয়াছে।

দয়া-দাক্ষিণ্য উদারতা প্রভৃতি নানা ভাবেই মুলু ছিল উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। রামানন্দবাবু যে কত বড় মহদাশয় মানুষ ছিলেন তাহার একটি পরিচয় বিশ্বভারতীর ইতিবৃত্ত হইতেই আমরা দিতে পারি। এক সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রন্থগুলির সমস্ত হিন্দী অনুবাদের অধিকার ও মালিকানা নিজে ইইতেই রামানন্দবাবুকে দিয়াছিলেন। তাহার বহুবৎসর পরে রামানন্দবাবুকে প্রদত্ত এই মালিকানা স্বত্বটা বিশ্বভারতীর পক্ষে পুনরায় পাওয়া একান্ত আবশ্যক হইল। এই স্বত্বটা না পাইলে বিশ্বভারতীর শুধু যে আয়ের ক্ষতি হয় তাহা নহে, রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভারতীয় অনুবাদগুলির সুব্যবস্থাও বিশ্বভারতী করিতে পারেন না। অথচ যে বস্তু দিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা তো ফেরত চাওয়াও যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাহা কিছুতেই চাহিলেন না। কিন্তু কি করিয়া রামানন্দবাবু তাহা টের পাইলেন এবং নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কবিগুরুর কাছে প্রাপ্ত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সমস্ত স্বত্ব ও মালিকানা তিনি সানন্দে বিশ্বভারতীকে প্রত্যর্পণ করেন।

এই বিষয়ে রামানন্দবাবুর বন্ধু চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ও কম নহেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের দুঃখের দিনে অর্থাভাবে কবি তাঁহার সব বাংলা গ্রন্থের স্বত্ব (যাহা তখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল) এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণিবাবুকে নাম-মাত্র মূল্যে বিক্রয় করেন। বিশ্বভারতীর আরম্ভ সময়ে দেখা গেল কবির বাংলা গ্রন্থই একটা বিরাট সম্পত্তি। এই স্বত্বটা ফিরিয়া না পাইলে বিশ্বভারতীর কিছুতেই চলে না, ইহা জানিয়াও কবি তাহা ফেরত চাহিতে অসম্মত হইলেন।

কবিকে না জানাইয়া এক দিন স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুইজনে এলাহাবাদে গেলেন এবং চিন্তামণিবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। চিন্তামণিবাবু তখন কোথায় যাইতেছেন, তাঁহার দুয়ারে গাড়ী প্রস্তুত। কি করিয়া কথাটা চিন্তামণিবাবুর কাছে ঠিকমত পাড়া যায় এই কথাই যখন সুরেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ উভয়ে ভাবিতেছেন তখন চিন্তামণিবাবু কথাটা বুঝিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন, "আপনারা কেন ইতস্ততঃ করিতেছেন? আপনারা নিশ্চিন্তমনে ফিরিয়া যাউন। আমি বিশেষ প্রয়োজনে এখনই অন্যত্র চলিয়াছি। ফিরিয়া আসিয়াই কাগজপত্র সমেত সব অধিকার নিঃশেষে আপনাদিগকে ফিরাইয়া দিব।"

এমন নিশ্চিত কথার উপর আর তো কথা চলে না। উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল চিন্তামণিবাবু ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার সব স্বত্ব একেবারে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বভারতীর জন্য ফিরাইয়া দিয়াছেন। আজ বিশ্বভারতীর তাহাই প্রধান সম্পত্তি।

রামানন্দবাবু ও চিন্তামণিবাবু উভয়েই উভয়ের উপযুক্ত বন্ধু ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা এতক্ষণ কিছুই বলা হয় নাই। তিনি ছিলেন জ্ঞান-তপস্বী সংসার-ভোলা লোক। রামানন্দবাবুকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। রামানন্দবাবুও তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সব লেখাই তিনি রামানন্দবাবুকে পাঠাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতেন। এক এক সময় রাত্রিকালে আসিয়াও তিনি আমাকে শুনাইতেন রামানন্দবাবুকে তিনি কি লিখিয়াছেন অথবা রামানন্দবাবু তাঁহাকে কি লিখিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই বাংলাতে Short hand বা রেখাক্ষরলেখনরীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার সেই প্রণালীই একটু পরিবর্ত্তিত আকারে এখনও চলে।

তিনি তেমন বৈষয়িক লোক নহেন বলিয়া সেই প্রণালীর যে তিনিই আদি প্রবর্ত্তক সে কথা অনেকেই এখন জানেন না।

এই রেখাক্ষর বিষয়ে নানা চিত্রসহ তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে নানা চমৎকার সরস কবিতার উদাহরণ সমেত দ্বিজেন্দ্রবাবু সাজাইয়া লিখিতেন। তাহা ছাপাইতে গিয়া কোনো মুদ্রাযন্ত্রেই তাহা ঠিক তেমনটি করিয়া মুদ্রিত করিতে পারা গেল না। তখন তিনি রামানন্দবাবুকে ধরিলেন। রামানন্দবাবু বলিলেন, "যদি ছাপানই না যায় তবে আপনার স্বহস্তে লেখা পাতাগুলি হাফটোন করিয়া বই ছাপান যায়।" তাহাতে দ্বিজেন্দ্রবাবু অতিশয় প্রীত হন এবং রামানন্দবাবু সেই ভাবেই মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া দেন।*

দ্বিজেন্দ্রবাবু শুনিয়াছিলেন রামানন্দবাবু অন্ধদের জন্যও এইরূপ লিখন-প্রণালী বাহির করিয়াছিলেন। তাহাও কোনো সাধারণ প্রেসে ছাপিবার মত ছিল না। সেই জন্যই রামানন্দবাবু হয়ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর মনের উৎসাহটার অর্থ বুঝিয়াছিলেন ও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন রামানন্দবাবুকে একটি কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে এই দেশের অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ দেবার জন্য আপনি চাকুরী প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছিলেন। আপনার সেই চেষ্টা এত দিনে ধন্য হইয়াছে। আপনি আপনার জীবনের প্রারম্ভে অন্ধদের দৃষ্টিহীনতার দুঃখ দূর করিতে তাহাদের জন্য অক্ষর রচনা করিয়াছিলেন, আপনি ধন্য। অন্ধকে দৃষ্টি দিয়া বোবার মর্মকথা প্রকাশ করিয়া আপনি জীবনকে সার্থক করিয়াছেন। ভগবান আপনার সহায় হউন। বহুকাল আপনি ছিলেন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমতীর্থ প্রয়াগধামে। আপনার মধ্যে এখনও জ্ঞান ও সেবার ধারা সমভাবে প্রবহমান। আপনি এখনও জ্ঞান ও সেবার সঙ্গমক্ষেত্র সেই মুক্তিতীর্থবাসী।"

"আপনি অক্ষয় বটের তলে সাধনা করিয়াছেন। আপনার সাধনা অক্ষয় হউক। দ্রৌপদীর স্থালী ছিল অক্ষয় স্থালী। যতক্ষণ দ্রৌপদী নিজে না খাইতেন ততক্ষণ তাঁহার স্থালীর অন্ন ফুরাইত না। স্বার্থের স্পর্শ না ঘটিলে ভগবানের দান অক্ষয় হয়। আপনি নিঃস্বার্থ সাধক, আপনার সাধনা অক্ষয় হইবে। সেই সাধনার অক্ষয় বট-মূলে আপনি চিরকাল সমাসীন থাকুন।"

রামানন্দবাবুর জীবনাবসানে দ্বিজেন্দ্রনাথের সেই মহা-বাণী স্মরণ করি।

* দ্বিজেন্দ্রবাবুকে রামানন্দবাবু এত ভালবাসিতেন এবং ভক্তি করিতেন যে দ্বিজেন্দ্রবাবু একবার তাঁহার লেখায় (রেখাক্ষর বিষয়ে) সামান্য একটু পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করাতে রামানন্দবাবু দ্বিজেন্দ্র-বাবুকে খুসী করিবার জন্য প্রবাসীর একটি ছাপা ফর্ম্মা নষ্ট করিয়া নূতন করিয়া আর একটি ফর্ম্মা ছাপিয়া দেন।

শ্রমিক সমস্যা

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৩২০ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সাহিত্যে' শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ-গুপ্ত মহাশয়ের 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে দাশগুপ্ত মহাশয় ১১৯৫ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণে লিখিত দুইখানি দলিলের আলোচনা করেন। প্রথমখানিতে "দারিদ্র্য-নিবন্ধন তিনটি টাকা পাইয়া কুঞ্জমালা (সধবা কি বিধবা প্রকাশ নাই) সপ্তমবর্ষীয়া কন্যাসহ আত্মবিক্রীতা হয়, সত্তর বৎসরের জন্য আত্মবিক্রয়, তখন তাহার বয়স ২৭ বৎসর, মোচনের ব্যবস্থা "সোয়া মণ হলধি সিধা"। দ্বিতীয় দলিল-খানিতে দেখা যায় কুঞ্জমালার এক "ভাসুর" রামরামতৈ জীবিত ছিল এবং এই আত্মবিক্রয়ে তাহার সম্মতি ছিল। দ্বিতীয় দলিল অনুসারে কুঞ্জমালার প্রাপ্য তিন টাকা এবং দালাল রামরাম দাসই এর ২ (দুই) টাকা, সম্ভবতঃ এই তিন টাকারই অন্তর্গত। ক্রেতা ন্যায়ভূষণ মহাশয় কুঞ্জ-মালার ভাসুর রামরামতৈর সম্মতি দলিলে লিখাইয়া লন এবং দালাল রামরাম দাসই "খেসারত নিশা" করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

নারদস্মৃতিতে* যে পঞ্চদশ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে

* গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ
অন্নকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ।

উপরের দলিল দুখানি হইতে জানা যায় যে ঐ প্রথার কতকাংশ ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তাহার পূর্ব্বেও যে এই প্রকার প্রথার প্রবর্ত্তন ছিল বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য চারিখানি মৈথিল দলিল তাহার নিদর্শন।

গত বাইশ বৎসর যাবৎ 'বিহার ও উড়িষ্যা গবেষণা সমিতি' প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আদেশে ও ব্যয়ে বিহার ও উড়িষ্যায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত হস্তলিখিত পুঁথির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন এবং আমি এই অনুসন্ধানের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিয়াছি। আমার নির্দেশে এক জন মৈথিল পণ্ডিত মিথিলার ও একজন উড়িয়া পণ্ডিত উড়িষ্যার পুঁথি অন্বেষণ করেন। আমাদের আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির বিবরণ এগারটি বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, তাহার মধ্যে চারিটি খণ্ড (প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গা মহারাজ বাহাদুরের অর্থব্যয়ে এই পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে।

পুরাতন পুঁথির এই অনুসন্ধান-ব্যপদেশে নিম্নলিখিত দলিল চারিখানি পাওয়া যায়।

(১) প্রথম দলিল: তারিখ—লস' ৬৬০, বিক্রমাঙ্ক ১৬৯১, শাক ১৬৯১, সালিবাহন ১৮২৬ (অঙ্ক সম্বৎ ১৮২৬), সন ১১৭৭, শ্রাবণ কৃষ্ণদশমী শুক্রবার। [১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ]

"তীরভুক্তিরাজ প্রতাপসিংহের সময়…শ্রীধর শর্ম্মা লক্ষ্মীধর শর্ম্মার নিকট দ্বাদশ মুদ্রা দিয়া রবিত্যা ও বুধুত্যা নামক দুইজন ধানুষ্কজাতীয় শ্যামবর্ণ শূদ্র ক্রয় করে। যদি ইহারা পলায়ন করে তবে রাজসিংহাসনের নিকট হইতেও ইহাদের ধরিয়া আনিয়া কাযে লাগান হইবে। যদি কেহ কোন প্রকার বিবাদের সৃষ্টি করে, বিক্রেতা তাহার মীমাংসার জন্য দায়ী।"

(২) দ্বিতীয় দলিল: তারিখ—লক্ষ্মণসেন ৫৮১, শকাব্দ ১৬১২—[অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৬৯০]

"কাশ্যপতি গজপতি নরপতি এই তিন রাজার অধিপতি সুরত্রাণ শ্রীশ্রীশ্রী নওরঙ্গসাহের রাজ্যকালে ও তাঁহার অনুগ্রহে শ্রীশ্রীসারিস্তাখাণ ভবকাসুবার অধিকারী তাঁহার অধীনে শ্রীইসপজিত্যাখা জাগীরদার, তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশের অন্তর্গত পুটকিনীপুর নগরে জমীদার শ্রীশ্রীহৃদয়নারায়ণ রায় কাণীগোয়, তাঁহার অধিকারে শ্রীশ্রীসুন্দর রায়ের দবা পরগণার অন্তর্গত মহথোর গ্রামবাসী পালীস শ্রীরামশর্ম্মা দাসদাসী ক্রয়ের জন্য নিজের ধন ব্যবহার করিতেছে। * * * ইহার নিকট ৫০৲ টাকা লইয়া কটৌহার পরগণার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামনিবাসী চাঁদশর্ম্মা—অমাতজাতীয় নমন, ধুরৈনিঞা, অঝুডী, জুগরী, বদ'রিয়া ও চামুঞা নামা ও নাম্নী ঈষদ্‌গৌরবর্ণ নিজের দাসী ও দাসগুলিকে নানামধ্যস্থের দ্বারা মূল্য স্থির করিয়া ঐ ধনীর নিকট বিক্রয় ক'রিতেছে। যদি কোথায়ও পলাইয়া যায় রাজসিংহাসনতল হইতেও ধরিয়া আনিয়া দাসদাসীর কার্য্যে লাগান হইবে। * * * দলিল লেখক শ্রীজয়কৃষ্ণ শর্ম্মা। লেখার জন্য দেয় ৬।০।"

(৩) তৃতীয় দলিল: তারিখ—লক্ষ্মণসেন ৬৭৭, শকাব্দ ১৬৫৯ [অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৭]

"* * * ডিল্লীসম্রাট্ মুহম্মদ সাহের রাজ্যকালে তাঁহার প্রেরিত ভবকার সুব্বাদার সুজাউদ্দীখান নৌআর, তাঁহার প্রেরিত জাগীরদার শ্রীশ্রীসএকখান নৌআর পুটকিনীপুরের মালিক, তাঁহার প্রে'রিত রাজা শ্রীরামচন্দ্রনারায়ণ রায় কটিহার প্রগন্নান্তর্গত রজকড গ্রামে শ্রীহরদত্ত শর্ম্মা, শ্রীরমাপতি বচ্ছরু, আনন্দ ও নরহরি শর্ম্মাকে শূদ্রক্রয়ের জন্য নিজের টাকা দেয়। তাহার ২২৲ রজতমুদ্রা লইয়া ৪টী প্রাণী বিক্রয় করিল—কৈবর্ত্তজাতীয় পরৌআ নামক নিজের দাস বয়স ৩২ বৎসর, তাহার পত্নী অমিয়া, বর্ণ গৌর বয়স ২১ বৎসর, তাহার পুত্র নাম দায়া, ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বয়স ৭ বৎসর এবং তাহার কন্যা নাম মুনিয়া, বর্ণ গৌর * * সন ১১৪৪ সাল, আষাঢ়, শুক্লপূর্ণমাসী তিথি। * *"

(৪) চতুর্থ দলিলখানির নাম 'গৌরীবরাটিকাপত্র'। তারিখ—শাক ১৬৪৫ সন ১১৩১ সালমুকী—[অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দে ১৭২৩]

"* * শ্রীভবদেব শর্ম্মা শ্রীসাহেব শর্ম্মাকে পত্র দিতেছে। ইহার নিকট হইতে ৩৲ তিন রজত মুদ্রা লইয়া অমাত জাতীয় তুলইর কন্যাকে—বর্ণ শ্যাম বয়স ৬ বৎসর—বাদরির পুত্রকে বিবাহের জন্য দেওয়া হইল। ইহার পর আমার কোন স্বত্ব নাই…। আষাঢ় শুক্ল, গুরুবার, দ্বিতীয়া তিথি। সাক্ষী শ্রীবাসুদেব ঝা শ্রীবিশ্বেশ ঝা। দুইএর অনুমতিতে লিখিত লেখক শ্রীঘোষ শর্ম্মা। লেখার খরচ তিন আনা।

বাংলা ও মিথিলার সম্বন্ধ চিরকালই ঘনিষ্ঠ। শ্রীনিবারণ দাশগুপ্তের প্রকাশিত দুইখানি এবং উপরে আলোচিত তিনখানি দলিলের বিষয়বস্তু প্রায় একই প্রকার। আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান ইহাদের যথাযথ সংগ্রহে এবং ঐ অর্থনীতির পুনঃসংস্কারের আশা এই সব অনাচারের

যোক্ষিতো মহতশ্চনাং যুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণেজিতঃ
তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রব্রজ্যাবাসিতঃ কৃতঃ।
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশস্মৃতাঃ।

প্রতিকারে। এই প্রকার আচারের মূলে আছে—নিদারুণ দারিদ্র্য এবং ততোধিক পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা ও দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতির অভাব। দাস স্বামীদিগকে ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রা দিয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের Emancipation Act এই প্রথা আইনতঃ বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার প্রতিকার তখনই হইবে যখন ইহার নির্ম্মম বাধ্যতামূলক প্ররোচনার প্রতিরোধ করা হইবে। তাহার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিবদ্ধ স্বার্থত্যাগ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

মূল দলিল

[দান বিক্রয় পত্র]

(১) সিদ্ধি। পরম ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলীপূর্বকগত-রাজলক্ষ্মণ সেনীয়ে ষষ্ট্যধিকষট্‌শতে লিখ্যমানে যত্রাঙ্কেনাপি লসং ৬৬০ বিক্রমার্কগত বর্ষে একনবত্যধিক ষোড়শতশে লিখ্যমানে যত্রাঙ্কেনাপি শাকে ১৬৯১ সালিবাহনীয় গতবর্ষে ষড়বিংশত্যধিকাষ্টাদশশতে যত্রাঙ্কেনাপি সংবৎ ১৮২৬ সন ১১৭৭ সাল শ্রাবণকৃষ্ণদশম্যাং শুক্রে পুনঃ পরমভট্টার কাম্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়োধিপতি পাতিসাহ পদাঙ্কিত শ্রীশ্রীশ্রী গোহর সাহে তদনুমতি লব্ধ ফিরঙ্গপদাঙ্কিত কলকত্তা-পুরাধীশ শ্রীশ্রীবড়েসাহেব ব্যবস্থাপিত মকসুদাবাদাবস্থিত শ্রীশ্রীমুজফরজঙ্গে তৎপ্রসাদলব্ধাধিপত্য পাটলিপুরাবস্থিত শ্রীশ্রীসিতাবরায়ে তদ্ভুজাবলাবলম্বন প্রলব্ধতীরভুক্তিদেশকর গ্রহণমামর্থ্যকদডিভঙ্গাগ্রামাবস্থিত ফৌজদার পদাঙ্কিত—শ্রীশ্রীরায়ে সংগমলালে সকলরাজমণ্ডলালংকৃত চরণারবিন্দ মহারাজাধিরাজদেব দেব সদাসমরবিজয়িতীরভুক্ত্যধিপ মহোপ্রপ্রতাপ শ্রীশ্রীমৎপ্রতাপসিংহে বর্ত্তমানে প্রগন্না পরিহারপুর রাঘোহরিপুরগ্রামস্থিতো বলিয়াস সং শ্রীধর শর্ম্মা শূদ্রক্রয়ণার্থং স্বধনং প্রদত্তবান্। ধনগ্রাহক এতৎসকাশাৎ প্রগন্নাজরইল ককরৌড়গ্রামস্থিতঃ করমহাসং চাতুর্ধরিক শ্রীলক্ষ্মীদত্তশর্ম্মা শূদ্রৌ শ্যামবর্ণৌ ধানুষ ক জাতীয়ৌ রবি-সাবুধুআনামানৌ দ্বৌ নানামধ্যস্থকৃত মূল্যগোহরশাহাঙ্কিত রাজত দ্বাদশমুদ্রা আদায়ামুষ্মিন্ ধনিনি বিক্রীতবান্। প্রাণী দুই ২ মূল্য রুপৈয়া ১২ বারহ তকর দেহাত্র রবিআক ৭ সাত বুধুআক ৫ গোত্রাগোত্র নিবারকশ্চাত্র বিক্রেতৈব পুনর্দাস্যঃ। যদি কুত্রাপীমৌ দাসৌ প্রপলায্য গচ্ছেতাং তদানেন পত্রপাত্র প্রমাণেন রাজসিংহাসন তটাদপ্যানীয় সকল দামকর্ম্মসু নিয়োজ্যৌ। যদি কোপি কুত্রাপ্যস্মিন্নর্থে বিবদেৎ তদা ময়া বিক্রয়কারিণৈব সমাধেয় মিতি। দসখত রত্নপাল সংগ্রামস্থিত শ্রীশূলপাণি দাস প্রপন্না পিডারুক্ত লিখাপন দীয়তে আনা বারহ ৮০

সহী লক্ষীদত্ত বো' সে লিখল সে সহী। গোআহ শ্রীগণেশ ঝা সাকিন ককরৌড়।

সহী দেবন বো' গো' রমণ ঝা | সাক্ষী শ্রীঝোণ্ট ঠাকুর | সাকিন ককরৌড়। গোঃ বোধ ঝা ক' সাকিন ককরৌড় | গো' বাচা ঝা সাকিন ককরৌড় | সাক্ষী শ্রীপ্রীতম শর্ম্মা জলকী সাকিন হরিপুর।

(২) স্বস্তি। পরমভট্টারকেত্যাদিরাজাবলীপূর্বকগত-লক্ষ্মণ সেন দেবীয় একাশীত্যধিকপঞ্চশততমে সম্বৎসরে অঙ্কেপিলসং ৫৮১ দ্বাদশাধিকষোড়শশততমে শকাব্দে চ অঙ্কেপি ১৬১২ পুনঃ পরমভট্টারকাশ্বপতিগজপতিনরপতি-রাজত্রয়াধিপতি সুরত্রাণ শ্রীশ্রীশ্রীনসোরঙ্গসাহ সম্ভুজ্যমানে ভূমণ্ডলে তৎপ্রসাদলব্ধ ঢক্কাসুব্বাধিকার শ্রীশ্রীসারিস্তাষাণ তৎপ্রেষিতজাগীরদার শ্রীইসপজিআষাং সম্ভুজ্যমানে বঙ্গ-দেশান্তর্গত পুটকিনীপুরনগরে জমীদার শ্রীশ্রীহৃদয়নারায়ণ রায় কানীগোয়াধিকারাধিকৃত শ্রীশ্রীসুন্দর রায় কদবাপর-গনান্তর্গতমহথৌরগ্রামবাসী পালীসং শ্রীরাম শর্ম্মা দাস দাসীক্রয়নার্থং স্বধনং প্রযুঙক্তে। ধনগ্রাহকোঽপ্যেতৎসকাশা-ন্মাঘশুক্লদশম্যাং চন্দ্রেদরিহরাসং চাঁদ শর্ম্মা কটোহার পরগনা-ন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামনিবাসী রাজতপঞ্চাশতমুদ্রামাদায় সমাতজাতীয়ান্ নয়নচধুরৈনিঞা অংঝুড়ীজুগরীবদরিয়া চমুঞা নামান্ ইষদ্ গৌরবর্ণান্ স্বদাসী দাসান্ নানামধ্যস্থ-কৃত মূল্যান্ অমুষ্মিন্ ধনিনি বিক্রীতবান্। তত্র বিক্রীত-প্রাণী ৬ দাসাস্ত্রয়ঃ ৩ দাস্য স্তিস্রঃ ৩ যদি কুত্রাপি প্রপলায্য গচ্ছন্তি এতে তদা রাজসিংহাসনতলাদপ্যানীয় দাসদাসী-কর্ম্মণি যোজ্যেতি। অত্রার্থে সাক্ষিণঃ সোদপুর সং শ্রীলাল শর্ম্মা করমহাসংশ্রীনারায়ণ শর্ম্মা ব্রহ্মপুর সং শ্রীগোসী শর্ম্মাণঃ॥ লিখিতমিদমুভ্যানুমত্যা করমহাসং শ্রীজয়কৃষ্ণ শর্ম্মণেতি লিখাপণোভয়দেয় ৬৷০

(৩) স্বস্তি। পরমভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী ভোগ-পূর্বকগতলক্ষ্মণ সেন দেবীয়সমুদ্রযুগ্মষষ্ঠকে গতে শকাব্দে ১৬৫৯ পুনঃ পরমভট্টারকাশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজত্রয়াধি-পতি ডিল্লীসম্ভুজ্যমানপাতিসাহ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমহম্মদ সাহ মহীমনুশাসতি তৎপ্রেষিতসুব্বাঢক্কায়াং শ্রীশ্রীশ্রীসুজাউদ্দী খান নৌষার সম্ভুজ্যমানে তৎপ্রেষিতজাগীরদার শ্রীশ্রীসএক খান নৌষার পুটকিনীপুর সংভুজ্যামনে তৎপ্রেষিত রাজশ্রীরামচন্দ্র নারায়ণ রায় কটিহারপ্রগনান্তর্গতরজবাড়-গ্রামে বুধবালসং শ্রীহরদত্ত শর্ম্মা বলিষাসং শ্রীরমাপতি তথা বচ্ছরু তথা আনন্দ তথা নরহরিশর্ম্মসুশূদ্রক্রয়নার্থং স্বধনং প্রযুঙক্তে। ধনগ্রাহকা অপ্যেতৎসকাশাৎ দ্বাবিংশতি রাজতমুদ্রামাদায়ামুষ্মিন্ ধনিনি বিক্রীতবন্তঃ। যত্রাঙ্কে

প্রাণী ৪ স্বদাসং কৈবর্ত্তজাতীয়ং পরৌআনামানং দ্বাবিংশ-দ্বর্ষবয়স্কং তৎপৎনীমমিয়ানাম্নীমেকবিংশতিবর্ষবয়স্কাং গৌর-বর্ণাং তৎপুত্রং দায়ানামানং সপ্তবর্ষবয়স্কং সর্বমীষৎশ্যাম-বর্ণং তৎপুত্রীং মুনিয়ানাম্নীং গৌরবর্ণাং বিক্রীতবন্তঃ। যদি কুত্রচিৎ প্রপলায্য গচ্ছতি তদা রাজসিংহাসনাদানীয় দাস্য-কর্ম্মনি যুজ্যতে ইতি সন্ ১১৪৪ সাল আষাঢ় শুক্লপৌর্ণমাস্যাং তিথৌ ॥

সাক্ষী মহিসীবুধবালসংশ্রীদুঃখহরণ শর্ম্মা রাজবাডবাসী হরিঅম্ব সং শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা বাজবাডবাসী করম্বহা সং শ্রীগোপাল শর্ম্মা মরিচইবাসী ॥ লিখিতমুভয়ানুমত্যা বুধ-বালসং শ্রীমণিধর শর্ম্মা দ্বাবিংশত্যণুকমাদায় যাফরপুর-বাসিনেতি ॥

[গৌরীবরাটিকাপত্র]

গৌরীবরাটিকাপত্রমিদং মাগুরসং শ্রীভবদেব শর্ম্মা পালী সং শ্রীসাহেব শর্ম্মসু পত্রমর্পয়তি। তদেতৎসকাশাদ্রাজত-মুদ্রাত্রয়মাদায় অমাতজাতীয়াং তুলইপুত্রীং শ্যামবর্ণাং ষড্-বর্ষবয়স্কাং বাদরিপুত্রায় পরিণেতুং দত্তা। অতপরং মমস্বত্বং নাধি শাকে ১৬৪৫ সন্ ১১৩১ সাল মুলকী। আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং গুরৌ। সাছী শ্রীবাসুদেব ঝা শ্রীবিশ্বেশ ঝা। লিখিতমুভয়ানুমত্যা শ্রীঘোঘে শর্ম্মণা। লিখাপন আনা ত্রীণি—

পান্থ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ছুটেছিস চঞ্চল তোরা কোন্ পান্থ গো,
অস্থির বেগে দিবারাত্রি,
কোথা সেই কোন্ দেশ? পেলি তার বার্ত্তা কি,
রে অজানা তীর্থের যাত্রী।
জন্মের পর থেকে কর্ম্মের বোঝা বয়ে ঘুরে' মলি' চঞ্চল পান্থ,
শান্তির ভারে হায় দেহমন কেঁদে ওঠে
আজো তবু হলি না রে ক্ষান্ত।
উষা আসে—উঠে রোদ—তাতে কঙ্কর পথ—
দাউ দাউ জলে মধ্যাহ্ন,
যাত্রার পথে তোর বেলা ওই নেমে আসে
লাল হয়ে এল অপরাহ্ণ।
বেলা যায়—বেলা যায়—কেহ ঐ ডাক ছাড়ে,—কেহ কয়—
ঐ যায় কাল গো,
তারি সাথে মিশে তোর বন্ধু গো হ'ল ভুল
হারাইলি জীবনের তাল গো।
সঙ্গীর সাথে তুই মিলাইয়া কণ্ঠ গো
ভুলে গেলি আপনার ছন্দ,
কাল যায়—বলি' সবে করি' তুই সাবধান
নিজে হায় হয়ে রলি' অন্ধ।
বন্ধু গো, তোরি পথে যায় জীবনের বেলা ওঠে তাল
পড়ে তারি সোম গো,
তুই শুধু চলেছিস চলে না রে মহাকাল সীমাহীন
সে যে মহাব্যোম গো।
অনন্ত মহাকাল নেই তার আদিশেষ সীমাহীন
কি ক'রে সে চলবে,
বন্ধু গো, আঁখি খোল্, তোরি যাত্রার যাদু
ভুল করে' তোরি পথ ছল্‌বে
ওই দেখ্ কালাকাশ বক্ষেতে তারি তোর
যাত্রার রচা মহাপথটি,
চলে না রে মহাকাল, পান্থ গো, তোরি ওই জীবনের
চলে শুধু রথটি।
তোরি ঐ বেলা যায়—এল সাঁঝ—সাথী নেই—
সংসার ঝরে' যায় দৃশ্যে,
চলে না রে মহাকাল তোরি ঐ জীবনের বেলা হায়
ডুবে' যায় বিশ্বে!

ছেলের চাকুরী

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

চাকুরীর জন্য শ্রীধরের সঙ্গে জগুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া অবধি বিমলার চোখে আর ঘুম নাই। ছেলে সবে এই চৌদ্দয় পড়িয়াছে, নিতান্তই অবুঝ। জেলার শহর পর্য্যন্ত দেখে নাই, কলিকাতার পথ-ঘাটে সে চলিবে কেমন করিয়া?

এতদিন বিমলা কলিকাতাকে শুধু কুবেরের ভাণ্ডার বলিয়াই জানিত। পথে-ঘাটে টাকাকড়ি ছড়ানো আছে, অপেক্ষা খালি কুড়াইয়া লইবার।

ছেলে রওনা হওয়ার পর পাঁচজনের নিকট হইতে সে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিল। কলিকাতা ভাল-মন্দয় মিশেল জায়গা তবে মন্দের ভাগই বেশী। রাস্তায় হাওয়া-গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম গাড়ী—এরা সব দৈত্য-দানবের মত পিষিয়া মারে, চাপা পড়িয়া যারা রক্ষা পায় তারাও বাঁচিয়া থাকে কানা খোঁড়া হইয়া। তার উপর আছে বদমায়েস আর ছেলে ধরার দল।

এসব আগে জানিলে জগুকে সে কোনরকমেই পাঠাইত না।

বিমলা এত করিয়া বলিয়া দিল, পৌছিয়াই যেন চিঠি দেয়। কিন্তু তার পর কাটিল দশদশটা দিন, জগুদের কোন খবরই আসিল না।

তার উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। শ্রীধরের পরিবারও বলে, তাই ত, কি হ'ল? উনি ফি বার পৌছেই চিঠি দেয়। এরকম ত কখনও করে না।

কেহ কেহ বিমলাকে প্রবোধ দেয়, আজকাল লড়াইয়ের বাজার, রেল বোঝাই থাকে পল্টনে আর গোলাগুলিতে, তাদের খাবারে আর সরঞ্জামে, তাই ডাকের এত গোলমাল হচ্ছে।

বিমলা ভাবে হবেও বা। আর পিওনের প্রতীক্ষায় প্রত্যহ আসিয়া শ্রীধরের বাড়ী বসিয়া থাকে।

খবর শেষে এক দিন আসিল। শ্রীধর লিখিয়াছে শিয়ালদহে নেমেও জগুকে দেখেছিলাম। দুষ্টু ছেলেটা তার পর যে কোথায় উধাও হয়ে গেল—

বিমলা বলিল, কি, কি হয়েছে জগুর?

শ্রীধরের স্ত্রী দুষ্টু শব্দটা বাদ দিয়া আবার পড়িল, ছেলেটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। চিঠি লিখতে দেরী হ'ল এইজন্য। গ্রামের ভদ্র-অভদ্র যারা আছেন সবাইকে খবর দিয়েছি। নারান ভৰ্চাযি্য দাদাঠাকুর বলেছেন, কাগজে ছাপিয়ে দেবেন। বোসজা মশাই, শরৎ বাবু পুলিসে তত্ত্ব নিয়েছেন। ব্রজ মেসে কাজ করে। সেও বাবুদের দিয়ে তত্ত্ব করছে। বিমলাদিকে খবরটা দিয়ো তার কাকা গঙ্গাচরণের মারফৎ, বুঝিয়ে বলো ভয় নেই, এত লোক যখন চেষ্টা করছে, খবর মিলবেই।

অন্য দিন ছেলের কথা মনে হইলেই বিমলার চোখ ছল ছল করে। আজ সত্যকার বিপদের সংবাদে সে স্থাণুর মত বসিয়া রহিল। দুর্দৈব যে কত বড়, কত নিষ্ঠুর তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যও তখন যেন ছিল না।

ঘণ্টাখানেক পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। শ্রীধরের দাদা অশ্বিনীর বৌ মন্তব্য করিল, সেদিন বিমলির সোয়ামি গেল, বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই আজ ছেলের এই খবর।

শ্রীধরের স্ত্রী কোন কথা বলিল না। তার স্বামীর নিকট হইতে ছেলেটি হারাইয়া যাওয়ায় সে নিজেকেই কেমন যেন অপরাধী মনে করিতেছিল। অশ্বিনীর বৌ এবার আপনা-আপনিই বলিতে লাগিল, ছুঁড়ি ঠাকুর-দেবতার নামে পাগল, আর তার এই অদেষ্ট। দেবতা আছে না ছাই।

যে-সব পরিবারের লোক কলিকাতায় থাকে বিমলা কয়েক দিন তাদের বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি করিল। প্রত্যেককেই বলিল, দয়া করে ওনাদের কাছে লিখে দাও আমার জগুর একটু খোঁজ করতে। তার কাকা নিষেধ না করিলে সে নিজেও হয়ত যাইত। গঙ্গাচরণ এবং আরও পাঁচ জনে ভয় দেখাইল, খবর ত পাবেই না বরং আরও মুশকিলে পড়বে। কলকাতায় সোমত্ত মেয়েমানুষের ভারি বিপদ।

এতদিন অতি কষ্টে খাবার জুটিত, কোনদিন বা জুটিত না। ছেলেকে কলিকাতায় পাঠানো ঐ খাবারেরই চেষ্টায়। বিমলা আজ সেই অন্ন ত্যাগ করিল।

কোন দিন শনির পূজা, কোন দিন মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, আজ মহাদেবের নামে উপবাস, কাল রক্ষাকালীর উদ্দেশ্যে। কোনদিন বিমলা দু-একটা ফলপাকুড় খায়, খুব ক্ষুধা পাইলে এক দিন বা দুটি চাল-মাখা।

শুইতে, বসিতে, হাঁটিতে, চলিতে সর্ব্বদাই তার মনে পড়ে জগুর জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা। তেঁতুল মাখিয়া ভাত খাইতে সে ভালবাসে তার উপর এক ছিটা গুড় পাইলে সে কি তার আনন্দ। হাসিতে হাসিতে বলে, মা, তুমি সূর্য্যির মতন, সকল আঁধার ঘুচিয়ে দাও।

এত কথা তুই শিখলি কোত্থেকে, বলিয়া বিমলা ছেলের মুখে চুমা খায়।

পান্তা ভাতের সঙ্গে এক কুচি লঙ্কা, গাছতলায় কুড়াইয়া পাওয়া পাখীতে ঠোকরানো একটা আম—কখনও বা দুটা কয়মচা—জগুর আনন্দের উৎস এই সব ছোটখাটো জিনিস। গরীবের ছেলে, এর বেশী আশা করিতেও সে জানে না।

এই সেদিনের কথা, ভাবিলে বিমলার বুকটা ভাঙ্গিয়া যায়। মল্লিকবাবুদের গাছতলা হইতে একটা আম কুড়াইয়া লইবার জন্ত জগু কি মারটাই না খাইল।

মল্লিকরা তাদের জমিদার। প্রায়-ভূমিহীন এই ভূম্যধিকারীরা কবিরাজীর নামে আসামে গেরিমাটির বড়ি বেচিয়া কিছু পয়সা করিয়াছে। তারা দেশে না থাকায় গ্রামের লোক এক রকম শান্তিতেই কাটাইতেছিল। মল্লিকরা বোমার হিড়িকে গাঁয়ে ফিরিয়া সুরু করিয়াছে অকথ্য অত্যাচার। গত বৎসর এদের জন্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অনুরোধ পালন না করায় জগুর বাপ যতুনাথকে কি মারটাই না তারা মারিল। ফলে আসিল জর এবং জরের পিছন পিছন মৃত্যু।

যতুনাথ বাঁচিয়া থাকিতে একটা জিনিস কোন দিনই বিমলার চোখে পড়ে নাই। আজ ছেলের দিকে চাহিলেই মনে হয় তার স্বামী যেন ছোটটি হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। হাসিলে বাপেরই মতন তার গালে টোল পড়ে। চলার ভঙ্গীও সেই রকম। চলার সময় হাত তুখানা শিথিল ভাবে ঝুলিতে থাকে। জগু হেলিয়া তুলিয়া চলে যেমন চলিত যতুনাথ।

যতু লেখাপড়া জানিত না কিন্তু জগু শিখিতেছিল। পাঠশালায় গুরু মহাশয় মৌলবী আবতুল আজিজ কাজি কত বার বলিয়াছেন, "ছেলেকে পড়াতে পারলে ও মস্ত লোক হবে। অনেক বি-এ, এম-এ পাস আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে, জগুর মাথা তাদের চেয়েও ভাল।"

কথাগুলি মনে পড়িলে বিমলার হাসি পায়, অভাগীর ছেলের আবার মাথা। তার চেয়ে পেটে দেবার মত তুমুঠো ভাত দিলেই ত ভাল হ'ত ঠাকুর।

বিমলা ঘরে শুইয়া শুইয়াই চালার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখিতে দেখিতে স্বচ্ছ নিবিড়, নীল নভস্তলের ও-পারের কার উদ্দেশ্যে যেন বলে, ঠাকুর, তোমার মনে এই ছিল।

সকালে সূর্য্য-প্রণামের সঙ্গে প্রার্থনা জানায়, দেবতা ফিরিয়ে দাও আমার বাছাকে।

সাঁঝের প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসীতলায় মাথা ছোঁয়াইয়া সন্ধ্যায় দেবীর নিকটও করে ঐ একই নিবেদন।

মাস তুই পরের কথা। বিমলার চেহারা শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে। লোকের সামনে সে বাহির হয় না। পাঁচজনকে মুখ দেখাইতে লজ্জা করে। শুধু রোজ তুপুরে একবার করিয়া পূর্ণ শীলের বাড়ী যায়। পূর্ণের বিধবা পুত্রবধূ ময়নার মা তাকে রামায়ণ পড়িয়া শোনায়। রামায়ণ শুনিতে শুনিতে বিমলার তু'চোখ জলে ভরিয়া যায়। বরাতে ছিল বলিয়া রাম নিজে ভগবান্ হইয়াও কত কষ্ট পাইয়াছেন। সামান্ত মানুষ তারা, ভাগ্যের হাত এড়াইবে কেমন করিয়া।

কখনও বা সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে জগুর সাদৃশ্য। ছেলের বনগমনের পর কৌশল্যার কষ্টের কথা মনে করিয়া কোন সময় বা একটু সান্ত্বনা পায়।

সেদিন সিদ্ধান্ত-খোলার ঠাকুরের উপবাস। বিমলা তুপুরে আর পূর্ণের বাড়ী যায় নাই। মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় বাহির হইতে পূর্ণের ছোট ছেলে কেদার ডাকিল, বিমিদি চিঠি আছে।

বিমলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার চিঠি ভাই? জগু ভাল আছে তো? কি লিখেছে সে?

কেদার বলিল, ডাকঘরে গিছলাম। পিওনদা দিলে, তোমার চিঠি।

পড়িতে না জানিলেও বিমলা হাত বাড়াইয়া কেদারের হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া একদৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার ভয় হইল কে জানে কি আছে এ চিঠিতে। একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, দেখ তু ভাই জগুর লেখা কি না।

কেদার জগুর সহপাঠী। তুজনে খুব ভাব। সে পরম উৎসাহে চিঠিখানা খুলিয়া বলিল, হ্যাঁ এ জগুরই হাতের লেখা। ঠিকানাটা আর কেউ লিখে দিয়েছে তাই আগে ঠিক বুঝতে পারি নি।

কেদার পড়িতে সুরু করিল, মা, আমার জন্ত আর ভেবো না। আমার চাকুরী হয়েছে। আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

শিয়ালদহে নেমেই শ্রীধরদাকে হারিয়ে ফেললাম। কত ডাকলাম, শ্রীধরদা, শ্রীধরদা।

কলকাতায় কত যে শ্রীধর আছে তার ঠিকানা নেই। তিন-তিনটা শ্রীধর এল। একজন ধমক দিলে, কে তোর শ্রীধরদা, শুধু শুধু হল্লা করছিস।

শুধালাম কত লোককে চালকির শ্রীধরদা কোথায় থাকে। চালকির নামও কেউ শোনে নি। বললাম, বিভূতি মুখুজ্জেবাবুর গাঁ চালকি। গাড়ীর তেল আর কেরোসিনের দোকানের মালিক ঠিকাদার বিভূতিবাবু, কত তার কারবার, সিপাইর জন্ত রাস্তা বাঁধে, দালান কোঠা করে, উড়ো-জাহাজের ঘাঁটি বানায়। তাতেও কেউ চিনল না।

আঁচলে তুমি মুড়ি বেঁধে দিয়েছিলে আর তুটো পাকা আম, তাই খেলাম বাতাসা দিয়ে। সন্ধ্যে হ'লে ভয় করতে লাগল। একটা দোকানের সামনে গিয়ে বসতেই দোকানী বলল, ভাগ্ ছোঁড়া।

শুধালাম, কেন বাবু?

দোকানী বলল, কেন আবার কি? বেটা যেন নবাবপুত্তুর, সব কথার জবাব দিতে হবে।

এক বারান্দার নীচে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে দেখি কাপড়ের খুঁটে তুমি যে টাকা আর পয়সা বেঁধে দিয়েছিলে তা নেই। চোরে নিয়ে গেছে।

পুঁটুলির ভিতরের চিঁড়ে, তেঁতুল ও বাতাসা দিয়ে খুব খেলাম। রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটতে লাগল। ক'দিন পরে পুঁটুলিটাও কে যেন নিয়ে গেল শিয়রের তলা থেকে। কাপড়, গেঞ্জি সবই গেল, রইল গামছাখানা।

বাড়ী বাড়ী ঘুরি চাকুরীর খোঁজে। কেউ শুধায়, কলকাতায় চেনা কে আছে। শ্রীধরদা ও নারায়ণ দাদাঠাকুরের নাম করি। শুনে সবাই হাসে।

পথে ঘুরি আর কাঁদি, কাঁদি আর ঘুরি।

একবাড়ীতে শেষটায় দয়া ক'রে রাখলে। এক টাকা মাইনে। কাজ, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, মসলা পেষা, বাজার করা, জুতা বুরুষ করা।

বাড়ীর একটি মেয়ের একটি টাকা হারাল। বাবুরা বললে, তুই বেটা নিয়েছিস্। কি মারটাই-না-মারলে আমায়। একটা ভুঁড়ি-পেট গামছাওয়ালা রাস্তায় বসে গামছা বেচে। কেষ্টোর সহস্র নাম পড়ে আর পাকৌড়ি খায়। কবে তার একখানা গামছা হারিয়েছিল। বাবুদের সঙ্গে তার চেনা আছে বলে সেও আমায় মারলে। বললে, শালা চোর।

একটু পরে টাকাটা পাওয়া গেল। ছোটবাবু দুঃখ করতে লাগল, শুধু শুধু ওকে চোর মনে করলাম।

গামছাওলা বলল, ও বেটাই লুকিয়ে রেখেছিল। এর পর সরিয়ে ফেলত। দেখছ না কি রকম চোখ ওর। কে কেমন লোক আমি চোখ দেখেই বলে দিতে পারি।

চাকুরী গেল। মাইনে পাওনা হয়েছিল। ওরা দিলে না, বললে, পুলিসে দেই নি এই তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি।

আবার বেরুলাম পথে। কেউ বলে, লেখাপড়া করতে পার না? এ ধারে ত বেশ ফুটফুটেটি, কেউ বা জিজ্ঞাসা করে, বিড়ি খাস্ ছোঁড়া, কোকেন?

বড় ফটকওয়ালা বাড়ীর দরজার কাছে গেলেই দারোয়ানরা তাড়া করে, বলে, এ আমীর আদমীর কোঠী। উনারা ভিখারী দেখলে গোঁসা হয়, ভাগ।

কোট-প্যাণ্টলুন-পরা বাবুরা আবার ইংরেজীতে গাল দেয়। তখন আমায় দেখলে তুমি কেঁদে ফেলতে। আমি কাঁদতাম ক্ষিধের কষ্টে আর তোমার জন্যে। মনে পড়ত, বিভূতিবাবুর বাড়ীর সদর অবধি এসে একটা গরুর গাড়ীর আড়ালে তুমি আমায় চুমু খেয়েছিলে। আমার কাপড়ের খুঁটে টাকাটা বেঁধে দেওয়ার সময় তোমার হাত কাঁপছিল। ভাঙা গলায় তুমি বললে, কিছু কিনে খাস্।

আগের দিন রাত্তিরে তুমি ঘুমোতে পার নি। আমায় কত বললে, শহরে যাচ্ছিস। ভাল হয়ে থাকবি। সবাই যেন তোর সুখ্যেত করে, ভালবাসে, তাতেই আমার সুখ।

রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি, তুমি আমার গায়ে হাত বুলোচ্ছ। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে। চালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছিল তোমার মুখের উপর।

এক দিন একটা খাবারের দোকানে গিয়ে বললাম, তিন দিন খাই নি, কিছু খেতে দিন, বাবু।

পিছন থেকে একজন শুধাল, বাড়ী কোথায় খোকা? বললাম, বনগাঁর কাছে চালকি।

—কি কর এখানে?

বললাম, কিছু না।

—কলকাতায় কেউ নাই তোমার?

—না।

—দেশে?

—আর কেউ নেই, খালি মা আছে।

—এস আমার সঙ্গে খাবে এস। বলে সে আমার দিকে হাত বাড়াতেই দেখলাম মানুষটি অন্ধ।

সে আমায় ঐ দোকানে নিয়ে গিয়ে পুরী, তরকারি ও বোঁদে কিনে দিলে।

খেলাম পেট পুরে। অন্ধকে বড় ভাল লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থাক খোকা?

বললাম, পথে পথে।

—থানায় নিয়ে যায় নি কখনও?

একদিন নিয়ে গিছল বাগিচা থেকে। নিয়ে কান মলে ছেড়ে দিয়েছে। বলেছে, বাগিচায় আর থেক না। এবার তা হ'লে বেত খাবে।

অন্ধ বলল, তাকেও নিয়ে গিছল কতবার। গরীবদের ও রকম নিয়ে যায়।

তার পর শুধাল, চাকুরী করবে খোকা?

যেন স্বর্গ হাতে পেলাম। সেই থেকে চাকুরী করি ওঁর ঠাঁই। মাস মাইনে চার টাকা। কাপড়ও দেবে।

সকালে উঠে বাসন ধুই, উনান ধরাই, ঘর নিকুই, রান্না করি। রান্না করতে শিখেছি একটু। তবে তোমার মতন পারি না।

তুমি কি রাঁধ আজকাল? কচুর শাক? কাঁটানটে? ইঁচড়ের ঝোল?

সকালে খাওয়া শেষ করে অন্ধের হাত ধরে বেরুই। উনি একতারা বাজিয়ে গান করে। কি মিষ্টি গলা যদি শুনতে একবার। বনগাঁয়ের বীরেশ্বর উকিলবাবুর বাড়ীতে নিশি যাত্রাওয়ালার গান শুনেছি। এর গলা তার চেয়েও মিষ্টি।

সারাদিন পথে পথে ঘুরি। লোকে ডেকে ডেকে ওর গান শোনে। কত পয়সা দেয়। কত আনি, দোয়ানি।

কেউ পয়সা আমার হাতে দিলে অন্ধ রাগ করে। তাই আমি হাত পেতে নেই না, বলি কাকাকে দাও।

উনি আমায় বলে দিয়েছিল, কেউ যদি শুধোয়, বলবি তুই আমার ছেলে।

আমি বললাম, তা পারব না। বাবা বলব কেন মা, তা কি বলতে আছে? কাকাই বলি। কাকা ভারি খুশী আমার উপর। বলে বেশ, বেশ।

অন্ধ বড় ভাল মানুষ। রং ফরসা, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, বড় বড় চুল, দেখতে বেশ। তবে চোখের পাতা, মুখ, নাক, কান ও ঠোঁটের চামড়া একটু ফুলো ফুলো। আঙুলগুলোও মোটা।

কাকা আমায় না দিয়ে কিছু খায় না। রোজ বিকালে আমরা দোকানের খাবার খাই। হালুয়া-পুরী, মুড়ি-বেগুনি, বাদাম ভাজা, গোলাপী রেউড়ি—এক এক্ দিন এক এক রকম।

কত যে খাবার আছে কলকাতায় তার নামও সব জানি না। খাই আর ভাবি তোমার কথা। তুমি চাল পাও কোথায়?

সেদিন একটি বাবু জিজ্ঞাসা করল, তুমি ওর সঙ্গে বেড়াও কেন খোকা?

আমি বললাম, উনি যে আমার কাকা।

বাবুটি ইংরেজীতে কি যেন ব'লে হটহট ক'রে চ'লে গেল। কাকা আমার হাতে চারটে পয়সা দিয়ে বললে, এই ত চাই জগু, এই দিয়ে কিছু কিনে খেয়ো।

আমি বললাম, খাব না, জমিয়ে মাকে পাঠাব। ও বলল, ও দিয়ে তুমি খাও খোকা। বাড়ীতে টাকা পাঠাবাব ব্যবস্থা আমি করব।

কাল রাত্রে তোমার সব কথা শুনে কাকা আমায় দুটো টাকা দিলে তোমায় পাঠাবার জন্য, আর দিয়েছে ডাক খরচ আর এই খাম ও কাগজের দাম।

আবাব পনেরো দিন পরে ২ টাকা দেবে। দিলেই পাঠিয়ে দেব চট্ ক'রে। তুমি চাল কিনো, ডাল কিনো, গুড় তেঁতুল কিনো। তুমি তো গুড়-তেঁতুল খেতে খুব ভালবাস।

এইবার বিমলা একটু হাসিয়া ফেলিল।

কেদার পড়িতে লাগিল, মা, তুমি আমার শতকোটি প্রণাম নিও আর শতকোটি ভালবাসা। দুদিন দুরাত বসে চিঠি লিখেছি। লিখেছি আর কেটেছি।

কাকাকে চিঠি দেখালাম। শুনে সে ভারি খুশী। বলে, তুই মাতৃভক্ত, উন্নতি তোর হবেই। এক দিন তুই আমার মত রোজগার করবি। চাই কি আমার চেয়েও বেশী। তোকে তাহ'লে কিন্তু গান শিখতে হবে। লিখতে ভুলে গেছি মা, আমিও দুটো গানের একটু একটু শিখেছি। "নারায়ণ পরা মুক্তি, নারায়ণ পরাৎ পরা।" আর "নিত্ নাহেনসে হরি মিলে ত' জলজন্তু হোই"।

ভাল গান শিখে যদি কাকার মত রোজগার করতে পারি তাহ'লে তোমাকে কলকাতায় নিয়ে আসব। কি সুখেই না থাকব তখন।

চিঠি লিখ মা। প্রণাম। আজ আর সময় নেই। আসি। ইতি—

অধম জগু।

চিঠি শুনিতে শুনিতে বিমলার চোখ দিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কি আনন্দই না আজ তার। জগু কলিকাতায় রোজগার করে। কত ভালবাসে সে তার মাকে। এটুকু ছেলে, বোঝেই বা কত।

জগু আজ টাকা পাঠাইয়াছে। এ গ্রামে তার বয়সী কত ছেলেই না আছে। তারা ত কেহই রোজগার করিতে পারে না। পারে জগু একা।

ভাবিয়া ভাবিয়া বিমলার বুক গর্বে ভরিয়া ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয় হয়, ঠাকুরকে প্রার্থনা জানায়, রাগ কর না, দর্পহারী মধুসূদন। জগুকে আমার বাঁচিয়ে রেখ।

চিঠি পড়িয়া কেদার খুশী হইতে পারিল না। পড়া শেষ হইলে কহিল, আমার কথা একটুও লেখে নি। একেবারে ভুলে গেল আমায়।

বিমলা বলিল, পরে ঠিক লিখবে ভাই। এবার এই প্রথম কিনা।

কেদার চলিয়া গেলে চিঠিখানা বেড়ার ফাঁকে গুঁজিয়া বিমলা বাপের বাড়ীর দিকে রওনা হইল, কাকা গঙ্গাচরণকে খবর দিবার জন্য।

গঙ্গাচরণ ছেঁড়া কাপড়ের উপর ময়লা গামছা জড়াইয়া কচু গাছের গোড়ায় ছাইয়ের সার দিতেছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখিয়া বলিল, কি বিমলি।

বিমলা বলিল, জগুর চিঠি এসেছে।

—বাঃ বাঃ, শালা ভাল আছে ত?

হ্যাঁ ভাল আছে, চাকুরী হয়েছে। বড়লোকের চাকুরী, মাস না ফুরুতেই দু-টাকা দিয়েছে, আবার দেবে। বিমলা এক-নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া বুকের বোঝাটা হাল্কা করিয়া ফেলিল।

গঙ্গাচরণ বলিল, বরাবরই তো বলেছি, শালার রাজলক্ষণ আছে। চাঁদা-কপালে ছেলে। আচ্ছা, এ গাছগুলো পুরুষ্ট হবে তো, কি বলিস? যে রকম ছাই দিয়েছি। তার উপর জাত কচুর বাচ্চা।

বিমলা একটু হাসিল। এই সময়ে উঠানের পূবদিকের টিনের ঘর হইতে তার মেজকাকার মেয়ে সরলা বাহির হইয়া বলিল, বিমিদি, চাকুরী হয়েছে তোমার ছেলের? খুব সুখবর। খাওয়াও একদিন।

বিমলা বলিল, নিশ্চয় খাওয়াব। জগু যে আবার চাকুরী ক'রে টাকা পাঠাবে তা তো স্বপ্নেও ভাবি নি, বোন। আজ তোর জামাইবাবু থাকলে—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না।

একে একে বিমলার খুড়তুতো ভাই-বোনের দল উঠানে

আসিয়া তাকে ঘিরিয়া ধরিল। সকলেরই মুখ আনন্দোজ্জ্বল, কেহ খাইতে চায়, কেহ চায় গোপাল নগরের মেলায় যাওয়ার হাত-খরচা।

সকলেই বয়সে বিমলার চেয়ে ছোট। তাদের "না" বলিতে তার বাধে।

সে বলে, কাল সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব, আর হরির লুট, মানত আছে কি না জগুর জন্য।

কমল বলিল, কাঁচা সিন্নি দিও, ভারি খাসা খেতে।

বিমলা বলিল, যাস্ ভাই তোরা সব। সবাই মিলে আনন্দ করবি জগুর টাকায়। জগু আমার—

কণ্ঠ তার জড়াইয়া আসিল।

ঠিক এই সময় কলিকাতার রাজপথে অন্ধ ভিখারীর হাত ধরিয়া জগু তার সঙ্গে গাহিতেছিল—"নারায়ণ পরা মুক্তি, নারায়ণ পরাৎ পরা।"

রাজনারায়ণ বসু

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লোকবরেণ্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ২৪-পরগণার বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলার সাহিত্য ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে যে অভিনব ও সুপবিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকার এবং প্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ হিন্দু কলেজে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যেও রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

যখন দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা মদিরার ন্যায় যুবকদিগকে মত্ত করিয়াছে, প্রাচ্য হিন্দু জাতির সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম ও সমাজনীতি সমস্তই চূর্ণ করিয়া নূতন কিছু গড়িতে হইবে এই ভাব ছাত্রগণের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে তখন ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াও বসু মহাশয় তাঁহার সুশিক্ষা-প্রণোদিত মনীষার সাহায্যে জাতীয়তার প্রচারকার্য্য ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার লিখিত 'সেকাল আর একাল' নামক পুস্তকে তদানীন্তন সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলার কথা সম্যক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের (Society for Promotion of National Feeling among Educated Natives of Bengal) সাহায্যে দেশাত্মবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন "ন্যাশনাল" নবগোপাল মিত্র মহাশয় সেইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়াছিলেন এবং 'হিন্দু মেলা'য় বসু মহাশয় তাঁহার চিরস্মরণীয় বক্তৃতায় সেই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।



রাজনারায়ণ বসু

তাঁহার "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক পুস্তকের সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "রাজনারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক।" ঐ পুস্তকে বসু



রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বোড়াল গ্রামে অবস্থিত বাসভবনের বর্ত্তমান অবস্থা

মহাশয় লিখিয়াছেন—আমার এইরূপ আশা হইতেছে পূর্ব্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতার জন্য বিখ্যাত ছিল পুনরায় সে বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা ও ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন :—

"Methinks I see in my mind noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks; methinks I see her as an eagle redeeming her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day heaven."

"আমিও সেইরূপ দেখিতেছি আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর কুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হিন্দু কলেজের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজের অধ্যয়ন শেষ হইলে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ইহার দুই বৎসর পরে আদি ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদক রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক এবং তৎপরে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হন। মেদিনীপুরই তাঁহার মহৎ জীবনের কার্য্যাবলীর সর্ব্বপ্রথম স্ফুরণ-ক্ষেত্র।

প্রায় ষোল বৎসর মেদিনীপুরে হেড মাষ্টারের কার্য্য করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন তিনি স্বাস্থ্য-লাভার্থ ভারতবর্ষের নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ কালে এবং স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও সর্ব্বদাই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, সমাজ-সংস্কার ও স্বদেশ-হিতৈষণা মন্ত্রে লোককে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলেন। নানা দেশ ভ্রমণের পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া দশ-এগার বৎসর অবস্থান করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বিদেশী শিল্পে ও পণ্য-দ্রব্যে প্লাবিত বঙ্গদেশে পুনরায় স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রচলনের জন্য হিন্দু মেলা উদ্ঘাটন করেন। তাঁহার 'সেকাল আর একাল' ও 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতা সম্বন্ধে বঙ্গ-দেশে গভীর আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"রাজনারায়ণবাবু কিছু একটা বলেন আর দেশে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়।"

তিনি বলিতেন, আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে কেবল বেকারবাহিনী বৰ্দ্ধিত হইতেছে; ঐ শিক্ষায় বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ হয় না, কেবল স্মৃতিশক্তির অনুশীলন হয়। বিদ্যা-লয়ে নীতিশিক্ষার অভাবে সমাজে যে "godless" শিক্ষার ফলে বিশৃঙ্খলা ও অসংযম দেখা দিবে তাহাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন তিনি বুঝিতেন কিন্তু উহা যে কেবল "কিতাবকী" শিক্ষা নহে তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু সংস্কারের ছলে সংহারের বৃত্তি পোষণ করিতেন না; বরং রক্ষণশীলতাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি বলিতেন বিদেশীর অধীন জাতি

সমাজের উপযোগী সংস্কার করিতে পারে না। যে-সংস্কার দেশ, কাল ও অবস্থার উপযোগী তাহাই প্রকৃত সংস্কার। তিনি বাঙালীর সুখপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা এবং উন্নতি-বিরোধী নানা অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিরস্কার করিতেন আবার সকলকে বিপুল উৎসাহে উদ্দীপ্ত করিতে ভুলিতেন না, বলিতেন—"হয়ত এই বাঙ্গালী জাতি যাহা করিবে ভারতবর্ষে আর কোন জাতি তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। হয়ত এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে।"

বসু মহাশয় হিন্দু জাতির কল্যাণ কামনায় নানা প্রতিষ্ঠানের ও গঠনমূলক কার্য্যের সহিত সারাজীবন সংশ্লিষ্ট থাকা সত্বেও, তাঁহার জন্মস্থান ক্ষুদ্র বোড়াল গ্রামখানির কথা কখনও ভুলেন নাই। ছোট নগণ্য পল্লীগ্রাম হইলেও বোড়ালকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি "গ্রাম্যউপাখ্যান" নামক পুস্তকে বোড়াল গ্রামের তদানীন্তন ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি ও সাধারণ অবস্থাসমূহ সম্যকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে তিনি তাঁহার নিজ গ্রামে বাল্যজীবন কিরূপ আনন্দে কাটাইয়াছেন তাহাও এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন:

"এই গ্রামে বাল্যকালে আমরা কি আনন্দের সহিত সঞ্চরণ করিতাম। যে কালে কলার ছোটায় শামুকের শাঁস বাঁধিয়া পুকুরে ফেলিয়া রামের পিতা দশরথ ধরিতাম এবং বাকস ফুলের মধু পান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম। তখন কি মনোহর কাল ছিল!...এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন উদ্যান হইতে কাঁচা আঁব সংগ্রহ করা, এবং কড়াইসুঁটি-ক্ষেতে পড়িয়া কড়াইসুঁটি খাওয়া—এইরূপ আরও কত আমোদ ছিল। মাছ ধরিবার জন্য আমরা কি আগ্রহের সহিত চার ও মশলা তৈয়ারী করিতাম এবং যখন মাছে ছিপের ফাত্‌না একবার ডুবাইত একবার উঠাইত তখন আমাদিগের স্পন্দমান হৃদয়ে কি উল্লাস উপস্থিত হইত। সেকালে সকল বস্তু কি মনোহর বোধ হইত!

বালক হইতে পুনঃ চায় মোর মন
হর্ষদীপ্ত বর্ষময় যবে দেখাইত;
মনবায়ুঃ, যাহা কিছু হৃদয় বেদন
বারেক অশ্রুবর্ষণে ধুইয়া যাইত।
যখন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পরিধান করি
সুস্বপ্নের নবীনতা ও দীপ্তি ধরি
ভাতিত প্রান্তর, কুঞ্জ, সামান্য তটিনী
যৎ সামান্য বৃক্ষ আর সামান্য মেদিনী"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—
"ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না।... তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটার মত হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই। তিনি একেবারে সহজ মানুষটার মতই ছিলেন।...একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটাকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন আর একদিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই কত রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান্ করিতেন তার আর অন্ত নাই। একদিকে তিনি মাটির মানুষ, কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটার তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যময় জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান, তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।"

কলিকাতায় প্রায় দশ-এগার বৎসর নানা গঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া পুনরায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তিনি দেওঘরে গমন করেন। দেওঘরে কয়েক বৎসর নানা পীড়ায় ভুগিয়া অবশেষে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। "যে প্রতিভায় প্রদীপ্ত প্রদীপ বঙ্গদেশকে আলোকিত করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা শাশ্বত ধ্রুবলোকে পুনঃ মহোজ্জ্বলরূপে প্রজ্জ্বলিত হইবার জন্য অদৃশ্য হইল।"

যে অভিনব ভাবের উৎস এক দিন প্রতি বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়াছিল—জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা সেই ভাবধারা চির-প্রদীপ্ত থাকিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের জয়যাত্রার পথ আলোকিত করিয়া রাখে।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় যে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয় যে সে আলোচনা বহুদিন যাবৎ আর যথার্থ একাগ্রতার সহিত অনুষ্ঠিত হয় নাই বা তাঁহার সমস্ত রচনা ও বক্তৃতাগুলি সংগৃহীত হয় নাই; তাঁহার অনেক পুস্তক এখন দুষ্প্রাপ্য ও পুনর্মুদ্রণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তিনি আমাদের জাতীয়তা ও ধর্ম্মক্ষেত্রে যে মহৎ দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা অতি দ্রুত ভুলিতে বসিয়াছি। একান্ত পরিতাপের বিষয়, তাঁহার ন্যায় একজন স্বনামধন্য মহাপুরুষের বাস্তুভিটাটি পর্য্যন্ত আমরা রক্ষা করিতে অক্ষম! তাঁহার বোড়ালের বাসভবনটি আজ ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ ও পতনোন্মুখ হইয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে বর্ত্তমানে মনুষ্য গতায়াত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত ভবন গত ১৮৮৮ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত বোড়াল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-গৃহ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা উক্ত বিদ্যালয়টি তাহার নূতন গৃহে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ও সংস্কারের অভাবে তাঁহার বাস্তুভিটাটির স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

বাঙ্গলার বাহিরে রবীন্দ্র-নিন্দা

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

নিখিল-বিশ্ব আজ রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ। কিন্তু তাঁর প্রতি এই যে সর্ব্বজনীন শ্রদ্ধা তার কতটুকু অংশ তাঁর কবিতাপাঠের আনন্দে জন্মলাভ করেছে, কতখানি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান হ'তে উদ্ভূত, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। বাঙ্গালীসমাজ হয়ত তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাব্য—দুই-কেই সমানভাবে ভালবাসে। কিন্তু বাঙ্গালীরা যে তাঁর কাব্য বিশেষভাবে পাঠ করে একথা বল্‌লে সত্য কথা বলা হবে না। অবাঙ্গালী সমাজে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে যে-জ্ঞান তা নিতান্তই অল্প। সে-জ্ঞান ইংরেজী গীতাঞ্জলি বা দুয়েকটি ইংরেজী লেখা থেকে আহৃত। বেশীর ভাগ সে-জ্ঞান সংবাদপত্রের প্রবন্ধ বা শোনা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙ্গলার বাহিরে তাঁর প্রতি যে-শ্রদ্ধা তা তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য। রবীন্দ্রকাব্য প্রশংসা করা অনেক সময়ে একটা ফ্যাশান মাত্র। সব সময়ে কোন একটা সত্য অনুভূতির কায়েমী ভিত্তির উপর তা রচিত নয়। কাজেই বাঙ্গলার বাহিরে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদর ক্রমেই কম হ'য়ে যাচ্ছে। ইংরেজী অনুবাদ থেকে যতটুকু ধারণা করা যায় তা এত সঙ্কীর্ণ যে তা হ'তে নানা প্রকারের ভুল মতামত পোষণ করা আশ্চর্য্য নয়। এই ভুলের জন্য বাঙ্গালীই সব চেয়ে দায়ী। সব প্রকারের রবীন্দ্র-সাহিত্যের—শুধু তাঁর লিরিকের নয়—নানা ভাষায় অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এতে অবশ্য অনেক বিঘ্ন আছে। সব চেয়ে বড় বাধা বিশ্বভারতী নিজে। সব লেখা কপিরাইট। বিশ্বভারতীর বিনানুমতিতে তার অনুবাদ প্রকাশ করা চলবে না। বিশ্বভারতীর আবার একটি অনুবাদ-কমিটি আছে। তার সভ্যেরা আবার আপনাদিগের শক্তি ও সাহিত্যিক বিচার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। ফলে আত্মসম্মানসম্পন্ন ব্যক্তিদের তার সঙ্গে সহযোগিতা করা কঠিন হওয়া অসম্ভব না হ'তে পারে। কিন্তু সে-কথা বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নয়। বাঙ্গলার বাহিরে কবির সম্বন্ধে দুয়েকটি ভুল ধারণার অবতারণা করাই আমার এই উদ্যমের একমাত্র কৈফিয়ৎ।

উর্দ্দু সাহিত্যের পাঠকদিগের মধ্যে এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি উর্দ্দু কবি ডাঃ ইকবালকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনার কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কি? তার জবাবে নাকি ইকবাল বলেন যে আমি যখন সুন্দরকে দেখি তখন তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করি ("হোয়েন আই সী বিউটি, আই র‍্যাভিশ হার") আর রবীন্দ্রনাথ শুধু দূর হ'তে মুগ্ধনয়নে তাকে দেখেন ও তার স্তবস্তুতি করেন। কথাটা সত্যই ইকবাল বলেছিলেন কিনা তা বলা শক্ত, তবে ইকবাল-ভক্তেরা এ কথাটা ব'লে আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভ করে। তাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে এইটুকু বোঝা যায় যে তাদের মতে বলই হ'ল ইকবালের কবিতার বিশেষ ধর্ম্ম আর নির্জ্জীবতা রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান ত্রুটি—যেন পৌরুষ তাতে নাই, রয়েছে শুধু রমণীসুলভ দৌর্ব্বল্য। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা ইংরেজী সাহিত্য পাঠ ও সমালোচনা করেন, তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এস্থেটিসিজমের অপবাদ আনয়ন করেন। এঁরা বলতে চান যে রুচিবিলাসের প্রভাবে রবীন্দ্র-কাব্যে দৃঢ়তা ও বীর্য্যের অভাব অতি বেশী হ'য়ে পড়েছে এবং এই জন্য তা মানবহৃদয়কে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদের ব্যঙ্গ নিজেই করেছেন তাঁর "শেষের কবিতায়"। নিবারণ চক্রবর্ত্তী "রবিঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হালছাড়া বিলাপ" লিখবে না ব'লে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার সে দর্প ধোপে টিক্‌ল না। তার মাথা নত করতে হয়েছিল।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যে সাহিত্যিক যুগের প্রবর্ত্তন হয় তার নাম হচ্ছে এস্থেটিক যুগ। এর অপর নাম ডেকাডেন্ট যুগ। বদ্‌লেয়ার প্রমুখ কবিরা ফ্রান্সে ও রোজেটি, সুইনবার্ণ ও অস্কার ওয়াইল্‌ড ইংলণ্ডে এই মতবাদের মুখপাত্র। আর্টের জন্য আর্ট—এই যুগের বিশেষ বাণী—যে-বাণী রবীন্দ্রনাথও তাঁর লেখায় ও সমালোচনায় বহুবার প্রচার করেছেন। ইউরোপীয় এই সব লেখক আজ যে জন্য নিন্দিত তা হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, বাস্তবিকতার সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হ'য়েছিল। এঁরা তাঁদের যুগের আবেষ্টনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান নি, তাই দেশ ও কালের অতীত একটা স্বপ্নলোকে প্রয়াণ করে সৌন্দর্য্যরচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই ধরণীর ধুলা তাকে ধূসরিত করে এ তাঁরা চান নি, কাজেই জীবন্ত মানুষের প্রাণের স্পন্দন সেখানে পৌঁছাতে পারে নি। যুগকে এই যে অগ্রাহ্য করা তার দরুন তাঁদের শাস্তি পেতে হয়েছিল।

বাস্তবিকতার সুদৃঢ় নোঙর স্বেচ্ছায় তাঁরা ছিঁড়েছিলেন, তাই তাঁরা ভেসে গেলেন অবাস্তবতার বানে, অধ্রুবের পশ্চাতে। সত্যের দিকে মোড় ফিরে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করতে গিয়ে কাব্যে এসে পড়ল স্বপ্নবিলাস, ভাববিলাস, রুচিবিলাস ও শব্দবিলাস—আর সবার চেয়ে গর্হিত দুর্নীতি। তাঁদের স্বপন-পসারী চিত্ত নিত্য নূতন কল্প-লোক অচেনা, অজানা ও অদ্ভুত সামগ্রীতে পূর্ণ ক'রে তুলতে লাগল। কবিতার উদ্দেশ্য হ'ল ধ্বনির চমক-প্রবাহ। তার নির্বাধ সঙ্গীতপ্লাবন অর্থ ও সঙ্গতিকে পশ্চাতে ফেলে সম্মুখের দিকে ভেসে চলল শব্দ-জোয়ারের টানে—একটা বিরাট্ অসংযত বেগে। এই অসংযম শুধু বাক্য ও ভাবেই আবদ্ধ রইল না—চরিত্রেও ভাঙন ধরল। সুইনবার্ণের কবিতায় এই দুই ভাব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। পেটার ও তাঁর ভক্তেরা অপর দিকে সাহিত্যের জাত যাওয়ার ভয়ে অবসন্ন ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। রুচি-বিলাসের শুচিবাই এদের স্কন্ধে এমন ক'রে ভর করল যে এরা পা মেপে মেপে চলতে লাগল। কেউ কেউ আবার শব্দের ললিপপ্ মুখে পুরে লালায় লালায় সাহিত্যের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করতে লাগল। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ এই যুগের মানুষ। এই যুগের সাহিত্য ও সমালোচনা তিনি ছাত্র অবস্থায় ও যৌবনে বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন, আনন্দ পেয়েছিলেন ও তার দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁর প্রথম যুগের কাব্যের মধ্যে তার প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই যুগের ভাব ও ভাষার মধ্যে অনেক সময় অসংযত উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় তাঁর সঙ্গীত প্রবাহ অর্থ ও বিধির শৃঙ্খলকে ছিন্ন ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমস্ত বাধা ও নিষেধকে—শব্দের পিরামিড স্তরে স্তরে আকাশ ফুঁড়ে মাথা তোলে। তাঁর সুমার্জ্জিত ও সুতীক্ষ্ণ রুচি পোষাকে পরিচ্ছদে, উপভোগে ও আনন্দে এরূপ অসাধারণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে তিনি তাঁর যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন ও উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন। রোমান্টিক কবি তিনি—স্বপনবিহারী ছিল তাঁর চিত্ত। ভাবের উচ্ছ্বাসও তাঁর কবিতায় বহুল। কিন্তু তাঁর দৃঢ় সত্যানুভূতি ও সুতীব্র বাস্তদৃষ্টি কখনও তাঁকে অবাস্তব করতে পারে নি, তাঁর অসাধারণ প্রাণ-প্রাচুর্য্য তাঁকে দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও প্রাণহীন হ'তে দেয় নি। তাই এস্থেটিসিজমের দোহাই দিয়ে যাঁরা মনে করে যে তাঁর কাব্যের মধ্যে একটা বস্তুতন্ত্রহীন ক্ষীণতা, একটা পেশীহীন দুর্ব্বলতা আছে তারা হয় তাঁর কাব্য পাঠ করে নি, নয় যৎসামান্যই পাঠ করেছে—তাও হয়ত অনুবাদের সাহায্যে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে এই যে অভিযোগ এ নূতন নয়। পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নারায়ণ পত্রিকায় তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথের মেয়েলিপনার উপর আক্রমণ চালাতেন ও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতাপূর্ণ কণ্ঠে গোলদীঘি প্রকম্পিত করতেন। প্রথম বয়সে তাঁর বক্তৃতা শুনে রবীন্দ্রনাথের উপর আমাদের করুণা হ'ত—ভাবতাম বুঝি রবীন্দ্রকাব্য জোলো দুধ। রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব কোমল মিষ্টত্ব আছে। তাঁর কাব্যপাঠে চিত্ত মধুর রসে পূর্ণ হয়—গ্রাসে গ্রাসে যেমন আঙুরের কোমল স্পর্শে জিহ্বা অবশ হয় ও তরল মিষ্টরসে মুখ ভরে আসে এ যেন কতকটা সেই রকম। তাই সেই স্বাদ যতক্ষণ মুখে থাকে ততক্ষণ মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে রবীন্দ্র-কবিতা শুধু কোমলই—তরলই—নুয়েপড়াই। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি। নর-নারীর প্রেমের ব্যথা তাঁর কবিতার মধ্যে যেমন প্রাণ পেয়েছে, বাঙ্গলা সাহিত্যে তেমনটি আর দেখি না—বিশ্বসাহিত্যেও তা অপ্রতুল। প্রেম কখনও গর্জ্জন করে না—অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে, মৃদুগুঞ্জনে সে তার ব্যথা নিবেদন করে, সে দূর হ'তে তার প্রেমাস্পদকে প্রদক্ষিণ করে, তার হৃদয় থেকে ওঠে নিরাশার মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন—দূর আকাশের পানে ওঠে যেমন হোমশিখা। রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় এই হতাশার ভাবটি খুবই দেখতে পাওয়া যায়। কবিতাসুন্দরীকে লক্ষ্য ক'রে তিনি যে তাঁর হৃদয়ের পূজাটি জানিয়েছেন তাতেই কবি বলেছেন যে তিনি হবেন সুন্দরীর মালঞ্চের মালাকর। রাজা আসবে তাঁর অশ্বগজ নিয়ে, সেনাপতি আসবে তার বলদর্প নিয়ে সেই দেবীর পূজায়। কিন্তু কবি রইবেন ব'সে মন্দিরদ্বারে জোড় হাতে। কিন্তু আত্মবিলোপের এই যে স্বেচ্ছাকৃত বলাপকর্ষণ এ হতে এ ধারণা করা ভুল হবে যে রবীন্দ্র-কাব্যের সাধারণ প্রকৃতিই এই। প্রেমের ত্যাগ ও আত্মজয় তাঁর কবিতা ও উপন্যাসে কিরূপ দুর্জ্জয় শক্তিতে দেহ পেয়েছিল তা একটু পরেই উল্লেখ করব।

রবীন্দ্রনাথের বহু গান ভগবৎপ্রীতি থেকে উৎসারিত। বিনতি ব্রহ্মসাধনার বিশেষ উপায়। কিন্তু এখানেও দেখি লোকে ভুল করে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক পণ্ডিত-সভায় এক জন মুসলমান অধ্যাপক ইকবালের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা-প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন যে ইকবাল খোদা-তায়লাকে ডেকে বলেছেন, "হে খোদা, প্রকৃতির ঘোমটা দিয়ে তুমি তোমার মুখ ঢেকে রেখেছ। আমি বলছি, তুমি তোমার ঐ পর্দ্দা খোল। নতুবা আমি জোর ক'রে খুলব।" আর রবীন্দ্রনাথ কিনা শুধু ভগবানকে খোসামোদ করেন। ইকবালের চ্যালেঞ্জের উত্তরে খোদা কি জবাব

দিলেন তা অবশ্য অধ্যাপক মশায় বলেন নি। কিন্তু উত্তরটার ধরণ বোঝা যায়। আপনারা ইকবালের "খুদি"-বাদের কথা অনেকেই বোধ হয় শুনেছেন। "খুদি" মানে ব্যক্তিত্ব (Self)। তাঁর খুদিবাদের চরম কথা হচ্ছে তোমার ব্যক্তিত্বকে বড় হ'তে আরও বড় কর। তাহ'লে পরমেশ্বর নিজে এসে তোমায় জিজ্ঞেস করবেন, "হে মানুষ, তোমার কি ইচ্ছা? তোমার জন্য আমি আর কি করতে পারি?" তাঁর নিজের কথাটা হচ্ছে—"খুদিকো কর্ বুলান্দ ইত্না কি হর্ তক্দীরসে পেহ্লে খুদা বন্দেসে খুদ পুছে বাতা তেরি রিজা ক্যা হ্যায়?" খোদা একরকম মানবের দাস হ'য়ে যাবে। আর টেগোর কিনা মন্দিরদ্বারে নতজানু হয়ে বসে কত ভাষায় কত ছন্দে তাঁর দাসানুদাসের মত স্তবস্তুতি করছেন! মন্দিরে ঢুকবার পর্য্যন্ত তাঁর ভরসা নাই। হিন্দু সাতশো বছর গোলামি করেছে, তার মানসিক অবস্থা আর কি হবে। কথার শ্লেষটা এই রকম। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমেশ্বরকে যদি মহতোমহীয়ান, রাজাধিরাজ, বিশ্বেশ্বর ব'লে না জানি তবে তাঁকে স্বীকার করবার, তাঁর কাছে মাথা নত করবার প্রয়োজন কি? কোটি কোটি গ্রহ চন্দ্র তারকা, অযুত সূর্য্য যাঁর আজ্ঞাবহ দাস, যাঁর যাত্রা-পথে ফোটে ঋতুতে ঋতুতে নব নব কুসুমমালা, সৃষ্টিপ্রলয়ের স্রোতমুখে, ইতিহাসের উত্থান পতনের তরঙ্গে তরঙ্গে, নব নব ভাবে যিনি আপনাকে লীলায়িত করছেন তাঁর সঙ্গে চালাকি? যাঁর ভয়ে সকল বিশ্ব ভীত, ঋষি যাঁর নাগাল না পেয়ে ত্রস্ত কণ্ঠে বলেছেন, "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ," তাঁকে তুমি চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবে? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর বাতুল আস্পর্দ্ধা আর কি হ'তে পারে? শুধু মূর্খের মত গোঁয়ারতামির জোরে একটা কথা বল্লেই হয় না—তার একটা সম্ভাব্যতা থাকা চাই।* এই আশ্চর্য্য সৃষ্টিরহস্য দেখে, প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব মায়াকুহেলিকায় মুগ্ধ হ'য়ে হৃদয়ে যদি বিস্ময় ও বিনতি না জাগে তবে কবিতা লিখবার প্রয়াস না করাই ভাল। যিনি চিত্তে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি লাভ করেছেন তাঁর চিত্তে দীনতা না এসে পারে না। আফ্রিকার জঙ্গলে বর্ব্বরেরা নূতন নূতন দেবতার মূর্ত্তি রচনা ক'রে তার কাছে বর চায়। দেবতা যদি অভিলাষ পূর্ণ না করে তবে তাকে লাঠি পিটে ভেঙে দেয়। শিক্ষিত ও বর্ব্বর মনের এই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের হৃদয় পরমেশ্বরের করুণাস্পর্শে বিগলিত হয়েছিল। তাই তাঁর সঙ্গীতে আমরা দেখি দীনতা, দাস্য ও পরিপূর্ণ আত্মবিলোপ। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের ব্রহ্মসঙ্গীতে দৃঢ়তা ও বলের অভাব আছে যদি বলি তবে তাহা একান্ত মূর্খতার পরিচয় হবে।

যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।

যে-কবি এই গান করতে পারেন তাঁর হৃদয়ে আত্মিক শক্তির অভাব আছে একথা শুধু অজ্ঞ লোকেরাই বলতে পারে। মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে যিনি একান্ত নির্ভয়ে পরিপূর্ণ নির্ভরতার সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে তার ক্রোড়ে নিজকে সমর্পণ করেছেন, তিনি হ'লেন কাপুরুষ? মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে যিনি পরিপূর্ণতার আলোকে বলতে পারেন, "তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু"—এই বিশ্বে কিছুই হারায় না, যাকে কালে হারিয়েছি, তাকে খুঁজে পাব অনন্তলোকে—এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা যিনি বলতে পারেন, তার হৃদয়ে বল নাই? আত্মার বলও বল, বিশ্বাসের বলও বল।

লোকে এইখানেই ক্ষান্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁদের কেউ কেউ বলেন, রবীন্দ্রনাথের এস্থেটিসিজম তাঁর উপাখ্যানের প্রাণ-বস্তুর মধ্যে যেন একটা দুর্ব্বলতা, একটা অবাস্তবতার সঞ্চার করেছে। তাঁর এস্থেটিসিজম অপবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার এই লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সে আর এক কাহিনী। কিন্তু তাঁর প্রেমসঙ্গীত ও প্রেমোপাখ্যান সম্বন্ধে এই যে অভিযোগ করা হয় তিনি ভাব-সাবানকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে একবারে বাষ্পে পরিণত করেছেন—যার না আছে ধরা-ছোঁয়ার রূপ, না আছে শক্তি, তার সম্বন্ধে দুয়েকটি

---

*এই প্রসঙ্গে দয়ালসিংহ কলেজের ভূতপূর্ব্ব ফার্সীর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় কিশোরীমোহন মৈত্র মহাশয় নিম্নের বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:—"মওলানা সুহা নামক বিখ্যাত উর্দ্দু সাহিত্যিক কবি গালিবের কবিতার ভূমিকা লিখ্তে গিয়ে বলেছেন: পূর্ব্ব ও প্রাচ্যের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ টেগোর অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর কবিতার উপজীব্য কি রাষ্ট্রনীতি ও স্বাদেশিকতা? একথা ঠিক যে আমরা যদি তাঁর কবিতা থেকে তাঁর দয়িতের প্রতি দাসসুলভ ভাব বাদ দিই তবে তাঁর কবিতায় পাগলের অসম্বদ্ধ প্রলাপ ছাড়া আর কিছু থাকে না। তাঁর নিজের কথাটি এই:—

"রবীন্দরনাথ টেগোর আজ মশ্রিক ব মগ্রিব কা মুসাল্লামা শা'য়ের মানা জাতা হয়। ক্যা উস্‌কী শা'য়েরী কওমিয়ৎ অওর সিয়াসৎ কী তবলীয়গ্ সে মুতাল্লেক হয়? বজাহের তো ইয়ে মালুম হোতা হয় কে আগর উস্‌কী শায়েরী মে সে এক মজবায়ে শওক্‌-তা'ব্বুদ হজফ্ করা দিয়া যায় তো মজ্জুব কী বড়্‌কে সিবা কোই দুসরী তারিফ্ উস্‌পর সাদেক নেহি আ সকতী।"

পোপের সেই বিখ্যাত কথাটি—"ফুলস্ রাশ ইন্ হোয়ার এঞ্জেলস্ ফিয়ার টু ট্রেড" কি সত্য নয়?

কথা বলতে চাই। এ কথা সত্য যে না-পাওয়ার বিলাপ অথবা পেয়ে হারানর মর্ম্মভেদী ব্যথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশেষ উপাদান। কত না চোখের জল, কত না নিষ্ফল হাহাকার আকারিত হ'য়ে উঠেছে সে সাহিত্যে। শুধু ব্যথা শুধু আত্মলোপ। শাজাহান, কচদেবযানী ও চিত্রাঙ্গদা সে ব্যথায় উচ্ছলিত। কিন্তু এই সব কথা, সঙ্গীত ও উপন্যাসের মধ্যে যে একটা বিরাট্ আত্মিক বল নাই, সত্যানুভূতি নাই—এ কথা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশের বিপথগামিনী পত্নীর প্রতি যে ক্ষমা তা শুব্ধীভূত ঝটিকার অন্তর্নিহিত বিরাট্ বল। প্রাচীন সাহিত্যে ত এরূপ বস্তু ছিলই না—বর্ত্তমান সাহিত্যেও কম। হেলেন প্যারিসের সঙ্গে যখন ট্রয় চলে গেল, মেনেলস্ তাকে ক্ষমা করতে পারে নি। কিং আর্থারের রাণী গুইনিভিয়ার যখন সুন্দর যুবক ল্যান্সলটের প্রেমে পতিত হ'য়ে ব্যভিচারিণী হ'লেন, তখন রাজা আর্থার উভয়কে কঠিন শাস্তি দিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই রণের দামামা বেজে উঠল। রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হ'ল। সামাজিক শান্তি নষ্ট হ'ল। রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশের চিত্তে ক্ষমা ও দারুণ অভিমান ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। জমিদার-পুত্রের একটি কার্ত্তুজও নষ্ট হ'ল না। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মনের সভ্য ও সংযত প্রকাশ। রাণী বিমলা যে শাস্তি পেল তাতে রক্ত ছিল না, আঘাত ছিল না, কিন্তু সব চাইতে কঠোর। হেনরী দি এইট্থ হয়ত নিখিলেশকে কাপুরুষ ব'লে ঘৃণা করত। কিন্তু পত্নীহন্তা সেই রাজা অপেক্ষা তার আত্মিক বল অনেক বেশী তাতে সন্দেহ নাই। অমিট রায় ও লাবণ্যর দীর্ঘ ও ডেলিকেট কোর্টশিপের কাহিনী পাঠ ক'রে বিরক্ত হ'তে পারেন, বলতে পারেন এ ত প্রেম নয়, প্রেমের ভাপ, ষ্টীমবাথ। শুধু এস্থেটিসিজম্—প্রেমবিলাস। প্রেমের এই শুচিবাই দেখে প্রাকৃটিক্যাল প্রেমিকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু এখানেও দেখতে পাই পরস্পরের প্রতি সবল শ্রদ্ধা —পরস্পরের স্বেচ্ছাবৃত আত্মাবরোপণ। প্রাচীন কালে যা ছিল দুর্ব্বলতা—এখন তাই বল। বর্ত্তমান যুগে প্রেমের বল নাইট এরাণ্টি্তে নয়—আত্মবিলোপে, তিতিক্ষায়, সংযমে।

আসল কথা আমাদের অনেকের ধারণা যে কবিতার বল মানে ধ্বনিমূলক বল। উর্দ্দু ও হিন্দী কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব কর্কশ ব্যঞ্জনের সমাবেশে বা অনুপ্রাসের সাহায্যে কবিতাকে বীর্য্যবতী করা হয়। আমাদের দেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও আমরা এই ভাবের পরিচয় পাই :—

ঘন তোরঙ্গ ভমভম দামামা দমদম
ঝনন্ন ঝমঝম ঝাঁজে
কত নিশাদ করকর নিনাদ ধরধর
কামান গরগর গাজে।

অথবা

দামিনী তকতক ঝামকী ধক্ ধক্
ঝকমক চকমক খরতরবারা।
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত
মোগল মাহুত রণ অনিবারা।

রবীন্দ্রনাথেও বহু অনুপ্রাস, বহু ভাবানুসারী ধ্বনিরচনা (অনোম্যাটোপীয়া) ও ছন্দের ঝঙ্কার আছে। ভাষা ছিল তাঁর চরণের দাসী। তাকে নিয়ে অনেক কসরৎ তিনিও করেছেন। কিন্তু ধ্বনির খাতিরে কোন প্রকার সচেতন চেষ্টার চিহ্ন তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় না। জিউসের মাথা ভেদ ক'রে যেমন বেরিয়েছিল সালঙ্কারা, সর্ব্বায়ুধা সুন্দরী দেবী মিনার্ভা, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজের বলে, নিজের দাবিতে, স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর কবিতা ছিল যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নিপাত। নিজের গতিবেগে নিজের ছন্দ ও ভাষা নিজে রচনা করেছে। সত্যিকারের কবির এমনি হয়, তাতে না থাকে রুচিবিলাস, না থাকে ভাববিলাস, না থাকে শব্দবিলাস। হৃদয়ের গোপন গুহায়, মনের নিভৃত অন্ধকারে হয় কবিতার জন্ম—স্বাভাবিক আইনে, আপনার আনন্দে। বিলাসে হয় তার মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই আমরা দেখতে পাই বহু ভাষা, বহু ছন্দ। কখন পল্লীবধূর মত সে ঘোমটাটানা, কখনও নাগরিকার মত গর্ব্বোন্নত গ্রীবা। কখন গ্রামপথে প্রবাহিত জলধারার মত স্নিগ্ধ, স্থির, কখনও ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগরের মত স্ফীত, উচ্ছ্বসিত কল-চঞ্চল।

কখন,

দীঘির কালোজলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।

এমনিতর স্বচ্ছ, সরল ও সহজ। আবার কখনও সে মহীয়সী রাজ্ঞীর মতআপন ঐশ্বর্য্যে উদ্ভাসিত—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।

দুঃখ ও ক্ষোভে কখনও ভাষা একবারে গ্রাম্য হ'য়ে পড়েছে, ক্রূর ব্যঙ্গে একবারে চল্তি কথায় পরিণত হয়েছে—

অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোষে বসে।
ভদ্র মোরা, শান্ত বড়,
পোষমানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান। (দুরন্ত আশা)

আবার ক্রোধে ঘৃণায় ভাষা কখনও গম গম করে—

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হ'তে।

কখনও ভাষা প্রেমের লাস্যে মন্থর, কখন শোকে ভারাক্রান্ত, কখনও আশায় উৎফুল্ল—কখন আবার তার চোখে লেগছে স্বপ্নের কুহেলি। তাঁর ভাষা সম্বন্ধে যদি কেউ এক কথায় কিছু বলতে যায় তবে তার মূর্খতারই প্রকাশ পাবে। তাঁর কবিতায় বীর্য্য নাই—রয়েছে শুধু মিইয়ে-পড়া কাঁদুনী? তবে "অপমানে"র সেই জাগ্রত অভিশাপ আমাদের বুকে এমন তীব্র হয়ে লাগে কেন?

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হোতে হবে তাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান;
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।

যাঁদের মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বীর্য্যের অভাব আছে ব'লে অণুমাত্র সন্দেহ আছে আজ তাঁরা তাঁর "কথা ও কাহিনী" ও "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি এক বার পাঠ করুন। শেষোক্ত কবিতাটি থেকে আমি কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি:—

স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে।

কবির সকল হৃদয়ের সবল ক্রোধ ও জীবন্ত আশা এই বিখ্যাত কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

পঞ্জাবী একটি ভদ্রলোক আছেন তাঁর নাম ডাঃ তাসির। ইনি পূর্ব্বে অমৃতসর এম. এ. ও. কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও ইংরেজীর প্রোফেসর ছিলেন। ইনি কেম্ব্রিজে শিক্ষিত। পরে ইনি শ্রীনগর রাজ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। এখন ফুড-কণ্ট্রোলার হয়েছেন। এই প্রোফেসর ফুড-কণ্ট্রোলার আবার রেডিও টকারও। এখন আপনারা জানেন যে দুই নেশন থিয়োরির ফলে মহাত্মা গান্ধীর নাম করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে কায়েদ-ই-আজম জিন্নার নাম করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে ইকবালের নাম করতে হবে। অথবা ভাইসি ভার্সা। এঁরা উভয়ে আমাদের জাতির ½ ও ½র প্রতীক। এখন এঁদের গুণের পারস্পরিক তারতম্যও এই প্রকার কিনা এ কথার বিচার করা আমার সাধ্যের বাহিরে। যা হোক ইনি একবার ব'লে বসলেন যে ইকবাল জীবনের কবি আর রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কবি। এই সাহিত্যাচার্য্য বড় কামাল লোক। তাঁর কথা এখানে প্রায় বেদবাক্যের সমান। কথাটি অনেক দিন হ'তে মুখে মুখে ঘুরছে। তবে এটা ঠিক যে তিনি না বুঝে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা সত্য কথা ব'লে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যই মরণের কবি। তাঁর গান করতে করতে হাসিমুখে বহু বাঙ্গালী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। তিনি আমাদের জাতিকে যৌবনে দীক্ষিত করেছেন—মরতে শিখিয়েছেন। অজানার জয়গাথায় আমাদের বুকে বল আসে। আমরা সেই মন্ত্র তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি যে-মন্ত্রের আহ্বান- গীত যে কানে শুনেছে—

ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তা'রে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তা'রে করেছে কুঠারে।
সর্ব্ব প্রিয় বস্তু তা'র অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।

রবীন্দ্রনাথ শুকনো পাতার কবি ছিলেন না। সবুজের চির অভিযান চলেছিল তাঁর হৃদয়ে। তাই ভারতীয় সাধনায় যে-সকল মতবাদ আমাদের সমাজকে ক্লীব ক'রে রেখেছে তার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এ সংসার মিথ্যা মায়া—একে ত্যাগ কর। কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—এই সন্ন্যাস সাধনা না এনেছে মোক্ষ, না শিখিয়েছে আমাদের ভাল ক'রে বাঁচতে। তাই রবীন্দ্রনাথ উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন:—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।

শুধু এই কথাই ব'লে তিনি ক্ষান্ত হন নি। সকল বিরোধিতাকে তিনি অগ্রাহ্য করে, সকল বিদ্রূপকে তুচ্ছ

ক'রে তিনি যৌবনের বিদ্রোহধ্বজা উত্তোলিত করেছিলেন তাঁর "নবীন" নামক কবিতায়—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে ?
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা!
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা!

এর পরেও যদি কেহ বলেন রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কবি, তাঁর বক্তৃতা শুধু ধোঁয়া ও ভাপে ভরা, তাঁর কবিতায় বল নাই, তবে হয় তাঁরা বোঝেন না, নয় আমি বুঝি না।

ভাঙ্গাশাখে 'বেনে বউ'

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

রাজত্বটা যথার্থ মালিকের হাতে গিয়াই যেন বেহাত হইয়া গেল। প্রকৃত উত্তরাধিকারীর হাতে আসিয়াই সম্পত্তিটা হস্তান্তর হইল। উপায় নাই, বলিবার যথেষ্ট থাকিলেও করিবার কিছু নাই বলিয়াই সকলে নীরব রহিয়া গেল। জমিদারবাবুর তিন পুত্র সাবালকের কোঠায় আসিয়া একে একে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। পুরী অন্ধকার। কর্ত্তার বয়স তেমন না হইলেও পর পর তিনটি ধাক্কা খাইয়া সংক্ষিপ্ত সড়কেই বার্দ্ধক্যের ঘরে উপস্থিত হইলেন। এখন উপায়! এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করে কে? অবশ্য, ভোগ করিবার ভূতের অভাব হইবে না। বার ছাড়াইয়া বাট-বাহাত্তর ভূতও জুটিবে! যাহারা প্রকৃত ভোগ করিবার তাহারা পাইল না বলিয়াই দুঃখ। জমিদার-গৃহিণী এখন কেমন যেন হইয়া গিয়াছেন! পাত্রের অভাবে তাঁহার স্নেহ এখন প্রথম জননীর মতই কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কি আর করেন? ঝি-চাকরদের খাওয়া-পরার একটু বেশী করিয়া খবর লইতেছেন।

জমিদারবাবুর পুত্র ঠিক তিনটি নয়, চারিটি। তৃতীয় পুত্রটিকে দত্তক দেওয়া হইয়াছে—তবে, গোত্রান্তর হয় নাই; নিজেদেরই জ্ঞাতির মধ্যে। সে অনেক দিনের কথা। কর্ত্তারা তখন জীবিত। তাঁহাদের ইচ্ছাতেই কর্ম্ম হইয়া গেল। বর্ত্তমানের গৃহিণী বালিকা বধূ—কোন কাজেই লাগিলেন না। জমিদার-গোষ্ঠীর মধ্যে ন'কর্ত্তাই ছিলেন বিশেষ শাঁসাল। সরিকানার বাঁটোয়ারার উপর তিনি তেজারতির কারবার করিয়া কয়েকটা পরগণা ও সাবেকী ইমারৎ সংগ্রহ করিয়া আপনার অঙ্ক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। হইলে কি হইবে, তিনি অপুত্রক! অত বড় ধনবল জনের অভাবে বিফল হয় দেখিয়া, পাঁচজন জ্ঞাতি-কুটুম্বের পরামর্শ লইয়া নারায়ণ সাক্ষী করিয়া দত্তক গ্রহণ করিলেন। তার পর কতকাল গত হইয়াছে, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই; আছে শুধু নামবাহী রামায়ণ। অতীতের কথা সাক্ষ্য দিতে আছে সেই দত্তক আর তার বিধবা মা।

বড় ঘরের বড় গৃহিণীর ব্যথিত স্নেহ এখন সেই দত্তকের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই পুত্রটি যেন না দিলেই হইত ভাল! কর্ত্তার সহিত পরামর্শ করিলেন, সম্পত্তিটা তাহা হইলে তাহাকেই লিখিয়া দিবেন! সে তো পুত্রই। বিশেষ তাহার অবস্থা যখন পড়িয়া গিয়াছে। এত বড় বাড়ী খাঁ-খাঁ করিতেছে; তবু তাহারা আসিয়া থাকিলে কতক শান্তি পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর সমূহ বিপদের সময় সেই ছেলে কয়েকবার আসিয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্বেও বহুবার আসিয়াছিল। গৃহিণী অমন করিয়া আর কখনও তাহাকে দেখেন নাই। সে যে তাঁহারই ইহা জানা থাকিলেও শোনা কথার মতই জানা, মনের মধ্যে বিস্তার লাভ কোনদিনও করে নাই। আজ নিঃস্ব হইয়া জীবনের একটা বাজে খরচের জন্য অনুতাপ হইতেছে।—"দত্তক যদি না দিতাম এ পুত্র তো আমারই থাকিত। একেবারে পুত্রহীন তো হইতে হইত না। উহাকেও আর পরিণত বয়সে এমন করিয়া অর্থচিন্তা করিতে হইত না।

তার পর বহু আবাহনে দত্তক যখন যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল সংসারের রূপ তখন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তা অল্পদিন পরেই লোকান্তরে গেলেন। দত্তকই সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিল। অবশিষ্ট গিন্নী, কিন্তু গিন্নীর মর্য্যাদা তাঁর একেবারেই চলিয়া গেল। তিনি কেবল অবশিষ্টের মতই এক পাশে পড়িয়া রহিলেন। তা তো হইবার নয়, এ যেন একে আর হইয়া গেল! যার বাড়ী, যার ঘর তাহাকে পর সাজাইয়া যথার্থ যে উত্তরাধিকারী সে একজন অনাত্মীয় মালিকের মত হইয়া উঠিল। বিশাল জমিদারী, বিরাট পুরী সবই যেন হস্তান্তর হইয়া গেল। গৃহিণী তো আগে অত ভাবেন নাই! ভাবিবার কথাও নহে। নিজের পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইবে ইহার মধ্যে আবার ভাবনা-চিন্তার কি থাকিতে পারে! তবে পুত্র পরের ঘরে মানুষ; ইহাতেই কি সে পর হইয়া গেল!

বড় গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল পুত্ররূপে তাহাকে সম্মুখে পাইতে। সম্পত্তি দেখা-শুনার লোক আরও আছে। উপর্য্যুপরি বিপদের পর প্রথম যখন সে আসে তখন তাহার নিকট সেই প্রস্তাবই

করা হইয়াছিল। তখন কর্ত্তা বর্ত্তমান। সেও তাহাতে অরাজী হয় নাই; তবে নানারূপ অসুবিধা প্রকাশ করিয়াছিল। তখন সে আসিত একলা, অভাব-অভিযোগ কথাবার্ত্তা সমস্ত বড়মার সঙ্গেই হইত। আর বড়মা ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তিও কেহ ছিল না। কিন্তু এবার যখন আসিল সে শুধু একলা নয়—তাহার মা আসিল, চাকর-জন আসিল সঙ্গে। পাতান কুটুম-সাক্ষেৎ, বন্ধুবান্ধব, অভাব হেতু যাহাদের পুষিতে পারিতেছিল না সেই সমস্ত পোষ্য বয়স্য যেন, একটা বিরাট্ সম্প্রদায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিতে কেবল মাতা পুত্র দুই এক জন পুরাতন ভৃত্যের সহিত বহু সাধনার পর তাহাদেরই যেন উপকার করিতে আসিয়াছিল। কর্ত্তা গত হইলে সেই যে মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। পরিবর্ত্তনের মধ্যে এতদিন একটানা ছিল এখন দোটানা হইয়াছে। আসা যাওয়া করে। এক আধটা নয়, যূথবদ্ধ হইয়া তরঙ্গের পিছনে তরঙ্গ।

তাহাতে দুঃখ নাই। বড় গৃহিণী যাহার জন্য তাহাদের ডাকিলেন তাহার তো কিছুই হইল না। তাঁহার পুত্রস্নেহ ব্যাহত হইয়াছে, একটি পুত্র দূরে বর্ত্তমান, তিনি তাহাকে সম্মুখে পাইতে চাহিয়াছিলেন। এমন ভাবেই পাইলেন, সে এমন ভাবেই তাঁহার বুক জোড়া করিয়া বসিল যে বুকের অস্থিগুলি পর্য্যন্ত টন্ টন্ করিয়া উঠিয়াছে। এখন কি এই সমস্ত সহ্য হয়? তাঁহার শোকতাপের মন, কোথায় একটু শান্তিতে থাকিবেন, না, এ কি উৎপাত। এ যে আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে! তিন মহল্লার বিরাট বাড়িটাকে যেন চব্বিশ ঘণ্টা মন্থন করিতেছে। সমস্ত জগতের কলরব যেন উহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শিশুর ক্রন্দন হইতে রুগ্নের আর্ত্তনাদ বৃদ্ধের খেদ মায় নানা জাতীয় পশুর চীৎকার অবধি। বড় গৃহিণী উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। বাড়ীতে আর মন টিকিল না। তিনি প্রায় সময়ই বাগান ছাড়াইয়া বাহির বাগানে গিয়া থাকিতেন। থরে থরে তুলসীমঞ্চ সজ্জিত, পূর্ব্বপুরুষদের চিতাভূমি সেখানে। বোধ হয় নিকটবর্ত্তী হইবারই বাসনা। সূর্য্যাস্তে ধূপদীপের ব্যবস্থা আছে। দেখিয়া চমকিত হইলেন কত দিন বুঝি সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই। যাহার উপর ভার সে কি ভূতের বেগার দিয়া সময় পায় না সন্ধ্যায় ধূপ জ্বালিয়া প্রদীপ দেখাইতে! এখানে যে জীয়ন্তের বাস! সংসারের যাহা কিছু সব যে এখান হইতে! পরদিন ভারপ্রাপ্তাকে করুন ভাবায় শাসন করিলেন, "—ইহকালটা না হয় জ্বলে গেছে, তুলসীতলায় দীপ না জ্বেলে তোমরা কি আমার পরকালটাও জ্বালিয়ে দিতে চাও নাকি?"

পরিচারিকা কাঁদিয়া ফেলিল,—"ওমা কি ঘেন্না! জানি এরা লোক ভাল নয়, ঠিক নানান্টা করে লাগিয়েছে—হিংসের মরে যাচ্ছে যেন! আমরা একটু ভাল খাই, ভাল পরি মোটে দেখতে পারে না।"

—"খাওয়া পরারই কি হল, লাগাবারই বা কে এল এর মধ্যে? আমি নিজের চোখে দেখে এলুম যে?"

ঝি আশ্চর্য্যের ভাবে উত্তর দিল,—আপনি দেখে এলেন! কেন আমি তো রোজ জ্বেলে দি। কেন, জ্বালাব না-ই বা কেন! আমাদের আপনার জন বলতে সবাই তো এখন ঐখানে; বাড়ীতে আর কে আছে?"

ক্ষতের বন্ধনটা খুলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গৃহিণী আর কোন কথা কহিলেন না। ঝি আবার বলিল—"আপনি বার বাগানে গিয়েলেন কেন মা? আপনি তো ওখানে যেতেন না!"

—"গিয়েছিলুম দরকার ছিল, যা তুই তোর কাজে যা!"

পরের দিন হইতে যেখানে আর শান্তি নাই। সাবেক ঝি-চাকরেরা একে একে সকলেই যাতায়াত আরম্ভ করিল। কেহ কেহ মায়ের সেবায় বসিয়া গেল। তাহাদের নানারূপ অভাব-অভিযোগ। নূতন সংসারে মন টেকে না। কে কাহাকে কবে গালি দিয়াছে,—কে কাহার প্রতি হিংসা করে,—কে কাহাকে বেশী খাটায়,—কে কাহাকে কাজে হাত দিতে দেয় না ইত্যাদি বহুরূপ। তাহাদের গিন্নী-মা ভূমির উপর বসিয়া থাকেন দেখিয়া জায়গাটা ইট পাতাইয়া বেদীর মত করিয়া দিল, রোদ বৃষ্টি নিবারণ করিয়া মাথার উপর পাতার ছাউনি দিল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া গৃহিণী একদিন উত্তর করিলেন,—"তোরা যে আমায় ঘাটে রাখবারই ব্যবস্থা করছিস!"

একজন বৃদ্ধ চাকর বহুদিনের পুরাতন, সে কহিল—"আমাদেরও তো পাশে থাকতে হবে!"

গৃহিনী হাসিলেন,—"ঘাটেই যদি থাকতে হবে তবে আর উঁচু নীচু কেন?"

এমন নিরিবিলি জায়গা! তাঁহার পুত্রটিকে যদি একবার পাওয়া যাইত তো দুই চারিটি কথা বলিতে পারিতেন। সে যে তাঁহার ধারেসুদ্ধ আসে না—একটা কথা জিজ্ঞাসা করে না পর্য্যন্ত। তলাইয়া গিয়াছিল, কূল পাইয়া প্রাণ মান বাঁচাইল! যাহার জন্য কূল তাহাকেই চিনিল না। তা ছাড়া, সে যে তাঁহারই পুত্র সে কথা কি সে জানে না! না জানিলে সেইটাই যাচাই করা উদ্দেশ্য। তাহাই তাহাকে শুনাইয়া দিতে চাহেন! তাহাকে পুত্র ভাবেই পাইতে চান। দান হইয়া গিয়াছে এখন তো আর ফেরত নেওয়া চলে না! 'নিতে তিনি চাহেন না,' যাহা দিয়াছেন তাহার উপর আর একটু দিতে চান—তাঁহার মাতৃস্নেহ!

হৃদয়ের মাতৃস্নেহ-ফলক তল না পাইয়া দ্বিগুণ আঘাতে আবার হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। বড় গৃহিণীর শিবের আরাধনা করিয়া কেবল ভূতের উপদ্রবই সহ্য করিতে হইল, শিবের সন্ধান আর মিলিল না। দিবারাত্র দ্বাদশ ভূতে বুকের উপর দুরমুস করিতেছে।—কেন কিসের জন্য? ভূতের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে শ্মশানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, হইলে কি হয় মন তাঁহার পড়িয়া আছে ঘরের কোণে! সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তা কিসে কি হইয়া যায়, কে কি করিয়া ফেলে? বড় ছেলের হাতের গাছটা সেই দিন কে একজন কাটিতেছে দেখিয়া তাঁহার হাড়গুলা যেন গুড়া হইয়া গেল। দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন! কি করা যায়! উপায় কি আছে? ন'গৃহিণী এখন কর্ত্রী, কথা

বলিবার জো নাই! তাঁর ঘর, তাঁর দুয়ারে তাঁরই টাকাকড়ি লইয়া ন'বউ সর্দ্দারী করিতেছে। দিনান্তে একটা কথা জিজ্ঞাসা করাও উচিত বিবেচনা করে না। মরা ছেলেদের হাতের জিনিষগুলি যাকে তাকে ব্যবহার করিতে দিতেছে! ঘরের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে! এ যেন মন্দির ভাঙ্গিয়া গির্জ্জার গঠন। বড় গৃহিণী অসহ্য হইয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আর হইল না; শরীর অসুস্থ হওয়ায় বাহিরে যাওয়া একেবারে বন্ধ হইল।

পূর্ব্বে যখন দত্তক আসিত, বড় গৃহিণীকেই কর্ত্রী দেখিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, কাছে বসিত। এখন সঙ্গে তাহার মা আছে। তাহার অভাব-অভিযোগ পরামর্শ সমস্তই মায়ের সহিত হইয়া থাকে। বড় গৃহিণীকে বড় একটা আবশ্যকই হয় না। তবু প্রথম প্রথম যতটা সম্ভব হইত, এখন তাও হয় না। তাহার সর্ব্বাঙ্গে আগাছা জড়াইয়া গিয়াছে, দিনান্তে সে অবকাশই পায় না। —তার মধ্যে যতটুকু হয়, তাহা তাহার মায়ের জন্য; পূর্ব্বকালের মায়ের কোন স্থানই নাই। জমিদার-বাড়ীর কাণ্ড! বড় গৃহিণীর অসুখের সংবাদ তাহার কাছে পৌঁছাইতেই কয়েকদিন লাগিয়া গেল। সে যখন দেখিতে আসিল তখন বড়মা তাহার শয্যা লইয়াছেন, আঘাতে আঘাতে শিকড় শিথিল হইয়া গিয়াছিল, শেষে সামান্য বাতাসেই পড়িয়া গেল। আপনার বলিতে পুরাতন ঝি-চাকর; তাহারাই সঙ্গে থাকে। বড় গৃহিণীর ইচ্ছা, তাহার পুত্রই যে পরের ঘরে মানুষ, ইহা প্রকাশ করিয়া দেয়। তাহাদের তরফের লোকেরা বুঝুক যে, সে হইতেই সব। অন্ততঃপক্ষে ছেলেটার কানেও যদি তোলা যায়,—সে তাহার দিক একটু টানিতে পারে। এতখানি বয়স হইয়াছে এ সংবাদ কি সে জানে না! এক গাছের ফল হইয়া অন্য গাছে লাগিয়া আছে ইহা কি স্বেচ্ছায়?

ছেলেটি ধারাবাহিক দেখাশুনা করিতেছে। বৈদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। আশা কম শুনিয়া সে একটু দ্রুতই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় কি আছে না আছে সমস্ত জানিয়া রাখা আবশ্যক। সবই ত তাহারই। রোগীকে বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করা চলে না। যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে পারে, মনে কষ্ট হইতে পারে। সে বুঝিল এতদিন কাছে কাছে না থাকিয়া ভুল করিয়াছে। সেই-ই লাভবান হইতে পারিত। নিকটবর্ত্তী হওয়া খুবই উচিত ছিল। কি একটা কথা, কয়দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছে, বলিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতে পারে না। অন্য লোক থাকে তাহাতে বাধা পায়। নিজ হইতেও অনেক সময় সংযত হয়। কি সেই কথা! কাহারও কাছে কোন বন্ধকী বিষয়! কোন গোপন সম্পদের সন্ধান! সে অনেক তলাইয়াও মিলাইতে পারিল না। অথচ রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধির মুখে। কখন কি হইয়া যায় বলা যায় না!

বড় গৃহিণী ঠিক করিলেন এইবার তিনি বলিবেন। একবার সকলকে শুনাইয়া বলিলেন যে সে তাঁহারই পুত্র। রোগের প্রলাপ হিসাবেও সকলে শুনুক আসল কথাটা কি? তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়া রাখিলেও যথার্থ তিনি কোণঠাসা নন্। অতগুলি বাহিরের লোক আসিয়া মাথা গুঁজিয়াছে, প্রতিদিন পিণ্ড গ্রহণ করিতেছে, তাহারাই যেন ঘরের লোক; আর যাহার জন্য সব সেই হইয়াছে পর! তাহার উপর অসন্তুষ্ট পর্য্যন্ত কত দিন কত জনে হইয়াছে। আড়ালে অন্তরালে রাগ প্রকাশ করিয়াছে। এক দিন একটা কথা থাকে নাই। মরা ছেলেদের ঘরগুলি তালা খুলিয়া ব্যবহার করিতেছে; তাহাদের জিনিসপত্রগুলি পর্য্যন্ত হাঁটকাইয়া নষ্ট করিতেছে। অমন সাধের বাগানটা ভাঙ্গিয়া কি করিয়াছে! যেন প্রেতের বাসা হইয়াছে। এখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের কোন অধিকারই নাই। তাহাদের বাবুও এখানে কেহ নয়, সমস্তই ঐ একজন হইতে। ও তরফের ঝি-চাকরগুলি পর্য্যন্ত সমঝাইতে জানে না।

আবার বিপরীত চিন্তাও মনে উদয় হয়। এতকাল বাদে তিনি যদি কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, তবে কি সেই পুত্র তার নকল মাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আসল মাকে মাথায় তুলিয়া ধরিবে? দাসদাসী সমেত আগাছার মত অতগুলি আগন্তুক কি নূতন সমাচার পাইয়া করজোড়ে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইবে? ইহাও কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়ও, তাহা দেখিবার মত অবকাশ তো তিনি আর পাইবেন না। তাঁহার সময় যে শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাহির-বাগানে চাকরেরা তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার স্থান নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র তুলসী-মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বৈদ্যের বাক্যদানটাই কেবল বাকী।

বড় গৃহিণীর রোগ কয়দিন ধরিয়াই বৃদ্ধির মুখে। বিশেষ কথা কহেন না, কেবল পুত্রকে খোঁজেন। মরা ছেলেদেরও নাকি মাঝে মাঝে দেখিতে পান। বৈদ্য বটিকা শেষ করিয়া জবাব দিয়া গিয়াছে। আর বেশী বাকীও নাই। প্রদত্ত পুত্র প্রায় সময়ই ঘরে থাকে। পুত্রের মতই সেবা-শুশ্রূষা করে। সেই দিন সকাল হইতেই রোগীর চোখে মুখে কেমন ব্যস্ততা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘরের সকলেই ব্যস্ত। পুত্রকে একটা দিন ঘর ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। আকার-ইঙ্গিতে অস্পষ্ট ভাষায় অনেক কথা কহিলেন। আরও কহিলেন, "আমি চললুম! আমার যা কিছুর ভার তোমার ওপর রইল! আমার বাড়ী-ঘর সমস্ত সম্পত্তির তুমিই এখন প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তোমাকেই দিয়ে গেলুম।"

চক্ষু তাঁহার বড় বড় হইয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি দিতেছেন। ন'বউ পাশে ছিল, তাহার চক্ষুও বিস্ফারিত হইয়াছে। কি বলে, কি না বলে শুনিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"তুমিই দেখাশুনা করবে! আর, ন'বউ তোমার মা কিন্তু অনেক কষ্টে তোমায় পেয়েছে, তাকে অযত্ন করবে না। আমার সবই শেষ হয়ে গেছে।"

তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া আসিল। তার পর সন্ধ্যার দীপ নিভিয়া গেল। বড় গৃহিণীর মৃত্যু হইল কিন্তু কি ভাবিয়া সারা জীবন বাদে মরিবার সময় পুত্রকে মাতৃহীন করিল না।

প্রতাপরুদ্র গজপতি

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

বাঙালীর নিকট উড়িষ্যার সূর্যবংশীয় গজপতি প্রতাপরুদ্রের নাম সুপরিচিত। তাঁর রাজত্বকালে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়। প্রতাপ-রুদ্রের ধর্মমত সম্বন্ধে পূর্বে 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছি ও আমার *The History of Medieval Vaishnavism in Orissa* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। কাজেই এ প্রবন্ধে কেবল প্রতাপরুদ্রের সহিত সুলতান হুশেন শাহ্ ও বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থের উল্লেখ সংক্ষেপে করিব—

Epigraphica Carnatica—সংক্ষেপে "এপি. ইনডিকা"

Annual Report. South Indian Epigraphy—সংক্ষেপে, "দ. ভা. এপি, রিপোর্ট"

Historical Inscriptions of Southern India···সংক্ষেপে, "সিওয়েল ও আয়াঙ্গার"

History of Orrissa by R. D. Banerjee···সংক্ষেপে, "উড়িষ্যার ইতিহাস"

South Indian Inscriptions···সংক্ষেপে, "দ. ভা. অনুশাসনমালা"

Journal of Andhra Historical Research Society···সংক্ষেপে, "অন্ধ্র ঐতিহাসিক পত্রিকা"

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র সিংহাসন আরোহণ করেন। সেই সময় উড়িষ্যা-সাম্রাজ্য দক্ষিণে নেল্লুর জিলা হইতে উত্তরে রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রতাপরুদ্রের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল না। বাংলার মসনদে হুশেন শাহের (খ্রীঃ ১৪৯৩-১৫১৮) অধিকার তখনও দৃঢ় হয় নাই। প্রতাপরুদ্র বাংলা আক্রমণ করিলে তিনি বিপন্ন হইতেন। দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যে ইম্মডি নরসিংহ তখন নামে মাত্র রাজা ছিলেন। তুলুভ-বংশীয় নরসানায়ক রাজ্যের প্রকৃত কর্তা হইয়া "পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন"[১] নরসানায়ক গজপতিকে[২] পরাজিত করিয়া তাঁর দক্ষিণ আর্কট জিলা অধিকার চেষ্টা প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নরসার মৃত্যু হয়।[৩] প্রতাপরুদ্র ইচ্ছা করিলে এই সময় বিজয়নগর রাজ্যের ক্ষমতা চূর্ণ করিতে পারিতেন। রাজ্যে কিছুকাল অশান্তির[৪] পর নরসার পুত্র বীর নরসিংহ সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। ১৪২৭ শকাব্দ—১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে শালুভ-বংশীয় শেষ রাজা ইম্মডি নরসিং হর মৃত্যু হয়। তুলুভ-বংশীয় বীর নরসিংহ রাজা হইয়া তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে বীর নরসিংহের মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেবরায় রাজা হইলেন। বিজয়নগর রাজ্যের প্রাচীন গৌরব উদ্ধার করা তাঁর লক্ষ্য হইল। প্রতাপ-রুদ্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি দক্ষিণ-ভারত হইতে মুসলমান অধিকার নির্মূল করিতে পারিতেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব গজপতিদের অত্যাচার ভুলিতে পারেন নাই। কপিলেন্দ্র ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-আর্কট জিলা পর্যন্ত জয় করেন।[৬] তাঁহার অত্যাচারে অনেক গ্রাম জনশূন্য হইয়া গেল ও গ্রাম-গুলির শিব মন্দিরে পূজা বন্ধ হইল।[৭] কৃষ্ণদেবের সমসাময়িক তামিল কবি তিরুভরুর গ্রামের তত্ত্বপ্রকাশুর, এই "ওড্ডিয়ণ গলভই" বা উড়িয়াদের আক্রমণের সঙ্গে মুসলমান সেনাপতি মালিক কাফুরের অভিযানের তুলনা করিয়াছিলেন।[৮] কপিলেন্দ্রের পুত্র পুরুষোত্তম বিদ্যা-নগর বা বিজয়নগর লুণ্ঠন করিয়া সাক্ষী গোপালের মূর্তি লইয়া গিয়াছিলেন।[৯] কাজেই রাজা হইয়াই কৃষ্ণদেব পূর্ব অপমানের প্রতিশোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

উড়িষ্যায় তখন বৈষ্ণবধর্মের স্বর্ণযুগ। অতিবড়ী জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উড়িয়া বৈষ্ণবদের সহিত ধর্মালোচনায় গজপতি সময় কাটাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁর মোহনিদ্রা এক দিন ভাঙ্গিয়া গেল—কৃষ্ণদেবের উড়িষ্যা-অভিযানের আয়োজন সংবাদ পাইয়া।

---

(১) সালেম জিলা অনুশাসন। খ্রীঃ ১৯১৫, নং ১৪৩

(২) অচ্যুতরায়ের উণ্ডমল্লী তাম্রলিপি এপি. ইণ্ডিকা, তৃতীয় খণ্ড, সদাশিব রায়ের তাম্রলিপি—এপি. ইণ্ডিকা, চতুর্থ খণ্ড। কিন্তু নরসা, পুরুষোত্তম ও প্রতাপরুদ্র, কাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলা কঠিন।

(৩) উত্তর-আর্কট জিলা অনুশাসন ১৯১২ নং ৩৫৭

(৪) দ ভা. এপি রিপোর্ট, ১৯৩৪-৩৫, পৃ. ৮৬

(৬) দ. ভা. এপি. রিপোর্ট ১৯১৯ পৃ. ৫১ ও ১০৬তে উল্লিখিত মুধুর অনুশাসন। কুমার হাম্বীর পুত্র কপিলেশ্বর কুমার-মহাপাত্র প্রদত্ত

(৭) দক্ষিণ-আর্কট অনুশাসন ১৯০৫ নং ১; ১৯০৬ নং ৯৩; ১৯১৯ নং ৩১০; ১৯৩৫ নং ১১১ ও ২১৩; এবং ১৯৩৭ নং ২৬২

(৮) অন্ধ্র ঐতিহাসিক পত্রিকা, নবম খণ্ড ১ ও ২ ভাগ

(৯) কাঞ্চি কাবেরী কাহিনী। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য, ৫ ও উড়িষ্যার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১৬

কৃষ্ণদেবের উড়িষ্যা-অভিযান সম্পর্কে কয়েকটি তেলুগু বইর পরিচয় দেওয়া দরকার

১। মনুচরিত্রমু—লেখক অল্লসানি পেদ্দন—কৃষ্ণদেবরায়ের সভাকবি

২। পারিজাতাপহরণমু—লেখক মুক্কু তিম্মন—কৃষ্ণদেবের সভাকবি

৩। কৃষ্ণরায় বিজয়মু—লেখক কুমার ধূর্জটি

৪। রায় বাচকমু—মাদুরার সামন্ত-রাজা বিশ্বনাথ নায়কের (১৫২৯-৬৪) এক কর্মচারী ইহার লেখক।

৫। আমুক্ত মাল্যিদ—লেখক স্বয়ং কৃষ্ণদেব রায়। শ্রীরঙ্গনাথ-বিষ্ণুর মাহাত্ম্য তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদেবরায়ের উড়িষ্যা-অভিযানের সময়-সূচি

জুলাই ১৫০৯—কৃষ্ণদেবের সিংহাসন আরোহণ।[১০] ১৫১০—কৃষ্ণদেবের যুদ্ধ-আয়োজনের সংবাদ পাইয়া গজপতি রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে গেলেন। ("যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে"—চৈতন্য ভাগবত—অন্ত-৩) **জানুয়ারী ২৪** – নেল্লুর জিলার গুণ্ডলাপালেম গ্রামে প্রাপ্ত প্রতাপরুদ্রের অনুশাসন[১১] ফেব্রুয়ারী মাসে মহাপ্রভুর পুরীতে শুভাগমন। এপ্রিল মাসে মহাপ্রভুর দক্ষিণ যাত্রা। প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতির সুযোগে সুলতান হুশেন শাহ্‌ উত্তর-উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া অনেক দেবমন্দির ধ্বংস করিলেন।[১২] জগন্নাথ মন্দিরের মাদলা পাঞ্জীতে তাঁহাকে "গউড় পাতিশা, অমুরা সুরথান" অর্থাৎ আমির সুলতান বলা হইয়াছে।[১৩] গজপতি সুদূর দক্ষিণ দেশে এ খবর পাইলেন। "বড় ক্রোধ করি দশমাস বাট তিনি মাসে আসিলে।" (মাদলাপাঞ্জী) "সুরথান" তাঁকে আসিতে দেখিয়া পিছু হটিলেন। **১৫ই অক্টোবর**—গজপতি চলিয়া যাওয়ায় কৃষ্ণদেব অক্লেশে নেল্লুর জিলার দক্ষিণ অংশ অধিকার করিলেন।[১৪]

১৫১১—গজপতি সুলতান হুশেন শাহ্‌কে পিছু তাড়া করিয়া হুগলী জিলার মন্দারণ গড় পর্যন্ত গেলেন। মাদলা-পাঞ্জী অনুসারে প্রতাপরুদ্র তাঁহার কর্মচারী গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোইর বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হইয়া, শেষে রাজত্বের ভার গোবিন্দকে দেন। এ সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, কৃষ্ণদেবকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গজপতি তাড়াতাড়ি হুশেন শাহের সহিত সন্ধি করিলেন ও সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে নেল্লুর জিলায় ফিরিয়া গেলেন। কৃষ্ণদেবের সমরায়োজন সম্পূর্ণ না হওয়ায় তিনি বাধা দিলেন না। **অক্টোবর**—গজপতি এক ব্রাহ্মণকে বেলিচের্লা গ্রাম (কভুর তালুক, নেল্লুর জিলা) দান করিলেন।[১৫] প্রতাপরুদ্র কটকে ফিরিলেন। (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ১০)

১৫১২—**জানুয়ারী**—মহাপ্রভু পুরীতে ফিরিলেন। গজপতি তাঁহাকে দর্শন করিতে পুরী ফিরিলেন। প্রথম উড়িষ্যা-অভিযান আরম্ভ হইল। প্রতাপরুদ্র কৃষ্ণদেবকে বাধা দিতে দক্ষিণ সীমান্তে আবার গেলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে স্বয়ং মহাপ্রভু গজপতিকে সুলতান হুশেন শাহের পরিবর্তে বিজয়নগরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।[১৬] জয়ানন্দের এ কথা বিশ্বাস হয় নাই। কৃষ্ণদেব দ্বারা পরাজিত হইয়া গজপতি উদয়গিরি দুর্গে (উদয়গিরি তালুক, নেল্লুর জিলা) আশ্রয় লইলেন।[১৭] মহাপ্রভুর পুরীতে থাকার সময়ে প্রথম বার রথযাত্রার সমারোহ দেখিতে গজপতি পুরী ফিরিয়া গেলেন।

১৫১৩—উদয়গিরি অবরোধ

১৫১৪—**৯ই জুন**—উদয়গিরি দুর্গের পতন।[১৮] নুনিজের বিবরণী অনুসারে দুর্গ জয় করিতে প্রায় দেড় বৎসর লাগিয়াছিল। গজপতির পিতৃব্য (?) তিরুমল রাউত রায় বন্দী হইলেন। প্রতাপরুদ্র কোণ্ডভীডু দুর্গ (নরসারাও-পেটা তালুক—গুণ্টুর জিলা) অভিমুখে পলায়ন করিলেন।[১৯] জ্যৈষ্ঠ—শকাব্দ ১৪৩৬—**জুন**—কৃষ্ণদেব উদয়গিরির কোণবল্লভরায় দেবতার পূজা করিলেন। আষাঢ়—**জুন** বা **জুলাই**—কৃষ্ণদেব তিরুপতি (চন্দ্রগিরি তালুক, উত্তর-আর্কট জিলা) গেলেন। গজপতিকে পরাজিত করিতে পারায় তিনি ও তাঁহার রাণীরা তিরুপতির বেঙ্কটেশ দেবকে অর্থ ও

(১০) কৃষ্ণদেবের সর্বপ্রথম অনুশাসনের সময়—২৬শে জুলাই, ১৫০৯। বেলারি জিলা অনুশাসন—১৯১৯, নং ৭০৩

(১১) দ. ভা. এপি. রিপোর্ট—১৯৩৩-৩৪, পৃ. ৪২

(১২) চৈতন্য ভাগবত—অন্ত ৪

(১৩) অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তি সম্পাদিত মাদলাপাঞ্জী

(১৪) নেল্লুর জিলার গোমুণ্টা গ্রামে প্রাপ্ত অনুশাসন—"নেল্লুর লিপিমালা" অঙ্গোল, নং ৪৬

(১৫) অন্ধ্র ঐতিহাসিক পত্রিকা, একাদশ খণ্ড—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

(১৬) "কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।** প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরে গেল করিবারে যুদ্ধ"—চৈতন্যমঙ্গল

(১৭) দ. ভা. অনুশাসনমালা—চতুর্থ খণ্ড, নং ২৮২...A. R. ১৮৮৯র নং ৫৩

(১৮) "নেল্লুর লিপিমালা", তৃতীয় খণ্ড, উদয় গিরি নং ৪০। সিওয়েল ও আয়াঙ্গার, পৃ. ২৩৯

(১৯) দ. ভা. অনুশাসনমালা...চতুর্থ খণ্ড, নং ২৮২...A.R. ১৮৮৯র নং ৫৩

অলঙ্কার দানকরিলেন।[২০] আশ্বিন, শকাব্দ ১৪৩৬—**সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর**—মহাপ্রভু বাংলা দেশে গেলেন। কৃষ্ণদেব নিজের রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

১৫১৫—ফাল্গুন, শকাব্দ ১৪৩৬—**মার্চ**—কৃষ্ণদেব উদয়-গিরি হইতে আনীত বালকৃষ্ণ-মূর্তি বিজয়নগরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দ্বিতীয় উড়িষ্যা অভিযান আরম্ভ হইল। কৃষ্ণদেব কোন্ডাভীডু অভিমুখে অগ্রসর হইয়া অড়াঙ্কি, বিনুকোণ্ডা, বেল্লাম কোণ্ডা, নাগার্জুন কোণ্ডা, কেতাবরম অধিকার করিলেন। কৃষ্ণদেবের প্রধান মন্ত্রী শালুভ তিম্মরস্থ কোণ্ডাভীডু দুর্গ অবরোধ করিলেন। আষাঢ়, শকাব্দ ১৪৩৭—**২৩শে জুন**—কোণ্ডভীডু দুর্গের পতন হইল।[২২] তিম্মরস্থ "গজপতি নিযুক্ত ভীরু সামন্তের দল"কে বন্দী করিলেন।[২৩] প্রতাপরুদ্রের পুত্র কুমার বীরভদ্র, কুমার হাম্বীর মহাপাত্রের পুত্র নরহরি পাত্র, কেশব পাত্র, বালচন্দ্র মহাপাত্র, পশুপতি রাউত রায়, লক্ষ্মীপতি রাউত প্রভৃতি সামন্তেরা আত্মসমর্পণ করিলেন।[২৪] দুইজন মুসলমান সেনাপতি মল্ল ও উদ্দণ্ড খান (মালিক ও ওসমান?) বন্দী হইলেন। কৃষ্ণদেব বীরভদ্রের বীরত্বের সম্মান করিয়া তাঁহাকে হয়শলানাডুর মলয়বেন্থুর সীমা অর্থাৎ জিলার নায়ক নিযুক্ত করিলেন।[২৫] শালুভ তিম্মরস্থর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপেন্না কোণ্ডভীডুর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। **২৫শে জুলাই**—কৃষ্ণদেব শ্রীশৈলম দর্শন করিলেন।[২৬] **২রা ডিসেম্বর**—পৌষ, শকাব্দ ১৪৩৭—কৃষ্ণদেব কুর্ণুল জিলার অহোবল শহরের দেবমন্দির দর্শন করিলেন।[২৭]

১৫১৬—কৃষ্ণদেব বেজওয়াডাতে কিছুদিন বিশ্রাম করিলেন। তারপর আরও অগ্রসর হইয়া কোণ্ডাপল্লী (বেজওয়াডা তালুক, গুণ্টুর জিলা) অবরোধ করিলেন। শিরশ্চন্দ্র মহাপাত্র দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। নুনিজ লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণদেব কোণ্ডভীডু দুর্গ জয় করিয়া প্রতাপ-রুদ্রের এক পুত্র, এক রাণী ও সাত জন সামন্তকে বন্দী করিয়াছিলেন। (সিওয়েলের "এক বিস্মৃত সাম্রাজ্য" গ্রন্থে উদ্ধৃত বিবরণী) নুনিজের বিবরণী আগাগোড়া পড়িলে বুঝা যায় যে তিনি কোণ্ডাভীডু জয়ের সহিত কোণ্ডাপল্লী জয় গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

কৃষ্ণদেব স্বয়ং লিখিয়াছেন যে কোণ্ডাপল্লী জয় করিয়া তিনি প্রহরেশ্বর মহাপাত্রকে (গজপতির এক পিতৃব্য) বন্দী করিয়াছিলেন। (আমুক্ত মালিয়াদ, তৃতীয় আশ্বাস বা অধ্যায়) তারপর তিনি কোটম (পূর্ব গোদাবরী জিলাতে) ওওয়াদদি (কোরাপুট এজেন্সি) জয় করিলেন, (আমুক্ত মালিয়াদ, প্রথম আশ্বাস) ও রাজমহেন্দ্রী পৌছিলেন। ৩০শে মার্চ—১২ই চৈত্র, শকাব্দ ১৪৩৮—বিজয়নগর-অধিপতি সিংহাচলম্-এ গেলেন। তিনি ও তাঁহার রাণী তিরুমল দেবী ও চিন্না দেবী সিংহাদ্রি-নাথ অর্থাৎ নৃসিংহকে বহু অর্থ ও অলঙ্কার দিয়া পূজা করিলেন।[২৮] তাঁহার সেনাপতি রায়সম কোণ্ড মারসয় শ্রীকূর্ম্ম (চিকাকোন তালুক, ভাইজাগ জেলা) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া রাজার প্রতিনিধিরূপে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করিলেন।[২৯]

এইবার কৃষ্ণদেবরায় দেশে ফিরিলেন। **২৯শে জুন**—কৃষ্ণা নদী-তটে উৎকীর্ণ এক অনুশাসন হইতে জানা যায় যে তিনি "উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজের রাজ্যে ফিরিতেছিলেন"[৩০]। ডিসেম্বর—পৌষ, শকাব্দ ১৪৩৮—"পোটমুরু গ্রামে এক বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তিনি উত্তর দিক হইতে ফিরিলেন।"[৩১] ও এক মন্দিরে পূজা দিলেন। পোটমুরু গ্রাম চিত্তিবিলাশ নদীতীরে অবস্থিত ও ভাইজাগ জেলার বিমিলিপটম শহর হইতে ১২ মাইল দূরে।

তথাকথিত কটক অধিকার

রায়-বাচকমু, পারিজাতাপহরণমু ও মনুচরিত্রমু মতে কৃষ্ণদেবরায় উড়িষ্যার রাজধানী কটক অধিকার করিয়াছিলেন।

১। কৃষ্ণদেব সিংহাচলম্ হইতে অগ্রসর হইলেন। প্রতাপরুদ্র ষোল জন সামন্ত ("পাত্র") সমেত বাধা দিলেন।

(২০) দ. ভা. অনুশাসনমালা…চতুর্থ খণ্ড, নং ২৮৪…A.R, ১৮৮৯র নং ৫৫

(২২) এপি ইণ্ডিকা, ষষ্ঠ ভাগ, পৃ. ১১০-১১১

(২৩) ঐ , পৃ. ১০৮-১১০

(২৪) "দ. ভা. অনুশাসনমালা" ষষ্ঠ খণ্ড, নং ২৪৮—A. R. ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের নং ২৭২, এই অনুশাসনটি হইতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়

(২৫) "এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকা," একাদশ খণ্ড Dg. 107

(২৬) দ. ভা. এপি. রিপোর্ট ১৯১৫ নং ১৮ ও ১৯

(২৭) ঐ নং ৬৪

(২৮) দ. ভা. অনুশাসনমালা', ষষ্ঠ খণ্ড, নং ৬৯৪ ও ৬৯৬—A.R. ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নং ২৪৩ ও ২৪৫

(২৯) ১৪৩৯ শকাব্দে উৎকীর্ণ অনন্তপুর জিলার চোলসমুদ্রম অনু-শাসন—দ. ভা. এপি. রিপোর্ট—১৯২১

(৩০) এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকা V. H. N. 13

(৩১) দ. ভা. এপি. রিপোর্ট ১৯০৩, নং ১৯৬

কিন্তু শালুভ তিম্মরসুর কূটনীতি-ফলে প্রতাপরুদ্র যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজধানী অতি সহজে শত্রুহস্তগত হইল। (রায়-বাচকমু—কুমার ধূর্জটি তাঁর কৃষ্ণরায় বিজয়মু গ্রন্থে রায়-বাচকমুর অনুকরণ করিয়াছেন)।

২। কৃষ্ণদেব কটক অভিমুখে অগ্রসর হওয়াতে গজপতি ভীত হইয়াছিলেন। (পারিজাতাপহরণমু—প্রথম আশ্বাস ২৩)

৩। কৃষ্ণদেবের বাহুবল বাড়ব-অগ্নির মত উদয়গিরি হইতে প্রসারিত হইয়া কটক পর্যন্ত অগ্রসর হইল। গজপতি ইহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না। (মনুচরিত্রমু)

বলাবাহুল্য, কটক অধিকারকাহিনী কৃষ্ণদেবের সভা-কবিদের কল্পনা-প্রসূত। তিনি নিজে তাঁহার অনুশাসন বা গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করেন নাই।

প্রতাপরুদ্র ও কৃষ্ণদেবের সন্ধি

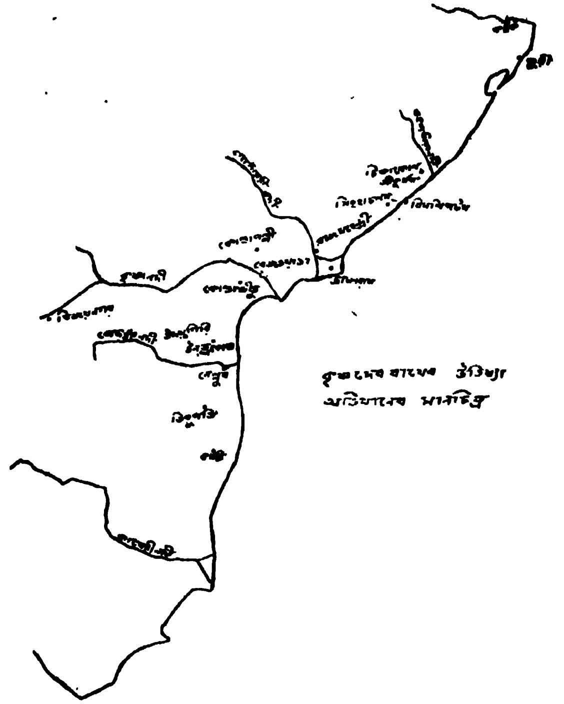
১। কৃষ্ণদেব গজপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি কলিঙ্গদেশ অধিকার করিতে আসেন নাই—নিজের ক্ষমতা দেখাইতে আসিয়াছেন মাত্র। তিনি গজপতিকে বিজিত অঞ্চল ফিরাইয়া দিলেন। কৃতজ্ঞ হইয়া প্রতাপরুদ্র নিজের কন্যার সহিত কৃষ্ণদেবের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে অবস্থিত উড়িষ্যা-সাম্রাজ্যের অংশ যৌতুক দিলেন। (রায়-বাচকমু—"বিজয়নগর ইতিহাসের উপাদান" গ্রন্থে উদ্ধৃত বিবরণী, পৃঃ ১৩২)

২। প্রতাপরুদ্রের এক রাণী কোণ্ডাপল্লী দুর্গে বন্দী হইয়াছিলেন। গজপতি তাঁহার মুক্তির জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। শেষে স্থির হইল যে কৃষ্ণদেব প্রতাপরুদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিবেন ও গজপতিকে তাঁহার রাণী ও বিজিত অঞ্চল ফিরাইয়া দিবেন। ("এক বিস্মৃত সাম্রাজ্য"—পৃঃ ৩২০—নুনিজের বিবরণী)

রায়-বাচকমুর লেখক কৃষ্ণদেবকে অতি মহানুভব লোক প্রতিপন্ন করিতে চান। কৃষ্ণদেব বীরত্ব দেখাইবার জন্য যুদ্ধ করেন নাই। কৃষ্ণা-গোদাবরী দোআব বা ভেঙ্গী রাজ্য পূর্বে চোল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণদেব দাক্ষিণাত্যের আর এক সাম্রাজ্যের জন্য সেই অঞ্চল অধিকার করিলেন। তিনি "গজপতি সপ্তাঙ্গ হরণ" উপাধি ধারণ করিলেন।[৩২] তিম্মন তাঁর পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় দিয়াছেন "উৎকল-ভূমি ধর-দর্প-হরণ" বলিয়া।[৩৩] ১৫১৬ বা ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হয় নাই। সুতরাং রায়বাচকমুর

(৩২) কেম্ব্রিজের ভারত ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৭

(৩৩) পারিজাতাপহরণমু, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১



বিবরণ বিশ্বাস করা যায় না। নুনিজের বিবরণ আগাগোড়া অতিরঞ্জিত মনে হয়।

তৃতীয় অভিযান

১৫১৮—১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে কৃষ্ণদেব আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বেজওয়াডাতে প্রাপ্ত এক অনুশাসনে তিনি কোণ্ডাপল্লীতে রাজত্ব করিতেছেন, জানা যায়।[৩৪]

১৫১৯—২৭শে জানুয়ারী—শকাব্দ ১৪৪০, ফাল্গুন—কৃষ্ণদেব শ্রীকাকুলমের (মসুলিপটমের নিকট) অন্ধ্র বল্লভস্বামীর মন্দিরে পূজা দিলেন।[৩৫] ৮ই আগষ্ট=শ্রাবণ, শকাব্দ ১৪৪১ তিনি সিংহাচলম মন্দিরকে "কলিঙ্গ-দণ্ডপাটে"র কয়েকটী গ্রাম দান করিলেন। এই গ্রামগুলি পূর্বে "প্রতাপরুদ্র মহারাজা"র ছিল।[৩৬]

এই বার বোধ হয় সন্ধি স্থাপিত হইল। মহাপ্রভু তত দিনে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ গজপতির আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। তুলুভ নরপতিও এইবার রায়চুর দোআবের জন্য বিজাপুর-সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসুক হইলেন।

(৩৪) সিওয়েল ও আয়াঙ্গার, পৃ. ২৪২

(৩৫) "দ. ভা. অনুশাসনমালা"—চতুর্থ খণ্ড—নং ৯৮১=A R. ১৮৯৩র নং ১৫৭

(৩৬) দ. ভা. অনুশাসনমালা ষষ্ঠ খণ্ড—নং ৬৯৫

তিনি গজপতির এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া গোদাবরী পর্যন্ত উড়িষ্যা সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশ অধিকার করিলেন।

প্রতাপরুদ্রের কন্যা

রায়বাচকমু অনুসারে তাঁহার নাম জগন্মোহিনী ও কৃষ্ণরায় বিজয়মু অনুসারে তুক্কা ছিল। শালুভ তিম্মরস্থর ভ্রাতুষ্পুত্র নদিন্দ্‌লা গোপমন্ত্রীর, কৃষ্ণমিশ্র-বিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকা হইতে উৎকল-রাজকুমারীর নাম ভদ্রা ছিল জানা যায়। পোর্টুগীজ লেখক Paes লিখিয়াছেন যে উৎকল-রাজকুমারী কৃষ্ণদেবের তিন পট্টমহিষীর অন্যতম ছিলেন। কৃষ্ণরায় বিজয়মু অনুসারে প্রতাপরুদ্র তাঁহার আর এক কন্যা আক্কামম্বার সহিত কেতাবরমের সামন্তরাজ পশুপতি রাউত রায়ের বিবাহ দিয়াছিলেন।[৩৭]

প্রতাপরুদ্রের শেষ জীবন

১৫২০খ্রীষ্টাব্দের পর প্রতাপরুদ্রকে আর যুদ্ধ করিতে হয় নাই। কৃষ্ণদেব, বা তার পরবর্তী রাজা অচ্যুত রায়, অথবা সুলতান হুশেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ্ (১৫১৮-৩৩) তাঁকে বিব্রত করেন নাই। গজপতি মনের আনন্দে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ও উড়িয়া-বৈষ্ণব জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতির সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পথে চলিয়া গেলেন। উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব হরিচন্দনের দ্রাক্ষারাম অনুশাসন হইতে জানা যায় যে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দেও উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমানা গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩৮]

প্রতাপরুদ্রের অনুশাসন

১৪৯৭—সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

১। ১৪৯৯—জুলাই—চতুর্থ অঙ্ক—জগন্নাথমন্দিরে—J. A. S. B. ১৮৯৩ খ্রীঃ

২। ১৫০০—ডিসেম্বর—পঞ্চম অঙ্ক—জগন্নাথ মন্দিরে—J. A. S. B, ১৮৯৩ খ্রীঃ

৩। ১৫০৩—নবেম্বর=শকাব্দ ১৪২৫—শ্রীকূর্ম—A, R, ১৮৯৬র নং ৩৪৬

৪। ১৫১০=শকাব্দ ১৪৩২—কাভালি তালুক—নেল্লুর জিলা—

দ, ভা. এপি রিপোর্ট, ১৯২১, পৃ. ১১৩

৫। ১৫১০—জানুয়ারী=শকাব্দ ১৪৩২—দ. ভা. এপি, রিপোর্ট, ১৯৩৪, পৃ. ৪২

৬। ১৫১০-১১ শকাব্দ ১৪৩২—ভাইজাগ জিলা—A, R, ১৯০৫-র নং ৩৭৭

৭। ১৫১১—অক্টোবর—বেলিচের্লা—অন্ধ্র ঐতিহাসিক পত্রিকা—একাদশ খণ্ড

৮। ১৫০৪-১৫=শকাব্দ ৪৩৬—উদয়গিরি—J. A. S, B,—১৯০০ খ্রীঃ

(৩৭) "কৃষ্ণদেবের অভিযান" প্রবন্ধ—অন্ধ্র ঐতিহাসিক পত্রিকা, নবম খণ্ড, চতুর্থ ভাগ

(৩৮) উড়িষ্যার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮

আলোচনা

"রংপুর ভাষার একটি দিক"

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গত পৌষের প্রবাসীতে (২৩৯ পৃ.) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়ের 'রংপুর-ভাষার একটি দিক্' প্রবন্ধে রংপুর অঞ্চলে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাদেশিক শব্দকোষ সংকলনে শব্দগুলি কাজে লাগিবে। প্রবন্ধকারের মতে 'ভূতপূর্ব্ব কামতাপুর রাজ্যে অর্থাৎ বর্ত্তমান রংপুর ও কুচবিহারের অঞ্চল-বিশেষে অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ অথবা কিঞ্চিৎ বিকৃত সংস্কৃত শব্দ অনেক পাওয়া যায়, যা বাংলা দেশের অন্য কোন স্থানে প্রচলিত নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস।' তাঁহার এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্যই শব্দগুলি সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু এ জাতীয় শব্দকে রংপুর অঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। চলতি বাঙ্গালায় সংস্কৃত হইতে আগত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা প্রচুর। তাহা ছাড়া, বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম্য লোকের মধ্যেও এইরূপ অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ ফরিদপুর কোটালিপাড়ার উখেল (উদুখল), থালি (স্থালী), সেইজ (শয্যা), মেদিনীপুরের বরা (বরাহ) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ চৌধুরী মহাশয়ের তালিকায় উদ্ধৃত কুড়িটি শব্দের মধ্যে ঝাটিতি (তাড়াতাড়ি), জিটি (টিক্‌টিকি), বির্ত্তি (একপ্রকার গাছ বা ফল), নিন্দ (নিদ্রা), বীচন (বীজ), ছেব (থুথু), সোন্দা (প্রবেশ করা), ভাতার (স্বামী) অন্ততঃ এই আটটি শব্দ ঠিক এই আকারে বা ঈষৎ ভিন্ন রূপে অন্যত্রও পাওয়া যায়—পুরাতন সাহিত্যেও ইহাদের কোন কোনটি পরিচিত।

"নিবর্ত্তন এবং গোচর্ম্ম"

শ্রীবিমলাচরণ দেব

বর্ত্তমান পৌষ মাসের "প্রবাসী"তে (পৃ. ৩০৩) অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার, এম. এ., পিএচ. ডি. মহাশয়ের "নিবর্ত্তন ও গোচর্ম (উত্তর)" পড়িলাম। গত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত (পৃ. ১৮৩-৪) আমার একটি ক্ষুদ্র নিবেদন সম্বন্ধে এই "উত্তর"। উক্ত "উত্তর" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তথ্যানুসন্ধানের অনুরোধে বলিতে নিজেকে বাধ্য মনে করিতেছি।

(১) শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন আমি নাকি "নিবর্ত্তনকে ক্ষেত্রপরিমাণফল না ধরিয়া উহাকে রৈখিক মাপ হিসাবে গ্রহণ করিতে" চাই। ইহাতে আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।

আমার উক্ত নিবেদনে স্পষ্টই বলিয়াছি যে নিবর্ত্তন নিশ্চয়ই দৈর্ঘ্য-জ্ঞাপক, কিন্তু কখনও কখনও Square area অর্থে ব্যবহৃত হইত। আমার এই কথার সমর্থনে ভাণ্ডারকর-এর *Early History of the Dekkan*এর নির্দ্দেশ দিয়াছি। ইহার পর, ভাণ্ডারকর-এর "অভিমত একেবারে উড়াইয়া" দেওয়ার অভিযোগ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় আমার বিরুদ্ধে কি করিয়া আনেন, বুঝিলাম না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার পুস্তক পড়িতে বলিয়াছেন, কিন্তু এ অবস্থায় তাহা আবশ্যক বোধ করিতেছি না, কারণ পুস্তকের নামে যত দূর বোধ হইতেছে, মন্নির্দ্দিষ্ট ভাণ্ডারকর-এর অভিমত ও অধ্যাপক মহাশয়ের পুস্তক, দুইয়েরই বিষয়বস্তু এক—শাতবাহন রাজগণের শাসন।

(২) শাম শাস্ত্রী নির্দ্দিষ্ট টীকাকার সম্বন্ধে তিনি পাদটীকায় বলিয়াছেন —"This is used in measuring squares" অর্থাৎ ইহা ব্যবহৃত হয় বর্গপরিমাপ করিতে। ইহা নিজে Square area নয়, বোধ হয় বেশ স্পষ্ট। ইহাই আমি পূর্ব্বাপর বলিতেছি। এ অবস্থায় আমার উক্তির সমর্থক টীকাকারকে কি করিয়া "উড়াইয়া" দিতে পারি বা কোথায় "উড়াইয়া" দিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছি না।

(৩) শাম শাস্ত্রী তৎকৃত অনুবাদের মূলে বন্ধনীমধ্যে যে "Square area" দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক, অর্থাৎ মূলে এরূপ কিছুই নাই, এ কথা তখনও বলিয়াছি, এখনও জোর করিয়া বলিতেছি। মূলে আছে দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। "নিবর্ত্তন Square area" উপরোক্ত টীকাকারও এ কথা সমর্থন করেন না।

(৪) "দশহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্", ইহা যে দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক অস্বীকার করিবার বোধ হয় উপায় নাই। তাহার পরই যদি "বিস্তার" শব্দ থাকে, তাহার অর্থ "বিস্তৃতি" অর্থাৎ লম্বা ও চওড়া।

(৫) শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় শাতাতপ সংহিতার বচন উদ্ধার করিয়াছেন। ঠিক ঐ শ্লোকই আমি আমার নিবেদনে দিয়াছি—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা টীকা হইতে। সেখানে উহার আকর বৃহস্পতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। উক্ত শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে নিঃসন্দেহ দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক কথা বলিয়া পর পংক্তিতে "দশ তান্যেব" বলিলে "দশ গুণ সেই দৈর্ঘ্যমাত্র" বুঝাইতে পারে না। "গোচর্ম" অর্থাৎ বর্গপরিমাপ বুঝিতে হইলে লম্বা ও চওড়া উভয়ই দশ গুণ বুঝিতে হইবে, বলা বাহুল্য।

(৬) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২. ২০. ১. ২৭এ সমস্তই দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক, যথা আঙ্গুল, হস্ত, রজ্জু, নিবর্ত্তন ("ত্রিরজ্জুকং নিবর্ত্তনম্"), গোরুত ও যোজন। ইহার মধ্যে কোনটিই বর্গপরিমাপজ্ঞাপক মনে হয় না। অন্ততঃ আঙ্গুল, হস্ত, রজ্জু, গোরুত ও যোজন যে দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে "নিবর্ত্তন" হঠাৎ "বর্গপরিমাপ" বলিলে তাহার বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি হয়—(ক) তাহা স্বজাত্যবিধি- (Ejusdem generis rules) বিরুদ্ধ, (খ) মূলের "ত্রিরজ্জুকং নিবর্ত্তনম্" উপেক্ষা করিতে হয়, বা (গ) রজ্জুকেও বর্গপরিমাপজ্ঞাপক বলিতে হয়।

প্রাণতোষণীতন্ত্রধৃত স্বরোদয়টীকাকারমতেও নিবর্ত্তন দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক।

ইহার পরও, নিবর্ত্তন দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক হইতে পারে না, এ কথা বলা সম্ভব কি?

(৭) প্রাণতোষণীতন্ত্রের উক্তি উদ্ধার করিলাম, অথচ লক্ষ্য করি নাই, এ অভিযোগ বোধ হয় ঠিক নয়। পূর্ব্বাংশে ২০ বংশে ১ নিবর্ত্তন এবং পরবর্ত্তী অংশে "যে সমচতুরস্র ক্ষেত্রের প্রতি ভুজ ২০ বংশ তাহাকে নিবর্ত্তন বলে" ইহার মধ্যে বিরোধ কোথায়? এই কথাই ত পূর্ব্বাপর বলিতেছি। ১ নিবর্ত্তন × ১ নিবর্ত্তন = ১ বর্গ নিবর্ত্তন, সংক্ষেপে ১ নিবর্ত্তন। মূলে "চ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

অতএব—"নিবর্ত্তন" মুখ্যতঃ দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক।

১ নিবর্ত্তন × ১ নিবর্ত্তন = ১ বর্গ নিবর্ত্তন, সংক্ষেপে ১ নিবর্ত্তন।

১০ নিবর্ত্তন × ১০ নিবর্ত্তন = ১ গোচর্ম।

সর্বশেষে—কৌতূহলী পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ নিবেদন করি—গত বারে অনবধানতাবশতঃ দুইটী কথার উল্লেখ করি নাই। গরুর চামড়া পাতিয়া ব্যবহার এ দেশে হইত। (১) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ১. ৮, ৯এ আছে—নবদম্পতি অনডুহ চর্ম পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া দধিপ্রাশন করিবে। (২) শতপথ ব্রাহ্মণ ১. ২. ৫. ২এ আছে—অসুররা "উক্ষেঃ চর্মভিঃ" পৃথিবী ভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইটিই বোধ হয় প্রাচীনতম উদাহরণ।

(প্রত্যুত্তর)

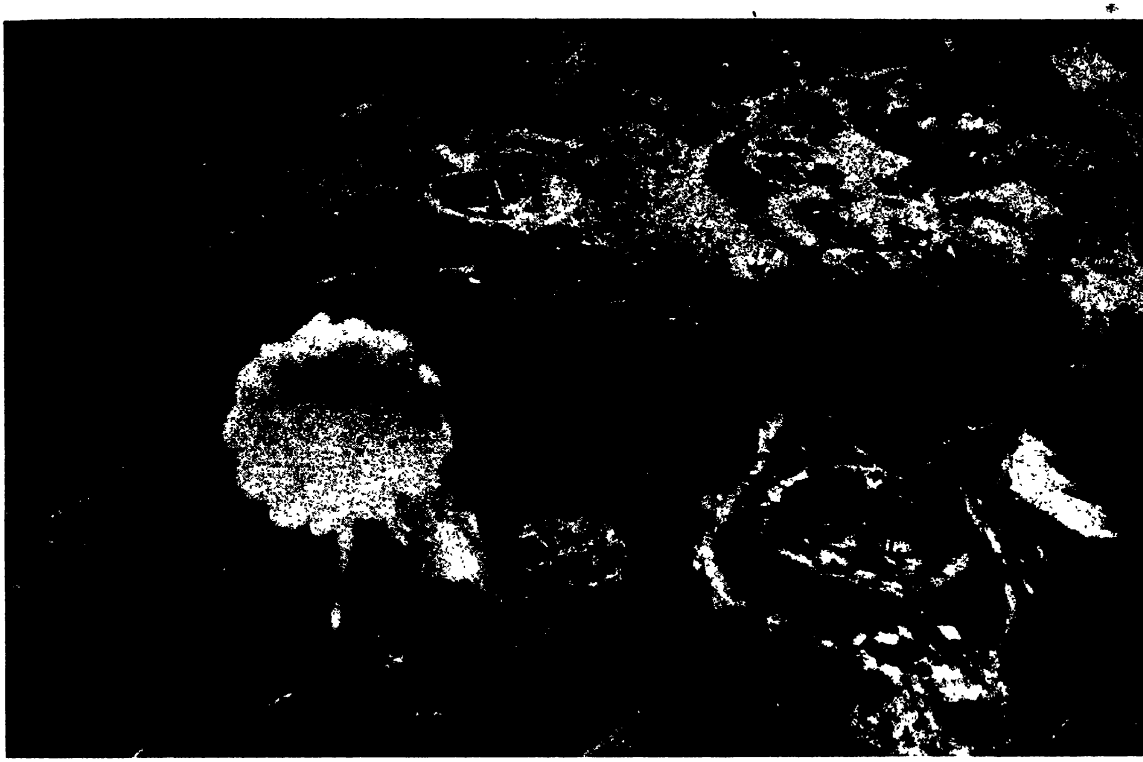
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয়ের প্রত্যুত্তর পাঠ করিলাম। তিনি বলিতে চান, নিবর্ত্তন মূলতঃ রৈখিক মাপ; পরবর্ত্তী কালে যে চতুরস্র ভূমিখণ্ডের চারি বাহুই এক নিবর্ত্তন দীর্ঘ তাহার নিবর্ত্তন সংজ্ঞা হইয়াছিল। আমার বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে। কারণ, নিবর্ত্তন যে দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ নাই। দেব মহাশয় প্রাণতোষণী-তন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাহা সমর্থন করিতে পারি না। "নিবর্ত্তনং বিংশতিবংশসংখ্যৈঃ—ক্ষেত্রং চতুর্ভিশ্চ ভুজৈর্নিবদ্ধম্" এবং "সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্" এই দুইটি মতের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া প্রাণতোষণীতন্ত্রকার নিশ্চয়ই প্রথম ক্ষেত্রে নিবর্ত্তনকে ক্ষেত্রফল পরিমাপ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহাকে রৈখিক মাপ বুঝিতে যান নাই; উভয়ত্রই সংজ্ঞাটিকে এক রূপে অর্থাৎ ক্ষেত্রফল পরিমাপ রূপে বুঝিয়াছেন।

আমার মনে হয়, নিবর্ত্তন শব্দটির ধাতুগত অর্থই দেব মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ। এই শব্দটির প্রাথমিক অর্থ ফিরিয়া আসা বা ঘুরিয়া আসা। ইহাতে কোন ভূখণ্ডের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে মাপিতে আরম্ভ করিয়া উহার চারিদিক মাপিয়া আবার সেই স্থানটিতে ফিরিয়া আসা দ্যোতিত হয়। নিবর্ত্তন রৈখিক মাপ হইলে ঐ সংজ্ঞার সহিত এই ধাতুগত অর্থের কোনই সামঞ্জস্য থাকে না।

পৌষের "প্রবাসী"তে আমি গোচর্ম্ম সম্পর্কে বিষ্ণুসংহিতার উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম; উহার মত উদ্ধৃত করি নাই। বঙ্গবাসীর বিষ্ণুসংহিতা (৫।১৭৭) অনুসারে—

> একোঽপীয়াদ্ বহুৎপন্নং নরঃ সংবৎসরং ফলম্।
> গোচর্ম্মমাত্রা সা ক্ষৌণী স্তোকা বা যদি বা বহু।



মার্কিন বিমান-বাহিনী বি-২৫ মিচেল বোমারু-বিমান হইতে নিউগিনির জাপানী বিমান-ঘাঁটিতে প্যারাসুট-বোমা বর্ষণ করিতেছে





সলোমন্‌স্‌ দ্বীপমালার অন্তর্বর্ত্তী নিউ জর্জিয়ার জঙ্গলে মার্কিন পদাতিক-সেনা অগ্নি-ক্ষেপক অস্ত্রের সাহায্যে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে



চীনে মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে একটি বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মাণে রত চীনাগণ

সমররত ব্রিটেনের কার্য্যকলাপ

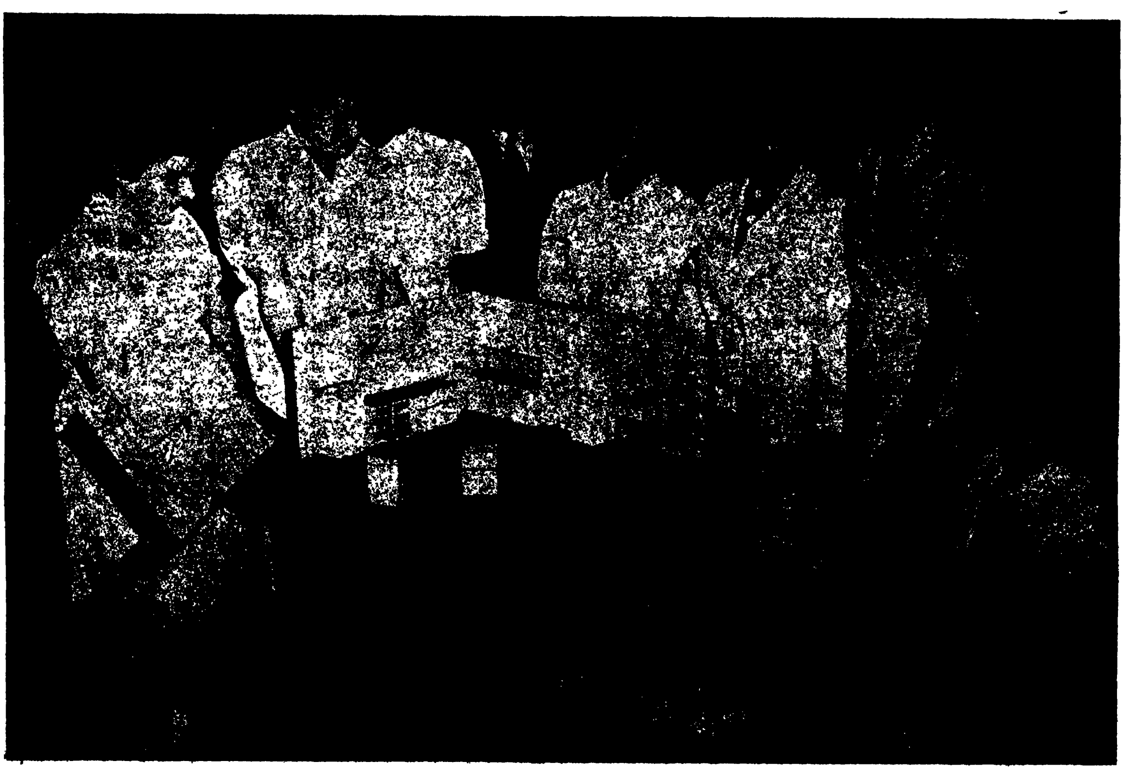


শস্যক্ষেত্র হইতে ট্রাক্‌টর সাহায্যে পক্ব শস্য তুলিবার দৃশ্য





বোমা-বিধ্বস্ত গৃহাদি হইতে ইট বাহির করিয়া লইয়া তাহা পুনরায় গৃহ-নির্মাণের উপযোগী করিয়া তোলা হইতেছে



ছাত্রী-শিল্পীগণের গৃহাদি নির্মাণের নূতন পরিকল্পনা

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইয়োরোপের পূর্ব্বাঞ্চলে সুদূর বিস্তৃত রুশরণাঙ্গনের একটি সঙ্কীর্ণ প্রান্তে এখন প্রবল যুদ্ধ চলিয়াছে। এখানে যুদ্ধের লক্ষ্য উক্রাইন অঞ্চল হইতে শত্রু বিতাড়ন এবং পোলাণ্ডে প্রবেশ করিয়া জার্ম্মান রণবাহিনীগুলির চলাচল ও সরবরাহের পথ ভাঙ্গিয়া রুশ রণাঙ্গনে অবস্থিত অক্ষ-শক্তির সেনাদলের পরিস্থিতি অতিশয় বিপজ্জনক করা। উক্রাইন হইতে জার্ম্মান সেনা বিতাড়িত হইবার পূর্ব্বে সেই সেনাদলের বিশেষ বিশেষ অংশকে বেড়াজালে ঘেরিয়া নষ্ট করিবার উদ্যোগও রহিয়াছে। রুশ রণাঙ্গনের একটি অংশে, যথা ডিপার নদের বাঁকের পাশে দুই স্থলে সোভিয়েট সেনা এই উদ্দেশে অতি প্রবল আক্রমণের ফলে ১৯৩৯ সালের পোলাণ্ডের সীমান্তরেখা পার হইয়াছে। সোভিয়েট অভিযানের এই অংশের গতিমুখ এখনও সোজা ভাবে চলিতেছে না, এবং দক্ষিণে উমান অঞ্চলের আক্রমণও ঠিক কোন মুখে ঘুরিবে বুঝা যাইতেছে না। জার্ম্মান সংবাদে বুঝা যায় যে সোভিয়েট সেনা এই সকল অঞ্চলে অবিশ্রাম সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িতেছে এবং সোভিয়েট সংবাদে বুঝা যায় যে জার্ম্মান দলের প্রতিরোধ-চেষ্টাও সবল রহিয়াছে এবং তাহাদের পাল্টা আক্রমণও সতেজে চলিতেছে। এই অঞ্চলের দক্ষিণে রুশসেনা ক্রিমিয়া অঞ্চল আক্রমণের চেষ্টায় কার্চ্চ উপদ্বীপের উত্তরে নামিয়াছে কিন্তু সেখানে এখনও কোনও প্রবল যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় নাই (১২-১-৪৪)। উত্তরের রণপ্রান্ত এখন শীতের আবেশে নিশ্চল। মোটের উপর রুশ রণক্ষেত্রে একমাত্র পোলাণ্ড সীমান্তেই এখনও প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে এবং ইহা এখনও "ঝটিকা যুদ্ধে"র আকার ধারণ করে নাই। জেনারেল ম্যানস্টাইনের পলায়ন (বা পশ্চাদপসরণ) পথ কর্ত্তনের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ এখনও দেখা যাইতেছে না। তবে রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মান ব্যূহরেখা এখন প্রচণ্ড টাল খাইয়াছে এবং এই বক্র রেখার পিছনে কোনও বিশেষ প্রাকৃতিক বাধা নাই যাহা আশ্রয় করিয়া জার্ম্মান দল স্থিরভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে। একমাত্র শীতের প্রকোপে সোভিয়েট সেনার কার্য্যক্রমে বিশেষ অন্তরায় আসিতে পারে। সুতরাং রুশ রণাঙ্গনের দক্ষিণ ভাগে যুদ্ধের গতিমুখ এখনও জার্ম্মান বহিষ্কারের দিকেই রহিয়াছে, কিন্তু বহিষ্কার ও পরাজয়ের মধ্যে ব্যবধান পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে মনে হয়, কেন না এখনও জার্ম্মানদল সেরূপ সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিগত পাঁচ মাসের জার্ম্মান পশ্চাদপসরণের সময়ে সোভিয়েট তাহার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া জার্ম্মান-ব্যূহ আক্রমণ করে নাই একথা ভাবিবার কোনও কারণ আমরা পাই নাই, সুতরাং জার্ম্মান-ব্যূহ বিপর্য্যস্ত বা অক্ষশক্তি সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার কারণ অন্যত্র দেখিতে হইবে।

ইটালীর যুদ্ধের গতিমুখ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এত দিনে মিত্রপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে ইটালীর রণাঙ্গন দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত নহে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ ত প্রকাশ্য ভাবেই বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত বলিতে এরূপ রণাঙ্গন তাঁহারা বুঝেন যেখানে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অক্ষশক্তি রুশ রণপ্রান্ত হইতে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ-ষাটটি ডিভিসন সৈন্য আনিতে বাধ্য হয়। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের মতে এখনও অক্ষশক্তি একটি ডিভিসন সৈন্যও রুশ রণাঙ্গন হইতে সরায় নাই এবং সোভিয়েটের যুদ্ধের বোঝা এখনও কিছুমাত্র হাল্কা হয় নাই। ইটালীতে এখন মিত্রপক্ষের সেনাদল অত্যন্ত দুরূহ প্রাকৃতিক বাধা অতি-ক্রম করিয়া অতি অল্পে অল্পে রোমনগরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে মিত্রপক্ষের লক্ষ্য প্রথমে যাহা ছিল এখন তাহা হইতে অনেক বদল হইয়া গিয়াছে, চার্চ্চিলের "অক্ষশক্তির নরম উদর বিদারণের" পরিকল্পনা বোধ হয় তেহেরানের বৈঠকে শেষ হইয়া গিয়াছে, নহিলে সেনানায়ক ও উচ্চতম সেনাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তন হইত না।

ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ নাই বলিলেই চলে কেবলমাত্র মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনীর অভিযান এখনও প্রবল ভাবেই চলিতেছে। এই আক্রমণের পাল্টা জবাব জার্মানদল এখনও খুঁজিয়া পায় নাই দেখা যাই-তেছে এবং এই জবাবের অভাবেই জার্মানির পতনের সম্ভাবনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বলিতে কি, একমাত্র রুশ রণক্ষেত্র ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সকল ক্ষেত্রেই মিত্রপক্ষের আশা-ভরসার যাহা কিছু দেখা গিয়াছে সবকিছুই এই মিত্রপক্ষের আকাশসেনার প্রাধান্যলাভে নিহিত। জলপথে বা স্থলপথে যাহা কিছু সামান্য সাফল্যলাভ মিত্রপক্ষের ভাগ্যে ঘটিয়াছে সে সবই এই বিমানবাহিনীর প্রাধান্যের সহিত জড়িত।

মোটের উপর বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইয়োরোপে অক্ষশক্তি এখন পরাজয়ের মুখে চলিতেছে। আকাশপথে তাহার শক্তি এখন প্রতিহত, মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী এখন প্রবল আক্রমণ চালনায় সক্ষম। জলপথে সাবমেরি-

নের ধ্বংসকার্য্য আগেকার মত প্রবল নাই, জলের উপর অক্ষশক্তি রুশনৌবাহিনী ভিন্ন মিত্রপক্ষের অন্য কাহারও সম্মুখে অগ্রসর হইবার শক্তি রাখে না। স্থলে যাহা ঘটিতেছে তাহা কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপার। স্থলে এক-মাত্র ইটালীর পরাজয় ঘটিয়াছে। অক্ষশক্তির অন্য সেনাদল এখনও পরাক্রমের সহিত লড়িতেছে। এখনও তাহাদের মধ্যে নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্যের কোনও চিহ্ন দেখা যায় নাই। তবে এক্ষেত্রেও তাহারা বিপক্ষের শক্তিকে পরাস্ত করিবার সামর্থ্য দেখাইতে পারিতেছে না।

এসিয়ার যুদ্ধে মিত্রপক্ষের আক্রমণ এখনও বিশেষ সুসংবদ্ধ রূপ ধারণ করে নাই, অন্য দিকে জাপান এখনও তাহার শক্তি গঠনে ব্যস্ত, কেবল মাত্র মাঝে মাঝে স্বাধীন চীনের বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে আক্রমণ চলি-তেছে। এরূপ অবস্থায় এসিয়ার রণভূমিগুলিতে যুদ্ধের গতিমুখ নির্দ্ধারণ করা বৃথা। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যাহা চলিতেছে সে সম্বন্ধে আমেরিকার "লাইফ" পত্রিকা গত আগষ্ট মাসের শেষে মন্তব্য করে যে, "তিনটি পথে জাপানের শক্তি ধ্বংস করা যায়। প্রথমতঃ, অষ্ট্রেলিয়া হইতে জল ও স্থল পথে লাফাইয়া চলিয়া, দ্বিতীয়তঃ, ভারত-বর্ম্মা সীমান্ত ভেদ করিয়া এবং তৃতীয়তঃ এলুশিয়ান, কুরাইল, সাইবিরিয়া হইয়া, এবং এই তিন পথেই চীনের সাহায্য বিনা মিত্রশক্তি জয়লাভে সমর্থ হইবেন না।" এখনও এই তিনটি পথের কোন্‌টি দিয়া জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলিবে তাহাই স্থির হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য, এখন যে-সকল খণ্ডযুদ্ধ নানা অঞ্চলে চলিতেছে তাহা মূল উদ্দেশ্য সাধনের হিসাবে বিশেষ কার্য্যকরী নহে।

এখন শেষ নিষ্পত্তির কথা। বিগত আগষ্টে মস্কৌ হইতে যাহা প্রকাশিত হয় এবং আমেরিকার "টাইম" সংবাদপত্র মারফৎ সে বিষয়ে আমরা যাহা বুঝিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের মতে ইয়োরোপে সংযুক্তজাতিদলের অগ্রগতি মোটেই সন্তোষ-জনক নহে। এবং তাঁহারা ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রুশ-রণাঙ্গন হইতে অক্ষশক্তি ৫০।৬০ ডিভিসন সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য না হইলে সোভিয়েটের পক্ষে এই যুদ্ধের চাপ ক্রমেই দুর্ব্বহ হইতে পারে। রুশ-রণক্ষেত্রে সোভিয়েটের অগ্রগতির বেগের বিচার করিতে হইলে ইহা জানা প্রয়োজন যে এইরূপ পশ্চাদপসরণে জার্ম্মান দল এখনও সুসংবদ্ধভাবে উপযুক্ত রেল ও রাজপথ দিয়া সৈন্য ও রসদ আদি চলাচলের ব্যবস্থা রাখিতে পারিতেছে এবং তাহাদের সরবরাহ কেন্দ্র হইতে যুদ্ধক্ষেত্র নিকটতর হইয়াছে। অন্য দিকে রুশ সেনার পক্ষে সুদূর বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়া চলাচল ও সরবরাহের পথের ব্যবস্থা করা ক্রমেই দুরূহতর হইতেছে। ইহা এখন প্রকাশিত হইয়াছে যে স্টালিনগ্রাডে জার্ম্মান সেনার দুর্গতির কারণে রুশ সেনার অদম্য শৌর্য্য যতটা ছিল ঠিক ততটা বা ততোধিক ছিল উক্রাইনের মহাপঙ্ক যাহার দরুণ জার্ম্মান সেনার অস্ত্রশস্ত্র রসদ ইত্যাদির অনেকাংশ পথেই নষ্ট হয় এবং বাকী অংশ সময়মত না পৌঁছাইবার দরুণ জার্ম্মানদল ক্ষীণবল হইয়া পড়ে এবং বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বর্ত্তমানে রুশ রণক্ষেত্রে যে রীতিতে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে আক্রমণকারী অতর্কিতভাবে নির্দ্দিষ্ট অল্পপরিসর ক্ষেত্রে বহুসৈন্য এবং অস্ত্রের সমাবেশে শক্তিবৈষম্য ঘটাইয়া বিপক্ষের ব্যূহচ্ছেদ করে। ইহাতে আক্রমণকারীর ক্ষতি প্রথমে অনেক অধিক হয় কিন্তু পরে যদি আক্রমণকারী ব্যূহভেদ করিয়া পিছনে গিয়া নিজের সৈন্যদল ও অস্ত্রসমষ্টি প্রসারিত করিয়া বিপক্ষের সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ঘিরিয়া লইতে পারে তবে বিপক্ষের ক্ষতি অতি ভয়ানক হয়। অন্য দিকে যদি বিপক্ষ ছিন্নব্যূহ পিছাইয়া লইয়া অন্য স্থান হইতে দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করিয়া আক্রমণকারীর সৈন্যদল প্রসারণে বাধা দিতে পারে, তবে আক্রমণকারীর ক্ষতি প্রচণ্ড হয়, কেবলমাত্র তাহার কিছু ভূমিলাভ হয়, বিপক্ষ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় কিন্তু তাহার ক্ষতি অপেক্ষা-কৃত কমই হয়। বিগত পাঁচ মাসে রুশসেনা বহুবার জার্ম্মান ব্যূহচ্ছেদ করিয়াছে কিন্তু বিপক্ষদল প্রত্যেক বারেই দ্রুত পশ্চাৎপদ হইয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়া বিপদ ঠেকাইতে সমর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রান্ত গঠনের ফলে সৈন্য সরাইতে বাধ্য হইলে তাহারা এরূপ করিতে সমর্থ হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় প্রান্তযোজনা সম্যক্‌ভাবে না হইলে রুশ-রণক্ষেত্রে সোভিয়েটের অগ্রগতি সন্তোষজনক ভাবে হওয়া সম্ভব নহে।

দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ যে ভাবে চলিয়াছে, আমেরিকার 'লাইফ' কাগজের মতে তাহাতে জাপানের কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধ পৌঁছাইতে ১৫ বৎসর লাগিবে! ইয়োরোপেও যাহা চলিতেছে তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে সেখানেও অন্ততঃপক্ষে আরও তিন-চার বৎসর লাগিবে। ইতিমধ্যে যদি জার্ম্মান আকাশপথে নূতন যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধ আবিষ্কার করে তবে সকল কিছুই অনিশ্চিতের কোঠায় চলিয়া যাইতে পারে। জাপান এখনই দুর্দ্ধর্ষ; আরও তিন বৎসর সময় পাইলে সে জার্ম্মানী অপেক্ষাও প্রবল হইবে ইহা নিশ্চিত। সুতরাং শেষ নিষ্পত্তির সময় অদূরে একথা বলিবার সময় এখনও হয় নাই।

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, বি-লিট, পি-এইচ-ডি, সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে লিখিত ও ভারত-সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত ১৭১খানি বিভিন্ন বিষয়ক বাঙ্গালা চিঠিপত্র আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলির অধিকাংশই কুচবিহার, আসাম, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি ভারতের পূর্ব-প্রান্তবর্তী রাজ্যগুলির রাজা, রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ বা কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক ইংরেজ সরকারের নিকট লিখিত—কয়েকখানি ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন কর্মচারি কর্তৃক লিখিত পত্রের অনুবাদ (১২৯-৩০)। ইহা ছাড়া, দুই-চারিখানি বেসরকারী পত্র (১৪৫-৭), বিভিন্ন প্রকারের দরখাস্ত বা আরজিপত্র (৯৪-৫), কবুলতিপত্র (৯৭) রওয়ানাপত্র বা ছাড়পত্র (৯৮) ইহাদের মধ্যে আছে। নানা দিক দিয়া পত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান। ভারতের পূর্ব সীমান্তের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক হইতে ইহাদের মূল্য-বিচার প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় ঐ প্রদেশে তৎকালে যে মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল দীর্ঘ ভূমিকায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় সম্পাদক মহাশয় তাহারও পরিচয় দিয়াছেন ও ইহাদের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে বাঙ্গালার পুরাতন গদ্যরীতির আলোচনার জন্য এই পত্রগুলি অমূল্য উপকরণ জোগাইবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানিকে সকল রকম আলোচকের উপযোগী করিতে সম্পাদক চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। শব্দকোষ, ব্যক্তি ও স্থলের সূচী, টীকা, নির্ঘণ্ট ও ইংরেজী সার প্রভৃতির মধ্য দিয়া ইহার অধিকাংশ দুর্বোধ্য বিষয়ের যথাসম্ভব সুষ্ঠ্ মীমাংসার জন্য প্রচুর যত্ন করা হইয়াছে। কতকগুলি পত্র ও পত্রাংশের প্রতিলিপি ইহার গৌরব বর্ধিত করিয়াছে। সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নয়। তবে, ইহার বহুল প্রচার ও আলোচনা দেশের সাহিত্য ও ইতিহাসের দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয়—একরূপ অপরিহার্য।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বিশ্বের উপাদান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৪৯; মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানিতে অণু, পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ইলেকট্রন, প্রোটন,

পজিট্রন, নিউট্রন, নিউট্রিনো, উপাদানের প্রকৃতি, শক্তি, তড়িৎ এবং কস্‌মিক-রশ্মির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মোটের উপর, জগতের মূল উপাদান সম্বন্ধে পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা যে-সকল অপূর্ব্ব রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহা বৈচিত্র্যময় এবং জটিলতাপূর্ণ হইলেও এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে চারুবাবু ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া সংক্ষিপ্ত অথচ সহজবোধ্য ভাবে তাহার প্রায় সকল বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। বর্ণনাভঙ্গীর সরসতা এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের দুরূহ তথ্যগুলিকেও অতি সহজভাবে অল্পকথায় গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা চারুবাবুর লেখার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই পুস্তকখানিতেও অনেক স্থলেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি বিশেষজ্ঞদের জন্য লিখিত নহে ; জ্ঞানবিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ের সহিত সাধারণকে পরিচিত করাইবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। এই হিসাবে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালা প্রকাশের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে ইহা যে যথেষ্ট সহায়তা করিবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্রম-পরিণতি সম্পর্কে যাহাদের কিছুমাত্র কৌতূহল আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। উল্লেখযোগ্য না হইলেও যে সামান্য দোষত্রুটি রহিয়া গিয়াছে নূতন সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আত্মজ্ঞান—স্বামী অভেদানন্দ। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ইহা স্বামীজীর Self-knowledge নামক ইংরেজী পুস্তকের প্রাঞ্জল অনুবাদ। ইহার ছয়টি প্রবন্ধে আত্মা, জড়, প্রাণ, বিজ্ঞান, অমরত্ব, আত্মানুসন্ধান ও আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ক উপদেশ আছে ; ঐ সকল উপদেশে কেন, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের তত্ত্বই প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

পত্র সংকলন—স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন ; কঠোর তপস্যার জন্য প্রথম যৌবনেই তিনি "তপস্বী" আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রথম অংশে তাঁহার নিকট গুরুভাইদের লিখিত কয়খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সেইগুলি হইতে তাঁহার প্রতি গুরুভাইদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের দ্বিতীয় অংশের পত্রগুলি স্বামিজী কর্ত্তৃক শিষ্যদের নিকট লিখিত ; এইগুলি শিষ্যদের প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ ও তাহাদের কল্যাণের জন্য ব্যাকুলতার চিহ্ন। ইহার প্রতি পৃষ্ঠাতেই স্বামিজীর মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে অপর কয়েকটি সংবাদও পাওয়া যায়। ইহার প্রথমাংশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিনের যে নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায় তাহা নানা কারণে মূল্যবান।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা—অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরী, এম-এ। আর্য পাবলিশিং হাউস, ৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে সংক্ষেপে, অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, শ্রীঅরবিন্দের যোগ প্রণালী ও তাহার লক্ষ্য বিবৃত করা হইয়াছে।

আত্মসমর্পণ অরবিন্দের যোগের মূল কথা। সাধক কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব সমর্পণ করিবেন ভাগবত শক্তির হস্তে। অজ্ঞান, অহঙ্কার ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্মজীবন আলিঙ্গন করা ভগবদ্গীতার মূল মন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ যোগের লক্ষ্য ঠিক ইহাই।

এই আত্মপ্রকাশের যুগে, বৈদিক সাধনার সূত্র ধরিয়া অনন্তের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যকে ভারতীয় সাধকের বুকে ফুটাইয়া তুলিবার বিরাট্ তপস্যাই ভারতমাতা প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে আমাদের পার্থিব জীবন প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে অবিদ্যার শক্তি-পুঞ্জ দ্বারা। এখন চাই সেই সাধনা যাহাতে অবিদ্যাকে বিদ্যারূপে রূপান্তরিত করিয়া ভারতমাতা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন। ইহার জন্য আবশ্যক ভাগবতী-শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য, যাহা এই পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচিত করা হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

শান্তিসোপান—(প্রথম অংশ), ৺নন্দলাল রায়, প্রকাশক শ্রীহরিদাস রায়, সিমলা। মূল্য দেড় টাকা।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে-সমস্ত কবিতা লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশটি একত্র করিয়া আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অংশ বাহির হইয়াছে। যোগ ও তান্ত্রিক সাধনার রহস্য-প্রণালী এবং আধ্যাত্মিক কথা পদ্যে বলা হইয়াছে। কাব্য সম্পদ নাই বলিলেই চলে। তবে যাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট আদরলাভ করিতে পারে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ব্যথার পূজা—শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু। ২৩৮সি, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ক্ষুদ্র শোককাব্য। লেখক তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া



৫—০ ! শ্রীদুর্গা কটন মিলস্ স্পোর্টিং ক্লাব ৫—০ গোলে শ্রীরামপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারাইয়া এই বৎসরের জন্য "কুঞ্জবিহারী মেমোরিয়াল শীল্ড" লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে মোহামেডান স্পোর্টিং, ব্ল্যাকওয়াচ প্রভৃতি বিখ্যাত টীম এই শীল্ড লাভ করিয়াছিল। উপরের ছবিতে শীল্ডটি সহ বিজয়ী ক্লাবের সভ্যবৃন্দ, ক্লাবের সভাপতি **শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী**, মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ চৌধুরী ও কালীপদ চৌধুরী ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকগণকে দেখা যাইতেছে।

এই কবিতাগুচ্ছ রচনা করিয়াছেন। রচনায় একটি সরল স্নিগ্ধ ভক্তির ভাব মাখানো আছে। বেদনার আঘাতে হৃদয় কাতর, কিন্তু ভগবানের কাছে কবি শান্তিপ্রার্থী।

"তুমি স্পর্শ করো প্রাণ, তুমি মোরে ডাকো;
দয়া দিয়ে ক্ষমা দিয়ে তুমি মোরে ঢাকো।
বিক্ষিপ্ত বিমুখ চিত্ত বিদ্রোহী এ হিয়া
কুপথ-বিপথ-গামী, তারে কুড়াইয়া
তোমার পায়ের কাছে বাঁধ আনি' তুমি।"

এই প্রার্থনা-বাণী কবির অন্তর হইতে ধ্বনিত হইয়াছে।

দুপুরের স্বপ্ন—শ্রীবিষ্ণু ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়। সংহতি পাব্লিশিং হাউস। ৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

কবিতার বই। বোধ হয় আধুনিক কর্ম্মব্যস্ত জীবনের কাব্য বলিয়া এ স্বপ্ন দুপুরের। শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশ ভূমিকায় বলিয়াছেন: "লেখক-দের সংযম, স্থির চিন্তা, পরিষ্কার ভাব ও ভাষা অনুরূপ-বয়সী অনেক লেখকের কলমের কুয়াশা থেকে তাঁদের দূরে রেখেছে, এ আশার কথা।" আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কার কথা, 'সাম্প্রতিক নেশা'র ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। ভূমিকা-লেখকের আক্ষেপ—"গ্রন্থকারেরা তাঁদের মন্ডেলকে একটা বিশিষ্ট, আধুনিকতর সময় ও আবহাওয়ার ভিতর থেকে খালাস করে দিতে পারেন নি।" হয়তো, খালাস করিতে গিয়াই দ্বিতীয় লেখক বিভ্রান্ত হইয়াছেন। নহিলে, কয়েকটি মোলায়েম কবিতা লিখিবার পর "ধ্যেৎ ছাই একি বেঁচে থাকা?" শিরোনামা দিয়া "বিড়ি খাই, সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখি" ইত্যাদি আজে বাজে বকিবেন কেন? প্রথম কবির কবিতায় নূতন যুগের সুর আছে, কিন্তু এরূপ বিকার নাই।

সঙ্কেত—শ্রীনৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র। পূর্ব্বাশা প্রেস, ১৫৭ বি, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কবিতার বই। ভূমিকায় গ্রন্থকার 'যথার্থ কবি' শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আবাল্য সৌহৃদ্য লাভে' নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি নিজে 'যথার্থ কবি' হ'তে পারেন নি। বিকৃত আধুনিকতার কতকগুলি অর্থহীন বুলি তিনি অর্থব্যয় করে ছাপিয়েছেন, এইমাত্র। "চিরগৃধ্র আদম সন্তান" "কুৎসিত কেঙ্গারু গর্ভে ভূমিষ্ঠ", "কুক্কুরীর প্রসবাস্ত রূপ দিয়ে গড়া সংখ্যাতীত কুমারীরা", "বেবুনের মত সুসমঞ্জহীন দেহ," ইত্যাকার ভাষার অমেধ্যরাজি তিনি পাঠকবর্গের উপর নিক্ষেপ না করলেই ভালো করতেন।

আলোছায়া—প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত। সংহতি পাব্লিশিং হাউস, ৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ছোট্ট কবিতার বই। কবিতাগুলিতে কোমল মাধুর্য্য আছে। দু-একটি কবিতায় ছন্দের ও ভাষার সামান্য ত্রুটি (যেমন, শেষ কবিতায় 'কলুষিত-ময়') উপভোগে বাধা জন্মায়। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে লেখক এদিকে দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা

ভ রত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য্য

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষে স্বামী আত্মানন্দ লিখিতেছেন :—

বাংলার নিরন্ন ও মহামারী প্রপীড়িত দুঃস্থদিগকে রক্ষাকল্পে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে বর্ত্তমানে মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা বর্দ্ধমান, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, বগুড়া, রাজসাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, পাবনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় স্থায়ী ও নিয়মিতরূপে খাদ্য, কাপড়, কম্বল, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করা হইতেছে। তন্মধ্যে ১৮টি কেন্দ্র হইতে শিশু ও রোগীদিগকে দুগ্ধ, ২৮টি কেন্দ্র হইতে ঔষধ ও পথ্য, ১৫টি কেন্দ্র হইতে চাউল ও খিচুড়ি এবং ৩৯টি কেন্দ্র হইতে কাপড়, কম্বল, চাদর, জামা প্রভৃতি বিতরণ করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জেলার প্রায় ৫০টি সেবা-সমিতিকে অর্থ, বস্ত্র, কম্বল, ঔষধ, পথ্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে ও হইতেছে।



ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কলিকাতাস্থ একটি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র

এই বিরাট্ সেবাকার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থ, বস্ত্র, কম্বল, ঔষধ পথ্যাদির প্রয়োজন। সম্পাদক, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা, ঠিকানায় যে-কোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

মহিলা চিকিৎসকের কৃতিত্ব

রংপুর জেলার অন্তর্গত কুড়িগ্রাম "চৌধুরী ভিলার" মহিলা চিকিৎসক ডাঃ শ্রীমতী অণিমা চৌধুরী, এম্, ডি, এইচ, এস্ মহাশয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই বৎসর আমেরিকার হ্যানিম্যান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিকাগো মেডিকেল কলেজ অফ্ হোমিওপ্যাথি হইতে ডি-এস্‌সি, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সমগ্র বঙ্গের মহিলাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ উপাধিলাভ করিয়া ডক্টর অফ্ অনার হইলেন। ইনি বহুদিন হইতে সর্বপ্রকার জটিল নূতন ও পুরাতন শিশু ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়া আসিতেছেন। এই ভাবে নারী ও শিশু-সেবা বৃদ্ধি পাইলে দেশের মঙ্গল।

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

মেদিনীপুরের প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমাজ-সংস্কারক মণীন্দ্র-নাথ মণ্ডল মহাশয় গত ২২শে অগ্রহায়ণ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ইহাতে যোগদান করেন। জমিদারের সন্তান হইয়াও স্বদেশী কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতের স্বাধীনতালাভ তাঁহার সমগ্র জীবনের স্বপ্ন ছিল। রাজনৈতিক জীবনে তিনি দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সহকর্মী ছিলেন। সাহিত্য-সেবার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 'আরতি', 'বঙ্গীয় জনসংঘ', 'আর্য্য পৌণ্ড্রক', 'পল্লী কবি রসিকচন্দ্র'

প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং 'নব্যভারত', 'বিচিত্রা' (অধুনালুপ্ত), 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ



মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'তে তিনি তপশীলভুক্ত জাতি সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে-গুলিতে তিনি সংকীর্ণ সুবিধাবাদের প্রশ্রয় না দিয়া জাতির বৃহত্তর কল্যাণের কথাই চিন্তা করিয়াছেন। নিপীড়িত সমাজসমূহের দুঃখে তিনি গভীর বেদনাবোধ করিতেন। বঙ্গের নিপীড়িত জাতিদের লইয়া তিনি 'বঙ্গীয় জনসংঘ' নামে এক জাতীয়তাবাদী প্রগতি-মূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। সর্বোপরি ছিল তাঁহার সুন্দর চরিত্র। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই।

বাংলার দুর্গতদের সাহায্যার্থে প্রবাসী বাঙালীর উদ্যম

কানপুর হইতে শ্রীমতী বেলা সেন লিখিতেছেন,—

সুটারগঞ্জ-প্রবাসী-বাঙালী-অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺মহামায়ার পূজা-উৎসবের সময় পূজামণ্ডপে বাংলার সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'বেঙ্গল রিলিফ কাফে' নামে একটি টি-ষ্টল খোলা হয়। কাফেটির পরিচালনার ভার ছিল গবর্মেণ্ট টেক্সটাইলের ছাত্র শ্রীযুক্ত নান্নু চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর। ছাত্রদের উক্ত অনুষ্ঠানটি যথার্থই আকর্ষণীয় হইয়াছিল। ইহাতে যাহা কিছু লাভ হয় সবই বাংলার দুর্গতদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়াছে। প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী

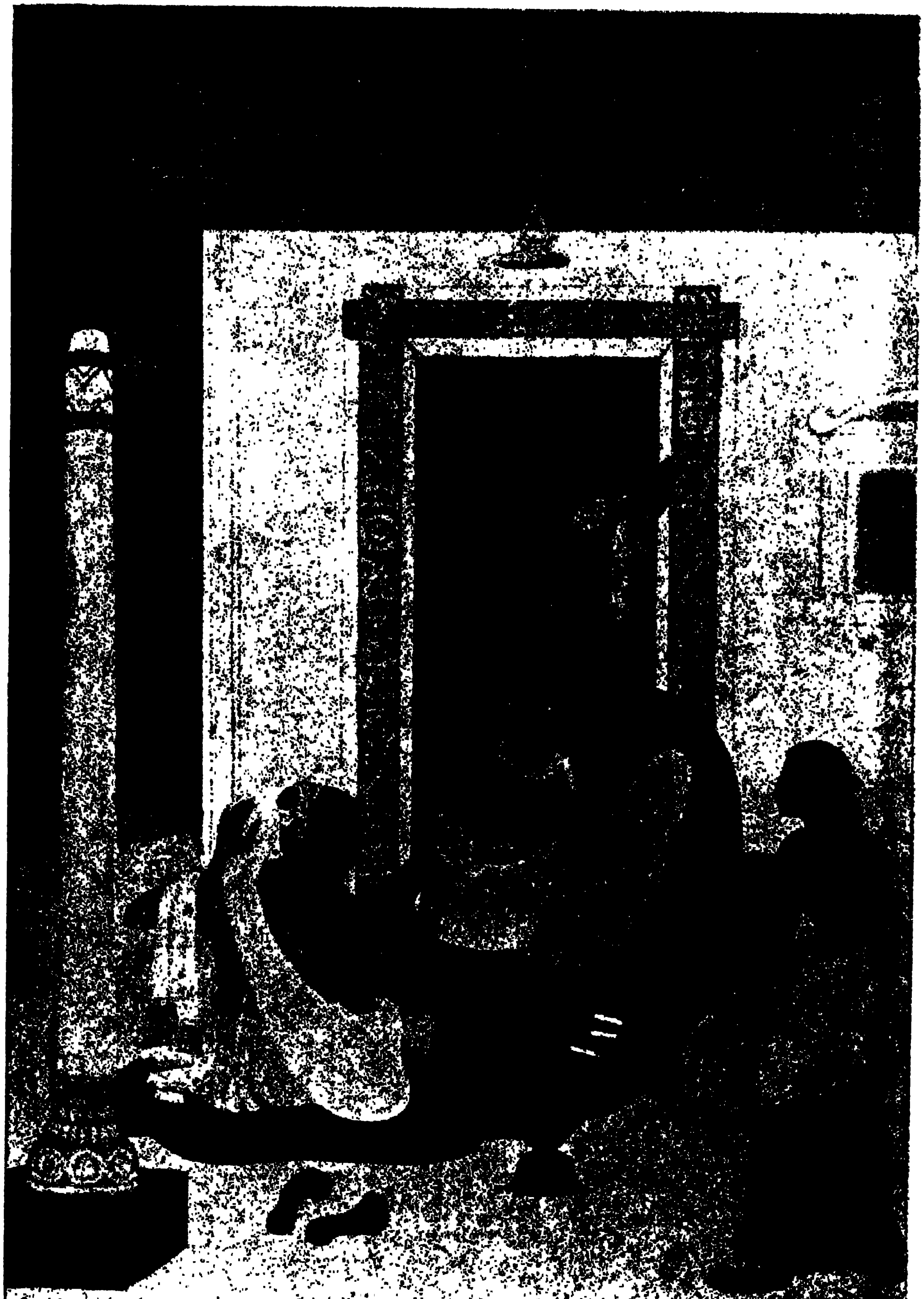
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতি। ইহার জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠির

শ্রীগৌরীশঙ্কর পাল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫০

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতে প্রজাতন্ত্রবাদ

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শিক্ষার্থীদিগের সম্মুখে "বর্তমান ভারতশাসন-নিয়মতন্ত্রে ব্যবস্থাপক-ক্ষমতা" বিষয়ে বক্তৃতায় ভারতের এডভোকেট-জেনারেল সর্ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিদেশে ব্রিটিশরাজ সম্বন্ধে প্রচার করিতেছেন যে ভারতবর্ষে ডিমক্রেসী অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র বিশেষ পরিমাণে প্রচলিত। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ দূত, সত্যের অবতার, লর্ড হ্যালিফাক্স আরও বলিয়াছেন যে এই সৌভাগ্যবান দেশে ইংরেজরাজ "আটলাণ্টিক চার্টার" নামক মানবত্বের ও স্বাধীনতাবাদের আদর্শগুলি বহুদিন হইতেই প্রচুর পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতেই ভূস্বর্গে পরিণত হইবে। সর্ ব্রজেন্দ্র কিন্তু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অন্যরূপ অবস্থাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন যে পৃথিবীর যাবতীয় যুক্তরাষ্ট্র-মূলক (ফেডারেল) শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের আদর্শের উপর অল্পস্বল্প স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী অদলবদল সহিত প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিচার করিয়া নিজ নিজ স্বায়ত্তক্ষমতার ঠিক ততটুকুই কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদে হস্তান্তরিত করে, যাহাতে সকল রাষ্ট্রের সাধারণ ইষ্টসিদ্ধি সম্ভব হয়। যথা, দেশরক্ষা, বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি, ডাক ও তার বিভাগ এবং মুদ্রানীতি সম্পর্কে সবকয়টি রাষ্ট্রের কার্যধারা একসূত্রে চলা উচিত সুতরাং সেগুলির বিধি-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা হয়।

কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ঐ প্রথানুযায়ী ক্ষমতা-বিভাগ পদ্ধতিই শাসনতন্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় ব্যবস্থা হয় বিশেষভাবে অন্যরূপ, কেননা এখানে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিয়া বসেন। যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে শাসনতন্ত্রের কার্য্যপরিচালক অংশ (এক্জিকিউটিভ), বিচার বিভাগ এবং ব্যবস্থাপক বিভাগ স্বতন্ত্র স্বাধীন থাকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু এদেশে কার্যপরিচালকেরা ব্যবস্থাপক বিভাগের উপর চাপিয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহাদের উচ্চতম অধিকারী স্বয়ং আইনকানুন গঠনের ক্ষমতাযুক্ত! তাহার পর সর্ ব্রজেন্দ্র বলেন, ১৯৩৫ সালের পূর্বেকার শাসন-নিয়মতন্ত্রে ব্যবস্থাপক বিভাগের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তাহারও কিছু খর্ব হইয়াছে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের দৌলতে! এখন কয়েক শ্রেণীর আইন-ব্যবস্থাসম্পর্কিত প্রস্তাব গবর্ণর-জেনারেলের অনুমতি বিনা ব্যবস্থাপক সভায় উঠিতেই পারে না এবং ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে আদানপ্রদান পূর্ববৎ বজায় রাখার অজুহাতে কতকগুলি বিষয়ে এবং অন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। দুর্বল ও সবলের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থায় দুর্বলের—এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ—স্বার্থহানি হইতে বাধ্য। এদেশে আইন-কানুন গঠনের ক্ষেত্রের অধিকারী ব্যবস্থাপক সভা কিছুটা, বাকি সব কিছুই গবর্ণর-জেনারেলের দখলে। পরিশেষে সর্ ব্রজেন্দ্র বলেন, এদেশের শাসন নিয়মতন্ত্রকে কোনমতেই প্রজাতন্ত্রবাদ-মূলক বলা চলে না। ধর্মসাম্প্রদায়িক নির্বাচন-অধিকার দানের ফলে এদেশের বিভিন্ন দলগুলি রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতভেদের উপর সাধারণতঃ গঠিত হয় নাই, হইয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সম্পর্কে। এই

কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিয়া যাওয়াই হয় স্বাভাবিক এবং লঘিষ্ঠ থাকে লঘিষ্ঠই, যে কারণে এখন ভারতের পাঁচটি বৃহৎ প্রদেশে ৯৩ ধারায় শাসন চলিতেছে।

এদেশের বিদেশী শাসকবর্গের একটি সুন্দর কার্যপদ্ধতি আছে। তাঁহারা এদেশের লোকের উপর মেকী চালাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজদেশের জনসাধারণের নিকট—এবং সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বিদেশেও—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, "অজস্র স্বর্ণদান করিয়া ফেলিলাম" এবং সেই মেকীর ফলে এদেশের সর্বনাশ যতই বাড়ে ততই উঠে তাঁহাদের ঘোষণার শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে। এই পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন জার্মানিতে গোয়েবেল্‌স্ জন্মাইবার শত: বর্ষাধিক পূর্বে, সুতরাং এই পন্থার সততা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে কোন সন্দেহই নাই এবং অন্যের যদি সন্দেহ জন্মে তবে তাহা খণ্ডনের জন্য কূটতর্কের এবং নজীরের কোনও অভাব হয় না, কেননা দেড় শত বৎসরের অসংখ্য অন্যায় কার্য যখন ন্যায়ে পরিণত হইয়া গিয়াছে তখন নূতন কোনও অন্যায়কে আইনসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা কঠিন হইতেই পারে না।

তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের অনেকগুলি দেশে ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে জনমত বহু অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে যাহারা পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহারাও যুদ্ধের পর দ্রুত অগ্রসর হইবে। যাহারা গণতন্ত্রবাদের বিরোধী তাহাদের ধ্বংসই যদি এই মহাযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য নাও হয় তাহা হইলেও এই যুদ্ধের পর পৃথিবীর অন্য দেশের সাম্য ও স্বাধীনতাবাদের সহিত এদেশের "ঝুটামালে"র প্রভেদ আরও বিসদৃশ দাঁড়াইবেই। যুদ্ধের গতি যেভাবে চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি পূর্ববৎ ক্ষমতাপন্ন থাকিতে চাহে তবে ভারতে এইরূপ মেকী চালাইবার প্রথা ব্রিটেনকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই উচ্ছেদ করিতে হইবে। বর্তমান যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই এবং শেষ হইবার পূর্বে ব্রিটেনকে আরও অনেক ক্ষমতা ও অশেষ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং অপরিসীম ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের সময় ভারতের সহায়তা যদি এদেশ স্বেচ্ছায় না দেয় তখন কি হইবে তাহা বিচার করা ব্রিটেনেরই স্বার্থ। এই সকল কথা বিচার করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্ষীয়সী রুগ্না শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর কণ্ঠরোধ, নেতৃবর্গের কারামোচন ইত্যাদির সম্পর্কে যে-সকল তর্কবিতর্ক হইয়াছে তাহাতে আমরা সরকারী অধিকারীবর্গের আইনজ্ঞান, কূটতর্কে পারদর্শিতা, ক্ষমতাব্যবহারে দৃঢ়তা, পাণ্ডিত্য, ইত্যাদির পরিচয় পাইয়াছি যথেষ্ট, পাই নাই কেবলমাত্র কাণ্ডজ্ঞানের কোনও নিদর্শন। —

ভারতরক্ষা বিধানের ফলে আদালতের ক্ষমতা লোপ

আগ্রার উকিল পণ্ডিত বৈজনাথ ভারত-রক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ নং ধারানুসারে আটক আছেন। তাঁহার পক্ষ হইতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে যে আবেদন করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমার মনে হয় যে ভারত-রক্ষা নিয়মাবলী আমাদের সকল ক্ষমতা হরণ করিয়াছে ও আমাদের বাস্তবিকই কোন ক্ষমতা নাই।" যুক্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য পণ্ডিত বিশ্বম্ভর দয়াল ত্রিপাঠির পক্ষ হইতে হেবিয়াস কর্পাস বিধি অনুসারে আবেদন করিলে প্রধান বিচারপতি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর দয়ালকে ভারত-রক্ষা বিধির ২৬ ধারা অনুসারে ফরক্কাবাদ জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

প্রধান বিচারপতি অতঃপর বলেন, পণ্ডিত বৈজনাথের আবেদন সম্পর্কে তিনি নিদারুণ অস্বস্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সরকার এই অস্বস্তি দূর করার ব্যবস্থা করিবেন। ঐ সময় তাঁহার আশা ছিল যে, সরকার পণ্ডিত বৈজনাথকে মুক্তি দিবেন। কিন্তু সম্প্রতি সন্ধান লইয়া তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। বিচারপতি আরও বলেন যে, ভারত-রক্ষা বিধিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া পড়িয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহার কোন এখতিয়ার নাই। ঠিকই হউক বা ভুলই হউক—তাঁহার আরও ধারণা হইয়াছে যে, গোলযোগ-সংক্রান্ত বহু মামলায় পণ্ডিত বৈজনাথ আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করাই পুলিস প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করিয়াছিল।

এফিডেভিটে বলা হইয়াছিল যে, তিনি আগ্রার উকিলদিগের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। বিচারপতি বলেন যে, আগ্রার জেলা জজ মিঃ ওয়ানচোড়ের নিকট খবর লইয়া তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, পণ্ডিত বৈজনাথ সত্যই তথাকার উকিলদিগের অন্যতম নেতা। তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন ও যে-কোন সময় তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

ভারত-রক্ষা বিধির ২৬ ধারার প্রয়োগ আইনসঙ্গত হয় নাই, ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস গয়ার এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। যে কোন সভ্য দেশে প্রধান বিচারপতির এই রায়ের পর সকল বন্দী মুক্তি পাইতেন। কিন্তু এখানে আবার এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া লর্ড লিনলিথগো ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাতিল করিয়া দেন। আদালতের এই অপমান আমেরিকা অথবা স্বয়ং ইংলণ্ড নিজের দেশের জন্য কল্পনা করিতেও পারে কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষে শাসন-বিভাগ কর্তৃক আদালতের অসম্মান নূতন নহে, আজও অব্যাহত ভাবেই যে উহা চলিয়া আসিতেছে এলাহাবাদের প্রধান বিচারপতির অসহায় উক্তি তাহারই প্রমাণ। কোন জাপ-অধিকৃত দেশে এরূপ ঘটিলে ব্রিটিশ বেতারে উহাকেই হয়ত ফাসিষ্ট বর্বরতা বলিয়া অভিহিত করা হইত।

—

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আমেরিকান শিল্পের প্রতিযোগিতা

গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড ঈষ্ট নামক পত্রিকাখানি ভারতে ব্যবসার কাজে বহুদিনের অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তির বোম্বাই হইতে প্রেরিত এক পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। পত্রে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় বাজারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করিয়া মার্কিন শিল্পকারগণ জাহাজ চলাচলের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই বাজার ব্যাপকভাবে দখলের জন্য চেষ্টা করিতেছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা ত্রুটিবিহীন করার জন্য আমেরিকা হইতে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারী পাঠান হইতেছে। এই কর্ম্মচারীরা গোটা দেশ ঘুরিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছে। এই কাজ শেষ করিতে তাহাদের চারি হইতে ছয় মাস কাল সময় লাগিবে। পত্রিকাটি জানাইতেছেন যে, তাঁহাদের এই সংবাদদাতা আমেরিকানদের কাজের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ করিতেছেন তাহা নয়, ইহার কারণ এই যে ভারতের বাজার বস্তুতঃ সকলের নিকটেই সমান ভাবে খোলা। সংবাদদাতার আসল বক্তব্য বিষয় হইতেছে এই যে, ব্রিটিশ শিল্পকারদেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং যে মুহূর্তে অনুকূল অবস্থা আসিবে সেই মুহূর্তেই যাহাতে তাঁহারাও কাজ আরম্ভ করিতে পারেন তজ্জন্য পরিকল্পনা-মত এখন হইতে ব্যবস্থা করা দরকার।

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আমেরিকান শিল্পদ্রব্যের বন্যা বহিবে, ইহা স্বাভাবিক। বিলাতী বড় বড় কোম্পানী কয়েকজন ভারতীয়কে সঙ্গে লইয়া এদেশে যেভাবে 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' কোম্পানী গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমেরিকাও যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পন্থা অনুসরণ করিতে উদ্যত হয়। বাঙ্গালোরে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদের এরোপ্লেনের কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আমেরিকার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত ক্রাইসলার কোম্পানী তাঁহাকে পার্টস এবং এঞ্জিন সরবরাহ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল। ভারত-সরকার এই কারখানাটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বিধিমতে বাধা দিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত মহীশূর-রাজের সহায়তায় স্থাপিত হইবার পর উহা দখল করিয়া লইয়াছেন। ভারতীয় ডিরেক্টর সঙ্গে না লইয়াও আমেরিকা এ দেশে বড় বড় কতকগুলি কারখানা তৈরি করিয়া লইয়াছে। বোম্বাইয়ের জেনারেল মোটর এবং কলিকাতার ফোর্ডের কারখানা ইহার উদাহরণ। অবাধ বাণিজ্যের নামে অবাধ শোষণের একান্ত পক্ষপাতী ব্রিটেন যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে রক্ষণ শুল্কের আড়ালে নিজের কারখানা এবং ব্যবসায় সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা যাহাতে করিতে পারে তাহার আয়োজন আগে হইতেই করা আছে। আমেরিকার বিরুদ্ধেও এই সব বিলাতী কারখানা রক্ষণ শুল্কের সুযোগ লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না, কিন্তু মারা পড়িবে ভারতীয় শিল্প। ভারত-শাসন আইনে যে-সব ধারা সংযোগ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহার ফলে কোন ভারতীয় শিল্পকে এ দেশে স্থাপিত বিলাতী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

বর্তমান যুদ্ধে শিল্প-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা কত সুদূরপ্রসারী তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় শিল্পপতিগণ যদি এই শিক্ষা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধ্বংসই সর্বাগ্রে হইবে।

—

সরকারী হুকুমনামার তাৎপর্য্য

রেশনিং আরম্ভ করিবার কয়েক দিন পূর্বে বাংলা-সরকার হুকুম জারি করিলেন যে, জন প্রতি ১ মণ ১৬ সের করিয়া চাউল মজুত রাখা চলিবে। যাঁহারা তখনও রেশন-কার্ড পান নাই অথবা পাইয়াও রেজেষ্ট্রী করিতে পারেন নাই এবং কবে যে পারিবেন সে ভরসাও পাইতেছিলেন না তাঁহারা উক্ত হুকুমনামা প্রকাশের পর ঊর্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করিয়া ১ মণ ১৬ সের হিসাবে চাউল সংগ্রহ করিলেন। হঠাৎ দুই-তিন দিনের মধ্যেই এমেণ্ড-

মেণ্টের নামে হুকুমনামাটি বদলাইয়া ফেলা হইল এবং প্রচার করা হইল যে কেহ ষোল সেরের বেশী চাউল সংগ্রহ করিলে তাহাকে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীদলের মুখপাত্র সিদ্দিকী সাহেবের কিছুদিন পূর্বেকার উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার উক্তিটির তাৎপর্য্য এই—সরকারী কর্মচারীরা চোরাবাজারের ব্যবসায়ীদের সহিত যোগসাজস করিয়াই কাজ করিয়া থাকেন। কথাটা তিনি হক-মন্ত্রীদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। দুই-এক ক্ষেত্রে উহা যেন হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। রেশনিং আরম্ভের প্রাক্কালে চাউলের চোরাব্যবসায়ীদের হাতে মজুত মাল নামাইবার জন্যই প্রথম আদেশটি দেওয়া হইয়াছিল এবং কার্য্যসিদ্ধির পর দ্বিতীয় আদেশ জারি করিয়া সাধু সাজা হইয়াছে—হুকুমনামার এই অর্থ যাঁহারা করিবেন তাঁহাদের দোষ দেওয়া কঠিন হইবে।

বাংলা-সরকার অন্ততঃ এইটুকু বিবেচনার পরিচয় যেন দেন, যে কাহারও গৃহে প্রথম আদেশে বর্ণিত পরিমাণ চাউল পাওয়া গেলে তাঁহাকে যেন দণ্ডিত বা হায়রানি করিবার আয়োজন না হয়।

তারপর আটার কথা। রেশনিং আরম্ভের সময় প্রথমে বলা হইল চার সেরের মধ্যে তিন সের পর্য্যন্ত আটা পাওয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল আটা বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া সাড়ে তিন সের করা হইয়াছে। নেহাৎ চক্ষুলজ্জায় বাধে বলিয়াই বোধ হয় উহা পুরাপুরি চার সের করা হয় নাই, অথচ যাঁহারা চাউল বেশী চান তাঁহাদিগকে আড়াই সেরের বেশী কোন ক্রমেই দেওয়া হইবে না। ইহার পিছনে কোন রহস্য আছে কি? মেদিনীপুরের যে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার অভিযোগ দেশের সর্বত্র উঠিয়াছিল, যাঁহার আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে হক সাহেব প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু সর্ জন হারবার্ট করিতে দেন নাই, খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হইবার পর সেই ব্যক্তিই সিভিল সাপ্লাই দপ্তরে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে-ব্যক্তি বন্যা-বিধ্বস্ত একটি মাত্র জেলার আর্তত্রাণ কার্য্যে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন সেই ব্যক্তির হাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার জন্য গম ও আটা সংগ্রহের ভার দিতে সর্ জন হারবার্ট এবং খাজা নাজিমুদ্দিন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাকে আরও প্রমোশন দিয়া আটা ক্রয়ের জন্য পঞ্জাবে পাঠান হইয়াছিল। শুনা যাইতেছে, তিনি সেখান হইতে আটা এত বেশী পাঠাইয়া দিয়াছেন যে, দুই-তিন মাসের মধ্যে ঐগুলি গবর্মেণ্টের ঘাড় হইতে না নামিলে সমস্ত পচিয়া নষ্ট হইবে। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে গবর্মেণ্টের পক্ষে খোলাখুলি ভাবে ইহা বলিয়া দিয়া জনসাধারণকে বেশী করিয়া আটা কিনিতে অনুরোধ করা উচিত।

—

কুইনাইন

কিছু দিন যাবৎ বাংলা-সরকার, ভারত-সরকার এবং আমেরী সাহেব তিন জনে মিলিয়া প্রচার করিতেছেন যে বাংলা দেশে নিয়ন্ত্রিত মূল্য ৩৮৲ টাকা দরে প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন বিক্রয় করা হইতেছে এবং ম্যালেরিয়া রোগীদের পক্ষে কুইনাইন প্রাপ্তিতে আর কোনও অসুবিধা নাই। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় দেখা গেল যে, কুইনাইন বাই-হাইড্রোক্লোর এবং সালফেট উভয়ের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ভেজাল আছে এবং প্রথমটি দুষ্প্রাপ্য। দশ গ্রেণের এক এম্পুলের দাম চোরাবাজারে আড়াই টাকা অর্থাৎ পাউণ্ড দুই হাজার টাকা। তা ছাড়া বুঝিবারও উপায় নাই উহাতে পুরা দশ গ্রেণ আছে কি না। গুঁড়াগুলির মধ্যে অর্দ্ধেক গ্লুকোসের ভেজাল এবং ইহারও দাম এত বেশী যে কেনা দুষ্কর।

কুইনাইন-চাষে গাফিলতির জন্য বাংলা-সরকার এবং ভারত-সরকার উভয়েই সমান ভাবে দায়ী। কুইনাইন উৎপাদনের জন্য ভারত-সরকার কোন দিনই উৎসাহ দেন নাই অথচ ডাচ কুইনাইন বন্ধ হইবার পর বাংলার উৎপন্ন কুইনাইন টানিয়া লইয়া সারা ভারতে বিলি করিতেছেন। ১৯৪৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বন-বিভাগের মন্ত্রী জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা দেশে মোট দশ হাজার একর জমিতে কুইনাইন চাষ হইতেছে। কুইনাইন সালফেট প্রস্তুত করিবার বর্তমান ব্যয় প্রতি পাউণ্ড ২০৲ টাকা, গত তিন বছরের হিসাব অনুসারে বাংলায় মোট কুইনাইন প্রয়োজন নব্বই হাজার পাউণ্ড এবং এখনও কুইনাইন চাষ হইতে পারে এরূপ দশ হাজার একর জমি খালি পড়িয়া রহিয়াছে।

মন্ত্রী মহাশয়ের শেষোক্ত উক্তিতে সভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং এই দশ হাজার একর জমি কেন খালি পড়িয়া রহিয়াছে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। উত্তরে তিনি বলেন যে, প্রতি বৎসর তিন শত একর জমি নূতন করিয়া চাষের আয়োজন হইতেছে। এই হিসাবে সমস্ত জমি চাষ করিতে ৩১ বৎসর লাগিবে এবং চাহিদার তুলনায় ইহা নিতান্ত কম। এই কথার উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, গবর্মেণ্ট বৎসরে চারি শত একর জমির চাষ বাড়াইবার

জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং পরিকল্পনা হইতেছে। তিনি আরও জানান যে, দশ হাজার একর জমিতে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ খালি জমিগুলিতে একসঙ্গে চাষ করা হইলে বৎসরে মোট এক লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যাইত। ডাক্তার বেণ্টলির মতে বাংলায় বৎসরে তিন লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন দরকার। সেই হিসাবে অন্ততঃ এক লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া গেলেও যে খানিকটা সুরাহা হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন সময়ের প্রশ্ন। মন্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন গাছ পুঁতিবার ৮ বৎসর পর সিঙ্কোনার ছাল হইতে কুইনাইন পাওয়া যায়—এটা মান্ধাতার আমলের প্রাচীন পদ্ধতি। সোভিয়েট রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছ পুঁতিবার এক বৎসর পরেই কুইনাইন বাহির করা হয়। যে রাশিয়াকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ইংরেজ জুজুর মত ভয় করিত সেই রাশিয়া বর্তমানে ইংরেজের মিত্র। এই সুযোগে ভারতবর্ষীয় রুশ-দূতাবাস মারফৎ কুইনাইন উৎপাদনের সোভিয়েট প্রণালীটি জানিয়া লইতে গবর্ন্মেণ্ট অনিচ্ছুক কেন?

—

গত বৎসরের আউশ ধান্যের ফসল

এদেশ ধন-ধান্যে ভরিয়া গিয়াছে, আর ভয় নাই ইত্যাদি নানা কথার প্রচার এদেশে ও বিদেশে উত্তমরূপেই চলিয়াছে। আমরাও সে-কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি, কেননা দেশের কষ্টে আমাদের সুখ বা লাভ কিছুই নাই যদিও সরকারী পক্ষের ভুয়া বাক্য-ব্যবসায়ী দলের সকলে সরকারী অকর্ম্মণ্যতার সাফাই গাহিতে গিয়া ঐরূপ মন্তব্য প্রায়ই করিয়া থাকেন। কিন্তু সরকার-পক্ষ নিজ প্রচারকার্য্যের সমর্থনের জন্য মাঝে মাঝে যে-সকল হিসাব-পত্র দাখিল করেন সে-সকল পরীক্ষা করিলে মনের সন্দেহ দূর করা সত্য সত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। ১৯৪৩ সালের আউশ ফসলের হিসাব অল্পদিন হইল সরকার-পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পরীক্ষায় নিম্নলিখিত হিসাব আমরা পাই :—

	আউশ চাষের জমির পরিমাণ একর	উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ টন	একর প্রতি উৎপন্ন চাউল মণ
১৯৪৩	৭,৯১২,১০০	৩০,১৪১,৩০০	১০·৫ (মোটামুটি)
১৯৪২	৬,৫০৭,০০০	১,৬৯৩,৫০০	৭·১ ”
বিগত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা—	৫,৮৪৬,৯০০	১,৭৫৪,৪০০	৮·২ ”
বিগত দশ বৎসরের গড়পড়তা—	৫,৭৯৮,৪০০	১,৮৯৫,৫০০	৯ ”

ইহার মধ্যে আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, সরকারী কথামত গত বৎসরের চাষের জমির পরিমাণ ১৯৪২ সালের তুলনায় বাড়িয়াছে শতকরা ২১·৬ ভাগ, কিন্তু ফসল বাড়িয়াছে একেবারে শতকরা ৮০ ভাগ! অর্থাৎ একর প্রতি উৎপন্ন ফসল বাড়িয়াছে শতকরা ৪৭·৫ ভাগ। চাউলের দর উঠিয়া আকাশে ঠেকিয়াছিল, সুতরাং চাষী প্রাণের দায়ে বা লাভের আশায় দুর্ব্বল শরীর লইয়াই, গরু-বলদ নৌকার টান সত্ত্বেও, শতকরা ২১·৬ ভাগ বেশী জমি চাষ করিয়াছিল—একথা বিশ্বাস করা চলিতেও পারে, কিন্তু ফসল কোন্ ইন্দ্রজালের ফলে হঠাৎ প্রায় দেড় গুণ ফলিল একথা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বেকার পাঁচ বৎসরের এবং দশ বৎসরের গড়পড়তা দেখিলে বুঝা যায় যে, বাংলার জমি ক্রমেই অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং ১৯৪৩ সালের আপেক্ষিক ফলন ১৯৪২ অপেক্ষা কম হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, অন্ততঃপক্ষে সমান হইলেও বুঝা যাইত, এবং সে হিসাবে ফসল দাঁড়াইত মোটামুটি ২,১৫০,০০০ টন। কিন্তু ফসলের যে-অঙ্ক আমরা ছাপার অক্ষরে দেখিতেছি তাহাতে আমাদের সন্দেহ হইতেছে যে, বাংলার জমি হঠাৎ উর্ব্বরতর হওয়ায় এই অঙ্কের অভ্যুত্থান হয় নাই, বরঞ্চ সরকারী স্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগে উর্ব্বরতর মস্তিষ্কের আমদানী হইয়াছে এবং তাহারই অত্যধিক উৎসাহের ফলে ছাপার অক্ষরে এরূপ অসম্ভব ফসল ফলিয়াছে।

—

পাটচাষীর স্বার্থ

পাট বাংলার অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি। গত যুদ্ধে দুই-এক বার পাটের দর ভাল পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু গত পঁচিশ বৎসরে পাটচাষী পাটের ন্যায্য দর পায় নাই। বর্তমান যুদ্ধে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে—যুদ্ধ অথবা স্বাভাবিক অবস্থা কোন সময়েই পাটের ন্যায্য দর পাইবার আশা বাঙালী কৃষকের নাই। বহু আন্দোলন, আবেদন-নিবেদন প্রভৃতির পর ভারত-সরকার পাটচাষ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে প্রেস-নোট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশ শাসন বর্তমান রূপে থাকিতে পাটের ন্যায্য দর প্রাপ্তির বিন্দুমাত্র আশা নাই। ১৯৪০ সালে যত জমিতে পাটচাষ হইত তাহার অর্দ্ধেক জমিতে আগামী বৎসর পাট বোনা হইবে। এই আদেশের মারাত্মক তাৎপর্য্য চাপা দিবার জন্য পাটের সর্বনিম্ন দর ১৫৲ টাকা এবং সর্বোচ্চ দর ১৭৲ টাকা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিষয়টি আলোচনার জন্য ৯ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনীত হয়।

প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন যে, ১৯৪০-এর পাটের জমির পরিমাণ চুয়ান্ন লক্ষ একর। তন্মধ্যে চার লক্ষ একর জমিতে পাট ছাড়া আর কিছু হয় না, বাকি পঞ্চাশ লক্ষ একরে ধান জন্মিতে পারে। তিনি হিসাব করিয়া দেখান যে ১৯৪৪-৪৫এ যুদ্ধের জন্য সাতাশ লক্ষ গাঁইটের বেশী পাট দরকার হইবে না। তন্মধ্যে অন্যান্য প্রদেশে ১৫ লক্ষ গাঁইট উৎপন্ন হইবে। বাংলা হইতে বার লক্ষ গাঁইটের বেশী দরকার হইবে না। এই বার লক্ষ গাঁইট অর্থাৎ ৬০ লক্ষ মণ উৎপন্ন করিতে চার লক্ষ একর জমিই যথেষ্ট। কাজেই ঐ চার লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করিয়া এই দারুণ খাদ্যাভাবের দিনে বাকি সমস্ত জমিতে ধান উৎপন্ন করা উচিত। পাটের সর্বনিম্ন দরের তাৎপর্য্য তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দেন। ১৫ টাকা নিম্নতম দর কলিকাতার জন্য, মফঃস্বলের জন্য নয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের হিসাবে চাষী বড়জোর নয় টাকা—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহার কম—পাইবে এই বিতর্কে শ্বেতাঙ্গ দলের কেহ মুখ খোলেন নাই। সিদ্দিকি সাহেব তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। সরকার-পক্ষ হইতে মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের কোন যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই, তবে আরও দুই একটি গুরুতর আশঙ্কার কথা বলিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, পূর্ব পূর্ব বৎসরের সঞ্চিত পাট যতই জমা থাকুক না কেন, গবর্ন্মেণ্ট তাহাতে পরোয়া করেন না, কারণ তাঁহারা সমস্ত পাট নিম্নতম মূল্যে কিনিয়া লইবেন। অধ্যাপক পি. সি. জৈন তাঁহার নব-প্রকাশিত একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ১৯৩৪ সালে ভারত-সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, চটকলগুলিতে যত যন্ত্রপাতি আছে তাহার এক-চতুর্থাংশের দ্বারাই চট ও থলিয়ার সমস্ত চাহিদা মিটান যাইতে পারে। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' ভারত-সরকার-প্রদত্ত এই হিসাবের তীব্র প্রতিবাদ করে। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে, শ্বেতাঙ্গ চটকলগুলি যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চট ও থলিয়া তৈরি করিতে যাহাতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না হয় সেজন্য বিরাট কারখানাগুলি পূর্ণ উদ্যমে কাজ করাইবার জন্য যত পাট দরকার এখন হইতেই তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। গবর্ন্মেণ্টও এই সঞ্চয়কে সাহায্য করিয়া চাষীকে অবাধে দোহন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন।

—

পাট ও পাটচাষের জমি নিয়ন্ত্রণ

পাট বাঙালীর ও বাংলা দেশের উপর বিধাতার অভিশাপের ন্যায় অশুভ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। বাংলার চাষী লাভের দুরাশার বশে এই চাষে স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, নিজের খাইবার ব্যবস্থায় সঙ্কোচ ঘটাইয়াছে, দুগ্ধবতী গাভী ও ভারবাহী পশুর খাদ্যের টান পড়াইয়াছে, উপরন্তু বিগত পনর বৎসর যাবৎ ভবিষ্যৎ লাভের আশায় বর্ত্তমানে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাটের দাম বাড়িবে এই আশায় চাষ করিয়া শেষে বেচিবার মুখে পাট কাটিবার খরচও পোষায় না এরূপ অবস্থাও ১৯৩৪-৩৫ সালে ঘটিয়াছিল। এদেশে পাট হইতে ক্রোড়পতি হইয়াছে বিদেশী কলওয়ালা, বিদেশী বণিক এবং তাহাদের অ-বাঙালী মধ্যস্থ—দালাল, আড়তদার ও বেপারের দল। চটকলের মজুরি করিয়াও বাঙালী বিশেষ কিছু পায় নাই; যখন বাজার গরম তখন মজুরগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক বাঙালী দিন গুজরান করার মত কিছু পাইয়াছে, বাজার নামিলে প্রথমেই তাহাদের বিদায় করা হইয়াছে। সুতরাং বাঙালী চাষী ও মজুরের পক্ষে পাটচাষ, আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া জলায় পড়িয়া মরার মতই হইয়াছে। কিছু কাল যাবৎ পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের বিষয় অনেক কথাবার্ত্তা হয় এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সাল হইতে বাংলার পাটচাষী যে দুর্দশার মধ্যে পড়িয়াছিল তাহার কিছু প্রতিকার করার জন্য ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলে, প্রথমে উপদেশ-প্রচার দ্বারা, পরে যুদ্ধের মুখে আইন-কানুনের সাহায্যে। কিন্তু এই পাট-নিয়ন্ত্রণ আইন চালাইবার ভার যাঁহাদের হাতে ছিল তাঁহারা চাষীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ততটা নজর না দিয়া পাটের ব্যবসায়ী এবং চটকলের অধিকারিবর্গের লাভের দিকেই বোধ হয় ঝোঁক দিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা করিলেন। ১৯৩৯ সালে পাটচাষ হইয়াছিল ২৫,০৪০০০ একরের উপর, ১৯৪০ সালে পাটচাষ জমির মূল মান ধরা হইল ৪৯,৩৯০০০ একর! যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল, কাজেই চাষীকে বলা হইল মনের আনন্দে পাটচাষ কর ভাই। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথম শ্রেণীর পাটের ৫ মণ ওজনের গাঁইটের দাম হইয়াছিল ১১০ টাকা—যদিও তাহাতে লাভ হইয়াছিল কলিকাতার অ-বাঙালী পাট-ব্যবসায়ীদেরই, চাষী ঐ দামের এক-তৃতীয়াংশও পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ—সুতরাং বাংলার চাষীও উৎফুল্ল মনে করিল চাষ! ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাটের গাঁইটের দাম দাঁড়াইল ১১০৲ টাকা হইতে নামিয়া ৩৮৲ টাকায়, চাষীর হইল সর্বনাশ। তাহার পর ১৯৪১ সালে ১৫,৩৩০০০ একরে চাষ নামাইয়া দাম উঠিল শেষের দিকে পঞ্চাশের কোঠায়, ১৯৪২ সালে হইল

২৭,১২,৯৪০ একর চাষ, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম আগুন হইতে আরম্ভ করায় ইতিমধ্যে পাটের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ লইয়া চলিল নানারকম খেলা। যাহা হউক, ১৯৪২ সালের শেষে পাটের দাম দাঁড়াইল সত্তরের কোঠায়, ১৯৪৩ সালে ২১,৪৬,২৫৫ একর চাষ হইল এবং পাটের দাম দাঁড়াইল বৎসরের শেষে ৭৭ টাকার কাছাকাছি। পাট-কলওয়ালার লাভের অঙ্ক কিন্তু এই সকল ব্যাপারের ভিতর দিয়া বাড়িয়াই চলিল, যথা :—

জানুয়ারী ১৯৩৯	জানুঃ ১৯৪০	ডিসেম্বর ১৯৪০	জানুঃ ১৯৪১	ডিঃ ১৯৪১	জানুঃ ১৯৪২	জানুঃ ১৯৪৩	জানুঃ ১৯৪৪
পাটের গাঁইটের দাম—(৫ মণ)							
৩৫।৶০	১০৪৲	৩৮৲	৪১৲	৫৬।০	৫৩।০	৭৩৲	৭৭৲
৯ পোর্টার চটের দাম—							
৭৸৵০	২০৸৵০	১২।৶১০	১২৸৵০	১৬৸৶০	১৮।০	১৮।০	২১।৵০

অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩৯ হইতে জানুয়ারী ১৯৪৪ সালের মধ্যে কাঁচামালের দাম কলিকাতার বাজারে বাড়িয়াছে শতকরা ২২০ ভাগ অপেক্ষা কম, কিন্তু কলের উৎপন্ন মালের দাম বাড়িয়াছে শতকরা ২৬৫ ভাগ। ইতিমধ্যে চাষীর খাওয়া-পরার খরচের মূল্য বাড়িয়াছিল, যথা : চাউলের দাম শতকরা ৬২৫ ভাগের উপর, কাপড়ের দাম শতকরা ৫০০ ভাগের উপর, ঔষধপত্রের তো কথাই নাই। কলওয়ালার পক্ষে জীবিকানির্বাহের সামগ্রীর দাম ওঠানামায় বিশেষ কিছু আসে যায় না, তাহার ধাক্কা সামলায় প্রথমতঃ চাষী এবং পরে কিছু অংশে মজুর।

চাষীর পক্ষে ধান্যের ন্যায় পাট ধরিয়া রাখা সম্ভব নহে একথা সকলেই জানে, এবং চাষী পাট বিক্রয়ও সোজা কলওয়ালার কাছে করে না ইহাও জানা কথা। মাঝে আছে ফড়িয়া-ব্যাপারী, দালাল-আড়তদার, কাঁচা গাঁইট-ওয়ালা, তারপরে কলওয়ালা বা পাকা গাঁইটওয়ালা, উপরন্তু আছেন রেল-ষ্টীমার কোম্পানী এবং তৎপূর্বে গাড়ি বা নৌকাওয়ালা। চাষী গায়ের রক্ত জল করিয়া যে-ফসল ফলায় তাহার শাঁসে উক্ত মধ্যস্থের দল সকলেই এক এক কামড় লাগাইয়া থাকেন। সুতরাং সরকার কলিকাতায় উৎকৃষ্ট মালের দর ১৭৲—১৫৲মণকরা বাঁধিলে, চাষী প্রাণের দায়ে বেচিতে বাধ্য হইয়া মফস্বলে ভালমন্দ মালে মণ প্রতি গড়ে নয় টাকাও কি করিয়া পাইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অপর্য্যাপ্ত পাট বাজারে আসিলে কলওয়ালা, পাকা গাঁইটওয়ালা পূর্ব পূর্ব বৎসরের রীতি মত হাত গুটাইয়া বসিবে, কেননা তাহাদের গুদামে যথেষ্ট মাল মজুত আছে। কলিকাতার দালাল ও ব্যবসায়ীদের লাভ বাঁধা রহিল, কেননা সরকার ঐ মাল নিম্নতম মূল্যে কিনিতে বাধ্য, কলওয়ালারা যদি না কিনিতে চাহে তবে সরকার গুদাম-ভাড়া, মালবহন ইত্যাদির খরচ কাঁধে লইয়া শেষে লোকসানে বিদেশী বণিকের কাছে মাল ছাড়িতে বাধ্য হইবেন এবং গৌরী সেন—অর্থাৎ ভারতীয় করদাতা—যে-টাকা লাগে তাহা একদিন-না-একদিন গুণিতে বাধ্য হইবেন।

চাষী একর প্রতি ১৩ মণ পাট ৯৲ মণ পাইলেও বেচিবে এবং তাহা না পাইলেও কমে বেচিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু একর প্রতি ১০॥ মণ ধান্যে সে ৯৲ মণ দর পাইলে ভাল, না পাইলেও সে খাইয়া বাঁচিবে, তাহার গরু-বাছুর খড় পাইবে এবং দেশের লোকের অন্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি, দীনতা ও হীনতার কিছু উপশম হইবে। পাট ৯৲ মণে বিক্রয় হইলেও এই আক্রার বাজারে চাষীর কিনিয়া খাওয়া যদি-বা পোষায় পরনের বেলায় টান পড়িবেই, ঔষধপত্র, মহাজনের সুদের কথা না বলাই ভাল।

—

নেপালচন্দ্র রায়

ভক্তিভাজন নেপালচন্দ্র রায় বিগত ৭ই মাঘ প্রত্যুষে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ পূর্ণ হইয়া ৭৭ চলিতেছিল। পূতচরিত্র নীরবকর্মী এই আদর্শ শিক্ষাগুরুর তিরোধানে বাংলার যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। শিক্ষকের মহান্ ব্রতে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, দীর্ঘ জীবনে মুহূর্তের জন্যও তিনি কর্তব্য-ভ্রষ্ট হন নাই। এলাহাবাদ এংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া তিনি সেখানে গিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গবিচ্ছেদ-আন্দোলনের সময় যুক্তপ্রদেশের কর্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া তথা হইতে বিতাড়িত হন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘকাল সেখানেই অতিবাহিত করেন। শিক্ষাদানের মূল আদর্শ চরিত্রগঠন, উচ্চ আদর্শে অনুপ্রেরণা দান এবং তরুণ প্রাণে দেশপ্রেমের সঞ্চার—তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং আজীবন শিক্ষাদানের এই মহৎ আদর্শ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইল তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। শিক্ষকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জনসেবার বিরাট্ ক্ষেত্রে আপনাকে তিনি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। শুধু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের রোগে শোকে নয়, স্বগ্রাম-বাসীর বিপদে নয়, দেশের যে-কোন স্থান হইতে যখনই জনসেবার আহ্বান আসিয়াছে, ৭৬ বৎসরের এই বৃদ্ধ অপটু দেহ লইয়া তখনই সেখানে ছুটিয়া গিয়াছেন। পরিণত বয়সে রোগগ্রস্ত দেহের প্রতি দৃক্-পাত মাত্র করেন নাই।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার দান সামান্য নয়। জাতীয় দল সৃষ্টিতে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হিন্দু মহাসভাতেও তিনি একনিষ্ঠ কর্ম্মী রূপে যোগদান করেন। টাউন হলের সভায় সামান্য কয়েক বৎসর পূর্বে বিরোধী দল তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লাঠির আঘাতে আহত করিয়াছিল—ইহাতেই বুঝা যায় বিরোধী দল এই বৃদ্ধকে কতখানি ভয় করিত। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ দেশবাসী প্রত্যেকের অবশ্যকর্তব্য, ইহা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন।

'প্রবাসী'র জন্মাবধি প্রবাসীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "বলিতে গেলে প্রবাসী'র আঁতুড় ঘরে উপস্থিত ছিলাম।" রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অবিচলিত ছিল। ইহাদেরই পুণ্য আদর্শে গঠিত জীবন তিনি মানব-সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেবতাকে তিনি কোন একটি স্থান বা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করেন নাই, বিশ্বমানবের পূজাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং এই সুদৃঢ় বিশ্বাস হইতে কখনও বিচলিত হন নাই। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল সেবা তাঁহার সার্থক হইত, ফলের অপেক্ষা তিনি রাখিতেন না।

এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির তিরোধানে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার পরিজন-বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়ী এম. ভট্টাচার্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ২৭শে মাঘ ছিয়াশী বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মহেশচন্দ্র বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানদের অন্যতম। ত্রিপুরা জেলার বিটঘর গ্রামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। দারিদ্র্য-নিবন্ধন কুমিল্লায় অপরের বাড়ীতে রান্না করিয়া তাঁহাকে পড়াশুনার খরচ চালাইতে হইত। অর্থাভাবে তাহার পড়াশুনা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অল্প বয়সেই জীবিকার্জনের চেষ্টায় তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে, এমনকি সুদূর ব্রহ্মদেশে পর্যান্ত, গমন করেন। অবশেষে ১২৮৮ সালে কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পান। কষ্টার্জিত অর্থ হইতে যৎসামান্য সঞ্চয় করিয়া তিনি ১২৯৬ সালে হোমিওপ্যাথি ঔষধের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেখিতে দেখিতে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়ান। সংকল্পের দৃঢ়তাই তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী করিয়াছে।

কিন্তু মহেশচন্দ্র মানুষ হিসাবে ছিলেন আরও বড়। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার অর্থে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কুমিল্লার বিখ্যাত ঈশ্বর পাঠশালা ও রামমালা ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থে এই প্রতিষ্ঠান দুইটি পরিচালিত। অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেও তাঁহার দান বিস্তর। গত দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার গ্রামের দুঃস্থ পরিবারসমূহের ভরণ-পোষণের ভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিপুল প্রাচুর্য্যের মধ্যেও সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার ন্যায় ধর্মপরায়ণ, কর্মিষ্ঠ দানবীরের পরলোকগমনে বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

—

মানকুমারী বসু

অতীতের সহিত বর্তমানের আর একটি সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। গত ৯ই পৌষ শনিবার উনআশী বৎসর বয়সে বর্ষীয়সী কবি মানকুমারী বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন মানকুমারী তাঁহাদের অন্যতম। কাব্য কুসুমাঞ্জলি, কনকাঞ্জলি, বীরকুমার বধ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ একদা কাব্যামোদী পাঠকবর্গের চিত্তে প্রভূত আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল। অল্পবয়সে বিধবা হইয়া তিনি বাণীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। পিতৃব্য মধুসূদনের আদর্শ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে। স্বামীহারা হইয়া "প্রিয় প্রসঙ্গ" নামক গদ্যকাব্যখানি যখন তিনি রচনা করেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ। ইহাই তাঁহার প্রথম পুস্তক। "বামা-বোধিনী"-সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার পত্রিকায় মানকুমারীর কাব্য ও গদ্যরচনা প্রকাশ করিয়া তরুণী কবিকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। "বামা-বোধিনী"তে প্রকাশিত তাঁহার কয়েকটি রচনা পুরস্কার-প্রাপ্ত হয়। কালে তাঁহার রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তাঁহার কবিখ্যাতি বিদ্বজ্জনসমাজে ছড়াইয়া পড়ে। একদা তিনি "বীরকুমার বধ"-রচয়িত্রী নামেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। "শুভ সাধনা" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার গদ্য-রচনার উৎকৃষ্ট পরিচয়। যশোহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে একমাত্র কন্যাকে হারাইয়া তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া পড়েন। খুলনায় কন্যা-গৃহেই তিনি বাস করিতেন। সেই গৃহেই তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে খুলনায় কবি মানকুমারী বসুর জয়ন্তী-উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়

—

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ভারত-সরকার রেলের ভাড়া শতকরা ২৫৲ বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদ সকলেই করিয়াছেন, কিন্তু ভারত-সরকার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিয়া অর্থ সংগ্রহের এই সহজ পন্থা অবলম্বনের লোভ সম্বরণ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। রেলে ভ্রমণ কমাইবার জন্য প্রচার-কার্য্য করিলেও ভারত-সরকার খুব ভাল করিয়াই জানেন যে, রেলগাড়ী ছাড়া ভারতবাসীর যাতায়াতের অন্য কোন উপায় নাই। আসা-যাওয়া লোককে করিতেই হইবে এবং রেলের ভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলেও তাহা বন্ধ করা সম্ভব হইবে না।

জনসাধারণকে দোহন করিবার একটা নূতন সাফাই তোলা হইয়াছে—ইন্‌ফ্লেশন বন্ধের চেষ্টা। সরকারী বড়-কর্ত্তারা এবং ইঁহাদের ধামাধরা একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্ প্রচার করিতেছেন যে জনসাধারণের হাতে অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছে, সোনা-রূপা এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য ইহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে ইহাদের হাত হইতে বাড়্‌তি টাকা সরাইয়া লওয়া দরকার। এই যুক্তি একেবারে অন্তঃসারশূন্য। বাংলার অর্থকরী ফসল পাটের দাম নাই। সরকারী মূল্য-নির্দ্দেশক সংখ্যায় দেখা যায় অন্যান্য প্রদেশে চীনাবাদাম, তিসি, আখ, তুলা এবং চামড়া প্রভৃতি কোন কোন অর্থকরী ফসলের দাম যুদ্ধের পূর্ব্বের মূল্যের দেড় গুণ বা দ্বিগুণ হইলেও জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়াছে চতুর্গুণ।

ইহাদের হাতে টাকা জমিতে পারে না,—জমেও নাই। ব্যাঙ্কের হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধের পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে যত টাকা জমা থাকিত, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা ৫০০ কোটি টাকা বেশী জমা আছে। ১০০ কোটি ফাঁপতি টাকার ৫০০ কোটি জমা আছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বৃহৎ ব্যাঙ্কে, যেখানে কৃষিজীবীর প্রবেশাধিকার নাই। ইন্‌ফ্লেশন বন্ধ করিবার ইচ্ছা আন্তরিক হইলে গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে এই সব হিসাবের খাতায় নজর দেওয়াই স্বাভাবিক হইত। এটা করা কঠিন, কারণ ইহাতে গবর্ন্মেণ্টের পরিচালক এবং প্রধান সমর্থকদের নিজেদের পকেটেই হাত পড়িবে। অজ্ঞ এবং মূর্খের দেশে ইন্‌ফ্লেশন বন্ধের স্তোকবাক্য শুনাইয়া নির্বিবাদে দরিদ্র জনসাধারণের উপর নূতন নূতন কর বসান চলিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ইন্‌ফ্লেশন কমানোর জন্য রেলের ভাড়া বাড়াইতে হইলে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ানো এবং বার্থ-রিজার্ভেশন ফি এক টাকার পরিবর্ত্তে যে পাঁচটি আসন জুড়িয়া তিনি শয়ন করেন তাহার যথাযথ ভাড়া আদায় করা চলিতে পারে।

ইন্‌ফ্লেশন বন্ধের দোহাই দিয়া রেলের সকল যাত্রীর ভাড়া এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধির যে মারাত্মক প্রস্তাব এবার করা হইয়াছে তাহাতে পেট্রল রেশনিঙের অন্য এক গূঢ় কারণ যেন অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট একটু দূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই কাজ করেন, সুতরাং আমাদেরও তিন-চারি বৎসর পূর্বের কথা স্মরণ করা আবশ্যক। পেট্রল রেশনিং আরম্ভ করিবার সময় বাস ও লরী প্রভৃতি জনসাধারণের যানবাহনগুলির বরাদ্দ নির্ম্মম ভাবে কমান হইয়াছিল এবং উহাদের চলাচলের সময় শুধু কলিকাতায় নহে মফঃস্বলে পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বরাবর ইহার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলা হইয়াছে, পেট্রলের অভাব। কিন্তু রুজভেল্ট বলিয়াছেন ব্রিটেনের তেলের অভাব ছিল না, ইরাণের খনি হইতে তেল তুলিয়া আবার উহা পাম্প করিয়া খনিতেই পাঠান হইয়াছে, ভারতবর্ষে চালান দেওয়া হয় নাই। ঘরের পাশে ইরাণ হইতে এ দেশে পেট্রল আনিবার উপযুক্ত তৈলবাহী জাহাজ ও লরী সংগ্রহ করা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ক্ষমতার অতীত ছিল ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। সাবমেরিণ যুদ্ধ কম হইবার পর, আমাদের চক্ষের উপর মিলিটারি তৈলবাহী লরীর বহর দেখিয়া বুঝা যায় অন্তত এখন এই কৈফিয়ৎ অনেকাংশেই অচল। তথাপি পেট্রল রেশনিং উঠে নাই, উঠিবে না, এবং উঠিতে পারে না হয়ত এই জন্যই যে তাহা হইলে রেলের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিবে।

—

বাংলায় ম্যালেরিয়া

নবেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহে কলিকাতায় ম্যালেরিয়া রোগে ৯৮৩ জনের মৃত্যু হওয়ায় ভারত-সরকারের টনক নড়িয়াছে। ভারত-সরকারের পাবলিক হেলথ কমিশনার ডাঃ কটার কলিকাতায় আসিয়া ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। ১৩ই জানুয়ারী তিনি কর্পোরেশনের এবং বাংলা-সরকারের হেলথ অফিসার এবং এঞ্জিনীয়ারগণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী লবণাক্ত জলাগুলি পরিদর্শন করেন।

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরে। গবর্ন্মেণ্ট এই দুরন্ত রোগ নিবারণের জন্য পোষ্টাপিস

মারফৎ কিছু কুইনাইন বিক্রয় ভিন্ন আর কিছু করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। কটার সাহেবের কলিকাতা পরিদর্শনের দিনই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে ঢাকা শহরে এক নবেম্বর মাসেই ৪০,৭০৪ জন নূতন ম্যালেরিয়া রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ম্যালেরিয়ায় যত লোক মরিত এখন তাহার কয় গুণ মরিতেছে সে হিসাবটি পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

সর্ উইলিয়াম উইলকক্স এবং ডাঃ বেণ্টলী বাংলায় ম্যালেরিয়া নিবারণের সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ম্যালেরিয়া নিবারণে ভারত-সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে ঐ দুইজন বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট অনুসারে তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিতেন। নূতন করিয়া অনুসন্ধান এবং স্পেশাল অফিসার নিয়োগের প্রয়োজন তাহা হইলে হইত না। অন্ততঃ ডাঃ কটার এবং মিঃ গার্ণার অপেক্ষা সর্ উইলিয়াম উইলকক্স এবং ডাঃ বেণ্টলীর অভিমতের গুরুত্ব অধিক বলিয়াই মনে হয়।

—

বাংলা-সরকারের অদৃষ্টবাদী প্রচার-সচিব

বাংলা-সরকারের প্রচার-সচিব মিঃ পুলিনবিহারী মল্লিক উলুবেড়িয়ায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমরা ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্ত রোগের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, জয়লাভ যে আমরাই করিতেছি তাহার চিহ্নও দেখা যাইতেছে। অবশ্য এখনও আমাদের অনেক কিছু করিবার আছে। নানা-বিধ ঘটনার একত্র সমাবেশে হাজার হাজার লোক মরিয়াছে, সরকারী অথবা বেসরকারী মানুষের কোন প্রতিষ্ঠানই তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিত না।" পল্লীগ্রামের নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে অদৃষ্টের উপর যে শ্রেণীর নির্ভরশীলতা দেখা যায়, বাংলার এই পাকিস্থানি মুখপাত্রের বক্তৃতা ঠিক তাহারই প্রতিধ্বনি। বাংলার দুর্ভিক্ষ মানুষের তৈরি, সময় থাকিতে সাবধান হইলে উহার প্রতিকার সম্ভব হইত, পৃথিবীর সকল দেশের নিরপেক্ষ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট নিদারুণ সাবমেরিণ-যুদ্ধের মধ্যেও আটলাণ্টিকের পরপার হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ৪ কোটি লোকের খাদ্য জোগাইয়াছে; চার্চ্চিল বা উলটন একবারও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিবার কথা বলেন নাই। অথচ বাংলায় চার-পাঁচ মাসের জন্য দুই কোটি লোকের খাবার আনিয়া দিলে এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটিতেই পারিত না। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ জানিবার সুবন্দোবস্ত থাকিলে এবং সময় থাকিতে ঘাটতি পূরণের আয়োজন করিলেই দুর্ভিক্ষ রোধ করা যায়।

—

ফসল ক্রয় সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের গবর্ণরের উক্তি

বোম্বাইয়ের গবর্ণর সর্ জন কলভিল আমেদাবাদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "কৃষক যে ফসল উৎপাদন করিয়াছে তাহার শতকরা ১০ ভাগ মাত্র গবর্ন্মেণ্ট ক্রয় করিতে চাহেন। ইহাতে কৃষকের অসুবিধা হইবার কারণ নাই, আগামী ফসল না উঠা পর্যন্ত তাহাদের হাতে যথেষ্ট খাদ্য এবং বীজ থাকিবে। এই সমস্ত ফসল গবর্ন্মেণ্ট স্বয়ং ক্রয় করিবেন, আমেদাবাদের ধনী বণিকগণকে গ্রামে গিয়া কৃষককে দোহন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না। উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করাই কৃষকদের রীতি, উদ্বৃত্ত ফসলই তাহারা গবর্ন্মেণ্টকে বিক্রয় করিবে।"

সর্ জন কলভিল স্বীকার করেন যে পূর্বে বহু ব্যবসায়ী গ্রামাঞ্চলে গিয়া বাজার দর হইতে অনেক কম দামে ফসল ক্রয় করিয়াছে এবং চড়া দরে উহা বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন, ফসল লইয়া কোন প্রকার লাভ এবার করিতে দেওয়া হইবে না। ন্যায্য এবং নগদ মূল্যে কৃষকের নিকট হইতে গবর্ন্মেণ্ট স্বয়ং এবার ফসল ক্রয় করিবেন।

বাংলার অস্থায়ী গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়া আসিবার সময় সর্ টমাস রাদারফোর্ড বলিয়াছিলেন চাউলের দর কমাইয়া তিনি ৯৲ টাকা ও ১০৲ টাকা করিবেন। ৯০৲ টাকা ও ১০০৲ টাকা দরে চাউল বিক্রয় তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের গবর্ণর অল্পদিনের মধ্যেই যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, বাংলার নূতন গবর্ণর তাহা পারিবেন কি?

—

সরকারী প্রতিশ্রুতির মূল্য

সরকারী প্রতিশ্রুতির উপর দেশবাসী আস্থা রাখিতে পারিতেছে না, বাংলার খাদ্যসচিব হইতে সুরু করিয়া বিলাতের ভারত-সচিব পর্য্যন্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই লুপ্ত আস্থা ফিরাইয়া আনা দরকার ইহাও বলিয়াছেন। প্রচলিত গবর্ন্মেণ্টের উপর লোকে আস্থা হারাইলে দেশব্যাপী অরাজকতা দেখা দেয়, ধূমায়িত অসন্তোষের বারুদে কোন একটি দল একবার চকমকির আগুন ঠুকিয়া দিলে সমগ্র গবর্ন্মেণ্ট তাসের ঘরের ন্যায় ধ্বসিয়া পড়ে—ইতিহাসের এই শিক্ষা গায়ের জোরে কিছু দিন উপেক্ষা করা চলিতে পারে, কিন্তু চিরদিন চলে না।

বাংলা-সরকারকে চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়াও যে বিশ্বাস করা চলে না, করিলে বিপদে পড়িতে হয়,

তাহার পরিচয়স্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করিলাম। এটি বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা নহে, ইহা বহু জনের অভিজ্ঞতা।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

মহাশয়,

বাংলা-সরকার সেপ্টেম্বর মাসে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইয়াছিলেন যে রেশন কার্ডের গণনা কার্য্য আরম্ভ হইবে, প্রত্যেকে যেন বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যা অপেক্ষা করেন অথবা গণনাকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ এরূপ কাহাকেও বাড়ীতে রাখিয়া যান। সারা মাস অপেক্ষা করিলাম। গণনাকারী আসিল না। পূজার ছুটিতে আমি সপরিবারে কলিকাতার বাহিরে যাই। ২রা অক্টোবর অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে যাত্রা করি এবং ১৭ই অক্টোবর প্রাতে ফিরিয়া আসি। আসিয়া শুনিলাম সারা সেপ্টেম্বর মাসে যাহা করা সম্ভব হয় নাই, ছুটির এই কয়দিনের মধ্যে তাহা সারিয়া লওয়া হইয়াছে। এ আর পি ঘাঁটিতে খোঁজ লইয়া জানিলাম, রেশনকার্ডের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। তারপর 'এনকোয়ারি' হইবে, ঐ সময় বাটীস্থ সকলকে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং কার্ড বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। নবেম্বরের শেষে পরিবারস্থ সকলে ফিরিয়া আসিলে ডিসেম্বরের প্রথমে ২০নং সাদার্ণ এভিনিউ স্থিত এ আর পি ইনফরমেশন আফিসে দরখাস্ত দাখিল করিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই উহা রেশন আফিসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল (ফরোয়ার্ডিং নম্বর ৬১০)। আমি এনকোয়ারির অপেক্ষায় রহিলাম। ডিসেম্বর গেল, জানুয়ারীর তিন সপ্তাহ গেল, কোন এনকোয়ারি আসিল না। যত বার সংবাদ লইলাম তত বারই শুনিলাম এনকোয়ারি না হইলে কার্ড দিবার উপায় নাই এবং কার্ড বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। ২০শে জানুয়ারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে "অতঃপর আর কোন কার্ড বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে না, রেশন আফিস হইতে লইতে হইবে।" আবার ছুটিলাম রেশন আফিসে। এবার 'এনকোয়ারি'র দরজায় জনৈক কর্ম্মচারী বলিয়া ফেলিলেন, "মশাই, ও সব বাণ্ডিল খোলার সময় কি আমাদের আছে? নতুন একটা দরখাস্ত দিয়ে দিন না।" আমি একা নহি, আরও অনেকেরই অবস্থা আমারই মত, ইহাও সেখানে দেখিলাম। সরকারী উপদেশ মত আমি দরখাস্ত করিয়াছি এবং সে দরখাস্ত পাঠানো হইয়াছে তাহার সঠিক সংবাদ লইয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। সে দিন সময় ছিল না। পর দিন জুম্মাবার, রেশন আফিস বন্ধ। অগত্যা শনিবার গিয়া এসিষ্টাণ্ট রেশন অফিসারের সহিত দেখা করিয়া কার্ড প্রাপ্তির উপায় জানিতে চাহিলাম। অতিশয় অভদ্র ভাবে তিনি বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন বুঝিলাম না, হাত দিয়া একটা জানালা দেখাইয়া দিলেন। সেখানে প্রায় শতাবধি লোকের ভিড়। আফিসের সময় হইয়াছে, অগত্যা সে দিনও চলিয়া আসিতে হইল। পর দিন রবিবার ২৩শে জানুয়ারী প্রায় ঘণ্টাদ্বয়েক চেষ্টার পর নূতন দরখাস্ত দাখিল করিলাম। পাঁচ দিন পর কার্ড লইতে বলা হইল। তদনুসারে ২৯শে জানুয়ারী শনিবার গেলাম। দেখিলাম ডেলিভারীর জানালা বন্ধ। জানিলাম এবার এ আর পি ওয়ার্ডেন পোষ্ট হইতে কার্ড আনিতে, হইবে। সেখানে গিয়া শুনিলাম তখনও তাঁহারা বলিতেছেন, "কার্ড বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে, আপনার কষ্ট করিতে হইবে না।" সবিনয়ে জানাইলাম, আমি কষ্ট করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, কার্ড পাইলে বাঁচি। তিন দিন প্রত্যহ ঘুরিয়া ১লা ফেব্রুয়ারী কার্ড পাইলাম। মুদীর দোকানের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কাজেই কার্ড রেজেষ্ট্রি করিতে আমার নিকটতম দোকান ৩১নং রসা রোডের হউ।৩।১ গবর্ণমেণ্ট ষ্টোরে গেলাম। কার্ড রেজেষ্ট্রির কথা বলিবামাত্র একটি কর্ম্মচারী "হবে না মশাই" বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ৩রা ফেব্রুয়ারী বেলা ২টার সময় আসিতে বলিলেন। ঐ দিন সকালে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সরকারী দোকানে কার্ড রেজেষ্ট্রি হইবে। ২টার সময়ে ঐ দোকানে গিয়া কার্ড বাহির করিবা মাত্র ম্যানেজার এবং অপর একটি কর্ম্মচারী উভয়ে উগ্রভাবে জানাইলেন রেজেষ্ট্রি হইবে না, কারণ তাঁহাদের ৩০০০ "প্রায়" পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সরকারী দোকানে রেজেষ্ট্রির কোন উর্দ্ধসংখ্যা নাই এবং আজ হইতেই উহা করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এই কথা বলিবামাত্র ইঁহারা দুই জনে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জানাইয়া দিলেন আমার কার্ড তাঁহারা রেজেষ্ট্রি করিবেন না। বুঝিলাম ইঁহারা আর বেশী লোক লইয়া খাটুনি বাড়াইতে চাহেন না। পাশের সরকারী দোকানে গিয়া দেখিলাম উহার লোহার গেট বন্ধ, সিঁড়িতে কয়েকটি লোক সদ্যপ্রাপ্ত কার্ড লইয়া বসিয়া আছে। ইহার পর দুই দিন এই দোকানটিতে রেজেষ্ট্রির জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এক দিনও দুপুর বেলা খোলা পাইলাম না। অগত্যা শনিবার ৫ই ফেব্রুয়ারী রেশনিং কণ্ট্রোলারকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া কবে এবং কোথায় আমার কার্ড রেজেষ্ট্রি করিতে পারিব জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এখনও উত্তর পাই নাই।

ইতি— শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

পত্রখানিতে কয়েকটি মূল নীতিগত প্রশ্ন আছে। এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যের একটি মূল কারণ ছিল এই যে, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্য আপিসে আসিয়া বসিতেন, সর্বসাধারণ সেখানে প্রবেশাধিকার পাইত, প্রত্যেকের বক্তব্য তাঁহারা ধৈর্য্যের সহিত শুনিতেন এবং অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। বহু প্রাচীন সিভিলিয়ান এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। পদস্থ পুরাতন কর্মচারীদের ভদ্রতা এবং বর্ত্তমান ছোট বড় কর্মচারীদের অভদ্রতা আজ প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারী কর্মচারীর অভদ্রতায়

লোকে সেই ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্রুদ্ধ হয় না, গবর্মেণ্টের উপরে রুষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া যখন তাহা পায় না তখন সমগ্র গবর্মেণ্টের উপর তাহার ঘৃণা জন্মে। পৃথিবীর কোন সভ্য গবর্মেণ্ট ইহা উপেক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—গ্রামের একটি সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট কোন অভিযোগ পত্রযোগে জানাইলে তাহার প্রতিকার পায়। কিন্তু এদেশে লোকে যখন সংবাদপত্রে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী লিখিত প্রবন্ধে পড়ে যে সরকারী দোকানের কর্মচারিগণকে ভদ্র ব্যবহার করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন গবর্মেণ্টের উপর তাহার অনাস্থাই দৃঢ়তর হয়। শুধু অভদ্রতা নয়, যে-কাজ দশ মিনিটে হয়, সেই কাজের জন্য লোককে দশ দিন ঘুরিয়া যখন তাহার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে হয় তখন সে আর যাহাই করুক গবর্মেণ্টকে আশীর্বাদ করে না ইহা নিশ্চিত। এই অবস্থা বিপ্লববাদীর কাম্য সন্দেহ নাই, কিন্তু গবর্মেণ্টের নিকট ইহা সর্বথা বর্জনীয়। প্রতিপালনের উপায় স্থির না করিয়াই প্রতিশ্রুতি বা উপদেশ দিতে গেলে গবর্মেণ্ট নিজেই নিজেকে লোকচক্ষে হেয় এবং হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিবেন।

—

কলিকাতার রেশনিং

কলিকাতায় রেশনিং আরম্ভ হইয়াছে। বহু পূর্বে যাহা করা উচিত ছিল, বিলম্বে হইলেও তাহা যে শেষ পর্য্যন্ত হইয়াছে ইহাও মন্দের ভাল। কিন্তু যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি এখনও রহিয়া গিয়াছে সেগুলি দূর করিতে না পারিলে রেশনিং সাফল্যমণ্ডিত করা কঠিন হইবে এবং কলিকাতাবাসীর পক্ষে অনাবশ্যক দুর্ভোগ ভোগাই সার হইবে। পরাধীন দেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রায় কোন ক্ষেত্রেই জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। বোম্বাই রেশনিং-এ ইহার অন্ততঃ একটি শুভ ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। কলিকাতাতেও সাফল্যলাভ অসম্ভব হইবে না, যদি কর্তৃপক্ষ ক্ষুদ্রতম ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, সহিষ্ণুতার সহিত অভিযোগ শুনিবার এবং উহা দ্রুত দূর করিবার সুবন্দোবস্ত করেন।

চাউলের নিকৃষ্টতা লইয়া বেশ কিছু দিন যাবৎ বাদানুবাদ চলিবার পর এতদিনে প্রতিকারের চেষ্টা চলিতেছে। রেশনিং কণ্ট্রোলার মিঃ হার্টলি বলিয়াছেন, অতঃপর কলিকাতার চাউল পরীক্ষা করিয়া লইবার বন্দোবস্ত বাংলা-সরকার করিয়াছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার ভার কি সেই চির পুরাতন ঘুষখোর ও ফাঁকিবাজ সরকারী কর্মচারীদের হাতেই দেওয়া হইবে? না, সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মসমিতির তত্ত্বাবধানে নূতন ও বিশ্বস্ত লোকের উপর ভার দেওয়া হইবে?

সরকারী দোকানগুলি দৈনিক মাত্র সাড়ে ছয় ঘণ্টা খোলা রাখা হইতেছে অথচ এক-একটি দোকানে তিন হাজারের অধিক ক্রেতার ভার লওয়া হইয়াছে। সাধারণ দোকানগুলিতে ক্রেতৃসংখ্যা বাড়াইতে গবর্মেণ্টের আপত্তি কেন? সরকারী দোকানগুলি অন্যান্য দোকানের ন্যায় সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা রাখায় গবর্মেণ্টের অসুবিধা কিসের?

২৯শে ডিসেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়াছিলেন যে, সারা ভারতে এবার এক কোটি টন ধান বেশী হইয়াছে এবং একমাত্র বাংলাতেই প্রায় দেড় গুণ ধান বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে সাপ্তাহিক বরাদ্দ ৪ সেরের মধ্যে ২॥ সেরের বেশী চাউল দেওয়া হয় না কেন? বাঙ্গালীকে অনভ্যস্ত আটা খাইতে বাধ্য করা হইতেছে কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় যে সময়ে চাউলের দর চার-পাঁচ টাকার বেশী থাকে না, এবার সেই সময়েই গবর্মেণ্ট প্রথমে পনর টাকা, পরে উহা আরও বাড়াইয়া ১৬।০ আনা আদায় করিতেছেন।

সরু মাঝারি ও মোটা এই তিন শ্রেণীর চাউলের তিন রকম দর বাঁধিয়া দিলেই উহা ন্যায়সঙ্গত হইত।

তারপর বরাদ্দের পরিমাণ। সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য সমান ভাবে সাপ্তাহিক ৪ সের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। মজুর ও ভৃত্যদের পক্ষে এই বরাদ্দ নিতান্ত কম। দৈনিক এক সের পাঁচ পোয়া চাউল খায় এরূপ মজুর ও ভৃত্যের সংখ্যা কলিকাতায় বহু লক্ষ আছে। বোম্বাইয়ে বরাদ্দের পরিমাণ সাপ্তাহিক পৌনে দশ সের। অনেকে একই নামে দুইটি কার্ড অথবা ভুয়া কার্ড বাহির করিয়া লইয়াছে বলিয়া গবর্মেণ্ট জানাইয়াছেন এবং এই সব লোক ধরা পড়িলে সাজা পাইবে বলিয়া শাসাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করেন নাই যে ১৬।০ আনা দরে চাউল কিনিয়া উহা জমাইয়া রাখিবার জন্য কেহ ভুয়া কার্ড লয় না, বরাদ্দের পরিমাণ দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে একান্ত অপর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিলে তবেই মানুষ তিন বৎসর জেল খাটিবার ভয় সত্ত্বেও ভুয়া বা ডবল কার্ড সংগ্রহে অগ্রসর হইতে পারে। তাহা ছাড়া, গবর্মেণ্ট নিজেই যেখানে বলিয়াছেন যে এ বৎসর বাংলায় দেড় গুণ

ফসল হইয়াছে, সেখানে চাউলের বরাদ্দ সম্বন্ধে এত কার্পণ্যই বা কেন? বাংলার বাহিরেও ত তাঁহাদেরই হিসাবে এবার অনেক বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট কার্য্যের দ্বারা নিজের উক্তি যে ভাবে খণ্ডন করিতেছেন তাহাতে এই আশঙ্কা করাই স্বাভাবিক যে, তাঁহাদের প্রকাশিত তথ্যের কোন ভিত্তি নাই, নিজেদের প্রকাশিত তথ্য তাঁহারা নিজেরাই বিশ্বাস করিতে অক্ষম; অথবা জোর করিয়া লোককে কম খাওয়াইয়া চাউল উদ্বৃত্ত আছে দেখাইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় উহা সিংহল প্রভৃতি স্থানে পাঠাইবার জন্য তাঁহারা মতলব আঁটিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এক পোয়াকে ইউনিট ধরিলে শিশুদের জন্য এক ইউনিট বয়স্ক সাধারণ লোকের দুই ইউনিট এবং মজুর ও ভৃত্যদের জন্য তিন ইউনিট বরাদ্দ করা কি চলিত না? জনপ্রতি দশ ইউনিট বরাদ্দ করিলেও এত চড়া দরে কেহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল কিনিতে আসিবে না, ইহা বুঝিবার জন্য খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না।

দেশে চাউল এবং গম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবার পর এই দুইটি দ্রব্য যথাসাধ্য কম করিয়া দেওয়ার আয়োজন হইল, কিন্তু কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, ঘি প্রভৃতি যে-সব দ্রব্য অগ্নিমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে সে-গুলি কিন্তু রেশনিঙের বাহিরেই রহিল। বাংলা-সরকারের এই কৃতিত্ব অবশ্যই লক্ষণীয়।

—

বিক্রয়-কর বৃদ্ধি

বিক্রয়-করের হার দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব ইউরোপীয় দলের হাতের পুতুল মন্ত্রীদল পাস করাইয়া লইয়াছেন। বড় বড় ইউরোপীয় আপিস এবং কারখানাগুলি প্রতিবৎসর যে লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্র ক্রয় করে তাহার উপর বিক্রয়-কর লাগে না। নাম রেজেষ্ট্রি করিয়া লইলেই হয়। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আপিস ও কারখানাগুলিও অবশ্য রেহাই পায়। ধনী আপিস ও কারখানা বিক্রয়-করের কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে বটে, কিন্তু গরীবের তাঁতের কাপড় বাদ পড়ে নাই।

গরীবের জলযোগ পুরী, কচুরি ও মিঠাইয়ের উপর বিক্রয়-কর আছে, কিন্তু গ্র্যাণ্ড হোটেল বা ফিরপোর রাজসিক ভোজ বাদ পড়িয়াছে। তারপর করের হার। পরনের ধুতিখানি কিনিতে গেলে যে হারে গরীবকে কর দিতে হইবে, লক্ষপতি ধনী পাঁচশ' টাকার ঘড়ি অথবা দশ হাজার টাকার মোটর গাড়ী কিনিতে গেলে তাঁহার নিকটও সেই হারেই কর আদায় করা হইবে। বিক্রয়-করের কবল হইতে বড়লোকেরা অনবধানতা বশতঃ বাদ পড়িয়াছেন ইহা মনে করিবার কারণ নাই, ইহা ইচ্ছাকৃত।

—

আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা?

লণ্ডন হইতে গত ১৭ই জানুয়ারী রয়টার মারফৎ নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:

নিউজ ক্রনিকলের দিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে ভাল ফসল হওয়া সত্ত্বেও বাংলার দ্বারদেশে আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইলে বাংলার রোগজীর্ণ, খাদ্যাভাবে অপরিপুষ্ট সহস্র সহস্র নর-নারীর দুঃখকষ্টের আর সীমা থাকিবে না। কিছুদিন পূর্ব্বেও লোকের মনে আশা হইয়াছিল, যে, অবস্থা বুঝি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে সে আশাও ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে। স্থানীয় দলাদলি ও কর্ম্মীদের অকর্ম্মণ্যতার ফলে বাংলা-সরকারের চাউল সংগ্রহ ও বিতরণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না; সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখার অজুহাতে এই অবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। গত বৎসরের বিপর্য্যয়ের সময় যে সমস্ত অবস্থা ঘটিয়াছিল সেইগুলিরই পুনরাবৃত্তি হইতে সুরু হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা বন্ধ, চোরাবাজারের আবির্ভাব, খাদ্যান্বেষণে শহরের দিকে অভিযান প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণই আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। সমালোচকেরা বাংলা-সরকারকে দোষ দিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, চাউল ব্যবসায়ী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ চারটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে এজেণ্ট করার ফলেই যত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। ফলে স্বাভাবিক ব্যবসার সঙ্গে এজেণ্টদের লড়াই সুরু হইয়াছে আর বাংলার অধিবাসীদের দুর্দ্দিনও দেখা দিয়াছে।

বাস্তবিক এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী বাংলা-সরকার, বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ভারত-সরকার এবং সর্ব্বোপরি ভারত-সচিবের দপ্তরখানা, কিন্তু ভারত-সচিবের দপ্তরের ধারণা যে, সমস্তই সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। বর্ত্তমান জটিল সমস্যার সমাধান করা বাংলা-সরকারের অসাধ্য। আর হিন্দু ও কংগ্রেস রাজনীতিবিদেরা জনপ্রিয় সরকার গঠনের দিকে নজর না দিয়া রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারও নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা করা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা করাই আশু কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে ভাঙিয়া দিয়া বাংলার জন্য সুদক্ষ কর্ম্মচারী নিয়োগ ও মিঃ কেসির হস্তে বাংলার সম্পূর্ণ শাসনভার অর্পণ করিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

দুর্ভিক্ষের তীব্রতা নূতন ধান উঠিবার পর প্রশমিত হইলেও বিপদের আশঙ্কা একেবারে দূর হয় নাই, বাংলা

ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। নিউজ ক্রনিকেলের মন্তব্যে স্বভাবতঃই গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং পর দিনই বাংলা-সরকার উহার প্রতিবাদে সাফাই গাহিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সম্বন্ধে নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতা যে-সব যুক্তি দিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিবার জন্য বাংলা-সরকার যে-সব কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহার একটিও বিচারসহ নহে। সরকারের প্রথম যুক্তি :

"অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল" এখনও তাহা আছে এবং তাহার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। দুর্দ্দশার যে বিশেষ প্রশমন হইয়াছে তাহার যথেষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে সাহায্য গ্রহণের জন্য যে পরিমাণ লোক আসিতেছে দুই-এক মাস পূর্ব্বের তুলনায় তাহা খুবই কম এবং প্রত্যহই এই সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। বর্ত্তমানে প্রদেশের কোন অংশ হইতেই গুরুতর খাদ্যাভাবের কোন অভিযোগ আসিতেছে না। অধিকন্তু প্রদেশের সর্ব্বত্র স্থানীয় অফিসারদের নিকট সরকারী খাদ্যদ্রব্য মজুত রহিয়াছে এবং বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল পাওয়া যাইতেছে বলিয়া কম দামে এই সকল মজুত খাদ্যশস্য খুব কমই বিক্রয় হইতেছে।

"চাউলের দাম পুনরায় বাড়িতেছে"—এই বিবরণী ঠিক নহে। প্রদেশের অধিকাংশ স্থানেই বস্তুতঃই চাউলের দাম কমিতেছে।

প্রদেশের কোন স্থান হইতেই গুরুতর খাদ্যাভাবের সংবাদ না আসিলেও চাউলের নিয়ন্ত্রিত দরই সর্ব্বত্র এত চড়া যে বহু দরিদ্রের পক্ষে এখনও চাউল ক্রয় সাধ্যের অতীত। বস্তুতঃই "চাউলের দাম কমিতেছে"এই বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। আমরা কোথায়ও এরূপ সংবাদ পাই নাই যে দাম কমিতেছে, যদিও তাহার বিপরীত সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হইতেছে না। বৎসরের প্রথমেই এই ব্যাপার ঘটিলে এবং এখন হইতেই লোকে আধপেটা সিকিপেটা খাইয়া থাকিতে আরম্ভ করিলে মৃত্যু-হার কিছুতেই কমিতে পারে না। বৎসরের শেষে গতবারের ন্যায় চাউলের দর দশ গুণ না বাড়িয়া এবার দ্বিগুণ বাড়িলেই উহা কোটি কোটি লোকের ক্রয়-ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া যাইবে। বৎসরের শেষে চাউলের দর দ্বিগুণ বাড়িবে না, বাংলা-সরকার ইহা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত আছেন কি? ১লা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন যে, ২৬টি জেলা ও মহকুমার চাউলের দর সমান আছে, ১৩টি জেলা ও মহকুমার খবর গবর্মেণ্ট দিতে পারেন নাই; কিন্তু বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ সেখানে দাম বাড়িতেছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ইহাও দেখাইয়াছেন যে, সরকারী রিপোর্টের একস্থানে ফুটনোটে বলা হইয়াছে যে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বাজারে চাউল পাওয়া যায় না।

সরকারের দ্বিতীয় যুক্তি :

সংবাদদাতা বাংলা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এই বৎসরের অত্যধিক ফসল সংগ্রহ ও বণ্টনের পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন। গবর্মেণ্ট বাজারের বাড়্তি খাদ্যশস্য ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া ঘাটতি অঞ্চলে বণ্টনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন সংবাদদাতা তাহা জানেন না বলিয়াই উক্ত বিবরণ দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় কিম্বা প্রাদেশিক সরকার কেহই বৎসরের সমস্ত ফসল সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন নাই কিম্বা তাহা করা সম্ভবও নহে। গবর্মেণ্টের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতেছে না একথা বলা সঙ্গত নহে। সরকারের পরিকল্পনার প্রধান বিষয় হইতেছে এই যে, তাঁহারা তাড়াহুড়া করিয়া বৎসরের প্রথমেই চাউল কিনিতে নামিবেন না। বাজারে যাহাতে অচল অবস্থার সৃষ্টি না হয় এবং মূল্য বৃদ্ধি না ঘটে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা ধীরে-সুস্থে চাউল কিনিবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং চলিতেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কার্য্য চলিতেছে সংবাদদাতা তাহা যে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই তাহাই উক্ত পরিকল্পনা সুন্দররূপে চলিবার একটি প্রমাণ। খাদ্যশস্য বণ্টন সম্পর্কে গবর্মেণ্টের পরিকল্পনার ইহাও একটি অঙ্গ। চল্‌তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-সমূহের হাতেই বণ্টনের ভার থাকুক, গবর্মেণ্ট কখনই এই সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করিয়া বণ্টনের সমস্ত ভার নিজেদের হাতে রাখিতে চাহেন নাই। গবর্মেণ্টের পরিকল্পনা হইতেছে এই যে, খাদ্যশস্য মজুত করিয়া পরে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানে স্থানে সরবরাহ করা। চলতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা সরকারের উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে বন্ধ করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। সংবাদদাতা "স্থানে স্থানে গোলযোগ ও অযোগ্যতা" সম্পর্কে যে ভুয়া অভিযোগ করিয়াছেন তাহা অনিষ্টকর এবং বিশ্বাসযোগ্য বিবরণের ভিত্তিতে রচিত হয় নাই।

ইহা খুব সত্য যে ফসল উঠার গোড়ার দিকে বাজারে খুব কম দামে চাউল বিক্রয় হইয়াছে। স্থানে স্থানে ৫৲ টাকা মণ দরেও চাউল বিক্রয় হইয়াছে কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে অনেকে বিশেষ প্রয়োজনে নগদ টাকা সংগ্রহ করার জন্য কম দামে চাউল বিক্রয় করিয়াছে। ইহাকে চল্‌তি বাজারের দাম বলিয়া গণ্য করা যায় না। স্বভাবতঃই এই সকল নিম্নমূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্মেণ্ট বাড়্তি অঞ্চলসমূহে ১৩৲ টাকার কাছাকাছি মণ দরে কলছাঁটা চাউল প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেছেন। ঢেঁকী ছাঁটা চাউল ইহার চেয়ে কম দরেও বিক্রয় হইতেছে।

যে-সকল জেলাতে চাউলের খুবই ঘাটতি আছে এবং গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে বিশেষ দুর্দ্দশা হইয়াছিল সেই সকল জেলায় চাউলের দাম কিছু চড়া বটে, কিন্তু তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-

গণের কাছে প্রভূত পরিমাণে সরকারী চাউল মজুত আছে এবং বাজারের চড়া দর অপেক্ষা কম দরে তাহা বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হইতেছে। বাড়্‌তি জেলাসমূহ হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া বণ্টনের যে পরিকল্পনা গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, চালান দেওয়ার ব্যবস্থার সীমা অনুযায়ী তাহা কার্য্যকরী হইবে এবং ঘাটতি অঞ্চলে যে চড়া দাম প্রচলিত আছে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাহা কমিয়া যাইবে।

বাংলা-সরকারের চাউল ক্রয় পরিকল্পনা এত সুন্দর রূপে এবং সঙ্গোপনে চলিতেছে যে কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না—এই কথা বলিয়া তাঁহারা কৃতিত্ব দাবী করিয়াছেন। কিন্তু ধান চাউল ক্রয়ের সরকারী পরিকল্পনা যে ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহাতে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা জনসাধারণের মনে আরও বদ্ধমূল হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "গত তিন মাসে বাংলা-সরকার যশোহরের কোন কোন অঞ্চলের কৃষকদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য নামমাত্র ধান অবশিষ্ট রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে জোর করিয়া দুই লক্ষ মণ ধান সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ ধান গোপালনগর হইতে বেঙ্গেরডাঙা পর্য্যন্ত কয়েকটি ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া পচিতেছে। অথচ চারিপাশের লোকে অত্যধিক মূল্যে চাউল কিনিতে না পারিয়া অনাহারে রহিয়াছে। যশোহরের কোন মিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপার টেলিগ্রামে ভারত-সরকারের খাদ্য-সচিবকে এবং বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও খাদ্য-সচিবকে জানাইয়াছেন। অনাবৃত স্থানে ধানগুলি পড়িয়া আছে, ইতিমধ্যে দুই বার সেগুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, এবারকার প্রবল বৃষ্টিতে সমস্ত ধান প্রায় নষ্ট হইয়াছে।" মিঃ সুরাবর্দী এই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছেন এবং কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিয়াছেন যে মালগাড়ীর অভাবে ধানগুলি সরাইতে পারা যায় নাই। এই কৈফিয়ৎ একেবারে অচল। মালগাড়ীর বন্দোবস্ত না করিয়াই এই সব ধান ষ্টেশনে আনিয়া ফেলা হইয়াছিল কেন? আজকাল কথায় কথায় সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া রেওয়াজ হইয়া । কোন সরকারী কর্ম্মচারীর দোষে জনসাধারণের ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইলে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বাংলা-সরকার এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে প্রস্তুত আছেন কি? ধান্য ক্রয় সুন্দরভাবে চলিতেছে বলিয়া বাংলা-সরকার যদি সত্যই বিশ্বাস করেন তাহা হইলে এই প্রকার আইন প্রণয়নে কোন বাধা থাকিতে পারে না। "স্থানে স্থানে গোলযোগ ও অযোগ্যতা" ঘটিতেছে, নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতার এই কথা অত্যুক্তি নয়, বরং ইহাতে কম করিয়াই বলা হইয়াছে।

সরকারের তৃতীয় যুক্তি :

সংবাদদাতা "সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলি শুকাইয়া মরিবে" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যতটা সম্ভব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে চলিত থাকে গবর্মেণ্ট তাহার চেষ্টা করিবেন। তবে খাদ্যশস্য যাহাতে মজুতকারীদের হাতে না যায় কিংবা উধাও না হয় কিংবা মূল্যবৃদ্ধি দমনের জন্য যতটা প্রয়োজন গবর্মেণ্ট ততটা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক গতিতে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। কিন্তু যদি কোথাও কোথাও তাহাদের গতি ব্যাহত হয়, গবর্মেণ্টের শস্য-সংগ্রহের নীতির সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। বলদের অভাবে এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ বন্ধ হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে সমর-বিভাগকে যানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। গবর্মেণ্টের নিযুক্ত চারিটি এজেণ্ট "চাউলের ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ" বলিয়া সংবাদদাতা যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক হয় নাই। এজেণ্টদের মধ্যে দুইটি এজেণ্ট মেসার্স এম, এম, ইস্পাহানি এণ্ড কোং এবং মেসার্স শাওয়ালেস এণ্ড কোং বাংলার বৃহত্তম চাউল ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত। তৃতীয় এজেণ্ট মেসার্স দৌলতরাম এণ্ড কোং এবং চতুর্থ এজেণ্ট ভাগ্যকুলের রায়েদের সম্পর্কেও এক কথা বলা চলে।

চাউলের ব্যবসায়ে শাওয়ালেসের নাম থাকিলেও ইস্পাহানী কোম্পানী সম্প্রতি বাংলা গবর্মেণ্টের দৌলতে নাম করিয়াছেন। মাড়োয়ারী ফার্ম্মটিকে বাঙালী চেনে না এবং ভাগ্যকুলের রায়েরা দেশবাসীর নিকট তেজারতি কারবারের জন্যই পরিচিত। তাঁহাদের প্রধান ব্যবসায় বন্ধকী কারবার, চাউলের ব্যবসা নহে, ইহাই এত দিন জানা ছিল।

কলিকাতার খাদ্য-সরবরাহের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের; ইহার উপর সামরিক বিভাগের ক্রয় নিয়ন্ত্রিত হইলে এবং বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানী বন্ধ থাকিলে স্বাভাবিক বাণিজ্য চলিতে দেওয়ায় আপত্তি থাকিতে পারে না। বাড়্‌তি এবং ঘাট্‌তি অঞ্চলে স্বাভাবিক মাল চলাচল করিতে দিলে সর্বত্র মূল্যের সমতা থাকিবে এবং চোরাবাজার সৃষ্টি হইতে পারিবে না। ধান ক্রয় করিয়া উহা স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা যে-গবর্মেণ্টের নাই, তাহাদের পক্ষে রিজার্ভ গঠন করিবার আশা বাতুলতা মাত্র।

সরকারের চতুর্থ যুক্তি :

কলিকাতায় পুনরায় দুঃস্থদের আগমন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পেশাদার ভিক্ষুক এবং গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক খাদ্য ও শীতবস্ত্রের সুবিধার লোভেও অনেকে আসিয়াছে। অনেকের আবার আসিবার কারণ হইতেছে বর্তমানের অপেক্ষাকৃত নিম্নমূল্যে চাউল ক্রয় করা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর। যাহা হউক অবস্থাটা কোনক্রমেই আশঙ্কাজনক নহে এবং সর্ব্বদাই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

আবার কলিকাতায় খাদ্যান্বেষী নর-নারীর আগমন ও আর্ত্তনাদ সুরু হইয়াছে। ইহারা পেশাদার ভিক্ষুক নহে। ইহারা পয়সা চায় না, খাইতে চায়। পয়সা দিতে চাহিলে অনেকেই প্রত্যাখ্যান করে। লঙ্গরখানা বন্ধ, বস্ত্র-বিক্রয় কেন্দ্রও এখানে নাই। রেশনিঙের বেড়াজালে ঘেরা কলিকাতা অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে অন্ন সংগ্রহ সহজ হওয়া উচিত ছিল, তথাপি ইহারা কলিকাতায় আসিতেছে কেন তাহার অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

—

বেরিলিতে ইস্পাহানীর এজেন্টের দণ্ড

বেরিলিতে ৩৯২৩ বস্তা চাউল কিনিয়া মেজিষ্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে মজুত রাখার অভিযোগে কলিকাতার চাউল-ব্যবসায়ী মেসার্স এম, এম, ইস্পাহানী কোম্পানীর গোমস্তা মির্জ্জা আবদুল ওয়াহেব ও তাঁহার ভৃত্য যুক্ত-প্রদেশের খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৩ ও ৫ ধারা অমান্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বেরিলির সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রথম আসামীর প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ শত টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয় আসামীর প্রতি তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। বিনানুমতিতে মজুত ৩৯২৩ বস্তা চাউল বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আসামীগণ আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বাংলার অনশনক্লিষ্টদিগকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে করুণার্দ্র হইয়া তাঁহারা ঐ চাউল কিনিয়াছিলেন।" ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ যুক্তি মানিয়া লন নাই। তিনি বলেন, "এই যুক্তিতে কেহই প্রতারিত হইবে না। মির্জ্জা আবদুল ওয়াহেবের মত ক্রেতারাই বাজার হইতে প্রচুর মাল সরাইয়া জনসাধারণের দুর্দ্দশা ঘটাইতেছে। যে স্থানে নিজেদের ইচ্ছানুসারে দর পাওয়ার সুবিধা থাকে কেবলমাত্র সেই স্থানেই তাহারা মাল বিক্রয় করে ও ঐ উপায়ে জনসাধারণকে শোষণ করিয়া থাকে। মির্জ্জা আবদুল ওয়াহেব যুক্তপ্রাদেশিক খাদ্যশস্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ মানিয়া চলা আবশ্যক বোধ করে নাই। সুতরাং তাহার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।" বাজেয়াপ্ত চাউলের মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

ইস্পাহানী কোম্পানীর কার্যের সাফাই গাহিয়া বাংলা-সরকার একবার একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যেন ইহারা বাংলা দেশকে মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। মিঃ সিদ্দিকী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ইস্পাহানী কোম্পানীর পক্ষ হইয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, চাউলের ব্যবসায়ে তাঁহাদের লাভের সমস্ত টাকা জনকল্যাণে ব্যয় করিবার জন্য গবর্ণরের হাতে অর্পণ করিবেন। এই প্রকাশ্য ঘোষণার পর প্রায় এক-বৎসর অতীত হইয়াছে, কত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং দেওয়া হইয়া থাকিলে কি ভাবে উহা ব্যয় হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ আজও প্রকাশিত হয় নাই।

—

বোম্বাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্মেলন

বোম্বাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত এম, জি, শীতলবাদ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, বিচার-বিভাগ জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি তজ্জন্য বিচার-বিভাগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। বিভিন্ন অর্ডিনান্স জারীর কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত শীতলবাদ বলেন যে, এই দেশে কোন প্রকার প্রতিনিধিমূলক গবর্ন্মেণ্ট নাই বলিয়াই শাসন-বিভাগ এরূপভাবে অর্ডিনান্স জারী করিতে সমর্থ হন। বর্ত্তমানে অধিকাংশ প্রদেশে এবং কেন্দ্রে যে-গবর্ন্মেণ্ট শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের উপর জনসাধারণ অথবা আইন-সভার কোন প্রভাব নাই। কেন্দ্রীয় আইন-সভার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত শীতলবাদ বলেন যে, ১৯৪০ সালের জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন-সভায় ১২৫টি আইন পাস হইয়াছে, কিন্তু বড়লাট এই সময়ে তাঁহার জরুরী ক্ষমতা বলে ১৩২টি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। একই স্থানে এবং একই সময় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্বন্ধে দুই কর্তৃপক্ষের অবস্থান নিয়মবিরুদ্ধ। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে এ দেশের নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকিবে না তাহাতে আশ্চর্য্যবোধ করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীযুক্ত শীতলবাদ আরও বলেন যে, যুদ্ধ বাধিবার সময় ইংলণ্ডেও সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, কিন্তু জরুরী অবস্থার নামে ইংলণ্ডের চেয়ে ভারতে অনেক বেশী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতরক্ষা আইন অনুসারে শাসন-বিভাগকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার সকল চেষ্টা ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হইবে। ভিন্ন দেশের স্বার্থ যেখানে দেশবাসীর জীবন-মরণ অপেক্ষাও অনেক বেশী প্রবল, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেখানে থাকিতে পারে না।

—

ছবির গোড়ার কথা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আজকের মানুষ নানা বিভিন্ন পথে আপনার মনের কথা প্রকাশ করে চলেছে। সে এখন কথা বলে, গল্প করে, বক্তৃতা করে, কথা কাটা-কাটি করে, বকা-বকি করে, 'বখেড়া' করে, কলহ করে। সে এখন লেখে এবং পড়ে, সে এখন গান বাঁধে এবং গান গায়,—কথার ভাষার উপর সুর জুড়ে দেয়; সঙ্গীতে আপনার মনের কথা, মনের ব্যথা ও আনন্দ—নানা সুরে, নানা ছন্দে, নানা তালে-লয়ে প্রকাশ করে। মানুষ যে শুধু কালির আঁচড় দিয়ে লেখার খাতা ভর্ত্তি করতে পারে তা নয়,—নানা রকমের, নানা ছাঁদের রূপ ও আকৃতি চোখ দিয়ে দেখে, আর তুলীর আঁচড় দিয়ে, নানা রঙ্ দিয়ে,—নানা আকৃতি এবং রূপ—যেমন মানুষ, পশু-পাখী, ফুল-ফল, গাছ-পাতা, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী,—নানা সুন্দর রূপের আভাস, রেখার ভাষায় ফুটিয়ে তোলে,—যা দেখে' আমাদের চোখ জুড়োয়,—আমাদের মন কখনও আনন্দে নেচে ওঠে, কখনও দুঃখে চোখের জল ফেলে, এবং—ঐ তুলীর আঁচড়ে লেখা ছবির ভাষার মধ্য দিয়ে,—যে ছবি 'লিখেছে' সেই চিত্র-কারের অনেক মনের কথা, অনেক হর্ষ-বিষাদের ইতিহাস আমরা পড়ে' নিতে পারি—এবং সেই সব পটে লেখা কথার বিচার করে'—যে, ছবি লিখেছে সেই ছবির কারিগরকে, সেই 'পট-কার'কে বাহবা দি, বা নিন্দা করি, পুরস্কার দি, কিম্বা তিরস্কার করি।

মানুষের মনের কথা বলবার আর একটি ভাষা দেখতে পাচ্ছি—সেটা হ'ল অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাষা,—নিস্তব্ধের ভাষা। মাথা নেড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে ও ঘুরিয়ে, নানা ইঙ্গিত ও ইসারা দিয়ে—আমরা অনেক কথা বলতে পারি। এই অঙ্গভঙ্গীর ভাষা,—সুর, তাল ও ছন্দে জুড়ে দিয়ে, নট-নটী ও নর্ত্তকীরা নাচের চলন্ত ভাষায় আমাদের আনন্দ দেয়—আমাদের চেতন করে তোলে, নাচিয়ে তোলে, কখনও কখনও ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়, ভগবানের আরাধনার দিকে পথ দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু, আজ এই যে যিশু খ্রীষ্টের তিরোধানের ১৯৪৩ বৎসর পরে,—মানুষ যে এই নানা পথে, নানা রকমের ভাষায় আপনাকে প্রকাশ করতে শিখেছে—এই যে কথা-বার্ত্তা চালাচ্ছে—এই যে বোঝা-পড়ার নানা পথ শিখে নিয়েছে—এই সব স্বতন্ত্র পথ, স্বতন্ত্র ভাষা, একসঙ্গে দখল করতে পারে নি মানুষ। এক একটি ভাষা শিখে নিতে মানুষের হাজার-হাজার বছর লেগেছে। আর সকলের চেয়ে পুরোনো ভাষা হ'ল অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাষা—আর রঙ্ তুলী দিয়ে ছবি আঁকবার ভাষা,—রূপ লেখবার ভাষা। এই দুই ভাষা শেখবার অনেক হাজার বৎসর পরে—মানুষ কথা বলতে শিখেছে—কথা বলবার উপযুক্ত শব্দ আবিষ্কার করেছে। এই কথা বলতে শেখ্‌বার আগের যুগে, তার দুটি মাত্র ভাষা ছিল—অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাষা, আর ছবি লেখ্‌বার ভাষা। সেই যুগ হ'ল খৃষ্টের জন্মাবার বিশ হাজার বছর আগেকার যুগ। তখন না ছিল কথা, না ছিল গান, না ছিল কোনও লেখাপড়ার ভাষা। তখন মানুষের মুখে ভাষা ফোটে নি—তখন কথা চলত ঘাড় নেড়ে, আর হাত ঘুরিয়ে। তখন মানুষ কেবল শুনছে, প্রকৃতি-দেবীর কোলে বসে—নানা পশু পক্ষীর ডাক, বুলি আর সুমধুর সঙ্গীত, নানা গাছ-পাতার মর্ম্মর-ধ্বনি—চুপি-চুপি 'ফিস্-ফিস' কথা, নানা নদ-নদীর আর নির্ঝরণীর ছুটে চলার কলতান—জলের তরঙ্গের নাচের সুললিত সঙ্গীত। তখন মানুষ কেবল দেখছে—স্বভাবের নানা রূপ, নানা ছাঁদ, নানা রঙ, নানা রূপ-রেখার আঁকা-বাঁকা ছন্দ,—গাছের ডালের উপর সবুজ রঙে আঁকা পাতার পর পাতার সারি, নিস্তব্ধ পাহাড়ের গায়ে-গায়ে চলন্ত সীমা-রেখার নানা রকমের চলাচলির ছাঁদে গাঁথা সোজা ও বাঁকা রেখার নানা তরঙ্গ—যেগুলি কোথাও বা রোদে ফুটে উঠেছে, কোথাও বা কুয়াশায়, কোথাও বা গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেছে—চোখ যার নাগাল পেতে হায়রান হয়ে যায়। তখন মানুষ কেবল দেখ্‌ছে ঘাসের মাঠে চরছে যে-সব হরিণ,—যাদের ঘাড় পীঠ নুয়ে গেছে ধনুকের মত বাঁকা রেখায়,—কেননা তার মুখ লেগে রয়েছে মাটিতে, যেখানে তারা চোখ বুজে মনের সুখে ঘাস চিবুচ্ছে। আর তার ঘাস চিবোনর ভঙ্গীতে নড়ে উঠছে, কেঁপে উঠছে, দুলে উঠছে, তার মাথার দুটো শিং—গাছের ডালের মত নানা শাখায় বিভক্ত, থাকে থাকে সাজান—রূপ-রেখার

অপরূপ ছন্দ। হরিণ যখন ঘাস খায় তখন সে নিশ্চল—পটে-আঁকা ছবিটির মত—দূর থেকে বোঝা যায় না—জীবন্ত জীব, না কোনও গাছের ডাল—না আর কিছু। কিন্তু ঘাস চিবুতে গেলে মাথা নড়ে—আর রেখার সারি নিয়ে দুলে দুলে উঠে মাথার শিং। তখন শিকারী দূর থেকে বুঝতে পারে যে, সেটি প্রকৃতির পটে লেখা কোনও রূপের মরীচিকা নয়—শিকারীর শিকারের বস্তু—রক্ত-মাংসে গাঁথা—তার আহারের সামগ্রী, তার ক্ষুধা নিবারণের অতি প্রয়োজনের ঔষধ। শিকারী তখন ঐ ঘাসের মাঠে চরছে যে-সব হরিণ তাদের লক্ষ্য করে', তার পাথরের সেই সেকেলে অস্ত্র ছুড়ে মারে, তখন তার হাতে আর কোনও অস্ত্র নেই—নেই কোনও তীর, নেই কোনও বল্লম, নেই কোনও বন্দুক—কারণ, সেটা লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কারের বহু আগেকার যুগ সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের কথা। যাই হোক্, শিকারীর হাতের সেই পাথরের বাণ ছুটে গেল সেই হরিণ মারতে—কিন্তু হরিণ এক লাফে বিশ হাত লাফিয়ে পড়ে' আপনার প্রাণ বাঁচালে,—ছুটে পালাল শিকারীর পাথরের অস্ত্রের নাগালের বাহিরে। শিকারী হতাশের দুঃখে, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে, কপালে চোখ তুলে, ব্যগ্র হয়ে দেখে নিলে—হরিণের সেই পেটের ভেতর থেকে বার করা', পা-ছুটোনোর শীঘ্র-গতি—সেই সোজা লাইনের আঁক কেটে আকাশ-মার্গে—এক নূতন ভঙ্গীতে পালানোর ছবি। সেই ছবি তার চোখে, তার মনে, তার হৃদয়-পটে গভীর রেখায় আঁকা হয়ে রইল। কিন্তু শিকারীর পেটে ক্ষুধা, আর হাতে হরিণ-শিকারের পাথরের ছুঁচালো অস্ত্র, আর তার মনে লক্ষ্য-ভ্রষ্টের দুঃখ আর অভিমান। সে আর এক ঘাস-খেগো হরিণকে লক্ষ্য করে আবার ছুড়ে মারলে তার সেই সেকেলে পাথরের তীর। এবার-ও সে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হ'ল। আকাশের চিত্র-পটে, আর তার অন্তরের চিত্র-পটে আবার ফুটে উঠল—সেই সোজা লাইন-কাটা হরিণের লাফ ও পালানোর সুন্দর লীলা-চিত্র। এই রকম বার বার পরাস্ত হয়ে, সে কেবলই দেখতে পেলে—সেই এক-একটি হরিণের ছুটে পালানোর চমৎকার চঞ্চল-চিত্র—সোজা লাইনে আঁকা, অদ্ভুত গতিলীলার আশ্চর্য্য চলৎ-চিত্র।

শিকারী ফিরে এল, সন্ধ্যার অন্ধকারে—তার পাহাড়ের গুহার আবাসে,—যেখানে অপেক্ষা করে' বসেছিল তার স্ত্রী, তার ছেলে-মেয়ে, তার বুড়ো বাপ-মা,—অন্ধকার গুহায় পাতার আলো জেলে, শিকারীর হরিণ-মাংস নিয়ে ফিরে আসবার আশায়। শিকারী শুধু-হাতের উপর, তার খালি পীঠের উপর এসে পড়ল—নিরাশার ভর্ৎসনা, তিরস্কারের তর্জ্জনী-আস্ফালন,—রাগের হাত-নাড়া মুখ-নাড়া—অপমানের অস্ফুট-ধ্বনি; নানা কণ্ঠ থেকে ফুটে উঠল প্রতিবাদের অস্ফুট-ভাষার কোলাহল;—শিকারীকে করে দিলে মন-মরা। শিকারী গুহার এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে রইল—দেওয়ালের দিকে মুখ করে, আর তার পরিবারগণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, তার নিষ্ফল শিকারের অবসাদ নিয়ে, তার নিরাশার দুঃখ নিয়ে, তার মনের অন্ধকার নিয়ে। সেই অন্ধকার ভেদ করে' তার মানস-পটে কেবলই ভেসে উঠতে লাগল—সেই পেটের ভিতর থেকে পা-বার-করা হরিণদের প্রাণ-বাঁচানো লাফ আর ছুটে চলার আশ্চর্য্য চলৎ-চিত্র,—সেই উদ্দাম-লীলা; যাহা শিকারীর হাতে ছোড়া ভোঁতা পাথরের তীরকে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ করেছে—আর আকাশপটে আশ্চর্য্য গতি-ভঙ্গীর অপরূপ ছবি লিখে দিয়েছে—যে ছবিটি শিকারীর সুতীক্ষ্ণ চোখের মধ্য দিয়ে তার মনের ক্যামেরায় ছক্ কেটে মুদ্রিত হয়ে গেছে।

তখন শিকারীর মনে এক নতুন ফন্দী জেগে উঠল। সে ভাবলে যদি এই লাফ-মারা হরিণের ছবি তার গুহার দেওয়ালে কোনও রকমে আটুকে রাখতে পারে তাহলে সেই ছবির 'মন্ত্রে'—সেই নকলের 'যন্ত্রে' ও 'যাদুতে' আসলটাকে ধরে আনতে পারবে সে কাল সকালে, ঐ গুহার ভিতরে। এই 'যাদু' বানাবার নেশায় শিকারীর ছবি আঁকবার কৌশল ফুটে উঠল। তখনও তার দিনের প্রখর আলোতে দেখা, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে চিত্ত-গত করা, সেই লাফ-মারা হরিণের ছবি, তার চিত্তের ফলকে, তার মানস-পটে স্পষ্ট ফুটে রয়েছে—সুতরাং ঐ শিকারী চিত্র-শিল্পী—সেই চোখে-দেখা ছবির স্মৃতি অবলম্বন করে' ঐ সামনের পোড়া কাঠের কয়লার লেখনীর সাহায্যে ক্ষিপ্র হস্তে, অনায়াসে, লিখে ফেললে গুহার দেওয়ালে, তাহার মানস-পটে মুদ্রিত—ঐ লম্ফমান হরিণের পলায়নের প্রাকৃতিক চিত্র। মানুষের চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে জন্ম নিলে আদিম কালের এই প্রথম চাক্ষুষ-চিত্র,—যে চিত্রটি প্রথম লিখেছিল—ঐ আদিম কালের কুশলী কলা-শিল্পী,—যার রূপ গ্রহণের দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, যার রূপের স্মরণশক্তি ছিল প্রখর, যার ছবি আঁকবার হাত ছিল শক্তিমান। কারণ, সেই ইতিহাসের নাগালের অনেক হাজার বছর আগের মানুষের সমস্ত শক্তিই ছিল অটুট, ছিল সু-তীক্ষ্ণ, ছিল পর্য্যাপ্ত, ছিল অপরিসীম। কেবল ছিল না তার

হাতে বিজ্ঞানের বিদ্যায় গড়া তুলীপালখের সূক্ষ্ম লেখনী, কিম্বা রঙ্ তৈয়ারী করার পরিণত রসায়নের বিদ্যা। কিন্তু, সেই পোড়া কাঠের মোটা লেখনী দিয়ে সেই আদিম যুগের প্রথম চিত্রকর, যে 'হরিণের চিত্র' বিশ হাজার বছর আগে লিখে গেছে—তার গুহার দেওয়ালে, তার আশ্চর্য্য রূপ-রেখা, তার শক্তিমান রেখা-ভঙ্গী, তার লাইনের দৌড়, তার গতি-লীলার হুবহু চমৎ-কার চলৎ-চিত্র আজও মুগ্ধ করে-রেখেছে আমাদের এই সভ্যতার যুগের সমস্ত কলা-কুশলী রসবিদ্‌গণের আকর্ণ-বিস্তৃত, ও বিস্ফারিত রূপ- ও রস-দৃষ্টি।

তার পর, যুগের পর যুগ, হাজার হাজার বছর চলে গেছে, যে-সব যুগের কোলে কোলে জেগে উঠেছে, নানা শক্তি নিয়ে, নানা সূক্ষ্ম-দৃষ্টি নিয়ে, নানা বিজ্ঞান, নানা তুলী কলমের, নানা সাধন, নানা অস্ত্র নিয়ে, নানা ওস্তাদী নিয়ে, নানা দেশের নানা কুশলী পশু-শিল্পী,—যাঁরা যাবজ্জীবন ধরে' পশুর চিত্রলেখা 'পেশায়' পরিণত করেছেন, এবং যাদের পশু-চিত্র সভ্য জগতের নানা চিত্র-শালার বড় বড় ভিত্তি-প্রসারের অনেকখানি জায়গা দখল করে রয়েছে—ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডসীয়র, ফ্রান্সের রোজা বহুার, জাপানের সোসেন, মোগলাই ভারতের মনসুর।

কিন্তু এই বিশ হাজার বছর আগে চিত্রিত, এই বর্ব্বর-শিল্পের প্রথম অধ্যায়ের আগে লেখা,—ঐ আদিম যুগের আদিম চিত্রকরের মোটা লেখনীতে লেখা—সেই হরিণের লাফ দিয়ে ছুটে চলার চিত্র—চিত্র-শিল্পের ইতিহাসের প্রথম আলেখ্য-পট পরের যুগের পৃথিবীর সমস্ত পশু-চিত্রের সমস্ত পটকে পরাস্ত করে' বয়স ও গুণের দাবিতে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে।

এই জাতীয় পশু-চিত্রের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় ফরাসী দেশের "হোং গারোণ্" জেলায় একটি পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে। পাহাড়টির নাম "ওরিনাক্" (Aurignac)। তাই থেকে এই যুগের সভ্যতা ও শিল্প-কলার নাম হয়েছে—"ওরিনাকীয়" বা "ওরিনাসীয়" (Aurignacian) এই যুগ হ'ল, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের প্রথম-পাদ—আজ থেকে আন্দাজ বিশ হাজার থেকে দশ হাজার বৎসর আগেকার সময়।

ভাববার কথা এই যে তখন মানুষের কথা বলবার, কোনও ভাব প্রকাশ করবার আর কোনও ভাষা ছিল না। এই ছবির ভাষা, এই রঙ্-রেখার ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষার সৃষ্টি হয় নি। কথা বলবার জন্য বুক ফাটছে, কিন্তু মুখ ফুটছে না। এই কারণে, শ্রবণ-পথের বস্তু ও বিষয়গুলো, চাক্ষুষ পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই যুগে মানুষ যা-কিছু শুনছে, সমস্ত চাক্ষুষ ছবির লেখাতে পরিণত করছে, প্রকাশ করছে। সেই প্রাচীন ইতিহাসের নাগালের বাহিরের যুগে, মানুষের কান প্রকৃতি-দেবীর কোলে বসে নানা মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনছে—নদ-নদীর উত্থান-পতনের তরঙ্গের কলতান, ঝরণার কুলু-কুলু ধ্বনি, গাছের ডালের উপর পাখীদের ঐকতান। কিন্তু, স্বরের পথে, সুরের পথে, গলার ভাষার পথে তার প্রকাশের উপায় নাই।

এই সব সঙ্গীতের লহর, সুরের ঐকতান, চোখের পথে ছবির অক্ষরে প্রকাশ হচ্ছিল, অপরূপ রেখায় রূপ পাচ্ছিল—আদিম যুগের বর্ব্বর মানুষের নানা চিত্রাবলীতে, গুহার দেওয়ালে, শিকার-করা হরিণের হাড়ের উপরে লেখা খাঁজকাটা নক্সায়, নিত্য ব্যবহারের মাটির ভাঁড়-খুরির উপরে লেখা নানা মাঙ্গলিক চিত্রে, পূজা-স্থানের যাদু-বিদ্যার অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত নানা সাঙ্কেতিক ও মাঙ্গলিক "স্বস্তিকে"র আলপনায়।

এইরূপে কানে শোনা বস্তুগুলোও চোখের পথে চাক্ষুষ আলপনায় আত্মপ্রকাশ করছিল। কারণ, তখন কথার ভাষার অভাবে, কানের পথে পাওয়া জিনিস-গুলোর, চোখের পথে হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তাই, 'নয়ন হলো শ্রবণ তখন'। একজন পারস্য দেশের কবি কথাটা বেশ সরস ভাষায় বুঝিয়েছেন :—

"গগন তলে সগৌরবে গানের ধ্বনি উঠিল যবে জাগি',—
নয়ন হোলো শ্রবণ তবে,
দরশ ফিরে পরশ তারই লাগি।
বাজিল বীণা নিখিল নভে,—
সুরের ধারা ভরিল দশ দিক,—
শ্রবণ হোলো নয়ন তবে,
শুনিছে আঁখি অধীর অনিমিখ্॥"*

* শ্রীমান প্রভবদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পারসীক কবিতার ইংরেজী অনুবাদ হইতে ভাষান্তরিত।

অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

১

কয়েক বৎসর পরে আর একটি অগ্রহায়ণের সকালে ছাদে বসিয়া যোগমায়া বড়ি দিতেছিলেন। বড়ি দিতে দিতে ডাকিলেন, বউমা, ও বউমা—শুনে যাও।

বধূ নীচে হইতে উত্তর দিল, কি বলছেন মা?

যোগমায়ার সে উত্তর মনঃপূত হইল না। একালের মেয়েদের ধারাই এই। গলা বাহির করিয়া পাড়া জাহির না করিলে যেন কথা কহাই যায় না! বলিলেন, দোতলার বড় ঘরে একখানা বড়ি দেওয়ার টিন আছে, দিয়ে যাও তো। অমনি সরষে তেলের বাটিটাও এনো।

সে আসিলে বলিলেন, বউঝি মানুষ—অমন গলা বার করা ভাল নয়, পাড়ার লোকে নিন্দে করে।

বধূ কহিল, যে চারদিকে বন—এখানে কেউ কারো কথা শুনতে পায় বুঝি?

যোগমায়া হাসিলেন, বনের আর কি-ই বা দেখলে বউমা। আমরা যখন আসি—অজগর বন ওই কায়েত বাড়িটায়। বাড়ির না ছিল প্যাঁচীল, না ছিল—

বধূর কাছে সেকালের গল্প করিয়া উৎসাহ পান না তিনি; কাজেই অর্দ্ধপথে থামিয়া যান। একালের বধূরা সে-কাল সম্বন্ধে কৌতূহল পোষণ করে না; স্পষ্ট একটি অবজ্ঞা তাহাদের সূক্ষ্ম হাসিতে ফুটিয়া উঠে।

কল্পিত ভয়ে শিহরিয়া বধূ কহিল, মাগো, আমরা হ'লে মরেই যেতাম!

—বালাই—ষাট! শহুরে মেয়ে তোমরা কথায় কথায় মর-বাঁচ!

বধূ হাসিয়া বলিল, প্রথম যে-দিন ঘরের কানাচে শেয়ালের ডাক শুনলাম—এমনি বুকের গোড়ায় ধড়্ ধড়্ করে উঠলো!

—কেন, ঢাকা শহরে তোমাদের শেয়াল নেই—না সে শেয়াল-গুলো ডাকে না?

—ডাকবে না কেন, অমন নিকটে ঠিক কান ফাটিয়ে ডাকে না ত!

—বটে তো? সভ্য শেয়াল বুঝি?

যোগমায়ার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন পরিহাস ফুটিতেই বধূ নীরব হইল। একটু থামিয়া বলিল, আজ আমি রাঁধব—মা।

—তুমি? কি রাঁধবে?

—ডাল, ডালনা, ভাজা—যা বলেন।

—না, আজ থাক। নবান্নর দিন যদি গুরুঠাকুরই এসে পড়েন।

—এলেনই বা।

তা হয় না। গুরুঠাকুর কারও হাতে খান না। মন্তর না হ'লে তো হাতের জল শুদ্ধ হয় না। তুমি রাঁধলে চলবে না।

বধূ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আমি তো বামুনের মেয়ে, তবে—

যোগমায়া হাসিয়া কহিলেন, বামুন শুদ্দুরের কথা হচ্ছে না মা, ধর্ম্ম নিয়ে কথা। ভারি নিষ্ঠে-কাষ্ঠা ওঁর।

—তবে আপনিই রাঁধুন।

বধূ চলিয়া যায় দেখিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিমল কি এ শনিবারে বাড়ি আসবে?

ঘাড় নাড়িয়া বধূ নামিয়া গেল।

যোগমায়া আপন মনে বড়ি দিতে লাগিলেন—আর ভাবিতে লাগিলেন। কলিকাতার চাকরি ভাল। সপ্তাহান্তে প্রিয়-পরিজনের সঙ্গে মিলিবার সুযোগ ও সুবিধা আছে। শুধু কলিকাতা বলিয়া নহে—পোষ্টাপিস ছাড়া অন্য যে-কোন আপিসের চাকরিই ভাল। সপ্তাহে এক দিন ছুটি—পুরা একটি দিন বিশ্রাম। তা ছাড়া পূজায়—বড়দিনে লম্বা ছুটি মেলে এবং বাঁধা-বরাদ্দ ছুটি ছাড়া প্রায়ই সোম বা মঙ্গল বারেও বিমল বাড়ি থাকে। প্রথম প্রথম যোগমায়া আপত্তি করিতেন, হাঁরে খোকা, সোমবারে আবার কিসের ছুটি?

—এমনি ছুটি নিলাম।

—এই সে-দিন চাকরি হ'লো—এর মধ্যে অত ছুটি নেওয়া কি ভাল?

বিমল হাসিয়া জবাব দেয়, বড়বাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে—মা।

—দেখিস বাপু—ক্ষেতি না হয়। কত ঠাকুরের দোর ধরে চাকরিটুকু হয়েছে।

—দোর আর কি ধরলে মা, চাকরি তো আপনিই পেয়ে গেলাম।

—আপনি পেলি! কথা শোন। বেয়াই মশায় বলে কত চেষ্টা-চরিত্তির করে—

—তোমার বেয়াই মশায়ই চেষ্টা করেছেন—আমি তো করি নি।

—খুব কথা শিখেছিস বাপু, সায়েবের চাকরি করিস কিনা!

বিমলের রহস্য-প্রফুল্ল মুখে মেঘ নামিয়া আসে, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়।

অন্তরে অন্তরে খুশী হন যোগমায়া, সময়ে সময়ে অশান্তিও বোধ করেন। এমন যখন-তখন ছুটি লওয়া—প্রতিবেশিনীরা ছেলের বধূ-প্রীতির উপর কটাক্ষ করে। বিমলের মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি তাহাদের সন্দেহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেন; নিজের মনে সেই সন্দেহের অঙ্কুর কিন্তু বাড়িয়া উঠে। আজকাল মায়ের সঙ্গে যে সময়টুকু বিমলের কাটে, তা ঘড়ি না দেখিলেও যোগমায়া আঙুলের পর্ব্বে ধরিয়া দিতে পারেন। আর রুদ্ধদ্বার কক্ষে—সকাল, দুপুর, অপরাহ্ণের খানিকটা এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া যে অগুন্তি সময় মৃদু গল্পে ও নীরব হাসির মধ্য দিয়া নিঃশেষিত হয়—তা যোগমায়ার কাছে সুদীর্ঘ হইলেও—উহাদের পক্ষে অল্পায়ু।

—অনেক বেলা হ'লো—ওঠ্ না খোকা।

—আর একটু ঘুমুই মা, কাল রাত্তিরে যা গরম গেছে।

—রমেন বুঝি ডাকছে রে।

—ডাকুক। সকালবেলায় ওর যত ডাকাডাকি। বলে দাও—বাড়ি নেই।

—রোদ উঠলে বিছানায় শুয়ে থাকতে নেই রে—উঠে বস। এমনি সতর্কবাণী যোগমায়া কতদিন উচ্চারণ করেন। ছেলে কখনও শোনে—কখনও ছল-ছুতায় উড়াইয়া দেয়। যোগমায়া বুঝিতে পারেন কোন সঙ্গলাভের জন্য গৃহ-কোণের ওই সময়টুকু সর্ব্বক্ষণই ছেলের কাছে অমূল্য সম্পদবিশেষ। মাতৃভক্তির গৌরব ফুটা বেলুনের মত চুপসিয়া যায়, জ্বালা অনুভব করেন তিনি।

সেই বিমল! খেলায় যার অদম্য উৎসাহ, স্বদেশীর টানে নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া যে সারাদিন বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবে মাতিয়াছে, ঘরের টানকে উপেক্ষা করিয়া পথের মায়াডোরে যে মনকে বাঁধিয়া রাখিত সর্ব্বক্ষণ! বুক ঠেলিয়া নিশ্বাস বাহির হয়, একটা বড় রকমেরই নিশ্বাস। যোগমায়া আপনমনে বড়ি দিতে থাকেন।

বড়ি দেওয়া শেষ হইলে যোগমায়া বলিলেন, কুলুইচণ্ডীর ব্রত কাল—মনে আছে তো বউমা?

বধূ সলজ্জ কণ্ঠে উত্তর দিল, এবার আপনিই পালুন।

—কেন, একটা দিন ফলার খেয়ে থাকতে পার না?

—থাকতে পারি। জানেন তো আপনার ছেলের কাণ্ড—কাল শনিবারে মাছ আনবেন এই এতগুলি।

যোগমায়া কথা কহিলেন না। ধর্ম্মকর্ম্ম কিছু জোর করিয়া ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া চলে না।

আর অশান্তি বাড়িয়া উঠে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা প্রায়ই অগ্রহায়ণের প্রথম ঘেঁষিয়া পড়ে এবং ঐ একটি রাত্রির চাঁদের আলো সহস্র সূর্য্য-প্রভান্বিত হইয়া যোগমায়াকে দগ্ধ করিতে থাকে। ঐ দিন তিনি জলস্পর্শ করেন না—নিরম্বু উপবাসে কাটাইয়া দেন। বিমল বাড়ি আসিলে উনুন-পাড়ে তাঁহাকে বসিতে হয়, কিন্তু উনানের কাঠগুলিতে সেদিন ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য দেখা যায় এবং যোগমায়ার দু-চোখ বাহিয়া জলধারা গড়ায়। ঐ দিন সকালে গঙ্গাস্নানে গিয়া গুপ্তি-পাড়ার সুউচ্চ খেয়াঘাটের পানে তিনি বহুক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকেন। কত লোক খেয়াপারে চলিয়া যায়—খেয়াপার হইতে ফিরিয়া আসে; বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, কৃশ, বলিষ্ঠ, রুগ্ন, সুস্থ, গৌর বা কালো—কত ধরণের লোকই যে পারাপার করে—তেমন শ্যামবর্ণের রোগা ছেলেটি আর আসে না। খেয়ার উচ্চ পাড়ে—গরুর খুরের আঘাতে ধূলির কুয়াশা যেখানে রচিত হয়, তীরস্থ তরুরাজির মসীঘন সীমার পারে দৃষ্টি যেখানে পৌঁছায় না,—সেই অস্পষ্ট দিগন্তের কোল ঘেঁষিয়া ঈষৎ মলিন জামাটি গায়ে দিয়া—শুভ্র উত্তরীয় দু-পাশে উড়াইয়া, দীর্ঘ কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটি মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে হেলাইয়া রোগা পাতলা শ্যামবর্ণের ছেলেটি তো ফিরিয়া আসে না! জলে বুক ডুবাইয়া যোগমায়া ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করেন। দেবীর বীজমন্ত্রে শ্যামকিশোরের ছবিটি বার বার ফুটিয়া উঠে।

নিস্তারিণী বলেন, দিদি হ'লো?

—এই যে প্রণামটা সেরে নিই।

দীর্ঘ প্রণামের পরে আবার তিনি খেয়াপারে দৃষ্টি প্রেরণ করেন। ধূলিজালে ও বনরেখায় সে দৃষ্টি আটকাইয়া যায়, শ্বেত উত্তরীয়ের আলো লাগিয়া অন্ধ পারের তমসা তরল হয় না একটুও।

আজ কতদিন পরে তেমন ঘন বন্দে মাতরমের ধ্বনিও শোনা যায় না। বিমলের মুখে তো নয়ই। সাহস করিয়া যোগমায়া সে কথা বিমলকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। এই মায়ের পায়ে—যাওয়া-আসার কালে যে প্রণাম বিমল রাখিয়া দেয়—সে হয়ত ভক্তিভারে নম্র—শ্রদ্ধায় পবিত্র, মাটিকে মা মানিয়া যে প্রণাম-মন্ত্র বিমল উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিত—তাহাতে বজ্রের প্রতিধ্বনিই উঠিত। বজ্রের ডাকের আগে যেমন বিদ্যুতের আলো—তেমনই একটা চোখ-ধাঁধানো দীপ্তিও ছিল। কিন্তু ভক্তি লইয়াই যোগমায়াকে খুসি হইতে হয়। শরতের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। কি জানি, ভুলিয়া-যাওয়া মন্ত্র আবার যদি বিমলের মনে পড়ে—ভক্তিকে ছাপাইয়া বজ্রের ডাক যদি আবার ধ্বনিয়া উঠে!

বিমল আসিয়া প্রণাম করিল। বলিব না বলিয়া সারাদিন যে প্রশ্নকে বুকের মাঝে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন—অসাবধান-মুহূর্ত্তে সেই প্রশ্নই প্রথমে তাঁহার কণ্ঠস্খলিত হইয়া পড়িল: হাঁরে খোকা, শরৎ এখন কোথায় জানিস?

বিমলের প্রফুল্ল মুখ সহসা চাবুক খাইলে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায় তেমন ধারা দেখাইল। চোখের কোণে একটু আগুন যেন জ্বলিয়া উঠিল—ঈষৎ দীপ্তি। সবেগে সে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, জানি।

—কোথায় রে? একবার তাকে আনতে পারিস নে? যোগমায়া আগ্রহে আকুল হইয়া উঠিলেন।

—তোমার ভয় করবে না? মায়ের পানে চাহিয়া বিমল প্রশ্ন করিল। প্রশ্ন তো নহে—নির্ম্মম আঘাত।

অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া যোগমায়া কহিলেন, ভয় করে, কিন্তু তাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বিমল কহিল, কিন্তু তাকে দেখবার উপায় নেই, সে এখন অনেক—অনেক দূরে।

—কোথায়—কোথায় রে?

পোর্টব্লেয়ার—আন্দামান জান? ফাঁসির বদলে লোককে যেখানে পাঠায়।

আশ্চর্য্য—ওই একটি কথায় বিমলেরও কেমন যেন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল সেই সন্ধ্যায়। জলখাবার নামমাত্র সে স্পর্শ করিল। বধূর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ জমাইল না। খালি পায়ে বাড়ির বাহির হইবার সময় শুধু বলিল, একটু বাইরে যাচ্ছি মা, ফিরতে দেরি হবে।

অনেকখানি দেরি করিয়াই বিমল ফিরিল এবং ভাল করিয়া আহারও করিল না। যোগমায়া খুব বেশী অনুযোগ করিবার সাহস পাইলেন না। সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া মৌন হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রভাতে বিমলের পূর্ব্বমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। বধূর উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আজ তুমিই রাঁধ মা, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।

সংসারের আচার-বিচারে বধূ পটু না হইলেও গুছাইয়া রন্ধন করিতে জানে। যে যে জিনিস বিমল ভালবাসে—সেগুলি তো রাঁধিয়াছেই উপরন্তু এমন দু-একখানি তরকারি করিয়াছে যাহা যোগমায়াও কখনও খান নাই। বেশ তৃপ্তি করিয়াই বিমল খাইল। যোগমায়া প্রসন্ন হইলেন।

পাখা হাতে পুত্রের সম্মুখে বসিয়া বলিলেন, হাঁরে, তা হোটেলে খেতে তোদের খুব কষ্ট হয়?

বিমল বলিল, কষ্ট হলে আর উপায় কি, সবাই তো খায়।

যোগমায়া একটু থামিয়া বলিলেন, তা বাসা কর্ না কেন, বউমা তো দিব্যি রাঁধতে শিখেছেন।

বিমল হাসিয়া বলিল, তোমার বউমা রাঁধতে শিখলেই আমার বাসা করা চলে না, মা।

—খুব চলে। চিরজীবনটা কষ্টই করবি বুঝি!

বিমল বলিল, কষ্ট মনে করলেই কষ্ট—না হ'লে কিছুই নয়। শ্বশুরমশায় কি বলেন জান?

—কি বলেন?

—ওই তুমি যা বলছ।

—তা ঠিকই বলেন তিনি। এ অঘ্রাণেই ভাল একটি দিন দেখে—, কথাটা যোগমায়ার শেষ হইল না। কণ্ঠটা কেমন যেন শুকাইয়া উঠিল।

বিমল হাসিয়া বলিল, তুমি একা থাকবে কি করে?

যোগমায়াও হাসিলেন, চিরকালটা কাটালাম—আর দু'টো দিন না হয়—

—সে কি ভাল হয়?

—খুব হয়, তুই বাসা দেখিস।

—আচ্ছা ভেবে দেখি। বলিয়া বিমল উঠিয়া পড়িল। যোগমায়ার বুক ঠেলিয়া আবার নিশ্বাস উঠিল। বিমলের আপত্তি তো প্রবল নহে। প্রবল হইলেই বুঝি যোগমায়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতেন।

খাইতে বসিয়া বধূকে বলিলেন, বাসায় খুব সাবধানে থাকবে মা। যেন বিমল বাসা করিয়া কালই বধূকে লইয়া যাইতেছে!

বধূ সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, আপনার ছেলে তো আগে বাসা করলেন!

যোগমায়া বলিলেন, বাসা করবে বৈকি।

বধূ বলিল, আপনিও যাবেন তো?

—আমি! যোগমায়া হাসির দ্বারা এই প্রশ্নের অসম্ভাব্যতা প্রকাশ করিলেন।

—তা হোক্—চলুন না।

—আমি গেলে সংসার-ধর্ম্ম কে দেখবে—মা। শিবের মাথায় অর্ঘ্য-জল দেওয়া, গরুর সেবা করা, ঘর-দুয়োর দেখা-শোনা করা—

—কেন, কাউকে বলে যাবেন না হয়। পুরুতকে পয়সা দিলেই তিনি পূজো করে দেবেন।

—পাগল! পর দিয়ে কখনও কাজ হয়, না সে কাজের ছিরি থাকে! নিজের ঘর-দুয়োর নিজে না দেখলে নষ্ট হয়ে যায়।

যোগমায়ার গম্ভীর থমথমে আওয়াজে বধূ কথা কহিবার সাহস পাইল না।

যোগমায়ার মেজাজটাও সেইদিন অপরাহ্নে রুক্ষ হইয়া উঠিল। নিস্তারিণী আসিলে কহিলেন, এমনি করেই সংসার-ধর্ম্ম করবে এরা! সন্ধ্যেবেলায় দুয়োরে গঙ্গাজল দিয়ে শাঁখটায় গোটা তিনেক ফুঁ দেবার সময় থাকে না এ-কালের মেয়েদের! এরা আবার সংসার করবে!

নিস্তারিণী বলিলেন, তা যা বলেছ দিদি। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান সব হাওয়ার বিবি। দিন-রাত্তির ভাবন—সাজন-গোজন—এত ভালও লাগে?

যোগমায়া বলিলেন, লাগবে না কেন বোন। নিজে হাতে জমি কুপিয়ে তো শাকপাতা আজ্জায় না—কাজেই গরু-ছাগলে খেলে তো ওদের বয়েই গেল। এই যে বুড়ো মাগী ঠ্যাঙা হাতে করে বোশেখ-জ্যষ্টির রোদে ওপর-নীচে করে আমগুলো আগলাই—ওদের সাধ্যি! তা আর পারতে হয় না!

—তোমার দিদি অরুণের গতর। একা হাতে সব করছ।

—শ্বশুরের ভিটে—না করবার তো কথা নয় বোন। ওরা বলে এত খাটো কেন? খাটুনির মর্ম্ম ওরা কি বোঝে বল? শুয়ে থাকলে গায়ে কে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দেয়।

—তাই বটে। সেদিন বাঁড়ুজ্জে-বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ও মা, নাক ডাকিয়ে বউ ঘুমুচ্ছে দালানে—আর একটা

কালো গরু ঢুকে মস্‌মসিয়ে পালঙের ক্ষেত মুড়িয়ে খাচ্ছে। এমন ঘুমও বউ ছুঁড়ির!

—আহা, খাসা তেজালো শাক বেরিয়েছিল গো।

সন্ধ্যার মুখে নিস্তারিণী চলিয়া গেলেন। বধূ ততক্ষণে দুয়ারে গঙ্গাজল ছিটাইয়া শাঁখটা বাজাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। দুই গাল ফুলিয়া বধূর চোখে জল আসিবার উপক্রম হইয়াছে—তবু চাপা শব্দ ছাড়া শাঁখের ধ্বনি বাহির হইতেছে না। যোগমায়া উঠিয়া আসিয়া বধূর হাত হইতে শাঁখ লইয়া অল্প ফুঁ দিয়া তীব্র ধ্বনি বাহির করিয়া বলিলেন, আস্তে আস্তে সবটা ফুঁ ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে দিলে তবে শাঁখ বাজে, গায়ের জোরের কর্ম্ম নয়। ও কি, একটু গঙ্গাজল দিয়ে না ধুয়ে শাঁখ তাকের ওপর থুয়ো না। বাজালে এঁটো হয় যে।

—একটু ধুনো দেব।

—দাও, ধূপও একটা জ্বেলে দাও।

হরিনামের মালা হাতে যোগমায়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। করাঙ্গুলি সমেত জপের অক্ষগুলি আবর্ত্তিত হইতে লাগিল, মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণও হয়ত করিলেন, মুখে সংসার সম্বন্ধে বধূকে অনর্গল উপদেশ দিতে লাগিলেন।

রাত্রির আহারের সময় পুনরায় বিমলের কাছে বসিয়া কথাটা পাড়িলেন, হাঁরে, কবে নিয়ে যাচ্ছিস বউমাকে?

—তুমি ক্ষেপেছ মা। ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া বিমল সে কথার নিষ্পত্তি করিয়া দিল।

যোগমায়া মনে মনে পুলকিত হইলেন। বিমলকে আর অনুরোধ করিলেন না। কি জানি, মায়ের অনুরোধ আন্তরিক মনে করিয়া বিমল যদি সম্মতি দিয়া বসে!

২

হাতের চুড়ি ও কানের মাকড়ি পরিয়া লতা যোগমায়াকে প্রণাম করিল। যোগমায়া বধূর চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন, থাক, মা, থাক। কলকাতা থেকে বিমল গড়িয়ে আনলে বুঝি?

লতা নীরবে ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, বাবার জানা স্যাকরা।

—তা অনেকগুলি টাকা খরচ হয়েছে দেখছি।

বধূ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, সোনার দামটা লাগলো শুধু, বানী মাসে মাসে দিলেও চলবে।

যোগমায়া অকস্মাৎ রোয়াক হইতে নামিয়া গরুকে শাসাইতে লাগিলেন, ভাগাড়ে যাও, দিনরাত দড়া খুলে গাছপালা মুড়োচ্ছ—ভাগাড়ে যাও।

বধূও যোগমায়ার সাহায্যে অগ্রসর হইতেছিল। তিনি নিষেধ করিলেন, ওই দস্যি গরু সামলানো তোমার কর্ম্ম নয়—মা। সর। বলিয়া একটা সজিনার শুষ্ক ডাল তুলিয়া লইয়া সজোরে গরুটার পিঠে আঘাত করিলেন।

আর একটু বেলা হইলে প্রকাণ্ড একটি শালপাতার ঠোঙা যোগমায়ার হাতে দিয়া লতা বলিল, ঠাকুরকে উচ্ছুগ্যু করে পাড়ার সকলকে দেবেন।

যোগমায়া বলিলেন, গহনা হ'লে আবার পাড়ার লোককে খাওয়ানো কেন? সবই আদিখ্যেতা! বধূর পানে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার মনে অনুশোচনা জাগিল। কথাটা বড় তীব্র হইয়া গিয়াছে। আজকাল তাঁহার কি হইয়াছে কে জানে, মনের মধ্যে একটা অকারণ উত্তাপ জমিয়া বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করে। কথার সুরে তীব্রতা আসিয়াছে।

বধূর হাত হইতে শালপাতার ঠোঙাটি লইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, লোককে দেওয়া-থোওয়ার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই মা। এই এতগুলো টাকা খরচ করে গহনা গড়ালে—আবার খাওয়ানো—

বধূর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, খরচের পালা যখন পড়ে—তখন খরচই হয় শুধু। ওই ছোট ঠোঙাটায় আপনার মিষ্টি আছে।

—ঘরের লোকের জন্য আবার আলাদা ব্যবস্থা কেন? মুহূর্ত্তে যোগমায়ার অন্তরে সেই উত্তাপ তীব্র হইয়া উঠিল। ছেলেকে লইয়া বধূ পৃথক্ সংসার গড়িয়া তুলিতেছে!

ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া নিজের হাতে সেই মিষ্টান্ন যোগমায়া পাড়ায় বিলাইলেন। নিজে কিন্তু কিছু মুখে দিলেন না। বধূর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কিছু মুখে দিলেন না। শুধু বলিলেন, শরীরটা খারাপ হয়েছে, ভাতও আজ খাব না।

উদ্বিগ্ন মুখে বিমল ছুটিয়া আসিল, কি হয়েছে মা? কপালে হাত দিয়া বলিল, কই, কিছুই না তো!

—কপাল গরম নয়, বুকটা কেমন করছে।

বিমল পুনরায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, খুব ধড়ফড় করছে কি? ডাক্তার ডেকে আনি। সে ছুটিয়া যায় আর কি।

যোগমায়াকে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিতে হইল। কহিলেন, ডাক্তার ডাকতে হবে না। ডাক্তার এসে করবে কি, একটু জিরোলেই সব সেরে যাবে'খন।

—তুমি ভাত না খেলেই ডাক্তার ডাকব কিন্তু।

যোগমায়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোদের জন্য আমার অসুখও করবে না? খুব শাসন করছিস যাহোক!

—অসুখ করলে শুনবো কেন! যেমন তেমন দিনে অসুখ করলেই হ'লো।

অগত্যা যোগমায়া উঠিলেন।

কিন্তু এমন করিয়া আর কত দিন চলে। মনের উত্তাপ কখনও কথায়, কখনও কাজে ফুটিয়া উঠিতে চাহে। রুদ্ধ ঠাকুর-ঘরে বসিয়া যোগমায়া এই উত্তাপের হেতু নির্ণয় করিতে চাহেন। নিজের মনের সর্ব্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া এই সামঞ্জস্যহীন আচরণের জঞ্জালগুলি কোথায় জড়ো হইয়াছে দেখিতে চেষ্টা করেন; পূজার মন্ত্র, সংসার ও স্নেহে সব একাকার হইয়া যায়। মনে হয় বধূই

সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। এই সংসারে উহার অবাঞ্ছিত আগমনই এই অনর্থের হেতু। তবু তাহাকে কথার আঘাত করিলে সে আঘাত তীক্ষ্ণ তীরের মত তাঁহাকেই বিঁধিতে থাকে। তাঁহার বড় আদরের বিমলের বউ—কোথায় তাহাকে সর্ব্বদা স্নেহের অঞ্চলে ঘিরিয়া রাখিবেন, না সেই আঁচলের তলাকার উত্তাপ আগুন হইয়া প্রতিনিয়ত বাহিরে আসিতে চাহিতেছে। এতদিনের হাতে গড়া সংসার—এমনই করিয়া কি শুকাইয়া যাইবে? যোগমায়া সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া বিমলের কাছে আসিয়া বলিলেন, বোশেখ থেকে তোর মাইনে বেড়েছে—বাসাটাসা দেখ্।

বিমলের সেই পুরাতন আপত্তি, মা, তুমি পাগল!

—হাঁ আমি পাগল। সারাজীবন যদি কষ্টই করবি তো কিসের জন্য উপার্জ্জন শুনি?

বিমল রহস্য করিয়া বলিল, লোকে কি বলবে জান? বলবে শাশুড়ী বউয়ে বনিবনা হ'লো না, তাই বাসা করলে।

যোগমায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, লোকে বলবে, না তুই বলছিস? কি এমন দিনরাত বউকে নিয়ে কাক-চিল পড়াপড়ি করছি যে—লোকে বলবে? লোকের বলার কি ধার ধারি আমি।

সেই উত্তাপ অগ্নিশিখাকে প্রকটিত করিতে চাহিতেছে।

বিমল সবিস্ময়ে মায়ের রক্তবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া কহিল, তুমি সুখী হবে ওকে নিয়ে গেলে?

—কেন, বউ কি আমার দু-চক্ষের বিষ, তাই ওকথা বললি?

—কি বিপদ! তুমি যেন আজকাল কি হয়েছ মা। কথাগুলো এমন উল্টে ধর।

বধূ আসিয়া দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়াছে। যোগমায়ার উত্তাপ হু-হু করিয়া নামিয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিলেন, পোড়া মনের যেন কি হয়েছে। গৌরী আজ এক সপ্তাহ হ'লো চিঠি দেয় নি।

—আমি কালই খবর আনাচ্ছি।

রাত্রিতে বিমল বলিল, দিনকতক তীর্থে ঘুরে এসো না, মা।

—তীর্থে? কে নিয়ে যাবে?

—বল তো আমি নিয়ে যাই। তোমার তীর্থ হবে—আমারও দেশ দেখা হবে।

—কিন্তু এবার অকাল, তীর্থ করতে নেই।

—ঠাকুর দর্শনে আবার কালাকাল কি?

—আছে বৈকি। রোজ তো ঠাকুর দর্শন করছি নে। কিন্তু খোকা, হঠাৎ আমাকে তীর্থ করাবার সাধ হ'লো কেন রে তোর?

—বাঃ রে, এতখানি বয়স হ'লো—কোথাও তো গেলে না। বার মাস সংসার নিয়ে থাকলে মানুষের মন তো!

—মানুষের মনে কি হয় রে সংসার নিয়ে থাকলে?

—একঘেয়ে ভাল লাগে না।

—সংসার ভাল লাগে না! তা সংসার যাদের ভাল লাগে না তারা অরণ্যে গিয়ে থাকলেই পারে, সাধু-সন্ন্যেসী হ'লেই পারে। একটু থামিয়া বলিলেন, তা দিনরাত সংসার ভাল লাগে না—এ বুদ্ধি তোর মাথায় কে ঢুকিয়ে দিলে রে? বউমা বুঝি?

বিমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, যে-ই ঢুকিয়ে দিক, সত্যি কি না?

—না, সত্যি নয়। যারা সংসার কি চেনে নি—তারাই বলে ও-কথা। মায়ের কণ্ঠস্বর আবার গম্ভীর হইয়া আসিতেছে। বিমল রহস্য করিয়া বলিল, তা যাই বল, আমি কিন্তু এক মাসের ছুটি নিচ্ছি, বেড়াবার সখ হয়েছে বড্ড। আর তোমাকেও ছাড়ছি নে।

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, উনিই বড় করালেন তীর্থধর্ম্ম—তা তুই করাবি! ওসব বাজে কথা রেখে খাবি আয়।

—আচ্ছা মা, তোমার কি তীর্থে যেতে ইচ্ছে করে না?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া বলিলেন, সেই বরাত করেছি কি যে তীর্থ করব। যেতে ইচ্ছে হ'লেই বা যাওয়া হয় কৈ!

—না মা, তোমায় আমি নিয়ে যাব।

—দূর পাগল! অকালে আমি গেলাম আর কি। আচ্ছা শোন্, এ বছর আর ছুটি নিস্ নে, আসছে বার বরঞ্চ—

—আসছে বারও যদি অকাল থাকে?

—পাঁজি দেখে বেরুলেই হবে।

মা, তুমিই তো বল—ভাল ইচ্ছে মনে উঠবামাত্র করা উচিত, নইলে রাবণ রাজার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরির মত হয়।

—খুব পণ্ডিত হয়েছিস তো। এখন বাসা তো কর্।

—না মা, তোমার রাবণ রাজাই বলে গেছেন, মন্দ ইচ্ছে দেরিতে করাই ভাল।

মা ও ছেলে দুইজনেই হাসিতে লাগিলেন।

পর দিন সকালে যোগমায়া পুনরায় গম্ভীর হইয়া গেলেন। বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই একেবারে ছুটি নিয়েই এসেছিস বুঝি?

—পাওনা ছুটি—বড়বাবু বললেন নিতে—

—হুঁ, তা ছুটি নিয়ে পাহাড়ে চলেছিস বুঝি বেড়াতে?

—যা গরম—দার্জ্জিলিঙে ঘুরে আসি একবার।

—বউমাও শুনলাম যাবেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিমলের মুখের পানে চাহিলেন যোগমায়া।

বিমল অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, শ্বশুরমশায়রা মাসাবধি ওখানে রয়েছেন। বিশেষ করে ধরেছেন—

—তা জানি। আমাকেও লিখেছেন—দু-দুবার।

বিমল সাগ্রহে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল, তুমি উত্তর দাও নি?

যোগমায়া সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, যখনই যাও—ভাল দিন-টিন দেখিয়ো, আর সময় থাকতে আমায় বলো। হুট বলতে বাড়ি থেকে বেরুনো—একটা লক্ষণ আছে তো।

বিমল আর মায়ের পানে চাহিল না, প্রফুল্ল মনে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নিস্তারিণী বেড়াইতে আসিলে যোগমায়া কহিলেন, সে দিন

কথা শুনতে গিয়ে ভাল বুঝতে পারলাম না বোন। সেই যে ভরত রাজার উপাখ্যান।

নিস্তারিণী বলিলেন, আমার তো দিদি বসলেই ঢুল আসে। সারাদিন খেটে মরি সংসারে, দু-দণ্ড পা ছড়িয়ে যদি বসেছি কি—

—পোড়া কপাল, কি করতে যাস কথা শুনতে? ভরত রাজার কথা জানিস নে? ওই তোরই মত সংসারের মায়া রে। মরণ কালে হরিণ-ছানাটার মায়া কাটাতে না পেরে আবার জন্মগ্রহণ করলেন।

—আমরা নরুকি—পাপীষ্ঠি—আমরা যদি না জন্মাবো—

বাধা দিয়া যোগমায়া বলিলেন, তাই বলছিলাম। হা সংসার যো সংসার করে মরি, ছেলে বউ কেউ কারও না।

—কেউ কারও নয় দিদি! সেদিন বোসেদের—

যোগমায়া কণ্ঠে উত্তাপ ঢালিয়া কহিলেন, বিমল বউকে নিয়ে পাহাড়ে হাওয়া খেতে চলল যে।

—বউমা যাবেন?

—যাবার জন্যে আলগোছ—যাবেন না আবার! আজকাল-কার ঢেউ।

—তাই বটে।

—আমাকেও বলে চল, সে কি টানাটানি। বলি বুড়ো-মাগি কোথায় যাব!

—তা গেলেই পারতে।

তোর কথা শুনে গা জ্বালা করে। ছেলে যাবে বউ নিয়ে বেড়াতে, আমি চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামাণিক হয়ে যাব কোন্ মুখে শুনি?

নিস্তারিণী সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তা ঠাকুর-দেবতাও তো আছে।

—ছাই আছে। ওরা যাক। আমাদের সংসারই ভাল, কি বলিস?

—তা আর নয়—বলে শ্বশুরের ভিটে—

এমনই করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন যোগমায়া।

বিদায়-দিনে প্রবোধ মানিল না মন। দু-চোখে জলধারা গড়াইয়া পড়িল। বধূর চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া ধরা গলায় বলিলেন, সু-ভালাভালি ফিরে এস মা।

ছেলেকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, বউমাকে যেন বাপের কাছে রেখে এসো না। নিয়ে যেতে হয় বেয়াই নিজে এসে নিয়ে যাবেন। বউ রেখে আসা আমাদের বাড়ির নিয়ম নয়।

সে রাত্রিটা মনে হইল—বড় অন্ধকার রাত্রি। বৈশাখের প্রথম রাত্রিতে যে বাতাস বয়—সে যেমন উদ্দাম—তেমনই এলো-মেলো। সে বাতাসে বিলাপ-ধ্বনির আভাস পাওয়া যায়। একলা ঘরে শুইয়া যোগমায়ার অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত যত্নে গড়া সংসার কি তাঁহারই সঙ্গে শেষ হইবে? এই বাড়ির উপরে বউয়ের মমতা তো নাই-ই, ছেলেও যেন বউয়ের অতিরিক্ত অনুরাগী হইয়া উঠিতেছে। নিজের জীবনের বহু বর্ষ পূর্ব্বের ঘটনাগুলি মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। পুরুষরা চিরকাল ঘর ভাঙার মন্ত্রই দিয়া থাকে, ঘর গড়িবার দীক্ষা গ্রহণ না করিলে মেয়েরা পরম নিশ্চিন্তে কোন্ আশ্রয়ে থাকিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে! বিমল আর কিছুই নহে, রামচন্দ্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

পরদিন কমলার চিঠি আসিল। কমলা লিখিয়াছে:

ভাই বউ, অনেক দিন আমাদের এখানে আসিস নি, একবার আসবি? বউ নিয়ে সংসার আমিও করি, কিন্তু তোর মত জড়িয়ে পড়ি নি। তা ছাড়া নাতি আছে। টাকার চেয়ে টাকার সুদের মায়া বড়। এতদিন তুই কেন এখানে আসিস নি, জানি। কিন্তু ভাই—দৈবের ওপর মানুষের হাত কি! জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। ও সব হিন্দুই মানে। এঁরাও মানেন। যে মেয়েটিকে তুমি দেখে গিয়েছিলে—তার বিয়ে হয়ে গেছে। বেশ ভাল বিয়েই হয়েছে। আর তা ছাড়া জয়ন্তী-দিদি গঙ্গালাভ করেছেন। গঙ্গালাভ করেছেন বললে ভুল হয়, কেন না তীরস্থ হলেও গঙ্গার দিকে চেয়ে দেখেন নি তিনি। এমন মানুষও থাকে! সবাই বললে, তারকব্রহ্ম নাম কর দিদি। দিদি বললেন, অত কথা বলতে পারব না। হতাশ হয়ে সবাই বললে, ওই ষ্টীমার আসছে—দেখ দিদি। দিদি বললেন, তোরা দেখ গে ষ্টীমার। সবাই বললেন, নাম না নাও গঙ্গা দেখ এক বার, নইলে গতি হবে না। দিদি চোখ বুজে রইলেন। বললেন, না হোক গতি, সগ্‌গে যাবার রুচি নেই আমার। এমন কোথাও শুনেছ? আর জয়ন্তী-দিদির কথা বলে চিঠি বাড়াব না। তোমার ঠাকুর-জামাইয়ের শরীর-গতিক মোটেই ভাল যাচ্ছে না আজকাল। কি জানি, ভগবান কি কপালে লিখেছেন। কেমন আছিস? মান্যে বড় হলেও কোন দিন প্রণাম দিতে পারি নি। ভালবাসা নিস। যত শীঘ্র পারি মনীশের বিয়ে দেব। তৈরী হয়ে থাকিস।

চিঠি পড়িয়া যোগমায়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। নিজের মন দিয়া যাহাকে পুত্রবধূ করিতে চাহিয়াছিলেন—সে আজ অপরের ঘরে। সুশীলা বধূ হইয়া সেই ঘর সে শ্রীমণ্ডিত করুক, বার বার এই প্রার্থনাই যোগমায়া করিলেন। প্রার্থনার সঙ্গে চোখের জল এমন হু-হু করিয়া গড়াইতে লাগিল যে, আঁচলের সবটাই ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতে লাগিল। হায়, আজ যদি হৃষীকেশ বাঁচিয়া থাকিত। হৃষীকেশের নাম ধরিয়া মৃদু গুঞ্জনে যোগমায়া অনেক-ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন।

নিস্তারিণী আসিলে বলিলেন, প্রাণটা বড্ড হাঁপাই-হাঁপাই করছে ভাই, দিনকতক না হয় তীর্থেই ঘুরে আসি।

—বেশত, আমাকে সঙ্গে নিয়ো। তা নিয়ে যাবে কে?

—কে আবার, পা আছে নিজেরাই যাব। এই তো কালী-ঘাট—আজ গিয়ে আজই ফিরে আসা যায়।

—তবে যে বললে তীর্থ করবে?

—তুই এমনও নেকী! কালীঘাট তীর্থ নয়, একান্নপীঠের এক পীঠ নয়?

—পশ্চিম যাবে না ?

—উনি আসুন। আসছে বার পেন্সন নেবেন, তখন ঘুরবো।

—কচি বউয়ের ঘাড়ে সংসার দিয়ে গেলে পারবে তো গুছিয়ে করতে ?

—না পারবার তো কথা নয়। কচি বউ কিসের ? ওর আদ্ধেক বয়সে বিয়ে হয়ে আমরা সংসার-ধর্ম্ম করি নি ?

—সেকাল আর একালে অনেক তফাৎ দিদি।

—ঘাড়ে বোঝা পড়লে সব ঠিক হয়ে যায়।

অন্ধকার রাত্রি আর তত অন্ধকার বোধ হয় না, বাতাসে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দও কম শোনা যায়। তীর্থ দর্শনের ধ্রুব তারাটি মনের দূর সীমানায় উঠিয়া নির্জ্জন একাকিত্বকে স্নিগ্ধ ও গুঞ্জনময় করিয়া তুলিতেছে।

পরম উৎসাহে যোগমায়া সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

জুনপুট

দেরাদুন থেকে ১৯শে ডিসেম্বর রওনা হলাম, হাওড়া, খড়্গপুর হ'য়ে মোটর-বাসে কণ্টাই পৌঁছে আবার আরও পাঁচ মাইল সমুদ্রের দিকে গেলে তবে জুনপুট পৌঁছানো যায়।

দুন-স্কুলের সাত জন ছাত্র, তিন জন শিক্ষক ও আমি রিলিফ কাজের জন্য কণ্টাই পৌঁছলাম। দু'জন শিক্ষক ও তিনটি ছাত্র গেলেন পিছাবনীতে—কণ্টাই থেকে সাত মাইল দূরে এক গ্রামে; আমরা দুজন ও চারটি ছাত্র জুনপুটে পৌঁছলাম।*

চৌদ্দ-পনর বছর পূর্ব্বে জুনপুটে সাত দিনের জন্য এসেছিলুম। সে সময় আমি শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র। সঙ্গে ছিলেন কবিশিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্পী রামকিঙ্কর। শিক্ষাভবনের ছাত্র শ্রীসুকুমার জানার বাড়ী বনমালী চট্টাতে—কাঁথীরই এক গ্রামে তাঁরই অতিথি হয়েছিলাম। তখন জুনপুটে আসবার কারণ শহরের কোলাহলের বাইরে সমুদ্রের ধারে নির্জ্জন বাস এবং সাগরে সূর্য্যোদয় দর্শন। মাঝিদের গ্রামে থেকে ছবি আঁকা এই



ক্ষুধাতুর কৃষক-পরিবার

* মেদিনীপুরের সাইক্লোন ও বন্যার পর থেকে দুন-স্কুলের এক দল ছাত্র ও দু-তিনজন শিক্ষক প্রতি ছুটিতেই রিলিফ কাজের জন্য কণ্টাইয়ের গ্রামে গ্রামে গিয়ে থাকেন। প্রথম দু-বার তাঁরা পুকুর সেচবার কাজ ও চালাঘর তৈরি করার কাজ করেছিলেন। এবারেও একদল পিছাবনীতে একটি পুকুর সেচার কাজ করেছে ও হাসপাতালে কাজের সাহায্য, গ্রামে গ্রামে ঘুরে কুইনিন বিলি করা ও দরকার হ'লে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসার কাজে লেগেছিল। সুদূর দেরাদুন থেকে ছাত্ররা কণ্টাই এসে সামান্য কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে। বাংলা দেশের স্কুল-কলেজের ছেলেরা তাদের পুজোর ছুটি কি গরমের ছুটিতে অতি সহজেই তাদের কোনো উৎসাহী শিক্ষকের সহায়তায় কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ রিলিফের কাজে সাহায্য ক'রে যেতে পারেন। হিন্দু মিশন, রামকৃষ্ণ মিশন, ফ্রেণ্ডস্ এ্যাম্বুলেন্স, বা গবর্ণমেন্টের রিলিফের কাজে সাহায্যের জন্য উৎসাহী কর্ম্মী লোকের অত্যন্ত অভাব। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা এ বিষয়ে সাহায্য করলে পরোপকার ছাড়াও নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে সন্দেহ নাই।



ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট গ্রামবাসী

ছিল আমাদের কাজ। তারপর এই পনর বৎসরের মধ্যে কত রকম ঝড়ঝাপ্‌টা এই গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে গেছে।

গত বন্যাতে এখানকার কাছাকাছি সব গ্রামই জলের তলায় ডুবে ছিল। বেশীর ভাগ লোক ভেসে গেল মরে গেল—তাদের খবর কেউ জান্‌ল না—রাখলও না। বন্যার পর সর্ব্বস্ব খুইয়ে কেউ গেল শহরে—কেউ আবার ভিটে কাম্‌ড়ে রইল পড়ে এখানেই। নানা কষ্টের মধ্যে, রোগ-জ্বালার মধ্যে দিন কাট্‌তে লাগল—বাড়ী ঘর নেই—গহনা থালাবাটি বেচে সংসার চল্‌ল তাদের। এক বছরের ওপর হ'য়ে গেছে বন্যা এসেছিল—কিন্তু যে মার মেরে গেছে প্রবল বন্যা তা ১০০ বছরেও লোকে ভুলবে না। এ বছরেও এখানকার অনেক গ্রামের ওপর সুবর্ণরেখার বন্যা চাষ হ'তে দিল না। শরীরেও এদের সামর্থ্য নেই—রোগ-বালাই লেগেই আছে। কতটুকুই বা সাহায্য আমরা করছি এদের! আর তার থেকে কতটুকুই বা পাচ্ছে এরা!

পিছাবনীতে দেখে এলুম এক দিন হিন্দু মহাসভার হাসপাতাল; গত এগার মাস ধরে এঁরা কাজ চালিয়েছেন। অনেক লোকেরই এঁরা উপকার করেছেন ও করছেন। কাছাকাছি আর হাসপাতাল নেই। এখন চল্‌ছে এঁদের কাজ অপেক্ষাকৃত ঢিমে তালে। ওষুধ-পত্তরের অভাব আজকাল, অথচ রোগীর অভাব নেই। সম্প্রতি দু-সপ্তাহ হ'ল মাত্র জুনপুটে ও বালুসেই-এ হাসপাতাল খোলা হয়েছে—সৈন্যদের হাসপাতাল—ওষুধ-পত্তরের অভাব এদের তেমন নেই। কলেরার প্রকোপ এদিকে বেশী—রোগীরা যারা বহু কষ্টে হাসপাতালে পৌঁছচ্ছে, কিন্তু শেষ অবস্থায়—অনেকেই মরে যাচ্ছে। দূর গ্রামের থেকে তাদের নিয়ে আসবার লোকের অভাব—কারুর সামর্থ্য নেই। স্টে্‌চারে ক'রে রোগী হাসপাতালে আনার কতকটা ভার আমরা নিয়েছিলুম।

হাসপাতালে ডাক্তার লেফটেনাণ্ট জয়ন্তী অন্ধ্রদেশের লোক। তরুণ যুবক, খাটছেন খুব। কলেরা, নিউমোনিয়া রোগের সঙ্গে চলছে এঁর যুদ্ধ। খাবার-শোবার সময়ের ঠিক নেই এঁর। হাসপাতাল খোলা হয়েছে—তাঁবুতে সব ব্যাপার। জুনপুটের হাসপাতালে ১০০ বিছানার ৮০টা প্রায় ভরেছে—নার্স রাখা হয়েছে মাত্র দশ জন—নার্সের কাজ তারা ঠিক জানে না। অথচ নার্স পাওয়া যে খুব



পিছাবনীতে হিন্দু-মহাসভার হাসপাতাল

দুরূহ, তাও নয়। লেখাপড়া এই নার্সদের মধ্যে অনেকেই জানে না—ডাক্তার ব্যবস্থা লিখে যান এক—এরা করে অন্য।

কর্ত্তারা তাড়াতাড়ি হাসপাতাল খুলে দিলেন* কোন রকম ভাল ব্যবস্থা না ক'রে—অথচ সুবিধামত নার্স নেই চাকর-মেথর নেই—রোগী নিয়ে ডাক্তাররা এখন পড়েছেন মুশকিলে!

আমাদের ছেলেদের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার জন্য ও ডাক্তারের কথামত বিধি-ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা তদারক করতে ও নার্সদের সাহায্য করতে রাখা গেল।

টুরিং মেডিক্যাল অফিসার মেজর বসুর সঙ্গে এখানে এসেই প্রথম দেখা হয়েছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে কলেরা ইনজেকশন্ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমাদের বললেন সমুদ্র-পারের গ্রামগুলোর দেখা-শোনা করতে। ভয়ানক খারাপ অবস্থা এদের। সমুদ্রপারের গ্রাম কদুয়া এবং গোপাল-পুটের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা—কলেরা লেগেছে, ম্যালেরিয়া ও খোস পাচড়ায় সারা অঙ্গ ভরে গেছে, হাড় বার-করা শরীরখানা দু-হাতে চুলকাচ্ছে, ছোট্ট কাপড়খানা রক্তাক্ত বললেই হয়!

এদের যারা একেবারেই চলতে পারে না—তাদের কুইনিন বিলি করাও আমাদের কাজ। বেশ বুঝতে পারি দু-চার গুলি কুইনিন খাইয়ে এই সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া সারানো সম্ভব নয়। সরকার-বাহাদুর বন্যার পর দু-মাইল তফাতে তফাতে নলকূপ লাগিয়ে দিয়েছিলেন—খুবই ভাল কাজ করেছিলেন—যারা বেঁচে আছে সেই নলকূপের জলের জন্যই। বন্যার পর সব পুকুর খালের জলই লবণাক্ত হয়ে যাওয়াতে এবং পুকুর-ডোবা সবই অপরিষ্কার হওয়াতে জলাভাব ভীষণ। অনেক গ্রামে নলকূপ ভেঙে গেছে—সে-সব মেরামত করা হয় নি।* কদুয়া দক্ষিণ, পশ্চিম কদুয়া গ্রামখানায় কেবলমাত্র

* তাড়াতাড়ি অর্থে কোনো ব্যবস্থা না ক'রে। এই হাসপাতাল এখানে মহরখানেক আগে খোলা উচিত ছিল।

* S. D. O'র আপিসে আমাদের রিপোর্ট পৌঁছবার পর এই নলকূপটি মেরামত করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের আবেদন নিবেদনে তাঁরা নিশ্চলই ছিলেন।

জলের অভাবে সবাই মারা পড়ছে সমস্ত গ্রামখানায় দুর্গন্ধ। এর অসম্ভব রকম খারাপ অবস্থা। কারুর সামর্থ্য নেই—যারা মরছে তাদের খালের ধারে, ডোবার পাড়ে ফেলে দিচ্ছে। সমুদ্রের ধারেও মড়ার খুলি ও হাড়গোড় —কুকুর শেয়াল ও শকুনির উৎপাত! গ্রামের অনেকের গায়ে কম্বল দেখতে পাচ্ছি, খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি গুজরাটি রিলিফ কমিটি—হিন্দু মহাসভা ও রামকৃষ্ণ মিশনের থেকে সেগুলো বিলি করেছেন। ঝাওয়া গ্রাম থেকে একটি কলেরা রোগীকে নিয়ে আসা গেল। সে গ্রামে কলেরা লেগেছে অথচ রিলিফ ডাক্তার এখনও ইনজেকশন কারুকেই দেন নি। তিন মাইল ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ষ্ট্রেচারে রোগী হাসপাতালে আনা যে কি কষ্টকর তা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝবেন না। রোগীটিকে বাঁচানো গেল না, হাসপাতালে সেই রাত্রেই তার মৃত্যু ঘটল। বিধবা স্ত্রী ও দুইটি ছেলেমেয়ে অকূলে ভাসল! ঝাওয়া গ্রামে কলেরাতে মরেছে অনেক অথচ তাদের সৎকারের ব্যবস্থা নেই—পাশেই শুকনো খালের ধারে তাদের অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলে রাখা আছে—শকুনি-শেয়ালের উৎসব চলেছে!



অনশন-ক্লিষ্টা রমণী

ফরিদপুর, সারসা, ডাউকী গ্রামগুলো কণ্টাই শহরের কাছেই অথচ সেখানকার অবস্থাও ভাল নয়। সেখানে গিয়ে কুইনিন বিলি করা গেল একদিন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা কয়ে জানলুম অনেক বিষয়—চোখে যা দেখলুম তা ত সব গ্রামেই দেখছি এদিকের।

ঘরে চাল নেই—রিলিফ কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না। যারা পাচ্ছে তাদের তাতে পুরো দিনটাই চলে না! যাদের সামর্থ্য আছে দু-একজনকে ছোট ছোট জাল নিয়ে কাদাজলে মাছ ধরতে দেখছি, কচিৎ দুচারটা পুঁটি চিংড়ি পাচ্ছে তাইতেই খুসী! এই নোংরা পুকুরের মাছগুলো খেয়েও কলেরা হচ্ছে বলা বাহুল্য।



ঝাওয়া গ্রামের একটি কলেরা রোগী। তারই বিছানায় সবাই নির্বিবাদে বসে আছে

ডাউকী গ্রামে তিনটি বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেছে সম্প্রতি। বন্যার উৎপাত—রোগশোকেরও অভাব নেই—তার ওপর ডাকাতের উৎপাত—অথচ পুলিসে ডাকাতও ধরতে পারে না! থালাবাটি চালচুলো নিয়ে পালায় তারা বাড়ীর পুরুষদের কম্বল দিয়ে বেঁধে! মেয়েরা কঙ্কালসার ম্যালেরিয়া রোগী—তারা আর করবে কি?

ডাকাতরা ডাকাতি করেও ছাড়ে নি—যাবার সময় ঘরে আগুন দিয়ে গিয়েছে!

জুনপুটের কাছেই যে গ্রামগুলো, এই হাসপাতাল খোলাতে তাদের উপকার হয়েছে সন্দেহ নেই! কাছাকাছি গ্রামগুলো—বিচুনিয়া, আলাদারপুট, চিন্‌চুরপুট, শীকারপুট, বামুনিয়া থেকে আজকাল যাদের সামর্থ্য আছে সবাই ওষুধ নিতে আসছে।

মেজর দত্ত সম্প্রতি ডাক্তার জয়ন্তীকে সাহায্য করতে এসেছেন। তিনি outdoor patientদের ওষুধ দিতে সাহায্য করছেন!

গতবারে জুনপুট এসে আনন্দ করে গিয়েছিলুম। সে স্মৃতি মনে লেগে আছে—গ্রামে রোগশোক ছিল না। সুস্থ সবল মাঝিরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত। তাদের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে কত ঝাঁপাঝাঁপি করেছি। সকাল বেলায় বালির ওপর বাঁধের কাছে যেখানে কেয়াবনের ঝোপঝাড় তার ফাঁক দিয়ে সূর্য্যোদয় দেখতুম—সমুদ্রের ঢেউয়ের ছবি আঁকতুম, বালির ওপর সমুদ্রের শাদা চোখ-ওয়ালা টকটকে লাল কাঁকড়ার পিছনে ছুটতুম। সমুদ্রে বেশী জলে যেতে সাহস পেতুম না—মাঝিদের মধ্যে দু-জনের পা কাটা দেখেছিলুম। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম যে হাঙ্গরের উৎপাত আছে—পা তাদের হাঙ্গরেই কেটে নিয়ে গেছে—গোটা মানুষকেও মাঝে মাঝে হাঙ্গরে নিয়ে যায়! সেবারে ফিরে যাবার সময় বলেছিলাম আবার আসব জুনপুটে! আবার এসেছি বটে, কিন্তু সে রঙীন ছবি নিয়ে যেতে আর পারছি কই? মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার ও অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় পীড়িত অস্থিচর্ম্মসার গ্রামবাসীদের অকালমৃত্যু—ভাঙ্গা ঘর-বাড়ী পুকুর-ঘাট—প্রত্যেক পুকুরের ওপর দু-একটা গাছ উপড়ে ডুবে আছে—ডোবার লবণাক্ত জলে মশামাছি ভন ভন করছে—ছেঁড়া কাঁথা ভাসছে কোথাও—এই সবই মনের ভেতর গেঁথে রয়েছে।

ছবিগুলি লেখক কর্তৃক অঙ্কিত।

কিচেন গার্ডেন

রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন ভিটায় এমন কি বাড়ীর উঠানেও নানারকম শাকসব্জী উৎপাদন করা হইত, এবং সাধারণতঃ অন্তঃপুরিকারাই তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন; ঘনবসতিপূর্ণ শহর ছাড়া অন্যান্য শহরেও বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে এইরূপ তরিতরকারির বাগান করার প্রথা প্রচলিত ছিল; অনেক কারণে পল্লীগ্রামে এবং শহরেও এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল; এবং ইহার ফলে বাড়ীর আশে-পাশের জমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া দেশের স্বাস্থ্যেরও খুবই ক্ষতি করিতেছিল। বর্ত্তমানে "অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করুন" আন্দোলনের ফলে এবং শাকসব্জীর মূল্য অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য জনসাধারণের মন তরিতরকারির বাগান করার প্রতি আবার বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন পল্লী অঞ্চলে প্রায় সকলেই বাড়ীর সংলগ্ন জমি পরিষ্কার করিয়া উহাতে নানারকম শাকসব্জী উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আবার বর্ত্তমান পরিস্থিতির ফলে অনেকেই নিজেদের বহু দিনের পরিত্যক্ত দেশের বাড়ী সংস্কার করিয়া সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে নানাবিধ শাকসব্জী উৎপাদনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেকেরই কোনও অভিজ্ঞতা না থাকাতে তাঁহারা এ বিষয়ে তেমন সফল হইতেছেন না। লেখক অনেকের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন জ্ঞান না থাকায় তাঁহারা একই ঋতুতে সহজে প্রাপ্য বীজ বা চারার জন্য দুই-এক রকমের শাকসব্জী এত বেশী পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন করিয়াছেন যে উহা সংসারের প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং নষ্ট হইয়া যাইতেছে; এই সকল তরিতরকারি বেশী পরিমাণে খাইয়া পরিবারের লোকদেরও ইহাদের প্রতি অরুচি হইয়া গিয়াছে। এক ঋতুতে দীর্ঘদিন স্থায়ী দুই-এক রকমের শাকসব্জী অতিরিক্ত জমিতে বপন করার জন্য পরবর্ত্তী ঋতুতে অন্যান্য তরকারি লাগাইবার স্থানও আর নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রকমের শাকসব্জীর বা অন্যান্য খাদ্য ফসলের প্রকৃতি না জানার জন্য জমির অনেক অংশ অযথা খালি পড়িয়া থাকে; যেমন আদা, হলুদ, আনারস প্রভৃতি ছায়াযুক্ত স্থানে

উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু অনেকের এই জ্ঞান না থাকায় জন্য ছায়াযুক্ত জমিতে কোনও ফসল উৎপাদন করা হয় না। ইহা ছাড়া এমন অনেক শাকসব্জী আছে যাহা অল্প দিনের মধ্যে ফল দেয়; এই সকল শাকসব্জী বহুদিন স্থায়ী শাকসব্জীর সঙ্গে একই সময়ে রোপণ করিতে পারা যায়; বহুদিন স্থায়ী শাকসব্জী বৃদ্ধি পাইবার আগেই অল্পদিন স্থায়ী শাকসব্জীর ফল দেওয়া শেষ হইয়া যায়। যেমন অল্পদিন স্থায়ী নানাবিধ শাক, বিলাতী পিঁয়াজ, বিলাতী মূলা প্রভৃতি বহুদিন স্থায়ী বেগুন, বাঁধাকপি, লঙ্কা প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে রোপণ করা যাইতে পারে। আবার অনেক তরিতরকারি এক সঙ্গে বপন করিয়া প্রায় একই সময়ে তোলা যাইতে পারে; যেমন বেগুন ও লঙ্কা একসঙ্গে রোপণ করা চলে; সেইরূপ আলুর ক্ষেতে কুমড়ার বীজ বপন করিলে মাঘ-ফাল্গুন মাসে আলু উঠাইয়া লইবার পর কুমড়ার গাছ বড় হয় এবং বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফল দেয়। সুতরাং শাকসব্জীর বাগান করিতে হইলে পূর্ব্বেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে:—

১। তরিতরকারির চাষের উপযুক্ত বাড়ীর সংলগ্ন কত পরিমাণ জমি আছে এবং সেই জমির মাটি প্রধানতঃ কি কি শাকসব্জীর উপযুক্ত;

২। প্রত্যেক পরিবার কি কি শাকসব্জী খাইতে পছন্দ করেন;

৩। পছন্দমত প্রত্যেক শাকসব্জী প্রত্যেক ঋতুতে মোটামুটি কত পরিমাণ জমিতে উৎপাদন করিলে উহা প্রয়োজনমত প্রায় প্রত্যেক দিনই পাওয়া যাইবে;

৪। প্রত্যেক শাকসব্জীর প্রকৃতি অনুযায়ী কোন্ অংশে কখন, কি কি শাকসব্জী উৎপাদন করিলে জমির কোনও অংশ অযথা খালি পড়িয়া থাকিবে না;

(৫) কোনও সব্জী (আলু, রাঙ্গালু, পিঁয়াজ প্রভৃতি ছাড়া যাহা বহুদিন রাখা যায়) একসঙ্গে বেশী পরিমাণ জমিতে বুনিলে উহা একসঙ্গে ফল দিবে এবং পরিবারের প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়া পড়িবে এবং নষ্ট হইয়া যাইবে; সুতরাং উহা প্রয়োজন মত কিছুদিন পর পর বুনিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও মনে রাখিতে হইবে:—

(ক) শাকসব্জীর চাষের জন্য বাতাস ও রৌদ্রের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং শাকসব্জীর বাগান বেশ খোলা জায়গায় হওয়া দরকার, যেন উহার উপর কোন বড় গাছের বা অন্যান্য জিনিসের ছায়া না পড়ে; শাকসব্জীর জমি খুব উঁচু হওয়া দরকার, যেন উহার উপর জল না দাঁড়ায়।

(খ) শাকসব্জীর পক্ষে দোঁয়াশ মাটিই উপযুক্ত; মাটি খুব গভীর ভাবে কর্ষণ করিয়া বা কোদাল দ্বারা কোপাইয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে। উহাতে ইট, পাটকেল, জঙ্গল, কীটপতঙ্গ, ইত্যাদি যেন না থাকে।

(গ) শাকসব্জীর জন্য সারের খুবই প্রয়োজন; এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে সব্জী-ক্ষেতের কোন অংশই কোনও সময়ে খালি পড়িয়া থাকিবে না; একটি ফসলের পরেই আর একটি ফসল লাগাইতে হইবে; কাজেই প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করিয়া সব্জীক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি সব সময়েই বজায় রাখিতে হইবে। সুতরাং শাকসব্জীর চাষ করিতে হইলে সারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এই সম্পর্কে উত্তমরূপে সংরক্ষিত গোবর ও গোচনা সার ও 'কম্পোষ্ট' সার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

(ঘ) শাকসব্জীর জন্য জলসেচনের বিশেষ দরকার; কাজেই কোন জলাশয়ের নিকটে শাকসব্জীর বাগান হইলে জলসেচনের বিশেষ সুবিধা হইবে।

(ঙ) শাকসব্জীর ক্ষেত সকল সময়েই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে; মাঝে মাঝে নিড়ানীর দ্বারা জমি আলগা করিয়া দিতে হইবে; ইহাতে জমির রস রক্ষা হইবে।

(চ) শাকসব্জীর ক্ষেতে পোকা দেখিলেই উহা মারিয়া ফেলিতে হইবে। গাছের রোগাক্রান্ত পাতা বা ডালও কাটিয়া পোড়াইয়া বা অন্যভাবে নষ্ট করিয়া ফেলা দরকার। সব্জীক্ষেতের আশেপাশে জঙ্গল, রাবিশ ইত্যাদি থাকিলে উহারা পোকার বা রোগের আশ্রয়স্থল হয়; সুতরাং যতটা সম্ভব সব্জীক্ষেতের আশেপাশের জমিও পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

(ছ) জমির আকার অনুযায়ী সব্জী-বাগানকে ছোট ছোট সমান খণ্ডে ভাগ করিয়া লইলে অনেক সুবিধা হইবে; প্রত্যেক খণ্ডে যাতায়াত করিবার জন্য মাঝে মাঝে রাস্তা থাকা দরকার।

(জ) জানাশোনা এবং বিশ্বস্ত বীজ-বিক্রেতার নিকট হইতেই বীজ ক্রয় করা উচিত। প্রায় প্রত্যেক সব্জীরই জলদি, মাঝামাঝি, নাবী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বীজ আছে। বপনের সময় অনুযায়ী জলদি, মাঝামাঝি বা

* ১৩৫০ সালের পৌষ মাসের "প্রবাসী" দেখুন।

নাবী জাতীয় বীজ ক্রয় করা আবশ্যক। এই বিষয়ে বীজ-বিক্রেতার পরামর্শ লওয়া ভাল।

(ঝ) সব্জীর চারা প্রস্তুত, চারা নাড়িয়া রোপণ, চারা রক্ষা প্রভৃতি অতি যত্নসহকারে করিতে হইবে।*

(ঞ) তরিতরকারির বাগানটি সুন্দরভাবে রচনা করা উচিত। উহা যেন বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করে! বাগানের চারিধারে বেড়া থাকা আবশ্যক।

(ট) সব্জী-বাগানের অধিকাংশ কাজ নিজেদেরই করা উচিত; বাড়ীর মহিলারা ও ছেলেমেয়েরা ইহাতে অনায়াসে সাহায্য করিতে পারেন।

মোটামুটি ভাবে দেখা গিয়াছে যে, একটি সাধারণ পরিবারের (মোটামুটি ছয় জন পূর্ণবয়স্ক লোকের) ৬½ কাঠা (১২০×৪০ ফুট) জমিতে (রাস্তা ও আইল সমেত) শাকসব্জী উৎপাদন করিলে উহা দ্বারা সারা বছরের প্রয়োজন মত নানারকমের টাট্‌কা তরিতরকারি সব সময়েই পাওয়া যায়; ইহা ছাড়া ইহাতে কয়েক রকমের ফলের গাছও যেমন—কলা, পেঁপে, আনারস, কাগজী-লেবু, পাতিলেবু, তরমুজ, ফুটি, খরমুজা, শসা ইত্যাদি এবং আদা, হলুদ, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্যও রোপণ করা চলে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যেক দিন খাদ্য হিসাবে অন্ততঃ দশ আউন্স পরিমাণ টাট্‌কা শাকসব্জী গ্রহণ করা উচিত; সুতরাং ছয়জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি পরিবারের জন্য প্রতিদিন ৪ পাউণ্ড বা ২ সের টাট্‌কা তরিতরকারির প্রয়োজন। অর্থাৎ শাকসব্জীর বাগানে সব সময়ে যদি আট রকমের শাকসব্জী ফলে এবং প্রত্যেক শাকসব্জীর গাছ হইতে প্রত্যেক দিন অন্ততঃ এক পোয়া সব্জী সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত পরিবারের প্রয়োজন মত প্রত্যেক দিন উপযুক্ত পরিমাণ তরিতরকারি পাওয়া যাইবে। একটি 'প্ল্যান' অনুসারে ৬½ কাঠা জমি (১২০×৪০ ফুট) ছোট ছোট সমান খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডে প্রত্যেক ঋতুতে দফায় দফায় শাকসব্জী উৎপাদন করিলে প্রত্যেক দিন উক্ত পরিমাণ অর্থাৎ দুই সের শাকসব্জী অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। যেখানে পরিবারের লোকসংখ্যা ছয়জনের অধিক সেখানে বাগানের আয়তনও বেশী হওয়া দরকার।

সাড়ে ছয়কাঠা জমি (১২০×৪০ ফুট) কিরূপভাবে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কোন্ কোন্ খণ্ডে কোন্ কোন্ সময়ে কি কি শাকসব্জী বপন করা যাইতে পারে তাহা এতৎসংলগ্ন একটি নক্সায় বা 'প্ল্যানে' মোটামুটিভাবে দেখান হইল। প্রত্যেক খণ্ডটি ১২ ফুট লম্বা ৯ ফুট চওড়া হইবে; প্রত্যেক খণ্ডে যাহাতে সহজে যাতায়াত করিতে পারা যায়, তাহার জন্য জমির চারিধারে ২ ফুট চওড়া এবং মাঝখানে একটি ২ ফুট চওড়া রাস্তা থাকিবে; এবং এই রাস্তা হইতে প্রত্যেক দিকে ২ ফুট চওড়া দুইটি করিয়া রাস্তা রাখিলে সব্জীক্ষেতের সর্বত্র অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারা যাইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক খণ্ডের আইল এক ফুট চওড়া হইলে প্রত্যেক খণ্ডে যাতায়াতের কোনই অসুবিধা হইবে না। এই জমিটিকে এইরূপ ভাবে ১৮টি সমান খণ্ডে ভাগ করিয়া লইলে জমির উপরের দিকে ১২ ফুট চওড়া ও ৩৬ ফুট লম্বা, নীচের দিকে ১২ ফুট চওড়া ও ৩৬ ফুট লম্বা জমি পড়িয়া থাকে; একপাশেও ৯ ফুট চওড়া এবং ৯০ ফুট লম্বা জমি থাকিবে—এই সকল জমিতে মাচায় যে সকল তরকারি বা ফল হয় যেমন লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, করলা, শসা ইত্যাদি এবং কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, ফুটি, ইত্যাদি ফল রোপণ করা যাইবে। কাগজী-লেবু এবং পাতিলেবুর দুইটি গাছও রোপণ করা চলে। নক্সাতে এই সকল ফলও দেখান হইয়াছে। কোন্ কোন্ শাকসব্জী বা ফল কোন্ কোন্ মাসে রোপণ করিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ মাসে উহাদের ফল দেওয়া শেষ হইবে তাহাও প্রত্যেক খণ্ডে লিখিত প্রত্যেক শাকসব্জী বা ফলের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে; প্রথম মাস বপনের সময়, দ্বিতীয় মাস ফসল শেষ হইবার সময়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বপনের মাস বা ফসল শেষ হইবার মাস মোটামুটি ভাবে দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় মাটি, জলবায়ুর অবস্থা ইত্যাদি অনুযায়ী ইহার কিছু অদলবদল হইবে। কখনও কখনও হয়তো একটি ফসলের পর আর একটি ফসল বোনার সম্ভাবনা থাকিবে না। সাধারণতঃ কোন্ কোন্ শাকসব্জী এবং এই নক্সায় উল্লিখিত ফলমূল কোন্ কোন্ মাসে রোপণ করিতে হয়, তাহাদের রোপণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটি তালিকাও এই সঙ্গে দেওয়া হইল। বীজক্ষেত্র বা "হাপোর" প্রস্তুতের জন্য এই বাগানের মধ্যে বা বাহিরে জমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে।

বৈশাখ—বেগুন: প্রথমে বীজতলায় চারা প্রস্তুত করিয়া ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৩ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। ঢেঁড়স ২ ফুট অন্তর লাইন

* ১৩৪৯ সালের আশ্বিন মাসের "প্রবাসী" দেখুন।

কিচেন গার্ডেনের একটি প্ল্যান (মোটামুটি ৬২ কাঠা)

২´ রাস্তা ৪০´ ২´

৮´ ৮´

পেঁপে (এক লাইন) জ্যৈষ্ঠ ৮।১০ মাস পর ৩৬´

১২´ তরমুজ … অগ্রহায়ণ—চৈত্র | ফুটি … অগ্রহায়ণ—চৈত্র | খরমুজা … অগ্রহায়ণ—চৈত্র

সীম (মাচায়) জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক | চিচিঙ্গা (মাচায়) বৈশাখ—আশ্বিন | ঝিঙ্গা (পালা) বৈশাখ—ভাদ্র

পটল … কার্ত্তিক (২।৩ বৎসর লাগিবে)

বাম দিক

১২´
৯´ ভুট্টা — বৈশাখ—ভাদ্র
রাঙ্গালু — আশ্বিন—চৈত্র

১২´
কাঁকড়ি — চৈত্র—আষাঢ়
৯´ ফুলকপি — শ্রাবণ—কার্ত্তিক
বাঁধাকপি — অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন

১২´
মুলা ও চাঁপা নটে শাক—চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ
৯´ * বিলাতী বেগুন — আষাঢ়—আশ্বিন
" — কার্ত্তিক—মাঘ

২´ রাস্তা

১২´
৯´ বেগুন ও লঙ্কা — কার্ত্তিক—ভাদ্র

কাঁকড়ি ১২´ — চৈত্র—আষাঢ়
৯´ * মটর শুঁটি — শ্রাবণ—কার্ত্তিক
" — কার্ত্তিক—মাঘ

১২´
ওল — বৈশাখ—আশ্বিন
৯´ আলু ও কুমড়া — কার্ত্তিক—বৈশাখ
(আলু ফাল্গুন মাসের মধ্যেই তোলা যাইবে)

২´ রাস্তা

১২´
ঢেঁড়শ — জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন
৯´ ফুলকপি ও বাঁধাকপি — কার্ত্তিক—মাঘ

১২´
৯´ বেগুন ও লঙ্কা — বৈশাখ—চৈত্র

কচু ১২´ — জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন
৯´ আলু ও কুমড়া — কার্ত্তিক—বৈশাখ
(আলু ফাল্গুন মাসের মধ্যেই তোলা যাইবে)

মধ্যে: রাস্তা

ডান দিক

১২´
ভুট্টা — জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন
উচ্ছে (ভুঁয়ে) — কার্ত্তিক—চৈত্র

ঢেঁপারি :২´ — বৈশাখ—ভাদ্র
৯´ ওলকপি — আশ্বিন—কার্ত্তিক
" — অগ্রহায়ণ—পৌষ
লাউ (ভুঁয়ে) — মাঘ—চৈত্র

১২´
ঢেঁড়শ — জ্যৈষ্ঠ—ভাদ্র
৯´ বাঁধাকপি ও ফুলকপি — আশ্বিন—পৌষ
ঝিঙ্গা (ভুঁয়ে) — পৌষ—বৈশাখ

মুলা, ডাঁটা, পুঁই ১২´ — চৈত্র—শ্রাবণ
৯´ * বীট, গাজর, শালগম, বিলাতী মুলা — ভাদ্র—মাঘ

কচু ১২´ — বৈশাখ—ভাদ্র
৯´ পিঁয়াজ — কার্ত্তিক—চৈত্র

১২´
ঢেঁড়শ — বৈশাখ—শ্রাবণ
৯´ ফুলকপি ও বাঁধাকপি — ভাদ্র—অগ্রহায়ণ
লাউ (ভুঁয়ে) — পৌষ—চৈত্র

১২´
লেটুস, পালম শাক — শ্রাবণ—পৌষ
৯´ ঝিঙ্গা (ভুঁয়ে) — পৌষ—চৈত্র
ডাঁটা, পুঁই — বৈশাখ—আষাঢ়

১২´
৯´ বেগুন ও লঙ্কা — বৈশাখ—চৈত্র

চুকাপী ১২´ — চৈত্র—ভাদ্র
৯´ * বিলাতী সীম — ভাদ্র—মাঘ

ডান পাশের সারি ৯´
করলা (মাচায়) চৈত্র—ভাদ্র
বরবটী (মাচায়) চৈত্র—ভাদ্র
কলা (এক লাইন) বৈশাখ—১০।১২ মাস পর
আনারস (এক লাইন) আষাঢ়—দেড় বৎসর পর
বৈশাখ—ভাদ্র
কাঁকরোল (মাচায়)
১০´

রাস্তা ১২০´ | রাস্তা

আদা, হলুদ বৈশাখ—পৌষ | কাগজী লেবু | পাতি লেবু ৩৬´

১২´ লাউ বৈশাখ—শ্রাবণ, | কুমড়া জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন | শশা চৈত্র—শ্রাবণ

" কার্ত্তিক—চৈত্র | " কার্ত্তিক—বৈশাখ | " আশ্বিন—চৈত্র

৮´ ৮´

২´ রাস্তা ২´

* [illegible]

করিয়া প্রত্যেক লাইনে দুই ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। কুমড়া ৫।৬ ফুট অন্তর মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় সাত-আটটি বীজ বপন করিতে হয়। বীজ হইতে গাছ বাহির হইলে চার-পাঁচটি তেজালো গাছ রাখিয়া অন্য গাছগুলি সরাইয়া দেওয়া দরকার। মাচা করিয়া দিতে হয়; শীতকালের এক জাতীয় কুমড়াতে মাচার দরকার হয় না। চিচিঙ্গা ও করলা পাঁচ-ছয় ফুট অন্তর মাদা করিয়া উপরোক্ত ভাবে বীজ বপন করিতে হয়—মাচার দরকার। কাঁকরোল: ঐ। ইহা সাধারণতঃ কন্দ হইতে জন্মায়। ঝিঙ্গা (পালা) চার-পাঁচ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। মাচা করিয়া দিতে হয়। কাঁকড়ি: ঐ। মাচার দরকার নাই। চুকারী: ৪ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। মেটে আলু: চার-পাঁচ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। দেশী মূলা: বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; গাছ বাহির হইলে উহা ৬ ইঞ্চি অন্তর পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার। শিমুল আলু: ৫ ফুট অন্তর লাইন করিয়া ডগা লাগাইতে হয়। মানকচু: ২½ ফুট অন্তর মূল বসাইতে হয়। কচু ১½।২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ১½ ফুট অন্তর মুখী লাগাইতে হয়। বরবটি: তিন-চার ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। লতাইয়া উঠিবার জন্য ঠেকনার আবশ্যক। টেঁপারি: ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়।

হলুদ—২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ৯ ইঞ্চি অন্তর মূল বসাইতে হয়। আদা—ঐ। লঙ্কা—বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হইবে। নানাবিধ দেশী শাক—বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। কলা—আট হাত অন্তর তেউড় বসাইতে হয়। শসা—পাঁচ-ছয় ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। লতাইয়া উঠিবার জন্য ঠেকনার আবশ্যক। ভুট্টা—১½ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ১½ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ—বেগুন, ঢেঁড়শ, কুমড়া, চিচিঙ্গা, করলা, কাঁকরোল, ঝিঙ্গা, মেটে আলু, মূলা, বরবটি, কচু, মানকচু, টেঁপারি, লঙ্কা, শাক, কলা, ভুট্টা। লাউ: ৬ ফুট অন্তর মাদা করিয়া মাদায় বীজ বপন করিতে হয়। মাচা করিয়া দিতে হয়। ভুঁয়ে লাউ-এর জন্য মাচার দরকার নাই। সীম: ৪।৫ ফুট অন্তর মাদা করিয়া মাদায় বীজ বপন করিতে হয়। মাচা করিয়া দিতে হয়।—ফুল কপি: বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়।

আষাঢ়—বেগুন, লাউ, ঝিঙ্গা, সীম, দেশী মূলা, বরবটি, চিচিঙ্গা, বিলাতী মূলা, মানকচু, লঙ্কা, শাক, পেঁপে। বাকলা সীম: ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়। মাচা করিয়া দিতে হয়। ফুলকপি: বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। বিলাতী বেগুন: বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২½ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। ঠেকনার আবশ্যক। আনারস—৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া তেউড় বসাইতে হয়।

শ্রাবণ—বেগুন, বাকলা সীম, বরবটি, মূলা, শাক, ফুলকপি, বিলাতী মূলা, বিলাতী বেগুন, আনারস। বীট: সরাসরি জমিতে কিম্বা বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ১ ফুট অন্তর লাইনে ১ ফুট অন্তর বীজ বা চারা বসাইতে হয়। বাঁধাকপি: বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২ ফুট অন্তর লাইনে প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা বসাইতে হয়। মটর শুঁটি—সরাসরি জমিতে ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। লতাইয়া উঠিবার জন্য জাকরির আবশ্যক।

ভাদ্র—বেগুন, বরবটি, মানকচু, বিলাতী সীম, বীট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বিলাতী বেগুন, মটরশুঁটি, বিলাতী মূলা, শাক, আনারস। মিষ্টি আলু: ২।৩ ফুট অন্তর 'কাটিং' লাগাইতে হয়। গাজর: সরাসরি জমিতে ১ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে, এক ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। ওলকপি:—বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ১ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ১ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। লেটুস স্যালাদ: ঐ শালগম: সরাসরি জমিতে ৯ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়।

আশ্বিন—বেগুন, বরবটি, লাউ, মিষ্টি আলু, মূলা, কুমড়া, শাক, বিলাতী সীম, বীট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, ওলকপি, লেটুস (স্যালাদ), মটরশুঁটি, বিলাতী বেগুন, শালগম, আনারস, শসা। পিঁয়াজ: বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া বা সরাসরি জমিতে লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি অন্তর চারা বা গেঁড় বপন করিতে হয়। তরমুজ, ফুটি, খরমুজা—৪ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বপন করিতে হয়।

কার্ত্তিক—বেগুন, লাউ, বরবটি, মিষ্টি আলু, দেশী ও

বিলাতী মূলা, কুমড়া, শাক, বিলাতী সীম, বীট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, ওলকপি, লেটুস, মটরশুঁটি, বিলাতী বেগুন, শালগম, পিঁয়াজ, শসা, তরমুজ, ফুটি, খরমুজা। আলু—২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৯ ইঞ্চি অন্তর ৩ ইঞ্চি গভীর মাটির নীচে বীজ-আলু বসাইতে হয়। পটল—পাঁচ-ছয় ফুট অন্তর "কাটিং" লাগাইতে হয়। উচ্ছে—তিন-চার ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়।

অগ্রহায়ণ—বেগুন, লাউ, উচ্ছে, পটল, শাক, বিলাতী সীম, বীট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, গাজর, লেটুস, পিঁয়াজ, মটরশুঁটি, বিলাতী বেগুন, শালগম, বিলাতী মূলা, তরমুজ, ফুটি, খরমুজা।

পৌষ—ঝিঙ্গা, লাউ, বাঁধাকপি, লেটুস, মটরশুঁটি, শালগম, বিলাতী মূলা, বিলাতী বেগুন, তরমুজ, ফুটি, খরমুজা।

মাঘ—বেগুন, ঝিঙ্গা, বিলাতী মূলা, তরমুজ, ফুটি, খরমুজা।

ফাল্গুন—বেগুন, কুমড়া, চালকুমড়া, করলা, উচ্ছে, ঝিঙ্গা, বরবটি।

চৈত্র—বেগুন, কুমড়া, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, বরবটি, করলা, কাঁকড়ি, চুকারী, দেশী মূলা, সিমুলআলু, উচ্ছে, শসা, হলুদ, আদা।*

* মধ্যপ্রদেশ ও বেরার কৃষি বিভাগের একটি পত্রিকা অবলম্বনে লিখিত।

টিকটিকি ও চড়াই

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১

টিকটিকিটা মনে করে—এ ঘরের মালিক সে। কারণ, সব দেওয়ালেই তার অবাধ গতিবিধি। জানলা দিয়ে যে চড়াইটা আসে-যায়, তাকে সে সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু উপায় কি? চড়াইয়ের দেহের আয়তনকে সে যত ভয় করে, তার চেয়ে বেশী তারিফ করে তার ওড়ার ক্ষমতাকে। তাই আক্রমণ করতে সাহস হয় না।

চড়াইটা ছোট ছোট খড়কুটা আনে—আর বাসা বাঁধে কড়ি-বরগার ফাঁকে। টিকটিকি বিষণ্ণ মনে ভাবে, তাই তো কি করা যায়?

হঠাৎ এক দিন এক আরসোলা উড়ে এসে বসল সেই টিকটিকির পাশে। টিকটিকি কাতরভাবে বলল—"ভাই আরসোলা! তুমি ত বেশ উড়তে পার। একটু চেষ্টা কর না, আমার হু'চোখের বিষ ওই চড়াইটাকে তাড়াতে?"

আরসোলা বলে—"উড়তে আমি পারি সত্যি। কিন্তু আমার তো গতি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই! কোথা থেকে উড়ে কোথায় গিয়ে পড়ি, তা আমি নিজেই জানি না।"

টিকটিকি ভাবে তা সত্যি। সেকেলে রাজাদের তলোয়ারের মত, আরসোলার ফিনফিনে পাতলা পাখা দুটো ঢাকা থাকে খুব শক্ত দুটো খাপে। রাজাদের মতই, তলোয়ারের ধারের চেয়ে তার খাপের চাকচিক্য বেশী।

টিকটিকি তার কাছে গিয়ে বলে—"ভাই কুণো ব্যাঙ! তুমি কি পার ওই চড়াইটাকে তাড়াতে?"

কুণো ব্যাঙ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—"আমি কি ক'রে তাড়াব বল? সে থাকে উপরে, আমি থাকি নীচেয়। যদি কোন দিন নেমে আসে নীচেয়, সেই দিন হবে—আমার সঙ্গে বোঝাপড়া।"

টিকটিকি বলে—"তাতো বটেই—ঠিক, ঠিক, ঠিক।"

২

গত্যন্তর না দেখে টিকটিকি ডেকে আনল এক গুবরে-পোকাকে। সে এসেই চড়াইটার চার পাশে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা সুরু করল—"ভাই চড়াই! তুমিও পাখী, আমিও পাখী। আমি গোবর থেকে উড়ে এসে মাঝে মাঝে গৃহস্থের ঘরে ঢুকি বটে, কিন্তু কখনো কোথায়ও বাসা বাঁধি না। কি দরকার? উন্মুক্ত আকাশ, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, অসংখ্য জলাশয়, তা ফেলে কেন এসে বাসস্থান নির্ব্বাচন করব, একটা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আচ্ছাদনের তলে? অনন্তের সন্ধানী পক্ষীজাতি, অসীমের সহচর পক্ষীজাতি, বিরাটের ব্যাপারী পক্ষীজাতি···"

হঠাৎ গুবরে-পোকা ধপাস করে পড়ে গেল মেঝের। টিকটিকি ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করে—"কি হ'ল ভাই! বেশ ত বলছিলে। হঠাৎ পড়ে গেল কেন?"

গুবরে-পোকার ওড়াটা খুব স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ নয়। তার অবস্থাও ঠিক আরসোলার মত। অধিকন্তু, দেহের ওজন অতি অসঙ্গত রকম ভারী। পেট্রোল-ফুরিয়ে-যাওয়া বম্বারের মত সে যে হঠাৎ যেখানে-সেখানে পড়ে যেতে পারে, এ কথাটা টিকটিকির জানা ছিল না। তবু জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কি আর উড়তে পারবে না? তোমার বক্তৃতা কি শেষ হয়ে গেল?"

গুবরে-পোকা বলে—"নিশ্চয়ই না। আমি আবার উড়ব, আবার বক্তৃতা করব, তবে একটু সময় লাগবে, জিরিয়ে নিতে।"

কুণো ব্যাঙ খুব গম্ভীরভাবে বলে—"ওসব ভাড়াটে বক্তার সাহায্যে কোন ফল হবে না। নিজে কি করতে পার, তাই ভাব।"

টিকটিকি বলে—তা সত্যি। ঠিক, ঠিক, ঠিক।

৩

টিকটিকি, আরসোলা, আর কুণো-ব্যাঙ—এই তিন জনে মিলে এক ত্রিশক্তি-বৈঠকের অধিবেশন হ'ল। আলোচ্য বিষয়—"দুষমণ চড়াইটাকে কি উপায়ে তাড়ানো যায়।"

কুণো ব্যাঙ বলে, "দেখো ভাই! আমি হচ্ছি ক্ষেত্রজ্ঞ। যে-হেতু এই মেঝেয় থাকি। ঘরের মালিক যে কে তা তোমরা জান না। আমি জানি। আমাদের কারও 'মালিকানা-স্বত্ব-স্বামিত্ব' নেই এ ঘরে। সত্যি মালিকের চাকরটা যখন রোজ একবার এসে এই মেঝের উপর ঝাঁটা বুলিয়ে যায়, তখন আমাকে জানিয়ে যায় 'কে সেই মালিক!' দেওয়ালের গায়ে ওই যে একটা গর্ত্ত দেখতে পাচ্ছ—ওখানে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করি বলে আজও বেঁচে আছি।"

চার-দেওয়ালের মালিক টিকটিকি! অবাধ গতিবিধির জন্যে একটু স্ফীতমস্তক টিকটিকি! এক কথায়, অন্য কারও মালিকত্বে অসহিষ্ণু টিকটিকি অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলে, "কেন বাজে বকছ? মালিক যেই হোক্—ওই দুষমণ চড়াইটাকে কি ভাবে তাড়ানো যায়, সেই কথাই আলোচনা কর।"

কুণো ব্যাঙ হেসে বলে, "গৃহস্বামী কে, তা সাব্যস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত চড়াইয়ের বিরুদ্ধে অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগ টিকবে না। আগে গৃহস্বামীকে চেনো।"

আরসোলা একটু মাথা চুলকিয়ে চিন্তিতভাবে বলে, "আমারও তাই মনে হয়। আমিও যেন মাঝে মাঝে টের পাই—এ ঘরের মালিক আমাদের উপরেও আর একজন আছেন, যাঁকে আমরা চিনি না।"

টিকটিকি রেগে যায়, কিন্তু রাগলে তো চলবে না। পাঁচ জনকে নিয়ে কাজ। 'সবার মতে মত মিশাতে হবে।' তাই একটু সাম্‌লে নিয়ে বলে—"আচ্ছা, স্বীকার করছি। এখন বল তার পর কি?"...

কুণো ব্যাঙ মাথা নেড়ে বলে—"উঁহু! তোমার ও স্বীকারে আমি খুশী হলাম না। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। তুমি একটু ভাবো। কাল আবার বৈঠকে বসা যাবে।"

আরসোলা বলে—"ক্ষতি কি? ভাবো না একটু—"

টিকটিকি বলে—"আচ্ছা, ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্..."

৪

পরের দিন আবার বৈঠক। কুণো ব্যাঙ বলতে লাগল—"গৃহস্বামীর স্বভাব-চরিত্র বা মেজাজ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে। তোমরা যদি একটা কাজ করতে পার, তাহ'লে চড়াইটাকে তাড়াতে এক দিনের বেশী সময় লাগবে না।"

টিক্‌টিকি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—"কি?"

কুণো-ব্যাঙ বলে—"গৃহস্বামী সাহিত্যিক। দুনিয়ার ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তিনি ঐ টেবিলে ব'সে লেখাপড়া করেন। চড়াই বাসা বেঁধেছে ঠিক তাঁর মাথার উপরে। অনেক খড়কুটো সংগ্রহ ক'রে রেখেছে সেখানে। তিনি যখন লিখতে বসবেন তখন তুমি আর আরসোলা দুজনে গিয়ে খড়কুটোগুলো ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ফেলবে তাঁর লেখার উপরে।"

আরসোলা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—"তা'তে কি হবে?"

কুণো ব্যাঙ বলে—"গৃহস্বামীর চাকরটা যে ঝাঁটা দিয়ে রোজ মেঝে সাফ করে—সেই ঝাঁটাগাছটা কোনো বাঁশের ডগায় বেঁধে সাফ্ করবে ঐ কড়ি-বরগা।"

আরসোলা আর টিক্‌টিকি, কুণো ব্যাঙের এ যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারে না। বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে পরস্পরের মুখের দিকে। টিকটিকি আরসোলাকে জিজ্ঞাসা করে, "কুণো ব্যাঙ কি বলে?"

আরসোলা বিরক্ত ভাবে বলে—"কি জানি ভাই, আমি বুঝতে পারছি নে।"

কুণো ব্যাঙ হেসে বলে—"সাহিত্যিককে তোমরা চেন না। এই ঘরখানিকে চড়াই, টিক্‌টিকি, আরসোলা, মাকড়সা, গুবরে-পোকা, উই, ইঁদুর, কুণো ব্যাঙ প্রভৃতি যে-কেউ তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারে ততক্ষণ, যতক্ষণ সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টির কোন বিঘ্ন না ঘটে। তার সৃজন-বাসনার ব্যাঘাত না হয়।"

টিকটিকি খুব অনুসন্ধিৎসু ভাবে বলে—"বুঝতে পারলাম না। লেখার উপর খড়কুটো পড়লে তিনি চট্‌বেন কেন? তাঁর লেখাও যা, খড়কুটোও তো তাই।"

কুণো ব্যাঙ রেগে বলে—"তোমরা কিছু জান না। শক্তিমান্ সাহিত্যিকের লেখা কামান-গোলার চেয়েও ভয়ানক। তা'তে থাকে ঝড়ের বেগ, ভূমিকম্পের ঝাঁকি, জলোচ্ছ্বাসের উৎপাত! জগতের যত অশান্তি ও বিপ্লবের মূলে থাকে তাঁরই কলমের খোঁচা। টিকটিকি বা আরসোলার মত কে তাঁর নিজের নোংরা ঘরখানিকে নিজস্ব ব'লে দাবি করছে সে দিকে লক্ষ্য নেই বটে, কিন্তু বিশ্বমানবের অধিকার-বিচার নিয়ে হয়ত তাঁর মাথার ভেতর দাবানল জ্বলছে—কপালে ঝরছে বিন্দু বিন্দু ঘাম! সেই লেখার উপর যদি তোমরা খড়কুটো ফেলতে পার তা হ'লে নিশ্চয়ই আগুন জ্বলবে—চড়াইটা পালাতে পথ পাবে না।"

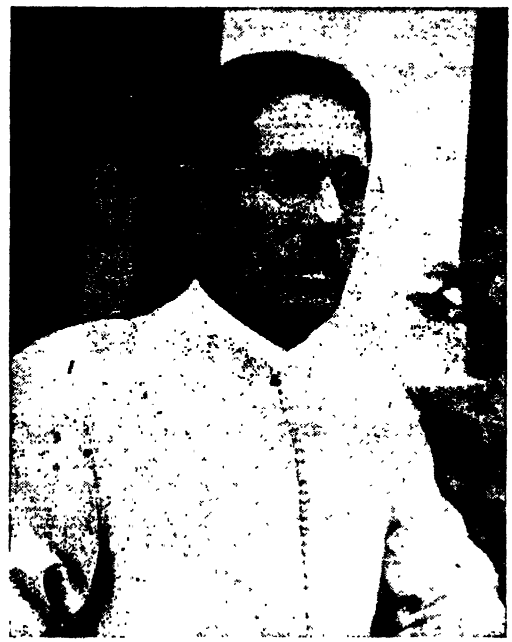
টিকটিকি এবার মাথাটা উঁচু ক'রে খুব সমঝদারের মত বলে—"ঠিক বলেছ। ঠিক, ঠিক, ঠিক।"

নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎ চন্দ্র রায়

শ্রীশ্যামল গুহ সরকার

শরৎচন্দ্র ১৮৭১ সালে ৪ঠা নবেম্বর খুলনা জেলাস্থিত বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত কাড়াপাড়া গ্রামে এক বিখ্যাত বঙ্গজ কায়স্থ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্র রায় মুন্সেফ ছিলেন। শৈশবে শরৎচন্দ্র পিতার সঙ্গে থাকিয়া বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ১৮৮৮ সালে কলিকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৯০ সালে ফার্ষ্ট আর্টস, ১৮৯২ সালে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি-এ ও ১৮৯৩ সালে এম-এ পাস করেন। শরৎচন্দ্র ১৮৯৫ সালে রিপন কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সেজন্য কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থাতেই তাঁহাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ১৮৯৭ সালে আলিপুর আদালতে আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম সূচনা হয়। ঐ বৎসরেই তিনি ছোটনাগপুরে জুডিশিয়াল কমিশনারের কোর্টে ওকালতী করিবার মানসে রাঁচী গমন করেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই আইন-ব্যবসায়ে রাঁচীতে তাঁহার পসার ও প্রতিপত্তি বাড়িল—তিনি বিশিষ্ট উকিল বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

এই সময়ে তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদিগের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি দেখিলেন, ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী মুণ্ডারা বিজাতীয়দের হস্তে অতি নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারার্থ তিনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত মুণ্ডাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেন এবং তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার ইংরেজী সংবাদপত্রে আন্দোলন করেন। ঐ সময় পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে আদিম অধিবাসীদের আচার-নিয়ম ও জমিজমা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তৎসম্পর্কীয় জটিল সমস্যাদি সমাধানের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিতেন। এই মুণ্ডাদের সম্বন্ধে গবেষণার ফল স্বরূপ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে *The Mundas and Their countries* নামক তাঁহার নৃতত্ত্ব-বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থ বহু খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং উহা বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। ভারত-সরকার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাইজার-ই-হিন্দ্ মেডেল দানে পুরস্কৃত করেন। উক্ত মেডেল প্রদান



শরৎ চন্দ্র রায়

কালে বিহার ও উড়িষ্যার তৎকালীন লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণর সার চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট বেলী, ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৩ তারিখে বাঁকিপুর দরবারে তাঁহার সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

Sarat Chandra Roy, Esq., M.A., B.L.—It gives me great pleasure to present to you, by command of His Excellency the Viceroy and Governor-General of India, the Kaisar-i-Hind Medal, of the second class, for public service in India, which His Excellency has been pleased to award to you. You have devoted many years to investigation into the history and ethnology of the Mundas of Chota-Nagpur and have recently embodied the results of your enquiries in a most interesting and valuable work called "The Mundas and their Country." You have rendered the people of this tribe even more useful service, by your endeavours to secure a proper understanding, by the courts, of their laws and customs and you have throughout maintained, at considerable loss to yourself, a high standard of professional integrity which has won for you the esteem and respect of all classes. I congratulate you heartily on the honor which

has been conferred upon you and I trust that you may long live to enjoy it."

ভারতের, বিশেষ ভাবে ছোটনাগপুরের আদিম জাতিগুলির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানী বলিয়া শরৎচন্দ্র দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনে নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ জে, এইচ্ হাটন্ এম-এ, ডি-এসসি, এল-এলডি, সি-আই-ই (ভূতপূর্ব্ব ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেন্সাস্ কমিশনার ও বর্ত্তমানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক) তাঁহার অভিভাষণে ভারতীয় এথনলজি বা নৃবিজ্ঞানের জন্মদাতা বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখ করেন।*

তিনি ১৯১৯ ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৎসরের জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রিডারশিপ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিহার-উড়িষ্যার তাৎকালীন গবর্ণর ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর স্যর্ এডওয়ার্ড গেট নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানে শরৎচন্দ্রের গভীর-জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া এই মন্তব্য করিয়াছিলেন :

"He knew more about the subject (Anthropology) than anybody else in India."

শরৎচন্দ্র কেবলমাত্র ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল (ইং ১৯২১-৩৭) এই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে জনসাধারণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশী-বিদেশী বহু উচ্চস্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পাটনা যাদুঘরের প্রথম কিউরেটার। বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটির তিনি জেনারল সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি লণ্ডনের ফোক্‌লোর সোসাইটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই সম্মান আজ পর্য্যন্ত আর কোন ভারতীয়ের অদৃষ্টে মিলে নাই। ঐ বৎসরই তিনি ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি ইণ্টারন্যাশান্যাল কাউন্সিল ডি অনারের নৃতত্ত্ব ও জাতি-বিজ্ঞান শাখার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সাল পর পর দুই বৎসর তিনি "অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সে"র নৃবিজ্ঞান ও ফোক্‌লোর শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি "ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট্ অফ সায়েন্স ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক প্রতিষ্ঠানের এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউনডেশন ফেলো ছিলেন।

* *Journal of the Indian Anthropological Institute*, vol. I, Nos. 1 & 2, p. 6.

নৃতত্ত্ব ও জাতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

The Mundas and their Countries (1912).
The Oraons of Chota-Nagpur (1915).
Principals and Methods of Physical Anthropology (1920).
The Birhors (1925).
Oraon Religion and Customs (1928).
The Hill Bhuinyas of Orissa (1935).
The Kharias (1937).

১৯২১ সালে তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে নৃতত্ত্ব-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা *Man In India* প্রথম প্রকাশ করেন এবং তাহা অদ্যাবধি সুনামের সহিত চলিতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত এই পত্রিকাখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের ২৮শে অক্টোবর "নেচার" পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন—"বিজ্ঞানের নীরস আলোক ও নিঃস্বার্থ গবেষণা (ভারতবর্ষে) একটি অতি ক্ষুদ্র সঙ্ঘ কর্ত্তৃক উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং এই সঙ্ঘের প্রবীণ নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র রায় চিরদিনই এজন্য সম্মানপ্রাপ্ত হইবেন।"*

১৯৪১ সালে 'ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস' শরৎচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বহু নৃতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক সম্মিলিতভাবে রচিত গ্রন্থ "Essays in Anthropology" তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল অধ্যয়ন, অনুসন্ধান অনুশীলন ও জ্ঞান আহরণ। তিনি অধিকাংশ সময় তাঁহার পুস্তকাগারে অতিবাহিত করিতেন এবং বোধ হয় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহারই নৃতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকাগারটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার শান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তি প্রথম দর্শনেই সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। তিনি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন, যিনি যখনই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনি তখনই তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের স্বদেশ—বাংলা দেশ কোন দিনই তাঁহাকে ভুলে নাই, চিরদিনই তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। তাহার নিদর্শন-স্বরূপ ১৯৩৮ সালে গৌহাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

যে সকল বাঙালী প্রবাসে থাকিয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন শরৎচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ৩০শে এপ্রিল (১৯৪২) তারিখে রাঁচীতে তাহার দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে।

* The dry light of pure science and disinterested research was kept aflame (in India) by a small band of devoted enthusiasts, among whom the veteran anthropologist Sarat Chandra Roy will ever be held in honour.

সর্প-ভুক্ ব্যাঙ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সকলেই জানেন—সাপ ব্যাঙ ধরিয়া খায়; কিন্তু ব্যাঙ সাপ ধরিয়া খায়—এ কথা বলিলে অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। ইঁদুরের বিড়াল শিকারের মত—ব্যাঙের সাপ খাওয়ার কথা অনেকেই উদ্ভট কল্পনা বলিয়া মনে করেন; কিন্তু কোনটাই ইহার উদ্ভট কল্পনা নয়, নিছক সত্য কথা। কেহ

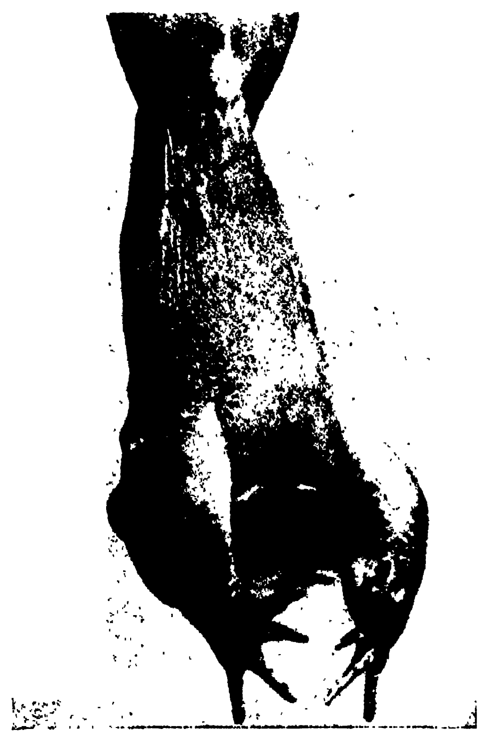


সর্প-ভুক্ ব্যাঙ (স্বাভাবিক অবস্থায়)

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে কোন বিচিত্র দেশের কোন এক রকম অদ্ভুত সর্প-ভুক্ ব্যাঙের কথা বলিতেছি; কিন্তু তাহা নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সর্প-ভুক্ ব্যাঙের অভাব না থাকিলেও আমাদের দেশের সুপরিচিত ব্যাঙের সম্বন্ধেই পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার কথাই বলিব।

অনেক দিন পূর্ব্বে এক বার নৌকাযোগে বিক্রমপুর অঞ্চলের কোন এক পল্লীগ্রামে যাইতেছিলাম। কচুরি পানায় আটক পড়িবার ভয়ে একটা অপ্রশস্ত জলপথে নৌকাটা ডাঙ্গা ঘেঁসিয়া চলিতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ভারী এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন। একস্থানে মোড় ঘুরিবার সময় নৌকাটা এক ধাক্কায় খানিকটা ডাঙ্গার উপর উঠিয়া গেল। ধাক্কা লাগিয়া ঘাসগুলি নড়িয়া উঠিবামাত্রই বড় একটা কোলা-ব্যাঙ লাফাইয়া জলে পড়িল এবং কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। লাফাইয়া পড়িবার সময়টুকুর মধ্যেই দেখিলাম—ব্যাঙটার মুখে প্রায় তিন-চার ইঞ্চি লম্বা সাপের লেজের মত কি যেন একটা পদার্থ ঝুলিতেছে। মাঝিদের একজন বলিল—ও কিছু নয়—কেঁচো। আর একজন বলিল—কুঁচে। যে যাই বলুক, আমার কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। কিন্তু ব্যাঙের মুখে সাপের লেজ—এ কথা ভাবিতেও যেন একটা সাধারণ সংস্কার বাধা দিতেছিল। যাহা হউক, দৃশ্যটা মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

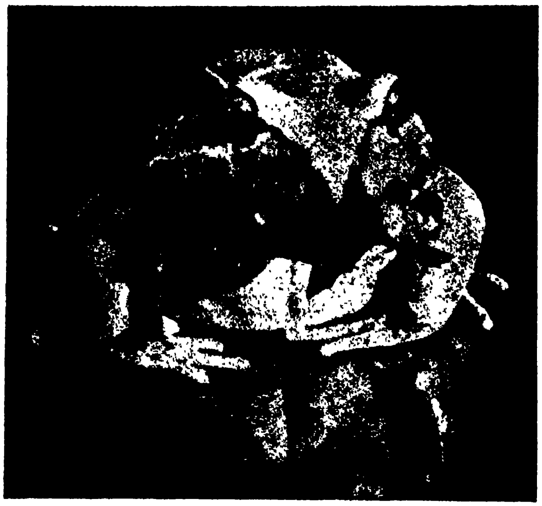
এই ঘটনার অনেক দিন পর এক দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের এক বাড়ীর আঙ্গিনার পাশে কালো রঙের ক্ষুদে পিঁপড়েদের লম্বা লাইনে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গতায়াত লক্ষ্য করিতেছিলাম। পাশের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখি—ধূসর বর্ণের একটা কুণো ব্যাঙ পিঁপড়ের লাইনের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আঁধার নামিয়া আসিলেই কুণো ব্যাঙগুলি থপ্ থপ্ করিয়া আহারান্বেষণে তাহাদের লুক্কায়িত স্থান হইতে বহির্গত হয়! কিন্তু এ ব্যাঙটা এমন চুপচাপ বসিয়া আছে কেন? কাছে গিয়া দেখিলাম সে টক্ টক্ করিয়া পিঁপড়ে ধরিয়া খাইতেছে। একমনে ব্যাঙের পিঁপড়ে ধরার কৌশল দেখিতেছি, হঠাৎ কোথা হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা কেঁচো আসিয়া জুটিল। কেঁচোটা



সর্প-ভুক্ ব্যাঙের সম্মুখের হাতের দৃশ্য

ব্যাঙের কাছাকাছি আসিবামাত্রই চক্ষের নিমেষে সে তাহার সম্মুখ-ভাগ মুখে পুরিয়া লইল। কিন্তু একবারে গিলিতে পারিল না।

মুক্ত হইবার জন্য কেঁচোটার বাহিরের অংশ নানা ভাবে কেবলই মোচড় খাইতেছিল। এই জন্যই গিলিতে অসুবিধা হইতেছিল। এক ঢোক গিলে আবার খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে! অবশেষে খানিকটা উঁচু হইয়া সামনের হাতের সাহায্যে কেঁচোটাকে চাপিয়া



সর্প-ভুক্ ব্যাঙ একটা চামচিকা গিলিতেছে

ধরিয়া গিলিবার অনেকটা সুবিধা করিয়া লইল। তথাপি কেঁচোটাকে সম্পূর্ণরূপে গিলিতে তার প্রায় এক ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিয়াছিল। এই ঘটনায় পূর্ব্বের দৃশ্যের কথা মনে পড়িল—তবে কি ব্যাঙ এইভাবে সাপ খাইতে পারে না? এই ঘটনার কিছু কাল পর বর্ষার প্রারম্ভে একবার বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলা কারখানার সন্নিহিত একটা জলাভূমিতে মশক-ভুক্ ব্যাঙাচির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেছিলাম। নিম্নভূমিতে বৃষ্টির জল জমিয়া মাঝে মাঝে যেন কতকগুলি ছোটখাট হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। পড়ন্ত বেলা, তাহাতে আবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অবস্থা দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আমার বিপরীত দিক হইতে ছোট্ট একটা হেলে-সাপকে সাঁতার কাটিয়া আমার দিকে আসিতে দেখিলাম। সাপটা বাচ্চা; লম্বায় প্রায় দেড় ফুটের মত হইবে। এ পাড়ে আসিয়া সাপটা আমাকেদেখিয়াই বোধ হয় গতি পরিবর্ত্তন করিল এবং আমার নিকট হইতে কিছু দূরে একটা জলজ ঘাসের ঝোপের দিকে অগ্রসর হইল। নেহাৎ চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তাহার উপর নজর পড়িয়াছিল নচেৎ উহার গতিবিধি সম্বন্ধে কোনই কৌতূহল ছিল না। যাহা হউক, সাপটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইতে-না-হইতেই জলের মধ্যে ভারী জিনিস পতনের মত ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। সাপটাও যে ইতিমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় চার-পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধভাবে কাটিবার পর ঝোপটার এক পাশে অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় একটা কোলা-ব্যাঙ দেখিতে পাইলাম। জলজ ঘাসগুলি নড়িবার ফলে মনে হইল যেন কোন কিছুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলিতেছে। নিকটে অগ্রসর হইতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—ব্যাঙ সাপটাকে আক্রমণ করিয়াছে। সাপটার লেজের খানিকটা অংশ ব্যাঙের মুখের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। ব্যাঙের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সাপ শরীরটাকে ঘাসের সঙ্গে জড়াইয়া নানাভাবে মোচড় খাইতেছিল। ইতিমধ্যে মুখখানাকে নীচু করিয়া ঢোক গিলিবার ভঙ্গীতে ব্যাঙ তাহার লেজের আরও খানিকটা অংশ উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। ঘাসের সহিত জড়াইয়া থাকায় গিলিতে অসুবিধা হইলেও প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সাপটার শরীরের অর্দ্ধাংশেরও বেশী ব্যাঙের উদরে প্রবেশলাভ করিল। সাপটাকে তখন অনেকটা নির্জ্জীবের মত বোধ হইল, কারণ শরীরের বাঁধন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছিল। তামাশা দেখিবার জন্য আরও দু-চার জন লোক আসিয়া জুটিল। খুব সম্ভব তাহাদের গোলমালে ব্যাঙটা ভয় পাইয়া এক লম্ফে অপেক্ষাকৃত একটু পরিষ্কার স্থানে আসিয়া পড়িল। সাপটার শরীরের সম্মুখভাগ তখনও ব্যাঙের মুখ হইতে ঝুলিতেছিল। পরিষ্কার স্থানে আসিয়া দুই এক ঢোকেই বাকী অংশ বেমালুম গিলিয়া ফেলিল। সেস্থানে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিবার পর অবশেষে ব্যাঙটা এক লাফে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ব্যাঙ যে সত্য সত্যই সাপ গিলিয়া থাকে এই ঘটনার পর সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। এরূপ কোন ঘটনা পুনরায় নজরে পড়ে কিনা—এই আশায় ব্যাঙ-অধ্যুষিত স্থানে অনেক বার বৃথাই ঘোরাফেরা করিয়াছি। কিন্তু গেল বছর বর্ষাকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঙের ডিম নিষেক করিবার জন্য কয়েকটি ছেলে-ছোকরাকে বিশেষ লক্ষণযুক্ত কোলা-ব্যাঙ সংগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিলাম।



ব্যাঙ ছোট একটা গো-সাপের বাচ্চা গিলিতেছে



গোসাপের লেজটা মাত্র বাহিরে রহিয়াছে। হাতে চাপিয়া ব্যাঙ তাহাকে ধীরে ধীরে গিলিতেছে

একদিন সকালের দিকে ঐরূপ দুইটি ছেলে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল যে, খুব কাছেই নালার মধ্যে একটা সোনা-ব্যাঙ সাপ ধরিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে স্থলে ছুটিয়া গেলাম। কলিকাতার নন্দনবাগান এলাকায় একটা পতিত জমিতে বিমান-আক্রমণের আশ্রয়স্থল হিসাবে কয়েক সার স্লিট-ট্রেঞ্চ খোঁড়া হইয়াছিল। বর্ষার জল জমিয়া সেগুলি অনেক স্থলেই প্রশস্ত ডোবার আকার ধারণ করিয়াছে। একস্থানে জলের মধ্যে বড় একটা মাটির চাঙড় ভাঙিয়া পড়ায় ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারই এক ধারে ছোট ছোট ঘাসের মধ্যে হলদে রঙের মস্ত বড় একটা ব্যাঙ বসিয়া রহিয়াছে। তাহারই মুখে সরু নলের মত একটা সাপ বাংলা '৪'-এর মত কেবলই মোচড় খাইতেছিল। ইতিমধ্যেই সাপটার মুখের দিকের কিয়দংশ তাহার উদরস্থ হইয়াছে। অনুমানে বোধ হইল সাপটা লম্বায় ১৭।১৮ ইঞ্চির কম হইবে না। কিন্তু কোন্ জাতের সাপ তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। ব্যাঙ ধরিতে আসিয়া ব্যাপারটা ছেলেদের নজরে পড়ে। কিন্তু প্রথমে কি ভাবে সাপটা ব্যাঙের কবলে পড়িয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারিল না। পূর্ব্বের ঘটনায় যেরূপ দেখিয়াছিলাম এবারও সেইরূপ ঢোকে ঢোকে সাপটাকে গিলিতে দেখিলাম। সাপটা মোচড় খাইতে খাইতে জড়াইয়া যাইতেছিল বলিয়াই তাড়াতাড়ি গিলিতে অসুবিধা হইতেছিল। মাঝে মাঝে ব্যাঙটা তাহার সম্মুখের হাতের সাহায্যে সাপটাকে চাপিয়া ধরিয়া গিলিবার সুবিধা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় সে সাপটার



সর্প-ভুক্ ব্যাঙ সম্মুখস্থ ছোট ব্যাঙকে অবলীলাক্রমে গিলিয়া ফেলিবে

অধিকাংশই উদরসাৎ করিল। কিন্তু পেটের মধ্যে আর স্থান ছিল না বলিয়াই বোধ হয় লেজের তিন-চার ইঞ্চি মুখের বাহিরেই রহিয়া গেল। তামাশা দেখিবার জন্য কতকগুলি লোক ভীড় করিয়াছিল বলিয়া আশঙ্কা হইল ব্যাঙটা হয়ত ভয়ে পলায়ন করিতে পারে। কাজেই ছেলেগুলোকে ব্যাঙটাকে ধরিতে বলিলাম। তাহারা ব্যাঙ-ধরা জালের সাহায্যে তাহাকে চাপিয়া ধরিল বটে, কিন্তু স্থানটা উঁচুনীচু থাকায় ফাঁক দিয়া জলে লাফাইয়া পড়িয়া সে কোথায় যে অদৃশ্য হইল অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

এই ঘটনার পর—ব্যাঙের সাপ খাওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, না ক্ষেত্রবিশেষে রুচিবিকারের পরিচায়ক মাত্র—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল জাগ্রত হইল। পরীক্ষাগারে বড় খাঁচায় করিয়া কোলা-ব্যাঙ পুষিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় মাসখানেক খাঁচায় থাকিতে অভ্যস্ত হইবার পর এক দিন তাহার সম্মুখে প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা একটা সাপ ছাড়িয়া দিলাম, ব্যাঙের চোখের সম্মুখেই সাপটা কিলবিল করিয়া চলিতে লাগিল। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিলেও সাপটার সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র আগ্রহ লক্ষিত হইল না। ব্যাঙের ভয়ে না হইলেও ইতিমধ্যে সাপটা খাঁচার এক কোণে আত্মগোপন করিল। পুনরায় সেটাকে ব্যাঙের সম্মুখে আনিয়া দিলাম। এবার চলিতে আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙটা চক্ষের নিমেষে সেটাকে বেমালুম মুখে পুরিয়া ফেলিল। টক্ করিয়া একটু শব্দ ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। সাপটা খুব ছোট ছিল বলিয়াই সে একবারে গিলিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক, তার পরে আরও দু-চারটা অপেক্ষাকৃত বড় সাপ লইয়া পরীক্ষার ফলে দেখিয়াছি—লেজই হউক কি মাথাই হউক, সুবিধামত যে-কোন দিক হইতেই প্রথমতঃ সাপগুলিকে ধরিয়া গিলিতে আরম্ভ করে। বাচ্চা সাপের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত লম্বা হইলে এবং আততায়ীর কবল-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলে ব্যাঙের শিকার গিলিতে অনেক সময় লাগিয়া থাকে।



ব্যাঙ একটা লম্বা সাপ গিলিতেছে। প্রথম দিনের অবস্থা

শরীরের মধ্যস্থলে সুতা বাঁধিয়া প্রায় পনর ইঞ্চি লম্বা। একটা খরিশ-গোখরার বাচ্চাকে একবার একটা বড় ব্যাঙের খাঁচায় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ব্যাঙটা নিকটেই বসিয়াছিল। সাপটা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পর একবার ব্যাঙটার পিঠের উপর দিয়া মাথায় চড়িয়া বসিল। ব্যাঙটা কিন্তু তখনও নির্ব্বিকার। কিছুক্ষণ মাথার উপর থাকিবার পর আবার নামিয়া আসিয়া ব্যাঙের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইতেই সুতাসমেত সে তাহাকে চক্ষের নিমেষে টক্ করিয়া মুখের মধ্যে টানিয়া লইল। সুতা ধরিয়া টানাটানির ফলে সাপটার মুখের দিকের অধিকাংশই বাহির হইয়া আসিল বটে—কিন্তু লেজের খানিকটা অংশ মুখের মধ্যেই কামড়াইয়া ধরিয়া রহিল। বাহিরে আসিয়াই সাপটা পলায়ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু মাত্র দু-তিন মিনিট চুপ করিয়া থাকিবার পর ব্যাঙটা দু-এক ঢোকেই পুনরায় তাহাকে মুখের ভিতর টানিয়া লইল। পরীক্ষা অসমাপ্ত থাকিলেও মোটের উপর মনে হয়—যে-সকল ছোটখাট সাপ অথবা বাচ্চা নালা ডোবা, খালবিল ও অন্যান্য জলাভূমির আশেপাশে বিচরণ করে তাহাদের অনেকেই ব্যাঙের উদরস্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক, ছবিসহ পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের কেহ কেহ সর্প-ভুক্ ব্যাঙ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমেরিকার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ছবিসহ সর্প-ভুক্ ব্যাঙ সম্বন্ধে ডাঃ ভিন্‌টনের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করিতেছি:

ডাঃ ভিন্‌টন পানামা ক্যানাল জোনের একটা জঙ্গলাকীর্ণ গুহার সম্মুখস্থ অগভীর জল হইতে এক জাতীয় ব্যাঙ (Rana catespeiana) ধরিয়া খাঁচায় রাখিয়া পুষিতে আরম্ভ করেন। খাঁচার মধ্যে ব্যাঙটা জলপাত্রের মধ্যে বসিয়া থাকিত। কিন্তু প্রথম সপ্তাহে তাহাকে যে-সকল কয়ার-ফড়িং এবং অন্যান্য পোকামাকড় খাইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা সে স্পর্শও করে নাই। দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই কয়ার-ফড়িংগুলি তাহার উদরস্থ হইতে লাগিল। কিছুদিন পর ডানায় আঘাতপ্রাপ্ত 'ফ্লাই-ক্যাচার' নামক একটা ছোট পাখীকে স্থানাভাব বশতঃ সেই ব্যাঙের খাঁচায় রাখা হয়। পরের দিন আর পাখীটাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। ব্যাঙের পেটটাও অসম্ভব রকমের স্ফীত দেখা গিয়াছিল। কিছুদিন পরে খাঁচার মধ্যে একটা ইঁদুর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইঁদুরটা খাঁচার মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। এক সময়ে ইঁদুরটা খাঁচার কোণ বাহিয়া উপরে উঠিবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময় ব্যাঙটাকে একটু নড়িতে দেখা গেল—তার পর 'টক্' করিয়া একটু শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরটা তাহার মুখের মধ্যে বেমালুম অদৃশ্য হইয়া গেল; কেবল তাহার লেজের খানিকটা অংশ তখনও ব্যাঙের মুখের বাহিরে ঝুলিতেছিল। খানিকক্ষণ পর আর এক ঢোকে সেটুকুও অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর তাহাকে ছোট্ট গোসাপের বাচ্চা, টিকটিকি এবং অন্যান্য ছোট ছোট ব্যাঙ দিয়া দেখা গেল যে সে নির্ব্বিচারে সবগুলিকেই উদরস্থ করে। টিকটিকি খাইতেই সে বেশী পছন্দ করিত। এই সকল প্রাণীকে গিলিবার পর প্রত্যেক বারই তাহার এক্স-রে ফটোগ্রাফ লইয়া দেখা গিয়াছে বস্তিকোটর হইতে গলা পর্য্যন্ত তাহার উদরদেশ সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। একবার সে একটা বাচ্চা অপোসামকে গিলিয়াছিল। বাচ্চাটা প্রায় তিন-চারটা নেংটি ইঁদুরের সমান হইবে। বাচ্চাটা ব্যাঙের পেটের মধ্যে গিয়াও ধস্তাধস্তি করিতেছে তাহা বাহির হইতেও পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল। এদিকে অপোসামের লম্বা লেজটা তার মুখের বাহিরেই নানা ভাবে মোচড় খাইতেছিল। ব্যাঙ তাহার হাতের সাহায্যে সেটাকে চাপিয়া ধরিয়া প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই উদরস্থ করিয়া ফেলিল।



দ্বিতীয় দিনের অবস্থা। সাপটাকে অনেকদূর গিলিয়াছে

চামচিকা ভক্ষণ করা ব্যাঙের পক্ষে বিপজ্জনক সন্দেহ নাই। কারণ তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচালো দাঁত একবার কোনস্থানে বসাইতে পারিলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু তথাপি চামচিকাই ছিল তার প্রিয় খাদ্য। খাঁচার মধ্যে চামচিকা ছাড়িয়া দেওয়া মাত্রই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। চামচিকার মাথাকে কিছুক্ষণ কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিত। চামচিকাটা নিস্তেজ হইয়া পড়িলে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে হাতের সাহায্যে তাহার ডানা দুইটাকে সামনের দিকে ঠেলিয়া রাখিয়া গিলিবার সুবিধা করিয়া লইত।

টিয়া জাতীয় একটা ছোট্ট পাখীকে সে কিন্তু বারংবার আক্রমণ করিয়া একবারও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ছিল—তাহার সাপ গিলিবার ক্ষমতা। একবার ২৯ ইঞ্চি এবং ২৬ ইঞ্চি লম্বা দুইটি সাপ ব্যাঙের খাঁচায় রাখা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—সাপ ও ব্যাঙ উভয়েই উভয়কে ভয় করিয়া বেশ দূরে দূরে থাকিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন গোলমালের সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। সংঘর্ষ বাধিল আকস্মিক ভাবে একটা দুর্ঘটনায়। বড় সাপটা একদিন খাঁচার গা বাহিয়া উপরে উঠিবার সময় হঠাৎ পিছলাইয়া পড়িয়া যায়। মাথাটা ছিল



শেষ দিনের অবস্থা। সাপটাকে প্রায় উদরস্থ করিয়া আনিয়াছে

ব্যাঙটার খুবই নিকটে। ব্যাঙটা যেন এ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। চক্ষের নিমেষে সে সাপের মাথাটাকে মুখের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। সাপটা ব্যাঙের গায়ে লেজ জড়াইয়া মাথাটাকে তাহার মুখ হইতে বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাঙ তাহার হাতের সাহায্যে পাক দেওয়া লেজটাকে কেবলই সরাইয়া দিতেছিল। সর্ব্বশেষে লেজটাকে হাতে চাপিয়া ধরিয়া আরও খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। সাপ দুইটা যাহাতে সহজে খাঁচার উপরের দিকে উঠিতে পারে এজন্য একটা কাঠ আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আক্রান্ত সাপের লেজটা এবার সেই কাঠখানাকে বাংলা '৪'এর মত প্যাঁচে জড়াইয়া ধরিল। কাজেই সাপের শরীরটাকে কাঠখানার কাছাকাছি পর্য্যন্ত গিলিয়া ব্যাঙ নেহাৎ বেকায়দায় পড়িয়া গেল। সে তখন কাঠের উপর দুই হাতে ভর রাখিয়া সাপটাকে পিছন দিকে টানিয়া প্যাঁচ ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এরূপ ধস্তাধস্তির পর দেখা গেল—সাপটা নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে, কারণ তাহার লেজের প্যাঁচ ক্রমশঃই ঢিলা হইয়া আসিতেছিল। ব্যাঙ তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সাপটাকে ঢোকে ঢোকে উদরস্থ করিতে লাগিল। আরও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধ্যে সাপের অধিকাংশই তাহার উদরস্থ হইল। তখন তাহার পেটটা অসম্ভবরূপে ফুলিয়া উঠিয়াছে।



ব্যাঙের এক্স-রে ফটোগ্রাফ। পেটের ভিতরে কুণ্ডলী-পাকানো সাপের হাড়গোড় দেখা যাইতেছে

তখনও সাপের লেজের তিন-চার ইঞ্চি পরিমিত অংশ তাহার মুখের বাহিরে ঝুলিতেছে। কিন্তু ভিতরে স্থানাভাব। খাওয়া বন্ধ করিয়া সে অনেকক্ষণ ঐভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘণ্টাখানেক বাদে বাকী অংশটুকু সম্পূর্ণরূপে গিলিয়া ফেলিল।

তারপর সে হয়ত হিসাবে ভুল করিয়াই সাড়ে চার ফুট লম্বা একটা সরু সাপ ধরিয়াছিল। সেটাকে গিলিতে গিয়া তাহাকে খুবই নাস্তানাবুদ হইতে হইয়াছিল। একদিনে সেটাকে গিলিতে পারে নাই। সম্পূর্ণরূপে উদরস্থ করিতে প্রায় তিন দিন লাগিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয় জন ?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

একই সময়ে এক নামের দুই ব্যক্তি থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। বর্ত্তমান কালে যেমন কোন কোন প্রখ্যাত লোকের নামে একাধিক ব্যক্তি রহিয়াছেন, অতীতেও এইরূপ একই নামের একাধিক ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে আরও অন্যূন দুই জন রামমোহন রায়ের সন্ধান পাইতেছি। মধুসূদন দত্তও একই সময়ে দুই জন দেখিতেছি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও যদি এইরূপ একই সময়ে দুই বা ততোধিক থাকেন তো তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তবে নামের ধাঁধাঁয় পড়িয়া এক জনের কৃতিত্ব অন্যের স্কন্ধে চাপাইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিলে তাহা আশু নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতে আমরা সাধাণতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেই বুঝি। কিন্তু শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টসমূহে* (১৮৪৫-৪৬ হইতে ১৮৪৮-৪৯) তাঁহারই সমসময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে আর একজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাইতেছি। এই সময়েই, ইংরেজী ১৮৪৭ সাল হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার একজন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন।† ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। কাজেই অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ যে ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা ঢের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। এ জন্য উক্ত রিপোর্টগুলিতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এ সবের নিরিখে অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ এবং ছাত্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে নিদ্দিষ্ট রেখা টানিবার সুবিধা হইবে। যাহা হউক, প্রথমেই 'প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টারে' (পৃঃ ৪৭১) উভয় দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ দিতেছি,—

> Tagore, Debendranath, Maharshi :
> Entered Hindu College, shortly after the resignation of Derozio, 1831; left while in the 2nd class...
> Tagore, Debendranath :
> Government Junior Scholarship, 1845. Gangnarain Das Senior Scholarship of Rs. 12, 1848.

এখানে দেখা যাইতেছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, এবং উভয়ের অধ্যয়ন-কালের ব্যবধান কমপক্ষে চৌদ্দ বৎসর। এখন, দ্বিতীয় (ছাত্র) দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রাপ্য তথ্যগুলি পর পর উপস্থাপিত করিব। ১৮৪৫-৪৬ সনের রিপোর্টে (পৃঃ ৩৭) আছে,—

> Junior Scholarships.
> * * *
> 20. Debendernath Tagore (Government Scholarship retains)...8.

১৮৪৬ ৪৭ সনের রিপোর্টে (পৃঃ ২৬) আছে,—

> Junior Scholarships.
> * * *
> 18. Debendernath Tagore, (Govt. S. retains)...8.

১৮৪৭-৪৮ সনের রিপোর্টে (পৃঃ ২৯) দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের পরীক্ষা সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে,—

> No change in the standard required by the rules is necessary. Of holders of junior scholarships, Debendernath Tagore, Haranchunder Bonerjea, and Rajchunder Dutt were examined in the senior scholarship papers, the former not only obtained a sufficient number of marks (113—1) to enable him to retain his scholarship, but attained the standard for gaining a senior scholarship within three marks. The two latter also obtained a sufficient number of marks to entitle them to retain their scholarships.

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জুনিয়র বৃত্তিধারী হইলেও ১৮৪৭ সনে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও তাঁহার পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল। যত নম্বর পাইলে সিনিয়র বৃত্তির যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় তাহা হইতে তাঁহার মাত্র তিন নম্বর কম ছিল।

১৮৪৮ সনে দেবেন্দ্রনাথ সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৪৮-৪৯ সনের রিপোর্টে হিন্দুকলেজ অধ্যায়ে সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার নাম পাইতেছি, —

---

* এই সময়কার শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টগুলির পুরা নাম—
"General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency."

† পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে (আগষ্ট ১৮৪৬) হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভায় যে পদ শূন্য হয় তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এ সম্বন্ধে ১৮৪৭-৪৮ সালের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃঃ ৩৪) আছে,—

"Baboos Debendernath Tagore and Ashootosh Dey have also been elected members of the Committee in succession to Baboos Dwarkanauth Tagore and Ram Comul Sen deceased."

Senior Scholarships.

* * *

16. Debendronath Thakoor, (Gunganarain Doss S. promoted), 1st year, marks 136, Rs. 12.

উক্ত রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে (Appendix H) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

Results of Senior English Scholarship Examinations in all Colleges under the control of the Council of education, 1847-48.

* * *

27. Debendranath Tagore...Hindu College...Jr. 3rd yr. Total marks 136...Promoted.

দেবেন্দ্রনাথ ১৩৬ নম্বর পাইয়া সিনিয়র বৃত্তিতে উন্নীত হন। তিনি এই পরীক্ষায় কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পাইয়াছিলেন, পরিশিষ্টে তাহাও দফাওয়ারি ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে,—

History 25/ Literature 27.4/ Mental and Moral Philosophy 26/ Mathematics 0.6/ Natural Philosophy 0/ English Essay 35/ Vernacular Essay 22.

১৮৪৮-৪৯ সনের পরের রিপোর্টগুলিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকায় বা অন্যত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর উল্লেখ পাই না। এ কারণ মনে হয়, ঐ বৎসর পাঠ অসমাপ্ত অবস্থায়ই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালে (১৭৭০ ও ১৭৭১ শক) তত্ত্ববোধিনী সভার চাঁদাদাতাদের তালিকায়ও এই দেবেন্দ্রনাথের উল্লেখ আছে। এই দুই বৎসরই তালিকায় তাঁহার ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে 'হিন্দু কলেজ'। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের চাঁদাদাতাদের তালিকায় 'পাথুরিয়া ঘাটা' 'পাতুরে ঘাটা' এইরূপ ঠিকানা আছে। ছাত্রাবস্থাতেই যে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন ইহার মধ্যেও কোন নূতনত্ব নাই। পূর্ব্বে ১৮৩৮ সনে যখন কলিকাতায় প্রধানতঃ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও বয়স্ক ব্যক্তিদের লইয়া সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা (The Soceity for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও কলেজের সিনিয়র ছাত্রগণ (যেমন, প্যারীচরণ সরকার, ভোলানাথ চন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি) ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। বয়স্কদের সভায় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের যোগদান সুতরাং প্রথম নহে।

দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে তত্ত্ববোধিনী সভার বরাবর সভ্য ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এক জনের কৃতিত্ব অন্যের স্কন্ধে চাপাইবার ব্যর্থ প্রয়াসও আশা করি আর করা হইবে না।

নারীর গোত্রান্তর

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

আজকাল হিন্দু-বিবাহে পত্নীর গোত্রান্তর অর্থাৎ পিতৃগোত্রচ্যুতি এবং পতিগোত্র লাভ ঘটিয়া থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের (১২।৭৫) "বিবাহানন্তরং নারী পতি গোত্রেণ গোত্রিণী" বাক্যটি অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী কৃত "আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহপদ্ধতি" নামক একখানি গ্রন্থ পাঠ করি। বইখানি আমার ভাল লাগিয়াছিল। অবশ্য উহা যে ত্রুটিহীন, তাহা নহে; কিন্তু বাংলা ভাষায় ঐরূপ তথ্যবহুল পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত ঘোষচৌধুরী মহাশয় ঠিক কোন্ সময়ে নারীর গোত্রান্তর ঘটে, এই বিষয়টি লইয়া তাঁহার গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১১-১৬) কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিবাহের ঠিক কোন্ অনুষ্ঠান দ্বারা বধূর পিতৃগোত্রচ্যুতি ও পতিগোত্রপ্রাপ্তি ঘটে, সে সম্পর্কে শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় নিবন্ধকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকৃত উদ্বাহতত্ত্বের (বঙ্গবাসী, পৃ. ১১২ হইতে) এতৎ সম্পর্কিত সমালোচনাটির উপর তিনি অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়।

১। রঘুনন্দনের গ্রন্থে লঘুহারীতের নামে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

> স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
> পতি গোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।

২। শূলপাণি তাঁহার শ্রাদ্ধবিবেকে বৃহস্পতির নাম করিয়া একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

> পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
> ভর্ত্তৃগোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ।

৩। ভবদেবভট্ট প্রভৃতি কেহ কেহ মনুসংহিতার নামে দুইটি শ্লোক তুলিয়াছেন।

বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে।
চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্‌মাংসহৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্রা সংযুজ্যতে নারী তদ্‌ গোত্রা তেন সা ভবেৎ॥

উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে বিবাহের সময় নারীর গোত্রান্তর-প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভট্টনারায়ণের মত অবলম্বন পূর্ব্বক রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, সপ্তপদী গমনের পরই বধূ নিজেকে পতিগোত্রীয়ারূপে উল্লেখ করিয়া স্বামীকে অভিবাদন করিবে; কিন্তু এই অভিবাদন-অনুষ্ঠানটি চতুর্থী কর্ম্মের (অর্থাৎ সহবাসের) পূর্ব্বেকার বলিয়া ভবদেব ভট্ট এবং গোভিলগৃহ্যসূত্রের টীকাকার উহাতে বধূর পিতৃ-গোত্রের উল্লেখ বিধান করিয়াছেন। যাহা হউক, কেহ কেহ আবার বিবাহকালে নারীর গোত্রান্তর প্রাপ্তির বিরোধী কথা বলিয়াছেন।

৪। রঘুনন্দনের উল্লিখিত এবং তদীয় টীকাকার বাচস্পতির উদ্ধৃত কাত্যায়নবচনে দেখা যায়—

সংস্থিতায়াস্ত ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তরম্।
পৈত্রিকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধ্বস্তু পতিপৈত্রিকম্।

অর্থাৎ, বিবাহিতা নারীর মৃত্যু হইলে, তাহার সপিণ্ডী-করণ পর্য্যন্ত কার্য্যাদিতে তদীয় পৈত্রিক গোত্র উল্লিখিত হইবে; কিন্তু উহার পরের অনুষ্ঠানাদিতে পতিগোত্র ব্যবহৃত হইবে। এই শ্লোক হইতে মনে হয়, জীবিত অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহিতা নারীর গোত্রান্তর ঘটে না।

৫। গরুড় পুরাণে (বঙ্গবাসী, উত্তর খণ্ড, ২৬।২১-২২) লিখিত আছে—

ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু যা বধূরিহ সংস্কৃতা।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।
আসুরাদি বিবাহেষু যা ব্যূঢ়া কন্যকা ভবেৎ।
তস্যাস্তু পিতৃগোত্রেণ কুর্য্যাৎ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্।

অর্থাৎ, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহের বধূ পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে বধূর গোত্রান্তর ঘটে না, পিতৃগোত্রই থাকিয়া যায়। সম্ভবতঃ সম্প্রদানের অভাব ইহার কারণ।

৬। পূর্ব্বোক্ত পুরাণে (ঐ, ২৬।৩৯) পুত্রিকা সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

পুত্রিকা পতিগোত্রাস্যাদধস্তাৎ পুত্রজন্মনঃ।
পুত্রোৎপত্তেঃ পুরস্তাৎ সা পিতৃগোত্রং ব্রজেৎ পুনঃ।

অর্থাৎ, বিবাহিতা পুত্রিকার গোত্রান্তর ঘটে পুত্রসন্তান জন্মিবার পরে। পুত্রিকা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা জর্ন্যাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মনুসংহিতার (৩।৫) একটি শ্লোকে বিবাহার্থী ব্যক্তির মাতৃ-গোত্রের অস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। টীকাকারগণের উক্তিতে এবং তাঁহাদের উদ্ধৃত নিবন্ধকারদিগের বচনে স্পষ্টই মাতৃগোত্রের উল্লেখ আছে।

মনু বলিয়াছেন—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা বিবাহেষু দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

ব্যাস বলেন—

সগোত্রাং মাতুরপ্যেকে নেচ্ছন্ত্যুদ্বাহকর্ম্মণি।
জন্মনাম্নোরবিজ্ঞানে উদ্বহেদবিশঙ্কিতঃ॥

বশিষ্ঠের মতে—

মাতুলস্য সুতাঞ্চৈব মাতৃগোত্রাং তথৈব চ। ইত্যাদি।

মধ্যযুগের নিবন্ধকারদিগের প্রায় সকলকেই এই "মাতার গোত্র" বিষয়টিকে যথামতি ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাঁহার মনুস্মৃতির টীকা-খণ্ডে এই সমুদয় ব্যাখার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া-ছেন। আমাদের পক্ষে কেবল পরাশরমাধবের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ব্যাখ্যাটি এই—"এ স্থলে কথা উঠে যে, মাতার গোত্রের স্বতন্ত্র উল্লেখ নিরর্থক; কারণ স্বামীর পিণ্ড ও গোত্রই পত্নীর পিণ্ড ও গোত্র। সুতরাং পিতার অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা মাতারও অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা। এই সমস্যার উত্তর এই যে, গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে পাত্রী পিতা কর্ত্তৃক সম্প্রদত্তা হয় না; সেজন্য পিতার পিণ্ড ও গোত্রই তাহার থাকিয়া যায়। তাহা হইলে, তাহার সপিণ্ডা ও সগোত্রা তাহার স্বামীর সপিণ্ডা ও সগোত্রার সহিত এক হইতে পারে না।" এই ব্যাখ্যার সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত গরুড় পুরাণের গোত্রান্তর বিষয়ক বচনের সামঞ্জস্য দেখা যায়। কিন্তু এই সরল ব্যাখ্যাটিকে সমুদয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে কি না, তাহা বিবেচ্য।

প্রাচীন ভারতীয় লেখমালা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে-স্থলেই স্ত্রীলোকের গোত্র উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমুদয় ক্ষেত্রেই উহা তাহার পাত্রগোত্র হইতে স্বতন্ত্র।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের অনেক স্থলে, বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যে, লোকের নামোল্লেখ কালে তাহাদের মাতার গোত্রনাম উল্লেখ করিবার প্রথা ছিল। রাজগণের মধ্যে এই প্রথাটির ব্যাপক প্রচলন ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ—গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি, বাসিষ্ঠীপুত্র শাত-

কর্ণি, মাঠরীপুত্র বীরপুরুষদত্ত, পারাশরীপুত্র শর্ব্বতাত, হারীতীপুত্র প্রবরসেন, গার্গীপুত্র বিশ্বদেব, গৌপ্তীপুত্র অঙ্গারদ্যুৎ, বাৎস্যীপুত্র ধনভূতি, কৌৎসীপুত্র ভাগভদ্র প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই রাজগণের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে একজনের মাতার পূর্ণ নামও জানা গিয়াছে। ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির মাতার সম্পূর্ণ নাম ছিল—মহাদেবী গৌতমী বলশ্রী। সে কালে অনেক রাজা বহু বিবাহ করিতেন; একই পিতার বহু পত্নীর গর্ভ-জাত বহুসংখ্যক সন্তানের পক্ষে আপনাদের পরিচয় স্পষ্টতর করিবার জন্যই মায়ের নাম উল্লিখিত হইত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, প্রথাটির ব্যাপকতা লক্ষ্য করিলে, সমুদয় ক্ষেত্রেই রাণীদিগের গোত্রান্তরাভাবের কারণ গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ, এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। অবশ্য যদি মানিয়া লই যে, সেকালে ঐরূপ বিবাহই সমধিক প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মাদি বিবাহ খুব কম ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান হয়। আবার কাত্যায়নের বচনকে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অসম্ভব। কারণ, গৌতমীপুত্র নামক ব্যক্তির মাতার সপিণ্ডীকরণের পরেও পুত্রের নামে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইত বলিয়া মনে করা চলে না। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নাম রাজার কোন উত্তরপুরুষের লিপিতে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। বাকাটকবংশীয় গৌতমীপুত্র তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ প্রবরসেনের তাম্রশাসনেও গৌতমীপুত্র নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন। আমাদের আধুনিক শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যাহা হউক, সে যুগে সাধারণতঃ যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত, উহাতে বধূর গোত্রান্তরের পাকাপাকি ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নারীর গোত্রান্তরাভাবের আরও দুই-একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত কচ্ছ দেশের অন্দৌ নামক স্থানে ১৩০ খৃষ্টাব্দের কতিপয় লেখ পাওয়া গিয়াছে। লেখসমূহ কয়েকটি শিলাযষ্টির গাত্রে উৎকীর্ণ। ইহার মধ্যে তিনটি শিলাযষ্টি এক ব্যক্তি তাঁহার তিনজন পরলোক-গত আত্মীয় ও আত্মীয়ার নামে স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম শিলাযষ্টি সিংহিলপুত্র মদনকর্তৃক আপন ভগ্নী সিংহিল-পুত্রী ঔপশতিগোত্রীয়া জ্যেষ্ঠবীরার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত। দ্বিতীয় শিলাযষ্টি সেই একই ব্যক্তি তদীয় ভ্রাতা সিংহিলপুত্র ঔপশতিগোত্রীয় ঋষভদেবের নামে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৃতীয় শিলাযষ্টিও মদনকর্তৃক তাঁহার পত্নী সিংহমিত্র-দুহিতা শৈনিক গোত্রীয়া যশোদত্তার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত হইয়াছিল। এই লিপিগুলিতে দেখা যায়, মদনের ভ্রাতা ঋষভদেব এবং ভগ্নী জ্যেষ্ঠবীরার গোত্র অভিন্ন; অর্থাৎ জ্যেষ্ঠবীরার নামের সহিত তাঁহার পিতৃগোত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার ঔপশতিগোত্রীয় মদনের পত্নী যশোদত্তাকে শৈনিকগোত্রীয়া বলা হইয়াছে; শৈনিক অবশ্যই মহিলাটির পৈত্রিক গোত্র। জ্যেষ্ঠ বীরা, ঋষভদেব এবং যশোদত্তার মৃত্যুর কতকাল পরে শিলাযষ্টি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। তবে তাঁহাদের বিভিন্ন সময়ে মৃত্যু হইয়া থাকিলে, শিলাযষ্টি স্থাপনের অনুষ্ঠানটির তারিখ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হওয়া সম্ভব নহে। আমার বিবেচনায়, এই লিপিগুলি হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৎকাল-প্রচলিত সাধারণ বিবাহে বধূর গোত্রান্তরাভাব সূচিত হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বাকাটকবংশীয় রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের প্রধানা মহিষী প্রভাবতী পতির মৃত্যুর পর কিছুকাল নাবালক পুত্রের অভিভাবিকারূপে বিদর্ভরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার তাম্রশাসনে তিনি ধারণ-সগোত্রা প্রভাবতী গুপ্তা নামে উল্লিখিতা হইয়াছেন। অথচ বাকাটকবংশীয় ব্রাহ্মণরাজগণের লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা বিষ্ণুবৃদ্ধগোত্রীয় ছিলেন। ধারণগোত্রটি প্রভাবতীর পৈত্রিক গোত্র। তিনি মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নাগকুলোৎপন্না মহিষীর গর্ভজাতা কন্যা ছিলেন। দেখা যাইতেছে, প্রভাবতী কেবল পিতৃবংশের গোত্রই ব্যবহার করেন নাই, নিজেকে "গুপ্তা" বলিয়া পৈত্রিক বংশনাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি তাঁহার সপিণ্ডীকরণ না হওয়া, অথবা গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ, অথবা পিতৃকুল ও পতি-কুলের অসবর্ণতা? ঐতিহাসিক জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া কঠিন। তবে, কারণ যাহাই হউক, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিবাহ ব্যাপারে অধুনিক কালের মত নারীর গোত্রান্তরলাভ স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে নাই।

মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন ভারতে দারগ্রহণ এবং পুত্রলাভের ব্যবস্থা আধুনিক কালের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। এ যুগের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে সেকালের বিবাহকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করা চলে না। বিবাহব্যাপারে যখন হইতে আধুনিক ধারা প্রবর্ত্তিত হইতে সুরু হয়, তখন হইতেই সম্ভবতঃ বিবাহিতা নারীর গোত্রান্তরবিধি স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের সুনিয়ন্ত্রিত বিবাহ-ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয়সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

শার্ট

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ

বার বার চেষ্টা করেও অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করা যায় না, কেবলই সেই একই চিন্তা মনের ভেতর ঘুরে ফিরে আসে—জোহান্‌কা প্রতারণা করছে তাঁর সঙ্গে। প্রতারণাই বইকি—এ বাড়িতে ও আছে অনেক কাল, বরাবর ওকে বিশ্বাসই করে এসেছেন, ও যে চুরি ক'রে তাকে ফতুর করবার চেষ্টা করবে এ যে কল্পনা করাও শক্ত! প্রতিদিনই সকালে পোষাকের ঐ দেরাজটা তিনি খোলেন আপিস বেরুবার আগে, দেখেন তাকের উপর ধোপদোস্ত এক রাশ শার্ট সাজানো, ওপরেরটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়িয়ে দিয়ে টেবিলে বসে যান আহার সারতে—জিনিসপত্রের হিসাব রাখার অবসরই হয় না তাঁর। মাঝে মাঝে একখানা ছেঁড়া শার্ট হাতে ঝুলিয়ে জোহান্‌কা এসে হাজির হয় সামনে, বলে, "কর্ত্তা, পুরোনো শার্ট সবই ছিঁড়ে গেছে, নতুন শার্ট না কিনলে আর চলবে না।" কর্ত্তা দ্বিরুক্তি না ক'রে বেরিয়ে পড়েন, সামনেই যে দোকান পান ঢুকে পড়েন তার মধ্যে, তারপর আধ ডজন শার্ট কিনে ফিরে আসেন বাড়ি—তবে প্রতিবারই শার্ট খরিদ করার সময় কেমন যেন তাঁর মনে হয়, দিন কতক আগেই এমনি আধ ডজন শার্ট খরিদ করেছেন তিনি। আর শুধু কি শার্ট, সব জিনিসই তাঁকে কিনতে হয়-এমনি দু-চার হপ্তা অন্তর—কলার, টাই, কোট, ট্রাউজার, জুতো, সাবান এবং আরও অনেক কিছু যা মানুষের দরকার হয় বিপত্নীক হবার পরেও। সংসারে বাস করতে গেলে সবই অবশ্য মাঝে মাঝে কিনতে হয় মানুষকে, পুরোনো জিনিস বরাবর ব্যবহার করা চলে না, তবু কি জানি কেন, বুড়ো মানুষের গায়ে সবই কেমন জীর্ণ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি অথবা কি যে তাদের পরিণতি ঘটে ভগবানই জানেন। নতুন জিনিস ত হামেশাই কিনছেন তিনি অথচ দেরাজ খুললেই দেখেন চারিদিকে ছেঁড়া রঙচটা জামার স্তূপ, কবে যে ঐ সব কেনা হয়েছিল মনেই পড়ে না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কখনও তিনি মাথা ঘামান নি এ সব নিয়ে, জোহান্‌কার ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি ছিলেন নিশ্চিন্ত। এতকাল পরে আজ এই প্রথম তাঁর ধারণা হয়েছে, জোহান্‌কা প্রতারক—বেপরোয়া চুরি করছে সে। ব্যাপারটা ধরা পড়ল এইভাবে: সেদিন সকালে তিনি এক নিমন্ত্রণ পেলেন সন্ধ্যার এক ভোজে উপস্থিত হবার জন্যে। বহুকাল কোথাও তিনি যান নি, বন্ধুবান্ধব তাঁর কম, নিমন্ত্রণ আসে না বড় একটা। আজ হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। মনে মনে খুশি হলেও কেমন একটা আতঙ্কে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রথমটা তিনি খুঁজতে সুরু করলেন ভোজের উৎসবে প'রে যাবার মত চটকদার কোন শার্ট দেরাজে আছে কি না—সমস্ত শার্টই দেরাজ থেকে টেনে বের করলেন, কিন্তু এমন একটা শার্টও দেখতে পেলেন না যার কলারের বা হাতার কাছে সুতো বেরিয়ে পড়ে নি। জোহান্‌কাকে ডেকে তিনি জানতে চাইলেন নতুন কোন শার্ট আছে কি না।

জোহান্‌কা যেন একটু ঘাবড়ে গেল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, নতুন শার্ট সে পাবে কোথা থেকে? শার্ট যা ছিল সবই গেছে ছিঁড়ে আর তাদের হাল হয়েছে এমনি যে মেরামত করা পণ্ডশ্রম। জোহান্‌কা যাই বলুক, তাঁর কেমন মনে হচ্ছিল যেন কিছুকাল আগেই খানকয়েক শার্ট তিনি কিনে এনেছেন দোকান থেকে, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্মৃতিটা একটু অস্পষ্ট ছিল বলে প্রতিবাদ করলেন না—মিনিটখানেক চুপ করে থেকে কোটটা গায়ে দিতে সুরু করলেন শার্ট কিনতে বেরুবার জন্যে। কোটের পকেটটা কাগজে ভর্ত্তি—কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে পকেট থেকে তিনি টেনে বের করলেন এক গাদা পুরোনো কাগজপত্র। কাগজগুলো রাখবেন কি ফেলে দেবেন ঠিক করতে না পেরে তিনি একটি একটি করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ ঐ কাগজের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল শার্ট কেনার শেষ বিলটা—তারিখও রয়েছে তাতে। বেশী দিনের ব্যবধান নয়, মাত্র সাত হপ্তা। সাত হপ্তা আগেই আধ ডজন শার্ট কেনা হয়েছে। বিস্ময়ে চোখ কপালে ওঠে তাঁর—অ্যাঁ! এরই মধ্যে অতগুলো নতুন শার্ট গেল কোথায়?

শার্ট কিনতে তাঁর আর বাইরে যাওয়া হয় না—চিন্তান্বিত ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন। বিগত কয়েকটা বছরের নিঃসঙ্গ জীবনের চিত্র মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টির পর যেদিন তিনি শূন্যঘরে ফিরে আসেন সেদিন থেকে জোহান্‌কাই তাঁর সংসারের তত্ত্বাবধান করছে, কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি সন্দেহ করেন নি ওকে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে জোহান্‌কার মত পাপিষ্ঠা আর নেই, তাঁর মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে ও তাঁর জিনিসপত্র আত্মসাৎ করেছে এতকাল! ঘরের চারিদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন—কি যে অন্তর্দ্ধান করেছে ঘর থেকে তিনি ধরতে পারেন না, কিন্তু ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, কি কি জিনিস ছিল চেষ্টা করেন ভাবতে, কিছুই ঠিক মনে পড়ে না, তবে বার বার চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে এ ধারণা মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন অনেক কিছুই নেই যা একদিন ছিল।...ভীত-সন্ত্রস্তমনে স্ত্রীর সিন্দুকটা খুলে ফেলেন তিনি। ঝুঁকে পড়েন তার ওপর। বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে ওঠে। গোটাকতক জীর্ণ পরিচ্ছদ রয়েছে পড়ে, বাকী সব উধাও—অতীতের সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত!

সিন্দুকটা বন্ধ করে তিনি অন্ত কিছু ভাবতে চেষ্টা করেন। ভাবতে চেষ্টা করেন সন্ধ্যার মজলিসের কথা। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য্য হন না, কেবলই মনের মধ্যে জাগে অতীতের বেদনাবিধুর স্মৃতি। মনে হয়, দীর্ঘ দশটা বছর কেটে গেছে এক নিদারুণ রিক্ততার মধ্যে—তার প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন বেদনার দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত।···নিঃসঙ্গতার ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে মনে—মনটা খাঁ খাঁ করে—স্ত্রীর অভাবটা আজ বুকে বাজে মর্ম্মান্তিক হয়ে।

একটা জিনিস কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না—জোহান্‌কা তাঁর জিনিসপত্র চুরি করছে কি উদ্দেশ্যে? ওসব কি কাজে আসবে তার?···হঠাৎ তাঁর মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে—ওঃ মনে পড়েছে, এখন বুঝতে পারছি এসব ও চুরি করছে কেন? ওর এক বোন-পো আছে কোথায় যেন···তার প্রশংসায় ও পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, বলে অমন ছেলে নাকি হয় না! ···বেশ মনে পড়ছে এখন, তার একখানা ফটো আমায় দেখিয়েছিল একবার···কোঁকড়া চুল, থ্যাবড়া নাক আর অত্যন্ত উদ্ধত এক জোড়া গোঁফ···ঐ তো কিম্ভূতকিমাকার চেহারা, কিন্তু মাগীর মুখে প্রশংসা ধরে না···বোনপোর কথা বলতে বলতে আবেগে ওর চোখে জল এসে পড়ে···বোনপোর কাছেই সব মাল ও চালান করেছে নিশ্চয়···সেই ফচ্‌কে ছোঁড়াটাই এখন তাঁর পোষাক পরে কতো নবাবী করছে···

ভাবতে ভাবতে মেজাজটা ভয়ানক গরম হয়ে ওঠে, দৌড়ে হাজির হন রান্নাঘরে, জোহান্‌কাকে উদ্দেশ করে চীৎকার করে ওঠেন, "পাজী বজ্জাত মাগী···"

আরও কি তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথাটা অসমাপ্ত রেখেই দৌড়ে ফিরে আসেন নিজের ঘরে, জোহান্‌কা ড্যাবডেবে চোখ দুটো মেলে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে, চোখের কোণ ক্রমশঃ ভরে ওঠে জলে।

সারাদিন জোহান্‌কার সঙ্গে তিনি আর বাক্যালাপ করেন না। জোহান্‌কা মনে মনে গুমরোতে থাকে—সারা দেহ ফুলে ফুলে ওঠে রাগে—চাকরাণী বলেই না তাকে এ অপমান সহ্য করতে হ'ল মুখ বুঁজে! কিন্তু এ আকস্মিক বিপর্য্যয়ের কারণটা যে কি তা সে আন্দাজ করতে পারে না।

বিকালের দিকে ছোট বড় সব ক'টা আলমারি খুলে কোথায় কি আছে তিনি সন্ধান করতে সুরু করেন। সবই প্রায় ফাঁকা, দু-একটা জিনিস এদিকে-ওদিকে ছড়ানো। চুপ করে ভাবতে ভাবতে অনেক জিনিসের কথাই মনে পড়ে। অতীতের কত স্মৃতিই জড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে। ঐ সমস্ত হারানো জিনিস আজ মহামূল্য মনে হয় তাঁর কাছে।···সবই গেছে, নেই একটাও—যেন এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সমস্তই ভস্মীভূত। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে—রাগে দুঃখে মনটা এমনি অধীর হয়ে পড়ে যে ইচ্ছা করে, চেঁচিয়ে কাঁদেন খানিকটা।

খোলা আলমারি দেরাজের সামনে তিনি বসে আছেন একখানা চেয়ারের ওপর—ক্লান্ত অবসন্ন, সর্ব্বাঙ্গ ধুলায় ভরা, হাতে রয়েছে একটা চামড়ার ব্যাগ, জীর্ণ মলিন দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ। বাবা ব্যবহার করতেন ওটা—অতীতের স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে ঐটাই রয়ে গেছে শুধু···সবই নিয়েছে জোহান্‌কা, নেয় নি শুধু ওটা, বোধ হয় অত্যন্ত পুরোনো বলে।···অনেক দিন ধরেই ও চুরি করছে নিশ্চয়, নইলে অত জিনিস ও সরাল কি করে? মাগী বজ্জাতের ধাড়ী···সব নিয়েছে, ফেলে রাখে নি কিছুই! রাগে তাঁর সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে, ঐ মুহূর্ত্তে জোহান্‌কাকে সামনে পেলে তিনি তার গালে একটা চড় কষিয়ে দিতেন নির্ঘাৎ।···আচ্ছা, কি করা যায় ওর সম্বন্ধে? এখনি বের করে দেবেন বাড়ি থেকে? পুলিসে খবর দেবেন? কিন্তু কে তাঁর রান্না করবে কাল? রান্নার অসুবিধা—বেশ, কাল না হয় হোটেলে গিয়েই খাবেন তিনি। কিন্তু স্নানের জল গরম করবে কে? শোবার ঘরে আগুনই বা কে জ্বালবে?···ধীরে ধীরে এ সমস্ত দুশ্চিন্তা মনটাকে কাবু করে আনে—মনের এই দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সতর্ক হয়ে ওঠেন; চেষ্টা করেন ওসব চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দিতে। ···কালই যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে—আজ আর গোলমালে কাজ নেই। জোহান্‌কার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে বলে মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু এ অপরাধের শাস্তি তিনি দেবেনই—মাগী চুরি করে তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত করছে!

সন্ধ্যাবেলা মনটাকে শক্ত ক'রে কোন রকমে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে জোহান্‌কাকে উদ্দেশ ক'রে বলেন, "কয়েকটা জরুরী কাজে তোমায় একটু বাইরে যেতে হবে। আমার সময় কম, তাই ভার দিচ্ছি তোমার ওপর।" এই বলে কাজের লম্বা একটা ফর্দ্দ দেন তাকে—অধিকাংশই বাজে কাজ, তবে সমাধা করতে সময় লাগবে যথেষ্ট। জোহান্‌কা কিছু না বলে বিরস মুখে প্রস্থান করে।

বাড়িতে তিনি এখন একা। জোহান্‌কার ফিরতে সময় লাগবে। সভয়ে তিনি এগিয়ে আসেন দরজার দিকে, বুকটা গুর্ গুর্ করে—পারবেন কি তিনি তাঁর মতলব হাসিল করতে! ভয়টা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে···মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হয় ···কাজটা যে অন্যায় বুঝতে পারেন তিনি। জোহান্‌কার অজ্ঞাতে তার দেরাজ তিনি খুলবেন কি অধিকারে? কিন্তু ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় ঢুকে পড়েন ভেতরে।

রান্নাঘর অতি পরিচ্ছন্ন—ঝক্‌ঝক্ করছে চারিধার। জোহান্‌কার দেরাজটা দেখা যায় ঘরের কোণে, দেরাজ চাবিবন্ধ, কিন্তু চাবির পাত্তা নেই। দেরাজটা আবিষ্কার ক'রে তাঁর উৎসাহ বেড়ে ওঠে, মনের দ্বন্দ্ব যায় ঘুচে। একখানা ছুরি সংগ্রহ করে চাড় দিয়ে তিনি খোলবার চেষ্টা করেন দেরাজটা, কিন্তু ছুরির ঘায়ে দেরাজটা ক্ষতবিক্ষত হয় মাত্র, খোলে না। ঘরের জিনিসপত্র হাঁটকে চাবির সন্ধান করেন, কিন্তু চাবি মেলে না কোথাও। পকেট থেকে নিজের চাবির তোড়া বের করে সব ক'টা চাবিই এক একবার লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, কিছুতেই দেরাজ

খোলা যায় না। অবশেষে আধ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর তিনি আবিষ্কার করেন দেরাজটা বন্ধ নয় মোটেই, হাতল ধরে জোরে টানলেই খুলে যেতে পারে।

দেরাজের ভেতর গোটাচারেক তাক। প্রত্যেকটি তাকেই তাঁর ইস্ত্রিকরা শার্টগুলি সযত্নে সাজানো। সব চেয়ে ওপরে যে তাকটা তারই ওপর দেখতে পান তার নতুন আধ ডজন শার্ট, নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা, দোকান থেকে যেমনটি এনেছিলেন ঠিক তেমনি। কার্ড-বোর্ডের ছোট একটা বাক্সে তাঁর স্ত্রীর সেই নীল পাথর-বসানো ব্রুচটা, বাবার সেই দামী হাতের বোতাম জোড়া, আইভরির ওপর তোলা মার একখানা ফটো···আশ্চর্য্য, এ ছবিটার লোভও জোহান্‌কা সামলাতে পারে নি! সব কিছুই তিনি টেনে বের করেন দেরাজ থেকে, হারানো অনেক জিনিসই রয়েছে তার মধ্যে—কয়েক জোড়া মোজা, এক ডজন কলার, এক বাক্স সাবান, কয়েকটা টুথ-ব্রাশ, সিল্কের ওয়েষ্ট-কোট একটা, বালিশের ওয়াড়, পুরোনো একটা পিস্তল, কম দামী সিগারেটের একটা পাইপ, মুখে ধোঁয়ার কালো দাগ, ব্যবহারের নিতান্ত অযোগ্য। এসব ছাড়া আরও অনেক জিনিস ছিল তাঁর, কিন্তু সেগুলো নিশ্চয় বহুদিন আগেই ও চালান করেছে সেই হতভাগা বোনপোটার কাছে। রাগটা নিস্তেজ হয়ে আসে, কিন্তু দুঃখটা তখনও ধূমায়িত হয় মনের মধ্যে···এমনি অকৃতজ্ঞ মানুষ! শেষে জোহান্‌কাও কিনা তাঁর সঙ্গে এই ব্যবহার করলে!

একটি একটি করে তিনি ঐ জিনিসগুলি নিয়ে আসেন নিজের ঘরে, তার পর সেগুলো ছড়িয়ে দেন টেবিলটার ওপর—হরেক-রকম মালের বিচিত্র প্রদর্শনী। যেগুলো জোহান্‌কার সম্পত্তি সেগুলো তুলে রাখেন রান্নাঘরের ঐ দেরাজের মধ্যে। ইচ্ছা করেন ওগুলো পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে রাখতে, কিন্তু বারকয়েক চেষ্টার পর তিনি হতাশ হয়ে ফিরে আসেন দেরাজটা বন্ধ না করেই। তার পর তাঁর মনে পড়ে এখনি ফিরে আসবে জোহান্‌কা, ওর সঙ্গে কথা কইতে হবে সহজ সুরেই—যেন কোথাও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি।···ভাবতে ভাবতে মনটা এমনি বিষিয়ে ওঠে যে তাড়াতাড়ি তিনি পোষাক পরতে সুরু করেন।··· কালই ওকে কড়কে দিলে চলবে—তিনি যে ওর প্রতারণা ধরে ফেলেছেন এইটে বুঝতে পারলেই ও নিশ্চয় খুব ঘাবড়ে যাবে—আজকের মত তাই-ই যথেষ্ট। নতুন একটা শার্ট তিনি তুলে নেন গায়ে দেবার জন্যে, কিন্তু শার্টটা শুকনো রুটির মত শক্ত, অনেক চেষ্টা করেও কলার আঁটা যায় না তার সঙ্গে। এদিকে দেরি করাও সঙ্গত নয় মোটেই—কখন যে জোহান্‌কা এসে পড়ে বলা যায় না।

পুরোনো একটা শার্টের মধ্যেই গলাটা গলিয়ে দেন তিনি, শার্টটা যে ছেঁড়া তা তাঁর খেয়ালই হয় না। পোষাক পরতে যেটুকু দেরি, তার পরই তিনি চোরের মত বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তখনও ভোজের অনেক দেরি—ঘণ্টাখানেক রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন বৃষ্টিতে ভিজে।

ভোজের আসরে তিনি কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করেন নিজেকে। পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলাপ জমতে চায় না।···এমনিই হয়, দীর্ঘকালের অদর্শনে আত্মীয়তার বন্ধন যায় শিথিল হয়ে, পরস্পরকে আমরা তখন বুঝতেও পারি না ঠিক মত। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই, তফাতে দাঁড়িয়ে প্রসন্নমনে তিনি দৃষ্টিপাত করেন চতুর্দিকে—মূল্যবান্ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সবাই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে—সবার মুখেই আনন্দের দীপ্তি—হাস্য-পরিহাসের অস্ফুট গুঞ্জন চারিধারে।···হঠাৎ এক অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠেন তিনি—ওদের মাঝখানে আমায় বেখাপ্পা দেখাচ্ছে না তো? ওদের ঐ আড়ম্বরের সঙ্গে আমার তো সামঞ্জস্য নেই এতটুকু! আমার শার্টের হাতা থেকে সুতো ঝুলছে, কোটের পিঠে বিশ্রী একটা দাগ, আর জুতো···জলে-কাদায় ওর রূপ যা হয়েছে তা দেখে অনেকেই আঁৎকে উঠবে হয়ত। কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকান—লুকোবার কোথাও কোন জায়গা যদি মেলে। কিন্তু যেদিকেই তাকান সেদিকেই দেখেন কেউ না কেউ পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে। ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে—কোথায় পালাবেন তিনি ওদের অলক্ষ্যে? দরজার দিকে পা বাড়াতে ভরসা হয় না তাঁর—কে জানে যদি সকলের দৃষ্টি হঠাৎ তাঁর ওপরে এসে পড়ে! দুশ্চিন্তায় সর্ব্বশরীর ঘেমে ওঠে—এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! মেঝেয় পা ঘষে ঘষে একটু একটু করে তিনি এগুতে থাকেন দরজার দিকে। অতি মন্থর ও সতর্ক তাঁর গতি—কেউ যেন বুঝতে না পারে তিনি এগুচ্ছেন ক্রমশঃ। দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ দেখা হয় এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে। ছেলে-বেলাকার সাথী, ছাড়তে চায় না সহজে। বিব্রত হয়ে ওঠেন তিনি, সংক্ষেপে তাঁর দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে চুপ করে যান, বন্ধু হয়তো ক্ষুণ্ণ হয় মনে মনে, কিন্তু উপায় কি···এখন তো আর আলাপ জমাবার সময় নয়। বন্ধু বিদায় নিলে তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন—আড়চোখে দরজার পানে একবার তাকান—দরজার দূরত্ব হিসাব করেন মনে মনে। না, আর ভাববার কিছু নেই—বড়জোর হাত দশেক। অবশেষে নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে—পিছন দিকে তাকাতে ভরসা পান না, হন্ হন্ করে পা চালিয়ে দেন বাড়ির দিকে।

পথ চলতে চলতে জোহান্‌কার কথা আবার মনে পড়ে। দ্রুত হাঁটার ফলে মগজটা বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে, বাড়ি ফিরে জোহান্‌কাকে কি বলবেন তার একটা খসড়া করেন মনে মনে। বচনবিন্যাসে তিনি পটু নন মোটেই, কিন্তু আজ যেন কথার ঝাঁক বন্যার বেগে হাজির হয় মনে—দীর্ঘ কঠোর ভর্ৎসনা, পরিশেষে ক্ষমা। হ্যাঁ, ক্ষমা—শেষটা ক্ষমাই করবেন ওকে, তাড়িয়ে দেওয়াটা সঙ্গত হবে না। জোহান্‌কা কাঁদবে, অনুনয় করবে, কাতরভাবে জানাবে এ কাজ আর কখনও করবে না···নীরবে দাঁড়িয়ে তিনি শুনবেন, বিচলিত হবেন না একটুও, শেষে গম্ভীর কণ্ঠে বলবেন,"জোহান্‌কা, এবারকার মত ক্ষমা করলাম তোমায়।

তুমি যাতে নিজেকে শোধরাতে পার তার একটা সুযোগ দিচ্ছি। সততার সঙ্গে কাজ কর, অন্যায় প্রলোভনের বশীভূত হয়ো না—এর বেশী আর কিছু আমি প্রত্যাশা করি না। বুড়ো হয়েছি আমি, কারও প্রতি নিষ্ঠুর হতে চাই না।"

ভাবতে ভাবতে তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেন যে কখন যে বাড়ি পৌঁছে গেছেন তাঁর খেয়ালই হয় না। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারেন তিনি। এ আবার কি? জোহান্‌কা ঘরময় ছুটোছুটি করছে আর এদিক ওদিক থেকে নিজের জিনিসপত্র টেনে এনে ফেলছে একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে। ও যে খুব কেঁদেছে তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়—ড্যাবডেবে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা তখনও ভিজে। ভয়ে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ভারী হয়ে ওঠে—জোহান্‌কার মতলব কি? ট্রাঙ্কটা বের করেছে কেন? পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এসে আশ্রয় নেন। মাথার মধ্যে যেন নানা রকমের চিন্তা জটলা পাকায়—অবস্থাটা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। জোহান্‌কা চলে যাচ্ছে নাকি?

ফিরে-পাওয়া জিনিসগুলো ছড়ানো রয়েছে সামনে ঐ টেবিল-টার ওপর—আঙুল দিয়ে তিনি একটু নাড়াচাড়া করেন, কিন্তু এতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় না স্পর্শে। মনে মনে তিনি বলেন জোহান্‌কা তা হলে জানতে পেরেছে যে ওর চুরি ধরা পড়ে গেছে—ভাবছে হয়ত, এখনি ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তাই-ই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে তাড়াতাড়ি। ভালই হয়েছে, আজ আর ওর ভুল ভাঙিয়ে কাজ নেই—থাকুক ঐ ধারণা নিয়ে কাল পর্য্যন্ত। এই মানসিক কষ্টটা কম শাস্তি হবে না ওর পক্ষে—অপরাধের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে—হ্যাঁ, কাল সকালেই ওর সঙ্গে আলোচনা করা যাবে এ সম্বন্ধে।···কিন্তু হয়ত—হয়ত ও এখুনি এসে হাজির হবে—ক্ষমা চাইবে আমার কাছে। আমার সামনে কেঁদে ফেলবে, নতজানু হয়ে মিনতি করবে—আমার করুণা উদ্রেক করার জন্য যা-কিছু করা দরকার কিছুই বাকী রাখবে না হয়ত। আমি অবশ্য বেশীক্ষণ চুপ করে থাকব না, আর্দ্রকণ্ঠে বলব, "তোমার অনুশোচনা দেখে আমি খুশি হয়েছি, জোহান্‌কা। তোমায় আমি বিদায় করতে চাই না—তুমি থাক।"

চেয়ারের ওপর বসে তিনি জোহান্‌কার প্রতীক্ষা করতে থাকেন। বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ—কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। রান্নাঘরে জোহান্‌কার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ শোনা যায়, ট্রাঙ্কের ডালাটা বন্ধ হয় ঝনাৎ করে, শব্দটা বেশ জোর, তারপর সব চুপচাপ।···ও আবার কি? ভীত সন্ত্রস্তভাবে তিনি উঠে দাঁড়ান চেয়ার থেকে, কানে আসে কিসের একটা আওয়াজ··· একটানা রুদ্ধ একটা গর্জ্জন···গর্জ্জনটা এমনি ভয়াবহ যে মনে হয় যেন কোন আহত বন্যপশু আর্ত্তনাদ করছে···গর্জ্জনটা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে, তার পর সুরু হয় ফোঁপানি···উদ্দাম অসংযত, বিকারগ্রস্তের কাতরোক্তির মত···হঠাৎ কানে আসে একটা বিকট শব্দ, কে যেন ধড়াস করে পড়ে মেঝের ওপর, তার পর চাপা কান্নার আওয়াজ।···জোহান্‌কা কাঁদছে। তিনি অবশ্য একটা কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন, কিন্তু এমনি একটা অঘটন একেবারে অপ্রত্যাশিত। রান্নাঘরে এখন কি হচ্ছে জানবার জন্য তিনি আবার কান খাড়া করে শোনেন। কৈ, কিছুই না—কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। এখনি ও নিজেকে সামলে নেবে হয়ত, তার পর···তার পর আসবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে।

মনটাকে বেশ একটু শক্ত করে নেবার জন্য ঘরের মধ্যে তিনি পায়চারি করতে থাকেন, কিন্তু জোহান্‌কার দেখা নেই। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কান খাড়া ক'রে শোনেন—সেই একটানা কান্নার সুর, তবে কান্নার বেগটা একটু যেন কমেছে।···এই ভয়াবহ নৈরাশ্য অসহ্য মনে হয়। মনে মনে বলেন, যাই না একবার জোহান্‌কার কাছে, ওকে শুধু বলব, কেঁদো না, জোহান্‌কা—তোমার অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এসব আমি ভুলে যাব, কিন্তু ভবিষ্যতে একাজ আর কখনও কর না।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড আঘাতে দরজাটা খুলে যায় সশব্দে, মুখ তুলে তিনি দেখেন, জোহান্‌কা চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে, কান্নায় মুখচোখ অসম্ভব রকম স্ফীত, তাকিয়ে থাকতে ভয় হয় মনে।

"জোহান্‌কা!" ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি।

"আমার সঙ্গে এই ব্যবহার? এমনি অবিশ্বাস···আমি যেন চোর! কি ঘেন্না···" উত্তেজিত ভাবে বলতে সুরু করে জোহান্‌কা।

"কিন্তু জোহান্‌কা," ভয়জড়িতকণ্ঠে তিনি বলেন, "আমার জিনিসপত্র তুমি কি না বলে নাও নি? ঐ ত রয়েছে সব টেবিলের ওপর—বল নাও নি?"

কিন্তু সে কথায় কান দেয় না জোহান্‌কা। "কি অপমান—কি লাঞ্ছনাই না আমায় সইতে হ'ল আজ! আমার অজান্তে আমার দেরাজ খুলে দেখা—যেন আমি চোর, চুরি করাই আমার পেশা! আপনার উচিত হয় নি ও কাজ করা···আমায় অপমান করার কোন অধিকারই নেই আপনার···এ ব্যবহার আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করি নি কোন দিন। আমি কি চোর? সত্যিই কি আমায় চোর মনে করেন আপনি?" আবেগের আতিশয্যে জোহান্‌কার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। "আমি কি সত্যিই চোর? নীচ বংশের মেয়ে আমি নই, আমি করব চুরি? এ অপমান···এ লাঞ্ছনা আমি ভুলব না কোন দিন···মৃত্যুর দিনও মনে থাকবে আমার···"

"কিন্তু জোহান্‌কা," বিব্রতভাবে তিনি বলেন, "একটু শান্ত হও—বোঝবার চেষ্টা কর দোষটা কার। আমার জিনিস তোমার দেরাজের মধ্যে গেল কি করে?···এই যে সিল্কের ওয়েস্ট-কোটটা—এটা তোমার, না আমার? বল, আমি তোমার উত্তর চাই।"

"আমি কিছু শুনতে চাই না," ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জোহান্‌কা বলে, "ছি ছি কি ঘেন্না! আমি যেন চোর···গোপনে আমার

দেরাজ তল্লাস করা···না না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না··· এই মুহূর্তেই···" —জোহান্‌কা উত্তেজিত হয়ে ওঠে—"এই মুহূর্তেই আমি চলে যাব এ বাড়ি ছেড়ে···কাল সকাল পর্য্যন্তও থাকব না এখানে···না না···"

"অত অস্থির হয়ো না, জোহান্‌কা," শঙ্কিত মুখে তিনি বলেন, "তোমায় আমি তাড়িয়ে দিতে চাই না। তুমি এখানে থাক—যেমন ছিলে এতদিন। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর হৈ চৈ করে লাভ নেই। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই তোমায় বলি নি এ পর্য্যন্ত—তুমি চুপ কর।"

"আর আমি থাকতে চাই না এখানে, আর কাউকে আপনি রাখুন, কাল সকাল পর্য্যন্তও এখানে থাকব না আমি," অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে জোহান্‌কা বলে—"আমি কি কুকুর যে এ অপমান মুখ বুজে সহ্য করব? হাজার টাকা মাইনে পেলেও আর আমি কাজ করব না এখানে···রাস্তায় রাত কাটাব সেও ভাল, তবু এখানে আর থাকব না··"

"কিন্তু কেন তুমি উত্তেজিত হচ্ছ, জোহান্‌কা?" অসহায়ভাবে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেন, "আমি ত তোমার মনে কোন আঘাত করি নি। তাছাড়া যতই দোষারোপ আমায় কর না কেন, এটা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে···"

"না, আঘাত করবেন কেন? আমার দেরাজ খুলে জিনিসপত্র তছনছ করেছেন—চোর বলে আমায় সন্দেহ করেছেন—এসব কিছুই নয়? আমি চাকরাণী যে, সব কিছুই আমায় সহ্য করতে হবে। এ রকম ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত কোথাও পাই নি··· অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ তাই এখানে···"

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে জোহান্‌কার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, বেগে সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

একেবারে হতভম্ব হয়ে যান তিনি। অনুশোচনার পরিবর্ত্তে এসব কি? এর তাৎপর্য্য বোঝা যায় না যেন। কাকের মত অলক্ষ্যে চুরি করছে ও, কিন্তু সেটা আমি জানতে পেরেছি বলে অপমানিত বোধ করছে—চুরি করতে লজ্জা বোধ করছে না অথচ চোর বলায় দুঃখে অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে! জোহান্‌কা পাগল হ'ল নাকি?

কিন্তু তিক্ততা কমে আসে ক্রমশঃ—জোহান্‌কার ওপর করুণা হয়। মনে মনে তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুর্ব্বলতা আছে, ঐ দুর্ব্বল স্থানটা স্পর্শ করলেই আঘাত পায় সে মনে—অভিমানে দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজের দোষত্রুটির মাঝখানে মানুষ যে কি করে এই অপরিসীম নৈতিক স্পর্শকাতরতা পোষণ করে মনে তা সত্যিই বিস্ময়কর। অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করবে না সে অথচ কেউ সেটার সামান্য উল্লেখ করলেই অভিমানে সে গর্জ্জন করে উঠবে। তার গোপন অপরাধের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। অমনি শুনবে বেদনার্ত্ত হৃদয়ের ক্রুদ্ধ অভিযোগ।

কান্নার আওয়াজ আসে রান্নাঘর থেকে—আওয়াজটা চাপা—মনে হয় জোহান্‌কা বালিশে মুখ রেখে কাঁদছে। আস্তে আস্তে তিনি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যান। ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই, দরজা বন্ধ। বাইরে থেকেই তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেন জোহান্‌কাকে, ভর্ৎসনা করেন আবার সান্ত্বনাও দেন, কিন্তু জোহান্‌কা সাড়া দেয় না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আরও জোরে। ক্লান্ত ভাবে তিনি ফিরে আসেন নিজের ঘরে—করুণার উচ্ছ্বাসে হৃদয় উদ্বেলিত, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় তিনি। সামনেই টেবিলের ওপর ছড়ানো সেই হারানো জিনিসগুলো—নতুন শার্টের গোছা, টাই, ওয়েষ্ট-কোট, প্রিয়জনের স্মৃতিচিহ্ন কত কি। আঙুল দিয়ে তিনি একটু নাড়াচাড়া করেন, কিন্তু স্পর্শে আনন্দের ক্ষীণতম আভাসমাত্র নেই, আছে ব্যথা ও বিষাদের সুনিবিড় অনুভূতি।*

* চেকোস্লোভাকিয়ার বিখ্যাত লেখক Karel Capek-এর The Shirts গল্পের অনুবাদ। নাট্যকার হিসাবে সমগ্র ইয়োরোপে Capek-এর খ্যাতি অসাধারণ। এঁর লেখা দুখানি বই—R. U. R. ও The Insect Play—বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে সুধীসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। ছোট গল্প রচনায়ও এঁর দক্ষতা কম নয়। অনূদিত গল্পটিই তার প্রমাণ।

অমৃতময়ীর শেষযাত্রা

শ্রীসরলাবালা সরকার

সন ১২৯৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস, অমৃতময়ী শেষশয্যায় শায়িতা, শয্যাপার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্থিরসৌদামিনী তাঁহার শুশ্রূষায় রত রহিয়াছেন।

অমৃতময়ী স্বর্গগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের জননী, তাঁহার নাম অনুসারেই ঘোষ পরিবারের বিখ্যাত পত্রিকার নাম হইয়াছিল "অমৃতবাজার।"

যশোহর জেলার পোলো মাগুরা নামক ক্ষুদ্র পল্লী, অমৃতময়ী এই পল্লীর বধূ ছিলেন। তখনকার পল্লী-বাসীর জীবনযাত্রা এখনকার দিন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল। দুঃখ দারিদ্র্য ও রোগ শোক চিরকালই পৃথিবীতে আছে এবং থাকিবে, কিন্তু তখনকার দুঃখ দারিদ্র্য আধুনিক কালের দুঃখ দারিদ্র্য হইতে পৃথক ধরণের ছিল।

অমৃতময়ীর দৌহিত্র পরলোকগত রঞ্জনবিলাস রায়-

চৌধুরী মহাশয় তৎকালীন অসচ্ছলতা সম্বন্ধে আমাদের নিকট একটি বর্ণনা দিয়াছিলেন। রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান যশোহর জেলার হাজিরালী গ্রাম। হাজিরালী গ্রামের রায় চৌধুরীরা এককালে ধনশালী জমিদার ছিলেন, ক্রমে তাঁহাদের অবস্থার অবনতি হয়। রঞ্জনবাবুর এক জ্ঞাতি খুল্লতাত দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার দারিদ্র্যের সম্বন্ধে রঞ্জনবাবু আমাদের যে-ভাবে বলিয়াছিলেন তাঁহার সেই কথাগুলিই এখানে দিতেছি :—"কাকামশায় ছিলেন বড়ই গরীব। কিছু ধানী জমি ছিল, তাতে সম্বৎসরের ধান হ'ত, আর কোন জমিজমা ছিল না। কাকামশায়ের আফিমের মৌতাত ছিল, সেইজন্য প্রত্যহ দেড়সের দুধ না হ'লে তাঁর চলত না। ঘরে গরু ছিল, কাজেই দুধের অভাব ছিল না। কাকামশায়ের ভাতের পাতে প্রত্যহই এক ছটাক করে গাওয়া ঘি খাওয়া অভ্যাস ছিল, দুধের সর তুলে ঘরেই ঘি তৈরী হ'ত, কাজেই তাঁর ঘিয়েরও অভাব হ'ত না। কিন্তু তবু তিনি বড়ই গরীব। গরীব, কেননা, তাঁর হাতে নগদ পয়সা ছিল না, আফিম কেনবার জন্য এ'র তার কাছে হাত পাত্‌তে হ'ত। হাটবারে তিনি পয়সার অভাবে মাছ কিনতে পারতেন না, পুকুরের ছিপে ধরা মাছেই তাঁর দিন চলত। আরও গরীব এই জন্য যে, হাটবারে যখন হাটে কদমা ও সাদা চিনি আসত পয়সার অভাবে তিনি তা কিনতে পারতেন না। কিন্তু তা বলে তাঁর বাড়ীতে ছেলেপুলে কদমা কি হাটের মাছ খেতে পেত না তা নয়, বরং সকলের বাড়ী থেকে তাঁর বাড়ীতে এসব জিনিস বেশীই থাকত, কেননা তাঁর পয়সা নাই তিনি কিনতে পারেন না, এজন্য সকলের ঘরের জিনিস আগে তাঁর ঘরে আসত।

"তাঁর সব চেয়ে বেশী গরীবের পরিচয় তাঁর পরনের কাপড়ে। তিনি কলের ধুতি কিনে পরতে পারতেন না, চরখার সুতায় জোলার বোনা ধুতিই তাঁকে পরতে হত। তবে দুর্গাপূজার সময় কিছু কলের কাপড়ও যে তিনি না পেতেন এমন নয়।"

চাষীরা তখনও অজন্মা ও অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইত, কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই তিন চারিটি ধানের মরাই ও ডালের গোলায় ধান ও ডাল সঞ্চিত থাকত, দু-এক বৎসরের অজন্মায় বড় কিছু আসিয়া যাইত না। বিখ্যাত মন্বন্তরের সময় অমৃতময়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র বসন্তকুমার বাড়ীর ধানের গোলাগুলি উজাড় করিয়া নিরন্নকে অন্ন দিয়া বাঁচাইয়াছিলেন।

অজন্মা ছিল, বন্যা ছিল, জমীদার ও থানার দারোগার অত্যাচারও ছিল এবং সর্ব্বোপরি ছিল নীলকরের বিষম অত্যাচার। ইহা সত্ত্বেও চাষীরা এখনকার মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল না। রঞ্জনবিলাস পশ্চিমে কর্ম্মস্থলে থাকিতেন। তিনি দেশে আসিলে একজন চাষী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হাদে, সে দেশে খেজুর গাছ নাই? সারা শীত রস খাতি পাও না? তবে থাক ক্যামনে? আমি হলি তো থাক্‌তি পারতাম না।" এই খেজুর গাছ ছিল যশোহর জেলার এক বিশেষ কৃষি-সম্পদ।

প্রথম জীবনে অমৃতময়ীকেও দারিদ্র্যক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রথমে একটি কন্যা সন্তান হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবার পর তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা হয় নাই। তাঁহার শ্বশুর পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, না হইলে বংশরক্ষা হয় না। অমৃতময়ী বুঝিলেন 'সন্তান হয় নাই' এই অপরাধে তিনি স্বামী হইতে বঞ্চিত হইবেন। সে সময়ে তাঁহার যে মানসিক অবস্থা হইয়াছিল বৃদ্ধবয়সে তিনি সে সম্বন্ধে গল্প করিতেন, "আমি তখন একটা উঁচু ঢিবি দেখলেও গড় হয়ে প্রণাম করতাম, বটগাছ, অশথ গাছ, তুলসী গাছ যা চোখে পড়ত সেই খানেই প্রণাম করতাম, মনে মনে বলতাম 'হে ঠাকুর, আমাকে একটি ছেলে দাও। রাঁধতে বসে উনুনের কাঠ সরিয়ে ব্রহ্মাকে প্রণাম করতাম, কপোতাক্ষী নদীতে স্নান করতে গিয়ে মা গঙ্গাকে প্রণাম করতাম। দিনরাত সকল দেবতাকে এক-মনে ডাকতাম। উনি তখন যশোরে ওকালতী করতে আরম্ভ করেছেন, এত সব খবর জানতেন না। এক মাস দু'মাস এইভাবে গেল, চারদিকে মেয়ের খোঁজ হচ্ছে, উনি বাড়ী এলেই বিয়ে হবে। উনি বাড়ী এলেন, আমার দশা দেখে ওঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমাকে অনেক বুঝালেন, বললেন 'তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি যদি বিয়ে না করি কে আমাকে বিয়ে দেবে?' কিন্তু সে কথা শুনেও আমার মন বুঝল না, 'বাপ মা'র কথা না শুনাই কি ভাল? আর বংশ রক্ষাও তো চাই।' তিনি আমার কথা শুনে হাসলেন, বললেন, 'আমি কিছুতেই আবার বিয়ে করব না, বাড়ী হতে যদি পালাতে হয় সেও ভাল।' তিনি কয়েকদিন থেকেই আবার যশোর চলে গেলেন, কিন্তু মেয়ের খোঁজ চলতেই লাগল।"

"ভাবনায় আমার শরীর এত কাহিল হ'ল যে উঠতে গেলে যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাই। আমার পিস্‌শাশুড়ী

আমার শ্বশুরকে একদিন বললেন 'বউডোরে কি তোরা খুন করবি।'

"আমি ভাবতে ভাবতে রাতে স্বপ্ন দেখলাম, মা দশ-ভূজা গণেশ-জননী রূপে দশ দিক আলো করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ছেলে ছেলে করে কি তুই পাগল হবি? এই নে, আমার ছেলে তোকে দিলাম।' বলে কোল থেকে গণেশকে তুলে আমার কোলে ফেলে দিলেন।"

অমৃতময়ীর এই স্বপ্ন দর্শনের অল্পদিন পরে বিবাহ যখন প্রায় স্থির হইয়াছে, তখন তাঁহার পিস্‌শাশুড়ী সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "ওরে তোরা আর বিয়ে. বিয়ে করে ডামাডোল করিস নে, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, বৌমার আবার সন্তান সম্ভাবনা মনে হচ্ছে।" এই গর্ভে বসন্তকুমারের জন্ম হয়।

সেই অমৃতময়ী আজ বহু পুত্র কন্যার জননী। তিনিই গৃহিণী, অথচ এই বৃদ্ধ বয়সেও অনুগতা কুলবধূর ন্যায়ই তাঁহার সকল আচরণ। বহু সন্তান বিয়োগশোকে তাঁহার স্বাভাবিক অতিকোমল স্নেহপূর্ণ হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি দিবারাত্র ভগবানের স্মরণ মননেই শোক নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দুই বিধবা পুত্রবধূর দিকে চাহিলে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত। আজ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি তাহাদেরই কথা ভাবিতেছেন। কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দামিনী, আমি কেবল ভাবি এই দুই অনাথিনীর কি হবে? নতুন বৌ তো পাগল, আর রাঙ্গাবৌ দারুণ অভিমানী, তাদের সে অভিমান কে বুঝবে? রাম যখন চলে গেল, আমাকে আর নতুন বৌকে ওরা কলকাতায় নিয়ে আস্‌ছে। ঝিকরগাছী ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠতে যাবার সময় আমি টলতে টলতে চলছি, পা কোথায় যে পড়ছে আমার জ্ঞান নেই; নতুন বৌ হঠাৎ হেসে উঠল, 'ওমা আমার যে বড্ড হাসি পাচ্ছে মা, তুমি কি রকম করে পা ফেলছ বল দেখি?'

"হায় রে কপাল, একমাস আগে তার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তা সে তখনও বুঝতে পারছে না এমনি ছেলেমানুষ! বলতো দামিনী তার এ ছেলেমানুষী কে বরদাস্ত করবে?"

এই সময় দূর হইতে শিশুর ক্রন্দনের ও সেই সঙ্গে প্রহারের শব্দ শুনা গেল, অমৃতময়ী চকিতভাবে বলিলেন, "ঐ দেখ, ছেলেটাকে রাঙাবৌ বুঝি মেরে খুন করলে? হা রে অবোধ, সকলের উপর অভিমান মেটাতে চাস্ কি ঐ শিশুর উপর দিয়ে? তুমি একবার ওকে আমার কাছে ডেকে আন্, আমি বুঝিয়ে বলি।"

বেলা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, অমৃতময়ী নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। মতিলাল আসিয়া জননীর শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়-দিদি মা কি ঘুমাচ্ছেন।" ইঙ্গিতে সম্মতিজ্ঞাপন পাইয়া ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন, "মার আবদারটা একবার দেখ। আমায় বলেন কিনা, 'মতি আমাকে কি তোরা গঙ্গায় নিয়ে যাবি নে?' দেখ তো কাণ্ড! মার এই শরীর নিয়ে টানাটানি করে গঙ্গায় নিয়ে যেতে পারি আমরা? মা যেন পাগল হয়েছেন, আমরা তো পাগল হই নি! কালাচাঁদ ডাক্তার কাল কি বলে গেল শুনেছ তো, যেন একটুও নড়াচড়া না করেন।"

অমৃতময়ী ঈষৎ হাসিয়া চক্ষু মেলিলেন, বলিলেন, "গঙ্গায় নিয়ে যাস্ যাবি না যাস্ না যাবি আমার কি? ছেলের কর্ত্তব্য না করলে লোকে তোদেরই নিন্দে করবে।"

মতিলাল রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "ছেলের কর্ত্তব্য বুঝি মাকে নিয়ে টানাটানি করা। দেখ একবার বড়দিদি মার কাণ্ডটা। কোথায় বিছানায় শুয়ে আরাম করে গৌরনাম করবেন তা নয়, চল সেই গঙ্গার ধারে! মা তোমার আবার এসব কেন? এতদিন পরে তোমার কাছে বাড়ী আর গঙ্গা আলাদা হল নাকি?"

ছেলের রাগ দেখিয়া জননী হাসিলেন, বলিলেন "আচ্ছা তোদের যা ভাল মনে হয় তাই করিস্।"

এই বলিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মতিলাল নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; বলিলেন, "আচ্ছা কালাচাঁদবাবু এখনি আস্‌ছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখি তিনি কি বলেন? আর দেখ মা, পাঁচ টাকার তুলসীগাছ কিনে এনেছি, তোমার বিছানার চারিপাশে সেই তুলসীগাছ ঘিরে তুলসী কানন করে দেব, তাতেও কি তোমার গঙ্গার সাধ মিটবে না।"

ডাক্তার আসিয়া মায়ের বিছানায় বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আজ কেমন আছেন?" বলিয়া মায়ের হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিলেন; মতিলাল দেখিলেন ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়াছে।

মতিলাল বলিলেন, "কালাচাঁদবাবু, এখন কি মাকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া যায়? মা গঙ্গায় যাব বলে আব্‌দার ধরেছেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "তা যখন যেতে চাইছেন নিয়েই যাও একবার। তবে দিনে দিনে খুব সাবধানে নিয়ে

যাও। সেখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে তো! যদি নিয়ে যেতে হয় আর দেরি কোরো না, গঙ্গার হাওয়ায় কিছু উপকার হতেও পারে।" এই বলিয়া মতিলালের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

মতিলাল কিছু পরে আবার আসিয়া মায়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, জননীকে বলিলেন, "তা চল, গঙ্গার ধারেই একবার চল, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে। বড়দিদি, আমি কিন্তু সংকীর্ত্তনের দল আনব না। খোলের বাজনায় মার মাথায় কষ্ট হবে।"

ইহার পরের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে স্থিরসৌদামিনী যেমন বলিয়াছিলেন সেই সেই কথাগুলিই দিতেছি,—

"মতি বলেছিল আমি কীর্ত্তনের দল কখনো আনব না, সেই মতি নিজেই আবার বেছে বেছে ভাল কীর্ত্তনীয়া নিয়ে এল। খাট কিনিয়ে নিয়ে এসে তাতে খুব নরম করে বিছানা পাতালে। রাশি রাশি বেলফুলের মালা এল, মতি বললে, 'মার গায়ের উপর কেউ যেন ফুল চাপিও না, তাতে মার কষ্ট হবে। ফুল দিয়ে খাট আর বিছানা সাজিয়ে দাও।'

"অতি সন্তর্পণে মাকে সেই বিছানার উপর তোলা হ'ল। 'মা চল তোমাকে গঙ্গাদর্শন করিয়ে আনি' বলে মৃণাল গোলাপকে ডেকে এনে নিজেই অগ্রণী হয়ে খাট তুলে নিয়ে গঙ্গার ধারে চলল। জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ গ্রীষ্ম, একমাস মোটে বৃষ্টি হয় নি। মতি বলেছিল, 'মাকে ছাতা ধরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে-দিন আকাশের মেঘ মা'র মাথার উপর যেন চন্দ্রাতপ ধরলে। রৌদ্রের আভাসও বুঝতে পারা গেল না, অথচ বৃষ্টিও হ'ল না।

"মতির বিশেষ নিষেধ ছিল, 'মার যাত্রার সময় কেউ যেন কান্নাকাটি না করে।' বাড়ীর সকলে নীরবে চোখের জল ফেলছে, কিন্তু বাড়ীর ভিতরের উঠান থেকে প্রসন্ন ঝির আর্ত্ত রোদন শোনা গেল। 'ওগো, আমার যে আর কেউ নেই গো!' বলে প্রসন্ন উঠানে আছড়াইয়া পড়িল। প্রসন্ন অল্প বয়সে লোকের প্রলোভনে ভুলিয়া বিপথে গিয়াছিল, সেজন্য তাহার বাড়ীতে তাহার স্থান হয় নাই, কিন্তু মা তাহাকে তখনকার দিনের সামাজিক অনুশাসন গ্রাহ্য না করিয়া অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। প্রসন্নের একটি মেয়ে হইয়াছিল, প্রসন্ন যখন বাগানের পুকুরে বাসন মাজিতে যাইত তখন মার আদেশে বৌদের একজন মেয়েটিকে পাহারা দিত। মেয়েটি কয়েক বৎসরের হইয়া মারা যায়। তাহার পর প্রসন্নের স্বভাব এত উগ্র হইয়া উঠিল যে তাহার ঝগড়ার জ্বালায় বাড়ীতে কাক চিল বসিতে পাইত না, কিন্তু মার কাছে সেই প্রসন্ন যেন একেবারে মাটির মানুষ।

"মা আজ বাড়ী ছাড়িয়া চলিলেন। এই বাড়ী এই সংসার মা যেন ভালবাসা দিয়া গড়িয়াছিলেন। তাঁহার সেই দুর্ব্বল, ক্ষীণ শরীরখানি যেন জগতের সকল ঝড়-ঝাপ্‌টা বুক পাতিয়া নিয়া সকলকেই কুশলে রাখিতে চাহিত। তাঁর ভালবাসায় সংসার যেন প্রেমের সংসার হইয়াছিল। ভাইয়ে ভাইয়ে ভাই বোনে কতই ভালবাসা, বধূগণ, আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত ও পরিজন সকলেই যেন সেই এক ভালবাসার বন্ধনে এক হইয়াছিল; আপন পর বলিয়া সংসারে কোন কথাই ছিল না।

"মা শান্তভাবে গৌরনাম জপ করিতে করিতে মৃণাল গোলাপ ও মতির দ্বারা বাহিত হইয়া গঙ্গাতীরে চলিয়াছেন। তাঁহার অতি প্রিয় হরিনামের মালাটি তাঁহার বুকের উপর রহিয়াছে, এই মালাগাছি তাঁহার দিবারজনীর সাথী ছিল। গঙ্গার তীরে পৌছিয়া বিশ্রামের জন্য মাকে শীতল হাওয়ায় রাখা হইল। সন্ধ্যা হইয়াছে, শুক্লা রজনীর জ্যোৎস্নায় গঙ্গাতীর আলোকিত। সেই সময় মেজদাদা তাঁহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া ঘাটে পৌছিলেন। তিনি মাগুরায় ছিলেন, সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছেন।

"মেজদাদা আসিয়া মার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন; মা হিমু বলিয়া তাঁহার হাতখানি তাঁহার নত মাথার উপর দিলেন। মেজদাদা বলিলেন, 'মা, তোমার দুই অনাথিনীর ভার আমি নিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত মনে গৌরধামে যাও।'

"মা অতি মৃদু স্বরে কি যে বলিলেন ঠিক বুঝা গেল না, যেন বলিলেন, 'অনাথ অনাথিনী সকলের ভারই নিতে হবে।'

"গঙ্গাতীরে একজন ব্রাহ্মণ জানি না কোথা হইতে আসিয়া মার শিয়রে বসিয়াছিলেন। তিনি মৃদু মৃদু জপ করিতেছিলেন। মতি আমাকে একটু দূরে ডাকিয়া নিয়া গিয়া বলিল, 'দেখ অন্তর্জলী-টলীর নাম আমার কাছে কেউ করো না, সে রকম নিষ্ঠুরাচরণ আমি কিছুতেই করতে পারব না।' কিন্তু সেই ব্রাহ্মণটি—'সময় উপস্থিত, ধর, ধর,' বলিয়া মার মাথা তুলিয়া ধরিলেন, মতি তাঁহাকে ধমক দিয়া 'থামো ঠাকুর তুমি!' বলিতে বলিতে যেন আবিষ্টের মত নিজেই মাকে কোলে তুলিয়া গঙ্গাগর্ভে নামাইল, নিজেই মার অন্তর্জলী করিল। এই ভাবে মুহূর্ত্তের জন্যও মা যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মতির দ্বারাই তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল।"

রবীন্দ্র-রচনায় অতিপ্রাকৃত

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়, এম-এ

যে রচনা বাস্তবকে ছাড়াইয়া অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনাকে আঁকড়াইয়া সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে চায় উহাকে আমরা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া গ্রহণ করি না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে স্বাভাবিক আখ্যানবস্তুর সৃষ্টি হয় উহাকেই আমরা নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত রচনা মনে করি। কিন্তু তাই বলিয়া অতিপ্রাকৃতের সাহায্য লইলেই যে রচনা বিকৃত হয় এমন নয়। অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনাকে বাস্তব ঘটনা সমন্বিত আখ্যানবস্তুতে প্রয়োগ করিতে হইলে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও নিপুণতার প্রয়োজন। মহাকবি শেক্সপীয়রের কয়েকটি নাটকে আমরা এইরূপ অতিপ্রাকৃত ঘটনার পরিচয় পাই। কিন্তু উহাতে তাঁহার ড্রামাটিক আর্টের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। বরঞ্চ ঐগুলি না থাকিলেই নাটকের গল্পাংশে কোথায় যেন একটু খুঁত থাকিয়া যাইত—এইরূপ এখন মনে হয়। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে তখন আমরা অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে আর অবাস্তব বলিয়া মনে করি না। ইহাই হইল নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত শিল্প।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে আমরা এইরূপ কয়েকটি অতিপ্রাকৃত ঘটনা পাই। কিন্তু উহাতে তাঁহার গল্পকয়েকটি 'ভৌতিক' আখ্যা পায় নাই। ঐ কয়েকটি গল্প তাঁহার উৎকৃষ্ট কয়েকটি গল্পের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কিরূপে ঐগুলি উৎকৃষ্ট রচনা হইল? ইহাই হইল প্রশ্ন। পাঠকের মনে এক আশ্চর্য্যভাব সৃষ্টি বা ভীতির সঞ্চার করিবার জন্য নিশ্চয়ই তিনি ঐগুলি লিখেন নাই। কেননা ঐগুলি শেষ করিলে পর আমরা কখনও আশ্চর্য্যান্বিত বা ভীত হই না। আমরা বরঞ্চ ভাবি, কি করিয়া এমনটা হইল? পড়িবার সময় ত কোনটাই অবাস্তব বলিয়া মনে হয় নাই!

রবীন্দ্রনাথের Supernaturalism তাঁহার "কঙ্কাল" ও "ক্ষুধিত পাষাণ" নামক ছোটগল্পদ্বয়ে সবিশেষ পরিস্ফুট। প্রত্যেকক্ষেত্রেই তিনি একটা অতিপ্রাকৃতের অনুরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াই পাঠকের মন আকৃষ্ট করিয়াছেন। কঙ্কালের অধিকারিণীর আবির্ভাবের সময় রাত্রি বারটা অতীত হইয়া গিয়াছিল। "ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল।" তারপরেই একটি অশরীরী জীবের উপস্থিতি অনুভূত হইল। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়স সীজরে' ও 'হ্যামলেটে' আমরা ঠিক এই ভাবেই সীজারের প্রেতাত্মা ও হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখিতে পাই। কিন্তু সীজারের আত্মা ও হ্যামলেটের পিতার আত্মার আবির্ভাবের মূলে প্রতিশোধগ্রহণ ইচ্ছা বলবতী। উহাদের উপস্থিতি অনুভূত হয় নাই, উহারা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পে আমরা যে-সকল মৃত ব্যক্তির পুনরাবির্ভাবের পরিচয় পাই তাহাতে কোথাও প্রতিশোধগ্রহণ ইচ্ছার ইঙ্গিত নাই। "কঙ্কালে" যে প্রেতাত্মা আসিয়াছিল উহা তাহার গত জীবনের ইতিহাস শুনাইতে আসিয়াছিল। উহা মানুষের সংসর্গলাভে ইচ্ছুক। কঙ্কাল স্পষ্টই বলিয়াছে, "এই কয় বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজি তোমার কাছে বসিয়া আর একবার মানুষের মত গল্প করি।" "ক্ষুধিত পাষাণে"ও কিসের একটা অতৃপ্ত বাসনা প্রতি পদার্থে বিরাজিত। রবীন্দ্রনাথের সহিত ইংরেজ কবি কীটসের অতিপ্রাকৃত রচনাভঙ্গীর অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কঙ্কালের প্রেতাত্মা আবার কাক ডাকিবার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। ইহারা যেন অন্ধকারের জীব, আলোকে উহারা ভয় করে।

"ক্ষুধিত পাষাণে" আমরা যে Supernaturalismএর পরিচয় পাই তাহাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থা উভয়ই সমভাবে কার্য্যকরী। যে বাড়ীর এত বদনাম যে 'রাত্রে চোরও আসিতে সাহস করে না' সেখানে থাকিলে অতি সাহসী ও মানসিক বল সম্পন্ন ব্যক্তিরও দুর্ব্বলতা দেখা দেয়। যে 'অসামান্য ব্যক্তিটি' গল্পটি বলিয়াছিলেন তাঁহার বুকের উপর এই পরিত্যক্ত পাষাণ-প্রাসাদের বিজনতা যেন একটা ভয়ঙ্কর মত চাপিয়া থাকিত। ক্রমে বাড়িটার এক অপূর্ব্ব নেশা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। "সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মত তাঁহাকে উহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।" তাহার পর হইতেই তিনি প্রতি পদার্থে সিঁড়িতে, গুস্তার জলে, ঘরে, কোন অশরীরী

জীবের অবস্থিতি অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি স্বপ্নে দূতী দ্বারা চালিত হইতে লাগিলেন ও অবশেষে আয়নায় তাঁহার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে তরুণী ইরাণীর ছায়া দেখিতে পান। সমস্ত প্রাসাদ যেন কিসের একটা ক্ষুধায় ক্ষুধিত। তাই যাহারা ঐ প্রাসাদে 'ত্রিরাত্র' বাস করে, তাহারা কেহ উহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই; কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়াছিল। মেহের আলিকে বাহির করিয়া রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃতের সহিত বাস্তবের যোগসাধন করিয়াছেন। "Ancient Mariner"-এও কোলরিজ Wedding Guestকে খাড়া করিয়া বাস্তবের সহিত তাঁহার অতিপ্রাকৃত ঘটনার সংযোগ রাখিয়াছেন। "ক্ষুধিত পাষাণে" যখন অশরীরী জীবের প্রকৃত উপস্থিতি অনুভূত হইল তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে আপনার কেশজাল ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে···মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে ও মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সমস্তই তিনি 'অনুভব' করিয়াছেন, 'প্রত্যক্ষ' নয়।

"কঙ্কালে"র পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানসিক অবস্থারও আলোচনার প্রয়োজন। যিনি কঙ্কালের প্রেতাত্মার অবস্থিতি অনুভব করিয়াছেন তিনি বহুপূর্ব্ব হইতেই ঐ কঙ্কালের সহিত পরিচিত। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম, উহার পাশের ঘরের দেওয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলো খট্ খট্ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত।" বহু বৎসর পরে একদিন রাত্রে কোন কারণে তাঁহাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশতঃ তাঁহার ঘুমও হইতেছিল না এবং সেই স্থানে কঙ্কালটিও ছিল না। এমতাবস্থায় কঙ্কাল সম্বন্ধে নানা কথা উদিত হইয়া মনকে বিভ্রান্ত করা অস্বাভাবিক নয়। এই মানসিক অবস্থাই "নিশীথে" গল্পে নানা প্রকার অতিপ্রাকৃত ঘটনার কারণ। দক্ষিণাচরণ তাহার প্রথমা স্ত্রীর নিকট বলিয়াছিল যে সে এ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না এবং ইহাতে তাহার স্ত্রী হাস্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরই সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে। তাই ঠিক অনুরূপ কথা দ্বিতীয়া স্ত্রীর নিকট বলিবার সময় তাহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল এবং সে দীর্ঘ এক ঝাঁক পাখীর পাখার শব্দকে মর্ম্মভেদী "হা হা" হাসি কল্পনা করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ "ও কে?" এই প্রশ্ন তাহার প্রথমা স্ত্রী তাহার ভাবী দ্বিতীয়া স্ত্রীর সম্পর্কেই করিয়াছিল। দক্ষিণাচরণ তখন জানে না বলিয়া উত্তর দেয় এবং ঠিক তাহার পরই তাহার স্ত্রী 'ভুল করিয়া' বিষাক্ত ঔষধ গ্রহণ করে। তাই নিশীথে জলচর পক্ষীর "ও কে? ও কে?" এই শব্দ তাহার মনে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দিল এবং তাহার রক্ত হিম করিয়া দিল। তাহার মনে হইল সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন তাহার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি কে একজন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে? ও কে গো?—"

অতএব আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি যে, মানসিক অবস্থা ও অনুরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতিপ্রাকৃত ঘটনাসম্বলিত গল্পগুলিকে স্বাভাবিক করিয়াছেন। গল্পগুলি পড়িতে বসিয়া কোথাও আমরা অবিশ্বাসের হাসি হাসি না; মনে করি এগুলি স্বাভাবিক। গল্পগুলির একটা অপূর্ব্ব নেশা যেন আমাদিগকে পাইয়া বসে। যদিও মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পাগলা মেহের আলির ন্যায় "তফাৎ যাও, সব ঝুঁট হ্যায়" বাণী উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে বাস্তব জগতে ফিরাইয়া আনেন, তথাপিও গল্পগুলির জঠরস্থ মোহরস আমরা এড়াইতে পারি না। যেন কোন নিপুণ শিল্পী তুলি দিয়া আঁকিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। রাত্রি ও বিজনতাই এই গল্পগুলিকে রূপ দেয়।

তিব্বতের সহিত ভারতের সম্পর্ক

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

তিব্বতের ইতিহাসে আছে যে, বুদ্ধের জন্মের বহুপূর্বে মহাভারতের যুদ্ধের সময় কুরুপক্ষীয় এক রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতে গিয়া আত্মগোপন করেন। ইহার নাম রূপতি। এক হাজার যোদ্ধা ইহার সঙ্গে যান। তখন তিব্বতীরা মানব-সভ্যতার আদিম অবস্থায়। তাহারা এই রাজকুমারকে দেশের রাজা করিয়া লয়। ইনি ও ইহার মিষ্ট ব্যবহারে দেশের লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া বহুকাল রাজত্ব করেন। ইহার ও ইহার বংশধরগণের রাজত্বকালে দেশের ও প্রজাগণের অবস্থার উন্নতি হয়।

তিব্বতের সহিত ভারতের সম্পর্কের ইহাই হইল প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত।

ইহার পর তিব্বতের ইতিহাসে ৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ঞ থি চন্ পো নামে একজন বিখ্যাত তিব্বতী নৃপতির কথা জানা যায়।[১] ইনিও ভারতীয়। ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের পঞ্চম পুত্র। কথিত আছে, এই বালক দুই পংক্তি দন্ত ও চক্রযুক্ত অঙ্গুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং সেইজন্য ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া রাজা ইহাকে পরিত্যাগ করেন। এক কৃষক ইহাকে প্রতিপালন করে। বড় হইয়া নিজেকে রাজপুত্র জানিতে পারিয়া, ইনি কৃষিবৃত্তি ও কৃষক-পরিবার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে ইনি তিব্বতে উপস্থিত হন। তিব্বতের অধিবাসিগণ ইহার সুন্দর আকৃতি দেখিয়া, ইহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিয়া, নিজেদের রাজা করিয়া লয়। ইহার বংশধরগণ সাত পুরুষ পর্যন্ত বেশ নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে থাকেন। অষ্টম পুরুষের রাজত্বকালে মন্ত্রী রাজাকে হত্যা করিয়া রাজ্য দখল করেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি মৃত রাজার বিধবা রাজ্ঞীকে বিবাহ করেন। ঐ রাজ্ঞীর গর্ভজাত তাঁহার এক ঔরস পুত্রই তাঁহাকে হত্যা করেন। রাজ্ঞী তাঁহার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত তিন নির্বাসিত পুত্রকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের সর্বজ্যেষ্ঠকে সিংহাসন দেন। তাঁহার নাম চ্য থি চন্ পো। তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিতে থাকেন।

বোনধর্ম

তিব্বতের প্রাচীন ধর্মের নাম বোন। কথিত আছে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি তিব্বতের উ প্রদেশের সেন-পরিবার হইতে একটি ১৩ বছরের বালককে ভূতে[২] ধরিয়া লইয়া যায়, সেই ভূত বালকটিকে তিব্বত ও খম্-এর নানা স্থানে, পর্বতে পর্বতে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। তের বছর যাবৎ ভূতের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে, নানা ভৌতিক বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে সে নিজ মানব-সমাজে ফিরিয়া আসে। ভৌতিক বিদ্যায় সে এমন অভিজ্ঞ হইয়াছিল যে—কোথায় কি ভূত থাকে—সেই ভূত কোন্ জাতের—দুষ্ট কি সাধু—উপকার করে, না অপকার করে, ইত্যাদি সবই বলিতে পারিত। কি ভাবে ভূতের ক্রোধ শান্ত করা যায় বা তাহার মনোরঞ্জন করা যায়, তাহাও তাহার জানা ছিল। এক কথায় সর্বপ্রকার ভূতের নাড়ীনক্ষত্র তাহার নখদর্পণে ছিল।

এই ব্যক্তি হইতেই বিশেষভাবে তিব্বতে বোনধর্মের প্রচার হয়।

প্রথম দিকে ইহা যাদুকরী ও ভৌতিকবিদ্যা ব্যতীত আর বিশেষ কিছু ছিল না। তখন নানারূপ ক্রিয়াকর্মের দ্বারা নিম্নস্তরের দুষ্ট ভূতদের শান্ত করা এবং উচ্চস্তরের সাধু ভূতগণের স্তুতির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করাই ছিল বোনধর্ম।

ইহার পরের স্তরে তিব্বতীয় ভৌতিক বিদ্যার সহিত ভারতীয় ভৌতিক বিদ্যার সম্মেলন হয়। তাহার সহিত নাকি শৈবধর্মেরও সংমিশ্রণ হয়।

তাহার পরের স্তরে যাহা হয় তাহা বেশ কৌতুকপ্রদ। কথিত আছে, একজন ভারতীয় পণ্ডিত, যিনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন এবং পরে কোন অনাচারের জন্য সমাজ হইতে বিতাড়িত হন, তিনি কাশ্মীরের উত্তরে গিয়া নিজেকে একজন ধর্মপ্রচারক বলিয়া প্রচার করেন। তিনি কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়া, সেই গ্রন্থ মাটির নীচে লুকাইয়া রাখেন। ইহার কয়েক বছর পরে, বহুলোক ডাকিয়া তিনি. ঐ গ্রন্থসমূহ মাটি খুঁড়িয়া উদ্ধার করেন। উহাই

১। রূপতির পর ঞ থি চন্ পোর পূর্ব পর্যন্ত তিব্বতের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

২। সম্ভব ভৌতিক ও যাদুবিদ্যাবিশারদ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি-বিশেষ উহাকে লইয়া গিয়াছিল।

পরে বোনধর্মের শাস্ত্ররূপে গৃহীত হয়। এইরূপে, বোনধর্মের আর একরূপ পরিবর্তন হইল।

ইহার পর যাহা হয় তাহা আরও চমৎকার। তিব্বতে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব বেশী (৭৩০ খ্রীঃ), তখন বোনধর্মিগণ সুবিধা করিতে না পারিয়া, সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিতে থাকে। তিব্বতের বৌদ্ধ সম্রাট্ ইহা জানিতে পারিয়া বহু বোনধর্মীকে হত্যা করেন। কিন্তু তাহাতেও এই জাল বন্ধ হয় নাই। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা গোপনে এই কাজ করিতে থাকে। বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম-ধ্বংশী সম্রাট্ লঙ্‌ দরমের সময় (৯০৮ খ্রীঃ) এই জালের কাজ খুবই বৃদ্ধি পায়। ইহারা এই সব নকল গ্রন্থ পর্বতগুহায় লুক্কায়িত রাখে। পরে যখন ইহা বাহির করা হয় তখন ইহার নাম হয়, বোনধর্মের "গুপ্ত সম্পদ"।

কথিত আছে, বোনধর্মিগণের নকল কাঞ্জুর আছে। বোনধর্মের ঐ শাস্ত্রে, বৌদ্ধধর্মের ন্যায় বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব—কর্মবাদ—বোধিসত্ত্বের মৈত্রী, করুণা, দশভূমি—ছয় পারমিতা ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত পূজা ও ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদিতেও উভয় ধর্মের বিশেষ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্মে যেরূপ বুদ্ধ অর্হৎ ও বোধিসত্ত্বাদি আছেন, সেইরূপ বোনধর্মেও বিভিন্ন নামে অনুরূপ পর্যায়ের মহাত্মা আছেন; যাঁহাদের জ্ঞান, কর্ম, ক্রিয়াকলাপাদি বৌদ্ধ ধর্মোক্ত ঐ সমস্ত মহাপুরুষেরই অনুরূপ। বুদ্ধের যেমন ত্রিকায় (ধর্মকায়, সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায়) আছে, বোনধর্মেও বিভিন্ন নামে অনুরূপ বস্তু আছে। বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের অনুরূপ মতবাদও বোনধর্মে আছে। কেবল নাম ভিন্ন।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম এবং তিব্বতীয় ও ভারতীয় ভৌতিক ও যাদুবিদ্যার সংমিশ্রণে, বোনধর্ম নামে এক অপূর্ব ধর্মের সৃষ্টি হয়। পূর্বে বোনধমে সন্ন্যাস ছিল না, পরে বৌদ্ধধর্মের দেখাদেখি ভিক্ষু ভিক্ষুণীরও সৃষ্টি হয়।

বৌদ্ধধর্ম

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। কিন্তু তিব্বতে হয় বহুকাল পরে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে স্রোঙ্‌ চন্‌ গম্‌ পো নামে একজন প্রতিভাবান তিব্বতী সম্রাট্ ছিলেন। এই সময় পর্যন্ত তিব্বতী ভাষায় কোনো বর্ণমালা ছিল না, ইনি চীন ভাষা ও ভারতীয় দুই-তিনটি ভাষা শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ও মেওয়ারী তাহার অন্যতম। নিজ সভ্যতা ও ভাষার দৈন্য ইহার দৃষ্টিগোচর হয়; এবং সেইজন্য ইনি ইহার মন্ত্রী সম্ভোটকে (থোন্‌ মি সম্ভোট) ভারতে পাঠান। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি ষোল জন সঙ্গী সহ সম্ভোট ভারতে আসেন। তাঁহার প্রতি সম্রাটের নির্দেশ থাকে তিনি যেন সংস্কৃত ভাষা এবং তাহার মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তিব্বতী ভাষায় সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যের বিষয়ও তিনি তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করেন।

বৌদ্ধ পণ্ডিত লিপিকরের নিকট সম্ভোট সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং ভারতীয় ৬৪ প্রকারের বিভিন্ন বর্ণও শিক্ষা করেন। পণ্ডিত দেববিদ সিংহের নিকট তাঁহারা কলাপ, চান্দ্র ও সারস্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অবশেষে বহু বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যান।

সম্ভোট দেশে ফিরিয়া ভারতীয় বর্ণমালা অনুযায়ী তিব্বতী বর্ণমালা প্রবর্তন করিয়া, তিব্বতে লেখ্য ভাষা প্রচলন করেন। তিব্বতী ভাষায়, 'ব্যাকরণ মূল ত্রিংশদ' ও 'ব্যাকরণ লিঙ্গাবতার' (সুম্‌ চু—তগ্‌ জুগ্‌ প) নামক ব্যাকরণ রচনা করেন।

রাজাদেশে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রকেই লেখাপড়া শিখিতে হইল। ক্রমে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ তিব্বতের এই নূতন ভাষায় অনূদিত হইল।

এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাটের ধর্মপ্রচারকার্য সফলতা লাভ করে, বিশেষ করিয়া ইহার দুই সহধর্মিণীর দ্বারা। ইহাদের একজন চীন-রাজকন্যা ও অন্যজন নেপাল-রাজ-দুহিতা। বৌদ্ধ পরিবারের এই দুই নারী, রাজার এই ধর্ম-কার্যে যথার্থ সহধর্মিণীর দৃষ্টান্ত দেখান।

৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের প্রসিদ্ধ রাজধানী লাসা (অর্থাৎ দেবভূমি) ইহার দ্বারা নির্মিত হয়। ইনি ইহার রাজ্য মধ্যে ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করেন। উত্তর-চীনের শান্‌সি প্রদেশে Wu Tai Shanএ ১০৮টি মন্দির নির্মাণের জন্য ইনি নিজ মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন।

ইনি পণ্ডিত কুশর (?) ও শঙ্করব্রাহ্মণ নামে দুইজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে ভারত হইতে, পণ্ডিত শীলমঞ্জুকে নেপাল হইতে এবং Hwa-shan Maha tshe নামক বিদ্বান্‌কে চীন দেশ হইতে তিব্বতে লইয়া যান। ইহাদের ও সম্ভোট সহ লুঙ্‌ ইত্যাদি তিব্বতীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর দ্বারা সংস্কৃত ও চীন ভাষা হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহকে তিব্বতের এই নূতন ভাষায় রূপান্তরিত করাইতে আরম্ভ করেন।

এই সম্রাটের মৃত্যুর পর চীন কর্তৃক তিব্বত আক্রান্ত হয়। তাহাতে তিব্বতের বহু ক্ষতি হয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচারকার্যও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বহুকাল পরে এই সম্রাটের প্রপৌত্র মে অগ্ ছোম্ বৌদ্ধধর্মের প্রচার-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি বুদ্ধগুহ্য ও বুদ্ধশান্তি নামক দুইজন ভারতীয় পণ্ডিতকে কৈলাস পর্বতের সমীপবর্তী কোন স্থান হইতে আনাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা আসিলেন না। যাঁহারা ইঁহাদের আনিতে যান, তাঁহারা ইঁহাদের আনিতে না পারিলেও পাঁচ খণ্ড মহাযান সূত্রান্ত গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া ফিরিয়া আসেন এবং উহা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। সম্রাট্ তাঁহার রাজ্যের পাঁচ জায়গায় পাঁচটি নবনির্মিত মন্দিরে ঐ পাঁচ খণ্ড গ্রন্থ রক্ষা করেন।

চীনদেশ হইতেও এই সম্রাট্ (Ser hod tam pa নামক) কিছু বৌদ্ধ শাস্ত্র আনাইয়া তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিব্বতে ভিক্ষু সম্প্রদায় প্রবর্তন উদ্দেশ্যে ইনি নেপাল হইতে কয়েক জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে তিব্বতে লইয়া যান, কিন্তু কেহই তখন ভিক্ষু হইতে রাজি না হওয়ায়, তাঁহার উদ্যম ফলপ্রসূ হয় নাই।

ইহার পর ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তিব্বতের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ থি স্রোঙ্ দে চন্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময় শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব আদি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তিব্বতে গমন করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় তিব্বতীদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার হয়। সংস্কৃতজ্ঞ তিব্বতীগণ যাঁহারা লোচব বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এই সব ভারতীয়ের সহযোগে বৌদ্ধসূত্র গ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

শান্তরক্ষিত তিব্বতীদের বিনয় ও মাধ্যমিক দর্শন শিক্ষা দেন, পদ্মসম্ভব ও তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাদিগকে তন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাঁহাদের পদ্ধতি অনুযায়ী সাধন করিয়া কয়েকজন তিব্বতীয় সিদ্ধিলাভ করত যথার্থ সাধক রূপে গণ্য হন।

শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের পরামর্শে ও সাহায্যে, সম্রাট্ থি স্রোঙ্ দে চন্, সম্ এ নামক বিখ্যাত বিহার নির্মাণ করেন। এই বিহারটি বিখ্যাত ভারতীয় বিহার ওদন্তপুরীর অনুকরণে নির্মিত হয়। ইহা তিন তলায় বিভক্ত—একতলা তিব্বতীয়, একতলা ভারতীয় ও একতলা চীনদেশীয় শিল্পের ধারা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়। ইহার চতুর্দিক উচ্চপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয় এবং চারিদিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার থাকে। কথিত আছে, আচার্য দীপঙ্কর যখন তিব্বতে গিয়া ঐ বিহার পরিদর্শন করেন, তখন উহাতে এত ভারতীয় গ্রন্থ রক্ষিত ছিল যে, সে সময় তত গ্রন্থ বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ইত্যাদি ভারতীয় বিহারেও ছিল না। দুঃখের বিষয়, পরে ঐ সমস্ত গ্রন্থ অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইয়া যায়।

সম্রাট্ থি স্রোঙ দে চন্-এর রাজত্বকালে চীনদেশীয় মহাযান সম্প্রদায়ের এক দার্শনিক তিব্বতে আসেন। তিনি তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভাবলে জনসাধারণকে নিজের মতাবলম্বী করিতে থাকেন, তাঁহার মতের সারাংশ এইরূপ—"চিত্তকে ভাবশূন্য কর। শুভ অশুভ যে-কোনো প্রকার ভাব-বিকল্প চিত্ত হইতে দূর করিতে না পারিলে মুক্তি নাই। মন তোমার শুভের দিকেই ধাবিত হউক, আর অশুভের দিকেই ধাবিত হউক, উভয়ই বন্ধনের কারণ, কারণ লোহার শিকলের বন্ধন যেমন বন্ধন, সোনার শিকলের বন্ধনও সেইরূপ বন্ধন।"

তাঁহার এই দার্শনিক মতের উচ্ছেদের জন্য সম্রাট্ ভারতীয় দার্শনিক কমলশীলকে লইয়া যান। তিনি এই চীন দার্শনিককে তর্কে পরাজিত করেন।

ইহার পর নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি (৮৬৭ খ্রীঃ) তিব্বতীয় সম্রাট্ রল্ প চন্-এর রাজত্বকালে জিনমিত্র, শূরেন্দ্রবোধি, শীলেন্দ্রবোধি, দানশীল বোধিমিত্র আদি বিদ্বান্ ও সাধকগণ তিব্বতে গমন করেন, তাঁহারা তিব্বতী ভাষায় বহু বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করেন। ঐ সব গ্রন্থ সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করে।

সম্রাট্ থি স্রোঙ্ দে চন্-এর সময় হইতে (৭৩০ খ্রীঃ) কুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মধ্বংসী সম্রাট্ লঙ্ দরম-এর পূর্ব পর্যন্ত (৯০৮ খ্রীঃ) তিব্বতে মাধ্যমিক শূন্যবাদই বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। এই দার্শনিক মতবাদ তিব্বতে শিকড় গাড়িয়া বসে। ঐ সময়ের মধ্যে যোগাচার সম্প্রদায়ের কয়েকজন আচার্য তিব্বতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধা করিতে পারেন নাই।

সম্রাট্ লঙ্ দরম বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের কাজেই তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। তাঁহার অত্যাচারে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কয়েকটি ভারতীয় ও তিব্বতীয় ভিক্ষুসঙ্ঘ লঙ্ দরম-এর রাজ্য হইতে কোনক্রমে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে আশ্রয় লন। এই সম্রাটের হত্যার (৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি) পর তাঁহারাই আবার তিব্বতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু লঙ্ দরম্-এর অত্যাচারের পর বহুকাল পর্যন্ত ভারত হইতে কোনো পণ্ডিত তিব্বতে যান নাই। ইহার বহুকাল পরে নেপাল হইতে দুই জন পণ্ডিত তিব্বতে যান।

ইহাদের একজনের নাম স্মৃতি। ইহারা তখন তিব্বতে কোনো সমাদর তো পানই নাই, উপরন্তু অতিকষ্টে ইহাদের দিন কাটাইতে হইত। কথিত আছে, স্মৃতি মেষপালকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজের জীবিকা নির্বাহ করেন। পরে তিব্বতী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে কিঞ্চিৎ সমাদর লাভ করেন।

যাহা হউক, ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয় সুরু হয়। এ সে ওদ্ (প্রজ্ঞালোক) নামক তিব্বতীয় রাজসন্ন্যাসী মগধ হইতে পণ্ডিত ধর্মপালকে নিমন্ত্রণ করেন। ধর্মপাল সিদ্ধপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল নামক তাঁহার তিন শিষ্যের সহিত তিব্বতে যান। তাঁহাদের সাহায্যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরায় প্রচার হইতে থাকে।

তাঁহাদের পর সুভূতি শ্রীশান্তি নামক পণ্ডিত তিব্বতে যান। তিনি সমস্ত প্রজ্ঞাপারমিতা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রজ্ঞালোকের পৌত্র একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তিব্বতী সম্রাট্ বোধিপ্রকাশ (চ্যাঙ্ ছুব্ ওদ্) অতীব বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ও বৌদ্ধবাহ্য দর্শনশাস্ত্র সমূহেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে পুনরায় কি ভাবে তাহার পূর্বগৌরব লাভ করে, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল। ভারতের সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্‌কে তিব্বতে আনা প্রয়োজন—ইহা মনে করিয়া তিনি সেই বিদ্বানের অনুসন্ধানের জন্য ভারতে দূত পাঠান। সেই সময় বাংলার গৌরব, ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত অতীশ (বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) জগদ্বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিদ্যামন্দিরের ধর্মাচার্য ও অধ্যক্ষের পদে কার্য করিতেছিলেন। মন্ত্রিগণের নিকট ইঁহার বিষয় অবগত হইয়া সম্রাট্ বোধিপ্রকাশ ইঁহাকে আনাইবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও অন্যান্য নানা মূল্যবান উপহার সমেত নগ্ ছো (ইঁহার পূরানাম—ছুল ঠিম্ গ্যল। বা, শীলজিৎ) লোচবের নেতৃত্বে রাজ্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নিরাপদে ভারতে পৌঁছিয়া বিক্রমশীলায় উপস্থিত হইলেন।

আচার্য অতীশের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ প্রভূত উপহারসমূহ তাঁহার পদপ্রান্তে নিবেদন করিলেন। তাহার পর তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার হইতে তাহার উত্থান পতন ও পুনরভ্যুদয়ের সূচনা ও আয়োজনের বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিলেন। এইরূপ অবস্থায়, তাঁহার ন্যায় ধর্মাচার্য ব্যতীত, ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়াই, তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য তিব্বতের ধর্মাধীশ সম্রাট্ কর্তৃক তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছেন—বিনীতভাবে ইহাও নিবেদন করিলেন।

তিব্বতীয় বিদ্বান্‌গণ বহুকাল যাবৎ আচার্য অতীশকে এইরূপে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং দাসের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বহুকাল চিন্তা করিয়া এবং বহু বিবেচনা করিয়া ধর্মাচার্য দীপঙ্কর সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন।

এই বিপৎসঙ্কুল কঠোর-শ্রমসাপেক্ষ সুদীর্ঘ ভ্রমণ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এমন কি মৃত্যুরও কারণ হইতে পারে, ইহা জানিয়াও তিনি ধর্মের উদ্ধারের জন্য ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন।

আত্মীয় বন্ধু, পুত্রসম অন্তরঙ্গ শিষ্য-সম্প্রদায়, প্রিয়তম বিদ্যামন্দির, অতুলনীয় যশগৌরব, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া ৫৯ বৎসরের বৃদ্ধ এই জ্ঞান-তাপস ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করিলেন।

ঞ রি নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি থো দিঙ নামক মঠে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি সম্রাট্‌কে সূত্র ও তন্ত্রে শিক্ষা দান করিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তিনি মধ্যতিব্বত ও চাঙএ গিয়া ধর্ম প্রচার করিলেন। এই পুণ্যশ্লোক বঙ্গবাসী ধর্মাচার্যের চেষ্টায় তিব্বতের সর্বত্র সদ্ধর্মের প্রচার হইল। মহাত্মা আর দেশে ফিরিলেন না। ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিব্বতেই (লাসার নিকট ঙে থঙ্ নামক স্থানে) তাঁহার দেহত্যাগ হইল।

আচার্য দীপঙ্কর সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; এবং তিব্বতী ভাষায়ও স্বকৃত ও অন্য, বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। মৌলিক গ্রন্থ আজ লুপ্ত। কিন্তু অনূদিত শতাধিক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত আছে।

তিব্বতের সমগ্র ভিক্ষু সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও আচার্য দীপঙ্কর কখনো নিজেকে লামা (ধর্মগুরু) বলিয়া প্রচার করিয়া বিশেষ অধিকার দাবী করেন নাই। অথচ তাঁহার শিষ্য ব্রোমতনের সময় হইতেই তিব্বতে লামার আধিপত্য সুরু হয়। ক্রমে সমস্ত তিব্বতের শাসন কর্তৃত্বই লামাদের হস্তে যায়।"[৩]

৩। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের পাণ্ডুভূমি (Sa Skya) বা শাক্যমঠের (in Upper Tsang) লামা ডো᾽গোন ফগ্ প কুবলাই খাঁর নিকট হইতে সমস্ত তিব্বতের শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।

আচার্য অতীশের পরও বহু ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গমন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বক্তিয়ার খিলজীর সময় যখন বিক্রমশীলা মঠ ধ্বংস করা হয়, তখন বহু ভিক্ষু তিব্বতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিক্রমশীলার বিখ্যাত পণ্ডিত শাক্যশ্রীর নাম উল্লেখ-যোগ্য।

সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এইরূপে বহু ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গমন করেন এবং বহু তিব্বতীও ভারতে আসিতে থাকেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। শুধু বৌদ্ধশাস্ত্র কেন, বহু অবৌদ্ধ গ্রন্থও তাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ইত্যাদিও আছে। উদাহরণস্বরূপ, মেঘদূত কাব্যাদর্শ, পাণিনি সারস্বত, কলাপাদি ব্যাকরণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই অনুবাদরাশি তিব্বতী ভাষায় (১) ক্য জুর (বা কন্ জুর) ও (২) ত্যন্ জুর নামে পরিচিত। ইহা ৪৫৬৯ খণ্ডে প্রকাশিত, ইহার মধ্যে ৩৪৫০-এর উপর গ্রন্থ আছে।[৪]

তিব্বতে এবং নালন্দা ও বিক্রমশীলা আদি ভারতীয় বিহারেও এই অনুবাদক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

এই অনুবাদ এমন যথাযথরূপে করা হইয়াছে যে, যে-কোন লুপ্ত গ্রন্থের মৌলিক রূপ এই অনুবাদ হইতে উদ্ধার করা যায়। একবার কোন পুস্তক লুপ্ত জানিয়া তিব্বতী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। পরে ঐ মৌলিক পুস্তকও পাওয়া যায়। তখন এই উভয় পুস্তক মিলাইয়া দেখা গেল—অনূদিত ও মৌলিক পুস্তক প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে।

ভারতের নালন্দা, বিক্রমশীলা ওদন্তপুরী আদি বিদ্যা-মন্দিরের অনুকরণে তিব্বতেও বহু বিদ্যামন্দিরের সৃষ্টি হয়। ভারতের ঐ সব বিদ্যামন্দির আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কাহারও বা চিহ্নও মিলে না। কিন্তু তিব্বতে তাহাদের অনুকৃতি আজও বর্তমান।

উহাদের মধ্যে কোন কোনটি আয়তনে একটি ছোটখাট শহরের মত, যেখানে হাজারকয়েক বিদ্যার্থী ও আচার্যের স্থান হইতে পারে।

তিব্বতের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ

এইরূপ একটি বিদ্যাপীঠের নাম ডে পুঙ্। ইহা ভারতের শ্রীধান্যকটক বিদ্যাপীঠের অনুকরণে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ঐ শ্রীধান্যকটকের আজ চিহ্নমাত্রও নাই। উহা কোথায় ছিল তাহাও আজ পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়।

কিন্তু এই ডে পুঙ্ আজও পূর্ণ গৌরবে বর্তমান। ইহা ৭ হাজার ৭ শত শিক্ষার্থীর আশ্রয় স্থান। দশ হাজার পর্যন্ত ছাত্র ও আচার্য ইহার মধ্যে স্থান পাইতে পারেন।

ইহা আকৃতি ও দৃশ্যে একটি শহর সদৃশ। ইহার মধ্যে এমন প্রকাণ্ড একটি হল আছে যেখানে সমস্ত মঠবাসী (প্রায় দশ হাজার লোক) একত্রিত হইয়া উপাসনা ও সভা ইত্যাদি করিতে পারে। পৃথিবীতে এত বড় মঠ আর নাই।

ইহা কেবল আয়তনেই বৃহৎ নহে, এখানে বিদ্যাচর্চার আয়োজনও বিরাট্। চীন, মোঙ্গলিয়া, সাইবেরিয়া, ভোট সিকিম, নেপাল হইতে বিদ্যার্থিগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসেন।

খুব বেশী দিনের কথা নহে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই বিদ্যাপীঠে পাণিনি ব্যাকরণের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ইহা সহজ কথা নহে। ২৫ বৎসর বয়স্ক এক তিব্বতী যুবক পঞ্চম দালাইলামা[৫] কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভারতে

৪। ক্য জুর (কান্ জুর) ও তাঞ্জুর এর কয়েকটি সংস্করণ তিব্বতের নর্ থঙ্, দে গে ইত্যাদি স্থান হইতে এবং চীনের পিকিং হইতে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত সংস্করণের মধ্যে দে গে সংস্করণই নানা দিক হইতে শ্রেষ্ঠ, এই সংস্করণের গ্রন্থ ও volume সংখ্যাই এখানে দেওয়া হইল।

৫। দালাইলামা:—১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে গে দুন্ দুব্ নামে একজন প্রসিদ্ধ লামা জন্মগ্রহণ করেন, যিনি তিব্বতের চাঙ্ প্রদেশের প্রসিদ্ধ তাশি লুন পো মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। লামাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বুদ্ধের ন্যায় জিন্ (গ্যল্‌ব) উপাধি ধারণ করেন। তিব্বতীদের বিশ্বাস তিনি দেহত্যাগ করিয়া গে দুন গ্য ছো লামারূপে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গে দুন গ্য ছো ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তাশি লুন পো মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু পরে তিনি সেই পদ পরিত্যাগ করিয়া ডে পুঙ্ মঠের অধ্যক্ষ হন। তিনিও দেহত্যাগ করিয়া ১৫৪১ খ্রীঃ সো নম্ গ্য ছো (পুণ্য-সাগর) রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। মোঙ্গল সম্রাট আলতান্ খাঁ কর্তৃক তিনি মোঙ্গলিয়ায় নিমন্ত্রিত হন। সেখানে সম্রাট্ তাঁহাকে দালাইলামা বলিয়া সম্বোধন করেন। দালাই শব্দ তিব্বতী গ্য ছো শব্দের প্রতিশব্দ, অর্থ—সাগর। গ্য ছো (সাগর) শব্দ তিব্বতীয় এই মহালামাদের নামের শেষে থাকায় সম্রাট্ উহাকে মহালামার কুলোপাধি বলিয়া ভুল করেন। এই ভাবে ভ্রান্তিবশত প্রদত্ত উপাধি মহালামার পরবর্তী অবতারগণও প্রাপ্ত হইতে থাকেন। ১৫৮৭ খ্রীঃ তৃতীয় দালাইলামার অবতাররূপে চতুর্থ দালাইলামার আবির্ভাব হয়। তাঁহার নাম ওন তন্ গ্য ছো বা গুণসাগর। তিনিই ১৬১৫ খ্রীঃ পঞ্চম দালাইলামা রূপে আবির্ভূত হন। পঞ্চম দালাইলামা ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম জিনেন্দ্র বা বাগীশ্বর সুমতি সাগর (গ্যল বঙ্, বা ঞগ্ বঙ্ লো জঙ গ্য ছো)। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি তিব্বতের সম্রাট্ হন।

আসেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে বলভদ্র ও গোকুলনাথ মিশ্র নামক পণ্ডিতদ্বয়ের নিকট উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়া তিব্বতে ফিরিয়া গিয়া ঐ ডে পুঙ্ মঠে পাণিনি ব্যাকরণের অনুবাদ করেন।

তাঁহার এই অনুবাদ শেষ করিতে প্রায় ২ বৎসর লাগে। এই অনুবাদ ২ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে, পাণিনির মূল সূত্রগুলি সংক্ষিপ্তরূপে প্রক্রিয়াকৌমুদীর ক্রম অনুযায়ী অনুবাদ করা হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রক্রিয়াকৌমুদীর ব্যাখ্যা পংক্তিগুলির অনুবাদ আছে।

মূলের সহিত ঐ অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? কতদূর অধ্যবসায় ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা থাকিলে ইহা সম্ভব হয়?

লোকে তো তিব্বতীদের অসভ্য বা অর্ধসভ্য এক জাতি বলিয়াই জানে। তাঁহাদের ভিতর যে এমন জ্ঞানচর্চা চলিতেছে, তাহার খবর কয়জন রাখি?

তিব্বতের সহিত ভারতের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা গেল। এখন তিব্বতের প্রসিদ্ধ সংস্কারক চোঙ্ খপ নামক মহাপুরুষের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

তিব্বতের বিখ্যাত সংস্কারক

এই বিখ্যাত মহাপুরুষের নাম চোঙ খপ বা লো জঙ্ ঠগ্ প (সুমতিকীর্তি)। তিনি তিব্বতের আম্দো প্রদেশের চোঙ খ শহরে ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মত অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ তিব্বতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্ক ও দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া, ২০ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ, শ্রোতাকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ অভিভূত করিয়া ফেলিতেন। বহু সহস্র ব্যক্তির জনতার মধ্যেও তাঁহার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কারভাবে প্রত্যেকে শুনিতে পাইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর এমনই জোরালো ছিল। যুক্তি তর্ক এবং ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বপক্ষে আনিতেন।

তিনি কেবল বিদ্বান্ ছিলেন না। অতি উচ্চস্তরের সাধক ও যোগী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে, বিরুদ্ধ ব্যক্তির মস্তক আপনি তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া পড়িত।

তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির রচনা-শৈলী, পাণ্ডিত্য, যুক্তি, তর্ক, ভাব সমস্তই অতুলনীয়। রচনা ও বক্তব্য বিষয়ের কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন অনিন্দ্য রচনা সত্যই দুর্লভ।

তাঁহার সময় তিব্বতে ধর্মের নামে নানা অনাচার ও কদাচার ঢুকিয়াছিল। বোনধর্মের এবং বিকৃত তান্ত্রিক মতের সংমিশ্রণে বৌদ্ধধর্ম এক অপরূপ রূপ ধারণ করিতেছিল। ধর্মের নামে যে যাহা খুশী করিয়া যাইত। প্রায় সমস্ত ধর্মাচার্যগণ মদ্যপ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই এক বিরাট্ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমস্ত অনাচার বন্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তিব্বত, মোঙ্গলিয়া ও চীনের এক হাজার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিহারের বৌদ্ধসঙ্ঘ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ধর্মের সর্বপ্রকার কলুষকালিমা দূর করিয়া বিশুদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতঃ ৬৩ বৎসর বয়সে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার দেহত্যাগের পরও এই সংস্কার-কার্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দশ হাজার বিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহার প্রবর্তিত সংস্কার মানিয়া লইলেন। এই বিহারের বৃহত্তমগুলির ভিক্ষুসংখ্যা দশ হাজার পর্যন্ত এবং ক্ষুদ্রতমগুলিরও অধিবাসীসংখ্যা আট শতের কম নহে।

তাঁহার মত প্রভাবশালী কৃতী সংস্কারক তিব্বতে কেন, বুদ্ধের পর বোধ হয় ভারতেও জন্মান নাই।

তিব্বতের সর্বত্র তিনি আজ বুদ্ধের ন্যায় পূজিত হইতেছেন।[৬]

৬। তিব্বতীদের বিশ্বাস, এই মহাপুরুষের দুই শিষ্য (ইঁহাদের একজনের নাম, গে দুন্ দুব—৫নং পাদটীকা • দ্রষ্টব্য) দালাই লামা ও পনছেন (বা তাশি) লামারূপে বার বার জন্মগ্রহণ করেন। দালাই লামা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, এবং পনছেন লামা ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সুভূতি (কাহারো মতে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী)। দালাই লামা তিব্বতের উ প্রদেশের লাসায় (in Central Tibet) এবং তাশি লামা চাঙ্ প্রদেশের তাশিলুন পো শহরে (in ulterior Tibet) বাস করেন। দেশের ও ধর্মের শাসনকর্তারূপে ইঁহাদের উভয়েরই অসাধারণ সম্মান। ইঁহাদের মাত্র দেহ পরিবর্তন হয়—মৃত্যু নাই।

Materials collected from:
1. Contributions on the Religion, History, etc., of Tibet by S. C. Das, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. L, Part I, 1881; *Ibid.*, Vol. Li, Part I, 1882.
2. Journey to Lhasa and Central Tibet by S. C. Das.
3. Outlines of Chinese History by Li Ung Bing.
4. A Grammar of the Tibetan Language by A. Csoma De Koros.
5. Lhasa and Its Mysteries by L. A. Waddel.
6. With Mystics and Magicians in Tibet by Alexandra David-Neel.

হিন্দুধর্ম্ম ও গো-মাহাত্ম্য

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুগণ গোবরকে অতি পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মে এবং গৃহ সংস্কারে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। একটা জন্তুর মল হিন্দুগণের নিকট কেন এত পবিত্র হইয়া উঠিল ইহা অতি রহস্যময়। কেহ কেহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া বলেন, গোবরের জীবাণুনাশক শক্তি আছে। কিন্তু তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে যে-সব দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে সেখানে গোবর একটি জীবাণুনাশক বস্তু হিসাবে কোথাও ব্যবহৃত হয় না কেন? আর গোবরের যে গুণই থাকুক, অসুস্থ রুগ্ন গরুর মলমূত্র যে রোগজীবাণুতে পূর্ণ থাকে, এবং সুস্থ গরুর মলেও যে নানা বিষাক্ত জিনিস থাকিতে পারে—সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই—অতএব গোবরকে সংস্কার-কার্য্যের জন্য ব্যবহার আদৌ নিরাপদ নহে।*

গীতা বলিয়াছে যুগে যুগে ধর্ম্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করে, যোগাঙ্গের মধ্যে গোময়ের প্রবেশ এইরূপই গ্লানির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ বেদ, উপনিষদ, গীতা—কোথাও গোবরের পবিত্রতার কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র মনুসংহিতাতেও গোবরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই। রাজযোগের মূল শাস্ত্র পাতঞ্জল দর্শনে শৌচ হইতেছে একটি নিয়ম, সেই হিসাবে যোগের অঙ্গ। সাধনপাদ ৩২ সূত্রে "শৌচ" শব্দের ব্যাখ্যায় ব্যাস বলিয়াছেন, তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্। অর্থাৎ মাটি ও জলাদি জনিত ও মেধ্যাহার† প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ্য। আভ্যন্তর শৌচ চিত্ত-মল-ক্ষালন। গোবরের দ্বারা স্থান বিশুদ্ধ বা পবিত্র করা যায়, ভাষ্যকারের তাহা অভিমত হইলে তিনি শুধু মাটি ও জলের উল্লেখ না করিয়া প্রথমেই গোময়ের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু এখন বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচির প্রধান উপকরণ হইয়াছে গোবর। কেহ যদি কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া পাপগ্রস্ত হয়, তাহারও আভ্যন্তর শৌচের জন্য ব্যবস্থা করা হয় কিঞ্চিৎ গোবর ভক্ষণ!

গরু ও গোবরের মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে দান-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে। সে স্থানটি পাঠ করিলে আশঙ্কা হয় যে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মহাভারতের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন। নিখিল সৌন্দর্য্য ও সুষমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী আসিয়া গাভীগণের নিকট আবেদন জানাইলেন, তিনি তাহাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করিতে চান। চঞ্চলা অস্থিরমতি লক্ষ্মীকে দেহমধ্যে স্থান দিতে গাভীগণ কিছুতেই সম্মত হয় না। লক্ষ্মীও নাছোড়বান্দা—তাঁহার অনেক কাকুতি-মিনতির পর গাভীগণ সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করিলেন—"আমাদের মল ও মূত্র অতিশয় পবিত্র, তুমি তাহার মধ্যে বাস করিতে পার।" লক্ষ্মী কৃতার্থ হইয়া গাভীগণকে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তদবধি ঐ পবিত্র বস্তুদ্বয়ের মধ্যে নিজের চির আবাস ঠিক করিয়া লইলেন।

যাহাদের মল মূত্র এত পবিত্র তাহারা নিজে কত মহান্ তাহা বলাই বাহুল্য। মহাভারতে বলা হইয়াছে,

দেবানামুপরিষ্টাচ্চ গাবঃ প্রতিবসন্তি বৈঃ,

গাভী সকল দেবতাদের উর্দ্ধে বাস করে, তাহাই গোলক, শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন সংসারে যে-বস্তু পবিত্র বস্তুসকল মধ্যেও পবিত্রতম, উত্তম ও পরম পাবন তাহার বর্ণনা করুন। ভীষ্ম কহিলেন, গাভী সকল হইতেছে মহান্ অর্থের সাধন, পরম পবিত্র এবং মানুষের ত্রাণকর্ত্তা। গাভীদের এইরূপ উচ্চপদ লাভের কারণ এই যে, তাহারা এক লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল—"এই সংসারে দানযোগ্য যত বস্তু আছে আমরা যেন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হই। আমাদিগকে যেন কোন দোষ স্পর্শ না করে। মানুষ আমাদের গোবরে স্নান করিয়া যেন সদা পবিত্র হয়, দেবতা ও মানব পবিত্রতার জন্য যেন আমাদের গোবর ব্যবহার করে। সমস্ত চরাচর প্রাণী যেন আমাদের গোবরে পবিত্র হয় এবং যে-সব মনুষ্য

---

* পল্লীগ্রামে হিন্দুগণ গোবর দিয়া ঘর নিকাইয়া থাকে। কিন্তু শুধু জল দিয়া মুছিলে অথবা ভাল মাটি দিয়া লেপিলে মাটির ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে—সাঁওতালেরা এবং মুসলমানেরা এই ভাবেই মাটির ঘর পরিষ্কার করে।

† পচা দুর্গন্ধ, মাদক, অস্বাভাবিকরূপে কোন শরীর-যন্ত্রের উত্তেজক, এরূপ দ্রব্য সকল অমেধ্য।

আমাদিগকে দান করিবে তাঁহারা যেন আমাদের উত্তমধাম (গোলক) প্রাপ্ত হয়।" ব্রহ্মা বর দিলেন, "তোমাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হোক, তোমরা জগতের জীবসকলকে উদ্ধার করিতে থাক।"

হিন্দুদের উপর মহাভারতের প্রভাব অসীম, অতএব কেন হিন্দুরা গরু ও গোবরকে এত পবিত্র জ্ঞান করে তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এই সব আজগুবী গল্প মহাভারতের মধ্যে কেমন করিয়া আসিল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা হিন্দু সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের অনেক তথ্যই জানিতে পারি। বৈদিক যুগে গরুই ছিল আর্য্যগণের প্রধান সম্পদ, গাভী হইতে দধি দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যাইত, বৃষসকল চাষের কাজে এবং যানবাহনের কাজে লাগিত, এমন কি মুদ্রার অভাবে গরুর আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই জিনিসপত্র কেনা-বেচা চলিত। অতএব গোধন সকলেরই আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। জগতের অন্যান্য স্থানেও প্রাচীন কালে গরু প্রধান সম্পত্তি ছিল কিন্তু ভারতে গরু পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবার মূল কারণ হইতেছে যজ্ঞে গরুর উপযোগিতা এবং বেদে পুনঃ পুনঃ গো-মাহাত্ম্য প্রচার, গো-শব্দের উল্লেখ। যজ্ঞই ছিল প্রাচীন আর্য্যগণের জীবনের কেন্দ্র, গীতাতেই বলা হইয়াছে, যে-কার্য্যের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধ নাই তাহা বৃথা, তাহা বন্ধন-স্বরূপ। মহাভারতে গরুকে বলা হইয়াছে যজ্ঞমূল, যজ্ঞের অঙ্গ এবং সাক্ষাৎ যজ্ঞ-স্বরূপ। প্রাচীনকালে যজ্ঞের জন্য গরু বলিদান দেওয়া হইত, সোমরসের সহিত গোদুগ্ধ মিশাইয়া তাহা দেবতাগণকে অর্পণ করা হইত। গরুর এই সব উপযোগিতার জন্য আর্য্যগণ যজ্ঞ করিয়া দেবতাদের নিকট হইতে গোধন প্রার্থনা করিতেন। ঋগ্বেদে এমন বিখ্যাত মন্ত্র খুব কমই আছে যেখানে দেবতাদের নিকট হইতে গোধন প্রার্থনা না করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বেদ শুধুই দেবতাদের নিকট হইতে বাহ্য ভোগ-ঐশ্বর্য্য প্রার্থনার গ্রন্থ নহে। যাহারা বেদের এইরূপ অর্থ করে গীতা তাহাদের মতকে বেদবাদ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। বেদ বাহ্যিক যজ্ঞের ভাষা প্রয়োগ করিলেও তাহার এক নিগূঢ় অর্থ ছিল, অধ্যাত্ম জ্ঞান, অধ্যাত্ম শক্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া পৃথিবীর এই মর্ত্ত্য জীবনকে অমৃতত্বে পরিণত করা, মর্ত্ত্যেষ্বমৃতঃ। এই যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের জ্যোতি, ইহা বুঝাইতেই বেদ পুনঃ পুনঃ "গো" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, কারণ প্রাচীন অধিকাংশ শব্দের ন্যায় এই "গো" শব্দেরও বহু অর্থ ছিল, এবং ইহার একটি অর্থ যেমন গরু, গাভী, অন্য একটি অর্থ ছিল, রশ্মি, জ্যোতি। প্রাচীন আর্য্যগণ যজ্ঞ করিয়া দেবতাগণের নিকট গরু, গোধন প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু সেটা ছিল নিম্ন অধিকারীদের পক্ষে; পরন্তু উচ্চতর অধ্যাত্ম সাধকগণ পরাজ্ঞানের জ্যোতি প্রার্থনা করিতেন।

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইদ্রেবতো মদঃ॥ —ঋগ্বেদ ১।৪।২

সাধারণ পূজকেরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ করিত এই আশায় যে ইন্দ্র উল্লসিত হইয়া তাহাদিগকে গোধন দান করিবে। কিন্তু যাঁহারা বৈদিক নিগূঢ় সাধনায় দীক্ষিত ছিলেন তাঁহারা জানিতেন যে এই মন্ত্রে "গোদা" শব্দের অর্থ আলোক-দাতা।

ঋষি এক স্থানে বলিয়াছেন ধিয়াঃ গো-অগ্রাঃ (১।৯০।৫), ধিয়াঃ শব্দের অর্থ চিন্তাসকল (thoughts), তাহারা গরুসকলকে সম্মুখে বহন করিতেছে—ইহার অর্থ কি? বস্তুতঃ এখানে গো অগ্রাঃ অর্থ জ্যোতিরগ্রাঃ অর্থাৎ চিন্তাসকল পরাজ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বস্তুতঃ বেদ অন্যত্র গো-অগ্রাঃ শব্দের পরিবর্ত্তে জ্যোতিরগ্রাঃ শব্দই ব্যবহার করিয়াছে—

ত্রিস্রো বাচঃ প্রবদ্ জ্যোতিরগ্রাঃ
—ঋগ্বেদ ৮।১০।১১

শ্রীঅরবিন্দ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

Three powers of speech that carry the Light in their front. (The Life Divine, Vol. II-XXVI).

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে কেমন করিয়া "গো" ভারতীয় জনসাধারণের নিকট পবিত্র বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল—পুণ্যতম গ্রন্থ বেদে পুনঃ পুনঃ যাহা উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কি হইতে পারে? সাধারণ লোক বেদের নিগূঢ় অর্থ না বুঝিয়া গরুকেই অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া ভাবিতে ও দেখিতে শিখিয়াছিল। গোলক শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্যোতির্ম্ময় লোক, সেখানে বিষ্ণুর আবাস। লোক বুঝিয়াছিল গোলক হইতেছে গরুদেরই উচ্চতম ধাম। অবশ্য পণ্ডিতেরা সাধারণকে এইরূপই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইহারই প্রমাণ আমরা মহাভারতে পাই। কেন তাঁহারা এইরূপ করিয়াছিলেন এইবার তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগে যজ্ঞে গরু বলিদান দেওয়া হইত এবং আর্য্যগণ গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। আর্য্যগণ কৃষিজীবী হইবার পূর্ব্বে পশুজীবী (pastoral) ছিলেন। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণ যেখানে বাস করিতেন সে দেশ ছিল শীতপ্রধান, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ কালই শীতঋতু, তাই বৎসরকে "হিম" শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইত। কেহ

বলেন, সে-সময়ে আর্য্যগণ শীতপ্রধান উত্তর-মেরুতে বাস করিতেন পরে তাঁহারা ভারতে আসেন, আবার কেহ বলেন যে ভারতেরই ঋতু তখন শীতপ্রধান ছিল, পরে নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইয়াছে। যাহাই হউক, ঋগ্বেদের সময় মাংস এবং বিশেষ করিয়া গোমাংস যে বৈদিক আর্য্যদের একটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছিল সে-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে অতিথি-সংকারের জন্য বৃহৎ বৃষ হননের বিধান আছে (৩।৪, ১।২)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ঐরূপ বৃষ বা বন্ধ্যা গাভী বধ করিয়া রাজা বা অতিথির সংকার করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে (১।৩।৪)। বিখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য দুগ্ধবতী গাভীর মাংস খাইতেই অভ্যস্ত ছিলেন। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।১।২,২১)। বৃষ ও গাভীদিগকে হত্যা করিবার জন্য কসাইখানা ছিল (ঋগ্বেদ ১০।৮৯।১৪)। রামায়ণ মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত এইরূপ মাংসাহার ভারতে খুবই প্রচলিত ছিল এবং মাংসের দোকানগুলিতে খরিদ্দারের খুব ভিড় হইত (মহাভারত বনপর্ব্ব, ২০৫ অধ্যায়, হরিবংশ ১৪৬—১৪৭)। মহাভারতে বনপর্ব্ব ২০৬ অধ্যায়ে রন্তিদেব নামে এক রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহার পাকশালায় প্রত্যহ ২০০০ গাভী হত্যা করা হইত, এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিগণকে রন্ধিত মাংস সহ অন্ন বিতরণ করিয়া তিনি প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, বৈদিক আর্য্যগণের গোমাংস ভক্ষণে কোন আপত্তিই ছিল না। কালে মাংসাহারের বিরুদ্ধে মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদের মধ্যেই অনেক স্থলে গাভীকে অবধ্য "অঘ্ন্যা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গাভী ও বৃষের ন্যায় এমন উপকারী জন্তুকে বধ করিয়া আহার করা অতি বর্ব্বর প্রথা বলিয়া গণ্য হয়। ঋতু-পরিবর্ত্তনে ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইয়া উঠাতেও গোমাংস আহার অপ্রয়োজনীয় এমন কি অনিষ্টকর বলিয়াই পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধ কর্ত্তৃক অহিংসাধর্ম্ম প্রচারও মাংসাহারের বিরুদ্ধে মত গঠন করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই ভাবে পরবর্ত্তী যুগে গোবধ এবং গোমাংসাহার ভারতে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। তবে এই কাজটি সহজে সংসিদ্ধ হয় নাই। কোন একটা জাতি বা সমাজ কোন বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহা ত্যাগ আদৌ সহজ ব্যাপার নহে। আজও আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংসাহার যে অপ্রয়োজনীয় শুধু তাহাই নহে, ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। অর্থনীতির দিক হইতেও ইহাতে যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা বলিবার নহে। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে এইটিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের প্রধান অন্তরায়। আজ যদি ভারতের মুসলমানেরা গোবধ এবং গোমাংসাহার বর্জ্জন করেন তাহা হইলে এক দিনেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমগ্র ভারতের যে সকল দিকে কত লাভ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ, আজ ইহা এত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে যে, হিন্দু-মুসলমান-মিলনের প্রকৃষ্ট উপায় রূপে মুসলমানগণকে গোবধ বন্ধ করার প্রস্তাব করিতেও কেহ সাহস করেন না। অতএব প্রাচীন ভারতে যাঁহারা গোবধ বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সম্মুখে সমস্যাটা কি কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মহাভারতেরই এক অংশে আমরা দেখিতে পাই গোমাংস রন্ধন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইতেছে এবং তাঁহারা এমন পরিতৃপ্তির সহিত উহা ভক্ষণ করিতেছেন যে একটু ঝোল পর্য্যন্ত পাতে পড়িয়া থাকিতেছে না। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কেন পরে ঐ মহাভারতেই* গো-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত আজগুবী কাহিনী সকল রচিত হইয়াছিল। সে যুগে ঐটিই ছিল লোকশিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। এখনকার মত তখন লোকে এত তর্কযুক্তি-পরায়ণ হইয়া উঠে নাই। যুক্তি অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষই তখন সত্যের প্রমাণ বলিয়া বিশেষভাবে পরিগণিত হইত। সাধারণে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জিনিসেই বিশ্বাস করিত এবং অতীন্দ্রিয় জিনিস সম্বন্ধেও মুনি-ঋষিগণের অধ্যাত্ম প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে তাঁহাদের বাণীতেই বিশ্বাস করিত। কোন বিষয় যদি কাল্পনিক কাহিনীর দ্বারা স্থূল জীবন্তভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইত তাহা হইলে সেটি সহজেই তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। আজ এই যুক্তি-তর্কের যুগেও আমরা দেখিতে পাই যুক্তিতর্ক অপেক্ষা কথার দ্বারা স্থূল চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলে মানুষের মনকে বেশী প্রভাবিত করা যায়। আদালতে উকীলগণ তাহাদের মক্কেলের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে যদি একটি স্থূল বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী রচনা করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে সহজেই বিচারকগণকে তাহাতে বিশ্বাস করাইতে পারেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ বক্তারা অনেক সময়ে যুক্তিতর্ক অপেক্ষা জীবন্ত চিত্রাঙ্কনের দ্বারা জনসাধারণের মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেন।

* খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মহাভারতের প্রাচীন ইতিহাস বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল এইরূপ শ্রেষ্ঠ বক্তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

তথাপি এইটি হইতেছে যুক্তিতর্কেরই যুগ—প্রাচীন কালের উপযোগী কথা ও কাহিনী বর্ত্তমানে অচল। সকল বিষয়ের সত্য-মিথ্যা তর্ক-যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বর্ত্তমান যুগে তাহা সাধারণের গ্রাহ্য হয় না, যদিও স্থূল দৃষ্টান্ত ও চিত্রের সাহায্যে তথ্যসকল সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। ভারতে গোবধ বন্ধ করিবার সপক্ষে যুক্তি এমন প্রবল যে, এ সব কল্পিত কাহিনীর শরণ লইবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু উহা হিন্দুর ধর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া পড়াতেই সমস্যাটি অতিশয় জটিল হইয়া পড়িয়াছে, মুসলমানেরা ভাবিতেছেন গোবধ বন্ধ করিলে হিন্দু ধর্ম্মকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, মুসলমান ধর্ম্মকে আঘাত করা হইবে। বস্তুতঃ গোবধ বন্ধ করিলে মুসলমান ধর্ম্মের কোন হানিই হয় না, ভারতের মুসলমান সম্রাট্‌গণ দেশে ঐক্য স্থাপনের জন্য গোহত্যা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গরু উৎসর্গ করিতেই হইবে, মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন বিধান কোথাও নাই। অতএব যে কারণে ভারতীয় মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষ বৈদিক আর্য্যগণ যজ্ঞে গোবধ এবং গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারাও আজ উহা করিতে পারেন। ভারতে গোবধ নিষিদ্ধ হওয়ায় সমগ্র মানবজাতির কি উপকার হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে মহাভারতের ঐ সব আজগুবী কাহিনীর রচয়িতাগণকে দূরদর্শী মনীষী বলিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। গোজাতি যে মানুষের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। যে-দেশের গরু দুর্ব্বল সে-দেশের মানুষ দুর্ব্বল এবং রুগ্ন। সর্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ বলিয়াছিলেন—

"I can dream of a cattle without a nation but I cannot imagine of a nation without a cattle."

মানুষ নাই গরু আছে এই কথা আমি ভাবিতে পারি, কিন্তু গরু নাই মানুষ আছে ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে যেমন উৎকৃষ্ট জাতির বৃষ পাওয়া গিয়াছে পৃথিবীতে আর কোথাও তাহা মিলে নাই। কোন একটি বৃক্ষে ভাল মন্দ নানা ফল হয়—কিন্তু দৈবাৎ কখনও দুই-একটা অতি উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। ঐ ফলটি বীজস্বরূপ রাখিয়া দিলে ক্রমশ ঐ ভাবে ঐ বৃক্ষের জাতের বিশেষ উন্নতি করা যায়। গরু প্রভৃতি সকল প্রাণী সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। যেখানে গোহত্যা ও গোমাংসাহার প্রচলিত আছে সেখানে উৎকৃষ্ট বৎসগুলি নিহত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী—ভারতে সেরূপ কোন সম্ভাবনা বহুকাল হইতেই নিরুদ্ধ হওয়ায় উৎকৃষ্ট বৎসসকল রক্ষা পাইয়াছে, ইহাতে মানবজাতির যে কত কল্যাণ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

এই সব কথা যুক্তি, তর্ক ও দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিলে আজ যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে তাহাদিগকে ঐ অনিষ্টকর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুরা এইটিকে তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় সমস্যাটি অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতাও বলিতেছেন, গো-রক্ষাই হিন্দু ধর্ম্ম। ইহার উত্তরে মুসলমানরা বলিতেছেন গোবধ করিবার, গোমাংস ভক্ষণ করিবার অধিকারই মুসলমান ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বস্তুতঃ গোরক্ষা হিন্দুর ধর্ম্মের অঙ্গ নহে; যদি তাহাই হইত তাহা হইলে বেদ ও মহাভারতের অনেক অংশকে হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বাদ দিতে হইত, বৈদিক আর্য্যগণও হিন্দু-পর্য্যায়ের বাহিরে পড়িতেন। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম্ম হইতেছে—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে যে এক আত্মা বা ভগবান রহিয়াছেন তাঁহাকে জানা, তাঁহার সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হওয়া, তাঁহার জ্যোতি, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দে আমাদের এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখময় মর্ত্ত্য জীবনকে এই পৃথিবীতেই অমৃতত্বে পরিণত করা;—আর যাহা কিছু তাহা হইতেছে অবান্তর, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সে-সবেরই পরিবর্ত্তন হইতে পারে বা হইয়াছে—সে-সবকে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ বলা যায় না।

গো-রক্ষাও ধর্ম্ম, কিন্তু তাহা হইতেছে মানব ধর্ম্ম। গরুর ন্যায় উপকারী জীব, গর্ভধারিণী জননীর ন্যায়ই যে আমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া আমাদের মাংসপেশী গঠন করিয়া দেয়, আমাদিগকে সুস্থ ও সবল রাখে তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিলে আমাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উপর অত্যাচার করা হয়, এবং তাহা পূর্ণতম মানবত্ব বিকাশের পরিপন্থী হয়। যেখানে গোমাংস ভক্ষণ না করিলেও অনায়াসে জীবন ধারণ করা যায়, সে-সব দেশে গো-বধ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়াই মানবতার দিক হইতে অবশ্যকর্ত্তব্য।

আমরা এতক্ষণ গরুর মাহাত্ম্যের কথাই আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু গোবর ও গোমূত্রের মাহাত্ম্যের কথা কিছু না বলিলে এই প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হিন্দু বহু-

কালের সভ্য ও ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, তাহাদের মধ্যে শৌচজ্ঞান অতিশয় প্রবল, এমন কি অনেক সময়েই তাহা মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, শুচিবাইয়ে পরিণত হইয়াছে। কোন একটি জন্তুর মল-মূত্রকে যে হিন্দু অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষি যখন প্রাচীন ভারতীয়-গণের প্রধান উপজীবিকা হইল, এবং বহু দিনের ব্যবহারে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা কমিয়া আসিতে লাগিল তখন জমিতে সাররূপে গোবর ও গোমূত্রের উপযোগ অপরিহার্য্য হইল। তখন যাহাতে লোকে গোবর ও গোমূত্রকে ঘৃণা না করে সেজন্যই শাস্ত্রকারগণকে নানা কাহিনী রচনা করিয়া মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছিল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"গোমূত্র ও গোবর দেখিয়া কখনও ঘৃণা করিও না।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, লোকে তখন ঐরূপ ঘৃণা করিত এবং তাহা দূর করিবার জন্যই ঐ সব কাহিনী রচিত হইয়াছিল। আর জমিতে গোবর ও গোমূত্রের সার দিলে শস্য বৃদ্ধি হয়, অতএব উল্লিখিত কাহিনীতে যে বলা হইয়াছে, লক্ষ্মী উহাদের মধ্যে বাস করেন ইহা একেবারে আজগুবী গল্প নহে, কারণ লক্ষ্মী হইতেছেন হিন্দুদের নিকট সম্পদের প্রতীক।

অবশ্য বর্ত্তমানে ঐসব কাহিনীর আর কোন উপ-যোগিতাই নাই। বরং উহা দ্বারা গোঁড়ামি ও কুসংস্কার প্রশ্রয় পাওয়ায় সমাজের অশেষ ক্ষতিই হইতেছে। মানুষ যত দিন অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিবে তত দিন তাহার মঙ্গলের জন্যই অনেক সময়ে সত্যের সহিত মিথ্যা মিশাইয়া দিতে হয়, কিন্তু এই মিথ্যার অশুভ ফল কালক্রমে অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

বর্ত্তমানে মানব মন যে-অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এখন আর সেই প্রাচীন পদ্ধতিসকল উপযোগী নহে—এখন মানুষের যুক্তিতর্ককে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে এবং গভীরতর আধ্যাত্মিকতার সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গোবর ও গোমূত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় করিবার জন্য আর লক্ষ্মীর গল্পের অব-তারণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থনৈতিক উপযোগিতার কথা যুক্তিতর্কের দ্বারাই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং অন্যভাবে আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও উহা সমর্থন করা যাইতে পারে। গীতা বলিয়াছে এই বিশ্ব একটি যজ্ঞ স্বরূপ; দেব, প্রকৃতি, মানুষ পরস্পরের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই এখানে সকলে বর্দ্ধিত হইতেছে, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ। যে-ব্যক্তি এই যজ্ঞচক্র অনুবর্ত্তন করে না, শুধুই গ্রহণ করে কিন্তু কিছুই প্রত্যর্পণ করে না, দান করে না সে চোর, তাহার জীবনই ব্যর্থ। এই যজ্ঞচক্রের দৃষ্টান্ত—উদ্ভিদ্ মাটি ও বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে, প্রাণিগণ ঐ উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেছে অথবা উদ্ভিদ্ভোজী অন্য প্রাণীকে আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, ঐ প্রাণীসকলের মল-মূত্র সার রূপে আবার মাটিতে ফিরিয়া আসিতেছে। এই যজ্ঞচক্র যদি ঠিক মত না চলে তাহা হইলেই অকল্যাণ হইবে।

এই দিক দিয়া দেখিলে জ্বালানী কাঠের পরিবর্ত্তে ঘুঁটে পোড়াইলে এবং মানুষের মল-মূত্র জমির সার রূপে ব্যবহার না করিলেও যজ্ঞচক্রের অবমাননা করা হয়। আমাদের দেশে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা অতিশয় হ্রাস পাইয়াছে, অন্য পক্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন। জমিতে ভাল সার দেওয়া হয় না বলিয়া আমাদের দেশে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিকরতা কম হইতেছে, এবং সেজন্য লোকে নানা রোগাক্রান্ত হইতেছে ইহা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মানুষের মল মূত্রকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিয়া এবং নদী বা সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিয়া প্রাকৃত যজ্ঞচক্রের যে অপলাপ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতেছে সেই পাপের ফল। মানুষ অন্যান্য সকল জন্তু অপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্য জমি হইতে গ্রহণ করে, অথচ তাহার মল-মূত্র সার রূপে জমিতে ফিরাইয়া দিতেছে না। আমাদের প্রতিবেশী চীনারা এই অন্যায় করে না, তাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকসংখ্যাকে পোষণ করিয়াও সে দেশের জমির উর্ব্বরতা অক্ষুণ্ণ আছে। আমরাও যদি অবিলম্বে তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করি তাহা হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এ-দেশে দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। মানুষের মল-মূত্রকে শহরের অন্যান্য আবর্জ্জনার সহিত মিশাইয়া উত্তম সার প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে ইহা সম্ভব নহে। সেখানে নরনারী পথে, ঘাটে, এমন কি পানীয় জলের পুষ্করিণীর পাড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া গ্রামের জল-হাওয়াকে দূষিত করিতেছে, অন্য পক্ষে চাষের জমিগুলি অতি-প্রয়োজনীয় সার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কৃষকগণ যদি তাহাদের জমিতে ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্ত্তের মাটি পাশেই ফেলিয়া রাখেন এবং গ্রামের লোক ঐ গর্ত্তের মধ্যে মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দেয় তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে উহা উত্তম সারে পরিণত হইবে। এ-বিষয়ে বিড়াল জাতির নিকট হইতে মানুষের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

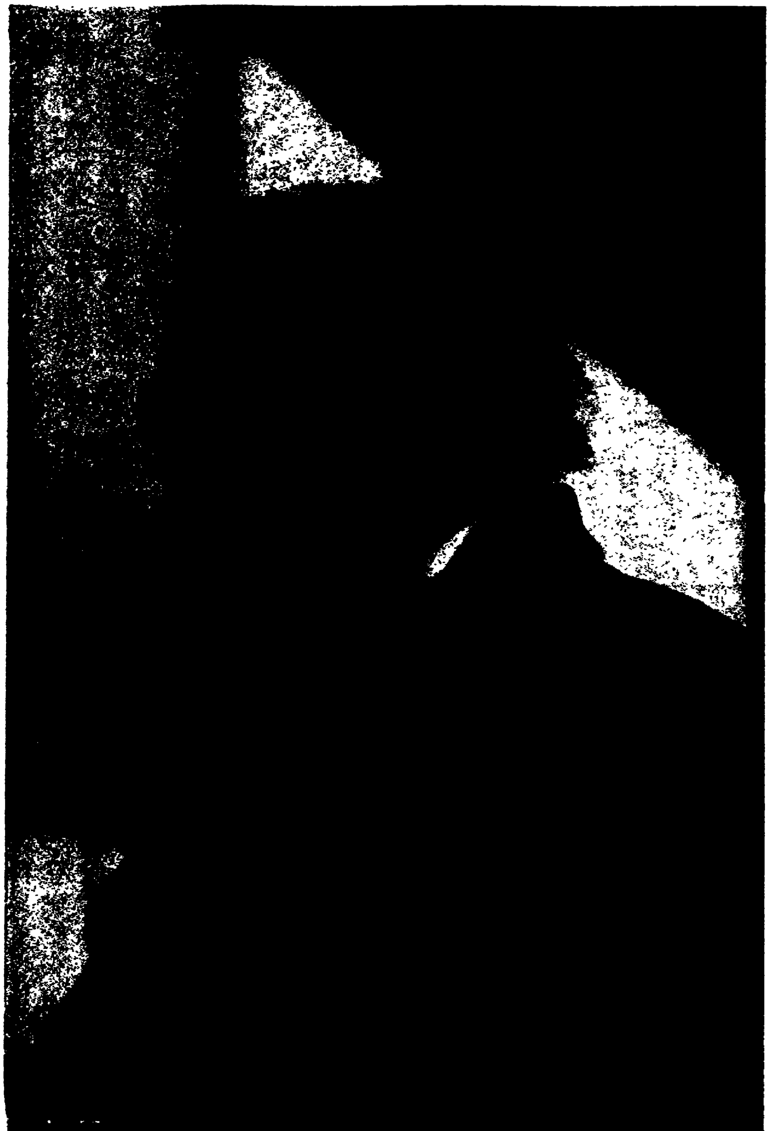


মিত্রপক্ষীয় বিমান দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে রাবাউল বন্দরে জাপানী জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে



ইটালী। একটি জলন্ত গৃহের পার্শ্ব দিয়া মার্কিন সৈন্যের অগ্রগতি। জার্মান বিমান হইতে বোমা বর্ষণের ফলে এই গ্রামে আগুন ধরিয়া যায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়





রাজা রামমোহন রায়

অধ্যাপক এস্, এন্, কিউ, জুলফিকার আলী

রাজা রামমোহন রায় সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ যাঁদেরকে কার্লাইল আখ্যা দিয়েছেন 'heroes' এবং এমার্সন বলেছেন 'representative men'। জাতির বিশেষ সঙ্কটমুহূর্তেই সাধারণতঃ মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়, এবং তাঁদের আসার ফলেই ধ্বংসের মুখ হ'তে সে জাতি বেঁচে যায়। এ ইতিহাসের অতি পুরোনো কথা।

রামমোহন রায়ের সমসাময়িক অবস্থার কথা যদি আমরা ক্ষণতরেও আলোচনা করি তা' হ'লেই বুঝতে পারব যে তাঁর মত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে সময়ে কত প্রয়োজন ছিল। তিনি যদি সেই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ না করতেন তা' হ'লে ভারতের জাতীয় জীবনের অবস্থা আজ কি হ'ত ভেবে পাই না।

মোগল সাম্রাজ্য তখন বিলীন হয়েছে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছেন। সমস্ত দিক দিয়ে মোস্‌লেম সামাজিক জীবনে এসেছে একটা গভীর নৈরাশ্য, ধর্ম্মীয়, নৈতিক, আর্থিক—এক কথায়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই লেগেছে মোস্‌লেম সমাজে ভাঙন। হিন্দুদের অবস্থাও তাই। জাতীয় কৃষ্টি তাঁরা তখন হারিয়ে ফেলেছে। সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নানা কু-প্রথা দুষ্টক্ষতের ন্যায় সমাজ-দেহে ঢুকে রয়েছে। ভারতীয় জীবন যখন এমনিভাবে দুর্নীতি ও জঞ্জালের জালে আচ্ছন্ন রামমোহন এলেন বিধাতার এক অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ। "ভারতের এই মহামানবের সাগরতীরে" দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর দেশবাসীকে দিলেন বরাভয়—ডেকে বললেন, "মা ভৈঃ।" সর্ব্বধর্ম্মের চরম সত্য—সর্ব্বমঙ্গলের পরম মঙ্গল—অঞ্জলি ভরে দিলেন তাদের মুখে তুলে—নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবার জন্যে!

রামমোহনের জীবনে আমরা দেখতে পাই তিনটি কৃষ্টির অপূর্ব্ব সমন্বয়—ইস্‌লামিক, হিন্দু ও য়ুরোপীয়।

প্রথম জীবনে তিনি আরবী ও ফার্‌সী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন; তখনই কোরাণের তৌহিদবাদ ও ইস্‌লামের সাম্যনীতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ইস্‌লামের এই দুই সত্য চিরজীবনের জন্য তাঁর চরিত্রের উপর রেখাপাত করে যায়। এই সময় হতেই প্রতীক-পূজার প্রতি আসে তাঁর গভীর বিতৃষ্ণা। এই সময়েই জন্মে মোস্‌লেম সামাজিক জীবনের প্রতি তাঁর অনুরক্তি,—আজীবন তাই মুসলমানী পোষাক, খাদ্য ও সামাজিক আচারের প্রতি দেখি তাঁর অনুরাগ।

পরে, কাশীতে তিনি অনেক দিন সংস্কৃত দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। উপনিষদ প্রভৃতির মধ্যে তিনি তখন খুঁজে পেলেন ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার সনাতন রূপ। ইস্‌লামিক ও ঔপনিষদিক চর্চ্চার ফলস্বরূপ যে-গ্রন্থ আমরা পাই—সে হ'ল তাঁর ফার্সীতে লেখা গ্রন্থ "তুহ্‌ফাতুল মোহ্‌হেদীন" (অর্থাৎ, একেশ্বরবাদীকে উপহার)। এই গ্রন্থ লেখার জন্য তাঁর পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সঙ্গে হ'ল তাঁর ছাড়াছাড়ি—ফলে তিনি তিব্বতে চলে গেলেন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য, সেখানেও গোঁড়া লোকদের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হ'ল না। লামা-পূজার তীব্র প্রতিবাদ করার ফলে তাঁর প্রায় প্রাণবিনাশের উপক্রম হয়।

দেশে যখন ফিরে এলেন তখন পাকাপাকি ভাবে ইংরেজ-শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিলেন না—কিন্তু কতিপয় মহানুভব ইংরেজের বন্ধুত্ব লাভ করায় এ মনোভাবের অনেকখানি পরিবর্ত্তন হয়, এবং এ শাসন যাতে সত্যিকার কল্যাণ আনয়ন করতে পারে দেশে সে দিকেই তিনি তাঁর চেষ্টা নিয়োজিত করলেন।

তিনি রাজসরকারে কাজ নিলেন এবং ২২ বৎসর বয়সে ইংরেজী ভাষা শিখতে সুরু করলেন। এই বয়সে এই ভাষা শিক্ষা সুরু করেও তিনি এতে কতখানি দখল অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন তা বেন্থামের মত একজন উচ্চাঙ্গের দার্শনিকের মত হতে আমরা বুঝতে পারি। বেন্থাম রামমোহনের ইংরেজী লিখনভঙ্গীকে জেম্‌স মিলের লিখনভঙ্গী হতে সুন্দরতর মনে করতেন।

এই সময়ে শ্রীরামপুরে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনরীরা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করছিলেন। রামমোহন খ্রীষ্টের সুন্দর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি বরদাস্ত করতে পারেন নি। এ সব তিনি খ্রীষ্টের শিক্ষার পরিপন্থী বলেই মনে করতেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম ভালভাবে জানবার জন্যে হিব্রু, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন। এবং

তিনি যে ভাবে শ্রীরামপুরের পণ্ডিত মিশনরীদের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক চালান তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। পাটনায় আরবী শিক্ষা করে নাম হয়েছিল তাঁর "জবরদস্ত মৌলবী"—মিশনরীদের সঙ্গে তর্কের ফলে হয়ে দাঁড়ালেন জবরদস্ত একেশ্বরবাদী।

রামমোহন দশটি ভাষা আয়ত্ত করেন; তন্মধ্যে সংস্কৃত ও আরবীতে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য জন্মে, আর চারটিতে—ফার্‌সী, হিন্দুস্থানী, বাংলা ও ইংরেজীতে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে ও লিখতে পারতেন। বাস্তবিকই, শুধু পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে যদি বিচার করা যায় তাতেও তিনি তদানীন্তন জগতের অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাক্‌বেন।

ভাষার কথা যখন উঠল তখন বলে রাখা ভাল যে তিনি বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিসাবেই এতদিন স্বীকৃত হয়ে আসছিলেন। কিন্তু ইদানীং কোন কোন লেখক এ বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। হতে পারে কোন পণ্ডিত তাঁর কিছু আগেই এক আধখানা পাঠ্য পুস্তক হয়ত বাংলা গদ্যে লিখেছিলেন—কিন্তু বাংলা গদ্যকে এর বর্ত্তমান রূপটি দেওয়ার কৃতিত্ব যে রামমোহনেরই এ স্বীকার না করে উপায় নেই।

তিনি হিন্দী গদ্যেরও অন্যতম পথপ্রদর্শকের সম্মান পেতে পারেন। কোন কোন লেখকের মতে হিন্দী গদ্য পুস্তিকা লেখকদের তিনি পঞ্চম ব্যক্তি। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী চার জনের দুইজন হিন্দী লেখেন ফার্‌সী অক্ষরে; আর দুইজন লেখেন দেবনাগরী অক্ষরে। বিশেষ, ফোর্ট উইলিয়মের অধ্যাপকেরা হিন্দী লেখেন চাকুরীর তাগিদে, কিন্তু হিন্দী ব্যবহারে এরূপ কোন তাগিদ রামমোহনের ছিল না। অন্যপক্ষে, "বর্ত্তমান হিন্দী ভাষায় দেবনাগরী লিপির প্রথম স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত" লেখকের গৌরবও তাই তাঁরই প্রাপ্য।

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে রামমোহন দেশের কি মঙ্গল সাধন করে গেছেন তা সকলেই বিদিত আছেন। তার পুনরুক্তি আজ করতে চাই নে। তবে অন্যগুলি বাদ দিয়ে যদি শুধু সতীদাহ প্রথা নিবারণে যেটুকু সাহায্য তিনি করেছিলেন সেইটুকুই স্মরণ করা যায়—তাতেও তিনি চিরদিনের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য।

এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্যে তিনি বহুলাংশে দায়ী, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সমর্থন করায় জন্য কেউ কেউ ইদানীং তাঁর নিন্দা করেছেন। যতটা মনে পড়ে তাতে স্বামী বিবেকানন্দ যেন এক যায়গায় বলেছেন যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দ্বারা ভারতীয় অগ্রগতি পঞ্চাশ বছরের জন্যে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদেশী ভাষার মারফতে শিক্ষার ব্যবস্থাকে আমরা খুবই অস্বাভাবিক মনে করি। কিন্তু রামমোহনের সময় অন্য কোন্ দেশীয় ভাষায় উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হত? ফার্‌সী ছিল মোগল-দরবারের ভাষা। সে-ভাষাকে ইংরেজরা বহাল রাখবেন সেরূপ আশা করা ছিল বৃথা, প্রাদেশিক ভাষাগুলি ত তখন ভাল করে গড়েই ওঠে নি। এমন অবস্থায় ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা যে খুবই অন্যায় হয়েছিল এ মত সমর্থন করা চলে না। বিশেষ, ইংরেজী শিক্ষাতে যে কোন উপকার হয় নি একথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে না। যে উদ্দেশ্যে ইংরেজীর প্রচলন হয় তা বহুলাংশে সফল হয়েছে। ইংরেজী ভারতীয়দের 'এক জাতিত্বের' জ্ঞান দিয়েছে; ইংরেজীনবিশেরাই প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে নবজীবন দান করেছেন। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেম, নবীন ও রবীন্দ্রনাথের নাম এ সম্পর্কে ভুলে গেলে চলবে কেন?

রামমোহন ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন প্রচেষ্টা সমর্থন করার জন্যে ও দেশীয় দুর্নীতিগুলিকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করার জন্যে কোন কোন সমালোচক তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতি ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

আগেই বলেছি, ইংরেজদের দ্বারা এদেশ অধিকারকে তিনি পূর্ব্বে আদৌ ভাল চোখে দেখেন নি। তিব্বত হতে ফিরে এ মনোভাব তিনি সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে কতিপয় সহৃদয় ইংরেজের সঙ্গে মেশায় ও ব্রিটিশ মনোবৃত্তিগুলি ভালভাবে জানায় তাঁর মতের পরিবর্ত্তন ঘটে।

তিনি যে স্বাধীনতা, বিশেষ করে গণতন্ত্র-শাসনপ্রণালী, কত শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তেন তার প্রমাণ পাই যখন দেখি যে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন স্থাপনের সংবাদ এদেশে আসামাত্রই তিনি টাউন হলে বিরাট ভোজের আয়োজন করেন।

তাঁর স্বাধীনতা-স্পৃহা যে কত তীব্র ছিল তা তাঁর জীবনের আরো অনেক ঘটনা হ'তে বুঝ্‌তে পারি। তিনি ফরাসী বিপ্লবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তেন। বিলাত যাবার পথে এডেনে তাই যখন তিনি কোন ফরাসী জাহাজ নোঙর করা আছে শুনলেন, তিনি ফরাসী জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে সময়ে কোন দুর্ঘটনার দরুণ তিনি শয্যাগত ছিলেন—তাই তাঁকে স্ট্রেচারে করে সে জাহাজের নিকট নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফরাসী পতাকা দর্শনে তিনি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলে উঠেন, "Glory, Glory, Glory to France!"

তাঁর আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে তাঁর একজন এডি-কংকে পাঠান তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে, এডি-কংটি ফিরে এসে বেণ্টিঙ্ককে খবর দিলেন যে রামমোহন দেখা করতে অসমর্থ বলেছেন। বেণ্টিঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন যে ঠিক কি কথাগুলি রামমোহনকে বলা হ'য়েছিল, এডি-কং বললেন যে তাঁকে বলা হয়েছিল—His Excellency Lord William Bentinck would be pleased to see you.—বেণ্টিঙ্ক তখনি এডি-কংটিকে এই বলে রামমোহনের নিকট ফিরে যেতে বললেন, "Go back and tell him again that Mr. William Bentinck will be highly obliged to him if he will kindly see him once." এই ভদ্র অনুরোধ অবশ্য রামমোহন আর অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু আমরা ভাব্‌ছি—এই উদগ্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগেও কয়জন নেতা এমন পাওয়া যাবে যাঁরা হেলায় বড়লাটের আহ্বান এরূপ উপেক্ষা করতে পারবেন?

রামমোহন রায়ের "রাজা"-খেতাব থাকায়ই বোধ হয় অনেকের মনে এরূপ সন্দেহ রয়েছে যে তিনি খুব ব্রিটিশ-অনুরাগী (pro-British) ছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল। তাঁর 'রাজা'-খেতাব তিনি পেয়েছিলেন মোগলের শেষ সম্রাট্ শাহ্ আলম হতে। এই বোধ হয় সেই হতভাগ্য সম্রাটের শেষ খেতাব-দান। যেখানেই অন্যায়, অবিচার দেখেছেন, রামমোহন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে তার প্রতি আঘাত হেনেছেন। শাহ্ আলমের ন্যায়সঙ্গত আবেদন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করবার জন্যই তিনি বিলাত যান এবং যাবার প্রাক্কালেই শাহ্ আলম তাঁকে "রাজা"-খেতাবে ভূষিত করেন।

কিন্তু এসব অনেকখানি তাঁর বাইরের কার্য্যকলাপের বিষয়ই আলোচনা করা গেল। মনোজগতে ও ভাব-জগতে রামমোহনের যে দান তার কোন তুলনা হয় না।

রামমোহনকে একহিসাবে অতীত ভারত ও বর্ত্তমান ভারতের মধ্যে সেতুস্বরূপ বলা চলে, অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে বর্ত্তমান ভারতের সুরুই তাঁর থেকে: তিনিই যে বর্ত্তমান ভারতের স্রষ্টা এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাধনার ক্ষেত্রে অর্থাৎ অধ্যাত্ম-ব্যাপারে তাঁর চিন্তা-ধারা ভারতের সনাতন ধারারই অভিব্যক্তি একথা অনেক লেখকই দেখিয়েছেন। ধর্মের যে সমন্বয়ের চেষ্টা তিনি করে গেছেন তাতে খুব নূতনত্ব *নেই—কারণ, তাঁর বহু-*পূর্ব্বে সম্রাট্ আকবর তাঁর 'এবাদৎ-খানার' ভিতর দিয়ে সে চেষ্টা করেছিলেন। এদিকে, কবীর, নানক, দাদু, দেখরাজ ও চৈতন্যদেবের সাধনার ভিতরও তাঁর সাধনার ধারার সন্ধান পাই। কিন্তু, শেষোক্ত এই সব সাধনার মূলে দেখতে পাই একটা 'নেতি-বাদ'—অতিশয় ভাবালুতা (emotionalism)—সংসার ত্যাগ ক'রে ধর্ম্ম সাধনাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করা। রামমোহনের ভিতর দেখতে পাই একটা অপূর্ব্ব সংযম—বুদ্ধির উৎকর্ষ (intellectualism)—যা তাঁর পূর্ব্বে ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে কোনদিন বড় একটা দেখা যায় নি। ধর্ম্মকে তিনি প্রতিদিনের কার্য্যকলাপের ভিতরই টেনে নিয়েছিলেন। মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বরানুভূতিকেও তিনি তেমনি স্বাভাবিক করে নিয়েছিলেন। এদিক দিয়েও তাঁর উপর ইস্‌লামিক সাধনার প্রভাব আছে বলে মনে হয়। অন্যপক্ষে, এইদিক দিয়ে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মসাধনা ব্যাপারে যে তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এই ধারাটি দেখতে পাই সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনে। কর্ম্মযোগী স্বামী বিবেকা-নন্দের উপরও এই ধারার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ভাবেই রয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি ইস্‌লাম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম সমভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলে এদের প্রতি তিনি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তেমনি আবশ্যকমত আঘাত করতেও দ্বিধা করেন নি। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে ভারতে ইস্‌লামের rationalism হয়ত তাঁর থেকেই সুরু হয়। পরবর্ত্তীকালে পশ্চিম-ভারতে যে মুসল-মান নেতার আবির্ভাব হয়—আমি সর্ সৈয়দ আহমেদের কথা বলছি—তাঁকে এই হিসাবে হয়ত রামমোহনের মানসপুত্র বলা যেতে পারে।

রামমোহনের শিক্ষা পুরোপুরিভাবে ভারত আজও গ্রহণ করতে পারে নি—তার ফলে যে-'ভারতে'র স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা আজও ঠিক গড়ে ওঠে নি। ভার-তের সর্ব্বসাধারণের নিকট আজও যেন তাঁর বাণী পৌঁছায় নি; তাঁর যুক্তিবাদ আজও যেন সকলের প্রাণে আলোড়ন তুলতে পারে নি। এখনও 'ভাব গদ-গদ অশ্রু' আমাদের নিকট বেশী সম্মান পায়। এই কারণেই তাঁর ব্রাহ্মসমাজও 'নব-বিধানে' বিভক্ত হতে বাধ্য হয়।

তবে আমার যা মনে হয় তাতে রামমোহনের জীবনের

আদর্শই হয়ত অনাগত ভারতের একমাত্র আদর্শ এবং তাঁর এই আদর্শ সর্ব্ব দিক দিয়ে পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনে। যে ভাব, যে কল্পনা মুকুলিত দেখতে পাই রামমোহনের মধ্যে, তাই-ই যেন বড়ৈশ্বর্য্যে আবির্ভূত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উপাস্য যে বিশ্বভূপের ইঙ্গিত পাই রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিতে, তিনিই আমাদের একান্ত আপনার হয়ে ধরা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ব্রহ্মসঙ্গীত ও 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, যে তীব্র জ্ঞানস্পৃহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল করে তুলেছিল রামমোহনকে, তাই-ই যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী'তে, ভারতের যে রূপ দেখেছিলেন মানসনেত্রে রামমোহন, সেই ভারতই রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অমর গাথা 'ভারত-তীর্থে'। বাস্তবিকই, নব্যভারতের অগ্রদূত রামমোহনের এই স্মৃতি-বার্ষিকীতে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি—কেননা, রবীন্দ্রনাথ না হলে হয়ত রামমোহনের জীবন বা আদর্শগুলি কোন দিনই এমন ভাবে আমাদের নিকট সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। আরও স্মরণ করি গর্ব্বের সঙ্গে আজ এই কথা যে এঁরা উভয়েই ছিলেন বাঙ্গালী এবং এই বাঙ্গালীরাই রয়েছে 'নব্য-ভারতে'র সৃষ্টির মূলে।*

* ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৩) তারিখে ঢাকা পূর্ব্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিবার্ষিকী সভাতে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলেখন।

চিরজীবী রামানন্দ

শ্রীমহাদেব রায়, এম-এ

দেশ-ভক্ত মুক্ত-প্রাণ নীতি-নিষ্ঠ কর্ম্মযোগী বীর,
ছিলে তুমি সুসন্তান গরীয়সী বঙ্গ-জননীর।
লেখ নাই ইতিহাস, রচিয়াছ ইতিবৃত্ত নব
সার্থক সত্যের রূপে প্রজ্ঞা-বদ্ধ লেখনীতে তব।
উচ্ছ্বাস-নির্ম্মুক্ত তব অকলঙ্ক বাক্য নিরমল
অনবদ্য রস-রূপে অপরূপ শাশ্বত উজ্জ্বল;
তোমার বাণীর পুণ্য-গরিমায় ধন্য হ'ল দেশ,
হে তপস্বি, মর-লোকে আজি তব তপস্যার শেষ।
'যে ধনে হইয়া ধনী' চাহ নাই মিথ্যা লোক-যশ,
লক্ষ প্রাণে দিলে তাতে সত্য-পূত প্রাণের পরশ।
সত্যের সংগ্রামে দৃঢ়, কঠোরতা-বর্ম্মে বরীয়ান্,
আচরণে অন্তরের কোমলতা-ধর্ম্মে মহীয়ান্,
গেছ ছাড়ি এ ধরায় অমরায় আজি পুণ্যবান্,
কীর্ত্তি তব চিরজীবী—চিরজীবী তুমি কীর্ত্তিমান্।

রামানন্দ-স্মরণে

শ্রীগোপাললাল দে

অসীম আশায় দীপ্ত তরুণ যৌবনে একদিনই,
আদর্শের পানে চেয়ে জীবনের যাহা কিছু প্রিয়,
বান্ধব, জনমভূমি, আত্ম-জন, গেহ ও গেহিনী
অসঙ্কোচে ত্যজি নিলে ব্রাহ্মণের ত্যাগ-উত্তরীয়।

মধ্যাহ্ন প্রখর হ'ল, দূর দেশে একা পরবাসী,
সত্য ও ন্যায়ের ব্রতে একনিষ্ঠ জাতীয় কল্যাণে,
সঙ্কট-পথের যাত্রী চলিয়াছে অনন্ত-বিশ্বাসী,
দারিদ্র্য দাক্ষিণ্যে ভরি, আতিথ্যেরে ভরি আপ্যায়নে

ঋষিরে চিনিল ঋষি, দিশি দিশি ছুটে গেল বাণী,
অগণ্য প্রয়াসে মেশে নিষ্ঠাপূত 'রামানন্দ' নাম,
শ্রদ্ধায় নমিত হ'ল ধরণীর ঋষি গুণী জ্ঞানী,
সমুজ্জ্বল মাতৃ অঙ্ক; 'সত্য শিব সুন্দরে' প্রণাম!

হে মনীষি, ভ্রান্তিবশে একদিন ছেড়েছিল যারা,
চেয়ে দেখ, স্মিত মুখে একে একে ফিরিয়াছে তারা!

প্রসারণশীল বিশ্ব

শ্রীঅতসী দে

১৯১৭ সালে অধ্যাপক ডে সিটার (De Sitter) সর্ব্বপ্রথম গণিতের সাহায্যে কষে বলেন যে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে—অন্ততঃ তাই দেখান উচিত—প্রকৃত প্রসারণ না হ'লেও। এ রকম ঘটনা বা কথা অনেক যুগ আগেকার লেখা গল্প ইত্যাদিতে পাওয়া যায়—যাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদাই সন্দিহান। মানব-মস্তিষ্ক জটিল হ'লেও সরলতার পক্ষপাতী, কোন নূতন আবিষ্কারের প্রতি ইহার যতই শ্রদ্ধা ও উৎসুকতা থাকুক না কেন যতক্ষণ না তার প্রকৃত কারণ জ্ঞাত হয় ততক্ষণ সেই আবিষ্কারকে সন্দেহের চোখে দেখে এই জন্যেই সাধারণ মানুষের কাছে এই আবিষ্কার প্রথমে নিতান্ত কাল্পনিক বলেই মনে হয়েছিল—কিন্তু গণিত-শাস্ত্র ও ভৌতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার সত্যতা সরলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এখন দেখা যাক বিশ্বে আমাদের স্থান কোথায়? আদি সংস্কারে স্বভাবতঃই নিজেকে সবচেয়ে বড় ভেবে পৃথিবীকে সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্র ধরে তার চারি পাশে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি ঘুরছে ধরা হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানী পৃথিবীর চারি দিকে আকাশমণ্ডল ঘুরবার কল্পনা স্বপ্নেও সত্য ভাবতে পারেন না—কেননা তাহলে যে সমস্ত সুদূর নক্ষত্র ও নীহারিকা মণ্ডলী দেখা যায়—তাহারা এত দূরে আছে যে ২৪ ঘণ্টায় পুরা চক্র পরিভ্রমণ করতে গেলে তাদের কোথাও কোথাও আলোর গতির চেয়ে বেশী দ্রুত চলতে হবে। এবং আমরা জানি আইনষ্টাইনের সাপেক্ষতাবাদ (Theory of Relativity) থেকে ইহা অসম্ভব। আইনষ্টাইনের সাপেক্ষতাবাদের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে; ইহা বলে বিশ্বে আলোর গতির চেয়ে দ্রুত কোন জিনিস চলতে পারে না। সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে তার চারি পাশে গ্রহদের ঘুরতে দেওয়ার সমস্ত মুশকিল দূর হয়ে গেছে। কিন্তু সূর্য্য একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র হতে পারে না—শুধু সূর্য্য-মণ্ডলের জন্য হতে পারে। সূর্য্য-মণ্ডলে সূর্য্যকেন্দ্রে এবং তার চারি পাশে গ্রহ, উপগ্রহ ও পুচ্ছবিশিষ্ট তারা ইত্যাদি ঘুরছে। গ্রহদের মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, বারুণী, বরুণ, যম ক্রমশঃ সূর্য্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে হাজার হাজার ছোট ছোট গ্রহের সমষ্টি আছে; বোধ হয় অনেক যুগ আগে তারা একটি বড় গ্রহ ছিল। সূর্য্য আপনার নীহারিকার মাঝে একটি জলন্ত কয়লা ছাড়া আর কিছুই নয়। (একটি নীহারিকা কোটি কোটি তারার সমষ্টি এবং কোটি কোটি নীহারিকা এই বিশ্বে আছে)।

এই নীহারিকাদের স্বচ্ছ আকাশে সাদা মেঘের মত দেখায় এবং তারা আকাশ-গঙ্গা (Milky Way) নামে প্রসিদ্ধ। এই নীহারিকাদের মাঝে ছোট, বড় মাঝারি, গরম, ঠাণ্ডা, ঘন, পাতলা অনেক প্রকার নক্ষত্র আছে। ভগবানের এই বিশাল সৃষ্টির মাঝে আমরা অতি নগণ্য,—আমরা নিজেদের ঘোষণা যতটুকু করতে পেরেছি ততটুকুই আমাদের সম্বল। যদিও বর্ত্তমানে পৃথিবী ছাড়া সূর্য্য-মণ্ডলের অন্য কোন গ্রহতে প্রাণীর আভাস পাওয়া যায় নি তথাপি বিশ্বের মরুভূমির মাঝে দুই-একটি মরুদ্বীপ থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। ভাবতে বেশ লাগে হয়ত অন্য কোন গ্রহের মানুষরা আমাদের বিষয়ে কিছু জানবার চেষ্টা করছে। হয়ত এক দিন আমরা বিশ্ব-বন্ধুত্ব করতে সমর্থ হব। কিন্তু কবে ও কোথায়? বিজ্ঞান এর জবাব এখনও দিতে অসমর্থ।

বিশ্বে অনুমান কোটি কোটি নীহারিকা আছে; নির্ম্মল মেঘশূন্য রাত্রে ছোট ছোট মেঘের টুকরার মত দেখা যায় এবং দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহাদের অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ বলে মনে হয়। শুধু চোখে যাহা শূন্য মনে হয় দূরবীক্ষণের সাহায্যে সেই সব স্থানে পাতলা মেঘের টুকরার মত দেখা যায়। এই সব নীহারিকামণ্ডলী এতদূরে আছে যে দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তাদের নক্ষত্রদের আলাদা দেখা যায় না। আকাশ-গঙ্গার মত প্রায় প্রত্যেক নীহারিকাতে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। নীহারিকাদের দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে এত বেশী যে তা মাইলে ব্যক্ত করা কঠিন। সেইজন্য আমাদের অন্য এক মাপের সাহায্য নিতে হবে। আমরা জানি আলো সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল যায়, তবুও আলোর সূর্য্য থেকে এখানে আসতে প্রায় ৮ মিনিট লাগে। এইরূপে সূর্য্য ছাড়া আমাদের নিকটতম নক্ষত্র থেকে আলো এখানে আসতে ৪·২৭ বছর লাগে—ইহা সূর্য্য অপেক্ষা ২৭০০০ গুণ দূরে আছে। অতএব আমরা নক্ষত্রদের ব্যবধান এখন থেকে

আলোকবর্ষ (light year)তে ব্যক্ত করব। নীহারিকাদের জন্যেও এই মাপ ব্যবহার করা চলে কিন্তু তাদের দূরত্ব আরও অনেক বেশী বলে কখনও কখনও অন্য মাপ ব্যবহার করা হয়। (এক megaparsec = ৩২৬ লাখ আলোকবর্ষ)। এই ব্যবধান আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে কল্পনাতীত বলে মনে হয়। এর দশ গুণ বা দশের এক ভাগ অনুমান করতে আমাদের মানসিক জগতে কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু তবুও এই সংখ্যাগুলি স্থূল সত্য।

আসল বিষয় বুঝিবার জন্য যতটুকু না জানলে নয় এতক্ষণ তারই অবতারণা করা গেল। এখন প্রকৃত আলোচ্য বিষয়ে আসা যাক। আইনষ্টাইনের ব্যাপক সাপেক্ষতাবাদ (General Relativity) প্রতিষ্ঠা হবার দু'বছর পরেই ডে সিটার এই সিদ্ধান্তের সাহায্যে কষে বলেন যে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে—অন্ততঃ তাই দেখান উচিত। নীহারিকাদের আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবার আভাস প্রথম পাওয়া যায় অধ্যাপক স্লিফারের (Slipher) প্রয়োগে (experiment)। শুধু যে পৃথিবী থেকেই এই সব গ্রহ উপগ্রহ নিরন্তর দূরে চলে যাচ্ছে তা নয়—এই মহাপ্রসারণে প্রত্যেক কোষ অন্যের কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রসারণের অথবা দূরে সরে যাবার বেগ নিরূপণ করা খুব কঠিন নয়। ডপ্লারের (Doppler) প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত (Doppler Effect) থেকে আমরা জানি যে যদি ঢেউয়ের উৎস এবং তাদের ডিটেক্টরের (detector) মধ্যকার ব্যবধান বাড়তে থাকে তা'হলে ডিটেক্টরের কাছে স্থির থাকার চেয়ে প্রতি সেকেণ্ডে কম ঢেউ পৌঁছুবে এবং আবৃত্তি (frequency) কমে যাবে—অথবা অন্য কথায় উর্ম্মি-দৈর্ঘ্য (wave-length) বেড়ে যাবে। উৎস ও ডিটেক্টরের ব্যবধান যদি কমতে থাকে তা'হলে একই কারণে আবৃত্তি বেড়ে যাবে অথবা উর্ম্মি-দৈর্ঘ্য কমে যাবে। শব্দ হাওয়াতে তরঙ্গ রূপে ভ্রমণ করে। সুতরাং তরঙ্গ-উৎস ক্রমশঃ দূরে সরে গেলে শব্দের আবৃত্তি কমে যায়। অতএব আমরা শব্দের পরিবর্ত্তিত আবৃত্তি থেকে বলতে পারি তার উৎস কত বেগে চলছে। কিন্তু শূন্যস্থিত সুদূর নীহারিকামণ্ডলীর কাছে আমাদের ধ্বনি কি করে পৌঁছুবে বা তাদের কাছ থেকে কোন শব্দ আমরা কি করে শুনতে পাব? এখানে আলোক-উর্ম্মিমালাই (light-waves) আমাদের একমাত্র সাহায্য করবে। পৃথিবীতে কোন উত্তেজিত অণু বা পরমাণুর বর্ণপট (spectrum) নিলে তাতে কতকগুলি বিশেষ রেখা দেখা যায়। কোন দূরের নীহারিকায় বর্ণপট বদ্ধ ক'রে অধ্যয়ন ক'রে দেখা গেছে যে সেই বিশেষ বিশেষ রেখাগুলিই একটু সরে গেছে ও অপেক্ষাকৃত লাল হয়ে গেছে। তার কারণ এই যে নীহারিকা থেকে আসতে আসতে আলোর আবৃত্তি কমে যায় অথবা উর্ম্মি-দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে নীহারিকামণ্ডলী দূরে সরে যাচ্ছে। নীহারিকা থেকে আলো গন্তব্য স্থানে অর্থাৎ আমাদের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে পথে পদার্থের উপস্থিতির কারণ আলো লাল হয়ে যায়। Dr. Ziwicky-র এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ নয়—এবং ইহাতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় না কেননা বিশ্বে পদার্থের ঘনত্ব অতি সামান্য। অধ্যাপক হাব্‌লের (Hubble) অবলোকন (observation) ও মাপের সাহায্যে জানা গেছে যে নীহারিকাদের দূরে সরে যাবার বেগ ৫৫০০০ মিটার প্রতি সেকেণ্ড প্রতি মেগাপারসেক। ভাগ্যক্রমে আজ পর্য্যন্ত কোন নীহারিকাকে আমাদের দিকে আসতে দেখা যায় নি। চারি-বিস্তার-বিশিষ্ট বিশ্ব কিরূপে প্রসারিত হচ্ছে ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝবার জন্য বেলুনের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। একটি বেলুনকে প্রথমে অল্প ফুলিয়ে তার সারা গায়ে ছোট ছোট বিন্দু চিহ্নিত করা যাক। এরকম ভাবে বিন্দুগুলিকে বেলুনের গায়ে রাখতে হবে যে প্রত্যেক বিন্দুর চারি দিকে কোন-না-কোন বিন্দু থাকে। কোন চ্যাপ্টা জায়গায় তা করা সম্ভব নয়। তার কারণ ধারের বিন্দুগুলির এক দিকে কিছুই থাকবে না। এই বিন্দুগুলিকে আমাদের গ্রহ, তারা, নক্ষত্র ইত্যাদির প্রতিরূপ ধরা যাক। তার পরে যখন বেলুনটিকে ফোলান হবে উহার ফুলিবার সঙ্গে বিশ্বের প্রসারণের উপমা দেওয়া যায়। বিশ্বে নীহারিকারা চারি দিকে নীহারিকা-দ্বারা পরিবেষ্টিত; অতএব ব্যোমের (space) বক্র হওয়া একান্ত আবশ্যক। শুধু তাই হলেই চলবে না—ব্যোমের বদ্ধ হওয়াও দরকার। বদ্ধ না হলে ব্যোমের সীমা এবং কেন্দ্র থাকবে এবং তাদের উপস্থিতি আমাদের নানা অসুবিধায় ফেলবে। ডে সিটারের বিশ্বের চিত্রে পদার্থের কোন স্থান নেই—শুধু গতি আছে। বিশ্বের পদার্থের ঘনত্ব অতি সামান্য—তা অগ্রাহ্য করা যায়। ডে সিটার ইহা ধরে গণিতের সাহায্যে এক শূন্য গতিশীল বিশ্ব রচনা করেছেন। অন্য দিকে আইনষ্টাইনের বিশ্বের চিত্রে পদার্থ আছে কিন্তু কোন গতি নেই,—ইহা সম্পূর্ণ স্থায়ী। এই দুই চিত্রের মধ্যে কোনটিই প্রকৃত চিত্র নয়। যদি ডে সিটারের বিশ্বে কিছু পদার্থ রাখা যায় এবং আইনষ্টাইনের বিশ্ব থেকে কিছু সরান যায় তা'হলে হয়ত যথার্থের নাগাল পাওয়া যেতে পারে। এইরূপে আইনষ্টাইনের স্থায়ী বিশ্ব ও ডে সিটারের গতিশীল বিশ্বের মাঝামাঝি কোন বিশ্ব

থাকা উচিত যাহা আমাদের বিশ্বের সত্যকারের প্রতিনিধি হবে।

বিশ্বের রচনা ও উহার প্রসারণ ভৌতিক বিজ্ঞান এবং গণিতের ছাত্রদের কাছে অতি আকর্ষণীয় বস্তু;—কিন্তু আমরা গণিতের সাহায্য নেব না। আমরা শুধু ভৌতিক দৃষ্টিতে ইহা অধ্যয়ন করব। আমরা জানি সৃষ্টিতে প্রত্যেক বস্তু অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বস্তু দুটির mass-এর গুণফল ও তাহাদের ব্যবধানের উল্টা বর্গের (square of the reciprocal) উপর নির্ভর করে। (সহজের জন্যে এখানে আমরা নিউটোনিয়ান আকর্ষণ ধরছি)। কিন্তু সাপেক্ষতাবাদ থেকে গণনাতে আমাদের একটি factor-এর সম্মুখীন হ'তে হবে—ইহা আকর্ষণের বিরুদ্ধে যায় এবং নীহারিকাদের পরস্পরের আকর্ষণের ফলে একত্র হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। অতএব আমরা ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডীয় বিকর্ষণ (cosmic repulsion) নামে অভিহিত করব। বিশ্বের প্রসারণ কেন যে প্রথমে আরম্ভ হ'ল তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে তবে একটি বিষয় বুঝা শক্ত নয় যে, যে-ক্রিয়া একবার আরম্ভ হবে সেই ক্রিয়াই বরাবর চলতে থাকবে। প্রসারণ মানে ঘনত্ব ও নিউটোনিয়ান আকর্ষণ কমে যাওয়া—যাতে বিশ্ব বাড়তে থাকবে এবং সংকোচন সুরু হলে ঘনত্ব ও আকর্ষণ বাড়তে থাকবে; ফলে বিশ্ব ক্রমশঃই ছোট হয়ে যাবে।

সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বের ব্যাস কত বেড়ে গেছে বলা বড় শক্ত। বিশ্বের গোড়াকার অর্দ্ধব্যাস, যখন প্রসারণ সুরু হ'য় নি, ৩২৮ মেগাপারসেক ছিল। কিন্তু বিশ্ব পৃথিবীর চেয়েও পরিবর্ত্তনশীল—একথা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, কেননা পৃথিবীর অনেক পুরণ পাহাড়ের আয়ুই ১৩০০০০০০০০ বৎসর। বিশ্বের উপস্থিত ব্যাস জানা নেই বটে, কিন্তু উহার প্রসারণের হার জানা শক্ত নয়। ১৩০০০০০০০০ বছরে নীহারিকাদের মধ্যকার ব্যবধান দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই সমস্যা দূর করবার জন্য দু'টি সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা হয়েছে। একটির নাম স্পন্দমান বিশ্ব যাহার মতে বিশ্ব এক স্ববেষ্টনকারিণী (self-winding) ঘড়ির স্প্রিঙের মত আপনা-আপনিই বাড়ে এবং কমে। এই সিদ্ধান্ত আমাদের ভবিষ্যতের প্রলয়-ভয় থেকে চিরকালের জন্যে মুক্ত করেছে বটে, কিন্তু ইহা ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। কেননা আমরা স্ববেষ্টনকারিণী ঘড়ি সচরাচর দেখতে পাই না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যুগান্তরের আইনষ্টাইনের স্থায়ী বিশ্বের কল্পনা ও কিছু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডীয়—প্রতিসরণ বেড়ে যাওয়া। আইনষ্টাইনের সাপেক্ষতাবাদ ও মিল্‌নের গতিবাদ (Milne's Kinematical Theory) থেকে আমরা প্রসারণশীল বিশ্বের অস্তিত্ব পাই। মিল্‌নের সিদ্ধান্ত গুরুত্ব আকর্ষণের (gravitational attraction) কোন প্রয়োজনীতা বোধ করে না—অথচ বিশ্বরচনার এই সিদ্ধান্তই অন্যান্য সিদ্ধান্তের তুলনায় সহজ ও সরল বলে মনে হয়। এই বিষয়ে আরও গবেষণায় প্রয়োজন, নচেৎ সব বিষয় পরিষ্কার করে বুঝতে পারা সম্ভবপর নয়। প্রয়োগের দ্বারা আমরা জানতে পারি বিশ্বের প্রসারণ অনেকটা ফুলঝুরির স্ফুলিঙ্গ বাহির হওয়ার মত। পৃথিবীতে যেমন সোজা চলতে থাকলে যেখান থেকে যাত্রা সুরু করা যায় সেখানেই আবার এসে পৌছান যায়, তেমনি চারি-বিস্তার বিশিষ্ট (four dimensional) বক্র বিশ্বে আলোর রশ্মি সরল রেখায় ভ্রমণ করার জন্যে যেখান থেকে যাত্রা ক'রবে সেখানেই এসে পৌছুবে। এইরূপে আমরা বর্ত্তমানের সঙ্গে সঙ্গে ভূতকেও দেখতে সমর্থ হব কেবল আলোর রশ্মি এই দীর্ঘ যাত্রার মাঝে ক্লান্ত হয়ে কিছু নিষ্প্রভ ও কিছু লাল হ'য়ে যাবে। যে-সময়ে বিশ্বের অর্দ্ধব্যাস সবচেয়ে ছোট ছিল ঐ সময়েও আলোকে পুরা পরিভ্রমণ করতে ৬০০০০০০০০০ বর্ষ লাগত এবং প্রতি ১৩০০০০০০০০ বর্ষে বিশ্বের অর্দ্ধব্যাস দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেমনি ব্যাস ১,০০৩ গুণ হয়ে গেল প্রসরণের কারণ আলো বিশ্বের চার দিকে যেতে অসমর্থ হয়ে গেল, এবং ঐ সময়ের পরে যে আলো চলতে সুরু করেছে সে বিশ্বকে কোন দিন পরিক্রম করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, প্রসারণ যখন ১'০৭৩ গুণ হ'য়ে গেল তখন আলোর পক্ষে বিশ্বকে অর্দ্ধেক পরিক্রম করাও অসম্ভব হয়ে গেল। এইরূপে আমাদের এখান থেকে আলো অর্দ্ধেক বিশ্বে পৌছুবে না এবং আমরাও বিশ্বের অনেক কিছুর বিষয়েই অজ্ঞান অন্ধকারে চিরকাল থাকব। তবে আমাদের সামর্থ্যের ভিতর যা জানবার আছে তাই অসীম ও অনন্ত। তাই আমরা কোন দিন জেনে উঠতে পারব কিনা কে বলতে পারে।

বিশ্বের প্রসারণ অথবা অণুর সংকোচন একই পর্য্যায়ে পড়ে। একের বাড়া অন্যের ছোট হওয়ার সমান। যদি কোন বিশ্বব্যাপী প্রাণী (যাই নাম হোক) বিশ্বের সঙ্গে নিজের সত্তা মিলিয়ে রাখে তা'হলে তার শরীর বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকবে। প্রাণী নিজে তা অনুভব করবে না কিন্তু তার কাছে অন্তর-নীহারিকা ব্যবধান অবিচল থাকবে। কিন্তু আমরা সব—জীবজন্তু, গিরি-

কন্দর, তরু, নদী, গ্রহ, উপগ্রহ ও সৌর পরিবার এবং নীহারিকা-মণ্ডলীও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছি মনে হবে। তার কাছে পৃথিবীর কক্ষ দিনের পর দিন ছোট হয়ে যাবে এবং উহার পরিভ্রমণ কাল স্থির আছে ভাবলে ভুল হবে। উহা আপনার দৈর্ঘ্য ও সময়ের ইউনিট এমন ভাবে সামঞ্জস্য করে নেবে যে আলোক গতি অবিচল থাকবে। ঐ মাপে আমাদের আয়ু কমে যাচ্ছে, সময় শীঘ্র শীঘ্র চলে যাচ্ছে, এবং আমাদের অনন্ত বর্ষ মিলে "বিশ্ব-কাল"-এর একটি মাত্র পল হবে। ঐ সময় আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্ব বেড়ে বেড়ে অনন্তে লীন হয়ে যাবে এবং বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে।

দাবী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কি জিঘাংসা, রণোন্মাদ কি অশান্তি ভরেছে ভুবন ?
দুর্নিবার কি আকাঙ্ক্ষা ক্লিষ্ট করে মানবে সদাই ?
সাম্রাজ্য, প্রাচুর্য্য, শৌর্য্য পারে না তা করিতে পূরণ,
বাঞ্ছিত সকলই পেয়ে, মনে হয় কি যেন কি নাই।

২

বিক্ষুব্ধ চলোর্ম্মি সম বিশ্ব মানবের মর্ম্মব্যথা
উচ্ছ্বসি উচ্ছলি ছোটে, সংঘর্ষের নাহি যেন শেষ,
কালের পাষাণ তটে আছাড়ি' আছাড়ি' কুটি' মাথা,
কি যে দাবী—বারবার তোমারে জানায় পরমেশ !

৩

রক্তাপ্লুত সর্ব্বঅঙ্গ, সমস্বরে কহে বিশ্ববাসী,
শরণ, সুহৃদ, ভর্ত্তা, সাক্ষী তুমি চির দিবসের।
মোরা ভাবোন্মাদ প্রভু,—অমৃতের আমরা পিয়াসী,
আকাঙ্ক্ষী নহি কো মোরা রাজত্ব কি প্রভুত্ব, যশের।

৪

ধনে তাহা পাই নাই, অতৃপ্তিতে পূর্ণ ধনেশ্বর,
জয়ে নয়, কাঁদে বীর করায়ত্ত করি বসুন্ধরা।
প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা, প্রীতি দিতে নারে তাহার খবর,
তুলি, ছেনী, লেখনীতে পড়ে নাই পড়িবে না ধরা।

৫

ভৃঙ্গারে অমৃত তুমি দেবতাকে করিলে অমর,
অসুর যে রাহু কেতু—তাহারাও পেলে তার স্বাদ।
সুধা পরিবেশনেতে হ'তে হবে আবার তৎপর,
মানব সন্তান তব—তারা কেন পড়ে রবে বাদ ?

৬

সেই সুধা যে অমৃতে জন্মগত রয়েছে যে ভাগ,
প্রমাণ যাহার পাই প্রতিদিন নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
রক্তস্রোতে মিশে আছে চিরন্তন যার অনুরাগ,
আনন্দেতে কণা যার পাই কভু ইঙ্গিতে আভাসে।

৭

তারি লাগি সব দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও সংগ্রাম,
তাই চায় সুধী, ভক্ত, শিল্পী, বীর, কবি, বৈজ্ঞানিক।
তারি লাগি এ উদ্বেগ, আন্দোলন চলে অবিশ্রাম,
মানব-দানব সম ক্ষিপ্ত প্রায় ছুটে দিগ্বিদিক।

৮

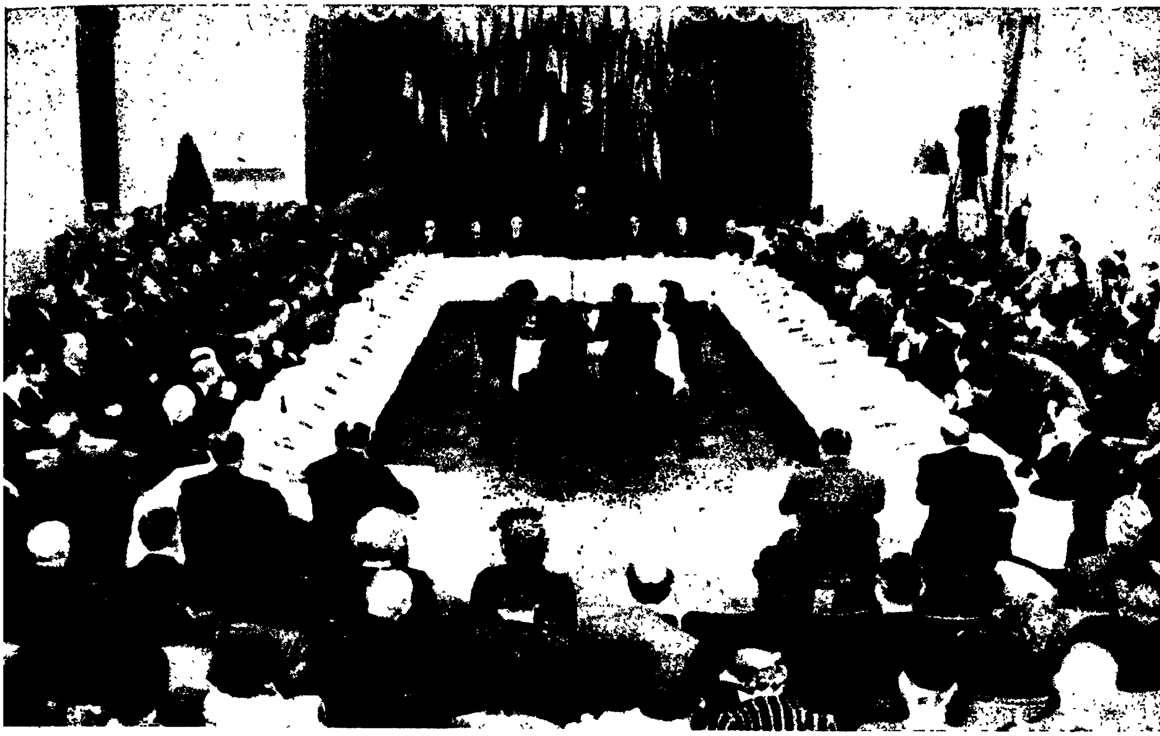
মানব জাতিরে তুমি লহ উচ্চ আরও উচ্চস্তরে,
কর্ম্মে জ্ঞানে, তেজে, প্রেমে কর তারে সম দেবতার
রোপিত পাদপে তব, যেন সেই কল্পফল ধরে,
ঠেকায়ে রেখো না আর অমৃতে তাহার অধিকার।

৯

বিশ্বনাথ, বিশ্বভরি উঠুক তোমার জয়গান,
কবির অমৃত কণ্ঠে নবগীতি হোক উচ্চারিত।
স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, শিল্পে লাগুক সে অমৃতের বান—
ভাষায়, চিন্তায়, কর্ম্মে সুধাধারা হোক উৎসারিত।

১০

মুছে যা'ক হিংসা, দ্বেষ, পশুত্বের গর্ব্ব আস্ফালন,
বেগবতী রক্ততৃষা ঘুচে যা'ক দুষ্ট স্বপ্নবৎ,
দেবত্বের কর যোগ্য—পাতো বুকে তোমার আসন,
হোক রম্য পুণ্যপ্রদ শুচি শান্ত সমগ্র জগৎ।



"সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্য ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমিতি"র (U.N.R.R.A.) বৈঠকে মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আটলান্টিক সিটি' নগরে সমবেত



প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উক্ত বৈঠকের (U.N.R.R.A.) 'দুর্গতি মোচন' চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন



মার্শাল চিয়াং কাই-শেক চীনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর চুংকিঙে গৃহীত চিত্র
মধ্যস্থলে চিয়াং কাই-শেক, পার্শ্বে মাদাম চিয়াং



চীনা বাহিনীর অধ্যক্ষ সান্ লি-জেন এক দল চীনা সামরিক কর্ম্মচারীকে "বাজুকা" হাউই বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষা দিতেছেন। এই ধরণের বন্দুক প্রচুর পরিমাণে আমেরিকা হইতে চীনে সরবরাহ করা হইতেছে

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

রুষ রণক্ষেত্রে দৃশ্যপটের আবার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেখানে দিগন্তবিস্তৃত সমরাঙ্গনে এখন একপক্ষ—অর্থাৎ জার্ম্মানি—চেষ্টা করিতেছে স্থায়ী অটুট ব্যূহ যোজনা করিয়া আত্মরক্ষার, অন্য পক্ষ অর্থাৎ সোভিয়েট চেষ্টা করিতেছে সেই রক্ষাব্যূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কয়েকটি পৃথক্ যুদ্ধ প্রান্তের গঠনে। আত্মরক্ষী দলের স্থাণুযুদ্ধে চালমাৎ আনিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য রুষ সেনাদল এখন কয়েকটি পৃথক্ সেনাদলে বিভক্ত করা হইয়াছে যাহার প্রত্যেকটিতে বিশেষভাবে গঠিত ও শিক্ষিত সেনা তুষারময় রণাঙ্গনে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সাহায্যে শত্রুর আত্মরক্ষা কেন্দ্রগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। রুষ রণক্ষেত্রে এখন দুই দিকেই সেনাব্যূহ রহিয়াছে কিন্তু রুষব্যূহের পিছনে আক্রমণকারী সেনাদল অতর্কিতে একত্র হইয়া শত্রুব্যূহ ছেদনের চেষ্টা বারংবার বিভিন্ন স্থলে করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত একযোগে সমস্ত রণাঙ্গন আক্রান্ত হয় নাই, স্থানে স্থানে বাড়বানলের মত অকস্মাৎ অগ্নিস্ফুরণ প্লাবন, দহন এবং ক্রমে ধূমায়মান যুদ্ধাবসানে পরিশেষ এই মতই হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় এত দিন পর্য্যন্ত যে যুদ্ধশক্তি ও অস্ত্রবল সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ যুদ্ধচালনে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ব্যাপকভাবে জার্ম্মান দলের আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে নাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মানসেনা প্রথমে পিছু হটিয়া পরে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া, রক্ষাব্যূহের পূর্ণ যোজনায় সমর্থ হইয়াছে, প্রথমের প্রচণ্ড আঘাতে তাহাদের যতটা হটিতে হইয়াছে,আশপাশের ঘাঁটিগুলির অল্পবিস্তর স্থানান্তরের ফলে শেষ পর্য্যন্ত সেইখানের কাছাকাছিই নূতন সরল রক্ষাব্যূহ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যেক বারই সোভিয়েট সেনা কিছু কিছু করিয়া দেশোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু জার্ম্মান রক্ষাব্যূহ সাময়িক ভাবে ভিন্ন বিশেষ বিপর্য্যস্ত হয় নাই এবং তাহার মধ্যস্থিত সেনাদলের কোনও বৃহৎ অংশ বেড়াজালে পড়িয়া (স্টালিনগ্রাডে ফন পউলসের জার্ম্মান সেনাদলের ন্যায়) বিনষ্ট হয় নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ আক্রমণে প্রথমের দিকে আক্রান্ত অপেক্ষা আক্রমণকারীদিগেরই ক্ষতি অনেক অধিক, আক্রান্ত দল যদি পরে বেড়াজালে পড়ে তবে তখন তাহাদের ক্ষতি অত্যধিক হয়।

সোভিয়েটের যুদ্ধচালনায় এখন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত সেনাদল দেখা যাইতেছে। এক শ্রেণীর সেনা স্থাণুযুদ্ধে বিপক্ষকে প্রহরীর মত লক্ষ্যমধ্যে রাখিয়া অবিশ্রাম অল্পস্বল্প আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিতেছে এবং তাহাদের পাল্টা আক্রমণ ইত্যাদি ব্যর্থ করিতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য শত্রুর চলাচলের খোঁজ রাখা, তাহার রক্ষাকেন্দ্রগুলি ক্রমাগত গোলাবর্ষণে ধীরে ধীরে নষ্ট করিয়া এবং অবিরাম দিবারাত্র ছোট ছোট সংঘর্ষ চালাইয়া শত্রুকে ক্ষীণবল করা। এই শ্রেণীর সেনাই অবিচ্ছিন্ন রেখায় জার্ম্মান ব্যূহের সম্মুখীন হইয়া স্থাণুযুদ্ধ চালাইতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেনা কয়েকটি বিশেষ বাহিনীতে গঠিত হইয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশই শকট-বাহিত, সঙ্গে অশ্বারোহী এবং তুষারক্ষেত্রে দ্রুতগামী "শী" (Ski) পরিযুক্ত সেনাদলও আছে। ইহারা বিশেষ ভাবে আক্রমণ চালনায় দক্ষ এবং ইহাদের সঙ্গে বিরাট্ বর্ম্মযুক্তবাহিনী এবং মোটর-বাহিত দ্রুতগামী গোলন্দাজবাহিনীও থাকে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহিনীগুলি প্রথম শ্রেণীর পিছনে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। কোনও স্থলে শত্রুসেনা অপসারিত হইয়াছে বা তাহাদের রক্ষাকেন্দ্র অল্পবিস্তর বিধ্বস্ত হইয়াছে কিম্বা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা কিছু শিথিল হইয়াছে এই সংবাদ পাইলেই এইরূপ বাহিনী সেখানে অতর্কিত আক্রমণ প্রচণ্ড তেজে চালনা করে। আক্রমণের গোড়ায় বর্ম্মাবৃতবাহিনী দলবদ্ধভাবে গোলাবর্ষণের আবরণীর পিছনে ছুটিয়া শত্রুব্যূহে বর্শাফলকের ন্যায় বিদ্ধ হয়। এই ফলকগুলি ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুসেনার পিছনে গিয়া ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করে এবং তাহাদের পিছনে পিছনে দ্রুতগামী শকট-বাহিত, অশ্বারোহী এবং "শী"যুক্ত সেনাদল অগ্রসর হইয়া ব্যাপক ভাবে শত্রুদলকে তিন দিক হইতে আক্রমণের চেষ্টা করে। শত্রুপক্ষের তখন একমাত্র উপায় থাকে বর্ম্মাবৃত ফলকগুলিকে নিজেদের বর্ম্মাবৃতবাহিনী দিয়া পাল্টা আক্রমণ করিয়া গতিরোধ করা এবং ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যূহকে পিছাইয়া আনিয়া বেড়াজালের ঘেরার বাহিরে লইয়া আসা এবং সেই সঙ্গে পশ্চাৎ হইতে গচ্ছিত (রিজার্ভ) শক্তিকেন্দ্র হইতে নূতন সেনাদল লইয়া ছিন্ন ব্যূহকে কিছু দূরে পিছনে পুনর্যোজনা করা। এ পর্য্যন্ত যতগুলি স্থলে সোভিয়েট দীর্ঘ প্রসরের উপর ব্যূহচ্ছেদে সমর্থ হইয়াছে, সকল ক্ষেত্রেই

জার্ম্মান দল ঐ ভাবে আত্মরক্ষায় সফলকাম হইতে পারিয়াছে।

সোভিয়েটের এই বিভিন্ন আক্রমণকারী বাহিনীগুলির মধ্যে লেনিনগ্রাড ও বল্টিক কূলের নিকটস্থ "প্রথম বল্টিক সেনাবাহিনী" আছে জেনারেল বাগ্রামিয়ান নামক আর্ম্মানি সেনাধ্যক্ষের চালনায়। ইঁহার আক্রমণবাহিনীতে আছে ১৪টি পদাতিক ডিভিসন, ১টি গোলন্দাজ, ২টি অশ্বারোহী ডিভিসন এবং দুইটি সম্পূর্ণ বর্ম্মাবৃতবাহিনী। ভিটেবস্কের নীচে জেনারেল রকসোভস্কীর চালনায় ইহা অপেক্ষাও বলশালী সৈন্যদল আছে। প্রিপেট জলাভূমির নিকট জেনারেল ভাটুটিন প্রথমে প্রায় ১৫০০০০ সেনায় গঠিত বাহিনী লইয়া আক্রমণ করেন, এখন শুনা যাইতেছে যে ঐ দলের বল বৃদ্ধি করিয়া ৫ লক্ষ সেনার বাহিনীতে গঠিত হইয়াছে। আরও নীচে ডিপার নদের বাঁকে জেনারেল আইভান কোনেভ এতদিন স্থাণু হইয়া বসিয়াছিলেন, সম্প্রতি জেনারেল মালিনোভস্কি এবং টোলবুখিনের বাহিনী-দ্বয়ের যোগে তাঁহার বাহিনীও অগ্রসর হইতেছে। এই সকল যুদ্ধের মধ্যে বাগ্রামিয়ানের বল্টিক বাহিনীকেই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ প্রাকৃতিক অবস্থা এবং অতিদৃঢ় সংরক্ষণ বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া গত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া লড়িতে হইয়াছে। বাগ্রামিয়ান (পুরানাম, আইভান ক্রিষ্টোফোরো-ভিচ বাগ্রামিয়ান) সোভিয়েট সেনানায়কদিগের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধপ্রান্ত ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী চালক যিনি স্লাভজাতীয় নহেন। এই আর্ম্মানী সেনানায়ক রুষ-জার্ম্মান যুদ্ধের আরম্ভকালে কর্ণেল ছিলেন, পাঁচ মাস পরে তিনি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা টিমোসেঙ্কোর যুদ্ধপরিচালনা সংসদের সহকারী অধ্যক্ষ রূপে লেফটেনাণ্ট-জেনারেল পদ লাভ করেন। সেই সময় বিষম পরাজয়ের দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া এই সেনানায়কের শিক্ষা পূর্ণ হয়, যাহার পরিচয় তিনি স্টালিনগ্রাডের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া ১৯৪২-৪৩ সনের শীত অভিযান চালনে দিয়াছিলেন। তাহার পর বিগত বসন্তকালের অভিযানে খারকভের সম্মুখে এবং গ্রীষ্মের শেষে কুর্স্ক নগরীর নিকটে তিনি তাঁহার রণ-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই সকল রুষ রণনায়ক এখন পরস্পরের সংযোগে জার্ম্মান রক্ষী সেনার বিরুদ্ধে ব্যাপক শীত অভিযান গঠনের চেষ্টা চালাইতেছেন। এতদিন কিন্তু এই যুদ্ধ খণ্ড বিভক্ত এবং এক এক অংশে অল্পদিন স্থায়ী হইতেছিল। এতদিন একটি কেন্দ্রে প্রবল যুদ্ধ চালাইয়া সেখানে জার্ম্মান সেনার অন্যত্র গচ্ছিত শক্তি টানিয়া আনিয়া পরে অকস্মাৎ যেখান হইতে সেনা ও অস্ত্রবল স্থানান্তরিত করা হইয়াছে সেই অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া সেখানকার রক্ষীদলকে পরাস্ত করার চেষ্টাই চলিতেছিল। এইরূপে গত ডিসেম্বরে ভিটেবস্ক আক্রান্ত হওয়ার সময় জার্ম্মানদল কিয়েভ অঞ্চল হইতে অনেক রক্ষীবাহিনী সরাইয়া সেখানে লইয়া যওয়ায় কিয়েভ অঞ্চল দুর্ব্বল হয় এবং সেই সুযোগ লইয়া ডিসে-ম্বরের শেষে জেনারেল ভাটুটিন প্রবল বেগে কিয়েভের সম্মুখের জার্ম্মানব্যূহের প্রায় ৫০ মাইল প্রসরের অংশ ছিঁড়িয়া ফেলেন। ১৫০০০০ রুষ সৈন্য ব্যূহভেদে ব্যবহৃত হয় এবং পরে আরও প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য তাহাদের সহায়তার জন্য ধাবিত হয়। ফলে ৫০ মাইল ফাঁকটি ২০০ মাইল চওড়া হয় এবং সোভিয়েট সেনা ১০ দিনে ৬০ মাইল অগ্র-সর হইয়া পোলাণ্ডের সীমান্তে উপস্থিত হয়। যখন এই সমূহ বিপদ ঠেকাইবার জন্য জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর অঞ্চল হইতে সৈন্য ও অস্ত্রবল স্থানান্তরিত করিয়া ভাটুটিনের অগ্রগতি রোধ করিলেন তখন সে অঞ্চলে অস্ত্র ও সৈন্যবল হইল ক্ষীণ এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাঞ্চলে বাগ্রামিয়ানের বাহিনীগুলি প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। তাহার পর সে অঞ্চলে সোভিয়েট সেনার গতি জার্ম্মানদল প্রতিরোধ করিয়া শ্লথ করিয়া আনার সঙ্গে সঙ্গে-এইবারে সুদূর বিস্তৃত যুদ্ধ-প্রান্তের উপর সমস্ত ডিপার নদের বাঁক আক্রান্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাগ্রামিয়ানের অভিযানও পুনর্ব্বার সতেজে চালিত হইতেছে। এক কথায় এতদিনে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ শীত অভিযান ব্যাপক ভাবে চালনা করিতেছেন। এইবার জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষের রক্ষণ ব্যবস্থার প্রকৃত পরীক্ষা হইবে।

জার্ম্মান রণনায়কদিগের মধ্যে ফিল্ড মার্শাল ম্যান-স্টাইনের যুদ্ধকৌশলের পরীক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা বিষম হইতেছে। এই 'যুঙ্কার' জার্ম্মান রণনায়কের যুদ্ধকৌশলের পরিচয় সোভিয়েট সেনা বহু বার পাইয়াছে সুতরাং এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে অবহেলা করার প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। মার্শাল ম্যানস্টাইন রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের প্রথম দিকে ওডেসা এবং সিবাস্টোপোল জয় করেন। স্টালিনগ্রাডের পরাজয়ের পর দক্ষিণ রুশদেশে জার্ম্মানবাহিনীগুলির রক্ষার ভার পড়ে এই ম্যানস্টাইনের উপরে। প্রথমে কাস্পিয়ান সমুদ্রের কূলে জলাভূমিতে ম্যানস্টাইনের সহিত রুশ জেনারেল মালিনোভস্কির (এখন ডিপারের বাঁকে তৃতীয় উক্রাইন যুদ্ধপ্রান্তের রণনায়ক) সংঘর্ষ হয়। প্রথমে মালিনো-ভস্কি প্রচণ্ড আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া হটিয়া যান, পরে অনেক সৈন্য ও অস্ত্রবলের সাহায্যে ম্যানস্টাইনের বাহিনী-গুলিকে হটাইতে সমর্থ হন। কিন্তু ম্যানস্টাইনের বাহিনী-গুলি অশেষ ক্ষতিস্বীকার করিয়াও পরস্পরের এবং অন্য

বাহিনীগুলির সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া জার্মান ব্যূহ অটুট রাখিয়া ৪০০ মাইল পিছাইয়া আসিতে সমর্থ হয়। এই পশ্চাৎ অপসরণে ভ্যাজমা, রেসেভ, খারকভ, বেলগরড, রস্টভ এবং ডনেসের অংশ রুশবাহিনী পুনরধিকার করে। কিন্তু সেই পশ্চাদপসরণের মুখেও ম্যানস্টাইনের বাহিনীগুলি অতর্কিতে মোড় ঘুরিয়া সোভিয়েটের অগ্রগামী বর্ম্মাবৃত বাহিনীগুলিকে আক্রমণ করিয়া বিষম ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া বেলগরড ও খারখভ কাড়িয়া লয়। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েটের বিপুল সমরবাহিনীগুলির সঙ্গে ম্যানস্টাইনের পুনর্ব্বার প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। প্রথমে রুষদল পিছাইতে আরম্ভ করে কিন্তু ক্রমে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং জার্মান কর্ত্তৃপক্ষ ম্যানস্টাইনের বাহিনীগুলির বলক্ষয়ের সম্যক ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না সুতরাং ম্যানস্টাইনকেও আত্মরক্ষার পথ লইতে হয়। তখন ডিনিপার নদের পিছনে আশ্রয় লওয়া ছিল একমাত্র উপায়, কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকটি বিরাট্ সোভিয়েট সমরবাহিনী ম্যানস্টাইনের বাহিনীগুলির দক্ষিণ রুষ অঞ্চলে-স্থিত অংশগুলিকে বেড়াজালে ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ লড়িতে থাকে। রুষবাহিনীগুলির অগ্রগতি রোধের জন্য প্রথমে স্টালিনোতে "সজারু" দুর্গমালা গঠিত হয়। জার্মান বাহিনীগুলি ডন নদের অববাহিকা হইতে চলিয়া আসা পর্য্যন্ত সেখানের দুর্গমালা সোভিয়েট বাহিনীগুলিকে ঠেকাইতে সমর্থ হয়। তাহার পর পোল্টাভায় ঐরূপ দ্বিতীয় সজারু দুর্গমালা গঠন করিয়া ম্যানস্টাইন তাঁহার বাহিনীগুলিকে ডিনিপারের পিছনে আসা পর্য্যন্ত আক্রমণকারি রুষ বাহিনীগুলিকে ঠেকাইতে সমর্থ হন। কিন্তু রুষসেনা তখন ম্যানস্টাইনের বাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে দৃঢ়সংকল্প। এতদিন ম্যানস্টাইনের বাহিনীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও পশ্চাৎপদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের রক্ষাব্যূহ অটুট ছিল এবং ঐ বাহিনী সমষ্টির কোনও ক্ষুদ্রতম অংশও বেড়াজালে পড়ে নাই। রুষ সেনানায়কগণ অতি বিষম ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিস্তৃত প্রসরের উপর বিরাট্ শক্তিতে ব্যূহ আক্রমণ করিলেন। জার্মান রক্ষীদলের ক্ষীণ ও যুদ্ধক্লিষ্ট ব্যূহ বহুগুণ বলগরিষ্ঠ সতেজ সোভিয়েট সেনার আক্রমণে ভাঙিয়া পড়িল। রুষ রণনায়ক ভাটুটিন প্রবল বেগে শত্রুপক্ষের উচ্ছেদ সাধনে অগ্রসর হইলেন। ম্যানস্টাইনের গচ্ছিত সেনার দ্বারা রক্ষণব্যূহের ছিন্ন অংশগুলির মেরামতি সম্ভব হইল না। ঝিটোমির এবং কোরোষ্টেন ভাটুটিনের হস্তগত হইল এবং সমস্ত জার্মান-ব্যূহ বিপন্ন এবং ধ্বংসোন্মুখ হইল। এই অবস্থার মধ্যে ম্যানস্টাইন অতি নৈপুণ্যের সহিত জার্মান বর্ম্মাবৃতবাহিনীর প্রধান অংশ (১৬০০ ট্যাঙ্ক) ঝিটোমিরের পশ্চাৎ দিয়া ঘুরাইয়া ভাটুটিনের বাহিনীসমষ্টির পার্শ্বদেশে হঠাৎ অতি প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইলেন। অগ্রগামী রুষ বাহিনীগুলি বিধ্বস্ত হইয়া ঝিটোমির ছাড়িয়া জলাভূমির উপর দিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল এবং তাহাদের বিষম ক্ষতির ফলে আবার কিছু দিন জার্মান রক্ষাব্যূহ পুনর্গঠনের সময় পাইল। রুষ দল তাহার পর ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছে এবং এইবার ম্যানস্টাইনের রক্ষাব্যূহ উত্তর, মধ্য ভাগ এবং দক্ষিণ, তিন অঞ্চলেই প্রবল ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। রুষসেনা এইবার আক্রমণের ব্যবস্থাও অতি ভয়ানক করিয়াছে। দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত গঠনের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে, শীতের প্রকোপও চরমে উঠিয়াছে, সুতরাং জার্মান রক্ষীদল এখন বিষমতম অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। তবে রুষ সেনানায়কগণকেও অশেষ বাধা-বিঘ্ন, বিশেষতঃ সরবরাহের ও সৈন্য-চলাচলের ব্যবস্থায়, অতিক্রম করিতে হইবে, অপরিসীম ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে এবং চরম রণকুশলী শত্রু সেনানায়কগণের ছল ও বলকে পরাস্ত করিতে হইবে।

ইটালীতে রোম নগরীর জন্য যুদ্ধ ক্রমেই জ্বলিয়া উঠিতেছে, তবে এখানেও জার্মান রক্ষীদল প্রবল বাধা দিতেছে। ইটালীর এই পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলে কোন পক্ষই দ্রুত নিষ্পত্তির আশা রাখে না। পৃথিবীর অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই।

পুস্তক-পরিচয়

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা। ৯৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৮০।

রবীন্দ্র-সাহিত্য অতি বিশাল। কবির সমস্ত রচনার কালক্রম নির্ধারণের চেষ্টা পূর্বে একাধিক বার হয়েছে, কিন্তু কোনও গ্রন্থপঞ্জী পূর্ণাঙ্গ হয় নি। তার কারণ, মধ্য এবং শেষ কালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি যেমন অনেকের কাছে সযত্নে সংগৃহীত আছে, আদ্য গ্রন্থগুলি সেরকম নেই, অনেক রচনা এখন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য। আটষট্টি বৎসরব্যাপী সাহিত্য-জীবনে কবি কবে কি লিখেছিলেন বা প্রকাশ করেছিলেন তা তিনি নিজেও সকল ক্ষেত্রে মনে আনতে পারতেন না। প্রখ্যাত বা বিস্মৃত লেখকদের কীর্তির ইতিহাস সন্ধানে ব্রজেন্দ্রবাবু সিদ্ধহস্ত, 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' তাঁর অসামান্য ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের ফল। যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে কৌতূহলী এবং কবির নানামুখী প্রতিভার কালক্রমিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য বিবরণ চান, তাঁদের পক্ষে এই পুস্তকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যথার্থই লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁহারা অতঃপর গবেষণাদি করিবেন, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।...ব্রজেন্দ্রবাবু সকলের হইয়া এই কঠিন কাজ করিয়া গবেষণার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।"

শ্রীরাজশেখর বসু

ভারতের খনিজ—শ্রীরাজশেখর বসু। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী।

দেশে কি আছে না জানিলে দেশের কি উন্নতি হইতে পারে সে কথা ভাবাই বৃথা। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এখন যে অবস্থার দিকে চলিতেছে তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন এ কথা বলা বাহুল্য এবং সেইজন্যই সাধারণ শিক্ষার মধ্য দিয়া নিজ দেশের সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির এখন বিশেষ প্রয়োজন। রাজশেখরবাবুর পুস্তিকাটি এ দেশের খনিজ সম্বন্ধে সেইরূপ পরিচয় দেওয়ার কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে করিতে পারিবে। প্রথমেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিষয়টি সহজবোধ্য করার জন্য যে ছয়টি সহজ ভাষায় লিখিত প্রকরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পুস্তিকাটির বিশেষ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এত অল্প পরিসরের ভিতর এরূপ দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের এমন সরল ব্যাখ্যা আমরা অন্য কোন ভাষাতেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, হিন্দী বা বাংলাতে দেখি নাই তাহা নিঃসন্দেহ। মূল বিষয়ের বিবৃতি এবং বিচারও অতি সরল ভাবে করা হইয়াছে, বিশেষতঃ বিবরণের মধ্যে ব্যবহারিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ অত্যন্ত মনোগ্রাহী হইয়াছে। অন্যদিকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হিসাবেও এই পুস্তিকার মূল্য কম নহে। বাংলাদেশের প্রত্যেক বিদ্যার্থীর কাছে এই বইটি থাকা উচিত, কেননা ইহাতে কেবল তাহার জ্ঞানবৃদ্ধিই হইবে না, আশা-ভরসাও বাড়িবে।

হিন্দু রসায়নী বিদ্যা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী।

অতীতে আমরা কি ছিলাম এ কথা ভাবিতে গেলে সাধারণ শিক্ষিত লোকে ভারতের স্বর্ণময় যুগের ঋষিমুনি, কবি, শিল্পী ও যোদ্ধাদিগের কথা ভাবে। অতীন্দ্রিয় জগৎ, আকাশপথ, পরলোক, ক্ষাত্রধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ইত্যাদির দিকে আমাদের চিন্তার ধারা কি ভাবে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, কাব্যে, দর্শনে ও ললিতকলায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি অসীম কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন আমরা কেবল সে-সকল কথা ভাবিয়াই গর্ব্ব অনুভব করি এবং সেই সঙ্গেই আমাদের মনে হয় যে এদেশে বাস্তব জগতের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-বিশ্লেষণ বা ব্যবহারিক বিচার-ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের পিতৃগণ হয়ত উদাসীনই ছিলেন বা পাশ্চাত্য জগৎ এবিষয়ে যে দক্ষতা ও পটুত্ব দেখাইয়াছে, এদেশে তাহার অভাব চিরকালই ছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে প্রথমে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করেন। সেই ইতিহাস প্রামাণিক গ্রন্থের রূপে লিখিত হয় এবং দেশ-বিদেশে সুধীজনমধ্যে সেইভাবেই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সেই কারণেই তাহা এ দেশের জনসাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য। কিন্তু দেশের লোকের এখন জানা প্রয়োজন যে বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক বিদ্যা চর্চ্চায় আমাদের কোনও জাতিগত দৌর্ব্বল্য নাই, বরঞ্চ সুদূর অতীতে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ বিজ্ঞানে ও ব্যবহারিক বিদ্যায় জগতে অগ্রণী ছিলেন। আলোচ্য পুস্তিকাটি সেই বিষয়ের প্রচারের জন্য অমূল্য।

ক. চ.

বিজ্ঞানে মুসলমানের দান—এম. আকবর আলি। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর মুসলমান বীরেরা পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যে অভিযান করেন তাহা শুধু ধর্ম্মের অভিযান ছিল না। শিক্ষায়

(পুস্তক-পরিচয়ের শেষ অংশ ৪৬৯ পৃঃ দেখুন)

নগর-দ্বারে অরাতি

কাড়ানাকাড়ায় পড়ল ঘা, বেজে উঠল রণদামামা! শত্রু নগর-প্রাকার ভেঙ্গে ফেলেছে! সংবাদ গেল তৎক্ষণাৎ নগরের শাসন-কেন্দ্রে। সেখানকার আদেশে দেখতে দেখতে নগরের বিস্তৃততর পথ দিয়ে কাতারে কাতারে ছুটল সেনাবাহিনী, সেই সঙ্গে এল যুদ্ধোপকরণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। শত্রুর আক্রমণে নগর-প্রাকার যেখানে ভেঙেছে সেখানেই চলেছে এই অভিযান।

শত্রু প্রাকার ভেঙ্গে প্রবেশ করতে না করতেই সৈনিকেরা এসে তাদের ছেঁকে ধরলে চারি দিক থেকে। তখন নগরের রুদ্ধ জলস্রোতের মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে, দুর্ব্বার স্রোতে শত্রুর দলকে ভাসিয়ে বার করে দেবার জন্যে, তারই ভেতর আরম্ভ হ'ল সংগ্রাম, ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম। মহাবল নগর-রক্ষী সৈনিকদেরও অনেকে তাতে প্রাণ দিলে কিন্তু অসংখ্য বিপক্ষকে বিনাশ না ক'রে নয়। হতাহতে রণস্থল ছেয়ে গেল। মৃতের স্তূপ হয়ে উঠেছে পর্ব্বত-প্রমাণ। এই রাশীকৃত শবের পাহাড়ে বাধা পেয়েই যে পিছনের সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ যথাস্থানে পৌছাতে পারবে না! না সে ভয় নেই। নগর রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত। যেমন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে রণক্ষেত্রে সৈনিক ও যুদ্ধোপকরণ পাঠান হচ্ছে, তেমন সুশৃঙ্খলায় রণক্ষেত্র থেকে শত্রুমিত্র সকলের মৃতদেহ অপসারিত করেছে বাহকেরা। মৃতের জায়গায় নূতন সৈনিক এসে দাঁড়াচ্ছে।

শেষ অরাতি নিপাত না হওয়া পর্য্যন্ত এমনি চল্ল সংগ্রাম। তারপর সৈনিকেরা রণক্ষেত্রের আবর্জ্জনা বয়ে নিয়ে ফিরে গেল। ভগ্ন নগর-প্রাচীর পুনঃনির্ম্মাণের কাজ তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধ করেছিল সৈনিকেরা, এখন নগরের কারুরা লেগেছে কাজে। যত শীঘ্র সম্ভব নগর-প্রাকার তারা আবার সংস্কার ক'রে ফেলবে।

শ্রাবস্তী কি উজ্জয়িনী কিম্বা প্রাচীনকালের আর কোন নগর অবরোধের কাহিনী এ নয়। এ কাহিনী আমাদের নিজেদের। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে মানুষের দেহে। শরীরের ক্ষত-মুখে বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করার সঙ্গে যে ব্যাপার ঘটে এ কাহিনী তার সম্পূর্ণ রূপক মাত্র।

আমাদের দেহ সুশৃঙ্খল, সুরক্ষিত নগরের চেয়ে অনেক বেশী বিস্ময়কর। আততায়ীকে বাধা দেবার ও তাকে পরাস্ত করবার শক্তি ও উপায় তার কল্পনাতীত। শরীরের শত্রু বিনাশে বাইরে থেকে সাহায্য করাও দরকার কিন্তু শরীরের নিজস্ব পদ্ধতি না জেনে অন্য পথে তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা।

আক্রান্ত নগরের সাহায্যে যদি এমন সৈন্যদল পাঠান যায়, যারা শত্রু-মিত্র চেনে না; নির্ব্বিকারে সকলকেই সংহার করে, তাহলে উপকারের বদলে ক্ষতিই করা হয় নিশ্চয়। ক্ষত চিকিৎসায় সাধারণ জীবাণুনাশক ঔষধ অনেকটা এমনি শুধু জীবাণু নয় শরীরের সৈনিকরূপী শ্বেত-রক্ত কণিকাও তার দ্বারা বিনষ্ট হয়, শরীরের তন্তু হয় ধ্বংস।

জীবাণু বিনাশ এবং ক্ষত আরোগ্যের জন্য তাই এমন জিনিস প্রয়োজন যা শরীরের নিজস্ব পদ্ধতিতেই তাকে সাহায্য করবে, গভীর ভাবে যত দূর প্রয়োজন প্রবেশ ক'রে শত্রু ধ্বংসের সঙ্গে শরীরের নিজস্ব রোগজয়ী শক্তিকেই নতুন প্রেরণা দেবে। এ রকম ঔষধ শুধু কল্পনার জিনিস আর নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাকে সম্ভব ও সত্য ক'রে তুলেছে বেঙ্গল ইমিউনিটির **'বাই ফ্লাভিন্টন'**এ।

ইতিহাসের আগে

পাঁচ হাজার বৎসর বা তার চেয়েও আগের মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন নগর 'সুমের' বা 'আক্কড়ে'র কথা যখন শুনি, মিশরের নীল নদীর বন্যাপ্লাবিত দুই তীরে মানুষের সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাই, প্রাচীন সিন্ধুর লুপ্তধারার কোলে, 'মহেঞ্জদারো'র মত ভূ-গর্ভলীন নগর-স্তূপের সন্ধান লাভ করি তখন মানুষের সভ্যতার প্রাচীনত্বের কথা ভেবে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। সেই সুদূর অতীতেও দেখা যায়, বর্ত্তমান নাগরিক জীবনের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্যেরই আভাস আছে। এখনকার মরুভূমি নয়, তখনকার ইউফ্রেটিসের উর্ব্বর উপকূলে নাতিগৌর দ্রাবিড়াত্মক 'সুমের'বাসীরা গৃহ-নির্ম্মাণ থেকে আরম্ভ করে বয়ন পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, মৃৎ-শিল্পে তাদের নিপুণতা সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের নাগাল পেয়েছে, লিপি-চিহ্নের ব্যবহার পর্য্যন্ত তাদের অজ্ঞাত নয়। তাদের লিখনের আধার অবশ্য ছিল স্থূল মাটির টালি মাত্র। কিন্তু সেই মৃৎ-ফলক খোদিত নাতিস্ফূট লিপিই সভ্যতার প্রথম কাহিনী সংগ্রহ করে রেখেছে ভাবী-কালের জন্য।

সে কাহিনীর পুরানত্ব আমাদের বিস্মিত করে বটে, কিন্তু সত্যই আমাদের সভ্যতার বয়স এমন কিছুই নয়। সৌরমণ্ডল বা এই পৃথিবীর কল্পাতীত আয়ুর তুলনায় বলছি না। সৃষ্টি-প্রভাতের ঘন বাষ্পাচ্ছাদিত আকাশের তলায় উষ্ণ, উদ্বেলিত আদি সাগরে, প্রথম যেদিন অপূর্ব্ব ঘটনা-সমাবেশে আদি প্রাণকলিকার আবির্ভাব হয়েছিল, সেই দিনকার অন্তহীন দূরত্ব স্মরণ করেও নয়; জীব-জগতের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে মানুষ যতদিন পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে তারই হিসাবে এ সভ্যতা ক্ষণকালের; মানুষের উদ্বর্ত্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের শেষের কটি লাইনে মাত্র এ সভ্যতার সূচনা দেখা যায়।

পৃথিবীর বর্ত্তমানরূপ ভূতত্ত্বের হিসাবে বেশী দিনের নয়। দুই মেরুর তুষারাবরণ নির্ম্মমভাবে অভিযান করে সমস্ত পৃথিবীকে একাধিকবার মরণ-আলিঙ্গনে বেষ্টন করে ধরেছে। আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবী নাকি শেষ তুষার-আলিঙ্গন থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় নি। প্রথম পৃথিবীর তুষারবেষ্টন অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষই অরণ্য ছেড়ে বেড়িয়েছিল না অরণ্যই মানুষের আদি পূর্ব্বপুরুষকে অসহায় ভাবে ফেলে সরে গেছল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু অরণ্য-আবেষ্টন থেকে মুক্ত আদি মানুষকে নাগরিক-জীবনে প্রবেশ করবার আগে, হাজার নয়, বহু অযুতবর্ষ ধরে যে ভবিষ্যৎ নিয়তির জন্য আর সমস্ত বন্যপ্রাণীর সহচররূপে প্রস্তুত হতে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন-কার অতিকায় গুহা-ভল্লুক আর বিশাল অসি-দন্তী শার্দ্দুলকে এড়িয়ে বিলুপ্তপ্রায় লোমশ হস্তীর বিচরণক্ষেত্রে সে তৃণভোজী পশুপালের পিছু পিছু শিকার করে ফিরেছে। যে পশু-যূথকে সে মৃগয়ার জন্য অনুসরণ করেছে তারাই ক্রমশঃ আশ্রিত হয়ে উঠে তাকে নিশ্চিন্ততার স্বাদের সঙ্গে সভ্যতার প্রথম সুযোগ দেবে একথা তখন কে জানত।

যন্ত্র-বিজ্ঞান-মুখরিত বর্ত্তমানের মধ্যে বাস করে আমরা সে সুদূর অতীতের কথা ভুলতে পারি কিন্তু আমাদের দেহ এখনও তা ভোলে নি। সত্য কথা বলতে কি এখনও এ সভ্যতাকে সে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেনি। আদিম আরণ্য শিকারীর জীবনের ধারার সঙ্গেই এখনও তার সঙ্গতি। সভ্য জীবনের সঙ্গে সেইজন্যে সব সময়ে তার বনিবনাও হয় না। আমাদের বৃহদ্‌যন্ত্রের দীর্ঘতা এমনি ছিল আরণ্যজীবন ও আহার সম্বন্ধে তার অনিশ্চয়তার উপযোগী। সভ্যতার খাদ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে বদলায় নি বলেই, অনেক সময়ে গোলযোগ বাধে, শরীরের আবর্জ্জনা যথারীতি নিষ্কাশিত হয় না, এবং বিবাদ এড়াবার জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় বেঙ্গল ইমিউনিটির **'বাই আগার অয়েল'** ব্যবহার করে।

সংস্কৃতিতে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আরব-পারস্যের মনীষীরা যে সকল নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন এই ভাবে তাহাও পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে বাঙালী জনসাধারণের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। আকবর আলি সাহেব নিজে একজন বৈজ্ঞানিক, তিনি পরিশ্রম সহকারে গবেষণা করিয়া বিজ্ঞান-বিষয়ে ইঁহাদের দান সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে তিনি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত অঙ্কশাস্ত্রে এই সকল মুসলমান সাধকদের কীর্ত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় এই ধরণের পুস্তক এই প্রথম। আকবর আলি সাহেব শুধু কাহিনী-আকারে এই পুস্তক লেখেন নাই। সহজবোধ্য ভাষায় জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্রের নানা দুরূহ তত্ত্ব লইয়া বিশদ আলোচনা করাতে এই পুস্তকের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা আশা করি আলি সাহেব তাঁহার আরব্ধ কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত করিবেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-শব্দ-কোষ - পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই অভিধানখানির ৯৬তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "সোহাগ" এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ৩০৮৪।

ড.

হেমলতা ঠাকুর—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। ৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯২, মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সপ্ততি-বৎসর-পূর্ত্তি উপলক্ষে এই পুস্তকখানি রচিত। লেখক অল্প পরিসরের মধ্যে সহজ ও সরল ভাষায় এই মহীয়সী মহিলার ত্যাগ-পূত কর্ম্মময় জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

লৌহ মুখোস—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

"দি ম্যান্ ইন দি আয়রণ মাস্ক" আলেকজাণ্ডার ডুমার একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। গ্রন্থকার এই উপন্যাসখানির মূল কাহিনীটি কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া স্থানে স্থানে সংক্ষেপ করতঃ অনুবাদ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি সহজ সরল ভাষায় লিখিত। পাঠকালে অনুবাদকে মূল বলিয়া ভ্রম হইবে। ইহাতে ফরাসী জাতির এক বিশিষ্ট যুগের সুন্দর চিত্র পাওয়া যাইবে। চিত্তাকর্ষক গল্পের মধ্য দিয়া বিদেশ ও বিদেশীর সঙ্গে পরিচয়ে এক দিকে যেমন কিশোর-কিশোরীরা আনন্দ পায়, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের চিত্তেরও প্রসারতা লাভ ঘটে। ইহাতে কয়েকটি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। মনোরম প্রচ্ছদপটটি পুস্তকের মূল বিষয়-বস্তুরই দ্যোতক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভাগবত ধর্ম্ম—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸০।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে দ্বৈতমায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া ভাগবতের মধ্যে অদ্বৈতামৃত রসের সন্ধান দিয়াছেন। এই গ্রন্থে আলোচিত নব-যোগীন্দ্র-সংবাদ পাঠ করিয়া পাঠক দেখিতে পাইবেন যে শ্রুতি-প্রতিপাদিত অদ্বৈততত্ত্বই ভাগবতের সার কথা। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

দেশ-বিদেশের কথা

হেমলতা ঠাকুর সপ্ততি-বর্ষ-পূর্ত্তি উৎসব

বিগত মকর-সংক্রান্তি দিবসে কলিকাতায় শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা এবং সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা রূপে হেমলতা ঠাকুর বাংলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিতা। দীর্ঘ সতরো বৎসর যাবৎ সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি নারীজাতির হিতকর নানা কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ১৯৩০ সালে তিনি পুরী বিধবাশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যেও তাঁহার দান সামান্য নহে। ত্রিশ বৎসর যাবৎ গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। তিনি ইউরোপের বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের বধূ এবং পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্যা।

পরলোকে মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ভবানীপুর কাঁসারীপাড়ায় ১৮৭৪, জুলাই মাসে মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা স্বনামধন্য সাহিত্যিক 'ভারতী'র সম্পাদক ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মতিলাল সাউথ সুবার্বাণ স্কুলে ও সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহার শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন মাতুল শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যিনি Dawn Society'র বিশিষ্ট কর্ম্মী ও অধুনালুপ্ত Dawn পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উনিশ বছর বয়সে মতিলাল সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নানা স্কুল কমিটি ও সভাসমিতির পরিচালনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি গত ২৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

আগামী ৯ই এবং ১০ই মার্চ্চ দোলযাত্রার ছুটির মধ্যে দিল্লীতে সাহিত্য সম্মেলনের একবিংশতি বার্ষিক অধিবেশনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। উক্ত অধিবেশনের বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য দিল্লীর ও নয়াদিল্লীর অধিবাসীদের লইয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় সমিতি গঠন করা হইয়াছে। বাণিজ্য-সচিব মাননীয় সর্ মহম্মদ আজিজুল হক্ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ, আই-সি-এস্ প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মূল অধিবেশন ব্যতীত সাহিত্য, সঙ্গীত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং প্রবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধে আরও ছয়টি শাখা-অধিবেশন হইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতনামা বাঙালীগণকে এই সমস্ত শাখা-অধিবেশনে যোগদান করিতে এবং সভাপতি হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীমতী দেবিকা দেবীর কৃতিত্ব

কাশিমবাজারের রাজা কমলারঞ্জন রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী দেবিকা দেবী (বয়স দশ বৎসর) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় সেতার বাজনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।



শ্রীমতী দেবিকা দেবী

১২০।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



প্রতীক্ষমাণা

শ্রীরমলা মৈত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী

কারা-প্রাচীরের অন্তরালে শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধীর জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছে। অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে



শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী

মুক্তিদানের কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু শ্রীমতী কস্তুরবা নিজেই তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। স্বামীর সহিত আজীবন তিনি সহস্র দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, সেই স্বামীকে কারাগারে রাখিয়া আপনার স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব যখন আসিল তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। হাসিমুখে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। পার্লামেণ্টে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট জানাইয়াছেন শ্রীমতী কস্তুরবায়ের ভালর জন্যই তাঁহারা তাঁহাকে মুক্তিদানে অক্ষম। কারা-প্রাচীরের অন্তরালেই গান্ধী-গৃহিণীর মৃত্যু-বরণ শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর ভাল করিবার এই জবরদস্তির তীব্রতম প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদ নিরর্থক নয়; সাধ্বী নারীর এ আত্মত্যাগ ব্যর্থ হইতে পারে না। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার যে কঠোর ব্রতে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, আত্মদানের এই প্রেরণা সে ব্রতকে পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

ভারতীয় নারী-চরিত্রের আদর্শরূপিণী, ত্যাগে ও কর্ম্মে উজ্জ্বল এই মহীয়সী মহিলার আত্মদান দধীচির আত্মদানের তুল্য হইয়া গান্ধীজীকে সতত রক্ষা করুক, ভারতবাসীকে যুগে যুগে প্রেরণা দান করুক, ইহাই কামনা করি।

দুর্ভিক্ষের বজেট

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বজেট পেশ করিয়া অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে ১৯৪৩-৪৪-এ ১১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে, ১৯৪৪-৪৫-এ আনুমানিক ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা আছে। এই ভয়ানক ঘাটতির জন্য একমাত্র দুর্ভিক্ষকে দায়ী করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ইহার প্রধান কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারী অদূরদর্শিতা, অপচয় এবং

অব্যবস্থার জন্যও যে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রীদের দলরক্ষার ব্যয় বিপুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। পুলিসের অকর্মণ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারও ব্যয়ভার বাড়িতেছে। পৃর্য্যাপ্ত ভাতার ব্যবস্থা অব্যাহতই রহিয়াছে। ব্যয়-সঙ্কোচের বিন্দুমাত্র চেষ্টা বজেটের কোন স্থানে দেখা যায় নাই।

গত বৎসর দুর্ভিক্ষের জন্য যে খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব:

খয়রাতি দান ...	৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
টেষ্ট রিলিফ ...	১ „ ২৫ „ „
চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ...	৫৩ „ „
রোগ নিবারণের চেষ্টায় „ „ ...	৪৬ „ „
	মোট ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা
খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের লোকসান ...	৩ „ ৫০ „ „
	মোট ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা

সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ অসাধু লোকের সংখ্যা কম নয়, ইহাদের হাত দিয়া ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার কতটা অংশ বাস্তবিক দুর্ভিক্ষপীড়িতদের কাজে লাগিয়াছে তাহার সঠিক হিসাব পাইবার উপায় নাই, স্বীকার করি। কিন্তু খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের হাত দিয়া যে সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে, তাহার সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য হিসাব অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। আরও বিস্ময়ের কথা, এই সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান দিবার পর আগামী বৎসরের জন্য আরও ৫ কোটি টাকা লোকসান ধরা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী এই বিপুল লোকসানের একটা কারণ দর্শাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ন্যায্য দামে খাদ্যদ্রব্য সকলকে প্রয়োজনানুসারে বণ্টনের জন্য গবর্ন্মেণ্টের হাতে যথেষ্ট ফসল মজুত থাকা দরকার। কাজেই বাধ্য হইয়া ইহার অনেকখানি চড়া দরে কিনিতে হয়। গবর্ন্মেণ্টের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে লোকসান অপরিহার্য্য। অর্থসচিবের এই কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জানা দরকার গবর্ন্মেণ্ট গত বৎসর কাহাদিগকে চাউল বিক্রয় করিয়া সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান দিয়াছেন? দুর্ভিক্ষের তীব্রতা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ট্রোলের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, অর্থাৎ গবর্ন্মেণ্টের কেনা দামের চেয়ে কম দামে চাউল ক্রয়ের সুবিধা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণ পায় নাই। সরকারী খাদ্য-বিতরণ কেন্দ্রের খিচুড়ীতে যে ছটাকখানেক চাউল থাকিত তাহার হিসাব নিশ্চয়ই খয়রাতি দানের মধ্যে ধরা হইয়াছে। আটা এবং বাজরা ক্রয়ে লোকসান হয় নাই বরং মোটা লাভই হইয়াছে ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এ বৎসর গবর্ন্মেণ্ট নিয়ন্ত্রিত দর ১৫ টাকা স্থলে ১৬।০ টাকা দরে রেশনের চাউল বিক্রয় করিয়া মণ প্রতি ১।০ টাকা লাভ রাখিতেছেন। গম, গমজাত দ্রব্য, ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়, চিনি ও লবণ বিক্রয়ে আগামী বৎসর কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না, অর্থসচিব ইহাও স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং আগামী বৎসরই বা ৫ কোটি টাকা লোকসান ধরিয়া রাখা হইতেছে কিসের জন্য?

গত বৎসর এজেন্টদের নিকট হইতে কত চাউল গবর্ন্মেণ্ট কি দরে ক্রয় করিয়াছেন এবং উহাতে এজেন্ট-দিগকে কি পরিমাণে লাভ রাখিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। প্রধান এজেন্ট ইস্পাহানী কোম্পানীর হিসাব নিষ্কলুষ, মিঃ সুরাবর্দ্দী ইহা তো ঘোষণা করিয়াই রাখিয়াছেন।

অর্থসচিবের বক্তৃতার একটি অংশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার। তিনি বলিয়াছেন, "বাস্তবিক গবর্ন্মেণ্টের লোকসানের দ্বারাই তাঁহাদের কার্য্যের সাফল্যের পরিমাণ বুঝা যায়।" সরকারের সাফল্যের এই নূতন সংজ্ঞা শুনিয়া তাঁহাদের প্রধান সমর্থক সিদ্দিকী ইস্পাহানী হেনড়ি প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা আনন্দিত হইয়াছিলেন কিনা প্রকাশ নাই, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্যও করেন নাই। তবে দেশবাসী ইহাতে স্তম্ভিত হইবে সন্দেহ নাই।

অর্থসচিব ক্ষতির যে হিসাব দিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ নহে। গুদামজাত মালের পরিমাণ হ্রাস, খারাপ মাল ও অবিক্রেয় মাল বাবদ আরও ক্ষতি হইবে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন।

এই বিপুল লোকসান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া আবশ্যক। সিভিল সাপ্লাই বিভাগের উচ্চপদস্থ অনেক কর্ম্মচারীকে লোকে অসাধু এবং ঘুষখোর বলিয়া মনে করে। এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অনেক অভিযোগ হইয়াছে এবং কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও এইরূপ প্রবল জনশ্রুতি আছে বলিয়া এক মামলার সময় বলিয়াছিলেন। গবর্ন্মেণ্টের নিজের সুনাম রক্ষার জন্যই আনুপূর্বিক সমস্ত হিসাব প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। জনসাধারণের তরফ হইতেও এ সম্বন্ধে তদন্তের দাবী যতখানি প্রবল হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। যুদ্ধের দোহাই দিয়া তদন্ত বন্ধ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। পার্ল

হারবারে জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে তদন্ত হইয়াছে এবং হারবারের ভারপ্রাপ্ত রিয়ার এডমিরাল কিমেল এবং লেফ্‌টেনাণ্ট-জেনারেল শর্টকে কোর্ট মার্শাল করা হইবে স্থির হইয়াছে। কোর্ট মার্শালের তারিখ পিছানো হইতেছিল বলিয়া নৌ-সচিব কর্ণেল নক্স এবং সমর-সচিব মিঃ ষ্টিমসনের বিরুদ্ধে সিনেটে অভিযোগ আনিয়া সিনেটর ক্লার্ক দাবী করেন যে অবিলম্বে কোর্ট মার্শালের বন্দোবস্ত না করিলে নৌ- এবং সমর-সচিবকে কর্ত্তব্যে গুরুতর অবহেলার অভিযোগে ইমপীচ করা হউক। সিনেটর ক্লার্কের প্রস্তাবানুসারে সিনেট কোর্ট মার্শালের জন্য ছয় মাস সময় দিয়াছেন। পার্ল হারবারের ঘটনার তদন্ত এবং তাহার বিচার যদি যুদ্ধের মধ্যেই হইতে পারে, তাহা হইলে বাংলার সিভিল সাপ্লাই বিভাগের দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের কোটি কোটি টাকা অপচয় হইতেছে কি না সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না।

—

সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি

১৯৪২-৪৩-এ সিভিল সাপ্লাই বিভাগ পরিচালনার ব্যয় হইয়াছিল ৪ লক্ষ টাকা, গত বৎসর উহা বাড়িয়া ১ কোটি টাকা হইয়াছে এবং আগামী বৎসর উহার জন্য ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। এই বিরাট্ ব্যয়বৃদ্ধি একেবারে অনাবশ্যক। সরকারী দোকানের সংখ্যা না বাড়াইয়া রেশন বিক্রয়ের জন্য অধিকসংখ্যক সাধারণ মুদী দোকানকে লাইসেন্স দিলে খরচ অনেক কমিয়া যাইত। বোম্বাইয়ে তাহাই করা হইয়াছে। বাংলা-সরকার বরাবর মুদী দোকানকে লাইসেন্স দেওয়ার বিরোধিতা করিয়াছেন এবং সরকারী দোকানের সংখ্যা যত দূর সম্ভব বাড়াইতে চাহিয়াছেন। অবশেষে কতকগুলি দোকানকে লাইসেন্স দিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে। মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আশ্রিত প্রতিপালনের প্রয়োজন থাকা আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু দরিদ্র করদাতাদের স্কন্ধে তাহার ব্যয়ভার চাপাইবার চেষ্টা অপরিসীম নির্লজ্জতার পরিচয়।

—

পাকিস্থান সম্বন্ধে মিঃ জিন্না এবং সৈয়দ আবদুল লতিফ

নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতার নিকট মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ইচ্ছা আন্তরিক হইলে তাঁহাদের পক্ষে ভারতবর্ষকে দুইটি সার্ব্বভৌম জাতিতে বিভক্ত করিয়া একটি নূতন শাসন-বিধি প্রণয়ন করা উচিত। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের এই ইচ্ছা ঘোষিত হইবার তিন মাসের মধ্যে কংগ্রেস এবং হিন্দু উভয়েই তাহা মানিয়া লইবে।" পাকিস্থান সম্বন্ধে তিনি বলেন যে নূতন শাসন-বিধি অনুসারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব ব্রিটিশের হস্তেই থাকিবে।

পাকিস্থানের আবিষ্কর্তা সৈয়দ আবদুল লতিফ মিঃ জিন্নার উপরোক্ত মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, "মুসলিম লীগের সভাপতি মুসলমানদের কোথায় ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছেন তাহা কি তাহারা আজও বুঝিবে না? আমি গোড়া হইতেই জানিতাম, মিঃ জিন্নার মুখে পাকিস্থানের দাবিতে আন্তরিকতার লেশমাত্র নাই। তিনি যে পাকিস্থান চান, রাজাহীন দেশী রাজ্য অথবা বড়জোর প্রটেক্টোরেট অপেক্ষা তাহার ক্ষমতা বেশী হইবে না। কালক্রমে উহা বর্তমান মিশরের ন্যায় নামে স্বাধীন কিন্তু কার্য্যে ব্রিটিশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল দেশে পরিণত হইতে পারে এই পর্য্যন্ত। করাচীতে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ এ দেশ ভাগ করিয়া দিয়া সরিয়া যাক্। কিন্তু এখন তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার অর্থ এই যে, তাহারা ভারতবর্ষ বিভক্ত করিয়া আরও আরামে জাঁকিয়া বসুক। হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানের সশস্ত্র সৈন্য এবং বৈদেশিক সম্পর্ক সমস্ত তাহাদেরই হাতে থাকুক। ব্রিটেন বার বার বলিয়াছে, ক্রিপ্‌স প্রস্তাব খোলা আছে; এই প্রস্তাবে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের এবং উহার কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিলে তাহারও পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ব্রিটেনের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে; যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে আপোষ করিয়া এই সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা না করিয়া মিঃ জিন্না ভারতের স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের নামে বলিতেছেন: 'না মহাশয়, ধন্যবাদ, আমরা আপনার বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া থাকিবার অধিকার পাইলেই সুখী হইব।' মুসলিম লীগের সাধারণ সদস্যেরা কি ইহা সমর্থন করিবে?"

মিঃ জিন্নার পরস্পরবিরোধী উক্তি নূতন নয়। পাকিস্থান সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অস্পষ্ট ইহাও সুবিদিত। একবার ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া দিলে কংগ্রেস এবং হিন্দু সমাজ তিন মাসের মধ্যে ভারত-বিভাগ মানিয়া লইবে, এই উক্তির দ্বারা কংগ্রেস ও হিন্দুর উপর কুৎসিত কটাক্ষপাত যিনি করিতে পারেন তাঁহার কূটবুদ্ধির

আবিলতাও সহজেই ধরা পড়ে। মুসলমান সমাজেও এই ব্যক্তির আন্তরিকতার অভাব বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি মুসলিম লীগ ইঁহাকেই বার বার কেন সভাপতি পদে বরণ করিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য।

—

বাংলার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী খাজা সর্ নাজিমুদ্দীন বলেন যে নিম্নলিখিত ১৬ খানি সংবাদপত্র সাময়িক পত্র ও ছাপাখানার উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে :—(১) অমৃতবাজার পত্রিকা (প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করাইবার আদেশ) ; (২) আনন্দ-বাজার পত্রিকা (সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত) ; (৩) আজাদ (জামানত তলব, সাময়িকভাবে বন্ধ ও ১৯৪২ সালের ৩রা অক্টোবরের সংখ্যা বাজেয়াপ্ত), (৪) ভারত (সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত), (৫) দৈনিক বসুমতী—(সম্পাদক মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত, সাময়িকভাবে বন্ধ, ১৯৪১ সালের ২৩শে মার্চ্চের সংখ্যা বাজেয়াপ্ত) ; (৬) ইত্তিহাদ (প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করাইবার আদেশ) ; (৭) জয়শ্রী (জামানত বাজেয়াপ্ত) ; (৮) নবযুগ (সাময়িকভাবে বন্ধ, সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত) ; (৯) ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (সাময়িকভাবে দুই বার বন্ধ, ১৯৪১ সালের ২০শে এপ্রিল ও ৫ই নবেম্বরের সংখ্যা বাজেয়াপ্ত) ; (১০) মহম্মদী প্রেস (জামানত তলব) ; (১১) নিউ সারদা প্রেস (জামানত তলব) ; (১২) শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস (কীপার অভিযুক্ত) ; (১৩) বীর ভারত (প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করাইবার আদেশ) ; (১৪) শক্তি প্রেস (প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করাইবার আদেশ) ; (১৫) বিশ্বমিত্র (সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত) এবং (১৬) যুগান্তর সাময়িকভাবে বন্ধ এবং ১৯৪২ সালের ২১শে এপ্রিলের সংখ্যা বাজেয়াপ্ত।

এই তালিকা অসম্পূর্ণ। ১৯৪২-এর আগষ্ট মাসে একটি দৈনিকের আপিসে তালাবদ্ধ করিয়া উহার প্রকাশ বন্ধ করা হইয়াছিল। তালাবদ্ধ করিবার সময় অফিসের বহু-সংখ্যক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সর্ নাজিমুদ্দীন এই তথ্য প্রকাশ করেন নাই।

সর্ নাজিমুদ্দীনের উত্তরে বাংলা দেশের প্রেস এডভাই-সরী কমিটির অসহায় অবস্থাও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি জানাইয়াছেন, মোট ১৬ বার প্রাদেশিক প্রেস এডভাইসরী কমীটির সহিত পরামর্শ না করিয়া তিন বার কমীটির সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া এবং তিন বার কমীটির সুপারিশ অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

—

কাঁথি ও তমলুকে ১৯৩টি কংগ্রেস ভবন ও ক্যাম্প ভস্মীভূত

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীন বলেন যে, ১৯৪২ সালের ঝঞ্ঝাবাত্যার পূর্ব্বে এবং পরে তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায় সরকারের লোকজন ১৯৩টি কংগ্রেস ভবন ও ক্যাম্প পোড়াইয়া দিয়াছে। এই সময় 'কংগ্রেসীরা' ৮১টি থানা, অফিস, সরকারী বাড়ীঘর প্রভৃতি পোড়াইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী জানান যে সরকারী অফিসারদের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি 'কংগ্রেসীরা বাড়ীঘর পোড়াইয়াছে' এই উক্তি করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে কাঁথি এবং তমলুক মহকুমায় যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তিসহ স্থানীয় অধিবাসীদের বহু কাঁচা ও পাকা বাসভবন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিনা—মেদিনীপুরের জনৈক সদস্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল এই প্রশ্ন করিলে প্রধান মন্ত্রী তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থাৎ সরকারের লোকজন শুধু 'কংগ্রেস ভবন ও ক্যাম্প' পোড়াইয়াই নিরস্ত হয় নাই, স্থানীয় অধিবাসীদের অস্থাবর সম্পত্তি সমেত বহু বাসভবনও তাহারা জ্বালাইয়া দিয়াছে।

সরকারের লোকজন যেরূপ ব্যাপকভাবে অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে সে বিষয়ে তদন্ত করিতে সরকার প্রস্তুত আছেন কিনা—এই প্রশ্ন উঠিলে সর্ নাজিমুদ্দীন ক্রুদ্ধ হন। উত্তরে তিনি বলেন :

"আমি পুনরায় এ বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই যে, আমার মতে তখন যে মন্ত্রিসভা গদীতে ছিল এতৎ-সম্পর্কে সাধ্যানুযায়ী করা তাহাদের উচিত ছিল। আঠার মাস পরে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে তদন্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সময়ে যে মন্ত্রিসভা বহাল ছিল তাহারা যদি কর্ত্তব্য না করিয়া থাকে তবে উহার জন্য তাহারাই দায়ী। আর যে-সকল লোক তাহাদের সমর্থন করিয়াছিলেন তাহারা যদি তখন সেই গবর্মেণ্টকে সহ্য করিয়া থাকেন তবে এখন আর তাহাদের কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। পরিষদের সদস্যগণ যখন কর্ত্তব্যে অবহেলা করার জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিতে অথবা তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই তখন তাঁহাদের পরবর্ত্তী গবর্ন্মেণ্টের উপর দোষ চাপান যায় না।"

মেদিনীপুরের অত্যাচার হক্‌সাহেবের আমলে হইয়া

থাকিলেও উহার উপর মন্ত্রীদের হাত ছিল কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। জনসাধারণের বিশ্বাস, এই তাণ্ডবলীলা মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটটির নেতৃত্বে ঘটিয়াছে এবং এই কার্য্যের প্রধান দায়িত্ব তাহার এবং তাহার সহকর্মী ও সমর্থক অন্যান্য সিভিলিয়ান ও পুলিস কর্মচারীর। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই ব্যাপারের তদন্তের দাবী উঠিলে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক উহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। সর্ জন হার্ব্বার্টের বিরোধিতার ফলেই এই তদন্ত সম্ভবপর হয় নাই। সর্ জন হার্ব্বার্টের চক্রান্তে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইলে তাঁহারা তদন্তের নামই করেন নাই। তদন্ত না করিবার দায়িত্ব পূর্ববর্তী মন্ত্রিমণ্ডলের স্কন্ধে চাপাইবার যে চেষ্টা সর্ নাজিমুদ্দীন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের দুর্ব্বলতাই বেশী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

—

লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। নূতন বড়লাটের আগমনে লর্ড লিনলিথগোর অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি পরিত্যক্ত হইবে এবং বর্ত্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানের সূচনা দেখা দিবে, এ আশা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন। ক্রিপস্ প্রস্তাবের নড়চড় হইবে না এবং 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব প্রত্যাহার না করিলে কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে মুক্তি দান করা হইবে না—ইহা ঘোষণা করিয়া নূতন বড়লাট বুঝাইয়া দিয়াছেন ভারতবর্ষের জনমতের মূল্য স্বীকারে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট এখনও অনিচ্ছুক এবং কথায় কথায় লর্ড এলেনবির দৃষ্টান্ত দিলেও এই রাষ্ট্রনায়কের দৃঢ়চিত্ততা ভাইকাউণ্ট ওয়াভেলের নাই, মিশর সম্বন্ধে এলেনবি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টকে স্বমতে আনয়ন করিতে যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ওয়াভেল তাহাতে অক্ষম। তাঁহার প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতায় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের চিরপুরাতন মামুলী উক্তি এবং যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। "আমরা ভারতে যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নতি প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার হাতে ভারতকে অর্পণ করিতে আমরা ন্যায়বিচার, আত্মসম্মান এবং উন্নতির দিক হইতে বাধ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে আমাদের কিছু ঝুঁকি লইতে হইবে।" এই উক্তিতে বড়লাটের সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে সর্ত্ত তিনি আরোপ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ়তার অভাবই ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার সর্ত্ত এই—"কিন্তু যে পর্য্যন্ত না দুইটি প্রধান দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা না হইতেছে সে পর্য্যন্ত শীঘ্র কোনরূপ আশার লক্ষণ দেখিতেছি না।" কথাটা বহু পুরাতন, মিঃ আমেরী ভারত-সচিবের গদীতে আসীন হইবার পর সম্ভবতঃ সহস্র বার ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, দুইটি প্রধান দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হইবামাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিপ্রায় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াই রাখিয়াছেন, ইহাতে ঝুঁকির প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

ক্রিপস্ প্রস্তাব সম্বন্ধে বড়লাট বলিয়াছেন: "প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ক্রিপ্স পরিকল্পনা ঘোষিত হয় এবং পৃথিবীর ও কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ভারতবর্ষের হাতেই থাকিবে—ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের এই প্রতিশ্রুতি হিসাবে উক্ত ক্রিপ্স প্রস্তাব আজও অব্যাহত আছে। ক্রিপ্স প্রস্তাবে ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দানেরই কথা ছিল এবং তাহাকে তাহার নিজের শাসনতন্ত্র রচনারও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিত।"

ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য কোন রাজনৈতিক দলই ক্রিপ্স প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয় নাই। সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাঃ জয়াকর প্রমুখ উদারনৈতিক নেতারাও ক্রিপ্স প্রস্তাব সম্বন্ধে উৎসাহিত হইতে পারেন নাই। প্রস্তাবটিতে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে, ইহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত অভিমত। ইহাকেই ভারতবর্ষের চরম রাজনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভারতবাসীর সমর্থন লাভের আশা দুরাশামাত্র।

—

কংগ্রেস নেতৃবর্গকে মুক্তিদানে বড়লাটের অসম্মতি

বন্দী কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তিদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বড়লাট বলিয়াছেন, "বন্দী নেতাদের দিক হইতে সহযোগিতার আগ্রহের কোন লক্ষণ দেখা না গেলে তাঁহাদের মুক্তির দাবী করিয়া কোন লাভ নাই। যে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ও যে নীতি অবলম্বনের ফলে মর্ম্মান্তিক ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিতে এবং আসন্ন গুরুতর কর্ত্তব্যে সহযোগিতা করিবার সিদ্ধান্ত করিতে কোন বন্দী-নেতার সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন থাকিতে পারে না।"

তাঁহাদের সহযোগিতা তিনি কামনা করিয়াছেন কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে ক্রিপ্‌স প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়াই সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু সকলের পূর্বে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইবে। বড়লাটের বক্তব্য এই :—"একটি শক্তিশালী দল দূরে সরিয়া আছেন। তাঁহারা কতখানি যোগ্য এবং উচ্চমনা তাহা আমার জানা আছে। কিন্তু আমি তাঁহাদের বর্তমান নিষ্ফল ও অবাস্তব নীতি ও কার্যক্রমকে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি। তবে ভারতের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্যাসমূহের সমাধানে আমি এই দলটির সহযোগিতা কামনা করি।

"যদি ইহার দলপতিগণ মনে করেন যে, তাঁহারা বর্তমান ভারত গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন না, তথাপি ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যাসমূহ বিবেচনার ব্যাপারে তাঁহারা সহায়তা করিতে পারেন। তবুও ১৯৪২ সালে ৮ই আগষ্টের ঘোষণার জন্য দায়ী নেতৃবর্গকে আমি সেই অসহযোগিতার এবং বাধাদানের নীতি সন্তোষজনকভাবে প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দিতে পারি না। অবশ্য আমি তাঁহাদিগকে 'অঙ্গে ভস্ম মাখিয়া এবং দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ঐ নীতি প্রত্যাহার করিতে বলিতেছি না, কারণ তাহাতে কোন পক্ষই লাভবান হয় না—উহা ভুল এবং নিষ্ফল নীতি স্বীকার করিয়াই প্রত্যাহার করিতে হইবে।"

৮ই আগষ্ট নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। ইহার পরে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়, তাহা মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অথবা নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দেশে বা পরিচালনাধীনে ঘটে নাই, দেশবাসী ইহা জানে ও বিশ্বাস করে। সম্প্রতি ওয়ার্কিং কমীটির সদস্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মুক্তিলাভের পর ইহা পরিষ্কার করিয়াই জানাইয়াছেন। ভারত-সরকার কর্তৃক আন্দোলনের দায়িত্ব কংগ্রেস এবং গান্ধীজীর স্কন্ধে চাপাইবার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছিল তাহাকে দেশে অথবা বিদেশে সরকারী ধামাধরার দল ভিন্ন আর কেহই নিঃসন্দিগ্ধ প্রমানরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। টটেনহামের নামে প্রকাশিত ভারত-সরকারের বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ একতরফা, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে উহার জবাব দিবার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয় নাই, অধিকন্তু গান্ধীজী স্বয়ং কতকগুলি মারাত্মক অভিযোগের উত্তর দিয়া শ্রীমতী মীরা বেনকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা পর্য্যন্ত আটক করা হইয়াছিল, এরূপ কথাও কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে বলা হইয়াছিল। এই পত্রখানি আটক না করিলে উহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং ইহাতে টটেনহাম পুস্তিকা প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। টটেনহাম পুস্তিকায় বর্ণিত অভিযোগগুলি যে প্রমাণ নহে, একতরফা অভিযোগ মাত্র, অ-কংগ্রেসী উদারনৈতিক এবং আইন-জ্ঞানে সুপণ্ডিত সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু পর্য্যন্ত তাহা কিঞ্চিৎ তীব্র ভাষাতেই বলিয়াছিলেন। সরকারী অভিযোগগুলিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া কংগ্রেসের উপর আন্দোলনের দায়িত্ব চাপাইতে লর্ড ওয়াভেলের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

'ভারত ছাড়' দাবীকে লর্ড ওয়াভেল ভুল এবং নিষ্ফল নীতি বলিয়াছেন অথচ তিনিই দেখাইতেছেন ক্রিপ্‌স-প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত তাহার সম্পর্ক ইচ্ছা করিলে ছিন্ন করিতে পারিত। বড়লাটের সাফ কথা, 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হইলে নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইবে না। নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আজও দেখান নাই এবং এরূপ কোন সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

ভারতের অখণ্ডতা সম্বন্ধে বড়লাট

মিঃ জিন্নার পাকিস্থানের দাবী সম্বন্ধে আমেরী বা লিনলিথগো যেখানে আবছা উক্তির অন্তরালে দুই দিক বাঁচাইয়া চলিয়াছেন, লর্ড ওয়াভেল তাঁহার বক্তৃতায় সেই বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় খোলাখুলি বলিয়া দিয়াছেন। ভারতীয় ঐক্যের প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই : "ভৌগোলিক অবস্থানকে উল্টান যায় না। দেশরক্ষার দিক হইতে, বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগের দিক হইতে এবং বহু আভ্যন্তরীণ ও বহির্জাগতিক অর্থনৈতিক প্রশ্ন বিবেচনায় ভারতবর্ষ স্বভাবতঃই একটি অখণ্ড দেশ। এখন সেই অখণ্ড দেশের মধ্যে বসবাস এবং উহার সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধাসমূহের সদ্ব্যবহারের জন্য ভারতের প্রধান দুইটি সম্প্রদায় ও অপরাপর কয়েকটি সংখ্যাল্প সম্প্রদায় এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে যে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা ভারতবর্ষের লোকদের নিজেদেরই স্থির করিয়া লইতে হইবে।" বড়লাট ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, ইহাদের প্রত্যেকটি দেশ নিজ নিজ দেশের মধ্যে থাকিয়াই তাহাদের জাতি ও সম্প্রদায়গত সমস্যার সমাধান করিয়াছে। "ভারতবর্ষের সম্মুখে এই সকল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এখন কোন্ দেশের

তাহার পক্ষে সর্বাধিক অনুসরণীয় তাহা স্থির করিয়া লইবার দায়িত্ব ভারতবাসীদেরই। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানকে কেহই উল্টাইতে পারে না।'

সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ক্ষেত্রে মিঃ জিন্নার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়াই হয়ত লর্ড ওয়াভেল এই সুস্পষ্ট উক্তি করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে মিঃ জিন্নার প্রভাব কত কম, গত কয়েক বৎসরে তাহা দেখা গিয়াছে। বড়লাটের শাসন-পরিষদে আসন গ্রহণের অপরাধে স্যর্ সুলতান আহমদ লীগ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, অথচ ইহার বৎসর দুয়েক পরে ঐ পরিষদেই যোগদানের পর স্যর্ আজিজুল হক লীগ-মহলে সম্বর্দ্ধিতই হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি 'শাস্তিমূলক বিধি' অবলম্বনে জিন্নাসাহেব আর অগ্রণী হন নাই। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অসহযোগিতার প্রস্তাব মুসলিম লীগ অধিবেশনে গৃহীত হইলেও প্রদেশে, বিশেষতঃ বাংলা ও আসামের লীগমন্ত্রি-গণকে শুধু যুদ্ধে সহযোগিতা নয়, যুদ্ধে সাহায্যের নামে তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে সিভিলিয়ান তন্ত্রের তাঁবেদারি করিতে দেখিয়াও মিঃ জিন্না নীরব। বড়লাটের গদীতে আসীন হইয়া লর্ড ওয়াভেল অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়া লইয়াছেন, ভারতের অখণ্ডতা ঘোষণা তাহারই পরিচয়।

নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘ

নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘের বাংলা শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীললিতচন্দ্র দাস ও প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে যে সকল প্রশ্নোত্তর হইয়াছে, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। নিঃ ভাঃ চরকা সঙ্ঘের কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিবার এবং উহার সম্পত্ত্যাদি অধিকার করা সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা প্রশ্নোত্তরকালে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা হয় নাই। প্রকৃত ঘটনা এই—১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে পুলিস ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী জোর করিয়া কলিকাতা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, খুলনা, মালদহ, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় নিঃ ভাঃ চরকা সঙ্ঘে ২৮টি খাদি কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেয় এবং তখন হইতেই তিনটি বাদে অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলি সরকারী অধিকারে রহিয়াছে। কয়েক মাস পরে সরকার কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ১৯০৮ সালের সংশোধিত ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুযায়ী কয়েকটি কেন্দ্র বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কয়েকটি কেন্দ্র বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে ব্যবহার করা হয় বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৬টি কেন্দ্র বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। ১১টি কেন্দ্র সম্পর্কে সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানান যে, উক্ত কেন্দ্রগুলির দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করণের বিরুদ্ধে কাহারও দাবী জানাইবার থাকিলে, তিনি তাহা করিতে পারেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী নিঃ ভাঃ চরকা সঙ্ঘের ট্রাষ্টি বোর্ডের অস্থায়ী সভাপতি যথারীতি তাঁহার দাবী পেশ করেন। এইরূপ দুইটি দাবী সম্পর্কে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রাষ্টিদের বক্তব্য শুনিবার পর সোনামুখী এবং বিহারজরিয়া কেন্দ্রের সম্পত্ত্যাদি ট্রাষ্টিদের প্রত্যর্পণ করিবার নির্দেশ দেন। কলিকাতার পুলিস কমিশনার এবং সিউরীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রাষ্টিদের দাবী বাতিল করিয়া দেন এবং পুলিস কমিশনার ঐ বিষয় মীমাংসার জন্য কলিকাতার ছোট আদালতের চীফ জজের নিকট প্রেরণ করেন। এই মামলা এখন বিচারাধীন রহিয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সরকার যে ২৮টি কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেন, তাহার মধ্যে মাত্র ১৬টি কেন্দ্র বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ১২টি সম্পর্কে সরকার এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। পুলিস পাহারা থাকা সত্ত্বেও একটি কেন্দ্রে চুরি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ১১টি কেন্দ্রে কোন পুলিস পাহারার ব্যবস্থা না রাখিয়া উহার দ্রব্যাদি চোরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। চরকা সঙ্ঘের প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি সরকারী হেফাজতে রহিয়াছে। নিম্নে আমি সঙ্ঘের ১৯৪১-৪২ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। উহার দ্বারা দেখা যাইবে বাংলা দেশে খাদির কার্য্য কিভাবে চলিত এবং পল্লী পুনর্গঠনে উহা কি ভাবে সাহায্য করিতে পারিত :—(১) বাংলা দেশে মোট উৎপন্ন খাদির মূল্য—৬১৩১১৮৲ টাকা ; (২) মোট খাদি বিক্রয়ের পরিমাণ—৫৬৪০৫৫৲ টাকা ; (৩) কাটুনীর সংখ্যা —১৫৭২৬ জন (তন্মধ্যে ১২৪৯৮ জন মুসলমান) ; (৪) চরকা সঙ্ঘের অধীনে তাঁতির সংখ্যা—৬৯৯ জন ; (৫) কাটুনীদের প্রদত্ত বেতনের পরিমাণ—৮৫০৪৪৲ টাকা ; (৬) তাঁতিদের প্রদত্ত বেতনের পরিমাণ—৪৮৯৩৬৲ টাকা।

বস্ত্রের এই মহার্ঘ্যতা ও দুর্মূল্যতার দিনে নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘের খাদি কেন্দ্রগুলি বস্ত্র সরবরাহ করিতেছিল ; ঐ সঙ্গে প্রায় সতর হাজার লোকেরও অন্নসংস্থান হইতেছিল। কংগ্রেসের বোম্বাই প্রস্তাবের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত বাংলা-সরকার এই সব কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, আন্দোলন থামিয়া যাওয়ার পরও উহাদিগের স্বাভাবিক কার্য্যকলাপ চলিতে দিতে তাঁহারা সাহসী হন নাই। কোন সুশৃঙ্খল গবর্মেণ্টের পক্ষে এরূপ অনাবশ্যক এবং দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ক শোভন নহে। দুর্ভিক্ষে বিপর্য্যস্ত বাংলায় স্বাভাবিক জীবন ফিরাইয়া আনিবার সরকারী ইচ্ছা আন্তরিক হইলে তাঁহারা অনায়াসে এই চরকা কেন্দ্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়া উহাদের সাহায্য লইতে পারিতেন।

পাটে অন্যায় ব্যবস্থা

বাংলা-সরকার সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন এবারের পাটচাষ ১৯৪০ সালের অর্দ্ধেক জমিতে করিতে দিবেন ও কৃষককে পুরা মাত্রায় ঐ জমিতে পাট বুনিতে 'পরামর্শ ও উৎসাহ' দিবেন তাহার ফলে ১৩৫১ সালের পৌষ মাসের

ধান কাটার কয়েক মাস মধ্যেই তখনও যদি ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত না হয় তাহা হইলে বঙ্গদেশে পুনরায় অন্নাভাব ঘটিবে। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে গত দুর্ভিক্ষের বহু পূর্ব্বে ১৩৪৮ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে আমরা

"আগামী ফসলে কেবল যে পাটের দর কম হইবে তাহা নহে, পরন্তু ধান্যের চাষ কম হওয়ায় ও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর অসুবিধা থাকায় বঙ্গদেশে অন্নাভাব ঘটিতে পারে"

এই কথা লিখিয়াছিলাম। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা-পরিষদে বিতর্কের উত্তরে মন্ত্রী মিঃ কে সাহাবুদ্দিন বলিয়াছেন পাটচাষ ধানচাষের দশ ভাগের এক ভাগ জমিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল সাধারণ সময়ে পাটচাষের কম-বেশীতে খাদ্যাভাব ঘটে না। কারণ ব্রহ্মদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ৪ কোটি ৫ লক্ষ মণ চাউল কেবল বন্দর দিয়া আসিত; তাহা ছাড়া যে প্রভূত পরিমাণ চাউল নৌকাযোগে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসিত তাহার কথা স্থানীয় লোকরা জানেন কিন্তু তাহার হিসাব সরকারী দপ্তরখানায় নাই। বঙ্গদেশে লীগ-মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে এই কথা প্রায়ই বলা হয়। ভারতের মুসলমান সমাজের এক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি সর্ সাফাৎ আহমদ্ খাঁ দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় হাই কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গত ২৯শে ডিসেম্বর বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম বঙ্গদেশের শস্যভাণ্ডার ছিল ও ব্রহ্ম ইংরেজের হস্তে থাকিলে দুর্ভিক্ষ হইত না। ধানচাষের জমি কমাইয়া পাটচাষের জমি বাড়াইয়া দেওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হইয়া যায়।" এই সুস্পষ্ট উক্তির মাসাধিক পরেও মিঃ সাহাবুদ্দিন পূর্ব্বোক্ত কথা কি করিয়া বলিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

সরকার পাটের দর কলিকাতায় সর্ব্বনিম্ন ১৫ টাকা ও সর্ব্বোচ্চ ১৭ টাকার নিরিখে বাঁধিয়া দিয়াছেন ও বলিতেছেন পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের (যেমন চটের) সর্ব্বোচ্চ মূল্যও বাঁধিয়া দিবেন। ৭ই ফেব্রুয়ারীর ঐ ঘোষণার পর আজ অবধি ইহা করা হয় নাই এবং করা হইলে চটের দর ২৬ টাকার নিম্নে নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ গত ইংরেজী বৎসরে ইংরেজ পাটকলওয়ালাদিগের সমিতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ য়্যাসোসিয়েসন ঐ দরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নিকট ৭০ কোটি গজের অর্ডার লইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমরা কেহই চাহি না যে, আজকাল যখন সকল জিনিসের দর চড়া তখন চটের দাম পড়িয়া যাউক। চটের দামের তুলনায় পাটের দাম অত্যধিক কম রাখিয়া কলওয়ালারা অন্যায় লাভ করিয়া যাইতেছে ইহাই হইল আপত্তির বিষয়। পাটকলগুলির অধিকাংশ ইংরেজদিগের পরিচালনাধীন ও যে কয়টি ভারতীয়চালিত পাটকল আছে তাহাদিগকেও হক-নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডল গত ১৯৩৮ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের অর্ডিনান্সের দ্বারা ইংরেজ কলওয়ালাদিগের ইচ্ছাধীন চলিতে বাধ্য করিয়াছেন। এখন (অর্থাৎ ২০শে ফাল্গুন) ১০০ গজ চটের দাম ২৮ টাকা ৮ আনা। এই পরিমাণ চট তৈয়ারী করিতে ৩৫ সের পাট লাগে। সুতরাং হিসাবে দাঁড়াইতেছে এই যে, যে ওজনের পাট কলিকাতায় ১৪ টাকায় বিক্রীত হইতেছে তাহাই এক বার কলে ঘুরাইয়া কলওয়ালারা ২৮ টাকা ৮ আনা দরে বেচিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে গঙ্গার দুই ধারের পাটকলগুলিতে কৃষকরা বৎসরে বহু পাট নিজেরা বিক্রয় করে। তাহা ছাড়া যে-সকল জেলায় পাট জন্মে সেগুলির সর্ব্বত্র কলওয়ালারা নিজেদের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষকদিগের নিকট হইতে সরাসরি পাট কিনিয়া থাকে। পাবনায় এইরূপ এক শাখায় কৃষক বলদের পৃষ্ঠে লইয়া দুই মণ পাট বেচিতেছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং লক্ষ লক্ষ অসহায়, মূক, দারিদ্র্যজর্জ্জরিত কৃষক একদিকে ও অল্পসংখ্যক, সংঘবদ্ধ অতুল বিত্তশালী কলওয়ালা অপর দিকে—এই অসম প্রতিযোগিতায় দুর্ব্বল চিরকাল পরাজিত হইয়া আসিতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে পাট গড়ে ৫ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইয়াছে আর কলওয়ালারা গড়ে শতকরা ৯০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে। সরকারের নিযুক্ত ফিনলো কমিটি ১৯২০-২১ হইতে ১৯৩১-৩২ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর কলিকাতায় টন প্রতি পাটের দর ও পাট হইতে উৎপন্ন জিনিসের (যেমন চটের) কি দাম ছিল তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করেন। তাহাতে দেখা যায়, গড়ে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য পাটের মূল্যের দ্বিগুণ। এখন বাজারে ওজন হিসাবে চটের যে দর চলিতেছে তাহা মন্ত্রিমণ্ডল পাটের যে দর বাঁধিলেন তাহার দ্বিগুণ। কিছুদিন পূর্ব্বে পাটচাষীকে ৪০ হইতে ৮০ টাকা মণ চাউল কিনিয়া খাইতে হইয়াছে এবং সেই অবস্থা যে আবার হইবে না তাহাও বলা যায় না। সরকার হইতে চটের মূল্য ২৮ টাকা ৮ আনার অনেক নিম্নে যদি বাঁধিয়া না দেওয়া হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে অগণিত ভারতীয় কৃষকের উপর যে অত্যাচার বহু বৎসর ধরিয়া কলওয়ালারা (যাহারা পূর্ব্বে সকলেই ইংরেজ ছিল ও এখন অধিকাংশ ইংরেজ) চালাইয়া আসিয়াছে তাহাই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল আইনের দ্বারা বলবৎ করিলেন। পাটচাষীর শতকরা ৯০ জন মুসলমান। সুতরাং পাটকেই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মুসলমানী ফসল বলা চলে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের অধিকাংশ মুসলমান। তাঁহারা যেভাবে কয়েকটি ইউরোপীয় ভোটের বিনিময়ে স্বধর্ম্মীদিগের বিরাট্ স্বার্থ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন তাহা প্রকৃতই নিন্দার্হ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

বাংলায় লবণের অভাব

চাউলের দুর্ভিক্ষ কতকটা প্রশমিত হইয়া আসিবার পর বাংলায় লবণের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং কয়লার দুর্ভিক্ষও আবার ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। লবণের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে সময় থাকিতে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বনের অভাবেই বর্ত্তমান লবণ দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ। লবণের অভাবে মানুষের দুঃসহ কষ্ট তো আছেই, ইহার ফলে গোমড়কও সুরু হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের মোট বক্তব্য এই যে:

"কেন্দ্রীয় সরকার দুই মাস কাল লবণ সরবরাহ করিতে পারেন নাই, প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে যে লবণ গোলা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে নাই। কারণ, লবণ উৎপাদকেরা অধিক মূল্য পাইয়া সরকারী গোলায় লবণ বিক্রয় না করিয়া অন্যত্র বিক্রয় করিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন যে, বাংলার সম্পূর্ণ লবণের চাহিদাই করাচী ও পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বন্দর হইতে মিটানো হইত। ইহাদের এক অংশ রেলপথে আসিত এবং সরাসরি জেলাগুলিতে প্রেরিত হইত। কিন্তু ভারত-সরকার কিছুকাল ধরিয়া রেলপথে লবণ প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে মহা অসুবিধায় ফেলিয়াছেন। লবণের অভাব ঘটিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি ভারত-সরকারের নিকট সরবরাহের কথা জানাইয়াছিলেন। তাহার পর জরুরী অবস্থায় যাহাতে অসুবিধায় পড়িতে না হয় সেজন্য বাংলাদেশেই লবণ মজুতের পরামর্শ আসে এবং দুই মাসের উপযোগী লবণ তাঁহাদিগকে মজুত করিয়া রাখিতে বলা হয়। বাংলার স্বাভাবিক চাহিদা মাসিক আট লক্ষ মণ এবং এই হিসাবেই দুই মাসের লবণ মজুতের কথা হইয়াছিল। সরবরাহ-মন্ত্রী ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট টাকা চাহেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে জানান যে, অবস্থার যখন কতকটা উন্নতি হইয়াছে তখন উহার আর প্রয়োজন নাই। বাংলা-সরকার তাঁহাদের নিজেদের অর্থে এক মাসের লবণ মজুত করেন। জানুয়ারী হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যানবাহনের গোলযোগ ঘটে, দুই মাস রেলপথে লবণ আসা বন্ধ থাকে, ইত্যাদি নানা কারণে লবণের অসুবিধা দেখা দিয়াছে। বাংলার বাণিজ্য-সচিব খাজা সাহাবুদ্দিন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলা-সরকার ভারত-সরকারের নিকট হইতে বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে লবণ প্রস্তুতের জন্য মঞ্জুরী পাইয়াছেন। কিন্তু উহা এই সর্ত্তে যে, উক্ত অঞ্চলসমূহে যে লবণ প্রস্তুত হইবে তাহা সবই কতকগুলি গুদামে লইয়া যাইতে হইবে; ঐ সব গুদামে ভারত-গবর্মেণ্ট লবণ কর সংগ্রহ করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে মেদিনীপুরে পাঁচটি এবং চব্বিশপরগণায় দুইটি ঐরূপ ধরণের গুদাম করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার আরও প্রসার সাধন করা যায় নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।"

খাজা সাহাবুদ্দীন এবং মিঃ সুরাবর্দ্দীর বিবৃতিতে দেখা যায় বাংলায় লবণের অভাব ঘটিতে পারে ইহা তাঁহারা জানিতেন এবং রেলে বা ষ্টীমারে করাচী হইতে লবণ আমদানী হঠাৎ বন্ধ হওয়া যে বিচিত্র নয় সে সম্বন্ধেও তাঁহারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তৎসত্ত্বেও স্বাবলম্বনের চেষ্টা না করিয়া ইঁহারা চিরন্তন নাবালকের ন্যায় ভারত-সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া ছিলেন। চাউল, লবণ ও কয়লা ইহার কোনটিরই জন্য বাংলাদেশের পরনির্ভরশীল হইবার কথা নহে। অথচ জীবনযাত্রায় অপরিহার্য্য এই তিনটি দ্রব্যেরই মারাত্মক অভাব বাংলায় অহরহ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিটি অভাব তীব্র হইয়া উঠিবার পর ভারত-সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রীদের নয়াদিল্লী ছুটাছুটিও তেমনি নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলার প্রত্যেক সমস্যার সমাধান যদি ভারত-সরকারকেই আসিয়া করিতে হয়, তাহা হইলে বিপুল ব্যয়ে এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে চাকুরীতে বহাল রাখিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

কয়লার অভাব

যুগান্তর লিখিতেছেন :—"কলিকাতা শহরে আবার কয়লার অভাব ঘটিয়াছে। কোন স্থানেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইতেছে না—যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহারও অধিকাংশ গুঁড়া ও পাথর মিশ্রিত বলিয়া জ্বালানীরূপে ব্যবহারের অযোগ্য। গুঁড়ার বাহুল্য দেখিয়া মনে হয় যে, কয়লা বোঝাই ও খালাস করার সময় স্বাভাবিক কারণে ঐ গুঁড়া জমে নাই, উহার অধিকাংশই খনি হইতে চালান আসিয়াছে। মালিকরা গত যুদ্ধের সময়ও এই ভাবে পাথর ও গুঁড়া মিশ্রিত কয়লা চালাইয়া আশাতীত লাভ করিয়াছিল। অসহায় ক্রেতারা তৎকালে এই অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইলেও পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে খনি-মালিকদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল—

কয়লা রপ্তানী অত্যধিক কমিয়াছিল, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রেও ভারতীয় কয়লার বিক্রয় হ্রাস পাইয়াছিল। অবশেষে রেলের মাশুল কমাইয়া ও রপ্তানী ব্যবসায়ে অর্থসাহায্য করিয়া খনি-মালিকদিগকে টিকাইয়া রাখার জন্য রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কোন কোন পৌর-প্রতিষ্ঠানেও কয়লার গুরুতর অভাব পড়িতেছে এবং পানীয় জল সরবরাহও বন্ধ হওয়ার উপক্রম ঘটিতেছে। রেল কোম্পানীগুলিও কয়লার অভাবে বহু ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। একমাত্র নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথেই ৭১ খানি যাত্রী-বাহী ট্রেন বন্ধ হইয়াছে। সাধারণ শিল্পকারখানাসমূহেও কয়লার অভাবে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা ঘটিয়াছে। এইরূপ সর্বব্যাপক ঘাটতির কারণ রহস্যাবৃত, এ সম্পর্কে সরকারের ভাবগতিকও উদ্বেগজনক। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ডাঃ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় পরিষদে জানাইয়াছিলেন যে নবেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছিল, জানুয়ারী মাসে উহা আরও বাড়িয়াছে। মালগাড়ী সরবরাহের পরিমাণও কমিয়াছে বলিয়া জানান হয় নাই। তথাপি সরবরাহের পরিমাণ কমিতেছে কেন? জানা গিয়াছে যে, বার্ষিক সওয়া দুই কোটি টন কয়লা তুলিবার চেষ্টা করা হইবে, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ টন সিংহলে ও সুদূর প্রাচীতে রপ্তানী করা এবং ১৪। লক্ষ টন ভারতীয় বন্দরে নজরকারী সমুদ্রগামী জাহাজে সরবরাহ করা হইবে। রপ্তানীর বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার কয়েকখানি জাহাজ ধার দিবেন। ঐ সকল জাহাজযোগে বোম্বাই প্রদেশে মাসিক ৩০ হাজার টন ও মাদ্রাজ প্রদেশে মাসিক ৬০ হাজার টন কয়লা পাঠান হইবে।"

কয়লা সরবরাহের পরিমাণ কমিবার কারণ রহস্যজনক সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট চাপ দিয়া ছাব্বিশ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানীর যে ব্যবস্থা করিতেছেন স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা হয়ত ক্ষতিকর হইত না। ১৯৩৯-৪০-এ কুড়ি লক্ষ টন, ১৯৪০-৪১-এ উনিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টন এবং ১৯৪১-৪২-এ পনর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছে, কিন্তু ১৯৪২-৪৩-এ রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া মাত্র তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র কয়লার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে। ভারত-সরকার কয়লা উত্তোলনের হিসাব দেন না, কাজেই রপ্তানী কমিবার সঙ্গে উত্তোলন কি ভাবে কমিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কয়লা-নিয়ন্ত্রণের নামে শ্বেতাঙ্গ কোম্পানীদের বড় খনিগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার এবং ভারতীয় মালিকদের ছোট খনিগুলিকে প্রকারান্তরে গলা টিপিয়া মারিবার আয়োজন দেখিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, রপ্তানী কমিবার পর কম কয়লা তুলিয়া দ্বিগুণ দামে উহা বিক্রয় করিয়া চড়া লাভ করিবার সুযোগ ভারত-সরকার বড় খনিগুলিকে দিয়াছেন।

বেঙ্গল কোল কোম্পানী লিমিটেডের বার্ষিক সভায় চেয়ারম্যান মিঃ মীলিং উত্তোলন কমিবার যে কয়টি কারণ দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, "দামোদরের বাঁধ ভাঙিয়া রেল চলাচল বিপর্য্যস্ত হইবার পরও এত মালগাড়ী খনিতে আসিয়াছে যে কম কয়লা উঠিয়াছে বলিয়া সবগুলি বোঝাই করাও সম্ভব হয় নাই। খনির বহু শ্রমিক পূর্বের ন্যায় অন্যান্য কাজে চলিয়া গিয়াছে। চাউলের দর বেশী বলিয়া যাহারা ধান বুনিতে দেশে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিতে দেরি করিয়াছে। গত জুলাই হইতে অক্টোবরের মধ্যে তিন বার ব্যাপক কলেরা দেখা দেওয়ায় যে-সব শ্রমিক অবশিষ্ট ছিল তাহাদেরও অনেকে পলাইয়াছে। চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়ায় শ্রমিকদের কর্মশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, ইহাতে কাজের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে এবং কম কয়লা উঠিয়াছে।" মিঃ মীলিঙের এই উক্তি হইতে অনেকগুলি সত্য কথা জানা গিয়াছে। প্রথম ভারতীয় ছোট খনিগুলি যে-সময় মালগাড়ীর জন্য হাহাকার করিয়াছে, শ্বেতাঙ্গ বড় খনিগুলি তখন এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গাড়ী পাইয়াছে যে সবগুলি ভর্তি করিতেও পারে নাই। ইহার নাম মালগাড়ী-নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয়, সুযোগ পাইলেই কয়লার খনির শ্রমিক অন্য কাজে চলিয়া যায়। খনিতে নারী-শ্রমিক পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিতর্কে জানা গিয়াছিল যে, কয়লার খনির শ্রমিকদের মজুরি এখনও অপর সব কার্য্যের তুলনায় অনেক কম। অথচ খাটুনি এখানে অনেক বেশী, প্রাণ হারাইবার ভয়ও কম নয়। কাজেই ইহারা অন্যত্র কাজ খুঁজিবে এবং সুযোগ পাইলেই সরিয়া পড়িবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। তৃতীয়, একই খনিতে তিন তিন বার অসময়ে কলেরা দেখা দেওয়ায় সন্দেহ হয় শ্রমিকদের বস্তি পরিষ্কার রাখিবার অথবা পানীয় জল সরবরাহের বিশেষ সুবন্দোবস্ত নাই। চতুর্থ, কম খাওয়াইয়া বেশী কাজ আদায় করিতে গেলে তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য—এই সত্য শ্বেতাঙ্গ মালিকগণকে শেষ পর্য্যন্ত পরখ করিয়া উহার সারবত্তা যাচাই করিয়া লইতে হইয়াছে।

—

দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসংখ্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগ দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল-সমূহের আট শতাধিক পরিবারে অনুসন্ধান করিয়া যে-তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, নমুনামূলক পদ্ধতি অনুসারে হিসাবের দ্বারা উহা হইতে দুর্ভিক্ষের মোট মৃত্যুসংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই হিসাবে মৃত্যুসংখ্যা ৩৫ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। ইঁহারা যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগ বাংলার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দশটি জেলা লইয়া নমুনা হিসাবে একটি তদন্ত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আটটি জেলা সংক্রান্ত সংখ্যামূলক তথ্য-তালিকা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐগুলিতে ৩ হাজার ৮ শত ৪০ জন লোক লইয়া ৮ শত ১৬টি পরিবারের বিবরণ আছে। এই দলে ১৯৪৩ সালের জুন-জুলাই হইতে নবেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে মোট মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছে ৩ শত ৮৬; অর্থাৎ ছয় মাসে শতকরা কিঞ্চিদধিক দশ ভাগ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহে যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তদ্দ্বারা প্রত্যেক পরিবারের বংশতালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং এই পন্থায় সাধারণ সরকারী অনুসৃত পন্থা অপেক্ষা অনেক নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কে. পি. চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার একটি গ্রামে গত বৎসর ৩২ জনের মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু সরকারী হিসাবে কেবল ৭ জনের উল্লেখ ছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মন্তব্যে বলিয়াছেন—"বিভিন্ন এলাকায় মৃত্যুহারের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। বর্দ্ধমানের কালনা অঞ্চলে এই হার মাত্র হাজার-করা ৫৫; আবার মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে কয়েকটি গ্রামে উহা হাজার-করা প্রায় ৮০। চৌমুহানি (নোয়াখালী)র কয়েকটি গ্রামে মৃত্যুহার হাজার-করা ৮১ জনের উপর এবং ঢাকার একটি গ্রামে এই হার হাজার-করা ১১০-এর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। নদীয়ার একটি গ্রামে মৃত্যুহার শতকরা ১০, আর অপর একটি গ্রামে তাহা শতকরা ২০। হাওড়ার একটি গ্রামে মৃত্যুহার সর্বাপেক্ষা অধিক শতকরা ২২ জন পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক সময়ে বাংলার মৃত্যুহার বৎসরে হাজার-করা ৩০ অর্থাৎ ৬ মাসে হাজার-করা ১৫; অতএব এই হাজার-করা ৮৫ অর্থাৎ শতকরা ৮। মৃত্যুহার হইবার কারণ হইল দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত ব্যাধি। পশ্চিম ও মধ্য বাংলা অথবা পূর্ববঙ্গের ঘাট্তি অঞ্চলের তুলনায় উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেক কম হওয়ায় সমগ্র বাংলার মৃত্যুহার নির্ধারণের সময় উপরোক্ত সংখ্যা কিছু কমাইতে হইবে। বাংলার কমবেশী দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহা অতিশয়োক্তি হইবে না। সেই হিসাবে স্বাভাবিক অপেক্ষা সম্ভাব্য মৃত্যুসংখ্যা ৩৫ লক্ষের অধিক হইবে বলিয়া ধরা যায়। নমুনামূলক তদন্তের হিসাবে যে ভুলভ্রান্তি থাকা অবশ্যম্ভাবী, এই হিসাবেও হয়ত তাহা থাকিবার সম্ভাবনা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারী কর্মচারিগণ যদি নির্দেশানুযায়ী কার্য্য করেন, তাহা হইলে আরও সঠিক হিসাব পাওয়া যাইবে।

শিশু-মৃত্যুর হার আশঙ্কানুরূপে অত্যন্ত বেশী। পাঁচ বৎসরের কম শিশুদের হার সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ। বয়স্কা স্ত্রীলোকের তুলনায় বয়স্ক পুরুষের মৃত্যুহার অনেক বেশী। অল্প প্রকোপের অঞ্চলেই পুরুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ, অধিক প্রকোপের এলাকায় ইহা আরও অধিক। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, এই দুর্ভিক্ষের ফলে ১০ বৎসর পর তাহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে।

তদন্তে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, বহুসংখ্যক সাধারণ ক্ষুদ্র কৃষক তাহাদের সমস্ত জমি হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই সকল জমি তাহাদের প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা অবিলম্বে না করিলে এই সকল পরিবার নিঃস্ব ভিক্ষাজীবীতে পরিণত হইবে। যে-সকল ধীবর নিজেদের নৌকা, জাল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াছে বা যাহাদের মৎস্য ধরিবার অধিকার হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহাদেরও জীবিকা অর্জনের জন্য সরকার হইতে সাহায্য দেওয়া আবশ্যক।"

নমুনামূলক হিসাবে ভুলের সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিরক্ষর চৌকিদারের দ্বারা মৃত্যুহার নির্ধারণের যে পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে এই হিসাবে ভুলের মাত্রা তদপেক্ষা অনেক কম হইবার সম্ভাবনা। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যবিভাগ মৃত্যুসংখ্যা জানেন না, জানিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টাও করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাংলা-সরকারও সমান উদাসীন। পার্লামেন্টে মিঃ বাটলার বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের হিসাব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেও দেশবাসী উহাকেই অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিবে।

—

যশোহর জেলায় রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে ধান নষ্ট হইবার দায়িত্ব

২৩শে ফাল্গুন তারিখের দৈনিক বসুমতী যশোহর জেলার উন্মুক্ত রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়িয়া ধান নষ্ট হইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে মিঃ সুরাবর্দ্দী এবং সর্ এডোয়ার্ড বেন্থলের উক্তি পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া কে মিথ্যাবাদী তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। বসুমতী লিখিয়াছেন :

কে মিথ্যাবাদী?

গত ১লা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন, প্রজার নিকট হইতে গৃহীত প্রায় ২

লক্ষ মণ ধান্য যশোহর জিলার রেলষ্টেশনসমূহের উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে পড়িয়া বিকৃত হইতেছে, তখন মিষ্টার সুরাবর্দী বলেন :—

"They had been trying to move them but they did not succeed because they did not get wagons"

রেল বিভাগ কেন্দ্রী সরকারের—সেই বিভাগ আবশ্যক সংখ্যক মালগাড়ী দেন নাই। দোষ কেন্দ্রী সরকারের।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা-পরিষদে ঐ বিষয়ে বাংলার প্রতিনিধি সদস্য শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রী সরকারের সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন—গত নভেম্বর মাসে প্রায় ৭৬ হাজার মণ ধান্য বাংলা-সরকারের এজেন্টদিগের দ্বারা ক্রীত হইয়া কিছুকাল ষ্টেশনের প্লাটফর্মে পড়িয়া ছিল। কারণ, বাংলা-সরকার উহা আনিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই—

"Movements of foodgrains in Bengal are arranged in accordance with programmes prepared by the Bengal Government and this paddy was not included in these programmes."

অর্থাৎ দোষ বাংলা-সরকারের।

বাংলা-সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে ইহার কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

ভারত-সরকারের বজেট

২৯শে ফেব্রুয়ারী ভারত-সরকারের অর্থসচিব সর্ জেরেমি রেইসম্যান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯৪৪-৪৫ সালের বজেট পেশ করেন। উহাতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসর মোট আয় ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা (বর্তমানে যে ট্যাক্স আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া) এবং ব্যয় ৩৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা; সুতরাং ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। চলতি বৎসরে মোট ২৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয়; ৩৪৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়, সুতরাং ৯২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। ১৯৪২-৪৩ সালে ১১২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছিল।

বজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি এই,—আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা বহাল থাকিবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ড প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ভার বাড়ে নাই বা কমে নাই। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান জন্য গবর্মেণ্ট কর্তৃক ১৯৪৩-৪৪ সালে যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা হইতে নানাভাবে ঈপ্সিত ফললাভ হইয়াছে। গবর্মেণ্টের ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে—যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে মোট ৫৪৭ কোটি টাকা ঋণ (ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ বাবদসহ) গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে অর্ধেকের অধিক পরিমাণ ঋণ গত ১২ মাসের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের বজেটে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পসংক্রান্ত গবেষণার জন্য অধিকতর অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য একটি ডলার ফণ্ড গড়িয়া তুলিতে হইবে।

অর্থসচিব নূতন কর ধার্য ও বাধ্যতামূলক টাকা জমা রাখার প্রস্তাব সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। চা, কফি ও সুপারির উপর প্রতি পাউণ্ডে দুই আনা হারে নূতন উৎপাদন-শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করেন।

দেড় হাজার টাকার উপর আয়কর ধার্যের ব্যবস্থা ছিল; এক্ষণে দুই হাজার টাকার কম আয়ের উপর আয়কর ধার্য হইবে না।

১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কর সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন হইবে না, কিন্তু ১০ হাজার টাকা হইতে অধিক আয়ের উপর সারচার্জের হার বাড়িবে।

বর্তমানে আমদানী শুল্কের উপর যে শতকরা ২০৲ টাকা সারচার্জ ধার্য আছে, তাহা আরও এক বৎসরকাল বহাল থাকিবে। তামাক ও সুরাসারের সারচার্জ বর্তমানে ১/৫ আছে, উহা বৃদ্ধি করিয়া ½ করা হইবে।

তামাকের উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ঐ বাবদ অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া নূতন ট্যাক্স ধার্য করিয়া মোট ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে; সুতরাং আগামী বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া ৫৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইতে পারে।

"মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান জন্য গবর্মেণ্ট কর্তৃক ১৯৪৩-৪৪ সালে যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা হইতে নানাভাবে ঈপ্সিত ফললাভ হইয়াছে"—অর্থসচিবের এই উক্তি সত্য নহে। ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক দপ্তর হইতে যে সূচক-সংখ্যা প্রকাশিত হয়, ১৯৪৩-এর জুন মাস পর্যন্ত তাহা দেওয়া হইয়াছে। এই মাসে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসের তুলনায় নিম্নোক্ত রূপ দাঁড়াইয়াছে :

	আগষ্ট ১৯৩৯	জুন ১৯৪২	জুন ১৯৪৩
চাউল	১০০	২০৭	৯৫১
গম	১০০	২১৪	৩৩০
কয়লা	১০০	১২৪	১৯৯
কেরোসিন	১০০	১৭৭	১৯৮
কাপড়	১০০	২১২	৫১৩

ইহা পাইকারী দরের হিসাব, খুচরা মূল্য অনেক বেশী তাহা বলাই বাহুল্য, বিশেষতঃ কয়লা ও কেরোসিনের বেলায় যদি বা একান্তই উহা পাওয়া যায়। চাউলের দর ১৯৪০-এর শেষভাগে আরও অনেক বাড়িয়াছে; পরে যেটুকু কমিয়াছে তাহা প্রকৃতির দয়ায়, সরকারের কৃতিত্বে নয়।

ভারতীয় কৃষকের আয়ের পথ সাধারণতঃ তূলা, পাট, চীনাবাদাম, তিসি ও কাঁচা চামড়া। ইহাদের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তরূপ :

	আগষ্ট ১৯৩৯	জুন ১৯৪২	জুন ১৯৪৩
তূলা	১০০	১৩২	২৬১
পাট	১০০	১২০	২৪১
চীনাবাদাম	১০০	১৫১	৩১৪
তিসি	১০০	১৪৪	২২৫
কাঁচা চামড়া	১০০	১১৯	১১২

এগুলি পাইকারী বিক্রয়মূল্য, অর্থাৎ কৃষকের নিকট হইতে আরও কম দরে উহা সংগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ কৃষক তাহার অর্থকরী ফসল বিক্রয় করিয়া কোন ক্ষেত্রেই দ্বিগুণ বা সওয়া দুই গুণের বেশী পায় নাই, অথচ অন্ন ও বস্ত্রের জন্য তাহাকে নয় গুণ এবং সাড়ে পাঁচ গুণ ব্যয় করিতে হইয়াছে।

শুধু কৃষক নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সমানভাবে বিপন্ন। বাঁধা আয় দুর্মূল্য-ভাতা প্রভৃতি প্রাপ্তির পরও দেড়গুণের বেশী কোন ক্ষেত্রেই বাড়ে নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তদপেক্ষা অনেক কম বাড়িয়াছে। উকীল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক প্রভৃতিকে অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। অথচ রেইসম্যান সাহেবের ট্যাক্স প্রস্তাবে ইহাদিগকেই আরও বেশী করিয়া আক্রমণ করা হইয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতির একটা প্রধান কথা রেইসম্যান সাহেব বলেন নাই, ভারত-সরকার প্রথম হইতেই উহা চাপিয়া গিয়াছেন। এদেশে ব্রিটিশ ও আমেরিকান গবর্মেণ্ট কর্তৃক কত টাকা ব্যয় হইতেছে বজেটে তাহার কোন উল্লেখ থাকে না, ফলে সরকারী তহবিল হইতে ব্যয়ের মোটামুটি হিসাবও পাওয়ার উপায় নাই। বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকাও ভারত-সরকারের বজেটের এই গলদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই দাবী নিরর্থক, কারণ তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত কারণ ও পরিমাণ ধরা পড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতির নিবারণের নামে যে-সব অনাবশ্যক করভার চাপানো হইতেছে তাহার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝা যায়। ভারত-সরকারের ইহা অভিপ্রেত নহে।

কলিকাতা হইতে মফস্বলে খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা

ইউনাইটেড প্রেস কর্তৃক নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"ঢাকা ও ফরিদপুরের ন্যায় যে-সকল ঘাটতি জেলায় খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সেই সকল জেলায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্মেণ্ট সম্প্রতি মালবহনের জন্য নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে সরাসরি ঐ সকল জেলার বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র পাহারায় মালবাহী নৌকা প্রেরণ করা হইতেছে। এক সঙ্গে পঁচিশটি করিয়া নৌকা যাইতেছে এবং উহাতে ত্রিশ হাজার মণ মাল বহন করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে এইরূপ তিনটি বহর খাদ্যশস্য লইয়া মাদারিপুর, ঢাকা, নীলকান্দি ও মিরকাদিম রওনা হইয়াছে। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে নৌকাগুলি বোঝাই করা হইতেছে। যে-সকল নৌকা ছাড়িয়া গিয়াছে তাহা ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় মাল লইয়া যাইবে।"

এই সংবাদটি সম্বন্ধে জনসাধারণের তরফ হইতে কয়েকটি বক্তব্য আছে। বাড়তি অঞ্চল হইতে একবার কলিকাতায় মাল আনিয়া আবার উহা ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণের দ্বারা যানবাহনের উপর অনর্থক চাপ তো পড়িতেছেই, এই প্রকার টানাটানির দ্বারা বহু ফসল নষ্ট হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। নৌকাযোগেই যদি চাউল পাঠাইতে হয় তবে কলিকাতা হইতে ঢাকায় উহা প্রেরণ অপেক্ষা বরিশাল হইতে পাঠানই সুবিধা ও স্বল্পব্যয়সাধ্য। দুই বৎসরাধিক কাল অনাবশ্যক ভাবে নৌকা আটকাইয়া রাখিয়া অগত্যা তাহার ব্যবহার যদি বা আরম্ভ হইল তাহাতেই বা এত কার্পণ্য কিসের? আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, কলিকাতায় রেশনিঙের পর বাংলার বাহিরে ধান চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়া গবর্মেণ্ট যদি অবাধ ব্যবসা চলিতে দিতেন, নৌকা চলাচলের অন্তরায় দূর করিতেন, তাহা হইলে এবার যে ফসল হইয়াছে তাহাতে স্বাভাবিক ভাবেই চাউলের দর কমিয়া আসিত। সরকারী গুদাম খুলিয়া আপৎকালীন সতর্কতার নামে অনর্থক খাদ্যদ্রব্য অপচয় হইবার সম্ভাবনা ইহাতে থাকিত না, লোকেরও সুবিধা হইত। সরকারী এজেণ্টদের এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক সরকারী কর্মচারী বা মন্ত্রীদের ইহাতে কি অসুবিধা হইত?

চাউলের দর ও প্রাপ্তির অসুবিধা

বাংলা-সরকারের কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রচারিত চাউলের ফলন সম্পর্কীয় তৃতীয় এবং শেষ পূর্বাভাসে হিসাব দেওয়া হইয়াছে যে,

এই বৎসর (১৯৪৩-৪৪) বাংলায় শীতকালীন চাউলের ফলন স্বাভাবিক ফলনের তুলনায় শতকরা ১০৩ ভাগ ফলিয়াছে। গত বৎসর এই ফসলের ফলন ছিল ৬৮ ভাগ। সাতটি জেলায় অতিরিক্ত এবং অন্যান্য জেলায় ষোল আনা ফলন হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় বাংলার প্রতি একর (তিন বিঘা) জমির ফসল হইতে বার মণ ষোল সের পরিষ্কার চাউল পাওয়া যায়। প্রদেশের এই বৎসরের ফলন শতকরা ১০৩ ভাগ হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইলে প্রতি একরের ফলন অনুসারে এই বৎসরের মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ হয় ৮৫ লক্ষ ২৮ হাজার একশত টন (প্রতি টনে ২৭ মণ)। গত বৎসর এই ফসলের পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ ২০ হাজার একশত টন। জেলার কর্মচারীরা অনুমান করিয়াছেন যে, এই বৎসর মোট এক কোটি একাশী লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাত শত একর জমিতে শীতকালীন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর উক্ত জমির পরিমাণ ছিল ১৬২০৭১০০ একর।"

এই সুসংবাদ জ্ঞাপনের পর ৭ই মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, ১লা মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বারাকপুর, বারাসত, রাণাঘাট, ঝিনাইদহ, ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং নোয়াখালীতে নিয়ন্ত্রিত দরে প্রকাশ্য বাজারে চাউল অপ্রাপ্য ছিল। শুধু এক সপ্তাহের জন্য নহে, ইহার পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলিতেও ঐ একই রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে, কখনও বা রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই বলিয়া কৃষিবিভাগ এড়াইয়া গিয়াছেন। ঐ সব স্থানে গেজেটের ঐ সংবাদেই দর ১৭।৶০ আনা দেখান হইয়াছে। অন্যান্য অনেকগুলি স্থানের সংবাদ আসে নাই বলিয়া উঁহাদের ঘর শূন্যও আছে। ভারতরক্ষা আইনে গবর্মেণ্ট যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন, বহু ক্ষেত্রে করিতেছেনও। বাংলার সমস্ত জেলা কর্তৃপক্ষকে চাউলের দর প্রতি সপ্তাহে পাঠাইতে তাঁহারা বাধ্য করিতে পারেন না কেন, এ চেষ্টাই বা হয় না কেন? চাউলের ফলন যেখানে এইরূপ বেশী হইয়াছে বলিয়া গবর্মেণ্ট ঘোষণা করিতেছেন, সেখানে রেশনের চাউলের পরিমাণ সম্বন্ধে অতিশয় কৃপণতা, মফঃস্বলের বাজারে দরের অস্বাভাবিক বর্ধিত হার এবং প্রকাশ্য বাজারে চাউলের অভাব কোন অজ্ঞাত রহস্যজনক কারণে ঘটিতেছে বলিয়াই দেশবাসীর ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

রাজবন্দীদের সুবিধা দানের প্রস্তাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ভারতরক্ষা আইনের বলে অথবা তিন আইনের বলে বিনাবিচারে আটক বন্দীগণকে কারাগারে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা দানের বিষয়ে মিঃ হুমায়ুন কবীরের একটি প্রস্তাব ১৭-১১ ভোটে না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। মিঃ কবীরের প্রস্তাবটিতে বলা হয় যে, সভার মতে ভারতরক্ষা আইন অথবা তিন আইনের বলে বিনাবিচারে আটক বন্দীগণের নিম্নোক্তরূপ অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য সরকারের অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। (ক) যে-সকল আটক বন্দী পড়াশুনা চালাইতে চাহে, তাহাদের পরীক্ষার ফিস মঞ্জুর করিতে হইবে; (খ) যাহারা কঠিন রোগে ভুগিতেছে তাহাদিগকে কলিকাতার কোন জেলে স্থানান্তরিত করিতে হইবে; (গ) পরিবারবর্গের অথবা বন্দীদের নিজেদের ভাতা সম্পর্কিত দরখাস্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং (ঘ) ভাতা মঞ্জুর হইলে তাহা সত্বর দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই প্রস্তাব অতিশয় ন্যায়সঙ্গত, তথাপি বাংলা-সরকার ইহা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। ১৯৩০-৩৮-এ আটক বন্দীগণকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফিসও গবর্মেণ্ট দিয়াছেন। এবার তাহা না দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। মিঃ কবীরের বন্দীদের পরিবারবর্গের জন্য মাথাপিছু ২০ টাকা করিয়া ভাতা দাবী অন্ন-বস্ত্র ও ঔষধের অগ্নিমূল্য বিবেচনা করিলেকম বলিয়াই মনে হইবে। প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া খাঁ বাহাদুর মহম্মদ জান বলেন যে, শত্রুপক্ষের বন্দীদের রাজার হালে রাখিবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু যে-সকল ভারতবাসী দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে তাহাদিগকে উপবাসক্লিষ্ট করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা গবর্মেণ্ট করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত জানান যে বহু রাজবন্দীর পরিবারের জন্য ভাতার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

বিতর্কের উত্তরে খাজা সর্ নাজিমুদ্দীন বলেন যে সম্প্রতি তিনি রাজসাহী এবং ঢাকা জেল পরিদর্শন করিয়া এবং ঐ সকল জেলে আটক রাজবন্দীদের সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাদের বড় অভাব-অভিযোগ নাই এবং যেগুলি আছে, তাহাও সামান্য ধরণের। রাজবন্দীগণকে পড়াশুনা এবং পরীক্ষার বাবদ ভাতাদানের বিষয়ে সরকার এখনও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে পারেন নাই। পীড়িত রাজবন্দীগণকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ডাক্তারগণ সুপারিশ করিলে সরকার সাধারণতঃ এই সকল বন্দীকে কলিকাতায় লইয়া আসিতেন। কিন্তু হাসপাতাল হইতে একটি ক্ষেত্রে এক জন সিকিউরিটি বন্দী নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক হইতে হইয়াছে। সর্ নাজিমুদ্দীন আরও বলেন যে, কয়েক স্থলে সিকিউরিটি বন্দীগণের ভাতা শতকরা ১০০ ভাগ ও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ভাতাদান সম্পর্কে সরকার দুইটি বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, যে-সকল বন্দী আবদ্ধ হইবার পূর্বে উপার্জন করিত না, তাহাদিগকে কোন ভাতা দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক আবদ্ধ হইবার পূর্বে রাজবন্দীগণ যাহা উপার্জন করিত, তাহার অধিক ভাতা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না। কিন্তু যে-সকল ক্ষেত্রে রাজবন্দীগণের পরিবারবর্গ সত্য সত্যই দুর্দশাগ্রস্ত বলিয়া সরকার নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, সেখানে তাহাদের পরিবারের জন্য মাসিক দশ টাকা হইতে পনর টাকা পর্য্যন্ত ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন। সর্ নাজিমুদ্দীন আরও বলেন যে, মিঃ কবীরের প্রস্তাব অনুযায়ী কোন রাজবন্দীর পরিবারে ৮ জন লোক থাকিলে সেই পরিবারের জন্য মাসিক ১৬০৲ মঞ্জুর করিতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কয়টি মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক আয় ১৬০৲ টাকা?

কয়েকস্থলে বন্দীদের ভাতা শতকরা ১০০ ভাগ ও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে সর্ নাজিমুদ্দীনের এই উক্তি একেবারে অর্থহীন। ৫ টাকাকে ১০ টাকা অথবা ৮ টাকাকে ১২ করিয়া কি ভাতা বৃদ্ধির এই চমকপ্রদ হার ঠিক করা হইয়াছে? তাহা ছাড়া, ভাতাদান সম্বন্ধে প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন, "গ্রেপ্তারের পূর্বে রাজবন্দীগণ যাহা উপার্জন করিত তাহার অধিক ভাতা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না," আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন, "যে-সকল ক্ষেত্রে রাজবন্দীগণের পরিবারবর্গ সত্য সত্যই দুর্দশাগ্রস্ত বলিয়া সরকার নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, সেখানে তাহাদের পরিবারের জন্য মাসিক দশ টাকা হইতে পনর টাকা পর্য্যন্ত ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা ১৫ টাকার বেশী কাহাকেও দেন নাই, তাহাও দিয়াছেন বন্দীর পরিবারবর্গ চরম দুর্দশায় পড়িবার পর। গ্রেপ্তারের পূর্বে কোন বন্দীর উপার্জন ১৫ টাকার দশ বা কুড়ি গুণ বেশী হইয়া থাকিলেও তিনি ১৫ টাকার বেশী পান নাই, প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় ইহাই বুঝা যায়। গ্রেপ্তারের পূর্বে যাহারা উপার্জন করে নাই, তাহারাও ভাতা পাইবে না কেন? বাংলার মধ্য-বিত্ত বেকার-সমস্যা বর্তমানে প্রায় নাই বলিলেই চলে, ইঁহারা বাহিরে থাকিলে আজ অর্থোপার্জনের প্রচুর সুযোগ পাইতেন না ইহা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারে না। বিনাবিচারে বিনাপ্রমাণে মাত্র গোয়েন্দা পুলিসের সন্দেহের বশে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতি গবর্মেণ্টের দায়িত্ব সাধারণ দায়িত্বের অনেক উর্দ্ধে।

বাংলায় দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসংখ্যা

বাংলা-সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে জেলাবোর্ডসমূহের মারফৎ ১৯৪৩ সালের মৃত্যুসংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্য গবর্মেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমানে সমস্ত জেলা হইতেই রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। গত ৫ বৎসরের গড়পড়তা মৃত্যুহার অপেক্ষা ১৯৪৩ সালে বাংলার মৃত্যুহার শতকরা ৫৮ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসর গড়পড়তা মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১১,৮৪,৯০৩; ১৯৪৩ সালে মোট মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৮,৭৩,৭৪৯ অর্থাৎ গড়পড়তা সংখ্যা অপেক্ষা ৬৮৮,৮৪৬ বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কলেরায় ২,১৪,১৭৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে অর্থাৎ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১,৬০,৯০৯ জন বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যালেরিয়ায় ৬৭৪,৩৩০ জন, অর্থাৎ অন্যান্য বারের তুলনায় ২,৮৫,৭৯২ জন বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বসন্তে ২২,০০৫ জন, অর্থাৎ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৪,০৭৫ জন বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বিভিন্ন জেলার বিবরণী শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে।

এই হিসাবের দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষে মোট ৬৮৮,৮৪৬ জন লোক মরিয়াছে। দুর্ভিক্ষে দশ লক্ষের অধিক লোক মরে নাই, আমেরী সাহেবের এই উক্তির পর হইতেই তিনি এই সংখ্যা কোথায় পাইলেন দেশে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্যসচিব সর্ জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্বীকার করেন এই সংবাদ কে দিয়াছে তাহা তিনি জানেন না, তবে এটুকু বলিতে পারেন তাঁহার দপ্তর হইতে উহা যায় নাই। স্পষ্ট না বলিলেও আকারে ইঙ্গিতে অনেকেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে সংবাদটি বাংলা-সরকারই হয়ত সরবরাহ করিয়া থাকিবেন। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সেই সন্দেহই দৃঢ়তর হইবে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি যে-দিন প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই পূর্বদিন নয়াদিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বর্তমান বাংলা সরকারের অকৃত্রিম সুহৃদ আজিজুল হক বলিয়াছেন, "বাংলার এক লোক মরিয়াছে

যে কবর দিয়া ও চিতা রচনা করিয়া ভুলান যায় নাই।' স্বাভাবিক মৃত্যু ১১ লক্ষের স্থলে আর ৭ লক্ষ বাড়িলে এতটা বিপদ হইত না ইহা নিঃসন্দেহ।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী

১৩৫১ বঙ্গাব্দের ৯ই বৈশাখ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে। আধুনিক বাংলা দ্বারকানাথকে ভুলিয়াছে; প্রাতঃস্মরণীয় সেই চিন্তানায়কের তাহাতে ক্ষতি নাই, ক্ষতি আছে জাতির। কংগ্রেসের অগ্রদূত-স্বরূপ, এবং মধ্যবিত্ত, কিষাণ ও মজুরদের সর্বপ্রথম প্রতিনিধিমূলক জাতীয় রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান 'ভারত-সভার' তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথমাবধিই তাহার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ও প্রধান কর্মী। বাংলা দেশে বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, স্ত্রীস্বাধীনতার তেজস্বী প্রবর্তক ছিলেন দ্বারকানাথ। জমিদার ও মধ্যবিত্তপ্রধান যুগে চা-বাগানের অত্যাচরিত কুলিদের তিনি ছিলেন নির্ভীক সহকর্মী ও অকৃত্রিম সহমর্মী বন্ধু; কুলিদের উপর অত্যাচারের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে গিয়া বহু বার তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কংগ্রেসকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় চালনা করিবার তিনি ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। সমগ্র ভারতে জাতীয় সঙ্গীতের সর্বপ্রথম সংগ্রহকর্তা ও প্রচারক দ্বারকানাথ। শিক্ষা-সংস্কারমূলক জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ স্কুলপাঠ্য পুস্তকের তিনি ছিলেন সক্ষম ও প্রতিভাশালী গ্রন্থকার; সুবিখ্যাত 'অবলাবান্ধব', 'সমালোচক' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার অগ্রুৎ-গারক সম্পাদক ও লেখক। কবি, গীতিকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষা-সংস্কারক, সাংবাদিক, রাষ্ট্রবীর এবং সর্বোপরি আজীবন নির্লোভ যশোবিমুখ ও নিরলস কর্মতপস্বী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতি তর্পণের সহিত তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন হওয়াও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিপ্লব-প্রধান অগ্নিময় যুগে সর্বপ্রকার কুপ্রথা ও কুসংস্কার নিবারণ-প্রচেষ্টার প্রধান কর্ম-কেন্দ্র এবং অগ্রণী আন্দোলন ছিল ব্রাহ্মসমাজ; সেইজন্য দ্বারকানাথ তাঁহার জীবনের সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষার সাফল্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহার জন্ম-শতবার্ষিকীর আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ কর্তব্য পালনেই অগ্রসর হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, সাংবাদিক সংঘ, শ্রমিক সংঘ এবং প্রগতিশীল নারীপ্রতিষ্ঠান-সমূহের তরফ হইতেও একটি বৃহত্তর কমিটি গঠিত হইয়া শত-বার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হইলে তাহা সুখের বিষয় হইবে।

—

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী এবং হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলার হিন্দু সংগঠন আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শৈলেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দার্জিলিংস্থ সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে এবং কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০২ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন এবং ১৯০৬ সালে ব্যারিষ্টারী পাস করেন। তিনি ঐ পরীক্ষায় ফৌজদারী আইনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই উহাতে যশঃ ও সাফল্য অর্জন করেন।

তিনি খেলাধুলায় বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি ১৯২৯ সালে মোহনবাগান ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী হন এবং ১০ বৎসর ঐ পদে ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি উহার অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি এক-বার (১৯৪০) আই এফ এ'রও সভাপতি হন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয় ও অন্যান্য জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহিতও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'প্রবাসী' প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বা তৎপূর্বে প্রকাশিত হয়। ১০ই তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষার পরও 'প্রবাসী' না পৌঁছিলে, গ্রাহকগণকে তৎক্ষণাৎ নির্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে এবং তৎপর আমাদের আপিসে যথারীতি অপ্রাপ্তি সংবাদ জানান প্রয়োজন। সম্প্রতি বুকপোষ্টে প্রেরিত 'প্রবাসী'র অপহরণের মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, গ্রাহকগণও যথোচিত প্রতি-কারের জন্য সচেষ্ট না হইলে বর্তমান কাগজ-দুষ্প্রাপ্যতার দিনে 'প্রবাসী' পুনঃপ্রেরণ অসম্ভব হইবে। চাঁদার উপর বৎসরে ৵০ তিন আনা অধিক দিলে 'সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং'-এর ব্যবস্থায় 'প্রবাসী' পাঠান যাইতে পারে।

—

সংকেতময় সাহিত্য

শ্রীরাজশেখর বসু

যে আবিষ্কার বা উদ্‌ভাবন আমাদের সমকালীন তার মূল্য আমরা সহজে ভুলি না। রেলগাড়ি টেলিফোন মোটর সিনেমা রেডিও প্রভৃতির আশ্চর্যতা এখনও আমাদের মন থেকে লুপ্ত হয় নি। আধুনিক সভ্যতার এই সব ফল ভোগ করছি ব'লে আমরা ধন্যজ্ঞান করি, যদিও মনের গোপন কোণে একটু দীনতাবোধ থাকে যে উদ্‌ভাবনের গৌরব আমাদের নয়।

কিন্তু যে আবিষ্কার অত্যন্ত পুরাতন, কিংবা যে বিষয়ের পরিণতি প্রাচীন কালের বহু মানবের চেষ্টায় ধীরে ধীরে হয়েছে, তার সম্বন্ধে এখন আর আমাদের বিস্ময় নেই। দীর্ঘকাল ব্যবহারে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে তার উপকারিতা মোটর সিনেমা রেডিওর চেয়ে লক্ষগুণ বেশী হ'লেও আমরা তা অকৃতজ্ঞচিত্তে আলো-বাতাসের মতই সুলভ জ্ঞান করি। আগুন, কৃষি, আর বয়নবিদ্যার আবিষ্কার কে করেছিল তা জানবার উপায় নেই। এগুলির উপর আমরা একান্ত নির্ভর করি, কিন্তু এদের অভাবে আধুনিক জীবনযাত্রা যে অসম্ভব হ'ত তা খেয়াল হয় না। এই সব বিষয়ের চেয়েও যা আশ্চর্য, যার জন্য মানবসভ্যতা ক্রমশ উন্নতিলাভ করেছে, যার প্রভাবে শুধু ঐশ্বর্যবৃদ্ধি নয়, বুদ্ধি আর চিত্তেরও উৎকর্ষ হয়েছে, যার উপযুক্ত প্রয়োগে হয়তো একদিন সমগ্র মানবজাতি এক সত্তায় পরিণত হবে— এমন একটি বিষয়ের উদ্‌ভাবন পুরাকালে হয়েছিল এবং তার প্রসার এখনও হচ্ছে। এই অসীমশক্তিশালী পরম সহায়ের নাম 'সাহিত্য'।

Literature শব্দের অর্থ সংকীর্ণ—শুধুই লিখিত বিষয়। 'সাহিত্য' শব্দের মৌলিক অর্থ—সহিতের ভাব বা সম্মেলন, যার ফলে বহু মানব একক্রিয়ান্বয়ী বা একভাবে ভাবিত হয়। এমন সার্থক আর ব্যাপক নাম বোধ হয় অন্য ভাষায় নেই। ভাব প্রকাশের আদিম উপায় অঙ্গভঙ্গী ও শব্দভঙ্গী, তার পর এল বাক্য। সুভাষিত বাক্য যখন বলা হ'ল এবং শুনে মনে রাখা হ'ল তখনই সাহিত্যের উৎপত্তি, শ্রুতি আর স্মৃতিই এদেশের প্রথম সাহিত্য। প্রথম যুগে যখন বাক্যই সম্বল ছিল তখন সাহিত্যের দেবী হলেন বাণী বা বাগ্‌দেবী। সংগীত আর লেখার উৎপত্তির পর বাগ্‌দেবী বীণাপুস্তক-ধারিণী হলেন। এখন সাহিত্যের দেবী রাশি রাশি মুদ্রিত পুস্তকে অধিষ্ঠান ক'রে বিশ্বব্যাপিনী হয়েছেন।

প্রথমে যখন লেখার উদ্‌ভাবন হ'ল তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অতি স্থূল—নিজের জিনিস চিহ্নিত করা, সম্পত্তির হিসাব রাখা, দানবিক্রয়াদির দলিল করা, ইত্যাদি। তার পর সংবাদ পাঠাবার জন্য চিঠির এবং রাজাজ্ঞা ঘোষণার জন্য অনুশাসনলিপির প্রচলন হ'ল। ক্রমশ লিপির প্রয়োগ আরও ব্যাপক হ'ল, যে সাহিত্য পূর্বে শ্রুতিবদ্ধ ছিল তা লিপিবদ্ধ এবং অবশেষে মুদ্রিত হওয়ায় প্রচারের আর সীমা রইল না।

মুখের কথার প্রভাব অল্প নয়, কিন্তু বেশী লোকে তা শুনতে পায় না, যারা শোনে তারাও চিরদিন মনে রাখতে পারে না। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে সকল বিদ্যাই গুরু-মুখে শুনে বারংবার আবৃত্তি ক'রে স্মৃতিপটে নিবদ্ধ করতে হ'ত। প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত টোলের পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও স্মরণশক্তির অসামান্য উৎকর্ষ দেখা যায়, কিন্তু শ্রুতবিদ্যা কণ্ঠস্থ করা সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। লেখা অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে, দরকার হ'লেই পড়া যেতে পারে। রচয়িতার মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁর লেখা বহু শত বৎসর পরেও জীবিত থাকে। লেখা যদি ছাপা হয় তবে তার প্রভাব সর্ব মানবসমাজে ব্যাপ্ত হ'তে পারে।

আমি একটি উত্তম কাব্য বা গল্প বা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা তথ্যমূলক গ্রন্থ পড়ছি। পড়তে পড়তে লেখকের ভাব, রসবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যুক্তি, আর জ্ঞান আমাতেও সঞ্চারিত হচ্ছে। লেখক যা অনুভব করেছেন, কল্পনা করেছেন, দেখেছেন, বা জেনেছেন, আমিও তা যথাসাধ্য উপলব্ধি করছি। এই আশ্চর্য ব্যাপারের সাধনযন্ত্র কি? শুধুই কাগজের উপর কালির চিহ্নশ্রেণী। শ্রুতিগ্রাহ্য বাঙ্‌ময় সাহিত্য দৃষ্টিগ্রাহ্য সংকেতময় হয়েছে। মুখের ভাষাও সংকেত, কিন্তু মাতৃভাষা শেখবার একটা সহজ প্রবণতা আমাদের আছে। শিশু কালে কথা বুঝতে আর বলতে সহজেই শিখেছি, লেশমাত্র আয়াস হয় নি। কিন্তু বাক্যের কৃত্রিম প্রতীকস্বরূপ অক্ষরমালা আয়ত্ত করতে কতই না কষ্ট পেয়েছি। প্রথমে লেখার অর্থ একবারেই অগ্রাহ্য

ছিল, এক মাত্র লক্ষ্য এক-একটি চিহ্নের পরিচয় এবং তার নাম। তার পর ধীরে ধীরে চিহ্নপরম্পরা আয়ত্ত হ'ল, পাঠের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন রইল না, লিখিত বাক্যের উচ্চারণ সহজ হ'ল, অবশেষে ক্রমশ অর্থবোধ এল। শিশু রবীন্দ্রনাথ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পাঠ ক'রে সাহিত্যের যে প্রথম আস্বাদ পেয়েছিলেন, সকল ভাগ্যবান্ শিশুই তা একদিন পায়। পাখি যেমন ক'রে তার বাচ্চাকে উড়তে শিখিয়ে আকাশচারী করে, মানুষও সেই রকমে তার সন্তানকে সংকেতের প্রয়োগ শিখিয়ে সাহিত্যচারী অর্থাৎ বিদ্যার্জনের যোগ্য করবার চেষ্টা করে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে সংকেতের কৃত্রিমতা আর লক্ষ্য হয় না, পড়া আর লেখার শক্তি ওঠা-হাঁটার মতই স্বভাবে পরিণত হয়।

এদেশে অসংখ্য হতভাগ্য অক্ষরপরিচয়েরও সুযোগ পায় না, অনেকে কোনও রকমে অক্ষর চেনে কিন্তু অর্থ বোঝে না। সামান্য লেখাপড়া শিখেও যে শক্তিলাভ হয় তার মর্ম আমরা সহজে বুঝি না, ছেলেবেলায় অনেকের সঙ্গে যা পাওয়া যায় তা তুচ্ছ মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যখন রাঁধবার কাজে বাহাল করি তখন সে এক টাকা বেশী মাইনে চেয়েছিল, কারণ সে চতুঃশাস্ত্রে পণ্ডিত। জানতে চাইলাম কি কি শাস্ত্র। উত্তর দিলে—পড়তে জানি, লিখতে জানি, যোগ দিতে পারি, এ-বি-সি-ডি চিনি। লোকটির শাস্ত্রজ্ঞান যতই অল্প হোক, সে তার নিরক্ষর আত্মীয়স্বজনের তুলনায় শিক্ষিত—এই অসামান্যতার গৌরব সে বুঝেছিল।

স্মরণশক্তি এবং বিচারশক্তির সাহায্যের জন্য মানুষ নানারকম প্রতীক বা সংকেতের উদ্‌ভাবন করেছে। পদার্থবিজ্ঞানী তাঁর আলোচ্য পদার্থের ধর্ম ও সম্বন্ধের প্রতীকস্বরূপ বিবিধ অক্ষর প্রয়োগ করেন। রসায়নী শাখা-প্রশাখাময় ফরমুলার দ্বারা বস্তুর গঠন নির্দেশ করেন। বিজ্ঞানচর্চার জন্য এই সব সংকেত অপরিহার্য, কিন্তু এদের প্রকাশশক্তি অতি সংকীর্ণ। কোনও বস্তু যখন উপর থেকে নীচে পড়ে তখন তার বেগের ক্রমবৃদ্ধির হার বোঝাবার জন্য g অক্ষর চলে। কিন্তু এই অক্ষরটি দেখলে কোনও বস্তুর পতন আমাদের মনে প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হয় না। জলের সংকেত H_2O দেখলে তৃষ্ণাহারক পানীয় বা বৃষ্টিধারা বা মহাসাগর কিছুই মনে আসে না। সংগীতের জন্য স্বর-লিপি উদ্‌ভাবিত হয়েছে। তা দেখে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাল-মান-লয়ের বিন্যাস বুঝতে পারেন, কিন্তু তাতে গান বাজনা শোনার ফল হয় না। হয়তো খুব অভ্যাস করলে স্বরলিপি প'ড়েই সংগীতের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্ভবত এরকম অভ্যাসের প্রয়োজন কোনও কালে হবে না। সংগীত যতই কাম্য হোক তা এমন আবশ্যক নয় যে শ্রুতিগত সাক্ষাৎ উপলব্ধির অভাবে সংকেতজনিত কল্পনার শরণ নিতে হবে।

সত্যমূলক বা কাল্পনিক কোনও ব্যাপার প্রতিরূপিত করবার যত উপায় আছে তার মধ্যে নাটকাভিনয় শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়, কারণ তা দেখাও যায় শোনাও যায়। তার পরেই মুখর চলচ্চিত্রের স্থান। শুনতে পাই এখন আর talkie যথেষ্ট নয়, smellie উদ্‌ভাবিত হচ্ছে, যাতে চিত্রাপিত ঘটনার আনুষঙ্গিক গন্ধও পাওয়া যাবে। পরে হয়তো tastie আর touchieর আবিষ্কারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তর্পণ পূর্ণ হবে, ভোজের দৃশ্যে দর্শককে খাওয়ানো এবং দাঙ্গার দৃশ্যে কিঞ্চিৎ প্রহার দেওয়া হবে। কিন্তু অভিনয় বা সিনেমা কোনওটি সহজলভ্য নয়, বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সংকেতও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষতুল্য নয়। লিখিত সাহিত্যই একমাত্র উপায় যাতে জ্ঞান বা অনুভূতি সঞ্চারের জন্য কোনও আড়ম্বর দরকার হয় না, নূতন সংকেতও অভ্যাস করতে হয় না।

সাহিত্যের যা বিষয় তা এতই বিচিত্র আর জটিল যে তার প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। কবিবর্ণিত নিসর্গদৃশ্য বা মানবচরিত্র, অথবা ভূগোলবর্ণিত বিভিন্ন দেশ-নদী-পর্বত-সাগরাদি, আমরা ইচ্ছা করলেই দেখতে পারি না। ঐতিহাসিক ঘটনা বা গ্রহনক্ষত্রের রহস্য আমাদের দৃষ্টিগম্য নয়। মৃত মহাপুরুষদের মুখের কথা শোনবার উপায় নেই। বিজ্ঞান বা দর্শনের সকল তথ্যের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অথচ অনেক বিদ্যা অল্পাধিক পরিমাণে শিখতেই হবে, নতুবা মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকবে। হিতোপদেশে আছে—

> অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
> সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

—অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক, সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্র যার নেই সে অন্ধই। শাস্ত্র অর্থাৎ বিদ্যা শেখবার এই প্রবল প্রয়োজন থেকেই সংকেতময় লিখিত সাহিত্যের উৎপত্তি। যা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য হ'তে পারে না তা সভ্য মানবের পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে চিরস্থায়ী এবং সকলের অধিগম্য হয়েছে। একজন যা জানে তা সকলে জানুক—সাহিত্যের এই সংকল্প মুদ্রণের আবিষ্কারে পূর্ণতা পেয়েছে।

যে ভাষা অবলম্বন ক'রে সাহিত্য রচিত হয় সেই

ভাষাও সংকেতের সমষ্টি। এই সংকেত শব্দাত্মক ও বাক্যাত্মক, কিন্তু বিজ্ঞানাদির পরিভাষার তুল্য স্থির নয়, প্রয়োজন অনুসারে শব্দের ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা বলেছেন—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি কেবল আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, আর দুটি থেকে প্রকরণ অনুসারে গৌণ অর্থ পাওয়া যায়। শব্দের যেমন ত্রিশক্তি, বাক্যের তেমন উপমা রূপক প্রভৃতি বহুবিধ অলংকার। সাহিত্যের বিষয়ভেদে শব্দ ও বাক্যের অভিপ্রায় এবং প্রকাশশক্তি বদলায়। স্থূল বিষয়ের বর্ণনা বা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল না হ'লে চলে না, তাতে শব্দের অভিধা বা বাচ্যার্থই আবশ্যক, লক্ষণা আর ব্যঞ্জনা বাধা-স্বরূপ। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, কদাচিৎ একটু রূপকও চলতে পারে, কিন্তু উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অন্যান্য অলংকার একেবারেই অচল। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড' — এ ভাষা কাব্যের উপযুক্ত কিন্তু ভূগোলের নয়।

যন্ত্রাদি বা মানবদেহের গঠন বোঝাবার জন্য যে নকশা আঁকা হয় তা অত্যন্ত সরল, তার প্রত্যেক রেখার মাপ মূলানুযায়ী, তা দেখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান, আকৃতি আর আয়তন সহজেই মোটামুটি বোঝা যায়। যন্ত্রবিদ্যা শারীর-বিদ্যা প্রভৃতি শেখবার জন্য নকশা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তা শুধুই একসমতলাশ্রিত মানচিত্র বা diagram, তাতে মূল বস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় না। তার জন্য এমন ছবি চাই যাতে অঙ্গের উচ্চতা নিম্নতা দূরত্ব নিকটত্ব প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়। ছবিতে চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মে রেখা বিকৃত করেন, উচ্চাবচতা বা আলো-ছায়ার ভেদ প্রকাশের জন্য মসীলেপের তারতম্য করেন, ফলে মাপের হানি হয় কিন্তু বস্তুর রূপ ফুটে ওঠে। ঠিক অনুরূপ প্রয়োজনে লেখককে ভাষার সরল পদ্ধতি বর্জন করতে হয়। যেখানে বর্ণনার বিষয় মানবপ্রকৃতি বা হর্ষ বিষাদ অনুরাগ বিরাগ দয়া ভয় বিস্ময় কৌতুক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় চিত্তবৃত্তি, সেখানে শুধু শব্দের বাচ্যার্থ আর নিরলংকার বৈজ্ঞানিক ভাষায় চলে না। নিপুণ রচয়িতা সে স্থলে ত্রিবিধ শব্দবৃত্তি এবং নানা অলংকার প্রয়োগে ভাষার যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন তাতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ও পাঠকের বোধগম্য হয়।

অনেক আধুনিক লেখক নূতনতর সাংকেতিক ভাষায় কবিতা লিখছেন। এই বিদেশাগত রীতির সার্থকতা সম্বন্ধে বহু বিতর্ক চলছে, অধিকাংশ পাঠক এসব কবিতা বুঝতে পারেন না। জনকতক নিশ্চয়ই বোঝেন এবং উপভোগ করেন, নয়তো ছাপা আর বিক্রয় হ'ত না। চিত্রে cubism আর sur-realismএর তুল্য এই সংকেতময় কবিতা কি শুধুই মুষ্টিমেয় লেখকের প্রলাপ, না অনাস্বাদিত-পূর্ব রসসাহিত্য? মীমাংসার সময় এখনও আসে নি। নূতন পদ্ধতির লেখকরা বলেন—এক কালে রবীন্দ্রকাব্যও সাধারণের অবোধ্য ছিল, অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্রকলাও উপহাস্য ছিল; ভাবী গুণগ্রাহীদের জন্য সবুর করতে আমরা রাজী আছি। হয়তো এঁদের কথা ঠিক, কারণ নূতন সংকেতে অভ্যস্ত হ'তে লোকের সময় লাগে। হয়তো এঁদের ভুল, কারণ সংকেতেরও সীমা আছে। নূতন কবিদের কেউ কেউ হয়তো সীমার মধ্যেই আছেন, কেউ বা সীমা লঙ্ঘন করেছেন। বিতর্ক ভাল, তার ফলে সদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা অথবা অসদ্‌বস্তুর উচ্ছেদ হ'তে পারে। যাঁরা বিতর্কে যোগ দিতে চান না তাঁদের পক্ষে এখন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই উত্তম পন্থা।*

---

* নিউ দিল্লীতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের একবিংশতিতম অধিবেশনে পঠিত।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

বধূর ঘাড়ে বোঝা ফেলিতেই যোগমায়া সচেষ্ট হইলেন।

দার্জিলিং স্বাস্থ্যকর স্থান। বধূর দেহবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছে, দেহও পুষ্ট হইয়াছে। এই বাড়ির নিরালা কোণের কথা—নির্জন পরিবেশের কথা যখন-তখন বধূর মুখে শুনা যায়। সে প্রায়ই বলে, মা, আপনাদের দেশের রাস্তায় ভারি ধুলো।

—আজ একমাস জল নেই যে মা। ধুলো আর কোন্ রাজত্বে নেই?

—শহরে পাইপে করে জল ছিটোয় কিনা, ধুলো জমে না।

—ওঃ! তাচ্ছিল্যভরে যোগমায়া উত্তর দেন।

—যে কুড়ি-বাইশ হাত কুয়ো আপনাদের দেশে—জল টেনে তুলতে প্রাণান্ত।

—হুঁ! যোগমায়ার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইতে থাকে।

—আর একটা বাথরুম না হ'লে ভারি অসুবিধে।

—সে আবার কি! গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও যোগমায়ার বিস্ময় ফুটিয়া উঠে।

—মানে নাইবার ঘর। দার্জ্জিলিঙে সব বাড়িতেই আছে।

—বেশ, কালই মিস্ত্রি ডাকিয়ে ইঁদারা-তলায় একটা ছোট ঘর করে দিচ্ছি। একটু থামিয়া বলেন, ভাল করে ঘর-সংসার দেখে নাও, আমি শীগগিরই তীর্থে যাব।

—আমাকেও সঙ্গে নেবেন মা।

—সাত সকালে তীর্থ কি? সে বয়েস হ'লে যাবে বৈকি।

—এ বাড়িতে আমি একলা থাকতে পারব না।

—সে কি—আমি যদি আজ মরে যাই—তোমার ঘর-সংসার বুঝে নেবে না?

—ও কথা বলবেন না মা। বধূ অনুনয় করে।

—মানুষ ত অমর নয়। হাসিয়া উত্তর দেন যোগমায়া।

বধূ ঘাড় নাড়িয়া বলে, না মা. ও কথা শুনলেও ভয় করে। আপনিও তীর্থে যাবেন—আমিও এক দিকে চলে যাব।

—ও কি কথা? ছিঃ! ভৎর্সনার সুরে যোগমায়া উত্তর দেন।

বধূ অপরাধিনীর মত হাতের আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াইতে লাগিল।

—যা বললে-বললে—আমার সামনে আর কখনও বলো না ও-কথা। আমরা এগার বছর বয়েস থেকে গুছিয়ে সংসার করতে শিখেছি। শাশুড়ী কত বকেছেন—কত শক্ত কথা বলেছেন। আবার আদরও করেছেন কত। নিজের সংসার নিজে না বুঝে নিলে কখনও লক্ষ্মীশ্রী থাকে!

বধূ আর কহিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যোগমায়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, যাও—গা ধুয়ে কাপড় কেচে নাও গে। আমি মাত্তর কালীঘাটে যাব। যাব আর আসব—ভয় কি? বিমল বাড়ি থাকবে।

বধূ চলিয়া গেল।

যোগমায়া হাসিলেন। বয়স হইলে কি হয়—একালের মেয়েরা মনে অত্যন্ত ছেলেমানুষই আছে। ন' বছরের মেয়ে এক দিন সভয়ে শাশুড়ীর আঁচল চাপিয়া ধরিতে পারে, এক ছেলে কোলে করিয়া যোল বছরে যেদিন সমস্ত দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়া সেই বালিকা এই ভিটায় ফিরিয়া আসিল—সেদিন ভয়ের লেশমাত্রও তার মনে ছিল না। অথচ আঠার বছরের মেয়ের ভয় দেখিলে হাসি পায়!

ভয় উহার ভাঙ্গাইতেই হইবে,—এই রবিবারেই তিনি কালীঘাট যাইবেন।

গাঙ্গুলী-গিন্নি, নিস্তারিণী, বোসেদের হরিলক্ষ্মী প্রভৃতি জন-কয়েক মিলিয়া তাহারা কালী দেখিতে রওনা হইলেন।

বধূকে উপদেশ দিতে গিয়া যোগমায়ার ত ট্রেন ফেল হইবার যো। অবশেষে বিমলই তাড়া দিয়া তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল।

গাড়ি খানকদূর আসিলে বলিলেন, ওই যাঃ—নিস্তার, হরি-নামের ঝুলিটা ফেলে এলাম।

—তা হোক, মনে মনে জপ করো। গাঙ্গুলী-গিন্নি উত্তর দিলেন।

—মানতের পয়সা ক'গণ্ডা যে আনা হ'ল না।

—এখন আনতে গেলে ট্রেন ধরা যাবে না ভাই, পরে কারও হাতে পাঠিয়ে দিও।

—কপালে ছোঁয়ানো পয়সা। যোগমায়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দেখা গেল—যে কয়টি প্রয়োজনীয় জিনিস—সব কটিই হয় ফেলিয়া অথবা ভুলিয়া আসিয়াছেন। ঘোড়ার গাড়ি বদল করিয়া ছোট ট্রেনে উঠিতে হইল; ছোট ট্রেনের পর চূর্ণীঘাটের নৌকা, তারপর রাণাঘাটে দুই দফা ট্রেন বদল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া বিরাট ষ্টেশন ও জনমণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত না-হওয়া পর্য্যন্ত একটি-না-একটি ফেলিয়া আসা জিনিসের জন্য যোগমায়ার মৃদু, সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ আক্ষেপে গাড়ির কামরা মুখরিত হইয়া উঠিল। বোস-গিন্নি মুখ টিপিয়া হাসিলেন, গাঙ্গুলী-গিন্নি কয়েকবার প্রবোধ দিলেন, নিস্তারিণী সর্ব্বক্ষণই সমবেদনাতুর হইয়া রহিলেন।

কলিকাতায় পা দিতে-না-দিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। বলিলেন, রাতকে দিন ক'রে রেখেছে—এত আলো জ্বাললে কে? বিস্ময় কাটিলে বলিলেন, কি জানি বাড়িতে কি কাণ্ড হচ্ছে! সন্ধ্যে উৎরে যাবার আগে পিদীমটা যদি জ্বেলে দেয়!

—দেবে—ভাই দেবে। বউ তোমার সেয়ানা খুব।

—কোথায় সেয়ানা! আমি তা হ'লে ভেবে মরি।

—কেন, কথার ত খুব ছবনবনা দেখতে পাই। বোস-গিন্নি বলিলেন।

—ওই কথাই। আমার আঁচল ধরেই ফেরে! যা বলি মুখটি বুজিয়ে শোনে।

—তবে ত ভাল তোমার বউ। বোস-গিন্নি বলিতে লাগিলেন, আমার বউটি কেমন জান? একেবারে যাকে বলে বিষ নেই কুলোপানা চক্কোর। আবার বলে, বোয়ের হিংসে করি। শুনেছ কথা! আমি যেন ওর সতীন! পোড়া কপাল!

নিস্তারিণীর বিস্ময় সব কথাতেই বর্দ্ধিত হয়। বলিলেন, ছেলের বোয়ের হিংসে? ওমা—সে আবার কি কথা!

—ওই যে কথায় কথায় টিকটিক্ করি কিনা। ক্ষেতি অপচো দেখতে পারি নে। সাধে বলি—তুমি বউ—একটা কাজের যদি ধরণ আছে! নথ ঘুরাইয়া বোস-গিন্নি বাহির পানে চাহিলেন।

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, এখন বউয়ের কথা রেখে—নিজের নিজের মোট গুনে নাও। কালীঘাটে এলাম বলে।

বোস-গিন্নির কথাটা যোগমায়ার মনে ধরিয়া গেল শাশুড়ী তবে সত্যিই বধূর হিংসা করে। অন্তত শাশুড়ী না মনে করুক—বধূরা হয়ত মনে করে। বধূর কথায় মনের মধ্যে ওই যে অকারণ উত্তাপ জমিতে থাকে—সে কি হিংসা? হিংসা বলিয়াই বধূর অকর্ম্মণ্যতাকে তীব্র কণ্ঠে অনাবৃত করিতে ইচ্ছা করে। কলহ যোগমায়া কোন কালেই ভালবাসেন না—অথচ ওই তীব্র উত্তাপ মন হইতে বাহির করিয়া দিতে গেলেই যে তীব্র বাক্য বাহির হয়—হয়ত তাহাই কলহের নামান্তর। জলস্রোতের মত হু-হু করিয়া শহরের সাজান বৈভব, জনস্রোত, আলো, প্রাসাদ, যানবাহন দ্রুত সরিয়া গেল। যোগমায়া বধূর কথা ভাবিতে লাগিলেন।

তা ঠেলাঠেলি করিয়া ঠাকুর দেখা এক রকম হইল। গঙ্গায় স্নান হইতে কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন—সবই ঠেলাঠেলির ব্যাপার। কাপড় ছিঁড়িবার ভয় আছে, কোমরের গেঁজিয়া অপহৃত হইবার ভয় আছে, হাতের জবাফুল ও বিল্বপত্র শক্ত মুঠার চাপে নিষ্পেষিত হইবার ভয় আছে। পাণ্ডা হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দিয়া বলিল, বল নমো। তারপর দ্রুত আবৃত্তির মধ্যেই যাত্রীর কণ্ঠ হইতে পূজা-মন্ত্র উচ্চারিত হইল কিনা সেটুকু না জানিয়াই অথবা বুঝিয়াই পাণ্ডা-ঠাকুর ভক্তের হাতের মুঠা শিথিল করিয়া দিলেন। অঞ্জলি দেবী-পাদপদ্মে পড়িল কি কোথায় পড়িল দেখিবার সুযোগ হইল না। পুরোহিত অন্ধকার গর্ভগৃহে প্রদীপ উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন, আচ্ছা ক'রে দর্শন কর মায়ি—পূজা দেও। মা কালীর লাল টকটকে জিহ্বার খানিকটা দেখা গেল শুধু, কানে—তাম্র পাত্রে অবিশ্রান্ত দর্শনী পড়িবার ঝনঝন্ আওয়াজ শ্রুত হইল, এবং যুক্তকর যাত্রীর প্রণাম শেষ হইতে-না-হইতে পাণ্ডা-ঠাকুর তাঁহাদের ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। বাহিরে আলো-হাওয়ায় নিঃশ্বাস লইবার সুযোগে যাত্রীরা কথা কহিবার সুযোগ পাইলেন।

—আঃ—খাসা দর্শন হ'ল। বোস-গিন্নি বলিলেন।

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, বড্ড তাড়াতাড়ি করে।

নিস্তারিণী বলিলেন, আর পিদীমের তেমন জোরও নেই।

চাটুয্যে-গিন্নি বলিলেন, যে তাড়াতাড়ি মন্তর পড়ে!

যোগমায়া কোন কথা না বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

বোস-গিন্নি রহস্য করিয়া কহিলেন, কি দিদি, লাউ-মাচা—পুঁই-মাচা দেখলে নাকি?

যোগমায়া বলিলেন, সে ত তবু একটা ঠাহর করা যায়—এ সবই ধোঁয়া।

সকলেই হাসিলেন। ধোঁয়া? উনুনের, না মনের?

যোগমায়া বলিলেন, মনেরই ভাই।

ঠাকুর দর্শন হইলে দুই ধারের দোকানে যে অজস্র রকমের জিনিসপত্র আছে—সেই দিকে ইহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। গাঙ্গুলী-গিন্নির কোন আত্মীয় কালীঘাটে বাসা করিয়া আছেন। তাঁহারই ভবনে এই নাতিবৃহৎ দলটি আশ্রয় লইয়াছেন। সেই বাড়িরই একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলে পথ-প্রদর্শকের কাজ করিতেছিল। ছেলেটি ছোট হইলেও—একেবারে স্ত্রী-চরিত্র অনভিজ্ঞ নহে। ইহাদের দোকানের দিকে ঝুঁকিতে দেখিয়া বলিল, এ বেলা বাসায় চলুন, খাওয়া-দাওয়া করে ও বেলা বরঞ্চ জিনিস-পত্র কিনবেন।

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, এই পাঁচ মিনিট বাবা। তুমি একটু দরদস্তুর করে দাও, চেনা দোকান দেখিয়ে দাও।

কিন্তু সে অবসরটুকুও ইহারা ছেলেটিকে দিলেন না। সামনের বড় দোকানটিতেই হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং জিনিস হাতে করিয়া দরদস্তুর আরম্ভ করিলেন। ছেলেটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

—ওমা, ওইটুকুন পুতুলের দাম ছ' পয়সা!

—এযে কালীঘাটের পুতুল মা, আর কোথাও এমন পুতুল পাবেন না।

—নাঃ! আমাদের কেষ্টনগরে বার-দোলের মেলায় যা পুতুল আসে······ঘূর্ণির মত কারিগর কোথাও আছে নাকি?

নিস্তারিণী বলিলেন, তবে বার-দোল থেকেই না হয় নেব। মিছিমিছি এতদূর থেকে মাটির ঢেলা বয়ে মরি কেন?

যুক্তি ভাল। কিন্তু ঘূর্ণির কারিগর ভাল হইলেও—কালীঘাটের তীর্থ-মাহাত্ম্য ত সে পুতুলগুলিতে নাই। দরদস্তুর চলিতে লাগিল, এবং বোঝার আঁচল ক্রমশঃই ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল। এ দিকে ছেলেটি তাগাদা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, চলুন, দশটা বেজে গেল যে!

—হেই বাবা, আর একটুখানি—দু'খানা পট ভাল দেখে কিনে নেই।

—ওবেলাই না-হয় কিনবেন—দোকান তো উঠে যাবে না। ছেলেটি যেন বিরক্ত হইয়াছে।

কিন্তু ছেলেমানুষের কথা শুনিতে গেলে আর সংসার চলে না। দোকানী ত আগেই বলিয়াছে, যা কিনবার পছন্দ করে নিন্ মাঠাকরুণরা ওবেলা ফিরিয়ে যেতে পারে জিনিস।

ধূর্ত্ত দোকানী জানে—ইহাদের প্রত্যেক জিনিসের প্রতি অপরিসীম লোভ আছে এবং পুরাতন দোকান খুঁজিয়া বাহির করিবার ধৈর্য্যেরও অভাব।

বলিল, সবুর করুন না বাবু, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্টই হবে না।

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, তুমিও যেমন বাবা, বিধবার আবার খাওয়া! একটা ভাতে-ভোতে—

ছেলেটি মনে মনে বলিল, সবাই ত আর বিধবা নয়।

পট কেনা হইলে—কাঠের খেলনার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেগুলি কিনিয়া পিতলের বাসনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

—এই পঞ্চ পিদীম কত বাবা? পিলসুজ? তামার কোশো?

দোকানী ইহাদের চেনে—কাজেই চড়া দাম হাঁকিয়া বসিল। দরদস্তুরে ইহারাও পটু। দেবস্থানের মাহাত্ম্য-বর্ণন ও ধর্ম্ম-শপথ করিয়া ন্যায্য দরটি বলিয়াও দোকানী শুধু ইঁহাদেরই খাতিরে দর কমাইতে থাকে—খুশী মনে ইহারাও জিনিস গ্রহণ করিতে থাকেন। পিতলের জিনিসের পর জপের মালা ইত্যাদির উপর দৃষ্টি পড়িল।

কিন্তু সঙ্গী ছেলেটি অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, তাহলে আপনারা জিনিস কিনুন—আমি ঘুরে আসি।

সত্যই সে দোকান ত্যাগ করিয়া যায় দেখিয়া—সে ঘটনাকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দিবার সাহস কাহারও হইল না। চেনা পথ হইলে অবশ্য অন্য কথা ছিল।

—ওই বাবা—একটু দাঁড়া। কার ঠেঁয়ে কি পয়সা ধার করলাম—একটু হিসেব করে নিই। যোগমায়া-দিদি—তুমি দিয়েছ আমায় পাঁচ পয়সা—কিন্তু তোমার ঠেঁয়ে এক গুটি (কাচি পোয়া) দুধের দাম দেড় পয়সা পাব। তাহলে দেড় পয়সা বাদ দিলে—তোমার পাওনা হ'ল গিয়ে সাড়ে তিন পয়সা। কেমন সাড়ে তিন পয়সা নয় ?

—তার জন্য ব্যস্ত কি ভাই—বাড়ি গিয়েই দিও।

—তাত দেবই, কিন্তু তীর্থের পয়সা হিসেবে গোল হ'লে নরক ভোগ করতে হবে যে দিদি। আমরণ—ভিক্ষে চাইতে এসে একেবারে ছুঁয়ে ফেললি! আস্পর্দ্ধা কম ত নয় মাগির।

এইরূপে জিনিসপত্র আঁচলে বাঁধিয়া, পয়সার হিসাব ও লাভ-লোকসান খতাইয়া বেলা একটার সময়ে সকলে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

আহারাদি সারিতে অপরাহ্ণ হইল। গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, কাল সকালের ট্রেনেই ত বাড়ি যাব, এই বেলা রোদ্দুর থাকতে থাকতে মালা দু'গাছা কিনে আনি গে ভাই।

নিস্তারিণী বলিলেন, তাই চল দিদি, সইয়ের জন্যে আমিও একখানা মা-কালীর পট নেব।

কিন্তু ও-বেলাকার সেই ছেলেটিকে পাওয়া গেল না। গাঙ্গুলী গিন্নি বলিলেন, ভারি ত রাস্তা—আর ও-বেলা দোকানও চিনে এসেছি একলাই কত কেনা-কাটা করতে পারি।

এ-বাড়ির বধূরা ঝিকে সঙ্গে দিতে চাহিলে ইহারা অস্বীকার করিলেন।

—কালীঘাট ত পাড়াগাঁর মত। আর তোমাদের তালগাছ-ওলা বাড়ি খুব চিনতে পারব।

তবু যদি ভুলিয়া যান—এই জন্য বধূরা বলিল, তিরিশ নম্বর মনে রাখবেন। হালদার পাড়া।

চেনা দোকান খুঁজিয়া না পাইলেও দোকানীরা সবাই ভদ্র। সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইল। নানা প্রকারের জিনিস দেখিয়া ইহাদেরও অঞ্চল-গ্রন্থি শিথিল হইতে লাগিল।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া যাওয়াতে বড় কাচের পুতুলটা হাতে লইয়া যোগমায়া বলিলেন, দু'আনা পয়সা হবে নিস্তার ?

নিস্তারিণী বলিলেন, আমিই বলে তোমার কাছে চাইব-চাইব মনে করছি। আহা—কালীঘাট এমন জানলে আর দু'এক টাকা সঙ্গে করে আনতাম!

সে আক্ষেপ কম-বেশি সকলেই করিলেন এবং ক্রীত দ্রব্যের দোষগুণ বিচার করিতে করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ভাদ্রের আকাশে তীব্র রৌদ্রের পিছনে একখানা বড় কালো মেঘ তাড়া করিয়া আসিতেছিল। সেইখানা কালীঘাটের এই রাস্তাটির উপর—থমকিয়া দাঁড়াইল ও বিনা সতর্কতায় হঠাৎ বর্ষণ সুরু করিয়া দিল।

যোগমায়াদের দল ছুটিতে ছুটিতে একটি গেট-ওয়ালা বাড়ির গাড়িবারান্দার তলায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মাটির পুতুল না থাকিলে আশ্রয় লইতেন কি না সন্দেহ। এমন সময় সেই গাড়িবারান্দার সামনে একখানা মোটর আসিয়া থামিল। ছোট্ট ঝকঝকে মোটর হইতে নামিল—দুইজন সুশ্রী ও সুবেশ তরুণ তরুণী।

তরুণের পরনে মোটা কাপড়—গায়ে মোটা জামা ও চাদর, পায়ে চটি জুতা। উজ্জ্বল রং, মার্জ্জিত ও চকচকে চওড়া কপাল, চক্ষু বুদ্ধির দীপ্তিতে শাণিত, দাঁতগুলি সাদা ঝকঝকে। তরুণীর গাত্রবর্ণ অতটা উজ্জ্বল নহে, খোঁপা দেখিয়া মনে হয় চুল আগুল্ফ-লম্বিত, কিন্তু চুল বাঁধিবার ধরণটি—ইহাদের সুষ্ঠু বলিয়া বোধ হইল না। কপালে সিঁদুর ও হাতে লোহা নাই, কাপড়ের পাড়ও তেমন চওড়া নহে! চোখ দুটি বড় হইলে কি হয়—দৃষ্টিটা কেমন যেন প্রখর। এই এতগুলি স্ত্রীলোকের সম্মুখে মাথার ঘোমটা তুলিয়া বাহ্যিক লজ্জা-প্রকাশের নিয়মটুকুও রক্ষা করিতে তাহার যথেষ্ট আলস্য দেখা গেল।

কলিকাতার চলনই—আলাদা!

যুবক অপাঙ্গে জড়সড় কৌতূহলাক্রান্ত জনতার পানে চাহিয়া মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, রেবা, বাইরের ঘরটা খুলে ওঁদের বসাও। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন।

দুয়ার খুলিয়া রেবা অভ্যর্থনা করিল, আসুন, বসবেন আসুন!

উন্মুক্ত দ্বারপথে উঁকি মারিয়া সকলেই সে গৃহের সজ্জা-নৈপুণ্য কিছু কিছু দেখিলেন। চেয়ার-টেবিলে ঠাসাঠাসি ঘর—কয়েকটা বই-ঠাসা আলমারিও রহিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে যে-সব ছবি ঝুলিতেছে—তাহার একখানিও পরিচিত দেবদেবীর নহে। অপরিচিত সায়েব, মেম, ঘোড়া, কামান, পাহাড়, ফুলগাছ, নদী, বাড়ি, শৃঙ্গ ও লাঙ্গুল সমন্বিত কাল দৈত্য—অদ্ভুত সব ছবি। পরস্পর গা টেপাটেপি করিয়া ইহারা নিঃসন্দেহ হইলেন যে—ইহা কোন হিন্দুর বাড়ি নহে।

রেবা ডাকিল, আসুন!

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, আর যাব না মা, বেশ আছি। ভাদ্দর মাসের বিষ্টি—এখুনি ছেড়ে যাবে।

রেবা বলিল, বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে আধ ঘণ্টার আগে আর ছাড়ছে না। আপনারা যদি না বসেন ত ভারি দুঃখিত হব।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন, আধ ঘণ্টা লাগবে! বল কি? অন্ধকার হ'লে আমরা পথ চিনতে পারব না যে?

—অন্ধকার হবে কেন, পথে আলো জ্বলবে।

—রাত হবে ত। আলো জ্বললেও পথ চিনতে পারব কেন, মা।

রেবা হাসিয়া বলিল, ঠিকানাটা দেবেন—আমি আপনাদের পৌঁছে দেব।

—তুমি একলা যাবে আম'দের সঙ্গে? কেউ কিছু বলবেন না?

—না। রেবা হাসিয়া উত্তর দিল। আমার শাশুড়ীর ঢালাও হুকুম আছে।

—তোমার শাশুড়ী আছেন? তাঁকে দেখলাম না ত!

—তিনি ত এখানে নেই। এলাহাবাদে থাকেন।

অবশেষে ইঁহারা ঘরে আসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে এক পাশে দাঁড়াইলেন। রেবার অনুরোধে নহে, বৃষ্টির সঙ্গে এমন এলোমেলো হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে যে—কোঁচড়ের পুতুলগুলি সেই ছাঁট হইতে রক্ষা করা দুষ্কর।

রেবা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিল, বসুন।

—না মা, দাঁড়িয়েই বেশ আছি।

নিস্তারিণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, যা তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল হ'লে—

রেবা বলিল, জল খাবেন? আচ্ছা, আমি এনে দিচ্ছি।

রেবা চলিয়া গেলে যোগমায়া বলিলেন, তোর যদি কোন কালে আক্কেল হ'লো নিস্তার। কি জাত ঠিক নেই—বললি জল তেষ্টা পেয়েছে।

—জল তেষ্টা পেয়েছে তাই বললাম। তা আমি কি জানি মেয়েটা জল আনতে ছুটে যাবে।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন, যাবে না ছুটে! ওরা ত ওই চায়।

শুষ্ক কণ্ঠে নিস্তারিণী বলিলেন, কি চায় ওরা?

—জান না—ওরা যে খিরিষ্টান। ছোঁয়া খাইয়ে সবাইকে খিরিষ্টান করে দেয়।

নিস্তারিণী শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, ওমা, তবে আমার কি হবে! কেন মরতে তেষ্টার কথা বললাম! দিদি, পালাই চল।

—বৃষ্টি ঝেঁপে এলো। এককাঁড়ি পয়সা দিয়ে পুতুল কিনলাম—সব নষ্ট করব নাকি! ঝাঁজিয়া উঠিলেন বোস-গিন্নী।

নিস্তারিণী পরম বিপদে দিশা না পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। যোগমায়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, কি হবে—দিদি?

কি করিয়া নিস্তারিণীর জাতি রক্ষা হয়—সেই চিন্তায় সকলেরই মুখ কালো ও গম্ভীর হইয়া উঠিল।

অবশেষে বোস-গিন্নী বলিলেন, পোড়া কপাল! ভর সন্ধ্যে বেলা ইষ্টদেবতার নাম না করে জল খাব কিগো!

অকূলে কূল পাইয়া নিস্তারিণী হাসিমুখে বলিলেন, তাই বটে, বাঁচালি দিদি।

জলের গ্লাস হাতে রেবা আসিয়া বলিল, শুধু জল দেওয়া যায় না! উনি বললেন—মিষ্টি আনিয়ে দিতে। একটু বসুন না দয়া করে।

পরস্পরের গায়ে চিমটি কাটিয়া দলটি রেবার এই সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে বিশেষরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বোস-গিন্নী বলিলেন, ভর সন্ধ্যে বেলা ইষ্টদেবতার নাম না নিয়ে কি জল খেতে পারি মা।

—তবে কে যেন জল চাইলেন?

—ও ভুলে বলে ফেলেছে। কিছু মনে কর না—মা। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বেশত, জিজ্ঞেস করুন না।

—তোমরা কি খিরিষ্টান?

রেবা হাসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। চেয়ারের হাতলে দু'হাত চাপিয়া অদম্য হাসির বেগকে ঈষৎ সম্বৃত করিয়া কহিল, না।

—তবে হাতে নোয়া নেই—মাথায় সিঁদুর নেই—

রেবা হাসিতে হাসিতেই বলিল, হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর পুরুষের দাস্যবৃত্তির চিহ্ন বলে আমরা ত্যাগ করেছি।

—ওমা, স্বামীর অকল্যাণ হয় না?

—হয় নি ত। ভালই আছে। হাসিতে হাসিতেই রেবা উত্তর দিল।

যোগমায়া শিহরিয়া মনে মনে বলিলেন, ষাট—ষাট! কি বেহায়া মেয়েগো।

রেবা বলিল, তবে আপনাদের অনুমান মিথ্যে নয়। আমরা হিন্দু হলেও—আচার-বিচারে আপনাদের চেয়ে পৃথক্। ব্রাহ্ম জানেন! আমরা তাই।

—হুঁ—বেশ জানি। ঘর দেখেই আমরা বুঝেছি। তা কালীঘাটে বাসা করেছ কেন?

—শ্বশুরের ভিটে—কোথায় যাব বলুন।

—কালীঠাকুরকে দেখেছ কখনও?

—কত বার।

—প্রণাম করেছ?

রেবা হাসিয়া বলিল, প্রণাম করেছি শুনলে আপনারা খুসি হবেন?

—ঠাকুরকে প্রণাম করলে কে আর খুসি না হয়।

এমন সময়ে উপর হইতে গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, রেবা একবার উপরে এসো, অতীন এসেছে।

—আপনারা বসুন—আমি চট্ করে আসছি।

রেবা চলিয়া গেলে নিস্তারিণী বলিল, আর নয় দিদি, পালাই চল। হয়ত খাবার নিয়ে আসবে।

বোস-গিন্নী বলিলেন, মিথ্যে নয়। জলও কমে এল, আঁচলের তলায় ঢেকে-ঢুকে দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি চল।

যোগমায়া বলিলেন ত মাদের অত ভয়ই বা কিসের! না খেলে—কেউ জোর করে খাইয়ে দিতে পারে!

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন, কর্ত্তা বলতেন—ওরা সব পারে। গিয়ে না নাইলে গা ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকবে ভাই।

সকলের মতে সায় দিয়া অগত্যা যোগমায়াও অল্প বৃষ্টি মাথায় করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ম্লেচ্ছগৃহ ভাবিয়াও এই ভাবে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিতে তাঁহার কোথায় যেন বাধিতে ছিল। ব্রাহ্ম বলিয়া যা একটু ভয়, নতুবা মেয়েটির হাসি-খুসি মুখের কথাগুলি ভারি মিষ্ট। জল খাওয়াইবার অনুরোধটুকু আন্তরিক। অতিথিকে যত্ন-আপ্যায়ন করা পল্লীবাসীদের নূতন নহে। অতগুলি মিষ্ট আনাইতে দিয়া মেয়েটি বড় ভুল করিয়াছে। আহা—বেচারীর জিনিসগুলি নষ্ট হইবে! আর মনেও কষ্ট পাইবে বৈকি।

পথে নামিয়া গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন, যাঃ—ভিজে গেল পুতুলগুলো।

যোগমায়া ঈষৎ তিক্তস্বরে বলিলেন, একটু থাকলেই হ'ত। ও ত আর এতগুলো লোককে ধরে খেয়ে ফেলত না!

নিস্তারিণী চুপি চুপি বলিলেন, দিদি ত বললেন—ওরা সব পারে? নয় দিদি?

পুতুল ভিজিয়া যাওয়ায় গাঙ্গুলী-গিন্নীর মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। চড়া গলায় বলিলেন, সব পারে বলে মানুষ খায় নাকি? ওরা কি রাক্ষস! মরণ আর কি।

নিস্তারিণী এতটুকু হইয়া গিয়া চুপ করিলেন।

বোস-গিন্নী বলিলেন, কি গো, তালগাছওলা বাড়ি দেখতে পাচ্ছ?

—এর চেয়ে অন্ধকার ভাল। খানিকটা আলো—খানিকটা অন্ধকার, তালগাছ কি নারকোল গাছ কি আমগাছ ঠাহর করা যায় নাকি!

—তবে কি হবে?

—হাঁগো বাছা—তিরিশ নম্বরের বাড়ি কোন্‌টা বলতে পার?

—ওই যে বাঁহাতে গলিটার মুখে।

—ওমা তাই ত! তালের বালদো নড়ছে হাওয়ায়—দেখেছ দিদি। নিস্তারিণী মৌন ভঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

৪

নূতন চেহারা লইয়া বাড়িটা দেখা দিল, নূতন মূর্ত্তি বধূরও। শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইতেই তিনি আন্তরিক স্নেহোচ্ছ্বসিত করে চিবুক ধরিয়া চুমা খাইলেন। রেবা মেয়েটিকে তাঁহার মনে পড়িল। সে যেন শহরের তীব্র আলোর মতই চোখ ধাঁধানো, আর লতা, সেকালের স্নিগ্ধ মাটির প্রদীপ না হউক, তার চেয়ে উজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলো। যোগমায়ার চোখে ঈষৎ তীব্র লাগে সে আলো—কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে, কত সুস্নিগ্ধ এ আলো। খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাড়ি দেখিতে লাগিলেন যোগমায়া। কার্ণিশের চুণবালি খসিয়াছে কি না, আলিসার ইট স্থানচ্যুত হইয়াছে কি না, মেঝের কোথাও ফাটিয়াছে বা গর্ত্ত হইয়াছে কি না, পৈঁঠা বা সিঁড়ির ধাপের কোণগুলি ভাঙিয়াছে কি না। কড়ি বরগায় মাকড়সারা কিছু ঘন ঝুল বুনিয়াছে—ঘরের কোণে সামান্ত ধুলাও যেন জমিয়াছে। আর গাছগুলি বেশ সতেজই আছে। শসার মাচায় যে সাতটি শসা গুনিয়া রাখিয়াছিলেন—সেই সাতটিই আছে, আরও গুটি কয়েক জালি পড়িয়াছে। কুমড়া গাছটায় জালি সমেত আর একটি ফুল ধরিয়াছে। আর বাতাবীলেবুগাছটায় অনেকগুলি ফল ছিল—সেগুলি গুনিয়া উঠা দুষ্কর, তবু আন্দাজমত হিসাব করিতে লাগিলেন—ফলগুলি ঠিক আছে কিনা।

—হাঁ মা, বিমলকে একটা বাতাবীলেবু পেড়ে দাও নি কেন, ও বড্ড লেবু ভালবাসে। মুড়ি দিয়ে না হয় একটা শসাই খেতে!

বধূ বলিল, ছোট্ট জালি শসা বলে তুলি নি।

—আঃ পোড়ার দশা, গাছের জিনিস নিজেরা আগলাবে—পেড়ে খাবে—তবে না আহ্লাদ। কলু তেল দিয়ে গেছে?

ঘাড় নাড়িয়া লতা স্বীকার করিল।

পা ধুইয়া পুঁটুলি খুলিতে বসিলেন যোগমায়া।

—এই নাও, ওগুলো কাঠের আলমারিতে ভাল করে গুছিয়ে রাখগে। এই পট দু'খানা টাঙিয়ে দেও ঘরে।

লতা বলিল, এই পুতুলটার হাত ভেঙ্গে গেছে যে মা।

অ্যাঁ—দেখি? ওমা তাইত, সাত মুল্লুক বয়ে এনে—এই ঘোড়ার গাড়িতে ওঠবার সময় ধাক্কা লেগে হবে না? একখানা গাড়িতে ছ'জন লোক—যেন গুড়ের নাগরি বোঝাই! খানিকক্ষণ আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, তা হোক তুলে রাখ। তবু তীর্থির চিহ্ন।

খাইতে বসিয়া তীর্থের গল্প আর ফুরায় না। রেলগাড়ি, রাজধানী, লোকজন, ঠাকুর, আদিগঙ্গা ইত্যাদি লইয়া এমন অনর্গল কাহিনী বলা চলে—যাহা এক মাসেও ফুরাইবার কথা নহে। আহারাদি শেষ হইলে বধূ একখানি খামে মোড়া চিঠি আনিয়া যোগমায়ার হাতে দিল।

বলিল, আমি পান সেজে আনি মা।

ঢাকা হইতে রামচন্দ্র চিঠি দিয়াছেন। অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন: শরীর যেন এলাইয়া থাকে—বল পাই না। আর একটা বছর কেমন করিয়া যে কাটিবে জানি না। পেন্‌সনের শেষ বছরটা—যেন কাটে না। বধূমাতা ওখানে না থাকিলে তোমাকে আসিতে লিখিতাম।

পান লইয়া লতা ফিরিয়া আসিল। বলিল, মা, কি ভাবছেন? খবর সব ভাল তো?

—না মা, তোমার শ্বশুরের শরীর ভাল যাচ্ছে না।

—তবে ছুটি নিন্ না কেন।

—পেন্‌সনের আর এক বছর আছে মাত্র, এখন ছুটি নেয়া নাকি খারাপ।

—তবে আপনি সেখানে যান।

—আমি? তোমাকে একলা ফেলে আমি কোথায় যাব? ম্লান হাসি হাসিলেন যোগমায়া।

লতা জিদ ধরিল, না মা, তাঁকে দেখবার একজন লোকের দরকার। আপনার যাওয়া উচিত।

—উচিত ত বুঝি—কিন্তু যাই কি ক'রে মা?

একটু ভাবিয়া লতা বলিল, কাউকে রাত্তিরে শোবার ব্যবস্থা করে যান—আমি একলাই থাকব না হয়।

সে জানে—বাড়ি একেবারে বন্ধ করাটা যোগমায়া পছন্দ করেন না কোন দিন, নতুবা শাশুড়ীর সঙ্গিনী হইতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল।

—পারবে থাকতে? শেয়াল ডাকলে ভয় করবে না?

—ভয় করবে কেন—খুব থাকতে পারব।

যোগমায়ার অন্তর একস্মাৎ আনন্দের বন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। সংসার রাখিবার শক্তি এ মেয়ের আছে। কল্যাণী বধূ—লক্ষ্মী বধূ।

আবেগে তিনি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার।

লতা সেই আদরে বিহ্বল হইল না, মুখ তাহার ঈষৎ শুকাইয়া গেল।

সাত-সমুদ্র-তের-নদী না হউক, বার কয়েক ট্রেন বদল ও মাঝখানে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী ষ্টীমারে চাপিয়া পদ্মার উপর পাড়ি দেওয়া—একা যোগমায়ার সাধ্য নহে। পাড়ারই একজন অল্প লেখাপড়া জানা নিষ্কর্ম্মা যুবক সঙ্গী হইল। যাত্রা-পথের দূরত্বে ও বিঘ্নসঙ্কুলত্বে ম্রিয়মাণ হইবারই কথা। তবু—পদ্মার বিস্তীর্ণ বুকে ষ্টীমারের দোলায় দুলিতে দুলিতে এই যাত্রার মধ্যেও ভয় দূর হইবার অবসর যথেষ্ট আছে। তীরে ভিড়িবার মুখে অবতরণোন্মুখ যাত্রীদলের উৎসাহে মন চঞ্চল হইয়া উঠে। এই ক্ষণকালব্যাপী যাত্রার মধ্যে যাহারা ষ্টীমারের পাটাতনের উপর আসিয়া সংসার পাতায়, কলরব করে ও সংসার ঘাড়ে করিয়া নামিয়া যায়—নাম-পরিচয়হীন তাহাদের বিচিত্র জীবন-তথ্য ও অন্তরালবর্ত্তী সম্পদ-সম্পত্তির হিসাব নিকাশ করিতে ভারি ভাল লাগে। কল্পনায় তাহাদের বাড়ির অঙ্গনে কোঠাঘরের সংখ্যা গণনা, পরিজনদের মধ্যে সম্প্রীতি ও কলহের খণ্ড চিত্র, দৈনন্দিন আহার্য্য-তালিকা, পাল-পার্ব্বণ, বার-ব্রতের উপবাস ও উৎসব—মনের মাঝে রঙ ধরাইয়া দেয়। যে-বধূ কলসী কাঁকে দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া ঘাটে জল লইবার কালে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওই জলে-ভাসা শহরের সমৃদ্ধ রূপের পানে চাহিয়া বিহ্বল হইয়া যাইতেছে—তাহার কুটিরের পল্লবঘন ছায়ায় একটি জ্যোৎস্না আবেশ মাখা রাত্রির কল্পনা হয়ত অসাময়িক হইবে না, কিন্তু স্বামী-সোহাগিনীর মনের পাতায় যে লেখাগুলি ক্ষুদ্র কলহে ও খণ্ড প্রণয়ে সোনার অক্ষরে আবদ্ধ হইয়া আছে—সেগুলির পাঠোদ্ধারে নারীমাত্রেরই কৌতূহল স্বাভাবিক। তীরে কলসী নামাইয়া বধূ ত ষ্টীমারে উঠিয়া তাহার জীবন-রহস্যের কাহিনী উদ্ঘাটিত করিবে না—ষ্টীমারের যাত্রীদলের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মুখে যোগমায়া এ দেশীয় আচার-নীতির অনেকখানিই জানিতে পারিলেন। পদ্মার তীর অলঙ্কৃত করিয়া তাল-সুপারি-নারিকেলশ্রেণী-চিহ্নিত গ্রামগুলির মত ইহাদের উদ্ভাসিত হইয়া উঠা ক্ষণিকের। সে আলোকে যেটুকু পরিচয় মিলে—তীরের কোলে তরঙ্গের অস্ফুট ধ্বনির মতই তাহা সঙ্কেত-ময় ও মনোরম। যোগমায়া ভাবেন, কথা কহিবার ধরণটি ইহাদের এমন কেন? চেনা জিনিসের নাম করিলেও ইহাদের চক্ষুতে না-জানার কৌতূহল কেন জাগিয়া থাকে? পদ্মার তরঙ্গ-আলাপের মতই এই নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম ও বাসিন্দাদের অল্প জানিলেও—অনেকখানি না জানিয়া অতৃপ্ত থাকিতে হয়। ইহারা জমির কথা বলে, ফসলের গল্প শোনায়। জমি অনেক দেখিয়াছেন যোগমায়া, কিন্তু এমন করিয়া জমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। দীর্ঘপথ তাই কষ্টকর বোধ হইল না। প্রায় অপরাহ্ণ সময়ে ঢাকার বাসায় ইঁহারা পৌঁছিয়া গেলেন।

ভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র সেইমাত্র বাড়ি ফিরিয়া জামা ছাড়িতে-ছিলেন। মোট-সমেত যোগমায়া সেই ঘরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জামাটা মাথা গলাইতে গলাইতে রামচন্দ্র বাহিরে আসিলেন।

—খবর না দিয়ে হঠাৎ—ব্যাপার কি?

—কালিকে নিয়ে এলাম চলে আর খবর দেবার অবসর হ'ল না। কি অসুখ তোমার?

কালিপদ আসিয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম করিল।

—তারপর কালিপদ—কি করছ এখন? কিছুই না? ক'বছর হ'ল পাস করে বসে আছ? আচ্ছা—আচ্ছা পরে শুনব। এখন হাতমুখ ধুয়ে সুস্থ হও—বামুনটা আবার চলে গেছে।

যোগমায়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়াছিলেন। বলিলেন, বামুনের কি দরকার? মাথায় দু'ঘড়া জল ঢেলে আমিই রেঁধে ফেলছি'খন। কুয়োতলাটা একবার দেখিয়ে দাও ত।

ছোট্ট বাড়ি। পুরাতন। তবু ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশে তৈয়ারি হইয়াছে বলিয়া ঐটুকুর মধ্যে সব ব্যবস্থাই আছে। নূতন ভাড়াটে আসিলেই কলি চুণ ফিরাইয়া বাড়িটার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিতে হয়। এলা মাটির গেরুয়া রঙ কোনকালে দেওয়া হইয়াছিল—সাদা চুণের আস্তরণ ভেদ করিয়া সে রঙ এখনও উঁকি দেয়। পাতকুয়াতলা শান বাঁধান—তার পাশে একটু মাটির উঠানও আছে। তবু ঘাসের জঙ্গলে সে উঠানটা ভরিয়া আছে। রান্নাঘরের টিনের চালে লাউ বা কুমড়ার লতাও নাই। অপরাহ্ণের রৌদ্রপাতে বিবর্ণ টিনও ঈষৎ চকচক্ করিতেছে। খাড়া উঁচু পাঁচীল, গাছপালা কোথাও চোখে পড়ে না, চারি পাশেই বাড়ির বেড়া। এই বাড়ির বেড়ার ঊর্দ্ধে ঝুলিয়া আছে এক টুকরা আকাশ, অপরাহ্ণের বিবিধ বর্ণচ্ছটায় প্রতিফলিত আকাশ। বাড়িটা দ্বিতল। দ্বিতলের খোলা জানালা দিয়া চাহিলে—ওই টুকরা আকাশের বিস্তৃতিই দেখা যায়। দূরে একটা বট বা

অশ্বত্থ গাছের খানিকটা দেখা যায়—আর গলির মোড়টা পর্য্যন্ত। পুরাতন শহরের আভিজাত্য-গৌরব হয়ত কিছু আছে, চোখ ভুলাইবার মত রূপ নাই।

সন্ধ্যা হইলেও বাসার একজন চাকরকে সঙ্গী করিয়া ঘণ্টা-খানেকের জন্ম কালিপদ শহর দেখিতে বাহির হইয়া গেল। যোগমায়া রামচন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিলেন।

—কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তোমার? মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

রামচন্দ্র হাসিলেন, এতটুকু!

সে হাসি করুণ হইয়া যোগমায়ার দৃষ্টিকে আঘাত করিল। রামচন্দ্রের মুখ যেন অপরাহ্নের পদ্ম ফুল। মুদিত দলের মাঝে একটা দমকা হাওয়া ঢুকিয়া সেগুলি ঈষৎ উন্মিলিত করিয়া দিবার কালে প্রভাতকালের সেই পূর্ণ প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের রেখা-চিত্রের আভাস যেমন পাওয়া যায়—সেই রকম। পূর্ণ দৃষ্টিতে যোগমায়া রামচন্দ্রের পানে চাহিলেন। আশ্চর্য্য, সেই দৃষ্টিপাতে রামচন্দ্রের মাথাই যেন নুইয়া পড়িল, ঈষৎ শুষ্কস্বরে তিনি কহিলেন, অমন করে চাইচ যে?

ক্ষুদ্র নিশ্বাস বুকের মাঝে ঠেলিয়া দিয়া যোগমায়া বলিল, দেখছি।

—কি দেখছ?

—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছ—বড্ড রোগা হ'য়ে গেছ।

—কোন্ কালেই বা মোটা ছিলাম।

—মোটা না থাক—রঙ তোমার এমন তামাটে ছিল না, মুখও এমন শুকনো শুকনো না। কি হয়েছে?

—কি জানি। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। বলেন, অসুখ ত কিছুই দেখি না। মন-বোঝানোগোছ একটা ওষুধ দিয়েছেন। সব দিন খেতে ভালও লাগে না।

—তাই বল! ওষুধ না খেলে কখনও রোগ সারে! বেঁধে একটি মাস ওষুধ খাও দেখি।

—তুমি থাকবে—এক মাস?

—কেন থাকব না? ভাবছ সংসার দেখবে কে? ভেব না গো ভেব না, বউমা খুব শক্ত মেয়ে। উদ্যোগ করে নিজেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

রামচন্দ্র পুলকিত হইয়া কহিলেন, মেয়েটি সত্যিই লক্ষ্মী।

যোগমায়া বলিলেন, সে যাই বলুক, বেশিদিন তার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। যদি এক মাসে বিশেষ উপকার না বুঝি—

—বলেছি তো—আর কিছুদিন পরে একেবারে ছুটি নেব।

—ও সব কথা শুনছি না, চাকরি আগে—না দেহ আগে? একটু থামিয়া বলিলেন, এ-বাসাটি বদলাও না কেন? বেশ নদীর ধারে একটু খোলা যায়গায়—

—এখানে যে-গঙ্গা আছেন—তিনি বুড়ো হয়েছেন খুব। তাঁর চেহারা এই আমারই চেহারার মত—দেখলে খুশী হবে না।

নদী নাকি বুড়ো হয়! এই ত আসতে আসতে দেখলাম—কেমন চওড়া সুন্দর নদী।

—আচ্ছা—কাল একবার নদীর ধারে যেয়ো, দেখবে মিথ্যে বলছি—কি সত্যি বলছি। একটু থামিয়া বলিলেন, ওষুধ না খাইয়ে বরঞ্চ তোমার হাতের রান্না খাইয়ে দেখ, রোগ সারতেও পারে।

রামচন্দ্র আর একটু সরিয়া আসিয়া যোগমায়ার একখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন। স্পর্শের সঙ্গে কত কথা—কত ঘটনাই মনে পড়িয়া গেল। তরুণ মনের সে দিনগুলি একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। যোগমায়া ও রামচন্দ্র মৃদু হাসিয়া তাহা স্বীকার করিলেন।

—কালিপদ হয়ত এখুনি আসবে? কয়েক মিনিট পরে যোগমায়া বলিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, ও কি কিছুদিন থাকবে এখানে?

—তা তো জানি না। কাজকর্ম্ম ত করে না কিছু, বললাম—চলে এলো। তোমার আপিসে একটা চাকরি হয় না ওর?

রামচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, যে রকম সুপারিশ নিয়ে এসেছে—হয়ে যেতেও পারে।

—যাও। বলিয়া যোগমায়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, হাঁগো এখানেও কেরোসিনের আলো জেলে দেয়? ভারি বিশ্রী দেখায়। একগাদা অন্ধকারের মাঝে টিম-টিমে আলো!

—ও আলো কি আর অন্ধকারকে দূর করে।

—তবে কি জন্তে জ্বালে?

—এই অন্ধকার রাত্রিতে লোকে দূর থেকে বুঝতে পারে একটা পথ আছে—এই আর কি।

—কলকাতায় কিন্তু দিন রাত্তির বোঝা যায় না।

—সেখানে যে গ্যাস জ্বলে।

কালিপদ হয়ত থাকিয়াই যাইত।

রামচন্দ্র বলিলেন, চাকরি তোমার করে দিতে পারি, কিন্তু শহরে ত হবে না। সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হবে।

কালিপদ বলিল, তাহলে বাড়িতে একবার পরামর্শ ক'রে আসি।

—কেন, চিঠি লেখ না—একখানা।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল, না কাকাবাবু, একবার ঘুরেই আসি।

রামচন্দ্র তাহার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন, বেশ। আমার রিটায়ার করতে এখনও প্রায় এক বছর, কিছুদিন পরে এলেও ক্ষতি হবে না।

ক্রমশঃ

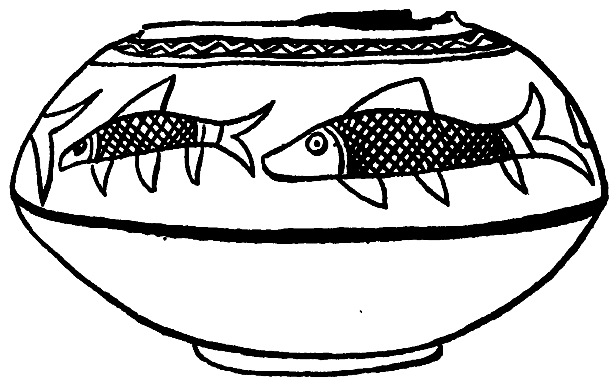
মৃৎশিল্প

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিধাতার হাতে গড়া সৃষ্টি হ'ল—জল, স্থল, আর আকাশ—এই তিনটি উপকরণ নিয়ে। আর মানুষের হাতে গড়া সৃষ্টি হ'ল—জল আর স্থল নিয়ে। জল আর স্থল না হ'লে মানুষ বাঁচে না। মাটির মানুষ—মাটি নিয়ে তার কাজ, মাটি নিয়ে তার খেলা, মাটি নিয়ে তার পূজো। কিন্তু, কেবল মাটি নিয়ে কোনও কাজ হয় না,—চাই সরস মাটি, শীতল মাটি, নমনীয় মাটি, জল আর স্থলে মেলান, মেশান মাটি। সুতরাং জল আর স্থল, জল আর মাটি, এই দু'টোই হ'ল আদিম মানুষের জীবনের উপকরণ। যখন ঘর গড়তে শেখে নি মানুষ—তখন গাছের তলায়, কিংবা পাহাড়ের গুহায়—তার রাত কাটান চলে। গাছের ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ হয়, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের জন্য চাই জল,—প্রহরে প্রহরে, ক্ষণে ক্ষণে। সুতরাং মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের প্রথম উপকরণ হ'ল—জল-পাত্র—মাটির ভাঁড়, কুম্ভ, কলসী। এই জন্য মানুষের জীবন-যাত্রার ইতিহাসে, আদিম শিল্পী হ'ল—মাটির ঘটি-বাটি গড়তে কুশল, মৃৎশিল্পী, কুম্ভকার, কুমোর।

খুব প্রাচীন সময় থেকে, সেই অতি প্রাচীন প্রস্তর-যুগের সময় থেকে, যে সব যুগের স্মৃতি ইতিহাস লিখে রাখতে পারে নি, সেই স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ তাহার তৃষ্ণার জলাধার, তাহার বারি-সঞ্চয়ের পান-পাত্র—ঐ কুম্ভ আর কলস গড়তে শিখে নিয়েছে, যখন আর কিছু গড়তে শেখে নি তখন থেকে গড়ছে—ঐ ভাঁড়, খুরি, আর কলস। সুতরাং মানুষের শিল্পের ঐ প্রথম নিদর্শন হ'ল—মাটির পাত্র, মৃৎশিল্প,—"কুমোর সজ্জা"। মানুষের সভ্যতার অতি প্রাচীন প্রমাণ ও নিদর্শন হ'ল—ঐ ইতিহাসের বহুপূর্ব্বের যুগের জিনিষ—মানুষের হাতে গড়া মাটির আসবাব। এসিয়ার নানা দেশে-প্রদেশে ঐ প্রাচীন মানুষের ঐ সব প্রাচীন জলাধার—কলস, কুঁজো, ভাঁড়, খুরি—মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছেন পুরাতাত্ত্বিকরা। টাইগ্রীস নদীর তীরে সুমের সভ্যতার উপকরণ—ভাঁড় খুরি, অন্ততঃ, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে তিন হাজার বছর আগেকার বস্তু। চীনের হোনান প্রদেশে প্রায় একই প্রাচীন কালের নানা মাটির বাসন পাওয়া গিয়েছে। ভারতের মৃৎ শিল্পও অন্ততঃ প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে।

সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার প্রাচীন ক্ষেত্রে মাটি খুঁড়ে, ভারতের পুরাতাত্ত্বিক অনেক সুচিত্রিত ও নানা

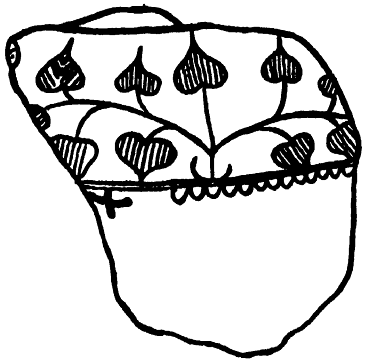


(১)

ছাঁদের, নানা রূপের, নানা আকারের, নানা ধরণের মাটির ভাঁড়-খুরি আবিষ্কার করেছেন। ঐ প্রাচীন কালের জীবন-যাত্রার অনেক কথাই ঐ সব মাটির ভাঁড়ের গায়ে চিত্রিত নক্সায় লেখা আছে। ভারতের নানা গাছ-পাতা লতা-পাতার নক্সা ও ইতিহাস আদিম যুগের মানুষেরা জুড়ে দিয়ে গেছেন ঐ সব ভাঁড়-খুরির গায়ের উপরে। যে-নদী থেকে জল আনা হ'ত, সেই নদীর তরঙ্গের লহর-লীলা, নানা আঁকা-বাঁকা রেখার লহরে, সেই নদীর প্রতিকৃতি যেন লিখে রাখা হয়েছে ঐ মাটির ভাঁড়ের বুকের উপরে। তা ছাড়া, বট ও অশ্বত্থ গাছের পাতা, (চিত্র ২,৩) অলঙ্কারের হার পরিয়ে দিয়েছে শত শত কলসীর কণ্ঠে কণ্ঠে,—তা থেকে বোঝা যায়, এই সব পূজনীয় পাদপ, বট ও অশ্বত্থ বৈদিক যুগের বহু আগে থেকেই আদর ও পূজা পেয়ে আসছে আদিম যুগের লৌকিক প্রাচীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসে।

পূজা-পার্ব্বণের ইতিহাস ছাড়া জীবন-যাত্রার অনেক দ্বন্দ্বের, অনেক প্রতিযোগিতার কাহিনী, অনেক মৃগয়ার ইতিহাস লেখা আছে—এই সব মাটির কলসীর কণ্ঠে ও উপকণ্ঠে, বুকে ও নিতম্ব-দেশে। নানা হরিণ, নানা মৃগ, নানা ছাগের মূর্ত্তি, নানা বাঘ ও সিংহের মূর্ত্তি, ভাঁড়-খুরির চিত্রকর চিত্রিত করে জানিয়ে গেছেন—এই সব

ইতিহাসের পূর্ব্বের যুগে—কি সব জীব-জন্তু-জানোয়ার ছিল এই সব সেকেলে মানুষের জীবনের সহচর, জীবনের



(২)

প্রতিদ্বন্দ্বী ; কার সঙ্গে ছিল তাদের মিতালী, আর কার সঙ্গে করত তারা প্রাণ বাঁচাবার যুদ্ধ। (চিত্র ৯, ১০)।

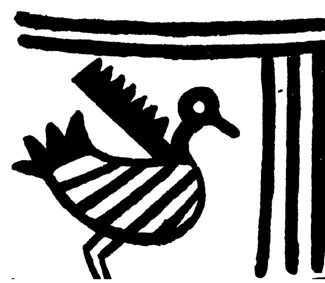
কোনও কোনও কলসের গায়ে, আদিম যুগের ভারতের চিত্রকর নানা জাতির, নানা পালকের পাখীর সার বসিয়ে দিয়ে গেছেন—যাদের পালকের পাখা-নাচান রূপে, যাদের উপর-দিকে ঠোঁট-তোলা মুখে, যাদের সুঠাম ও সুগোল বাঁকা রেখার বুকে (চিত্র ৪,৬)—কি চঞ্চল আকাশচারিতার চমৎকার ছবি আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ ক'রে ফুটে রয়েছে! কোনও কোনও পান-পাত্রে, কেউ কেউ জুড়ে দিয়েছেন একজোড়া মাছের ছবি।



(৩)

আদিম যুগে মানুষের জাতি-বিভাগ, গোষ্ঠী-বিভাগ, বংশ-বিভাগ করা হত—নানা বিভিন্ন পশুর চিহ্ন দিয়ে ;—কোনও দল ছিলেন "মীন-কেতন," কোনও গোষ্ঠী ছিলেন "পক্ষী-কেতন", কোনও বংশ ছিলেন "বৃষ-কেতন," আবার কেউ কেউ ছিলেন "ময়ূর-কেতন"। ঐতিহাসিক যুগেও এই প্রাচীন পংক্তি-বিভাগের, গোষ্ঠী ও বংশ-বিভাগের ধারার অনেক প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণ দেশের পাণ্ড্যরাজাদের রাজবংশের লাঞ্ছন ছিল, "মীন-দ্বন্দ্ব," একজোড়া মাছ। এই বংশ-বিভাগের চিহ্ন ও লাঞ্ছনের প্রাচীন ইতিহাস, মহেঞ্জোদারো'র দু-চারখানা ভাঙা ভাঁড়ের গায়ের উপর মাছের নক্সায় এখনও লেখা আছে। (চিত্র ১)।

এই সব গণ ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতি-বিভাগের নানা লাঞ্ছন ও চিহ্ন ছাড়াও অনেক রকমের অনেক মন-ভোলানো, চোখ-ভোলান চমৎকার চিত্র সব লেখা আছে এই সব বৈদিক-যুগের সমসাময়িক ভাঁড়-খুরির বুকের উপর। এই জাতির বেশীর ভাগ নক্সা হল—"মাঙ্গলিক আল্পনা"। এক একটা নক্সা ছিল এক একটি দেবতার



(৪)

প্রিয়-লাঞ্ছন। যে-সব দেবতা দেবেন সরোবরের জন্য বারির বৃষ্টি, কৃষি-ক্ষেত্রের জন্য দেবেন ফসলের বৃষ্টি, গাছের উপর দেবেন ফলের বৃষ্টি—তাঁদের প্রত্যেকের জন্য এক-একটি মাঙ্গলিক চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছিল অনেক হাজার যুগ পূর্ব্বে। এই সব অতি প্রাচীন পানপাত্রের গলায় ও বুকে ভারতের প্রাচীন চিত্রকর এই সব মাঙ্গলিক নক্সার সার গেঁথে রেখে গেছেন যার অনেক অর্থ, অনেক প্রার্থনা, অনেক ব্যথার কথা, অনেক নিবেদন, অনেক ক্রন্দন, আমাদের কাছে আজ অর্থহীন ও দুর্ব্বোধ হয়ে গেছে।

বাংলা দেশের "লক্ষ্মীর সরা"য় ও নানা "মঙ্গল-ঘটে" এই প্রাচীন মাঙ্গলিক চিহ্নের যাদু-মন্ত্রের কিছু কিছু প্রতিধ্বনি আজও যেন আমরা শুনতে পাই। পূর্ব্ববঙ্গের নানা সুচিত্রিত ও সুরঞ্জিত নানা "মঙ্গল-ঘটে" আজও যেন গাঁথা রয়েছে সেই মঙ্গল-ধ্বনির মধুর সুর। এই ঘটকে মাঙ্গলিক চিহ্নে সুচিত্রিত করার প্রথা আজও বাংলার নানা স্থানে প্রচলিত আছে। আর বাঙ্গলার প্রাচীন

লোক-সাহিত্যেও এই প্রাচীন প্রথার নানা প্রতিধ্বনি আছে :—"মনসার ভাসানে" লখিন্দরের কন্যা-সম্প্রদান ও স্ত্রী-আচারের বর্ণনায় আমরা তাহার প্রমাণ পাই :—

"বেহুলা সুন্দরী মঙ্গলির হাঁড়ী লখাই ঢাকে সাত বার,
হইয়া হরষিত করিল সর্ব্ব নীত, তন্তু-সূত্র চারি ধারে তার।"

("মনসা-মঙ্গল" পৃঃ ২৫৩)



(৫)

এই "মঙ্গল-ঘট" আর "বোকা কলস" বাঙালীর জীবনের অতি আবশ্যক আসবাব ও জীবনের সরস সাজ-সজ্জা। প্রাচীন গান,—যার অনেক কথাই, অনেক সুরই আজ আমরা ভুলে গেছি,—তার সরল ছন্দে অনেক "বোকা কলসে"র ইতিহাস আজও গাঁথা আছে :—

"কোথায় পাব বোকা কলস রে, কোথায় পাব দড়ি
তুমি হও যমুনার জল রে, আমি ডুবে মরি।" (হারামণি পৃঃ ১৩৫)।

ভারতবর্ষের কৃষ্টির ইতিহাসের নানা যুগে—মৌর্য্য-যুগের, শুঙ্গ-যুগের, কুষাণ-যুগের, নাগ-যুগের, গুপ্ত-যুগের—নানা প্রাচীন ক্ষেত্রে ও কেন্দ্রে,—মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা রূপের, নানা শ্রেণীর, নানা ক্ষুদ্র, নানা বৃহৎ আকারের নানা মাটির পাত্র,—কলস-কলসী, পান-পাত্র, আহারের থালা-ঘটি,—ভাঁড়-খুরী। প্রাচীন রূপ-কার শিল্পীদের কুশলী রচনা-রীতির সুন্দর প্রমাণ আজও বহন করে রয়েছে—এই সব প্রাচীন যুগের মৃৎ-পাত্রের অসংখ্য নিদর্শন। আমাদের নানা চিত্রশালার কক্ষ, এই সব মৃৎশিল্পের প্রচুর নিদর্শনে ভ'রে উঠেছে। কেবল মাটিকে উপকরণ করে কি সুন্দর রূপ গড়া যায়, কি সুন্দর নক্সায় চিত্রিত করা যায় তাহার প্রমাণ—এই মাটিতে গড়া, মাটিতে লেখা মানুষের মনের কথার আধার-বস্তু, আমাদের মন ও চক্ষুকে যুগপৎ চমৎকৃত করে।

শুধু সাধারণ জীবন-যাত্রার উপকরণ বলে নয়, ভারতের কৃষ্টির, ভারতের সভ্যতার উচ্চ-চিন্তার নানা কথা—এই সব মৃৎশিল্পের অসংখ্য মাটির মূর্ত্তিতে লেখা আছে।

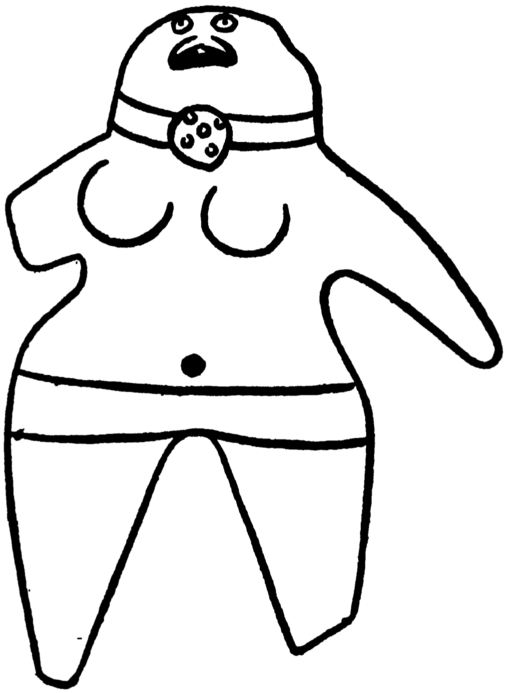
পণ্ডিতেরা বলেছেন যে বৈদিক যুগে নাকি প্রতিমা-পূজার প্রথা ছিল না। বৈদিক যুগের অর্ঘ্যরা অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, সবিতা, ইত্যাদি দেবতা ও বিরজা, বিনতা, অদিতি, মহামায়া ইত্যাদি দেবীদের পূজা করতেন, কেবল কথার অর্ঘ্য রচনা করে। কিন্তু পণ্ডিতের বাতুল কল্পনা বাতিল হ'ল,—মাটি হ'ল, ঐ বৈদিক যুগের অসংখ্য মাটির মূর্ত্তিতে। ঐ বৈদিক যুগে গড়া অসংখ্য পোড়ামাটির প্রতিমা এতদিন মাথা গুঁজে ছিল মাটির তলায়। পুরাতাত্ত্বিকের খনন-পটু খনিত্র তাদের খুঁড়ে বার করলে মাটির



(৬)

কবর থেকে। আবার জেগে উঠেছে তারা যারা এত হাজার বছর ঘুমিয়ে ছিল বৈদিক ঋষিদের স্তব-গান শুনে হোমের ঘৃতের আহুতির রস পান ক'রে। আমাদের যাদুঘরের কাঠের আসনে বসে—পুরাতাত্ত্বিকের যাদু-বিদ্যার মন্ত্রে তাঁরা কণ্ঠ পেয়ে বলছেন, "আমরা বৈদিক-যুগের পোড়ামাটির প্রতিমা। (চিত্র ৬)। আমরা মৌর্য্য-যুগের অনেক শত বর্ষ আগে জন্ম নিয়েছি। আমরা কেউ এসেছি সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন ক্ষেত্র হতে, কেউ এসেছি প্রাচীন মথুরার বিস্মৃত বৈদিক-ক্ষেত্র হতে, কেউ এসেছি কোশাম্বীর কুশলী শিল্পের নানা নিদর্শন ক্ষেত্র হতে, কেউ

এসেছি বিস্মৃত বৈশালীর বিশাল বৌদ্ধ-সাধনার ক্ষেত্র হতে, কেউ এসেছি বৈদিক যজ্ঞ-ভূমির ক্ষেত্র বারাণসীর বরুণা-নদীর গঙ্গা-সঙ্গমের উপকূল হতে, কালের বিহঙ্গম যার কথা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বিস্মৃতির আকাশপটে।" সেই গঙ্গা-সঙ্গমের ঘাটায় ছিল রাজসূয় যজ্ঞের রাজার রাজঘাট, যার মাটির স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে লুকিয়েছিল,—বৈদিক যুগের, মৌর্য্য-যুগের, শুঙ্গ-যুগের, গুপ্ত যুগের নানা গুপ্তকথা ;—যার মাটির আবরণে গুপ্ত ছিল, লুক্কায়িত ছিল, অসংখ্য পোড়ামাটির প্রাচীন প্রতিমা। যাদুঘরের তাকে তাকে



(৭)

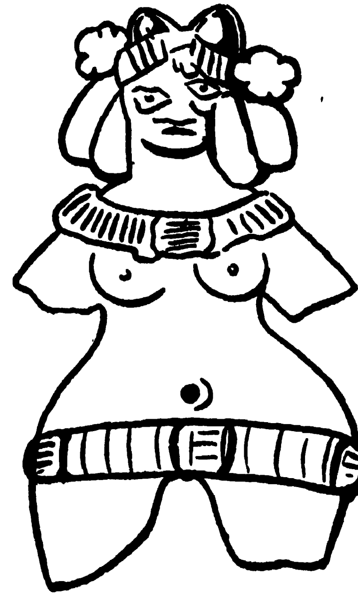
আমাদের তাক্ লাগিয়ে যখন তাঁরা আবার বসলেন প্রশস্ত আলোকে প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকার মোচন ক'রে, তখন শ্রদ্ধায় নতশির হয়ে, বিনয়ের করজোড় নিয়ে, পরিচয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—এই সব মাটির দেব-দেবীদের—"গরুড়ের সুচাগ্র ওষ্ঠ নিয়ে, মাতার স্তন-যুগের প্রশস্ত সুধা-সিক্ত বক্ষপট নিয়ে, বিশাল শ্রোণীর বদান্যতা নিয়ে—তুমি কে ?" (চিত্র ৭)

মাটির প্রতিমার মুখে কথা ফুটল—"আমি সুরসা সুপর্ণী,—প্রজাপতি বৈ সুপর্ণো গরুৎমান্—যিনি সুপক্ষ, সুপর্ণ-যুক্ত গরুড়-রূপী প্রজাপতি, 'শতপথ ব্রাহ্মণ' (১০ ২।২ ৪ ঋক্‌বেদ ১০,১৪৯.৩) যাঁর আরাধনা করেছেন, আমি সেই সুপর্ণ গরুৎমানের সহধর্ম্মিণী—সুরসা সুপর্ণী,—আমাকে কেউ বলেন 'সুপর্ণা', কেউ বলেন 'বিনতা'।"

আর একজন পোড়ামাটির প্রতিমাকে প্রশ্ন করি—

"গ্রীবাতটে 'গ্রৈবেয়ক' হার প'রে, বিশাল শ্রোণীতটে মেখলার মন-ভুলান মোটা গোটহার ঝুলিয়ে, পৃথুল কর্ণাভরণের বড় বড় কানবালা দুলিয়ে,—মাথার উপর দুটি কাণকে জাগিয়ে রেখে—কার স্তব-আরাধনা শুনবে বলে উৎকর্ণা হয়ে রয়েছ তুমি কোন দেবী ?" (চিত্র ৮)

যাদুঘরের যাদুবিদ্যায় পোড়ামাটির প্রতিমার কণ্ঠে কথা ফুটল—"আমি সুব্রতা, আমি বিশ্ব-রূপী, আমি



(৮)

মহীমাতা, আমি অদিতি। ঋগ্‌বেদের ঋষি ঋক্ রচনা ক'রে আমার স্তুতি করেছেন—

"মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানাং…মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট।" (ঋগ্‌বেদ, ৮,১০১,১৫) "ইয়ং পৃথিবী বৈ দেবী অদিতি-র্বিশ্বরূপী" (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, ১,৭,৬৭১। "ইয়ং পৃথিবী বৈ সর্বেষাং দেবানামায়তনম্"—এই আমি পৃথিবী যার মাটির আয়তনে আসন ক'রে বসেন নানা রূপের নানা জাতির দেবতা। "ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ" (শতপথ ব্রাহ্মণ—২,২,১,১৯)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ যাকে বলেছেন 'মহীমাতা পৃথিবী'—"পৃথিবীং মাতরং মহীম্" (তৈঃ ব্রাঃ ২,৪,৬,৮)। আমি অষ্টপুত্রের

জননী,—আমার বিশাল শ্রোণী,আমার অষ্ট আদিত্যের জননীত্বের, মাতৃত্বের চিহ্ন।



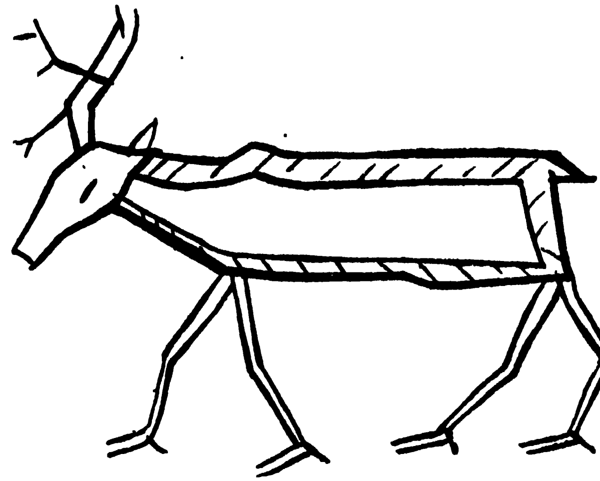
(১০)

ঋগ্‌বেদ বলেছেন—"অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ... অদিতি-রূপ-প্রৈৎ-পূর্ব্যম্ যুগম" (ঋঃ বেঃ, ১০,৭২,৮,৯)। আমার মাতৃত্বের চিহ্নরূপে আমি অলঙ্কার পরেছি—বেদের ছন্দে সুপরিচিত "পর্বময়ী মেখলা"। আমার মাথার উপরে যে কান দুটি জাগিয়ে রেখেছি—ভক্তদের মনের কথা, প্রার্থনা, নিবেদন, আরাধনা শুনব ব'লে,—ঋষি জৈমিনী প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বলেছিলেন "কর্ণিনী বৈ ভূমিরিতি"—'ভূমিদেবীর কান আছে, তিনি কথা শুনেন' (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ, ১,১২৬)।

মানুষের ব্যথার কথা, মানুষের ক্রন্দন, মানুষের আবেদন শুনবার জন্য চিরকাল উৎকর্ণ হয়ে আছি—আমি মহীমাতা, পৃথিবী, আমি আদিত্যের জননী, আমি অদিতি। পুরাণকার বিষ্ণুর বরাহরূপের পত্নীরূপে আমাকে দেখেছেন—"বিষ্ণো-র্বরাহ-রূপস্য পত্নী সা শ্রুতি-সম্মতা" (প্রকৃতি খণ্ড, ৮,২৪, মহাঃ শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২,৯২, বনপর্ব্ব, ১৪২,৪৫)।

এইরূপে পরে পরে এই সব পোড়ামাটির "পোড়ামাদের" প্রশ্ন করতে,—আমাদের কণ্ঠ হ'ল রুদ্ধ, তালু হ'ল শুষ্ক, আর আমাদের কথা সরে না মুখে,—শুধু নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে দেখি—এই শত শত মাটির মূর্ত্তির মোহময়ী মৃন্ময়ী মাধুর্য্য। শত-সহস্র বৎসরের বৈদিক পূজা আরাধনার ধারা বহন ক'রে আজ চুপ ক'রে বসে আছেন যাদুঘরের তাকের উপর শত সহস্র মাটির মূর্ত্তি।

মহেঞ্জোদারো থেকে এসেছেন নয় শত মূর্ত্তি, শীতল-গর্ভা "তক্ষশিলা"র মাটি থেকে এসেছেন ৩০০ জন,



(৯)

"শঙ্খিবা"র মাটি দিয়েছেন অসংখ্য মাটির মূর্ত্তি, "ভীতা"র মূর্ত্তি-সংখ্যাবিশেষ ভীতিজনক, বৈশালীর কথা বলাই বাহুল্য, প্রাচীন নগর "বেশ-নগর" হ'তে এসেছেন নানা বেশ ধারণ ক'রে নানা রূপের নানা মৃন্ময় মূর্ত্তি, উদয়-পুরের কাছে প্রাচীন মাধ্যমিকার রাজধানী "নগরী" দিয়েছেন প্রচুর পোড়ামাটির পুতুল, "কৌশাম্বী"র শিল্প-কোষ ছিল মূর্ত্তি-শিল্পে ভরপুর ;—"মথুরা"র মাধুরী প্রতিমা-কার নানা আকারের প্রতিমা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আমাদের প্রতিমা-শালা, প্রাচীন "পাটলী-পুত্রে"র অসংখ্য পুতুলে ভরে উঠেছে পাটনা শহরের পুরাতত্ত্বের মন্দির। এইরূপে আমাদের শিল্পের ভাণ্ডার প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মৃৎশিল্পের মাটির মাধুর্য্য, প্রাচীন সাধনার প্রত্যক্ষ প্রাচুর্য্য মাটির মানুষকে মাটি থেকে অনেক উপরে তুলে দিয়েছে। আমরা যদি এই মাটির সাধনা জাগিয়ে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ মাটি না হয়ে পরিপাটি হয়ে উঠবে, মাটির মানুষের মাটির সাধনায় ভরপুর হয়ে উঠবে। এই সব মাটির প্রতিমার মধ্য দিয়ে অমরাবতীর অমর দেবতাদের মাটিতে নামিয়ে মানুষের সাধনাকে অমর ক'রে তুলবে।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

হিন্দু পাদশাহী

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মারাঠা জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে শিবাজীর আবির্ভাব ধূমকেতুর উদয়ের মত আকস্মিক ঘটনা নহে। শিবাজী জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট ভাবধারার পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই ভাবধারার উৎপত্তি হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে, মহারাষ্ট্র দেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরোক্ষ ফলরূপে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আলাউদ্দীন খলজী দেবগিরির যাদবরাজ্য আক্রমণ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই যাদবরাজ্য (অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশ) প্রত্যক্ষ ভাবে দিল্লীর সুলতানের শাসনাধীন হয়। দাক্ষিণাত্যে সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের পর মহারাষ্ট্র দেশ বাহ্‌মনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কালক্রমে বাহ্‌মনী রাজ্য পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইলে মহারাষ্ট্র দেশ আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানগণের হস্তগত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আহম্মদনগর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, বিজাপুর কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঔরংজীব বিজাপুর জয় করেন। সুতরাং মারাঠা জাতি সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের অধিককাল মুসলমানের পদানত ছিল। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী পরাধীনতা মারাঠা জাতির মানস জগতে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মহারাষ্ট্র দেশের উচ্চ বংশোদ্ভব সামন্তগণ মুসলমান রাজশক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের কুলক্রমাগত প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সুলতানের দরবারে মুসলমান ওমরাহদের পার্শ্বেই আসন গ্রহণ করিতেন, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সুলতানের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, এবং রাজসেবার বিনিময়ে রাজার অনুগ্রহ-প্রদত্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ফলে তাঁহাদের চরিত্রগঠনে 'স্বামীভক্তি' (অর্থাৎ অন্নদাতার প্রতি আনুগত্য) এবং 'বতনপ্রীতি' (অর্থাৎ নিজস্ব জায়গীর বা জমিদারীর প্রতি মমতা), এই দুইটি হৃদয়বৃত্তিই প্রবল হইয়াছিল। যে-সিপাহীরা যুদ্ধকালে সামন্তগণের পতাকাতলে সমবেত হইত তাঁহাদের চরিত্রেও কালক্রমে 'স্বামীভক্তি' ও 'বতনপ্রীতি' ফুটিয়া উঠিল। মুসলমান সুলতানের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় বা সম্পর্ক ছিল না, যে সামন্ত তাহাদিগকে কর্ষণযোগ্য জমি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতেন তিনিই ছিলেন তাহাদের 'স্বামী'। এইরূপে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ, সামন্ততন্ত্র পরিচালিত এক অদ্ভুত সমাজ মহারাষ্ট্র দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমাজের প্রধান বন্ধন ছিল ধর্ম্ম। যে সমাজ রাজশক্তির একনায়কত্ব হইতে বঞ্চিত, বিভিন্ন সামন্তের পরস্পরবিরোধী কর্ত্তৃত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন, একমাত্র ধর্ম্মই তাহার ঐক্য রক্ষা করিতে পারে। সমগ্র ভারতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত মারাঠা জাতির পরিচয় ছিল না, পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালার দুর্গম সানুপ্রদেশে লুক্কায়িত মারাঠা জাতি 'স্নান-সন্ধ্যা'র অবসরে 'বতন' রক্ষার জন্য খণ্ড যুদ্ধে যোগদান করিয়া কোন প্রকারে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান রাজ্যগুলির পতনের ফলে মারাঠা সমাজে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলা বহু চেষ্টা করিয়াও আহম্মদনগরের হৃতরাজ্য সুলতান-বংশকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না। বহু মারাঠা সামন্ত 'বতনহারা' হইল, নূতন 'স্বামী' সংগ্রহ করিবার জন্য আহম্মদনগরের ভাগ্যহত সামন্তগণ বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বিজাপুরের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। মারাঠা সামন্তগণ 'বতন' হারাইবার ভয়ে বিপর্য্যস্ত হইলেন। 'স্নান-সন্ধ্যা' নিরাপদে নির্ব্বাহ করা যাইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হইল, কারণ দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী সম্রাট শাহ্‌জাহান ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔরংজীবের অনুদার নীতির অগ্রদূত ছিলেন। মারাঠা জাতির এই সঙ্কটকালে শিবাজীর আবির্ভাব।

বিপ্লব জাতীয় জীবনে নবশক্তির সঞ্চার করে, সমাজকে নূতন রূপ দান করে। সাধারণতঃ এই নবশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয় সমাজের নির্যাতিত ও অবহেলিত অংশে, জনসাধারণের মধ্যে। শিবাজীর পিতৃকুল ও মাতৃকুল সামন্ত সমাজে উচ্চস্থানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু শিবাজী পিতার সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করিতে পারেন নাই। স্বামী-পরিত্যক্তা দুঃখিনী মায়ের অনাথ পুত্রের মত তিনি নিজের ভাগ্যলিপি নিজেই রচনা করিয়াছিলেন। যে মাওয়ালী জাতি এতদিন পর্য্যন্ত দাম্ভিক মারাঠা সামন্তের নিকট কোন মর্য্যাদা পায় নাই, জাতীয় জীবনের সেই সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতেই শিবাজী শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এখানেই তাঁহার অভিযান আরম্ভ হইল। পরবর্ত্তী জীবনে স্বাধীন

রাজ্যের অধিপতি হইয়া তিনি জায়গীর প্রথার বিলোপসাধন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের সহিত প্রজার, রাজশক্তির সহিত জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; হয়ত তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 'স্বামীভক্তি' ও 'বতনপ্রীতি' স্থায়ী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। কিন্তু জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের মূল্য তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই তিনি 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক' আখ্যা গ্রহণ করেন। পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন প্রকৃত ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ, ইহা শিবাজী কথায় ও কার্য্যে অবিসম্বাদিত ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাই শিবাজীর হিন্দুরাজ্যে গো-ব্রাহ্মণের ন্যায় মুসলমানও সযত্নে প্রতিপালিত হইত। ধর্ম্মকে তিনি রাষ্ট্রের পরিপোষকরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তির নিয়োগ তাঁহার নীতিবহির্ভূত ছিল।

শিবাজী যে-রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন তাহা মহারাষ্ট্রের জাতীয় সম্পত্তি, মারাঠা জাতির জীবনে নব-সূর্য্যোদয়ের প্রতীক। মুঘল পাদশাহী বিধ্বস্ত করিয়া হিন্দু পাদশাহী স্থাপনের কল্পনা শিবাজীকে কখনও অনুপ্রাণিত করে নাই। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্যরবি তখনও মধ্যগগনে; আসন্ন সূর্য্যাস্তের অবসাদ মুঘল হারেমের নিষিদ্ধ কক্ষে হয়ত কৃষ্ণ-ছায়া বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু মুঘল-দরবার তখনও প্রতিভায়, ঐশ্বর্য্যে ও নৃশংসতায় সমুজ্জ্বল। সেকালে ভারতব্যাপী মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা বাতুলের প্রলাপে পরিণত হইত। যখন হিন্দুবীর জয়সিংহ শিবাজীর উন্নত মস্তক দেওয়ানী আমে অবলুণ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে-ছিলেন, যখন জয়সিংহ-তনয় রামসিংহ ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত আসাম রাজ্যে মুঘলের জয়পতাকা প্রোথিত করিতেছিলেন, যখন দারার মিত্র যশোবন্ত সিংহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঔরংজীবের স্বার্থরক্ষার প্রহরী ছিলেন, হিন্দুর সেই চরম দুর্দ্দিনে সহ্যাদ্রির পার্ব্বত্য অশ্বারোহী সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যতিব্যস্ত ছিল, মহাজাতি গঠনের ব্যর্থ প্রয়াসে নবলব্ধ শক্তির অপব্যয় করে নাই।

শিবাজীর সাধনা কতখানি সফল হইয়াছিল তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া গেল তাঁহার মৃত্যুর পর। শম্ভুজীর রাজ্যলাভের অল্পদিন পরেই ঔরংজীব সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন এবং জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর কাল তিনি সেখানেই অতিবাহিত করেন। এই দীর্ঘকাল তিনি মারাঠাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল ঐশ্বর্য্য এবং অগণিত সৈন্য লইয়াও তিনি এই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন নাই। শম্ভুজী পরাজিত ও নিহত হইলেন, শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম মহারাষ্ট্রে নিরাপত্তার অভাব দেখিয়া পূর্ব্ব উপকূলে জিঞ্জির দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইল, তাঁহার পত্নী তারাবাঈ নাবালক পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া বিধ্বস্ত মারাঠা রাজ্যের কর্ণধার হইলেন। একদিকে মহাপরাক্রান্ত 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', অন্যদিকে নেতৃহীন মারাঠা জাতি। এই সংগ্রামে মারাঠা জাতির জয় হইল। শিবাজী মারাঠা জাতির মনে যে রোমাঞ্চ শিহরণ জাগাইয়াছিলেন তাহা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। স্বাধীনতা রক্ষার জাগ্রত বাসনা প্রত্যেক মারাঠার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, দেশরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাই প্রকৃত জনযুদ্ধ; শিবাজী জনশক্তিকে নব প্রেরণায়, নব মর্য্যাদায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

যুদ্ধ বিজেতার মনে লোভের সঞ্চার করে, তাহার মানসিক অবনতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যে-সকল মারাঠা সেনানী জাতীয় সংগ্রামের যুগে মুঘল শাসনাধীন কোন কোন ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন, সংগ্রামের অবসানে তাঁহারা কিছুতেই তাহা হস্তচ্যুত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তারাবাঈর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাহুর সিংহাসন তখন বিপন্ন, রাজশক্তি আত্মকলহে অবসন্ন। শিবাজীর দৃঢ়তা, আদর্শানুরক্তি ও চরিত্রবল শাহুর রক্তে সংক্রামিত হয় নাই; বাল্যকাল হইতে মুঘল শিবিরে প্রতিপালিত হইয়া তিনি মেরুদণ্ডহীন ও বিলাসপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান সহায়, পেশোয়া-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বালাজী বিশ্বনাথ তখন শাসনযন্ত্র নিজের করায়ত্ত করিতে উৎসুক; পরাক্রান্ত সেনানীগণের স্বার্থে আঘাত করিবার সাহস ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। এই সকল কারণে সেনানীরা বাহুবলাধিকৃত ভূখণ্ডের জমিদার হইলেন, জায়গীর-প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইল, রাজার সহিত প্রজার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল। 'স্বামীভক্তি' পুনরায় রাষ্ট্রানুগত্যের স্থান গ্রহণ করিল, 'বতন' রক্ষা আবার মারাঠা জীবনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হইল। মারাঠা সমাজকে নূতন রূপ প্রদানের জন্য শিবাজী যে-প্রয়াস করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই ব্যর্থতাই মারাঠা জাতির ইতিহাসে চরম 'ট্র্যাজেডী'। পেশোয়া-বংশের অভ্যুত্থানে এই 'ট্র্যাজেডী'র সূত্রপাত, পেশোয়া বংশের পতনে ইহার পরিণতি।

ঔরংজীবের পুত্র বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যে পতনের চিহ্ন সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইল। সাত বৎসরের মধ্যে ছয় জন বাদশাহ ঔরংজীবের মহিমান্বিত তখ্‌তে আরোহণ করিলেন, সুচতুর মন্ত্রীরা তাঁহাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত করিয়া স্ব-স্ব স্বার্থসাধনে ব্যাপৃত হইলেন। শিবাজী যদি এই সময় জীবিত থাকিতেন তবে হয়ত ভারতবর্ষের ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তিত হইত, কিন্তু মুঘল-দরবারের বিষাক্ত প্রভাবে আচ্ছন্ন শাহু এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। পতনোন্মুখ মুঘল পাদশাহীকে আঘাত করা দূরে থাকুক, তিনি ইহার মর্য্যাদা ও সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। ফররুখসিয়রের মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন আলীর নিকট হইতে বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার প্রভু শাহুর নামে দক্ষিণাপথের ছয়টি সুবার চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের বাদশাহী সনন্দ গ্রহণ করিলেন। শিবাজী পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ঔরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, মুঘল সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত শক্তি তাঁহাকে অভিভূত করে নাই। সেই মহান্ আদর্শ বিস্মৃত হইয়া শিবাজীর পৌত্র মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিনে ঔরংজীবের প্রপৌত্রের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

এই আদর্শচ্যুতির সাময়িক ফল ভালই হইল, বাদশাহী সনন্দের অন্তরালে মারাঠা রাজ্যের প্রসার বাড়িতে লাগিল। কিন্তু আদর্শবাদ হইতে বিচ্যুত মহৎ প্রচেষ্টা প্রায়ই বিকৃতরূপ ধারণ করে। মারাঠা জাতির ভাগ্যে এই ঐতিহাসিক নীতির ব্যতিক্রম হইল না। রাজ্যবিস্তার উপলক্ষে মারাঠা সৈন্য লুণ্ঠনে অভ্যস্ত হইল; মুঘল-শিবির লুণ্ঠনে যে-প্রবৃত্তির সূত্রপাত, বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামায় তাহারই পরিণতি। রাজ্যলোভ মারাঠা জাতির চক্ষু অন্ধ করিল, অর্থলোভ হিন্দু পাদশাহীর পতাকাধারী মারাঠা কৃষককে দস্যুতে পরিণত করিল। ফলে মারাঠা জাতির পতন হইল, হিন্দু পাদশাহীর স্বপ্ন মেঘান্তরালস্থিত চন্দ্রলেখার মত বিলুপ্ত হইল।

মারাঠার সহিত রাজপুতের আন্তরিক সংযোগ স্থাপিত হইলে মুঘল পাদশাহীর ধ্বংস অনিবার্য্য ছিল, কিন্তু ক্ষীণদৃষ্টি মারাঠা নায়কেরা রাজপুতানা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া এই সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। বিজয়ী বাজীরাও সসৈন্যে দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইয়াও বাদশাহের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজধানী অবরোধ করিলেন না। দাক্ষিণাত্যে মুঘল পাদশাহীর স্তম্ভ নিজামকে পরাজিত করিয়াও তিনি তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। বাজীরাও যদি যথার্থই হিন্দু পাদশাহী স্থাপনের জন্য ইচ্ছুক হইতেন তবে তিনি দাক্ষিণাত্যে নিজামের আধিপত্য বিনষ্ট করিতেন এবং রাজপুত রাজগণের সহযোগিতায় মুঘল সম্রাটের অন্তঃসারশূন্য মর্য্যাদা দিল্লীর রাজপথে অবলুণ্ঠিত করিতেন। হয়ত প্রথম যৌবনের ভাবোচ্ছ্বাস তাঁহার মানসমুকুরে হিন্দু পাদশাহীর স্বপ্ন অস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করিয়াছিল, পরে স্বার্থের সংঘাতে সেই ভঙ্গুর মুকুর চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নৈতিক অধোগতির সহিত রাজনৈতিক পতনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিবাজীর চরিত্রবল সুবিদিত। বন্দিনী মুসলমান যুবতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তিনি অনন্যসাধারণ উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শম্ভুজী চরিত্রহীন ছিলেন। ঔরংজীবের ঘাতক নৃশংসভাবে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। বাজীরাও কৌশলী যোদ্ধা ও সুশাসক ছিলেন; অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকেই পেশোয়াদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও শাসকরূপে গণ্য করেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অপরিমিত মদ্যপান করিতেন; মস্তানী নামক মুসলমানী উপপত্নীর প্রতি তাঁহার আসক্তির কাহিনী মহারাষ্ট্রে জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাওয়ের নৈতিক চরিত্র অকলঙ্ক ছিল না। বালাজীর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও প্রৌঢ় বয়সেও সুন্দরী নর্ত্তকীর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। বালাজীর পুত্র প্রথম মাধবরাও চরিত্রবলে শিবাজীর মতই গরীয়ান ছিলেন, কিন্তু মারাঠাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও দুশ্চরিত্র ছিলেন। রাজ্যহারা হইয়াও তিনি বারংবার বিবাহ করিবার আগ্রহ দমন করিতে পারেন নাই।

শিবাজীর সময়ে মারাঠা-শিবিরে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল-শিবিরের ন্যায় মারাঠা-শিবিরেও বহু স্ত্রীলোকের সমাগম হইত। সেনানায়কেরা সপরিবারে যুদ্ধযাত্রা করিতেন। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের নিদারুণ পরাজয়ের পর মুসলমানেরা মারাঠা-শিবির লুণ্ঠন করে; তখন বহু উচ্চবংশীয়া মারাঠা মহিলা লাঞ্ছিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু মারাঠাশিবিরে কেবল যে সেনানায়কগণের পরিবারস্থ মহিলারাই উপস্থিত থাকিতেন তাহা নহে, অসংখ্য নর্ত্তকী ও রূপোপজীবী হতভাগিনী অর্থলোভে সেখানে সমবেত হইত। ফলে সৈন্যদলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল, মারাঠাবাহিনীর বিজয়যাত্রা অবমানিতা নারীর অশ্রুজলে কলঙ্কিত হইতে লাগিল। বর্গী-হস্তে লাঞ্ছিতা বাঙ্গালী নারীর দীর্ঘশ্বাস অদ্যাপি

'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ ঔরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য পেশোয়াগণ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ফলে মারাঠা-বাহিনী নবরূপ গ্রহণ করিল, স্বাধীনতার পূজারী জাতীয় সৈন্যদল বেতনভোগী লুণ্ঠনকারীতে পরিণত হইল। এই সৈন্যদল বেতন না পাইলে বিদ্রোহী হইত, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে লুণ্ঠন করিত, শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের অপমান করিত। ইহাদের বেতন নিয়মিতভাবে রাজকোষ হইতে যোগাইতে না পারিয়া পেশোয়ারা প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন নীতি গ্রহণ করিলেন। কর্ণাটকে, রাজপুতানায়, বুন্দেলখণ্ডে, গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে, বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায় মারাঠা-বাহিনীর তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইল। হিন্দু বাদশাহীর পতাকাধারী মারাঠা সৈন্যের পদধ্বনি হিন্দুস্থানে বিভীষিকার সঞ্চার করিল।

ইতিমধ্যে মারাঠা-রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির মূল শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর হইতেই পেশোয়ার পদ বংশানুগত হইয়া গেল। শাহু রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রথম বাজীরাওয়ের উপর সকল ভার অর্পণ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক দলিলদ্বারা প্রকাশ্য ভাবে পেশোয়া বালাজী বাজীরাওকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের চরম দায়িত্ব প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ সাতারা দুর্গে বন্দীভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন, পেশোয়া-বংশই মারাঠা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু রাজবংশের প্রাপ্য সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি পেশোয়া-বংশ কখনও লাভ করে নাই। শাহুর আমলের প্রধান সামন্তগণ আপনাদিগকে পদমর্য্যাদায় পেশোয়ার সমকক্ষ বলিয়াই গণ্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে বেরারের ভোঁসলাগণ এবং বরোদার গাইকোয়াড়গণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা কখনও মনে-প্রাণে পেশোয়াদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ভোঁসলাগণ বারবার পেশোয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিয়াছেন। গাইকোয়াড়গণ কখনও পেশোয়াদের সামরিক অভিযানে যথাযোগ্য সহযোগিতা প্রদর্শন করেন নাই। এই দুই পরাক্রান্ত সামন্তবংশের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই।

ধীরে ধীরে অন্যান্য সামন্ত-বংশের মনেও পেশোয়া-বংশের প্রতি বিরুদ্ধতা সংক্রামিত হইতে লাগিল। পেশোয়ারা কোঙ্কণের চিৎপাবন বংশীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের আভিজাত্য ও জাতি-গৌরব অনেক সময় অব্রাহ্মণ মারাঠা সামন্তগণের বিরক্তি উৎপাদন করিত। সামন্তগণ বহু-বলার্জ্জিত ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেন, প্রজারা তাঁহাদিগকেই 'স্বামী' রূপে গণ্য করিত, মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ ও যুদ্ধকালে সামরিক সাহায্যদান ব্যতীত পেশোয়ার প্রতি সামন্তগণের আর কোন কর্ত্তব্য ছিল না। ফলে হোলকার ও সিন্ধিয়া মধ্যভারতে ও রাজপুতানায় স্ব-স্ব আধিপত্য স্থাপন করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মারাঠা সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ নায়কের (পেশোয়া, ভোঁসলা, গাইকোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়া) শাসনাধীন হইল। তাই ইংরেজ লেখকেরা মারাঠা সাম্রাজ্যকে 'মহারাষ্ট্র চক্র' (Maratha Confederacy) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত, আত্মকলহে ক্ষীয়মান সাম্রাজ্যের পক্ষে সমগ্র ভারত অধিকার করিয়া নূতন পাদশাহী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত না।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত হইল, যে-সকল কারণে মারাঠারা হিন্দু পাদশাহী সংগঠন করিতে পারে নাই তাহাও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। আহম্মদ শাহ আবদালী অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে এবং রোহিলা-নায়ক নজীব খাঁকে মিত্ররূপে পাইয়া শক্তিমান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠারা কোন হিন্দু শক্তির সাহায্য পায় নাই। বারংবার উৎপীড়নে রাজপুতের মন মারাঠার প্রতি বিমুখ হইয়াছিল। জাঠনায়ক সুরজমল তখন ঐশ্বর্য্যে ও সামরিক শক্তিতে প্রবল, কিন্তু সাম্রাজ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত মারাঠারা তাঁহার মিত্রতা লাভের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নাই। পঞ্জাবে শিখেরা তখন আবদালীর পরম শত্রু, তথাপি মারাঠাবাহিনীর নায়ক সদাশিব রাও ভাউ তাহাদের সহিত সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন নাই। মল্হর রাও হোলকারের ন্যায় অভিজ্ঞ সেনানায়কের পরামর্শ তুচ্ছ করিয়া পেশোয়ার খুল্লতাত-ভ্রাতা নূতন রণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে পাণিপথের রণক্ষেত্র মারাঠা-শোণিতে রঞ্জিত হইল, সম্মিলিত মুসলমান শক্তির নিকট বৃহত্তর হিন্দু জাতির সহানুভূতিতে ও সাহায্যে বঞ্চিত মারাঠা সাম্রাজ্যের নিদারুণ পরাজয় ঘটিল।

তখনও মারাঠা জাতির প্রাণশক্তি একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। পাণিপথের যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ভগ্নহৃদয়ে [ক্ষয়রোগে] প্রাণত্যাগ

করিলেন। দক্ষিণে হায়দর আলীর অভ্যুত্থান হইল, পূর্ব্বদিক হইতে নিজাম পুণা আক্রমণ করিলেন, উত্তরে ভোঁসলা নিজামের সহযোগী রূপে স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, মালবে ও রাজপুতানায় সামন্তরাজগণ মারাঠা-কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। বোম্বায়ের ইংরেজ বণিকেরা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, এবার পুণার ব্রাহ্মণদের আর নিস্তার নাই। কিন্তু বালাজীর নাবালক পুত্র প্রথম মাধব রাও পেশোয়ার গদী লাভ করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে মারাঠা-শক্তির পুনরুদ্ধার করিলেন। হায়দর আলীর দর্প চূর্ণ হইল, নিজাম অবনতমস্তক হইলেন, ভোঁসলা পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার করিলেন, মালবে ও রাজপুতানায় মারাঠা-প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ বিজয়গৌরবের দিনেও মারাঠারা হিন্দু পাদশাহী প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই, বরঞ্চ লুপ্তপ্রায় মুঘল পাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করিয়াছিল। সম্রাট্ শাহ্ আলম কয়েক বৎসর যাবৎ নবাব সুজাউদ্দৌলা ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহজীবী হইয়া এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন। দিল্লীতে যাইয়া তৈমুর বংশের হৃতগৌরব সিংহাসনে আরোহণ করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। মারাঠাবাহিনী দিল্লী অধিকার করিয়া শাহ্ আলমকে সিংহাসনে স্থাপন করিল এবং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ শাসন করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে সম্রাটের রক্ষক মহাদাজী সিন্ধিয়া এক সনন্দের বলে পেশোয়াকে বাদশাহের প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিলেন; ইহা বালাজী বিশ্বনাথের নীতির পুনরাবৃত্তি মাত্র। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজবাহিনী দিল্লী অধিকার করিয়া সম্রাট্ শাহ্ আলমকে কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করে। মুঘল পাদশাহীর পতাকাতলে মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরিণামের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বিজ্ঞান-চর্চ্চায় ভারতীয় প্রতিভা

শ্রীসুশোভন দত্ত

'অপরা' বিদ্যা অপেক্ষা 'পরা' বিদ্যার প্রতি প্রাচীন ভারতীয় মনীষার আকর্ষণ বেশী ছিল সন্দেহ নাই। বেদ বেদান্তে অধ্যাত্মতত্ত্ব ও দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে সে মনীষার সম্যক্ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'অপরা' বিদ্যায় হিন্দু প্রতিভার দানও নগণ্য ছিল না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন ভারতীয় মনীষার দানের শুদ্ধ পরিমাপ আজও হয় নাই। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে জড়বিজ্ঞানে, গণিতে, রসায়নে, ভেষজতত্ত্বে ও চিকিৎসা বিদ্যায় প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা যত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ০ হইতে ৯ পর্য্যন্ত (০১২৩৪৫৬৭৮৯) দশটি চিহ্ন দ্বারা ছোট বড় যাবতীয় সংখ্যা নির্দ্দেশ করার পদ্ধতি গণিতশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বহু বাদানুবাদের পর অবিসংবাদিত ভাবে স্থির হইয়াছে হিন্দু গণিতশাস্ত্রবিদ্‌রাই প্রথম এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন। জ্যামিতি, বীজগণিত এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির চলাচল সম্বন্ধীয় গণনায় হিন্দু গণিতবিদ্‌দের প্রতিভার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। আরবীয়েরা মুখ্যতঃ ভারতীয়দের নিকট পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষা করে এবং পরে ইউরোপে ঐ বিদ্যার প্রসার করে। আর্য্যভট্টের (৬ষ্ঠ শতাব্দী) ন্যায় গণিতবিদ্, নাগার্জ্জুনের (৭ম বা ৮ম শতাব্দী) ন্যায় রাসায়নিক এবং চরক ও সুশ্রুতের (খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে) ন্যায় চিকিৎসক পৃথিবীর যে কোনও দেশের ও যে কোনও জাতির গর্ব্বের বিষয় হইতে পারিত। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে-দেশে এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল সে-দেশবাসী জড়বিজ্ঞান-চর্চ্চায় বিমুখ বা অক্ষম এই যুক্তি বাস্তবিক বিস্ময়কর। আমাদের দেশ ও জাতির পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়—যে কারণেই হউক বিগত ছয়-সাত শত বৎসর বিজ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণায় ভারতীয়েরা কোনও রূপ চেষ্টা বা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ও বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় বিজ্ঞানের কোনও শাখায় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বা গবেষণা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

বর্ত্তমান যুগে ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণার সূত্রপাত হয় বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং কেহ কেহ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভায় আসন লাভ করিয়াছেন। ভারতে

বিজ্ঞানচর্চ্চা কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে ভারতীয় বিজ্ঞান-মহাসভার (Indian Science Congress) বার্ষিক কার্য্য-সূচী হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সভার প্রথম অধিবেশনে ছয়টি শাখায় মাত্র পঁয়ত্রিশটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পঠিত হয়। তাহারও কতক-গুলি এদেশবাসী ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের রচনা। পঁচিশ বৎসর পরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক সভায় আট শতাধিক মৌলিক প্রবন্ধ প্রেরিত হয়। এই আট শত প্রবন্ধের অধিকাংশ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের রচনা। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের লণ্ডন রয়েল সোসাইটীর সভ্যপদ লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। ঐ বৎসর দক্ষিণ ভারতীয় গণিতবিদ্ শ্রীনিবাস রামানুজন এই সম্মান লাভ করেন। গত বাইশ বৎসরে আরও সাত জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক—জগদীশচন্দ্র বসু (পদার্থবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান ১৯২০), চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ (পদার্থ-বিজ্ঞান ১৯২৪), মেঘনাদ সাহা (পদার্থবিজ্ঞান ১৯২৭), বীরবল সাহানী (উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান ১৯৩৭), কার্য্যমাণিক্কম্ শ্রীনিবাস কৃষ্ণন্ (পদার্থবিজ্ঞান ১৯৪০), হোমী জাহাংগীর ভাবা (পদার্থবিজ্ঞান ১৯৪১), শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (রসায়ন ১৯৪৩)—রয়েল সোসাইটীর সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠ সম্মান ও পুরস্কার নোবেল প্রাইজ লাভও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। সমগ্র এশিয়াবাসীর মধ্যে প্রথম সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্মান লাভ করেন।

বর্ত্তমান যুগে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং বিজ্ঞান-জগতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের জন্য বিশিষ্ট আসন দাবি করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন দুইজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। যে-কোনও যুগে এবং যে-কোনও দেশে জগদীশ-চন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক স্বীয় মৌলিকত্ব ও নিপুণত্বের বলে বিজ্ঞানজগতে উচ্চ আসন লাভ করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তিনি যে-যুগে এ-দেশে জন্মিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণে ও গবেষণা এবং আবিষ্কারের সাফল্যে আমাদের আরও বিস্ময় লাগে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা দীর্ঘকাল বিশ্বাস ও প্রচার করিয়া আসিয়াছেন ভারতীয় প্রতিভা জড়বিজ্ঞানচর্চ্চাবিমুখ। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিভারপুলে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের এক সভায় বিশিষ্ট পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর সমক্ষে নাতিদীর্ঘ বেতার বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে কতক-গুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখাইয়া জগদীশচন্দ্র প্রচুর বিস্ময় সৃষ্টি করেন এবং ভারতীয় প্রতিভার বিজ্ঞানচর্চ্চাবিমুখতা-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন। লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে যোগদান করার দিন হইতেই জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বীয় প্রতিভা নিয়োজিত করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বেতার-বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বেতার সংবাদপ্রেরণ সম্বন্ধে মার্কনির পরীক্ষার পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র বেতার-বিদ্যুৎতরঙ্গের সাহায্যে সংকেত প্রেরণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন এবং একটি পরীক্ষায় ৭৫ ফুটের ব্যবধানে ৩টি দেওয়াল ভেদ করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে বেতার বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। এই সকল পরীক্ষায় তিনি ধাতুশলাকার মাথায় ধাতুর চাকতি ব্যবহার করেন। ইহা বর্ত্তমানে ব্যবহৃত বেতার-বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রেরণের যন্ত্রবিশেষের (antennae) কথা মনে করাইয়া দেয়। জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সম্মুখে এই সকল পরীক্ষা দেখাইলে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে দূরে বেতার-সংকেত প্রেরণ করা যায় কিনা তথা-কার বৈজ্ঞানিক মহলে সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল। দূরদেশে বেতারবার্ত্তা প্রেরণের সাফল্যের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহ মার্কনির প্রাপ্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে মার্কনির পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র এক স্থান হইতে অপর স্থানে বেতার-বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে সংকেত প্রেরণ সম্ভব ইহা প্রমাণ করেন। জগদীশচন্দ্রের ব্যবসায় বুদ্ধি প্রবল হইলে এবং ভারতের কলকারখানায় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকিলে জগদীশচন্দ্র ভারতের মার্কনি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। উত্তরকালে জগদীশচন্দ্র জড় বিজ্ঞানের পরীক্ষা ছাড়িয়া উদ্ভিদ্- ও প্রাণী-জগতের জীবনধারার সাদৃশ্য লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন তড়িৎস্পর্শে প্রাণীদেহে পেশীসমূহের যেরূপ সংকোচন হয় উদ্ভিদ্-দেহেও তদ্রূপ হয়। স্বীয় উদ্ভাবিত Resonant Recorder, Oscillating Recorder প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের দেহে উষ্ণতা, শৈত্য, উত্তেজক ঔষধ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতির প্রতি-ক্রিয়া প্রাণীদেহের অনুরূপ ইহা দেখাইতে সমর্থ হন, এবং উদ্ভিদের দেহে প্রাণীর ন্যায় হৃৎস্পন্দনের অস্তিত্বও প্রমাণ করেন। বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী প্রথমে তাঁহার পরীক্ষা ও প্রমাণ সন্দেহের চক্ষে দেখেন। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটী তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তাঁহাদের পত্রে প্রকাশ করিতে

পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হন। এইরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উৎসাহ আরও উদ্দীপিত হয় এবং অধিকতর সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তিনি উদ্ভিদের সাড়া লিপিবদ্ধ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরীক্ষা ও প্রমাণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের নিরাকরণ হয় এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরীক্ষা-সমূহের ফল সমর্থন করিয়া রয়াল সোসাইটীর একাদশ বিশিষ্ট সভ্যের স্বাক্ষরিত এক পত্র লণ্ডন 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবৎসর তিনি রয়াল সোসাইটীর সভ্য মনোনীত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। গত পঁচিশ বৎসর তাঁহার এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর তত্ত্বাবধানে এই বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গবেষণা চলিতেছে। এই বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য জগদীশচন্দ্র স্বীয় উপার্জ্জিত কয়েক লক্ষ টাকা এবং অন্য সম্পত্তি ট্রাষ্টীর হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন:

বর্ত্তমান যুগে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পথপ্রদর্শক হিসাবে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পরেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম মনে পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় চিরকুমার ঋষিতুল্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আজও আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে সুদূর প্রবাসে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নাগারে গবেষণায় রত এই ভারতীয় যুবক তাঁহার স্বদেশ কবে জগতের বিজ্ঞান-সভায় আসন পাইবে এই চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। আজ তাঁহার স্বপ্ন কিছু পরিমাণে সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করা ব্যাপারে তাঁহার নিজের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বীয় দীর্ঘ জীবনের একনিষ্ঠ চেষ্টায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশে রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের লেবরেটরীতে প্রফুল্লচন্দ্র যখন মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করেন তৎপূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র ব্যতীত কোনও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই দেশে মৌলিক গবেষণা করেন নাই। পারদঘটিত কতকগুলি নূতন যৌগিক পদার্থ mercury) nitrites) আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার উৎসাহে ও উদ্দীপনায় তাঁহার এক দল ছাত্র রাসায়নিক গবেষণায় নিযুক্ত হন। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বহু শিষ্য মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজ বিজ্ঞান-জগতে সুপরিচিত। জনৈক বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের লেবরেটরীকে 'ভারতের রাসায়নিক সৃষ্টি'র কারখানা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দুরসায়নের ইতিহাস রচনা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অপর কীর্ত্তি। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিজ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণায় আজীবন লিপ্ত থাকিয়াও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই। দেশের অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি উপদেষ্টা বা কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে যুক্ত। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্তে লালিত বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্—যাহার মূলধন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং যেখানে আজ প্রায় দুই সহস্র কর্ম্মী নিযুক্ত—বাঙালীর গর্ব্বের বস্তু।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্যগণের মধ্যে সর্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্ জ্ঞানচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপকতা করিয়া বর্ত্তমানে বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব্ সায়েন্স-এ ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যুৎবাহী তরলপদার্থ সম্বন্ধীয় নূতন একটি মত (Ghosh's theory of complete dissociation of strong electrolytes) প্রচার করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষের মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া Debye প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বিদ্যুদ্‌বাহী তরল পদার্থের রূপ ও ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছেন। আলোকরশ্মি কি ভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এসম্বন্ধেও তিনি বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালোর বিজ্ঞানমন্দিরে ফলিত ও ব্যবহারিক রসায়নে বহু গবেষণা চলিতেছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রাসায়নিক গবেষণায় এই দেশে যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় রাসায়নিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। শান্তিস্বরূপ পঞ্জাবে এক দরিদ্র শিক্ষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র আট মাস বয়সে পিতৃহীন হন। বি-এস্‌সি' পাশ করিয়া তিনি সামান্য বেতনে লাহোরে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। নিজের উৎসাহ, চেষ্টা এবং প্রতিভা বলে সেই দরিদ্র অনাথ বালক আজ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আসনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। Colloid এবং চৌম্বক রসায়নে (Magneto-Chemistry) তিনি অনেক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত সূক্ষ্ম চৌম্বকশক্তি পরিমাপক

যন্ত্র (Magnetic Balance) বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে এবং লণ্ডনের প্রসিদ্ধ যন্ত্রনির্ম্মাতা Adam Hilger Co এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেছে। সর্ শান্তিস্বরূপ বর্ত্তমানে ভারত-সরকারের 'ডিপার্টমেণ্ট অফ্ সায়ান্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ' নামক নূতন বিভাগের ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সংক্রান্ত নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের দান পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় পদার্থবিজ্ঞান-চর্চ্চায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রামন্, সাহা অথবা বসুর নাম পৃথিবীর যে-কোনও দেশে, পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রের নিকট সুবিদিত। 'রামন্ এফেক্ট' (Raman Effect) বিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ভারতীয় Audits and Accounts Servi.e-এ যোগ দেন। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার অসামান্য প্রতিভা সরকারী দপ্তরে নিয়মবাঁধা কাজে বেশী দিন অপব্যয়িত হয় নাই। কলিকাতার কর্ম্মস্থলে যাতায়াতের পথে বৌবাজারে ৺ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং সরকারী দপ্তরের কাজ শেষ করিয়া দিনান্তে এখানে আসিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। এই মনীষীর প্রতিভা শীঘ্রই ৺সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি রামন্‌কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে নবপ্রতিষ্ঠিত পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। রামন্ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই পদ গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সম্যক্ উন্মেষ হয়। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ধ্বনি-বিজ্ঞানে (accoustics) তারের কম্পন (vibration of strings) এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। বিশেষ কোনও কোনও শ্রেণীর অণুর (assymetric molecules) চৌম্বকশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত। তরল পদার্থের মধ্য দিয়া রঞ্জনরশ্মি (X-rays) বিক্ষিপ্ত করিয়া তরল পদার্থের শৃঙ্খলাবদ্ধ অণুসমাবেশ (orderliness in the arrangement of molecules) দেখাইবার একটি উপায় তিনি আবিষ্কার করেন। গভীর সাগরের বারিরাশির আকৃতি নীলবর্ণ আকাশের বর্ণের প্রতিফলনের জন্য হয় ইহাই এতাবৎ সকলে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। রামন্ প্রমাণ করেন বাস্তবপক্ষে সাগরের জলের অণুদ্বারা আলোক বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলেই সাগরের জল নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়। ঘন তরল অথবা বাষ্পীয় কোনও পদার্থের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষেপণের ফলে আলোক-তরঙ্গের আকৃতি-প্রকৃতির (wave-length and colour) কোনও ব্যতিক্রম হয় না ইহাই এতকাল বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী রামন্ আবিষ্কার করেন কোনও পদার্থের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইলে আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও বর্ণের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এই আবিষ্কারই 'রামন্ এফেক্ট' নামে পরিচিত। পদার্থবিশেষ দ্বারা বিক্ষিপ্ত আলোক-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হইতে সেই পদার্থের আণবিক সংগঠন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘন তরল ও বাষ্পীয় বিভিন্ন পদার্থের আণবিক ও রাসায়নিক সংগঠন নির্দ্দেশ ব্যাপারে রামনের নূতন আবিষ্কার অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছে।

রামনের বহু ছাত্র মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক কে. এস্. কৃষ্ণানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি একযোগে রামনের সঙ্গে বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। 'রামন্ এফেক্ট' আবিষ্কার ব্যাপারে আংশিক গৌরব ইঁহার প্রাপ্য। বিগত কয়েক বৎসর অধ্যাপক কৃষ্ণান crystals-এর চৌম্বকশক্তি পরিমাপের বিভিন্ন সূক্ষ্ম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং চৌম্বকশক্তির পরিমাপ হইতে crystals-এর মধ্যে অণুর সমাবেশ, অবস্থান ও শৃঙ্খলা (arrangement and orientation of molecules) সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

ভারতের অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বাংলা দেশে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় মেধা ও অধ্যবসায়ের গুণে বিজ্ঞান-জগতে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে এম-এস্‌সি পাস করিয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে লেক্‌চারার নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে তিনি পদার্থবিজ্ঞান-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। অনতিকাল পরে সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ করিলে কেবল কতকগুলি মাত্র মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় কেন ইহার ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক সাহা এক

মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধেই উত্তরকালে 'Saha's Ionization Theory' নামে পরিচিত মতবাদ প্রচার করেন। অধ্যাপক সাহার মতবাদ অনুসারে সূর্য্য এবং তারকায় তাপাধিক্য হেতু তথাকার পদার্থের অণুর বহিরাবরণের ইলেকট্রনগুলি একে একে খসিয়া পড়ে। অণুগুলি কি পরিমাণে ইলেকট্রন খোলসমুক্ত হইবে তাহা নির্ভর করে তাপ এবং চাপের উপর এবং অধ্যাপক সাহার মতবাদের সাহায্যে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন তারকার বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের সংগঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে তিনি সমর্থ হন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর্ আর্থার এডিংটন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা গ্রন্থে 'তারকা' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক সাহার মতবাদকে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ দ্বাদশটি আবিষ্কারের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক সাহা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও অনেক গবেষণা করিয়াছেন—তন্মধ্যে আণবিক বর্ণচ্ছত্র (atomic spectra) ও অণুকোষের উপাদান ও সংগঠন (nuclear structure) সম্বন্ধীয় গবেষণা উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে তাঁহার ল্যাবরেটরীতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে সাইক্লোট্রন নামক অণুবিধ্বংসী যন্ত্র (atom smasher) স্থাপন করা হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে অণুর আভ্যন্তরীণ উপাদান ও সংগঠন বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। অধ্যাপক সাহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ডাঃ ডি. এস. কোঠারী তারকার সংগঠন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। অত্যধিক তাপের ফলে পদার্থের অণু যেমন ইলেকট্রন খোলসমুক্ত হয় অধ্যাপক কোঠারী দেখাইয়াছেন অত্যধিক চাপের ফলেও তাহাই ঘটে—সে অবস্থায়ও অণুর বহিরাবরণে ইলেকট্রনের খোলসের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। তাপহীন মৃত তারকার বিশালায়তনের জন্য যে আভ্যন্তরীণ চাপের সৃষ্টি হয় সেই চাপে অণুর এই বিকৃতি ঘটে এবং ফলে মৃত তারকার দেহের সংকোচন হইয়া উহা অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। সূর্য্যের মৃত্যু ঘটিলে সূর্য্যের আয়তনও পৃথিবীর ন্যায় ক্ষুদ্র হইবে। ডাঃ কোঠারীর গণনা অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাপহীন অবস্থায় জুপিটার অপেক্ষা বৃহদায়তন কোন বস্তুপিণ্ডের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

বিগত কয়েক বৎসরে আরও কয়েক জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র, দেবেন্দ্রমোহন বসু, ডাঃ জে. এইচ. ভাবা, ডাঃ এস্. চন্দ্রশেখর প্রভৃতির নাম বিজ্ঞান-জগতে সুপরিচিত। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও জগদ্বিখ্যাত মনীষী আইনষ্টাইন একযোগে Bose Einstein statistics নামে পরিচিত অভিনব statistics উদ্ভাবিত করেন। অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র তড়িৎকণাবাহী বায়ুস্তরের (ionosphere) উচ্চতা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। এই তড়িৎকণাবাহী বায়ুস্তরের অস্তিত্বের জন্যই গোলাকৃতি ভূপৃষ্ঠের এক স্থান হইতে অপর স্থানে বেতার-তড়িৎতরঙ্গ প্রেরণ করা সম্ভব। বহু উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলে এইরূপ কয়েকটি তড়িৎকণাবাহী বায়ুস্তরের (ionospheric layers) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক মিত্র পূর্ব্ব পরিচিত স্তরগুলির নিম্নে একটি নূতন স্তরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু এদেশে সর্ব্বপ্রথম রেডিয়ো-একটিভ পদার্থের অণু হইতে নির্গত রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। অণুর রাসায়নিক গঠন ও চৌম্বক শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত। লৌহজাতীয় বিভিন্ন পদার্থের চৌম্বক শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক মতবাদ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক ষ্টোনার (Stoner) কর্ত্তৃক সেই মতবাদ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে Bose-Stoner মতবাদ নামে সুপরিচিত। ডাঃ জে. এইচ. ভাবা কস্‌মিক রশ্মির (cosmic rays) উৎপত্তি-বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার কোনও কোনও মতবাদ সাদরে বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হইয়াছে। ডাঃ এস্ চন্দ্রশেখর স্যর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের ভ্রাতুষ্পুত্র। অতি অল্পবয়সেই তিনি তারকার আভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং জন্মরহস্য প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং সম্প্রতি এর প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত আছেন।

বর্ত্তমান যুগে গণিতচর্চ্চায় যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন 'অর্দ্ধশিক্ষিত' ভারতীয়ের আসন অতি উচ্চে। বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্ শ্রীনিবাস রামানুজন্ গণিতে উচ্চশিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজন্ দক্ষিণ-ভারতে কুম্ভকোনামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এফ-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টে সামান্য বেতনে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে কোনও

উচ্চ কর্ম্মচারী গণিতে তাঁহার অপূর্ব্ব মেধার পরিচয় পান। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হার্ডি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সেখানে তাঁহার জন্য একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং রামানুজন্ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজে আসিয়া গণিতে গবেষণায় রত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তিনি লণ্ডন রয়াল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে এই প্রতিভাবান্ পুরুষ মৃত্যুমুখে পতিত হন। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রামানুজন্ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, প্রথম জীবনে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পাইলে এবং এরূপ অকালমৃত্যু না ঘটিলে রামানুজন্ জগতের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্‌দের মধ্যে চিরকাল আসন পাইতেন।

সম্প্রতি কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস অধ্যাপক হার্ডির সম্পাদনায় রামানুজনের মৌলিক গবেষণা সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত ইউরোপের অনেক প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ রামানুজন্ কর্ত্তৃক উল্লিখিত বিভিন্ন গণিতের সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত আছেন। রামানুজনের পরে গণিতের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা করিয়া যে-সকল ভারতীয় গণিতবিদ্ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ গণেশপ্রসাদ ও অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দেশে গণিতের একটি বিশিষ্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শাখায় চর্চ্চা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সংখ্যা-তত্ত্ববিদ্ (statistician) হিসাবে তাঁহার নাম দেশে-বিদেশে সুপরিচিত। তাঁহার উদ্ভাবিত কতকগুলি সংখ্যা-তাত্ত্বিক টেক্‌নিক্ (for classification of statistical populations, large-scale sample surveys প্রভৃতি) অত্যন্ত কার্য্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এদেশে সংখ্যাতত্ত্বের চর্চ্চা এবং সে সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের চর্চ্চা করিয়া এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী হইয়াছেন অধ্যাপক বীরবল সাহানী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভূপ্রোথিত প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্ প্রভৃতি (Plant fossils) সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বিজ্ঞান-জগতে সুপরিচিত। ভারতীয় উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে একমাত্র তিনিই রয়াল সোসাইটির সদস্যপদ লাভের সম্মান পাইয়াছেন।

ভেষজতত্ত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণায় কোনও কোনও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনে সর্ রামনাথ চোপ্‌রার তত্ত্বাবধানে cinchona alkaloids, emetine, artemesia, ephedras প্রভৃতি ভেষজ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। এদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত ভারতীয় গাছ-গাছড়া হইতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঔষধ প্রস্তুতকরণ বিষয়ে সর্ রামনাথ চোপরা বহু পরীক্ষা করিয়াছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশিষ্ট আবিষ্কারের মধ্যে সর্ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কালাজ্বরের প্রতিষেধক urea-stibamine আবিষ্কারই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশ ও আসামের বহু অংশে কালাজ্বর মড়ক রূপে দেখা দিত এবং এই রোগে মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৯৫। সর্ উপেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক urea-stibamine আবিষ্কারের পর এই রোগ দমন করা সহজসাধ্য হয়। আসাম-সরকার বহুলপরিমাণে এই ঔষধপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া আসাম প্রদেশকে কালাজ্বরের মড়কের হাত হইতে উদ্ধার করেন। আসামের স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তার মতে বিগত কয় বৎসরে আসামে urea-stibamine প্রয়োগে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও প্লেগ মড়ক-রূপে দেখা দেয়। বোম্বে হফ্‌কিন্ ইন্‌স্টিটিউট-এ কর্নেল এস্ এস্ সোখে প্লেগ-প্রতিষেধক টীকা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে-সকল বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র ব্যতীত সকলের গবেষণার কার্য্যকাল প্রায় বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে নিবদ্ধ। ঐতিহাসিক কারণে ভারতবর্ষ বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানচর্চ্চায় পাশ্চাত্য কোনও কোনও দেশের তুলনায় বহু পশ্চাৎপদ। এই অল্পকাল মধ্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্ব বিজ্ঞানচর্চ্চায় অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ একটি দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। এ দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণার সহিত যাঁহারা যুক্ত আছেন তাঁহারা পদে পদে অনুভব করেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে আজও বহু ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গবেষণা কার্য্য চালাইতে হয়। অর্থাভাব এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক-বিষয়ের গবেষণায় হস্তক্ষেপ করা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ইউরোপের অগ্রগামী দেশসমূহে ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়। ভারতের ধনী সম্প্রদায় ও সরকারকেও দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। বিগত পঁচিশ বৎসরে বিজ্ঞানচর্চ্চায় ভারতীয় প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আশা করা অসঙ্গত নয় যথেষ্ট অর্থানুকূল্য পাইলে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বহুল প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন।

চোর

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা। অসহ্য গরমে সমস্ত সংসার যেন একেবারে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে। একটু বাতাস নাই, আকাশে এক টুকরা মেঘের সঞ্চার নাই। এই দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মাথায় করিয়া বাগ্দীপাড়ার পশ্চিমের মাঠের আলপথ ধরিয়া নটবর বাগ্দী সম্মুখের পাড়াটির উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। রৌদ্র যে এত কড়া, বাতাস যে একেবারে আগুনের মত—গায়ে লাগিলে চোখমুখের চামড়ায় ফোস্কা উঠিতে চাহে—ইহার কিছুমাত্র খেয়াল নটবরের নাই। পা কিন্তু তাহার কোনক্রমেই আর চলিতে চাহিতেছে না—মনে হইতেছে এখানেই এই খররৌদ্রের ভিতরেই সে শুইয়া পড়ে। চোখের সম্মুখে বিশ্বসংসার তাহার ঘুরিতেছে—পেটের অন্ত্রগুলির সমস্ত গতিবিধি যেন সে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিতেছে—কোথাও যেন মোচড়াইয়া উঠিতেছে, কোথাও জ্বলিয়া যাইতেছে—কোথাও কাটাঘায়ের উপরে নুনের ছিটা দিলে যেমনি হয় তেমনি করিয়া উঠিতেছে। আজ চার দিন সে ভাতের মুখ দেখে নাই। এক দিন বজরা সিদ্ধ, এক দিন মেটে আলু সিদ্ধ। গতকল্য খানিকটা ফেন পাইয়াছিল, তাহাই আরও খানিকটা জলের সহিত মিশাইয়া নুন দিয়া খাইয়াছে, আজ সারাদিনের ভিতরে কিছুই জুটে নাই। সামনের পাড়াটা "মহাজন পাড়া"—বড় বড় ব্যবসায়ী ধনীলোকের পাড়া। কিন্তু সেখানে যে কি উদ্দেশ্যে নটবর যাইতেছে তাহা সে নিজেই জানে না। ভিক্ষা? ভিক্ষা যে মিলিবে না তাহা নটবর বেশ ভালভাবেই জানে। ভিক্ষা ইহারা দেয় না। দিবেই বা কয় জনকে! রাস্তায় রাস্তায় তাহার মত এমনি কত জন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক জনকে দিলে সেই মুহূর্ত্তেই দশ জন আসে, এক ঘণ্টার মধ্যে সেই দশ জন একশ' জনে দাঁড়ায়। অবস্থা যাহাদের ভাল, গোলা ভরিয়া বেশী লাভের আশায় যাহারা বেশী করিয়া মাল মজুত করিয়া রাখিয়াছে—দুই-দশ জনকে তাহারা যে দুই-এক মুষ্টি না দিতে চাহে এমন নয় কিন্তু বেশী লোক দেখিলে তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠে। এই বুভুক্ষুর দল সমস্ত ন্যায়-নীতি ও পাপ-পুণ্যের দড়াদড়ি ছিঁড়িয়া কখনও যে তাহাদের সযত্নসঞ্চিত ভাণ্ডারের ভিতরে জোর করিয়া মাথা গলাইয়া বসিবে না তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং ধনীদের ফটক একদম বন্ধ। তবু নটবর চলিয়াছে। পাড়াটার প্রান্ত সীমানায় পথের ধারে একটি বড় আমগাছ—তাহারই পরে বড় একটি বাগান—রায়বাবুদের বাগান। বাগানের পরেই রায়বাবুদের খিড়কির পুকুর। পুকুরের ওধারে পাকাবাড়ী। নটবর আমগাছটির তলায় আসিয়া একেবারে এলাইয়া পড়িল। আমগাছের গুঁড়ির উপরে দেহভার ন্যস্ত করিয়া দুই পা ধূলার উপরে ছড়াইয়া দিয়া—সে কতক্ষণ চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। পড়িয়া পড়িয়া নটবর স্বপ্ন দেখিতেছিল। ভাতের স্বপ্ন। এক থালা মোটা লালচালের মিষ্টি ভাত—সঙ্গে খানিকটা শাকচচ্চড়ি, ইয়া বড় একটা কই বা মাগুরমাছের ঝোল! পাইলে এক নিশ্বাসে সে থালার সমস্ত ভাত নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে। তাহার শুষ্ক মুখের ভিতরে অসাড় জিহ্বা হঠাৎ একবার আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়া আবার ঝিমাইয়া পড়িল। নটবর চোখ মেলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল—দূর শালার মাছই কি আছে বিলে এবার! কাল একটা বেলা ধরে কাদা হাতড়েও একটা কই পেলাম নাই। তারপর নটবর খাড়া হইয়া বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে আমগাছটার শাখায় পাতায় দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা; এই জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোথাও কোন গাছে এবার একটা আম পাইবার উপায় নাই। অন্যান্য বারে এ সময়টা অন্ততঃ মাস-খানেক গরীব দুঃখীর চালের খরচটা তো তবু অনেকটা কম লাগিত। এক বেলা অনেকে আম খাইয়াই পেট ভরাইয়া লইত। যাহার নিজের গাছ আছে তাহার তো কথাই নাই—যাহার গাছ নাই সেও পরের গাছের তলা হইতে দুই-দশটা কুড়াইয়া লইত। খানিকক্ষণ বৃথা তাকাইয়া তাকাইয়া সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া নটবর মনে মনে বিড়বিড় করিয়া গাছটার উদ্দেশ্যে গালাগালি করিতে লাগিল। পুনরায় গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়া আবার চোখ বুঁজিল সে। এবার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল কতকাল পূর্ব্বের একটি ঘটনা। এই রায়বাবুদের বড় তরফ—মহিম রায়—মস্তবড় চালের ব্যবসা ছিল তাঁর। সেবার আষাঢ় মাসের প্রথমে একসঙ্গে দশ দিন ধরিয়া নামিতে লাগিল ভীষণ বৃষ্টি। সমস্ত মাঠঘাট গেল ডুবিয়া—মাঠের ধানের উপরে বানের জল ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আউশ আমন কোন ধানেরই আর কোন আশা-ভরসা রহিল না। দেশের সব লোক হাহাকার করিতে লাগিল—কি খাইবে এবার—কেমন করিয়া বাঁচিবে। কিন্তু তবু চাউলের দাম তো দুই আনা সেরের বেশী উঠিল না। রায়বাবুরা, পোদ্দাররা সব হাজার হাজার মণ রেঙ্গুন চাউল আনিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। নটবর পুনরায় চোখ খুলিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—আর শালার কি যে হয়েছে এবার—বানে ডুবলো না রোদে শুকিয়ে গেল না ফসল উঠলো চাষার ঘরে—তবু শালার চালই পাওয়া যাচ্ছেক নি বাজারে! লুকিয়ে কেউ দুই-এক সের বেচে তো দাম টাকা টাকা সের! সে পুনরায় চোখ বুজিল। সেবার নটবরের যোয়ান বয়স। রায়বাবুদের কাজ করিত সে। সেবার একদিন পাংশা ষ্টেশনে দুই শত মণ

চাউল নামিল মহিম রায়ের। নৌকা লইয়া চন্দনা উজাইয়া নটবর গেল আর চার-পাঁচ জন লোক লইয়া সেই চাউল আনিতে। নৌকাও বোঝাই হইল—এদিকে বৃষ্টিও অঝোর ধারায় ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল। সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া গ্রামে আসিয়া ঢুকিতে রাত্রি হইয়া গেল এক প্রহর। বৃষ্টির কিন্তু তবুও বিরাম নাই। এত রাত্রে এই বৃষ্টির ভিতরে কে নামাইবে চাউল। বাগ্দীপাড়ায় আসিয়া নৌকা পৌছিলে রায়বাবু হুকুম দিলেন—নৌকা নটবরের বাড়ীর ঘাটে বাঁধিয়া রাখিতে। কাল সকালে মাল ঘরে তোলা যাইবে, দুইশত মণ চাউলের নৌকা রহিল সারারাত্রি নটবরের ঘাটে বাঁধা—নটবর রহিল তাহার একমাত্র প্রহরী! আর আজ সেই নটবর তিন দিনের মধ্যে এক দানা অন্ন জুটাইতে পারে নাই! তিন দিন ধরিয়া ছোট ছেলেমেয়ে দুইটি ঘরের দাওয়ায় পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। বড় মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে—মাস দুই ধরিয়া একবেলা খাইয়া উপবাস করিয়া মেয়েটি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে—হাতেপায়ে জল লাগিয়াছে—বাঁচিবে না নিশ্চিত। নটবরের দৃষ্টি গিয়া পড়িল রায়বাবুদের খিড়কির ঘাটের দিকে। রায়বাবুদের ঝি মোক্ষদা এক গাদা এঁটো বাসন লইয়া ঘাটে আসিয়া নামিল। মোক্ষদা ঘাটে বসিয়া ভুক্তাবশিষ্ট সব ঘাটের পাশে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। নটবর একদৃষ্টে সেইদিকে রহিল তাকাইয়া। এঁটো কয়েকটি ভাত তরকারির চোক্‌লা—লঙ্কার খোসা যদি পাইত সে! তাহার রসনা পুনরায় সজল হইয়া উঠিল। মোক্ষদা বাসনগুলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া ঢুকিল। নটবর পুনরায় চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ঠিক মাথার উপরের একটা ডালে একটি কাক আসিয়া কা-কা করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। বড় বিশ্রী লাগিতেছিল নটবরের। চোখ মেলিয়া কাকটিকে দুই হাত আস্ফালন করিয়া তাড়াইতে গেল কিন্তু হাত দুইখানি যেন একেবারে 'অসাড়' হইয়া গিয়াছে আর উঠিতে চাহে না। কাকটি কিন্তু কয়েক বার ডাকিয়া উড়িয়া গিয়া সম্মুখের কাঁঠাল গাছটিতে বসিল। বার-চৌদ্দটি বড় বড় কাঁঠাল হইয়াছে গাছটিতে। কয়েকবার ইতস্ততঃ করিয়া কাকটি একটি বড় কাঁঠাল ঠোক্‌রাইতে আরম্ভ করিল। কয়েক বার ঠোক্‌রাইয়া আস্ত একটি কোষ বাহির করিয়া ফেলিয়া দুই ঠোঁটের ভিতরে চাপিয়া একেবারে নটবরের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ নটবরের মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল—পাকিয়াছে কাঁঠালটা তাহা হইলে। নটবর এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল—সম্মুখে ও পশ্চাতে কয়েক বার দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু পিছনের দিকে চাহিয়া দেখে—নিতাই মণ্ডল গরু লইয়া মাঠের দিকে আসিতেছে। নিতাই চলিয়া গেলে পুনরায় সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল—এবার আর পথে কাহাকেও দেখা গেল না কিন্তু পুনরায় মোক্ষদা আর এক গাদা বাসন হাতে করিয়া ঘাটে আসিয়া বসিল। নটবরের গা রাগে জলিয়া গেল! তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—আবার মরতে এলি ঘাটকে—মরিস্ নি কেনে—তুই মর—শিয়াল শকুনির পেট ভরুক। নাঃ এবার আর কোন আশা নাই, মোক্ষদা বিকালের আগে আর ঘাট হইতে উঠিবে না—ততক্ষণ রাস্তা দিয়া রীতিমত লোক চলাচল আরম্ভ হইয়া যাইবে। নটবর উঠিয়া বাড়ীর পানে পা চালাইল।

২

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ অল্প রাত্রেই চাঁদ উঠিবে, সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই কাজটি শেষ করা দরকার! নটবর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া আবার সেই আলপথ ধরিয়া রায়বাবুদের বাগানের দিকে চলিল। পথটি আধ মাইল হইবে। এই পথটুকু চলিতে চলিতে নানা চিন্তা মাথায় আসিতে লাগিল নটবরের। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। নটবর হাটের পাশের বড় রাস্তাটি ধরিয়া বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। হঠাৎ পথের মাঝে এক জায়গায় সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। রাস্তার উপরে ঘাসের ভিতরে একটি চামড়ার মনিব্যাগ রহিয়াছে পড়িয়া। নিকটে কোন লোকজন ছিল না। নটবর ব্যাগটি তুলিয়া লইল। খুলিয়া দেখে দশ টাকার করিয়া কুড়িখানা নোট রহিয়াছে ভিতরে। কাপড়ের নীচে লুকাইয়া বাড়ী আসিয়া ঘরের ভিতরে পুনরায় ব্যাগটি খুলিয়া গনিয়া গনিয়া দেখিল—নগদ দুইশত টাকা! কাহার টাকা? যাহারই হউক, কেহ তো আর জানিতে পারে নাই। নটবর অতি যত্ন করিয়া শিকায় হাঁড়ির ভিতরে তুলিয়া রাখিল নোটগুলি। স্থির করিল এ টাকা সে লইবে। কিন্তু সারাটা দিন সে কোন কাজ করিতে পারিল না। আচ্ছা, সে যদি না পাইয়া অন্য কেহ পাইত—ফিরাইয়া দিত কি টাকাগুলা? তাদের পাড়ার হলধর কি গোবিন্দ পাইলে যে দিত না তা সে হলফ করিয়া বলিতে পারে। কিন্তু সবাই তো আর এক রকম নয়। সেবার ও-পাড়ার চকোত্তিদের পুকুরে, বড় চকোত্তির পুত্রবধূর গলার সোনার হার হারাইয়া গিয়াছিল—ডুবুরি নামাইয়া জল তোলপাড় করিয়া ফেলা হইল—কিন্তু হার পাওয়া গেল না। পরের দিন সকাল বেলা তারিণী মাঝি মুখ ধুইতে পুকুরে নামিতেই দেখে পরিষ্কার জলের নীচে কি যেন চক্ চক্ করিতেছে। মাত্র এক হাঁটু জলে নামিয়া তারিণী হারগাছি তুলিয়া ফেলিল, তুলিয়াই চকোত্তি-গৃহিণীর হাতে গিয়া তুলিয়া দিল। ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল তারিণীর নামে। আবার ভাবিয়াছিল—কিন্তু কাহার টাকা তাহারই নাই খোঁজ—পথে পাইয়াছে কুড়াইয়া—কাহাকে দিতে যাইবে সে? কিন্তু বিকালবেলা খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। বোসেদের বাড়ীর বড়বাবুর টাকা হারাইয়াছে। তিনি সাইকেলে চড়িয়া সদরে যাইতেছিলেন খাজনা দিতে—পথে কোথায় মানিব্যাগসুদ্ধ সমস্ত টাকা পড়িয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা বৈঠকখানায় বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু সবাই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। নটবর গিয়া সেখানে ঢুকিল। ধীরে ধীরে কাপড়ের নীচে হইতে মানিব্যাগটি বাহির করিয়া বলিল—

ভাখেন তো বড়বাবু আপনার মনিব্যাগ কি না? বড়বাবু তাড়াতাড়ি নটবরের হাত হইতে ব্যাগটি লইয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এ কি তুই পেয়েছিস্ নটবর—দেখি দেখি! খুলিয়া দেখেন—ভিতরে দশ টাকার কুড়িখানা নোট তেমনি ভাঁজ-করা রহিয়াছে। তারপর নটবরের সে কি খাতির—গ্রামময় সুখ্যাতি পড়িয়া গেল। বড়বাবু দশটি টাকা তাহাকে দিলেন পুরস্কার। বোসগিন্নি পরের দিন তাহাকে পেট ভরিয়া রসগোল্লা খাওয়াইলেন। তাহার মনে আছে—তিন কুড়ি রসগোল্লা খাইয়াছিল সে!

আর আজ? নটবরের দুই চোখ বহিয়া ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। চোর সে—রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া সামান্য একটি কাঁঠাল চুরি করিতে যাইতেছে। হঠাৎ মাঠের প্রান্ত সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল নটবর। না, সে পারিবে না চুরি করিতে—পারিবে না। কিন্তু পেটের অন্ত্রগুলা তখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—ঘরে ছেলেমেয়ে দুইটি যে মরিবার মত হইয়াছে!—না চুরি সে করিবে—যেমন করিয়া হোক্ বাঁচিতে হইবে তো! মাত্র দশ-বার হাত উঁচুতে কাঁঠালটি। বেশ বড় কাঁঠাল, প্রায় আধ মণ হইবে ওজনে। নটবর প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া কাস্তে দিয়া বোঁটাটি কাটিয়া ফেলিল। হঠাৎ কে একজন বেড়া ডিঙাইয়া একেবারে নটবরের গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেই দিকে চোখ পড়িতেই নটবরের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে কাঁঠালের বোঁটাটি শক্ত করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া গাছের উপরে বসিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। নীচের লোকটি দুই-এক বার এদিক-ওদিক তাকাইয়া গাছের গুঁড়ি হইতে দুটি কাঁঠাল ছিঁড়িয়া মাটিতে নামাইয়া দুইটিকে একসঙ্গে রশি দিয়া বাঁধিয়া মাথায় লইবার যোগাড় করিতেছিল। নটবর গাছের উপরে বসিয়া সমস্তই দেখিল—তাহার সমস্ত ভয় গেল দূর হইয়া—এও তাহা হইলে তাহার মত আর একটি চোর! কিন্তু দুর্বল শরীরে গাছের উপরে বসিয়া এতবড় কাঁঠালের ভার সে কিছুতেই আর সহিতে পারিতেছিল না। অগত্যা কাঁঠালটি হাতে ধরিয়া গাছ বাহিয়া নীচে নামিয়া ঝুপ করিয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। নীচের লোকটি আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করিয়া দৌড় দিল—কিন্তু সম্মুখের বেড়ায় বাধিয়া একেবারে চিৎপাত হইয়া গেল পড়িয়া। নটবর ভড়কিয়া গিয়াছিল। কিন্তু লোকটি আর উঠিবার চেষ্টামাত্রও করিল না দেখিয়া দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। লোকটা নিশ্চয় ভূতের ভয় পাইয়াছে—এমনি করিয়া ভয় পাইয়া মরিয়া যাইবে নাকি শেষে। সে তাড়াতাড়ি গিয়া লোকটিকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। ততক্ষণ আকাশে চাঁদ দেখা দিয়াছে—অন্ধকার আর নাই। নটবর লোকটির মুখের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল! এ কি, এ যে রসিকঠাকুর!—গ্রামের পুরোহিত!

রসিকঠাকুরকে খানিকটা সুস্থ করিয়া লইয়া আবার সেই মাঠের আলপথ ধরিয়া তাহারা চলিতে লাগিল। রসিকঠাকুর কিছু দূর গিয়া দক্ষিণের পাড়াটির দিকে যাইবেন—নটবর যাইবে সোজা পূর্ব্বে।

মাঠে নামিয়া রসিক বলিলেন—দেখিস্ বাপু—কথাটি যেন কোনক্রমে প্রকাশ না হয়! শেষকালে—এই বুড় বয়সে—

নটবর বাধা দিয়া বলিল—বলতে যাব কেনে, দা-ঠাউর—আমি নিজেও যে আজ চোর!

রসিকঠাকুর কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—আর বলিস নে বাপু—আজ দুটো দিন অন্নের মুখ দেখি নি! মরে গেলাম রে—এবার আর বাঁচব না। আমাদের দিকে কে ফিরে দেখে?

নটবর তাহার কাঁঠালটির ভাঙ্গা স্থানটির ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিয়া ততক্ষণ একটির পর একটি কোষ বাহির করিয়া মুখের ভিতরে পুরিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পথের বাঁকে আসিয়া রসিকঠাকুর থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

নটবর বলিল—এইবার যান্ তাহলে দা-ঠাউর।

রসিক বলিলেন—একটা কথা বলতে চাই নটবর!

নটবর বলিল—আজ্ঞে করেন!

—তোর কাঁঠালটা থেকে খানিকটা কেটে আমায় দিয়ে যা আর আমার একটা তুই নে। পাকা কাঁঠালের কতকটা পেলে তবু ছেলেমেয়ে দুটি আজ খেতে পাবে।

নটবর সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—কিন্তু আমি যে এঁটো করে ফেলেছি, দা-ঠাউর!

—আরে রেখে দে বাপু ও সব—নিজে বাঁচলে তো বাপের নাম!

নটবর কাস্তে ঢুকাইয়া দিয়া আড়াআড়ি কাঁঠালটি দুই ভাগ করিয়া ফেলিয়া একটি ভাগ রসিকঠাকুরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—কিন্তুক চুরি করা তো মহাপাপ দা-ঠাউর!

—পাপপুণ্যির সময় এ নয় রে! আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে—আত্মানাং সততং রক্ষেৎ—অর্থাৎ যেমন করেই হোক বাঁচা চাই-ই বুঝলি না।

একা একা চলিতে চলিতে নটবরের মন অনেকখানি হাল্কা হইয়া গেল।—এ চুরিতে তা হ'লে পাপ নাই। রসিকঠাকুর, যিনি ভদ্দর লোকের বাড়ী বাড়ী পুজো করে বেড়ান—তিনি যখন চুরি করেন—তবে সে তো কোন্ ছার! আর সেই যে তিনি কি বললেন—আত্মানাং না কি—সেও ত শাস্তোরেরই কথা!

ঘরে ঢুকিয়া নটবর ডাকিল—ও বাতাসী, বাতাসী আয় মা!

বাতাসী ঘরের মেঝেয় শুইয়াছিল—তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—খিদে লেগেছে বাবা?

নটবর কাঁঠালটি ঘরের মেঝের নামাইয়া বলিল—এই যে আয় মা! বলাই কুথারে?

বাতাসী ঘরের আর এক কোণায় আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ যে হোথায় শুয়ে আছে—এতক্ষণ ক্ষিদের জ্বালায় কাঁদতি লেগেছ্যালো। বাতাসী কাঁঠালের কোষ ভাঙ্গিয়া মুখে পুরিতে লাগিল। নটবর বলাইকে কয়েক বার ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না, বলাই তখন মূর্চ্ছিত।

রোগীর পথ্য

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

আজকাল দৈনন্দিন সাধারণ খাদ্যই যখন দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য তখন রোগীর পথ্য সংগ্রহ করা কিংবা তার ব্যয় বহন করা যে কি কষ্টকর ব্যাপার তা জনসাধারণের সকলেই জানেন। এই সম্বন্ধে আমাদের চিকিৎসকদের উপযুক্ত নির্দেশের অভাব, পথ্য সম্বন্ধে সাধারণের মনের কতকগুলি ভুল ধারণা, এবং সময় সময় রোগীর নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনেক স্থলে ব্যয়বাহুল্য সত্বেও পথ্য-বিভ্রাটের কারণ হয়; ফলে অসুখ সারতে অনেক দেরি হয়। যে কোন রোগে উপযুক্ত ঔষধের চেয়ে উপযুক্ত পথ্যের আবশ্যকতা কোন অংশে কম নয়, আবার অনেকগুলি রোগ কেবল নিয়মিত সতর্ক-পথ্য গ্রহণেই সারে, এবং কতকগুলি রোগ সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক ভাবে, পথ্যের সাহায্যেই উপশম হয়। এ জন্য সাধারণের (বিশেষত মহিলাদের, কারণ তাঁদেরই প্রায়শ রোগীর পথ্যের ঝুঁকি নিতে হয়) অবগতির জন্য এই প্রবন্ধে দু-চারটি কথা আলোচনা করব।

"মাছে ভাতে বাঙালী"; যতই দুর্মূল্য অথবা দুর্লভ হোক না কেন, এই দুই বস্তুই আমাদের সাধারণ খাদ্য। সাধারণ অসুখ-বিসুখের সময় আমরা ভাতের পরিবর্তে আটা কিংবা সুজির রুটি, (কখনও বা পাঁউরুটি), সাগু, বার্লি, এবং সময় সময় খই কিংবা চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি খাই। অধিকাংশ রোগেই রোগীর পরিপাক শক্তি কমে যায় সেজন্য পথ্য যাতে পুষ্টিকর অথচ লঘু ও সহজপাচ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

আটার রুটি—সাধারণত জ্বর প্রভৃতিতে ভাতের পরিবর্তে এর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু একমাত্র অভ্যস্ত খাদ্য ভাতের পরিবর্তে "মুখ বদলানো"-গোছের ক্রিয়া ছাড়া এর দ্বারা অন্য কোন উপকারই হয় না; কেননা ভাত এবং আটার মধ্যে ভাতই সহজপাচ্য বলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যাঁরা সর্বদা রুটি খান, তাঁরা জ্বর হলে ভাত পথ্য-হিসাবে গ্রহণ করেন। পুষ্টি হিসাবেও আটার স্থান ভাতের খুব উপরে নয়, কেননা যদিও আটাতে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ কিছু পরিমাণে অধিক থাকে, তবু চাউলের প্রোটিনের শরীর-গঠনোপযোগী শক্তি আটার প্রোটিনের অপেক্ষা অনেক বেশি। আটায় 'বি'-জাতীয় ভাইটামিনের পরিমাণ কলে ছাঁটা চাউলের পরিমাণ থেকে অধিক হলেও, সিদ্ধ চাউল অথবা ঢেঁকিছাঁটা চাউল অপেক্ষা খুব বেশী নয়। সুতরাং পথ্য হিসাবে ভাতের পরিবর্তে আটার রুটির ব্যবস্থায় বিশেষ কোন উপকার হয় না। সুজির মধ্যে ভাইটামিন, এবং ময়দা কিংবা আটা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রোটিন আছে, এতদ্ব্যতীত সুপাচ্য বলে ভাতের পরিবর্তে রোগীকে সুজি দেওয়া যেতে পারে। সুজির তালকে প্রথমে জলে সিদ্ধ করে যে রুটি প্রস্তুত করা হয়, তা সহজে পরিপাক হয়, এজন্য রোগীর পথ্যরূপে এই ভাবে প্রস্তুত রুটিই দেওয়া উচিত।

পাঁউরুটি—গৃহে প্রস্তুত রুটি অপেক্ষা পাঁউরুটি সুপরিপাচ্য হলেও একে ভাতের তুলনায় দুষ্পাচ্যই বলা চলে, কারণ যখন এক হতে দু-ঘণ্টার মধ্যে ভাতের পরিপাক হয় তখন পাঁউরুটি পরিপাক হতে সময় লাগে তিন হতে চার ঘণ্টা। সাদা পাঁউরুটি সাধারণত ময়দায় প্রস্তুত হয় বলে তাতে ভাইটামিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ খুবই কম থাকে, এজন্য বাজারে যে ধূসর বা আটার পাঁউরুটি (brown bread) পাওয়া যায়, খাদ্য হিসাবে তা সাধারণ সাদা পাঁউরুটি হতে অনেক পুষ্টিকর। পাঁউরুটি খণ্ডগুলিকে টোষ্ট করে নিলে যদিও তা কতকটা সুপাচ্য হয়, তবু সম্যক্ পরিপাক হতে ভাতের চেয়ে অধিক সময় লাগে। সুতরাং ভাতের পরিবর্তে পথ্যরূপে পাঁউরুটির বিশেষ কোন মূল্য থাকতে পারে না।

সাগু—বাজারে সাগুদানা বা পার্ল-সাগু বলে সাধারণত যে বস্তু পাওয়া যায়, আসলে তা সাগুদানা নয় এবং প্রকৃত সাগুদানার মত সুপাচ্যও নয়। আসল সাগুদানা সাগু-গাছের মজ্জা হতে প্রস্তুত হয়, এবং তার দামও অনেক বেশী। বাজারে বিক্রীত সাধারণ সাগুদানা কাসাভা নামক এক জাতীয় গুল্মের শিকড় থেকে প্রস্তুত শ্বেতসার ছাড়া আর কিছুই নয়। এর তুলনায় প্রত্যেক গৃহে প্রায়শ যে ভাতের ফেন নষ্ট করা হয়, তা পথ্য হিসাবে অনেক ভাল, কেননা তা যেমন সুপাচ্য, তেমনি তাতে ভাইটামিন এবং ফসফরাস প্রভৃতিও আছে। সুতরাং আজকাল অধিক মূল্যে বাজারের সাগু নামক বস্তু ক্রয়ের কোনও প্রয়োজনই নাই। আয়ুর্বেদ-মতে সফেন অন্ন অ-ফেন অন্ন অপেক্ষা পুষ্টিকর। বর্তমান পঞ্চাশের মন্বন্তরে অসংখ্য অন্নহীন বভুক্ষু নরনারীর

গৃহে গৃহে পরিত্যক্ত ফেনের সাহায্যেই কতকটা জীবন-রক্ষা সম্ভবপর হয়েছিল।

বার্লি—পরিষ্কৃত যবের গুঁড়োকে সাধারণে বার্লি বলে। এটি একটি সহজপাচ্য পথ্য; কিন্তু বাজারে সাধারণত যে বার্লি খোলা অবস্থায় বিক্রয় হয়, প্রায়ই নানা ভেজালের জন্য তার রং ময়লা থাকে। খ্যাত দেশী ব্যবসায়ীর টিনে ভরা বার্লি, বিলাতি অধুনা দুর্মূল্য বার্লির পরিবর্তে পথ্য হিসাবে চলতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণে লেবুর রসের সঙ্গে ইহা সুস্বাদু ও স্নিগ্ধকর পানীয় রূপেও ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলে এর পরিবর্তে চিড়ার মণ্ডও দেওয়া যেতে পারে। প্রায় এক ছটাক চিড়া এক ঘণ্টা এক পোয়া গরম জলে ভিজিয়ে রেখে, পরে আরও আধ পোয়া গরম জল মিশিয়ে পাঁচ মিনিট আগুনে ফুটিয়ে নিতে হয়। তারপর একটা পরিষ্কৃত ন্যাকড়ার মধ্যে রেখে দু'দিকে ধরে, চিড়াকে ভাল করে জল দিয়ে চটকাতে থাকলে যে সূক্ষ্ম মণ্ড কাপড়ের অপর দিকে ছেঁকে বের হয়, তাকে উপযুক্ত-পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

এরোরুট—বাজারে এরোরুট নামে যা পাওয়া যায়, তা সাধারণত নানা প্রকার নিকৃষ্ট শ্বেতসার থেকে প্রস্তুত, এজন্য শিশু বা রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহারে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। এদেশে প্রস্তুত 'শটি-ফুড'ও প্রায় ভেজালযুক্ত। বিশুদ্ধ হলে শটি-চূর্ণ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এরোরুট, শটি প্রভৃতিতে ক্যালসিয়াম লবণ একেবারে না থাকাতে, শিশুর খাদ্য কিংবা রোগীর পথ্য হিসাবে বহুদিন ক্রমাগত খেতে দিলে অপকার হতে পারে।

মাছ—ভাতের ন্যায় মাছও বাঙালীর খাদ্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু আজকাল দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। মাছ সুপাচ্য, মাংসেরই ন্যায় দেহগঠনোপযোগী প্রোটিন-সম্বলিত একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। জনসাধারণের মনে বিশ্বাস যে মাছে অধিক পরিমাণে ফসফরস থাকাতে যাঁরা মনন, চিন্তন প্রভৃতি মস্তিষ্কের কার্য অধিক করেন, তাঁদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য আছে কিনা সন্দেহ। পূর্বে মনে করা হত যে বাঙালীরা মাছ খায় বলেই তীক্ষ্ণধী হয়, কিন্তু অধুনা মস্তিষ্কের উৎকর্ষে নিরামিষাশী মাদ্রাজীদের অগ্রগতি সেই ধারণার সমর্থন করে না। এতৎসত্ত্বেও মাছ যে একটি সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতির বাচ্চা, মৌরলা, খলসে প্রভৃতি ছোট মাছ এবং কই, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি জীয়ল মাছ-গুলি সুপাচ্য ও বলকারক বলে রোগীর পথ্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পক্ষান্তরে ইলিশ, বাচা প্রভৃতি মাছে স্নেহের অংশ বা তৈল অধিক থাকে বলে, ভাইটামিন 'এ'-র উপস্থিতি সত্ত্বেও দুষ্পাচ্যতার জন্য এদের রোগীর পথ্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। চিংড়ি ও কাঁকড়া মাছ-জাতীয় জীব নয়, এবং দুষ্পাচ্য বলে কখনই রোগীকে দেওয়া উচিত নয়। অতি অল্প মসলা সহযোগে মাছ সিদ্ধ কিংবা মাছের ঝোলই রোগীর পক্ষে প্রকৃষ্ট খাদ্য। মাছ ভাজা, কিংবা ঝাল চচ্চড়ি, কিংবা কালিয়া প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্যগুলি রোগীর পক্ষে বর্জনীয়।

মাংস—সাধারণ পথ্য হিসাবে মাংস বর্জন করাই বিধেয়। তবে কখনও বা অসুখের পর পরিপুষ্টির জন্য চিকিৎসকেরা মাংসের বিধান করেন। ঐ সময় পক্ষী-মাংসের অথবা কচি ছাগ-মাংসের সুপ-রূপেই তা পথ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রোগের পরবর্তী অবস্থায়ও পরিপাকশক্তি ক্ষীণ থাকে বলে কখনই মাংস খাওয়া উচিত নয়, বরং খানিকক্ষণ চিবিয়ে ফেলে দেওয়াই উচিত। হাড়ের সুপও একটি বলকারক পথ্য। রক্তহীনতা প্রভৃতি রোগে কাঁচা অথবা অল্প সিদ্ধ যকৃৎ (মেটে) খেতে দিলে উপকার হয়। সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে অধিক তেল, ঘি কিংবা মসলা সহযোগে, মাংস অত্যন্ত গুরুপাক বস্তুতে রূপান্তরিত হয় বলে রোগীর পক্ষে সে রকমে রাঁধা মাংস কখনই পথ্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়।

ডিম—একটি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্য। যে সকল রোগে পরিপাক শক্তি খুবই কমে যায়, তাতে আধসিদ্ধ, সিকিসিদ্ধ, কিংবা কাঁচা ডিম, এবং সময় সময় সাদা অংশ (এল্‌বুমিন) জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিলে উপকার হয়। ডিমের কুসুমও একটি খুবই পুষ্টিকর বস্তু। অধিক সিদ্ধ শক্ত ডিম, ডিমের অমলেট, ডিমের কালিয়া প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুপাক বলে পথ্য হিসাবে ঐরূপ বস্তুগুলি অনিষ্টকর।

দুধ—অনেক রোগেই দুধ অথবা দুধ থেকে প্রস্তুত দই, এবং পরিমিত মাত্রায় ঘি, মাখন, ছানা প্রভৃতি দুগ্ধজ উপাদানগুলি পথ্যরূপে দেওয়া যেতে পারে। ছানার জলও সময় সময় খুবই উপকারী পথ্য, এমন কি এর মধ্যে ল্যাকটোজ নামক যে শর্করা থাকে তারও পথ্য হিসাবে মূল্য বড় কম নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ দেশে দুধের বড়ই অভাব, এবং দুর্মূল্যতার জন্য পথ্য হিসাবে জন-সাধারণের সাধ্যের বাইরে বললেও চলে। গ্ল্যাক্সো, হরলিক্স, মল্টেড মিল্ক প্রভৃতি বিদেশী দুগ্ধজ খাদ্যও বাজারে

বেশী পাওয়া যায় না। সুতরাং শিশু, গর্ভিণী এবং স্তন্য-দাত্রী জননীদের স্বাস্থ্য উপযুক্ত দুধের অভাবে দিন দিনই অবনতির নিম্ন স্তরে নেমে যাচ্ছে। ১৯৩৭ সালে পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি রূপে আমি গরীবদের খাদ্যে প্রত্যহ পাঁচ থেকে দশ গ্রেণ ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট কিংবা ডাই-ক্যালসিয়ম ফসফেট খেতে দিলে তাদের দেহ গঠন হয় এবং শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়ম অনেকটা অব্যাহত থাকে, সে কথা বলেছিলুম। আমার মনে হয়, এই দুঃসময়ে এরূপ কৃত্রিম উপায়েই দুগ্ধের অভাব জনিত ক্যালসিয়মের এবং সেই অনুসারে ফসফরসের অল্পতাও দূর করা উচিত। অবশ্য কেউ কেউ সোয়া-বীন নামক সিমজাতীয় বীজ হতে প্রস্তুত এক প্রকার তরল পদার্থ দুধের পরিবর্তে ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, কিন্তু সকল গৃহে তা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, এবং অনেকে তার স্বাদও পছন্দ করেন না; সুতরাং এভাবে বাংলা দেশে দুধের অভাব সোয়া-বীন দিয়ে মেটানো সম্ভবপর নয়।

ডাল—যাঁরা মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খান না, ডাল হতেই তাঁদের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যাংশ লাভ হয়। ডালের মধ্যে মুগ এবং ছোলাই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী, যদিও অনেকের মনেই ভুল ধারণা আছে যে একমাত্র মসুরই মাংসের ন্যয় গুণ-সম্পন্ন, এবং এই ধারণার বশে নিরামিষাশীরা এই ডালকে সর্বদাই বর্জন করেন। ডালের মধ্যে লোহা এবং ক্যালসিয়ম ঘটিত লবণ যথেষ্ট থাকে, এবং প্রোটিনও প্রচুর পরিমাণে আছে বলে সুসিদ্ধ ডালের জল সময় সময় উপকারী পথ্য বলে গণ্য হতে পারে। ডালের সঙ্গে সর্বদাই অল্প পরিমাণে ঘি অথবা মাখন খাওয়া উচিত। যাঁরা সহজে ডাল পরিপাক করতে পারেন না, তাঁরা অনায়াসে পাঁপর খেতে পারেন। ডাল-বাটার সঙ্গে ঈষৎ ক্ষার মিশিয়ে পাঁপর প্রস্তুত হয়। শুষ্ক করবার সময় রৌদ্র-তাপে এর কতকাংশ কৃত্রিম উপায়ে পরিপক হয়, সেজন্য পাঁপর ডাল অপেক্ষা সহজপাচ্য সামগ্রী। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে রোগীর পক্ষে কেবল সেঁকে খাওয়াই উচিত, ঘি অথবা তেলে ভেজে খেলে উহা পুনরায় দুষ্পাচ্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়।

তরিতরকারি—সিদ্ধ অথবা পোড়া গোল আলু একটি সহজপাচ্য পথ্য। খোসা সমেত সিদ্ধ করে, পরে খোসা ছাড়িয়ে নিলে, এর কোন সার পদার্থ নষ্ট হতে পারে না এবং খোসাবিহীন সিদ্ধ আলু অপেক্ষা সহজে পরিপাক হয়। আলুতে প্রোটিন কম থাকলেও, অন্যান্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা শ্রেয় এবং মাংসের প্রোটিনের ন্যায়ই সুপাচ্য। সুতরাং রোগীর পথ্যের যে-সকল গুণ থাকা উচিত, অর্থাৎ সুপাচ্যতা এবং পুষ্টিশক্তি, এই দুইই আলুতে বর্তমান। কিন্তু ভাজা হলে তা অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে, এজন্য জ্বর হলে আলু ভাজা কখনই পথ্যরূপে গণ্য হতে পারে না।

কাঁচা পেঁপে প্যাপেন নামক প্রোটিনভঞ্জক এনজাইম থাকার জন্য একটি অতি উপকারী পথ্য। পুষ্টিকর কিন্তু দুষ্পাচ্য যে কোন খাদ্যের রন্ধনকালে তাতে কয় টুকরো কাঁচা পেঁপে ছেড়ে দিলে, তা সহজেই অনেকটা সুপাচ্য হতে পারে। এ হিসাবে যে-সকল রোগে পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হয়, তাতে কাঁচা পেঁপে খুবই উপকারী।

সাধারণত লোকের মনে ধারণা যে কাঁচকলা একটি অতীব রক্তবর্ধক উপাদান কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। সাধারণ শাক-সবজি (যেমন পালম, নটে, সরিষা-শাক প্রভৃতিতে,) এবং শালগমেও লৌহের পরিমাণ কাঁচকলা হতে বেশী, সুতরাং এ হিসাবে কাঁচকলার শ্রেষ্ঠত্ব ভুল ধারণা। কিন্তু এই সকল শাক-সবজিতে লৌহ এবং ভাইটামিন 'এ'-পূর্ব বস্তু কেরোটিনের প্রাধান্য সত্ত্বেও এগুলি দুষ্পাচ্য বলে অধিক পরিমাণে পথ্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়।

গাজর কেরোটিনপূর্ণ ও সুস্বাদু তরকারি রূপে সুপথ্যের অন্তর্গত। এইরূপ ভাইটামিন 'সি' ও কেরোটিন থাকায় বিলাতি বেগুনও উপকারী বস্তু বলে পরিচিত, কিন্তু অধিকক্ষণ সিদ্ধ করলে ভাইটামিন নষ্ট হয়ে যায় বলে একে কাঁচা, অথবা অল্প সিদ্ধ করে খাওয়াই বিধেয়।

কাঁচকলা, শিম, আলু, বাঁধাকপি, গাজর, বীট, শালগম, ডুমুর প্রভৃতি তরিতরকারি প্রায় সকল প্রকার ফলের মতই দেহের ক্ষারবর্ধক বস্তু বলে অম্ল প্রভৃতি রোগের পথ্যরূপে গণ্য হতে পারে।

ফলমূল—প্রায়শ দেখা যায় চিকিৎসকেরা রোগীর জন্য বেদানা, আঙুর প্রভৃতি বহুমূল্য ফলমূলের ব্যবস্থা করে থাকেন, এবং যতটা বেদানার রস খাওয়া যায় শরীরে ততটা রক্ত হয়, আঙুর খেলে স্বাস্থ্যোন্নতি হয় এরূপ ভুল ধারণার বশে রোগীও সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয়ে এই সকল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে এগুলির জন্য যে পরিমাণ দাম দিতে হয়, সেই পরিমাণে এদের খাদ্যমূল্য অথবা পথ্যমূল্য কিছুই নেই। অপর সকল সুমিষ্ট ফলের ন্যায় এদের মধ্যেও গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ আছে এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' এগুলিতে আমাদের দেশী অথচ সস্তা ফল আম,

পাকা পেঁপে, কমলালেবু, কাগজী বা পাতিলেবু, পেয়ারা, আমলকি, কিংবা বিলাতি বেগুনের মতও নয়। সুতরাং এত অতিরিক্ত ব্যয়ে পথ্যহিসাবে এই সকল বিশেষ ফলের উপকারিতা এবং আবশ্যকতা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "রোজ একটি আপেল খেলে ডাক্তার ডাকতে হয় না" এজন্য অনেকে বহু মূল্যে আপেল সংগ্রহ করেন। আপেল যদিও একটি উৎকৃষ্ট ফল, তবুও প্রবাদবাক্য তার যত দূর গুণকীর্ত্তন করে, বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করলে, গুণহিসাবে তার দাম অনেক বেশী বলেই মনে হয়। একই কারণে এবং দুষ্পাচ্যতার জন্য আকরোট, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতিও রোগীর পক্ষে তো নয়ই, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষেও খুব অল্পই গ্রহণ করা উচিত। এদের পরিবর্ত্তে নারকেল, চীনাবাদাম প্রভৃতি গ্রহণই শ্রেয়।

মিছরি—এদেশে সাধারণের মনে ধারণা যে মিছরি রোগীর পথ্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যাঁরা শীতল পানীয় রূপে মিছরির সরবৎ পান করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে ঐরূপ মিছরি-ভিজানো জলে কি পরিমাণ ময়লা নীচে জমা হয়। সাধারণ চিনির সঙ্গে মিছরির তফাৎ এই যে, যখন চিনিকে জ্বাল দিয়া মিছরিতে রূপান্তরিত করা হয়, তখন যত রকম ধুলা বালি মাছি বোলতা প্রভৃতি এসে এর মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং পথ্য হিসাবে চিনির পরিবর্তে মিছরির স্থান সাধারণের অজ্ঞতাপ্রসূত ভুল ধারণা এবং চিকিৎসকদের বিবেচনা-রহিত ভুল নির্দেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অনেকের বিশ্বাস মিছরিতে গ্লুকোজ আছে। এই ধারণা একেবারেই ভুল। মিছরির চেয়ে দানাদার চিনি পথ্যহিসাবে সর্বাংশে শ্রেয়, কেননা উহাতে ধুলা-বালি কম থাকে। কিন্তু পরিপুষ্টি হিসাবে গুড়ের স্থান চিনিরও উপরে, কারণ এতে শর্করা ব্যতীত লবণজাতীয় উপাদান এবং ভাইটামিনও অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গুড় গুণানুসারে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং মিছরির মূল্য সকলের চেয়ে অধিক হলেও তা নিকৃষ্ট। মধুতে গ্লুকোজ এবং ফ্রকটোজ রূপে শর্করা থাকে বলে এর পথ্যমূল্য অন্যান্য শর্করার চেয়ে বেশী।

চা, কফি, কোকো প্রভৃতি—পানীয়রূপে সর্বসাধারণে এদের প্রচলন সত্ত্বেও পথ্যহিসাবে এদের কোন মূল্যই নেই। বরং অতিরিক্ত খেলে ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, বুক ধড়ফড় প্রভৃতি অনিষ্টকর লক্ষণ প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং রোগীর পক্ষে এই সকল পানীয় বর্জনীয়।

ওভালটিন প্রভৃতি—পুষ্টিকর নানা খাদ্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বলে,' এদের খাদ্যহিসাবে গুণ যতই হোক না কেন, গুণের তুলনায় ক্রয়মূল্য শতগুণ অধিক, কেননা সুদৃশ্য বহিরাবরণ ও উপযুক্ত ঢাকনিযুক্ত টিনের মূল্য, কাগজের মোড়কের ব্যয় ও বিজ্ঞাপনের জন্য যে বহ্বাড়ম্বর আবশ্যক তার খরচও পুষিয়ে নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে যখন এদেশে পৌছয়, তখন কিছুতেই তার মূল্য কম হতে পারে না। অথচ তার মধ্যে যে-সকল উপাদান আছে, যথা দুধ, ডিম, কোকো প্রভৃতি, তার সাহায্যে প্রত্যহ ঘরে তা তৈরি করে নিলে, খরচ হয় দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সুতরাং পথ্যহিসাবে এদের প্রচলন যত কম হয় ততই মঙ্গল।

শিশুর পথ্য—শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রসূতিরা আজকাল চিকিৎসকদের প্রশ্ন করেন 'বেবি'র জন্য কি ফুডের (অর্থাৎ বিলাতি ফুড) ব্যবস্থা হবে? যিনি জীবসৃষ্টি করেন তিনিই তার ফুডের ব্যবস্থা জন্মের পুর্বেই করে রেখেছেন। কিন্তু আধুনিকী জননীরা হয় স্বাস্থ্য নষ্ট হবার ভয়ে, অথবা অজ্ঞতাবশত শিশুকে তার নিজস্ব খাদ্য হতে বঞ্চিত করে, এলেনবারি, হরলিকস্, মেলিন্স, গ্লাক্সো প্রভৃতি বিলাতি ফুড খাওয়াতে আরম্ভ করেন। ফলে একদিকে যেমন তাঁদের পীযুষধারার উৎসও শুকিয়ে যায়, এবং তাঁদের জরায়ুঘটিত নানা রোগ জন্মে, আবার তেমনি কৃত্রিম খাদ্য গ্রহণের ফলে শিশুরও পেটের অসুখ, যকৃৎ-বৃদ্ধি এবং রিকেট্স্ প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। সুতরাং স্তন্যদাত্রী জননীর পক্ষে সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, মাতৃ-স্তন্যই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট খাদ্য। তদভাবে সুস্থ ও নীরোগ অন্য রমণীর স্তন্য, এবং তারও অভাবে গরুর দুধকে মানুষের দুধের মতন করে শিশুকে খাওয়ানো উচিত। গরুর দুধে সমপরিমাণে জল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে, তাতে চিনি, ক্রীম ও কয় ফোঁটা কডলিভার অয়েল (কিংবা হাঙ্গরের যকৃৎ-তৈল) মিশিয়ে শিশুর উপযুক্ত পথ্য প্রস্তুত করা যায়। শিশুর দাঁত ওঠবার আগে তাকে বার্লি, সাগু প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় বস্তু একেবারেই দেওয়া উচিত নয়।

সাধারণ ভাবে পথ্য সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলা গেল। কোন্ রোগে কোন্ বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত, একমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসকের নির্দেশ ক্রমেই তার ব্যবস্থা করা উচিত, কেননা এরূপ সাধারণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নয়।

বুভুক্ষু মানব

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

অমানিশার ঘোর অন্ধকার এবং ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নারীকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ উঠিল দ্বার খোল। ধ্বংসোন্মুখ জীর্ণ অট্টালিকা, তাহারই দ্বারপার্শ্বে একটি ক্ষীণকায়া নারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহের সমভার বহনে অক্ষম, পা টলিতেছে, কোন প্রকারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া নারী ব্যাকুল ভাবে দ্বার উন্মোচনের আবেদন জানাইল। রুদ্ধ কবাট খুলিল না। ভিতর হইতে কোন মানুষের নাভিশ্বাসের ন্যায় শেষনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছিল। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান রাখিয়া শ্লেষ্মাজড়িত ঘড় ঘড় ধ্বনি। শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল, মৃত্যুর বার্ত্তা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ বাদে শব্দ থামিয়া গেল। নারীর দৃশ্যপটে সূচিভেদ্য অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু নাই—আবেষ্টনী যেন মুহূর্ত্তে প্রেতলোকে পরিণত হইয়া গেল। মহান্ধকারের অতল গহ্বর হইতে আর এক অন্তর্ভেদী বাণী উঠিতেছিল, মৃতের নিমিত্ত নির্ব্বাক্ শোকোচ্ছ্বাস। নারী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সংজ্ঞাহীনার ন্যায় চৌকাঠের উপর গিয়া পড়িল।

ঘটনাস্থলটি গৌরপুর গ্রামের বাবুদের বাড়ী। এখানে কয়েক মাস আগেও প্রাচীন বংশের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিয়াছিল কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। অকস্মাৎ অন্নাভাব মহামারীর ন্যায় গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিল। লোকেরা দিশাহারা হইয়া দিকে দিকে ভিটার মায়া ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সকলের মুখে একই কথা—অন্ন কোথায়? যাহারা ভিটার মায়া ছাড়িতে পারিল না তাহাদের ভিতর অনেকে দিনে দিনে শুকাইয়া মরিল, যাহারা মরিল না তাহারা মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে মৃতের দেহ। তাহাদের দাহনক্রিয়া হয় নাই, গলিত মাংসের পূতিগন্ধে বায়ু বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের ছোটবড় কুটিরগুলি অধিকাংশই পরিত্যক্ত, কোনটির কবাট খোলা,—ভিতর খাঁ-খাঁ করিতেছে। কোনটির কুলুপ ভাঙা—দুর্বৃত্ত মরিবার আগেও অপহরণের লোভ কাটাইতে পারে নাই, কিংবা হইতে পারে অপাক অন্নের সন্ধানেই বলপ্রয়োগে পরগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। চাটুয্যেদের ঐ আটচালায় ভাগাড়ের ন্যায় অস্থির ভিড় লাগিয়াছে, সব নরকঙ্কাল। ওলাউঠা একটির পর একটি মানুষকে মারিয়া বংশে পিণ্ডদানের নিমিত্ত কাহাকেও রাখে নাই। এ যে রামু মুদির দোকান—যেখানে লাউতলায় শুক্না কয়টা মোটা ডাল পড়িয়া আছে। ঐখানে ছিল রামুর তুলসীতলা। নিকটেই স্বহস্তে বীজ পুঁতিয়াছিল গাছটাকে নজরে রাখিবার জন্য। পুষ্ট কাণ্ড লইয়া যে-দিন লতা ফলেফুলে কুটিরের ছাউনি সব ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল সে-দিন রামু আনন্দ ও স্বত্বাধিকারীর



গর্ব্বে বলিয়াছিল—আঃ বাবা, যে-ভাবে বেড়ে চলেছে কোন্ দিন ওর ওজনে চালসুদ্ধ ভেঙে পড়বে। চালা ভাঙে নাই, রামু মরিয়াছে। গাছের গোড়া পর্য্যন্ত মানুষ কাঁচা অবস্থাতেই চিবাইয়া খাইয়াছে। বাবুদের বাঁধান বড় পাতকুয়ায় কিসের শব্দ? ভিতরে মানুষকে ভাসিতে দেখা যায় না? সত্যই দুইটি প্রাণী ডুবিয়া মরিয়াছে, কানের পাশ দিয়া ছোট ছোট বুদ্বুদ বাহির হইতেছে, বৃষ্টির বড় ফোঁটার শব্দের মত তাহার আওয়াজ যাহার প্রতিধ্বনি কাঁপা মৃৎ-গহ্বর হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসিতেছে। মানুষ একটি নয়, দুইটি। একটি শিশু, অপরটি নারী। উভয়েই উপুড় হইয়া

আছে,—মাথার পিছন দিকটা ও কোমরের খানিকটা জলের উপর দেখা যায়। সামান্য হাওয়া ভিতরে ঢুকিলে গোলাকার বৃত্তির ভিতর ঘুরিতে থাকে, হাওয়ায় নারীর এলোকেশ অসংখ্য ছোট সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া নড়ে। শিশুর অনশন মাতা হয়তো সহ্য করিতে পারে নাই, সন্তানকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া নিজে তাহার পথানুসরণ করিয়াছে। পাতকুয়ার উপরে আরও একটি শব কঙ্কালসার পুরুষের। অধিককাল মরে নাই,—দড়িবাঁধা ঘটিটা হাতে ধরা রহিয়াছে। লোকটা নিশ্চয় জল খাইয়া জঠরাগ্নি নিভাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কূপ হইতে জল তুলিতে না পারিলেও জলপাত্রটিকে ছাড়ে নাই। এইরূপ দৃশ্য একটির পর একটি অতিক্রম করিলে পুনরায় বাবুদের সড়কে আসিয়া পড়া যায়। সড়ক পার হইলেই তোরণদ্বার, নবাবী আমলের তৈয়ারি। এখান হইতে খানিকটা দূরে সেই রুদ্ধ কবাট, যেখানে নারী শোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল।

বলিতেছিলাম বাবুদের কথা, রুদ্রনারায়ণ চৌধুরীর কথা। আভিজাত্যের পূর্ণ প্রকোপ যখন রুদ্রনারায়ণের সহিত ধীরে দৈন্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ব্যবস্থা করিতেছিল। যখন রুদ্রনারায়ণ এক তৌজী গোপনে বেচিয়া অপর তৌজীর প্রজার অন্ন সরবরাহ করিতেছিলেন, যখন চৌধুরী-বাড়ীর বৌরাণী মহালক্ষ্মীর জড়োয়া গহনা প্রায় পিতল, কাঁসার দরে বিক্রী হইতেছিল সেই সময় এই মহামারী ব্যাপক ভাবে গ্রামকে আসিয়া গ্রাস করিল। দানবীর রুদ্রনারায়ণ বেশী দিন প্রকৃতিগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহার নিজের পুরাতন কর্ম্মচারীরাই অন্নাভাবে প্রজাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, দানের অপেক্ষায় কেহ থাকিল না। সবকিছুই লুট হইতে লাগিল। মহালক্ষ্মী প্রাচীনপন্থী জমিদার-বংশের ঘরণী হইলেও প্রজাদের সামনে বাহির হইতেন, সকলে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত। অভিমানী স্বামীর তরফ লইয়া মহালক্ষ্মী প্রজাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন "ক্ষণ তিষ্ঠ", কিন্তু ফল পান নাই। সহস্র প্রাণীর হাহাকারে প্রাঙ্গণ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—অন্ন দাও, বুভুক্ষু মানব আমরা, অন্ন দাও। মানুষের জঠরাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই। দেখিতে দেখিতে গ্রামে বাজার হাট উঠিয়া গেল, কতক লুটের ভয়ে, কতক মাল সরবরাহের অভাবে। গ্রাম অল্প সময়ের ভিতর মৃতের আবাসভূমিতে পরিণত হইল। যেটুকু আহারের সংস্থান মহালক্ষ্মী করিয়াছিলেন তাহাও নিয়মিত ব্যয়ে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। স্বামীকে তিনি চিনিতেন তথাপি একমাত্র সন্তানের দিকে তাকাইয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, একবার সাহেবসুবোদের সঙ্গে দেখা কর না, হয়ত একটা কিছু ব্যবস্থা হ'তে পারে। রুদ্রনারায়ণের বংশমর্য্যাদা এবং আত্মাভিমানের নিকট সবকিছুই তুচ্ছ। যেখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ নাই, সেখানে দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যু তাঁহার নিকট অধিকতর বরণীয়। স্বল্পভাষী দানবীর বলিয়াছিলেন "ভেবে দেখি।" তাঁহার ভাবনার অন্ত ছিল না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না।

ঘটনার ঘূর্ণমান চক্র দারুণ বেগে ঘুরিতেছিল। সঞ্চিত অন্ন নিঃশেষিত হইতে হইতে এমন একটি সময় আসিল যখন একবেলা অর্দ্ধাহারের বেশী জীবনধারণের জন্য অন্ন সংস্থান থাকিল না। রুদ্রনারায়ণ উহা হইতেও পুত্র ও স্ত্রীকে ভাগ দিতেছিলেন। মহালক্ষ্মীর প্রতিবাদ নিষ্ফল হইয়াছিল। রুদ্রনারায়ণের মত পরিবর্ত্তন যে অসাধ্য কর্ম্ম তাহা তিনি জানিতেন।

সে-দিন ময়না চাকরটা আর ফিরিল না। পুরাতন ভৃত্যদের ভিতর ময়নাই টিকিয়াছিল, সেও চলিয়া গেল। যে-দিন ময়না বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়া গেল সেই দিনই পুত্রের সংক্রামক রোগের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। নধর ননীর পুতুল শুকাইয়া জীর্ণ কঙ্কাল হইয়া গিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণায় জল জল করিয়া উঠিতেছে। ঘরে একটি মাত্র জলপাত্র তাহাও শূন্য, এখন বাহির হইতে জল না আনিলে উপায় নাই। মহালক্ষ্মী উঠিতে পারেন না, অসুস্থ শিশু ক্রোড়ের উপর রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। মহালক্ষ্মী দৃষ্টির দ্বারা স্বামীকে জল আনিতে অনুরোধ করিলেন।

বাহিরের পাতকুয়া হইতে চৌধুরী-বাড়ীর কোন কর্ত্তা জল তুলে নাই। উহা ভাবিতে ক্ষণিকের জন্য ইতস্ততঃ ভাব আসিয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের করুণ প্রার্থনা শুনিয়া চাঁদির ঘটী লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই জলপাত্র পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু পুত্রকে তাহা পান করাইতে দ্বিধান্বিত হইতেছিলেন। জল দূষিত। ঐ পাতকুয়াতেই দুইটি মানুষের মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছেন। জলপাত্র হস্তে তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া মহালক্ষ্মী পাত্রটি গ্রহণের নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। রুদ্রনারায়ণের মুখাকৃতিতে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—দয়ার অবতার কঠোর হইয়া গিয়াছেন, দেহে যেন রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়াছে। পাষাণবৎ অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। যে-মানুষ ভগবানকে দয়াল প্রভু ভাবিয়া একনিষ্ঠায় সারাটা জীবন পূজা করিয়াছেন, যে-মানুষ দান না করিয়া নিজে অন্নগ্রহণ করিতেন না, তিনি আজ ইষ্টদেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছেন, মানুষের সদ্‌গুণকে দুর্ব্বলতা ভাবিতেছেন। কয়েক মুহূর্ত্তের ভিতর নানা চিন্তাই তাঁহাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত কম্পিত হস্তে বীজাণুর বিষমিশ্রিত জল স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিলেন। পুত্র আগ্রহে তাহা গলাধঃকরণ করিল। রুদ্রনারায়ণ পুত্রের মৃত্যুর অপেক্ষায় অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন তিনি ভাবিতেছিলেন—চিকিৎসার আশা নাই, কোনপ্রকারে রোগমুক্ত হইলেও, অন্নাভাবে তিলে তিলে শুকাইয়া মরিবে। এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখা অপেক্ষা মৃত্যুর দ্বার বিস্তারিত করিয়া দেওয়া ভাল। জল সেবনের পর পিতা পুত্রের মুখশ্রীকে অপলক দৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পলে পলে সময় কাটিতেছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নির্ব্বাক্। ঘরে ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলো আসিয়াছে। ভিতরের দিকে গাঢ় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কারণ ঘরে প্রদীপ নাই। যেটুকু প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছিল তাহা থাকিয়া থাকিয়া কচি গলার হেঁচ্‌কি।

গভীর রাত্রে কঙ্কালসার শিশু বাঁচার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ধীরে ধীরে মাতার ক্রোড়ে অসাড় ও কঠিন হইতে লাগিল। শোকবিহ্বলা মাতা ভাবিতে পারিতেছিল না মা বলিয়া ডাকার প্রধান অধিকারী তাঁহাকে সর্ব্বহারা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মৃত সন্তানকে বুকের মাঝে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, যে নাই তাহাকেই পাওয়ার সান্ত্বনায়।

রুদ্রনারায়ণ সত্যই পাষাণ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই। হয়ত অশ্রুধারা অদৃশ্যভাবে অন্তরে বহিতেছিল। স্ত্রীকে স্থির ও দৃঢ়ভাবে বলিলেন, আর কাঁদিয়া লাভ নাই, এখন আমাকে দাও আমার শেষ কর্ত্তব্য সারিয়া আসি।

পুত্রের দাহক্রিয়া শেষ করিয়া, রুদ্রনারায়ণ নিজের সমস্ত সহ্য-শক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষ করিয়া শেষশয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরের দিনের ঘটনা প্রথমেই বলিয়াছি। দ্বারপার্শ্বে যে-নারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তিনি মহালক্ষ্মী। স্বামীর জন্য চৌধুরী-বংশের গৃহলক্ষ্মী পথের অসহায় ভিখারিণীর মত ডাক্তারের দ্বারস্থ হইয়া সামান্য ঔষধ-পথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। জনসেবায় নিযুক্ত ডাক্তার দয়াপরবশ হইয়া আহার ও ঔষধ দিয়াছিলেন। মহালক্ষ্মী মানমর্য্যাদার বিনিময়ে যাহা সংগ্রহ করিলেন তাহাই গ্রহণের অসম্ভবতা রুদ্রনারায়ণ মরিয়া জানাইয়া দিলেন।

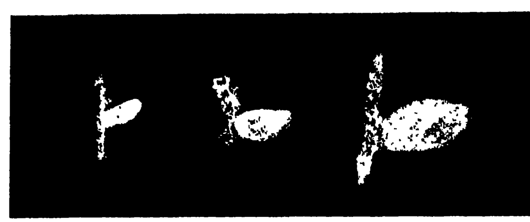
বোল্‌তার জীবন-রহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীব-জগতের অনেকেই একক ভাবে বাস করিলেও কেহ কেহ আবার সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করিয়া থাকে। জাতীয় উৎকর্ষ বিধানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে একক ভাবে বসবাস করার অসুবিধা অনেক। কারণ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি কার্য্যই নিজে নিজে সম্পন্ন করিতে হয়। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় কর্ম্ম-বিভাগের সুযোগ পাওয়া যায়। মানুষ সামাজিক জীব। আদিম মনুষ্যসমাজে প্রয়োজন অথবা অভাব বোধ অনেক কম ছিল বলিয়াই বোধ হয় কতকটা স্বাভাবিক ভাবেই কর্ম্ম-বিভাগের গোড়াপত্তন সুরু হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ ব্যষ্টিগত অথবা সমষ্টিগত প্রয়োজনে পার্থিব সম্পদ আহরণ এবং সুশৃঙ্খলার সহিত বিবিধ দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত বলপ্রয়োগে দাসত্ব প্রথার প্রচলন করে। পরবর্ত্তী কালে অস্ত্রপ্রয়োগের সহায়তায় মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমূহ বিনষ্ট করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে চিরজীবন দাসত্বকার্য্যে লিপ্ত রাখিবার উপায় অবলম্বিত হয়। তৎপরবর্ত্তী যুগে হয়ত নৈতিক কারণে এই প্রথা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইলেও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বুদ্ধি এবং কূট-কৌশল প্রয়োগে দাসত্বপ্রথা অব্যাহত রাখিবার উপায় অবলম্বিত হয়। ধর্ম্মের অনুশাসন, ইহকাল এবং পরকালের কাহিনী শুনাইয়া সেবাধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন হয়ত এই উপায়েরই একটা বিশিষ্ট দিকমাত্র। যাহাহউক, নৈতিক দৃষ্টিতে নির্দ্দোষ এবং অনেকটা স্বাভাবিক উপায়ে মানুষ যদি এমন এক জাতীয় মানুষ উৎপাদনে সমর্থ হইত, যাহাদের একমাত্র সেবাধর্ম্মে আসুরক্তি ছাড়া ক্ষুৎপিপাসা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রবৃত্তি থাকিবে না অর্থাৎ তাহারা যদি যান্ত্রিক মানুষের মত



রাণী-বোল্‌তার শীত-ঘুম



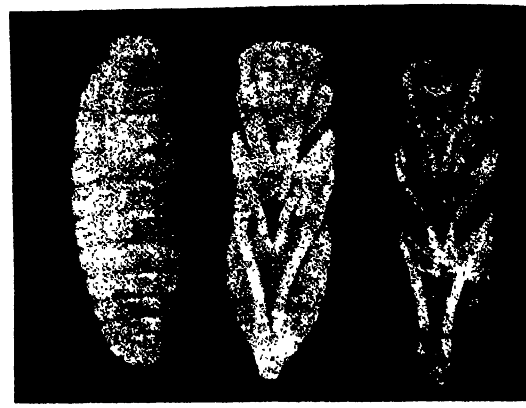
বোল্‌তার ডিমের ক্রম-পরিণতি



বোল্‌তার কীড়ার ক্রম-পরিণতি

রক্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি করিতে পারিত তবে এই সমস্যা সমাধানে এত বিব্রত হইয়া পড়িত না। কিন্তু মানুষ এবিষয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইলেও আজও সেরূপ কিছু অব্যর্থ উপায় আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যাহা করিতে পারে নাই বহুগুণ নিম্নস্তরের কীটপতঙ্গেরা সুদূর অতীত যুগ হইতে তাহা আয়ত্ত করিয়া সাফল্যের সহিত কাজে লাগাইতেছে। সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীদের কথা বলিতেছি। হাজার হাজার মৌমাছি, হাজার হাজার পিপীলিকা এক বাসায় বাস করে। সমাজের বিভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহের জন্ত ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। তাহাদের এই শ্রেণী-বিভাগ স্বাভাবিক, কারণ রাজা, রাণী, সৈনিক, শ্রমিক বা কর্ম্মী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মৌমাছি, বোল্‌তা, পিপীলিকা প্রভৃতি বিভিন্ন-জাতীয় প্রত্যেকটি সমাজেই কর্ম্মীদের সংখ্যা অগণিত। রাজা ও রাণীদের সংখ্যা কর্ম্মীদের তুলনায় অনেক কম। মৌমাছিদের ক্ষেত্রে এক-একটি চাকে সাধারণতঃ একাধিক রাণী-মক্ষিকা দেখা যায় না। রাজা এবং রাণীরা অলসভাবে দিন কাটায়। তাহাদের কোনই কাজকর্ম্ম করিতে হয় না। কর্ম্মীরাই সংসারের যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে। খাদ্য আহরণ ও তাহার বিলি-ব্যবস্থা, বাসগৃহ নির্ম্মাণ, বাসগৃহ পরিষ্কার, শিশু প্রতিপালন এমন কি রাজা ও রাণীদের মুখে খাবার তুলিয়া দেওয়া ও তাহাদের পরিচর্য্যার যাবতীয় ব্যবস্থা কর্ম্মীরাই করিয়া থাকে। রাণী কেবল ডিম পাড়িয়াই খালাস। কর্ম্মীরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে দিবারাত্রি প্রায় সমভাবেই বাসার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। কর্ম্মীদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, আলস্য অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিশ্রামের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। ইহাদের কোন কার্য্যনিয়ন্ত্রণকারী পরিদর্শকও নাই; প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই যন্ত্রের মত নিজের কাজ করিয়া যায় এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রয়োজন মত

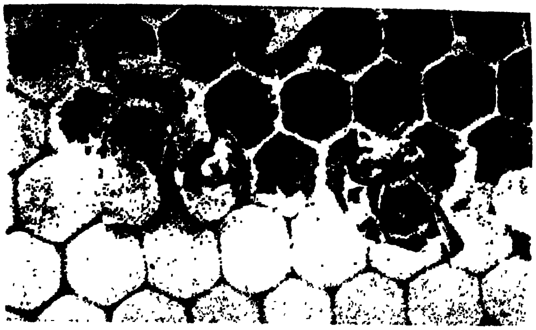


বাম হইতে দক্ষিণে—বোল্‌তার কীড়া ও পুত্তলী

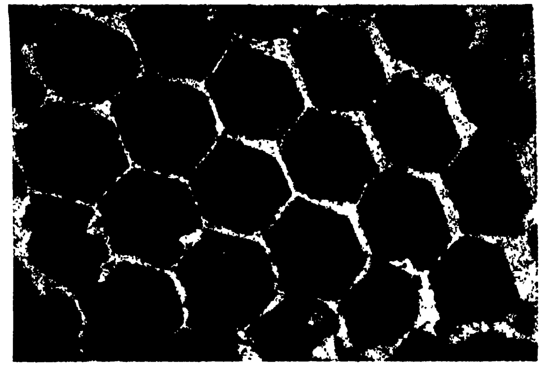
বুদ্ধি খাটাইয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে। যতই তুচ্ছ হউক, ইহারা কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে মৃত্যু বরণ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। কর্ম্মীদের আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কারণে রাণীর অভাব ঘটিলে বাসায় নূতন নূতন কর্ম্মী উৎপন্ন হইতে পারে না। যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মীর অভাবে সহজেই নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; তাহার ফলে সমাজ অতিক্রত ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে কর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ পুরুষ-সংশ্রব ব্যতিরেকেই ডিম প্রসব করিয়া নূতন নূতন কর্ম্মী উৎপাদন করিয়া থাকে।

স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মিলনের ফলেই পিতা অথবা মাতার অনুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে—জীবজগতের ইহা একটি সাধারণ পরিচিত ঘটনা। কিন্তু নিম্নস্তরের এই সামাজিক প্রাণীদের মধ্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে কেমন করিয়া? ইহা একটি অদ্ভুত ব্যাপার, তাছাড়া আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রাণীরা যৌন-মিলনের পূর্ব্বেও ডিম প্রসব করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইতে কেবল পুরুষ বা রাজাই জন্মগ্রহণ করে। যৌন-মিলনের পর রাণীর ডিম হইতে কর্ম্মীরাই আবির্ভূত হয়। কর্ম্মীরা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে মাতা বা পিতা কাহারও অনুরূপ নহে। পিপীলিকার কর্ম্মীদের মধ্যে মাতা বা পিতা কাহারও সহিত কোন সামঞ্জস্য বাহির করা দুষ্কর। কেমন করিয়া এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়? আজ পর্য্যন্তও এই জটিল রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে এ বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার জানিতে পারা গিয়াছে।

মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, পিপীলিকা প্রভৃতি একই বর্গভুক্ত প্রাণী। মোটামুটি কতকগুলি বিষয়ে মিল থাকিলেও এই বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে গুরুতর কতকগুলি বৈষম্যও রহিয়াছে। কাজেই মৌমাছি-সমাজের শ্রেণীভেদের কারণ নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম এবং "রয়েল-জেলী" প্রয়োগের তারতম্যের বিষয় অবগত থাকিলেও বোল্‌তা, ভীমরুল, পিপীলিকার মধ্যে প্রকৃত ব্যাপার কি ঘটিয়া থাকে তাহা জানিবার



কর্ম্মীরা গর্ত্তের টুপি কাটিয়া নূতন কর্ম্মীদিগকে বাহির হইবার সুবিধা করিয়া দিতেছে



বোল্‌তার গর্ত্তের মধ্যে ডিমগুলিকে শয়ানভাবে স্থাপিত দেখা যাইতেছে

জন্য পিপীলিকা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু পিপীলিকারা ক্ষুদ্রকায় প্রাণী এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে বলিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ একটা বিরাট দলকে কৃত্রিম বাসস্থানে প্রতিপালন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা বড়ই অসুবিধার ব্যাপার। তথাপি কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইলাম। তখন অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির ভীমরুল, বোল্‌তার কথা মনে পড়িল। কিন্তু ভয়ানক বিপজ্জনক বলিয়া ভীমরুল পুষিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব নহে। বোল্‌তা বিপজ্জনক হইলেও ভীমরুলের মত ততটা গুরুতর নহে। কাজেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বোল্‌তার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলাম। কলিকাতার উপকণ্ঠে একটা পরিত্যক্ত স্থানে গাছের ডালে বোল্‌তার প্রকাণ্ড একটা বাসার সন্ধান পাওয়া গেল। বাসাটাতে প্রায় পাঁচ-ছয় শতের অধিক বোল্‌তা ছিল। বাসাটার অনেকটা অংশ লতাপাতার আড়ালে পড়িলেও কিয়দংশ অনাবৃত ছিল। কিন্তু নিকটে না গেলে ইহাদের কার্য্যকলাপ ভাল করিয়া দেখা যায় না। কাছে যাইতেও বিশেষ ভরসা পাইলাম না; কারণ বাসা হইতে হাত দুই ব্যবধানে আসিলেই ইহারা ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে। কাজেই টেলি-মাইক্রস্কোপের সাহায্য লইলাম।

প্রায় ৫০গজ দূর হইতে টেলি-মাইক্রস্কোপের সাহায্যে বাসার মধ্যে বোল্‌তাদের কার্য্যকলাপ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইতেছিল। দুই-তিন দিন পর্য্যবেক্ষণের ফলে বোল্‌তাগুলির গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেককিছু দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু এতগুলি বোল্‌তা বাসাটার উপর প্রায় ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া চলফেরা করে বলিয়া গর্ত্তগুলির অভ্যন্তরস্থ ডিম ও বাচ্চার অবস্থা লক্ষ্য করিবার উপায় ছিল না। অগত্যা দিবাবসানে বাসাটাতে একদিন আগুন ও প্রচুর ধূম প্রয়োগ করিলাম। অধিকাংশ বোল্‌তা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও কয়েকটি উড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। পরের দিন গিয়া দেখিলাম যাহারা উড়িয়া গিয়াছিল তাহারা বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। উত্তেজিত ভাবে তাহারা প্রত্যেকটি গর্ত্তে মস্তক প্রবেশ করাইয়া বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। বাসার দিকে অগ্রসর হইতেই তাহারা ডানা প্রসারিত করিয়া উত্তেজিত ভাবে আমার উদ্দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কেহই কিন্তু বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া আসিল না। তথাপি ভয়ে পিছাইয়া গেলাম এবং টেলি-মাইক্রস্কোপের সাহায্যেই গর্ত্তগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। বাসাটার মধ্যস্থলে কতকগুলি গর্ত্তের মুখ সাদা টুপির মত পদার্থে আবৃত। বাকী গর্ত্তগুলি সম্পূর্ণ অনাবৃত। বাসাটা থালার মত চেপটা এবং কতকটা গোলাকার। গর্ত্তগুলি বাসার ধারের দিক্ হইতে মধ্যভাগে ক্রমশঃ লম্বায় বড় হইয়া উঠিয়াছে। ছোটবড় বিভিন্ন গর্ত্তের মধ্যে বয়সের তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির বাচ্চা ও ডিম দেখা যাইতেছিল। গর্ত্তগুলির মুখ নীচের দিকে। বাচ্চাগুলিও নীচের দিকেই মুখ করিয়া রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত ছোট বাচ্চাগুলি প্রায় নিশ্চল ভাবেই অবস্থান করিতেছিল; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা গর্ত্তগুলির অভ্যন্তরে হলুদ বর্ণের পরিপুষ্ট বাচ্চাগুলির অদ্ভুত একটা গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় বাচ্চাগুলির প্রত্যেকেই তাহাদের দেহের ঊর্দ্ধভাগ ধীরে ধীরে চক্রাকারে আন্দোলিত করিতেছিল। বড় বাচ্চাগুলি যে কেন এরূপ করিতেছিল তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরের দিন দেখিলাম বাসায় বোল্‌তার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম—ঢাকনায় আবদ্ধ গর্ত্তগুলি হইতে নূতন নূতন বোল্‌তা বাহির হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

যাহা হউক, বোল্‌তার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই বাসাটাকে তুলিয়া আনিয়া পরীক্ষাগারে স্থাপন করিবার মনস্থ করিলাম। ধূম প্রয়োগে বোল্‌তাগুলিকে তাড়াইয়া বাসাটাকে তুলিয়া আনিয়া পরীক্ষাগারে স্থাপন করিলাম। দুই-তিন দিন পরেই পুনরায় কিছু নূতন বোল্‌তার আবির্ভাব ঘটিল। কিন্তু তাহারা কেহই বাসা ছাড়িয়া বাহিরে যাইত না। ইতিমধ্যে বাচ্চাগুলির মস্তক আন্দোলনের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম। বড় বাচ্চাগুলি পুত্তলিতে রূপান্তরিত হইবার সময় হইলে এরূপ ভাবে সূতা বুনিয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। সূতা এত সূক্ষ্ম যে



রাণী-বোলতা তাহার বাসার গর্ত্তগুলি তদারক করিতেছে



উপর হইতে নীচে—একজাতীয় বোলতার রাণী, রাজা ও কর্ম্মী



বোলতার শরীরের অভ্যন্তরে বিষের থলি এবং বাহিরের হুলের দৃশ্য

ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাসের সাহায্য ছাড়া দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বারংবার এরূপ সূক্ষ্ম সুতা জড়াইবার ফলে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধ্যেই গর্ত্তের মুখে সাদা টুপির মত একটা আবরণী গড়িয়া উঠে। ঢাক্‌না নির্ম্মিত হইবার পর বোল্‌তার কীড়া বা অপরিণত বাচ্চাটা তথায় নিশ্চিন্তমনে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে কীড়াটা পুত্তলীর আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর উপরের পাতলা খোলস পরিত্যাগ করিয়া ডানাসমেত পূর্ণাঙ্গ বোলতা গর্ত্তের ঢাক্‌না কাটিয়া বাহির হইয়া আসে।

যাহা হউক, বাসাটাকে পরীক্ষাগারে রাখিবার পর দিনদশেকের মধ্যেই প্রায় দুই শতাধিক নূতন বোল্‌তা বাহির হইয়া পুনরায় বাসাটাকে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। ইহাদের অনেকেই বাহির হইতে খাদ্য এবং বাসা নির্ম্মাণের উপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবেই কাজ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই সময়ে এক দিন পরীক্ষাগারে কয়েকজন দর্শক আসিয়াছিলেন। বোল্‌তা পুষিতে দেখিতে তাঁহারা বিশেষ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। একটু দূরে দাঁড়াইয়াই তাঁহাদের নিকট ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতেছিলাম। ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে একজন ধূমপান করিতে সুরু করিয়াছিলেন। দুই-চার মিনিট পরেই বোল্‌তাগুলি যেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং দুই-একটি বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া একজন দর্শককে ভীষণভাবে দংশন করিল। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম—তামাকের ধোঁয়াই এই উত্তেজনার কারণ। যাহা হউক, এই ঘটনার পর আর বোল্‌তাগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে ক্লোরোফর্ম গ্যাস প্রয়োগে বোল্‌তাগুলিকে অজ্ঞান করিয়া একে একে অধিকাংশ বোল্‌তার ডানা কাটিয়া দিলাম। তাহার ফলে বোল্‌তাগুলি বাসার সমস্ত কার্য্যই চালাইতে পারিত কিন্তু উড়িয়া আসিয়া কাহাকেও দংশন করিবার সাধ্য রহিল না। যাহাদের ডানা কাটা হয় নাই—অল্পসংখ্যক হইলেও তাহারাই বাহির হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসিত। কিন্তু তাহার ফলেই বোধ হয় বিপদ দেখা দিল। বাসার প্রয়োজনানুরূপ সরবরাহ হইতেছিল না। গায়ের রং পরিবর্ত্তন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, খুব সম্ভব উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অনেকগুলি বাচ্চাই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ এক দিন দেখিতে পাইলাম—মাছির মত অতিক্ষুদ্র এক জাতীয় অদ্ভুত পতঙ্গ কোন কোন গর্ত্তে ঢুকিয়া রুগ্ন বাচ্চাগুলিকে চুষিয়া খাইয়া ফেলিতেছে। বাসাটার গর্ত্ত অসংখ্য এবং প্রায় প্রত্যেক গর্ত্তেই ডিম অথবা বাচ্চা ছিল। অল্পসংখ্যক বোল্‌তার পক্ষে এতগুলি বাচ্চার তদারক সম্ভবে না। কাজেই মড়ক অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি মাছির আক্রমণে অতিশীঘ্রই বাসার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। এই সকল নানা অসুবিধার জন্য কিছুকাল পরে পুনরায় লাল-পিঁপড়ে লইয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইল। যাহা হউক, বোল্‌তা প্রতিপালনের সময় তাহাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্পর্কে যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম সে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতীয় অনেক রকম বোল্‌তা দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক জাতীয় বোল্‌তা বৃক্ষকোটরে অন্ধকার গহ্বরে অথবা অনেক সময় মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বলের মত গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে। আবার কতকগুলি ঘরের চালার নীচে, গাছের ডালে অথবা নির্জ্জন স্থানে কোন



ভূমি-নিম্নস্থিত একজাতীয় বোল্তার বাসার অভ্যন্তর ভাগ। উপরের আবরণী ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।



একজাতীয় বোল্তার গোলাকার বাসা

কিছুর আড়ালে থালার মত চেপটা বাসা তৈয়ারী করিয়া বসবাস করে। গর্ত্তবাসী বোল্তারা প্রথমতঃ অসংখ্য গর্ত্তসমন্বিত চেপটা থালার মত তিন-চার স্তর বাসা নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বশেষে সেগুলির চতুর্দ্দিকে গোল করিয়া একটা শক্ত আবরণে ঢাকিয়া দেয়। এই জন্ম বাসাটাকে বাহির হইতে বলের মত গোলাকার দেখায়, কিন্তু ভিতরে কুঠরিগুলি বিভিন্ন স্তরে পর পর সজ্জিত থাকে। শীতের কিছু পূর্ব্বে এই জাতীয় বোল্তা-রাণীর যৌন-মিলন ঘটে। যৌন-মিলনের পর পুরুষগুলি মরিয়া যায়। গর্ভবতী রাণী সারা শীতকালটা সুবিধামত কোন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া খড়কুটা বা অন্ত কোন শক্ত জিনিস আঁকড়াইয়া ধরিয়া শীতঘুমে কাটাইয়া দেয়। শীতের অবসানে সে বাসা বাঁধিবার জন্ত স্থান নির্ব্বাচনে বহির্গত হয়। স্থান নির্ব্বাচন হইলে সে বারংবার পরিভ্রমণ করিয়া দেখে এবং আনন্দে অধীর হইয়াই যেন নানা প্রকার গতিভঙ্গী করিয়া অবশেষে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রসাধনে রত হয়। তারপর বাসার চতুর্দ্দিকে বারংবার চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে কোন পুরাতন বৃক্ষকাণ্ড বা অন্ত কোন শুষ্ক কাষ্ঠের উপর উপবেশন করিয়া তাহার কিয়দংশ কুরিয়া লয়। সেই পদার্থের সহিত মুখের লালা মিশ্রিত করিয়া মণ্ডের মত প্রস্তুত করে। ইহাই বোল্তার বাসা নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। বার বার এই মণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাণী প্রথমতঃ চারটি কোষ বা গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিবার পর নানা প্রকার কীটপতঙ্গ বা মাংসের টুক্‌রা মণ্ডের মত করিয়া বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইতে থাকে। ইতিমধ্যে আরও-কয়েকটি গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেও ডিম পাড়িয়া রাখে। ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে করিতে প্রথম চারটি গর্ত্ত হইতে চারটি কর্ম্ম বোল্তা নির্গত হইয়া বাসার কার্য্যে রাণীকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করে। আরও কিছুকাল পর যখন দশ-বারটি কর্ম্মী জন্মগ্রহণ করে তখন তাহারাই বাসা নির্ম্মাণ, খাদ্য আহরণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। রাণীকে তখন হইতে আর কোন কাজ করিতে হয় না। সে কেবল গর্ত্তে গর্ত্তে ডিম পাড়িয়া যায়।

আমাদের দেশীয় হলদে রঙের বড় বোল্তা ও খয়েরী রঙের ক্ষুদে বোলতারা গাছের ডালে, চালার নীচে অথবা আনাচে-কানাচে বাসা নির্ম্মাণ করে। মৌমাছির চাকের গর্ত্তগুলি যেমন শয়ানভাবে পাশের দিকে প্রসারিত থাকে হলদে বোল্তার চাকের গর্ত্তগুলি সেরূপে নির্ম্মিত হয় না। ইহাদের গর্ত্তগুলি থাকে নীচের দিকে মুখ করিয়া খাড়াভাবে। শীতের অবসানে রাণী-বোল্তাই প্রথমে বাসা নির্ম্মাণ সুরু করে। গর্ত্তের পত্তন হইয়া গেলেই তাহার দেয়ালের গায়ে একটি ডিম পাড়িয়া আটকাইয়া রাখে। ডিমটি দেয়ালের গায়ে সমকোণে অবস্থান করে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে গর্ত্তটাকে লম্বায় ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকে। বাচ্চাটা নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকিলেও কোনক্রমেই গর্ত্ত হইতে পড়িয়া যায় না। এইরূপে প্রথমতঃ কয়েকটি কর্ম্মী নির্গত হইলে তাহারাই সংসারের যাবতীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করে এবং নূতন নূতন গর্ত্ত নির্ম্মিত হইবামাত্রই রাণীরা তাহাতে ডিম পাড়িয়া দেয়। এক একটা বাসায় কতকগুলি রাণী এবং কতকগুলি রাজা থাকে। কিন্তু কর্ম্মীদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাসার উপরে অথবা আশেপাশেই ইহাদের মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে। মিলনের পর পুরুষেরা সাধারণতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাণী-বোল্তা নূতন বাসার পত্তন করিয়া সারা বছর ডিম পাড়িবার পর মৃত্যু বরণ করে। বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ শীত আগমনের পূর্ব্বেই বাসার মধ্যে নূতন নূতন পুরুষ- ও রাণী-বোল্তার আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। পুরুষ-বোল্তাগুলি রাণীদের আগে জন্মগ্রহণ করে। রাণীদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরুষ-বোল্তাগুলি শ্রমিকদের সেবা-শুশ্রূষায়

অভিমুখে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহারা বাসার মধ্যে অলসভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় অথবা আনন্দ-বিহারে বহির্গত হইয়া নূতন পত্রপল্লবের মধু খাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় ফিরিয়া আসে। মৌমাছির ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, তাহারা অপরিণত বাচ্চাগুলিকে 'রয়েল-জেলী' প্রদান করিয়া ইচ্ছামত রাণী-মক্ষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে। 'রয়েল-জেলী' কম পরিমাণে দেওয়া হয় বলিয়াই কর্ম্মী-মাছির উৎপত্তি হয়। রাণী-মক্ষিকা আকৃতিতে অনেক বড়। তাহার জন্য চাকের মধ্যে অনেক বড় গর্ত্ত নির্ম্মিত হয় এবং কর্ম্মীরা তাহাতে প্রচুর পরিমাণ 'রয়েল-জেলী' রাখিয়া দেয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে কর্ম্মীদের গর্ত্ত হইতে অথবা যে কোন স্থান হইতে ডিম আনিয়া 'রয়েল-জেলী'পূর্ণ রাণীর গর্ত্তে রাখিলে সেখান হইতে রাণীই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়—'রয়েল-জেলী'র পরিমাণের তারতম্যের উপরই পুরুষ, রাণী অথবা কর্ম্মীদের উৎপত্তি নির্ভর করে। বোল্তাদের মধ্যেও রাণীর গর্ত্তটা কর্ম্মীদের গর্ত্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হয়। তা ছাড়া কর্ম্মীদের গর্ত্তের মুখের ঢাক্নাটি প্রায় চেপ্টা; কিন্তু রাণীর গর্ত্তের ঢাক্না গোলাকার—টুপির মত। ইহারাও বাচ্চাগুলিকে রয়েল জেলীর মত একটা অপূর্ব্ব পদার্থ খাওয়াইয়া ইচ্ছামত কর্ম্মী, পুরুষ অথবা রাণী উৎপাদন করিয়া থাকে। এই শক্তিশালী পদার্থের প্রভাবে কোন অজ্ঞাত উপায়ে রাণীরা ডিম পাড়িবার যন্ত্ররূপে পরিণত হয় আর কর্ম্মীরা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ উপেক্ষা করিয়া সমাজের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে।

চাষবাসের কথা

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

৮

জলসেচন

ভাল ফসল পাইতে হইলে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ রস থাকা দরকার; সুতরাং যদি দেখা যায় যে, জমিতে রসের অভাব হইয়াছে, তাহা হইলে জলসেচন দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা আবশ্যক। সাধারণতঃ বর্ষাকালে যে-সকল ফসল জন্মায় তাহাদের জন্য জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মকালের ফসলের জন্য জলসেচন খুবই আবশ্যক। এমন কি, শীতকালেও যদি জমির রস শুকাইয়া যায়, তাহা হইলেও জমিতে জলসেচন করিতে হয়; আবার শীতকালের এমন ফসলও আছে, (যথা—বিলাতী শাক-সব্জী আলু ইত্যাদি) নিয়মিত জলসেচন না করিলে তাহাদের ফলন ভাল হয় না। জলসেচনের দ্বারা অন্য ভাবেও জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বাড়ে, যেমন পলিমাটি-যুক্ত জল জমিতে প্রয়োগ করিলে উহার দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বাড়ে।

জলসেচন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার—

(১) কোন্ ফসলের জন্য কত পরিমাণ জলের প্রয়োজন এবং উহা কোথা হইতে আনা হইবে, যেমন নদী, নালা, খাল, বিলের জল কিংবা বাঁধ, পুকুর ইত্যাদিতে আবদ্ধ বৃষ্টির জল অথবা কূপের জল; অবস্থা-ভেদে কোন কোন শস্যে পাঁচ-ছয় বার জল সেচন করা দরকার।

(২) কি ভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(৩) জমির সর্ব্বত্র কি ভাবে সমান জল পাইতে পারে। ইহার জন্য জমিতে আবশ্যক মত নালি কাটিয়া দিতে হয়।

কোন্ ফসলে কোন্ সময়ে কত পরিমাণ জলের দরকার তাহা জমির রকম, ফসলের প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানীয় আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।

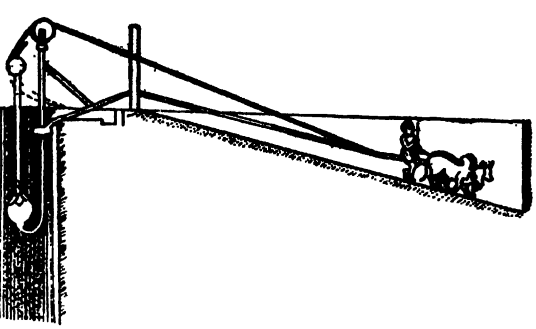
জলসেচনের জন্য কয়েকটি সাধারণ যন্ত্রের কথা নিয়ে বলা হইতেছে—

(১) ঢেঁকি বা লাঠা—অগভীর কূপ বা জলাশয় হইতে এই যন্ত্রের দ্বারা জল উত্তোলন করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মিনিটে আধ মণ হইতে এক মণ পর্য্যন্ত জল তুলিতে পারা যায়। একজনের দ্বারাই এই যন্ত্র পরিচালনা করা যায়।

(২) দোন্—শিমুল বা তাল গাছের গুঁড়ি কুঁদিয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার আকার কতকটা নৌকার মত। একটি মাত্র লোকের দ্বারাই এই যন্ত্র পরিচালিত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় হাজার মণ জল উঠাইতে পারা যায়। পুকুর বা বাঁধ হইতে জলসেচনের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(৩) শিউলি বা সেচনী—ইহা বাঁশ অথবা বেতের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে; ইহার আকৃতি অনেকটা সেঁউতির মত। দোনের ন্যায় ইহার দ্বারা তিন-চার হাত নিম্ন

হইতে জল উত্তোলন করা যায়। সেচনীর দুই পাশে দড়ি বাঁধা থাকে এবং দুই পাশে দুই জন লোক দাঁড়াইয়া জল-সেচন করে।



জলসেচনের যন্ত্র—মোট

(৪) বলদেও বালতি—দুইটি দোন একত্র করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত। একটি দোন যখন উপরে উঠিয়া জল ঢালিয়া দেয়, তখন অপরটি নীচে চলিয়া যায়। ইহা বলদ দ্বারা পরিচালিত হয়। নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বলদটির যাওয়া-আসার সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি দোন নামিতে এবং উঠিতে থাকে।

(৫) মোট—কূপ হইতে জল উত্তোলনের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র একজোড়া বলদ এবং এক জন লোকের সাহায্যে চালিত হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত যন্ত্রগুলি ছাড়া জল উত্তোলনের জন্য আরও অনেক উন্নত যন্ত্র আছে। এই সম্পর্কে পার্শিয়ান হুইল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৯

জল নিষ্কাশন

জমিতে জলসেচনের যেমন প্রয়োজন সেইরূপ আবশ্যক হইলে জমি হইতে অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা রাখা দরকার। এমন অনেক শস্য আছে যাহা জমিতে জল আবদ্ধ হইয়া থাকিলে মোটেই বাঁচিতে পারে না। এই সকল শস্যের জন্য জমি হইতে জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন।

জমি জলে আবদ্ধ থাকিলে উহাতে বায়ু চলাচল করিতে পারে না। ইহা ছাড়া জল নিকাশনের দ্বারা জমির প্রকৃতিরও উন্নতি করা যায়। এমন অনেক বিশেষ সার আছে (যেমন নাইট্রেট অব সোডা) জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহা ধৌত হইয়া যায়। জল নিকাশনের দ্বারা জমির উত্তাপ রক্ষা করা যায় এবং ফসলের জন্য জমিকে দৃঢ় রাখা যায়।

১০

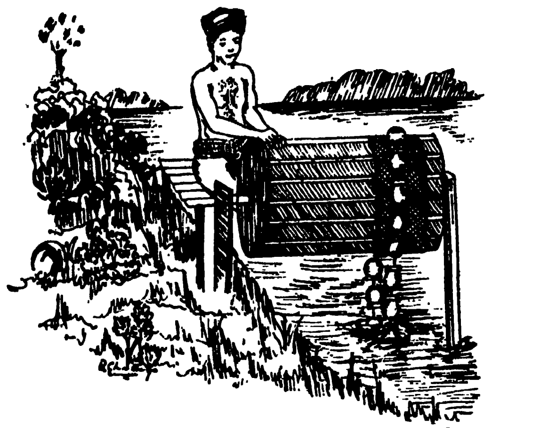
ফসলের পোকা

নানা জাতীয় পোকামাকড়ের দ্বারা শস্যের যে কত ক্ষতি হয় তাহা অনুমান করা যায় না। পোকার আক্রমণ নিবারণের জন্য ঔষধের ব্যবহার ও অন্য কোন প্রতিকার করা খুবই কষ্টসাপেক্ষ। পোকামাকড়ের আক্রমণ যখন খুবই বেশী হয় এবং উহার দ্বারা ফসলের খুবই ক্ষতি হয়, কেবল তখনই উহা আমাদের চোখে পড়ে; পোকার আক্রমণ হঠাৎ একেবারে বাড়িয়া যায় না, উহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। শুঁয়া ও লেদা পোকাতেই আমাদের ফসলের বেশী ক্ষতি হয়; উহারা নিজেদের শরীর বদলাইয়া প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া বেড়ায়; প্রজাপতির মধ্যে মেয়ে ও পুরুষ আছে; মেয়ে-প্রজাপতি ডাল, পাতা, ফল, ফুল কিংবা মাটির উপর ডিম পাড়ে, ডিম হইতে ছানা বাহির হইয়া গাছের কচি পাতা, শাঁস খাইতে আরম্ভ করে; ইহাদের তখন প্রজাপতির মত ডানা, শুঁড় ইত্যাদি কিছুই থাকে না, ইহারা তখন উড়িতে পারে না, কিন্তু চলিয়া বেড়ায়; যাহাদের গায়ে লোম আছে তাহাদের শুঁয়াপোকা বলে আর যাহাদের গায়ে লোম নাই তাহাদের লেদা পোকা বলে; ইহারা দিনকতক বাদে খোলস ছাড়ে এবং এই রকম পাঁচ-ছয় বার খোলস ছাড়ে। প্রত্যেক বার খোলস ছাড়ার সময় ইহাদের চেহারা ও রং বদলাইয়া যায়। শেষবার খোলস ছাড়িবার পর ইহারা খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং নিশ্চল হইয়া পড়িয়া



জলসেচনের যন্ত্র—সিউনি বা সেচনী

থাকে; এই অবস্থায় নিজের মুখ হইতে সুতা বাহির করিয়া তাহার সহিত পিছনকার পা জড়াইয়া ঝুলিতে



জলসেচনের যন্ত্র—পার্শিয়ান হুইল

থাকে; এখন ইহাদের গা, মুখ, চোখ ইত্যাদি কিছুই দেখা যায় না; ইহাদের এই অবস্থার নাম পুত্তলি; কিছুদিন পর এক একটি পুত্তলি হইতে এক-একটি প্রজাপতি বাহির হয়; এক-একটি প্রজাপতি ৩০০।৪০০ এবং তাহারও বেশী ডিম পাড়ে, সুতরাং শস্যক্ষেত্রে একটি শুঁয়াপোকা কিংবা লেদাপোকা দেখিলেই উহা যদি মারিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে উহাদের বংশবৃদ্ধি ও উহাদের দ্বারা ফসলের ক্ষতি অনেক কম হয়। উইও ফসলের খুব ক্ষতি করে।

নানাবিধ কারণের উপর পোকার আবির্ভাব নির্ভর করে এবং ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ জাতীয় পোকার আবির্ভাব হইবে তাহা বলা সহজ নয়; তবে মোটামুটি বৎসরের কোন্ ঋতুতে কোন্ জাতীয় পোকার আবির্ভাব হইতে পারে তাহা পূর্ব্বাহ্ণে অনুমান করিয়া লইতে পারা যায় এবং তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকিলে পোকার আক্রমণ সম্বন্ধে অনেকটা সাবধান হওয়া যায় এবং ফসলের ক্ষতির পরিমাণও অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে।

কীটপতঙ্গের দ্বারা ফসলের ক্ষতির পরিমাণ যাহাতে হ্রাস হইতে পারে তাহার জন্য নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলি পালন করা বিশেষ দরকার—

(১) ফসল যাহাতে সবল ও সতেজ হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত; কারণ, ফসল সবল ও সতেজ হইলে উহা পোকার আক্রমণ অনেক পরিমাণে প্রতিরোধ করিতে পারে।

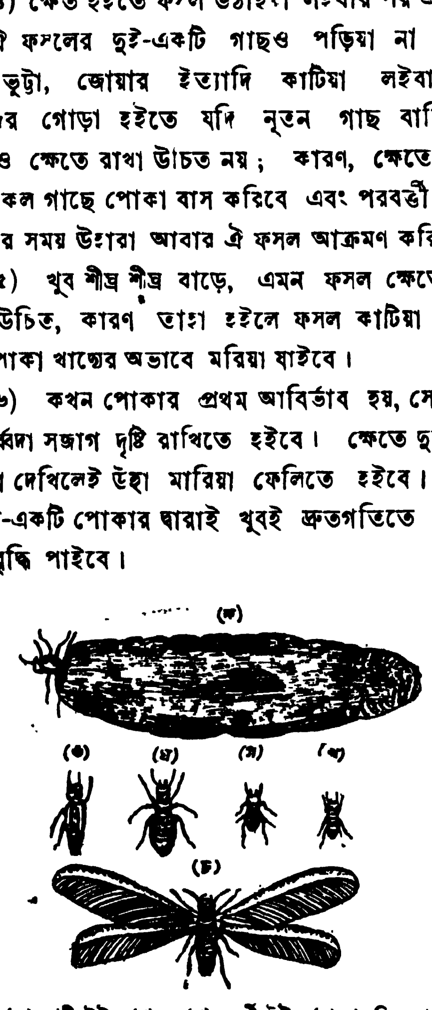
(২) শস্যক্ষেত্র সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। শস্যক্ষেত্রের উপর বা কাছাকাছি আশপাশে ঘাস-জঙ্গল, আগাছা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি থাকিলে পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশী হয়; কারণ উহাদের উপর বাস করিয়া উহারা বংশ বৃদ্ধি করে।

(৩) গ্রীষ্মকালে জমি ভাল করিয়া লাঙ্গল দিয়া ওলট-পালট করিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে জমিতে যে-সকল পোকার ডিম, বাচ্চা ইত্যাদি থাকে তাহারা নষ্ট হইয়া যায়।

(৪) ক্ষেত হইতে ফসল উঠাইয়া লইবার পর ঐ ক্ষেতে যেন ঐ ফসলের দুই-একটি গাছও পড়িয়া না থাকে; ধান, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি কাটিয়া লইবার পর উহাদের গোড়া হইতে যদি নূতন গাছ বাহির হয়, তাহাও ক্ষেতে রাখা উচিত নয়; কারণ, ক্ষেতের উপর এই সকল গাছে পোকা বাস করিবে এবং পরবর্ত্তী বৎসরে ফসলের সময় উহারা আবার ঐ ফসল আক্রমণ করিবে।

(৫) খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে, এমন ফসল ক্ষেতে বপন করা উচিত, কারণ তাহা হইলে ফসল কাটিয়া লইবার পর পোকা খাদ্যের অভাবে মরিয়া যাইবে।

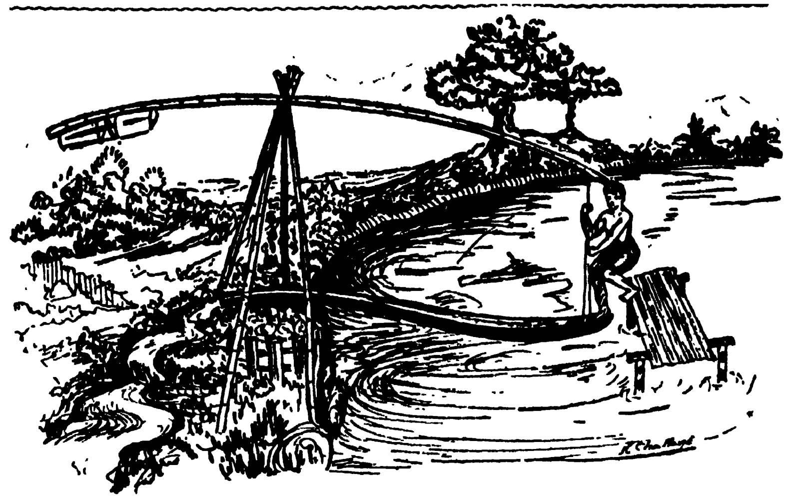
(৬) কখন পোকার প্রথম আবির্ভাব হয়, সে সম্বন্ধে সদাসর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষেতে দুই-একটি পোকা দেখিলেই উহা মারিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ ঐ দুই-একটি পোকার দ্বারাই খুবই দ্রুতগতিতে উহাদের বংশ বৃদ্ধি পাইবে।



(ক) রাণী উই, (খ) ও (গ) কর্ম্মী উই, (ঘ) পুত্তলি—পুরুষ, (ঙ) পুত্তলি—স্ত্রী, (চ) ডানাযুক্ত উই

(৭) মই দিয়া জমি শক্ত করিয়া দিলে মাটির ভিতর হইতে পোকা মাটির উপরে আসিতে পারে না এবং উপর হইতে নীচে যাইতে পারে না।

(৮) গোবরের গর্ত্ত, আবর্জ্জনার স্তূপ ইত্যাদি পোকা



জল সেচনের যন্ত্র—দোন

মাকড়ের আবাসভূমি ; সুতরাং উহাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৯) বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করা উচিত ; কারণ, অনেক সময়ে বীজের গায়ে পোকার ডিম লাগিয়া থাকে।

উপরোক্ত নিয়মগুলি অবলম্বন করা ছাড়া পোকার আবির্ভাব হইলে নিম্নলিখিত উপায়ের দ্বারা পোকার আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে—

১। যে-সকল পোকা লাফাইয়া বেড়ায় কাপড়ের থলের দ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া মারিয়া ফেলা যায়।

২। এমন অনেক পোকা আছে যাহারা আলো দেখিলে আলোতে আসিয়া পড়ে ও মরিয়া যায় ; সুতরাং মাঠে আলো জ্বালিয়া ঐ সকল পোকা নষ্ট করা যায়।

৩। যে-সকল পোকা মাটির তলায় লুকাইয়া থাকে জলসেচনের দ্বারা তাহাদিগকে অনেক পরিমাণে নষ্ট করা যায়।

৪। পিচকারীর দ্বারা ঔষধ ছিটাইয়া অনেক রকমের পোকা নষ্ট করিতে পারা যায়।

১১

ফসলের রোগ

নানাজাতীয় কীট পতঙ্গের দ্বারা শস্যের যেরূপ ক্ষতি হয়, নানা প্রকার রোগের দ্বারাও শস্যের ক্ষতির পরিমাণ খুবই অধিক। কীট-পতঙ্গের আক্রমণের মত রোগের আক্রমণও প্রথমে কম থাকে এবং দৃষ্টিগোচর হয় না। রোগ যখন বৃদ্ধি পাইয়া গাছের খুবই ক্ষতি করিতে আরম্ভ করে তখনই উহা আমাদের নজরে পড়ে। গাছের সমুদয় রোগই স্থানীয় জলবায়ুর উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। গাছের রোগ নিবারণ করা খুবই শ্রমসাপেক্ষ এবং ইহার জন্য সমবেত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। কোন্ কোন্ কারণে, কি কি অবস্থায় ও কোন্ কোন্ সময়ে কি কি রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা জানা থাকিলে, রোগ-নিবারক ও আরোগ্যজনক উপায় অবলম্বন করিয়া শস্যকে উহাদের আক্রমণ হইতে অনেকটা বাঁচান যাইতে পারে। নিম্নলিখিত রোগ-নিবারক উপায়গুলি নিয়মমত অবলম্বন করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়—

১। গরম জলে কিংবা তুঁতে ভিজান জলে বীজগুলি ধুইয়া লইলে অনেক প্রকার রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়।

২। যে-সকল পাতার উপর সাদা সাদা ছাতা পড়ে, সেই পাতাগুলির উপর গন্ধক ও তামার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে বীজাণু বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

৩। বাগান, জঙ্গল, কিংবা ক্ষেত হইতে 'ছাতা' ধরা গাছ একেবারে সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া ফেলা দরকার।

৪। গাছের ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা মৃত অংশগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া স্থানান্তরিত করিয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত।

৫। মাঠে আগাছার ভিতরে রোগের বীজাণু বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং আগাছাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে হইবে।

৬। গাছের ক্ষতস্থান আলকাতরা কিংবা অন্য কোনও প্রকার প্রতিষেধক দ্বারা প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক।

৭। বীজ জমিতে একত্রে জমাট করিয়া অনেকগুলি গাছ জন্মান কোনমতেই উচিত নহে।

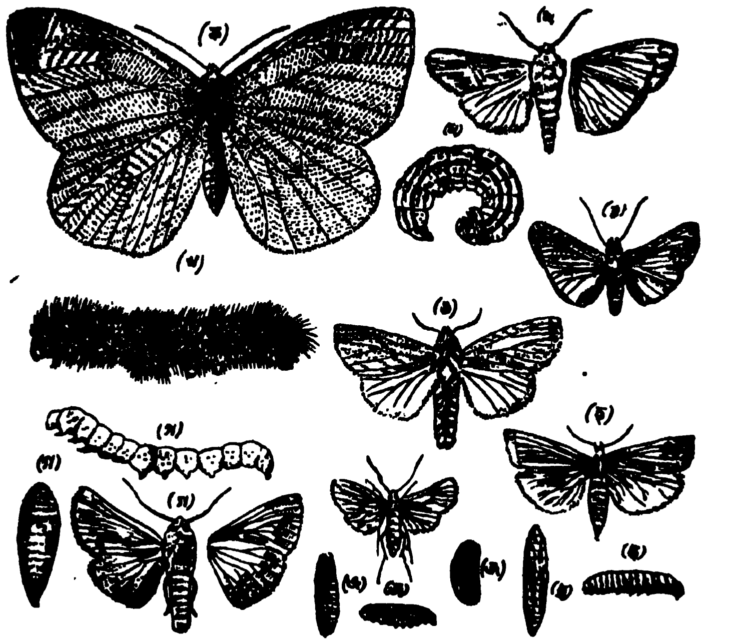
৮। একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন গাছ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

৯। যে সকল স্থানে রোগের জীবাণু সকল বর্দ্ধিত হয় ঐ সকল স্থানে গাছ রোপণ করা বিধেয় নহে।

১০। যে-সকল গাছ রোগ প্রতিরোধ করিতে পারে ঐ সকল গাছই নির্ব্বাচন করিয়া রোপণ করা দরকার।

উপরোক্ত নিয়মগুলি ছাড়া আরোগ্যজনক নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সহজে কার্য্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ঃ

১। বোরদো মিকশ্চার—সাধারণতঃ রোগের বীজাণু ধ্বংসের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত ফলপ্রদ ; ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহার-প্রণালী অতি সহজ ও অল্পব্যয়-সাপেক্ষ। গাছের বাড়িবার শক্তি যখন বন্ধ থাকে তখন রোগ নিবারণ করিবার জন্য এই ঔষধ পিচ্‌কারীর দ্বারা



(ক) একটি সাদা রঙের প্রজাপতি—ইহা অনেক প্রকার শস্যের খুবই ক্ষতি করে। (খ) ইহা আর এক প্রকার প্রজাপতির বাচ্চা—শস্যের খুবই ক্ষতি করে। (গ) আর এক প্রকারের প্রজাপতি—তাহার কীট ও পুত্তলি। (ঘ) আর এক প্রকারের প্রজাপতি—কীট ও পুত্তলি। (ঙ) আর এক প্রকারের প্রজাপতি—ধানের খুবই ক্ষতি করে। (চ) মুসুরের খুবই ক্ষতি করে। (ছ) ইহাও নানাবিধ ফসলের খুব ক্ষতি করে। (জ) বেগুনের খুবই ক্ষতি করে।

এখন দেখিতে হইবে যে, বোরদো মিক্‌শ্চার ঠিকভাবে প্রস্তুত হইয়াছে কি না? একটি ছুরির পরিষ্কার ফলা এই ঔষধে আধমিনিট ডুবাইয়া রাখিলে যদি ফলাতে তাম্রের আবরণ পড়ে তবে বুঝিতে হইবে যে, ইহা ঠিকভাবে তৈয়ারী হয় নাই। হিসাব করিয়া আরও চুণের জল মিশাইলে এই দোষ দূর হয়।

(২) বার্গাণ্ডি মিক্‌শ্চার—তুঁতে ১২ ছটাক ৪ তোলা, কাপড় কাচা সোডা—১ সের, জল—১ মণ

প্রথম জল ফুটাইয়া তাহাতে সোডা মিশাইতে হয়; সোডা গলিয়া গেলে উহাতে রজন দিয়া আধঘণ্টা ফুটাইতে হয়; এই সময় উহা অনবরত নাড়িতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে ইহা এক মণ বোরদো বা বার্গাণ্ডি মিক্‌শ্চারে মিশ্রিত করিতে হইবে। বর্ষাকালে এই ঔষধ গাছে ছিটাইবার জন্য খুবই উপযোগী।

(৩) ফর্ম্মালিন—ফর্ম্মালিন আধ ছটাক এবং জল ১০ সের।

ছিটানো হয়। আলু, পাট প্রভৃতি ফসলের চারা গাছের উপরিভাগে যখন এই রোগ দেখা যায় তখনও পিচ্‌কারী-সাহায্যে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম—

তুঁতে—ছয় ছটাক, ২ তোলা। পাথর-চূণ—ছয় ছটাক, ২ তোলা। জল— ১ মণ।

১। অর্দ্ধেক জলে তুঁতে গুলিয়া লইতে হইবে। ইহার সহজ উপায় হইতেছে যে, এক টুকরা ছালায় তুঁতে বাঁধিয়া পাত্রের জলের ভিতর ডুবাইয়া একটি দড়ি দিয়া উহা ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে; এই ভাবে ডুবাইয়া রাখিলে তুঁতে সহজে গলিয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়।

২। শুকনা পাথর-চূণ একটি ভিন্ন পাত্রে রাখিয়া উহাতে চূণের ঢেলাটি যেন ঢাকিয়া যায় এই পরিমাণ জল দিতে হয়। চূণ ফুটিয়া উঠিলে ও উহার বুদ্‌বুদ উঠা বন্ধ হইলে বাকী জল দিতে হইবে। এখন তুঁতের জল ও চূণের জল একটি তৃতীয় পাত্রে অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া মিশাইতে হইবে ও পরে একটি মিহি ছাঁকনী দিয়া উহা ভালভাবে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

ইহা একটি চমৎকার জীবাণুনাশক; এবং গম, যই, যব, জোয়ার প্রভৃতি বীজ শোধন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, বীজের উপর ফর্ম্মালিন ছিটাইয়া বীজগুলি নাড়িয়া উত্তমরূপে মাখাইতে হয় এবং তৎপর ফর্ম্মালিনের জলে ডুবান ভিজান বস্তা দিয়া দুই ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। পরে শুকাইবার জন্য বীজগুলি মেলিয়া দিতে হয়।

(৪) শতকরা দুইভাগ তুঁতের জল। তুঁতে ১ তোলা এবং জল ১ বোতল (কেরোসিন বোতল)। গাছের বাড়িবার শক্তি যখন বন্ধ থাকে তখন এই জল ব্যবহৃত হয়। যদি কোন কলমে কোন রোগের বীজ থাকে তাহা নষ্ট করিবার জন্য রোপণের পূর্ব্বে এই জলে উক্ত কলম ডুবাইয়া লওয়া হয়। ফর্ম্মালিনের মত নাড়িয়া চাড়িয়া উত্তমরূপে মাখাইতে হয় এবং পরে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়।

(৫) গোলাপ, তুঁত, গুজবেরী প্রভৃতির উপরে যে এক রকমের সাদা রঙের ছাতা রোগ জন্মে তাহা নিবারণ করিতে গুঁড়া গন্ধক উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা এইরূপ ভাবে আক্রান্ত গাছের উপর ছড়াইয়া দিতে হয় যেন গাছটি হলদে গুঁড়া দ্বারা ঢাকিয়া যায়।

"সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

এই নাম দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের খ্যাত- ও অখ্যাত-নামা গ্রন্থকর্তার সংক্ষিপ্ত চরিত প্রকাশ করিতেছেন। ১৩৪৭ সালে মালা-গাঁথা আরম্ভ হইয়াছে। অদ্যাবধি প্রায় ৫০ জনের চরিত ৩৯ খানি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রামমোহন রায়, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত শতাধিক পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা, এবং অবশিষ্ট ৩৫ খানি অনধিক ৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আনা নির্দিষ্ট হইয়াছে। কয়েকখানি পুস্তকের এক এক সংস্করণ বর্ষে বর্ষে আবশ্যক হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার। বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ও গল্পের বই ব্যতীত অন্য বই বিকায় না। কিন্তু এই সকল চরিত ঐ দুই-এর বাহিরে। এক এক সংস্করণে কত খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা লিখিত হয় নাই। যদি সহস্র খণ্ডও হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৎসরে সহস্র খণ্ডের গ্রাহক হইয়াছিল। এই জন্যই বলিতেছি, অভাবনীয় ব্যাপার। দেশ অতিশয় দরিদ্র। কয় জন লেখাপড়া শিখিতে পারে, কয় জনই বা সাহিত্য-চর্চা করিবার অবসর পায়।

পঞ্চাশ বৎসর হইল, কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশজ্ঞান-অনুসন্ধান ও -প্রচার ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমান দেশ প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু অতীতের উপরে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের দ্বারা বর্তমান অতীতের সন্ততি হইয়াছে। মানবচিত্তে সাহিত্যের প্রভাব অতুলনীয়। যাঁহারা সে সাহিত্য-সৃষ্টি ও -পুষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম সাহিত্য-সাধক রাখা হইয়াছে। চরিতমালার সকলেই যে সাহিত্য-সাধক ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। কেহ উত্তর-সাধক, কেহ বা উপ-সাধক ছিলেন। তথাপি "সাহিত্য-সাধক" নাম মন্দ হয় নাই।

শ্রীসজনীকান্ত দাস উইলিয়ম কেরী সাহেবের, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল রাধাকান্ত দেবের চরিত এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত লিখিয়াছেন। বাকি সমুদয় সাধকের চরিত শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একা লিখিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পরিচয়", "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাকে কি অন্বেষণ, কি পরিশ্রম, কি সমাহরণ করিতে হইয়াছে! অনেকে পরিশ্রম করিতে পারেন, কোন্ পুস্তকে কি আছে, তাহাও জানিতে পারেন, কিন্তু সকলের সমাহরণ-দক্ষতা থাকে না। সমাহরণের পরে নির্মাণ। নির্মাণ মাত্রেই কলা। গদ্যে হউক, পদ্যে হউক, সাহিত্য-কলা গুণীর সাধ্য। এই গুণের অভাবে সকল রচনা সুপাঠ্য হয় না।

অল্প পরিসরে বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্মরণীয় সাধকের চরিত ও কৃতি-প্রচার এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। আমি সাহিত্যিক নই, সমালোচক নই, আমি সামান্য পাঠক। আমার বিবেচনায়, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আমি কাহারও নাম জানিতাম, কৃতি জানিতাম না; কৃতি জানিতাম, কর্তার নাম জানিতাম না; অধিকাংশের জীবন-চরিত জানিতাম না। এক্ষণে ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহে আমার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হইল, দেশ-জ্ঞান বৃদ্ধি পাইল। কোনও চরিতে একটা উড়া কথা নাই, বাগাড়ম্বর নাই। তাঁহার এক হাতে তুলা, অপর হাতে পাঁজি। প্রত্যেক উক্তি উন্মিত হইয়াছে, সন-তারিখ দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। কত যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বই, সংবাদ-পত্র, সরকারী নথিপত্র, নানা গ্রন্থশালার সূচীপত্র নিরীক্ষণ করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি কখন স্মরণ করেন, কখন পড়েন, কখন লেখেন? কোন কোন সাধকের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হইয়াছে। কাহারও চরিত সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই, অগত্যা তাঁহাকে প্রাণহীন সাধন-যন্ত্র-রূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর ভাষা ঋজু, প্রসন্ন। কিন্তু কোন কোন স্থলে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে। বোধহয় দ্রুত রচনা-হেতু হইয়াছে। বাক্যের সমাপ্তির পূর্বে কর্তৃপদবিন্যাস-হেতুও হইয়াছে। সর্বদা ইংরেজী পড়িতে পড়িতে নব্য শিক্ষিতদের ভাষায় ইংরেজী রচনা-রীতির অনুকরণ আসিয়া পড়িতেছে। ইহা আশ্চর্য নয়। আমরা ভাবে, বেশে, আচরণে, ভাষায় জনসাধারণ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছি, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের তারতম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি ভাবিতেছি, এই চরিতমালা ইংরেজী-অনভিজ্ঞের ভোগে আসিবে কিনা। ইহা নিশ্চিত, তাঁহারা 'শতক' ও 'দশক' শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া খ্রীষ্টাব্দ-শতক ও খ্রীষ্টাব্দ-দশক অর্থ হইল, আমিও বুঝিতে পারি না। নব্য শিক্ষিতেরা আমাদের অসংখ্য জীবন আবিষ্কার করিয়াছেন। ছাত্র-জীবন, চাকরি-জীবন, ধর্ম-জীবন, কর্ম-জীবন, পারিবারিক-জীবন, সামাজিক-জীবন, জাতীয়-জীবন, যৌন-জীবন, দাম্পত্য-জীবন, সাহিত্য-জীবন, সাহিত্যিক-জীবন ইত্যাদি জীবন-অধ্যায়ের শেষ নাই। এমন কি, এই জীবনেই 'পর-জীবন'ও পাইতেছি। এই সকল জীবনের অর্থ কি? নব-রচিত 'জীবনী' শব্দে কোন্ জীবন বুঝিতে হইবে? কোন কোন চরিতে প্রবন্ধের মাঝে ইংরেজী পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। যে সকল পাঠক ইংরেজী জানেন না, বাঙ্গালা পুস্তক ভাবিয়া পড়িতে থাকিবেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের এই ব্যবহারে তুষ্ট হইবেন না। ইংরেজী পত্রের ভাবার্থ দিলে প্রবন্ধের কোন ক্ষতি হয় না, পাঠকেরও দুঃখ হয় না। সে পত্র এবং অন্যান্য ইংরেজী ও অন্য ভাষায় লিখিত পত্র, বিবরণ

ইত্যাদি পুস্তকের পরিশিষ্টে দিলে বাঙ্গালা ইংরেজীর মিশাল হয় না, লেখক ও পাঠকের চিন্তা-প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে না;

চরিত পড়িতে পড়িতে কয়েকটি অভাব মনে হইয়াছে। চরিত-মালা পাঠকের প্রিয়তর করিতে হইলে কোন বিষয়ে ত্রুটি রাখা কর্তব্য হইবে না। আমি কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। (১) প্রত্যেক সাধকের উত্তম রচনার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতে হইবে। হস্তাক্ষর পাইলে চারি-পাঁচ পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত করিলে চরিত জীবন্ত আকার ধারণ করিবে। (২) যে গ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইবে, তাহার বর্তমান প্রকাশকের নাম-ধাম ও গ্রন্থের সংস্করণ লিখিতে হইবে। (৩) গ্রন্থকারের কোন্ কোন্ গ্রন্থ কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা চিহ্নিত করিয়া দিলে পাঠক ইচ্ছা করিলে ক্রয় করিয়া পড়িতে পারিবেন। (৪) কোনও গ্রন্থকারের জীবন-চরিত ইতঃপূর্বে লিখিত হইয়া থাকিলে চরিত-কারের নাম ও চরিতের নাম ভূমিকায় জানাইতে হইবে। প্রত্যেক চরিতের আকরও নির্দেশ করিতে হইবে। এই চরিতমালার কোন কোন চরিত-পুস্তকে উপরিউক্ত অভাব মোচন হইয়াছে, কিন্তু সকল চরিতে হয় নাই।

এই চরিতমালায় যে সকল সাহিত্য-সাধকের চরিত অদ্যাবধি সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ইং ১৮০০ সালের পরে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপিত হইল, কলিকাতায় হইল। সম্বাদপত্র প্রচারিত হইতে লাগিল; দূরবর্তী গ্রাম হইতে সমাচার আসিতে লাগিল। যে গদ্য প্রচলিত ছিল সেই গদ্যেই নির্বাহ হইতে লাগিল; কাহাকেও নূতন করিয়া সে ভাষা শিখিতে হয় নাই। পূর্বে সাধারণের পাঠের নিমিত্ত নানাবিধ ছন্দে, সুমধুর পদ্যে পুস্তক রচিত হইত। বলা বাহুল্য, সংসার-যাত্রা-নির্বাহার্থে গদ্যের প্রচলন ছিল। এখন সাধারণের পাঠের নিমিত্ত সেই গদ্যেই পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। কাহাকেও নূতন করিয়া গদ্য রচনারীতি শিখিতে হয় নাই। চির-কাল লৌকিক ভাষা চলিয়া আসিতেছিল, চলিতে থাকিবে। বিষয়, প্রয়োজন ও বক্তা অনুসারে লৌকিক ভাষার নানা ভেদ ছিল, এখনও আছে। লৌকিক ভাষা ব্যতীত আর এক ভাষা আছে, তাহা শাস্ত্রীয় ভাষা, সকলের বোধ্য নহে। ন্যায়ের ভাষা, উচ্চ বিজ্ঞানের ভাষা, শাস্ত্রীয় ভাষা। (শাস্ত্রীয়—technical) সংস্কৃত পণ্ডিতেরা সংস্কৃত চর্চা করিতেন, বাঙ্গালা পদ্য পড়িতেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র বাঙ্গালা শাস্ত্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেন। এই অভ্যাস-প্রযুক্ত তাঁহারা লৌকিক বিষয়ে লিখিবার সময়েও লৌকিক বাঙ্গালাকে সংস্কৃত-বহুল করিয়া ফেলিতেন। কেহ কেহ সংস্কৃত সমস্ত পদ ভাঙ্গিয়া সহজ বাঙ্গালায় অর্থ প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহারা ভাষার গুরুত্ব-লোপের আশঙ্কা করিতেন। লৌকিক ভাষায় বিসদৃশ সংস্কৃত পদের মিশালে পণ্ডিতী বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছিল। "লিখিতং শ্রীধনঞ্জয় দত্ত কস্য বিক্রয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে" এই বাক্য অদ্যাপি গ্রামে গ্রামে প্রচলিত আছে। এক্ষণে খানকয়েক চরিত অবলোকন করি।

(১) ইং ১৮০০ সালে কলিকাতায় নবাগত সিবিলিয়ন সাহেবদের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্তে এক কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। তৎকালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই কলেজে বাঙ্গালা শিখাইবার নিমিত্ত প্রথম ও প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত গদ্য ভাষা শিখাইবার পুস্তক ছিল না। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইং ১৮০২ সাল হইতে ১৮১৯ সালের মধ্যে পাঁচখানি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়া-ছিলেন। পাঁচখানিই সংস্কৃত হইতে সংগ্রহ। আর লিখিত আছে, "মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে"। তিনি বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ-লেখকের অগ্রণী। তাঁহার রসজ্ঞান ছিল। স্থানে স্থানে নর্মোক্তি দ্বারা তিনি প্রবন্ধকে সরস করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার পণ্ডিতী বাঙ্গালা পড়িতে আনন্দ হয়। সাহেবদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিখাইতে হইলে, শাস্ত্রীয় ভাষা ও লৌকিক ভাষা উভয় ভাষাই শিখাইতে হইত। লৌকিক ভাষার নানা ভেদ আছে। তাঁহার "প্রবোধ চন্দ্রিকা" অদ্যাপি আদরণীয় হইয়া আছে। ইহাতে এক দরিদ্র নারীর খেদোক্তি আছে (৪২ পৃঃ)। কিন্তু সে ভাষা বিদ্যালঙ্কারের নির্মিত নয়। নারী বলিতেছে, "মটর, মসুর, শাক, পাত, শামুক, গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। খড়, কুটা, কাঁটা ('কাটা' ছাপার ভুল), শুকনা পাতা, কঞ্চী, তুঁষ ও বিল ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি।" এখানে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সে নারীর ভাষা অবিকল লিখিতে ও শব্দের সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অন্য লেখকেরাও এইরূপ লিখিতেন। প্রত্যেক লেখকের স্বকীয় বাগ্‌বৃত্তি আছে, যাহাকে ব্রজেন্দ্রবাবু 'স্টাইল' বলিয়াছেন। বিদ্যালঙ্কারের বাগ্‌বৃত্তি সুকুমার। ইহার সহিত রস-সংযুক্ত হইয়া তাঁহার রচনা সাহিত্য-পদ-বাচ্য হইয়াছে। যদি তাঁহাকে ভাষা শিখাইতে না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার রচনা আরও উত্তম হইত। কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষায় উত্তমতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' (৪৪ পৃঃ) পড়িলে তাঁহার বাগ্‌বৃত্তির পরাঙ্মুখতা প্রতীয়মান হয়। বিদ্যা-লঙ্কারের পর রামমোহন রায় ইং ১৮১৫ হইতে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কতকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে উপনিষদের ও বেদান্তের বাঙ্গালা ভাষান্তর করিয়াছিলেন। আর যে সব রচনা, সে সবও শাস্ত্রীয় বিচার। শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁহার যুক্তির বাঁধনি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এইরূপ বিষয়ের গ্রন্থ লৌকিক ভাষায় লিখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। "সহমরণ বিষয়ে দ্বিতীয় সম্বাদে" (৭৪ পৃঃ) রামমোহন রায় যে ভাষা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লৌকিক ভাষায়

অধিকার ও স্ববাগ্‌বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ভাষা। ইহাতে পণ্ডিতী ভাষার লেশমাত্র নাই।

(২) রামমোহন রায়ের চরিত সঙ্কলন করিতে ব্রজেন্দ্রবাবু অনেক বৎসর ধরিয়া অশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। যাঁহারা পরে রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত লিখিবেন, তাঁহারা ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট নিশ্চয় ঋণী থাকিবেন। সাধারণ পাঠক তাঁহার অন্বেষণের মূল্য বুঝিবেন না। তাঁহারা দেখিবেন, ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহাদের অজ্ঞাত প্রতিপক্ষের সহিত তর্ক করিতেছেন। প্রথম ৫০ পৃষ্ঠায় এইরূপ তর্ক অনেক আছে। তদ্দ্বারা আখ্যানোচিত শান্ত-রসের হানি হইয়াছে, বর্ণনার ধারা মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়াছে। সন ১৩৪৯ সালের আষাঢ় মাসে এই চরিতের প্রথম সংস্করণ হইয়াছিল। এক মাস পরে দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইয়াছিল। তর্ক-বিতর্ক যথাসাধ্য বর্জন করিয়া নূতন সংস্করণ করিলে চরিতের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাইবে!

চরিত-পুস্তকে রামমোহন রায়ের একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কি সুন্দর মূর্তি! সস্মিত মুখমণ্ডলে বুদ্ধি ও বীর্যের দীপ্তি প্রতিফলিত হইতেছে। এই চরিত পড়িতে পড়িতে মনে হইতে থাকে, আমরা রামমোহন রায়ের যথোচিত পূজা করিতে শিখি নাই। অধুনা দেশহিতৈষী যে যে দুঃখ অনুভব করিতেছেন, প্রতীকার অন্বেষণ করিতেছেন, আশ্চর্যের বিষয়, শত বর্ষ পূর্বে রামমোহন রায় সে চিন্তায় পীড়িত হইয়াছিলেন। কোথায় ইয়োরোপে এক রাজ্য স্বাধীনতা হারাইল, সে সমাচারে তিনি ব্যথিত হইলেন, ভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে পারিলেন না, এক সাহেবের নিমন্ত্রণ। কোথায় আমেরিকা হইতে কাহার স্বাধীনতা-লাভের বার্তা শুনিলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না, বন্ধুগণকে ডাকিয়া উৎসব করিলেন! তখন তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া থাকিবেন, একদিন তাঁহারও মাতৃভূমি স্বাধীন হইবে। যে চরিত্রে কোনও বিষয়ে স্বাধীনতার অভিলাষ প্রকাশিত হয়, বুঝিতে হইবে, স্ব-তন্ত্রতা তাঁহার স্বভাবজ সংস্কার, সে সংস্কার বন্ধন স্বীকার করিতে পারে না। আমরা বাল্যকাল হইতে নানাবিধ আচার দেখিয়া আসিতেছি। অতিপরিচয়-প্রযুক্ত তাহাদের প্রয়োজন, দোষ-গুণ, যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, সে সব সার্বকালিক। বিধবার সহমরণ বহু লোকে দেখিত, মহনীয় মনে করিত। কদাচিৎ কাহারও হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইত। হয়ত সেই অসহায় দুঃখার্ত বিরলে অশ্রুমোচন করিত, দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিত না, সমাজে উদাসীন হইয়া থাকিত। রামমোহন রায় সে দৃশ্য সহিতে পারিলেন না, বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন। যিনি বহু লোকের বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন, তিনি মহাপুরুষ। তিনি একা সহস্র নির্বাক্ জনের প্রতিনিধি। যাহা সহস্র মানুষের চিত্তে ধূম্র-ছন্ন অস্পষ্ট থাকে, তিনি তাহার দীপ্ত মূর্তি দেখাইয়া দেন।

রামমোহন রায় প্রতিমা-পূজার বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও প্রখর বুদ্ধি দ্বারা প্রতিমা-পূজার নিষ্ফলতা অনুভব করিলেন। তাঁহার মাতা "তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশীলা ও (আচার-) নিষ্ঠাবতী" ছিলেন। পুত্রও তেজস্বী, ধীমান্ ও স্বাধীন-চেতা ছিলেন। এরূপ স্থলে মাতৃস্নেহ-বন্ধন শিথিল হইয়া থাকে। রামমোহনের এক অগ্রজ ও এক ভগিনী এবং এক বৈমাত্রেয় অবরজ ছিলেন। তাঁহার পিতা সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। বাহিরে সংসার সুখে চলিতেছিল। কিন্তু ভিতরে বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। যখন রামমোহনের বয়ঃক্রম ২২ বৎসর, তিন ভ্রাতাই যুবা, বিবাহিত, তখন তাঁহার পিতা নিজের অংশে কিছু রাখিয়া সমুদয় সম্পত্তি তিন পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিলেন, সকলকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, তিন পুত্রের মধ্যে সদ্‌ভাব নাই, দুই পত্নীর মধ্যেও নাই। তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্বে যখন রামমোহনের বয়স ১৪ বৎসর, তখন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তখন নন্দকুমারের বয়স প্রায় ২৫ বৎসর। বিদ্যালঙ্কারের চরিত পুস্তক (মালার ৯ সংখ্যক) দেখিতেছি, গঙ্গার পূর্বপারে নৈহাটির দিকে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি অল্প বয়সে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। বোধ হয় দেশভ্রমণের সময় তিনি রাধানগরে রামমোহনের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি তান্ত্রিক কুলাবধূত হইয়াছিলেন। (কুল শব্দের গূঢ় অর্থ ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম-শক্তি। কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞানী শাক্ত সন্ন্যাসী)। ইহার পরেও উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। একবার অবধূত মহাশয় রামমোহনের নিকটে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভ তন্ত্রশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তিনি যে রামমোহনকে তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন, তাহা নিঃসন্দেহ।" আমার বোধ হয়, বিদ্যালঙ্কার বাল্যকালেই রামমোহনের দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। সেই বীজ অল্পে অল্পে অদৃশ্যে অঙ্কুরিত হইয়া ১০।১২ বৎসর পরে বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। রামমোহনের ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তখন তাঁহার অগ্রজ তালুকের বাকি খাজনার দায়ে মেদিনীপুরে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি জেলে পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় গ্রামে আসিলেন না। সেখানে তাঁহার মাতা, স্ত্রী-পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এই ভ্রাতা দান কর্ম দ্বারা পিতার শ্রাদ্ধ করিলেন। রামমোহন রায় আসিলেন না, কলিকাতায় করিলেন। রামমোহন কেন বাড়ী আসিলেন না? মাতার সহিত বিরোধ ছিল? স্মৃতি মতে শ্রাদ্ধ না করিয়া তন্ত্র মতে করিলেন? সেই বৎসরেই রামমোহন রায় এক আর্বী-ফার্সী পুস্তকে একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন। এইটি তাঁহার প্রথম পুস্তক। তখন তাঁহার বয়স ২৯। একেশ্বর শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সে বয়সেই ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। প্রচলিত আচার ত্যাগ করিয়া এই মতে ও কার্যে আসিতে স্বজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সময় লাগিয়া থাকিবে। বাড়ীতে

দেব-সেবা ছিল, কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, পুরোহিত পূজা করিতেন, রামমোহন রায়কে কিছু কহিতে হইত না। মহা-নির্বাণ তন্ত্রে সাধককে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। উপনিষদের অনুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মনিষ্ঠের ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার ও অন্য আচার-বিচার নিবারণ।

(৩) মধুসূদন দত্তের চরিতে কবির একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু চিত্রকর কৃষ্ণ-বর্ণ কবিকে শ্বেত-বর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন, কবিকে চিনিতে পারা যায় না। কবির জীবন-চরিত পড়িতে পড়িতে পুনঃ পুনঃ মনে হইতে থাকে, বঙ্গবাণী কি মূল্য দিয়া "মেঘনাদ-বধ কাব্য" পাইয়াছেন! প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে অসামান্য মেধা, দুর্লভ কবিত্ব-শক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিভার দণ্ডও দিয়াছিলেন। ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি লিখিলেন,

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।"

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর আড়াই শত বৎসরে প্রায় আড়াই শত বৈষ্ণব কবির উদয় হইয়াছিল। সেই এক কথা, এক ভাষা, এক ভাব—আদি ও করুণ রস। পলাশী যুদ্ধের কিছু পূর্বে ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" লইয়া বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। রচনা-পারিপাট্যে, পদ-লালিত্যে, ভাবের সুকুমারতায় "অন্নদা-মঙ্গল" অদ্বিতীয়। বঙ্গবাসী বাঁয়া তবলা ও এস্‌রাজ-যোগে লক্ষ্ণৌ ঠুংরি শুনিতে শুনিতে ঝিমাইতেছিলেন। কোথা হইতে অকস্মাৎ আসিয়া মধুসূদন তানপুরা ও পাখোয়াজ-যোগে ধ্রুপদ গাহিতে লাগিলেন। বৃদ্ধেরা চমকিয়া উঠিলেন, কেহ রুষ্ট হইলেন, কেহ 'হা হতোস্মি' করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবকেরা বীর ও রৌদ্র রসের আস্বাদ পাইয়া মাতিয়া উঠিলেন। এক বিদ্যা-গজ কবিকে ব্যঙ্গ করিবার নিমিত্ত ৫।৭ পৃষ্ঠায় "ছুছুন্দরী-বধ কাব্য" লিখিলেন। আমরা তখন কলেজের ছাত্র। মনে পড়ে কেহ কেহ চটি বইখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু কবির কাব্য-প্রতিভার নিদর্শন তুলেন নাই। বোধ হয় মনে করিয়াছেন, সকলেই জানে। কিন্তু ইদানীর যুবকেরা মধুসূদনকে সেকেলে কবি বলেন।*

(৪) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিতে বিদ্যাসাগরের একখানি পরিচিত চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চরিত লিখিতে ব্রজেন্দ্রবাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু তদনুপাতে পুস্তকখানি মনোজ্ঞ হয় নাই। এক এক বিষয়ের অন্তর্গত বহু অবান্তরে (details) মানুষটি ঢাকা পড়িয়াছেন। যাঁহারা দিন-ক্ষণ ধরিয়া বিদ্যাসাগরের কৃতকর্ম জানিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য প্রীত হইবেন। নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইলেন। কোথায় তাঁহার জন্মগ্রাম বীরসিংহ, আর কোথায় কলিকাতা। কি সূত্রে তিনি কলিকাতা গেলেন, কোথায় থাকিতেন, ব্রজেন্দ্র-বাবু কিছুই লেখেন নাই। উপনয়ন ও বিবাহ মানবের দুই প্রধান সংস্কার। ব্রজেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে উপনীত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহ-সংস্কার ভুলিয়া গিয়া-ছেন। অনেকে জানেন না, বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতুলা-লয়। হুগলী আরামবাগের অন্তর্গত মলয়পুরে তাঁহার পিতৃ-নিবাস ছিল। তাঁহার বংশ শাক্ত, উপাধি ভট্টাচার্য। দামোদরের বন্যায় মলয়পুর বারম্বার বিধ্বস্ত হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞাতি গ্রামান্তরে গিয়া বাস করিতেছেন। মলয়পুরের প্রতি তাঁহার মমতা ছিল। তিনি মলয়পুরের কন্যাকে স্বীয় কন্যাজ্ঞান করিতেন। কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তাহার ফিরিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে মেলানি সাজাইয়া দিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কতকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। চরিতে (৬৩পৃঃ) দেখিতেছি, হুগলী জেলার বীরসিংহ ও মলয়পুরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর-ঘাটালের অন্তর্গত। কিন্তু ঘাটাল বিদ্যাসাগরের জন্মের ৫০ বৎসর পরেও হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিতের অনেক আখ্যান প্রচারিত আছে। তিনি একাধারে বজ্রবৎ কঠোর এবং নবনীতবৎ মৃদু ছিলেন। আমি তাঁহার ভীমমূর্তি ও মাতৃ-মূর্তি দেখিয়াছি। এই দুই বিপরীত ধর্মের সমাবেশ আর দেখা যায় না। তাঁহার পাণ্ডিত্য, দেশ-হিতৈষণা, কর্ম-কুশলতা, পৌরুষ ও করুণা তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। যদি কাহাকেও বর্তমান বাঙ্গালা গদ্যের স্রষ্টা বলিতে হয়, তবে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। তিনি জন-শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত বহু চিন্তা, যুক্তি ও যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি আজীবন শিক্ষয়িতা ছিলেন। কেবল বালকদের নিমিত্ত নয়, বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তও তিনিই প্রথমে বিশেষ বিশেষ গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বেথুন সাহেব (আমরা বেথুন বলি, বীটন জানি না) বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পর বৎসর বিদ্যাসাগর সে বিদ্যালয়ের কার্যনিবাহক হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের গাড়ীর দুই পার্শ্বে মহানির্বাণ তন্ত্রের (৮।৪৭) শ্লোকার্ধ "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" লিখাইয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয়ই পরে বেথুন কলেজ হইয়াছে।

নারীর দুঃখে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইত। রামমোহন রায় বিধবার সহমরণ নিবারণ করিলেন। করুণাসাগর বিধবার পুন-

*ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "মধুসূদনের জন্ম-সন লইয়া গোল আছে।" কিন্তু সন ১২৩০ সালের ১২ মাঘ, শনিবার—ইং ১৮২৪ সাল ২৫ জানু-আরি ঠিক মনে হয়। কারণ শুধু সন নয়, মাসের দিন ও বার বিনা প্রমাণে আসিতে পারিত না। আমাদের দেশে অনেকে বয়স বলিবার সময় চলিত বৎসর বলে, কদাচিৎ কেহ বলে, এত বর্ষ গত হইয়াছে। এইরূপে বয়সে এক বৎসরের ভুল হইতে পারে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলেজে প্রবেশ কালে কবির বয়স ২১ বৎসর ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার অর্থ ২০ গত, "২১" চলিতেছিল। কবির সমাধি-স্তম্ভে জন্ম-বৎসর "১৮২৬" খ্রীষ্টাব্দ উৎকীর্ণ আছে। এখানে সন ১২৩০ সালটি ধরা হইয়াছে কিন্তু জন্ম-মাস ধরা হয় নাই। পৌষের মাঝামাঝি নূতন খ্রীষ্টাব্দ হয়।

বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রতিষেধ খণ্ডন করিয়া স্বয়ং দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। ব্যাপারটি অল্প নয়। যে দেশে এইরূপ করুণাময় নর শার্দূলের আবির্ভাব হয়, সে দেশ ধন্য।

কয়েক বৎসর ব্রজেন্দ্রবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক আছেন। তিনি দেশজ্ঞান প্রচারের নূতন পথ দেখাইলেন। তাঁহার সোনার দোয়াতকলম হউক।

নির্দ্দেশবাদ ও কোয়াণ্টামবাদ

অধ্যক্ষ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

আমরা অনেকেই আশা করিয়াছিলাম, দেশের ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা এই পরিষদের উদ্বোধন-বক্তৃতার একটি বিশিষ্টতা হইবে। পণ্ডিত জওয়াহরলাল দেশের অভাব ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। বেশী দিন আগের কথা নয়, আমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও কলকারখানার মালিক তাঁহার নেতৃত্বে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন সম্বন্ধে দীর্ঘ ও সনির্ব্বন্ধ আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফল বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান হইত। ঘটনাচক্রে আমরা দেশের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার বহুকালব্যাপী সযত্ন চিন্তার সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছি। এজন্য আমি অতীব দুঃখিত। তাঁহার চিন্তা ও আলোচনার ফল হস্তগত হইলে সানন্দে উহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইবার উপায় নাই; কারণ সে সম্বন্ধে অধিকাংশ বিবরণই আমার অনায়ত্ত।

আপনাদের কোনও পূর্ব্বতন সভাপতি বলিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণমান বিষয়ে বিবর্দ্ধমান জ্ঞান লাভ করিবার প্রবণতা রহিয়াছে। কাজে কাজেই তাঁহার স্বকীয় ক্ষেত্রের বহির্ভূত বিষয়ে তাঁহার মতামতের তেমন মূল্য না-ও থাকিতে পারে।" আমি এই সতর্কবাণীর সারবত্তা বেশ উপলব্ধি করিতেছি। যদি আমি আবশ্যক জ্ঞানের চেয়ে সন্দেহ ও সমালোচনার অবতারণাই অধিক করিয়া বসি, তবে আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমি আপনাদের সমক্ষে বর্ত্তমান পদার্থ-বিজ্ঞানের কতিপয় বিশেষ দিক্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই, এবং বর্ত্তমান কোয়াণ্টাম-বাদের প্রভাবে নৈসর্গিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-নীতির যে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলিতে গেলে কেবল ইলেকট্রন, নিউট্রন, রঞ্জনরশ্মি এবং রেডিয়ম-শক্তি নিঃসরণের নামোল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট। আমাদের পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্রাদির বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, পরিমাপ-সীমা এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন, এক দিকে যেমন আমরা বিশাল দূর-বীক্ষণের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছি, অন্য দিকে তেমনি নির্ভুল সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে অণুপরমাণুর অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছি। আল্‌কেমী-বিদেরা এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করিবার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আজকাল পরমাণুর ভাঙাগড়া সম্ভব হইয়াছে। রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা অদৃশ্য জগৎ দৃশ্যমান হইতেছে, এবং বেতার-যোগে ভূমণ্ডলের সুদূরবর্ত্তী প্রান্তসমূহ সংযুক্ত করিয়া সংবাদ আদান-প্রদানের সম্ভাব্যতা সূচিত হইতেছে। চিন্তা-জগতেও এই সব আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হেতুবাদ ও নির্দ্দেশবাদ অবিসংবাদিত সত্যরূপে বিবেচিত হইত। আজ পদার্থ-বিদেরা জ্ঞানলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস হারাইয়াছে। এরূপ মূলগত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে, ইহা কিরূপে ঘটিল তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। নক্ষত্র-বিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বপন্থী পদার্থবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। নিউটন তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ ও বল-বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা গ্রহাদির গতি ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর দেখা গিয়াছে, এই নিয়ম দ্বারা নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধেও নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। তাই পদার্থবিদেরা সৌরবিজ্ঞানের সমীকরণগুলিকে নৈসর্গিক নিত্য-নিয়মের আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে পরমাণুবাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল। অতএব, পদার্থ যখন পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইল তখন সমুদয় জাগতিক ব্যাপারকে পরমাণুর গতি ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই

হইল আদর্শ পন্থা। কেবল এক-গুচ্ছ সঙ্গত সমীকরণ খাড়া করিয়া যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেই কাজ হয়। অর্থাৎ, কোনও এক মুহূর্ত্তে সমস্ত কণিকার জড়পরিমাণ, অবস্থান ও গতিবেগ জানিতে পারিলেই, এই সব সমীকরণের সাহায্যে পদার্থবিদ্ বিচার প্রয়োগ দ্বারা যে-কোনও ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তে ঐ সমস্ত কণিকার অবস্থান ও গতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রথম প্রথম আলোক-বিজ্ঞানের ঘটনাবলী এই সহজ পদ্ধতির সহিত খাপ খাইতেছিল না। আলোকরশ্মির পারস্পরিক বিলোপন আবিষ্কৃত হওয়ায়, ইহাকে আর কণিকা-স্রোত রূপে কল্পনা করা যাইতেছিল না। এই কারণে হিগিন্‌স্ আলোকের তরঙ্গবাদ প্রবর্ত্তন করেন, এবং ম্যাক্সওয়েল তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সর্ব্বপদার্থের মূলীভূত বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন আবিষ্কার হইবার পর ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বকবাদকেই লরেঞ্জ বিদ্যুৎ-কণিকাবাদে পরিণত করেন। এই সময় বল-বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর সহিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক সমীকরণগুলিও যুক্ত হইল। এতদুভয়ের সংযোগে হেতুবাদের নিয়ম সম্পূর্ণ হইয়া আদর্শ প্রকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইল। অবশ্য, এখন হইতে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ামূলক বলের মধ্যে শুধু মাধ্যাকর্ষণই নহে বরং কণিকার বিদ্যুৎ-পরিমাণ এবং গতি হইতে উৎপন্ন প্রতিক্রিয়াগুলিও ধরা হইতে লাগিল। এই শেষোক্ত প্রতিক্রিয়ার নিদানভূত প্রভাব তরঙ্গাকারে আলোক-গতিতে বিস্তৃত হয়। এই প্রভাব পরস্পর সংযোজন, বিলোপন এবং বলক্ষেত্র উৎপাদন করিয়া কণিকার গতিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও প্রভাবিত হয়। নিখিল-বিশ্বের সমুদয় কণিকার গতিই এই ভাবে পরস্পর সংবদ্ধ। এই উপায়ে নিষ্ক্রান্ত প্রভাবও আলোক, অদৃশ্য-বিকিরণ, রঞ্জন-রশ্মি এবং বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমরা ভাবিতেছিলাম যে এমন কতকগুলি নিত্য-নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা আবশ্যক মত প্রয়োগ করিলেই যাবতীয় নৈসর্গিক ঘটনা, এমন কি, যাহা কিছু আমাদের কল্পনায় আসে, সে সমস্তেরই ব্যাখ্যা হইয়া যায়। কিন্তু আমরা পদার্থ-বিজ্ঞানে সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত পন্থা অনুসারে অণুপরমাণুঘটিত সমীকরণের দ্বারস্থ হইয়া জাগতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে যাই না। আমরা অনেক সময় সমগ্র ভাবে পদার্থের গুণ বা ক্রিয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। এইরূপ এক একটি গোষ্ঠীতে কোটি কোটি পদার্থ-কণা বিদ্যমান থাকে। উহাদের ক্রিয়াদি ব্যাখ্যা করিবার জন্য হয় আমরা শক্তি-সংরক্ষণের নিয়ম, না-হয় তাপ-প্রবাহ-বিজ্ঞানের আশ্রয় লই। সে যাহাই হউক, এই দুইটিকেই আমরা মূল সমীকরণের সহজ সিদ্ধান্ত বলিয়া, অথবা উপযুক্ত গড়-নির্ণয়ে প্রাপ্ত সমষ্টিগত নিয়ম বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে যদিও আমরা সম্ভাব্যতা এবং তারতম্যের কথা বলিয়া থাকি, তথাপি আমাদের বিশ্বাস অনেকটা এই ধরণের ছিল যে, যদি কোনও ক্রমে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সমুদয় তথ্য অবগত হওয়া যাইত, তাহা হইলে এই মূল সমীকরণের সাহায্যে প্রত্যেকটি পরমাণুর বিচিত্র গতি-বিভঙ্গ অবশ্যই নির্ণয় করিতে পারিতাম, এবং সর্ব্বত্রই দেখা যাইত, মূল নিয়মগুলি সম্পূর্ণ খাটিয়া যাইতেছে এবং পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সহিত হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বপন্থী পদার্থবিদ্‌গণের বিশ্বাস সংক্ষেপতঃ উল্লিখিত ভাবেই প্রকাশ করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আরও কয়েকটি বিশ্বাস ইহার সহিত জড়িত আছে। যথা, (১) পদার্থ অবিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বব্যাপী, (২) সর্ব্ব ঘটনা স্থান-কাল-সহযোগে বর্ণনীয়, এবং (৩) দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ এমন কতকগুলি নিত্য-নিয়ম আছে যাহার ফলে ভবিষ্যৎ ঘটনাচক্র এবং ভৌতিক জগতের পরিণাম চিরকালের জন্য অনিবার্য্য রূপে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

সাধারণ সমীকরণগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিলেই বোধ হয় এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যে-সব সমালোচনা হইয়াছে তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। কণিকার গতি-নির্ণায়ক সমীকরণ সমূহের প্রকৃতি ম্যাক্সওয়েল ও লরেঞ্জের বলক্ষেত্র-বিষয়ক সমীকরণগুলির গঠন-প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথমোক্ত সমীকরণাবলীর সিদ্ধান্তস্বরূপই শক্তি সংরক্ষণ গতিবল সংরক্ষণের নিয়ম প্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রভাবক্ষেত্রে অবস্থিত শক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, কণিকার জড়-পরিমাণ ও বেগ-পরিমাণই গতিবল ও শক্তি-পরিমাণ নির্দ্ধারণের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংরক্ষণ-নীতির ঐকিকতা রক্ষা করিতে হইলে প্রভাবক্ষেত্রকেই শক্তি ও গতিবল ধারণের উপযোগী বলিয়া মনে করিতে হইবে। আবার, তরঙ্গ-গতির সংশ্লিষ্ট থাকায় এই প্রভাব-ক্ষেত্রও ইহার সহিত অবশ্যই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। সুতরাং প্রভাব-ক্ষেত্র হইতে কণিকার শক্তি সঞ্চারণ অবিচ্ছেদে ঘটা চাই। সুতরাং পরিমিত পরিবর্ত্তন কেবল পরিমিত ক্ষণেতেই সম্ভব, এবং এই প্রক্রিয়া ভাবতঃ দেশকাল সহযোগে নিখুঁতরূপে বর্ণনীয় হওয়া চাই।

বিভিন্ন পরিমাণের সম্বন্ধ-নির্ণয়ই মূলতঃ পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। সুতরাং এগুলি নিখুঁত রূপে পরিমাপ্য হওয়া

চাই। আমরা সর্ব্বদাই ক্ষণ হইতে ক্ষণের এবং বিন্দু হইতে বিন্দুর 'ব্যবধান' মাপিয়া থাকি। কাজে কাজেই পরিমাপাদির একক বর্ণন যেমন আবশ্যক, ইহাদের মাপনাঙ্কের আদি-নির্দ্দেশনও ঠিক তেমনই আবশ্যক। নিউটন জড়-পরিমাণ ও কাল-বিষয়ক ধারণা তেমন গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেন নাই। কণিকা-সমূহের গতি-সম্বন্ধীয় সমীকরণ-গুলির ভিতরে এই অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তরঙ্গবাদের মূলীভূত ক্ষেত্র-সমীকরণগুলির উৎপত্তি অন্যভাবে। ন্যূনতম ক্রিয়া বা 'য়্যাক্‌শন্' নীতি আবিষ্কৃত হইবার পর উভয়বিধ সমীকরণ একই সূত্র হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে আদি-নির্দ্দেশনের বিভিন্নতা রহিয়াই গিয়াছে। ক্ষেত্র-সমীকরণগুলি অচল ইথারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর জড়-কণিকার নিয়মগুলি গ্যালিলিও প্রবর্ত্তিত জড়াশ্রিত আদি-নির্দ্দেশনকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই বিভিন্নতার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ভাবা গিয়াছিল যে অচল ইথারের ভিতর দিয়া দ্রষ্টার গতি-পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। কিন্তু মাইকেল্‌সন-মর্লির পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইহা কার্য্যতঃ অসম্ভব। ইহা হইতেই স্বনামখ্যাত আপেক্ষিক-নীতির সূত্রপাত হয়। আইনষ্টাইন কাল-পরিমাপন ব্যাপারটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'দ্রষ্টা নিরপেক্ষ কাল'-এর কল্পনা অসম্ভব; অর্থাৎ দুইটি বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘটিত ঘটনার এককালীনতা কল্পনা করা যায় না। গতি-সমীকরণ ও ক্ষেত্র-সমীকরণের জন্য একই প্রকার আদি-নির্দ্দেশন অবলম্বন করা উচিত; আর, দেশ-কালে দ্রষ্টার অবস্থিতিই সেই আদি-নির্দ্দেশনের কাজ করিবে। এ বিষয়ে এই প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকিলেও আইনষ্টাইন দেখাইলেন যে আদি-নির্দ্দেশন-নিরপেক্ষ ভাবে জাগতিক নিয়ম ব্যক্ত করা যায়। শুধু তাহাই নহে, এই কার্য্যের সহকারীরূপে গাণিতিকের ধ্রুবনীতি ও টেনসর-গণিত প্রস্তুতই রহিয়াছে। আপেক্ষিকবাদের এবম্বিধ বিপর্য্যয়কারী কল্পনা সত্ত্বেও ইহা হেতুবাদ ও নির্দ্দেশবাদের সহায়কই রহিল। আইনষ্টাইন নিজেও নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে এমন এক সমন্বয়কারী ক্ষেত্র-বাদ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা মাধ্যাকর্ষণ ও বিদ্যুৎ-চৌম্বকবাদকে একীভূত করিয়া কণিকার গতি সমীকরণগুলিকে অনাবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিবে। কিন্তু অদ্যাপি এমন কোন মতবাদ উদ্ভাবিত হয় নাই।

কোয়াণ্টামবাদের পরিণতির সহিত কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, সে-সব স্থলে মূল সমীকরণগুলি প্রয়োগ করা চলে না। অপর পক্ষে, এই সমীকরণগুলির নিত্য-প্রযোজ্যতার উপরেই নির্দ্দেশবাদে বিশ্বাস নির্ভর করিতেছে। যে-ভাবে জড় পদার্থের বিভিন্ন পরিমাপ গ্রহণ করা হয় তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পদার্থকণিকার গতির স্থানকালগত বর্ণনা করিবার জন্য যে-যে পরিমাণ জানা আবশ্যক তাহার সবগুলি নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অবস্থাবিশেষে ফোটন ও ইলেক্‌ট্রন কণীয় বা তরঙ্গীয় উভয়বিধ প্রকৃতিই প্রকাশ করে। ইহার ফলে আমাদিগকে দুইটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির সমন্বয় করিয়া একই বোধগম্য চিত্র কল্পনা করিবার মত অসম্ভব কার্য্যের সম্মুখীন হইতে হয়। এ পর্য্যন্ত ইহার একটিমাত্র সমাধান কল্পনা করা গিয়াছে; সেটি হইতেছে, আণবিক ব্যাপারের স্থান-কাল-ঘটিত বর্ণনা পরিত্যাগ করা, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে হেতুবাদ ও নির্দ্দেশবাদে বিশ্বাসেও জলাঞ্জলি দেওয়া।

এই বার তথ্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাউক। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থের ও বিকিরণ-ক্ষেত্রের সাম্যাবস্থা কি কি সর্ত্তে যুগপৎ রক্ষিত হইতে পারে, এই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া প্ল্যাঙ্ক কোয়াণ্টামবাদ আবিষ্কার করেন। স্পষ্টতঃ দেখা গেল, শক্তির আদানপ্রদান ঝলকে ঝলকে হয়। এইরূপ এক এক ঝলকের পরিমাণ নির্ভর করিত দুইটি সংখ্যার উপরে। উহাদের একটি হইতেছে h বা প্ল্যাঙ্কের অব্যয় সংখ্যা; আর একটি হইতেছে, পদার্থ-কণিকা হইতে নিঃসৃত বা তদ্দ্বারা পরিশোষিত বিকিরণের কম্পন সংখ্যা। আলোকসম্পাতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের ব্যাপারও এই প্রকার বিপর্য্যয়কর বলিয়া প্রমাণিত হইল। এই সব কারণে আইনষ্টাইন অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, বিকিরণ-ক্ষেত্র অবিচ্ছিন্ন নহে এবং ইহার মধ্যে শক্তিও তরঙ্গবাদানুযায়ী অবিচ্ছেদে বিস্তৃত না থাকিয়া বরং অসংলগ্ন ভাবে অবস্থান করে। এই কোয়াণ্টাম কিন্তু নিউটন-কথিত সুবিদিত আলোক-কণা নহে। তরঙ্গবাদের সমর্থক পরীক্ষামূলক তথ্যসম্ভার দ্বারা সে সম্ভাবনা বারিত হইতেছে। অধিকন্তু যে মূলীভূত সমীকরণ দ্বারা ফোটনের শক্তি ও গতিবলের সহিত কম্পন সংখ্যার এবং ঊর্ম্মি-দিঙ্‌মান্-এর সম্পর্ক প্রকাশিত হইতেছে সেই সমীকরণই প্রত্যক্ষভাবে আদর্শ সমতলবর্ত্তী তরঙ্গের দিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সমীকরণ দুইটি হইতেছে $E = h\nu$ এবং $P = hk$। এই মত আলোককণার পূর্ব্বপরিচিত ধারণা

হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিছু দিন পরে ব'র পদার্থ-কণার বিকিরণ-বিরহিত স্থায়ী অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া দেখাইলেন যে, ইহা দ্বারা পরমাণুর বর্ণ-বিন্যাসের খুব সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাঁহার প্রস্তাবিত পরমাণুর গঠন এতই সহজ এবং ভূরি ভূরি পরীক্ষাগত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে এই মতের উপযোগিতা এতই চমৎকার হইল যে, পরমাণুর আশ্চর্য্যরকমের স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করিতে সাধারণ কণীয় বা বিদ্যুতীয় বল-বিজ্ঞানের অনুপযোগিতা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া গেল।

এই নূতন ধারণাগুলি পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কাজে লাগান গেল। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মূলে অবচ্ছিন্ন কোয়াণ্টামের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অনেক সমস্যার সমাধান হইল। প্রয়োজন মত পরিবর্দ্ধিত করিয়া ইহা দ্বারা মৌলিক পদার্থের পর্য্যায় বিভাগ এবং অতি নিম্নতাপে পদার্থের ব্যবহার সম্বন্ধে চলনসই রকম ব্যাখ্যা মিলিল। এই সম্পর্কে একটি বিষয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য। ঠিক কোন্ প্রক্রিয়া অনুসারে পরমাণু এক সাম্যাবস্থা হইতে অন্য সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা সমস্যাই রহিয়া গেল; অর্থাৎ, কোনও প্রকার অনাবিষ্কৃত নিয়ম অনুসারেও, এই প্রক্রিয়াকে ক্রমিক পরিবর্ত্তনের নিরবচ্ছিন্ন ধারা বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভবই রহিয়া গেল। তখন স্পষ্টই ধরা পড়িল, বল-বিজ্ঞানের নিয়ম এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক নিয়ম উভয়েই আণবিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। অতএব এখন এমন সব নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে যাহা কোয়াণ্টামবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত পদার্থ-বিজ্ঞানের অমূল্য তথ্য-ভাণ্ডারকে ব্যাখ্যা করিবার উপযোগী হইবে। কিছু দিন ধরিয়া ব'র এবং তাঁহার অনুগামিগণ একপ্রকার উপমানবাদের সাহায্যে পূর্ব্বপন্থী মতের ফলাফল হইতে সাদৃশ্যমূলে আণবিক ব্যাপারের যথার্থ নিয়ম অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থলেই দেখা গেল, এইগুলি পরমাণুর অবস্থা হইতে অবস্থান্তর গ্রহণের সম্ভাব্যতার সহিত জড়িত সমষ্টিগত নিয়ম মাত্র। আইনষ্টাইন পদার্থকণা এবং বিকিরণের সাম্যাবস্থা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শক্তি-পরিশোষণ ও নিক্রমণ দ্বারা পরমাণুর বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবন সম্বন্ধে কতিপয় স্বীকৃতি অবলম্বন করেন। বহু পূর্ব্বপন্থী ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের পরিচিত পন্থা আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত করিয়া একভাবে প্ল্যাঙ্কের নিয়মের প্রমাণ দিলেন। অবশেষে হাইসেনবার্গ ইহার এক সন্তোষজনক সমাধান বাহির করিলেন। বস্তুতঃ তিনি ম্যাট্রিক্স-গণিত আবিষ্কার করিয়া সমুদয় আণবিক প্রশ্নের এক সাধারণ সমাধানে উপনীত হইলেন। ডিরাক এবং শ্রডিংগারও একই সময়ে তাঁহাদের নিজ নিজ সমাধান প্রকাশ করেন। প্রথম দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের গাণিতিক সঙ্কেতাবৃত বলিয়া বোধ হইলেও এই তিনটি মতবাদ হইতেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতে লাগিল। এজন্য এখন মনে করা হয়, এগুলি বিভিন্ন আকারে হইলেও আসলে একই সমষ্টিগত নিয়ম প্রকাশ করিতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ফোটনের সাহায্যে বিকিরণ-সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা করা যায়। ইহা দ্বারা উহার কণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, আবার পারস্পরিক বিলোপন ও সংযোজন সংক্রান্ত সুবিদিত তরঙ্গীয় প্রকৃতির প্রকাশ হয়। ডি ব্রগ্‌লি সর্ব্বপ্রথম কল্পনা করেন যে, জড়কণিকার মধ্যেও এই দ্বৈত-প্রকৃতি বিদ্যমান থাকিতে পারে। তৎ-প্রবর্ত্তিত অবস্থা-বৈশিষ্ট্যের তরঙ্গবাদ অনতিবিলম্বে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। তখন পদার্থ-কণিকার যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রশ্ন উঠিল। শ্রডিংগারের তরঙ্গ-গণিত প্রচলিত হইবার পর অনেকের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমাদের পদার্থকণা-বিষয়ক মত হয়ত আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় হেতুবাদ ও সনাতন নির্দ্দেশবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে এই আশার কোনও ভিত্তি নাই। তাঁহার তরঙ্গগুলি গাণিতিক কল্পনাব্যতীত আর কিছু নহে। উহা অবস্থা-বৈশিষ্ট্যের বহু-নির্দ্দেশন-মূলক বর্ণনা মাত্র। ফোটন যেমন প্রভাব-ক্ষেত্রের সংযোজন বা উপস্থাপন ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, ইহাও তেমনি ইলেকট্রনের স্বকীয়ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অপারগ। সমষ্টিগত তাৎপর্য্য বর্ণনই শ্রডিংগারের সমীকরণগুলির প্রকৃত অর্থ।

কোয়াণ্টামবাদীরা ঐ সব সমীকরণের এক প্রকার অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ সমীকরণগুলি এক একটি অযৌগিক পরমাণুর ব্যবহার বর্ণনা করে, অথচ বড় জোর ইহার এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর ধারণের সম্ভাবন নির্ণয় করা ছাড়া আর কিছুই হিসাব করিয়া বাহির করিবার যো নাই। একটি মাত্র পরমাণু-বিষয়ক হইলেও, এই প্রকার সমষ্টিগত নিয়মের মধ্যে দুর্ব্বোধ্য কিছুই নাই। কিন্তু নির্দ্দেশবাদীরা বলিবেন, অজ্ঞতা হইতেই সম্ভাবনের কথা উঠে। - হয় উপস্থিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে, না-হয় মৌলিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। একটি পাশার ঘুঁটি বহু বার নিক্ষেপ করিয়া, পরীক্ষা দ্বারা একটি সমষ্টিগত



দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত গিলবার্ট দ্বীপের টারাওয়া এটল দখল করিবার জন্য যুদ্ধ-রত মার্কিন নৌ-সেনা



মার্কিন গোলন্দাজ-বাহিনী কর্তৃক ভীষণ গোলা-বর্ষণের ফলে জার্ম্মানরা ইটালীর একটি শহর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে



বর্ত্তমান চীনা বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত মেজর-জেনারেল চেনল্ট ও চীনা বিমান-বাহিনী কমিশনের সভ্যগণ চীনের একটি বিমান-ঘাঁটি পরিদর্শনে রত



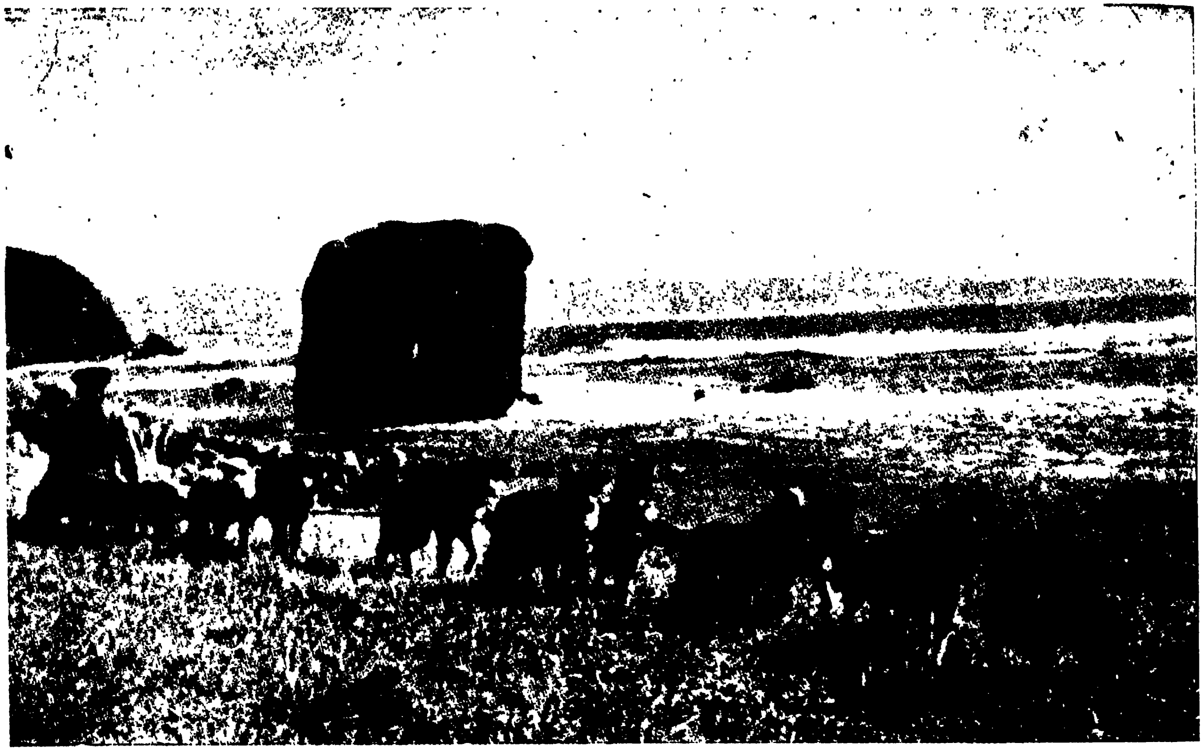
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত পূর্ব্বভারতস্থ চীনা-বাহিনী সামরিক কায়দায় দণ্ডায়মান হইয়া মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে



ব্রিটেনের পল্লী-অঞ্চলের অশ্ব-প্রদর্শনী। অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহিণীগণ পুরস্কার-প্রতিযোগিতার জন্য সমবেত



ব্রিটেনের মোটর-সাইকেল-পুলিশ রণসম্ভার-বোঝাই লরীর গতি-নিয়ন্ত্রণে রত



আলাস্কা হইতে এশিয়ার পথে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের পূর্ব্ব প্রান্তে স্থিত 'কমাণ্ডার আয়ল্যাণ্ডস' দ্বীপমালা



হিমালয়ের অধিত্যকায় খেয়া-নৌকায় সিন্ধু নদ অতিক্রমণ

নিয়ম পাওয়া যাইতে পারে, যদ্দ্বারা জানা যায়, হাজার-করা কত বার ঐ ঘুঁটিটির এক বিশেষ পৃষ্ঠ উপরমুখী হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি আমরা উহার ভারকেন্দ্রের সঠিক অবস্থান, নিক্ষেপ-সংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত, প্রারম্ভিক গতিবেগ, টেবিল ও বায়ুর প্রতিরোধক্ষমতা, এবং আর আর যে সমস্ত আনুষঙ্গিক ঘটনার দ্বারা উহা প্রভাবিত হইতে পারে, সে সমস্তই ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে পারিতাম, তবে আর দৈবের কোন আমলই থাকিত না। কারণ, তাহা হইলে আমরা অবশ্য হিসাব করিয়া বলিতে পারিতাম ঘুঁটিটা কোথায় পড়িবে এবং কি অবস্থায় থাকিবে। কিন্তু পরমাণু-সংক্রান্ত এই প্রকার মূলীভূত নির্ণয়ক নিয়ম কল্পনায়ও আনা যায় না, এই উক্তিই পূর্ব্বপন্থী পদার্থবিদের কাছে ভয়াবহ বোধ হয়।

ফন নোয়ম্যান বলিতেছেন, তিনি কোয়াণ্টাম-গণিতের সমষ্টিগত তাৎপর্য্যের বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সঠিক কার্য্যকারণ নিয়মের কোনও প্রকার গড়-নির্ণয় দ্বারা কোয়াণ্টাম গণিতের সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ অভিমত এই যে, কোয়াণ্টাম-গণিতের কোনও প্রকার হেতুমূলক ব্যাখ্যা হইতেই পারে না; কারণ তাহা হইলে কোয়াণ্টামবাদ সম্বন্ধে বর্ত্তমান ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন বা কোন কোন অংশ সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ইদানীং ব'র এই বিষয়টি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে কোয়াণ্টামবাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির ফলেও যে-কোনও সময়ে আমরা পুনরায় আণবিক ব্যাপার বর্ণনে হেতুবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, এরূপ আশা করা যায় না। হাইসেনবার্গ পরীক্ষণ-নীতির যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা অনির্দ্দেশবাদে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার গুরুত্বের দিকে ব'র দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই মতানুসারে আমরা কস্মিন্‌কালেও কোনও বস্তু-সমাবেশের গতিবল ও অবস্থানের নির্দ্দেশাঙ্ক একসঙ্গে নির্ভুলরূপে নির্ণয় করিতে পারি না। ইহাদের ভুল-পরিমাণ একটি অসমীকরণের দ্বারা পরস্পর সম্পর্কিত। ইহাদের গড়পড়তা ভুলের গুণফল সব সময় $\frac{h}{4\pi}$ অপেক্ষা অধিক হইতে বাধ্য।

এই নৈসর্গিক সীমার ফলে পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট পদার্থের ব্যবহার বর্ণনে বিশেষ পার্থক্য হয় না; কিন্তু বস্তুকণা ও ফোটন সম্বন্ধে স্থানকালগত বর্ণনা দিতে গেলেই গোলযোগ বাধে। কারণ আমরা প্রাথমিক কনিকার ব্যবহার পরীক্ষা করিতে গেলেই দেখিতে পাই, মাপফলের উপর মাপকযন্ত্রের প্রভাব রহিয়াছে। আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার কতটুকু যন্ত্র-ঘটিত এবং কতটুকু বস্তু-ঘটিত তাহাও পৃথক্ ভাবে নির্ণয় করা যায় না। কারণ, এই মাপফলকে পূর্ব্বপন্থী নিয়মে প্রচলিত অবস্থানাঙ্ক ও গতিবলের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়। অতএব পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে যে, কোয়াণ্টামের দরুন মাপ্যমাপকের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা পরীক্ষা-বহির্ভূত ভ্রান্তির মধ্যে গণ্য।

জ্ঞানগোচর সমুদয় বিষয়ই বর্ণনা করিবার সময় প্রচলিত পূর্ব্বপন্থী ধারণার আশ্রয় করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ব'র বলেন, এই নিরুপায় অবস্থার মধ্যেই আমরা বিভিন্ন পরীক্ষণে কণা ও বিকিরণের আপাত-পরিপন্থী ব্যবহারের কারণ খুঁজিয়া পাই। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা স্থান-কালের নির্দ্দেশাঙ্ক নির্ভুলভাবে মাপিবার মত করিয়া যন্ত্রপাতি সাজাই, তবে ঐ একই সংস্থানে শক্তি-গতিবলের সম্বন্ধ নির্ভুলভাবে নির্ণয় করিতে পারি না। আমরা যখন অবস্থানাঙ্ক নির্ণয়ের ব্যবস্থা-সৌকর্য্য করিয়া যন্ত্র-সংস্থান করি তখন আমাদের মাপফল কেবল কণীয় বর্ণনারই উপযোগী হইবে। আবার যদি শক্তি ও গতিবল যথাসম্ভব নির্ভুলরূপে নির্ণয় করাই লক্ষ্য হয়, তখন ঐ সংস্থানে আর নির্ভুলভাবে অবস্থানাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না; তখন কেবল তরঙ্গগতির কল্পনা-সাহায্যেই মাপফলের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের সিদ্ধান্তের এই প্রকার আপাত-বিরোধের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বলিতে হয় যে প্রত্যেক পরিমাপের এক স্বকীয় প্রকৃতি আছে। কোয়াণ্টাম-বাদ অনুসারে প্রকৃতপক্ষে মাপ্যমাপকের প্রভাব বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই কারণে সর্ব্ববিধ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান-সমষ্টি একত্র করিয়া পরীক্ষণীয় বস্তুর বিষয়ে কুত্রাপি এমন কোনও সুসঙ্গত ধারণা করিতে পারি না, যদ্দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উহার ব্যবস্থার সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মৌলিক কণিকাদি সম্বন্ধে আমরা সমষ্টিগত নিয়মের অতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারি না, এবং ভবিষ্যতে মতবাদের পরিণতি হইলেও এই সাধারণ সিদ্ধান্তের যে কোনও পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইবার অর্থই হইতেছে পূর্ব্বস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-নীতির সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান। হেতুবাদ এবং নিত্যনিয়মগুলিকে একসঙ্গে বর্জন করিতে হইবে। এই সব অভিমত এতই চিন্তা-বিপ্লবী যে, ইহার ফলে

পদার্থবিদ্‌গণের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেহ কেহ হেতুবাদকে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার একটি অপরিহার্য্য স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য করেন। আমরা বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা ইহাকে সুসঙ্গত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে একেবারে বর্জ্জন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। পদার্থবিদ্যা এখন এই মতবাদের বলবিজ্ঞান-সম্মত গাণিতিক বিবৃতির যুগ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, তাঁহাদের মতে এখন বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে কর্ত্তব্য হইতেছে ইহার অপর কোনও শ্রেষ্ঠতর বিবৃতি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা। প্রতিপক্ষীয় অপর বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, সনাতন নির্দ্দেশবাদ মানবাতীত কল্পনা মাত্র। ইহা যে কেবল এক অসম্ভব আদর্শ স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছে, তাহা নহে; ইহা মানুষকে এমন এক ভাগ্যাধীন মনোবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করিতেছে, যাহা দ্বারা সে কেবল কার্য্য-কারণের লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ প্রাণহীন নিরুপায় যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই নূতন মতবাদ পদার্থ-বিজ্ঞানে মানবীয়তার সঞ্চার করিয়াছে। নির্দ্দেশবাদের কোয়াণ্টাম ষ্ট্যাটিষ্টিকীয় ধারণা অধিকতর বাস্তবাশ্রয়ী, অর্থাৎ অপ্রাপ্তব্য আদর্শের স্থানে ইহা সহজ কল্পনীয় সত্য স্থাপন করিয়াছে। এই মতবাদ আশার সঞ্চার করিয়া কর্ম্ম-প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃতিকে বুঝিবার পথে ইহাকে এক দীর্ঘ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান মতবাদের সকল বৈশিষ্ট্যের সহিত আমরা হয়ত পরিচিত নহি, কিন্তু ব্যবহার করিতে করিতেই প্রাথমিক বিরুদ্ধভাব কাটিয়া যাইবে। নিসর্গের উপর নিজেদের যুক্তিশাস্ত্র বা দর্শন প্রক্ষেপ করা চলে না; বরং আমাদের যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শনই প্রকৃতির সহিত অধিকতর খাপ খাইতে খাইতে ক্রম-বিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য।

এই নূতন মতবাদের চমকপ্রদ সাফল্য সত্ত্বেও ইহা যে এখনও কেবল পরীক্ষার স্তরে রহিয়াছে, এ কথা অনেক সময় অকপটে স্বীকার করা হয়। প্রভাব-ক্ষেত্র-বাদ এখনও ঠিক সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছে নাই। প্রবল আশাবাদের অভাব নাই সত্য, কিন্তু বাধাগুলি ক্রমশঃ ঝরিয়া গিয়া অন্তর্হিত হইতেছে না বরং এগুলিকে চাপা দিয়া ক্রমশঃ স্তূপাকার করিয়া রাখা হইতেছে। ইহার ফলে পরিশেষে সমুদয় সিদ্ধান্ত নড়চড় হইয়া যাইবারও ভয় আছে। এই কারণে বিরাট্ বিরাট্ গাণিতিক সঙ্কেতের নিশ্চয়াত্মক ক্ষমতা অনেকটা মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। অধিকন্তু, এই মতানুযায়ী দ্বৈত-প্রকৃতি স্বীকার করিয়া লওয়াতেই কি কণিকা ও বিকিরণের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে? ইতিমধ্যেই পরমাণুকেন্দ্র সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রয়োগ করিতে গিয়া এই মতবাদের অপ্রতুলতার কথা শুনা যাইতেছে। কোয়াণ্টামবাদ প্রকাশ্যভাবেই প্রয়োজনাশ্রয়ী। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, জড়াদি বস্তুর পরিমাপ-নীতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারাই কি নিত্য সত্য মতবাদের আদর্শকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে হইবে?

ব'র সমুদয় পরিমাপ-প্রক্রিয়ার এক অনন্য-সাধারণ প্রকৃতির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা পরিমাপ-ফলকে একীভূত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু নিশ্চয়তার পরিবর্ত্তে সম্ভাবন মাত্রই পাইয়া থাকি। কিন্তু কেমন করিয়া একটি সূত্র নিশ্চিত নিয়মের পর্য্যায়ে স্থান পাইল? প্রয়োগ-ক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সত্যের বিষয়বস্তু সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে সদাগ্রাহ্য নিয়মের বিষয়বস্তু কিছুই থাকে না। তথাপি ইহা কল্পনার রাজ্যে অভাবনীয় সৌষ্ঠবের সন্ধান দিতে পারে। বর্ত্তমান কালে পদার্থ বিজ্ঞানের কল্পনারাজ্যে শৃঙ্খলা আনিতে হইলে এইরূপ একটি সম্প্রসারণের সমধিক প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।*

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত পরিভাষার তালিকা

Accurate—নির্ভুল
Absorbed—পরিশোষিত
Astronomy—নক্ষত্র-বিজ্ঞান
Causality—হেতুবাদ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধবাদ
Classical—পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত, সনাতন, পূর্ব্বপন্থী, পূর্ব্বখ্যাত
Correspondence Principle—উপমান বাদ
Continuous— অবিচ্ছিন্ন, নিরবচ্ছিন্ন
Convincing power— নিশ্চয়াত্মক ক্ষমতা
Co-ordinates— নির্দ্দেশনাঙ্ক, অবস্থানাঙ্ক
Co-ordinate axes—আদি নির্দ্দেশন
Corpuscular— কণীয়
Congress— পরিষদ
Discrete— অবিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন
Determinism—নির্দ্দেশবাদ
Dual Character—দ্বৈত-প্রকৃতি
Delicate Instrument— সূক্ষ্ম (যন্ত্র)
Electrodynamics - বিদ্যুতীয় বলবিজ্ঞান
Energy (emission of)—শক্তি (নিঃসরণ)
Equilibrium— সাম্যবস্থা, স্থিতাবস্থা
Elementary laws—মৌলিক নিয়ম, প্রাথমিক নিয়ম

---

* ইণ্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের একত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন কর্ত্তৃক অনূদিত।

Experiment— পরীক্ষণ
Electromagnetism— বিদ্যুৎ-চৌম্বকবাদ
Electron Theory— বিদ্যুৎ কণিকাবাদ, ইলেকট্রনবাদ
Field of Force— বলক্ষেত্র, প্রভাবক্ষেত্র
Frequency—কম্পন সংখ্যা
Finite— পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট
Fundamental—মূলীভূত, মূলগত, মৌলিক
Fluctuation— তারতম্য
Generalisation— সম্প্রসারণ
General—সাধারণ, নিত্য-প্রযোজ্য
Universal— সর্বগ্রাহ্য
In quanta— ঝলকে ঝলকে
Invariant Theory—ধ্রুবনীতি
Interference— বিলোপন
Indeterminacy (principle)—অনির্দ্দেশবাদ
Interaction— পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া
Momentum—গতিবল
Mass— জড় পরিমাণ
Mathematical Fiction—গাণিতিক কল্পনা
Nucleus— পরমাণু-কেন্দ্র
Photo-electricity—আলোকসম্পাতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ
Probability— সম্ভাবন, সম্ভাব্যতা
Phase—অবস্থা-বৈশিষ্ট্য
Provisional stage— পরীক্ষার স্তর
Periodic Classification— পর্য্যায়-বিভাগ
Resistance— প্রতিরোধ-ক্ষমতা
Resolving Power— বিশ্লেষণ-ক্ষমতা
Range— পরিমাপ-সীমা
Superposition—সংযোজন, উপস্থাপন
Set of Equations— সমীকরণ গুচ্ছ।
Statistical— সমষ্টিগত, ষ্ট্যাটিষ্টিকীয়
Simple— অযৌগিক
To Set (an instrument)— যন্ত্র সংস্থান করা
Theoretically—ভাবতঃ, বিচার প্রয়োগ দ্বারা, নীতিমূলে
Stability— স্থিতিশীলতা
Thermodynamics— তাপপ্রবাহ বিজ্ঞান
Universal Constant— অব্যয় সংখ্যা

কস্তুরবাঈ

শ্রীকৃষ্ণকুমার দত্ত

অন্তরের অন্তস্তল উঠিছে কাঁদিয়া
তোমারে হারা'য়ে আজি ওগো বরণীয়া!
হৃদয় তোমার ছিল স্বাধীনতাময়,
—সেই নহে জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়,
কর্ম্মে প্রেমে সাধনায় তোমার জীবন
ফুটেছিল ফুলসম হে নারী-রতন!
ত্যাগ করি' রাজৈশ্বর্য্য রাজপথ'পরে
নেমে এলে হাসিমুখে আর্ত্ত-দুঃস্থ তরে,
গরিমায়, মহিমায় সে ত্যাগ-সুরভি
বেঁচে র'বে যুগ যুগ নব জন্ম লভি'।
তোমারে হারা'য়ে কাঁদে ব্যথিত মানব
দেখেছিল যা'রা তব মূর্ত্তি অভিনব।
কী দিয়ে তর্পণ করি শোকতপ্ত মনে
যুগ যুগ ধরি' তুমি রহিবে স্মরণে!

কস্তুরবঙ্গা

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

যে-নারী আপন প্রেম নিষ্কাম রাখিয়া সংগোপনে,
মায়া-মমতায় ভরা তপঃক্লিষ্ট সর্বদেহমনে,
আত্মসুখ বিসর্জিয়া প্রাণের মাধুর্য দিয়া ঘিরে—
ভারতের নির্যাতিত নিপীড়িত নারীর মন্দিরে,
নিঃশব্দ সেবার অর্ঘ্য দ্বিধা-ভরে করি গেল দান—
প্রাসাদের প্রান্তনীড়ে আজি তার মহৎ প্রয়াণ।
আমার প্রণাম লহ, সর্ব-সহা, সর্ব দুঃখ গ্লানি
আপনি গ্রহণ করি', পরিবর্তে প্রতি গৃহখানি
উজ্জীবিত করিয়াছ কল্যাণের পরশে তোমার;
ভারত অর্পিয়াছিল যে মহান মানবের ভার
তাঁর তরে স্নেহনীড় অন্তরে বাহিরে রচিয়াছ;
আজও তুমি তাঁর বুকে সর্বকর্মে আছ বেঁচে আছ
তপস্বীর নিত্য ধ্যানে—অসামান্যা
হে কস্তুরবাঈ,
এ ধরার ধূলি ছাড়ি তুমি চলে গেছ তব
গন্ধ মরে নাই।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধের গতি কোন্ দিকে তাহা বুঝিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের বিচার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যুদ্ধরত জাতিগুলির অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ত্তমান আপেক্ষিক পরিস্থিতি, তৃতীয়তঃ, নিকট ভবিষ্যতে এই আপেক্ষিক পরিস্থিতি পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা এবং সর্ব্বশেষে যুদ্ধচালকগণের মতামত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে জগতে শান্তির সম্ভাবনা কত দূর। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিচার খোলাখুলিভাবে করা অসম্ভব, তবে মোটামুটি কিছু বলা যাইতে পারে।

অক্ষশক্তির নেতৃস্থানীয় জার্ম্মানী এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং যুদ্ধক্ষতে আচ্ছন্ন। অন্য দিকে জার্ম্মানীর চতুষ্পার্শ্বের দেশগুলি তাহার করায়ত্ত এবং তাহার ফলে জার্ম্মান জাতি এইবার গত যুদ্ধের তুলনায় কাঁচা মাল এবং খাদ্যদ্রব্য অনেক অধিক পরিমাণে পাইতেছে। জার্ম্মান জাতি এখন বিব্রত এবং পরিশ্রান্ত, কিন্তু তাহার মধ্যে জনবিক্ষোভ এখনও দেখা দেয় নাই, যুদ্ধ-চেষ্টায় বিরতিরও কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। জার্ম্মানসেনার যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ত্তমান পরিস্থিতি এখন রক্ষণমূলক সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই রক্ষণ চেষ্টায় তাহার সমরশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এরূপ বুঝিবার কোনও কারণ এখনও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। ইটালীতেও জার্ম্মানসেনা রক্ষণ কার্য্যে শক্তিপ্রয়োগে সক্ষম ইহাই বুঝা যায়। নিকট ভবিষ্যতে দ্বিতীয় যুদ্ধ-প্রান্তের যোজনা কিরূপ পরিসরের উপর হইবে তাহার উপরেই জার্ম্মানীর আত্মরক্ষা-শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ভর করিতেছে। যদি তাহা অল্প দিনের মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং প্রচণ্ড শক্তির সহিত চালিত হয় তবেই জার্ম্মানীর পতনের সম্ভাবনা নিকটে আসিবে, নহিলে তাহা এখনও দূরে আছে বুঝিতে হইবে। জার্ম্মানীর যুদ্ধচালকবর্গের কথায়-বার্ত্তায় যুদ্ধবিরতির কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, তবে বিপক্ষকে সম্মুখ সমরে বিধ্বস্ত করিয়া পরাজিত করার কথা আর শোনা যায় না।

বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট রুশ অতি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। সে দেশের শ্রেষ্ঠ নগরীগুলি মস্কো বাদে প্রায় সব কয়টিই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত, কয়েকটি তো খণ্ডস্তূপে পরিণত। রুশ জাতির সমৃদ্ধির শতকরা ৬০ ভাগ যে অঞ্চলগুলিতে ছিল সেগুলি এখন সুদূর প্রসারিত দলিত-মথিত রণক্ষেত্রের অবস্থায় আছে। যে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ও অভাব সহ্য করিয়া সোভিয়েটের জনসাধারণ এখনও অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ-চেষ্টায় ব্যস্ত তাহা বর্ণনার অতীত এবং ঐরূপ নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে সোভিয়েট রুশ নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে কেবল মাত্র সোভিয়েট গণসেনার অসীম শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় নহে, উপরন্তু রুশ দেশের সমস্ত জনসাধারণের অতুলনীয় বীরত্ব ও সহ্যশক্তি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু একথা বুঝা দরকার যে, সোভিয়েটের ক্ষতি এখনও বিষম ভাবেই হইতেছে এবং নিকট ভবিষ্যতে যদি সোভিয়েট সেনা শত্রুদলনে সম্যক্‌ভাবে সাহায্য পায় তবেই তাহার পক্ষে এইরূপে অভিযান চালনায় প্রচণ্ড ভাব বজায় রাখা সম্ভব হইবে, নহিলে তাহা রাখা ক্রমশঃই দুষ্কর হইয়া উঠিবে। সোভিয়েটের কর্ত্তৃপক্ষের কথাবার্ত্তায় যুদ্ধ-বিরতির কোনও চিহ্ন নাই।

পশ্চিমের মিত্রদ্বয়ের মধ্যে ব্রিটেন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যদিও তাহার লোকক্ষয় সেরূপ ভয়ানক কিছু হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের লোকক্ষয় বলক্ষয় বা ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় নাই। তবে এই মিত্রদ্বয় এখনও আয়োজন-পর্ব্বেই ব্যস্ত, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অন্যান্য রণাঙ্গনের তুলনায় ইহারা পূর্ণ পরিসরের যুদ্ধারম্ভই করে নাই। কেবলমাত্র আকাশপথে ইহারা বিরাট্ অনুপাতে শক্তিপ্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে এখন এই মিত্রদ্বয়েরই স্থল-যুদ্ধশক্তি সঞ্চিত আছে। বিগত বৎসরে এই মিত্রদ্বয়ের যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের ক্ষমতাও প্রায় চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। সৈন্যবল গঠনেও ব্রিটেন তাহার কার্য্যক্রম প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রের এখনও কিছুটা পথ বাকী আছে। নিকট ভবিষ্যতে এই সঞ্চিত শক্তি কি ভাবে এবং কতটা প্রযুক্ত হয় তাহার উপরই গণতন্ত্রবাদী জাতিগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। মিত্রদ্বয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে-সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও যুদ্ধবিরতির কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই।

ইটালী এক হিসাবে যুদ্ধের বাহিরে গিয়াছে, তবে ইউরোপের যুদ্ধ যদি বেশী দিন চলে এবং ইটালীর ভূমিখণ্ড যদি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মিত্রপক্ষের করায়ত্ত না হয় তবে এই পরিস্থিতির আংশিক পরিবর্ত্তন নিতান্ত অসম্ভব নহে।

ইউরোপের অন্য অক্ষশক্তির অংশীদারগুলি জার্ম্মানীরই মত—এমন কি কেহ কেহ তাহা অপেক্ষা অধিক ভাবে ক্ষতি-

গ্রস্ত হইয়া আছে। তবে এক ফিনল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোথায়ও যুদ্ধের অবসাদজনিত উক্তির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এসিয়ায় স্বাধীন চীন এখনও পূর্ব্ববৎ অবরোধক্লিষ্ট। এখন সেখানকার জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প। নিকট ভবিষ্যতে চীন এই মহাযুদ্ধে কোনও বিরাট্ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে এরূপ কোনও নির্দ্দেশ আমরা পাই নাই। স্বাধীন চীনের মধ্যেও যুদ্ধ-বিরতির কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।

সর্ব্বশেষে জাপান। অক্ষশক্তির পূর্বাঞ্চলের এই অংশীদার এখনও পূর্ব্ববৎই দুর্দ্ধর্ষ আছে বলিয়া মনে হয়। জাপান এখন ক্রমাগত বলবৃদ্ধির চেষ্টাতেই ব্যস্ত এবং সেই সঙ্গে বিজিত দেশগুলির রক্ষার ব্যবস্থাও দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার লোকক্ষয় ও বলক্ষয় বিগত দুই বৎসরে সেরূপ বিষম কিছুই হয় নাই, তাহার পূর্ব্বেও যাহা হইয়াছিল তাহাও নিদারুণ হয় নাই। অন্য দিকে যদিও তাহার সম্পত্তি ও সঙ্গতির অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে—এখন কাঁচামালের হিসাবে জাপানের অবস্থা অনেক বিষয়ে মিত্রপক্ষ অপেক্ষাও ভাল—তাহার যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থার উন্নতি সেই পরিমাপে বিশেষ কিছু হয় নাই মনে হয়। তবে জাপানের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা কোন দিনই বাহিরের কেহ সঠিক জানিতে পারে নাই। একথা বোধ হয় বলা চলে যে নিকট ভবিষ্যতে সে কোনও নূতন ব্যাপক অভিযান গঠন করিতে সমর্থ হইবে ইহা মনে হয় না। অন্য দিকে সে যে নিকট ভবিষ্যতে কোনও প্রচণ্ড আঘাত পাইবে তাহাও মনে হয় না। জাপানের নেতৃবর্গের কথায় বার্ত্তায় যুদ্ধক্লান্তির কোনও ইঙ্গিত নাই।

১৯৪১ সালের তুলনায় ইউরোপে অক্ষশক্তির ক্ষমতা বিশেষভাবে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাও সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষম, অতিশয় নিপুণ ও রণকুশলী রণাধ্যক্ষ চালিত এবং আত্মরক্ষায় সতেজ প্রচণ্ড যুদ্ধদানের প্রবৃত্তিযুক্ত। এই শক্তির অর্দ্ধেকের বিরুদ্ধে সমগ্র রুশ শক্তি নিযুক্ত আছে। কিন্তু সোভিয়েটের ক্ষতি এতই ভয়ানক হইয়াছে যে তাহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও সে এখনও অক্ষশক্তির রক্ষা-ব্যূহ ছিন্ন করিয়া রক্ষী সেনাদলগুলিকে সম্পূর্ণ কাবু করিয়া আনিতে পারে নাই। অন্য অর্দ্ধেকের বিরুদ্ধে পশ্চিমের মিত্রদ্বয়ের যুক্তশক্তি শীঘ্রই চালিত হইবে শুনা যাইতেছে। এই যুক্ত শক্তি সংখ্যায় এবং অস্ত্রবলে সমস্ত ইউরোপীয় অক্ষশক্তি অপেক্ষা অনেক গরিষ্ঠ, তবে রক্ষীদল দুর্গমালার পিছন হইতে লড়িবে এবং তাহাদের চালকবর্গ অভিজ্ঞ ও রণকুশলী। অন্য দিকে এসিয়ায় জাপানের প্রকৃত অবস্থা অজ্ঞাত, শুধু এইমাত্র জানা আছে যে, তাহাদের যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা ১৯৪১ সালের তুলনায় বহু উপরে উঠিয়াছে। অর্থাৎ যদি কার্য্য চালনার এবং বিধি ব্যবস্থা করার ক্ষমতায় জাপান ব্রিটেনের সমকক্ষ হয় তবে আর দুই বৎসরের মধ্যেই তাহার যুদ্ধশক্তি অতিশয় প্রবল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। উপরন্তু জাপান প্রবল নৌশক্তিযুক্ত, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে অভিযান চালনায় নৌবলেরও বিশেষ প্রয়োজন হইবে। ইউরোপের যুদ্ধের অবসানের পর কতদিনে মিত্র পক্ষের শক্তির কতটা জাপানের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে তাহার উপর এই মহাযুদ্ধের সময়ের সীমা নির্ভর করিতেছে। আকাশের ক্ষেত্রে জাপানের ক্ষমতা হঠাৎ কিছু বাড়িয়া যাওয়া সম্ভব মনে হয় না, তবে এখনকার তুলনায় ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি তাহা অনেক প্রবল হইবে মনে হয়, কেননা এখন উভয় পক্ষেরই আকাশযুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ক্রমেই গণ্ডীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং পরস্পরের বৈষম্য ক্রমেই সংখ্যার উপর এবং এরোপ্লেন-চালকের কৌশলের উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সকল কথা বিচার করিয়া এবং সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধ-পরিস্থিতি দৃষ্টে এইরূপ মনে হয় যে ইউরোপের যুদ্ধ বর্ত্তমান বৎসরে শেষ না হইলে মিত্রপক্ষের সম্মুখে সুদীর্ঘকালব্যাপী ক্ষয়যুদ্ধযাত্রার প্রশ্ন আসিতেও পারে।

* * *

রুশ-রণাঙ্গনে সোভিয়েট যুদ্ধচালকবর্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মানদলকে বিশ্রাম বা পুনর্গঠনের অবকাশ না দেওয়া এবং তাহাতে তাহারা সফলকাম হইয়াছে। এখন ঐ রণপ্রান্তে তুষার গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং সেখান-কার যুদ্ধে আক্রমণকারীর প্রত্যেকটি চাল অত্যন্ত আয়াসসাধ্য এবং ক্ষতিসাপেক্ষ। তবে দ্বিতীয় প্রান্ত যোজনার সময় এখন শিয়রে আসিয়া উপস্থিত, যখন জার্ম্মানদলের নিকট এক মুহূর্ত্তের অবকাশও মহামূল্য এবং সেইজন্যই রুশসেনা এখন সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া শত্রুপক্ষকে প্রবল আক্রমণে জর্জ্জরিত করিতে থাকিবেই। দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ম্মানব্যূহ এখন যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সোভিয়েট সেনার সকল আক্রমণই জার্ম্মানব্যূহের মূল খুঁটিগুলির উপর গিয়া পড়িতেছে। এখন যদি এখানকার জার্ম্মান রক্ষণ দুর্গমালা ভাঙ্গিয়া যায় তবে দ্বিতীয় প্রান্তের যোজনার মুখে জার্ম্মানীর উচ্চতম সমরপরিষদ উভয়সঙ্কটে পড়িবে। অন্য দিকে যদি ব্যূহ টিঁকিয়া যায়, তবে জার্ম্মানীর পক্ষে কিছু অল্পকালের জন্য অবকাশ পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে-শক্তি এখন ঐ অঞ্চলে সোভিয়েট কর্ত্তৃক যোজিত হইতেছে তাহা দীর্ঘকালের জন্য প্রয়োগ করা সোভিয়েটের পক্ষে সম্ভব কি না সন্দেহ।

আরাকানের ও ইটালীর অভিযান এখনও আটকাইয়াই রহিয়াছে। ঐ দুই অঞ্চলেই মিত্রপক্ষের পরিস্থিতি জটিল, তবে ইটালীতে অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে।

'এবার ফিরাও মোরে'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

যে-মানুষ নিখিলের সঙ্গে আপনার ঐক্যকে সমস্ত মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছে—নিখিলের হাহাকার তার চিত্তকে বিচলিত ক'রে তুলবে। আর মানুষের দুঃখে চিত্ত যার বিচলিত হয়ে উঠেছে সে কখনো বাস্তবের দাবীকে উপেক্ষা ক'রে কল্পনা নিয়ে ডুবে থাকতে পারে না। রোম যখন পোড়ে তখন বাঁশী বাজাতে পারে নীরোর মত হৃদয়হীন মানুষ। হৃদয় যার আছে সে কখনো জলন্ত ঘরের সম্মুখে বাঁশী বাজানোর আনন্দে ডুবে থাকতে পারে না। তাকে বাঁশী নামিয়ে রেখে বাল্তি হাতে কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপ দিতে হয়। চারিদিকের সহস্র সহস্র মানুষের সঙ্গে ঐক্যের উপলব্ধি কবির অন্তরে যখন অত্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে উঠল—তখন পদ্মার চরে চরে চখা-চখীর কাকলি-কল্লোলের মধ্যে স্বপ্ন নিয়ে ডুবে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। জীবন তূর্য্য বাজিয়ে তাঁকে ডাক দিল কর্ম্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল :

> কী গাহিবে, কী শুনাবে, বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
> মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
> বৃহৎ জগৎ হোতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
> মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
> নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

এত দিন কবির কারবার চলেছিল ফুল নিয়ে আর তারা নিয়ে, নদী নিয়ে আর আকাশ নিয়ে। নিপীড়িত মানুষের জগৎ ছিল দূরে। বাঁশী বাজিয়ে তাঁর স্বপ্ন-ভরা দিনগুলি তখন স্রোতের ফুলের মতই ভেসে চলেছিল—'এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলা দেশের একটি নিভৃত কোণে।' ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় কবির সেই অজ্ঞাতবাসের অভিজ্ঞতার অপরূপ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কখনো চলেছে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কবিতা পড়া, কখনো সময়কে অধিকার করেছেন কালিদাস। দুপুর বেলা কাটে গল্প রচনার মধ্যে। লিখছেন, 'আমার এই সাজাদপুরের দুপুর-বেলা গল্পের দুপুর বেলা।' দিগন্তব্যাপী বালির চর ধূ ধূ করছে—পাশ দিয়ে চলেছে পদ্মা। সেই জনহীন চরে কবির সান্ধ্য ভ্রমনের একমাত্র সাক্ষী শুক্ল সন্ধ্যার চাঁদ। বেড়াতে বেড়াতে কেবল জ্যোৎস্নার একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল মণ্ডিত হয়ে যায়। বেড়ানো শেষ হ'লে নদীর মাঝখানে জালি-বোটে শুয়ে চুপচাপ সময় কাটে। সেই সময়কার কথা লিখতে গিয়ে কবির লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে :

> চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হ'য়ে ওঠে। আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনো জন্ম গ্রহণ করবো। আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যা বেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলা দেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জালিবোটের উপরে বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব।

সেদিনের জীবন নদীতে নদীতে জল-বেড়ানোর আনন্দ-ময় জীবন। "দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি সারি গ্রাম" কবির চোখে বারবারই ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে সঙ্গ দিচ্ছে—নির্জ্জনের প্রিয়বন্ধু Amiel's Journal. সেই নিঃসঙ্গ জীবনের একটি দিন সম্পর্কে 'ছিন্নপত্রে' লেখা রয়েছে :

> আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটি মাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর সকলে ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে—সেখানে বৃটিশ গবর্মেণ্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ঠিক এই রকমের কথাই লেখা আছে :

> "সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহু কাল করিয়াছি বাস
> সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ;"

সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে এই নির্জ্জনবাস যে কত আনন্দের ছিল সে কথা 'ছিন্নপত্রে' লেখা আছে। সেখানে আছে :

> আমি প্রায়ই এক এক সময়ে ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি ক'রে দিন আসছে, কোনটি সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে রাঙা, কোনটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ শীতল, কোনটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য। এবং এরা কি কম মূল্যবান্।

দিন যায়—মাস যায়—বৎসর যায়। তার পর এল ভিতর থেকে একটা নূতন পথে চলবার প্রবল তাগিদ। এই নূতন পথ হ'ল নিষ্কাম সেবার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার পথ। চখা-চখীর কাকলি-কল্লোল ডুবে গেল নিখিলের হাহাকারের মধ্যে। স্বদেশের সহস্র সহস্র চলন্ত নরকঙ্কালের মধ্যে ছড়িয়ে গেল কবির চেতনা। তিনি দেখলেন কর্ম্মের জগৎ থেকে আপনাকে দূরে রেখে ধ্যানের মধ্যে নির্জ্জনে অনন্তকে উপলব্ধি করবার যে আনন্দ—সেই আনন্দের মধ্যে নেই আগেকার সেই তীব্রতা। উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন—কিন্তু সে মন্ত্র আগেকার মত আর প্রেরণা দেয় না। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত

হবার জন্য একটা ব্যাকুলতা আপনার মধ্যে তিনি অনুভব করলেন।

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে—
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারবো কবে?
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরবো ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারবো কবে?

অথবা

যখন আমি পাবো তোমার
নিখিল মাঝে
সেইক্ষণে হৃদয়ে পাবো
হৃদয়-রাজে।
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল,
তারি পরে বিশ্ব কমল,
তারি পরে পূর্ণ প্রকাশ—
দেখাও মোরে।

এই সব কবিতার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মিলনের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরিনে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াইনে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তি-বিহীন কাজে
প্রাণ-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে।

নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি—সকলের সঙ্গে প্রেমে মিলতে পারছি নে—'গীতাঞ্জলি'র বহু কবিতায় এই রকমের একটা সুতীব্র বেদনার বারম্বার প্রকাশ।

একা আমি ফিরবো না আর
এমন ক'রে—
নিজের মনে কোণে কোণে
মোহের ঘোরে।
তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে
ছোটো ক'রে ঘিরতে গিয়ে
আপনাকে যে বাঁধি কেবল
আপন ডোরে।

এখানে একই বেদনার অভিব্যক্তি। কর্ম্মের জগতে যেখানে

ভালো-মন্দ ওঠাপড়ায়
বিশ্বশালার ভাঙা গড়ায়

বিশ্বেশ্বরের খেলা চলেছে সেখানে তিনি যে কোনো অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না—এই বেদনা তাঁর মনকে অস্থির ক'রে তুলেছে। তাই তো তাঁর ব্যথাতুর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে কাজের জগতে সকলের সঙ্গে মিলবার জন্য একটি কান্নার সুর।

ভেবেছিলাম বিজন ছায়ায়
নাই যেখানে আনাগোনা
সন্ধ্যা বেলায় তোমায় আমায়
সেথায় হবে জানাশোনা।
অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচা কেনা।

বনে নয়, বিজনে নয়, আমার আপন মনেও নয়—যেখানে বিশ্বজনের পায়ের তলার ভূমি ধূলিময় হ'য়ে আছে সেইখানেই তো স্বর্গভূমি আর সেই স্বর্গভূমিতে কাজের দিনে সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে বিধাতার যে পরিচয় আমরা লাভ করি—সেই হ'ল তাঁর সত্যিকারের পরিচয়।

বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছো তুমি—
সেই তো আমার তুমি।

বৃহৎ মানব-সমাজ থেকে দূরে বিজনে আপনার মনের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করবার যে নিষ্ফল প্রয়াস—এই নিষ্ফলতার অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন তাঁর *Religion of Man* নামক গ্রন্থে। সেখানে আছে:

I am sure it was this idea of the divine Humanity unconsciously working in my mind, which compelled me to come out of the seclusion of my literary career and take my part in the world of practical activities. The solitary enjoyment of the infinite in meditation no longer satisfied me, and the texts which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it. I am sure I vaguely felt that my need was spiritual self-realisation in the life of Man through some disinterested service. (Pp. 165-66).

অর্থাৎ—

"মানুষের ভিতর দিয়েই যে ভগবানের প্রকাশ—এই সত্যের উপলব্ধি আমার মনের অবচেতন প্রদেশে দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। মানুষের মধ্যেই ভগবান—এই ধারণা অবশেষে আমাকে বাধ্য করলো আমার সাহিত্য-জীবনের নির্জ্জনতা থেকে বেরিয়ে এসে কর্ম্মজগতে আমার কাজের অংশ গ্রহণ করতে। অনন্তকে শুধু নিজের মধ্যে ধ্যান ক'রে আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না; যে-সব মন্ত্র আমার নীরব উপাসনার অঙ্গ ছিল, আমার অজ্ঞাতসারে তারাও আমাকে প্রেরণা দেবার শক্তি কখন্ হারিয়ে ফেল্‌লে। আমি ভিতরে ভিতরে

বুঝতে পারলাম, আমার আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন নিষ্কাম সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।"

মানুষের মধ্যেই যে ভগবান এবং দেবতাকে দেখবার চোখ যার অন্ধ হ'য়ে যায় নি সে যে মানুষের সেবাকেই ভগবানের সেবা ব'লে গ্রহণ করবে—এই সত্যের উপলব্ধিই চতুরঙ্গের জ্যাঠামশায়ের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। জ্যাঠামশাই ভাই হরিমোহনকে বলছেন,

ব্রাহ্মেরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মানো, তাহাকে কাণে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি তাহাকে চোখে দেখা যায়, কাণে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

"আমার এই চামার মুসলমান দেবতা।" এই কথা বলে জ্যাঠামশাই বিশ্বে যারা বঞ্চিত এবং নিপীড়িত তাদের পায়ে আপনার মস্তককে লুটিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে বাদ দিয়ে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না—এই উপলব্ধি যখন রবীন্দ্রনাথের চিত্তে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তখনই কল্প-জগৎ থেকে মানুষের জগতে ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুলতা জেগেছে তাঁর মনে। তখনই তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে :

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর। ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে।"

তখনই মানুষের সেবা ক'রে আপনার জীবনকে সফল করবার জন্য তাঁর বাঁশিতে বেজে উঠেছে :

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা..."

শিলাইদহের কল্পজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে বোলপুরের অবারিত প্রান্তরে প্রচণ্ড কর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার পিছনে রয়েছে সেবার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার এই পিপাসা। মানুষকে সেবা করবার এই যে প্রয়োজন তিনি বোধ ক'রেছিলেন আত্মোপলব্ধির জন্য—এই প্রয়োজন-বোধ থেকেই শান্তিনিকেতনের এবং শ্রীনিকেতনের জন্ম। কবির জীবনধারার এই যে বিরাট্‌ পরিবর্তন—অভিনব পথে কর্মবাদের জয়ধ্বজা উড়িয়ে এই যে জয়যাত্রা—এও এক রকমের জন্মান্তর আর এই জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা কবিকে দিয়েছে একটা প্রচণ্ড-মনোহর আনন্দের আস্বাদন। পুরাতনের সঙ্গে এই বিচ্ছেদকে কবি সানন্দে বরণ করেছেন। নূতন পথে চলার এই অনুভূতিকে তিনি ভাষা দিতে গিয়ে 'নৈবেদ্যে'র একটি কবিতায় লিখেছেন :

প্রকৃতির বুকে—
লালন-লালিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে, প্রভাতশর্ব্বরী সন্ধ্যাবধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু—
পুষ্পগন্ধে মাখা।
আজি সেই ভাবাবেশ,
সেই বিহ্বলতা—যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছো মোরে—দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল।

আর একটি কবিতায় রয়েছে :

কর মো'রে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়! পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

ভাবের ললিত ক্রোড় থেকে কর্ম্মক্ষেত্রের কঠিনতার মধ্যে জন্মান্তর গ্রহণ করবার জন্য কবির এই যে ব্যাকুলতা—এ ব্যাকুলতা কেন? কারণ কর্ম্মের দায়কে স্বীকার ক'রে আমরা সমাজের সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত করি। আর দশ জনের পরিশ্রমে উৎপন্ন সামাজিক সম্পদের উপরে ভাগ বসাব কিন্তু সমাজকে দেবার বেলায় কড়ে আঙুলটিও নড়াব না—এমন অলস মানুষকে শাস্ত্রে তস্করের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সমাজের সম্পদ সৃষ্টির কার্য্যে সবাই যদি অংশ গ্রহণ করে তবেই সমাজের সবাইকে দারিদ্র্যের দুঃখ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। এই জন্যই বলা হয়েছে—কাজ না করার চেয়ে কাজ করা ভাল। কাজ না করার মধ্যে রয়েছে বর্ব্বর-সুলভ স্বার্থপরতা, সামাজিক দায়িত্ব-বোধের অভাব। মানুষের আত্মপ্রকাশের পথ সেখানেই প্রশস্ত হয়েছে যেখানে মানুষ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে। মানুষ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে সেখানেই মুক্তি পেয়েছে যেখানে সম্পদ সৃষ্টির কাজে সব মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছে। বর্ব্বরতার স্তরে যারা রয়েছে তাদের আত্ম-প্রকাশের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে রয়েছে তাদের মারাত্মক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা। এই দিক থেকে চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ *Religion Of Man*-এ লিখেছেন :

"The history of the growth of freedom is the history of perfection of human relationship."

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যতই পূর্ণতা লাভ করছে—ততই সে আপনাকে মুক্ত করতে পেরেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে পূর্ণতা লাভ করতে দিচ্ছে না যে সকল কারণ—তার অন্যতম হচ্ছে নিজের আত্মাকে বাঁচাবার উদগ্র কামনা। চারি দিকের সহস্র সহস্র মানুষ খেতে পরতে পাক আর না পাক—সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে আমার আত্মার মুক্তি। এই যে আত্মাকে বাঁচাবার জন্য বৈরাগীর ঐকান্তিক প্রযত্ন এটা হচ্ছে টাকার থলিকে বাঁচাবার জন্য কোন কোন সম্প্রদায়ের অতন্দ্র চেষ্টার মতই স্বার্থপরতায় কলুষিত। এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার লিখেছেন:

And so too the whole modern period of commercial civilisation and Christianity has been fatal to love; for both these great movements have concentrated the thoughts of men on their individual salvation—Christianity on the salvation of their souls, and commercialism on the salvation of their money bags.

"এমনি ক'রে বৈশ্য সভ্যতার এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের দ্বারা শাসিত সমস্ত আধুনিক যুগটা প্রেমধর্ম্মের বিকাশের পথে মারাত্মক হয়েছে। এই দুটো বিরাট আন্দোলনই মানুষের সমস্ত চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করেছে তার ব্যক্তিগত মুক্তির লক্ষ্যের পানে; খ্রীষ্টান ধর্ম্ম জাগিয়েছে আত্মাকে বাঁচাবার কামনা আর বৈশ্য ধর্ম্ম জাগিয়েছে টাকার থলিকে বাঁচাবার কামনা।"

অর্থাৎ, ধর্ম্মসাধনার নামে এই যে কর্ম্মযজ্ঞে সকলের সঙ্গে মিলনের আদর্শকে অস্বীকার ক'রে নিজের কল্যাণ চিন্তার মধ্যে একান্তভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকার অনুদারতা—এই অনুদারতার বিরুদ্ধে কার্পেণ্টারের মত রবীন্দ্রনাথেরও অভিযান।—

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধিতে।

এই বাণী যে একদা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল—তার মূলে ছিল—মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয় ভালবাসা। সকলের সঙ্গে এই ঐক্যের সুগভীর অনুভূতিই তাঁর হস্তে তুলে দিয়েছে কর্ম্মবাদের জয়ধ্বজা।

এই অনুভূতি থেকেই বেরিয়ে এসেছে:

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে—
দেবতা নাই ঘরে।

পুস্তক-পরিচয়

যুদ্ধের দক্ষিণা—শ্রীঅনাথগোপাল সেন। মডার্ন বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার। পৃষ্ঠা ৮০+১১০। মূল্য দেড় টাকা।

বর্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ ভারতের ইচ্ছাকৃত না হইলেও ভারতবাসীকে ইহার গুরুভার বহন করিতে হইতেছে ও হইবে। আর্থিক সামর্থ্যে দুর্বল জাতির পক্ষে এ বোঝা কিরূপ মারাত্মক ইতিমধ্যেই তাহা নানা প্রকারে দেখা যাইতেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই অত্যধিক দুর্মূল্যতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের অস্বাভাবিক পার্থক্য ও তজ্জনিত অনটন এবং এক কথায় মুদ্রাস্ফীতির বিষময় ফল দেখা দিয়াছে। সর্বসাধারণ যুদ্ধটাকে একটা বহু লোকের ও জাতির মধ্যে অস্ত্রের লড়াই রূপে দেখিয়া থাকে, কিন্তু বিষয়টা আরও অনেক গুরুতর, ইহার আর্থিক দিক আরও অনেক ব্যাপক ও বহুদূরপ্রসারী অনর্থের কারণ—লেখক তাঁহার অনন্যকরণীয় নিজস্ব ভাষায় তাহাই বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এইরূপ জটিল বিষয়ের সরল আলোচনায় গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত এবং বর্তমান গ্রন্থে ইনফ্লেসন না স্বর্ণমৃগ, ষ্টার্লিঙের প্রেমালিঙ্গন, পরাধীন জাতির রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ল্যাণ্ড-লিজ রসায়ন, গত যুদ্ধের হিসাব-নিকাশ ও জার্মান মার্কের মহাপ্রস্থান প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া যে-কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কারণ বুঝিতে পারিবেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার একটি সুন্দর ভূমিকায় বিষয়ের অবতারণা করিয়া পুস্তকের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সানফ্রান্সিস্কোর যাত্রী—ইভান বুনিন। অনুবাদক শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য। মূল্য আড়াই টাকা।

ইভান বুনিন বিখ্যাত রুশ লেখক, ১৯৩৩ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। বইখানিতে তাঁহার কয়েকটি নামকরা গল্পের অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা—সানফ্রান্সিস্কোর যাত্রী, ভ্রাতৃকুল, চ্যাং-এর স্বপ্ন, সর্দিগর্মি, গৌতমী, মৃত্যু।

বুনিনের লেখার মধ্যে বাঙালী পাঠকের মনকে যা সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করিবে বলিয়া মনে হয় তা এর আধ্যাত্মিক সুর—যা নিতান্তই প্রাচ্য এবং যা একটি শ্রান্ত বিষাদের মধ্যে দিয়া চরম মাধুর্যে ফুটিয়া উঠে। এই জন্য তাঁহার বহু গল্প গল্প হইয়াও—অর্থাৎ আর্টের দিক দিয়া সার্থক সৃষ্টি হইয়াও পারমার্থিক নিবন্ধের সমগোত্র। এই দিক দিয়া বুনিনের লেখা সম্পূর্ণই অভিনব। অন্ততঃ ইউরোপীয় সাহিত্যে এরূপ রসসৃষ্টি সুলভ নয়।

বইয়ের অনুবাদ পশুপতিবাবুর মতো উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়ায় বইখানি আরও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষা এমন স্বচ্ছ এবং সাবলীল যে অনুবাদ পড়িতেছি বলিয়া কোথাও মনে হয় না। একে মূল রচনায় সুরই প্রাচ্য-ঘেঁষা, তার উপর ভাষার এই স্বচ্ছন্দতা—বইখানিতে যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে। ইউরোপীয় পুস্তকের বাংলা অনুবাদ বাঙালী সহজে পড়িতে চায় না; কতকটা ঔদাসীন্য আছে; কতকটা অত্যধিক ইংরেজী-প্রীতি, আর কতকটা বোধ হয়, আতঙ্কও—সচরাচর অনুবাদের যা অবস্থা দাঁড়ায় সে কথা ভাবিয়া। বইখানি অনুবাদ-সাহিত্যে সে আতঙ্কভাব ঘুচাইয়া শ্রদ্ধা জাগাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গীতা সারসংগ্রহ—সম্পাদক—স্বামী প্রেমেশানন্দ। আসাম-বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য আট আনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক শত শ্লোক বাছিয়া এই পুস্তিকায় দশ অধ্যায়ে সাজান হইয়াছে। গীতাসারসংগ্রহ-প্রবেশিকা নামক প্রকরণে প্রতি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ, টিপ্পনী, অন্বয়, প্রত্যেক শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ ও পদগুলির ব্যাকরণানুযায়ী বিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের পক্ষে পুস্তিকাখানির উপযোগিতা অবিসংবাদিত। সমগ্র গীতা অধ্যয়ন করিবার সুযোগ যাঁহাদের নাই তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন—সমগ্র গ্রন্থের মর্মগ্রহণে সুবিধা পাইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দীপশিখা—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স; বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার আনা।

বাংলার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা নাটিকা। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলা লেখকের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য, শিল্পকে আচ্ছন্ন করেছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার "লোকশিক্ষায় গণনাট্যের স্থান" সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন; তাতে জানবার এবং ভাববার কথা আছে।

ভাবধারা—শ্রীআশুতোষ ঘোষ। ৪ বি, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। পৃঃ ৩৩+৪। মূল্য আট আনা।

লেখক অরবিন্দ-রবীন্দ্রের নাম লইয়া 'আরম্ভ' করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত অল্প লিখিয়াছেন যে কোনও আলোচনাই হয় নাই, ভাবধারার কোনও ছবি ফুটে নাই। ভারতের ভাবধারার কথা বলিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ

অরবিন্দ অভেদানন্দের নাম অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু বিষয়নির্ব্বাচনই রচনার একমাত্র করণীয় বস্তু নহে। পুস্তিকাখানি ভাবনার চিহ্নবর্জ্জিত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভুলি নাই—শ্রীমনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

অগ্নিযুগের নেতা কুন্তল-দাকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি সর্ব্বত্যাগী নর-নারীর চিত্র লেখক নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এগুলি প্রকাশিত হইবার সময়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলিতে গল্পের রস নিবিড় এবং কৌতূহল জাগ্রত রহিয়াছে। ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলিয়া মানিয়া লইতে অনেকে দ্বিধা বোধ করিতে পারেন কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনীগুলিতে যে অবিচ্ছিন্ন ও অবিকৃত মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে—তাহাকে অন্য আখ্যা দেওয়াও কঠিন। বলিষ্ঠ ভাষা ও সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে দরদ মিশাইয়া লেখক অগ্নিযুগের পটভূমিকায় বিভিন্ন নর-নারীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। প্রাণ-সম্পদে ও যুগ-গৌরবে অগ্নির মতই উজ্জ্বল বলিয়া ইঁহাদের ভুলা কঠিন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নায়ক ও লেখক—শ্রীনবেন্দুভূষণ ঘোষ। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি পাবলিকেসন্স, পাটনা। ১৯৪৩। পৃষ্ঠা ১৩৬। মূল্য দেড় টাকা।

নূতন ধরণের উপন্যাস। লেখকের কাল্পনিক জীবনের ভূমিকায় কাল্পনিক নায়কের সৃষ্টি। লেখক ব্যর্থপ্রেমিক, অত্যন্ত একঘেয়ে ধরণের, নায়ক মানসিক দুর্ব্বলতা-বর্জ্জিত আদর্শবাদী সংস্কারক, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রেমেও পড়েন এবং জাতিভেদের উচ্ছেদকল্পে এক বৃদ্ধ অসহায় ব্রাহ্মণকে অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন মাঠের মধ্যে ডাকিয়া নিয়া হত্যা করেন। হতাশায় লেখকের মৃত্যু এবং নায়কের বীভৎস হত্যাকাণ্ড কোনটাই ট্র্যাজেডির পর্য্যায়ে পড়ে না, সাহিত্যের দিক হইতে দুইটাই ব্যর্থ। লেখকের ক্ষমতা এবং দুঃসাহস আছে, কিন্তু রসসৃষ্টি আর সমাজ-সংস্কার এই দুই বস্তুকে আলাদা করিয়া দেখিতে লেখককে অনুরোধ করি।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

মোহাম্মদীবেগ—এ. এইচ. এম্. বসিরউদ্দিন। প্রাপ্তিস্থান—প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৭২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

সিরাজউদ্দৌলার জীবন পটভূমিকা করিয়া নাটকখানি রচিত। গ্রন্থমধ্যে নারীচরিত্র সন্নিবেশিত হয় নাই, সিরাজ-চরিত্র উন্নত করিয়া দেখাইবার প্রচেষ্টা আছে। জাফরগঞ্জের রাজপ্রাসাদের নিম্নতল কারাকক্ষে সিরাজের স্বগতোক্তি এবং মোহাম্মদীবেগের তরবারির আঘাতে তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তির দৃশ্যটি মন্দ লাগিল না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু তাঁহার নাট্য-রচনায় শক্তি এখনও পরিপক্কতা লাভ করে নাই।

পরলোকাঞ্জলি—শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ। ১৪নং পুলিশ হস্পিটাল রোড হইতে গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯৮ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে চুয়ান্নটি কবিতা আছে। স্থানে স্থানে ছন্দ ও মিলের ত্রুটি রহিয়াছে। শব্দ চয়নে ঔদাসীন্যও দেখা গেল। সমগ্র গ্রন্থের ভিতর দিয়া করুণ রসের পরিবেশন করা হইয়াছে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য



খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—কবি তার্কিকচূড়ামণি শ্রীহর্ষ প্রণীত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক গ্রন্থ ও শ্রীশঙ্করচৈতন্য ভারতী কৃত তাহার শারদা টীকা, এবং দর্শনসর্ব্বস্ব নামক ভূমিকা-সম্বলিত। দুই ভাগ, ১ম ভাগ ৩০০শত পৃষ্ঠা, ২য় ভাগ ৬৪৯ পৃষ্ঠা, রয়াল ৮ পাতার আকার। বাঁধান, মূল্য—৭৲ টাকা। অপারনাথ মঠ সন্ন্যাসী সংস্কৃত কালেজ, কাশী হইতে শ্রীবালানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অদ্বৈতবেদান্ত শাস্ত্রের বিচার প্রধান গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক গ্রন্থখানি সর্ব্বজনপরিচিত এবং পরমতখণ্ডন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির ভাষ্য দ্বারা যাবতীয় অন্যমত খণ্ডন পূর্ব্বক অদ্বৈতবেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার পরে তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈত মত খণ্ডনের জন্য মস্তকোত্তোলন করেন, তাঁহাদের সকলের সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া শ্রীহর্ষাচার্য্য এই খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে স্বমতের স্থাপনা নাই, কিন্তু যিনি যাহাই বলিবেন, তাঁহার কথার দ্বারাই তাঁহার মত খণ্ডিত হইয়া যায় ইহাই প্রতিপাদন করায় অনির্ব্বচনীয় বাদ-স্বরূপ অদ্বৈতবাদ ফলতঃ স্থাপিত হইয়া যায়। যেহেতু ইহাতে অন্যরূপ অদ্বৈতবাদও খণ্ডিত হইয়াছে। ইহার যুক্তি পরিপাটী এমনই চমৎকার যে, এ গ্রন্থ যাঁহার আয়ত্ত থাকে তিনি বিচারে সর্ব্বত্র অজেয় হইয়া থাকেন। তত্ত্বনির্ণয়ে অনন্দিষ্কচিত্ত হয়েন। মহামতি বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যেমন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সর্ব্বমতের খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধ শূন্যবাদ ফলতঃ স্থাপন করিয়াছিলেন, কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর পরে শ্রীহর্ষাচার্য্য প্রায় সেইরূপ পথের অনুসরণ করিয়া শ্রীশঙ্কর-প্রচারিত অনির্ব্বচনীয় বাদরূপ অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে ইহার যুক্তি-কৌশল আরও অপূর্ব্ব ও অকাট্য। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের সময় অদ্বৈতবাদ প্রায় অসপত্ন রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এজন্য এই গ্রন্থ রচিত হইবার পর ইহার কত যে টীকাদি হইতে থাকে তাহার ইয়ত্তা করা আজ আর সম্ভবপর নহে। ন্যায়শাস্ত্রের জন্মস্থান মিথিলায় এমন একদিন ছিল যে, যে-সংসারে চারি ভাই পণ্ডিত হইতেন সেই সংসারে সেই চারি ভাইই খণ্ডন প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের টীকা করিতেন, নচেৎ তাঁহারা অধ্যাপনার অনুমতি লাভ করিতে পারিতেন না। এখনও খণ্ডনের বিদ্যাসাগরী টীকা, প্রগল্ভাচার্য্যের টীকা, চিৎসুখাচার্য্যের টীকা, রঘুনাথ শিরোমণির টীকা, শঙ্কর মিশ্রের টীকা ইত্যাদি বহু টীকাই পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীহর্ষাচার্য্য অনধিকারীর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য ইচ্ছা করিয়াই এমন কঠিন করিয়াছেন, যে, ইহার সর্ব্বাংশই সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। পণ্ডিতগণের শিক্ষাবস্থার পরীক্ষা এই খণ্ডনের টীকার দ্বারা সমাপ্ত হইত। যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত মহানৈয়ায়িক মহামতি শঙ্কর মিশ্রই বোধ হয় ইহার শেষ টীকাকার। তবে এই টীকাটি ন্যায়-মতের পক্ষপাতী বলিতে পারা যায়। ইহার পর অদ্যাবধি আর কেহ ইহার টীকা করিয়াছেন কি না জানা যায় নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে কাশীধামের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করচৈতন্য ভারতী মহাশয় ইহার যে টীকা করিয়াছেন, তাহা বুঝি পূর্ব্বতন সকল টীকাকে অতিক্রম করে। ইহাতে তিনি অদ্যাবধি নব্যন্যায় প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের যে সমস্ত পরিষ্কারাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সমস্তের সন্নিবেশ করিয়া শ্রীহর্ষাচার্য্যের অদ্বৈতবেদান্তানুকূল আশয় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এজন্য টীকার কলেবর যেমন বৃহৎ হইয়াছে তদ্রূপই দুরূহও হইয়াছে। টীকার ভাষাও ভাবানুরূপ গম্ভীর, সরল, সংক্ষিপ্ত ও ভাববহুল। টীকাকার ইহাতে যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা বিচারপটুতা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কাশীস্থ শ্রেষ্ঠতম সুধীবৃন্দও চমৎকৃত হইয়াছেন শুনা যাইতেছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা-স্বরূপ ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী দর্শনসর্ব্বস্ব নামক একখানি গ্রন্থ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে সর্ব্বমত খণ্ডন করিয়া বিজ্ঞানবাদের স্থাপন, তৎপরে তাহার খণ্ডন করিয়া শূন্যবাদ স্থাপন, তৎপরে তাহারও খণ্ডন করিয়া কাশ্মীরী শৈব স্বাতন্ত্র্যবাদ নামক অদ্বৈতবাদের স্থাপন, তৎপরে তাহারও খণ্ডন করিয়া বিবর্ত্তবাদ নামক শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের স্থাপন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে রচিত এই গ্রন্থখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী লাভের যোগ্য হইল। ভারতের এই দুর্দ্দিনে শাস্ত্রবিদ্যার এই অত্যন্ত অধোগতির দিনে, আজও যে এরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ জন্মিতেছে—ইহাতে মনে হয়, আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্যা ভগবৎ কৃপায় কখনও বিলুপ্ত হইবে না। কালে কালে এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার রক্ষাসাধন করিবেন। সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্যের বিষয়, টীকাকার স্বামীজী ২৫।২৬ বৎসরের যুবক মাত্র। তিনি যেরূপ নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী ও তপস্বী সেরূপ আজকাল অতি দুর্লভ। পণ্ডিতসমাজে এই গ্রন্থের প্রচার বাঞ্ছনীয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীজয়েন্দ্র পুরী মহাশয়ের ইচ্ছাতেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতী মহাশয় সাত প্রকার খ্যাতিবাদের পরিচয় প্রদান করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের যত্নে সরস্বতী ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ভারতী মহাশয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ।

চিদ্‌ঘনানন্দ

দেশ-বিদেশের কথা

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত ৯ই ও ১০ই মার্চ্চ নিউ দিল্লীতে সম্মেলনের একবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মূল অধিবেশন ব্যতীত সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 'প্রবাসী বাঙ্গালী' এই ছয়টি শাখা-অধিবেশনও হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় (পরশুরাম) সাহিত্যশাখার সভাপতি হন এবং তাঁহার অভিভাষণের বিষয় ছিল



নিউ দিল্লীর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কর্ম্মকর্তৃসভার কয়েকজন সভ্য। বাম দিক হইতে উপবিষ্ট—শ্রীদ্বিপেন্দ্র মৈত্র, শ্রীমোহিত সেনগুপ্ত, শ্রীমতী কমলা দাস, শ্রীঅমৃত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বামদিক হইতে দণ্ডায়মান—শ্রীনীহার ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্র বসু, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীমণি মৈত্র, শ্রীগগন সাহা, শ্রীমহিমা ভট্টাচার্য্য।

'সংকেতময় সাহিত্য'। এই অভিভাষণটি বর্ত্তমান সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন দর্শন শাখার সভাপতিত্ব করেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাখার সভাপতি যথাক্রমে ডক্টর নীলরতন ধর ও শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়।"

প্রবর্ত্তক শিশু-সদন

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ সম্প্রতি চট্টগ্রামে একটি শিশু-সদন স্থাপন করিয়াছেন। দুই শত জন অনাথ শিশুকে এখানে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আহার, বাসস্থান এবং বসন-ভূষণ ব্যতিরেকে শিশুদের ক্রমশঃ এরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মনির্ভরশীল হইয়া জীবিকার সংস্থান করিতে পারে। এজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইহার সাহায্যে অগ্রসর হইলে সমাজের ও জাতির বিশেষ কল্যাণ হইবে।

দুর্গত-সেবায় নারী

মধ্যপ্রদেশ—বিলাসপুর হইতে শ্রীযুক্তা অঞ্জলি দাশ লিখিয়াছেন—

"বাংলার এই দারুণ দুর্দ্দিনে বাংলার মায়েদের কর্ত্তব্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অসহায় শিশু ও মেয়েদের যথাসাধ্য সাহায্য করা। অবসর সময়ে মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ঘরের অকেজো ও রং উঠে-যাওয়া জামা কাপড় সামান্য একটু তালি বা সেলাই করে বেশ ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারেন। আমি আমার সামান্য ক্ষমতায় ২২০ খানা নূতন খাদির ফ্রক, পেনি, ব্লাউজ, পাজামা, পাঞ্জাবী এবং প্রসূতিদের জন্য শাড়ী ও কম্বল, আমার ২।৩ জন বন্ধুর সহযোগিতায় তৈরী করে শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠিয়েছি। তিনি হিন্দুমহাসভার পরিচালিত শিশুরক্ষা আশ্রমে বিতরণ করে দেবেন। অবশ্য ঐ কাপড়-চোপড় আমি চাঁদা তুলে করিয়েছি। তাই বাংলার বাহিরে ও বাংলার মধ্যে ভগিনীদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ যে সামান্য কষ্ট করলে হয়ত কতক শিশু ও তাদের অসহায় মাতাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তাই তাঁরা যেন কিছু কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করে বাংলার প্রসিদ্ধ কয়েকটি সাহায্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেন। আপনাদের এ সাহায্যে বহু শিশু—কাতর, নগ্ন শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে ও বহু অসহায় মাতার বুকে আশার সঞ্চার করবে।"

ছাত্রীর কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রমা নিয়োগী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি' (Ancient Indian History and Culture) বিভাগে বিগত এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারতের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে ইঁহার ভবিষ্যৎ সাধনা সফল হউক, এই কামনা করি।

পরলোকে চন্দ্রমুখী বসু

চন্দ্রমুখী বসু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ার দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি দেরাদুন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া বি-এ ও এম্-এ অধ্যয়ন করেন। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার প্রদান করেন। তিনি কলিকাতার বীটন কলেজের প্রথম ভারতীয় মহিলা প্রিন্সিপাল। বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষা-প্রচেষ্টার ইতিহাসে চন্দ্রমুখী বসুর নাম স্মরণীয়। তিনি পাদ্রী ভুবনমোহন বসুর কন্যা।

ডাক্তার যতীন্দ্রচন্দ্র আইচ

সুচিকিৎসক এবং ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাক্তার যতীন্দ্রচন্দ্র আইচ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ক্যাম্পবেল বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদেও কাজ করিয়াছিলেন।



ডাঃ যতীন্দ্রচন্দ্র আইচ

পাঠ্যাবস্থায় তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসের উচ্চতর বিভাগে মনোনীত হইয়া কাজ করিবার কালে তিনি গবেষণা ও পাঠের জন্য বিলাত যাত্রা করেন, এবং লণ্ডনের স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনস্ হইতে ডি-টি-এম এণ্ড এইচ ডিপ্লোমা এবং এডিনবরার রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস হইতে এম-আর-সি-পি উপাধি লইয়া ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। বর্ত্তমান রোনাল্ডসে মেডিকেল স্কুলে অধ্যাপকরূপে কাজ করিবার কালে তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কয়েকটি রোগ এবং তাহাদের প্রতিকার বিষয়ে তাঁহার গবেষণা বিশেষজ্ঞ-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তিনি উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা নিবাসী কবি কামিনী-কুমার ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার "অবনত ভারত চাহে তোমারে এস সুদর্শন-ধারী মুরারি", "শাসনসংযত কণ্ঠ জননী গাহিতে পারি না গান" প্রভৃতি জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত সমূহ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। কামিনীবাবু স্বভাবতঃ আত্মগোপনশীল ছিলেন বলিয়া এই সমস্ত বহুল আছে। কামিনীবাবু সঙ্গীত-শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং একজন ওস্তাদ তবলা-বাদক ছিলেন। এক সময়ে 'প্রবাসী'তে তিনি সঙ্গীত-বিষয়ক পুস্তকের সমালোচনা করিতেন।

মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়

মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অডিট বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি তাঁহার নিবাধই গ্রামস্থ ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরূপে গ্রামবাসীর কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি নিবাধই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পর পর সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ঐ স্কুলের উন্নতিকল্পে এক হাজার টাকা ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে পাঁচ শত টাকা দান করেন। তিনি সারস্বত পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গত



মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়

মন্বন্তরের সময় কলিকাতা গড়পারস্থ দুর্গত-সাহায্য-কেন্দ্রে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

পরলোকে ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বসু

ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাতাশ বৎসর বয়সে বর্ম্মা মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘকাল এই বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। দুঃস্থ, দুর্গত ও দুঃখী জনের নিকট তিনি ছিলেন করুণাময় চিকিৎসক। বহু দুর্গত ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষার ভার তিনি লইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে অবস্থান কালে তিনি নানা স্কুল-কমিটি ও সৎকর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

প্রভাবতী দাশ

প্রভাবতী দাশ মহাশয়া সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মতি-বাবু ঢাকা ও বরিশাল হইতে ঋগ্বেদের যে একটি সুন্দর সংস্করণ খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতেছেন, প্রভাবতী ছিলেন তাহার প্রকাশক ও বিশেষ উৎসাহদাত্রী। তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে মতিবাবু এরূপ দুরূহ কর্ম্মে